CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

(আষাঢ়—১৩৫৩)

প্রথম খণ্ড | চতুস্ত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বিবর্ত্তনবাদ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পৃথিবী চলেছে কোন্ পথে, নাহি জানি,
সম্মুখে পিছু দক্ষিণে, বা কি বামে!
জ্যোতিষ জানি না, শুনিনি বৈদবাণী,
শুনেছি, তাহার ঘূর্ণিবেগ বা থামে।

সেই পৃথিবীরই মানুষের কথা কহি,
বয়স যাহার হাজার দশ বা বিশ;
জ্ঞানীরা বলেন, নিজের যাঁরা রহি'
উন্নতি-পথে চলে সে অহর্নিশ!

পিছনে চাহিলে হয়তো একথা ঠিক,
সম্মুখে আসে পিছু ভাবি আজ যারে,
ধ্রুবসত্য, যে জন যে ভাবে বিভু,
উন্নতি-পথ উঁচু হইতে পারে।

প্রেম, ভালবাসা, সেবা, অহিংসা-বুলি,
মানুষের লাগি' মানুষের ব্যথা যত,
আজিকে সে কথা ভুলিতে রাখ তো ভুলি,
চোখে দেখে' তবু মিছে কেন বিব্রত!

আদিম মানুষ বেবুন-বংশধর,—
এ কথা সত্য কেনে লও যদি মনে,
সন্তান তার গুহাবাসী বর্ব্বর,—
সে নাকি সত্য হয়েছে বিবর্ত্তনে!

সাপ বাঘ মো'ষ—যতেক হিংস্র প্রাণী,
দংষ্ট্রা-নখর-শৃঙ্গ-আয়ুধধর,
আপনার মাঝে করি' নানা হানাহানি
আজও তারা বেঁচে রয়েছে পরস্পর!

সত্য মানুষ একথা শুনিয়া হাসে,
বলে, কি সাধ্য মূর্খ জন্তুরে?
মোদের সভ্যতা যাঁচার কথা কি আসে?
শেষ করে' দিতে পারি মোটা ফিরে।

বুঝিতে যদিই মোদের সে অধিকার,
বিদ্যাবুদ্ধি বলতত্ত্ব কত !
মোরা যে শ্রেষ্ঠ সৃজন-সভ্যতায়
বিবর্ত্তনের শেষ ধাপে উহত !

যাযাবরি করে' আজও বেঁচে আছে যারা,
মোদের দুঃখ সাধ কি তা'রা বোঝে ?
লক্ষ টাকায় জানি যাহিবার যারা,—
মন্বন্তরে কতটুকু ধির আছে ?

নষ্টীন কামান বন্দুক গোলাগুলি,
ছিপের বাষ্প, গ্যাসের গুপ্তাঘাত,
মারণযন্ত্র দেখাইব খোলাখুলি—
আণবিক বোমা, মানবিক পরিণাম !

কিসের লজ্জা ? জানি, সে দুর্ব্বলতা,
ব্যর্থ ঘৃতীত মানিবারে ইচ্ছা !
পাপে ভয় !—সে তো ছেলে-ভুলাবার কথা,
ধর্ম্মে—মিলিত পশু আর বর্ব্বর !

বানর, ভল্লুক, সাপ, বাঘ—সবে মিলে'
সৃজন মোদের সৃষ্টি-বিবর্ত্তনে,
শ্রেষ্ঠ শক্তি তাই মোরা এ নিখিলে,
পৃথিবীর শেষ মহামানবেরক্ষণে !

মরণু হিংসা জয় বিনাশের জয়,
জয়-জয়ন্ত নব-মোহ-পরিণাম,
জয়-জয়ন্ত অক্ষয়তার জয়,
লহ লহ জীব চিরমত্ত-প্রাণ।

P30439

মৃত্যুর পারে

রায় বাহাদুর শ্রীতারকচন্দ্র রায়

বার্ট্রাণ্ড রাসেল "A free man's worship" নামক সুপরিচিত প্রবন্ধে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন,

"বিনা কারণে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। যদি সৃষ্টে মানুষের উৎপত্তিরও কারণ আছে। তোমরা বল এক সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, দয়াবান ও করুণাময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় মানুষের উৎপত্তি। মানুষ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইলে, তাহাকে কি রূপ দিবেন, তাহা তিনি মনে কল্পনা করিয়াছিলেন, মানুষের সৃষ্টিও সেই কল্পনার অনুরূপ হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এরূপ ইচ্ছা ও কল্পনা করিয়া কেহ মানুষ সৃষ্টি করে নাই। যে যে কারণের সমবায়ে মানুষের উৎপত্তি, তাহাতে উদ্দেশ্য অথবা কল্পনা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কেননা তাহারা সকলেই জড় ও অচেতন। মানুষের উৎপত্তি, মানব-সমাজের বৃদ্ধি ও উন্নতি, মানুষের আশা ও ভয়, তাহার ভালবাসা ও বিশ্বাস,—সকলই শুধু পরমাণু-পুঞ্জের আকস্মিক সমবায়ের ফল। উৎসাহ, বীরত্ব, চিন্তা ও ভাবের তীব্রতা—কিছুতেই মৃত্যুর পরপারে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন রক্ষা করিতে পারে না। মানুষের যুগ-যুগান্তরব্যাপী সাধনা, তাহার প্রতিভা, তাহার প্রেরণা, মানবীয় মস্তিষ্কের মাধ্যাহ্নিক জ্যোতিঃ সমস্তই, সৌর জগতের বিরাট মৃত্যুর সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং মানব-কীর্ত্তির সমগ্র সৌধ বিশ্বত্ত বিষের অনিবার্য্য ধ্বংসের নিম্নে অনিবার্য্য সমাধি প্রাপ্ত হইবে। এই সব সর্ব্বনিশ্চয় সত্যের অটল ভিত্তির উপরেই এখন হইতে আত্মার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ধ্যান করা সম্ভব হইতে পারে।"

রাসেল অবশ্যই দৃঢ়তরভাবে অনেকে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। মানব ও জগতের পরিণাম সম্বন্ধে তাঁহাদের একটুও সন্দেহ নাই। সে পরিণাম অনিবার্য্য বিনাশ।

রাসেলের উক্তি তাঁহার এক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া সার অলিভার লজ বলিয়াছেন "এই নিশ্চয়াত্মক নৈরাশ্যব্যঞ্জক উক্তির মধ্যে যে দৃঢ় প্রতীতির সুর অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাকে বিদ্রোহাত্মক পূর্ণ বলিয়া মনে হয়।" বাস্তবিক মানবের এই শোচনীয় পরিণতি ব্যক্ত করিতে লেখকের লেখনি একটুও ইতস্ততঃ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাই যদি মানবের যাই ও সবই জীবনের পরিণাম হয়, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা শোচনীয় সত্য আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বীর মতের অসারত্বের জন্য চিন্তিত নহেন। তাঁহার কাজ সত্যের আবিষ্কার—সে সত্য যতই অপ্রীতিকর হউক। মানুষের অস্তিত্ব যদি তাহার পার্থিব জীবনকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে সত্য জানাতেই তাহার মঙ্গল, মিথ্যা আশায় তাহাকে প্রলুব্ধ করা অন্যায়। রাসেল যে একটা নূতন মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা নয়। আমাদের দেশে চার্ব্বাক-দর্শনেও মোহাভিভূত চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ" ইহা চার্ব্বাকমতাবলম্বীদিগেরই কথা।

কিন্তু রাসেলের এই বিদ্রোহাত্মক কি উপযুক্ত কারণ আছে?

ভক্তবাদীদিগকে বাস্তবিক পরাস্ত করিয়াছেন? এই প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চাই যে—রাসেলের মতের সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি নাই। প্রথমে আমরা দেহের সঙ্গে চৈতন্যের সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব, মৃত্যুতে চৈতন্যের বিনাশ হইবার যথেষ্ট কারণ নাই। তারপরে দর্শনের (metaphysics) দিক হইতে আমরা বিষয়টির আলোচনা করিয়া সর্বশেষে মৃত্যুর পরে জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান করিব।

বৈজ্ঞানিকদিগের কঠোর সমালোচনা সত্ত্বেও জগতের অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে, মৃত্যুতে দেহের বিনাশ হইলেও মানুষের সমগ্র সত্তার বিনাশ হয় না। তাঁহাদের মতে বোধবিশিষ্ট আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র। মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে। আত্মা শব্দ "অত্" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। "অত্ ধাতুর অর্থ গমন করা।" মৃত্যুকালে যাহা জীবদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাই আত্মা। আবার সকল গত্যর্থ ধাতুর অন্য অর্থ জ্ঞান। সুতরাং 'আত্মা' অর্থ "জ্ঞানবান"ও হয়। আমাদের ন্যায়-শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, যাহা জ্ঞানের অধিকরণ, তাহাই আত্মা (জ্ঞানাধিকরণমাত্মা)। এই "অধিকরণ" দেহ হইতে স্বতন্ত্র এবং দেহের বিনাশে তাহার বিনাশ হয় না। ইহা চিৎ পদার্থ—চৈতন্যস্বরূপ।

এখন দেখা যাউক দেহের বিনাশে চৈতন্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী কিনা। বৈজ্ঞানিক বলেন, মস্তিষ্ক হইতে চৈতন্যের উদ্ভব, মস্তিষ্ক কারণ, চৈতন্য তাহার কার্য্য। পাকযন্ত্রী নষ্ট হইলে, তাহার কার্য্য ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক দ্বারা রক্ত-স্নেহ-মাংসের উৎপাদন যেমন আর হয় না, তেমনি মস্তিষ্ক নষ্ট হইলে তাহার কার্য্যও আর থাকে না। মস্তিষ্কের কার্য্য জ্ঞান উৎপাদন ও জ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতি বহন করা। মৃত্যুতে মস্তিষ্কের ধ্বংস হইলে, নূতন জ্ঞানও যেমন আর উৎপন্ন হয় না, তেমনি জ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতিও থাকে না। যাহাকে আত্মা বলা হয়, তাহার সাক্ষাৎ কোথাও পাওয়া যায় না। আমাদের প্রতীতি, (perception) জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ-দুঃখবোধ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক ব্যাপারই মস্তিষ্কের কার্য্য। মস্তিষ্কই এ সকলের অধিকরণ। সুতরাং "আত্মা" শব্দ যদি ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে মস্তিষ্কই এই শব্দ-বাচ্য। মস্তিষ্কের সঙ্গে এ সকলের ধ্বংস অনিবার্য্য। সুতরাং মৃত্যুর পরে মস্তিষ্কের কার্য্যগুলির থাকিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বাস্তবিক অন্যান্য দৈহিক করণের (organ) সহিত তাহাদের কার্য্যের (function) যে সম্বন্ধ, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞানের যদি সেই সম্বন্ধ হয় এবং মানুষের জ্ঞান, প্রত্যয়, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারগুলি যদি বাস্তবিকই তাহার ইন্দ্রিয়, স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্য্য হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে তাহাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন ওঠা অসম্ভব। কিন্তু সম্বন্ধ যে একই জাতীয়, তাহা বলিবার উপযুক্ত প্রমাণের অভাব।

পাকাশয়ের কার্য্য (function) খাদ্য জীর্ণ করিয়া রক্তে পরিণত করা। সেই রক্ত শিরাকর্তৃক হৃদয়ে নীত হয়, সেখান হইতে ফুসফুসে প্রেরিত হইয়া তত্রত্য বায়ু হইতে প্রয়োজনানুরূপ অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং অঙ্গার ও জল পরিত্যাগ করে; পরে হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া ধমনী-উপধমনীসহযোগে শরীরের সর্বাংশে পুষ্টি ও তাপ বহন করিয়া লইয়া যায়। শরীরের যে সমস্ত প্রেষ্টিকর্তৃক এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারা মেরুদণ্ড হইতে উদ্ভূত স্নায়ুমণ্ডলিকর্তৃক চালিত হয়। স্নায়ুতন্ত্রের সমস্ত কার্য্য প্রত্যক্ষ করা সম্ভব না হইলেও, কল্পনার সাহায্যে বুঝিতে কষ্ট হয় না। সুতরাং সে ক্ষেত্রেও আমরা পদার্থবিদ্যার (physics) সীমার মধ্যে থাকি, একটী ভৌতিক কার্য্যের পর অন্য ভৌতিক কার্য্য দেখিতে পাই। সমস্তই আণবিক গতি (molecular movement), ইচ্ছানিরপেক্ষ (reflex)। আমাদের অজ্ঞাতসারে সমস্ত সম্পন্ন হয়। কিন্তু সজ্ঞান ও ইচ্ছাকৃত (conscious voluntary) কার্য্যের ক্ষেত্রে আমরা এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের সম্মুখীন হই, তাহার সহিত আণবিক গতির কোনও সাদৃশ্য আমরা খুঁজিয়া পাই না। উভয়ের মধ্যে কোনও সেতু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। সেখানে আমাদের কল্পনাশক্তি স্তম্ভিত হইয়া পড়ে এবং যে তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করি, তাহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অপরিচিত, আণবিকগতির সাহায্যে তাহাকে বুঝিতে পারা অসম্ভব। আণবিক গতি কিরূপে জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছার রূপান্তরিত হইতে পারে এবং জ্ঞান, অনুভূতি এবং ইচ্ছাই বা কিরূপে আণবিক গতিতে পরিণত হইতে পারে, তাহা দুর্বোধ্য নয়, অবোধ্য। বৈজ্ঞানিকপ্রবর অধ্যাপক টিণ্ডাল (Tyndall)ও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। চুম্বক-সূচির উপর বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহিত করাইলে সূচি দিক্ পরিবর্ত্তন করে। এই প্রত্যক্ষ ব্যাপারের সহিত মস্তিষ্কের উত্তেজনা ও তৎপরবর্ত্তী সজ্ঞান মানসিক (conscious) অবস্থার তুলনা করিয়া টিণ্ডাল বলিয়াছেন, "এই দুইটী ব্যাপার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বৈদ্যুতিক স্রোত কিরূপে সূচিতে সংক্রমিত হয়, তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলেও, আমরা তাহার কল্পনা করিতে পারি (thinkable) এবং একদিন যে পদার্থবিদ্যার নিয়মানুসারেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে, সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু মস্তিষ্কের স্পন্দন কিরূপে মানসিক অবস্থার পরিণত হইতে পারে, তাহা কল্পনা করিতে আমরা অসমর্থ। স্বীকার করিলাম, মস্তিষ্কের ক্রিয়া এবং মনের প্রত্যয় (thought) একই সময়ে উৎপন্ন হয়, কিন্তু আমাদের এমন বুদ্ধি নাই, যাহার সাহায্যে যুক্তিদ্বারা উহাদের একটী হইতে আমরা অন্যটীতে পৌঁছিতে পারি। একসঙ্গে তাহারা আবির্ভূত হয়, কিন্তু কেন হয়, তাহা জানি না। আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তি যদি এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত, যে আমরা মস্তিষ্কের প্রত্যেক পরমাণু দেখিতে ও অনুভব করিতে পারিতাম, তাহাদের স্পন্দন, সঞ্চালন, বৈদ্যুতিক স্ফুরণ, সমস্তই স্পষ্টভাবে অনুসরণ করিতে পারিতাম, এবং তাহাদের সমকালে জ্ঞাত মানসিক প্রত্যয় ও অনুভূতির সহিতও যদি পরিচিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলেও 'এই সমস্ত ভৌতিক ব্যাপারের সহিত মানসিক ব্যাপারের কি সম্বন্ধ' এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতাম না। দুই শ্রেণীর ঘটনাবলীর মধ্যে যে 'দুর্লঙ্ঘ্য গহ্বর' তাহা দুর্লঙ্ঘ্যই থাকিয়া যাইবে"।*

* Fragments of Science, Scientific Materialism Quoted in Martineau's Study of Religion, PP-311-12, Vol II.

সুতরাং এ কথা বলিলে অযৌক্তিক হইবে না, যে মস্তিষ্কের মধ্যে আণবিক স্পন্দন, তাহাদের সমবায় ও বৈদ্যুতিক ঘূর্ণন, ইহাই মস্তিষ্কের কার্য্য (function), যেমন ফুস্ফুস্ এর রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা রক্ত, মেদ ও মাংসে পরিণত করা পাকাশয়ের কার্য্য এবং অঙ্গারকে অঙ্গারক সাহায্যে রক্ত করা ফুস্ফুসের কার্য্য। যে প্রকারের কার্য্য মস্তিষ্কে সম্ভব হয়, তাহা এবং চৈতন্যের ইচ্ছার মধ্যে ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য। সুতরাং চৈতন্য, ইচ্ছা ও অন্যান্য মানসিক ব্যাপারকে মস্তিষ্কের কার্য্য বলিবার কোনও যুক্তি নাই। তাহারা যুগপৎ আবির্ভূত হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতে। অধ্যাপক টিণ্ডালের মতে এই দুই জগতের মধ্যে কেবল যে বর্ত্তমানেই কোনও সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না তাহা নয়, ভবিষ্যতেও কখনো তাহাদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ সূচিত হইবার সম্ভাবনা নাই। দৈহিক ও মানসিক ঘটনার মধ্যে ব্যবধান যদি এইরূপই দুর্লঙ্ঘ্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের একটী হইতে অন্যটী সম্বন্ধে কোনও অনুমান লব্ধ হইতে পারে না। "দৈহিক ঘটনা ঘটিলেই, তাহার পরে মানসিক ঘটনা ঘটিবে"—একথা বলা যদি সঙ্গত না হয়, তাহা হইলে দৈহিক কার্য্যের বিরতি ঘটিলেই মানসিক কার্য্যেরও বিরতি ঘটিবে, একথা বলাও সঙ্গত হয় না। দৈহিক ও মানসিক অবস্থার সংযোগ যদি নিয়ত (necessary) না হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিয়োগকে অনন্তর বলা চলে না। দৈহিক লক্ষ ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও তাহাদের মধ্যে কোথাও যদি চৈতন্যের সাক্ষাৎ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে মৃত্যুতে তাহাদের নিবৃত্তিতে চৈতন্যেরও নিবৃত্তি কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এইমাত্র শুধু বলা চলে, যে মৃত্যুর সঙ্গে চৈতন্যের নিবর্ত্তন ও প্রমাণ অন্তর্হিত হয়। কিন্তু মস্তিষ্কের দৈহিক কার্য্যাবলির অন্তরালে যে অদৃশ্য জগৎ বর্ত্তমান আছে, তাহার কার্য্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর; তাহার সহিত দেহের কি সম্বন্ধ তাহা আমাদের অজ্ঞাত। সে-জগৎসম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করিবার যোগ্যতা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নাই।

জড়জগতে শক্তির পরিমাণ সর্ব্বত্র, সর্ব্বশক্তির পরিমাণ-ভেদ নাই, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। একস্থানের জগতের আছে, গতি তাপে রূপান্তরিত হয়, তাপ গতিতে পরিণত হয়, কিন্তু জগতের সমগ্র শক্তির পরিমাণ ঠিকই থাকে, শক্তির বিনাশ নাই। শক্তির এই অবিনশ্বরতা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে Conservation of Energy নামে পরিচিত। মানুষের জীবন ও মৃত্যুতে এই তত্ত্বের প্রয়োগে কি ফল হয়, এখন আমরা তাহার আলোচনা করিব। প্রথমে মস্তিষ্কের ক্রিয়া ও তৎপরবর্ত্তী ইচ্ছাকৃত (Voluntary) কার্য্যের আলোচনা করা যাউক। মনে করুন, আপনি নির্জ্জনে বসিয়া উপাসনায় রত আছেন। এমন সময় আমি আস্তে আস্তে আপনার কাছে গিয়া কানে কানে বলিলাম "আপনার বাটীতে আগুন লাগিয়াছে।" শুনিয়াই আপনি লাফাইয়া উঠিলেন, দৌড়িয়া বাড়ী গেলেন এবং শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া গৃহ রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। "আপনার বাটীতে আগুন লাগিয়াছে" এই চৌদ্দ অক্ষর-যুক্ত বাক্য উচ্চারণ করিতে আমি যে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বায়ুর স্পন্দনরূপে আপনার কর্ণপটহে আঘাত করিয়াছে, এবং শ্রৌত স্নায়ুতে শব্দের উৎপন্ন করিয়াছে। স্নায়ুরা সেই [illegible] চালিত হইয়া তাহাকে শব্দিত করিয়াছে এবং মস্তিষ্ক হইতে সেইটে সংক্রামিত হইয়া শরীরকে চালিত করিয়াছে। [illegible] শব্দ করেকটী ধ্বনি বায়ুতে যে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, এবং শক্তির পরিমাণ তাহার সমান এবং স্নায়ুতে যে শক্তি [illegible] হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল, সে শক্তির পরিমাণও সেই শক্তির সমান। মস্তিষ্কে সঞ্চারিত শক্তির পরিমাণ স্নায়ুপ্রবাহিত শক্তির সমান। কিন্তু মস্তিষ্কের স্পন্দনের ফলে যে শক্তি সেইটে সংক্রামিত হইল, তাহার পরিমাণ এত বেশী, যে তাহা আপনাকে আসন হইতে টানিয়া তুলিল, এবং তাহার পরবর্ত্তী বিপুল প্রযত্নসাধ্য কার্য্য আপনার দ্বারা সম্পাদন করাইল। এই নূতন শক্তি কোথা হইতে আসিল? উত্তরে বলা যাইতে পারে স্নায়ুসঞ্চিতে যে শক্তি অব্যক্তরূপে সঞ্চিত ছিল, তাহা ব্যক্ত হইয়া কার্য্যকরী হইয়াছে, যেমন বন্দুকের ঘোড়া টিপিলে বারুদের অব্যক্তশক্তি (potential Energy) কার্য্যকরী (Kinetic) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই হিসাবে কি কোনও ভুল নাই? মস্তিষ্ক ও চৈতন্যের মধ্যবর্ত্তী অধ্যাপক-টিণ্ডাল-কথিত "অলঙ্ঘ্য সঙ্কটের" অপর পারের ঘটিত ঘটনার সহিত সেইটে সঞ্চারিত শক্তির পরিমাণের কি কোনও সম্বন্ধ নাই? আমি যে বাক্যটী আপনার কানে কানে বলিয়াছি, তাহার অর্থের সহিত সে শক্তির পরিমাণের কি কোনও সম্বন্ধ নাই? "আপনার বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে" এবং "আপনার বাড়ী নিরাপদে আছে" এই দুইটী বাক্যের মধ্যে প্রভেদ কি শুধু বাক্য দুইটী উচ্চারণ করিতে বায়ুতে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহারই প্রভেদ? তাহা যদি না হয়, যদি দুই বাক্যের মধ্যে অর্থের যে বিভেদ আছে, তাহার সঙ্গে আপনার দৈহিক কার্য্যের সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে আপনার মননই (thought) এই বিভেদের কারণ বলিতে হইবে। এই দুই ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে যে আণবিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা বিভিন্ন। কিন্তু এই বিভিন্নতা শ্রৌত স্নায়ুর কার্য্যের বিভিন্নতা-হেতুক নয়; বাক্যদ্বয়ের অর্থের বিভিন্নতা-হেতুক। অধ্যাপক টিণ্ডালের "দুর্লঙ্ঘ্য সঙ্কট" এখানে লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন "পূর্ব্বাপরব্যক্ত কারণ ও কার্য্যের শৃঙ্খলের (Chain of antecedence and sequence) মধ্যে কোথায় কি মানসিক ক্রিয়া প্রবেশ করিয়া দৈহিক চেষ্টা ও তৎপরবর্ত্তী মানসিক অবস্থা উৎপাদন করে, অথবা মানসিক অবস্থা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার অবাস্তর ফল মাত্র এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সহিত তাহার মুখ্য সম্বন্ধ নাই, ইহাই বিচার্য্য। মস্তিষ্কের অণুপরমাণুর মধ্যে কিরূপে মানসিক অবস্থার স্থান হইতে পারে, এবং তাহা এক অণু হইতে অন্য অণুতে কিরূপে গতি সংক্রামিত করিতে পারে, তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না। এরূপ ঘটনার আণবিক ক্রিয়াগুলির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং মস্তিষ্কের কার্য্য মানসিক ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না, এই সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাহারা মস্তিষ্ককে যন্ত্রমাত্র (automaton) মনে করেন, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে মানসিক অবস্থা মস্তিষ্কের বিভিন্ন আণবিক সংস্থানের ফল।

কল্প ক্রিয়া কর্তৃক মস্তিষ্কের মানসিক ক্রিয়ার উৎপত্তির ধারণা দেখাইতে পারি না, তেমনি মস্তিষ্কের মানসিক ক্রিয়া কর্তৃক আমরা যে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, তাহার ধারণা করিতেও আমি করিব, তাহা কল্পনাতীত, তাহা যদি অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে উহার বর্জন করা কর্তব্য। কিন্তু আমি দুই মতের কোনটিই বর্জন করিতেছি না। জড়বাদের পূর্ববর্ণিত তথ্য সকল নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াও আমি সেই রাসায়ণ মতকে ধূলাবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতেছি, যাহার ধরণীর অন্তর্ভেদী ক্ষমতাও আপনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার তত্ত্বাবধারণে সমর্থ হয় নাই।"

আচার্য্য টিণ্ডাল যে বস্তুতন্ত্রতাবাদীদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মতে জীবদেহ যন্ত্রতন্ত্র মাত্র বিশেষ। মস্তিষ্ক এই যন্ত্রের কেন্দ্র এবং তাহার ক্রিয়ার দ্বারাই যন্ত্র চালিত হয়। দেহের যাবতীয় চেষ্টা দৈহিক কারণেরই ফল, তাহারা আত্মার অপেক্ষা করে না। যাবতীয় মানসিক অবস্থা কিন্তু দৈহিক ক্রিয়ারই ফল। তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মস্তিষ্কের ক্রিয়া ব্যতীত কোনও মানসিক অবস্থাই উৎপন্ন হয় না। আমাদের ইচ্ছায় শরীরে যে চেষ্টার উদ্ভব হয়, ইচ্ছা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল বলিয়া সে শারীরিক চেষ্টাও মস্তিষ্কেরই ক্রিয়ার ফল। এই মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মৃত্যুতে মস্তিষ্কের নাশে সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার লোপ হইতে বাধ্য। এই মতের একটু আলোচনা আবশ্যক।

মানসিক ক্রিয়া যদি মস্তিষ্কের ক্রিয়ার অবান্তর ফল (by-products) হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, এই অবান্তর ফল উৎপাদনে মস্তিষ্কের শক্তি ব্যয়িত হয় কি না। যদি এরূপ হয় যে মানসিক ক্রিয়াকে গণনার মধ্যে না ধরিয়াও দৈহিক শক্তি ঠিক থাকে, তাহার কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মানসিক অবস্থার উৎপাদনে দৈহিক শক্তির কোনও অংশ ব্যয়িত হয় না, Conservation of Energyর নিয়ম এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে এবং মন জড় হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। আবার দেখা যায়, দৈহিক শক্তির কিয়দংশ চৈতন্য ও মননের (Consciousness & thought) উৎপাদনে ব্যয়িত হয়; তাহা হইলে, Conservation of Energyর নিয়মানুসারে দৈহিক শক্তির এই অংশ অন্য কোন উৎপন্ন করিয়া জড়জগতে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ। এ ক্ষেত্রে মনও জড়-নিরপেক্ষ নহে, জড় ও মন-নিরপেক্ষ নহে। উভয়ে উভয়ের উপরে ক্রিয়া করিতে সক্ষম। সুতরাং দেহের স্বতন্ত্রত্ব থাকে না।

উপরি উক্ত তর্কের ফল যাহাই হউক, আচার্য্য টিণ্ডাল মস্তিষ্ক ও চৈতন্যের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয়, তাহা বুদ্ধিগম্য নহে বলিয়াছেন। তাহাই যদি হয়, মস্তিষ্কের ক্রিয়া এবং মনের ক্রিয়ার পরস্পর সংযোগ যদি এতই অচিন্তনীয় ব্যাপার হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিয়োগকে অসম্ভব বলিবার কোনও কারণ নাই। অন্ততঃ দেহের সঙ্গে মানসিক জীবনকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিবার সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

মৃত্যুতে দৈহিক শক্তির কি পরিণাম হয় তাহা দেখা যাউক। শক্তির রূপান্তর হয় মাত্র। অম্লজান, জলজান, অঙ্গার ও যবক্ষারজান পরস্পর মিলিত হইয়া যে শরীর গঠন করিয়াছিল, মৃত্যুতে তাহারা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া প্রকৃতির সাধারণ ভাণ্ডারে ফিরিয়া যায়। এই প্রত্যাবর্ত্তনের সময় শক্তির (Energy) একটুকুও নষ্ট হয় না; কিয়দংশ অব্যক্তাবস্থা (potential state) প্রাপ্ত হয়, অবশিষ্টাংশ মূতন রাসায়নিক পদার্থের গঠনে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এই শক্তির মধ্যে মনন (thinking), আবেগ (feeling) ও ইচ্ছা (willing) সংক্রান্ত কোনও শক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই সমস্ত মানসিক ক্রিয়া যদি "শক্তি" সংজ্ঞার অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে তাহারা যখন উপরিউক্ত শক্তির মধ্যে নাই, তখন তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহারা যদি শক্তিই না হয়, তাহা হইলে তাহারা জৌতিক জগতের বাহিরে অবস্থিত, Law of conservation of Energy তাহাদের উপর প্রযোজ্য নহে, এবং প্রাকৃতিক জগতের ভাগ্যের সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই, বলিতে হইবে। চৈতন্যকে দেহের অবান্তর ফলস্বরূপ বলিব, অথচ দেহের সঙ্গে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী বলিব—ইহা পরিষ্কার উক্তি মাত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মৃত্যুতে দেহের বিনাশ হয় বলিয়া দেহের সঙ্গে দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্যেরও বিনাশ হইতেই হইবে, এমন কোনও যুক্তি নাই। মৃত্যুতে চৈতন্যের ব্যবহারিক নিদর্শনের লোপ হয় সত্য, কিন্তু অন্য নিদর্শনের সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এখন আপত্তি হইতে পারে উপরিউক্ত যুক্তি অনুসারে ইতর জীবেরও দেহাতিরিক্ত সত্তা থাকা সম্ভব। ইতর জীবের অনুভূতি, প্রজ্ঞা ও সহজাত বুদ্ধি এবং তাহাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়ার মধ্যেও আচার্য্য টিণ্ডালের "দুর্লঙ্ঘ্য সম্বন্ধ" বর্ত্তমান, এবং তাহাদের দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চৈতন্যেরও যে বিনাশ হইতেই হইবে, ইহা বলা সম্ভব নহে। ইতর জীবেরও যে আত্মা আছে এবং দেহের সঙ্গে তাহার বিনাশ হয় না, এ মত আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে, অন্যত্রও প্রচলিত ছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাবে বর্ত্তমানে অনেকের ইহাতে আস্থা নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে অযৌক্তিক কিছু নাই এবং যুক্তি দ্বারা ইহার খণ্ডনও সুসাধ্য নহে। এই মতে জীবাত্মার যে কেবল মৃত্যু নাই, তাহা নহে—তাহার জন্মও নাই, তাহা অজ, নিত্য, শাশ্বত, স্বীয় কর্ম্মের পুরস্কার ও শাস্তিরূপে নানা যোনি প্রাপ্ত হয়; আজ যে কীট যোনিতে আছে, কাল সে বানরযোনি প্রাপ্ত হইতে পারে, যে মানুষ আজ দুষ্কৃতির ফলে সে পশুযোনিতে জন্মিতে পারে। এই মতের খণ্ডন সুসাধ্য না হইলেও, প্রমাণদ্বারা বৈজ্ঞানিক ভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা সুসাধ্য নহে। ইতর জীবের অহংকারিক একত্ব (personal identity) আছে কি না, সন্দেহের বিষয়। মানুষে এই একত্ব পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। কৈশোর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলিয়াই জানি। পঞ্চম বৎসর যখন আমার বয়ঃক্রম ছিল, তখনকার "আমি" আর আজকার বৃদ্ধ বয়সের আমি যে একই ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই, যদিও আমার তখনকার দেহ ও বর্ত্তমান দেহের

করা প্রভৃতি প্রভেদ, তখন যে যে পরমাণুতে আমার দেহ গঠিত ছিল, তাহার একটীও বর্ত্তমানে আমার দেহে নাই। মৃত্যুর পরে জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে, এই কথা যখন বলা হয়, তখন জীবাত্মা দৈহিক জীবনের স্মৃতি, জ্ঞান ও অনুভূতিরও বর্ত্তমান থাকে, তাহার স্বতন্ত্রসত্তা থাকে, পার্থিব জীবনের সঙ্গে তাহার একত্ব বোধ থাকে, ইহাই বলা আমাদের অভিপ্রেত। মৃত্যুতে দৈহিক একত্ব বিনষ্ট হয়, দেহের পরমাণু সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাদের সমবায়ে ও পরস্পরের সহযোগিতায় দেহে যে দৈহিক একত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু দৈহিক একত্বের বিনাশ হইলেও, মানসিক একত্ব, আত্মিক একত্ব, অহংকারিক একত্বের বিনাশ হয় না ; পার্থিবজীবনের জ্ঞান ও স্মৃতি-সংবলিত "আমিত্বে" বিদেহ অবস্থায় নূতন অভিজ্ঞতা সংযুক্ত হইয়া সেই 'আমিত্বের' ধারাবাহিকতা চলিতে থাকিবে—ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। ইতর জীবের এই অহংকারিক একত্ব আছে কিনা, পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি পরজীবনে তাহাদের থাকে কিনা, তাহাদের জ্ঞান, কর্ম্ম ও অনুভূতি নিজের জ্ঞান, কর্ম্ম ও অনুভূতি বলিয়া তাহারা মনে করে কিনা, তাহা স্পষ্টভাবে আমাদের বুঝিবার উপায় নাই। পার্থিব জীবনেই যদি এই একত্ব না থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে কোন্ একত্ব থাকিবে? এই যুক্তিতে অনেক পরলোক-বিশ্বাসী পাশ্চাত্য পণ্ডিত মৃত্যুর পরে ইতর জীবের স্থায়িত্বে বিশ্বাস করেন না। এ বিষয়ে স্থানান্তরে আমরা আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে মানবাত্মার পরিণামই আমাদের আলোচ্য।

জীবদেহগঠনে অসাধারণ কৌশল লক্ষ্য করিয়া আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু এই কৌশল হইতে কৌশলী কোনও পুরুষের অনুমান এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই কৌশল প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা কল্পনা করা বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় নিষিদ্ধ। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় উদ্দেশ্যের (purpose) স্থান নাই। "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" (natural selection) সমস্ত কৌশলের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ বলিয়া গণ্য। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কার্য্য-সম্পাদনের জন্য বিশেষ বিশেষ দৈহিক করণের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা কল্পনা না করিয়াও, মানবদেহের করণগুলি (organs) ও তাহাদের কার্য্যের (function) মধ্যে একটা আনুপাতিক সমতা আশা করা যেমন অন্যায় নহে, সেইরূপ মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি (faculty) এবং তাহার জীবনের গতীর মধ্যেও একটা সাম্য আশা করা স্বাভাবিক। প্রাণীবিশেষের সহজাত সংস্কার (instinct), তাহার ইন্দ্রিয়প্রত্যয় (perception) ও তাহার ঘ্রাণ-জ্ঞেয়ের পরিচয় পাইলেই আমরা তাহার জীবনের গতী ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারি। তেমনি বিপরীত ক্রমে কোনও অন্তর করণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে আমরা তাহার প্রকৃতি ও সে কোন্ কার্য্যে পটু, তাহা অনুমান করিতে পারি। প্রাণীদেহের রক্ষণ ও পোষণই তাহার সহজাত সংস্কারের ধর্ম্ম। দেহের স্বাভাবিক শক্তি-দ্বারা তাহার রক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, ক্ষুধা ও তাহার সহকারী সূচনপটুতাদ্বারা তাহার পুষ্টি সাধিত হয়, ভয় ও সাহসদ্বারা আত্মরক্ষা হয়, এবং গর্ভধারণ ও সন্তানবিস্তারের পটুতাদ্বারা তাহার আত্মজের ব্যবস্থা হয়; অন্তরিন্দ্রিয়ের সংরক্ষণ ও আত্মরক্ষা হয়। কীটবিশেষের বুদ্ধির প্রাচুর্য্য দেখিয়া আমরা যে আশ্চর্য্যান্বিত তাহাদের সৃষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের প্রয়োজনসাধনে সেই বুদ্ধির বোধিতাই তাহার কারণ। এই উপযোগিতাদ্বারাই আমরা জীবদেহের সহজাত বুদ্ধির বিচার করি। দেহের জন্য যাহা প্রয়োজন, দৈহিক করণ সহজাত সংস্কারদ্বারা যখন তাহা পূর্ণরূপে সাধিত হয়, তখন তাহাদিগকে আমরা নির্দ্দোষ বলি ; প্রয়োজন সাধিত হইলেই তাহাদিগের কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। ইহার অধিক যাহা তাহাদিগের নিকট করা যায় না। বস্তুতঃ জীবদেহে একটা যন্ত্রবিশেষ। ইহার রক্ষণ, পোষণ ও ক্ষতিপূরণের জন্য নানা সজ্ঞান ও অজ্ঞান শক্তি ইহার মধ্যে নিহিত কিন্তু এমন কোনও প্রবৃত্তি অথবা কার্য্যপটুতা নাই, যাহা এই পরিপোষক নয়। সুতরাং যখন ইতর জীবের দেহ নষ্ট হয়, তখনই তাহাদের এই সকল প্রবৃত্তি ও সহজাত বুদ্ধির অস্তিত্বের কারণও অন্তর্হিত হয়। অতএব ইতর জীবের দৈহিক ও মানসিক জীবনের স্থিতিকাল সমান হইলেও, তাহাতে কোনও অসঙ্গতি লক্ষিত হয় না। আমাদের সৃষ্টি যতক্ষণ আমাদের দৈহিক জীবন অতিক্রম করিয়া না যায়, ততক্ষণ আমাদের সংস্কার সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। দেহের রক্ষণের পক্ষে দৈহিক প্রয়োজন সাধক প্রবৃত্তিগুলির থাকিবার কোনও প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমাদের এমন কতকগুলি প্রবৃত্তিও আছে, যাহারা মুখ্যতঃ দেহের প্রয়োজন সাধক না হইলেও গৌণতঃ বটে। অর্থসঞ্চয়ের প্রবৃত্তি, সুখলিপ্সা, ক্ষমতার লালসা প্রভৃতি এই শ্রেণীর। কিন্তু এই সকল প্রবৃত্তিও রূপান্তরিত হইয়া এখন অন্যরূপে প্রাপ্ত হয়, যে তাহাদিগকে মানবের পার্থিব জীবনাপেক্ষা উচ্চতর জীবনের উপযোগী বলিয়াই মনে হয়। ইতর জীবের ক্ষুধা, যাহা প্রত্যেকবার ভোজনের সঙ্গে অন্তর্হিত হয়, তাহাই যখন মানবে শিল্প, উদ্যম, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও আনুষঙ্গিক অধিকারের উৎসরূপে, চুক্তি ও বিনিময়ের ভিত্তিরূপে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষারূপে দেখা যায়, তখন বিস্মিত হইয়া আমরা ভাবি, ইতর জীব ও মানবের নিয়তি কি অভিন্ন? যখন দেখি, যে সমস্ত প্রবৃত্তি দেহের সেবকরূপে ইতর জীবে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহারাই দেহের নির্ব্বাতিশয্যের উপর প্রভাব করিয়া দেহের উপর প্রভুর শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তখন আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়ি। আবার যখন মানুষের ব্যাবর্ত্তক গুণগুলির (distinguishing attribute) চিন্তা করি, তখন তাহাদিগকে দৈহিক জীবনের সাধনরূপে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিষয়-বুদ্ধির দ্বারা পরিপাক-কার্য্যের সহায়তাও হয় না, শরীরের তাপও নিয়ন্ত্রিত হয় না, কোনও শত্রুও দমিত হয় না। বরং ইহা হইতে যে অসন্তোষের উৎপত্তি হয়, যে উৎসাহের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহাতে দৈহিক স্বাস্থ্য অনেক সময় নষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু বিষয় জীবনের পরিধি প্রসারিত করিয়া তাহাকে উচ্চতরস্তরে প্রতিষ্ঠিত করে, অজ্ঞানাকে জানিবার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে এবং যেনকালে সীমাহীন পরিপূর্ণতার দিকে জীবনকে আকৃষ্ট করে। সৌন্দর্য্যবোধ আর এক বৃত্তি। ইতর জীবনে ইহার সামান্য কিছু স্থান থাকিতে পারে, পুরুষকে আকৃষ্ট করিবার জন্য। কিন্তু মানুষ ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্র হইতে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে,

মানবের চিন্তাকে পারিপার্শ্বিক ও মানব-চরিত্রকে নাটকীয় করিয়াছে। ঘৃণা, সহানুভূতি ও ভালবাসার স্থান যে ইতর জীবনে তাহা নহে, কিন্তু জীবনস্থিতির প্রয়োজন অতিক্রম করিয়া মানবে অনেক সময়ে পরিণত হইয়াছে। যে সকল গভীরতা ও উচ্চতা মানবীয় প্রেমে লক্ষিত হয়, তাহাদ্বারা পার্থিব কোনও প্রয়োজনই হয় না। এই সকল বিশিষ্ট গুণের বিচার করিবার সময় যদি ইহার উৎপত্তির ইতিহাস বর্জন করিয়া ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভাবি—যা হইতে তাহারা আসিল, না ভাবিয়া, কোথায় তাহাদের গতি যদি ভাবি, তাহা হইলে বলিতেই হইবে "এই সমস্ত গুণের বিকাশের জন্যই আমাদের সৃষ্টি, এবং ইহাদের পরিপুষ্টির জন্যই আমাদের দৈহিক শক্তি নিয়োগ করিয়া, ইহাদের সাহায্যে দৈহিক জীবন অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে বৃহত্তর জীবনে পৌঁছিতে হইবে।"

উপরে যে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে ইতর জীব অপেক্ষা উচ্চতর প্রকৃতির অধিকারী বলিয়া মানুষের এক মহত্তর নিয়তি দাবী করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হইতে পারে আমরা মানুষ ও ইতর জীবের একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবধান কল্পনা করিতেছি এবং তাহাদিগকে স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলিয়া গণ্য করিতেছি। কিন্তু অভিব্যক্তিবাদের আবির্ভাবের পর হইতে সমস্ত জীবজগৎকে একই বংশ-সম্ভূত বলিয়া মনে করা হইয়াছে। মানব ও ইতর জীব এক বংশসম্ভূত হইলেও পারিপার্শ্বিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিভেদ খুব কম নয়। অভিব্যক্তিবাদী ধার্ম্মিকেরাও এই বিভেদের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ আমেরিকান ধার্ম্মিক অধ্যাপক ফিস্‌কের (Fiske) Destiny of Man গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ফিস্‌কে বলেন "প্রাণীর মানসিক জীবন (psychical life) দৈহিক জীবনের একটা সরঞ্জাম মাত্র ছিল। শত্রুর হাত হইতে অব্যাহতি, খাদ্য-সংগ্রহ, বংশরক্ষা, ইহা লইয়াই ইতর জীবের জীবন, এবং ইহারই প্রতিপত্তি, প্রজ্ঞা, রাগ, দ্বেষ ও ইচ্ছাশক্তি এই সকল প্রয়োজন সাধনের জন্যই ব্যবহৃত হইত, অন্য কাজ ইহাদের ছিল না। আজি পর্য্যন্তও অধিকাংশ মানুষের জীবনে অন্য উদ্দেশ্য নাই, ইহা সত্য; কিন্তু তাহাদের মানস জীবন এতদূর বিবৃতি-লাভ করিয়াছে যে এই সকল দ্বেষ, সাধনের বৈচিত্র্য, জটিলতা ও গৌণতার মধ্যে সে বিবৃতি সহসা আমাদের গোচর হয় না। কিন্তু সভ্য মানবসমাজে দৈহিকসম্বন্ধবিহীন অনেক উদ্দেশ্যও আমাদের জীবন প্রভাবিত করিয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল উদ্দেশ্যকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। "মানুষের জীবন কেবল অন্নেই প্রতিষ্ঠিত নয়"—বহুদিন পূর্ব্বে এই বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। বহু যুগ ধরিয়া আমরা দেখিয়াছি, সহস্র সহস্র লোক মহত্তম প্রবৃত্তির উত্তেজনায় দেহকে আধ্যাত্মিক জীবনের নিম্ন স্তরে করিয়া ঘৃণা ও পীড়ন করিয়াছে, অসংখ্য শহিদ তুচ্ছ আরামের মত পার্থিব জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি নিষ্ঠা তাহাদের কার্য্যের প্রেরণা যোগাইয়াছে। যেমন ধর্ম্মজগতে, তেমনি বিজ্ঞানজগতে, তেমনি প্রকুমার কলার রাজ্যে, প্রকৃতির রহস্য ভাঙ হইবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং রূপে, রসে ও সুরে সুন্দরকে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছার বশীভূত হইয়া অসংখ্য লোক দেহকে তুচ্ছ করিয়াছে। মহত্তম মানুষের মনোরাজ্যে এই সকল উদ্দেশ্য সর্ব্বোপরি স্থান লাভ করিয়াছে, এবং সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ততর স্থান লাভ করিবে। যদি কখনও এমন দিন আসে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকিবে না, মানুষ মানুষকে পীড়ন করিবে না, যখন পীড়ার প্রকোপ দমিত হইবে, এবং প্রত্যেক মানুষ অনায়াসে পরিশ্রমে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বাসস্থান সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহা হইলে সমাজের সেই উন্নত অবস্থাতেও সভ্যতার কার্য্য শেষ হইবে না। অসংখ্য উপায়ে অধিকতর আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে মানুষের সুখ বিধান করিবার জন্য, এবং মানবজীবন যতদূর সম্ভব বৈচিত্র্যে ও সম্পদে পূর্ণ করিবার জন্য তখনও অসীম কার্য্যক্ষেত্র বর্ত্তমান থাকিবে। ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট মানুষের এমন সময় আসিবে—আমি বিশ্বাস করি।—অভিব্যক্তির গতি অতিশয় মন্থর এবং ইহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অসংখ্য জীবনবলির প্রয়োজন। কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া এই পরিণামের দিকেই ইহার গতি চলিয়াছে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, প্রাণের মানস জীবন দেহের ভৃত্য থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিণতিপ্রাপ্ত মানবে দেহ আত্মার বাহনমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। জীবনের প্রত্যূষ কাল হইতে দেখিতে পাই, সর্ব্বত্রই এক মহৎ পরিণামের দিকে গতি। সে পরিণাম মানবের সর্ব্বোত্তম আধ্যাত্মিক গুণের অভিব্যক্তি। এই যুগ-যুগান্তরব্যাপী প্রচেষ্টার পশ্চাতে কি কোনও উদ্দেশ্য নাই? ইহা কি একান্তই অর্থহীন? বুদ্‌বুদের মত উঠিয়াই ফাটিয়া যাইবে? অলীক স্বপ্ন—সূন্যে মিলাইয়া যাইবে? ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে বিশ্বের প্রহেলিকা অর্থহীন প্রহেলিকা হইয়া পড়ে। যে অভিব্যক্তির ধারায় জগৎ বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের নিকট স্পষ্টতর হয়, তাহাই আমরা বুঝিতে পারি, যে মানবাত্মার অবিনশ্বরতা স্বীকার না করিলে, অভিব্যক্তি-ধারা অর্থহীন হইয়া পড়ে। স্বীকার না করিবার কারণ কেহ দেখাইয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আমি নিজে মানবাত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করি,—যে অর্থে প্রমাণযোগ্য বৈজ্ঞানিক সত্যে বিশ্বাস করি, সে অর্থে নয়; ঈশ্বরের কার্য্য যুক্তিহীন হইতে পারে না, এই বিশ্বাসে বিশ্বাস করি।" *

* এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ Principal Martineau's "Study of Religion" হইতে গৃহীত। কোন কোন স্থলে Martineau'র ভাষাই অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যোগ-বিয়োগ

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

জীবনের একটা দীর্ঘ অধ্যায় শেষ করে নূতন পরিচ্ছেদে পা দিয়েছি। এবার চাকরী জীবন সুরু করবো—লেখা-পড়ার যবনিকা এখানেই পড়লো।

এই বয়সটা চঞ্চল হবার। নানান চিন্তা এসে ভিড় করে মাথার মধ্যে, রক্ত হয় উত্তপ্ত। কিন্তু আমার জীবনে এভাবে উগ্র হবার অবকাশ খুব কম। চাকরী একটা সংগ্রহ করতে না পারলে সারা জীবনেই ব্যর্থ হয়ে যাবো, নির্ভরশীল কয়েকজন লোক আমার মুখ চেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। কাজেই চাকরী চাই।

দৈনন্দিন জীবনে আর পাঁচজনের মতোই বেঁচে থাকবো। দশটা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অফিসে কাটিয়ে সন্ধ্যার পর উভয়ের সঙ্গে গল্প করবো, নিতান্ত রোমান্টিক না লাগলেও নেহাৎ মন্দ হবে না। আর বিশেষ করে আরতির মতো মেয়েই যদি বউ হয়।

হবে নাই বা কেন? ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার কথা বাদ দিয়ে দেখা যায়—আরতির লোভ আছে আমাকে জয় করবার···বশ করবার মন্ত্রও তাই সে শিখেছে। ওর মাও আমাকে চায়। আর আমি?

জড়-জীবের মতোই চেতনাহীন চাকরীহীন বঞ্চিত আমি আরতিকে ভালবাসি, শুধু মৌখিক অনুকথায় সে প্রেম জানানো পর্য্যন্তই। কিন্তু ভালো টাকার একটা চাকুরী সংগ্রহ করতে পারলে আরতির বাবার কাছে নিজেকে দাঁড় করাতে পারি, ইঙ্গিতে তখন বলতে পারি আরতির অনুপযুক্ত আমি নয়।

কিন্তু মানুষের মনের রাজ্যে বিধাতার অভিশাপ চিরদিন। সেখানে সে যা করে, তা ভেঙেচুরে ঈশ্বর চমক লাগিয়ে দেন সকলকে। নইলে এখুনি আরতি এসে আমাকে ধরে নিয়ে যেত না দেকের নির্জ্জন একখানা বেঞ্চে।

মনে হল ভালই হল, কিন্তু এর পিছনকার প্রহসনে বড় ব্যথিত হলাম।

আরতি আমার হাতটা চেপে বলে—বাবা চিঠি দিয়েছেন···

কথা তারপর আটকে গেল, আরতির অশ্রু-ম্লান চোখ দুটিতে জেগে উঠলো শঙ্কা-ব্যাকুল নির্ম্মাক আবেদন।

দুর্য্যোগের পূর্ব্বে মেঘের আভাস পেলাম।

আরতি কোনো রকমে বলতে চেষ্টা করলে—তিনি লিখেছেন এই অগ্রহায়ণ মাসেই আমার বিয়ে দেবেন—

সাদা গলায় নিতান্ত নির্লিপ্তভাবেই বললাম—ভালই ত'—এতে অত ভনিতা করবার কি আছে, এত উতলা হবারই বা কি আছে? বিয়ে ত' মানুষেই করে।

ক্ষীণ আশার জোনাকি একটি মনের অলিতে গলিতে ঘুরে গেল, সে আলো এত অস্পষ্ট যে মনের সবখানি তাতে দেখা গেল না, তবু কিন্তু আনন্দ আবছায়া হয়ে উঠলো।

আরতি আরো করুণ হয়ে উঠলো—তুমি চিরকাল ছেলেমানুষ হয়েই থাকলে, গম্ভীর হতে শিখলে কই?

একটু সময় নীরবে কেটে যায়, অথচ অপরিমিত সময়ের টিক্ টিক্ করা ঘড়িতে পরিমিত-একটুকু অংশ। তারপরই আরতি অবশ্য আসল কথাটার আভাস দিলে।

আমি বললাম—ভালোই ত আরতি। জীবনে তোমার ছন্দ আসুক—আমি চাই। ছন্দছাড়া আমি, আমাকে আর পথের আলো দেখিয়ো না।

আরতি কাতরভাবে বললে—মার এতে মত নেই, তিনি ও পাত্রটির ঘোর বিপক্ষে।

একথায় মনে সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। কাঁচের খেলনা চুরমার করে শিরিষের আঁটা ঘরে পুনঃ সংস্কৃত করার মতোই প্রহসন মনে হয়। আরতি আমার সর্ব্বনাশ না করুক, মনের আনন্দ বিচূর্ণ করেছে নিষ্ঠুর আঘাতে। আরতি মহীয়সী নয়।

জীবনের এই অধ্যায়েই আর এক স্থানে ব্যাহত হয়েছি। চিন্তার স্রোতে বাধা পড়েছে, কিন্তু জীবনের অগ্রগমনে ছেদ আসেনি। দেখে গেছি। পাশের বাড়ীর [illegible] সম্পর্কীয়া কাকিমার প্ররোচনায় পাত্রী দেখতে যেতেই হল, খুড়তুতো ভাই সুরেন আর আমি গেলাম। মেয়েটিকে কাকিমা দেখেন নি—শুনেছেন গুণবতী। কাজেই আমার

বন্ধে সে মেয়েটিকে গ্রথিত করতে তাঁরা প্রচণ্ডভাবে উদ্বিগ্ন। আমার চিন্তা-জর্জ্জর মনের কোনো ঢেউ তাঁরা জানেন না। বয়স্ক ছেলে আমি, বিয়ে না করে উড়ু উড়ু হচ্ছি—এই কথাই তাঁদের মাথায় ঢুকেছে।

সুরেন এবং আমি দেখতে গেলাম মেয়েটিকে। সামান্য খোড়ো চালের একখানি কুটীর। আগাছার ভীড়ে ঘরের আশে পাশে সাপখোপের বাসা থাকা অসম্ভব নয়। ঘরখানি দারিদ্র্যের মূর্ত্তিমান প্রতীক্। গৃহস্বামী একজন বুড়ো থুরথুরে। তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন, হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে আপ্যায়ন জানালেন কত। তারপর মেয়ে দেখানোর পালা। বাহ্যিক অনাড়ম্বর দেখে সুরেনের ভিক্ততা বাড়লো; সে বললে—চলো মেয়ে দেখে কাজ নেই।

আমি চুপ করে বসলাম। সাধারণ ভদ্রতাবশতঃ নড়তে পারলাম না।

বুড়ো লোকটি নিষ্প্রভ নয়ন দুটি তুলে কাতর দৃষ্টিতে তাকালেন আমার প্রতি। আমি বেদনা অনুভব করলাম। ধীরে ধীরে জীবনের শেষের অঙ্কে এসে উপনীত হয়েছেন, মৃত্যুর ইসারায় চকিত হচ্ছেন বার বার, কিন্তু ইহলৌকিক মায়া ত্যাগ করতে পারছেন না। তাঁর বাস্তু-ভিটা, তাঁর মেয়েটিকে নিঃসহায় করতে মন চাইছে না বলেই না-থাকার মতো করে কোনো রকমে টিকে আছেন নড়বড়ে দেহটাকে নিয়ে।

তিনি মেয়েটিকে নেপথ্য হতে চোখের সামনে এনে ধরলেন। দীপ্ত স্বাস্থ্য—সন্দেহ নেই, কিন্তু নিতান্ত গ্রাম্য। সাধারণ আটপৌরে একখানা শাড়ী পরণে, চুলগুলি অগোছালো, মৃদুল বাতাসে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। আর গায়ের রঙ অস্বাভাবিক কালো, কালো পাথরে কোঁদাই করা প্রাগৈতিহাসিক কোনো মূর্ত্তির মতোই চেহারা।

মেয়ে দেখলাম···দেখলাম যেমন মন্থর পদভরে মেয়েটী এসেছিল এখানে, তেমনি ধীরেই দরজার আড়ালে সরে গেল। নাম নির্ভয়ে এবং সহজেই বলে গেল—'সুন্দরী'।

বুড়ো লোকটি আমার হাত ধরে কেঁদে উঠলেন—আকুলি বিকুলি সে কি কান্না, পাষাণ গলে যায় সে বেদনায়। বয়সের ভারে অবনমিত অসহায় বৃদ্ধ একজন পূর্ণবয়স্ক একটি যুবকের হাত ধরে সাহায্য ভিক্ষা চাইছেন! আমি বিচলিত হয়ে উঠলাম। কথা দিলাম তাঁর মেয়েটির কোনো বিহিত করবো।

কলকাতায় ফিরেই আরতির সঙ্গে দেখা। ছন্দহীন ছন্নছাড়া জীবনে একটানা শান্তি না থাকুক, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলছিলাম টুক টুক করে। তাই এ সময়ে আরতির আবির্ভাব আকাঙ্ক্ষা করিনি। কিন্তু আরতি চপল কণ্ঠে বলল—মার জ্বর হয়েছে সমীরদা, আমাদের অতীত জীবনে আবার ফিরে যাই চলো।

জীবন সুখ-দুঃখের টানা-পোড়েনে বোনা। যখন হাসির ঝিলিক আসে, দুঃখ ডুবে থাকে; আবার যখন দুঃখের বান ডাকে, সুখের সোণালী তীরভূমি প্লাবিত করে দিয়ে যায়। সুন্দরীর কালো রঙে সৌষ্ঠব না থাক, তার মধ্যেকার আত্মসচেতন প্রেরণার একটা নিজস্বতা আছে, যা আরতির মধ্যে নেই। আবার আরতির মধ্যে অনেক ত্যাগ করবার ক্ষমতা, একান্ত নির্ভরশীলতা আছে—যা কালো মেয়েটীর দীপ্ত দুটি চোখে দেখা যায় নি। তাই একের দেখায় অন্যকে ভুলতে হয়, সুখদুঃখের মতোই পরস্পরবিরোধী ভাবের অধিকারিণী এরা।

আমি উন্মনা হয়ে উঠলাম। বললাম—আরতি, জীবন আমার অগ্রসর হয়েছে কিছুদূর, তোমার নাগাল ছাড়িয়ে গেছি।

অর্থাৎ—বলে আরতি দীপ্তজ্যোতিঃ নিয়ে আমার প্রতি তাকালে।

আমি একটা গল্প বললাম। সুশান্ত বলে একটি ছেলে কুৎসিত কালো এক মেয়েকে অরক্ষণীয়ার জ্বালা থেকে মুক্ত করবে পণ করেছে। এতে মেয়েটীর বাবার আকুল আগ্রহ আছে। কিন্তু সেই সুশান্ত আবার অসীমা নাম্নী একটি মেয়ের কাছে বিক্রীতা। অথচ কালো মেয়েটীর বাবাকে কথা দিয়েছে সুশান্ত—

আরতি গল্প শেষ করতে দিলে না। অত্যন্ত রূঢ়-ভাবেই আমার দিকে তাকালে। সে দৃষ্টিতে রুক্ষতা ছিল—কি সর্ব্বহারার অসহায়তা ছিল বুঝতে পারলাম না, আমার সমস্ত মনটা হায় হায় করে উঠলো।

সমীরদা, সেই কালো মেয়েটীর ঠিকানা দাও, আমিই লিখে দিচ্ছি।—আরতি নির্ব্বিকার ভাবে কথা কটি বললে।

আরতি মহীয়সী নয়—একদিন আমার এই কথা মনে

হয়েছে ; কিন্তু আজ তার স্মিত ও প্রশান্ত চোখ দুটিতে যে তিতীক্ষা প্রতিভাত হল—তার মূল্য অনেক, সে সুন্দরীকে উদ্ধার করার অনুমতি দিলে। আরতি সত্যিই মহীয়সী !

জীবনের এই টার্গ্ অব্ ওয়ারে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। বুদ্ধের কাতর অনুনয়ের সুর অনুরণিত হল মনের মধ্যে, আর তীব্রভাবে জাগল আলোড়ন—আরতিকে এভাবে হারাবার ভয়ে আমি অব্যক্ত হয়ে উঠলাম।

আরতি অতি সহজেই বললে—এ তুমি আগেই বলো নি কেন সমীরদা ? স্বার্থই মানুষকে পাগল করে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওটা ছেঁটে বাদ দিতে পারলে স্বর্গীয় দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠে মনটা। এ ক্ষতি শুধু আমার নয়, তোমারও।

আমি আরও অভিভূত হয়ে পড়লাম।

এর পর যবনিকা হয়তো পড়ত এই অধ্যায়ে। কিন্তু আরতির আর একটি কথা মনে গাঁথা রইল। ফুলশয্যার দিন বৈকালে আমাকে জানালে—তোমাকে একান্ত আপনার করে একান্ত আত্মীয় করে রেখেছিলাম বলেই এমন ভাবে পরের হাতে দিতে পারলাম, কিন্তু···

কাজের হৈচৈয়ে কথা শেষ হয় নি। বিকালের অস্ত-সূর্য্য পশ্চিম মেঘে আবির ছড়াচ্ছে, তারই আভা আরতির গণ্ডদুটোয় প্রতিভাত হয়েছিল—আরতিকে বড় করুণ ঠেকল। কিন্তু জীবনের স্রোত থামল না—নিজের মনে বয়ে চলতে লাগল, শবও ভুলতে লাগল কুলুকুলু।

সুন্দরী একদা বলেছিল—আমি তোমার সর্ব্বনাশ করেছি, আরতিদি'র কাছ থেকে রাক্ষুসীর মতো তোমাকে ছিনিয়ে এনেছি, আমায় তুমি মাপ করো।

সুন্দরীর সেদিন অহেতুক কান্নার তলে বঞ্চনার কোনও রেখা পাই নি, নিতান্ত সরল অভিব্যক্তি বলেই মনে হল।

আর একদিন সে বললে—তুমি আরতিকে বিয়ে কর, আমি তোমাদের দাসী হয়ে থাকবো।

আরও সরল এবং সহজ উক্তি। সুন্দরীর মহত্ত্ব আছে।

কিন্তু আরতিকে আমি বিয়ে করি নি ; সে চিন্তা মনেও আসে নি। জীবনে শান্তি না আসুক, অন্তত দুশ্চিন্তাকে পুঞ্জ পুঞ্জ করে সংগৃহীত করার কি মানে হতে পারে ?

এমিভাবেই অখণ্ড সময়কে অতিবাহিত করছিলাম—আর দশজনের মতো। চাকুরী একটি সংগ্রহ করেছি, পত্নীভাগ্যে কিনা জানি না—তবে দু তিন জোড়া জুতো নষ্ট হয়েছে হেঁটে হেঁটে এটা সত্য কথা। একটি মেয়ে এসেছে সংসারে। খল খল হাসে এবং অকারণ-কান্নায় ছোট্ট সংসার আমাদের, আরও ছোট্ট ঘরখানি মুখর করে তোলে। খুকিটি সুন্দরীর রূপ পায় নি, কিন্তু চোখ দুটি আশ্চর্য্যজনক ভাবেই অধিকার করেছে।

মন্থর কেরাণী-জীবন টুক টুক করে গন্তব্যের দিকে ধাবমান হচ্ছে। এ জীবনে বৃহত্তর আশা নেই, মহত্তর কোনো সাধনা নেই। শুধু রোববারের দিনটিতে খবরের কাগজে চোখ রেখে নিজের বাইরে যে বিশাল জগৎটা রয়েছে, সেটাকে অনুভব করা যায়। সাধনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না এখানে, বড় হবার আশাও ঠিক তেমনি অবান্তর।

কাগজ পড়ছি, সুন্দরী বৈঠকখানায় এসে হাজির হল। কেমন যেন থমথমে মুখের ভাব। ঝড় উঠবার পূর্ব্বে কালবৈশাখীর আকাশ যেমন রূপ ধারণ করে, তেমনি সুন্দরীর মুখের ভাব।

আজ রোববার। অন্যদিনের তুলনায় কর্ম্মব্যস্ততা অনেক কম। কর্ম্মটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করেই বললাম—হঠাৎ উদয় হলে কি মনে করে এখানে—ডেকে পাঠালে অধীন দেখা দিত নিশ্চয়ই।

সুন্দরী রহস্য উপভোগ করতে পারল না, বুঝতে পারলাম। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছন্দ কোথাও কেটে গেছে ধরতে পারলাম। তাই কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দিলাম—আমি দুপুরে একবার বেরোবো আজ, বিশেষ দরকার।

এইবার সুন্দরী ফেটে পড়লো, মেঘের বর্ষণ সুরু হল না, ভীষণ গর্জ্জন জাগলো : না তুমি যেতে পারবে না। এই চিঠি, ঘরে তোমার টেবিলে খোলা ছিল, দেখেছি। আরতির সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। আমার মাথার দিব্যি রইলো।

আরতি রংপুর চলে যাচ্ছে, সেখানে মাষ্টারি পেয়েছে, জীবনচক্রের আবর্ত্তনে কে কোথায় ছিটকে পড়বো, আর হয়তো দেখাই হবে না, তাই নিবেদন জানিয়েছিল শেষ বার দেখা করতে।

সুন্দরী অত্যন্ত ঝাঁঝিয়ে উঠলো—কেন তখন আমাকে বিয়ে করেছিলে? কে চেয়েছিল তোমার করুণা? তুমি সেখানে যেতে পারবে না, আইবুড়ো মেয়ের সঙ্গে অত মেলামেশা কেন? মনে কর আমি বুঝি বোকা, তাই তুমি ইচ্ছামত এখানে সেখানে যাবে—আমি তা বারণ করবো না।

একবার মনে হল বলি—ফুলশয্যার পর আরতির সঙ্গে দেখাই হয় নি একবারও, ভবিষ্যৎ জীবনে যে আমার দেখা হবে—তার সম্ভাবনাও নেই, কিন্তু তবু সুন্দরীর এ কি অহেতুক অমানুষিকতা, নির্লজ্জ হিংস্রতা!

জীবনে এমনই ঘটে। বঞ্চিতকে ঐশ্বর্য্যের আবর্ত্তে এনে ফেললে সে যেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে উঠে, তেমনই অনাদৃতকে সম্ভাষণ জানালে—এই-ই হয়। সুন্দরী আমার জীবন নিয়ন্ত্রণে অধিকার পেয়েছে উড়ে এসে, কিন্তু সত্যকার শক্তিশালিনী, জীবনের কেন্দ্রে যার অনুরণন প্রতি চাল-চলনে প্রতিধ্বনিত—সে দূরে চলে গিয়ে নবীনসী হতে পেরেছে।

আমার চিন্তার জগৎ ঘোলাটে হয়ে এল। সুন্দরীর প্রতি আমার যে অনাবিল পরিচয়—এ সেই দুর্ব্বলতারই পরিপূরক কি না কে জানে?

ধান্যাদি খাদ্যশস্য চাষের সমস্যা ও তাহা সমাধানের উপায় নির্দ্দেশ

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম-এস্‌সি

পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ স্মৃতি এবং আসন্ন ব্যাপক খাদ্যসংকটের পূর্ব্বাভাস ভারতবাসীমাত্রেরই মন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই খাদ্যসমস্যা সমাধানে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। এই সমস্যা এত জটিল ও সুদূরপ্রসারী যে বহুসময়, অপরিমেয় শক্তি ও অজস্র অর্থব্যয় ব্যতিরেকে ইহার স্থায়ী কূলকিনারা সমাধান সম্ভবপর নহে। খাদ্যশস্য চাষের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; ইহার কোনও একটি উপেক্ষিত হইলেই মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবার সম্ভাবনা। বিষয়গুলি এই :—

(১) ভূমির উর্ব্বরতাবৃদ্ধিকল্পে সম্যক্ পরিমাণ সারের ব্যবস্থা
(২) পতিত জমি আবাদ করা
(৩) অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টিজনিত শস্যহানির প্রতিকার
(৪) উন্নত বীজ সরবরাহ করা
(৫) পশুচিকিৎসার ব্যাপক ব্যবস্থা ও ভূমিক্ষয় প্রশমন
(৬) পঙ্গপাল ও ধানবিশেষে রসমূলকের উপদ্রব নিবারণ
(৭) কৃষকগণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভূচিকিৎসার ব্যবস্থা
(৮) জনশিক্ষার প্রসার ও জাতীয়তাবোধের উদ্বেষ প্রচেষ্টা

এক্ষণে প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভূমির তুলনায় আমাদের দেশের ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি কত কম নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

দেশ	একর প্রতি ধানের ফলন		একর প্রতি গমের ফলন	
ভারতবর্ষ	১৩৮৭	পাউণ্ড	৬৪২	পাউণ্ড
জাপান	২৭৬৭	"	১৪০৮	"
মিশর	২৩৫৩	"	১৬৮৯	"
ইটালি	৪৬০১	"	১২৪১	"
ইংলণ্ড	———		১৮১২	
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	২১১২	"	৯৭৩	

ভারতবর্ষের আবাদী জমির পরিমাণ ১০ কোটি একর এবং বার্ষিক উৎপন্ন ধানের পরিমাণ আড়াই কোটি টন ও গমের পরিমাণ এক কোটি টন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষের ৩০ কোটি লোকের পক্ষে দেশের উৎপন্ন চাউল ও আটা একত্রে পড়ে মাথা পিছু দৈনিক দুই ছটাকেরও কম পড়ে। সুতরাং ধান ও গমের ফলন স্বাভাবিক হইলেও দেশের অধিকাংশ লোক যে একবেলার বেশী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার উপর যুদ্ধজনিত কারণে বিদেশী লোক বেশী আসিয়া পড়িলে বা ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি হইতে চাউলের আমদানি বন্ধ হইলে দেশে যে নিবারণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! অথচ উপরের তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে অন্যান্য দেশের মত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ধান ও গমের ফলন অনায়াসেই দ্বিগুণ বাড়ান যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের কৃষি বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এ দেশের মৃত্তিকে পটাশ এবং ফসফেট সারের বেশী ঘাটতি নাই; প্রকৃত অভাব হইতেছে নাইট্রোজেনঘটিত উদ্ভিদ্ খাদ্যের। আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিতেই কোনও সার দেওয়া হয় না। অতি অল্প স্থলেই গোশালার সার, পুকুরের পাঁক বা সবুজ সার দেওয়া হইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের বড় বড় নদীর বিটুমিনিস্যালিটির আবর্জনা হইতে হাজার করা চারি ভাগ নাইট্রোজেনযুক্ত এক কোটি টন সার প্রস্তুত হইতে পারে এবং উহা প্রয়োগ করিয়া ৩ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। প্রাথমিক সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে বঙ্গদেশ বা হইলে আমাদের ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি বিদ্যমান। সুতরাং বর্তমান আবাদী জমি হইতে এই পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে আমাদের জমিতে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টন অ্যামোনিয়ম সালফেট দিবার প্রয়োজন। আজকাল দেশে মাত্র ২৬ হাজার টন অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রস্তুত হয় এবং বাকি প্রায় ৭৩ হাজার টন বিদেশ হইতে আসে। অবশ্য ইহার অধিকাংশই চা বাগানে, ইক্ষুক্ষেত্রে এবং তুলার চাষেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধানের জমিতে ভাগে ইহা পড়ে বা বলিলেই চলে।

অনেকেই জানেন, পাথুরিয়া কয়লাকে বিশেষ চুল্লীতে পুড়াইয়া কোক করিবার সময় অন্যান্য উপকারী পদার্থের সহিত যে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়, সালফিউরিক অ্যাসিডের সংযোগে তাহাকে অ্যামোনিয়ম সালফেটে পরিণত করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশের লৌহশিল্পের জন্য বার্ষিক ৪০ লক্ষ টন পাথুরিয়া কয়লা হইতে কোক করা হয়। উহা হইতে ৫০ হাজার টন অ্যামোনিয়ম সালফেট পাইবার কথা, কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় সে স্থলে মাত্র ২৬ হাজার টন অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ প্রতি বৎসর ১৪ লক্ষ টন কয়লা গ্যাস করিয়া পুড়াইয়া কোক করাতে উহা হইতে অন্যান্য মূল্যবান্ রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে ১০ হাজার টন অ্যামোনিয়ম সালফেট হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি। কয়লা একটি অমূল্য জাতীয় সম্পদ্। কয়লার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের উপর দেশের অশেষ কল্যাণ নির্ভর করে। কোনও সভ্যদেশের গবর্নমেণ্টই কয়লার এইরূপ অপব্যবহার সহ্য করিতেন না। যদ্যপিও অধ্যাপক হেমেন্দ্রকুমার সেন এই শোচনীয় অপচয়ের উল্লেখ করিয়া দিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে বিচলিত হইয়া পড়িতেন। পক্ষান্তরে, জাপানীরা দেশগুলিতে প্রতিবৎসর ১০ লক্ষ টন উৎকৃষ্ট কাঁচা কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইঁহারা যদি কাঁচা কয়লা ব্যবহারের পরিবর্তে ঐ পরিমাণ কয়লা কোক করিয়া ব্যবহার করিতেন তবে এই কয়লা হইতে বার্ষিক সাড়ে ৮৭ হাজার টন অ্যামোনিয়ম সালফেট পাওয়া যাইত। অ্যামোনিয়ম সালফেটের বর্তমান উৎপাদন, আমদানি ও উহা প্রস্তুতের যে সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হইল সমুদয় ধরিলেও আমাদের চাহিদা মিটাইতে আরও অল্প পরিমাণে উহার প্রয়োজন। দেশের যে ১০ কোটি একর জমিতে ধান ও গমের চাষ হয় উহার একরপ্রতি বার্ষিক ৮০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগে ফসলের পরিমাণ গড়পড়তা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং তাহাতে মোট ৩৫ লক্ষ টন অ্যামোনিয়ম সালফেটের প্রয়োজন। ফসলের এই বৃদ্ধি ধরিলেও আমাদের বর্তমান উৎপাদন দ্বিগুণ করিতে হইলে আরও আড়াই কোটি টন মৃত্তিকা থাকে। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন আমাদের উপযোগী ৭ কোটি একর জমিতে বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টন অ্যামোনিয়ম সালফেট দিয়া ধান ও গমের চাষ করিলে এই ঘাটতি পূরণ হইতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ হইলেও সেখানে বার্ষিক ৭০ লক্ষ টন অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রভৃতি নাইট্রোজেনযুক্ত সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের বিষয় এই যে, সম্প্রতি মহীশূরে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাতাসের নাইট্রোজেন ও জলের হাইড্রোজেন হইতে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করিয়া অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রস্তুতের ছোট একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং ভারত গবর্নমেণ্ট ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টন অ্যামোনিয়ম সালফেট উল্লিখিত উপায়ে প্রস্তুতের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

অবশ্য দেশে যথেষ্ট পরিমাণে অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রস্তুত হইলেও কৃষক কি দরে উহা পাইবে এবং কি ভাবে ব্যবহার করিয়া ফসলের ফলন বাড়াইতে পারিবে সে বিষয়ে অনেক চিন্তা করিবার আছে। প্রত্যেক এলাকার জমি ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিলে এবং কোন্ এলাকার জমিতে কি পরিমাণ সার দিতে হইবে তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হইলে সার প্রয়োগ নিরাপদ নয়। পক্ষান্তরে, দরের চড়তা এবং খাঁটি দ্রব্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী না থাকিলেও সমূহ বিপদ বিদ্যমান। যে দেশে চালের মণেই সিকি পরিমাণ কাঁকর মিশাইতে ব্যবসায়িগণ ইতস্তত: করেন না—যখন খাঁটি সরষার অনেক উঁচু ব্যবসায়ী রোগীকে ঔষধের পরিবর্তে জল দিতে দ্বিধা করেন না, সে দেশে সারের নামে ছাই পাঁশ দিয়া নিরীহ কৃষককুলকে প্রতারিত করা হইবে না তাহারই বা বিশ্বাস কি? যতদিন পর্যন্ত দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিকে প্রতারিত করিলেও পরলোকে বসে ইহলোকেই আমাদিগকে যমযাতনা ভোগ করিতে হইবে—এই শুভবুদ্ধি আমাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত না হইতেছে, যতদিন সরকারী কর্মচারী সাধারণের দৃষ্টি এবং সর্বতোভাবে জনসাধারণের নিকট জবাবদিহী না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত সরকারের সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিতনীতি এবং ব্যবস্থাও কার্যক্ষেত্রে সুফলপ্রদ হইবে না বলিলাই মনে হয়। দেশে ব্যাপকভাবে সার প্রয়োগে ফসলের উন্নতি সাধন করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পরগণায় কৃষিরক্ষেপাগার স্থাপন এবং কৃষিবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী, হাতে কলমের কাজে সুদক্ষ কর্মিদল নিযুক্ত করিতে হইবে। ইংলণ্ডে সার প্রয়োগসম্বন্ধে বিজ্ঞান সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী অনুসন্ধান করা হয় পরের তালিকা হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

একরপ্রতি উদ্ভিদ্‌খাদ্যের পরিমাণ		ঐ সার প্রয়োগে উৎপন্ন শস্য, ঘাস প্রভৃতির পরিমাণ		ঐ সারের ফলে উৎপন্ন সোনালুর পরিমাণ	
নাইট্রোজেন	২২·৪ পাউণ্ড	৩	হন্দর	১৩	হন্দর
"	৪৪·৮ "	৪·৮	"	২৮	"
"	৬৭·২ "	৫·৮	"	৩৪	"
"	৮৯·৬ "	৬·৪	"	৩৮	"
"	১১২ "	৮·৯	"	৪০	"
ফসফরিক অ্যাসিড					
"	২২·৪ "	০·৪	"	১০	"
"	৪৪·৮ "	০·৯	"	১৮	"
"	৬৭·২ "	১·১	"	২২	"
"	৮৯·৬ "	১·৩	"	২৬	"
"	১১২ "	১·৪	"	২৮	"
পটাস	২২·৪ "	০·৪	"	১২	"
"	৪৪·৮ "	০·৬	"	২০	"
"	৬৭·২ "	০·৮	"	২৪	"
"	৮৯·৬ "	০·৯	"	২৮	"
"	১১২ "	১	"	৩২	"

গবেষণাক্ষেত্রের এই অনুসন্ধানের ফল উপযুক্ত সরকারী কর্মচারীর সাহায্যে প্রত্যেক কৃষককে হাতে কলমে দেখাইয়া দেওয়া হয়। বিভিন্ন সার কি অনুপাতে, পৃথক পৃথক বা মিশ্রিত ভাবে এবং কত বড় দানা করিয়া দিলে কোন্ শস্যে কোন্ বস্তুতে সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হইবে তাহাও স্থির করিয়া দেওয়া হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিও কৃষি গবেষণার ফল জানিয়া তদনুসারে সার প্রস্তুত করিয়া কৃষকগণকে সরবরাহ করিয়া থাকেন। খাদ্যশস্যের ফলন আশানুরূপ সন্তোষজনক করিতে হইলে আমাদের দেশেও যে অনুরূপ ব্যবস্থার প্রচলন অপরিহার্য্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সারের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষেত্রে উপযুক্ত জলসেচনের ব্যবস্থা চিন্তনীয়। যদিও আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থলেই এখন পর্য্যন্ত বৃষ্টির উপরেই কৃষক একমাত্র নির্ভরশীল, তথাপি অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যাইতেছে এই অবস্থা ক্রমেই অচল হইয়া পড়িতেছে। সময়ে দৈবের কৃপালাভে দিন দিনই আমরা বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি। সুতরাং ব্যাপকভাবে জলসেচের ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইলে শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, পূর্ব জন্মানই অসাধ্য হইয়া উঠিবে। সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর সাময়িক বৃষ্টির অভাবে মধ্য ও পশ্চিম বাংলার ধান চাষ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে জলসেচ ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়র ও রাসায়নিক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের সাহায্য বিশেষভাবে আবশ্যক। অনেকেই অবগত আছেন যে কোনও কোনও কূপ বা খালের জলে এমন কতকগুলি অপকারী লবণ পদার্থ থাকে যাহাতে ভূমির উর্বরতাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং প্রচুর সার প্রয়োগেও পরে তাহা সংশোধন করা যায় না। ইঞ্জিনের কয়লারে যেরূপ বিশুদ্ধ জল ব্যবহৃত হয় এরূপ ক্ষেত্রেও রাসায়নিক উপায়ে জলের অপকারী লবণ পদার্থ দূর করিয়া সেই জলসেচের ব্যবস্থা করিতে হয়। অবশ্য ইহা অনেক পরের কথা। আপাততঃ জলসেচের প্রাথমিক চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করা সর্বাগ্রে আবশ্যক। আমন ধান্যাভাবের প্রধানকারণে অনেকে পয়ার চর ও বড় বড় বিলের চারিপাশের জমিতে বোরো ধানের আবাদের কথা উল্লেখ করিতেছেন। এরূপক্ষেত্রে অতি নিকটে জল থাকা সত্ত্বেও সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় ফসল নষ্ট হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট হইতে যদি দুই একটী ট্রেলর পাম্প (Trailer Pump) মোটরসহ করিয়া মালদহ হইতে বেথুয়ার মোহানা পর্য্যন্ত যে সব চরে প্রভূত জন্মিধান ফলা হইয়াছে এবং জলের অভাবে ধান শুকাইয়া যাইতেছে বা চৈত্রের শেষে ও বৈশাখের প্রথম ভাগে ধান ফুলিবার সময় জলের অভাবে নষ্ট হইতে চলিয়াছে সেই সব স্থলে পাম্পের সাহায্যে পয়ার জল দিবার ব্যবস্থা করেন তবে ঐ সব চরের ধানে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। গত বৎসর শিলাইদহের সন্নিকটে চরে প্রচুর জন্মিধান হইবে আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু সাময়িক বৃষ্টির অভাবে কৃষকদের সকল আশা নিরাশায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের ৩০ অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট একটি ট্রেলর পাম্পে ঘণ্টায় ২ গ্যালন করিয়া পেট্রল প্রয়োজন হয় এবং উহাতে ঘণ্টায় ৩০,০০০ গ্যালন জল পাম্প করা যায়। পয়ার এই সব নূতন পলিমাটিযুক্ত অতিশয় উর্বর চরগুলির বিস্তার বেশী নয় সুতরাং অনায়াসেই ঐ পাম্পের সাহায্যে জলসেচনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। নদী সন্নিহিত অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে চৈত্রের শেষ ভাগ হইতে (বৃষ্টি না হইলে) ঐরূপ পাম্পের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা করিলে দেশের অনেক জায়গাতেই আউশ ধানের চাষ সন্তোষজনকভাবে আরম্ভ করা যাইতে পারে। এ বি রেলওয়ের বগুলা এবং মাজদিয়া ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী রেললাইন সন্নিহিত বিরাট জলার কালো জলরাশি অনেকেই দেখিয়াছেন। উহার চারিপাশে কত অনাবাদী জমি পড়িয়া আছে—আবাদী জমিতেও জলের অভাবে ভাল ফসল জন্মে না। ঐ জলার জল সেচের ব্যবস্থা করিলে উহার সন্নিহিত ভূমি হইতে অসংখ্য লোকের খাদ্যাভাব বিদূরিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের এই সব ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোযোগ দিবার দিন কি আসিবে না? অনাবৃষ্টির মত অতিবৃষ্টিজনিত প্লাবনেও ফসলের প্রভূত ক্ষতি হইয়া থাকে। বাংলা দেশের মজা নদীগুলির সংস্কার, রেলপথে আরও অধিকসংখ্যক স্থলে জলনিকাশের ব্যবস্থা করা এবং বড় বড় বিলগুলির সঙ্গে সন্নিহিত নদীর সংযোগ সাধন করিয়া দিলে এ বিষয়ে অনেকটা উপকার পাইবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে দামোদর, তিস্তা প্রভৃতি নদীর উৎপত্তি স্থলের নিকটে বড় বড় বাঁধ বাঁধিয়া বর্ষাকালীন উদ্বৃত্ত জলরাশি ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা করিলে তাহা হইতে একদিকে যেমন প্রভূত বৈদ্যুতিকশক্তি পাওয়া যাইবে ও দামোদর চরের সুবিধা হইবে তেমনি ঐ জল সংবৎসর ধরিয়া ছাড়িলে নদীগুলি নৌচালনের উপযোগী থাকিবে ও পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে জলসেচনে খাদ্যশস্য উৎপাদনের সুবিধা হইবে।

বীজ সরবরাহ সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে দায়িত্বশীল জাতীয় গবর্ণমেণ্ট

প্রতিষ্ঠিত না হইলে বীজ সাধারণ ব্যয়সাধ্য কতকগুলি সরকারী কর্মচারী ও স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী লোকের অর্থলাভ ব্যতীত চাষীরা ইহাতে উপকার পাইবে না, বরং পয়সা ও নিকৃষ্ট বীজ পাইয়া তাহারা ক্ষতিগ্রস্তই হইবে। দেশব্যাপী প্লাবন বা অনাবৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে শস্যহানি না হইলে নিতান্ত দরিদ্র কৃষকও ক্ষেত্রের সর্বাপেক্ষা ভাল ফসলটি বীজরূপে সযত্নে রাখিয়া দেয়—এমন কি অনাহারে পড়িয়া যায় কিনিয়া বা কর্জ করিয়া খাইলেও সহজে বীজধান খরচ করে না। কৃষি এবং কৃষকের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় থাকাতে ইহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

ইহার পরে কৃষিঋণ ও পশুচিকিৎসার কথা। এখন পর্যন্ত সত্যিকারের অভাবগ্রস্ত কৃষক ঐ ঋণের দ্বারা উপকৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। গোদরুক কৃষকের জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদ্‌ঋণ। এই সময় বড় সুদে বলদ কিনিবার টাকা না পাইলে দরিদ্র কৃষকের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে কৃষিঋণ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কিন্তু পল্লীর জনসাধারণের মনের এমনতরো অভাবের অভাবে প্রকৃত অভাবগ্রস্ত দরিদ্র কৃষক কদাচিৎ সাহায্য পাইয়া থাকে। পশুচিকিৎসাও এখন পর্যন্ত পল্লীবাসী কৃষক সম্প্রদায়ের সত্যিকারের কাজে লাগিতেছে না। সাধারণতঃ মহকুমা সহরেই সরকারী কৃষি চিকিৎসালয় স্থাপিত এবং চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য ও অধিকাংশ স্থলেই ফলপ্রসূ হয় না বলিয়া কৃষকগণ কদাচিৎ পশুচিকিৎসকের সাহায্য লইয়া থাকে। আরও ব্যাপকভাবে এবং যথাসম্ভব কৃষকপল্লীর সন্নিধ্যে পশুচিকিৎসালয় স্থাপিত না হইলে এবং দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত পশুচিকিৎসায় পারদর্শী উপযুক্তসংখ্যক চিকিৎসক না পাওয়া গেলে সরকারের এই বিভাগ আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের মতই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সমর্থতা করিতে পারিবে না।

আজকাল পাটকল ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীদিগের খাদ্যোন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা যত্ন করাইতেছেন, গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে অবহিত হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু পল্লীর চাষীদের কথা কয়জন ভাবিয়া থাকেন? বাংলা দেশের অধিকাংশ কৃষকপল্লীই ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের চির আবাসভূমি। একে কৃষকেরা উপযুক্ত পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যাভাবে শক্তিহীন, তারপর বর্ষার শেষে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং তাহার জের কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত চলে। সুতরাং রোগক্লিষ্ট দুর্বল কৃষকের পক্ষে আউশ ও ছিটাইয়া-বুনা আমনধানের জমি ভালভাবে চাষ করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় না। ফলে ঐ সব জমিতে সুবৃষ্টি হইলেও ভাল ফসল জন্মে না। যথা বাংলার উঁচু জমিগুলিতে আউশ এবং আমন ধান কাটার পর রাঙ আখি চাষ দিয়া তৈল শস্য এবং মূল বিশেষে মাষ কলাই, মুগ, মটর, মসুরী, ছোলা ও খেসারীর চাষ করা হইয়া থাকে। অনেকেই জানেন, ছোলা মটর প্রভৃতি ডাল জাতীয় উদ্ভিদের মূল সংলগ্ন ব্যাক্টেরিয়ার ক্রিয়াতে বাতাসের নাইট্রোজেন আবদ্ধ হইয়া সারে পরিণত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সব ফসলেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সর্বাপেক্ষা অধিক। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত কৃষক রবিখন্দের চাষ করিয়া উঠিতে পারে না। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াই 'মাটির মায়া'র কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"কার্ত্তিকে ঘরে পড়ি' চৈত্রালী ঘুনা হ'ল না, ক্ষেত্র রহিল পতিত পড়ি।" সুতরাং খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে দেশের ম্যালেরিয়া নিবারণ করা যে সর্বাগ্রে কর্তব্য তাহা সহজেই অনুমেয়। গবর্ণমেণ্টের বাজেট দেখি অধিকাংশ অর্থ দেশরক্ষাকল্পে সৈনিকদের জন্যপোষণেই ব্যয়িত হইয়া থাকে, অথচ কমুকধারী সৈন্যের অপেক্ষা অল্পতে অপরিহার্য এই সকল হলধারী সৈনিকের জন্য গবর্ণমেণ্টের কোনও দরদই লক্ষিত হয় না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সরবরাহ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত মহিলা কার্ত্তসন লিখিত 'জীবন রক্ষা করুন যুদ্ধ' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিতে পাই রুষদেশের যুদ্ধে সৈনিক প্রেরণের পূর্বে বিমানপোত হইতে মশকবিনাশী ডি-ডি-টি ছিটাইয়া দেওয়াতে এবার স্থানে যুদ্ধরত সৈন্যদিগকে ম্যালেরিয়া স্পর্শ করিতেও পারে নাই। গবর্ণমেণ্ট একটু মনোযোগী হইলে দেশের ম্যালেরিয়া-প্রধান গ্রামগুলিতে অনুরূপভাবে ডি-ডি-টি ছিটাইয়া চাষী জনসাধারণের খাদ্যোন্নতি করিতে পারেন। পক্ষান্তরে, যে সকল গ্রাম ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রায় বিজন হইয়া গিয়াছে এবং দুই চারি ঘর কৃষক কোনও গতিকে বাঁচিয়া আছে সরকার হইতে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে গ্রামের বাহিরে কাঁকা জায়গায় স্বাস্থ্যসম্মত গৃহাদি নির্মাণ করিয়া দেওয়া কর্তব্য। পাবনা, রাজসাহী, নদীয়া, মুরশিদাবাদ, হুগলী, বর্দ্ধমান, করিদপুর ও খুলনার অনেক মহকুমার বড় নদী হইতে দূরবর্তী গ্রামগুলিতে অচিরে এ ব্যবস্থা কার্যে পরিণত না করিলে বাংলার বহু উর্বর জমি চাষীর অভাবে অনাবাদী পড়িয়া থাকিবে। সম্ভব হইলে জনবহুল জিলাগুলির ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদিগকে স্বাস্থ্যসম্মত ঘর বাড়ি করিয়া দিয়া এই সব বিজন গ্রামে বসাবার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক।

এতক্ষণ যে সব বিষয়ের আলোচনা করা হইল তাহার কোনটিই বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে না, যতদিন দেশে প্রকৃত মানুষ সৃষ্টির ব্যবস্থা না হয়। দেশের প্রত্যেকটি অঙ্গ যেমন পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ, একটির বিকলতায় যেমন সবগুলি অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, মানুষের সমাজেও যে তাই হইবে, ইহার জন্য সবাই সোজাসুজি সংবদ্ধ একথা যতদিন আমরা মনেপ্রাণে অনুভব না করিব—যতদিন পর্যন্ত কালী মতন ও করিম সেখের সুখদুঃখ আমাদের নিজের সুখদুঃখ বলিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিব ততদিন আমাদের সত্যিকারের বাঁচিবার অধিকার জন্মিবে না। আজাদ-হিন্দ ফৌজ যেমন জাতিধর্ম নির্বিশেষে একই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তেমনি আমরাও যতদিন বর্ণ, অর্থ ও শিক্ষার অভিমান ভুলিয়া সকলে একত্র হইয়া কার্যক্ষেত্রে নামিতে না পারিব ততদিন আমাদের সকল পরিকল্পনা ও সমুদয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। আমাদের ছেলেমেয়েদিগকে মাটির প্রতি মমত্ববোধ, মানুষী শক্তির বিরাটত্বের কথা, সুখ শান্তিতে শতায়ু হইবার প্র্যাকটিক্যাল উপদেশদানে আপাদিত, উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে' এই মহাবাক্য বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া নিত্যের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে পালন করিতে হইবে। দ্বিতীয় মহাসমরের ফলে—ইংলণ্ডের দরিদ্র শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইয়া তাহারা যুদ্ধপূর্বকাল অপেক্ষা অধিকতর সুখে স্বচ্ছন্দে আছে বলিয়া ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের নিকট শুনিতে পাইলাম। অথচ এই যুদ্ধের ফলেই আমাদের দেশের একশ্রেণী বিত্তা হইতে একেবারেই উচ্ছন্ন লাভ করিয়াছে, আর যাহারা সম্বলে ছিল তাহারা ভারত মহাশ্মশানের অঙ্গনে নিঃস্বত্বের হইয়াছে। জাতীয় চরিত্রের যে সুপ্ত দুর্বলতা এই ঐতিহাসিক কলঙ্কের জন্য দায়ী তাহার সম্পূর্ণ নিঃশেষ বাহিরেকে আমাদের বাঁচিবার অধিকার জন্মিতে পারে না। আশা করি, সম্প্রতি জাগ্রত স্বাধীনতা-লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা পুণ্য ভাগীরথী প্রবাহের মত আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষুদ্রতা, দীনতার কলুষ নাশ করিয়া আমাদিগকে নূতন জীবনের মহত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং সমাজের সকল স্তরের সহানুভূতি ও সাহায্যপুষ্ট স্বাস্থ্যবান্ শিক্ষিত কৃষকগণ মুষ্টি মুষ্টিতে ফলধারণপূর্বক আধুনিক বিজ্ঞানের দান কার্যতঃ প্রয়োগে যাহা দরকার সমাধান করিয়া দেশ হইবেন।

বেণু মধুচক্রের সন্ধানে

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

রাত প্রায় ন'টা।

আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ। বাইরের গাছটার পাতায় পাতায় রুপালী আলোর ঝিলমিলি। লিচু ও কাঁঠাল গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সে-আলো আল্পনা এঁকেছে ফুলোঢাকা বহুরূপী আঙিনায়। গন্ধ-রাজের মাতাল গন্ধে মাতাল ছিলাম। পৃথিবী সুন্দর।

ঘরে আর মন টিকল না। ইজিচেয়ারটা টেনে আঙিনায় পা এলিয়ে দিলাম। চোখ দুটো অজান্তেই বুজে এল।

গ্রামীণ ডাকের কাগজ আসে ডাক পিওনের হাতে—সন্ধ্যার একটু আগে।

একটু-আগে-পড়া খবরগুলো মনের কথা হয়ে ফিরে বেড়ায় :

ভারতবর্ষের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ; ময়মনসিংহের গ্রামে দুপক্ষে হত্যাকাণ্ড : কানপুরে দাঙ্গায় জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ……

কেন এমন হয়? এক আলো, এক বাতাস, এক নদীর জল, এক ক্ষেতের ফল। বিপক্ষে দুয়েরি মাথার নামে দুদিনের জলধারা, লক্ষ্যে দুয়েরি আকাশে হয় উজ্জ্বল সূর্যোদয়। তবু কেন এই আত্ম-কলহ? কেন এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা?

কার যেন পরশে চমক ভাঙল। চোখ খুললাম। আশ্চর্য-বর্ণনি এক নারীমূর্তি। আলুলায়িত-কুন্তলা, দুর্বীল-যৌবনা।

কিন্তু শুচি? মাতৃকে শিহরে উঠলাম। সুন্দর গৌরবর্ণ মুখ নির্মম অস্ত্রাঘাতের চিহ্নে। শাণিত অস্ত্রের আঘাতে মুখখানি দুই ভাগ হয়ে গেছে। কপালগুলি আঁশাসোতা ফাঁক হয়ে গেছে। নাক ও ঠোঁট হয়েছে বিকৃত। কণ্ঠস্থান হতে তখনো ঝরছে রক্তধারা।

অজান্তেই মুখ দিয়ে প্রশ্ন বের হল : কে তুমি মা?

সজল কণ্ঠে উত্তর এল : আমি বেদমাতৃকা।

: তুমি ভারত মাতা? বর্ণাধিপি গরীয়সী জননী আমার? তোমার এ দশা কে করেছে মা? বল মা, কে সেই বরাধম—

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নারীমূর্তি বাধা দিল : কাকে ভর্ৎসনা করব বল? কারে দাও দোষ? ভাই ভাইয়ের বুকে হানছে গরল, তাই তো জননীর মুখ বিবর্ণিত। তাই তার চোখে অবিরল অশ্রুধারা।

: তুমি আদেশ করো মা, এ আত্মনাশা আত্মকলহ আমিপুরে—

মুখের কথা মুখেই রইল। রহস্যময়ী নারীমূর্তি আলো-ছায়া আঁকা পথে পা বাড়াল।

আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলাম : দাঁড়াও মা।

বৃথা এ আহ্বান। নারীমূর্তি এগিয়েই চলল। নীরবে, নিঃশব্দে।

অকস্মাৎ মনে হল, তার সেই নীরব পদক্ষেপে যেন অঙ্কিত আহ্বান। জোছনা-ধোয়া পথ যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে ডাকে মায়ের কণ্ঠস্বর। আমার অন্তরাত্মা সে-ডাকে সাড়া দিল।

রহস্যময়ী মূর্তির অনুসরণ করলাম।

পচা পুকুরের পাড় দিয়ে, বাঁশোয়ারী কালীমণ্ডপ পার হয়ে, কাটা খাল পিছনে ফেলে চলছি এগিয়ে। হে রহস্যময়ী অজানা ছায়ামূর্তি! আরো কতো দূরে আমায় নিয়ে যাবে? কোথায় তোমার পথচলার শেষ?

একি? তোজবাজী না ভূতের কারসাজি? কোথায় আতরমাতা? কোথায় ইংসিতময়ী ছায়ামূর্তি?

এক টুকরো মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদের মুখ। হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সম্মুখবর্তিনী রক্তাক্ত নারীমূর্তি। আবছা অন্ধকারে আমাকে এ কোথায় সে নিয়ে এল?

এ যে মাঠের শেষে চলা খিলের ধারে এসে পড়েছি। এ-পথে যে দিনে-দুপুরে কতো পথিক পথ হারায়। কতো মানুষ হারায় প্রাণ।

বুকটা চিপ্ চিপ্ করতে লাগল। ওই তো দূরে দেখা যায় সেই ঝুমুরে বটগাছ। তারি নিচে কেষ্ট ঠাকুরের বন্দনা……

সন্ধ্যা ঝন্-ঝন্ করে মাথার ভিতরটা ঘুরতে লাগল। কানের চাকায় লাগল উল্টো টান। বিস্মৃত অতীত ফিরে এল যাদব বর্তমানে…

* * *

অনেক দিন আগেকার কথা।

কল হাজার গাঁয়ের বন্দরবাড়ীর কাছারি ঘরে সখের যাত্রার রিহার্সেল চলেছে। আসর সরগরম।

অনেক ভেবে এবার ধরা হয়েছে 'মাতাতা' পালা। যাত্রা করবার মতো একখানা বই বটে।

মহারাজ মাতাতা রাজ্য-ঐশ্বর্য হারিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কাঙালের বেশে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। কিশোর পুত্র মৃদুকুন্দ গানে গানে ঘরিয়াদুরুকে ডাকে। দেবতার ভক্তির পরীক্ষায় তবু শেষ নাই। রাক্ষসেরী দুর্মতি দেবতা চায় মৃদুকুন্দর বক্ষমাংস। সত্যসন্ধি মহারাজ মাতাতা নিজ হাতে পুত্র বলি দেয় রাক্ষসের ক্ষুধা মেটাতে। মহারাণীর করুণ এ্যাকটিংএ আর মৃদুকুন্দর সজল সংগীতে বনের পাখী গান ভোলে। শ্রোতাদের চোখে জল ঝরে। পালা দেখতে দেখতে রাত কাবার হয়ে ওঠে। বইয়ের রাজা মাতাতা পালা।

তাইতো সখের যাত্রার অধিকারী হারাধন দত্ত মশায় নিজে এবার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পড়ে তবে এই বই আনিয়েছেন। এবার পূজায় যাত্রীযাত, তিনি করবেনই।

রিহার্সেল চলেছে।

ওস্তাদ নটবর গোঁসাই বেহালায় ছড় টানছে মাথা ঝাঁকিয়ে। আর কিশোর মৃদুকুন্দ ধরেছে গান :

পড়া ছিল ঘরিয়ার
কী সুন্দর মা প্রভাময়,
ভূপের কথা কি আর কব,—
সুখে ভুলে ভুলেছি।

এমন সময় ভূতের মতো কাছারিঘরে ঢুকল সতীনাথ। বন্দরমশায়ের কর্মচারী ও এ-অঞ্চলের সেরা কমিক এ্যাকটর।

বিরাগ কণ্ঠে বলল সীতানাথ : হুম না বন্দরমশায়, 'মাতাতা' এখানের মতো মাতবরদেরই তুলে রাখুন।

নটবর গোঁসাইর বেহালার ছড় থেমে গেল। থেমে গেল মৃদুকুন্দর গান।

বন্দরমশায় অসহিষ্ণু গলায় বললেন : ওসব কাজলামি এখন রাখো তো মশায়। তাদের কথা কি হল তাই বলো।

জবাব দিল সতীনাথ দুই হাত ঘুরিয়ে : আর বলাবলির কিছু নাই বন্দরমশায়, ফকির আসবে না।

কাছারি-ঘরের মাথার যেন সহসা বজ্র ভেঙে পড়ল। সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন করল : আসবে না মানে?

সতীনাথ দাঁতাতের তাগু উল্টো করে চানহাতের মুঠো আঙুল তার নিচে ঘুরাতে ঘুরাতে জবাব দিল : মানে, ফকিরের আশা নরকংকা। আটঘরের সমস্ত মাতবরেরা একজোট হয়েছে—ফকিরকে আসতে দেবে না।

ফেটে পড়লেন বন্দরমশায় : আসতে দেবে না, কললেই হলো আর কি! তোমরা কিছু ভেবোনা মশায়রা, রিহার্সেল জোর চালাও। না এলে ওর ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে দেব না? ওর বাবার ধর্মাদর্মের যে ভট-ভরসার বাঁধা আছে আমার কাছে, সে খেয়াল আছে বাপধনের?

জনার্দন রায় এ যাত্রাদলের পাকা মানুষ। সে এবার কথা বলল : আপনি থামুন বন্দরমশায়। আগে শুনেই নি ব্যাপারটা কি। তারপরে সে—কলকাটি তো আপনার হাতেই আছে। কী হে সতীনাথ, আসলে ব্যাপারটা কি? এতদিনকাল ফকির আমাদের দলে পাট করে আসছে, এবারে হঠাৎ তাকে আসতে দেবে না কেন? কি হয়েছে?

সতীনাথ হাত মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিল : হয়েছে আমার মাথা, আর আমাদের দলের মণ্ডু। আটঘরের মাতবরেরা সব পৌ ধরেছে—ফকির মুসলমানের ছেলে, ওকে আর কেষ্ট ঠাকুরের পার্ট করতে দেবে না।

হেসে উঠলেন বন্দরমশায়, কেন দেবে না? কেষ্ট ঠাকুরের পার্টটা কি কেল্লা নাকি রে মশায়? আরে ওই কেষ্ট ঠাকুর তো আসর মাতাবে। আহা—হা, সেবারে উমানাথ ঘোষালের দলের সেই কেলো ছোঁড়াটা কী গানই করল কেষ্টর পার্টে—

অমনি স্থান-কাল ভুলে বন্দরমশায় ডান হাতে তালির দিয়ে গুণ গুণ করে গান ধরলেন :

বীরব আমি মুকুতার তরে
ডুবে বেড়াই আমি ভব-সাগরে,
হল সফল জনম,
পেয়েছি রতন,
আলিংগন দাও হে আমায়।

আহা-হা। সে কি গান, যেন অমরতো ঝেরে যেত কানে। এ-হেন যে কেষ্টর পার্ট, তা ব্যাটাদের মনে ধরছে না। কেন? খুলি কী দোষ হচ্ছে ও-পার্টের, তাই শুনি?

কোঁড়ন কেটে কথা বলল সতীনাথ : আপনি তো চাষা দেখেই বলা পড়ছেন দত্তমশায়। কিন্তু ব্যাপারটা অতো সোজা নয়। আসলে কেষ্ট ঠাকুর হিন্দুর দেবতা বলেই ফকিরকে সে-পার্ট করতে ওরা দেবে না।

দত্তমশায় শুধালেন : আর এত কাল ধরে অতো যে কেষ্ট ঠাকুরের পার্ট ওই ফকির করে এল, তাতে দোষ হল না ?

চটপট জবাব দিল সতীনাথ : আজ্ঞে সে কথাও আমি তুলেছিলাম। ছড়াজনে মাতব্বর তাতে জবাব দিল—এতকাল যা হইছে তা হইছে, কিন্তুক অমন খারাপি কাম আর মোরা হতি দেব না—দত্ত মশায়রে এ-কতাটা আপনি বুলবেন সায়েব মশায়।

নটবর গোঁসাই কথা বলল : তাহলে উপায় ? ও ফকির ছাড়া আমাদের পালার কেষ্টর কাজ আর কাউকে দিয়ে হবে না—হতে পারে না।

এ-কথায় সকলেই ভেঙে পড়ল। আহারে ! এত সাধের যাত্রাখানা এমন আ-ঘাটায় ডুবে মরবে। রিহার্সেলের আগুনে ঠাণ্ডা জল পড়ল। আসর ভাঙে আর কি।

গতিক আর সুবিধার নয় দেখে জনার্দন রায় বলল : কি বলেন দত্ত মশায়, তাহলে কি অন্য কোন যাত্রা হাত দেব ? 'অযরিশের ব্রহ্মশাপ বা দুর্বাশা' যখন যাত্রাখানা আপনি কেনা করে এনেছেন ?

দত্ত মশায় ক্ষেপে উঠলেন : না না, ও সব দুর্বাশা যখন-তখন নয়। আগে ওই ফকির যখন, তারপরে অন্যকথা। এঃ, ব্যাটারা সব সাপের পাঁচ পা দেখেছে না ? আর দেখো তো মশায়রা কথায় ছিরি ! করবে যাত্রা, সখ যাওয়াবে, তার আবার হিন্দুর দেবতা, আর মুসলমানের পীর।

কথা বলল সতীনাথ : সে-কথা একশোবার। আমিও তো তাই বললাম। কিন্তু কার কথা কে শোনে ? সব ব্যাটার ওই এক কথা—ফকির যাবে না যাত্রায়।

দত্ত মশায়ের গলা সপ্তমে উঠল : ফকির যাবে না, ফকিরের বাবা যাবে, ওর চোদ্দপুরুষ যাবে। যাবে না ! ও সব মিয়ারে আমি চিনি। ফত মশায় ঘড়ি-ঘাটি বাঁধা আছে আমার এই হাত যাত্রে। চাবির এক মোচড়েই সব ঠিক হয়ে যাবে। হাঃ—

দত্ত মশা'র মত বলেন, অনুচরগণ তায় মতগত হলে।

দত্ত প্রতিজ্ঞাতে কাছারি বাড়ী মুখর হয়ে উঠল। গড়গড়ায় আওয়াজ উঠল গড়র্—গড়র্—

দত্ত মশায় ঘোষ মেজাজে বললেন : তোমরা সব ভড়কে যেও না হে মশায়রা। রিহার্সেলে ভাল করে তালিম যাও। ও ফকির বদলের ভার আমার।

নটবর গোঁসাই নতুন উদ্যমে বেহালায় ছড় বসাল। তোলে পড়ল চাট।

রিহার্সেল সুরু হল আবার।

প্রথমে যা ছিল সামান্য একটা খেয়াল মাত্র, ক্রমে তাই রূপ নিল অনন্যসাধারণ জিদে। দত্ত মশায়ের জিদ—ফকিরকে দিয়ে কেষ্টর পার্ট করাতেই হবে ; আবার ও-পক্ষেরও জিদ—কেষ্ট ঠাকুরের পার্ট ফকিরকে করতে দেওয়া হবে না।

কথা চালাচালি, আর ঘুষ ঘোরাঘুরি চলল প্রথম কিছুদিন। মুখে মুখে একপক্ষের অনেক খারাপেরাপী কথা বিকৃত রূপে উঠল গেয়ে অন্য পক্ষের কানে। ঘোলাটে ঘোরালো হয়ে রেখা দিল।

ধীরে ধীরে ব্যাপারটা দাঁড়াল গ্রামা কলহে। ফকির ও কেষ্ট ঠাকুরের পার্টকে কেন্দ্র করে দশহাজার আর আটঘর গাঁয়ের মান-মর্যাদা যেন সুতোয় মালায় ঝুলতে লাগল।

মানুষের গড়া এই জগতে ইমন ঘোপাল এমন একটা ব্যাপার যার উপায় মানুষের কোন হাত নাই। ঘটনাচক্রে দশহাজার গাঁয়ের প্রায় সব অধিবাসীই হিন্দু, আর আটঘর গাঁয়ে শুধুই মুসলমানের বাস।

কাজেই বহু তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনায় ভিতর দিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াল : দশহাজার বনাম আটঘর বিরোধ—হিন্দু বনাম মুসলমানের স্বার্থ-দ্বন্দ্ব।

হারাধন দত্ত এ-অঞ্চলের বড় জোতদার ও অর্থবান লোক। তাঁর হাত বাক্সের টাকা না হলে এ-কৃষিপ্রধান দেশের অনেকেরই চলে না। সহজে হাল ছাড়বার পাত্র তিনি নন। অনুরোধ-উপরোধ ও হুংকার-হুমকিতে যখন কোন কাজ হল না, তখন তিনি চরম পন্থার আশ্রয় নিলেন।

অমাবস্যার এক কালো রাতে লোকজন পাঠিয়ে সকলের অজান্তে ফকিরকে ধরে নিয়ে এলেন সটান দত্ত বাড়ীর কাছারিতে। দত্ত মশায়ের হুকুমনুযায়ী সাক্ষাতে ফকির ঢোক গিলে গিলে কেষ্টঠাকুরের পার্টে তালিম দিতে লাগল।

দত্ত মশায় গড়গড়ার টান দিয়ে বললেন : কেমন হল তো এবার ?

আর ওদিকে…

দরিদ্র আটঘরী কৃষকগণ। আহত সাপের মত তারা মনের আগুন মনে চেপে নীরবে দিন কাটাতে লাগল। জন কয়েক মাতব্বর গোছের মানুষ তাদের দিবারাত্র উস্কানি দেয় : আটঘরের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে। কিন্তু কোরী আটঘরবাসীরা ! তাদের অনেকেই দত্ত মশায়ের কাছ থেকে ধার-করা টাকায় বছর চালায়। তাঁর সঙ্গে একাজে লাগবে তারা কোন্ দুঃসাহসে ? মনের তীব্র প্রতিশোধ-বাসনা তাই বাঁকা পথ ধরল—

ভাদ্রের বর্ষণ-মুখর রাত।

জনার্দন রায় হাট থেকে বাড়ী ফিরছে।

দোকানের হিসাব পত্র মিলাতে একটু দেরীই হয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের সঙ্গীরা সব যে-যার দুর্যোগের আগেই বেলা থাকতে বাড়ী ফিরেছে। সঙ্গে জনার্দন একা।

একটানা বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ ঝুপ করে। তার সাথে সুর মিলিয়ে ডাকছে ব্যাঙের দল। চারদিকে নিশকালো আঁধার।

হঠাৎ একটা তীব্র আলো এসে পড়ল জনার্দনের মুখে।

ভয়ে সে চমকে উঠল : কে ?

সঙ্গে সঙ্গে একখানি লাঠি পড়ল তার মাথায়। জনার্দন চীৎকার করে পড়ে গেল মাটিতে।

কয়েকটি ছায়ামূর্তি চকিতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বলে গেল : এই তো মোটে কাটো দিন হয়ে গেল।

দুঃসংবাদ রায়াবন গ্রামের কানে পৌঁছতে দেরী হলো না।

ঘড়ঘড়ার নবটা তার হাত থেকে টুক্ করে মেঝের পড়ে গেল। প্রশ্নটা কুচকে চোখদুটি আপনিই বুজে এল। উপরের দাঁত চেপে ধরল নিচের ঠোঁটখানি। কুটচক্রের পাশার চলল নতুন চালের মহড়া।

অনেকদিন পরে।

মাঠ থেকে ফিরবার পথে সন্ধ্যার আবছায়া আঁধারে চড়ালান মাতব্বর বিধবাঁর হয়ে গেল।

রমহারার—মাটবর কিরোধ এমনি করেই ক্রমাগত এগিয়ে চলল।

আজ এ পক্ষের একজন মরল ; কাল ও পক্ষের একজন হয় শুরু। ইস্কাদিন মোল্লার বদি মাথা কাটে, তো সতীনাথের পা হয় খোঁড়া।

কিন্তু বদি চলে অন্ধকারে—রাসমঞ্চের অন্তরালে। রাতের অন্ধকার অন্ধাতে ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে গোপন চক্রান্ত। রাতের বাতাসে ফিস্-ফিস্ করে পাকা লাঠীর আস্ফালন। কালো অন্ধকারে সরলা ঝিলিক দিয়ে ওঠে—ইস্পাত-ফলক।.....

হাড়ি মাথা দিয়ে ঘরে চলে রমহারার মাটবরের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা।

'মাস্তাতা' পালার রিহার্সেল সমাপ্তপ্রায়েই চলে। মাথার পট্টি বেঁধে জনার্দন মাস্তাতার অ্যাকটো করে। খোঁড়া পা নিয়ে সতীনাথ হাসির হররা ছুটায়। ভেষ্ট ঠাকুরের করুণ গান গাইতে গাইতে ফকিরের ছুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরা নামে।

বেচারী ফকির। দুই পক্ষের খুন খারাপির নানা পাঁচ-মসলা কাহিনী ওর কানে আসে। নিরুপায় বেদনায় সব কথা ও শোনে, আর রাতদিন মনে মনে ভাবে। কখনো কখনো নিজেকেই ওর অপরাধী বলে মনে হয় : ওরি জন্যেই তো এই খুন-জখমের পালা...

সেদিনও রিহার্সেল চলছে পুরোদমে।

রাক্ষসের সিনটাই ধরা হয়েছে। মুচকুন্দ রক্তলোলুপ মায়ের চোখ বুজিয়ে কতো করে বুঝিয়ে বলছে :

> জননী গো, কেঁদো না—তুমি কেঁদো না। এক মুখাগ্নের তৃপ্তির জন্য এ ছার জীবন যদি যায়, সে যে আমার পরম গৌরব। তুমি হাসি মুখে আমায় বিদায় দাও জননী, পরের উপকারে এ-জীবন উৎসর্গ করে তোমার মুচকুন্দর জীবন ধন্য হোক.....

মুচকুন্দর পার্ট শুনতে শুনতে ফকিরের চোখের সামনে যেন একটা নতুন দেশ ঝলমল করে উঠল। কোন্ যাদুকরের ইংগিতে যেন বেহালার সুর, ঢোলের শব্দ হল স্তব্ধ। নতুন আলোয় চেকে গেল সব দর্শকের মুখচক্ষু। তুচ্ছ মনে হল নিজের জীবন—তুচ্ছ স্বার্থ—কলহ সংশয়।

ওর মনে হল : পরের উপকারে এ ছার জীবন উৎসর্গ করে ওর জীবনও তো ধন্য হতে পারে। অবে কেন্দ্র করেই রমহারার—মাট ঘরের এই প্রাণঘাতী কুৎসিত কিরোধ। নিজের জীবন দিয়ে এক মুহূর্তেই তো এ-কিরোধ ও বন্ধ করে দিতে পারে।

পার্টের মাঝখানে হঠাৎ ফকির থেমে গেল।

প্রম্পটার গলায় আরো একটু জোর দিয়ে—বলল : বল—তারপর বল—

ফকির স্তব্ধ—আচ্ছন্ন—বাক্যহীন।

ধর্ম রমহার উৎসাহ দিয়ে বললেন : হ্যাঁ—হ্যাঁ, চমৎকার—

'পার্টের মাঝখানে হঠাৎ ফকির থেমে গেল'

চমৎকার হচ্ছে তোমার পার্ট। ধরো—তারপর গানটা ধরো—'আমি আসিব না তো যাবে কোথায় ?'

অর্থহীন চোখ তুলে ফকির বলল : আজ আর আমি গাইতে পারব না ধর্ম রমহার, আমার মাথার ভিতরটা যেন কেমনতর করছে—

অগত্যা রিহার্সেল বন্ধ হয়ে গেল।

আর—

সেই রাতেই ফকিরের জীবন-নাটকের রিহার্সেলও চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল।

পরদিন সকালে বিছানায় 'পরে ওর রক্তাক্ত মৃতদেহ পাওয়া গেল। বারান্দা ঘরের আখাতে গলার আর্ধেকটা একেবারে হাঁ হ'য়ে আছে।

ফকির আত্মদান করেছে।

একটি হতভাগ্য ওস্তাদের এই শোচনীয় মৃত্যুতে রমহারায়—মাট

ঘরের ঘুণপিত কলসের আশুন মুহূর্তে নিভে গেল। দুই গ্রামের সমস্ত শঙ্কিত অন্তরঙ্গল নিঃশেষে ঘুমে ঘুমে ছিল প্রবল সাম্প্রদায়িক কলহক-কাহিনী।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু নরনারী মহাসমারোহে কবিরের শব দেহকে কবর দিয়ে এল।

* * *

একটা বিকট শব্দে আচমকা তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। বাড়া আমগাছটার শুকনো ডালে একটা হুতোম প্যাঁচা ডাকছে।

আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ। নারকেল গাছটার পাতায় পাতায় রূপালী আলোর ঝিলমিলি। শস্যরাজের মাতাল গন্ধে মাতাস বিহ্বল। পৃথিবী সুন্দর।

এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম।

বছরের কাদনে আজকের পড়া সাম্প্রদায়িক দাংগার সংবাদ আর বহুদিন বহুবার শোনা কেষ্ট ঠাকুরের বরগার কাহিনী মিলিয়ে বিপুল মনের এই অদ্ভুত স্বপ্ন-রচনা!

তবে এক হতভাগা তরুণের বক্ষরক্তে দুই গ্রামের হীন সাম্প্রদায়িক কলহের কলংক-রেখা মুছে ছিল যে জানে। কে জানে এ-কাহিনীর কতোখানি সত্য, আর কতোখানি কল্পনা।

কিন্তু সীমাহীন প্রান্তরের এক নিরালা বটগাছের নিচে আজো আছে কেষ্ট ঠাকুরের বরগা। ভাঁটফুলের জংলা আর কণি-কলমার ঝেড়ার মেরা একখণ্ড মাটির স্তূপ আজো এ-কাহিনীর সাক্ষ্য দেয়। কতো ঘরছাড়া যাউল-সন্ন্যাসী পীর-ফকির সেখানে আস্তানা নেয়। ঝিনুরা দেবতা স্মরণ করে সেখানে দুধ-চিনি দেয়, মুসলমানেরা দেয় সিন্নি। কালস্রোত কুটিল বংকিম রেখায় এগিয়ে চলে।.....

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুকের তল হতে। আবার চোখ বুজলাম। বিশ্বস্তিত এক রক্তাক্ত মুখই চোখের সামনে ভেসে উঠল।

হুতোম প্যাঁচাটা এখনো ডাকছে।....

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

অষ্টম প্রকরণ—গূঢ় পুরুষ-প্রণিধি

দ্বাদশ অধ্যায়

মূল :—আর যাহারা অসম্বন্ধী অথচ অবশ্য ভরণীয়—লক্ষণ-অঙ্গবিদ্যা-জন্তুক বিদ্যা-মায়াগত-আশ্রমধর্মনিমিত্ত-অন্তরচক্র অথবা সংসর্গবিদ্যা অধ্যয়নকারী—তাহারা সত্রী।

সংকেত :—গূঢ়পুরুষপ্রণিধি—গূঢ়পুরুষ অর্থাৎ চরমণের প্রণিধি অর্থাৎ প্রণিধান—কার্যে নিয়োগ (গঃ শাঃ); Institution of spies (SE)। পূর্বাধ্যায়ে গূঢ়পুরুষোৎপত্তি কথিত হইয়াছে। কাপটিক-উদাহিত-গৃহপতি-বৈদেহক-তাপসব্যঞ্জন চরমণের কথা তথায় বিবৃত হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে সত্রী তীক্ষ্ণ রসদ পরিব্রাজিকা প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত হইবে। চর হিসাবে উক্ত সম্প্রদায়ই সমান, তবে দুইটি সম্প্রদায়ের বিবরণ একই অধ্যায়ে প্রদত্ত না হইয়া দুইটি বিভিন্ন অধ্যায়ে লিখিত হইল কেন?—এরূপ প্রশ্নের সমাধানকল্পে গণপতি শাস্ত্রী বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই ভেদ কর্তৃভেদের সূচক। কাপটিকাদি পঞ্চ শ্রেণীর চরের কর্তা মন্ত্রি-সহিত রাজা; পূর্বাধ্যায়ের একটি বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায়—'তাহারক (অর্থাৎ কাপটিককে) অর্থ ও মান দ্বারা উৎসাহিত করিয়া মন্ত্রী বলিবেন—রাজা ও আমাকে প্রবাসরূপে গণ্য করিয়া' ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, সত্রী প্রভৃতি চার শ্রেণীর চরের কর্তা স্বয়ং রাজা—মন্ত্রী নহেন; কারণ, একটু পরেই এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—'ইহাদিগকে (সত্রী প্রভৃতি শ্রেণীর চরমণকে) রাজা নিজ রসদে মন্ত্রী পুরোহিত সেনাপতি যুবরাজ প্রভৃতির পরীক্ষার্থ নিযুক্ত করিবেন' ইত্যাদি। কেবল এই ভেদই পর্যাপ্ত নহে—অন্য ভেদও আছে। কাপটিকাদির স্বরূপও সত্রী প্রভৃতির স্বরূপ হইতে ভিন্ন। কাপটিকাদি পঞ্চ শ্রেণীর চর 'সংস্থা'-শব্দ-বাচ্য। ইঁহারা স্বস্থানে (নিজ নিজ ডেরায়) থাকিয়া রাজকার্য সাধন করেন—স্থান ছাড়িয়া কোথাও যান না। পক্ষান্তরে, সত্রী প্রভৃতি সর্বত্র সঞ্চরণশীল—ইতস্ততঃ বেড়াইয়াই তাঁহারা রাজার কার্য উদ্ধার করেন।

ভাদশাস্ত্রীর পাঠ—যে চাপ্যসম্বন্ধিনঃ; গণপতিশাস্ত্রীর পাঠ—'যে চাস্য সম্বন্ধিনঃ' ইত্যাদি। ইহার অর্থ-সম্পূর্ণ বিপরীত—আর যাহারা উঁহার (অর্থাৎ রাজার) সম্বন্ধী অর্থাৎ আত্মীয় বা কুটুম্ব। ভাদশাস্ত্রী 'অসম্বন্ধী' বলিতে রাজার সহিত সম্বন্ধহীন এরূপ অর্থ বুঝেন নাই; অসম্বন্ধী বলিতে বুঝিয়াছেন যাহার সহিত কাহারও কোনও সম্বন্ধ নাই—নিরাশ্রয়—orphan. দুইটি অর্থের যে কোনটিই গ্রহণযোগ্য। অবশ্য ভরণীয়—অবশ্য পোষ্য। লক্ষণ—সামুদ্রিকাদি (গঃ শাঃ); science (SII)। অঙ্গবিদ্যা—বেদের ষড়ঙ্গ—শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দঃ ও জ্যোতিষ;

অথবা অঙ্গবর্ণনের বা স্পর্শে শুভাশুভ-জ্ঞান (গঃ শাঃ) ; palmistry (SH)। অক্ষক্রিড়া—দ্যূতক্রীড়ন বা অক্ষদ্যূত বিদ্যা (গঃ শাঃ) ; legerdemain (SH)—হাতসাফাই। যাদোগর্ভ—ইন্দ্রজাল (গঃ শাঃ) ; sorcery (SH) ; জাদুবিদ্যার খেল, ভোজবাজি। আত্মরক্ষা—ক্রমহ্রস্য গার্হস্থ্য-যানস্থান-ভৈষজ—এই চতুরাশ্রমের বিষয়। গঃ শাঃ অর্থ করিয়াছেন —ধর্মাধিকরণাদি ; সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন বা না করুন—আশ্রম-চতুষ্টয়ের কর্তব্যসম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রে যেখানে যাহা উক্ত হইয়াছে সেই সকল অংশ। নিখিল—সমুদয়বিদ্যা—পূর্বকৃত-কর্মবাদি শুভাশুভ-নিমিত্ত ; omens (SH)। অন্তরীক্ষ—পক্ষি-পশু প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞাপিত শুভাশুভ —পক্ষিশাস্ত্র (গঃ শাঃ)। সামর্থ্যবিদ্যা—গণপতি শাস্ত্রীর মতে ইহা অধ্যয়ন ক্রিয়ার (অধীয়ানাঃ) কর্ম ; ইহার অর্থ—কামশাস্ত্র ও তদনুরূপ নীত-যুক্ত্যাদি শাস্ত্র ; পক্ষান্তরে শ্যামশাস্ত্রী ইহাকে 'সন্নিধাঃ' পদের বিশেষণ ধরিয়াছেন ; অর্থ—সামাজিক সামর্থ্য-দ্বারা শিক্ষাকারী সখী। শ্যামশাস্ত্রী 'সখী' পদের অনুবাদ করিয়াছেন—'classmate spies' রূপে ; হইতে বুঝা যায় সন্নিগণ শিক্ষার্থী শ্রেণীর চর।

মূল :—জনপদে যে সকল শূর আত্মত্যাগপূর্বক হস্তী কিংবা ব্যালের (শ্বাপদের) সহিত দ্রব্যহেতু যুদ্ধ করেন, তাহারাই তীক্ষ্ণ।

সঙ্কেত :—শূর···বীর, brave desperadoes (SH) ; ইহা তাৎপর্য হউক, তবে অনুবাদে desperadoes শব্দটি বর্জনীয় মনে হিলে ভাল হইত। আত্মত্যাগঃ—এখানে আত্মপদের অর্থ দেহেন্দ্রিয়াদি ; শরীর তুচ্ছ করিয়া—প্রাণের মমতা না রাখিয়া। ব্যাল—শ্বাপদ, হিংস্রজন্তু। তীক্ষ্ণ—শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ—fiery spies or firebrands.

মূল :—যাহারা বন্ধুগণের প্রতি (ও) নিঃস্নেহ, ক্রূর ও অলস, তাহারাই রসদ।

সঙ্কেত :—বন্ধু—(১) অব্যাপৎসহজো বন্ধুঃ—যিনি বিনা অপরাধে সঙ্গ করেন—তিনিই বন্ধু ; আর (২) পারিভাষিক বন্ধু—মাসতুত ভাই, পিসতুত ভাই। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ মূলানুগ নহে—those who have no trace of filial affection left in them ; those that are devoid of all affection towards their friends (or relations)—বলা উচিত। ক্রূর—আততায়ী (গঃ শাঃ) ; cruel (SH)—crooked. অলস—অনুদ্যোগ (গঃ শাঃ) ; indolent (SH). রসদ—'রস' শব্দের অর্থ বিষ—এই শ্রেণীর চর বিষদানেও অসমর্থ।

মূল :—পরিব্রাজিকা (হইতেছেন) বৃত্তিকামা দরিদ্রা বিধবা প্রগল্ভা ব্রাহ্মণী—অন্তঃপুরে কৃতসংকারা (পরিব্রাজিকা) মহামাত্র-গৃহসমূহে গমন করিবেন।

সঙ্কেত :—পরিব্রাজিকা আর ভিক্ষুকী একই। বৃত্তিকামা—ভোগাভিলাষী (গঃ শাঃ) ; জীবিকার্জনে অভিলাষিণী, desirous to earn her livelihood (SH). প্রগল্ভা—very clever (SH) ; forward বলাই ভাল। মহামাত্রগণের মৃদু সংকারলাভের আশায় পুনঃ পুনঃ গমন করিবেন।

মূল :—ইঁহার দ্বারা মুণ্ডিত-মস্তকবিশিষ্টা (নারীগণ) ও মুণ্ডলীগণও ব্যাখ্যাত হইলেন।

সঙ্কেত :—মুণ্ডাঃ—শাক্যভিক্ষুণীগণ (গঃ শাঃ)। মুণ্ডলী—মুণ্ডা। পরিব্রাজিকা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, মুণ্ডা ও মুণ্ডলী সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য —ইহাই তাৎপর্য।

মূল :—এইগুলি সঞ্চার।

সঙ্কেত :—এই চারি শ্রেণীর চরের নাম 'সঞ্চার' অর্থাৎ—যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়, যাযাবর। পক্ষান্তরে,কাপটিকাদি পঞ্চশ্রেণীর চরের নাম—'সংস্থা'। শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদ—wandering spies.

মূল :—রাজা নিজ রাষ্ট্রে বিশ্বাস্য-বেশ-বেশ-শিল্প-ভাষা-বয়স-নির্দেশবিশিষ্ট তাহাদিগকে (সঞ্চারবর্গকে) ভক্তি ও সামর্থ্যযোগানুসারে মন্ত্রি-পুরোহিত-সেনাপতি-যুবরাজ-দৌবারিক-অন্তর্বংশিক-প্রশাস্তৃ-সমাহর্তৃ-সন্নিধাতৃ-প্রদেষ্টৃ-নায়ক-পৌর-ব্যাবহারিক-কার্মান্তিক-মন্ত্রিপরিষদ্-অধ্যক্ষ-দণ্ডপাল-দুর্গপাল-অন্তপাল-আটবিক (প্রভৃতির নিকট) পাঠাইয়া দিবেন।

সঙ্কেত :—বিষয়ে (মূল)—'বিষয়' অর্থে রাজ্য, জনপদ ইত্যাদি। রাজা নিজ রাষ্ট্রমধ্যে সঞ্চারগণকে প্রচারিত করিবেন অর্থাৎ মাঝে মিশে মিশুক করিবেন। কি নিমিত্ত তাহাদিগের নিয়োগ তাহা বলা হইতেছে। উদ্দেশ্য—মন্ত্রি-পুরোহিতাদির ভক্তি-জ্ঞান। মন্ত্রী প্রভৃতি বিশ্বাসী ও সক্ষমচিত্ত কি না—ইহা বুঝিবার জন্য সঞ্চার-প্রয়োগের প্রয়োজন। ভক্তি ও সামর্থ্যযোগ অনুসারে—ভক্তি সেব্যগতা আর সামর্থ্য সেবকগত। অর্থাৎ —সেব্য মন্ত্রী প্রভৃতির মধ্যে যিনি সেবকের, তাঁহার নিকট সেবকের-সেবাকারী চর পাঠান উচিত ; আবার চরগণও তথায় যাইয়া নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী ছলাবরণাদি অর্থে নিযুক্ত হইবেন—গণপতি শাস্ত্রীর ব্যাখ্যার ইহাই তাৎপর্য। মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ—ইঁহারা সর্বজনবন্দিত। দৌবারিক—দরোয়ান, প্রতিহারী (গঃ শাঃ)। অন্তর্বংশিক—অন্তঃপুরাধিকৃত—কঞ্চুকিস্থানীয়। প্রশাস্তা—কার্যবাহ-সংস্থাপিকা (গঃ শাঃ) ; magistrate (SH)। সমাহর্তা—রাজার নিমিত্ত অর্থাহরণকারী ; Collector-general (SH)। সন্নিধাতা—ভাণ্ডাগারাধিকারী (গঃ শাঃ) ; Chamberlain (SH) ; Chancellor of the exchequer বলিলে কিরূপ হয়?' অনেক —কণ্টকশোধনের কর্তা (গঃ শাঃ) ; Commissioner (SH). নায়ক—এক সহস্র—দ্বিসহস্র ইত্যাদি পদাতিকগণের নেতা (গঃ শাঃ)—যোগল আমলে পাঁচহাজারী ইত্যাদি মনসবদারগণের তুল্য ; পক্ষান্তরে শ্যামশাস্ত্রী ইহার ইংরাজী করিয়াছেন—city constable. গণপতি

শাস্ত্রীর ব্যাখ্যায় 'পৌরব্যবহারিক' এক পদ—পুরমুখ্য অথবা পুরপ্রাড়্-বিবাক। কামন্দকীয় মতে পৌর পৃথক্ পদ—পুরশাসনকর্ত্তা, officer-in-charge of the city; আর ব্যবহারিক—ব্যবসার অধ্যক্ষ—superintendent of transactions. কার্ম্মান্তিক—আকরাদি কর্ম্ম অধিকারী (গ: শা:); superintendent of manufactories (SH)। গণপতি শাস্ত্রীর মতে—'মন্ত্রিপরিষদ্ধ্যক্ষ' এক পদ—মন্ত্রিসভার অধ্যক্ষ অথবা রাজসভাধিকার-নেতা; কিন্তু কামন্দকীয় মতে মন্ত্রি-পরিষদ ও অধ্যক্ষ দুইটি পৃথক্ পৃথক্ পদ; 'অধ্যক্ষ' বলিতে বুঝাইতেছে—বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ। দণ্ডপাল—সৈন্য-সেনামুখাদির নেতা (গ: শা:); commissary-general (SH). দুর্গপাল—আকারাধি-রক্ষী (গ: শা:); officer-in-charge of fortifications (SH)। অন্তপাল—রাজ্যসীমারক্ষী (গ: শা:), সীমান্তরক্ষক; officer-in-charge of boundaries (SH)। আটবিক—আটবী-রাজ্যাধিপতি (গ: শা:); অথবা বনভূমি-রক্ষক; officer-in-charge of wild tracts (SH).

মূল :—তাঁহাদিগের বাহ্য আচরণ ছত্র-ভৃঙ্গার-ব্যজন-পাদুকা-আসন-যান-বাহন-গ্রাহী তীক্ষ্ণগণ নির্ণয় করিবে।

সঙ্কেত :—তাঁহাদিগের—মন্ত্রি-পুরোহিতাদির। চার (মূল) আচরণ। বাহ্যং চারং বিদ্যুঃ (মূল)—বাহ্য আচরণ জানিবে—shall espy the public character (SH)—বাহিরে ইঁহারা কিরূপ আচরণ করেন, ছত্রাদি-গ্রাহক তীক্ষ্ণ চরগণ তাহা জানিবে। ছত্র—ছাতা। ভৃঙ্গার—জলপাত্রবিশেষ, ঝারু; vase (SH)—ইহা ভুল। ব্যজন—পাখা, চামর ইত্যাদি। পাদুকা—জুতা, খড়ম ইত্যাদি। আসন—সিংহাসনাদি, বসিবার কাঠাসনাদি। যান—গোযান, অশ্বযান, শিবিকাদি। বাহন—অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি, conveyance (SH); vehicle বলা ভাল।

মূল :—উহা সত্রিগণ সংস্থাসমূহে অর্পণ করিবে।

সঙ্কেত :—উহা—তীক্ষ্ণ-শ্রেণীর চরগণ মন্ত্রিপুরোহিতাদির যে বাহ্য আচরণ ছত্রাদি-গ্রহণকালে জানিতে পারিবেন—সেই বাহ্য আচরণ। সংস্থাসমূহ—পক্ষ সংস্থা—কাপটিক, উদাহিত, গৃহপতি, বৈদেহক, তাপস—পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত।

ব্যাপারটি এইরূপ :—তীক্ষ্ণ-শ্রেণীর চরগণ ছত্রাদি-বহন-ব্যাপদেশে মন্ত্রি-পুরোহিতাদির বাহ্য আচরণ জানিয়া সত্রিগণের নিকট বলিবে—সত্রিগণও ভ্রমণ-ব্যাপদেশে তীক্ষ্ণগণের নিকট হইতে উক্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কাপটিকাদি সংস্থার নিকট উহা জানাইবে। তীক্ষ্ণগণ স্বয়ং সংস্থাকে সংবাদ জানাইবার সুযোগ পায় না—কারণ তাহাদিগকে বেতনভুক্ কর্ম্মচারীর ন্যায় সর্ব্বদা মন্ত্রি-পুরোহিতাদির সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হয়—সংস্থাদিগের নিবাসে যাওয়া তাহাদিগের পক্ষে সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, সত্রিগণ প্রায় ভবঘুরের মত—সাধুত্রিক-ভোজবাদি প্রভৃতি শিখিয়া উহার সাহায্যে জীবিকার্জ্জন-ব্যাপদেশে তাহারা সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়—অবাধে সকল স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তীক্ষ্ণগণের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সংস্থাকে উহা জানাইয়া দেওয়া তাহাদিগের পক্ষে অনায়াসসাধ্য। (ক্রমশ:)

P30439

আসবে

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

—ঠাকুরপো, ঠাকুরপো শিগ্‌গির দেখে যাও—

বৌদির চীৎকারে নীচে নেমে আসি।

জানলার ধারে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি বলেন—দে'খ, ওই দে'খ—ঠিক আমার মলয়ের মত না? একেবারে অবিকল—ডাকো—ওকে তুমি ডাকো ঠাকুরপো—

আশ্চর্য! সত্যি এমন আশ্চর্য মিল দেখা যায় না। ফুল ফেরৎ ছেলের দলে খাকী প্যাণ্ট্ পরা ওই ছেলেটী আমার ভাইপো মলয়ের মত দেখতে। ষোলো আনা মিল না হ'লেও বারো আনা মিল।

বৌদির অনুরোধে তাকে ডেকে নিয়ে এলাম অনেক কষ্টে রাজী করে। এসে ভীরু হরিণের মত তাকায় আর বলে, আমি বাড়ী যাব, আমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

বৌদি কাছে টেনে নেন, আদর করে বলেন, ভয় কি খোকা—থাক না একটু আমার কাছে।

ছেলেটী কি ভেবে চুপ করে থাকে, আদর নেয়। একটী রেকাবীতে খাবার সাজিয়ে বৌদি ছেলেটীকে খেতে দেন। ছেলেটী খায়।

—মলয়, তুমি আমার মলয়,—বৌদি বলেন।

—বারে, আমি মলয় হব কেন, আমি তো অমর,—ছেলেটী প্রতিবাদ করে বলে।

গভীর আগ্রহে বৌদি আবার বলে ওঠেন—না তুমি মলয়, আমি তোমায় মলয় বলে ডাকবো কেমন ?

চোখে জল দেখে অমর অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকে, তারপর ঘাড় নেড়ে বলে,—আচ্ছা।

খাবারে আর আদরে সে খুশী হয়, তাই যাবার সময় বলে যায়,—আবার আসবো !

সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

যেদিন আমাদের ফাঁকী দিয়ে মলয় চিরদিনের জন্যে চলে যায়।

দুপুর বেলা—দাদা তখন অফিসে। পাড়ার লোক ডেকে তাকে নিয়ে যাই। বৌদি একা থাকেন।

শ্মশান থেকে ফিরি সন্ধ্যার পর। দেখি দাদা শুয়ে আছেন, মাঝে মাঝে এক একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস তাঁর বুক নিঙড়ে বার হয়ে আসছে। আর বৌদি মলয়ের খেলনাগুলি চারদিকে ছড়িয়ে তার মধ্যে চুপ করে বসে আছেন। চোখে তাঁর জল নেই—মুখে নাই হাহুতাশ—অচল অটল মূর্ত্তি, যেন বেদনার প্রতিচ্ছবি। দৃষ্টি তাঁর খেলনাগুলির প্রতি স্থির অচঞ্চল। আমার মনে হল এর চেয়ে কাঁদলে যেন ভাল হ'তো। অনেক ডাকে সাড়া দিলেন, ক্ষীণকণ্ঠে বললেন,—আবার আসবে !

আবার এল।

মলয় তাহলে ভুলে যায় নি আমাদের। হাসি আনন্দে সবার মন ভ'রে উঠলো। সমস্ত বাড়ীখানি শিশুর কলকণ্ঠে মুখর হ'লো।

দাদা খেলনা কিনে আনেন—নিত্য নূতন খেলনা।

অমর রোজ আসে স্কুল থেকে সোজা আমাদের বাড়ী। অনেকক্ষণ থাকে, খেলা করে, পড়ে, তারপর খাওয়া দাওয়া হ'লে রাত্রে তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

তার বাড়ীর লোকেরা সব শুনেছেন, তাই কিছু বলেন না। অত্যন্ত ভাল লোক তাঁরা।

একদিনের ঘটনা···

অমর এসেছে ; এসেই তার নজর পড়লো মলয়ের ফটোটার দিকে—দেয়ালে সেটা টাঙানো ছিল।

—দাও, দাও পেড়ে দাও,—আকুল কণ্ঠে বায়না ধরলো সে।

ওকি দেওয়া যায়। পড়ে হয় তো ভেঙ্গে যেতে পারে।

কোনও কথা সে শোনে না, বলে,—একুণি পেড়ে দাও, ওতো আমার ছবি।

বৌদি আর স্থির থাকতে পারেন না, তাই পেড়ে দেন' তার হাতে। ছবিটাকে বুকে জড়িয়ে সে কত আদর করে—চুমু খায় ছবির মুখে।

বৌদি হাসেন—তৃপ্তির হাসি—তারপর চোখ তাঁর ভ'রে যায় জলে।

একদিন হঠাৎ সে এল না, শুনলাম তার জ্বর হয়েছে।

বৌদি বললেন,—আমায় নিয়ে চল ঠাকুরপো, আমি এখনি যাব।···তাঁকে নিয়ে গেলাম।

সে এল না, তাই বৌদিই সেখানে থেকে যান।

দুই মা সেবা করে—দুজনেরই বুকের ধন।

তবু তাকে রাখা গেল না।

ধরণীর আলো, ছায়া, মাটী,—জননীর স্নেহ, মায়া, প্রীতি সব ছেড়ে সে চলে গেল।

প্রতিদিন ঘড়ীতে চারটে বাজে···বৌদি দাঁড়ান জানলার ধারে।···

স্কুল ফেরত ছেলের দল বাড়ী যায়।···

অধীর উৎসুকে ভরা চোখ দুটী মেলে বৌদি চেয়ে থাকেন তাদের পানে। কি এক অজানা আশায় তাঁর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।···হয়ত—হয়ত তেমনি করেই আবার সে আসবে···

সূর্য্য আর উঠবে না

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইলা এসে তাড়া দিয়ে যায়—রাত যে একটা বাজে, রাখো তোমার গবেষণা, শরীরের কি দশা হয়েছে দেখো দিকিন্, আমাকে না কাঁদিয়ে বুঝি তোমার সুখ হয় না।

ছিঃ ইলা, তুমি না বিজ্ঞানের ছাত্রী—

বিরূপাক্ষ বৈজ্ঞানিক, পাঁচতলা বাড়ীর সবার উপর ফ্ল্যাটে সে আর ইলা নীড় বেঁধেছে আজ তিনবছর। সারাজীবনের রক্তজলকরা অর্থে স্ত্রীর গহনা ও পৈতৃক বাড়ী বেচা টাকায় গড়ে তুলেছে নিজের মনের মত ছোট্ট একটি বীক্ষণাগার, কিনেছে বড় টেলিস্কোপ, সারারাত ধরে সে চেয়ে থাকে নির্নিমেষ নয়নে অগাধ রহস্যভরা সীমাহীন নীল আকাশের পানে নীহারিকা ঘেরা তারার দিকে, ভক্ত যেমন করে আকুল হয়ে তাকায় তার উপাস্যের দিকে, প্রিয়া যেমন করে ব্যাকুল হয়ে চায় প্রিয়তমের দিকে।

খাতা পেন্সিল নিয়ে বিরূপাক্ষ টুকে যাচ্ছে নিজের গবেষণার ফল, তারা সকলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তাপ, ঘনত্ব ও চাপ কতখানি অণু পরমাণুর সঙ্ঘর্ষের ফলে আণবিক শক্তির কতখানি মুক্ত হয়ে ব্যোমরশ্মিরূপে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে, হিলিয়ম পরমাণু গঠনের জন্য কতটা হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রয়োজন—কতটা ইলেক্ট্রন্ কতটা বিপরীত গুণ বিশিষ্ট পজিট্রনের সঙ্গ খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ সে বলে—ইলা জানো, আমার গণনা যদি সত্যি হয়, তবে এমনদিন আসবে, হয়ত কালই, যেদিন এই পৃথিবীতে সূর্য্য আর উঠবেনা, অতি প্রবল আণবিক আলোড়নের ফলে সবিতা হবেন অদৃশ্য এক্সিস্ থেকে কেন্দ্রচ্যুত। কণ্ঠস্বর তার গুরুগম্ভীর হয়ে ওঠে, আবেগময় জড়তা মাখানো স্বরে বলে—আমি দেখতে পাচ্ছি, সেদিন আসছে, এগিয়ে আসছে মহাকালের করাল ছায়া, সব কালো নিকষ কালো, সব অন্ধকার, তাপমৃত্যু নয়, হঠাৎ একদিন সকালে উঠে লোকে দেখবে আকাশে ওঠেনি সূর্য্য, সপ্তাশ্ববাহিত অরুণের রথচিহ্ন অন্তর্হিত, মুছে গেছে আলোর রেখা। আস্তে আস্তে থেমে আসবে জীবজগতের জীবন স্পন্দন সুষুপ্তির অন্তরালে।

ইলা বলে—কত লক্ষ কোটী বছর পরে তা হবে তা নিয়ে আজ আর তোমার মাথা ঘামাতে হবে না, তুমি ঘুমুবে চল। বিরূপাক্ষ চুপ করে যায়, নিজের মনে বিড়বিড় করে চার্ট ও গ্রাফের দিকে পলকহীন নেত্রে চেয়ে থাকে, বড় বড় ফর্মুলা কসে। ইলা তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মনে পড়ে তার কুমারী জীবনের বহু টুকরো টুকরো স্মৃতিভরা ক্ষণগুলির সমগ্র স্বপ্ন। এম্-এস্সি পাশ করে একদিন সে এসে দাঁড়িয়েছিল, দুরু দুরু বক্ষে বিরূপাক্ষের ল্যাবোরেটারীর সামনে। বিরূপাক্ষ কাজ করে যাচ্ছে তন্ময় হয়ে—আধ ঘণ্টা অপেক্ষার পর সে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কে—কি দরকার!

ইলা এগিয়ে দেয় ন্যাশন্যাল এসোসিয়েশানের চিঠিখানি।

ওঃ আপনি এখানে কাজ করবেন, বেশ ত—

একঘণ্টা চুপচাপ থাকার পর আবার চমক্ ভাঙে—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, কাজ আরম্ভ করে দিন্। সাইক্লোট্রন্ জানেন?

ধীরে ধীরে ইলা এই অদ্ভুত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। দেখে সেইখানেই পাশের এক ছোটঘরে তাঁর আস্তানা, দেখা যায় খাটের উপর ছেঁড়া চাদর, আলনায় মলিন জামা, বেয়ারাটাই দেখা শোনা করে। খাবার আসে কাছের রেষ্টুরাণ্ট হতে, অর্দ্ধেক জিনিসই তার অখাদ্য। রিসার্চের চেয়ে তার ভাল লাগে রিসার্চকর্ত্তাকে। মনে হয় এই আপনভোলা বৈরাগী মানুষটির বুঝি পরিচর্য্যা হচ্ছে না, দরদ দিয়ে সেবা করবার কেউ নেই। জেগে ওঠে তার মনে নতুন ছন্দ, একটা অস্পষ্ট অস্ফুট ইঙ্গিত। গড়ে তোলে একটু আরামের আয়োজন, এপাশে একটা স্টোভ্, দুটো কাপ, স্প্যান্ চা কফি ডিম, ওপাশে একটা ছোট টেবিল ফ্যান্, গরমের দিনে যখন এক্সপেরিমেন্টের সময় মাথার উপরকার ফ্যান্ বন্ধ রাখতে হয়, তখন যাতে হাওয়াটা ঠিক্ গায়ে লাগে তার ব্যবস্থা। বই খাতা নোটস্গুলি পরিপাটিরূপে গোছানো, ইন্ডেক্স করা। বিরূপাক্ষ যখন যা চায়, তা হাতের কাছেই পায়, হাতড়াতে হয় না। নজরে পড়ে—তার বিছানার চাদর সাদা ধবধবে,

প্যান্টের নিখুঁত ভাঁজ, ছোট্ট টিপয়ে সযত্নে রোনা রঙীণ, টেবিল ক্লথ, ফুলদানীতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, কাঁচের পাত্রে ভেজা বেলফুলের হাল্কা গন্ধ। মাসের পর মাস যায়, চলে বিজ্ঞান তপস্বীর নিভৃত সাধনা, তপস্বিনীর নীরব সেবা।

হঠাৎ একদিন সে ডাকে—ইলা, চা খেয়েছি আজ? বেলা তখন তিনটে বেজে গেছে, মনে পড়ে সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি ত। কেউ সাড়া দেয় না, সে ধমকে ওঠে বেয়ারার উপর—দিদিমণি কোথায়? সে চমকে উঠে বলে, আজ ত দিদিমণি আসেননি। ভিতরে ভিতরে প্লেসিয়ার যে গলতে সুরু করেছে তার খবর সে নিজেই জানে না। বেয়ারাকে চা আনতে বলে। কিন্তু বাইরের চা লাগে বিস্বাদ···ফেলে দিয়ে সে উঠে পড়ে।

বেয়ারা আশ্চর্য্য হয়ে যায়—সাহেব চলল কোথায়?

আধঘণ্টা ঘোরাঘুরির পর মনে পড়ে ইলার ঠিকানা জানা নেই ত, ফিরে এসে বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করে—এই দিদিমণির বাড়ী জানিস্? বেয়ারা তাকে নিয়ে যায় সার্কুলার রোডের ছোট একটি ফ্ল্যাটে। মা ও মেয়ে নিভৃতে বাস করেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, অন্তরের মহিমা নিয়ে। শান্ত, শিষ্ট, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। খবর পান ইলার আজ চার পাঁচদিন ধরেই জ্বর হচ্ছে। অথচ সে রোজ বিরূপাক্ষের কাছে যায়, ল্যাবোরেটারীতে কাজ করে। আজও সে বেরুচ্ছিল, মাথাঘুরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। বিরূপাক্ষ চুপ করে গিয়ে দাঁড়ান্ তার শয্যার পাশে, জ্বরতপ্ত কপালে রাখেন হাত—চোখ চাইল ইলা, সশব্যস্ত হয়ে বললে—আপনি? আপনার খাওয়া হয়েছে? হয়নি শুনে মাকে বলে—শীগ্‌গির, দুখানা লুচি এক কাপ চা নিয়ে এসো। শতকাজ ফেলে সারাসন্ধ্যা বসে থাকেন বিরূপাক্ষ তার রোগ শিয়রে। তার রুটিন্ যায় উল্টে। পরের দিনও যথাসময়ে সে গিয়ে দাঁড়ালো ইলার রোগশয্যার পাশে। তারপর এই যাওয়া আসা তার নিত্যকার হয়ে উঠলো—যতদিন না ইলা সেরে ওঠে।

কলেজে ছেলেরা লক্ষ্য করে তার কণ্ঠস্বরে এক কমনীয়তা, চোখের দীপ্তিতে মাধুর্য্য, চলনের ভঙ্গী দৃপ্ত কিন্তু নমনীয়। 'হোল কি' গবেষণা হয় কমনরুমে, হাসে ছাত্রীর দল। একদিন সবাই শুনলে অপত্নীক বিরূপাক্ষ কনকার্ষড ব্যাচিলার বেশী বয়সে বিয়ে করেছেন। নন্দিতা সেন খবরটা ফাঁস করে দিলে। বললে, জানিস এ বিয়ে নয় বিয়ের চেয়ে বড়—যুগলে সাধনা হবে। তারপর বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে—প্যাক্ট হয়েছে যোগাভ্যাসে। ইলা বসে আছে—কখন তপস্যা ভাঙবে।

থর থর করে কাঁপতে থাকেন বিরূপাক্ষ উত্তেজনায়—ইলা, ইলা ঐ দেখো, তিন লক্ষ বছর আগে যে নক্ষত্রের বিস্ফোরণ হয়েছে, আকাশপথে তার অনন্ত রেখা, কোথায় লাগে তোমাদের সূর্য্যি ঠাকুরের মাটির পিদিমের আলো, তিন হাজার কোটিগুণ বেশী তেজ, প্রণাম করো সেই তেজস্বর বিরাট্‌কে। ইলা ভয় পেয়ে যায় তার অধীর উন্মত্ত আবেগ দেখে, বলে—ওগুলো মায়া তারা, কোটি সহস্র বছর আগেকার প্রতিবিম্ব, কেন এই মায়ার পিছনে ঘুরছ? সে কেঁদে ফেলে—আমি তোমায় নিয়ে বাঁচতে চাই, এইসব আজগুবী রাখো, চল শোবে চল। বিরূপাক্ষের মাথা দিয়ে বেরুচ্ছে আগুন, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। ইজি চেয়ারে শুইয়ে দিয়ে তার লম্বা চুলের ভিতর হাত বুলিয়ে দেয়, তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে। বহুক্ষণ পরে সে ঘুমিয়ে পড়ল, ছোট্ট ছেলেটির মত। তার ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে ভাবনার আর শেষ থাকে না ইলার। ডাক্তার কত ভয় দেখিয়ে গেছেন।

ঘড়িতে এলার্ম দেওয়া থাকে, বিরূপাক্ষের ঘুম ভাঙে নিক্তির কাঁটা হিসাবে। জেগে উঠে সে তাকায় এদিক্ ওদিক্। মাথার ভিতরটা যেন খালি লাগছে। 'ইলা' বলে সে চীৎকার করে ওঠে—তোমায় বলিনি আমি যে সূর্য্য আর উঠবে না, দেখো আমার কথা ঠিক্ কিনা—সব কালো, সব অন্ধকার।

তার বিস্ফারিত চোখ দুটি অর্থহীন দৃষ্টিহীন।

ইলা ভয়ে কেঁদে ওঠে।

কাঁদো কেন আমার গণনা সত্যি, কেঁদো না, পৃথিবীও একদিন যেতই—আজ না হয় কাল!

ইলা বলে—না না···রুদ্ধ আবেগে কথা বেরোয় না।

রাঁচির মেণ্টাল হসপিটালে এক রোগীকে দেখা যায়, রোজ বিকালে বসে থাকে মাঠের কটি ঘাসের সবুজের ওপর। কারুর সঙ্গে কথা কয় না, কারুর সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা নেই, কোন গোলমাল নেই—শান্ত সৌম্য শুধু মাথা উঁচু করে চেয়ে থাকে—ইলা, বলিনি তোমায়—সূর্য্য আর উঠবে না।

একটি কাঁপকায়া মহিলা এসে দাঁড়ায় তার পাশে—ব্যথাতুর দৃষ্টিতে উদ্গত অশ্রু গোপন করে।

প্লাসটিক্‌স

শ্রীসুবর্ণকমল রায়

আমাদের দেশে সর্বসাধারণের মধ্যে প্লাসটিকের নাম প্রচলিত নয়। এই রসায়নিক পদার্থটির ভবিষ্যৎ এত উজ্জ্বল যে সকলেরই প্লাসটিক সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত হওয়া উচিত।

প্লাসটিক বহুবিধ আছে। ইহারা সকলে মিলিয়া জৈব রসায়নের একটি প্রকাণ্ড অধ্যায় জুড়িয়া থাকে। ইহাদের ব্যবহারিক ক্ষমতা এত বিস্তার লাভ করিতেছে যে ভাবীযুগকে প্লাসটিক যুগ বলিলে ভুল হইবে না। ইহারা সকলেই রাসায়নিকের হাতের জিনিষ। কার্বলিক, ফরম্যালডিহাইড (যথা ব্যাকেলাইট), ইউরিয়া ফরম্যালডিহাইড, সিনাইল, ইত্যাদি বহুবিধ রাসায়নিক নাম উহাদের আছে। প্রকৃতির অটলিতা বাদ দিয়া একমাত্র ব্যবহারিক তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। রাসায়নিকের দিক দিয়া ইহারা সকলেই আঠালতীয় পদার্থ। ইহাদ্বারা বহু অত্যাবশ্যক, বিত্তব্যবহার্য্য পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে। আমরা ভারতবাসীও কিছু কিছু ব্যবহার করিয়া ধন্য হইতেছি। বিদ্যুৎ ছিপি (Electric plug), সিগারেট ধরা পাত্র, চুলের কাঁটা, তাবিজের মল, ইত্যাদি বহুবিধ প্লাসটিক আমাদের দেশে আসিয়াছে। বাকিগ রাসায়নিকগণ ইহাদ্বারা বাদুবিদ্যা খেলিতেছেন। যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামে যেন নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। প্লাসটিক যে কি অপরূপ সম্পদ, যুদ্ধের পরে আমরা তাহা বিশদভাবে জানিতে পারিব।

বাদুকর রাসায়নিক তাহার রসায়নাগারে অনু পরমাণুর কি অপূর্ব্ব খেলাই খেলিতেছেন। বিশ্বে নূতন সম্পদ দান করাই যেন উহাদের একমাত্র ব্যবসা। এই সেদিন 'পলিথিন্' (polythene) নামে একটি প্লাসটিক রাসায়নাগারে জন্মলাভ করিয়াছে। এ জিনিষটা যুদ্ধের এত বড় সম্পত্তি যে বিস্তৃত প্রস্তুতপদ্ধতি আজ পর্য্যন্ত মার্কিণ রাসায়নিক কাহাকেও জানিতে দেন নাই। ইহারা থার্মোপ্লাসটিক জাতীয় অর্থাৎ তাপদ্বারা ইহাদের নরম করা যায় এবং ইচ্ছা করিলে রবারের মত লম্বা করা যায়। এই থার্মোপ্লাসটিকগণ শিল্পিদের হাতে পাইয়া সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদাকারে মানুষের মনোরঞ্জন করিতেছে। যে কোন পর্য্যায়ের কাপড়, মোটা বা মসৃণ প্লাসটিক সূত্রে তৈয়ার হইতেছে। আবার ফুলা বা পলম পরিচ্ছদ প্লাসটিক আবরণ পাইয়া নানারঙে বিভূষিত হইতেছে। একজন আমেরিকান রাসায়নিক বলিয়াছেন, তিনি যুদ্ধের পরে এমন সুন্দর পলম পরিচ্ছদ তৈয়ার করিবেন যাহা কখনও ব্যবহারে সঙ্কুচিত হইবে না, অথচ জীবন পাইবে অনেক বেশী এবং ব্যবহার দ্বারা আসল পলম কি রকম তাহা টের পাইবার সাধ্য থাকিবে না। পলিথিন্ যদিও প্রচুর তৈয়ার হইতেছে, যুদ্ধের চাহিদার জন্য অসামরিক অধিবাসীদের এখনও পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। সবটাই যুদ্ধদেবতা খাইয়া ফেলিতেছে। উহাদের রাসায়নিক গঠনভঙ্গি এমন সুন্দর যে বিদ্যুৎ অন্তরক (Insulator) হিসাবে ইহার খুব সুনাম। ইহা ১১০° ডিগ্রি তাপ সহ্য করিতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে কোন থার্মোপ্লাসটিকই ফুটন্ত জলের তাপ সহ্য করিতে পারে নাই। কাজেই জিনিষটা কতদূর সুবিধাজনক হইয়াছে সকলে তাহা বিবেচনা করিবেন। প্লাসটিকটির আর একটি গুণ, ইহা অম্ল, ক্ষার, সুরাসার, তৈল বা পেট্রোলদ্বারা বিনষ্ট হয় না। ইহাতে রবারের সমস্ত গুণ আছে, অপগুণ নাই। ইহা অত্যন্ত মজবুত। এ প্লাসটিকের কোন পাত্র যে কোন আঘাত সহ্য করিতে পারে। ইহাকে বাঁকান বা সরু করা রাসায়নিকের হাতের খেলা। যুদ্ধের চাহিদা শেষ হইলে উক্ত চমৎকার পদার্থটির দ্বারা কি কি দ্রব্য তৈয়ার হইবে সে সম্বন্ধে এখনই বৈজ্ঞানিক মহল মেতিয়াছেন। রেডিও অন্তরক (Insulator), টেলিভিসন অন্তরক, হিসাবে ইহার স্থান হইবে সর্ব্বোপরি। সোবাক পরিচ্ছদের রাজ্যে ইহা রাজত্ব বিস্তার করিবে। পলম, কার্পাস ইহার সংস্পর্শে থাকিয়া মসৃণতা ও মখমল বিভা আসরে নামিবে। শিল্পিগণ ইহা আরও নূতন নূতন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিযুক্ত করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মেঝের ইট, (Tile), বোতলের উপযুক্ত ঢেওয়াল কাগজ, হাতুড়ীর মাথা, টাইপরাইটারের চাবী, ইয়ারিং হুইল (Steering Wheels) ইত্যাদি কয়েকটীর নাম এখানে উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধের হাটে পলিথিন যেমন জমকাল করিয়া বসিয়াছে, পুরাতন প্লাসটিকগুলিরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একটির দ্বারা ফাইটার প্লেন (Fighter plane) এর মধ্যে রকেট (Rocket) ছুঁড়িবার জন্য একপ্রকার পাত্র তৈয়ার করিয়া রাখা হয়। প্লাসটিকগুলি সাধারণতঃ খুব হালকা বলিয়া হাজার হাজার উড়োজাহাজের শরীরে ইহারা বর্ত্তমান। প্রজেক্টাইল (Projectile) ছুড়িবার ভীষণ আঘাত ইহারা বেশ সহ্য করিতে পারে।

বর্ত্তমানে কাঠখণ্ডের চরিত্র প্লাসটিকের দ্বারা বদলাইয়া যাইতেছে। প্লাসটিকলিপ্ত কাঠখণ্ডে শক্তি ও সৌন্দর্য্য অপরূপ। শুনা যায় অতি সাধারণ কাঠখণ্ডও প্লাসটিকের সংস্পর্শে আসিয়া অতীব কাঙ্ক্ষিত পাইয়া থাকে। আবার ইচ্ছামত তাহাকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করা যায়। প্লাসটিক কাঠের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহার চরিত্র ও আকৃতি এরূপ সৌন্দর্য্যময় করিয়া তোলে যে সাধারণ মানুষ ইহা কাঠখণ্ড কি অপর কোন অপরূপ পদার্থ তাহা বুঝিতে পারে না। এরূপ কাঠের ক্ষয়ের অবধি নাই। ইহা ফাটে না, ভাঙ্গে না, ফুলিয়া উঠে না, এমন কি জলবায়ু ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। প্লাসটিকের মহিমায় অসার্থ কাঠখণ্ডও পরমসারার্থে পরিণত হইয়াছে। আমাদের আসবাবপত্র এখন যে কোন কাঠখণ্ড তৈয়ার করিব—প্লাসটিক দ্বারা

উহার স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবে। কাঠের পাটাতন এখন হইতে ইষ্টক ফেলে হইতে সহস্রগুণে মজবুত ও সুন্দী হইবে।

সিলিকোন্‌ নামক আর একটি প্লাষ্টিকেরও ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। জৈব প্লাষ্টিকের সঙ্গে সিলিকন্‌ যুক্ত হইয়া এজাতীয় প্লাষ্টিক তৈয়ার হইয়াছে। এদিকে বহুদিন পূর্ব্বেই দৃষ্টি ফেলা ছিল, বর্ত্তমানে উহাতে সূত্রপাত হইয়াছে। এমন সুন্দর বিদ্যুৎ রোধক পদার্থ দুনিয়ার আর প্রস্তুত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ইহা দ্বারা ইলেক্‌ট্রিক ঘটর তৈয়ার হয়। পূর্ব্বের একটি ঘটরের এক তৃতীয়াংশ আকার পাইয়াও ইহা সম-পরিমাণ অশ্বশক্তি দান করিতে পারে।

প্লাষ্টিকদের গুণাবলী আর কত আলোচনা করা যায়। বৈজ্ঞানিকের হাতে প্লাষ্টিকের আবরণ পাইয়া যা মুক্ত হইয়া এমন মজবুত হইয়াছে যে, জলে ভিজিয়া বা অপর কোন কারণে ইহা নষ্ট হয় না। মৎস্য-শিকারীদের এখন আনন্দের সীমা নাই। বর্ত্তমান রাসায়নিকগণ ইহাকে খাদ্য ও মাখনাদারে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতেছেন। গল্‌ফ (Golf) খেলার বল, বিলিয়ার্ড বল, শিকারীর যন্ত্রপাতি সবটাই প্লাষ্টিকের অবয়ব পাইতেছে। বায়ু পদার্থের টানাটানির জন্য ইহা যুদ্ধের বাজারে বাতুবের স্থান জুড়িয়া বসিতেছে। বায়ুযান, জলযান ও অন্যান্য যান বাহনের শরীরে যেখানে বায়ু পদার্থ দরকার সেখানেই প্লাষ্টিক বাক্সিয়া অবতালো হইয়া বসিয়াছে। ইহাকে এমন শক্ত করা যায় যে ইস্পাত পর্য্যন্ত হার মানিয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে প্লাষ্টিক রাজত্ব মাত্র আরম্ভ, ভবিষ্যতে ইহার প্রভুত্ব পৃথিবীর সর্ব্ব ব্যাপারে প্রকাশ পাইবে।

বাসক

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এসসি ও কবিরাজ শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য ভিষক্‌রত্ন

আরও বেশী খাদ্য জন্মাও—এই প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী করেণী ঔষধ তৈয়ার করাও এই প্রচারটাও চলিত হওয়া উচিত। এই ধরিয়া দেশের দরিদ্রদের জন্য সুলভ ঔষধ প্রাপ্তির ব্যবস্থা হউক।

বাসক একটি অতি উপকারী গাছ। উহাকে অতি সহজেই জন্মান যাইতে পারে। বর্ষা সম্মুখে আসিতেছে। অন্তত দিন ব্যাপী বৃষ্টির সময় বাসকের কয়েকটি ডাল যে কোনও রকমে মাটিতে পুঁতিয়া দিলেই বাসক গাছ জন্মিবে। একটু জায়গা পাইলে একটি বাসক গাছ এক বৎসরের মধ্যেই বেশ বড় হইয়া উঠিবে। উহা তখন একটা সমগ্র পল্লীর ঔষধ সরবরাহের কাজ করিতে পারিবে।

বাসায়াঃ বিদ্যমানায়াংবাসায়াঃ কীর্ত্তিতত্ত্ব চ।
রক্তপিত্তী-ক্ষয়ী-কাসী ভিষগ্‌ভির্ন্নোপেক্ষয়েৎ॥

অর্থাৎ বাসক যদি বিদ্যমান থাকে, জীবের জন্য যদি আশা থাকে তবে রক্তপিত্ত রোগী, ক্ষয় রোগী ও কাস রোগী কেন অবসন্ন হয়?

ঐ মহামূল্য শ্লোকটি গরুড় পুরাণে আছে এবং পরে উহা বঙ্গ দেশ, ব্রহ্মদেশ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কালের আয়ুর্ব্বেদীয় লেখকগণ নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন।

বাসকের পত্র, গাছের ডাল, ফুলের ডাল বা সমগ্র গাছ ফুল ও ফল ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। কাঁচা বাসক থেঁতো করিয়া উহার রস ব্যবহার হয়। সিদ্ধ করিয়া উহার কাথ ব্যবহার হয়। বাসকের কাথের সহ সিদ্ধ ঘৃতও ব্যবহার হয়। বাসকের কাথ গুড়ের সহ পাক করিয়া উহার অবলেহও ব্যবহৃত হয়।

দরিদ্রদের জন্য যে ঔষধ দিতে হইবে উহার হাজামা কম হওয়া প্রয়োজন। পার্শ্বর হইতে উদ্ধৃত এই প্রেস্‌ক্রিপসনটি (যোগ) বিশেষ উপযোগী।

বাসকঃ সমাঃ গ্রাহ্যা মধুনা রক্তপিত্তজিৎ।
অস্য কাস ক্ষয় হরঃ কাসলাপিত্তমেহহা।

বাসকের রস মধুর সহিত পান করিবে; উহা রক্তপিত্ত (শরীরের যে কোন স্থান—ফুসফুস, পাকস্থলী, গলা, অর্শ, নাসা, গর্ভাশয়—প্রভৃতি হইতে রক্তস্রাবকে আয়ুর্ব্বেদে রক্তপিত্ত বলে) নষ্ট করে; ক্ষয়, কাস, অম্লরোগ ও কফজরোগ নাশ করে এবং পিত্তঘ্ন ক্রিয়া দমন করে। মধু অভাবে চিনি ও গুড় ব্যবহার করিলেও চলে।

এমন দরিদ্রও আছে যাহাদের পক্ষে বাসক প্রস্তুত করিবার আয়োজন করাও দুরূহ। সেরূপ অবস্থায় নিম্ন মতের প্রয়োগবিধিতে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। একটি বাসক পাতা (রোগীর বয়সের অনুপাতে বড়, মাঝারি বা ছোট) দুটি বেলপাতা, চারিটি গোলমরিচ এবং এক টিপটি লবণ (সৈন্ধব হইলে ভাল) রোগীকে চিবাইয়া খাইতে দেওয়া হয়। সর্দ্দি, কাশি ও গায়ের বেদনা সংযুক্ত জ্বরে বিশেষ উপযোগী। প্রাতে একবার সেব্য। এই অতি সাধারণ ঔষধ রোগী প্রথম দিন অবজ্ঞার সহ সেবন করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন আগ্রহের সহ গ্রহণ করে।

যেখানে কাঁচা বাসক সংগ্রহ করা যায় না, সেখানে শার্ঙ্গধরের নিম্নলিখিত যোগটি চলিবে:—

রক্তপিত্তং ক্ষয়ঃ কাসঃ সোপদ্রবো ন সাধ্যতে।
কেবলো বাসকঃ কাথঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রেণ সাধয়েৎ।

অর্থাৎ কেবল বাসকের কাথ মধুসহ সেবিত হইলে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস ও শ্লেষ্মা এবং পিত্তসংযুক্ত জ্বরনাশ করে। দুই তোলা শুষ্ক বাসক আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থেকে দাঁড়াইয়া ছাঁকিয়া একবারে বা দুইবারে সেব্য। ইহা পাচন প্রস্তুতের সাধারণ বিধান।

বাসকের পাতার ছুটে করিয়া সেবন-করিলে বাঁশাদি উপদংশ হয় (রামাস যাস যোর Materia Medica and Thera peutics)।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

কিছুদিন পরে—

শেষ পেপার পরীক্ষা দিয়া অপর্ণা ও অমল দারভাঙ্গার লিক্‌টের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। অপর্ণাই প্রথম কথা কহিল—চল হাঁটতে হাঁটতেই যাই। তোমার কেমন হ'ল?

—ভাল না, ভাল হওয়ার কথাও নয়। সেকেণ্ড ক্লাসের তলার দিকে কোনমতে নামটা থাকতে পারে। কিন্তু সে দুর্ভাগ্যকে আমি নির্দ্বিচারেই গ্রহণ ক'রবো—তোমার ফার্ষ্ট ক্লাস থাকবে ত?

অপর্ণা একটু বিনয় সহকারে কহিল—একেবারে নিরাশ হইনি। তবে আশাও খুব বেশী নেই।

—যা হোক, তোমার পরীক্ষাটা যে খারাপ হয়নি এ সান্ত্বনা আমার থাকবে।

কথা বলিতে বলিতে অপেক্ষাকৃত জনহীন স্থানে আসিয়া অপর্ণা কহিল—এখন কি বাড়ী যাবে?

—হ্যাঁ, সেই মায়ের স্নেহাঞ্চল ছাড়া এখন আর কোন সান্ত্বনাই নেই।

—কবে যাবে?

—তিন চার দিনের মাঝেই—একটু থামিয়া কহিল—আজই সম্ভবতঃ তোমার সঙ্গে শেষ দেখা।

অপর্ণা অমলের মুখের উপর সোজা দৃষ্টি রাখিয়া কহিল—না। পরশু আমাদের ওখানে যাবে, সন্ধ্যার পরে তারপর বাড়ী যাবে।

—এখনও কি যাবার প্রয়োজন আছে?

—আছে, প্রয়োজন শেষ আমি এখনও ক'রতে পারিনি। চলো, আজ একটু বেড়িয়ে আসি।

—চল, আপত্তির কোন কারণই নেই।

দু'জনে চা খাইয়া আবার ময়দানের সেই গাছটির ছায়ায় গিয়া বসিল—সেখানে একদিন তাহারা ঝরাপাতার মত জীবনের বৃন্ত হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বাতাসের মাঝে ভাসিয়া যাইতে চাহিয়াছিল। অমল আজ যেন কেন একটা অনুদার ঔদাস্য বোধ করিতেছিল—যেন তাহার যাহা কিছু বলিবার যাহা কিছু করিবার সবই শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ অপর্ণাই তাহার পদপ্রান্তে শরাহত পক্ষী-শাবকের মত রক্তাক্ত দেহে সাহায্যের আবেদন করিবে।

অপর্ণা অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল—তুমি সেদিন মাকে যা বলে এসেছ সবই শুনেছি। মার মত কি তা তোমার বুঝতে বাকি নেই, কিন্তু আমি আজ কি ক'রবো?

—আমার কাছে যুক্তি চাও? কি করা উচিত?

—হ্যাঁ, আমি আজ তোমার কাছে কিছুই বলতে বাকি রাখবো না। যা ব'লতে চাই তা তুমি জানো। আমাকে যদি আজ···বাপ-মা সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভাসতে হবে—

একটা অপ্রকাশ্য বেদনায় অপর্ণার চক্ষু ভারাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল, সে ভাষা হারাইয়া চুপ করিল। অমল ধীরে মধুর কণ্ঠে কহিল—দেখ অপর্ণা,দারিদ্র্য কি তা তুমি জানো না, সে যে কি দুর্বিসহ লাঞ্ছনা তাও তুমি জানো না। তোমাদের ওখানেই, তোমার মার সামনে এই দারিদ্র্যের ক্ষত যেন আমাকে কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্তের মত লজ্জায় ম্রিয়মান ক'রে দিয়েছে। তুমি উপন্যাসে হয়ত পড়েছ কিন্তু সত্যিকার অভিজ্ঞতা তোমার নেই। জগতের সমগ্র শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাকে গ্রহণ করবার মত বুকের বল যদি তোমার থাকে—এবং সেই ভুলের জন্য জীবনে কখনও অনুশোচনা ক'রতে হবে না এমনি শক্তি যদি থাকে—নেমে এস, দু'জনে ভাসি—আর যদি তা না থাকে তবে ফিরে যাও। মনকে ব্যসনের প্রলেপে সুরক্ষিত ক'রে রেখো—সব ভুলে যাবে—

আজকার এই কথা অমলের অভিমানপ্রসূত, না তিরস্কার, না সত্য কথা—তাহা অপর্ণা বুঝিতে পারিল না, অসহায় দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

অমল পুনরায় কহিল—তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরূপে যদি আমাকে ব'লতে হয় তবে তোমার মা-বাবার সঙ্গে আমাকে একমত হ'তে হয়। তোমার মাঝে সে শক্তি নেই—যে শক্তি

থাকলে জগতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষে সংগ্রাম করিতে পারে।

অপর্ণা দ্বিধাতুর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—তুমি সুখী হবে না?

—আমার সুখদুঃখের প্রশ্ন ওঠে না, ব্যাপারটা তোমার। আমাকে সুখী ক'রতে তোমাকে ঐশ্বর্য্য ছেড়ে ধূলায় নেমে আসতে বলা যায় না। আমার জন্যে সে ত্যাগ ক'রতে পারো কিনা সে তোমার বিচার্য্য, আমার নয়।

অপর্ণা আর্দ্র চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—তবে কি এইখানেই শেষ?

—না, শেষ এখানে হবে না। সারাজীবন অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী ক'রে আমরা আজকার হারানো মণিকে খুঁজবো—কিন্তু কখনই পাবো না—সেই না পাওয়ার অতৃপ্তি আমাদের গৃহকে, মনকে, কর্ম্মকে আচ্ছন্ন করে আমাদের জীবনকে শুষ্ক কঠোর ক'রে রাখবে। আমার বিশ্বাস আজ যদি তুমি সমস্ত ছেড়ে আমার পিছু পিছু নেমে এসো তা হ'লেও সেই অতৃপ্তি সমানে চ'লবে। মানুষ যাকে ভালবাসে তাকে পায় না কখনও, অন্তত এই পৃথিবীর ধূলায় —কাজেই তুমি থাকো। আমার মানসী-প্রিয়ার স্থান আমাকে পূর্ণ ক'রতে হবে অন্য উপায়ে। তুমি রবে আমার জীবনে না-পাওয়া,তাই সমগ্র বিশ্বের মাঝে তোমাকে পাবো একান্ত আপনার ক'রে, একান্ত প্রিয় বলে—তোমার জীবন তুমি আনন্দে, ব্যসনে পূর্ণ ক'রে ধন্য হও—আমি নিষ্ফলের দলে রবো তাতে আমার অভিমান নেই, দুঃখ নেই; আজ যেন আমি সব কিছুরই অতীত।

অমল থামিল। অপর্ণাও কিছু বলিল না। মাটির পরে দৃষ্টি রাখিয়া আনমনে অপর্ণা দূর্ব্বা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখিল। ক্ষণকাল পরে অপর্ণা প্রশ্ন করিল—আমাকে আশ্রয় দেওয়ার সাহসও কি তোমার নেই।

অমল ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—না, তোমার নিজে এসে অধিকার ক'রবার শক্তি যদি না থাকে তবে আমার সে সাহস নেই। আমি জানি সেকেণ্ড ক্লাস পেলে কি হবে, হয় স্কুলমাষ্টারী না হয় সদাগরী আফিসে কেরাণীগিরি। সেই অমঙ্গল গৃহে তোমার স্থান নেই, যদি বা তুমি সমস্ত ত্যাগ ক'রে আপনি এসে আশ্রয় নাও। তুমি জানো না—

অমল অকস্মাৎ রুদ্ধকণ্ঠে চুপ করিয়া গেল। অপর্ণা চাহিয়া দেখে অমলের চোখ দুইটি তাহার মতই আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। অপর্ণা অমলের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে ব্যথিত হইল কিন্তু এমনি উত্তেজিত ভাব-তরঙ্গের সম্মুখে তাহার অসহায় ভাষা আর একবার প্রতারণা করিয়া গেল।

অমল অপর্ণার হাতখানিকে দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া কি যেন বলিতে গেল—ওষ্ঠ কয়েকবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল। অমল অব্যক্ত একটা বেদনাকে দৃঢ়মুষ্টিতে নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া যেন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কিছু না বলিয়াই দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়া গেল—

অপর্ণা বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে একাকী অসহায়ভাবে বসিয়া থাকিয়া দেখিল—অমল চলিয়া গেল,একবার ফিরিয়াও চাহিল না। তবুও সে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়াই রহিল।

সমগ্র রাত্রি একটা অনির্দ্দিষ্ট তিক্ত বেদনায় কাটিয়া গিয়াছে—ঘুমাইতে চেষ্টা করিয়াও ঘুম আসে নাই। অমল অপ্রসন্ন মনেই সকাল ৮টায় জাগিল এবং ক্লান্ত ও অবসন্ন অন্তরে আজকার কর্ত্তব্যের কথা মনে হইল। আর একটি স্থানেও শেষ বিদায় লইয়া আসিতে হইবে। খোকাকে পড়ান ছাড়িতে হইয়াছে, সেখানে মাহিনা বুঝিয়া আনিতে হইবে এবং হয়ত রমলাকে বলিয়া আসিতে হইবে—এই অকিঞ্চিৎকর পরিচয়কে ভুলিয়া যাইও, যদি আমাকে একটুও ভালবাসিয়া থাকো তবে তাহাও ভুলিও।

রমলাদের বাড়ীতে সে যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন বেলা প্রায় দশটা। তাহার বাবা আফিসে গিয়াছেন, খোকা স্কুলে যাইতেছে, তাহার মাতা পিতার সঙ্গে পিত্রালয়ে গিয়াছেন। রমলা বাড়ীতে অন্যান্য ভাই-বোনদের সঙ্গে রহিয়াছে—সে কলেজে যাইবে না।

পড়িবার ঘরে রমলা চা ও প্রচুর খাবার লইয়া প্রবেশ করিল। অমল হাসিয়া বলিল—এত খাবার কি একজনে খেতে পারে?

—কষ্ট করেই না হয় খেলেন। আর কবে—সম্ভবতঃ আর দেখাই হবে না। রমলা আঁচলের খুঁট হইতে দু'খানা নোট খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল। পুনরায় বলিল—বাবা দিয়ে গেছেন—

অমল চা খাইয়া শেষ করিলে, রমলা বলিল—আপনি ত আমাদের কথা ভুলে যাবেন, কিন্তু আমি এখানে

আপনার লেখা কবিতা গল্প কাগজে পড়ে কত কথা স্মরণ ক'রবো। মনে মনে হয়ত ভাববো—এর মাঝে অতীতের কোন প্রশ্ন আছে কে তা জানে!

অমল টাকাটা পকেটে রাখিয়া কহিল—ভগবান করুন আপনারা যেন আমাকে মনে রাখতে পারেন। এ অভাগাকে কেউ ত মনে রাখবে না।

—আপনার সঙ্গে যার এতটুকুও পরিচয় আছে, সে আপনাকে ভুলতে পারবে না।

—শুনেও তৃপ্তি।

রমলা কি যেন একটা প্রসঙ্গ তুলিবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু তুলিতে পারিতেছিল না। তাই নেহাত আকস্মিক-ভাবেই প্রশ্ন করিল—এইখানেই কি আমাদের পরিচয়ের শেষ?

অমল কাল বৈকালে যেমন করিয়া এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছিল আজও ঠিক তেমনি করিয়াই মুখস্থ কবিতার মত সেই কয়েকটি কথা বলিয়া গেল। রমলা সোৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া শুনিতে লাগিল। পরিশেষে অবনত মুখের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপাইয়া প্রশ্ন করিল—আমাকে ভুল বুঝেছেন কিনা জানি না, তবে আপনার কি কিছুই ব'লবার নেই আজ?

—যা ব'লবার ছিল তা না বলাই ভাল। যখন যেতেই হবে তখন সংশয়ের বোঝাকে ফেলে রেখে যাওয়া অত্যন্ত কাপুরুষতা হবে। দুঃখের সঙ্গেও সংশয় জীবনকে হয়ত কিছু সান্ত্বনা দেবে।

—আমি কি এখানে এমনি ক'রেই রবো?

অমল ধৈর্য্য হারাইয়াছিল—কলিকাতার এই ঐশ্বর্য্যকে ছাড়িয়া ফিরিয়া যাইতে সে অত্যন্ত উৎসুকভাবে নির্দ্দিষ্ট ট্রেণের সময়ের জন্ম অপেক্ষা করিতেছিল তাই বলিল—মিস্ মিত্র আজ সত্য কথা ব'লতে আপত্তি নেই। মনটা আমার এমন একটা অবস্থায় পৌঁচেছে যেখানে সেটা যে কোন মুহূর্ত্তেই ভেঙ্গে পড়তে পারে। আমি কি ক'রতে পারি, আমার মত অভাগা আপনার কোন্ সাহায্য ক'রতে পারে? আমাকে যদি ভালবেসে থাকেন তবে সেই স্মৃতিকে পুণ্যস্মৃতি মনে করে সারাজীবন সগৌরবে বহন করা যেতে পারে, সে করুণাকে স্মর[illegible] ক'রে আনন্দ করা চলে কিন্তু আপনার মত, যারা ছুঁয়ে [illegible] শ্রী-সৌন্দর্য্য-কোমলতা নিয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে তাদের মত মেয়েকে কেমন ক'রে আমার জীর্ণ কুটীরে অশেষ দৈন্য দুঃখের মধ্যে আহ্বান করি? সেখানে সেই বিরুদ্ধ নিগ্রহ যে আমাকে ক্রমাগত বৃশ্চিকের মত দংশন ক'রে ফিরবে—

রমলা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—কিন্তু সে নিগ্রহকে আমি যে আপনার জন্যে সাগ্রহে সানন্দে সহ্য ক'রতে পারি এ কথাটা কোন দিন জানাতে পারি নি। সমাজ সংসার সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম ক'রবার শক্তি আমার আছে। এ বিশ্বাস আপনার না থাকলেও আমার আছে—

—আর সে মন-বল চিরদিন সমান ভাবেই থাকবে?

—থাকবে—না থাকলেও তার জন্যে অভিযোগ করা যাবে না।

অমল মুখ তুলিয়া চাহিল—রমলাকে এমন ভাবে কথা বলিতে সে কোন দিন দেখে নাই। তাহার কণ্ঠের দৃঢ়তা, তাহার নিষ্পলক চক্ষুর প্রায় দৃষ্টি অমলকে মুগ্ধ করিয়া দিল। এই মেয়েটির অন্তরে এমন শক্তি ছিল, এমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার শক্তি ছিল তাহা সে পূর্ব্বে কখনও কল্পনা করে নাই। এই হৃদয়োচ্ছ্বাসের সম্মুখে দাঁড়াইতে তাহার সাহস হইতেছিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—দারিদ্র্য কি, কি তার জ্বালা তা গল্প উপন্যাসে বোঝা যায় না মিস্ মিত্র, সেখানে সমস্ত মানব-মন, ভালবাসা প্রীতি শ্রদ্ধা সবার উপর একটি সত্য জেগে রয়—সেটা অপার লজ্জা, অপার একটা ঘৃণা। সব পারলেও মানুষ সেটা সহ্য ক'রতে পারে না—

রমলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আরক্তমুখে কম্পিতকণ্ঠে কহিল—তবে আমার অন্তরের কি কোনও মূল্য নাই আপনার কাছে? এই নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ, এই ভালবাসা, ...এই কি শেষ বিদায়? তীব্র অভিমানে, তীব্রতর দুঃখে, হতাশায় রমলা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অমল অকস্মাৎ রমলার এই চোখের জলে বিব্রত হইয়া পড়িল। রমলার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মৃদু [illegible] অন্তর অতি সন্নিকটে আকর্ষণ করিয়া কহিল —আমাকে ভুলে যান, আমি যতই নিষ্ঠুর হই, যতই নির্ম্মম হই আপনাকে [illegible] আমার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যের গভীরতম

CALCUTTA UNIVERSITY

প্রবেশে নিষেধ ক'রবেন। আমাকে ক্ষমা ক'রবেন—যে অযোগ্য সে অযোগ্যই, তার দুর্ভাগ্যকে মার্জ্জনা ক'রবেন—

অমল রমণীকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া, ঘরজা ঠেলিয়া দ্রুতপদে রাস্তায় আসিয়া নামিল। আপনার অবাধ্য চোখ দুইটিকে পরিষ্কার করিয়া আবার চলিতে লাগিল—

উপর্য্যুপরি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার মাঝে অমলের সমস্ত অন্তর দুঃখে বেদনায়, আপনার প্রতি, অদৃষ্টের প্রতি, দারিদ্র্যের প্রতি ধিক্কারে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এই পরিবেশকে ত্যাগ করিবার দুর্জ্জয় বাসনাকে সে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিল না, তাই আজই রাত্রে জন্ম-পল্লীর মেহাঞ্চলে ফিরিয়া যাইবে স্থির করিল এবং সেই ঝোঁকে অবশ্য বিস্তস্ত রুক্ষ একরাশ চুল ও আধময়লা একটী সার্ট গায়ে দিয়াই সে অপর্ণার বাড়ীতে যাইয়া উঠিল।

তখন সবে সন্ধ্যা হইয়াছে, শ্রাবণের সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে অকলুষ হইয়া পৃথিবীর উপরে কালো যবনিকার মত আলোকের পথ রোধ করিয়া বিধবার অবগুণ্ঠনের মত বেদনার্ত্ত ভঙ্গিতে চাহিয়া আছে। অমল সহজ সরল পদ-ক্ষেপে সামনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—আলো-কোজ্জ্বল কক্ষে, অপর্ণা, করুণা ও তাহাদের মাতা বসিয়া আছেন।

মাতা অভ্যর্থনা করিলেন—এস অমল, কবে বাড়ী যাবে?

অমল সামনের চেয়ারটায় বসিয়া কহিল—আজই।

—আজই? কেন?

—হ্যাঁ, বৃথা অপেক্ষা ক'রে লাভ কি?

অপর্ণা অমলের চেহারা দেখিয়া শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করিল—চেহারা অমন হ'য়েছে কেন?

—পরীক্ষার পড়া পড়তে পড়তে।

—অপর্ণা জানে একথা কত বড় মিথ্যা। পরীক্ষার জন্য সে আদৌ চিন্তা করে নাই, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত মনেও ক্লাসকে সে এমন করিয়া মাতিয়া রহিতে পারিত না।

অবান্তর কথার মাঝে চা ও খাবার আসিল। অমল খাবারটা ঠেলিয়া রাখিয়া চা খাইয়া ফেলিল। অপর্ণা প্রশ্ন করিল—এটা খেলে না যে!

—ইচ্ছে নেই।

অমলের শুষ্ক কঠোর কণ্ঠস্বর ও কোটরগত চক্ষুর তীব্র দৃষ্টিতে অপর্ণা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই অবনত মস্তকে সে টেবিলটার উপরে কি যেন দেখিতেছিল।

মাতা বলিলেন—শুনে বোধ হয় সুখী হবে, শ্রাবণের শেষেই অপর্ণার বিবাহের দিন স্থির ক'রেছি অজিতের সঙ্গেই। তোমার বুদ্ধি ও উদারতার প্রশংসা শত মুখে ক'রবো। তোমার কথা আমি ভুলতে পারবো না—মনে যে ইচ্ছা ছিল তা ত হ'ল না।

অমল কহিল—আনন্দেরই ত কথা। আনন্দিত হব না কেন?

—সে পর্য্যন্ত ত তুমি থাকলে না, আবার কি আসতে পারবে?

—এ শুভকার্য্যে যোগদান ক'রবার ইচ্ছে রইল—আশা করি এসে পড়তে পারবো—

—বেশ বেশ, খুব চেষ্টা ক'রো। অপর্ণাও আজ যখন এ বিয়েতে মত দিয়েছে তখন আর দেরী করা সঙ্গত বোধ ক'রলাম না। তা হ'লে অঘ্রাণে হ'তে পারতো—

অমল দুঃখে লাঞ্ছনায় নিরুত্তর হইয়া গেল। বাড়ীতে যক্ষারোগী ভিলে ভিলে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছে জানিয়াও যেমন চরম মুহূর্ত্তে আত্মীয় পরিজন হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠে; শেষ কথা কয়েকটির সঙ্গে সঙ্গে অমলের অন্তরও তেমনি অসহ্য বেদনায় মোচড় খাইয়া হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অকস্মাৎ বুকের মাঝে একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে এমনি একটী শূন্যতার আঘাতে সে বসিয়াই রহিল কোন জবাব দিল না, অপর্ণার পানেও চাহিল না।

মাতা ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আলোকোজ্জ্বল কক্ষের মাঝে অপর্ণা ও অমল মুখোমুখি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—অনেকক্ষণ। তীব্র ভর্ৎসনায় অপর্ণাকে বিদীর্ণ করিয়া দিয়া যাইবে মনে করিয়া অমল উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কেমন করিয়া কথায় সে তাহার তীব্র জ্বালাবেগ প্রকাশ করিবে বুঝিয়া পাইল না—যদি আজ ডাকিয়া আনিয়াছিলে এই কথাই শুনাইতে, তবে এ ডাকার অর্থ কি? এমন করিয়া নিষ্ঠুর করাল ছুরিকাঘাতে তাহার হৃদয়কে কেন মুহূর্ত্তে রক্তাক্ত করিয়া দিলে? কিন্তু অমল কিছুই বলিতে পারিল না। দাঁড়াইয়াই রহিল—

অপর্ণা ধীরে ধীরে আনমিত আঁখির দৃষ্টি তুলিয়া অমলের মুখের উপর রাখিল। আয়ত বেদনার্ত দুই চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু মুক্তার মত গড়াইয়া আসিয়া গণ্ডে থামিল। অস্পষ্ট বিচ্ছিন্ন কণ্ঠে সে কহিল—এখনই যাবে?

অমল প্রবল চেষ্টায় আত্মদমন করিয়া, উৎসারিত অশ্রু-সিন্ধুর কণ্ঠ রোধ করিয়া কহিল—হঁ এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পদে সিঁড়ি পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। চোখের ঝাপসা দৃষ্টির সাহায্যে পথ চলা যায় না—ঘনান্ধকার আকাশের গায়ে অপর্ণাদের আলোকোজ্জ্বল বাড়ীখানা তাহারই অশ্রুর প্রলেপে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই হৃদয় শোণিতে রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের মত তাহা অন্ধকারে আপনাকে হারাইতে চলিয়াছে। অন্ধ দৃষ্টিতে লোহার গেটটা ধরিয়া অমল দাঁড়াইয়া রহিল, পুঞ্জীভূত অভিমান ও বেদনা কণ্ঠের মধ্যে উন্মত্ত কোলাহলে তাহাকে মূক করিয়া দিয়াছে। মনে মনে সে কহিল অপর্ণা তুমি জানো না, তোমারই জন্যে আজ তোমাকে ত্যাগ করিয়া গেলাম—জীবনের সমস্ত সঞ্চয় উষ্ণ রক্তাপ্লুত ছিন্ন হৃদপিণ্ডের মত পথপ্রান্তে ফেলিয়া রাখিয়া গেলাম—তুমি জানিলে না, জানিবে না।—জীবনের চরমতম বিদায় মুহূর্ত আজ মৌন-বেদনার কতখানি দুর্বিসহ।

ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া পড়িল—ধীরে ধীরে ঘন বৃষ্টির অন্তরালে অপর্ণাদের আলোকোজ্জ্বল জানালা একটি একটি করিয়া আকাশের পটে নিভিয়া গেল। অমল ভিজিতে ভিজিতে গাঢ়তম দীর্ঘশ্বাসে বিদায়ক্ষণ ঘোষণা করিয়া একাকী, অত্যন্ত একাকী—সহরের এক জনারণ্যে আপনাকে মিলাইয়া দিল। ক্রমশঃ

শেষ নমস্কার

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

তুমি ছিলে ক্ষুদ্র এক তারকার প্রায়
অতি দূর মহাশূন্যাকাশে
ক্ষিতি কিরণ যার ব্যর্থ হ'ল শুধু
ধরণীর অন্ধকার নাশে;

দার্শক জনম তার জ্যোতিষ মণ্ডলে
সেথায় সে উজল ভুবন,
বৃথা হল আশা তার মরত-গগনে
জানে শুধু সর্বদর্শীজন।

হয়ত ভুলিয়া যাবে দুদিনের পরে
তার কথা কেহ নাহি ক'বে,
যে ভূতলে পূজিলাছে মানীর চরণ
একদিন তাও স্তব্ধ হ'বে।

পূর্ণতার সাধনায় ক্ষুদ্রের অঞ্জলি,
মানি তার আছে প্রয়োজন,
কে বল রোধিবে তারে, সিন্ধু বারি যথা
করিয়াছে সাগর সৃজন।

আজীবন সঞ্চীবায় অভিশপ্ত সম
কবি ছিলে খ্যাতি-কামনারে,
আত্মীয় স্বজন যারা, স্নেহভরে কভু
আলেখিক হৃদয়ের দ্বারে।

অন্তর-দুয়ার তব, দূরণিখা সম,
নিঃশেষে জ্বলিয়া গেছে যায়,
চিরতরে হয়ে গেল, সৌরভ সুরভি,
আপন আত্মার সীমায়।

আশৈশব বন্ধু যারা দূর হ'তে শুধু
নাহিয়াছে কর্তব্য সবার,
আরো দূর হ'তে তারা জানায় তোমারে
বন্ধুদের শেষ নমস্কার।

---

* পরলোকগত কথা-সাহিত্যিক বাণীনাথ চক্রবর্তীর উদ্দেশে।

দৈব-দুর্যোগ

শ্রীকানাই বসু

বাড়ী আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তাহার অল্পক্ষণ আগেই দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তখনও চিহ্ন ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে।

রেল গাড়ীর সংঘর্ষ (collision) কখনও দেখি নাই, দৃশ্যটা কিরূপ ভয়াবহ হয় সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নাই। শুনিলাম, সংঘাত হইয়াছে যে দুইটি ট্রেনের, তাহাদের একখানি নাকি ছিল মালগাড়ী, যুদ্ধের মালপত্র বোঝাই, অপর খানি মেল ট্রেণ, যাত্রী ঠাসা। কেহ বলিল, তুফান মেল, কেহ বলিল, না ইম্পিরিয়াল ব্লু মেল। ক'বছর আগে এক আত্মীয় বিলাত হইতে ফিরিতে ইম্পিরিয়াল ব্লু মেলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গল্প বাড়ীতে সবাই শুনিয়াছে। ব্লু মেলের ছবিও দেখিয়াছে। সেই হইতে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের কাছে ব্লু মেল অতি পরিচিত, প্রায় ঘরের জিনিস হইয়া গিয়াছে।

যে মেলই হোক, অজ্ঞ লোকের চোখে বিধ্বস্ত গাড়ীর কোনটা যাত্রী ও কোনটা মেল, ধরা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমার সঙ্গে বলিয়া দিবার, বুঝাইয়া দিবার একজন ছিল। সেই সর্বজ্ঞাস্তা গাইডই দেখাইয়া দিল, কোনটা ইঞ্জিন, কোনটা গার্ডের গাড়ী, কোনটা কোন পক্ষের ইত্যাদি। উপুড় হইয়া পড়া মালগাড়ীর ইঞ্জিনটা তখনও কোঁস কোঁস করিতেছে—বাষ্প-সমাকুল সেই আর্তনাদ কখনও আস্তে, কখনও জোরে বাহির হইতেছে। আর তাহারই অল্প দূরে এক গার্ডের গাড়ী দুর্যোগের রক্তাক্ত প্রমাণ গায় মাখিয়া ছিন্ন ভিন্ন বিপর্য্যস্ত মূর্ত্তিতে ঊর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতেছে। কাছে থাকা নিরাপদ নহে, হঠাৎ কোন ঝঞ্ঝাট বাধিয়া যাইবে, মনে করিয়া অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিলাম।

ঘটনাস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া জলযোগে বসিয়াছি, রহিম আসিয়া কাছে বসিল ও গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিল—"বাবা, দুর্দান্ত মানে কি জান?"

ইসলাম-সমাজী নই, সংসারে রাম রহিম জুদা না করা হয়, এই উদ্দেশ্যেই কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখিয়াছি রহিম। রহিমের প্রশ্নটি সময়োচিত। এই সময়টিতে প্রত্যহ তাহার জ্ঞানচর্চ্চা প্রবল হয়। উত্তর-স্বরূপ এক টুকরা রসগোল্লা তাহার মুখে তুলিয়া দিলাম। যথাসম্ভব সত্বর সেই বাধা গলার ভিতর নামাইয়া দিয়া রহিম বলিল—"দুর্দান্ত মানে আমি জানি বাবা। দুর্দান্ত মানে দুরন্ত। দাদা দুর্দান্ত, মানে দাদা দুরন্ত।"

পিছন হইতে রহিমের জননী আসিয়া বলিল—"আচ্ছা, হয়েছে। আর খেতে হবে না এখন। যাও, বেড়িয়ে এস তো রহিম। বাইরে কেমন মজা হয়েছে দেখে আয় দিকি।"

ধ্যানী বুদ্ধের মতো গম্ভীরমূর্ত্তি রহিম নীরবে বসিয়া রহিল। হাঁ, না, কোনও জবাব দিল না। স্পষ্ট বুঝা গেল, বাহিরের মজা অপেক্ষা ভিতরের আনন্দই রসজ্ঞ রহিমের কাছে বেশি মূল্যবান।

আমি আর এক টুকরা খাবার তাহার মুখে দিলাম, অবিচলিত মহিমায় মৌন রহিম তাহার রসাস্বাদনে মনোনিবেশ করিল।

তাহার গাম্ভীর্য্যের রকম দেখিয়া রহিম-জননী মুখ টিপিয়া হাসিলেন। ইহা পুত্রের বুদ্ধিজনিত গৌরবের হাসি। তিনি বলিলেন—"রাক্কোস ছেলে। যতক্ষণ খাবার শেষ না হবে, পৃথিবী রসাতলে গেলেও নড়বে এখান থেকে মনে করেছ?"

তাহা মনে করি নাই। কিন্তু সে-কথা এমন নির্মমভাবে বলা উচিত বোধ করি না। কারণ আমি বরাবর দেখিয়া আসিয়াছি, অতিশয় নিস্পৃহতা সত্ত্বেও রহিম যে আমার প্রদত্ত মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার উল্লেখে সে হৃদয়ের অন্তস্তলে লজ্জা অনুভব করে। তাহার জননী স্নেহ-ভরা হৃদয় লইয়াও পুত্রের হৃদয়ের পানে চাহে না, যকৃতের প্রতিই তাঁহার সমধিক দৃষ্টি।

কিন্তু হৃদয় যে যকৃতেরও ঊর্দ্ধে, তাহা স্মরণ করিয়া আমি বলিলাম—"তুমি ওর আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে কথা কও কেন অমলা? ও তো খেতে চায় নি। সেই গল্পটা জান তো? একটা ছেলে দোরে বসে মুড়ি খাচ্ছে। আর একটি অচেনা ছেলে এসে বল্লে—হ্যাঁ ভাই, তোদের পাখী

কথা কয়? এ ছেলেটি বলে—পাখী? পাখী তো নেই আমাদের। তখন নতুন ছেলেটি বলে—তবে এক গাল মুড়ি দে না ভাই। দেখ, অচেনা ছেলের কাছে প্রথমেই মুড়ি চাইলে লোকে হ্যাংলা বলতে পারে। কিন্তু আলাপ পরিচয় হয়ে গেল যখন, তখন বন্ধু লোকের কাছে চেয়ে নিতে ভদ্রতায় বাধে না। তোমার রহিমের শিষ্টতা তো তার চেয়ে ঢের বেশি গো। আমার সঙ্গে এতদিনকার আলাপ, জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে প্রশ্নোত্তর আলোচনা করছে। কিন্তু একবার আঙুল দিয়েও খাবারের ইঙ্গিত করে নি।

অমলা ঈষৎ হাসিল। এ তাহার স্বামীর নির্বুদ্ধিতাজনিত ক্রোধের হাসি। কিন্তু হাসিলে ক্রোধের মর্য্যাদা থাকে না বলিয়া হাসি দমন করিয়া অমলা বলিল—"তুমি থামো তো। আর ব্যাখ্যানা করতে হবে না তোমায়। তুমিই তো আস্কারা দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে হ্যাংলা করে তুলেছো। উঠে এসো বলছি খোকা।"

এইবার রহিম সকল গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও উঠিল। যতক্ষণ রহিম, তুই, ততক্ষণ পার আছে। কিন্তু জননী যখন খোকা, তুমি, ধরিয়াছেন, তখন আর কৌশল খাটিবে না, ইহা তাহার সহজাত দিব্যবুদ্ধি (instinct)তে সে বুঝিয়াছে।

কিন্তু যাইবার সময় পিছন ফিরিয়া যে দৃষ্টিতে সে চাহিয়া গেল আমার পানে, তাহা দেখিলে, কেতাবী ভাষায় বলিতে গেলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়। অমলা পাষাণ অপেক্ষা কঠিন নহে, তবে সে দৃষ্টি সে দেখে নাই, আমি দেখিয়া কিরূপে স্থির থাকি? তাড়াতাড়ি আধখানা নারিকেল নাড়ু রহিমকে দেখাইয়া পানের ডিবার ভিতর লুকাইয়া রাখিলাম। শান্ত, সুশীল মাতৃ-অনুগত রহিম দরজার কাছ হইতে বলিল—"আমি বেড়িয়ে আসছি বাবা, তোমার জল খাওয়া হলে আসব। তুমি খেয়ে নাও।"

শুধু রহিম নয়, ছেলেমেয়েরা সকলেই অমলাকে অতিশয় ভয় করে। ওদের দোষ দিতে পারি না, ওই অঞ্চলে আমারও খুব সাহসী বলিয়া খ্যাতি নাই।

২

ক্লাবে ভোজ ছিল, ফিরিতে অনেকটা রাত হইল। অমলা তখনও তাহার রান্নাঘরের, ভাঁড়ার ঘরের ও কয়লার ঘরের মণিমাণিক্যাদি চাবি বন্ধ করিতে ব্যস্ত।

সবে তন্দ্রা আসিয়াছে। অকস্মাৎ যেন শুনিতে পাইলাম সেই ইঞ্জিনের বাষ্পোচ্ছ্বাস শব্দ। তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

দুর্যোগ দুর্দৈবের কথা ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু সংসার ভুলিতে দেয় কই?

সেই শব্দই বটে।

হাত বাড়াইয়া ইঞ্জিনটাকে কাছে টানিয়া লইলাম। আদরের স্পর্শ পাইয়া উচ্ছ্বাস বাড়িয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হয়েছে বাবু?"

এক অক্ষরের অশ্রুসিক্ত জবাব পাইলাম "মা···"।

বলিলাম—"মা মেরেছিল বলে? ছিঃ কাঁদতে নেই। তুমি ছোট বোনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে—অত জোরে কি ধাক্কা দিতে আছে বাবা?"

ক্রন্দনজড়িত স্বরে জবাব আসিল—'ধাক্কা দিইনি তো। এক লাইনে এসেছিল, তাই কলিশন হয়ে একসিডেণ্ট হয়ে গেল, গার্ডের গাড়ীর সঙ্গে।"

সেই কলিশনের জন্যই অমলা আসিয়া দুর্দান্ত ইঞ্জিনকে ঠেঙ্গাইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী রহিমের বিবরণে জানিয়াছিলাম। মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম—"ছোট্ট গার্ডের গাড়ী, তোমার মতন আমেরিকান ইঞ্জিন তো নয়। অত জোর কলিশন কি করতে হয় বাবা? গার্ডের গাড়ীর দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে গেছে যে। তাইতো মার খেয়েছ। তার জন্যে এতক্ষণ পরে, তুমি বড়ভাই, তোমাকে আবার কাঁদতে আছে? ছিঃ। ঘুমোও।"

এক মুহূর্ত্ত পরে অন্ধকারের মধ্যে শুনিলাম—"সেজন্যে কাঁদিনি তো।"

"তবে?"

আর জবাব নাই। অথচ ইঞ্জিনের ভীম বাড়িয়া চলিল।

নাঃ, অমলা ঠিকই বলে। আমাকে কেহ ভয় করে না। আদর দিলে মাথাতেই ওঠে বটে।

আবার কিছু সাধ্যসাধনা, আদর আপ্যায়নের পর শুনিলাম—"মন কেমন করছে বাবা।"

"কি বিপদ! এত বড় ছেলে, নয় বৎসর বয়স হইল, রাত্রিদ্বিপ্রহরে তাহার মন কেমন করিতেছে শুনিয়া সুখের আর সীমা নাই! ভয় করে না বলিয়া কি আমার সম্বন্ধে এতটাই নির্ভয় হইতে হইবে। প্রচণ্ড এক ধমকের দ্বারা ভয় করিতে শিখাইব ভাবিতেছি—এমন সময় শুনিলাম—

অর্দ্ধস্ফুট বাষ্পরুদ্ধ কয়টি কথা,—"সেই মা'র জন্যে মন কেমন করছে, বাবা।"

চমকিয়া রামেশ্বরকে আরও কাছে টানিয়া লইলাম। বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে বলিল—"সেই যে রেলগাড়ী করে মা চলে গেল—তাই মন কেমন করছে···"

আর সে বলিতে পারিল না। আমিও কিছু বলিতে পারিলাম না।

স্মৃতির চোর-কুঠারীতে কোন রুদ্ধকক্ষের দ্বার কখন কোন বাতাসে হঠাৎ খুলিয়া যায়, সে রহস্যের মীমাংসা কে করিবে। তিন বৎসরের ভাই বোনহীন রামেশ্বরকে লইয়া রামেশ্বরের জননী একদিন খেলা করিয়াই গিয়াছিলেন বটে, একা রামেশ্বরকে লইয়া ফিরি, তাঁহাকে আর ফিরাইয়া আনিতে পারি নাই। কিন্তু সেই কথা এই নয় বৎসরের রামেশ্বরের ভাইবোন খেলাধুলা-ভরা মনে অকস্মাৎ কেন আসিয়া পড়িল। কেনই বা এই অন্ধকার নিদ্রাহীন শয্যায় তাহাকে এমন করিয়া কাঁদাইল। এ কান্নার কি সান্ত্বনা দিব আমি?

রামেশ্বর যে অতি দুঃখী, তিন বৎসর হইতে আজ অবধি গোপন মনে দুঃখের পাষাণ ভার বহিয়া বহিয়াই যে এই শিশু দিনযাপন করিতেছে, একথা বলা এই কাহিনীর উদ্দেশ্য নহে। কারণ একথা সত্য নহে। শিশুচিত্ত কোনও দুঃখকেই অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধিয়া রাখে না।

প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলাম, রামেশ্বর তাহার ছোট ভাই বোন তিনটিকে লঙ্ঘন করিয়া কোন এক সময়ে অলক্ষ্যে পাশে গিয়া শুইয়া গভীর নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছে।

এবং উভয়ের কে যে কাহাকে ধরিয়া আছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

আলোর বিদায়

শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

যায়!
আসিল বিদায়,
উৎসবের আয়োজন মাঝে
মোহিনী সোহিনী তাই সহসাই থামে,
বেলা শেষ হয়ে আসে, মুছে আসে প্রান্তরের ছায়া,
জনে স্বপন রচি বিছাইয়া নবঘন মায়া
দিন চলে যেতে চায়, অস্ফুট বেদনাখানি
হল হল জলদাকে গুমি;
শেষ সব তাই
আজ।
তাই
কথা কার গাই
শুনিতে অন্তরমাঝে; আপনার
কার দরদের তরে সে ঈশান,
কার মৃদু আলিঙ্গন অনন্ত আকাশ মণি আনে,
কার মৌন ব্যাকুলতা উতলা বাতাস বায়ুভরে,
অধীর অধির হল পরাণ চঞ্চল,
উচ্ছ্বসিল কম্র বনতল;
পাইনু সহসা
ভাষা।
এই
ম্লান দিনেই
ভুলাইয়া স্বপন আমার
অন্তরাগে ভরে গেল অন্তর আবার,
বসন্তের ঝরাকুল পরাগ ছড়ানো পথ বেয়ে
পরিপূর্ণ হরষের রসে ভরা পাত্র তরে চেয়ে
বিফলে জাগিছে আশা; তারি তরে দুখ
আশাহীন অবসন্ন বুক।
বিফল বেদনা?
না, না।
দিনে
শুধু তারে বিনে
মুছে যায় পৃথিবীর আশা,
ধরা হতে ভেঙ্গে পড়ে কল্পনার বাসা,
সোনার কমল ফুটে পত্রাকাশে কোথা হয় হারা,
বিজন আঁধার কোণে তরুশাখা মিছে দুলে সারা,
রূপের মন্দির তলে নাহি রূপলেশ,
ক্ষণপ্রভা ছলনার বেশ;
স্বপ্ন সহচরি,
মরি?
মধু
আলোকের ইন্দু;
উদ্বেলিত দিবাদিন্ধু তটে
হাসির ফেনাভাঙ্গা ঝিনুকের পটে
সুখ স্মৃতি তরে ম্লান ধরার আঁধার সঁাঝেরে,
ধীরে জাগে শুকতারা, আকাশটা পুষ্প কলি হাসে;
আনন্দের অলক্তক, কল্পনার ডালি
সবি আজে প্রেমহীন আলি;
আর নাই, তাই;
যাই।
গানে
ধরে অবসানে;
অজ্ঞা শিখরে তব তরে,
শুভ্রমৌন সুধা রহিবে অনন্ত ভরে,
আমি যাব ভুলপথে; সেথা কাঁটা বিঁধিবে চরণে,
মোরে হেরি' পাখা শশী নভতলে বসিবে মরণে;
যে বিজনী, কল্যাণ কামনাযামি রাখি
চলে যাবে কোন্ পথে পাখী—
তারে সেই ভালো,
আলো।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীমুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

৯

রথ প্রাসাদদ্বারে আসিয়া উপনীত হইল। দ্বার তখনও উন্মুক্ত ছিল। রথ তোরণ অতিক্রম করিয়া প্রাসাদোদ্যানে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে একজন রক্ষী আসিয়া পথরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমরা কে? কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? মহামান্য ক্ষত্রপের সহিত সাক্ষাতের এখন সময় নহে।"

সারথী তখন অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া রথের গতি রোধ করিয়াছিল। মহাস্থবির রথ হইতে অবতরণ করিয়া রক্ষীকে হস্তপ্রসারণপূর্বক অনামিকায় একটি অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করিলেন। দ্বার-রক্ষী অঙ্গুরীয় দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদনপূর্বক আমাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিল। সারথীকে রথ লইয়া অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া আমরা পদব্রজে উদ্যানপথে সৌধাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

প্রাসাদোদ্যানের আলোকমালা তখনও নিভিয়া যায় নাই। প্রত্যহ সন্ধ্যায় যেমন ক্ষত্রপবংশোদ্ভবে দীপমালা প্রজ্বালিত হইয়া থাকে, অদ্যও তেমনই হইয়াছিল এবং শত সহস্র খদ্যোতের ন্যায় উদ্যানপথে, বাপীতটে ও বেষ্টনীতে প্রদীপগুলি তখনও জ্বলিতেছিল। উপরে, আকাশের চন্দ্র তরল নিদাঘ জ্যোৎস্নায় অনাবিল শুভ্রতায় জগতের সকল মলিনতা বিধৌত করিয়া দিতেছিল। নিশীথিনীর এই উন্মুক্ত উৎসবপ্রাঙ্গণ হইতে অন্ধকার দৈত্য নির্ব্বাসিত হইয়া নিবিড় বিকুঞ্জে, বৃক্ষবাটিকায় ও লতামণ্ডপে ঘন পত্রাবলীর মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। উদ্যানকুঞ্জের পত্রান্তরাল হইতে দু-একটা বিরহী বিহঙ্গের আকুল কাকলী শুনা যাইতেছিল। এমন রাত্রিতে—রজনীর এমন অমল ধবল সৌরবের মধ্যে এই দীপাবলীর খদ্যোতদ্যুতির কি আবশ্যক ছিল বুঝিলাম না। যে রূপসী স্বর্ণে ও সৌরবে পরিমায়ী—কোন দুষণে তাহার রূপ প্রসাধিত ও বর্দ্ধিত হয় না। অলঙ্কারে ও ভূষণে সৌন্দর্য্যকে সংক্ষেপ করিয়া দেয়। রূপের অনাবিল উদারতা ও উন্মুক্ত নগ্নতা কখনও দেখিয়াছ কি?—আর দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ কি?—কিন্তু রূপসীও অলঙ্কার ভালবাসে এবং বসন-ভূষণের ভারে অজ্ঞাতসারে আপনার সৌন্দর্য্যগৌরব খর্ব্ব করিয়া ফেলে।

সৌধ দ্বারে আমরা উপস্থিত হইলে একজন রক্ষী আসিয়া আমাদের এই অসময়ে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মহাস্থবির মহাশয় বলিলেন যে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমরা এই অসময়ে মহামান্য ক্ষত্রপের দর্শনাভিলাষী হইয়া আসিয়াছি।

রক্ষী বলিল "মহামান্য ক্ষত্রপ এরূপ সময়ে সাধারণতঃ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না। আপনাদের কি সময়ে প্রাসাদে আসিবার অনুমতি আছে কি? এবং সেই অনুমতির নিদর্শনস্বরূপ কিছু দেখাইতে পারেন কি?"

মহাস্থবির অঙ্গুরীয় দেখাইলেন। রক্ষী অভিবাদনপূর্বক সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল এবং আমাদের সম্মুখের কক্ষে গিয়া কক্ষস্থিত ঘণ্টিকা যন্ত্র তিনবার আঘাত করিতে বলিয়া চলিয়া গেল। আমরা তাহার উপদেশ মত কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘণ্টিকা যন্ত্রটি তিনবার শব্দিত করিলাম। প্রকোষ্ঠান্তর হইতে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেল। আমরা একটি প্রশস্ত বরণ পার হইয়া দ্বিতলে উঠিবার সোপান-মূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই সোপানাবলম্বনে আমাদিগকে উপরে যাইতে বলিয়া কর্ম্মচারী চলিয়া গেল।

প্রাসাদের দ্বারদেশে ও সকল কক্ষগুলিতে পঞ্চবীপ জ্বলিতেছিল। দশটি করিয়া দীপ প্রত্যেক কক্ষকে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। বরণটি কক্ষগুলি অপেক্ষা প্রশস্ততর। চারিটি কোণে দশটি করিয়া চল্লিশটি প্রজ্বলিত পঞ্চবীপের আলোকে এই প্রশস্ত বরণটি ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। সোপানের মূল হইতে শেষ অবধি আলোকমালায় সুশোভিত ছিল।

আমরা সোপানাবলী পার হইয়া দ্বিতলের একটি প্রশস্ত চত্বরে উপস্থিত হইলাম। চত্বরে অনেকগুলি দীপ জ্বলিতেছিল। এই চত্বরের উত্তরপ্রান্তে একটি কক্ষের কক্ষদ্বারে একজন রক্ষী স্থূল হস্তে পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল। আমরা তাহার নিকটে গেলে সে অভিবাদনপূর্বক দ্বার খুলিয়া দিল এবং আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বলিল। আমরা ভিতরে গেলে সে আমাদিগকে ঐ কক্ষস্থিত ঘণ্টিকায় একবার আঘাত করিয়া অপেক্ষা করিতে বলিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আমরা তাহার নির্দ্দেশ মত ঘণ্টিকায় একবার আঘাত করিয়া দেখিলাম আস্তরণী মণ্ডিত তিনখানি বার্ব্বনিক কাষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্বক অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রাসাদের সকল কক্ষগুলি রাজোপভোগযোগ্য চিত্রসজ্জিতে ও সুশোভন দ্রব্যসমূহে সুসজ্জিত। ভূতলে বহুমূল্য পশুলোম নির্ম্মিত প্রকোষল আস্তরণ বিস্তৃত, তদুপরি কোমল সুদৃশ্য আস্তরণী মণ্ডিত বার্ব্বনিক কাষ্ঠাসন সমূহ সুবিন্যস্ত। গবাক্ষসমূহে চীনাংশুকের আতপত্র এবং ভিত্তিগাত্র ভাস্কর্য্যোদ্ভিদ ও বর্ণচিত্রে পরিশোভিত। প্রকোষ্ঠে, বরণে ও

চক্ষের মর্ম্মর নির্ম্মিত অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পনিদর্শনসমূহ মূর্ত্তিমতী কবিকল্পনার ন্যায় বিরাজিত। কোথাও যার ও মারবমু(১) দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কোথাও উলঙ্গিনী মারবমু আপনার নগ্ন সৌন্দর্য্য গর্ব্বে, বিলাসবিভ্রমে ও অঙ্গকলা লাস্যে প্রতিষ্ঠিতা; কোথাও বা বন্ধুরের যাবনিক-যার, এরস্, তাহার কামনাপ্রযুক্ত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; আবার কোথাও মদোৎসবে যুবকীগণ পানদেবতা ডিওনোসিসকুকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছে—নৃত্যপরা হইয়াও গতিহীনা—চঞ্চলা হইয়াও অচঞ্চলা।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিবার পর একজন যবন সৈনিক আমাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করিল এবং বস্ত্রাধার, লেখনী ও তিনখণ্ড ভূর্জ্জপত্র আমাদিগকে দিয়া আমাদের নাম লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিল। আমরা পত্রখণ্ডগুলিতে আপনাপন নাম লিখিয়া সৈনিকের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলাম। সৈনিক বস্ত্রাধার ও লেখনী যথাস্থানে রক্ষা করিয়া পত্র তিনখণ্ড লইয়া আমাদিগকে পুনরভিবাদনপূর্ব্বক চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে সৈনিক ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার অভিবাদনপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহার সহিত আসিতে অনুরোধ করিল। আমরা তাহার সহিত সভাধাগারে প্রবেশ করিলাম। প্রকোষ্ঠটি অতি পরিপাটির সহিত সজ্জিত ও সুশোভিত। ভিত্তিসমূহ খজোত্তির ভাস্কর্য্যে(২) বর্ণচিত্রে উদ্ভাসিত। কক্ষতলে সুকোমল গালিচা আস্তরণ বিস্তৃত। সম্মুখে মহামূল্য স্বর্ণখচিত প্রশস্ত রৌপ্যবেদিকা ও তদুপরি রৌপ্য-সিংহাসন। বেদিকা পার্শ্বে মূল্যবান আস্তরণী মণ্ডিত অনেকগুলি রৌপ্য নির্ম্মিত যাবনিক আসন সুবিন্যস্ত। আমরা বেদিকার সম্মুখে তিনটি আসনে বসিয়া কক্ষপের সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সিংহাসনের পশ্চাতে, বেদীর উপরে মূলাস্ত্র চারিজন যবন সৈনিক চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল।

যে সৈনিক আমাদিগের সঙ্গে আসিয়াছিল সে আমাদিগকে আসন পরিগ্রহ করিতে বলিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক চলিয়া গেল। ইহারা যুদ্ধবিদ্যার সহিত অভিবাদনটাও বোধহয় বেশ শিখিয়া থাকে। ছিলের মধ্যে ইহাদিগকে কতবার অভিবাদন করিতে হয়? ইহাও বুঝি ইহাদের একটা কর্ত্তব্য। সৈনিক চলিয়া গেলে বাহিরের প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ হইল।

তখন পার্শ্বের কক্ষ হইতে উৎসবের আভাস পাওয়া যাইতেছিল। সঙ্গীত, বাদ্য, বাদ্য ও আনন্দকলরোল পার্শ্বের বিলাস প্রকোষ্ঠকে প্লাবিত করিয়া উচ্ছলিত হইতেছিল। সভাধাগকক্ষ হইতে বিলাসপ্রকোষ্ঠের সকল কথা ও গান—সমস্ত কলরবই—আমরা শুনিতে পাইতেছিলাম। তখন রমণীকণ্ঠে গাহিতেছিল—

"সে আসিবে কখন?
আকুল হৃদয় আমার মানে না বারণ।"

মনে হইল যেন ইহা সাফোর একটি গান। গৃহস্থাত যবন এই সুদূর বিদেশে আসিয়া, তাহার দস্যুবৃত্তির মধ্যে, তাহার জাতীয় ভাষা, কবিতা ও চিন্তার ভিতর দিয়া, তাহার দেশমাতৃকার পূজা করিয়া থাকে এবং এই চিরপ্রবাসে তাহার সুদূর প্রাচীন গ্রিস মাতৃভূমির স্মৃতিকে তাহার বিয়োগবিধুর প্রাণের মধ্যে জাগরিত করিয়া রাখে।

আবার গাহিল—

"অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ভরে
বসে আছি পথ চেয়ে
হতাশে পরাণ হায়—আঁধার-আঁধার।

হাঁ—সাফোই বটে—মনে পড়িতেছে।—এত সৌন্দর্য্য—এত ব্যাকুলতা—এত অনুভূতি, লালসা ও পিপাসা আর কোনও যাবনিক কবিতায় কখনও উপভোগ করি নাই। তখন, কৈশোরে, উচ্চ আদর্শে ও চিন্তায় আমার জীবন পরিব্যাপ্ত ছিল;—মধুরতাবের—রসাবেশের—মানবহৃদয়ের গুপ্ত লালসা ও তৃষ্ণার সকল কথা তাল বুঝিতাম না। কিন্তু এখন যৌবনের এই অকাল অবসানের মধ্যে—যখন আমার জীবন একটা অবর্ণনীয় অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—এই নিরাশা ও বেদনার মধ্যে,—এই লজ্জা ও হীনতার মধ্যে,—দাসে অনেক সময় আমার সকল বীরতা ভুলাইয়া দেয়,—এখনও জীবনের অনেক নির্জ্জন মুহূর্ত্তে সকল কালিমা মুছাইয়া দিয়া একটা অভিনব বিমল জ্যোৎস্নার আভাসের মত মাঝে মাঝে আমার হৃদয়ের নিবিড় অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করে।

"সখিলো কেমনে বলি
হৃদি যে ওঠে আকুলি—
কেমনে বুঝাব ওলো—হৃদয়ে কেমন?"

সঙ্গীত থামিয়া গেল—মনে হইল যেন এক অমৃতনির্ঝর, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পৌরাণিকী আখ্যায়িকার কোনও এক কোপনস্বভাব ঋষির অভিসম্পাতরচিত মরুপ্রান্তরে, বিলীন হইয়া গেল।

বেদীর পার্শ্বে সভাধাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইল। একজন যবন সৈনিক দ্বারদেশে আসিয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়া গেল:—

"বাসিলেঅস্(৩) মেগ মহানুভবতা পরম সৌম্যত ধর্ম্মরক্ষিত পরম স্রষ্টারক ভ্রাতা কক্ষস আর্কেলাওস আখেনীয়(৪)।"

আমরা সকলে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং যাবনিক অভিবাদননিয়মানুযায়ী আনতমস্তকে হস্ত প্রসারিত করিলাম। রক্ষীগণ তাহাদের হস্তস্থিত শূল সসম্ভ্রমে নত করিল।

কক্ষস সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। আমরা উপবিষ্ট হইলে একজন যবন কর্ম্মচারী আসিয়া যথারীতি আমাদিগকে অর্ঘ্যচন্দন দিয়া গেল, আমরা তাহা গ্রহণ করিলাম।

কক্ষস জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আর্য্য মহাত্মবির, বৃহস্পতি ধর্ম্মমিত্র ও বৃহস্পতিপুত্র ধর্ম্মদেব, কি

---

(১) যার, যাবনিক Free বা যবন। মারবমু, যাবনিক Psyche বা মূর্ত্তি।

(২) Bas relief.

(৩) বাসিলেঅস্ গ্রীক বা যাবনিক শব্দ, ইহার অর্থ রাজা বা সম্রাট্।

(৪) আখেনবাসী বা আথেন্স যাঁহার জন্মস্থান।

অভিপ্রায়ে এত ব্যস্ত হইয়া, অদ্য এই অসময়ে, আপনারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ?"

আমাদের নামোচ্চারিত হইবামাত্র আমরা যথাক্রমে আসন পরিত্যাগ পূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া অভিবাদন করিলাম।

পিতা নিবেদন করিলেন—

"মহামান্য কক্ষপ মহোদয়, অদ্য আমরা বড় বিপদগ্রস্ত হইয়া আপনার নিকট এই অসময়ে আবেদন করিতে আসিয়াছি। আপনি আমাদের সর্ববিষয়ে রক্ষক—এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র আপনিই কর্ত্তা।"

কক্ষপ বলিলেন—

"বৃহস্পতি ভদ্রভদ্র, আপনাদিগের আবেদন বিবৃত করিলে আপনাদিগকে আমি বিপন্মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইব।"

পিতা বৃহস্পতি পালক ও তাঁহার পুত্র প্রজাবর্দ্ধনের বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন।

কক্ষপ বিবিধ প্রশ্নপ্রসঙ্গে বুঝিলেন যে নগরপালক নির্দ্দোষী এবং রাজকর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে উৎপীড়িত। তিনি তাঁহাদের মুক্তির আজ্ঞাপত্র লিখিয়া এবং যথারীতি মোহর ও মুদ্রাঙ্কিত পূর্বক একজন রক্ষীর হস্তে নগরপালের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং আমাদিগকে বলিলেন—

"আর্য্য মহাত্মন্, বৃহস্পতি ও বৃহস্পতিপুত্র, আমার শাসিত রাজ্যে কর্ম্মচারীগণের দ্বারা এইরূপ উৎপীড়নের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি নগরপালকে আজ্ঞা দিলাম যেন তিনি নগরপালককে মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহে পাঠাইয়া দেন। আমি এ বিষয়ের সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়া এরূপ অত্যাচার যাহাতে আর কখনও না হয় তাহার ব্যবস্থা করিব প্রতিশ্রুত রহিলাম। এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে দু-একটী কথা বলিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। শুনিতেছি বাহ্লিক-সম্রাজ্ঞীমাত্রা ধবলবিষের উদ্ভূত হইয়াছে। যদি তাহা সত্য হয়—এবং আমি যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে বোধ হয় ইহা সত্য—তাহার মূলতত্ত্ব অনুসন্ধানপূর্বক তাহা নিরাকরণে বাহ্লিক-সম্রাটের কক্ষপ ও মন্ত্রিপরিষদ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। এ সম্বন্ধে আপনাদেরও উচিত যাহাতে সাধারণের মন হইতে এরূপ ভাব বিদূরিত হইয়া দেশে বিবিধ জনসমাজের মধ্যে সদ্ভাব ও শান্তি বিরাজিত থাকে তাহার আনুকূল্য করা। আশা করি আপনাদিগের ন্যায় সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ এবং পৌর ও জনপদবর্গ আমার এই কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিয়া আপনাদিগের নিজের প্রতি ও দেশের প্রতি আপনাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইবেন।"

কক্ষপ বেদী হইতে অবতরণপূর্বক সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের সময়ে আমরা তাঁহাকে যথারীতি প্রথানুযায়ী অভিবাদন করিলাম। তিনিও প্রত্যভিবাদন পূর্বক প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলেন। আমরা প্রাসাদের কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে প্রাসাদের কক্ষশ্রেণী একে একে পার হইয়া অবশেষে দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলাম।

ততক্ষণ কক্ষাজ্ঞের কক্ষসেন প্রীতিসম্ভাষণাদির নৈশ সম্মেলনসভা হইতে আনন্দোৎসবের সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইয়া উঠিতেছিল।

"তুমি কি বুঝিবে সখি কত তারে ভালবাসি ?
আমি যে পরাণ দিয়া সে ধন পুনিয়া পাই।"

আমরা যখন কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে নীত হইতেছিলাম, তখনও এই গান পুনরুক্ত হইলেও তাহার কথাগুলি অস্পষ্ট হয় নাই।—

"ভুলিতে পারি না সখি,
তারে না হৃদয়ে রাখি,
সে বিনা আমি যে শুধু বিষিড় আঁধাররাশি।"

তাহার পর আর বুঝিতে পারিলাম না। তখন কেবল এই গানের অস্পষ্ট কথাগুলির তীব্র লালসা ও উদ্দাম বিলাস ক্ষীণাবয়ব সুরলহরীতে ভাসিয়া আসিতেছিল।

আমরা প্রাসাদদ্বারে কর্ম্মচারীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক, উদ্যান পার হইয়া রথে আরোহণ করিলাম; পিতার আদেশে সারথী মহাশ্বিককে পাঠাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে রথ বিহারাভিমুখে চালিত করিল।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে কক্ষসভাবর্ণন নামক

চতুর্থ বিবৃতি। ক্রমশঃ

গঙ্গাজল

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(১)

এই বস্ত্রসঙ্কটের দিনে ধব্‌ধবে মলমলের পাড়হীন সাড়ি বিশ্বনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ধর্ম্মতলার ছত্রিশ জাতির ভিড়ের মাঝে অবলীলাক্রমে মহিলা বিচরণ করছিলেন। যাত্রাপথে ফুটপাথের দোকানদারের বিবিধ পণ্য পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। শ্রদ্ধায় আমেরিকান, চীনাম্যান, নিগ্রো, ভারতীয় এবং ব্রিটিশ সকলে তাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল। বিশ্বনাথ তার কণ্ঠস্বর শুনে নাই, একথা অলীক। অন্ততঃ কত দাম, একথা সে তিনবার শুনেছিল। কিন্তু সে সত্য অবজ্ঞা ক'রে তার চিত্ত নির্দ্দেশ করলে যে পথচারিণীর কথা শোনা সে যাত্রায় তার নিজের পথ-ভ্রমণের কাম্য কর্ত্তব্য।

নির্ভীক বিধবা। চৌরঙ্গী পার হয়ে ময়দানে পৌঁছবার সময়, প্রথম অর্দ্ধপথ বার কতক ডানদিকে তাকালে, পরে পথের পশ্চিমার্দ্ধে বামদিকে দেখে ট্রামের চক্রপথে এসে

পৌঁছিল। সবার এক একটা বিভিন্ন পথের ট্রামগাড়ি লক্ষ্য। বিশ্বনাথের লক্ষ্য সামনের মহিলা।

যখন এক বুক ভিড় নিয়ে বালীগঞ্জের গাড়ি এলো, মহিলা বুঝলে, স্থান নাই, স্থান নাই, পূর্ণ সে গাড়ি। ঘড়ির ঘড়ি দেখলে। ছটা পঁচিশ। ফাগুনের হাওয়া জনতার শ্রম অপনোদন করছিল। সল্‌টেড্ বাদামওয়ালা তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির সদুদ্দেশে বিচিত্র শব্দ করছিল। বিশ্বনাথ গোটাকতক পাক্ খেয়ে যখন মহিলার সম্মুখে এলো, তাদের চার চক্ষু মিলিত হল। সাহসী বিশ্বনাথ চট্ করে করজোড়ে বল্লে—নমস্কার।

এক ওপতে যত সময় লাগে তার এক উনিশ ভাগ সময়ের মধ্যে মহিলা তাকে যাচাই করলে। মনে গুমরে উঠ্‌লো অতি ক্ষুদ্র শব্দ—হুঁ!

বিশ্বনাথ বল্লে—ক্ষমা করবেন। আমি ভিড়ের তুফানে আপনার পিছনে এসে পড়েছিলাম। দেখলাম আপনার খোঁপায় একগোছা চাবী ঝুলছে। কোনো দুর্বৃত্ত অজ্ঞাতে ফাঁস টেনে চাবীর গোছাটা খুলে নিতে পারে।

শ্রীমতী অমিয়বালা হাসলো। বল্লে—ধন্যবাদ। কিন্তু দুর্বৃত্ত চাবীর গোছাটা নিলে, আমার অনেকটা কষ্ট কমিয়ে দেবে। আপনি নেবেন? শূন্য বাক্সের চাবি।

হরি! হরি! বিশ্বনাথ হতভম্ব হল। এক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ রণনীতি হ'তে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক্ হ'তে হবে অশোভন। সে বল্লে—আজ্ঞে, মানে হচ্ছে, আপনি বুঝি বিরক্ত হলেন?

এবার অমিয়বালা তুষ্টির হাসি হাসলে। সুস্মিতার বদনকমল বিনোদিত করলে বিশ্বনাথকে। শ্রীমতী বল্লে—বিরক্ত হইনি। বিস্মিত হয়েছি। হয়তো কৃতজ্ঞ হয়েছি। কারণ পেটের দায়ে আমাকে নিত্য পথ চল্‌তে হয়। প্রগতিশীল নবীন জগত আমার মুখ দেখে। সে জগতের প্রথম লোক আপনি আমার শূন্য বাক্স সৈটেরার মাত্র চাবী দেখে তাদের মঙ্গলকামনা করলেন।

বিশ্বনাথ এতটা সাহস প্রত্যাশা করেনি। সে নিরুত্তর রল। যুবতীর হৃদয়ে দয়া উপজিল। সে বল্লে—কিছু মনে করবেন না। আমিও নবীন জগতের। তাই বৈধব্য আমাকে কাবু করেনি। ট্রাম আসছে। নমস্কার। ছুটে এলো, সশব্দে চলে গেল বক্ষে নিয়ে অমিয়-বালাকে। শ্রীমান বেকুফ্ বেকুফ্ মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল যাত্রী-বিশ্রাম ঘরের সম্মুখে। তার অবসাদ ঘুচ্‌লো যখন তার সহকর্মী অমরেন্দ্রনাথ এসে তার মাথায় টোকা মারলে।

তারা উভয়ে অনেক কথা কইলে। পরে স্থির হ'ল পরদিন সাড়ে পাঁচটা হ'তে বিশ্বনাথকে এই মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কাজের জন্য।

বিশ্বনাথ সুস্থ হ'ল।

(২)

শ্রীমতী অমিয়বালা মজুমদার বিধবা কর্মী। বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। কিন্তু তার সাধের কর্মভূমি গৃহস্থের অন্তঃপুর। প্রতিদিন অমিয়বালা টানাটানির সংসারে ঘোরে অভাব অভিযোগের উৎসুক সন্ধানে। আর সজল সংসারে ঘুরে উদ্বৃত্ত পদার্থ সংগ্রহ করে। বাঙালী বিধবার অভাব-অভিযোগই তার চিন্তার বিষয়। তাদের অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব এবং নিরাশ জীবনের বিভীষিকা অমিয়বালার নিজের কঠোর নির্জনতা ভুলিয়ে রেখেছিল। যে সব সংসারে সে হাসিমুখে চাল-ডাল তরি-তরকারী বিতরণ করতো, সেঁথায় সে ছিল দিদিমণি। যে সব ধনী গৃহিণী তাকে সাহায্য করত তারা তাকে সসম্মানে আত্মীয় ভাবতো। মিষ্টি ছিল অমিয়ার ভিক্ষা। সে চাহিত না, অপরাধিনীর মতো লোকের দ্বারস্থ হ'ত। ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী হাতে নিয়ে, নিজের অপরাধ স্বীকার করতো। বল্‌তো—কত কষ্ট আপনাদের দিচ্ছি, লজ্জা হয় বারবার বিরক্ত করতে।

সেদিন সকালে বিদ্যালয় যাবার সময় অমিয়বালা শুনলে একদল তরুণের তর্কের প্রসঙ্গ—আপদ আর বিপদের প্রভেদ।

আপদ, বিপদ অমিয়বালার চিত্তের রস-সম্পদ নিঃশেষ করেনি। তার বিচিত্র মাতৃভূমি বঙ্গদেশের মত, এত ভঙ্গেও তার প্রাণ ছিল রঙ্গে-ভরা। তাই তার প্রজ্ঞা তরুণদের তর্কের সমাধান করলে। দেশের দুরবস্থা নিশ্চয়ই বিপদ। কিন্তু বর্ষাতলার মোড়ে সেই অপরিচিতের আপত্তিকর নিমিষের চাহনী এক আপদ। ট্রামে উঠে সে হাসলে।

পৌনে ছটায় যখন বিশ্রাম-ছাউনীর বাহিরে পুস্তকের দোকানের ধারে, বিশ্বনাথ মল্লিক তার মুখের দিকে

তাকানো, সে চাহনীকে উপেক্ষা না ক'রে শ্রীমতী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার দিকে। সে দৃষ্টিতে শাসন ছিলনা, ভ্রূকুটি ছিলনা, বিরক্তি ছিলনা, হয়তো প্রচ্ছন্ন উৎসাহ ছিল। অতএব বিশ্বনাথের পক্ষে—নমস্কার, বলা হ'ল আশু কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যপালনে আনন্দিত হ'ল বিশ্বনাথ। তার আনন্দ উল্লাসে পরিণত হ'ল, যখন মহিলা বল্লে—আজ কি দেখছেন? চাবি না ছবি?

সাহসে সাহস আসে। রসিকতা উদ্ভূদ্ধ করে রস রসহীন প্রাণেও। ভরসা ক'রে বিশ্বনাথ বল্লে—সত্য কথা বলব? ছবি দেখছিলাম—শুধু পটে আঁকা নয়।

মহিলা বল্লে—ভালো। আপনি কবিতা পড়েন।

সে নিরাসায় গেল বাগানের ধারে। যুবক অনুসরণ করলে। শিক্ষয়িত্রী বাধা দিল না।

বিশ্বনাথ বল্লে—আপনি নিত্য একেলা এই ভিড়ের মাঝে ঘোরেন। এখানে কত বিদেশী—

অমিয়বালা বাধা দিয়ে বল্লে—ভয়, মানে ভয় না হ'ক খটকা স্বদেশীকে নিয়ে। বিদেশীরা বড় একটা গ্রাহ্য করে না।

মল্লিক বল্লে—স্বদেশীর অপরাধ কি? শুনবেন, এরকম বিধবা দেখলে, অতি প্রতিক্রিয়াশীল বাঙ্গালীও বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে মত বদ্‌লালে, তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

অমিয়বালা অতটা দুঃসাহস আশঙ্কা করেনি। সে সামলে নিয়ে বল্‌লে—চীনদেশে কি বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে?

একটা চীনা গাড়ীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, কার্জন বাগিচার সন্নিকটে।

বিশ্বনাথ বল্লে—ভারতের এক শ্রেণী ছাড়া সকল সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত।

অমিয়বালা বল্লে—ওঃ! তাই। একবার একটি চীনা ভদ্রলোক আমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। আর সবচেয়ে মজার কথা, সে আমার নাকের সুখ্যাতি করেছিল। বুঝুন।

বিশ্বনাথ বল্লে—অবশ্য ক্ষমা করবেন, তিলফুল জিনি নাসা, বাঁশীর মত নাক, প্রভৃতি যে সব বর্ণনা আছে আদর্শ নাকের, সেগুলা আপনার নাসিকা সম্বন্ধে প্রযুজ্য।

—হতে পারে আপনার মত কাব্য-রসিকের বিচারে। কিন্তু চীনা—যার আদর্শ-নাসিকা দেখলে আতঙ্ক হয় বুঝিবা অধিকারিণীর দম্ বন্ধ হয়—

বিশ্বনাথ বল্লে—বিপরীত ভাব আকর্ষণ করে পরস্পরকে।

শিক্ষয়িত্রী বল্লে—সে কথা সত্য বিজলী বা চুম্বক সম্বন্ধে। কিন্তু নাক যে একটা তরঙ্গ, একথা বিজ্ঞান এখনও মানেনি।

বিশ্বনাথ শিক্ষিত। তার শ্রদ্ধা বাড়ছিল মহিলার প্রতি। সে বল্লে—মনোবৃত্তি বা রূপ সম্বন্ধেও কথা অনেকটা সত্য।

মহিলা বল্লে—শাশ্বত সত্য নয়। তাহলে লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাক্ না কেটে তার নাসিকা-প্রবাহে আকৃষ্ট হ'য়ে সূর্য্যবংশে এবং রাক্ষসবংশে উদ্বাহ তরঙ্গ প্রবাহিত করত।

—আপনি সুপণ্ডিত এবং মানে—

—সুশ্রী।—বল্লে অমিয়বালা। কিছুক্ষণ পরে বল্লে—আপনি ধর্ম্ম বিশ্বাস করেন? মৃদু সাধু শিক্ষিত ভদ্রলোক আপনি নিশ্চয়।

বিশ্বনাথ ভয় পেলে। অথচ একেবারে নিজেকে অশিষ্ট, অসাধু বা অশিক্ষিত ব'লে পরিচয় দিতে পারলে না। সে বল্লে—কথাগুলা আপেক্ষিক। অবশ্য আমি দুষ্ট নই।

অমিয়বালা হেসে বল্লে—তাহ'লে আমি দুষ্ট। বিপরীত চিত্তপ্রবাহ যখন মিলন-প্রয়াসী—

বিশ্বনাথ বুঝলে সে কোথায় এসে পড়েছে। আত্ম-গ্লানিতে পূর্ণ হ'ল তার মন। সে বল্লে—ক্ষমা করবেন আমার অশিষ্টতা। আমি অন্যায় করেছি আপনার সঙ্গে অযাচিতভাবে আলাপ ক'রে। মানুষ সকল কাজ বুঝে করে না। ক্ষমা করুন।

এবার অমিয়বালা হাসলে, ক্ষমার হাসি, বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার উদার হাসি। সে বল্লে—ক্ষমার কোনো কথা নাই। যখন আলাপ হ'য়েছে, আমরা পরিচিত। আপনি আমার উপকার করতে পারেন—বন্ধু হিসাবে।

—বিলক্ষণ—বল্লে বিশ্বনাথ।

বাকী কথা পরে হবে। মহিলা তাকে একখণ্ড কাগজ দিল, নাম ঠিকানা লেখবার। সে সুবোধ বালকের মত সহি দিল। মহিলা তাকে নিজের ঠিকানা দিল, বিদ্যালয়ের নাম দিল।

মহিলা চলে গেল। বহুক্ষণ বাগানের বেঞ্চে বসে ভাবলে বিশ্বনাথ মল্লিক। শেষে আপনমনে বল্লে—মুষ্টীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

(৩)

ফাল্গুন ১৩৪১ সালে কলিকাতার বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের মাথে সরকার প্রকাণ্ড বোমা বৃষ্টি করলে। হঠাৎ সকল দোকান-

দামের মজুত মাল সীল করা হ'ল। যে ব্যবসায়ীর দখলে যত মাল ছিল, তার ফর্দ্দ হ'ল, ব্যবসায়ীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হ'ল, সরকারী হুকুম ব্যতীত কেহ কাপড়ের বেচা-কেনা করতে পারবে না। তারপর যা' আদেশ জারি হ'ল প্রত্যক্ষভাবে সে ইতিহাস এ আখ্যায়িকার অপ্রাসঙ্গিক। সে ভবিষ্যত নির্দ্দেশের সমাচার তখন ব্যবসায়ীমহল অবিদিত ছিল।

কলিকাতার সকল গুদাম একদিনে সীল করা অসম্ভব। কিন্তু প্রথমদিনের অভিযান ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করলে। কালাবাজারের কল্যাণে বহু ব্যবসায়ী এবং সরকারী কর্ম্মচারী কমলার কৃপা আকর্ষণ করেছিল। একদিন বহু নাড়াবুনো যেমন কান্তে গলিয়ে খরতাল গড়ে কীর্ত্তনীয়া হ'য়েছিল, তেমনি বহু সচ্চরিত্র ব্যক্তি সোনা রূপা বেচে কাপড় কিনেছিল। কিন্তু সরকারের এ কি দুর্ব্যবহার! আর বাঙ্গালী কাগজওয়ালাদের! বস্ত্র নাই, বস্ত্র নাই, তো লক্ষ লক্ষ টাকার মূল্যের মাল কোটী টাকায় কেনে কে? তখন আশু বিপদে রক্ষার উপায় সময় থাকতে মাল সরানো, এ সিদ্ধান্ত করলে বহু ব্যবসায়ী।

শ্রীমতী অমিয়বালা মাসিক দশ টাকা ভাড়া দিয়ে দু'খানি ঘরে বাস করতো। নতুন দুখানি ঘর, আয়তনে ক্ষুদ্র। অথচ বিধবার পরিশ্রমে সেই ছোটো কামরা দুটি ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঐ ডামাডোলের দিনে হটাৎ তার গৃহের সম্মুখে সমাসীন হ'ল শ্রীযুক্ত টহলরাম ঘরপুরিয়া। সে তার সঙ্গে কথা বলে, কথার মাত্রা ছিল মারিজি।

—মারিজি একঠো কামরা মিলে যাহার মধ্যে আমি তিনটা গাঁঠ কাপড় রাখবো কয়দিনের তরে—বলে টহলরামজি।

সে আরও বোকালে। মেলে ধর্ম্ম নাই। সরকারের মতিচ্ছন্ন হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য মেরে দিয়ে ইংরাজ চায় বিলাতী মালে বাজার ছেয়ে ফেলতে। তাই মানুষের ঘরের কড়ি দিয়ে কেনা মাল জাবর্ ক'রে পুলিস জুলুম সুরু করেছে।

শ্রীমতী ছিন্নবসনাদের কথা ভাবলে। বস্ত্রাভাব ও অন্নাভাব বৈধব্যকে আরও কঠোর ও নির্ম্মম করে তুলেছে।

সে ধীর শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে—গুদাম নিয়ে আপনি কি করবেন?

সে বল্লে—এর মাঝে মারিজি আমি তিন গাঁট, ছয়শত জোড়া সাড়ি ধুতি লুকায়ে রাখব মারিজি। গণ্ডগোল কাটিয়ে গেলে নিয়ে যাব মারিজির কামরাটি হ'তে।

—আমার যদি পুলিসে ধরে?

টহলরামজি ঘরপুরিয়া খুব হাসলে। বল্লে—তার সম্ভাবনা নেই। এটা বাঙ্গালী পাড়া গৃহস্থ পাড়া। কেহ সন্ধান পাবে না মারিজি।

শ্রীমতী অমিয়বালা অগত্যা স্বীকৃত হল। মাসিক ভাড়া একশত টাকা। কিন্তু সে লেখা চাহিল। পরে না গণ্ডগোল হয়।

টহলরাম তাকে দু'খানা পত্র দিলে—একখানা বে-নামী। যদি পুলিসে সন্ধান পায় তা' হলে শ্রীমতী সেই বেনামী বেইমানী রসিদটা দেখাবে মালের মাসিকানা প্রমাণের জন্য। আর তার আসল রসিদ আর ঘরের একটা চাবী সে অন্যত্র লুকিয়ে রাখবে। একটা চাবী থাকবে ঘর-পুরিয়ার নিকট। বোঝাপড়ার সময় সেই ফর্দ্দ কাজে লাগবে। তবে যেহেতু ব্যাপারটা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে সংঘটিত ও সব লেখাপড়া বাজে।

এই সব গুপ্ত বন্দোবস্তের ফলে শ্রীমতী অমিয়বালাকে মাত্র একটি কক্ষে বাস করতে হয়েছিল। অন্য কক্ষে ছিল লুক্কায়িত ধুতি সাড়ি।

৪

অমিয়বালা খদ্দরের কাপড় পড়ে, যাদের বাড়ি ভিক্ষা করতে যায়, তাদের কাছে শোনে। তার উপকারী বন্ধুরা অনেকে উকীল-ঘরণী।

যখন টহলরাম তার কাছে তিন গাঁট কাপড় রেখেছিল, শ্রীমতী অমিয়বালার অন্তরে শয়তানী ছিল না। মাসিক একশত টাকায় সে অনেক বিধবার সহায়তা করতে পারবে, এই ছিল তার আইন-ভাঙ্গা কার্য্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন সে সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝলো, তার মনে এলো দুষ্টামী। ঘরপুরিয়া মাঝে মাঝে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মানুষটা কালা বাজারে বহু অর্থ লাভ করেছে। এ মালের দাম বারো হাজার টাকা, বেচতে পারলে সে অন্ততঃ বারো হাজার টাকা লাভ করতে পারবে। একদিন সে জিজ্ঞাসা করিল—আর ধরা পড়লে?

টহলরামজি বল্লে—সে আমার অদৃষ্ট। সরকার মালটা বাজেয়াপ্ত ক'রে নেবে, আমি জেলে যাব মারিজি।

শ্রীমতী শিহরে উঠলো। সে নিজে ধরা পড়লে কি হবে জিজ্ঞাসা করলে।

টহলরাম বল্লে—মারিজি আপনি সেই চিঠিখানা দেখাইবে দিবেন। সরকার দেখবে মালের মালিক গঙ্গারাম। তাকে খুঁজে পাবে না। মালটা জাবদ্ করিয়ে নিবে। সরকারের লাভ। দেশে বিচার নাই। কলিকাল মারিজি।

শ্রীমতী প্রকাশ্যে বল্লে—মোটেই বিচার নাই। মনে মনে বল্লে—তাহলে তাজমহলের পাশে ভাঙ্গা কুটীরে পূর্ণ থাকে সমাজ? সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদের নাম কলিকাল। ঠাকুর ঘরে না বসা আসল যুগ-ধর্ম নয়। তিন-পায় অধর্ম যার বিশেষত্ব, যে কলিকালের ধর্ম দারিদ্র্যের কঠোরতা বাড়ানো—আর তেলা মাথায় তেল ঢালা।

সেদিন উকীল কেদারবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবার পর শ্রীমতী অমিয়বালার মস্তিষ্কের কু-বুদ্ধি-কেন্দ্রে হিল্লোল উঠলো। যাকে হয়তো পৃথিবী বলবে দাগাবাজি বা বিশ্বাসঘাতকতা, সেটা নিশ্চয় এক্ষেত্রে ধর্ম, নির্ণয় করলে বিধবা। আর সত্যই যদি জগদীশ্বরের বিচারে কমটা হয় পাপ, সে নরকে গিয়ে অন্ততঃ এই তৃপ্তি পাবে সে তার বে-ইমানী বহু উলঙ্গকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করেছে।

সুতরাং পরদিন যখন টহলরামজি তাকে মাসিক ভাড়া দিতে এলো, সে ভাড়া নিল না। তাকে বল্লে—পুলিসের গোয়েন্দাকে দেখেছি এখানে। আপনি আর আসবেন না।

টহলরাম ভীত হ'ল। সে বল্লে—রাতারাতি সে মাল সরাবে। কিন্তু শ্রীমতী দৃঢ় হল। তার অমল মধুর হাসি উবে গেল। চোখের সে মিষ্টি চাহনী পরিবর্ত্তিত হ'ল কঠোর দৃষ্টিতে।

সে বল্লে—ওটি হবে না মশায়। আপনি দেশের বুকের অনেক রক্ত খেয়েছেন। আমি এই সাড়িগুলি গরীবদের বিলিয়ে দ'ব। আপনার প্রায়শ্চিত্ত হবে।

তার বুকে পিস্তল থাকলে শ্রীযুক্ত টহলরামজি ঘরপুরিয়া অত মর্মাহত হত না। অমিয়বালা তাকে বোঝালে যে সে পুলিসে খবর দিলে কাপড় তো সরকার পাবে, টহলরামের উপরি লাভ হবে কারা-ভোগ। পাড়ার লোক সাক্ষী দেবে যে কাপড় ঘরপুরিয়াবাবুর। টহলরাম পুলিসে খবর দিলে, অমিয়বালা বলবে সে কিছু জানে না। দোষী টহলরাম। ভাড়াটের কামরায় কি আছে না আছে, সেকথা জমিদারের জানবার কথা নয়।

শ্রীযুক্ত টহলরামজি ঘরপুরিয়া বহু টহলদারী ক'রে সামান্য অবস্থা হ'তে ধনী হয়েছিল। সে বুঝলে এক মারাত্মক কাঁকড়ার দাড়া তার টুঁটি টিপে ধরেছে। কুসুমে কীট থাকে। কিন্তু এমন সুন্দর দেহে কাঁকড়ার দাড়া থাকে! সে ভয় দেখালে, অনুনয় করলে, বিনয়-নম্র সম্ভাষণে বিধবার মনস্তুষ্টির প্রভূত চেষ্টা করলে, কিন্তু শ্রীমতী অমিয়-বালা কঠোর নির্মম।

শেষে রফা হ'ল। অমিয়বালা মাত্র এক গাঁট দুশো জোড়া সাড়ি রাখবে। বাকী দু গাঁট তাকে রাতারাতি সরিয়ে নিয়ে যাবার অবকাশ দেবে। যখন অমিয়বালার দুশো জোড়া সাড়ি বিতরণ শেষ হবে সে ফেরত দেবে তার চিঠি। তার বাক্সে ধরা পড়লে সে বাজে নামের চিঠিখানা দেখাবে পুলিসকে। মা কালীর নামে দিব্য করলে উভয়ে, কেহ কাকেও ধরিয়ে দেবে না।

আবার শিক্ষয়িত্রীর শ্রীমুখে সেই অমিয় হাসি ফুটে উঠলো। সে জুয়াচোর নয়, উৎপীড়ক নয়, অত্যাচারী নয়। সে কুসুম, তার মনে গোখরো সাপের বাসা নাই।

টহলরামজিকে অমিয়বালা বল্লে—আপনি ধনী, আমাকে মা বলেছেন আমি আপনার কন্যা। বাপের কাছে জুলুম ক'রে চেয়ে নিলাম চার পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু কত পুণ্য আপনার হ'ল।

বাস্তবকে সত্য জেনে আজ টহলরাম ব্যবসায়ী মহলে মানী। সে বল্লে—বেশ তো মা। মা কালী আমায় দয়া করুন, আমি আপনার শুভ কাজে আরও পয়সা দ'ব।

পূজার মধ্যে প্রায় দেড়শত জোড়া সাড়ি দান করেছিল তিনশত বিধবা। পূজার পরেও বিতরণ কার্য্য পূর্ণ হয়নি।

একদিন উকীল কেদারবাবু অমিয়বালাকে বল্লেন—মিসেস মজুমদার, কাল ধর্মতলায় আপনি সে লোকটির সঙ্গে কথা কইছিলেন, তাকে জানেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কেদারবাবু বল্লেন—ও পুলিসের লোক।

শ্রীমতী বল্লে—সে কথা জেনেছিলাম এক পক্ষ পূর্বে। ওকে চিনি প্রায় এক মাস। বোধ হয় টহলরামকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখে সন্দেহ করেছেন।

কেদারবাবু বিদ্রূপে একটা শেষ টান দিয়ে বল্লেন—একটু সাবধানে থাকবেন।

অমিয়বালা হেসে বল্লে—যার কাজ তিনি দেখবেন। আর হাঁটতে পারি না—জেলে গেলে বিশ্রাম পাব।

কেদারবাবুর স্ত্রী তার চিবুক ধরে বল্লেন—অমন অলক্ষণের কথা বোলোনা মা। তোমার কপালে—

—কপালের কথা তো জানি না মাসিমা। হাতের কথা জানি। তিনি হাতের রেখা খুলে নিয়েছিলেন বলেই তো এই হাতে চোরাই মাল বিলিয়ে আমার মত দুঃখিনীদের মুখে হাসি দেখেছি।

সে যখন চলে গেল, কেদারবাবু কোর্ট, হেবেস, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা এবং মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বের বিধান আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত করলেন যে শ্রীমতী অমিয়বালা যদি পাপী হয় তো ঐ রকম পাপই মহা পুণ্য, স্বর্গে যাবার সোপান।

•

এবার যেদিন বিশ্বনাথ মল্লিক অমিয়বালার সাক্ষাৎ পেলে উভয়ের জড়তা ছিল না। বিশ্বনাথ অমিয়বালার সঙ্গে একই ট্রামে উঠলো, একই মোড়ে নামল।

অমিয়া বল্লে—আমার কুটীরে স্থান নাই। আপনাকে আসতে বলতে পারি না।

বিশ্বনাথ বল্লে—কিলক্ষণ।

অমিয়া বল্লে—আমার ঘরে কিছু নাই। একখানি কামরা।

—পাশের ঘরে কি থাকে?

অমিয়বালা বল্লে—একজন ঘর ভাড়া নিয়েছে। আসুন না আমার দীন কুটীরে। তবে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে মত বদলাবেন না।

বিশ্বনাথ প্রীত হল। সে বল্লে—রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে মানুষ রঘুনন্দনের স্মৃতি—বাপ্।

এককোণে একটা জলের জালা ছিল—জলের জালা, কিন্তু তার মধ্যে ছিল জোড়া কতক নূতন কাপড়। মল্লিকের প্রশ্নের উত্তরে সে বল্লে—এর মধ্যে আছে গঙ্গাজল।

বিশ্বনাথ বল্লে—আপনি তো খুব নিষ্ঠাবতী।

মহিলা বল্লে—নিষ্ঠা আমার না। এর ভেতরের গঙ্গাজল নিয়ে বেহালায় যাব। এক বিধবার বাড়িতে কুলঙ্গীর ভিতর তাঁর গঙ্গাজলের ঘট আর পূজার সামগ্রী থাকতো। পাড়ার একটা মুরগী ঢুকে সেখানে ডিম পেড়ে দিয়ে এসেছে। এই গঙ্গাজল দিয়ে তার পূজার উপকরণ শুদ্ধ করতে হবে।

রসিকতা কি সত্য কথা তা ঠিক্ করতে পারলে না বিশ্বনাথ। কিন্তু তার মনের মাঝে দুটো বিরোধী ভাব তাকে অশান্ত করছিল। এমন রসিকা সুন্দরী মহিলা—এক কথা রিপোর্টে লিখে দেওয়া উচিত—এর পরে সন্দেহ ভিত্তিহীন। কিন্তু তবু একবার পাশের ঘরটা দেখতে পারলে হ'ত। বিবেক, ধর্ম্মবুদ্ধি, নিমক, কর্ত্তব্য প্রভৃতি শব্দ এ আলোচনায় তার মনের মাঝে গুমরে উঠলো। কিন্তু সত্য কথা বলতেই বা দোষ কি তার কাছে, যার আঁখি হ'তে শুধু তারার জ্যোতি ঠিক্‌রে পড়ে, যা'র কথা রসে ভরা।

সে বল্লে—আপনাকে একটা খবর দ'ব মিসেস মজুমদার। পরিহাস করবেন না। এবার আপনার ভাড়াটে এসে ঘরের মাঝে কি আছে দেখে নেবেন। ডিনক্যাশ খারাপ।

সে ভারত-রক্ষা আইন, বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ অনুশাসন প্রভৃতির কথা তাকে বোঝালো।

সব শুনে অমিয়বালা বল্লে—বিধবাদের বিলাবার জন্য যদি কেহ ওর মাঝে কাপড় রাখে।

—আইনের চোখে সধবা, বিধবা বা কুমারী সমান।

অমিয়বালা বল্লে—গঙ্গাজল দেখবেন?

সে জালার মধ্যে হাত পুরে একজোড়া ধুতি বার করলে।

বিশ্বনাথ লাফিয়ে উঠলো। বল্লে—তাহ'লে সত্য।

—কি সত্য?

বিশ্বনাথ বল্লে—ডিপার্টমেণ্ট সন্দেহ করে যে আপনার বাড়িতে কাপড় লুকানো আছে। আপনি দু একজোড়া করে নিয়ে বাজারে বেচে আসেন। আমি পুলিসের কর্ম্মচারী। আপনাকে লক্ষ্য করার ভার আমার উপর। তাই এক মাস পূর্বে যেচে আলাপ করেছি। তার পর কিন্তু—

এবার ললিতা ফণিনীর মত বিষে গর্জ্জে উঠলো। বল্লে—এর চেয়ে অধিক ভাববার শক্তি আপনাদের নাই। তাই আমি কাপড় সংগ্রহ করেছি। সেগুলা দরিদ্র নারায়ণের সেবায় যায়। কিন্তু একথা কি সন্দেহ করেছে ডিপার্টমেণ্ট

যে এ গুদামের মাল সরবরাহ করেছেন তাদেরই লোক শ্রীবিশ্বনাথ মল্লিক।

—বিশ্বনাথ মল্লিক ?

—এই সই কার ? কি লিখেছেন মনে নাই ? পড়ে দিচ্ছি—

প্রিয় ভগ্নি

আমি বহু কষ্টে কয়েক জোড়া কাপড় সংগ্রহ করেছি। আপনি দরিদ্রদের বিতরণ করবেন। আমি সরকারের হুকুম নিয়েছি। কিন্তু আমাকে মনে রাখবেন। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত উদার। রূপ-গুণ-মুগ্ধ

শ্রীবিশ্বনাথ মল্লিক

ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট

বিশ্বনাথ শিহরে উঠলো। সই তার বাকিটা জানে।

তাকে বোঝালে অমিয়বালা। শেষে বল্লে—সত্যই ভাইয়ের মত মানুষ যদি দরিদ্রের অনিষ্ট না করেন। কিন্তু জেলে দেবার জন্য পাতলে আমাকেও জাল জুয়াচুরি করতে হবে। সই করেন কেন ? এ কথা ডিপার্টমেণ্ট জিজ্ঞাসা করবে। উত্তর ভাবুন। আমার সাক্ষী আছে, এ চিঠি আপনার।

নিঃশব্দে বিশ্বনাথ গৃহত্যাগ করলে। রিপোর্ট লিখলে সন্দেহ ভিত্তিহীন।

তবুও সাবধানী কেদারবাবুর পরামর্শে অমিয়বালা বাকী কাপড়গুলা অন্যত্র রেখে এলো। জালায় ভরলে পবিত্র গঙ্গাজল।

আজাদ-হিন্দ-সরকার

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

(২)

ইংরাজী ভাষায় "গ্র্যাজার" বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ব্যবসায় বুদ্ধি তাহার দ্বারা জাঁকজমক বুঝায় তবে তাহার সহিত হুজাচন্দ্রের মনের মিল ও অন্তরের সম্প্রীতি ছিল। খদ্দর ত্যাগের প্রতীক এবং গান্ধীজী-পরিচালিত কংগ্রেস, চাকচিক্য বর্জন কংগ্রেসের অন্যতম মূলনীতি বলিয়া বিঘোষিত হইলেও কংগ্রেসে জাঁকজমক ও চাকচিক্যের অভাব কোনদিন দেখা যায় নাই। গান্ধীজী কংগ্রেসকে সহর হইতে ঘুরে পল্লীগ্রামে অথবা পল্লীগ্রামে যেখানেই কেন লইয়া যান না, জাঁকজমক এবং চাকচিক্য হাত ধরাধরি করিয়া, সাজিয়া গুজিয়া, ঘরঘরে, সাজসরঞ্জামে শীহিদাটোর 'ব্যালে'র মত, সেইখানেই সংঘাত্রী হইয়াছে। মোটা সুতার হাতে-বোনা খদ্দর ও 'গড়' খদ্দরও রাজাধিরাজ মহারাজার প্রাপ্য মান ও মর্য্যাদা পাইতে অভ্যস্ত, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গান্ধীজী স্বয়ং ! গান্ধী-আরুইন চুক্তির দিনের কথা আমার স্মরণ আছে। আমি তখন দিল্লীপ্রবাসী, খদ্দরের কটীবাসপরিহিত 'অর্দ্ধনগ্ন' এই ব্যক্তিটি যখন পুরাতন দিল্লী হইতে নব্য দিল্লীর রাজপ্রতিনিধি প্রাসাদে সমাগমন করিতেন, তখন রক্ত প্রস্তরবিস্তৃত রাজপথ পর্য্যন্ত সজীব হইয়া উঠিত ; দুর্বিসাদ ও প্রবিস্তৃত রাজধানীও ইন্দ্রপুরীতুল্য, জাঁকজমকে খচিত ও চাকচিক্যে সজ্জিত হইয়া উঠিত।

আজ আবার নূতন করিয়া তাহারই পুনরভিনয় দেখিতে পাইতেছি। আজ দিল্লীতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী-বিপণ ভারতবর্ষের সহিত যুদ্ধ-পড়া করা যায় কিনা, কোন্ কোন্ সর্ত্তে যুদ্ধ-পড়া হইতে পারে তাহারই যুদ্ধ-পড়া করিতে বসিয়াছেন। এ সময়ে গান্ধীজী দিল্লীতে না থাকিলে, দিল্লীর বক্ষ রক্ত-রাঙ্গার নিষ্ফল রক্ত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল। তাই গান্ধীজী দিল্লীতে উপনীত। কিন্তু অবস্থিতি, ভাঙ্গি-পল্লীতে। দু'চার দিনের জন্য দিল্লী প্রবাস করিতে আসিয়া দেখি, সেই ভাঙ্গি-পল্লী রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদকেও ছুয়ো দিতে বসিয়াছে। এই মেথর পাড়ায় স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপসের ঘন ঘন আগমন ঘটিতেছে ; পাঠিয়ালার মহারাজের ভ্রমের ও আবুলের ভূষণগুলির দ্বারা আবহমান দিল্লী আমি বিলাসে বিভূষিত পারি ; (অবশ্য যদি বিলাসে উঠে) ভূপালের নবাব যে এখানে সমাপন করিয়াছেন তাহা কি তাঁহারই স্বপ্নেরও অগোচর ছিল না ? বড়লাট সাহেবের অর্দ্ধদিবস ব্যাপী পরাক্রান্ত আচ্ছিবল্ড ষ্টাইন্যাও সাহেব নাসিকায় রুমাল না দিয়াও এই পাড়ায় এই কুটীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেছেন, ইহাও চাক্ষুষ করা যাইতেছে। নারায়ণ ভূরি-ভোজনের স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া বিদুরের কুটীরে ক্ষুধায় তৃপ্ত করিয়াছিলেন ; রাজা অশোক স্বর্ণ সিংহাসন অপেক্ষা ভূমাসনে বসিতে ভালবাসিতেন ; গান্ধীজী হরিজন-পল্লীকে ভূবিলাস 'মহল' লোকদের পাশে তুলিয়া দিলেন। ভাঙ্গি পল্লী জাঁক জমকে জম জম, ঘান ঘরাণে ঘম্ ঘম, চাকচিক্যে চকিত ও 'গ্র্যাজারে' ভরাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

বহুকাল পূর্ব্বে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-পর্য্যটক তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছিলেন, 'গান্ধীজীর মত কুৎসিত ও কদাকার লোক সচরাচর দেখা

যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই কদাকার কুৎসিত লোকটির চতুষ্পার্শে এমন একটি শুচিস্নাত সুকুমারশ্রীর 'রাজশ্রী' বিরাজ করে যে, যে কোন লোক তাহার সন্নিধানে আসিবামাত্র অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। যত অল্পোন্নত চিত্ত ও নৈতিক যে দেশেই মানুষ হৌক না কেন, এই সহজ, শান্ত, স্নিগ্ধ, ও দৃঢ়িকৃত পর্ণকুটীরের অধিকারীর সম্মুখীন হইবামাত্র নিজের অজ্ঞাতসারে বিনয়ে নত হইয়া আসে। পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরে, খুব সাদাসিধা, অমসৃণ খদ্দরের তুলি-শয্যা, কুটীরে আসবাবপত্র আদৌ নাই, অথবা থাকিলেও এতই অল্প ও তুচ্ছ যে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কুটীরাধিকারী লোকটি কটীবাস পরিহিত, উত্তরীয় আছে কিনা নাই, দেখা যায় না। চোখে মোটা কাচের চশমা—একখানি ফ্রেম ভাঙিয়া গিয়াছে, খদ্দরের ঘড়ি তাহার পরিবর্ত্ত হইয়াছে। আর রূপের বর্ণনা সে ত আগেই করিয়াছি! কিন্তু ঐ দুর্ব্বল, কৃশকায়, জীর্ণ ও কদাকার লোকটির সম্মুখীন হইবামাত্র মনে হইল, আমন্ত্রকের নিকট হইতে রাজকীয় মর্য্যাদা আদায় করিয়া লইবার জন্যই সে বসিয়া আছে; প্রাপ্য না দিয়া উপায় নাই। পৃথিবীর বহু নরপতি যে সম্মান দুরাশাতেও আশা করিতে পারেন না, এই আস্ত-উদ্ধদনয়ন, অর্দ্ধ উলঙ্গ ফকিরটি অনায়াসেই তাহা লাভ করিতে অভ্যস্ত।' [হাফ-নেকেড ফকির।]

আজ খদ্দর সূক্ষ্ম ও মসৃণ হইয়াছে; কিন্তু খদ্দরের প্রথমকালে খদ্দর পরিধান করিয়া ভদ্রস্থ হওয়া সম্ভব হইলেও খদ্দর ছিল মোটা, রেঁড়ো ও অমসৃণ। 'বুনো' ঘোড়া 'ব্রেক' করিতে সেকালের কুক্ বা হাট রাদার্সকে যে পরিমাণ বেগ পাইতে হইত, তদ্ধর হইবার বাসনায় খদ্দরধারণোদ্যোগীকে তদ্রূপেশ 'ব্রেক' করিতে আমাদিগকে তদপেক্ষা কম বেগ পাইতে হয় নাই। সেকালে খদ্দরে 'বাবু' সাজা সাধ্যাতীত ছিল বলিলে বেশী বলা হয় না। গান্ধীজীর অবশ্য বাবুয়ানির বালাই নাই (কটীবাস বাবুয়ানির বিপরীত বিকাশ), তিনি বিলাতের ব্যাকিংহাম প্যালেসের অধিশ্বর-অধিশ্বরীকেও খদ্দরেই 'শ্রদ্ধ' করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, তাঁর পুত্র বিশ্ববিশ্রুত জওহরলাল, আমাদের ষতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসুকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন, তাঁরা কখনই অম্লিকে আজ্ঞন্ন করিতে পারে না—খুব্বেও ভদ্র ভাঁড়িয়া পড়িতে পারে। ষতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উত্তর শিরে গান্ধীজী একদা একসঙ্গে তিনটি শিরোপা চাপাইয়া দিয়াছিলেন। সেদিন, ষতীন্দ্রমোহন ছিলেন বাঙ্গলার কংগ্রেসের নেতা, আইন সভায় কংগ্রেসের দলপতি ও কলিকাতার মেয়র: একই সময়ে তিনটি সম্মানজনক পদের অধিকারী। আমাদের প্রাচীন কাব্যাদি গ্রন্থে পুরুষের রূপের একটা মান (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) ছিল, সেকালের সমাজে সেই রূপের একটা মান (মর্য্যাদা) ও ছিল। আজ পুরুষের রূপের ত কথাই নাই, নারীর রূপ বর্ণনাও অচল এবং কালে কালেই অমূল্য। অবশ্য বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত পরিণতি বটে! সাহিত্য সমাজের মুকুর! সমাজে যাহা আছে, সাহিত্যে তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়; সমাজে যাহা নাই, সাহিত্যে তাহা আসিবে কিরূপে? যেদিন দেশে খাদ্যের অভাব হইয়াছে, রূপের বিদ্যা সেইদিন অন্তর্ধান করিয়াছে। আজ দুর্ভিক্ষ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে বটে; কিন্তু সূচনা বহুদিন পূর্ব্বেই হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষকবলিত দেশের কবি সুধার আলা অঙ্কিত করিতে পারিলেও রূপ-জ্যোতিঃ তাঁহার ধারণার অতীত। আজ যদি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সশরীরে আবির্ভাব করিতেন, তাহা হইলে প্রতাপ রায় কিম্বা শৈবলিনী থাকিতে তাঁহার বিশ্বিজয়ী লেখনীও অবশ ও অলস হইত। যাক্ সে কথা।

ষতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত রূপের মানও পূরণ করিয়াছিলেন, প্রাপ্য মান ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘোন্নত দেহ, বিশাল বক্ষঃ, গৌর বর্ণ, সুকুমার আনন, খর নাসা, আয়ত লোচন, আজানুলম্বিত বাহু মোটা খদ্দরের চাপে বিবর্ণ বা মলিন না হইয়া উজ্জ্বল বিভায় বিকশিত হইতেই দেখা যাইত। সেনগুপ্ত বারবার পাঁচ বার কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সদগুণরাশির তাঁহার অভাব ছিল না, কিন্তু স্বাভাবিক রূপও যে অনেকখানি কার্য্য আপনা হইতেই সাধিত, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কথায় বলে, পহেলা দর্শনধারী, পিছে গুণ বিচারী। কথা সঙ্গত। সুভাষের সম্বন্ধেও কথাগুলি খাটে; সর্ব্বাংশে না হৌক অংশতঃ নিশ্চয়।

গান্ধীজী, মৃত ও বিস্মৃতপ্রায় খদ্দরকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া, রাষ্ট্রসাধনার অঙ্গের সহিত খদ্দরের গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু, সর্ব্বত্যাগীর ভূষণ করিলেও সন্ন্যাসীর সেরূপ কদর্য্য অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না ইহা সকলেই জানে। কংগ্রেসী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, ঘর সংসার ভাসাইয়াছে, বিলাস বসন তাহাদের নিকট অস্পৃশ্য, তথাপি কংগ্রেস সন্ন্যাসীর আশ্রম বা উদাসীর মঠ হয় নাই। তাই গান্ধীজীর ভাল লাগে কি ভাল লাগে না, তাঁহার ইচ্ছা আছে কিম্বা নাই ইহার সন্ধান করিতে উদ্যোগ আয়োজন কেহ করে নাই এবং কংগ্রেস রাষ্ট্রের শক্তি অর্জ্জন করিয়া যতই শক্তিশালী হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের শ্রীবিলাসকও বাড়িয়াছে। কাহারও পক্ষে অলঙ্কার গ্রহণ একেবারেই নিরর্থক ও অবান্তর। সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ রূপের অভ্যন্তর বসুর মত ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত, সংমিশ্রিত ছিল।

ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ সুভাষচন্দ্রের হাতে আসিয়া পড়িল। লীগের শাখা প্রশাখা সুবিস্তৃত দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়াখণ্ডে পরিব্যাপ্ত। ভারতবর্ষীয় কংগ্রেসের অনুসরণে সেখানেও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের সাধনা চলিতেছিল। বৃটিশের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে পরাধীন জাতির মনে উল্লাস ও উদ্দীপনার প্রবল প্রবাহ সেখানেও প্রবাহিত। বৃটিশ-পরিত্যক্ত ভাগ্য-বিড়ম্বিত ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা, সেই সময়ে, সেই অবস্থায়, সেই পরিবেশে সহজ ও স্বাভাবিক হইলেও, সেই পরিবেশে, ভূমিমুক্ত রাজ্যে একটা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে রাজসিকতা, তাহার শ্রীবিলাসক ও চাকচিক্য কেবলমাত্র সুভাষচন্দ্রেরই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত তাহা আমরা নিঃসন্দেহে, দৃঢ়তার সহিত নিশ্চিত অনুমান করিতে পারি। পরবর্ত্তে ভূমিমুক্ত রাষ্ট্র গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইতে ক্যাবিনেট সংগঠনের যে উদ্যোগ, তাহাও সুভাষচন্দ্রের

অন্তরের দুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। অধিক, ব্যোমকেশ এক যুগাধিককাল পূর্বে তাহার সুচন্দ্র এই কলিকাতা সহরেই দেখিয়াছিলেন। দুই আর দুই যেমন চার হয়, পাঁচ কিছুতেই হয় না, তেমনই সেদিনের সঙ্গে আজার হিন্দু সভ্যসংঘের প্রতিষ্ঠার মূলের সামঞ্জস্য অস্বীকার করা অসাধ্য।

আমরা সকলেই জানি, সুভাষবাবু কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হইয়াছিলেন। একবার—বোধহয় ১৯২৮ সালে, তাঁহাকে মেয়র নির্বাচিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বাক-বিসম্বাদের ফলে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া বি, কে, পাল (আমাদের 'মিঠা' বিজয়কুমার বসু) মেয়র নির্বাচিত হন। ইহার আড়াই বৎসর পরে, সুভাষবাবু যখন কারাগারে আবদ্ধ (আগষ্ট ১৯৩০) তখন তিনি মেয়র নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মেয়রগিরি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। কারামুক্ত হইয়া কয়েকমাস কাজ না করিতেই পুনরায় কংগ্রেসীর স্থায়ী আবাস—রাজার অতিথিশালায় আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয়। গান্ধীজী যেমন একটিবারমাত্র কংগ্রেসের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই কাজ এবং তদবধি সভাপতি প্রস্তুতকারক (সূত্রকার?) থাকিয়া সন্তুষ্ট আছেন, কলিকাতা কর্পোরেশনেও সুভাষবাবু তদ্রূপ মেয়র-মেকার থাকিয়াই খুশী। চিত্তরঞ্জন দাশ দুইবার, ষতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পাঁচবার, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দুইবার মেয়র হইয়াছেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু ঐ একবারই, তা'ও ঐ কয়েক মাসেরই জন্য।

মেয়র—মহানগরীর সর্বপ্রধান নাগরিক, পদটি সম্মানার্থ এবং বিশেষ মর্যাদাব্যঞ্জক। লণ্ডনের মেয়রকে লর্ড মেয়র বলা হয়। লর্ড মেয়রের পদের অসামান্য মর্যাদার কথা আমাদের পাঠক-সমাজের অবিদিত থাকিবার কথা নহে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের আমূল সংস্কার সাধন করিয়া যে মনস্বী ব্যক্তি লণ্ডনের ধাঁচে মেয়র পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জন্ম ও কর্মস্থান কলিকাতা মহানগরীর মেয়র পদটিকে অনুরূপ সম্মানমণ্ডিত করিবার বাসনা পোষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বলিখিত জীবন কথায় 'এ নেশন ইন দি মেকিং'এ তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। লণ্ডনের লর্ড মেয়রের ব্যাপারেই লর্ড মেয়রের ভিন্নার ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। হয়ত ধনিক ভারতবর্ষের মেয়রগণকেও সেই 'টাগদিক' মজ্জালিকা-স্রোতে ভাসিতে হইত কিন্তু দরিদ্রনারায়ণের সেবাধর্মে অনুপ্রাণিত বৈকল্যধর্মাবলম্বী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ লণ্ডনের প্রাণবাহিনী টেমস্ নদীর পরিবর্তে সময়রাঞ্চকুল উদ্ধারিণী স্বর্গমন্দাকিনী পুতধারিণী ভাগীরথীর পুণ্যস্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। লর্ড মেয়রের চিত্র সেই স্রোতে কোথায় যে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার হদিস পাইবার উপায় নাই। প্রসঙ্গতঃ এ কথাটা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, ইংরাজের সহিত ভারতবর্ষের যখন জান্ পয়ান্ত ছিল না, আমাদের ভারতবর্ষের বহু নগরে তখনও মেয়রের উচ্চাসন ছিল এবং নাগরিকগণ যোগ্য ব্যক্তিকে মেয়র নির্বাচন করিত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্ত গৌরব উদ্ধার করিয়াছেন মাত্র। মেয়রগিরি ইংরাজের অভিনব দান বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

সুভাষচন্দ্র বহু মেয়র। একদিন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, কর্পোরেশনে একটা রিসেপশান্—পরিচয় সভা—অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। পরিচয়-সভায় কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা কর্পোরেশনের সমস্ত কর্মচারিবৃন্দকে মেয়রের সহিত পরিচিত করাইবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবটি বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে যে না পারে এমন নহে। এক সময়ে এই সুভাষচন্দ্র বসু এই কর্পোরেশনেরই প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন; পরে ডাউলিলার অথবা অল্ডারম্যান ও ভিন্ন ভিন্ন কমিটির সদস্য হিসাবে বহুকাল হইতে কর্পোরেশনের সহিত প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত আছেন। সমস্ত কর্মচারিদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহকর্মী অথবা সহকারী ছিলেন, এখনও আছেন; অধিকন্তু প্রায় সকলেই সুপরিচিত। এরূপ ক্ষেত্রে ও এমন অবস্থায় রিসেপশানের প্রস্তাব কেন, বাস্তবিক কেমন-কেমন! কিন্তু মেয়র যখন বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন তখন তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করাই যুক্তিসঙ্গত। প্রস্তাব কাহার ভাল লাগিল, কাহার লাগিল না; কে কি বলিল না বলিল, ইহা নিতান্তই অবান্তর।

এইখানে একটা মজার গল্প বলি। গল্পটি আমি সুভাষবাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে, সুতরাং গল্প হইলেও গল্পটি বিশ্বাসযোগ্য। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত "করওয়ার্ড" পত্রের তখন ভারি বোল্ বোলাও। সুভাষচন্দ্র বসু "করওয়ার্ড"-এর কর্ণধারক। কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত একটা লেন-দেনের সম্পর্ক "করওয়ার্ড" পত্রের ছিল – সকল সংবাদপত্রেরই থাকে। কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে যে কর্মচারীটি 'মাল' সরবরাহ করিত, সেই ব্যক্তি কিছু 'উপরি' আদায় করিত, সকল ক্ষেত্রেই তাহার বাঁধা অধিকার। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, সংবাদ সম্পর্কে সংবাদপত্রের সম্পাদক যেমন সর্বনিরঙ্কুশ, তাগিদ খাইতেও তিনি, লোককে চতুর্বর্গ—খুশী করিতেও তিনি, "ঐ যাঃ!" হারাইয়া ফেলিতেও তিনি। পয়সা কড়ির ব্যাপারে তেমনই ম্যানেজারই 'শেষ কথা।' কর্মচারীটি "করওয়ার্ড" পত্রের ম্যানেজারের নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য 'উপরি' আদায় করিত। সে-কি ছাই কল্পনাতেও আসিতে পারিয়াছিল যে খদ্দরের কাপড়ের আশিস হইতে ঐ শুভ্রাগুম্বরক ছোকরা অচিরকালমধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের সর্বাধ্যক্ষ হইয়া বসিবে। তাহার চিরাচরিত 'কেল কড়ি মাখ তেল' নীতির প্রয়োগে "করওয়ার্ডে"র ম্যানেজারকে কোনও সময়ে বোধ করি একটু বেশী মাত্রায় উত্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। ছিনে জোঁকের মত, জলৌকা জালার আকার ধারণ না করা পর্যন্ত শোষণের বিরাম ছিল না। সুভাষবাবু যখন চক্ষু তাড়িসে (চীফ একজিকিউটিভ অফিসার) বসিয়াছেন, তখন একদিন কার্যব্যপদেশে নিরীহ জলৌকায় এক্ষণ। চীফের ঘরে তখন অন্যান্য কর্মচারীও ছিলেন। চীফ সকলকে একে একে 'ছুটী' দিয়া, সর্বশেষে সেই ব্যক্তির ফাইল ধরিলেন। ফাইল ও ছাই-পাঁশ! চীফ মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিতেই তাহার অন্তরাত্মা খাবি খাইতে সুরু করিয়াছিল। কেশরিরূপ কোন্ অজ্ঞাতদর্শন ব্যক্তির মুখ দেখিয়া প্রত্যূষ হইয়াছিল, তাহারই হিসাব নিরাকরণে সে যখন আকাশ পাতাল চিন্তায়, চীফ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নাম কি···এই নহে? রক্তশোষণকারী জলৌকা মুহূর্তে সিক্ত-মার্জার। সবিস্ময়ে নিবেদন করিল, আজ্ঞে হুজুর।

পিতামাতা ঐ নামই রাখিয়াছেন। প্রশ্ন হইল, আমি যখন "কয়েদখানে" ছিলুম, আমার কাছে কাপনি প্রায়ই যেতেন, মনে পড়ে কি? অষ্টধাতু তখন চৈত্র বৈশাখের বাঁকুড়া জেলার বাস্তুঘুঘু; অন্তরবাহু হাঁড়া নিবার দুই-কাটার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আজেন নায়ক বস্তুটি (যদি থাকিয়া থাকে) স্নায়ুকের আওতায় কবিবার উপক্রম করিতেছে; অজ্ঞাত অদৃশ্য স্থানে বসিয়া টাইফয়েডের রোগীর গুরু মাথুকী মাথা চালিতেছে; পাকতলে ধরিত্রী টলমল—টলমল করিতেছে। এমনই এই মুহূর্তে, ঐ সময়ের একটি টানে চারুবাবুর জীবনের অন্তই "শেষ রজনী" হইতে পারে—চারুবাবু-সহিত বাঙ্গালীর মানসিক অবস্থা যে লোক না বুঝিতে পারে তাহার বাঙ্গালী জন্মই বৃথা, বাঙ্গালী জীবনই ব্যর্থ। বাঙ্গালী চীফও তাহা না বুঝিবেন কেন? বলিলেন, যা করেছেন—করেছেন; আর করবেন না; মাইনেতেই সন্তুষ্ট থাকবেন, 'উপরি'র সন্ধান করলে চাকরী থাকবে না। লোকটি নাকি কথাগুলি কিরিঙ্গি পতন মূর্চ্ছা' হইয়াছিল। তাহার পর একমাস ঘরে দুখিয়াছিল। ঘরের মধ্যে কেবল দুপ বর্ষিত; ধলিত, ইস্। কে জানে যে সে এই! 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশ "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল" ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হইয়াছিল; এই লোকটিও "এই সেই, সেই এই" ভবে বাড়ীর লোককে দুশ্চিন্তিত করিয়া কেলিয়াছিল।

কর্পোরেশনের চীফ কে-সি-মুখার্জি মনে মনে যতই হাস্য করিতে থাকুন, (অবশ্য হাস্য করিয়াছিলেন কি-না তাহা আমি দেখিতে যাই নাই; তিনিও আমাকে সাক্ষী রাখিয়া বন্ধুকচিকৌমুদী করেন নাই) মেয়রের বাসনা চরিতার্থ করিতে বিলম্ব করিলেন না। কবে, কোথায় ও কোন্ সময়ে রিসেপসান্ হইবে এবং কোন্ কোন্ কর্মচারী মেয়রের সম্মুখে উপস্থাপিত হইবেন, কে আগে কে বা পরে, তাহার তালিকা প্রস্তুত হইতে লাগিল। কর্পোরেশনের কর্মচারী—শুধু কর্মচারী কেন, কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোকই যেন সচকিত হইয়া উঠিল। একটা মস্ত উপঢৌকন করিবার উপলক্ষ জুটিয়া গিয়াছে বলিয়া আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল। নূতন লাট সাহেব আসিলে রিসেপসান হয়, তাহারা জানে; লাট সাহেবরা জেলায় গেলে রিসেপসান হয় ইহাও তাহারা শুনিয়াছে। কিন্তু মেয়রের রিসেপসান, অভিনব বটে! যাহাই হৌক, রিসেপসান যেন আঁকড়কের সহিত—হইয়া গেল। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সমস্ত কর্মচারিদের একে একে মেয়রের সহিত করমর্দ্দন করাইয়া দিলেন। "পরিচিত করাইয়া দিলেন"—এই কথাগুলি আমি ইচ্ছা করিয়াই লিখিলাম না; লিখিলে মিথ্যা বলা হইত; কারণ মেয়রও সকলের সুপরিচিত; কর্মচারীও প্রায় প্রত্যেকেই মেয়রের পরিচিত।

যে কথাটি বলিবার জন্য এতখানি ভূমিকা করিলাম এবং প্রবন্ধ-সূচনাতে যে কথা বলিয়াছি, এখন সেই কথায় ফিরিয়া আসিতে হয়। আঁকড়কের প্রতি সুভাষচন্দ্রের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল; আমাদের সোলোকবাসিরা বলিয়াছে, ৺ গত মাসে আপনারা তাহা পাঠ করিয়াছেন।) উহার ফলে বন্দীজীবন শিবিরের পক্ষে একান্ত অনাবশ্যক ও অশোভন (অবশ্য সোলোকের মতে।) হইলেও, রাতারাতি ক্যাম্প কমাণ্ডেণ্ট, ডেপুটি কমাণ্ডেণ্ট, এসিষ্টাণ্ট কমাণ্ডেণ্ট, এ্যাডজুটাণ্ট, এটাচি ভক্ত হরেক রকমের পদস্থ রকম বেরকমের পদবী সৃষ্টি হইয়া গেল। শিবির হইতে তের মাইল দূরে পোর্টব্লিয়ারের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য মেল্ রাণার সিষ্টেম প্রবর্ত্তিত হইল। বাদির কথা বলিব আর কত? প্রকাণ্ড একটা গোটা ষাঁড় আসিয়া গেল। কি না, খাবার জন্য দিতে হইবে! ষণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে খানা, ব্রান্ডি হাতে ফল্ ইন। এ কি স্কুল, না কলেজ, না পুলিশের কাঁড়ী যে প্রকাণ্ড ব্ল্যাক বোর্ড আমদানী করিবার দরকার হইয়া পড়িল? ক্যাম্প কমাণ্ডারের ক্যাম্পের মেওয়ালে ব্ল্যাক বোর্ড বিলম্বিত—সকালে নোটিশ, বিকালে বিজ্ঞপ্তি, সন্ধ্যায় ইস্তাহার, নিশীথে জরুরি বিজ্ঞপ্তি! বিবাহ যেমন-তেমন হৌক না কেন, তিন পারে আলতার বহর দেখে কে?

মোলোকের লোকেরা যাহাই বলুক না কেন, সুখদা-সুবিস্তৃত শিবির পরিচালনার ভিতর হইতে যথা কাচের কানুসে আবৃত আলোকের রশ্মির মত চাকচিক্য ও আঁকড়কের বিকীর্ণ হইতেছিল, নিতান্ত অন্ধ ব্যক্তিরেকে কাহারও চক্ষু এড়াইতে পারে না। বলা বাহুল্য সমস্তই সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা।

হইলই বা বরাষ্টমান শিবির। যুদ্ধের সাহায্য করিতে আসিয়া দুঃখ সহিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা সাহায্য করিতে আসিয়াছে তাহাদের উপর সদয় না হইলে সাহায্যের সম্পূর্ণ সুফল লাভ হইতে পারে না। দুঃখীর ঘর-করণার পানে দুঃখী খুব ভরসাপূর্ণ নয়নে চাহিতে পারে না। শিবির সদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইলে তবে না আর্ত্ত, আতুর দুঃখ ভরসা করিবে; প্রত্যাশা করিতে পারিবে; মনে বল পাইবে। দুঃখীর যাচকতা করিলে চলিবে না, শিবিরকে শিবির করিতে হইবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ করিতে চলিয়াছে। প্রতিপক্ষ প্রবল, প্রভূত পরাক্রমশালী, বলবল, জলবল, অস্ত্রবল সহস্রগুণ অধিক। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান। জলে তাহার জাহাজ, লঞ্চবোট, টর্পিডো, মাইন; স্থলে ট্যাঙ্ক, গান্, কামান; বিমানে তাহার ফাইটার, বিমান। তুলনায় আজাদ হিন্দ ফৌজ অতীব নগণ্য। অস্ত্র অপ্রতুল, যোদ্ধাদের প্রাণের উপরে মমতা বলবান। কোথায় গান্, কোথায় ট্যাঙ্ক, কোথায় বিমান! নেই কি!

জাপানীর আছে—সবই আছে; কিন্তু তাহাতে ইহাদের কি! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনেক টাকা, তাহাতে কাহার কি! আশা যদি যুক্তির এই পাশ্চিমের সহায়তায় ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশকে খেদাইয়া খেদুমণিদের সিংহাসন দখল করা হইবে তাহা হইলে ফলাফল সুফলাই হইত; কিন্তু সুভাষ বোসের হাতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা দেখিয়াই সুখদয় ভয় হইয়াছে; জাপানী হাত গুটাইয়াছে। মনুলের আশা থাকিলে তবে না গাধাকে ধাবন দেয়। আজাদীর কিন্তু নাই, তবু সব আছে। কেননা জন্মভূমির পৃঙ্খল মোচনের ব্রত ধারণ করিয়াছে। চড়া সুরে বাঁধা তারের সেতার। ঝিঙ্কার গান গাহিবে না; বিনতির সুর বাজিবে না; যাচ্ঞার বাজনা বাজিবে না।

সুভাষ বলিয়াছিলেন, তোমরা দেহের শোণিত দাও, আমি তোমাদের

স্বাধীনতা দিব। তাহারা তাহাতেই সম্মত হইয়াছে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাহাদের শোণিতের প্রয়োজন আছে; নেতাজী বলিয়াছেন, শোণিত দিতে হইবে; তাহারা শোণিত দিতে চলিয়াছে এই মাত্র। শোণিত দানের পর স্বাধীনতা আসিল কিংবা আসিল না, তাহা তাহারা দেখিতে আসিবে না; তাহারা স্বাধীনতা আনিতেও চাহে না। নেতাজী বলিয়াছেন, স্বাধীনতা আসিবে, তাঁহারা স্থির বিশ্বাসে বুঝিয়াছে, স্বাধীনতা আসিবে। স্বাধীনতা কে ভোগ করিবে সে সমস্যা তাহাদের নহে। তাহারা জন্মভূমির—মাতৃভূমির বন্ধন মোচন করিতে উদ্যত; পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নও তাহাদের নহে; তাহারা জাতীয়তার শোণিত স্বাধীনতা ক্রয় করিতে হইবে; তাহারা মূল্য দিতে চলিয়াছে। অন্য চিন্তা তাহাদের নাই; অন্য চিন্তা তাহারা করে নাই।

কিন্তু তাহাদের নেতাজী অন্য চিন্তাও করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়েই আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইউরোপ ও এসিয়ার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অক্ষশক্তি-অন্তর্ভুক্ত যতগুলি রাজ্য ও রাষ্ট্র ছিল, বিশ্ব রাষ্ট্রকে তাহাদের সমতুল্য বিজ্ঞাপিত করিয়া রাষ্ট্রোচিত মর্য্যাদা দাবী করিলেন। ধন্য, সুটেরা, চেম্বারলেনের দল ভারতবর্ষ জয় করিতে চলিয়াছে, সুভাষচন্দ্রের রাজ-অন্তঃকরণ এই হীনতা,হীনতা, এই মর্য্যাদাসূন্য আপনার সহিতে পারিল না। আমি মনে করি, এই সময়ে সুভাষের সহিত সুভাষের একটা বিনাশন অন্তর্দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। যে ইতাশ তাহার ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অধিনায়করূপে ভারতবর্ষকে বিদেশীর কবল হইতে উদ্ধার করিতে চলিয়াছে, আর যে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের অতীত ও ভবিষ্যতের মর্য্যাদার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি, এতদুভয়ের বিরোধ হওয়া স্বাভাবিক বলিয়াই আমি মনে করি। ইতিহাস শিবাজীকে লুটেরা, চেঙ্গিজ ও দস্যু নামে অভিহিত করিতে লজ্জা বোধ করে নাই। সুভাষচন্দ্রের অন্তরের যে রাজর্ষি-সুভাষের মূর্ত্তি ছিল, বিদ্রোহে—অন্তর্বিরোধে—তাহারই জয় হইল। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিল। জার্মানী, জাপান ও ইতালী স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রকে স্বীকার করিল; সমান মর্য্যাদা দিল। সুভাষের বাসনা পূর্ণ হইল।

ভুলাভাই দেশাইয়ের কথা এইখানে মনে পড়িতেছে। অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি ভুলাভাই, উচ্চ রসজ্ঞতার পরিচায়কস্বরূপ সামরিক আদালতে বিচিত, নিন্দিত ও নির্য্যাতীত মানবের মহত্তম অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে প্রতিভা, যে মানবিকতা ও যে বাগ্মিতার প্রখর রবিরশ্মি বিকীরণ করিয়া গিয়াছেন, সুসভ্য পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা অপূর্ব্ব ও অভিনব। শৃঙ্খলিত দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনের অধিকার আছে; রজ্জুবদ্ধ গো, অশ্ব-মহিষেরও সে অধিকার আছে; পিঞ্জরে আবদ্ধ বিহঙ্গেরও মুক্তি কামনায় পিঞ্জর ভেদ করিবার অধিকারী; সর্পেরও ফণা তুলিবার অবাধ অধিকার আছে; অধিকার নাই কেবল পরাধীন ও পরপদানত মানবের। সৃষ্টির আদি হইতে সৃষ্টির অন্তকাল পর্য্যন্ত তাহার মুক্তি-সাধনার ধারা, চিরন্তন। পরাধীন মানব সভ্যজগতে করীন্দ্রুক কলিঙ্গবৎ বাহিতে বাধ্য। তাই পরাধীন মানবজাতির মুক্তি প্রচেষ্টা সভ্যতার ভূলাদণ্ডে অমর্য্যাদনীয় মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত। ভুলাভাইয়ের স্মৃতি অক্ষয় হৌক। বিশ্ব-বিজয়ী বৃটিশের সামরিক আদালতে তিনি পাণ্ডিত্য প্রকর্ষে, তর্ক ও যুক্তিতর্কের প্রয়োগে প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন যে, জড়জগতে যাহাই হৌক না কেন, জীবজগতে পরাধীনতার বন্ধনপাশ মোচনের চেষ্টা জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, মহান ব্রত, চরম ও পরম সাধনা। যে জীব সে ধর্ম্মাচরণে বিরত, মহান ব্রত উদ্‌যাপনে পরাঙ্মুখ, সাধনায় উদাসীন, জীবজগতে সে ঘৃণ্য। পক্ষান্তরে, ব্রতধারী যে মানব ধর্ম্মসাধনা করিয়াছে, সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ যাহাই কেন হৌক না, জীবজগতে সে বরেণ্য। মানবের শ্রেষ্ঠ ব্রত পালনে যদি জীবনবিসর্জনও ঘটে, অনন্ত পুণ্য ও অক্ষয় স্বর্গ তাহার আয়ত্তাধীন। পৃথিবীর বিজিত ও পরাধীন মানুষ ভুলাভাই দেশাইয়ের কথা শুনিয়া ধন্য হইয়াছে। সামরিক আদালত যত সমরণ করিয়াছে; যতপ্রকার অপরাধীত্বকে ধূলিসাৎ করিয়াছেন। স্বর্গে যদিও দেবতারা থাকেন, তাঁহারা ভুলাভাইয়ের শিরে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন। তাই দেখি, সামরিক আদালতের বিচার শেষে স্বর্গের স্বর্ণমণ্ডিত পুষ্পকরথ মহারথী ভুলাভাইকে লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ধন্য ভুলাভাই, ধন্য তুমি! এই ভাইটিকে ভারতবর্ষ ভুলিবে না।

এই স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রই ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে। তাহারও পক্ষে বীরত্ব বা মর্য্যাদাহানির কথা আসে উঠিতে পারে না। বাঘ-ষোড়ের খেলায় রাজাকে রাজাই মারিতে পারে; মন্ত্রীকে মারিতে মন্ত্রীর দরকার হয়; হাতীকে হাতী দিয়া, ঘোড়াকে ঘোড়া দিয়া, নৌকাকে নৌকা দিয়া টিপিতে হয়—নহিলে খেলায় নিয়ম ভঙ্গ হইয়া পড়ে; সম্মানের হানি হয়।

রাষ্ট্রের সঙ্গে জাতিগঠনের ও চারিত্র্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন। সাম্রাজ্যবিরোধী, সর্ব্বত্যাগী কংগ্রেসী হাইলেও সুভাষের মধ্যে 'দুষ্ট' রাজনিকতা, তাহাও এই সময়ে পরিপূর্ণ মৌরবে আপনাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। রাষ্ট্র বহু বিভাগে বিভক্ত হয়। রাজস্ব বিভাগ, শাসন বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, যুদ্ধ বিভাগ। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টেরও বহু বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগে মন্ত্রী নিযুক্ত। মন্ত্রীরা সকলেই বিশ্বাসী, সুযোগ্য। দুঃখের বিষয় আজ—রাজর্ষির রাষ্ট্রতন্ত্র!

সুভাষ গঠিত রাষ্ট্রতন্ত্রে, নারীও পুরুষের সহিত সম মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর নেত্রী লক্ষ্মী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের অন্যতম পরিচালিকা। নব-ভারতের স্রষ্টা, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে নারীর দাবী অস্বীকার করিলে, ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মর্য্যাদা যেমন ক্ষুণ্ণ হইত, আফ্রিকার পৃথ্বীরাজও তেমনই অবজ্ঞা করা হইত। সমগ্র এসিয়ার যিনি জাগ্রত মন-জীবনের, নবীন ও দুরাগত জগতের গান শুনাইয়াছেন, তাঁহার রচিত রাষ্ট্রতন্ত্র পক্ষপাতদুষ্ট বা একদেশদর্শী হইতে পারে না।

জয় হিন্দ

জয় হিন্দ

পথ-হারা

শ্রীবিমল বসু

বসন্ত-উৎসব। শীতের শীর্ণতা ও রুক্ষতা শেষ হয়ে গেছে। সরসতার ও বর্ণের স্পর্শ লেগেছে বনে বনে পথে প্রান্তরে আর মানুষের মনে। দলে দলে নরনারী চলেছে বিচিত্র বসনে, কণ্ঠ ভরে উঠেছে আনন্দ-গানে। আনন্দে প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে—কথায় কাজে চলায় ফেরায় পোষাকে প্রসাধনে। অসংখ্য নরনারী চলেছে—কেউ গাড়ীতে, কেউ ঘোড়ার পিঠে, কেউ পাল্কীতে, কেউ বা পদব্রজে। বসন্ত-উৎসবের মেলা যেখানে, অসংখ্য নরনারী চলেছে সেখানে। একটি ছোট্ট ছেলে তার মা আর বাবার সঙ্গে হেঁটে চলেছে। বসন্তকালের বাতাসে, সকাল বেলাকার রোদে, বনে প্রান্তরে পুষ্প শোভার যে আনন্দ-আহ্বান, ছোট্ট ছেলেটির হাসিতে খুশিতে দ্রুত চলা ফেরায় তারই ছায়া ও প্রাণস্পর্শ।

পথের ধারে একটা পুতুলের দোকান। চলতে চলতে খোকা থমকে দাঁড়াল রঙীণ পুতুল দেখে।…'ওরে খোকা আয়, চলে আয়…' মা ডাকলো খোকাকে। তার বাবাও যোগ দেয় সে-ডাকের সঙ্গে। অনিচ্ছার সঙ্গে খোকন এগিয়ে চলে পায়ে পায়ে। পুতুলটাকে নেবার তার ইচ্ছা খুব। মনটা কেমন করে রঙীণ পুতুলটার জন্যে। কিন্তু সে জানে তার মা-বাবার কঠোর নিষেধের দ্রুভঙ্গির কাছে তার এই চাওয়াটা নিমেষে মিথ্যা হয়ে যাবে। তবু সে আবদারের সুরে বলে: 'আমি ঐ পুতুলটা নেবো…'

তার বাবা তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকায়। মায়ের মন খুশিতে কোমল আবেগে ভরা, বসন্ত-উৎসবের আনন্দ গুঞ্জন, সকাল বেলাকার বসন্ত বাতাসের স্পর্শ তার মনে কোমলতার আবেশ এনেছিল। তাই মা খোকনকে ভোলাবার জন্যে বলে উঠলো: 'দেখ, খোকন, সামনের দিকে চেয়ে দেখ।'

পুতুল না পাওয়ার জন্যে তার ছোট্ট মনে যে অভিমান আর ক্ষোভ জেগেছিল তা নিমেষে ধুয়ে মুছে গেল—মায়ের কথা মতো সামনের দিকে তাকিয়ে। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে সোনার বন্যা যেন। গলে যাওয়া সোনার ম্লান আভায় সারা মাঠ ভরা। সরষের ক্ষেত। সেই দিগন্ত বিস্তৃত সোনালী ঢেউয়ের পাশেই একটা সরু নদী বয়ে চলেছে গলে-যাওয়া সোনার ম্লান আভা বুকে নিয়ে। অশান্ত বাতাস এসে মাঝে মাঝে ঢেউ তুলছে এই সোনার সমুদ্রে, নদীর জলের সোনালী ছায়ায় লাগছে তার কাঁপন। নদীর ধারেই অনেকগুলো মাটী ছাওয়া ঘর। দূর থেকে সব ছবির মতো আঁকা মনে হয়। সেখানেই হলদে পোষাক-পরা অসংখ্য নরনারীর আনন্দ-কণ্ঠের বিচিত্র ঐকতান। একটা অদ্ভুত আনন্দ-গুঞ্জন যেন মাঠ নদী বন পেরিয়ে উর্দ্ধে নীল আকাশের বুকে আঘাত জানাবার চেষ্টা করছে। খোকনের চোখ আনন্দে ভরে উঠলো। অদ্ভুত আনন্দ-অনুভূতি জাগলো তার একবার। একবার চকিতে সে তার মা বাবার মুখের দিকে তাকাল। দেখলো সেখানেও লেগেছে এই আনন্দ স্পর্শ। অনাবিল আনন্দে তার চোখ দুটো যেন নেচে উঠলো। চঞ্চল পদে সে নেমে এলো পায়ে-চলা পথের ওপর। দূর প্রান্তর থেকে নাম-না-জানা ফুলের মিষ্টি গন্ধ বাতাসকে মধুরতর করে তুলেছে। অজস্র ফুল, আর নানা রঙের মৌমাছি আর প্রজাপতি দেখে খোকন পথ থেকে নেমে এলো মাঠে। রামধনু রঙের প্রজাপতিকে সে ধরবে, মধু-লোভী মৌমাছিকে সে বন্দী করে রাখবে তার ছোট্ট হাতের মুঠোর মধ্যে। দ্রুতপদে সে অনুসরণ করে চলেছে কখনও প্রজাপতিকে, কখনও মধু-লোভী মৌমাছিকে। সমস্ত প্রকৃতি, মাঠ, বন, ফুল, পাখী, মৌমাছি, প্রজাপতি যেন, খোকনকে হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। মায়ের ডাকে তার যেন স্বপন ভাঙে—'খোকন, পথের ওপর এসো,…খোকন।'

কিছুক্ষণ সে তার মা বাবার সঙ্গে চলে কিন্তু আবার সে পেছিয়ে পড়ে। পথের ধারে নানান ধরণের বিচিত্র বর্ণের কীটপতঙ্গ দেখে সে থমকে দাঁড়ায়। সকাল বেলাকার রোদ পোহাবার জন্যে অন্ধকার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে বিচিত্র বর্ণের কীটপতঙ্গের দল, খোকন অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখে।

…'খোকন, এলো শিগগিরি'…আহ্বান আসে আদেশের স্বরে। চমক ভেঙে আবার সে দ্রুতপদে চলতে সুরু করে। দৌড়ে সে যায় তার মা বাবার কাছে। একটা লতাপাতায় ঘেরা কুঞ্জবনের মতো পরিচ্ছন্ন স্থান। তার কাছে একটা ইঁদারার পাড়ে বসে তার মা বাবা বিশ্রাম করতে সুরু করে। বট গাছের বিস্তৃত শাখা প্রশাখার তলায় সানন্দে জেগে উঠেছে নানান ধরণের ফুলের গাছ। ফুল ফুটে আছে অজস্র, যেন আত্মনিবেদন করছে নিজেদের সূর্য্য দেবতার কাছে। আর্দ্র বাতাসে ফুলের মিষ্টি গন্ধ মেশানো। বিচিত্র পরিচ্ছন্ন মনোরম সকাল। খোকন এ-সব চেয়ে দেখতে দেখতে নিমেষে ভুলে গেলো তার মা বাবার কথা। কুঞ্জবনে প্রবেশ করতেই দেবতার আশীর্ব্বাদের মতো অসংখ্য ফুল ঝরে পড়লো তার মাথায় কাঁধে, হাতে পায়ের কাছে। আনন্দে শিউরে উঠে সেগুলো সে কুড়াতে সুরু করলো। সহসা কোথায় ঘুঘু ডেকে উঠলো। আনন্দে সচকিত হয়ে সে ছুটে এলো তার মা বাবার কাছে, আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলো: 'বাবা…মা, ঘুঘু—ঘুঘু ডাকছে…।' তার হাত থেকে তার সযত্নে কুড়ানো ফুলগুলো তারই অজ্ঞাতে ঝরে পড়ে গেল। অবাক চোখে সে তাকিয়ে রইল তার মা বাবার মুখের দিকে। সে চোখ আনন্দ জিজ্ঞাসায় ভরা। কোথায় হঠাৎ ডেকে উঠলো কোকিল কুহু কুহু করে, সে আনন্দে চঞ্চল হয়ে দৃষ্টি ফেরাল সেদিকে।

…'খোকন আয়, আয় খোকন…' মা বাবার ডাকে তার যেন স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। তার মা-বাবা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে মেলার দিকে সরষের ক্ষেতের উপর দিয়ে পায়ে চলা আঁকা বাঁকা পথ ধরে। সেও তাদের অনুসরণ করে চললো। খানিক চলার পর তারা এলো একটা গ্রামের বহির্প্রান্তে। খোকন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো—মেলা-যাত্রী অসংখ্য লোকের ভীড়। ক্রমে এলো তারা মেলার প্রবেশ পথে। বিচিত্র কণ্ঠের সুরে সে স্থান মুখরিত। মেলার প্রবেশ পথেই বসেছে খাবারের সারি সারি দোকান, দোকানদার হাঁকছে: রসগোল্লা…বরফি…জিলাপী… দোকানটা চমৎকার করে সাজানো। খাবারগুলো কি চমৎকার ভাবে স্তরে স্তরে সাজিয়ে মন্দিরের চূড়ার মতো করে রেখেছে। চোখ বড়ো বড়ো করে খোকন তাকিয়ে রইল। অস্ফুট কণ্ঠে খোকন বল্লো: 'আমি বরফি নেবো…' কিন্তু প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় না থেকেই সে এগিয়ে চল্লো; কারণ সে জানতো বরফি চাইলেই তা সে পাবে না। তার মা বাবা বরং তাকে ধমক দেবেন পেটুক আর লোভী বলে।

…গোল-মোহরের মালা চাই, গোল-মোহরের মালা… ফুলওয়ালা হাঁক দিলো। বাতাসে ভেসে আসা ফুলের মিষ্টি গন্ধে খোকনের বুক ভরে যায়। স্তূপাকার করা ফুলের মালার দিকে এগিয়ে গিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে খোকন বলে:…'আমি ফুলের মালা নেবো…' কিন্তু সে জানে এ মালা চাইলেও সে তা পাবে না। তার মা বাবা বরং তাকে ধমক দেবে: 'দূর বোকা, এত সস্তা জিনিস কখনও মেয়…' তাই সে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে।

একটা বেলুনওয়ালা নানান রঙের বেলুন বিক্রি করছে। সুতোয় বাঁধা বিচিত্র বর্ণের বেলুনগুলো নেবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। অথচ এই ব্যস্ততা যে নিষ্ফল তাও সে বুঝল। হয়ত শুনে বাবা মা তাকে ধমক দেবে: বেলুন নিয়ে খেলবার আর দরকার নাই। তাই সে এগিয়ে চলে।…

সাপুড়ে বাঁশী বাজিয়ে সাপের খেলা দেখাচ্ছে। ঝাঁপির ভেতর থেকে একটা সাপ হাঁসের মতো গলা বার করে স্থির হয়ে বাঁশী শুনছে। বাঁশীর মিষ্টি আওয়াজে খোকন শুনতে পেলে ঝরণার ঝিরি ঝিরি কলতান। এগিয়ে গেল সে সাপুড়ের দিকে। তার পরমুহূর্ত্তেই তার মনে পড়লো সাপুড়েদের কাছে বাঁশী না শোনার জন্যে তার বাবা তাকে বারণ করেছিল। তাই খোকন পায়ে পায়ে আবার এগিয়ে চললো।…

এবার এগুতেই তার চোখে পড়লো ছোটদের সবচেয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ের জিনিস—নাগরদোলা, চক্রাকারে কত ছেলেমেয়ে কত নর-নারী দুলছে ঘুরছে। খোকন নিবিড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো তাদের দোলা আর আনন্দ উচ্ছ্বাস। আনন্দে উত্তেজনায় তার চোখ দু'টো নাচতে লাগলো। বিস্ময়ে তার ঠোঁট দু'টি আধ-খোলা হয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখতে দেখতে তার মনে হলো সেও নাগরদোলায় দুলছে, ঘুরছে। এই আনন্দে সাড়া না দিয়ে সে থাকতে পারলো

না। সমস্ত দ্বিধা আর সঙ্কোচ কাটিয়ে সে চীৎকার করে বলে উঠলো···'বাবা, আমি নাগরদোলায় চড়বো, ওমা, আমি নাগরদোলায় ঘুরবো'···কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে সে ফিরে তাকাল তার মা বাবার দিকে, কিন্তু কই তারা? সামনে নেই! পিছনে? কই নাতো! পাশেও নেই তো! কোথায় মা বাবা?···কান্না তার বুক ঠেলে শুষ্ক কণ্ঠ বেয়ে ওপর দিকে উঠতে লাগলো। হঠাৎ চীৎকার করে সে ডেকে উঠলো: বাবা! মা···। সে পাগলের মতো দৌড়তে সুরু করলো। ভয়-ভরা চোখ বেয়ে বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা পড়তে লাগলো। একবার এদিকে, একবার ওদিকে, কখনও সামনে কখনও পিছনে সে দৌড়তে লাগলো ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো—আর আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে ডাকতে লাগলো: বাবা গো বাবা, মাগো মা··· ভিড়ে সন্ধার তীক্ষ্ণকণ্ঠের তার সেই আর্তনাদ যেন সহসা আনন্দগুঞ্জনকে ছাপিয়ে ওঠে আকাশের বুকখানাকে বারংবার বিদীর্ণ করতে লাগলো। তার মাথার চুলে ছোট পাগড়ী খুলে একাকার হয়ে গেছে। ঘামে তার অতি চমৎকার পোষাকটা কাদা আর ধুলোয় মাখামাখি হয়ে গেল। তার পালকের মতো হাল্কা শরীর সীসের মতো ভারী ও কঠিন হয়ে গেল।

রাগে ভয়ে দুর্ভাবনায় খানিক এদিক ওদিক দৌড়ে শেষে হেরে গিয়ে সে হঠাৎ এক জায়গায় নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। চেঁচিয়ে কান্না তখন কোঁপানীতে পরিণত হয়েছে। অদূরে সবুজ ঘাসের ওপর দাঁড়ানো হলদে পোষাক পরা নরনারীকে সে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলো। তারা হাসছে, কথা বলছে। কিন্তু খোকন সেই অসংখ্য নর-নারীর মতো তার অতি পরিচিত ও প্রিয় দুখানা মুখকে কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারলো না।

দেবতার মন্দিরের কাছে বিরাট জনতা, অসংখ্য মানুষের আনাগোনা সে মন্দিরকে ঘিরে। সেদিকে হঠাৎ সে দৌড়ে গেল এবং জনতার স্রোতের মধ্যে যেন সহসা ঝাঁপিয়ে পড়লো। বড়ো মানুষদের পায়ের তলা দিয়ে কোন রকমে এগিয়ে যেতে লাগলো—আর চীৎকার করে ডাকতে লাগলো: বাবা! বাবা! মাগো! মা, মা···কিন্তু সেই আনন্দ উন্মত্ত জনতার উচ্ছৃঙ্খল আনন্দধ্বনির মধ্যে তার কণ্ঠস্বর যেন হারিয়ে গেল। অসংখ্য মানুষের পাদপীড়নের মাঝেও ব্যাকুল চোখে সে তার মা বাবাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। আনন্দ উন্মত্ত মানুষের পদাঘাতে পদদলিত হবে বাবার উপক্রম হতেই সে চীৎকারে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ভিজে ভিজে গলায় শেষবারের মতো ডেকে উঠলো: মা—মা! মা—মা! তার আর্তনাদ শুনতে পেয়ে একজন অতিকষ্টে নিচু হয়ে মাটি থেকে তাকে দুহাত দিয়ে ওপরে তুলে কোলে করে নিল।

সেই উন্মত্ত জনস্রোত থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে লোকটি তাকে উদ্দেশ করে দয়ার্দ্র কণ্ঠে বল্লে: আহা! কার বাছারে! কি করে এলি এই ভীড়ে···

খোকন কি তার উত্তর দেবে। সে শুধু কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগলো: আমার বাবা কই? বাবা! মা কই? মা···

নাগরদোলার কাছে গিয়ে লোকটি তাকে ভোলাবার জন্যে বল্লো: নাগরদোলায় চড়বে খোকা?···কান্নায় তার বুক ভরে আছে। সে শুধু বল্লো: আমি বাবার কাছে যাবো। মার কাছে যাবো···

সাপুড়ে তখনও সাপের খেলা দেখাচ্ছে। লোকটি তাকে নিয়ে গিয়ে বল্লে: শোন খোকন, কেমন মিষ্টি বাঁশী···খোকন কিন্তু চীৎকার করে কেঁদে উঠলো: মা কই? মা। বাবা কোথায়?

রঙীণ বেলুন দেখলে খোকন চুপ করবে এই ভেবে লোকটি তাকে নিয়ে গেল বেলুনওলার কাছে।···রামধনু-রঙের বেলুন নেবে খোকন?···

—'আমি বাবার কাছে যাবো, আমি মার কাছে যাবো'—খোকন বেলুনের দিকে না চেয়ে কাঁদতে লাগলো।

—'কি চমৎকার ফুলের মালা দেখো খোকন, কি মিষ্টিগন্ধ? একটা মালা গলায় দেবে?'···

—'মার কাছে যাবো, মা কোথায়?'···

—'চলো ঐ খাবারের দোকানে, মজা করে বরফি খাবে তুমি।'···

—'আমি মার কাছে যাবো, বাবার কাছে যাবে।'···

খোকন শুধু আর্তকণ্ঠে কাঁদতে লাগলো। *

* বিদেশী গল্প অনুসরণে।

স্বাধীনতার রূপান্তর—কোরিয়া

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীনের মত পূর্ব এশিয়ার আর একটি দেশও স্বাধীনতা হারিয়েছিল এক অন্তরূপে। তবে তফাৎ এই যে, এখানে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা খাঁটি পাততাড়ি গোটাবার আগেই এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপান খাঁটি পেতে বসেছিল। তার কারণ এই হতভাগ্য দেশটি জাপানের প্রতিবেশী, জাপান-সমুদ্রের পরপারে মাত্র ১১০ মাইলের ব্যবধানে এর অবস্থিতি। এই দেশটি কোরিয়া। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের শক্তি-সূর্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়ার স্বাধীনতার আলো নিভে যায়। জাপানের মতই কোরিয়াকে নিজস্ব সম্পদ বিদেশীর হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে হতে হয় রিক্ত, নিঃস্ব। অন্নের চিন্তাই কোরিয়াবাসীদের প্রবল হয়ে দেখা দেয়। দারিদ্র্যের চাপে তাদের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি লোপ পেতে থাকে। অথচ ভারত ও চীনের মতই কোরিয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বের একটি প্রাচীন তীর্থ ছিল।

কোরিয়া অধিকার করে জাপান দেখলে যে প্রাকৃতিক সম্পদে কোরিয়া ঐশ্বর্যশালিনী—এর মাটিতে ফলে সোনা, এর পাহাড়ে পাহাড়ে কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানীজ, তামার ভাণ্ডার। হাতের কাছে এই দেশটিকে তখন তারা শোষণে প্রবৃত্ত হল। মাটির ফসল গেল জাপানীদের খাদ্য হয়ে, আর খনিজ-সম্পদ গেল তার শিল্পায়নে পরিকল্পনার যোরাক জোগাবার জন্য। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে কুটনৈতিক যদি ভারতকে শোষণ করতে পারে তাহ'লে মাত্র একশো মাইলের ব্যবধানের দেশে জাপানই বা শোষণ করতে ছাড়বে কেন? তার সাম্রাজ্যবাদ তো ইউরোপীয় আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত।

জাপান নিজ স্বার্থে কোরিয়াকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নূতনভাবে গড়ে তুলতে লাগল। রাস্তাঘাট তৈরী হল, রেল চলল, আধুনিকপ্রথায় চাষবাসের ব্যবস্থা হল। এ সমস্ত ব্যাপারেই কোরিয়াবাসীরা শ্রমিকের কাজ পেয়ে ধন্য হল—পরাধীন জাতির ভাগ্যে তার বেশী আর কি জুটতে পারে! দেখতে দেখতে কোরিয়ার বেশীর ভাগ জমির মালিকানা গেল জাপানীদের হাতে, কোরিয়ান প্রজারা অত্যধিক খাজনায় দুস্থ হয়ে জমির পত্তনী নিতে বাধ্য হল। এ ছাড়া আবার কোরিয়ানদের মধ্যেই এক দল লোক জাপানের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে দেশবাসীদের শোষণে সাহায্য করতে লাগল, প্রতিদানে তারা জমিদারী পেলে। এইভাবে কৃষিপ্রধান কোরিয়ার কৃষকদের দুর্দশার শেষ রইলো না। তারপর জাপানীদের মূলধনে বড় বড় শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হল—কোরিয়ানরা সেখানে মজুরের কাজ পেলে। পরাধীনতার পাত্র কাণায় কাণায় ভরে উঠল।

কোরিয়াবাসীরা এই শোষণের চাপে নীরব হয়ে রইল না। ভিতরে ভিতরে তারা চালাতে লাগল আন্দোলন—খুঁজতে লাগল পরাধীনতার গ্লানি মোচনের পথ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই সেখানকার জনসাধারণের মাঝে আত্মচেতনা জাগ্রত হয়। মাঝে মাঝে আন্দোলন প্রবল হলে শাসকশক্তির শাসনযন্ত্র উদ্যত হয়ে তার প্রতিরোধ করতে থাকে। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনও প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু তার এই আন্দোলন আরও সাফল্যমণ্ডিত হয় মিত্রশক্তি তাদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে, কিন্তু সব প্রতিশ্রুতিই কি পালিত হয়?

এশিয়ায় কোরিয়ার অবস্থিতি সামরিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপে অষ্ট্রিয়ার মত সকলের দৃষ্টি কোরিয়ার প্রতি নিবদ্ধ। সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে কোরিয়া আবার সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রশান্তমহাসাগরে রুশ নৌবহর ভ্লাডিভস্টকে শীতকালে বরফ জমে, কিন্তু কোরিয়ার বন্দরগুলি শীতকালেও ভাল থাকে। প্রশান্তমহাসাগরে প্রভুত্বের রূপ সোভিয়েট যেমন কোরিয়ার উপর আধিপত্য রাখতে চায়, তেমনই প্রশান্তমহাসাগরে মার্কিন আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য আমেরিকা চায় রাশিয়াকে প্রতিহত করতে। দ্বিতীয় মহাসমরের অবসানে এই ভাবে কোরিয়া হয়ে উঠে বিশ্বের দুই মহাশক্তির পরীক্ষা ক্ষেত্র।

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে জাপান বিনাসর্তে মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ফলে জাপানীরা কোরিয়া ছেড়ে যায়। কিন্তু যাবার আগে তারা কোরিয়ার বিপ্লববাদীদের হাতে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে যায়। কোরিয়ার বিপ্লবীরাও বিশ্ব-রাজনীতির সঙ্গে ভাল রেখেই চলেছিলেন। লি-উন-হেউং কোরিয়ার বিপ্লবীদলের নেতা। যুদ্ধের সময় তিনি স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে জাপানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। জাপানীরা যাবার সময় তাঁর পরিচালনাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি স্বীকার করে যায়। এই ভাবেই তারা এতকালের শোষণের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়াস করে। তারা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়, ব্যক্তি-স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর থেকে সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়। বিধান, শ্রমিক ও যুব-প্রতিষ্ঠানগুলিরও বৈধতা স্বীকৃত হয়।

লি-উন-হেউংয়ের নেতৃত্বে দেখতে দেখতে সমগ্র কোরিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয়। আগষ্ট মাসের শেষে দেখা যায় যে, কোরিয়ার ১৪৩টি সহরে পিপল্‌স কমিটি গঠিত হয়েছে। এই সকল কমিটি জাপানীদের হাত থেকে শাসনভার নিজেদের হাতে নেয়। ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে কোরিয়ার রাজধানী সিউলে এক জাতীয় প্রতিনিধি-পরিষদের অধিবেশন হয়। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৪৫০ শতাধিক প্রতিনিধি এতে যোগ দেন। এই সম্মেলনে একটী কেন্দ্রীয় পিপল্‌স কমিটী ও একটী শাসনতন্ত্র রচয়িতা কমিটী গঠিত হয় এবং কোরিয়ার অস্থায়ী সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। এই সম্মেলন অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণা ও একটী সার্বভৌম সরকার গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অস্থায়ী সাধারণতন্ত্র

যে কার্য্যসূচী গ্রহণ করে তাকে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কার্য্যসূচী বলা যেতে পারে। জাপ-মালিকদের সমস্ত ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে চাষীদের মধ্যে বণ্টন, খনি, কারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, জলের কল, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা, ছোট খাটো ব্যক্তিগত শিল্পপ্রচেষ্টাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি, নারী পুরুষের সমানাধিকার, অষ্টাদশবর্ষীয়ের ভোটাধিকার, দৈনিক আট ঘণ্টার অনধিক শ্রমের ব্যবস্থা, মজুরী ও জীবনযাত্রার নিয়তম মান নির্দ্দিষ্টকরণ, খাদ্যের বরাদ্দপ্রথা প্রবর্ত্তন ও চোরা কারবার বন্ধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্য থেকে লোক নিয়ে পুলিস ও সেনাবাহিনী গঠন—এই কার্য্যসূচীর প্রধান বিষয়।

এই কার্য্যসূচী সমগ্র কোরিয়ায় সমর্থন পায়। ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ ইউনিয়ন, যুবসঙ্ঘ, নারীসঙ্ঘ, শিল্পজীবী পার্টি ও প্যাক্‌ডিচুন-সুখের নেতৃত্বে গঠিত কম্যুনিষ্ট পার্টি সকলেই এই কার্য্যসূচীতে সমর্থন জ্ঞাপন করে। এই ভাবে সর্ব্বত্রের সমর্থনপুষ্ট কোরিয়ান সাধারণতন্ত্র জাপানীদের হাত থেকে নিজ দেশের শাসন চালাবার জন্য প্রস্তুত হয়।

এমন সময় তাদের সম্মেলন থেকে রুজভেল্ট-চার্চ্চিল ও চিয়াং কাইশেক ঘোষণা করলেন যে, যথাসময়ে কোরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। মার্শাল ষ্ট্যালিনও এই ঘোষণা সমর্থন করলেন। স্থির হল যে জাপ শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য রাশিয়া কোরিয়ার উত্তরার্দ্ধ ও আমেরিকা কোরিয়ার দক্ষিণার্দ্ধ দখল করবেন। সমগ্র কোরিয়াবাসীরা শত্রুর স্বাধীনতা রক্ষার্থে যুধ্যমান প্রবল মিত্রশক্তির ঘোষণায় বিশ্বাস না করে পারলে না। জাপশক্তিকে উৎখাত করবার জন্য তারা মিত্রশক্তির সাহায্য প্রয়োজন বলেও মনে করেছিল।

এই ব্যবস্থা মত উত্তরে এল রুশ ও দক্ষিণে এল মার্কিন। এসেই তারা জাপ সৈন্যদের নিরস্ত্র করার কাজে প্রবৃত্ত হল। কোরিয়ার লোকেরা জানত যে এ সব কাজ মিটে গেলেই 'স্বাধীনতা' আসবে এবং তারা স্বাধীনতা পাবে। এইভাবে মাস তিন কেটে গেল। ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে পররাষ্ট্র-সচিবদের বৈঠক হল। এই বৈঠকে ঘোষণা করা হল যে কোরিয়াকে পাঁচ বৎসরকাল মিত্রশক্তির অধিগিরির অধীনে থাকতে হবে। উদ্দেশ্য এই অধিগিরির মেয়াদ হবে পাঁচ বৎসর। মিত্রশক্তি কোরিয়াকে থেকে কোরিয়ানদের স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করে দেবে। আরও স্থির হয় যে যতশীঘ্র সম্ভব কোরিয়াতে রুশ-মার্কিন সমরনায়কদের এক বৈঠক হবে। এই বৈঠকে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয়তাকে তুলে ধরে অবাধ-বাণিজ্য ও বৈষয়িক আদানপ্রদানের পন্থা নির্দ্দিষ্ট হবে এবং এক সম্মিলিত রুশ-মার্কিন কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করা হবে। এই কমিশন সমগ্র কোরিয়ার জন্য একটী গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে।

এই ঘোষণায় সমগ্র কোরিয়ায় প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হল। পাঁচ বছরের অধিগিরির প্রস্তাবকে তারা সুনজরে দেখতে পারলে না। পারবেই বা কেন? স্বাধীনতা পাবার অধীর আগ্রহে যারা অপেক্ষা করছে তাদের যদি বলা হয় আরও পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করতে—তাহলে কোন হতভাগাটা খুবই স্বাভাবিক বৈকি। তাই মিত্রশক্তির অধিগিরি ঘোষণার প্রতিবাদে কোরিয়ার সহরে সহরে, পল্লীতে পল্লীতে বিক্ষোভ সুরু হল। অনেক ক্ষেত্রে উত্তর জনতাকে নিরস্ত্রিত করতে অধি শক্তিগুলিকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে এবং বিক্ষোভের ফলে সংঘর্ষে হতাহতের সংখ্যাও কম হয় নি। কিন্তু প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের বিক্ষোভ কতখানি আর সফল হতে পারে। কোরিয়াবাসীদের ভাগ্যেও তাই ঘটল। কিছুকাল পরে বিক্ষোভ বন্ধ হয়ে গেল। বাইরের বিক্ষোভ বন্ধ হলেও অন্তরের অসন্তোষ কি দূর হয়েছে? পরাধীন জাতির মর্ম্মবেদনা কি শান্ত হয় কোনদিন? অশান্তির আগুন বুকে নিয়েই তারা প্রতীক্ষা করছে সেই শুভ দিনটীর—যেদিন আপন দেশে তারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারবে।

এখন অধিগিরির অধীনে কোরিয়ার অবস্থা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উত্তরে সোভিয়েট শাসনাধীন এলাকার অবস্থা ও দক্ষিণে মার্কিন শাসনাধীন এলাকার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

উত্তরার্দ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া কঠোর হস্তে জাপ বিতাড়ন করতে থাকে। সমস্ত চাকুরী থেকে জাপানী ও জাপ ঘেঁষা কোরিয়ানদের তারা বরখাস্ত করলে। জনসাধারণ ওদের এই নীতিতে সন্তুষ্টই হল। সাইবেরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে যে সকল কোরিয়ান কম্যুনিষ্ট ছিল রুশ সেনারা ওদের নিয়ে এসে কোরিয়ানদের পিপল্‌স পার্টিগুলির সহিত সহযোগিতা করতে থাকে এবং এই প্রকার ব্যাপকভিত্তির কমিটী গঠনে উৎসাহ দেয়। জাপানী মালিকদের অধি বাজেয়াপ্ত করে কোরিয়ান চাষীদের মধ্যে বিলি করে এবং কোরিয়ান জমিদারদের খাজনা কমিয়ে চাষীরা যাতে ফসলের শতকরা ৭০ ভাগ পায় তার ব্যবস্থা করতে বাধ্য করে। সমস্ত কল-কারখানা, জলের কল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি শ্রমিকদের কমিটীর হাতে ন্যস্ত হয় এবং শাসন পরিচালনার ভার দেওয়া হয় পিপল্‌স কমিটী-সমূহের হাতে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

ক্যাপ্টেন

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ধর্ম্ম কর্ম্ম তব তরে সখি
সব পারি ছেড়ে দিতে—
তাই তব প্রেম বুঝি, নয় খাঁটি
সন্দেহ জাগে চিতে।

কামালউদ্দীন বিহজাদ

শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ

দ্বিতীয় পটখানিতে অঙ্কিত রহিয়াছে উটের লড়াইয়ের চিত্র। উহা দুইটি ভাগে বাঁটিয়া বন্যযুদ্ধে বিরত। একটির মুখ কালচক্রের, অপরটির সাদা। উটপাল দুইজন আপন আপন উটের পিঠে বসিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে। অনতিদূরে একজন শস্ত্রধারী ব্যক্তি হাত তুলিয়া বাহবা দিতেছেন, পোষাক দেখিয়া তাঁহাকে পশম লোক বলিয়াই মনে হয়।

তৃতীয় চিত্রটি তৈমুরের জীবনী হইতে গৃহীত। অশ্বারোহী সৈন্যদল শত্রুশিবির আক্রমণ করিতেছে। চিত্রে আঁকা আছে তিনটি তাঁবু, দুইটি কাছাকাছি, আর একটি কিছুদূরে খাটান। তাঁবুর সাদাখড়িগুলি চিত্রের সম্মুখভাগে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া—মোটের উপর বিন্যাসধারার ঐক্যসংস্থাপনে সাহায্য করিয়াছে। যুদ্ধের চিত্রে গতিচাঞ্চল্য যে বিশেষভাবে প্রকটিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! উপরের অংশে শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহীদিগের অশ্বগুলি চিত্রবিচিত্র অঙ্গভঙ্গে আকুল, ঘোড়াগুলির গায়ে কে যেন আলিপনা আঁকিয়া দিয়াছে। চিত্রকর দেখাইয়াছেন বলবদ্ধ সাদী সৈন্য একেবারে শিবিরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—সংঘাত অত্যাসন্ন। তাহাদিগের বর্ষার মাথায় সংলগ্ন রহিয়াছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা (hamon)। চিত্রের নিম্নভাগে রেলোয়ার অশ্বারোহী ও পদাতিক তীরন্দাজ, এই দুই শ্রেণীর সৈন্যই সমবেত। এ দিকটায় পূর্ব্বাদ্যেই যুদ্ধ বাধিয়াছে। নিম্নের ডানদিকে কোণে একজন আহত যোদ্ধা লুপ্তের কাত হইয়া পড়িয়া আছেন। লোকসংখ্যা এ চিত্রে বড় অল্প নয়, কিন্তু ব্যক্তিগুলির মুখের ভাব তেমন সুপরিস্ফুট হয় নাই।

বায়জাদ ইউরোপীয় শিল্পীর সকলবিদ্যা করিয়াছেন, অন্ততঃ একটিমাত্র তসবির সম্বন্ধে, এ অপবাদ কোনও কোনও পাশ্চাত্য লেখক প্রচার করিতে ছাড়েন নাই। মূল চিত্রখানি ইতালীয় চিত্রকর জেন্টিলি বেলিনি অথবা জেন্টিলিনি বেলিনি (Gentilini Bellini) কর্তৃক অঙ্কিত জেম্ (Djom) সুলতান নামক একজন তুর্কি (Turkish) রাজকুমারের প্রতিকৃতি। ষোড়শ শতাব্দীর এ চিত্রখানিও বাকিংহাম প্রাসাদ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। যখন এ চিত্র নকল করা হয় তখন বায়জাদের বয়স বাকি প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর। যৌবনের পূর্ণসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি বেলিনি অঙ্কিত প্রতিকৃতির একখানি রেখাচিত্র (Drawing) সহজে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন একথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। হঠাৎ বিদেশী চিত্রকর অঙ্কিত বিদেশী রাজকুমারের চিত্রের প্রতি তাঁহার এরূপ অনুরক্তির কারণই বা কি থাকিতে পারে?

বর্ত্তমানে লেনিনগ্রাড্ নামে পরিচিত সেণ্ট পিটার্সবর্গের হার্মিটেজ বিচিত্রিয়মে রাজতন্ত্রের যুগে একখানি বড় ছবির চিত্র রক্ষিত ছিল। এখনো তাহার সন্ধান করিলে সেইখানেই পাওয়া যাইবে। এ চিত্রে অন্যান্য মূর্ত্তির সহিত জেম্ সুলতানের প্রতিকৃতিও সন্নিবিষ্ট ছিল জানা যায়। এ চিত্রখানি যে বায়জাদের আঁকা নয় সে সম্বন্ধে আর মতদ্বৈধ নাই। আর এক কথা, বাকিংহাম হাউস প্রদর্শনীর এ চিত্রে বায়জাদের নাম কতকটা মূল ছাঁদের হরফে লেখা, যাঁটি বায়জাদীয় চিত্রে চিত্রীর নাম যেরূপ সুন্দাক্ষরে লেখা থাকে সেভাবে লেখা নয়। একথা যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে কৌতূহল বশতঃই হউক, বা অন্য পদ্ধতির কোন বৈশিষ্ট্যানুরোধে আকৃষ্ট হইয়াই হউক, বায়জাদ এ চিত্রখানি নকল করিয়াছিলেন তথাপি বলিব এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা একবারেই নিরর্থক, কারণ পাশ্চাত্যপ্রভাবে বায়জাদের নিজস্ব শিল্পতন্ত্রী কোন অংশেই বিকৃত হয় নাই।

তখনকার দিনে বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষকের বা পরিপালকের আকৃতি ক্ষুদ্রচিত্রে সন্নিবিষ্ট করা শিল্পীদিগের মধ্যে একপ্রকার রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছিল। নিজামীর সেকেন্দর নামার একটি চিত্রে বায়জাদ সুলতান হোসেন মির্জ্জার মুখচ্ছবি সেকেন্দরের (Alexander-এর) আকৃতিতে সন্নিবেশ করিয়াছেন। সেকেন্দর এ চিত্রে গুহাবাসী কোনও তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ মানসে সমাগত।

একখানি ঘুসরবর্গের (In grisaille) লোভাদায়ক চিত্রে দেখিতে পাই যে একটি লোরেলে (Pie) জাতীয় পক্ষী বৃক্ষশাখায় বসিয়া বেশ সুকৌশলে ভারসমতা রক্ষা করিতেছে। এ চিত্রের বিভিন্ন অংশ বিষয়বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সুকৌশলে পরিকল্পিত। পিঠভূমে বৃক্ষ ও শৈলাদি সমাকীর্ণ অধিত্যকা উচ্চাবচভাব রক্ষা করিয়া অতি সযত্নে অঙ্কিত। এ আলেখ্যখানিকে নিখুঁত নিদর্শচিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্মুখভাগের একটি বৃহদায়তন চেনার বৃক্ষের গায়ে একখানি ঘই লাগান, এই ঘই ধরিয়া একব্যক্তি সবেমাত্র উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইনিই বোধহয় বায়জাদ। আর একজন যিনি বৃক্ষতলে পাদচারণায় নিযুক্ত, তাঁহাকে দেখিলেই অভিজাতবংশীয় বলিয়া বুঝা যায়। নিম্নে, ক্ষুদ্রাক্ষরে, ইনি যে সাহ্ তামাস্প একথা কাটি লিখিত আছে। চিত্রের একাংশে "পুরাতন ভৃত্য বায়জাদ" এই একটি ছত্রে শিল্পীর আত্মপরিচয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সাহ তামাস্প ১৫২৪ খৃঃ অব্দে মাত্র দশবৎসর বয়সে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কথিত আছে যে তিনি বায়জাদ ও তাঁহার শিষ্য সুলতান মহম্মদের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পারসীক শিল্পে বায়জাদের প্রভাবের যথাযথ পরিমাপ সহজসাধ্য নয়। তিনি শুধু হিরাট ও সিরাজ শৈলীর নেতৃত্ব সাধন করেন নাই, বিশেষজ্ঞগণের মতে সমকালীন পারসীক শিল্প তৈমিক-প্রভাব মুক্ত

হইয়াছিল তাঁহারই প্রতিভাবলে। বাহ্যের শিল্পী ও বিষয়বস্তুর প্রশংসালাভ করেন প্রথমেই তাঁহার দৃঢ় ও জোরাল রেখার লাবণ্য সম্ভারে। ইহারও প্রতিভার ও শিল্পের একনিষ্ঠ অনুশীলন বলে, কি ভাব কৌশলে, কি বর্ণ বিন্যাসে, কি রেখাঙ্কন নৈপুণ্যে চিত্র শিল্পের এই তিনটি আঙ্গিকেই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব কৌশীন্য অর্জন করিয়াছিলেন।

বাহ্যের আবিষ্কৃত হিরাট্ শৈলীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন বটে, কিন্তু পারসীক কুরুক চিত্রের দ্বিতীয় যুগের শিল্পাদর্শ (norm) প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁহারই কর্তৃক, সিরাজ ও হিরাটের দুইটি পৃথক শৈলীর সমন্বয়সাধন বলে। সাফবের এক ভ্রাতা (১) সিরাজের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সিরাজে একটি নূতন শিল্পরীতি গড়িয়া উঠে। হিরাটের শিল্পক্ষেত্রে অত্যধিক চৈনিক প্রভাব দৃষ্ট হইত। তৈমুরীয় বংশের উৎসাহে যে চিত্র-পদ্ধতির উদ্ভব হয় তাহার আবিষ্কার ছিল সাফবের রাজধানী হিরাট। সিরাজ শিল্পের মৌলিকতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। হিরাট শিল্পীর ইংগাম্বিত (palettes) যে সকল রং ব্যবহৃত হইত তাহা যে শুধু অধিকতর উজ্জ্বল ও প্রাণবন্তপূর্ণ ছিল তা নয়, বর্ণযোজনার বেলায় এগুলির প্রয়োগবিধিও ক্রমেই হইয়াছিল জটিলতর। সিরাজ শৈলীতে কিন্তু "খাটো" বা খরতাপি রঙের ব্যবহার থাকিলেও মূলতঃ সেগুলি ছিল বড়ই নরম স্নিগ্ধকর, আর বর্ণসাম্যের (tonality) লালিত্যই ছিল এ শৈলীর বিশেষত্ব। সিরাজের শিল্পীরা উষ্ণতাজ্ঞাপক রক্তবর্ণ, বিষাদব্যঞ্জক অসিতবর্ণ ও প্রোজ্জ্বল হরিৎ-বর্ণের ব্যবহার ইঙ্গিতে দিয়া বর্ণপ্রয়োগ-কৌশলের বিধান করিয়াছিলেন। হিরাট শিল্পে এই তিনটি তীব্র রঙের ব্যবহারই অধিক প্রচলিত ছিল। সিরাজ শৈলীতে প্রাণপ্রদ বর্ণের ব্যবহার যে কম ছিল তা নয়, কিন্তু স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য্য ভাবের বিকাশে চিত্রীর চিত্রপট অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত হইত।

যে সকল বিভিন্ন উপাদান ঐতিহ্যের অঙ্গে সমাহিত, সার্থক সংযোগ ও সংমিশ্রণ বলে বাহ্যের সেগুলি একীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হইয়াছিল তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি ও তাঁহার শক্তিমত্তার গুণে। দূরদৃষ্ট আদর্শ ও জটিল পরিকল্পনা এই কৌশলী শিল্পীর দক্ষতার সাহায্যে তাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়া যাইত। চিত্রী হিসাবে বাহ্যের ছিলেন বাস্তবতাবাদী। আবার বিজ্ঞানবিৎ মনস্তত্ত্বজ্ঞের ন্যায় মানবিক অবস্থার বিশ্লেষণ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সে অভিজ্ঞতা তদঙ্কিত চিত্রেই পরিস্ফুট দেখা যায়। পূর্ববর্তীগণের বহন করিয়া যা তাঁহাদের বিভিন্ন পদ্ধতি তিনি যেখানেই আবশ্যক মনে করিয়াছেন গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই; কিন্তু সর্বত্রই যে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপটি বসাইয়া দিয়াছেন তাহাই তাঁহার শিল্প প্রতিভার বিশিষ্ট চিহ্ন বলিয়া গ্রহণীয়।

(১) ইস্কান্দর সুলতানই সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার শাসনকাল—১৪১৪-১৪৩৭ খৃঃ অঃ।

বাহ্যের চিত্রগুলি সমকালের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে উপযুক্ত অনুশীলন করিতে হইলে মার্কিণ ও ইউরোপের নানা দেশের সংগ্রহশালার বিবরণগুলি না দেখিয়া উপায় নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ১২।৯।৪১ তারিখের একখানি পত্রে অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে কিছু পূর্বেই বাহ্যের অঙ্কিত একখানি রেখাচিত্র লণ্ডনের কোনও নীলাম ঘরে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। অনাবিষ্কৃতপূর্ব নূতন ছবি এখন আর বেশী তার। এতদ্দেশীয় সহৃদয় ব্যক্তিদের নিকট বাহ্যের যশোজ্যোতি এখনও ম্লান হয় নাই (১)। সম্প্রতি কোনও মুসলমান চিত্র-বিক্রেতা লেখককে বলিয়াছিলেন "যদি বাহ্যের ছোট একখানি ছবিও সংগ্রহ করিতে পারিতাম তাহা হইলে অর্থশালী হইতে আর বিলম্ব হইত না।"

ইস্তাম্বুলের ইস্লামিক্ প্রত্নাগারে প্রাপ্ত বাহ্যের যে একখানি প্রতিকৃতি মঁসিয়ে সাকিসিয়ানের গ্রন্থে (২) প্রকাশ হইয়াছে তাহা দেখিলে তাঁহাকে জ্ঞানানুশীলনে রত পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। চিত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে তাঁহার দেহ ছিল একহারা গড়নের, বেষ্টনীবিহীন, কৃশ প্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সূচীক্ষ্ণ নাসিকা ও প্রতিভাদীপ্ত চক্ষুদ্বয় সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিচ্ছদ নীলাভ ফিরোজা (Turquoise) বর্ণের, আলখাল্লাটির রঙ কিঞ্চিৎ বাদামী। এইখানি ব্যতীত তাঁহার অপর কোনও চিত্র পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

বাহ্যের বাঁচিয়াছিলেন অনেক দিন। এমন দীর্ঘজীবী শিল্পী প্রাচ্য-দেশে অধিক দেখা যায় না। যিনি প্রাদেশিক শিল্পকে জাতীয় শিল্পে উন্নীত করিয়াছিলেন; সেই মনিষীকে বাকি শেষ জীবনে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হইয়াছিল। সংসারের ভরাবাতে জর্জরিত দেহ জীর্ণপুষ্টি অবস্থায় বৃদ্ধ চিত্রীর জীবন সন্ধ্যা তাব্রিজেই অতিবাহিত হয়। মঁসিয়ে গোলুবিয়েফ অনুমান করেন যে তাব্রিজেরই কোন মেপল্স্ (maples), সাইপ্রেস্ (সরু) আদি বৃক্ষ সমাবৃত প্রাচীন উদ্যান বাটিকায় শান্তিময় পরিবেশে বাহ্যের তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ সময় যাপন করিয়াছিলেন। এখানেই তাঁহার ক্লিষ্ট বিধ্বস্ত জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়—তাঁহার কর্মশক্তি ও প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হইয়া যায়।

জনৈক রুষ ইংরাজ লেখক (৩) বলিয়াছেন যে পারস্যে চিত্রের বিষয়-বস্তু ও উপকরণাদি অনেক স্থলেই যথারীতি সজ্জিত অবস্থায় শিল্পীর

(১) Current Thought, Vol. III, No 4, p. 210 ff, January—March, 1942.

(২) La miniature persane de XIIe a XVIIe siecle.

(৩) Thomas Sutton, Some Persian Miniatures, Bupam, No 1920, p. 114,

চক্ষের সম্মুখে উপনীত হইয়া থাকে। নীল আকাশের পৃষ্ঠপটে প্রাসাদ ও মসজিদের নীল মিনার ও গম্বুজগুলি অধিকতর গাঢ় নীল-বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া কি শোভাই না ধারণ করে! অবরুদ্ধের প্রতীক, উদ্যানের চিরহরিৎ সাইপ্রেস তরু শাখা আন্দোলিত করিয়া শিল্পীকে যেন তাহার নিজ ভাবার বিরাম লাভার্থে আহ্বান করিয়া লয়। এ আহ্বানে শিল্পী প্রত্যাখ্যান করিবেন কিরূপে? তিনি বৃক্ষতলে তাঁহার অভ্যস্ত আসনটিতে সুখে সমাসীন, তাঁহার দৃষ্টি প্রাঙ্গণ সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রবেশ দ্বারের দিকে সম্বদ্ধ। তাঁহার সম্মুখ রাজপথ বাহিয়া চলিতেছে বিবিধ বর্ণের পরিচ্ছদধারী বিচিত্র জনস্রোত; বিকটাই বাজার বসিয়াছে তাই ইহাদের সমাগম। তাহাদের কোলাহল শিল্পীকে অনুরাগ বিমুগ্ধ করিতে পারে নাই, তিনি স্থির চিত্তে বসিয়া আপন মনে আপনার কাজ করিয়া চলিয়াছেন। বার্ডোবণার উপনীত শিল্পী-শ্রেষ্ঠ বায়জাদের স্থির ধীর কর্মপ্রণালীর ঠিক এইরূপ একটি চিত্রই কল্পনা করিতে ইচ্ছা হয় যদিও বাস্তবের সহিত ইহার মিল না হইবারই সম্ভাবনা অধিক। বিহজাদের কোন সন্তান ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সমাধি পার্শ্বেই সমাহিত তাঁহারই এক আত্মজুল্য মিনি চিত্রকর না হইয়া লিপিকরের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। বায়জাদের শিল্পধারা বর্ত্তিয়াছিল তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যের উপর।

ছেলেবেলার কথা

এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (ক্যান্টাব), বার-এট-ল

নিজের জীবনী লেখবার যদি কখনও অবসর হয়, তাহলে আমার বাল্য-জীবনের কথাই তাতে সব চেয়ে বড় জায়গা দখল করবে; কেননা আমার স্মৃতিতে বাল্যজীবনের ছবি যেমন সুন্দর, সুস্পষ্ট এবং সরল আনন্দপূর্ণ, তেমন জীবনের অন্য কোন অংশের স্মৃতি মোটেই নয়। বাল্যের জগৎ —সে ছিল সত্যই এক অপূর্ব্ব জগৎ। নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা, নিত্য নূতন অনুভূতি, নিত্য নূতন পরিচয় মনের মধ্যে আনন্দের এক অন্তহীন প্রবাহ বইয়ে দিতো। বাল্যের সেই জীবনে বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না, আর সেই বিস্ময় থেকে আসতো অফুরন্ত আনন্দ। সেদিন আর ফিরে পাবো না, সে আনন্দও আর ফিরে পাবো না, তবে সে জীবনের স্মৃতি প্রত্যহ ফল্গুধারার মতই এখনও জীবনকে আমার আনন্দময় করে রেখেছে।

প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা। শিশু বালকের জীবনে, আজ যা অতি ক্ষুদ্র অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়, তাই তখন অতি বিরাট, অতি বিপুল বলে মনে হতো। আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামটী তখন কত বড় বলে মনে হতো, গ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাঙ্গা-চোরা রাস্তা চৌরঙ্গীর সুসজ্জিত প্রশস্ত রাজপথের চেয়েও চওড়া বলে মনে হতো। আর সেই গ্রামপথ বেয়ে ঘোড়ার গাড়ীর চলাচল যে বিস্ময় এবং আনন্দের সৃষ্টি করতো, তার তুলনায় চৌরঙ্গীর যানবাহনের অন্তহীন চলাচল পতঙ্গের একাগ্র বিস্ময়ের সৃষ্টিও করে না। আমাদের গ্রামে একটী পুকুর আছে সেটিকে "বড় পুকুর" বলা হয়, আকারে সে পুকুর ডেলহাউসী স্কোয়ারের চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু তবু ছেলেবেলায় সে পুকুর দেখেই সমুদ্রের আভাস পেয়েছি, আর তার জলের হিল্লোলে সাগরতরঙ্গের আহ্বান শুনেছি। বাল্যের ক্ষুদ্র জগৎ আমাদের কাছে বিরাট এই বিশ্বের এক প্রতীক রূপেই দেখা দিয়েছে, আর প্রকৃত পক্ষে সেই ক্ষুদ্র বিশ্ব যে ভাবে আমাদের কৌতূহলের আহার যুগিয়েছে, পরবর্ত্তী জীবনে এই সমাগরা ধরণীও সে ভাবে আমাদের কৌতূহল তৃপ্তি করতে কিম্বা আনন্দ বিধান করতে পারে নি।

আকাশে তো চাঁদ আমরা রোজই দেখি, কিন্তু ছেলেবেলার চাঁদ-মামাকে দেখার মধ্যে সম্পূর্ণ অন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। রাত্রে কোন আত্মীয়ের হাত ধরে যখন গ্রামপথ বেয়ে চলতুম, তখন সহাস্য মুখে চাঁদমামা আমার দিকে চাইতেন, আর আমিও তাঁর দিকে চাইতুম। আমি যেমন পথচলে চলেছি, তিনিও তেমনি আমার সঙ্গে তাল রেখে আকাশ বেয়ে চলেছেন। চমকিত হয়ে আমি দাঁড়াতুম, চাঁদমামাও আকাশ পথে দাঁড়াতেন। আমি আবার পথচলে চলতে সুরু করতুম, চাঁদমামাও আকাশপথে চলতে সুরু করতেন। আনন্দে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। আত্মীয়কে সম্বোধন করে বলতুম, দেখুন, দেখুন, চাঁদমামা আমায় কত ভালবাসেন। আত্মীয় আমায় মানরক্ষা করে বলতেন, তা বাস্তবে না, তিনি যে তোমার মামা হন। গর্ব্বে, আনন্দে বুক আমার ফুলে উঠতো। তারাভরা আকাশে বিট বিট করে চাইতো, তাদের দেখে বিস্ময় এবং পুলকের অপূর্ব্ব এক জগতের সিংহ-দ্বার আমার চোখের সামনে খুলে যেতো। আমি সাত-ভাই-চম্পার কথা ভাবতুম, সপ্তর্ষিদের কথা ভাবতুম, আকাশের সিংহাসনে সমাসীন ঘোড়ার কথা ভাবতুম, তাঁর দিগন্ত বেরেত্রাদের (দেবদূতদের) কথা ভাবতুম। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি মনে আমার ভাবের জোয়ার আনতো। আনন্দে আমার মন অভিভূত হয়ে যেতো।

সবেমাত্র জীবনে প্রবেশ করেছি, তখন সব জিনিসই বিস্ময়কর বলে মনে হতো। আমাদের গ্রামের মাঠটি কত বড়, কত রহস্যময় বলে মনে হতো। সন্ধ্যায় আমরা মাঠপ্রান্তে এসে দাঁড়াতুম, মাঠের শোভা দেখবার জন্যে, আকাশের শোভা দেখবার জন্যে। অস্তগামী সূর্য্যের বর্ণচ্ছটায় আকাশ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করতো—লাল, নীল, শ্বেত, হরিৎ প্রভৃতি রংএর সমাবেশে স্বর্গের যে হিল্লোল বিকচরবালে দেখা দিত, তার সৌরভ একালের কবিতা চিত্র-শিল্পী কোঁ Turner-এর তুলিকায়তাই, আর সেই

গগন পবনের যখন কলকার দল তাদের আবাস স্থানের উদ্দেশে দলবদ্ধ গতিতে উড়ে যেতো, তখন তারা অব্যক্ত সুরের যে হিল্লোল তুলতো তার কবির লেখাই তার সঠিক বর্ণনা করার আমাদের ক্ষমতা নেই।

সন্ধ্যাসমাগমে সূর্য্যদেব অস্তাচলে চলে যেতেন, প্রকৃতি কাল বৈশাখীর আবাহনে যেন আত্মহারা হতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মাঠের প্রান্তদেশে আলেয়ার দল ছুটোছুটি করতো। কতরকম অপূর্ব্ব অবর্ণনীয় খেয়াল যে জেগে উঠতো তার বর্ণনা করা সহজসাধ্য নয়।

এখন এই বৃক্ষ বনে কত রকমের পশু, কত রকমের পাখী প্রত্যহ দেখতে পাই, অথচ প্রাণে কোন ভাবের হিল্লোল জেগে যায় না। ছেলেবেলায় গাছে একটী টুনি পাখী দেখে প্রাণ আনন্দে নেচে উঠতো, 'বৌ কথা কও' পাখীর আহ্বান শুনে মন রূপকথার সোনালি রাজ্যে প্রবেশ করতো, কোকিলের ডাক শুনে আনন্দে মন প্রাণ ভরে যেতো। এখন বসে বসে ভাবি, কোথায় গেল সে আনন্দ, কোথায় গেল সে অনুভূতি, কোথায় গেল সে বিস্ময়, আর কোথায় গেল প্রকৃতির সঙ্গে সেই নিবিড় আত্মীয়তা বোধ। কবি Wordsworthএর মত মনে হয়, জীবনের প্রোতে স্বপ্নরাজ্য থেকে আমি অনেক দূরে এসে পড়েছি। অতীতে যে অমলকোমল স্মৃতি নিয়ে জীবনে প্রবেশ করেছিলুম, সে স্মৃতি ক্রমেই ম্লান হয়ে যাচ্ছে। শৈশবজীবনে ফিরে যাবার জন্য প্রাণ আবার চঞ্চল হয়ে উঠে। আর যখন বুঝি যে ফিরে যাওয়া অসম্ভব, তখন একা বসে সেই সোনালী শৈশব-জীবনের কথাই ভাবি, কল্পিতের স্বপ্নে স্বপ্নে উৎস প্রাণে আবার সজীব হয়ে উঠে, মন্দাকিনী ধারার কল্লোল মানব-জীবনে আবার শুনতে পাই।

সুন্দর বনের নদীপথে*

কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম-এ, এম-এল-এ

দূরে খুলনার নদীতীরের আলো, একটা লাইট হাউসের আলো পাক খাচ্ছে, আমাদের জাহাজ আড়কাটার জন্য ঘন ঘন বাঁশী বাজাচ্ছে।

সকালে যখন উঠলাম তখন আকাশ স্নিগ্ধ নির্ম্মল হয়ে গেছে। সুন্দরবন ও খুলনার সীমানা পার হয়ে যশোরের দিকে এগোচ্ছি। খুলনা থেকে বরিশাল যাবার দুটী পথ আছে। খুলনা থেকে সিধে আঠারবাঁকী নদী হয়ে মোল্লাহাট যাওয়া যায়। কিন্তু এ নদীতে সব সময়ে জল থাকে না, জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এ নদীতে যাওয়া চলে, তাও খুলনা অভিমুখী ষ্টীমার ছাড়া উল্টো পথের ষ্টীমার নাকি তখনও যেতে পারে না। সেজন্য আমাদের একটু ঘুরে কালিয়া-চৌনা হয়ে মোল্লাহাট যেতে হচ্ছে। ভোর বেলায় ডেকে বেরিয়ে দেখি চারপাশের দৃশ্য সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বন আর সমুদ্রের কোন হাতছানি নেই। চারপাশে যশোর জেলার নিজস্ব বড় বড় গাছ, ধানখেত, গ্রাম, গঞ্জ, তার মধ্যে মধ্যে স্কুট আড়াইশো তিনশো চওড়া নদী বয়ে চলেছে। জল খুব বেশী নেই, জায়গায় জায়গায় জলের মধ্যে বাঁশ পুঁতে জাহাজের যাবার পথের ইঙ্গিত দেওয়া আছে, যাতে জাহাজ কম জলে গিয়ে না পড়ে। নদীর ধারে ধারে নারিকেল গাছ, বট এবং অন্যান্য বড় বড় গাছ, লোকজন স্নান করছে, কাপড় কাচছে, ছেলেরা খেলা করছে। খালাসিদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল, গাজির খাল পার হয়ে এসে আমরা আলিবক্স্ নদীতে পড়েছি। আসলে নদীটার নাম হালিডেয়ান্স চ্যানেল, এরা তার রূপ বানিয়েছে আলিবক্স্ নদী। একটু পরেই নবগ্রাম, বারইপাড়া পার হয়ে প্রসিদ্ধগ্রাম কালিয়া পার হওয়া গেল।

আমাদের বিভিন্ন জায়গার নাম জানবার কৌতূহল দেখে ষ্টীমারের লোকজন সম্ভবতঃ ভয় পেয়েছে। সারেং মদন মিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে কেবল তিনটী অক্ষর শোনা যায়—'জানি নে'। যে আড়কাটীটী খুলনায় উঠেছে তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বেশ বলছিল, কিন্তু যেই কাগজে নামগুলো লেখা হল—অমনই সে বার দুই তিন 'প্যাথ্ছেন ক্যান্' বলে সেই যে মুখ বন্ধ করল আর তার মুখ খোলানো গেল না। অগত্যা এই ষ্টীমারের ক্লার্ক ভদ্রলোকই আমাদের একমাত্র সহায়। তাঁকে অতুলবাবুর 'নদীপথে' পড়তে দেওয়া হল, পড়ে তিনি বললেন ভদ্রলোক রসিকও

* গত ফাল্গুন সংখ্যায় এই কাহিনীর প্রথমাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বটেন সাহিত্যিকও বটেন, কিন্তু একজায়গায় একটু ভুল করেছেন। যে জায়গাটিকে তিনি মধুমতী বলেছেন—মধুমতী আসলে তার একটু পরে, টোনার কাছে। ও জায়গাটা ঐ 'আলিবক্স্' নদী।

টোনা পার হয়ে আমরা প্রকৃতই মধুমতীতে পড়লাম। নদীর ধারে কতকগুলি টিনের গুদাম ঘর, লোকজন যাওয়া আসা করছে, দুএকটা ষ্টীমার চল্‌ছে। পাড়ের ধারে অজস্র নারিকেল সুপারি গাছ, টিনের ঘর, গ্রামের কর্মব্যস্ততা। এখানে চালা ঘরের চেয়ে টিনের ঘরই বেশী। নদীর পাড় দিয়ে লোকে হেঁটে হেঁটে চলেছে—ঘর বাড়ী, সঙ্গে বাছুর। এক-আধটা ছেলে বাছুরকে জল খাওয়াতে এনেছে, অত্যন্ত ছোট ছোট মেয়েডিঙি ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও কোথাও নদীর ধারে মেয়েরা বাসন মাজছে।

সাড়ে বারটার সময় মোল্লাহাট পার হলুম। কিছুদিন পূর্বে সাম্প্রদায়িক অশান্তির জন্য মোল্লাহাটের নাম ঘন ঘন শোনা গিয়েছিল। এখানে আড়কাটী বদল হল। নতুন আড়কাটীর নাম আবদুলগণি, বাড়ী নোয়াখালী। লোকটী খুব ভদ্র এবং বেশ চটপটে। এক-আধঘণ্টা অন্তর আমাদের নানা কথা বুঝিয়ে দিতে লাগল এবং আমাদের ভৌগলিক জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করতে লাগল। সারাদিন মধুমতীতে চলেছি। দুপাশে নতুনত্ব কিছু নেই, যেমন রেলগাড়ী থেকে বাংলার এ অঞ্চলের দৃশ্য সাধারণতঃ দেখা যায়, তেমনি। নদীর ধারে ধানক্ষেত, ধান ভাল হয় নি, অনেক জায়গায় হলদে আভা হয়ে গেছে। একটু দূরে বড় গাছপালার সারি। বোঝা গেল বর্ষাকালে নদীর সীমানা সেই পর্যন্ত। যতই বরিশালের দিকে এগোচ্ছি ততই নদীর সুস্পষ্ট পাড় মিলিয়ে আসছে। নদীর প্রস্থ বেশী না হলেও ধারে অল্প অল্প জল, ধানখেত ও চরের মধ্যে খানিকটা খানিকটা প্রবেশ করেছে। অনেকগুলি বিপরীতগামী ষ্টীমারের সঙ্গে দেখা হল, তার মধ্যে একটীর নাম 'মহামুনি', আর একটীর নাম 'কানাডা'!

বিকেল পাঁচটায় নাজিরপুর পার হলুম। নদী থেকে ছোট গঞ্জ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। একটু দূরেই একটী হাট বসেছে দেখা গেল। মধুমতী ও আর একটী ছোট খালের সঙ্গমে হাটটী বসেছে। কয়েকটী ছোট ছোট চালা, ছোট নৌকোতে কিছু কিছু জিনিষ, কয়েক শ' লোক কেনাবেচা করছে। একটী খুব ছোট মেয়ে (বছর তিনচারেকের হবে) খুব টক্‌টকে লাল শাড়ী পরে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে নদীর ধারে হাটের পাশে বেশ মুরুব্বির মত পায়চারি করছে।

পরের ষ্টেশন শ্রীরামকাটিতেও দেখা গেল হাট বসেছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা, অজস্র ছোট ছোট নৌকোয় লোকে হাট থেকে ফিরছে। দুই একজন আরোহীও কিছু সওদা নিয়ে নৌকোগুলি বেয়ে তন্ন তন্ন করে চলেছে। দুপাশে ঘন নারকেল সুপারির বন। এক একটা জায়গায় আর একটা নদী মধুমতীতে এসে মিশেছে। সেখানে প্রায়ই একটা 'y' অক্ষরের মত হয়েছে। আমরা নীচের থেকে আসছি, নজরে পড়ছে দুইদিকে দুই বাহু বিস্তৃত হয়ে গেছে, সামনেটা গোল হয়ে রয়েছে, বড় বড় গাছ। ঠিক মনে হয়, সামনে

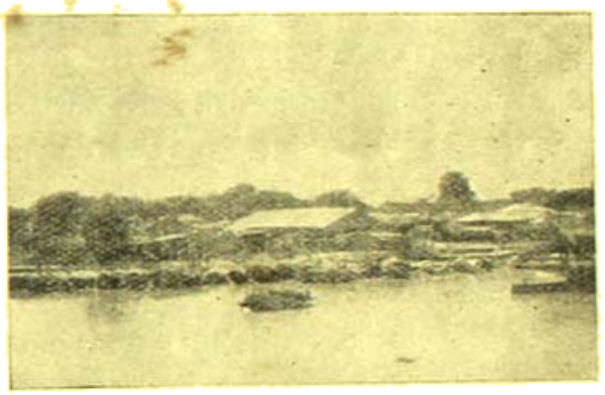

বাগেরহাট

আর রাস্তা নেই, আমরা যেন ঐ সামনের বাগানে গিয়ে ঢুকব।

এ দেশের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে—বড় বড় ধানখেতের মধ্যে এইরকম বড় গাছের খানিকটা করে ঘন সন্নিবেশ। তার একটা কারণ আছে। শোনা গেল, এখানে এবং নোয়াখালিতেও, লোকে বাড়ী করবার সময় প্রথমে একটা পুকুর কাটে, তার মাটী এক পাড়ে উঁচু করে সেখানে বাড়ী করে। তারপর চারদিকে নানা রকম গাছ লাগিয়ে দেয়। সুতরাং অবারিত কাঁচাসবুজ ধানখেতের মধ্যে বড় বড় গাছের গাঢ় সবুজ দ্বীপ দেখলেই বুঝতে হবে ওগুলি বসতি—ছোট দ্বীপগুলি এক-আধটী বাড়ী, বড়গুলি এক-একটী পাড়া।

ঠিক সন্ধ্যা হয়েছে, নদীর ধারে দু একটা আলো দেখা

যাচ্ছে, এমন সময় আমরা হলারহাট পৌঁছলাম। হলারহাট একটা জংশন। এর থেকে একদিকে নদীপথে বাগেরহাটের দিকে যাওয়া যায়। অন্যদিকে বরিশাল। আমরা বাগেরহাটের রাস্তা ত্যাগ করে বরিশাল-অভিমুখে কাউখালীর দিকে এগিয়ে চললাম। আড়কাটী আমাদের জানালে যে কাউখালীতে ঘণ্টা দুই নঙ্গর হবে। কাউখালী থেকে প্রায় আশাকাটি পর্যন্ত একটী সরু খাল দিয়ে যেতে হয়; এই বারণী খালটী এতই সরু যে তা দিয়ে এক সঙ্গে আপ ও ডাউন ষ্টীমার যেতে পারে না। সেইজন্য ডাউন বরিশাল 'ইস্‌প্রিট্' (Express) জাহাজ খুলনার দিকে না বেরিয়ে গেলে বারণী খালে ঢোকা যাবে না। আমরা কাউখালী পৌঁছবার মুখেই দেখলুম ষ্টীমার ষ্টেশনে একটী লাল সিগনাল জ্বলছে। অতএব দাঁড়ান গেল। একটু পরেই আর একটা ষ্টীমার পিছন থেকে এসে আমাদের ঠিক সামনে নঙ্গর করলো। এই ষ্টীমারের সারেংটী নিশ্চয়ই কিছু চঞ্চল প্রকৃতির, আমাদের মদন মিয়ার মত পাকা ধীর স্থির নয়। এগিয়ে নঙ্গর করার অর্থ, সে আমাদের আগেই খালে ঢুকবে। থেকে থেকে সার্চলাইট জ্বালছে এবং বাঁশী বাজাচ্ছে। আমাদের সারেং-এর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে নিশ্চিন্তে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে বসেছে। কিছুক্ষণ বাদেই 'ইস্‌প্রিট্' জাহাজ আলোয় ঝলমল করতে করতে খাল থেকে বেরিয়ে কাউখালী ষ্টেশনে লাগল, যাত্রী নিয়ে চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চলে গেল। তবু বাতি সবুজ হয় না। অন্য ষ্টীমারটি ঘন ঘন বাঁশী দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের সারেং অটল। সে চোঙা দিয়ে কাউখালী ষ্টেশনের সঙ্গে পূর্বেই কথা কয়ে জেনেছে যে 'ইস্‌প্রিট্' জাহাজ আসার সুযোগ নিয়ে আরও একটা ষ্টীমার খালে ঢুকে পড়েছে, সেটা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, খালের অপর মুখ থেকে এ মুখে এই টেলিফোন এসেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর দ্বিতীয় ষ্টীমারটী এসে পৌঁছল। আমাদের সহযাত্রী অপর ষ্টীমারটী নঙ্গর তুলে আলো জেলে দাঁড়িয়েছিল, এই ষ্টীমারটী পৌঁছান মাত্র সিগনাল বাতি সাদা বা সবুজ হবার আগেই সে রওনা হল। মদন মিয়ার চোখে এটা হল Violation of the rules of the game, আমাদের জাহাজের মাথার উপর থেকে গম্ভীর কণ্ঠে অপর জাহাজটীকে উদ্দেশ করে বললে "সাদা বাতি জ্বর নাই, চলি যাও যে?" এই বলে গম্ভীরতর কণ্ঠে আদেশ দিল, "আবেদ, নঙ্গর তোল্।" ধীরে ধীরে নঙ্গর তুলে আমরা মন্থর গতিতে বানরীপাড়ার খাল বাঁয়ে রেখে কাউখালীর খালে প্রবেশ করলাম। অল্প কোয়াশা, সার্চলাইট ভাল খেলছে না। শুনলাম রাত্রি দুটো তিনটের সময় বরিশাল পার হব। আমাদের ছোট সারেং এমতাবস্থায় আলি দেওয়ান বলে গেল যে স্রোতের সাহায্য পেলে আমরা আর ছত্রিশ ঘণ্টায় গোয়ালন্দ পৌঁছব।

সকাল-বেলা—

ভোর বেলায় কেবিন থেকে বেরিয়ে দেখি একটা বড় নদীতে এসে পড়েছি। ষ্টীমার দাঁড়িয়েছে এবং একজন পাইলট নেমে যাচ্ছে। এ হল আমাদের চতুর্থ আড়কাটী, বোধ হয় খালকাটিতে উঠেছিল, এখানে নেমে গেল। নতুন যে পাইলট উঠে এল তার নাম লালজী—অতি বৃদ্ধ, খালি গায়ে একটা চাদর জড়ান। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে জায়গাটার নাম নন্দীবাজার, যমুনা নদীর উপরে; আমরা মোড় নিয়েই আড়িয়ল খাঁ পড়ব এবং মাদারিপুর পর্যন্ত আড়িয়ল খাঁ হয়ে একটী খালে ঢুকব এবং সেই খাল দিয়ে চরমুগুরিয়া হয়ে কুতবপুরে পদ্মায় পড়ব। রাত্রি তিনটের বরিশাল পার হয়েছি।

আড়িয়ল খাঁ। নামটী শোনবামাত্র সমস্ত কল্পনা উন্মত্ত হয়ে উঠল। কেন জানি না, পূর্ববঙ্গের সমস্ত নদীর মধ্যে এই নদীর নামটী ছেলেবেলা হতেই আমার কাছে সব চেয়ে রোমাঞ্চকর মনে হয়েছে। পদ্মা অবশ্য সব চেয়ে বড় নদী, তার সঙ্গে পরিচয়ও অল্প বিস্তর আছে—আড়িয়ল খাঁ আমার সম্পূর্ণ কল্পনার নদী, একেবারেই অদেখা—তবু কতদিন যে পদ্মার চেয়েও এই নামটীতে বেশী রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি তার ইয়ত্তা নেই। বোধ হয় নামটীর মধ্যে মুসলমানি আমেজ এবং তার সঙ্গে কেমন যেন নবাব-বাদশাহী ঐশ্বর্য ও উদ্দামতার ধারণা ('খাঁ' বলতে কেমন যেন উদ্দাম পুরুষালি majesty-র কথা মনে আসে।)—আর সেই সঙ্গে ছেলেবেলায় পড়া কোনও একটী উপন্যাসে বর্ষার উন্মত্ত আড়িয়ল খাঁর উদ্দাম ডাক ও উদ্দাম কলরোলের বর্ণনা—এ দুটী মনের মধ্যে গভীর হয়ে বসে আছে। তাই আড়িয়ল

যাঁর নাম শুনলে, পশ্চিমবঙ্গবাসী আমি, মন উদাস রোমাঞ্চে বরাবরই চঞ্চল হয়ে ওঠে, এতই চঞ্চল হয় যে পদ্মার নামেও তেমন হয় না। বইয়ে পড়া সেই আড্রিয়ল খাঁর অশান্ত উন্মাদ ডাক আজও যেন আমার মনের মধ্যে ডাকতে থাকে।

সেই আড্রিয়ল খাঁ! সাগ্রহে চেয়ে আছি—আমরা নলীবাজার পার হয়ে আস্তে আস্তে আড্রিয়ল খাঁয়ে এসে ঢুকলাম। এই কি সেই নদী? কূলে কূলে ভরা, পাড়গুলি জলের সঙ্গে মিশে গেছে (এদিককার কোন নদীরই তটভূমি উঁচু নয়,একেবারে জলের লাগোয়া,বর্ষাকালে নিশ্চয়ই দুপাশে বহুদূর প্লাবিত হয়ে যায়), এক মাইল দেড় মাইল চওড়া। কিন্তু বড় গাছের সারি তটভূমি হতে বহু দূরে, দুধারের বড় গাছের সারের মধ্যে ব্যবধান আড়াই তিন মাইল হবে। বোঝা গেল, এখন যেখানে ধানখেত বা চর, বর্ষায় সেগুলি প্লাবিত হয়ে দুই ধারের বড় গাছের সার পর্যন্ত নদীর সীমানা বিস্তৃত হয়। এখন নদী তার চেয়ে বহু ক্ষীণকায়—মোটের উপর শান্তও। কিন্তু খুলনা-যশোর জেলার নদীর মত এ আর ঘরোয়া নদী নয়। ধারে বিশেষ কোনই বসতি নেই। মধ্যে মধ্যে ধানের ক্ষেত অথবা চর—আর ধূ ধূ করছে নদী। ক্বচিৎ দু একটা টিনের ঘর। আশ্চর্য লাগল, যখন নদী বর্ষায় চারপাশ প্লাবিত করে বহুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করে তখন এই ঘরগুলি ভেসে যায় না? আর ভেসে না গেলেও এরা থাকে কেমন করে? গ্রাম তো বহুদূরে? উন্মত্ত জলরাশির মধ্যে একটি ছোট টিনের ঘরে একটী কি দুটী প্রাণী থাকে কি করে? নিশ্চয়ই নদীর সঙ্গে তাদের মিতালি আছে। যখন বান ডেকে নদী তাদের চারপাশে ঘিরে ধরে তখন তারাও নিশ্চয়ই জোর হাতে বৈঠা ধরে নদী পার হতে একটুও ইতস্ততঃ করে না। আর ঘরোয়া কোনও দৃশ্যও চোখে পড়ে না, যেমন বসুমতীর পাশে পাশে পড়ে। অকূলবাবু ঠিকই লিখেছেন যে "এ নদীতে উদার পদ্মার মুক্তির ডাক এসে পৌঁচেছে।" উপরে শেষ শরতের নির্মল প্রসন্ন আকাশ, সাদা সাদা মেঘ, নীচে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর ফাঁকা, কোনও কিছুতে দৃষ্টি রুদ্ধ হবার নেই, বাঁকের মুখে নদীর সীমানা পাওয়া যায় না; এদিক ওদিকে বড় বড় খাল বেরিয়েছে, ডাইনে এবং বাঁয়ে বহুদূরে বড় গাছের সার ঈষৎ নীলাভ হয়ে দেখা যাচ্ছে, কাঁচা হলুদের মত রোদে ধানখেতগুলি অপরূপ দেখাচ্ছে, ক্বচিৎ দু' চারটে পালতোলা নৌকো চলছে। আমরা স্থিরগতিতে বিনা আয়াসে জলের উপর দিয়ে ভেসে চলেছি, গায়ে সুরসুরে হাওয়া লাগছে, মন কেমন একটা অনির্বচনীয় রসে ডুবে আছে।

বেলা একটার সময় নদীর বাঁকে মাদারিপুর দেখা গেল। নদীর ধারে টিনের ঘর, স্টীমার ষ্টেশন, কিছু নৌকা। মিনিট দশেকের মধ্যেই আর একটী বাঁক পার হয়ে চরমুগুরিয়া দেখা গেল। গোয়ালন্দর আগে কোথায়ও আমাদের থামবার কথা নয়। কিন্তু এখানে আমাদের একটী প্লাট ছাড়তে হবে, তাছাড়া আমাদের কিছু সব্জী কিনবার দরকার হওয়ায় সারেংকে থামবার জন্য অনুরোধ করার ফলে এখানে স্টীমার থামল। আজ

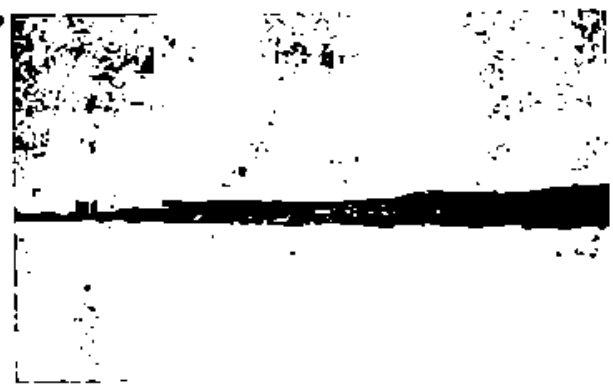

দূর হইতে গোয়ালন্দ

হাটবার, হাট লেগেছে। তরকারির মধ্যে বেগুন, আলু, পেঁয়াজ, হলুদ বিক্রি হচ্ছে। আম পাওয়া গেল। ডাব কলাও পাওয়া গেল। হাটে রকমারি জিনিস চোখে পড়ল। পূর্ববঙ্গে অধুনা বিখ্যাত বা কুখ্যাত দাদা হাঁড়ি ও কালো হাঁড়ি বিক্রি হচ্ছে। শোনা যায়, সাম্প্রদায়িক বিভেদ এতই চরমে উঠেছে যে দুই সম্প্রদায় একই রঙের হাঁড়িও ব্যবহার করতে পারে না। আলাদা রঙের হাঁড়ি ব্যবহার করে। মাটির ছাচ (পিঠে গড়বার) বিক্রি করতে এনেছে। এক জায়গায় দেখলাম বেদের মেয়েরা চিকিৎসা করছে, সামনে নানা রকম হাড় জড়িবুটী নিয়ে বসে আছে—তারই সাহায্যে মাথাধরা, বাত ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা চলছে। কিন্তু মাছ বা দুধ অনেক সন্ধান করেও পাওয়া গেল না। পশ্চিম বাংলার লোকদের কাছে পূর্ববঙ্গে

সুলভ দুধ ও মাছ প্রায় গল্প কথার মত লোভনীয়, কিন্তু সেই দুটীই অনুপস্থিত। যুদ্ধের ছায়া এসব সুখ সুবিধা গুবে নিয়েছে। তার উপর এবার এ সব অঞ্চলে জলপ্লাবন হয়ে যাওয়ায় তরিতরকারী সবই দুর্মূল্য—বাইরের আমদানি জিনিষে চলছে। একটা আম পাঁচ আনা, বেগুন আট আনা সের, আলু পাঁচ সিকে সের, কই মাছ তিন টাকা কুড়ি। আমাদের সারেং এবং খালাসিরা কিছু মুরগী কিনল, বড় মুরগী একটীর দর সাড়ে তিন চার টাকা।

চরবুগুরিয়ায় একটী ক্ল্যাট ছাড়া হল বটে, কিন্তু নতুন একটী এসে জুটল। আমাদের সিধে গোয়ালন্দ যাবার কথা ছিল, কিন্তু এটীকে তারপাশায় পৌছে দিয়ে তবে গোয়ালন্দ যাবার অর্ডার এসেছে। তার অর্থ, আমরা কুতবপুরে পদ্মায় পড়ে বাঁয়ে না বেঁকে অকারণে ডানদিকে তারপাশা পর্যন্ত যাব। এতে অবশ্য আমাদের লোকসানের চেয়ে লাভই হল। ষ্টীমার গোয়ালন্দ পৌছানর কথা ছিল ভোরবেলায়, অথচ আমাদের চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসের জন্য বেলা তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হত। যদি ষ্টীমার বেলা এগারোটার সময় গোয়ালন্দ পৌছায় তাহলে স্নানাহার করে বেশ নিশ্চিন্তে নামা যেতে পারবে, অপেক্ষাও করতে হবে কম, পদ্মার দৃশ্যও কিছু দেখা যাবে।

চরবুগুরিয়ার কিছু আগেই আড়িয়ল খাঁ ত্যাগ করে চরবুগুরিয়ার খাল ও ময়নাকাটার খাল হয়ে আমরা কুতবপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা আটটার সময় কুতবপুর পৌছন গেল। শুনলাম প্রকৃত পদ্মায় পড়তে আমাদের প্রায় আরও একঘণ্টা লাগবে।

বুধবার—

কাল প্রায় দশটা রাত্রে দেখা গেল ষ্টীমারের সার্চলাইটে একদিককার কূল পাচ্ছে বটে কিন্তু অন্যদিকের কূল পাচ্ছে না। সেই সঙ্গে জলের চেহারাও বদলে গেল। বোঝা গেল পদ্মায় পড়েছি। রাত্রি বারটা নাগাৎ ভাগ্যকুল পৌছে আমাদের সঙ্গী ক্ল্যাটটীকে সেখানে রেখে তারপাশা-গামী ক্ল্যাটটীকে নিয়ে তারপাশা রওনা হলুম। সেখানে সে ক্ল্যাটটীকে পৌছে দিয়ে ফিরবার পথে আমাদের সঙ্গী ক্ল্যাটটীকে আবার নিয়ে গোয়ালন্দর দিকে যাত্রা শুরু হল। ভোরবেলার আলো ফুটতেই চোখে পড়ল পদ্মার বিরাট জলরাশি; আমরা ডান পাড় ঘেঁষে চলেছি, বাঁ পাশের পাড় নজরেই পড়ে না, শুধু নীলাভ রেখা চোখে পড়ে মাত্র। দু একটা সাদা-গেরুয়া পাল-তোলা নৌকো ভেসে আসছে। পূর্বে পদ্মায় বহু নৌকো থাকত, এখন তার সংখ্যাল্পতার কারণ বোধ হয় নৌকা-বিতাড়ন নীতি। স্থানে স্থানে পাড় ভাঙছে, খেজুর গাছ কয়েকটা ভাঙনের মুখে জলে ঝুঁকে পড়েছে। নানা ষ্টীমার যাওয়া আসা করছে। 'গুরখা' ও 'ভামো' বলে দুটী ষ্টীমার সৈন্য বোঝাই হয়ে গোয়ালন্দের দিকে চলে গেল। আপ ঢাকা এক্সপ্রেসের ষ্টীমার আমাদের পার হয়ে ঢাকা অভিমুখে গেল।

প্রায় বারটার সময় আমরা গোয়ালন্দে পৌছলাম। গোয়ালন্দ একটা খুব বড় গঞ্জ বলে ধারণা ছিল, কিন্তু নদীর ধারে তার কোনও পরিচয় মিল্‌লো না। শুটিকয় টিনের ঘর, একটা ক্ল্যাটে ষ্টেশন-আফিস, একটা ওয়েটিং ক্ল্যাট, সাত আটটা ষ্টীমার দাঁড়িয়ে আছে, 'এদু' নামক চাঁদপুরযাত্রী ষ্টীমার আপ চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসের জন্য ঘাটে লেগে আছে, 'ভঁইসা' নামে একখানি ছোটো লঞ্চ এদিক ওদিক যাতায়াত করছে। মাছের বাজার শোনা গেল একমাইল দূরে।

সারেংকে বিদায় জানিয়ে আমরা ধীরে ধীরে ষ্টীমার ছেড়ে নেমে এলাম। ক'দিন ষ্টীমারে ঘর বাঁধার পর তা ছাড়তে যেন মায়া লাগছিল। নদীপথ এবং জলযানের সঙ্গে আত্মীয়তা ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে। আমাদের নামিয়ে দিয়ে কোহিনূর ব্রহ্মপুত্র অভিমুখে রওনা হল। আমরাও অপেক্ষমান ডাউন চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসে উঠে বসলাম।

বাস্তবিক বাংলাদেশের কত বিচিত্র রূপ আছে তা যাঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল দেখেন নি তাঁরা অনুভব করতে পারবেন না। একদিকে বীরভূমের কাঁকর ছড়ানো লাল-গেরুয়া মাঠ আর তালবন শালবন, অন্যদিকে সুন্দরবনের জলে-ভরা গাছে-ঢাকানিবিড় শ্যামল সৌন্দর্য্য—একদিকে রাঢ়ের অবারিত দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, অন্যদিকে পদ্মার দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি—এগুলির আস্বাদ এতই বিচিত্র এবং নতুন রকম যে কথায় তা বোঝানো যায় না। বিশেষতঃ সুন্দরবনের দৃশ্য একেবারেই নতুন মনে হয়। প্রকৃতি নিজে তাকে যেন বাগান সাজিয়েছেন, সে বাগান আজও তার আদিম সৌকুমার্য্য থেকে ভ্রষ্ট হয় নি। গাছে জলে ছোঁয়াছুঁয়ি, বড় নদী ছোট খাল মাটিকে চকচকে করে রেখেছে, রস

জোগাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। দুপাশে সবুজ বনবিথিকা, তার মধ্যে রূপালি জল একখানি বাঁকা ইস্পাতের ফলার মত ঘুরে ঘুরে গিয়েছে, চারপাশে গম্ভীর অপচ প্রসন্ন শান্তি—কলিকাতাবাসীর পক্ষে এ অনুভূতি একেবারেই নতুন। যাঁরা কলিকাতায় অবিরাম কলকোলাহলে অভ্যস্ত, কানে দিনরাত কোনও না কোনও আওয়াজ প্রবেশ করবেই, গভীর নিথর অন্ধকার কখনও দেখা যায় না, কোনও না কোনও আলো রাত্রিকে ক্ষত করবেই—তাঁদের পক্ষে এই ঝিঁঝি ডাকা নিস্তব্ধতার এবং জোনাকি জ্বলা অন্ধকারের নিবিড় প্রশান্তি আশ্চর্যরকম মানসিক বিশ্রাম। আর শুধু বিশ্রাম নয়, সেই সঙ্গে নতুন আস্বাদ আর বিচিত্র অনুভূতি।

মিশরের ডায়েরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

আমি মিঃ মহীউদ্দিনের সঙ্গে রওয়াক্-উল্-হসুদ্‌এর দিকে রওনা হ'লাম। আজ্‌হারএর শেষ সীমানাস্থিত বহু প্রাচীন ইমারৎ ভেঙ্গে ফেলা হ'য়েছে। তার সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র মসজিদও বিশ্লিষ্ট হ'য়ে গেছে। কারণ এই প্রান্তরে নূতন ক'রে আজ্‌হারএর জন্য পুষ্পবাটিকা নির্ম্মিত হ'বে। আমরা আজ্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখার মধ্যে দিলাম। ছোট ছোট শিশুরা বেঞ্চে ব'সে ব্লাক-বোর্ড সম্মুখে ক'রে কবিতা মুখস্থ করছিল দুহাত দুলিয়ে, যেমনি ক'রে আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা অভ্যাস ক'রে। আজ্‌হারের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষালয়গুলি সবই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। যে প্রাথমিক পাঠ অভ্যাস করে এবং যে অত্যুচ্চ শ্রেণীতে গবেষণা করে, উভয়েই আজ্‌হারী। মিঃ মহীউদ্দিন ব'লেন যে, আজ্‌হার সম্বন্ধে পৃথিবীর বহু স্থানে অনেক ভ্রান্ত ধারণা র'য়েছে—একজন আজ্‌হারী বলে পরিচয় দিলেই তাকে মুসলিম সমাজে বিরাট পণ্ডিত ব'লে মনে করা হয়। ভারতবর্ষে দু'একটি মুসলমান আজ্‌হারএর অতি প্রাথমিক শিক্ষালাভ ক'রে মিশরের শেখ্ ব'লে পরিচয় দিয়েছে এবং লোকচক্ষুতে যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জ্জন ক'রেছে। অবশ্য আজ্‌হারএর শেখ্—যিনি সমস্ত স্তরগুলি বিধিবিহিতভাবে অতিক্রম ক'রেছেন—তিনি পণ্ডিত। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশেই রওয়াক্-উল্-হসুদ্।

আজ্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বহু বৃত্তি ও দান র'য়েছে। সেই অর্থের উপস্বত্ব থেকে এবং সাময়িক দানের অর্থ থেকে বহু ছাত্রের বাসস্থান এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। বিশিষ্ট উৎসব উপলক্ষে কেহ কেহ সাময়িক খাদ্যাদি আজ্‌হারএর ছাত্রগণকে 'জিয়াফত' করেন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ ও চীন ভিন্ন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের রাষ্ট্রশক্তি মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন রওয়াক্ তৈরী ক'রেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থাও ক'রেছেন। আজ্‌হারএর সমস্ত ছাত্রই বিনা বেতনে শিক্ষা পায়। পূর্ব্বে উৎসবে প্রতিদিন দশ পয়সা হিসাবে খাদ্যের জন্য খয়রাত পেত। ইদানীং ভারতবর্ষ ও চীনের (জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীন) ছাত্রেরা এই দান গ্রহণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াকফ্ (ক্ষেত্রের বিভাগ) একটু বেশী সাহায্য করেন। রওয়াক্-উল-হসুদ্ আজ্‌হারএর ছাত্রাবাসের অংশবিশেষ। মিশরে মাটির নীচে ঘর তৈরারী হয়। অবশ্য সাধারণতঃ মাটির নীচের ঘর গুদাম, চাকর ও কর্ম্মচারীর বাসস্থান এবং রন্ধনশালা রূপে ব্যবহৃত হয়।

বেদুইন পরিচ্ছদে লেখক

রওয়াক্-উল্-হসুদ্ পশ্চিমমুখী বারান্দাযুক্ত একটি দু-মিহল প্রকোষ্ঠ; এই প্রকোষ্ঠে দুইটি কক্ষ আছে। উভয়কক্ষের মধ্যে একটি ঘাট এবং একখানি কম্বল। প্রতি বৎসর শীতকালে ছাত্রদের একখানি ক'রে কম্বল খয়রাত করা হয়। বারান্দায় জলের কল ও রন্ধনের ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমানে এই রওয়াক-উল্-হসুদে দুইজন বাঙ্গালী মুসলমান এবং একজন

চীনদেশীয় মুসলমান হজ্ করে আসেন। তাঁদের একজন প্রায় দশ বৎসর আছেন। তাঁর নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলায়, নাম লোকমান সিদ্দিকী। দ্বিতীয় সাধনার অধিবাসী, তুর্কের মুলুক এসেছেন, সারে হাঁটা পথে কেরাসানের থেকে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য ক'রে। তিনি এখনও আজ্হারএ ছাত্ররূপে গৃহীত হ'বার অনুমতি পান নাই। তিনি মিঃ মহীউদ্দিনকে অধ্যাপক হাবিবকে ব'লে তাঁর থাকবার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে অনুরোধ ক'রলেন। লোকমান সিদ্দিকী আমার কাছে দুঃখ ক'রলেন—হওয়াক্-উল্-হমুদের "মুফীয়" (শিক্ষক) একজন বাঙ্গালী মুসলমান। তিনি বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন এবং এই নিয়ে লোকমানের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত কয়েক মাস আগে লোকমান বাঙ্গালীর এই অপমান সহ্য ক'রতে না পেরে মাস্রাজীটির মাথায় লগুড়াঘাত করে। এই ব্যাপারটি আদালত পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল। লোকমান এই কথাগুলি খুব রাগের সঙ্গে আমাদের ব'লে গেলেন। তিনি আমাকে তাঁর হওয়াকে

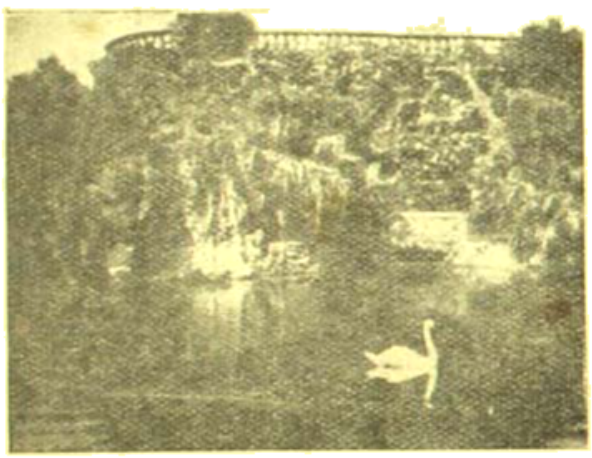

ছ-বীপ—জাজিরাৎউল্-সার

এসে একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে অনুরোধ ক'রলেন। এই প্রবাসী বাঙ্গালী ভায়ের সুবেশ এবং আত্ম-সম্মান জ্ঞান আমার বেশ ভাল লাগল।

লোকমান আমাকে ব'ল্লেন,—এখানে আবু আস্ মাবক একজন ফুলতানিবাসী মুসলমান প্রায় ছুটি বৎসর আছেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়ার আপনার সঙ্গে দেখা ক'রব। আমরা হওয়াক্ থেকে প্রায় দেড়টার সময় ফিরে এসে আজ্হার মস্জিদে প্রবেশ ক'রলাম।

৩রা অক্টোবর, '২৩

আজকে তোরবেলা ওয়াই-এম্-সি-এতে কাটালাম। পরশুর জাপানী যুদ্ধমূর্ত্তির পাশে দাঁড়িয়ে তোলা ছবি ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলাম। আমার মাথার আরাবান টুপী দেখে আমারই হাসি পাচ্ছিল। মুলুকের আমার ঘরে একজন মাদ্রাজী, সুদূর হাভিলার কেরালী এলেন। ওয়াই-এম-সি-এ হোষ্টেলে মাদ্রাজীর সংখ্যাই বেশী। এরা এম্ ই এস্ (মিডেল-ইষ্ট-ফোর্স) এর অন্তর্গত। ছোট ছোট ছুটিগুলি এরা এই ওয়াই-এম-সি-এ হোষ্টেলে কাটায়। এখানে স্নান, খাওয়া, রেডিও, খবরের কাগজ, তাস, পাশা, বাক্, পিঙ্-পঙ্, কেরম খেলার বন্দোবস্ত র'য়েছে। এই কাণ্টিনে নিত্য ব্যবহারের অনেক জিনিস কিনতে পাওয়া যায়, যথা,—খাম, পোষ্টকার্ড, কাগজ, টাকটিকিট, পাম্মা, বোতল, আতরওয়ার, মাথার তেল, চিরুণী, ব্রস, চকলেট, টফি ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয় সিগারেট। মিশরীয় সিগারেটের বাইরে খুব নাম আছে, যদিও এখানে কোন তামাক পাতা জন্মায় না। সিগারেটের দাম এখানে ভারতবর্ষের চেয়ে তিনগুণ। বাটায় একটি সুতার দোকানে এই ওয়াই-এম-সি-এ কাণ্টিনে আছে। চা, হিন্দুস্থানি সেও, মাছ্, জিনিসও পাওয়া যায়। ভোর আটটা থেকে দুটো, এবং বিকাল চারটে থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। ভোজনের রেকফাষ্টের জন্য ডিম, পাওরুটি, মাখন, চা, পাওয়া যায়। দুপুরে ডিনারের জন্য অনেক রকম বন্দোবস্ত র'য়েছে। যার যেমন অভিরুচি সে সেই দাম দিয়ে তাই খেতে পারে, অবশ্য অফিসার এবং সাধারণ সৈন্যদের জন্যে একই জিনিসের

গ্যাবী যুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে ভোজ

দামের তারতম্য আছে। রাত্রে ডিনারেরও তাই ব্যবস্থা। প্রত্যেককে খোরাক বাবদ জন্য ভাড়া দিতে হয় মৈমিক পাঁচ পিয়াষ্টার (পাঁচে বার আনা)। তার মধ্যে রুটি, মেষমাংস, দুইটি কমলা, একটি ডিমসিদ্ধ চায়ের,

একটি বালিশ এবং একটি টেবিল দেওয়া হয়। স্নানের অবশ্য অতিথিনিবাসের বেশ ভাল। কিন্তু সৈন্যদের ব্যবস্থা অতি সাধারণ।

আমার সঙ্গে কয়েকজন বাঙ্গালী চিকিৎসা বিভাগের কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁর অধীন চার্টার্ড প্লেনের সেবক এইমাত্র ইতালি থেকে এসেছেন। পাওয়ার টেবিলে লিবিয়া, গ্রীস এবং ইতালির গল্প ক'রলেন। কাহিনীগুলি খুবই হৃদয় এবং তাঁর অভিজ্ঞতা বিচিত্র।

মিঃ মহীউদ্দিন ছটার সময় আমাকে ফোনে জানালেন,—ডাঃ হাসান তাঁকে আমার বাসস্থান সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছেন। সিভার পথে রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিদূরে বায়েৎ-উল-আরাবী নামে একটি আরব মেসের ছাত্রাবাসে একটি প্রকোষ্ঠ আমার জন্য নির্দ্ধারিত হ'য়েছে, দক্ষিণা মাসিক দশ পাউণ্ড (১৩৫৲)। তিনি বলেন যে, কাল আমাকে নিয়ে যাবেন। সেখানে তাঁর অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেবেন।

সন্ধ্যায় শেখ লোকমান এবং আবু বক্কর ফুপালী আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। ফুপালী এসেই প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, মহীউদ্দিনের সঙ্গে আমার কি ক'রে পরিচয় হ'ল? এবং আমাকে সাবধান করিয়ে দিলেন যে ওর সঙ্গে যেন মেলামেশা না করি। কারণ, মহীউদ্দিন একজন গুপ্তচর (?)। এ সংবাদ তিনি ব্রিটিশ কন্‌সালেট থেকে পেয়েছেন। লোকমান এ বিষয়ে ভাল-মন্দ কিছুই ব'লেন না। আমি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে আবু বক্করের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম, সত্যি কি তাই? মনে একটু অস্বস্তি বোধ ক'রলাম। তারপরে আবু বক্কর লেখাপড়া সম্বন্ধে এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য ও কর্ম-ধারার আলোচনা ক'রলেন। দেখলাম, অল্পলোক লেখাপড়া জানেন। তিনি মহীউদ্দিনের উপর অত্যন্ত চটা। তিনি নিজেকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ছাত্র ব'লে পরিচয় দিয়ে গর্ব্ব অনুভব ক'রলেন, অথচ মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকীর বন্ধু ব'লেও খুব তৃপ্তিলাভ ক'রলেন।

৭ই অক্টোবর, '৪৪

মিঃ মহীউদ্দিন ন'টার সময় ওয়াই-এম-সি-এতে এলেন। কাল আবু বক্করের নিকট থেকে ওঁর বিষয় শুনে মনটা একটু তিক্ত হ'য়ে র'য়েছে। বাইরে ওঁকে কিন্তু প্রকাশ ক'রলাম না। শুধু নিজে একটু সাবধান হ'তে বাধ্য হ'লাম। আমরা বায়েৎ-উল-আরাবীর দিকে চলাম। প্রায় ওয়াই-এম-সি-এ থেকে দশ মাইল ঘুরে পিরামিডের পথে একটী ঘুরে ত্রিতল গৃহ, উত্তর ও পূর্ব্বদিক উন্মুক্ত। আমার কক্ষটী নীচে। চারটী জানালা র'য়েছে। সামান্য একটু বসবার ঘর, পাশে স্নানাগার;—লোহা, ড্রেসিং টেবিল, ইজিচেয়ার, রাইটিং টেবিল, ড্রেসিং বুরো, বড় আয়না,—বেশ সুব্যবস্থা। বিছানা, স্প্রিংএর খাট, পুরু জাজিম, তোষক, ধব্‌ধবে লম্বা বিছানার চাদর, দু'টী কম্বল—জিনিষগুলি বেশ ভাল। মালেকার আমাকে খাবারের ঘর, চায়ের ঘর, রক্ষণশালা, স্নানের ঘর,—দেখিয়ে দিলেন। আমি ইচ্ছা করলে বাইরে খেতে পারি,—তিনি ব'লে দিলেন। আমি যখ পাউণ্ড মাসিক ভাড়া দিয়ে অগ্রিম টাকা দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ মিঃ মহীউদ্দিন ব'লেন—আপনি ইচ্ছা ক'রলে 'তালাবাৎ-উৎ-সারকি-ইন্ডী'এ থাকতে পারেন। তাতে আপনার মাসে যখ পাউণ্ড বেঁচে যাবে। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে ব'লাম,—এটা সরীব শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা; আমি একজন অধ্যাপক এবং মিশরে অবস্থানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে টাকা দিচ্ছেন, এ অনুগ্রহের দান আমি গ্রহণ ক'রতে পারি না। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষেও

ভারতীয় সৈনিকদের এক প্রীতি সম্মেলনে লেখক

প্রমাদকর। সুতরাং এই অনুগ্রহ একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিলে আমি কৃতার্থ হ'ব। আপনি ডাঃ হাসানকে আমার হ'য়ে ধন্যবাদ জানাবেন। যা' হোক, আমি মালেকারকে টাকা দিয়ে ব'লাম,—কাল বেলা দশটার সময় এখানে আসব।

প্রায় বারটার সময় আমরা এসে রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ হাসানের সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি আমাকে বলেন—বায়েৎ-উল আরবীতে থাকবার একটী সর্ত্ত হ'চ্ছে—এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রিষ্ট থাকা চাই। সুতরাং তিনি আমাকে ডি. লিট্ উপাধির জন্য গবেষণার অনুমতি চাইতে ব'লেন। আমি ব'লাম—আমার পক্ষে দুই বৎসর এদেশে থাকা অসম্ভব। তিনি ব'লেন,—আপনি একটী পত্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে

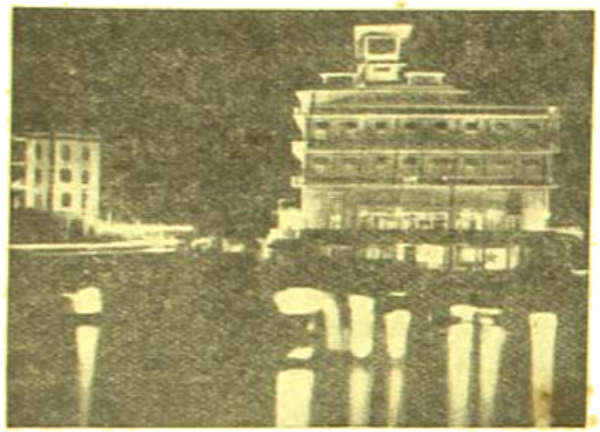

লেখকের হোটেল

পাঠিয়ে দিন। তার উপর নির্ভর ক'রে আমি আপনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা ক'রব।

ডাঃ হাসান অত্যন্ত ভদ্রলোক। তাঁর অফিস ঘরটি অতি সুসজ্জিত। মেঝেতে মূল্যবান কার্পেট। অভ্যাগতদের জন্য গদি-আঁটা চেয়ার, তাঁর নিজের ঘূর্ণায়মান চেয়ার, অতিকায় বিচিত্র কারুকার্যময় টেবিল, রেডিয়ো কলবসানি, দু'টি টেলিফোন—একটী সংবাদ প্রেরণের, অপরটী সংবাদ গ্রহণের। এখানে প্রত্যেক বড় কর্মচারীর দু'টী ক'রে টেলিফোন থাকে। তার বসবার ঘরের একপাশে সভা-কক্ষ। আর একটু দূরে সেই কক্ষে ভোজনের ব্যবস্থা। এখানে একজন কর্মচারীর অন্ততঃ দুইটী কক্ষ। সমস্ত ডিরেক্টরেটই রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় উপযোগী রাজকীয় ব্যবস্থা। ডাঃ হাসান তিন জন ডি ক্যাভালটি অফ আর্টস্। সুতরাং তাঁর সম্মান ও বিলাস-ব্যবস্থা তাঁর পদমর্য্যাদার উপযুক্ত।

দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে প্রদর্শনী

বর্ত্তমানে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া দুর্ভিক্ষের যে করালমূর্ত্তি ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহা যে পঞ্চাশের মন্বন্তরকে অতিক্রম করিয়া যাইবে তাহা এখন অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বাহির হইতে খাদ্যশস্যের আমদানি করিতে না পারিলে দুর্ভিক্ষ রোধ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। এ বিষয়ে সরকারী চেষ্টার ত্রুটী নাই, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বহু আশা পাওয়া গেলেও এক কণা তণ্ডুলও পাওয়া যায় নাই।

সকল দিক আলোচনা করিবার জন্য এবং সরকারী বে-সরকারী সকলের মনোযোগ ও দৃষ্টি একাগ্রভাবে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মসচিব শ্রীশৈলপতি চট্টোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশে কমার্শিয়াল মিউজিয়মে একটী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। অবস্থা অত্যন্ত গুরু এবং এরূপ প্রদর্শনীর কিরূপ প্রয়োজন আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ৯ই যে কলিকাতার মেয়র মিউজিয়মের একাংশ বাহিকী উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। কলিকাতার কমার্শিয়াল মিউজিয়মই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক এবং শিল্পবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সকল ব্যাপারে এরূপ মিউজিয়মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি দিবার মূল্যবান এক বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে কথা বলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দেশের মধ্যে যদি বৎসরের পর বৎসর অন্নকষ্ট থাকে, আর লোকে তাহার জন্য বিব্রত থাকে, তাহা হইলে শিল্প বাণিজ্য সকলই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকে অন্যান্য বিষয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ে অক্ষম এবং তাহার ফলে শিল্পও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ধনী অপেক্ষা মধ্যবিত্ত লোক সংখ্যায় অধিক এবং অধিকতর পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। তাহারাই যদি অন্নাভাবে বিব্রত থাকে, শিল্পজাত দ্রব্যের ক্রেতার অভাব ঘটে। এরূপ অবস্থায় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব নয়। অন্ন না থাকিলে লোকে অন্যাহারে মরে; কিন্তু যাহারা জীবন্মৃত হইয়া থাকে, তাহারা সমাজের ভারস্বরূপ। তাহাদের কিঞ্চিৎ আয়বৃদ্ধি করিতে পারিলে তবে তাহারা সুস্থ সবল জীবন যাপন করিতে পারে। কৃষি না হইলে খাদ্যদ্রব্যের অনুপলব্ধি ঘটে এবং কৃষির উন্নতি এই ভাবে প্রয়োজন। তাহাই অন্নকষ্ট দূর করিবার মূল উপায়। তাহা ছাড়া শিল্পের প্রসার না হইলে লোকের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। উদ্বৃত্ত পয়সা হাতে না থাকিলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেই অনেকের অনশন অর্দ্ধাশন ঘটিতে থাকে। ইহার সঙ্গে পশুপালন বিশেষ প্রয়োজন। অবসর সময়ে যেমন কুটীর শিল্প পরিচালনা করা যায়, সেই ভাবে পশুপালন করা চলে। পশুপালন দ্বারা দুধ মাংস ডিম প্রভৃতি পাইলেই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মিটে এবং লোকের আয় বৃদ্ধিও হয়। কৃষি, শিল্প ও পশুপালন—এই তিনের সমন্বয়ে দেশের অন্নাভাব দূর করিয়া জাতিকে সুস্থ সবল করা যাইতে পারে। তাহা না হইলে কোনও কালেই দুর্ভিক্ষ রোধ করা যাইবে না; দেশের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইবে। কমার্শিয়াল মিউজিয়মকে, তিনি এই দিকে দিবের লক্ষ্য রাখিয়া, প্রদর্শনীর আয়োজন করিতে বলেন। বাঙ্গালা সরকার সহযোগিতা দ্বারা প্রদর্শনীকে পূর্ণাঙ্গ করায় তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সকল জ্ঞান আরও ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়া প্রয়োজন, সুতরাং বে-সরকারী প্রদর্শনীতে সরকারী সহযোগিতা একান্ত দরকার। ডাঃ অমূল্য চন্দ্র কলিকাতায় একটী স্থায়ী কৃষিপ্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সমীচীন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এখন বিজ্ঞানের যুগ; চিকিৎসা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি ব্যাপারে যেমন বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, সেই

ভাবে কৃষির ব্যাপারে বিজ্ঞানের সাহায্য লইলে অন্নাভাব দূর করা কষ্টসাধ্য নয় বলিয়া তিনি মনে করেন।

কর্পোরেশনের প্রধান কর্মসচিব শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়ের পরিকল্পিত প্রদর্শনীর উপযোগিতা বোধ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সর্বপ্রকারে সাহায্য দান করিবার জন্য খাদ্য বণ্টন বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর ডাঃ কে-মিত্রকে প্রেরণ করেন। ১০ই মে তিনি মানকল্পে বর্তমান লংকিপ্ত রেশনের প্রভাব সম্পর্কে সরকারী মনোভাব ব্যক্ত করেন। ডাঃ মিত্রের মতে বর্তমানের রেশন হইতে মাত্র ১২০০ ক্যালরি পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজন ২৪০০ বা ২৬০০ ক্যালরি। দেশের মধ্যে তণ্ডুলের অভাব তাঁহাদের এই সংক্ষেপিত রেশন দিতে বাধ্য করিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার প্রভাব মাতির পক্ষে অতিকর। হয়ত সে কথা ঠিক নয়; কারণ যে তণ্ডুল সরকার যেন তাহা ছাড়া মানুষ অন্যান্য নানারকম খাদ্য খাইয়া থাকে। শাক পাতড়া, ডাল কলাই, আম জাম ডাল প্রভৃতি খাদ্য হইতে প্রাপ্ত ক্যালরি তণ্ডুল হইতে প্রাপ্ত পুষ্টির সহিত যোগ দিতে হইবে। তাহা ছাড়া বোম্বাই ও মাদ্রাজে শিশু, রোগী, গর্ভিনী ও স্তন্যদায়িনী মাতার জন্য দুগ্ধ বণ্টনের ব্যবস্থা হইয়াছে। মাদ্রাজে মাল্ট তোলা দুধ বণ্টিত হইতেছে। এক সময় পেয়োক্ত দুধের প্রতি মানুষের যে বিরাগ ছিল তাহা দূর হইয়াছে। তাঁহার মতে লোকের অধিকাংশের কলাই মাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। যোগার বাজরা ভুট্টার অবশ্যই বাঙ্গালী রুটি খই প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া এ সকল খাদ্যগ্রহণ করিলে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিবে না। তাহা ছাড়া প্রতিদিন কিছু চীনাবাদাম ছোলা প্রভৃতি যে যেমন পারেন, তাহা গ্রহণ করিবেন। চীনাবাদামের আটা বা ময়দা অল্পপরিমাণে ব্যবহার করা চলিতে পারে। শ্রীযুক্ত মনমোহন বর্মণ সভাপতির বক্তৃতার পুরাতনপ্রথার রক্ষিত নানা খাদ্যাদির উল্লেখ করিয়া তাহা ভোজন করিতে বলেন। সরকারী ব্যবহার নানা রুটীর উল্লেখ করিয়া তিনি যাহাতে লোকে ডাল প্রভৃতি সহজে এবং অল্পমূল্যে পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন।

বাঙ্গালা সরকারের খাদ্য পরিকল্পনা জানিবার জন্য সকলের বিশেষ আগ্রহ। যতই দিন যাইতেছে, লোকের আতঙ্ক ততই ঘনীভূত হইতেছে। ১১ই মে বাঙ্গালা সরকারের মাননীয় কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মিঃ আহম্মদ হোসেনের সভাপতিত্বে মিঃ নির্মল দেব কৃষি বিভাগে যে সকল উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার পরিচয় দেন। বাঙ্গালা সরকারের খাদ্য বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ রাজন লোককে আশ্বাস দেন যে আতঙ্কের কারণ নাই। কিন্তু অবস্থা যে গুরুতর, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সকলে যাহাতে সর্বপ্রকারে খাদ্যের অপচয় নিবারণ, অতিরিক্ত আমদানী না-করা এবং সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টন প্রভৃতি নীতি পালন করেন সেই অনুরোধ জানান। পশু চিকিৎসা বিভাগের স্পেশাল অফিসার শ্রীযুক্ত প্রেমরঞ্জন বসু পালিত পশুর উন্নতি সাধন এবং যে সকল স্থানে প্রয়োজনাতিরিক্ত দুগ্ধ প্রভৃতি সময়ে সময়ে উৎপাদিত হয় তাহার সদ্ব্যবহারের উপায় নির্দেশ করেন। তাঁহার মতে এখনই প্রত্যেক বাড়ীতে এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাহাতে দুধ নষ্ট না হয়। আজকাল তাপ নিয়ন্ত্রণের অনেক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহার আশ্রয় লওয়া দরকার।

শ্রীযুক্ত মনমোহন বর্মণ ১২ই মে তাঁহার সংগৃহীত নানাপ্রকার শুষ্ক বা রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য দ্বারা মনুষ্যের কি ভাবে কয়েকদিনও প্রাণ রক্ষা করা যায়, সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরদিন 'মন্বন্তরে নারীদিগের কর্তব্য' বিষয়ে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর নেতৃত্বে যে সভা হয় তাহাতে 'শিল্প দ্বারা আয়ের পথ' বিষয়ে শ্রীযুক্তা শোভা মহলানবিশ সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রকৃতপক্ষে নারীর উপযোগী বহু শিল্পকলা রহিয়াছে। তাহাদের কাজে ব্যাপৃত করা এবং সেই সকল উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা করা বর্তমানের একটী প্রধান কাজ। শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী বর্তমানে করণীয় নানা ব্যবস্থার মধ্যে সকলের জন্য দুধ বণ্টন, অন্নাভাবগ্রস্তদিগের মধ্যে ত্বরিত সাহায্য এবং প্রয়োজন হইলে সাহায্য কেন্দ্র খুলিয়া প্রাথমিকভাবে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করেন। কেন্দ্রীয় মহাসভা সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেককে কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে বলেন।

আমাদের মনে হয় এ সময় কবি রবীন্দ্রনাথের "নগরলক্ষ্মী" কবিতায় বর্ণিত বিশ্বপূর্ণী সুশ্রিয়ার কর্তব্যই মাতৃজাতির নির্দিষ্ট কাজ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। সেই যে "কাঁদে যারা অন্নহারা, আমার সন্তান তারা" যেন প্রতি অন্তরে ধ্বনিয়া উঠে। প্রতি পরিবারের কর্ত্রী যদি একটি বিষয়কে বাঁচাইবার ভার লন, তাহা হইলে বহু লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারে।

কংগ্রেস কেন্দ্রীয় খাদ্যকমিটি গঠনে অসহযোগ করিয়াছে, অতএব ১৯৪৩ সালের কংগ্রেস কর্মীর আর করিবার কিছু নাই বলিয়া একটা ধারণা জন্মিয়াছে। সেই মনোভাব হয়ত শেষ পর্যন্ত বহুলাংশক মৃত্যুর কারণ হইতে পারে বলিয়া শ্রীযুক্ত মনুষ্যদার এম্-এল্-এ সভাপতির অভিভাষণে সকল কংগ্রেস কর্মীকে খাদ্য বণ্টন অর্থাৎ লোকের প্রাণরক্ষার ব্যাপারে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিতে বলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী তদনুরূপ প্রস্তাব অগ্রসর হইয়া যুবকদের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইতে অনুরোধ জানান। তাঁহার বিশ্বাস যাহারা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছে, তাহারা আজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইবে না।

মিউজিয়মে প্রদর্শিত প্রতীকসমূহগুলি অতিমাত্রায় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সাধারণতঃ সারা ভারতবর্ষের লোকের জন্য ৯ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্য তণ্ডুলের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে অপচয়, বীজ প্রভৃতি বাদ দিলে ৪ কোটী ১০ লক্ষ টন হইলে কোনও রকমে চলিতে পারে। এ বৎসর ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টন পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং মোট ঘাটতি ৬০ লক্ষ টন। বর্তমানে রেশনে যে খাদ্য পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ১৯০০ ক্যালরি পর্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। ১৫০০ ক্যালরি না হইলে জীবন নাশ হয়। আমেরিকা অধিকৃত জাপানেও লোকে প্রতিদিন ১৪৭৭ ক্যালরি পাইতেছে; আর যে ভারতের সর্বনাশ করিয়া মিত্রশক্তি যুদ্ধ জয় করিয়াছে, সেই মিত্রশক্তি, বিশেষতঃ আমেরিকা আর কোনও

সাহায্য করিতেছে না। ফলে আজ আশঙ্কা হইতেছে ৪০ লক্ষ হইতে দেড় কোটী ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আমেরিকা যত "সৎকথা" শুনাইতেছে, গণনা করিয়া সেই কটা গম দিলে, বহু লোকের প্রাণ রক্ষা পাইত। বাঙ্গালা দেশ সরকারী মতে ঘাটতি অঞ্চল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশেও কমবেশী পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি না করিলে অন্নকষ্ট হয়। সেই হিসাবে পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও বেহার, সিন্ধু, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশে কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। এবারে সিন্ধু কতক পরিমাণ তণ্ডুল রপ্তানি করিতেছে, আর কোনও প্রদেশ হইতে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে বলিলেই শস্য বৃদ্ধি হয় না, তাহার জন্য জল, বীজ, সার প্রভৃতির প্রয়োজন। তাহার দৃষ্টু ব্যবস্থা না করিয়া কেবল প্রচার কার্য্য করিলে অর্থ নষ্ট হইতে পারে, শস্য উৎপন্ন হয় না। প্রায় চল্লিশ কোটী লোকের অন্ন যোগাইতে হইলে তণ্ডুল উৎপাদনের পরিমাণ ১০ ভাগ, কলাই ২০ ভাগ, অন্যান্য খাদ্যাদি ৪০ ভাগ, শাকসব্জি ১০০, ফেব্রুয়ারীর মত ২০০, দুগ্ধ ৩০০ ভাগ বৃদ্ধি করা দরকার। সরকারী মত, চেষ্টা করিলে ইহা অসম্ভব নয়। নানা প্রাচীন ও প্রচার পত্রে বহুবিধ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। কর্ণার্নিগাল মিউজিয়ম কর্তৃক প্রকাশিত "Food Crisis—1946" খানি সময়ের উপর অতি মূল্যবান্ পুস্তিকা; আমরা সকলকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

২২শে মে তারিখে বিশিষ্ট নাগরিকদিগের সভায় বিভিন্ন আলোচনা হইয়াছে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযাদবলাল সেন, শ্রীমৃণালকান্তি বসু, শ্রীযজ্ঞেশ্বরনাথ সেন, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বহু সুধী উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ বাতিলের ব্যবস্থা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার বিলাইয়া লওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া এযাবৎ রেলপথ ক্রমাগত নানা কারণে অথাদানে ভারতসরকারের স্কন্ধে ঋণের পর্ব্বত জমিয়া উঠিয়াছে। বিগত দুই মহাযুদ্ধের বিপুল পরিমাণ খরচ চালাইতেও ভারতসরকার বেশীর ভাগই বিদেশীদের নিকট হইতে ঋণ করিয়াছেন। এই ঋণভারের দরুণ ভারতসরকারকে বৎসরে বহু টাকা সুদ গণিতে হয়। আগে যে সব ঋণ গৃহীত হইয়াছিল, তৎকালীন টাকার বাজারের বিবেচনায় তাহার সুদের হার ছিল বেশী। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধোত্তরকালে নূতন ঋণপত্র অপেক্ষাকৃত কম সুদে বিক্রয় করা সম্ভব হইলেও ভারতসরকারকে আগেকার ঋণপত্রসমূহের স্বীকৃত সুদের হার এখনও রক্ষা করিতে হইতেছে। এ অবস্থায়, বর্ত্তমান সস্তা টাকার সুদের সুবিধা লইয়া ভারতসরকার যদি প্রাক্‌যুদ্ধকালীন বেশী সুদ দিবার সর্ত্তে সংগৃহীত ঋণ আইনসঙ্গত ভাবে পরিশোধের ব্যবস্থা করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে এখনকার বাজারের উপযোগী অল্প সুদের নূতন ঋণপত্র বাজারে ছাড়িয়া সুদের দরুণ কিছু টাকা বাঁচাইতে পারেন, তাহা তাঁহাদের দিক হইতে অবশ্যই অন্যায় বা অসঙ্গত নয়। বাস্তবিক ভারতসরকারের আর্থিক অসুবিধা এখন যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের খরচ কমাইবার যে কোন চেষ্টার মূল্য স্বীকার করিতেই হইবে।

গত ২৩শে মে ভারতসরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে ২৭০ কোটি টাকার শতকরা বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা সুদের যে কোম্পানীর কাগজ বাজারে চালু রহিয়াছে এবং যাহা পরিশোধের কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ নাই, সেই ঋণপত্রগুলি ১৯৪৬ সালের ১৭ই আগষ্ট হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারতসরকার সমমূল্যে পরিশোধ করিয়া দিবেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে যাহারা নগদ টাকা ফিরিয়া চাহেন না, ভারতসরকার তাঁহাদিগকে সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের পরিবর্ত্তে মেয়াদহীন শতকরা ৩ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ সমমূল্যে অথবা ১৯৭৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে পরিশোধযোগ্য শতকরা ২৷৷০ আনা সুদের ঋণপত্র প্রতি ১ শত টাকার হিসাবে ৯৯ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিবেন। ৩৷৷০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ এই ভাবে অন্যতর সুদের ঋণপত্রে রূপান্তরকরণের ফলে সুদের দরুণ ভারতসরকারের বৎসরে প্রায় দেড় কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে।

৩৷৷০ আনা সুদের মেয়াদহীন কোম্পানীর কাগজ ১৮৮২ সাল হইতে মোট ৪ কিস্তিতে বাজারে ছাড়া হয়। সর্ব্বশেষ বিক্রয় হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। বিভিন্ন কিস্তিতে কত পরিমাণ কোম্পানীর কাগজ বাজারে ছাড়া হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

১৮৮২-৪৩ সাল	৭২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা,
১৮৮৪-৫৪ সাল	৩৯ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা,
১৮৮৪ সাল	৩৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা,
১৮৭৯ সাল	১৭ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা,
১৯০০-১৯০১ সাল	৭৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা,
মোট	২৭২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

আগেই বলা হইয়াছে, ভারতসরকারের আর্থিক অবস্থা বর্তমানে যেরূপ, তাহাতে এই ভাবে বেশী সুদের ঋণপত্র বাতিল করিয়া দিয়া তৎপরিবর্তে অল্পতর সুদের ঋণপত্র বাজারে ছাড়িলে ভারতসরকারের আর্থিক সুবিধাই হইবে। বাস্তবিক এখন যেকোনে প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলিতে চলতি আমানতে শতকরা বার্ষিক ।০ আনা ও মেয়াদি আমানতে শতকরা বার্ষিক ১ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইতেছে এবং শতকরা ৩ টাকা সুদের ২৫ কোটি টাকার কোম্ সরকারী মেয়াদী ঋণপত্র ২ ঘণ্টার মধ্যে বিক্রীত হইয়া যাইতেছে, তখন কোম্পানীর কাগজের জন্য শতকরা ৩৲ আনা হিসাবে সুদ প্রদান ভারতসরকারের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি। মেয়াদহীন ৩৲ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ পরিশোধের জন্য যুদ্ধোত্তর এই প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতির সময় নির্ধারণ করিয়া কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের প্রচলন বন্ধের সংবাদ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শেয়ার বাজারসমূহে লক্ষণীয় তেজী ভাবের সঞ্চার হয়। পক্ষান্তরে এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের বাজার দর ১০৩ টাকা হইতে ১০১৸৵০ আনায় নামিয়া আসিয়াছিল। শেয়ারসমূহের এই যে মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে ইহার প্রধান কারণ, বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির মূলে শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজে টাকা খাটাইয়া যাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকে ব্যাঙ্কের জমা রাখা টাকার নামমাত্র সুদের মায়া ছাড়িয়া এইবার বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের দিকে মনোযোগ দিবেন এবং ফলে চাহিদার জন্য শেয়ারসমূহের দরবৃদ্ধিই ঘটিবে। ৩৲ আনা সুদের কাগজ বাজারে অতঃপর চালু থাকিবে না বলিয়া ইতিমধ্যেই ৩ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ এবং অপরাপর মেয়াদী ঋণপত্রের লক্ষণীয় মূল্যবৃদ্ধি দেখা গিয়াছে।

ভারতসরকার সস্তা টাকার সুদের সুবিধা লইয়া সুদের হার বৎসরে দেড় কোটি টাকা বাঁচাইবার এই যে পরিকল্পনা করিয়াছেন সাধারণভাবে ইহার জন্য সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু তবু ইহার আর একটি দিক আছে। এ পর্যন্ত ভারতের যত দানশীল ধনীরা বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে টাকা দিয়াছেন, প্রায় সকলের টাকাতেই ৩৲ টাকা সুদের মেয়াদহীন কোম্পানীর কাগজ কেনা আছে। এই টাকা হইতে সস্তা সুদের হিসাবে প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এখন এই দুর্দিনে সেই দায়িত্ব সঙ্কুচিত হইবার ফলে সরকারী হস্তক্ষেপে যদি সঙ্গুচিত হয়, তাহাতে বিপুল জাতীয় ক্ষতির সম্ভাবনা। ইহা ব্যতীত একেলের ৩৲ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ বহু বিধবা ও শিশুর একমাত্র আশ্রয়। ভারতসরকার এই কোম্পানীর কাগজের প্রচলন বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও নিরুপায় অনাথ-অনাথাদের ক্ষতিপূরণের কোনপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তাহার ফল অবশ্যই মারাত্মক হইবে। ইহা ছাড়া গভর্মেণ্টের এই ব্যবস্থায় বীমাকোম্পানী ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। এই সব প্রতিষ্ঠানের মোটা টাকা বাধ্যতামূলকভাবে কোম্পানীর কাগজে লগ্নী থাকে। অতঃপর সরকারী ঋণপত্র হইতে ইহারা যদি কম সুদ পায় তাহা হইলে তাহারা সেই ক্ষতি জনসাধারণের উপর দিয়া অবশ্যই পূরণ করিয়া লইবে। বলা বাহুল্য ইহার ফলে জনসাধারণের সহযোগিতার অভাবে ইহাদের ব্যবসায়িক ক্ষতি হওয়াও বিচিত্র নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি বক্তব্য এই যে, ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের প্রচলন বন্ধ করিয়া ভারতসরকার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত বেসরকারী এবং জনহিতৈষীর সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘাড়ের উপর দিয়া বৎসরে দেড় কোটি টাকা বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু ভারতের পাওনা যে ১৮ শত কোটি টাকার ষ্টার্লিং সিকিউরিটি ব্রিটার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডন শাখায় পচিতেছে, তাহা হইতে হেলবিভাসের হিসাবে ব্রিটেনে সুদবিহীন সাত শত কোটি টাকা ঋণপরিশোধ করিলে কি বৎসরে সুদের দরুণ ৩০ কোটি টাকা বাঁচিতে পারে। এই দেনা শোধের ব্যাপারে ভারতসরকারের আশানুরূপ আগ্রহ দেখা যায় না কেন? আলোচ্য কোম্পানীর কাগজের সুদ অধিকাংশক্ষেত্রে বেসরকারী প্রভূত কল্যাণসাধন করে, খরচ কমাইবার জন্য এই দুর্দিনে এখনি ইহার দিকে নজর না দিয়া অনেক বেশী সুদের বিদেশী দেনা আগে পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করা কি ভারতসরকারের কর্তব্য নয়?

আন্তর্জাতিক অর্থ-নৈতিক চুক্তি ও ভারতবর্ষ

আমেরিকার ব্রেটন উড্‌স সহরে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যে আন্তর্জাতিক অর্থ-নৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সমগ্র পৃথিবীর অর্থ-নৈতিক উন্নতিকল্পে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যে সকল বিধিব্যবস্থা নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য সকল দেশের নিকট সমানভাবে সমাদৃত হয় নাই। তবু এই ব্রেটন উড্‌স চুক্তিপত্রে যে সকল দেশ সদস্য হইবে তাহাদিগকে বাঙ্কের পূর্বে যথেষ্ট চিন্তাভাবনার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং অনুষ্ঠানপত্রে মোটামুটি আশাপ্রকাশ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক দেশের গভর্নমেণ্টই ব্যবস্থা পরিষদের প্রত্যেক সম্মতি গ্রহণ করিয়া তবেই সদস্যপদ গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন।

উক্ত ব্রেটন উড্‌স সম্মেলনে মিত্রপক্ষীয় যে সব দেশ সদস্য হইতে পারে তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই তালিকায় ভারতবর্ষের নাম আছে এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের তহবিলে ভারতবর্ষের মোট ৪০ কোটি ডলার হিসাবে ৮০ কোটি ডলার চাঁদা ধরা হইয়াছে। চাঁদা প্রদানকারী দেশের এই তালিকায় ভারতের স্থান হয় ষষ্ঠ। তখন স্থির হইয়াছিল যে, যে সকল মিত্রপক্ষীয় দেশ এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের প্রাথমিক সদস্য হইবে, তাহাদিগকে ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যে চাঁদা জমা দিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের ১৯৪৫ সালের শরৎকালীন অধিবেশন হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। পরিষদের অধিবেশনে ব্রেটন উড্‌স চুক্তিতে ভারতবর্ষের

যোগদান উচিত কি না সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই। তৎকালীন অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান পরিষদের সদস্যবৃন্দকে আশ্বাস দেন যে, চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের পূর্ব্বে ভারতসরকার এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পরিষদকে আলোচনার সুযোগ দিবেন। তাহার অবশ্য অর্থসচিব তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর হঠাৎ অকস্মাৎ এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রেটন উড্‌স চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের ভার স্বপরিষদ নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং ২৭শে ডিসেম্বর তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে আমেরিকাস্থ ভারতীয় এজেন্ট জেনারেল স্যার খিজিরহায়াত খাজেসী ভারতের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

ব্রেটন উড্‌স চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা ভারতবর্ষের পক্ষে সত্যকার লাভজনক কি না তাহা লইয়া গভীর আলোচনার প্রয়োজন ছিল। আন্তর্জাতিক অর্থ-নৈতিক উন্নতি সাধনের আর বড় বড় কথা এই চুক্তিপত্রে লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেকের ধারণা এই চুক্তি কার্য্যতঃ ভবিষ্যৎ পৃথিবীর আর্থিক ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন কায়েমী স্বার্থ—প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। সম্প্রতি ফেডারেশন চেম্বারের বার্ষিক সভার বিদায়ী সভাপতি স্যার বজিলাল শোয়েল্লা মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাগারের সদস্যের পক্ষে নিজ স্বার্থে অন্য দেশের বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের ক্ষতিকর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন চলিবে না এবং সকল দেশের শিল্পসংরক্ষণ নীতি শিথিল রাখিতে হইবে বলিয়া যে বিধান সংযোজিত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি শিল্পে পশ্চাৎপদ উন্নতিকামী দেশের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর। অষ্ট্রেলিয়া শিল্পের দিক হইতে অনেকটা অগ্রসর, তবু অষ্ট্রেলিয়ার একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি এই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাগার ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অষ্ট্রেলিয়ার আর্থিক স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করিয়াছেন। এ অবস্থায় মুখ ও দুর্ভিক্ষের চাপে সর্ব্বস্বান্ত ভারতবর্ষের পক্ষে বিনা চিন্তায় একরাশ টাকা দিয়া শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধের গণ্ডী মানিয়া লওয়া অবশ্যই যুক্তিযুক্ত হয় নাই। রাশিয়াকে পরিকল্পনা রচয়িতাগণ আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাভাণ্ডারের স্থায়ী সদস্যপদ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু পরে ব্রেটন উড্‌স চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক ষড়যন্ত্রজালে জড়াইয়া পড়িতে হয়, সেজন্য রাশিয়া ১৯৪৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর সুদের কথা, আজ পর্য্যন্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে নাই এবং চিন্তা-ভাবনার শেষ করিয়া কবে যে রাশিয়া যোগ দিবে তাহাও এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। শুধু রাশিয়া নয়, চীন ও অষ্ট্রেলিয়ার দিক হইতে পরিকল্পনানুসারে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের স্থান ভারতবর্ষের নীচে হইলেও অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডও আপাততঃ আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের প্রাথমিক সদস্য হইতে অস্বীকার করিয়াছে। সবচেয়ে মজার কথা, এই তিন দেশের অস্বীকৃতির ফলে প্রস্তাবিত মুদ্রা-ভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী ইহাদের প্রাথমিক সদস্য হইবার শেষ তারিখ নির্দ্ধারিত সময় হইতে এক বৎসর পিছাইয়া দিয়া ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর স্থির করিয়াছেন। তবু রাহুলা, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ যে মানসিক দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন এবং যাহার ফলে তাহারা সকল দিক হইতে ভাবনা-চিন্তার সুযোগ পাইয়াছেন, ভারতবর্ষের পক্ষেও সেই দৃঢ়তা দেখান অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষ বিদেশী শাসকসম্প্রদায় কর্তৃক শাসিত হইতেছে বলিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদের সম্মতি ছাড়াই ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদারী সপ্রমাণ করিতে ভারতসরকার একান্ত তাড়াহুড়া করিয়া ১৯৪৪ সালের মধ্যে ব্রেটন উড্‌স চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরপর্ব্ব শেষ করিয়াছেন।

আমার কথা, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাগার ও ব্যাঙ্কের বিধানপত্রে লেখা আছে যে, কোন দেশ অসুবিধাবোধ করিলে লিখিত নোটিশ দিয়া সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে পারিবে। কেন্দ্রীয় পরিষদের বর্ত্তমান জাতীয়তাবাদী সদস্যগণ এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত এই যোগদান অর্থহীন বা ক্ষতিকর মনে করিলে বাহির হইয়া আসাও ভারতবর্ষের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। ভারতবর্ষের জাতীয় সরকার অসময় বা অসম্ভাব্য উপেক্ষায় দুঃসাহস যে কখনই করিবেন না, তাহা আমরা অবাধেই আশা করিতে পারি। ১৩।১।৪৬

আশা

শ্রীমতী দীপ্তি দেবী

মনে জাগে শুধু—বড় হইবার আশা।
হে সখি, এ গর্ব্ব নয়—তোমারি তো যাদু
মুখে নেছে ভাষা।
তোমার চরণে নমিত স্মরণ করিয়া,
তোমারি আশিস উঠিব গড়িয়া,
মোর মাঝে তব যত কিছু দান,—
তোমার কৃপায় হউক অবাধ,
শুধু চরণে দিও গো বাসা।
মনে জাগে শুধু বড় হইবার আশা।

সে ইঙ্গিতে মোর উঠেছে জাগিয়া
সুপ্ত বাসনা যত,
প্রবল বেগেতে আজি মোর
বহিছে রক্ত স্রোত।
গোপনে তোমায় সম্মুখে রাখি,
তোমারি আদর্শ ধরি,
নীরব মনের কথাটি কেবল
তোমারেই যাক করি।
তোমার স্মৃতিটি লইয়া আমার
থাক্—কাঁদা-হাসা,
মনে জাগে শুধু বড় হইবার আশা।
তোমার পরশ পাই যেন প্রাণে
ওগো মোর প্রভু,
সেই দেবে যাবে পথ দেখাইয়া
তোমার কথাটি গোপনে কহিয়া—
তব—দুয়ারে কভু না কভু।
আমি প্রতীক্ষায় রবে এই বীণা।
তুমি অবাহতে বাজে তব বীণা—ফিরিবে পিপাসা।
মনে জাগে শুধু বড় হইবার আশা।

নঞ্‌ তৎপুরুষ

বনফুল

১২

ঘুঘলবাবুকে একেবারে বাগানের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যেতে হল, গিয়ে রেওয়ালের দিকে মুখ করে' দাঁড়াতে হ'ল একটি কোণে এবং ঘাড়ে ঘাড় ফিরিয়ে এদের দিকে না তাকায় তার জন্যে কটা-চুল সেই মেয়েটিকে পাহারা পাঠানো হল। ঘুঘল সাহসে নিশ্চয়ই নির্ভর করছিল এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল গুরুর মতো করে' গুরুর আদেশে যোগ দিতে। সুতরাং সে অনড় হয়ে রেওয়ালের দিকে মুখ ফেরে দাঁড়িয়ে রইল। কটাচুল মেয়েটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে দিতে আর সকলের সঙ্গে ইশারায় ইঙ্গিতে বলতে লাগল কি যেন সব। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিল এইবার মজার কিছু একটা হবে, ষড়যন্ত্র চলছে একটা। হঠাৎ কটাচুল মেয়েটি হাত নাড়তেই সবাই উঠে পালিয়ে গেল উর্দ্ধশ্বাসে।

"চলুন, চলুন আপনিও আসুন" অনেকে চুপি চুপি বললে পুরন্দরবাবুকে।

"কেন, ব্যাপার কি—"

"আঃ চেঁচাবেন না। উনি রেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন না যতক্ষণ পারেন, আমরা পালাই চলুন। শিমুল আসছে ওই দেখুন" কটা-চুল মেয়েটিও ছুটে পালিয়ে এল নিঃশব্দে। সকলে ছুটে পুকুরের ওধারে চলে গেল। অর্থাৎ ঘুঘল যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে অনেক দূরে বিপরীত দিকে একেবারে। পুরন্দরবাবু সেখানে গিয়ে দেখলেন সুমিতা খুব রাগ করে' কল্পনা আর পারুলকে বকছে খুব।

"রাগ কোরো না দিদি,লক্ষ্মীটি"—পারুল ভোলাবার চেষ্টা করছে তাকে।

"আচ্ছা বেশ, যা-কে আমি বলব না, কিন্তু আমি আর থাকছি না এখানে। ভদ্রলোককে রেওয়ালের ধারে দাঁড় করিয়ে এমনভাবে পালিয়ে আসাটা কি অন্যায়। কি মনে করবেন ভদ্রলোক, ছি, ছি, ছি"

সুমিতা চলে গেল। সুমিতা ঘুঘলের প্রতি সহানুভূতিশীলা হয়েছিল, কিন্তু আর কেউ হল না, বরং আরও মিচুর হয়ে উঠল সবাই। ঠিক হ'ল ঘুঘল ফিরে এলে কেউ যেন তাকে লক্ষ্য না করে। পুরন্দরবাবুও না।

"আরম্ভ কানামাছি খেলা যাক"—কটাচুল মেয়েটি বললে।

মিনিট পনের পরে ঘুঘল ফিরে এল। সত্যি অনেকক্ষণ সে রেওয়ালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। কানামাছি খেলা খুব জমে উঠেছে, চীৎকার হাসি ছড়োছড়ি মেতে উঠেছে সবাই। ঘুঘল রাগে ফোঁসতে ফোঁসতে সোজা চলে গেল পুরন্দরবাবুর কাছে। তার কাঁধিয়ের হাতাটায় টান দিয়ে বললে—"শুনুন একবার"

"কি মুশকিল, বার বার কত শুনবেন উনি আপনার কথা। আবার রুমাল চাই নাকি"

ঘুঘল পুরন্দরবাবুকে টেনে নিয়ে গেল একধারে।

"এবার বিচ্ছিরি আপনি, মানে আপনি ছাড়া—"

ঘুঘলের দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠল।

পুরন্দরবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন—"ওরকম করবেন না আপনি, তাহলে ওরা আরও ক্ষেপে যাবে। আপনি চটছেন বলেই না ওরা চটাচ্ছে আপনাকে। বেশ সহজভাবে মিশুন না, সব ঠিক হয়ে যাবে"

পুরন্দরবাবুর কথাগুলো ঘুঘলের কাণে লাগল মনে হল, সে আর কোন উচ্চবাচ্য না করে' দলের মধ্যে ফিরে গিয়ে কানামাছি খেলায় যোগ দিলে, যেন কিছু হয় নি। মেয়েরাও আর তাকে বিশেষ কিছু বলে না কিছু। বিদ্যাসুন্দরী শিমুলের (কটা-চুল মেয়েটির) সঙ্গেও সে বেশ সহজ ভাবে মেশবার চেষ্টা করতে লাগল। পুরন্দরবাবু এটা কিন্তু লক্ষ্য করলেন যে ঘুঘল পারুলের সঙ্গে কথা কইতে সাহস করছে না, যদিও তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠোঁক ঠোঁক করে'। মনে হ'ল পারুলের ঘৃণা এবং অবজ্ঞাটা সে যেন তার প্রাপ্য বলেই মেনে নিয়েছে—এ নিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস বা সামর্থ্য কোনটাই তার আর নেই যেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও আবার তারা শেষকালে তাকে আর একটা খোঁচা দিতে ছাড়লে না।

লুকোচুরি খেলা হচ্ছিল। ঘুঘল একটা কোণের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছিল। তারপর তার কি মনে হল সে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটা ঘরে গিয়ে আলমারির পিছনে লুকোল। দেখতে পেয়ে গেল সবাই দেখা! শিমুল তার পিছু পিছু গিয়ে আস্তে আস্তে ঘরটায় শিকল তুলে দিয়ে পালিয়ে এল। তারপর সবাই চলে গেল আবার সেই বটগাছটার দিকে। ঘুঘল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে যখন দেখল কেউ তাকে খুঁজতে আসছে না, তখন সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। কাছে-পিঠে কাউকে দেখতে পেলে না। কপাট খুলতে গিয়ে দেখে কপাট বাইরে থেকে বন্ধ। চীৎকার করবার উপায় নেই—বিদ্যাসুন্দরবাবুর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। কাছেপিঠে চাকরবাকরও দেখতে পাওয়া গেল না একটিও। সুমিতাও ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুতরাং বেচারাকে বন্দী হয়েই বসে থাকতে হল খানিকক্ষণ। অনেকক্ষণ পরে একে একে ফিরে এল সব।

ঘুঘলবাবু আপনি এখানে বসে' কি করছেন। কি মজা হল এতক্ষণ। আমরা ফিরেটার ফিরেটার খেলছিলাম। পুরন্দরবাবু কি চমৎকার বক্‌তা ছিলেন। বুদ্ধের পার্ট করলেন, এমন সুন্দর হয়েছিল।

"আপনি বসে' আছেন কেন। আসুন আপনাকে দেখেও খুশ হওয়া যাক একটু"

"এখনও খেলা শেষ হয় নি নাকি" বেমাক্কিনী দেবীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, বাগানে বসে' মেয়েদের সঙ্গে চা খাবেন বলে' বেরিয়ে এলেন তিনি।

"কি হচ্ছে সব"

"দেখুন না মৃণালবাবু ওপরে বসে আছেন"—মেয়েরা আঙুল দিয়ে মৃণালবাবুকে দেখিয়ে দিলে। হেসে টং হয়ে' তিনি জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন।

"তোমাদের সঙ্গে সামনে দাঁড়াদাঁড়ি করতে কে পারে বল"

হেসে তিনি চাইলেন মৃণালের দিকে। মৃণালও হাসবার চেষ্টা করলে একটু। পুরন্দরবাবু আসাতে পারুল বিশেষ করে' কেন যে খুশী হয়েছে তা একটু পরে সে নিজেই প্রকাশ করলে পুরন্দরবাবুর কাছে—অবশ্য সোপনে।

কল্পনা পুরন্দরবাবুকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। পারুল সেখানে অপেক্ষা করছিল তার জন্য। পুরন্দরবাবুকে পারুলের কাছে রেখে কল্পনা চলে গেল।

পারুল তাঁকে বললে—"আমার একটি উপকার করবেন? আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না, সেইজন্যে আপনি আমাকে বিশেষ করে' খুশী হয়েছি আমি"

"কি উপকার"

"মৃণালবাবু যতই বলুন আপনি যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নন তা আমার বুঝতে বাকী নেই। আপনি একটি কাজ করুন দয়া করে', এইটি ফেরত দিয়ে যান, ওঁকে দিয়ে দেবেন কোনসময়ে। আমিও ওঁকে দিতে পারতুম, কিন্তু আমি আর জীবনে ওঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাই না। আপনি একথাও জানিয়ে দিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলে' দেবেন ভবিষ্যতে উনি যেন জোর করে' কোন উপহার দিতে না আসেন কিম্বা আমার সঙ্গে মেলবার চেষ্টা না করেন। করলে আপনাকেও হবেন শুদ্ধু। এই উপকারটি আমার করবেন?"

ক্রোকোডাইলের বাচ্চাটা আঁচলের তলা থেকে বার করলে পারুল।

"আমাকে আর এর মধ্যে জড়িয়ো না, বোহাই" পুরন্দরবাবু সকাতরে বললেন।

"জড়াব না? কেন? আচ্ছা বেশ। বেশী করতে হবে না কিছু আপনাকে"

হঠাৎ পারুলের গলা কেঁপে গেল, ঠোঁট ফুলে উঠল, জল এসে পড়ল চোখে। পুরন্দরবাবু স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন।

"না, না, আমি তা বলছি না—আচ্ছা দাও দাও—আমারও একটা বোঝাপড়া আছে ওর সঙ্গে"

"আমি জানি আপনার সঙ্গে ওর ভাব নেই" হেসে বললে পারুলের, "হতেই পারে না ওরকম লোকের সঙ্গে ভাব। উনি এসেছেন আমাকে বিয়ে করতে। আশ্চর্য্য কম নয়। আপনি আজই ফিরে দেবেন এটা, কেমন? এ নিয়ে বাবার কাছে যদি কাঁদুনি গাইতে যান উনি, মজাটা দেখিয়ে দেব তাহলে"

হঠাৎ শিছনের ঝোপটা থেকে নীল-চশমা-পরা সেই লোকরা বেরিয়ে এল। "ওটা ফিরিয়ে দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য"—লোকরা বললে—"বুঝলেন, প্রাণে মায়াদয়ের প্রতি কিছুমাত্র সম্মানবোধ থাকলে এরকম অবস্থাতে প্রতিবাদ করা প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই কর্ত্তব্য" কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই পারুল হাঁচকা টান মেরে তাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দিয়ে গেল।

"যা গো যা। কি আক্কেল তোমার অজিত। সরে' যাও এখান থেকে। আড়ি পেতে কথা শুনতে লজ্জা করে না? তোমাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম—এ কি কাণ্ড—যাও এখান থেকে"

পা ঠুকে এক ধমক দিতেই অজিত সরে' পড়ল। তবু পারুলের রাগ যায় না। রাগে গরগর করতে লাগল সে।

"এবার আলাপন করে এস" হঠাৎ পুরন্দরের দিকে ফিরে সে বললে "আপনি বুঝবেন না ঠিক। ভারী অদ্ভুত সব। আপনার হয়তো মজা লাগছে, কিন্তু এমন লজ্জা করে' আমার—"

"একেই বিয়ে করবে ঠিক করেছ না কি" হেসে পুরন্দরবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"কক্খনো না! একে? আচ্ছা, কি করে ভাবতে পারলেন আপনি।"

হঠাৎ লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল তার "এ তার বন্ধু একজন। কি রকম অদ্ভুত সব বন্ধু দেখুন তো···বন্ধুত্ব করবার লোক পায় নি আর। দেখুন আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমি এ কথা বলতে পারি না—এটা ফিরিয়ে দেবেন তো?"

"বেশ দেব"

"সত্যি ভাল লোক আপনি, খুব ভাল লোক"

দুচোখে আলো ঝলমল করে' উঠল তার। বাচ্চাটা পুরন্দরবাবুকে দিয়ে বললে—"আর অনেক গান শোনাব আপনাকে। অনেক—অনেক। সত্যি খুব ভাল গাইতে পারি আমি, জানেন? তখন মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আবার আসবেন তো? আর একবার অন্তত আপনাকে আসতেই হবে—খুব খুশী হব তাহলে। আপনাকে সব কথা বলব পরে—সমস্ত খুলে বলব। আর কাউকে বলবেন না যেন—"

মুচকি হেসে ঘাড় নাড়িয়ে ছুটে চলে গেল সে।

পারুল তার কথা রেখেছিল, চা খাবার সময় দুটো গান ওঁকে শুনিয়েছিল। মধুর মিষ্টি চড়া গলা। চা খাবার জন্যে ভিতরে এসে পুরন্দরবাবু দেখলেন মৃণাল গম্ভীরভাবে বিমলবাবু ও হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে বসে কি কথা কইছে—বোধহয় বিবাহপ্রসঙ্গেই আলোচনাটা সে শেষ করছে। দুদিন পরে তো তাকে চলে যেতে হবে ব'ম্বাসের জন্য। সবাই মিলে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে কারও দিকে ফিরে তাকাল না, পুরন্দরবাবুর দিক থেকে বিশেষ করে' মুখটা ঘুরিয়ে নিলে।

কিন্তু পারুল খানিক আরম্ভ করতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পারুলকে একটা কি জিজ্ঞেস করলে একটু হেসে, পারুল কোন উত্তর দিলে না। এতে কিন্তু এতটুকু বসল না মৃণাল, কিছুমাত্র ইতস্তত না করে' এমনভাবে সে সোজা গিয়ে পারুলের জোয়ারের পিছনে দাঁড়াল যেন জায়গা ওইটেই তার স্থান এবং কোন কারণেই সেখান থেকে সে একচুল নড়বে না।

পারুলের গান শেষ হয়ে গেলে সে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে বললে—"আপনি একটা গান করুন না।"

"আগে গাইতাম, অনেকদিন গাই নি। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে"

পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসলেন তিনি।

"বা পুরন্দরবাবু গান গাইছেন" মেয়েরা আনন্দে কলরব করে' উঠল। কর্ত্রী গিন্নি রান্নাঘর থেকে ভিতরে এসে বসলেন। পুরন্দরবাবু রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা ধরলেন—

মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখী, জাগো জাগো

পারুল তাঁর কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে চেয়ে চেয়েই তিনি আবেগভরে গাইতে লাগলেন। আগেকার মতো গলা আর ছিল না, কিন্তু যা ছিল তাইতেই মাত করে' দিলেন। সমস্ত প্রাণ ঢেলে গাইছিলেন তিনি—অন্তরের কামনা যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠতে লাগল প্রতি ছত্রে ছত্রে। প্রতি কথায় ফুটে উঠতে লাগল আকুতির আবেগ, মর্ম্মের আবেদন, বাসনার বহ্নুৎসব। প্রদীপ্ত চোখে পারুলের দিকে চাইতে চাইতে তিনি গাইতে লাগলেন

জাগো আকুল ফুল সাজে
জাগো মৃদু কম্পিত লাজে
মম হৃদয়-পবন মাঝে
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি
সখী, জাগো জাগো।

পারুলের সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ জাগল, ভয়ে একটু পিছিয়ে গেল সে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল এবং সেই মুহূর্ত্তে পুরন্দরবাবুর মনে হল তার চোখে যেন দলজ্জ আহ্বানের একটা আভাস দেখতে পেলেন তিনি। অন্য শ্রোতারাও মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। গান থেমে যাবার পর একটা বিচ্ছি স্তব্ধতা যেন ঘনিয়ে এল কয়েকটা মুহূর্ত্তের জন্য—সবাই যেন নিশ্বাসে একটা কিসের প্রতীক্ষা করতে লাগল। পুরন্দরবাবু হঠাৎ লক্ষ্য করলেন সুমিত্রার চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে।

বিস্ময়বাবু নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

"গানটা বেশ, কিন্তু একটু, ওর মানে কি, থাকে বলে' গলা খাঁকারি দিয়ে থেমে গেলেন অমলোক। রবিঠাকুরের গানের বিরুদ্ধে কিছু বলবার সাহস সংগ্রহ করতে পারলেন না তিনি।

"পুরন্দরবাবুর গলা তো চমৎকার" মেধাজিনী দেবী সুরু করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু দুখল তাঁকে কথা শেষ করতে দিলে না। সে এক কাণ্ড করে' বসল। হঠাৎ ছুটে গিয়ে পারুলের হাত ধরে হিড় হিড় করে' তাকে পুরন্দরবাবুর কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে এল, তারপর পুরন্দরবাবুর কাছে গিয়ে বললে—

"এক মিনিট, বাইরে চলুন তো একবার"

ঠোঁট দুটো কাঁপছিল তার।

পুরন্দরবাবু বুঝলেন বাইরে না গেলে এখনই হয়তো সে যা তা একটা কাণ্ড ক'রে বসবে। তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন।

"আপনাকে এখনই এই মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে চলে যেতে হবে, বুঝলেন"

"কেন? বুঝতে পারছি না ঠিক"

উত্তেজিত কণ্ঠে দুখল বলতে লাগল "মনে আছে আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলতে বলেছিলেন তখন আমি বলি নি, সময় হলে বলব বলেছিলাম; এখন সময় হয়েছে, বুঝলেন, চলুন যাই। আর এখানে থাকা চলবে না"

পুরন্দরবাবু ক্ষণকাল ভাবলেন, দুখলের মুখের দিকে চাইলেন একবার, তার পর রাজি হয়ে গেলেন।

"আচ্ছা বেশ, চলুন তবে"

হঠাৎ চলে যাওয়ার প্রস্তাবে কর্ত্রীগিন্নি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন, মেয়েরা আপত্তি করতে লাগল।

"আর এক কাপ করে' চা খেয়ে যান অন্তত" মেধাজিনী দেবী অনুরোধ করলেন।

"দুখল একধারে মুখ কালো করে' দাঁড়িয়েছিল। বিস্ময়বাবু তার কাছে গিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "হঠাৎ হ'ল কি"

"দুখলবাবু কেন আপনি পুরন্দরবাবুকে নিয়ে যাচ্ছেন" মেয়েরা অনেকেই সুরকণ্ঠে প্রশ্ন করতে লাগল। পারুল দুখলবাবুর দিকে এমন একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, কিন্তু গোঁ ছাড়লে না।

পুরন্দরবাবু হেসে বললেন, "দুখলবাবুর দোষ নেই। আমারই জরুরি একটা এনগেজমেণ্ট আছে এখন—আমি ভুলে গিয়েছিলাম—দুখলবাবু মনে করিয়ে দিলেন সেটা। আমাকে যেতেই হবে"

পুরন্দরবাবু হাসিমুখে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সুমিত্রাকে নমস্কার করলেন বিশেষ করে'।

"আপনি আসাতে ভারী আনন্দে কাটল দিনটা। আবার আসবেন" বিস্ময়বাবু বললেন অন্যতা করে'।

"এলে সত্যিই ভারী খুশি হব" মেধাজিনী দেবীও বললেন হেসে।

"পুরন্দরবাবু আবার কবে আসবেন"—মেয়েরা অনেকেই বলে উঠল।

গাড়ীতে যখন চড়েছেন তখন একটি কণ্ঠস্বরে একটা বিশেষ মিনতি যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল—পুরন্দরবাবুর মনে হল।

"আসবেন আবার পুরন্দরবাবু, লক্ষ্মীটি—আসবেন নিশ্চয়"

পুরন্দরবাবু মুখ বাড়িয়ে দেখলেন সেই কটা-চুল মেয়েটি।

১৩

কটা-চুল মেয়েটির মুখখানা বার বার মনে পড়তে লাগল, কিন্তু শুধু পুরন্দরবাবুর মনের অন্ধকার যেন ঘুচল না। সমস্ত দিনটা মধিত হয়ে গেছে—খেলা, হাসি, গান, অতগুলি মেয়ের সঙ্গ—অন্তরের প্রাপ্তি কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অপসারিত হয় নি মন থেকে। গান গাইবার লোভটা কিছুতেই দমন করতে পারলেন না তিনি এবং সেই জন্যেই বোধহয় অত আবেগভরে গাইলেন।

"ছি ছি কি কাণ্ডটাই করলাম—এরকমভাবে চলে আসাটা" মনে মনে

আরম্ভ হচ্ছিল কিন্তু তখনই নিজেকে সম্বরণ করলেন। অনুতাপ করাটা আত্মসম্মানের পরিচায়ক হলে' মনে হতে লাগল—তার চেয়ে বরং রাগ করা ঢের ভাল।

"দাড়োগ!" খুসরুর দিকে আড়চোখে চেয়ে মনে মনে বললেন তিনি।

খুসরু নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল। একটি কথাও বলে নি—যা বলবে তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল বোধহয়। মাঝে মাঝে রুমালে দিয়ে মাথা মুখ মুছছিল। "বাথরুম ব্যাটা"—পুরন্দরবাবু মন্তব্যোক্তি করলেন।

একবার শুধু খুসরু দারোগাবাবুকে জিগ্যেস করলে—"ঝড়টড় করবে না কি, বেশ করেছে দেখছি"

"উঠবে টিক। যা শুমোট করেছে দমবন্ধ দিন"

ঈশান কোণে সত্যিই মেঘ উঠেছিল একটা, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

বাড়ি পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল।

"আমি আপনার বাসাতেই যাব এখন কিন্তু" খুসরু আগে থাকতেই বলে রেখেছিল।

"আসতে পারেন, কিন্তু আমার শরীরটা ভাল নেই"

"আমি বেশীক্ষণ থাকব না"

গাড়ি থেকে নেবেই খুসরু চাকরটার খোঁজ করতে ভিতরে ঢুকে গেল।

"কেন, চাকর কি করবে এখন"

খুসরু কোন উত্তর দিলে না। পুরন্দরবাবু আলো জ্বালতেই খুসরু চেয়ারে বসল। পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে' তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনের বিরক্তি যথাসাধ্য গোপন করে' শেষে বললেন—"দেখুন, সব কথা আমি জানতে চেয়েছিলাম বটে, কিন্তু আর আমার কিছু জানবার প্রবৃত্তি নেই। আমাদের মধ্যে জানাজানির আর কোন প্রয়োজন আছে বলেই মনে হচ্ছে না। সুতরাং আপনি এখন বাড়ি যান, আমি খিল বন্ধ করে শুয়ে পড়ি। রাত হয়ে গেছে"

"আমাদের মধ্যে বোঝাপড়াটা কিন্তু হওয়া দরকার যে" পুরন্দরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে খুসরু বেশ শান্তভাবেই কথাগুলো বললে।

"বোঝাপড়া! কিসের বোঝাপড়া? এই বলবার জন্যে আপনি ডেকে নিয়ে এলেন আমাকে?"

"হ্যাঁ—এই"

"বোঝাপড়া করবার কিছু নেই তো—বোঝাপড়া অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে"

"ও তাই না কি" বলে খুসরু চুপ করে' গেল।

পুরন্দরবাবুও কোন উত্তর না দিয়া পরিক্রমণ সুরু করলেন। পাশ্চিয়ার মুখখানা মনে পড়ছিল বারবার। অনেকক্ষণ নীরবতার পর হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন—"কি বোঝাপড়া করতে চান আপনি?"

খুসরু চেয়ে চেয়ে দেখছিল তাঁকে এতক্ষণ।

"আর তখনকে আপনি ছলেন না" সহসা কঠিন কণ্ঠে বলে' উঠল সে এবং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"ও, আপনি তাই সব ভাবছেন বুঝি" পুরন্দরবাবু হেসে ফেললেন, "আচ্ছা, আজ সমস্ত দিন আপনি কি কাণ্ডটা করলেন বলুন দেখি" খুব একটা উপদেশাত্মক বক্তৃতার সুরে আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ সুরটা বদলে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—"আজ আমিও নিজেকে যতটা হীন করেছি এত হীন বোধহয় জীবনে কখনও করি নি—প্রথমত আপনার সঙ্গে যেতে রাজি হ'য়ে—দ্বিতীয়ত ওখানে ওদের সঙ্গে যা হ'ল ...এত ছেলেমানুষি যা তা কাণ্ড সব...নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে লজ্জা হচ্ছে আমার...ছি ছি...আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল...আর আপনিও যে কাণ্ডটা করলেন তা কি কোন ভদ্রলোক করে'—আমাকে অমনভাবে অপ্রস্তুত করবার মানে কি—কিন্তু আপনাকে কিছু বলছি না আমি নিজেকে—আমার দুর্বুদ্ধির জন্যে শাস্তি পাওয়া উচিত—তার বেশী আমি আর ধার না সেখানে...ওদের সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই আমার"

সমস্ত বক্তব্য শেষ করলেন তিনি।

"সত্যি? সত্যি বলছেন?" খুসরু তার আনন্দ যেন আর চাপতে পারছিল না। পুরন্দরবাবু তার দিকে ঘৃণাব্যঞ্জক একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' আবার পদচারণা সুরু করলেন।

"আপনি তাহলে আবার বিয়ে করে' সুখী হবেন ঠিক করে' ফেলেছেন?"

"হ্যাঁ"

"তাতে আমার কি" পুরন্দরবাবু ভাবছিলেন," ও যদি বোকামি করে' উচ্ছন্নে যায় আমার কি এসে যায় তাতে। আমি বড় জোর ঘৃণা করতে পারি, যদিও ঘৃণারও উপযুক্ত ও নয়"

"বাধীর ভূমিকায় অভিনয় করাই তো আমার কাজ" কাচুমাচু হ'য়ে একটু হেসে খুসরু বললে, "আপনিই তো একথা বলেছিলেন একদিন। আপনার একটি কথাও ভুলি না আমি, যা বলেন সব মনে থাকে"

এক বোতল মদ এবং দুটো গ্লাস নিয়ে চাকরটা ঘরে ঢুকল।

"ও এই জন্যেই চাকরের খোঁজ হচ্ছিল। এখন আপনাকে মদ খেতে দেব না আমি—"

"মাপ করবেন পুরন্দরবাবু, না খেলে পারব না আমি। আমাকে ছোটলোক ভেবে ভাবুন ক্ষতি নেই—কিন্তু খেতে দিন আমাকে"

"আমার শরীর ভাল নেই, এখন আমি শুতে যাই"

"হ্যাঁ এই যে—এখনি এখনি—গলাটা ভিজিয়ে নি শুধু একটু"

তাড়াতাড়ি সে আধ গ্লাসটাক খেয়ে ফেলে ঢোঁ করে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই, বাকী অর্ধেকটা শেষ করলে ঘসে'। তারপর সহসা চাইলে সে পুরন্দরবাবুর দিকে। চাকরটা বেরিয়ে গেল।

"আঃ—" পুরন্দরবাবু অস্ফুট কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

"দেখুন, ওর মেয়ে-বন্ধুগুলোই ডাকে" খুসরু বাজিয়ে সুরু করল আবার।

"কি? ও, তাদের কথাই ভাবছেন এখনও"

"ওর মেয়ে-বন্ধুগুলোই ভাচি দিচ্ছে। ওর যাদই বা কি...তা ছাড়া মেয়েদের একটু আধটু আদিখ্যেতা তো থাকবেই। ভারী চমৎকার। আমি কেমন গোলাম হয়ে থাকব তার। তবু মন পাব না জন্মের মত'

গাড়ি, বাড়ি, গয়না, সামাজিক সম্মান এসব পেলেও বদলাবে না? নিশ্চয় বদলাবে"

"ওকে ব্রেকফেট, জোড়া ফেরত দিতে হবে" মনে পড়ল পুরন্দরবাবুর। অনুচ্চারিত করে' পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন সেটা আছে কিনা।

"আপনি বলছেন আমি সুখী হব ঠিক করেছি কি না? না ঠিক করে উপায় কি। আর বিয়ে না করলে সুখী হবই বা কি করে। বলুন, আপনিই বলুন"—করুণকণ্ঠে বলতে লাগল সে—"আমার গতি কি হবে, তাহলে ভেবে দেখুন" বোতলটা দেখিয়ে বললে—"এতেই ডুবে যেতে হবে শেষে, কিন্তু এ তো কিছু নয়, যে নরক আমাকে টানছে তার শতাংশের একাংশও নয়। বিয়ে করে' অন্য একটা জীবনকে যদি জড়িয়ে ধরতে না পারি তাহলে ডুবে যাব আমি। সুন্দর একটা আদর্শ পেলেই ফেলে উঠব আবার দেখবেন"

"কিন্তু এসব কথা আপনি আমাকে বলছেন কেন শুধু শুধু" বলেই পুরন্দরবাবু হেসে ফেললেন। তার পর বললেন, "আমরা আমাকে ওখানে টেনে নিয়ে গেলেন কেন আপনি। উদ্দেশ্যটা কি ছিল আপনার?"

"পরখ করা···" বলেই মুকুল বিব্রত হয়ে পড়ল।

"কি পরখ করা?"

"বলাকলাটা।···মানে, এই হপ্তাখানেক থেকে ওখানে যাচ্ছি তো," একটু বিব্রত হয়ে পড়ল সে—"আপনাকে দেখে সেদিন হঠাৎ মনে হল পাস-পুরুষের সঙ্গে ও কি রকম ব্যবহার করে' তা তো জানা নেই। পরীক্ষা করে' দেখলে হয় একদিন। বোকামি আর কি। কোন দরকার ছিল না। অত্যন্ত বেশী আশা করেছিলাম···আমার চরিত্র এমনই—কি আর বলব বলুন···মানে···"

হঠাৎ মুখ তুলে তাকালে সে। পুরন্দরবাবু দেখলেন—চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে তার।

"সত্যি কথা বলছে তো" পুরন্দরবাবু ভাবলেন এবং মনে মনে বিস্মিত হ'য়ে গেলেন—

"বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা ভাল করে"

"ছেলেমানুষি আর কি! তাছাড়া ওর ওই ছেলে বন্ধুগুলো। ছোঁড়ার মাথায় আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে' ফেলেছি মাপ করবেন। আর কখনও এমন হবে না"

"আমি সেখানে আর যাবই না"

"হাঁ, সেইজন্যেই আশা করছি যে এ রকমটা আর কখনও ঘটবে না"

পুরন্দরবাবু হেসে বললেন—"কিন্তু আমি ছাড়া আরও পুরুষ আছে তো সংসারে—তাদের সামলাবেন কি করে"

মুকুলের মুখ লাল হয়ে উঠল।

"আপনার মুখে একথা শুনে দুঃখিত হলাম পুরন্দরবাবু। পুরুষের সম্বন্ধে আমার ধারণা মোটেই হীন নয়"

"ক্ষমা করবেন, আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম। একটা ব্যাপারে খুব আশ্চর্য্য লাগছে কিন্তু। আমার আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে আপনার ধারণা যেমন প্রবল, আমার চরিত্রের ওপর আপনার বিশ্বাসও তেমনি অসীম দেখছি"

"হাঁ ঠিকই তাই···অতীতে এর প্রমাণ পেয়েছি যে"

"আপনি এখনও তাহলে আমাকে একজন চরিত্রবান পুরুষ বলে' মনে করেন।"

অন্য সময়ে নিজের এ প্রশ্নে নিজেই চমকে উঠতেন পুরন্দরবাবু।

"আমি বরাবরই তাই ভেবেছি আপনাকে"—চোখ বীচু করে মুকুল বললে।

"হাঁ তাতো ঠিকই—তা আমি বলছি না,—আমি বলছিলাম যে অতীতে আমার সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তা এখনও—মানে—"

"হাঁ এখনও তা ঠিক আছে"

"আপনি এবার যখন কোলকাতায় এসেছিলেন তখনও আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা ছিল আপনার?"

পুরন্দরবাবু কৌতূহল দমন করতে পারলেন না কিছুতেই।

"হাঁ। আমি বরাবরই আপনাকে শ্রদ্ধের ব্যক্তি বলেই জানি"

মুকুল চোখ তুলে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে চাইলে পুরন্দরবাবুর দিকে। পুরন্দরবাবুই তার চোখ এড়িয়ে গেলেন হঠাৎ—কিন্তু একটা ভয় পড়ুক এ তিনি চান না—যে অন্ধ আবরণটা দু'জনের মধ্যে এখনও আছে তা সরিয়ে দেবার মোটে ইচ্ছে নেই তাঁর। ভয় হতে লাগল আবরণটা খসে' পড়ে বুঝি!

"আমি আপনাকে ভালবাসতাম পুরন্দরবাবু" যেন এইবার সমস্ত খুলে বললে এই রকম একটা ভাব করে' মুকুল সুরু করলে "কলেজে যখন ছিলেন আপনি, সত্যিই আমি আপনাকে ভালবাসতাম। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেন নি"

মুকুলের গলা কাঁপতে লাগল, পুরন্দরবাবুর আরও ভয় হ'ল—"আপনার তুলনায় সত্যিই নগণ্য ছিলাম আমি, লক্ষ্য করবার কথাও নয়। তা ছাড়া প্রয়োজনও ছিল না কোন। গত ন বছর আপনার কথা কিন্তু বার বার মনে পড়েছে আমার, কারণ আমার জীবনে ওই বছরটাই সব চেয়ে সুখের ছিল। ওর চেয়ে ভাল সময় আর আসে নি" (মুকুলের চোখ দুটো চক চক করতে লাগল) "আপনার অনেক রসিকতা, অনেক কবিতার লাইন, অনেক জিনিস মনে পড়ত আমার। আপনি যে একজন উঁচুদরের শিক্ষিত ব্যক্তি—শুধু শিক্ষিত নয়, উচ্চশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তি—এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। আপনিই একবার বলেছিলেন—"মহৎ প্রেরণার উৎস মহৎ প্রতিভা নয়, মহৎ হৃদয়"—আপনি হয়তো ভুলে গেছেন—কিন্তু আমি ভুলি নি। আপনারও হৃদয় যে মহৎ সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলাম আমি তাই সমস্ত সত্ত্বেও আপনার উপর বিশ্বাস হারাই নি"

হঠাৎ তার থুতনিটা কাঁপতে লাগল। পুরন্দরবাবু অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। যেমন করে' হোক কথার মোড়টা ফেরাতে হবে। কিন্তু সহসা নিজেই সংযম হারিয়ে ফেললেন তিনি।

"থাক থাক হয়েছে হয়েছে, কি বলছেন যা তা" এই কথা বলতে বলতেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন "এ সব কথা বলবার মানে কি—যার যার বলবি শরীর ভাল নেই আমার—তবু আপনি ক্রমাগত ভ্যান ভ্যান করে'

ঝকেই চলেছেন ঝকেই চলেছেন—ঝকে' ঝকে' আমাকে উন্মাদ প্রায় করে' তুলেছেন, তবু আপনার তৃপ্তি হচ্ছে না—ইঙ্গিতে ইশারায় ঠারে-ঠোরে এক অন্ধকার অন্ধকারে ক্রমাগত ঠেলে নিয়ে চলেছেন আমাকে—অথচ সব মিথ্যে, বানানো কি, ঘুরোঘুরি বাড়াবাড়ি—এইটেই সব চেয়ে মারাত্মক—বাড়াবাড়ি—বাড়াবাড়ি। একটুও সত্যি নয়—সব বাজে মিথ্যে কথা। দুজনেই সমান পাপি আমরা, দুজনেই দুষ্কারের ঘৃণ্য জীব। একটুও ভালবাসেন না আপনি আমাকে, সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেন—জানি তো এখুনি প্রমাণ করে' দিতে পারি সে কথা। আপনি মিছে কথা বলছেন। আপনি যে আমাকে আজ ওখানে জোর করে' টেনে নিয়ে গেলেন তা আপনার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষা করবার জন্যে নয়—বাঁকাপথে প্রতিশোধ নেবার জন্যে। ওই মেয়েটাকে দেখিয়ে আমার হিংসা প্রবৃত্তিটাকে চরমোত্তেজিত করে আপনি উপভোগ করতে চাইছিলেন সেটা—"দেখেছেন কি রকম থাপ্পা মেরে জোগাড় করেছি এবার। আমারই হবে ও। কি করতে পারেন এবার করুন"—এই ছিল আপনার মনোভাব! আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন আমাকে। ঘৃণা না করলে কেউ কাউকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে না, সুতরাং আপনি যে আমাকে ঘৃণাই করেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার"

চীৎকার করতে করতে সমস্ত ঘরে যেন ছুটোছুটি করতে লাগলেন তিনি। আত্মসংবরণ হারিয়ে ফুলের কাছে নিজেকে যে এমন ভাবে হীন করে' ফেললেন এই ভেবে অত্যন্ত খারাপও লাগছিল তাঁর। কিন্তু সামলাতে পারছিলেন না নিজেকে।

"আপনার সঙ্গে ফিটবাট করে' বেড়াই উদ্দেশ্য ছিল আমার পুরন্দরবাবু"

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে ফুলল বলে' উঠল হঠাৎ, তার থুতনিটা কাঁপতে লাগল।

অন্তর রাগ হল পুরন্দরবাবুর—তাঁর মনে হল এত অপমান বুঝি তাঁকে জীবনে কেউ কখনও করে নি।

"আবার আমি আপনাকে বলছি আমার পরীক্ষা জ্ঞান নেই—এমন করে' লাগবেন না আমার পিছু। আপনি কেন লাগছেন তাও জানি, আপনি আশা করছেন যে আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলে একটা অন্তর স্বীকারোক্তি আদায় করে' নেবেন আমার মুখ থেকে। কিন্তু জেনে রাখুন ভিন্ন জগতের লোক আমরা এবং···এবং আমাদের দুজনের মাঝখানে একটা চিতা প্রজ্বলিত রয়েছে"—হঠাৎ বলে' ফেললেন তিনি এবং বলেই বুঝলেন কি করে' ফেলেছেন।

"আপনি জানেন" হঠাৎ ফুলের মুখখানা বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে গেল—"আপনি জানেন আমার কাছে সে চিতার অর্থ কি"—

হাতকর অথচ অসহায় একটা ভঙ্গীতে পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজের বুক চাপড়ে সে বলে উঠল "এইখানে জ্বলছে সে চিতা, আমরা দুজনেই সে চিতায় ধারে দাঁড়িয়ে আছি তা ঠিক, কিন্তু আমার দিকেই আঁচটা লাগছে বেশী"—পাগলের মতো বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগল—"অনেক বেশী, অনেক বেশী—"

হঠাৎ অত্যন্ত জোরে ইলেকট্রিক ঘণ্টাটা বেজে ওঠাতে দুজনেই প্রকৃতিস্থ হল। এত জোরে বাজতে লাগল যেন কেউ ঘণ্টাটা ভেঙে ফেলতে চায়।

"কে এলো? আমার কাছে যারা আসে তারা কখনও এত জোরে ঘণ্টা বাজায় না তো।"

পুরন্দরবাবু হকচকিয়ে গেলেন একটু।

"আমার কাছেও না" মৃদুকণ্ঠে ফুলও বললে, একটু ভয়ে ভয়ে। ঘণ্টার আওয়াজের চোটে সেও আত্মস্থ হয়েছিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করে' পুরন্দরবাবু এগিয়ে গেলেন এবং কপাটটা খুললেন।

"আপনিই কি পুরন্দরবাবু?" কনকনে জোর গলায় এক ভদ্রলোক কে একজন।

"হ্যাঁ, কি চাই"

"ফুলল পালিত এখানে আছেন শুনলাম। তাঁর সঙ্গে এখনি দেখা করতে চাই আমি"

পুরন্দরবাবু কদবয়সী ছোকরাটিকে আপাদমস্তক দেখলেন একবার। যদিও তাঁর ইচ্ছে করছিল লাথিয়ে ছোকরাকে দূর করে' দিতে—কিন্তু তা আর করলেন না।

"আসুন, এই যে ফুলবাবু এখানেই আছেন—"

ছোকরাটির বয়স সত্যিই কম, টনিক ভুড়ির বেল্ট হবে না, কমও হতে পারে। তার মুখের কিশোর-শ্রী, স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি, পুষ্ট উন্নত মস্তক দেখলে তাই মনে হয়। সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবীতেই চমৎকার মানিয়েছিল তাকে। একটু লম্বা ধরণের, মাথার কোঁকড়ান চুল, বড় বড় কালো চোখে নির্ভীক দৃষ্টি। সুশ্রী ছেলেটি। খুব গম্ভীরভাবে ঘরে এসে ঢুকল সে।

"আপনিই ফুলবাবু? ও"

বেশ গম্ভীরভাবে সে ফুলবাবুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে। "ও" কথাটাও এমনভাবে বললে যে ফুলল জড়সড় হয়ে গেল একটু।

পুরন্দরবাবু আন্দাজে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, ফুলের জন্যও কিসের যেন হায়াপাত হল একটা। চোখে মুখে আশঙ্কা ঘনিয়ে এল তার। আচমকে কিন্তু সে কোন বিচলিতভাব প্রকাশ করলে না। বেশ গম্ভীরভাবেই বললে—"আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ইতিপূর্বে হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার থাকতে পারে? ভুল করেন নি তো"

"আগে আমার কথাটা শুনে নিন, তারপর যা বলবার বলবেন"—বেশ একটু অভিজাতবংশী ভঙ্গিতে কথা কটি বলে ছেলেটি টেবিলে ঘরের বোতল ও গ্লাস দুটোর দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ সে দিকে চেয়ে থাকবার পর ফুলের দিকে ফিরে শান্ত কণ্ঠে বললে—"বিলীপ হালদার"

"বিলীপ হালদার মানে?"

"আমিই। আমার নাম শোনেন নি?"

"না"

"ও- শোনবার কথাও হয় আপনার। একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আছে আপনার সঙ্গে। বসব? বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি"

"বসুন বসুন"

পুরন্দরবাবু বলে' উঠলেন, কিন্তু তার আগেই ছোকরা একটা চেয়ার টেনে বসেছিল। পুরন্দরবাবুর বুকের ব্যথাটা বাড়ছিল ক্রমশঃ, কিন্তু এই ছেলেটির আকস্মিক আগমন এবং সপ্রতিভ ব্যবহার বেশ লাগছিল তাঁর। তার তরুণ সুন্দর মুখখানিতে পারুলকে মনে পড়ছিল।

"আপনিও বসুন না" মৃণালের দিকে চেয়ে ছেলেটি বললে এবং মাথা নেড়ে একটা চেয়ার বেঁকিয়ে দিলে।

"না, আমি বেশ আছি"

"ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। পুরন্দরবাবু, আপনি যদি থাকতে চান থাকুন"

"আমি আর যাব কোথায় নিজের বাসা ছেড়ে"

"আপনার যা খুশী। সত্যি কথা বলতে কি, আপনি থাকলে বরং ভালই হয়। পারুলের কাছে আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে—"

"পারুলের কাছে? বাঃ! কখন শুনলেন এর মধ্যে?"

"আপনারা চলে আসবার ঠিক পরেই। আমি সেখান থেকেই সোজা আসছি। মৃণালবাবুকে একটা কথা বলতে চাই—" মৃণালের দিকে ফিরে তারপর বললে—"আমরা—মানে পারুল আর আমি—ছেলেবেলা থেকে পরস্পরকে ভালবেসে আসছি এবং ঠিক করেছি যে আমরা বিয়ে করব। আপনি হঠাৎ আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে হাজির হয়েছেন, আমি বলতে এসেছি যে আপনি সরে পড়ুন। আমাদের এ অনুরোধ রক্ষা করতে কি আপত্তি আছে আপনার?"

"নিশ্চয়! বিশেষ আপত্তি আছে"

"ও, বাবা, তাই না কি।"

ছেলেটি গম্ভীরভাবে চেয়ারে ঠেস দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিলে।

"আমি আপনাকে চিনি না, সুতরাং আপনার সঙ্গে এসব আলোচনার কোন মানে নেই"

এই বলে' মৃণাল বসে পড়াটাই সমীচীন মনে করলে।

"বলছিলাম আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। এখনি তো আপনাকে বললাম যে আমার নাম দিলীপ হালদার—পারুল আর আমি দুজনেই দুজনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং আমি আপনাকে চিনি না' বলে' ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে। আমার সব বক্তব্যও শোনেন নি আপনি এখনও। তাছাড়া আমার কথা না হয় ছেড়েই দিন —আপনি পারুলকে যে এমন বেহায়ার মতো জ্বালাতন করছেন রোজ— এই কথাটাই তো বিশেষ করে আলোচনাযোগ্য"

একটি একটি করে' দাঁত টিপে টিপে কথাগুলি এমন ভাবে সে বললে যে মনে হল যেন নিতান্ত বাধ্য হয়েই অপ্রিয় কথাগুলো বলতে হচ্ছে তাকে।

"দেখ ছোকরা"—আত্মবিস্মৃত মৃণাল চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু ছোকরা তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিলে তাকে।

"দেখুন, অত সহজ হ'লে আপনার ওই 'ছোকরা' কথায় আপত্তি করতুম না আমি। এখন করব না, কারণ একথা আপনাকেও মানতে হবে যে কম ঝঞ্ঝাটটা আমার একমাত্র মূলধন এক্ষেত্রে। আজ সকালে যখন পারুলকে রেজলেট উপহার দিচ্ছিলেন তখন আপনিও ছোকরা হতে পারলে বেঁচে যেতেন"

"যদা কাঞ্চিল তো" পুরন্দরবাবু মনে মনে বললেন।

"যাই হোক" মৃণাল উত্তর দিলে "আপনার সঙ্গে তর্ক করব না আমি। আমার মনে হচ্ছে আপনি যে সব কারণ দেখাচ্ছেন তা আপনার মনগড়া, ও সব নিয়ে কোন কথা আর আমি কইব না আপনার সঙ্গে, কইলে নিতান্ত ছেলেমানুষি হবে তা আমার পক্ষে। কাল আমি বিষ্ণুবাবুর কাছে গিয়ে খোঁজ করব। আপনি এখন যেতে পারেন"

"দেখছেন কি রকম লোক" বলে' দিলীপ পুরন্দরবাবুর দিকে চাইলে "আর এত অপমানিত হয়েও লজ্জা হয় না ওঁর! উনি আমাদের নামে নালিশ করতে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে যেতে চান আবার! এর থেকে কি প্রমাণ হয়? প্রথমত প্রমাণ হয় যে আপনি অত্যন্ত আত্ম-সম্মানহীন একগুঁয়ে লোক, দ্বিতীয়ত প্রমাণ হয় যে আপনি এই বর্বর সমাজের শিথিলপ্রথার সুযোগ নিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে জোর করে পারুলকে বিয়ে করতে চাইছেন তার মতের বিরুদ্ধে। পারুল আপনাকে ঘৃণা করে এইটুকু জানানোতেই থেমে যাওয়া উচিত আপনার, সে আপনার রেজলেট পর্যন্ত ফেরত দিয়েছে—এর পরেও যাবেন আপনি।"

"রেজলেট আমাকে ফেরত দেয় নি সে। শুনুন একবার যাকে কথা"

"ফেরত দেয় নি! আপনি বলতে চান পুরন্দরবাবুর কাছ থেকে আপনি রেজলেট ফেরত পান নি?"

"আঃ, ভোবালে দেখছি" মনে মনে কথাগুলো উচ্চারণ করে' পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে' বললেন—"হ্যাঁ পারুল আমাকে এইটে ফেরত দিতে গিয়েছিল মৃণালবাবু, আমি নিতে চাই নি, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়লে না···এই দিন···এমন মুস্কিলে ফেলেছেন আমাকে আপনারা"

রেজলেটের বাক্সটা বার করে' পুরন্দরবাবু টেবিলের উপর রাখলেন। মৃণাল যন্ত্রাহতবৎ নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল।

"আপনি এটা এতক্ষণ দেন নি যে" একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠেই দিলীপ বলে' উঠল।

"দেয় ওঠে নি। মনেই ছিল না"

"অদ্ভুত কাণ্ড"

"কি বললেন?"

"একটু অদ্ভুত নয়? থাক গে···"

পুরন্দরবাবুর ইচ্ছে করছিল লাফিয়ে উঠে ছোঁড়ার কান মলে' দেন, কিন্তু তিনি হেসে ফেললেন, ছোকরাও হাসতে লাগল। মৃণাল কিন্তু একটুও হাসল না, তার অবস্থা ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুরন্দরবাবু যখন দিলীপের দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন তখন যদি তিনি মৃণালের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেন তাহলে বুঝতে পারতেন কি ভয়াবহ কাণ্ড হচ্ছে তার মনের ভিতর। কিন্তু তবুও পুরন্দরবাবুর মনে হল, এই দুঃসময়ে মৃণালের পক্ষ নেওয়া উচিত।

"দেখুন দিলীপবাবু, একটা কথা শুনুন আমার" বন্ধুভাবে আরম্ভ করলেন তিনি "এ বিয়ে অন্য কোন আলোচনা না করেও একটা কথা বলতে চাই শুধু আমি। পারুলের পাণি-প্রার্থী হিসেবে মৃণালবাবুর একাধিক যোগ্যতা আছে—প্রথমত ওঁরা মৃণালবাবুকে আগে থাকতে চেনেন ওঁর সম্বন্ধে সব জানেন, দ্বিতীয়ত উনি বড় চাকরি করেন একটা, তৃতীয়ত ওঁর বিষয়-সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে—সুতরাং আপনার মতো একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর আকস্মিক আবির্ভাবে উনি আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন একটু। আপনিও হয়তো খুব উপযুক্ত পাত্র—কিন্তু আপনার বয়স এত কম যে উনি আপনার কথা বিশ্বাস করতে ইতস্তত করছেন···তাই এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে না চাওয়াটা স্বাভাবিক ওঁর পক্ষে"

"আপনার বয়স এত কম—মানে কি বলতে চান আপনি! আমি উনিশ বছরে পড়েছি···আইনত আমার বিয়ে করবার বয়স হয়েছে।"

"তা হয়েছে। কিন্তু কোন মেয়ের বাবা আপনার হাতে কন্যাসম্প্রদান করবে বলুন? আপনি ভবিষ্যতে হয়তো কোটিপতি হবেন, কিম্বা মানব-জাতির মুক্তির পথ আবিষ্কার করবেন কিন্তু এখন আপনাকে দেখে কোন মেয়ের বাপই পাত্র হিসেবে পছন্দ করবে কি না সন্দেহ। উনিশ বছর বয়সে লোকে নিজের দায়িত্বই নিতে পারে না, আর আপনি আর একজনের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন এবং সেও আপনার মতো ছেলেমানুষ। এইটেই কি উচিত? আমার যা মনে হচ্ছে খোলাখুলি বলছি বলে' রাগ করবেন না,আপনিনিজেই আমাকে মধ্যস্থতা করতে ডাকলেন বলে' বলছি"

দিলীপ একটু লজ্জিতভাবে চেয়ে রইল পুরন্দরবাবুর দিকে। তারপর বলল "আপনার মুখ থেকে এসব কথা শুনব প্রত্যাশা করিনি। পারুল যা বলেছে আপনার সম্বন্ধে তাতে আমার একটু অন্য রকম ধারণা হয়েছিল। এখন দেখছি আপনারা সবাই একরকম, সব শিয়ালেরই এক রা। আপনাদের এসব জ্ঞানগর্ভ যুক্তি অনেক শুনেছি, কিন্তু তা মানবার উপায় নেই, কারণ একটা প্রবলতর যুক্তি আমাদেরও আছে"

"কি সেটা"

"আমরা পরস্পরকে ভালবাসি এবং অনেক দিন থেকে বাসছি। সুতরাং আপনার এসব যুক্তি শুনব না আমরা। আপনার বয়স কত হল—পঞ্চাশ?"

"সে জেনে আর কি হবে আপনার। যা বলবেন বলুন"

"মাপ করবেন, কৌতূহলটা সামলাতে পারলাম না। যাক সে—হ্যাঁ—দেখুন আপনি যে এখনই বলছিলেন—আমি কোটিপতি বা মহামানব কিছুই হব না হয় তো—কিন্তু বিয়ে করে যে সংসার চালাতে পারব সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এখন অবশ্য আমি নিজে, পারুলদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছি—বিষ্ণুচরণবাবুকে জ্যাঠামশাই বলি"

"ও, তাই না কি"

"আমার বাবা আর বিষ্ণুচরণবাবু খুব বন্ধু ছিলেন। আমরা পশ্চিমে থাকতাম। একবার প্লেগে আমাদের বাড়ির সবাই মারা গেল—এক আমি ছাড়া। জ্যাঠামশাই আমাকে মানুষ করেছেন—বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়েছেন আমাকে। জ্যাঠামশাই লোক খুব ভাল, বুঝলেন—"

"জানি"

"কিন্তু ওঁর মতামত বড় সেকেলে ধরণের। এখন অবশ্য আমি আর ওঁদের বাড়ি থাকি না, আলাদা মেসে থেকে রোজকারের চেষ্টা করছি"

"কতদিন থেকে?"

"চার মাস"

"চাকরি পেয়েছেন?"

"পেয়েছি একটা ছোটখাট গোছের। পঁচাত্তর টাকা মাইনে, তার আগে আর একটা পেয়েছিলাম, মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা দেওয়ায় তখনই আমি বিয়ের কথা বলেছিলাম"

"কাকে?"

"জ্যাঠামশাইকে"

"তিনি প্রথমে হেসেই উড়িয়ে দিলেন, তারপর চটে গেলেন। পারুলকে আমার সঙ্গে দেখাই করতে দিতেন না। আসল কারণ কি জানেন? উনি আমাকে ওকালতি পড়তে বলছিলেন—কিন্তু উকীল হয়ে কি হবে বলুন তো! তার চেয়ে রোজকার করাই তো ভাল এখন থেকে। তাই ওঁর রাগ। আমি সেইজন্যে আর যাই না বড় সেখানে। পারুল কিন্তু ঠিক আছে এসব সত্ত্বেও। আমি জানি সে তার প্রতিজ্ঞা রাখবেই"

"আপনি ওদের বাড়ি যান না বলছেন, তাহলে পারুলের সঙ্গে কথা হল কি করে?"

"কেন, ওদের বাগানের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে। সেই কটা-চুল মেয়েটিকে মনে আছে? সে আমাদের দিকে,—কতদূর দিয়িও। ওকি আপনি অমন করলেন যে? রাগের শব্দে ভয় করে না কি আপনার—" বাইরে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছিল।

"না, আমার বুকের কাছটা ব্যথা করছে অনেকক্ষণ থেকে"

সত্যিই পুরন্দরবাবু ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ছিলেন। একটু ঝুঁকো হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

"ও, তাহলে আমি যাই। আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি থাকাতে অসুবিধে হচ্ছে আপনার"

"না কিছু অসুবিধে নেই"

"চললাম তবু। হ্যাঁ দেখুন, অখিলবাবু—ও, মৃণালবাবু বুঝি আপনার নাম—দেখুন মৃণালবাবু কি ঠিক করলেন আপনি তাহলে।"

হাতঘড়ির দিকে চাইলে সে।

"পারুলকে মেয়াদ দিয়েছেন তো? দিন, বুঝলেন। দিলেন তো?"

"না—" মৃণাল অধীরভাবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। এরা ক্ষেপে যাবার মতো অবস্থা হয়েছিল তার—"আপনি দয়া করে' আমাকে রেহাই দিন"। তর্জ্জনী আস্ফালন করে দিলীপ বললে—"ভুল করছেন আপনি কিন্তু তা বলে' দিচ্ছি। পারুলকে আমি চিনি, সে মরে যাবে তবু আপনাকে বিয়ে করবে না। হিসেবে ভুল করলেন না। ন'মাস পরে ফিরে এসে দেখবেন খাঁচা খালি, পাখী উড়ে গেছে। এরকম 'ডগ্, ইন্ দি ম্যাঞ্জার' পলিসির মানেটা কি বুঝতে পারছি না। মাপ করবেন উপমায় বাজির কথাটা বললাম। জিনিসটা ভেবে দেখুন না, চেষ্টা করুন অন্তত।"

"দেখুন আপনার বক্তৃতা শোনবার ইচ্ছে নেই আমার। আপনি যা যা বলে গেলেন সব মনে থাকবে আমার। আপনি যে সব অভদ্র ইঙ্গিত করলেন তা নিয়ে এখন বাগবিতণ্ডা করতে চাই না। কাল এর ব্যবস্থা করব"

"অভদ্র ইঙ্গিত? তার মানে। আমার এ কথাগুলো যদি আপনার অভদ্র ইঙ্গিত বলে' মনে হয় তাহলে আপনার মনই অভদ্র বুঝতে হবে। আচ্ছা বেশ, কালকের জন্যে প্রস্তুত থাকব আমি। কিন্তু যদি···আঃ আবার বাজ পড়ল একটা···আচ্ছা চলি। নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারী খুশি হলাম" পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে হেসে যাবা মেঘে দিলীপ বেরিয়ে গেল। বাইরে ঝড় উঠল একটা।

ক্রমশঃ

ভারতে বৃটিশ মন্ত্রিমিশন

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

ভারতের ইতিহাসে ১৯৪৬ সাল একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। বিলাতের শ্রমিক-সরকার মুক্তিকামী ভারতকে এতদিনে তাহার মুক্তির বাণী শোনাইলেন। তবে সেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে পরাজয় স্বীকার করিয়া যে পরবশতা গ্রহণ করিয়াছে আজিও তাহার অবসান ঘটে নাই। পরাধীনতার এই শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য ভারতীয়গণ সিপাহী-বিদ্রোহ করিয়াছে, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অসহযোগ চালাইয়াছে, আগষ্ট আন্দোলন করিয়াছে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়িয়াছে তবুও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত হইতে পারে নাই। সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা ছলে-বলে আমাদের সকল মুক্তি-আন্দোলনকেই পণ্ড করিয়া দিয়াছে। গৃহ বিবাদের সৃষ্টি করিয়া সাম্প্রদায়িক অস্ত্র দিয়া দেশ শাসনের ও শোষণের সুযোগ লইয়াছে। এতদিন পরে বৃটিশ মন্ত্রিমিশন এদেশে আসিয়া, ভারতীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনা করিয়া, ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র এবং তাহা কি ভাবে ভারতীয়দের হস্তে ন্যস্ত হইবে তাহারই এক খসড়া প্রকাশ করিলেন।

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথম বিলাতে ঘোষণা করা হয় যে, ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের সহিত আলোচনা করিবার জন্য বৃটিশ মন্ত্রিসভা ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বাণিজ্য পরিষদের সভাপতি স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং নৌসচিব মিঃ আলেক্জাণ্ডারকে শীঘ্রই ভারতে প্রেরণ করিবেন। বৃটিশ মন্ত্রিমিশন ভারতে আসিবার কয়েক দিন পূর্বে ১৫ই মার্চ তারিখে প্রধান মন্ত্রী এট্‌লি পুনরায় জানান—ভারতবর্ষকে শীঘ্রই পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভের সাহায্য করিবার জন্যই আমার সহকর্মিগণ ভারতে যাইতেছেন। বর্তমান শাসন-তন্ত্রের পরিবর্তে কি ধরণের শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবে ভারতীয়গণই তাহা স্থির করিবেন। ভারতবাসী সত্বর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারুক ইহাই আমাদের ইচ্ছা।.....ইহাও আমি মনে করি যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিবার অধিকার রহিয়াছে এবং যথাসম্ভব সত্বর ও সহজে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে সাহায্য করাই আমাদের কর্তব্য।

এই ঘোষণার পর লর্ড পেথিক লরেন্স মন্ত্রিমিশনের নেতা হইয়া স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও মিঃ আলেকজাণ্ডারকে সঙ্গে লইয়া ২৪শে মার্চ তারিখে ভারতে আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিয়াই দিল্লী সহরে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায় ও দলের সকল নেতার সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। তারপর কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম উদ্দেশ্যে ১৮শে এপ্রিল তারিখে মন্ত্রিমিশন কাশ্মীর রওনা হইলেন। কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া মন্ত্রিমিশনের সদস্যগণ আলোচনা কেন্দ্রকে দিল্লী হইতে সিমলা শৈলে স্থানান্তরিত করিলেন। এইবার এইখানে ত্রি-দলীয় বৈঠকের ব্যবস্থা হইল। মন্ত্রিমিশন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ও লীগ প্রেসিডেন্ট প্রত্যেককে তাঁহাদের সহিত আরও তিনজন করিয়া অমোনীত ব্যক্তি লইয়া আলোচনা চালাইবার অনুমতি দিয়া আমন্ত্রণ জানাইলেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রহিলেন, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ও খান আবদুল গফুর খাঁ। কংগ্রেসের উপদেষ্টা হিসাবে মহাত্মা গান্ধীও সিমলা আসিলেন। লীগ প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্না, নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁ, জনাব মহম্মদ ইস্‌মাইল এবং মিঃ আবদুর রবী নিস্তারকে সঙ্গে লইলেন।

৫ই মে বেলা ১০টায় ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের সভাপতিত্বে সিমলায় ত্রি-দলীয় বৈঠক বসিল। কয়েক দিন বৈঠক চলিল, কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের মতানৈক্য মিটিল না। ১২ই মে সন্ধ্যায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া বৈঠকের অবসান ঘটে। বৈঠক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রিমিশন ও বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এক যুক্ত বিবৃতিতে জানান —ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ সিমলা বৈঠকে একমত হইতে না পারায় আমরা বিশেষ দুঃখিত। তবে বৈঠক সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শেষ হইয়া যাইতেছে না। ইহার পর যাহা করণীয় তাহা আমরা শীঘ্রই জানাইব।

পূর্বের সমস্ত মীমাংসালোচনার অভিজ্ঞতা হইতে মিশনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার সময় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতি আজাদও এই সর্ত জানাইয়া লইয়াছিলেন যে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্যের রেখা মিলিলও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রকৃত গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা কার্যে পরিণত করিতেই হইবে।

১৬ই মে অপরাহ্ণে মন্ত্রিমিশন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজস্ব পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। বিলাতের কমন্স সভায় এবং ভারতের সর্বত্র ইহা একই সঙ্গে বেতার যোগে প্রচার করা হয়। ইহার পরদিন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতের অন্তবর্তীকালীন গভর্ণমেণ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে বেতার বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—

বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইবে, যথা (ক) বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, (খ) পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, (গ) বাঙ্গলা, আসাম। বৃটিশ বেলুচিস্থানকেও (খ) ভাগের মধ্যে ধরা হইবে।

বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া শীঘ্রই একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যানবাহন এই যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন থাকিবে এবং এই সকল বিষয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহেরও ক্ষমতা ইহার থাকিবে।

যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল ক্ষমতা থাকিবে তাহা ছাড়া অপর সমস্তই প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকিবে।

বৃটিশ ভারত ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ও ব্যবস্থা পরিষদ থাকিবে।

প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে প্রতি দশ লক্ষে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে।

মোট সদস্য সংখ্যা থাকিবে ৩৭৪ জন, তন্মধ্যে বৃটিশ ভারত হইতে ২৯২জন এবং দেশীয় রাজ্য হইতে ৯৩জন।

বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলি হইতে নিম্নলিখিত হারে সাধারণ (মুসলিম ও শিখ ভিন্ন সকল সম্প্রদায়ই সাধারণের অন্তর্ভুক্ত) মুসলিম ও শিখ প্রতিনিধি থাকিবে—

"ক"

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	মোট
বোম্বাই	১৯	২	২১
মাদ্রাজ	৪৪	৫	৪৯
যুক্তপ্রদেশ	৪৭	৮	৫৫
মধ্যপ্রদেশ	১৬	১	১৭
বিহার	৩১	৪	৩৬
উড়িষ্যা	৯	০	৯
মোট	১৬৭	২০	১৮৭

"খ"

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	শিখ	মোট
পাঞ্জাব	৮	১৬	৪	২৮
সিন্ধু	১	৩	০	৪
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	০	৩	০	৩
	৯	২২	৪	৩৫

"গ"

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	মোট
বাঙ্গালা	২৭	৩৩	৬০
আসাম	৭	৩	১০
	৩৪	৩৬	৭০

যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাদেশিক সরকারের শাসন ব্যবস্থায় একটি বিধান থাকিবে যে, ব্যবস্থা পরিষদে ভোটাধিক্যের ফলে প্রতি দশবৎসর অন্তর শাসনতন্ত্রের পুনর্বিবেচনা দাবী করিতে পারিবে।

নূতন শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর কোনও প্রদেশ ইচ্ছা করিলে, নিজের প্রদেশ মণ্ডলী হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে।

মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা প্রচারিত হইবার পর এই বিষয়ের আলোচনার জন্য কয়েকদিন ধরিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠক বসে। ২৪শে মে তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশনে ১ ছাড়ার পক্ষ সম্বলিত এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মিশনের পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ এবং কয়েকটি বিষয় অস্পষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমানে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইতেছে না। মিশন-প্রস্তাবের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাইলে, পুনরায় ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠকে এ সম্বন্ধে সঠিক প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইবে।

মিশন-প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া মিঃ জিন্না ২২শে মে তারিখে এক বিবৃতিতে জানান—মন্ত্রিমিশন পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠন অস্বীকার করায় তিনি দুঃখিত। আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে পাকিস্থান ব্যতীতে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব, ইহা দ্বারা কেবল যে মুসলমান সম্প্রদায়ই উপকৃত হইবে তাহা নহে, ভারতের সর্ব্বসাধারণেরই মঙ্গল হইবে। মনে হয় কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই মিশন এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাই হউক লীগ ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতে আমি কিছু বলিতে চাহি না, শীঘ্রই দিল্লীতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটী কাউন্সিলের বৈঠক বসিবে, বৈঠকে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী মন্ত্রিমিশনের খসড়া প্রচারিত হইবার পর হইতেই উহা সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। হরিজন পত্রিকায় মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—বৃটিশ মন্ত্রিমিশন বর্ত্তমানে ইহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টতর পরিকল্পনা দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা ভারতের কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা ত নাইই, বরং এই প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। মন্ত্রিমিশন দেশের সকল দলের সহিত আলোচনা করিয়া এবং একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন যাহাতে সর্ব্বদলের স্বার্থ সমভাবে রক্ষা রহিয়াছে।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর দান চিরস্মরণীয়। তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতাও অতুলনীয়। সমগ্র দেশ ও জাতির পক্ষে ইহা মঙ্গলকর জানিয়াই তিনি গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। মিশনের প্রস্তাব পড়িয়া মনে হয় মন্ত্রিমিশন সমগ্র ভারতের প্রতি একটি শুভেচ্ছা লইয়াই যেন এই পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, পরিকল্পনায় ভারতকে প্রদেশ গোষ্ঠিতে বিভক্ত করায়, আপাত দৃষ্টিতে পাকিস্থান সমর্থন বলিয়া মনে হইলেও আসলে ঠিক তাহা নহে। কারণ, আসাম বাঙ্গালার সহিত যুক্ত হইলে, হিন্দু-প্রধান বাঙ্গালা শক্তিসম্পন্ন হইবে। আসাম-বাঙ্গালা-মণ্ডলে হিন্দু ও কংগ্রেসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এই মণ্ডলে আসামের ও কোন ক্ষতি হইবেই না অধিকন্তু বাঙ্গালার মঙ্গল হইবে। তাহা ছাড়া আসাম বাঙ্গালার সহিত যুক্ত হইলে অর্থনৈতিক দিক দিয়া বরং তাহার শীঘ্র উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতম বিচারালয় প্রভৃতির জন্য আসামকে এখনও বাঙ্গালার উপর নির্ভর করিতে হয়। আসাম মণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শক্তিশালী প্রতিকূল প্রতিবেশীর পার্শ্বে একা না থাকিয়া তাহার সহিত যুক্ত থাকিলে তাহাতে উভয়েরই মঙ্গল। আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধুর সহিত একপ্রদেশ গোষ্ঠির মধ্যে স্থান পাওয়ায় সেখানে কংগ্রেসী মুসলমানরা সিন্ধু ও পাঞ্জাবের লীগ বিরোধী মুসলমানদের সহিত মিলিত হইয়া জাতীয়তাবাদ প্রচারের সুযোগ পাইবে, এবং অন্যান্য লীগ বিরোধী সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিলে তাহাদেরও সংখ্যা কম হইবে না। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দান উপেক্ষা করিবার নহে। তাই মনে হয় মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনায় উত্তরকালে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি অবসানেরই একটি গোপন ইঙ্গিত রহিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী সেই ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়াই দেশের কল্যাণের জন্য ইহা গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

৫-৬-৪৬

বিজয়ী

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

পাকাদীর মূলবেদী মহাভারতের যুদ্ধকাণ্ড রচনা করিয়াছিল। যুদ্ধ তাণ্ডবের পিছনে অভিযান-মুক্ত পাকাদীর বৃত্তপরিমা না থাকিলে মহাভারতকে মহাকালের অঙ্কে অমর করিতে পারিত না। বীর্য্যশুল্কা তিনি—তাই পাণ্ডববীর্য্য পরিচয়ে কৌরব-গ্লানির উত্তর চাহিয়াছিলেন, তাই পঞ্চমুখী ভুজঙ্গীর মত পঞ্চপাণ্ডবকে মুক্ত করিয়া রংগনাট্য মূলক্ষেত্রের প্রথম ও শেষ ছত্র যোজনা করিয়াছিলেন।

মহাভারতেরও পূর্ব্বে বীর্য্যশুল্কায় যে প্রথম মানবমহাকাব্য রচিত হইয়াছিল তাহারও ছত্রে দেখিতেছি, মূলবেদী কালভুজঙ্গের মত তর্জ্জন করিতেছে—

দদৃশে কম্পিতা বেণী ব্যালীব পরিদর্শতী—(২৫ সঃ সুন্দরকাণ্ড)। কিষ্কিন্ধ্যার অশোকতুল্য মৃত অশোককাননে শিংশপা বৃক্ষমূলের তাপসীকে দেখিয়া 'কালভুজঙ্গী' বলিয়া চমকিত হইয়াছিলেন। রামকথোরুকে বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না, বর্ণনায় মহারাজকে জানাইতেও তাই বিলম্ব হয় নাই—'পঞ্চমুখ ভুজঙ্গী তোমার মুখে অবস্থান করিতেছেন, তুমি জানিতেছ না—'

মুখে যাং নাভিজানাদি পঞ্চাস্যামিব পন্নগীম্। (৫১ সঃ সুন্দর) সেই পঞ্চমুখী ভুজঙ্গীই লঙ্কাকাণ্ডের কাব্যকে কোটিত করিয়াছিলেন। মহর্ষির কাব্যমুখে জনকনন্দিনীকে এমনই ভুজঙ্গী বলিয়া কে পরিচিত করিল? সে কিষ্কিন্ধ্যার দূত, যাহার অমরকীর্ত্তি সুন্দরকাণ্ডকে পরম কাব্য করিয়া রাখিয়াছে।

কিষ্কিন্ধ্যার অলোক-প্রভা গুহাপ্রাসাদ যাঁহার দ্বারা অলঙ্কৃত, চন্দ্রাননা স্বর্ণপ্রতিমা তারা যাঁহার মহারাণী, রাঘবযুগল যাঁহার অগ্নিসাক্ষি, সেই মহারাজ, দক্ষিণভারতের সেই মহাসম্রাট্—সুগ্রীবের স্নেহ অমাত্য হনুমান্ যখন সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্য আপন জীবন পণ করিলেন, যখন শুধু রাঘব কারণেই সেই দুঃসাহসিকতার অভিযানে অগ্রসর হইলেন,—তখন সেই অপূর্ব্বক্ষণে সুন্দরকাণ্ডের মুখারম্ভ হর্ষমুখর হইয়া উঠিল, মহর্ষির কাব্য উজ্জীবিত হইল, আর তাহারই সাথে কল্পনায় আবেগে ও বর্ণনে বিসর্পের সকল শোভা সকল আড়ম্বর বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।

'বভূব রামবৃদ্ধার্থং'—শুধু রাঘব কারণেই হনুমান্ দেহের বৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন। সমুদ্রলঙ্ঘনের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ হনুমানের লাঙ্গুল-শোভা দেখে নাই, সমুদ্রলঙ্ঘনের উদ্যোগক্ষণে 'লাঙ্গুলের' আবির্ভাব হইল। কৃত্রিম যোজনায় হনুমানের দেহবর্দ্ধন হইল—তাই সমুদ্রলঙ্ঘনের পূর্ব্বে এত বটা এত স্তুতিবাদ, তাই, শুধু কৃত্রিম বলিয়াই এত 'লাঙ্গুল'কীর্ত্তি।

রঘুবংশবিন্যাসে তাই মহাকবি কালিদাস বলিলেন—মমতাহীন ব্যক্তি যেমন সংসারসাগর পার হয়, হনুমান্ তেমনই নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্র পার হইলেন।

—প্লবগৈঃ সাগরস্তীর্ণঃ সংসারমিব নির্ম্মমৈঃ।

কোনও সংস্কৃতি-অভিমানী হনুমান্‌জীর বহুপুষ্পিত লাঙ্গুলশোভিত রোমশঙ্কিত মূর্ত্তিকে সংস্কৃতির কলঙ্ক বলিয়া ঘোষিত করিবেন কি?

ঋষ্যমূকের সন্ন্যাসচারী রামলক্ষ্মণকে দেখিয়া হনুমান্ 'কপি'-রূপ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অভিনয়ের কুশীলবের মতই এই বেশ-পরিবর্ত্তন। যাদের মানুষেরই জাতি, বৈষম্য শুধু সংস্কারে ও আচারে। লাঙ্গুলই যদি কপিত্বের প্রধান পরিচয় হয়, ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়া হনুমান্ সে লাঙ্গুল লুকাইলেন কোথায়? সুন্দরকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে হনুমান্ সমুদ্রলঙ্ঘনের বিপুল বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। কাব্যের কথায়, নিজ রূপকে হ্রস্ব করিলেন। সমুদ্রলঙ্ঘনের কৃত্রিম বেশবাস হনুমান কোথাও কিন্তুই লুকাইয়া রাখিলেন, মহিলে অশোককাননে জানকীদর্শনের কালে যাঁহার লাঙ্গুল পরিচয় নাই, পরেই লঙ্কাদাহনের সময়েই আবার লাঙ্গুল কোথা হইতে আসিল? লুকানো লাঙ্গুলটা আবার বাহির করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন, এই একমাত্র ভাবই সম্ভব হইতে পারে।

লঙ্কাপুরী প্রবেশের সময় বর্ষবরূপের পরিচয়ে কবি বলিলেন—'বৃষবপু-মান্', অর্থাৎ টীকাকার অনুযায়ী মার্জ্জার প্রমাণ। অথচ মার্জ্জার দেহধারী হনুমানের লঙ্কাপ্রবেশই লোকশাস্ত্রবিদিত। কবিকাকার যদি এই মার্জ্জার লইয়া কিছু গবেষণা করিতেন তাহা হইলে আমরা উপকৃত হইতাম। মহাকাব্যের সৃষ্টিকর্ত্তা রূপ পরিবর্ত্তন, বেশ বা লাঙ্গলজ্জার অর্থাৎ 'মেক্-আপ্' পরিবর্ত্তন বা গ্রহণ মাত্র,—কোনক্রমেই দেহ বা অবয়ব পরিবর্ত্তন বুঝায় না।

দুঃসাহসিকতার অভিযানে কোথা হইতে যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে সবেমাত্র চূড়া তুলিয়া মৈনাক পাহাড় মূর্ত্তিমান্ বাধা হইয়া দাঁড়াইল। শাস্ত্রবিৎ হনুমান্ ক্ষণমাত্র বিচলিত হইলেন না—তিনি জানেন পাহাড়চূড়া অনন্ত অনাদি নহে, তাহারও মাঝে অবকাশ আছে, পুরাকালে বজ্র তাহার গর্ব্ব খর্ব্বিত হইয়াছে, আকাশকে অন্তরালে সে কিছুতেই রাখিতে পারিবে না। সেই সাহসে ভর করিয়া পাহাড় চূড়ায় তিনি অবতীর্ণ হইলেন—পাহাড় তাঁহাকে ফলে মূলে সবহমান অভ্যর্থনা জানাইল। পথের ক্লান্তি তাঁহার কিছু দূর হইল। 'বেগবুতের' বেগসখাকে বক্ষ যে কিশর পাহাড়চূড়ায় ক্লান্তি দূর করিতে বলিয়াছিলেন তাহা শ্রীহনুমানকে এই মৈনাকী অভ্যর্থনারই স্মৃতি।

সাগর অভিযানের দ্বিতীয় অঙ্কে কবিকাঙ্কনিকা সুরসা আকাশসাগর ব্যাপিয়া হনুমানকে প্রতিরোধ করিল। সুদূরআকাশবিহারী অজানা-পথচারী মহাবীরের বক্ষও হয়ত সংস্কারবশে মৃদু কম্পিত হইয়াছিল। বিপুল অগাধ সমুদ্র বারে বারে মুখব্যাদান করিয়াছে এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রীটিকে গ্রাস করিবার জন্য, কিন্তু রামকার্য্য সাধনেই যাহার মন্ত্র

তাহার সম্মুখে দুরূহ কর্ম্ম কিছু নাই। মহাকাশে মহাবেগে বেগবলে স্থির করিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

উপরে সম্মুখে দূরে মহাকাশপন্থা বিস্তৃত, নিম্নে অনন্তব্যাপিনী সাগর,—মহাবীরকে গ্রাস করিয়া দিগ্‌দিগন্ত প্রসারিত নীলিমা। মহাবীর ভাবিতেছেন, কপিরূপ মহাকায় মহাবীর্য্য ছায়াগ্রাহী জীবের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাদের দেখা কোথায়! অমনি কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া সিংহিকা আকাশপাতাল যুগব্যাদনে আবির্ভূত হইল। চন্দ্রকে যেন রাহু গ্রাস করিল। শাস্ত্রবিৎ হনুমান জানেন রাহু কল্পনার সৃষ্টি, জানেন ছায়াগ্রাহী জীব অজ্ঞানতার ভয় মাত্র। তাই আশ্রয় কল্পনাকে ছিন্নমূল করিয়া তিনি অভিযাত্রাগ্রসর হইলেন।

—তীব্রবেগ কৃতঃ কর্ম্ম যদ্বৎ সদ্যঃ ফলং হরেৎ—(১ম সর্গঃ সুন্দর)

হনুমান্! তুমি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছ, তোমারই বলবীর্য্যে মহাবলরাক্ষসী নিহত হইয়াছে।'—সত্যই, হনুমান অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন—অজ্ঞাতবেগ লঙ্ঘনে ক্ষুদ্রিনের কাল্পনিক সংস্কারকে ধ্বংস করিয়াছেন, মহাবল 'ভয়'কে তিনি নিহত করিয়াছেন।

লঙ্কার অমরাবতীতে যখন হনুমান অবতীর্ণ হইলেন—যখন পূর্ণচন্দ্র-কিরণে স্বর্ণলঙ্কার অট্টালিকে মুগ্ধ হইলেন,—তখন সেই অভিযানের বিজয়-সুখে প্রথম চিন্তা আসিল—এখানে এপথে আর কে আসিবে? কে এই বিপুল মহাসমৃদ্ধৈশ্বর্য্যকে পরাভূত করিবে?

ইন্দ্রপুরীসম রাবণান্তঃপুরের শোভায় হনুমান্ বিস্মিত হইলেন। ধ্বনিত মণিকাঞ্চনহার, মুক্ত কাঞ্চিদাম, রত্ন কেশপাশ,—রূপজ্যোতি-ললনাদের আকুল-বিলাস, ইহারই মধ্য দিয়া হনুমান্ অন্বেষণ করিতেছেন রাঘবকুলবন্দিনী সীতাকে। কমলমালাদম তারকামালসম সংসর্গে ও আকর্ষণে যেখানে ছড়ানো, তাহারই মধ্য দিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রসর হইতেছেন রামকার্য্য সাধনে। একবার ভুল করিয়াছিলেন রাবণবহ্নির রূপমহিমা ও ঐশ্বর্য্যগরিমা দেখিয়া। ভাবিয়াছিলেন ইনিই হয়তো জানকী, কিন্তু পরক্ষণেই রামচরিত স্মরণ করিয়া দৃঢ়চিত্ত হইলেন—সে রামকল্পনি স্বয়ংজ্যোতি, অলোকসামান্যা। তিনি তো এ অন্তঃপুরচারী কখনও নহেন। তাই তাঁহার বিস্ময় হইল—

কামং দৃষ্টা ময়া সর্ব্বা বিক্রম্য রাক্ষসস্ত্রিয়ঃ। (১১সঃ সুন্দর)

এ কি করিয়াছি! রাজান্তঃপুরললনাদের মধ্য দিয়া আমি অনধিকারে ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু তাই, মনে তো কোনও বিকার উপস্থিত হয় নাই। সাগর লঙ্ঘনে অভিযানে যে জানী, যে ধর্ম্মের ইঙ্গিতে ললনারূপের মধ্যেও নির্লক্ষচিত্ত, সে সীতানুসন্ধান করিবে না, শিংশপা বৃক্ষমূলের অশরাজিতা-টিকে আবিষ্কার করিবে না তো আর কে করিবে?

হনুমান দেখিলেন অশরাজিতা মহাকুলজীর বিশ্বাস স্বর্ণলঙ্কাকে কালমুখে আহ্বান করিতেছে। রামনাম কীর্ত্তনে যাঁহাকে সঞ্জীবিত করিলেন, আপন সারল্যেই তাঁহাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লঙ্কাপারে আনিবার কথা বলিলেন—

যাং তু পৃষ্ঠগতাং কৃত্বা সমুদ্রিষ্যামি সাগরম্।

'তোমাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া সাগর পার হইয়া যাইব—আজই তোমাকে রাঘবসুন্দরের সাথে মিলিত করিয়া দিব।'

জানকী তাঁহাকে কৌশল করিয়া বুঝাইলেন—'পৃষ্ঠ হইতে যদি পতিত হই, যদি রাক্ষসেরা জানিতে পারিয়া তোমার অনুধাবন করিলে আমি ভীত হইয়া চ্যুত হই, সাগর জলে নিমগ্ন হই যদি, কিংবা রাক্ষসেরা যদি কাড়িয়া লুকাইয়া রাখে নূতন করিয়া জানব বানর এমন কি যেন ধর্ম্ম গর্হণ কিসেরে অজ্ঞাত প্রদেশে?'

বীর্য্যশুল্কা নারী বলবীর্য্যে সসম্মানে জিনিতে চাহেন—গোপনে নয়, পরপুরুষের বীর্য্যবলে নয়। রামচন্দ্র যদি ফিরাইতে পারেন তবেই। হনুমান ধর্ম্মলঙ্কার কালরজনী অপেক্ষা করাই শ্রেয় বুঝিলেন।

বিদায় নেবার পূর্ব্বে স্বর্ণলঙ্কাকে দূতের যাহাতে বুঝাইতে সাধন করিলেন। রাক্ষসের লঙ্কাকে হনুমান স্বর্গের অমরাবতী হইতেও ঐশ্বর্য্যময়ী বলিয়াছেন—বহু দিন পরে বাংলার কবি মধুসূদন এই মহাকাব্যের বিশেষতঃ সুন্দরকাণ্ডের গরিমাকে বহু সম্মানিত করিয়াছেন, কিন্তু সেই অমরার বাহিরা নগরীকে যখন হনুমান্ দগ্ধ করিলেন, যখন রাঘবকুলবন্দিনীর অভিমানকে বহ্নিমানিত করিয়া স্বর্ণপুরীর ধ্বংস-কাব্যে উপক্রমণিকা লিখিলেন, তখন বাংলার কবি স্বর্ণলঙ্কার মোহবশে আপন কাব্যের লঙ্কা বিপথগামী করিলেন।

লঙ্কা দগ্ধ করিয়া হনুমান অকস্মাৎ খুশী হইয়াই চিন্তিত হইলেন। 'এ কি করিয়াছি! দগ্ধ লঙ্কার অশোককানন কি দগ্ধ না হইয়াছে? জানকী রামদূত কর্ত্তৃক অগ্নিরক্ষা! এ কি সম্ভব হইয়াছে!—'

'অসম্ভবং।' মহাকবি হনুমানকে আকাশবাণীরূপে স্মরণ করাইয়া দিলেন। শাস্ত্রবিৎ ধনি বিজ্ঞানী হনুমান্ দৃঢ়চিত্তে উচ্চারণ করিলেন—

—'নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ত্ততে'— (৫৫ সঃ সুন্দর)

অগ্নিকে দাহ করা অগ্নির পক্ষে অসম্ভব। জানকীরূপ অগ্নিই শুধু স্বর্ণলঙ্কাকে গ্রাস করিয়াছে, সে অগ্নিকে আর কে গ্রাস করিবে?

... মহেন্দ্রপর্ব্বতে প্রত্যাবৃত্ত হনুমানকে অভ্যর্থনা হইল অপূর্ব্ব ছন্দে, মহাকবির অপূর্ব্ব কাব্যমাধুর্য্যে ও ভাবসম্ভারে। মধুলকে বিশ্রামন করিয়া যে মধুপান তাহাতেই সুন্দরকাণ্ডের মধুমাপ্তি নয়, লঙ্কাকাণ্ডের সূচনায়ও জানকী সংবাদে প্রীতিভরে রামচন্দ্র যখন 'আলিঙ্গনই আমার যথাসর্ব্বস্ব' বলিয়া বাহু প্রসারিত করিলেন হনুমানের প্রতি,—সুন্দরকাণ্ডের সেই শেষ গৌরবটীকা।

শাস্ত্রপারের অশোক কাননে শিংশপামূলের অপরাজিতার স্বয় খুঁজিয়া এপারে সার্থক হইতে চলিয়াছে।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব—

গত ২১শে বৈশাখ হইতে ১ সপ্তাহ কাল ধরিয়া বাঙ্গালার ও ভারতের সর্বত্র, প্রায় প্রতি গ্রামে ও প্রতি গৃহে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠানাদি হইয়া গিয়াছে। সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পের আলোচনার ফলে রবীন্দ্রনাথকে সকলের নিকট নূতন ভাবে পরিচিত করিয়া দিবার সুযোগ হইয়াছিল। এই উপলক্ষে দেশের সর্বত্র নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য অর্থও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এখনও পর্য্যন্ত উক্ত ধন-ভাণ্ডারে ২৫ লক্ষ টাকাও সংগৃহীত হয় নাই। ভাণ্ডারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিরাট পরিকল্পনা লইয়া দেশবাসীর নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত না হইলে সে পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্যারম্ভ করা যাইবে না। ইতিমধ্যে ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর মিঃ কেসির চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের কলিকাতায় পৈতৃক ভবন ক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। উহাকে জাতীয় সম্পত্তিরূপে ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করাই স্মৃতি সমিতির একান্ত ইচ্ছা। আমাদের বিশ্বাস, বিলম্বে হইলেও, শেষ পর্য্যন্ত এই কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হইবে না।

আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য—

ভারতব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসিয়া পড়িয়াছে। এই দুর্ভিক্ষে ভারতের কয় কোটি লোককে প্রাণ হারাইতে হইবে তাহা সর্ব্বনিয়ন্তাই জানেন। যে মাসেই বাঙ্গালা দেশে চাউলের মণ কোন কোন স্থানে ৪০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। বহু জেলায় চাউল দুষ্প্রাপ্য, কাজেই লোক অখাদ্য খাইতে আরম্ভ করিয়াছে ও তাহার ফলে শীঘ্রই যে দেশে অকালমৃত্যু আরম্ভ হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গত ৭ মাস কাল গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তাব্যক্তিরা ভাবী দুর্ভিক্ষের কথা ঘোষণা করিয়াছে ও ভারতের বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিবে বলিয়া স্তোক দিয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ দুর্ভিক্ষ যাহাতে না হয়, সে জন্য কোন ব্যবস্থাই করে নাই। এমন কি, দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবার পরও কোথাও দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকে খাটাইয়া তাহাদের চাউল দিবার ব্যবস্থা করে কোন জনহিতকর কাজও আরম্ভ করে নাই। এখনও সরকারী গুদামসমূহে হাজার হাজার মণ খাদ্যশস্য পড়িয়া নষ্ট হইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। যে সময়ে সংবাদপত্রসমূহের পৃষ্ঠা চাউলের অভাবের সংবাদে পূর্ণ, সে সময়েও সরকারী বড় কর্ত্তারা "বাঙ্গালায় চাউলের অভাব হইবে না" বলিয়া ঘোষণা বাণী প্রকাশ করিতেছেন। সত্য সত্যই দেশে হয় ত খাদ্যের অভাব হয় নাই—সরকারী অব্যবস্থার ফলে দেশে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। অনেকে মনে করেন, এই ভাবে দুর্ভিক্ষ আনয়নের পিছনে রাজনীতিক কারণ বিদ্যমান। দেশে গত এক বৎসর কাল রাজনীতিক আন্দোলন প্রবল ভাবে বাড়িয়া যাইতেছিল। লোককে অন্নসমস্যায় বিব্রত করিলে তাহাদের আর রাজনীতিক চিন্তার অবসর থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ লোক না খাইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়িলে তাহার পক্ষে সাহসিকতার কাজ করাও অসম্ভব হইয়া যাইবে। সেইজন্যই হয় ত এই দুর্ভিক্ষকে ডাকিয়া আনার প্রয়োজন হইয়াছিল। কি ভাবে মানুষকে হীনবল করা হইতেছে, তাহা রেশন ব্যবস্থা দ্বারাই বুঝা যায়। পূর্ব্বে প্রতি লোকের প্রতি বেলা আহারের জন্য ১ পোয়া চাউল দেওয়া হইত, এখন সে স্থলে ৩ ছটাক চাউল দেওয়া হয়, পরে উহা আধ পোয়া করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। বাঙ্গালা দেশে শতকরা ৯০ জনেরও অধিক লোকের ১ বেলায় ১ পোয়া চাউলের

ভাত না খাইলে পেট ভরে না। কারখানাঞ্চল স্থানগুলিতে শ্রমিকদিগকে চাউলের বদলে ছোলা বেশী করিয়া দেওয়া হইতেছে; তাহার ফলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের গ্রীষ্মে লোক ক্ষুধার জ্বালায় ছোলা খাইয়া উদরাময়ে প্রাণ হারাইতেছে। অধিক খাদ্য উৎপাদন ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ সাহায্য ব্যবস্থা না থাকায় জনসাধারণের সে বিষয়ে উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও তাহারা কোন প্রকারে চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে নাই। যে দেশে শাসক সম্প্রদায় উদাসীন, সে দেশে স্বাধীনতা লাভ না করা পর্য্যন্ত মানুষের এই ভাবে দুর্গতি ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—

আবার ভারতের সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। অতি অল্প মাত্র কারণ হইতে দাঙ্গা ভীষণ আকার ধারণ করে। এলাহাবাদে ও বোম্বাইয়ে এরূপ অতি সামান্য কারণে দাঙ্গা হইয়াছিল। বেরিলি ও আলিগড়ের হাঙ্গামা ত লাগিয়াই আছে। বাঙ্গালা দেশে বর্দ্ধমানের কালনা মহকুমায় ও যশোহরের নড়াইল মহকুমায় হাঙ্গামার ফলে বহু ক্ষতি হইয়াছে। সিমলা বৈঠকে কংগ্রেসের সহিত মুসলেম লীগের আপোষ হইল না। বাঙ্গালার লীগ-নেতা মিঃ সুরাবর্দী কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া স্থায়ী সচিবসঙ্ঘ গঠনে সমর্থ হন নাই। তাহাই এই সকল দাঙ্গার মূল কারণ কি না কে জানে? অথচ সিন্ধু দেশের প্রধান মন্ত্রী সার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা সম্প্রতিও বলিয়াছেন, কংগ্রেসের সহিত মিলিত সচিবসঙ্ঘ গঠন করা না হইলে সিন্ধু দেশেও স্থায়ী সচিবসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হইবে না। ভারতে হিন্দু ও মুসলমানকে একত্র বাস করিতে হইবে। মন্ত্রী মিশনের সদস্যরাও বলিয়াছেন, ভারতে মিঃ জিন্নার পরিকল্পনা অনুসারে পাকিস্থান করা সম্ভব নহে। হিন্দুরা কোন দিন মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া ভারতে হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠার কথা মনেও করেন না। কাজেই উভয় সম্প্রদায় যদি পরস্পরের প্রতি মনোভাব পরিবর্ত্তন না করে, তবে এই বিবাদ ত দিন দিন বাড়িয়াই যাইবে—তাহার ফলে জাতি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। হিন্দুই মরুক, আর মুসলমানই মরুক, দেশের ক্ষতি সমানই হইবে।

আসন্ন রেল ধর্ম্মঘট—

নিখিল ভারত রেল শ্রমিক সংঘের পক্ষ হইতে ভারতের রেল কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগ বিবৃত করিয়া যে দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল, ভারত গভর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ফলে সারা ভারতের রেল কর্ম্মচারীরা গত ১লা জুন নোটীশ দিয়াছেন যে আগামী ২৭শে জুন মধ্যরাত্রি হইতে তাঁহারা একযোগে ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিবেন। ভারতের রেল সমূহের ব্যয় অপেক্ষা আয় কত বেশী, তাহা গত কয় বৎসরের রেল-বাজেট হইতে দেখা গিয়াছে। সেই উদ্বৃত্ত টাকায় যাত্রী সাধারণেরও কোন উপকারই করা হয় না। রেল যাত্রীদিগকে রেল ভ্রমণে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহারা রেল বিভাগে কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন, তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ দেওয়াও কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না। বহু দিন হইতে রেল কর্ম্মচারীরা অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। এখন তাহা সত্যই অসহনীয় হইয়াছে; সেজন্য ধর্ম্মঘট করা ছাড়া তাঁহারা অন্য কোন উপায় দেখিতেছেন না। ধর্ম্মঘটের ফলে রেল শ্রমিক ও দেশবাসী সকলের যে দুঃখ দুর্দ্দশা হইবে, সে কথা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ কি কোন প্রকার আপোষে অগ্রসর হইবেন না?

পরলোকে শরৎ মুখোপাধ্যায়—

হুগলী জেলার বাকুলিয়া নিবাসী শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত ২রা এপ্রিল ৮১ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র ভার-উত্তোলন করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এস-গুহ—

হাওড়া শিবপুর আইরণ ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ মেকানিকাল ও ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এস-গুহ শিল্প সংগঠন শিক্ষার জন্য সম্প্রতি জার্ম্মানীতে গমন করিয়াছেন। তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে জার্ম্মানীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের পর সে বিষয়ে তাঁহার অভিমত লণ্ডনে এক প্রতিষ্ঠানকে জানাইবেন। তাঁহার মত কর্ম্মীকে এ কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া গভর্ণমেণ্ট যোগ্যতার সমাদর করিয়াছেন।

শোভাযাত্রা সহ মেয়র-হেমাবেশ এ-সি-চ্যাটার্জী ফটো—তারক দাস

রাজবন্দীদের মুক্তিলাভ—

২৩শে মে তারিখে দমদম সেণ্ট্রাল জেল হইতে শ্রীযুক্ত অনিল রায়, জ্যোতিষ জোয়ার্দার, ভূপেন্দ্র রক্ষিত, ধীরেন্দ্র সাহা ও ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালার সকল নিরপত্তা বন্দীর মুক্তি হইল। কিন্তু বিভিন্ন মামলায় দণ্ডিত ৪০ জন রাজবন্দী এখনও মুক্তিলাভ করেন নাই। গত ১৯শে মে দমদম জেল হইতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী, আশুতোষ কাহালী, নরেন্দ্র দাস, হেমচন্দ্র ঘোষ, রসময় সুর, সুনীল দাশ, শান্তি গাঙ্গুলী ও সত্যব্রত মজুমদার মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

নূতন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ—

বাঙ্গালাদেশ হইতে নিম্নলিখিত ১২ জন কংগ্রেস নেতা এবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, মৌঃ আসরাফুদ্দীন আমেদ চৌধুরী, সুশীলচন্দ্র দেব, কিরণশঙ্কর রায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, দেবেন সে, তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন ভট্টাচার্য্য, যতীন্দ্রনাথ সেন, সত্যরঞ্জন বক্সী, নরেশচন্দ্র বসু, বনবিহারী বসু, দুর্গাপদ সিংহ, রামেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পরিমলকুমার রায়, শচীন্দ্রনাথ মাইতি, কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, শান্তিময় দত্ত, নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, শরৎচন্দ্র বসু, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, অমূল্য মুখোপাধ্যায়, লালবিহারী সিংহ, কুমারচন্দ্র জানা, যতীন্দ্রনাথ গুহ, সুশীল পালিত, লাবণ্যলতা চন্দ, ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হাসিময় রায়, সুধীরচন্দ্র রায়-চৌধুরী, আবদাস সত্তর, বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, ফকিরচন্দ্র রায়, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বসু, সৈয়দ নৌসের আলি, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিজয় ভট্টাচার্য্য, তারাপদ লাহিড়ী, অনন্ত-প্রসাদ সেন, সীতারাম সাকসেরিয়া, হবিবর রহমন চৌধুরী, গোলাম রসিদ খান, কমলকৃষ্ণ রায়, রাধাকিষণ নাওটিয়া, সত্যনারায়ণ মিশ্র, অমূল্য ঘোষ, রামসুন্দর সিং, লাবণ্য প্রভাদত্ত, লীলারায়, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন গুপ্ত,

দাশরথি চৌধুরী, অরুণচন্দ্র গুহ, সুরেশচন্দ্র দাস, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ভূপতি মজুমদার, নিখিলরঞ্জন গুহরায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, বিজয়চন্দ্র রায়, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ রায়, প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ জীবনরতন ধর, বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী।

মিঃ এস-এম ওসমান—

ইনি বিহারের পাটনা জেলার অধিবাসী হইলেও বাল্যকাল হইতে কলিকাতায় আছেন ও কলিকাতা বিশ্ব-

কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন মেয়র—মিঃ এস-এম-ওসমান

বিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এল। ১৯২০-২১ সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে ২ বার কারাবরণ করেন। তিনি কলিকাতা ২৬ জাকেরিয়া ষ্ট্রীটের প্রেসিডেন্সি মুসলেম এচ-ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সিটি কলেজের কমার্স বিভাগের অধ্যাপক। এবার ইনি কলিকাতার মেয়র হইয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশে সাংবাদিকগণের সুবিধাদান—

যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসদলের মন্ত্রিসভা স্থানীয় সাংবাদিকগণের কার্য্যকাল, বেতন, কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে এক নূতন আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিতেছেন। সেজন্য তাঁহারা সাংবাদিক, সংবাদপত্রের মালিক ও অন্যান্য নেতাদের লইয়া এক সম্মিলনে কর্ত্তব্য স্থির করিবেন এবং আমেরিকায় এ বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা আছে, সেরূপ ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন। বাঙ্গালাদেশের ব্যবস্থা পরিষদেও সেইরূপ বিল উপস্থাপনের ব্যবস্থা হইলে বাঙ্গালার সাংবাদিকগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর হইতে পারে।

শ্রীঅরেশনাথ মুখোপাধ্যায়—

ইনি ১৯৩৬ সালে ২০নং ওয়ার্ড হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হইয়া আছেন। তিনি খ্যাত-

কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন ডেপুটী মেয়র—
শ্রীযুক্ত অরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

নামা ব্যবসায়ী ও একবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তিনি ২০নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি। এবার ইনি কলিকাতার ডেপুটী মেয়র হইয়াছেন।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা—

লণ্ডনে এবার বৃটীশ সাম্রাজ্যের বৈজ্ঞানিকগণের এক সম্মিলন হইবে। তাহাতে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও দেশসেবক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা ৭ই জুন লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন।

হাওড়া পুলের উপর দিয়া পোভাযাত্রা সহ মেয়র-কেবারেল শাহ নওয়াজ ও মহবুব আলম ফটো—প্রাণ সেন

কাঙ্গাল হরিনাথ উৎসব—

গত ২১শে বৈশাখ শনিবার নদীয়া জেলার কুমারখালিতে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব হইয়া গিয়াছে। কাঙ্গালের গৃহে কাঙ্গালের সুবৃহৎ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসবের দিন ভোরে ঐ স্থান হইতে গ্রামবাসীরা মিছিলে বাহির হইয়া কাঙ্গাল-রচিত সঙ্গীত গান করিয়া ৩ মাইল দূরস্থ তাঁহার সাধন স্থলে গমন করেন ও প্রত্যাগমন সময়ে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আসেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের গ্রামগুলি হইতে বহু কীর্ত্তনের দল কাঙ্গাল গৃহে আসিয়া সারাদিন কীর্ত্তন উৎসব সম্পাদন করে। অপরাহ্নে উপস্থিত সকলকে ভূরিভোজে তৃপ্ত করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় কাঙ্গালের জীবনী, সাধনা ও সাহিত্যের আলোচনা হইয়াছিল। কাঙ্গালের পুত্রপৌত্রাদি এই সকল উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা হইলেও দেশবাসী সকলের উৎসব সম্পর্কে অসাধারণ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যায়। কাঙ্গাল তাঁহার ধর্ম্ম ও সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়া শুধু ঐ অঞ্চলে নহে, সারা বাঙ্গালা দেশে যে আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার স্বর্গলাভের ৪০ বৎসর পরেও সেই আদর্শপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা দেশবাসী সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। কাঙ্গাল হরিনাথের রচনাসমূহ পুনরায় প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করিলে তাহারা দেশবাসী উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন—

বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্ লিমিটেডের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন কয়মাস পূর্ব্বে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কারখানাসমূহ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'ফেডী-কেমিকেল ও ইনেকটো-কেমিকেল' সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শদাতা মনোনীত হইয়াছেন। সেন মহাশয়ের বিদেশ-ভ্রমণের কাহিনী 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইতেছে।

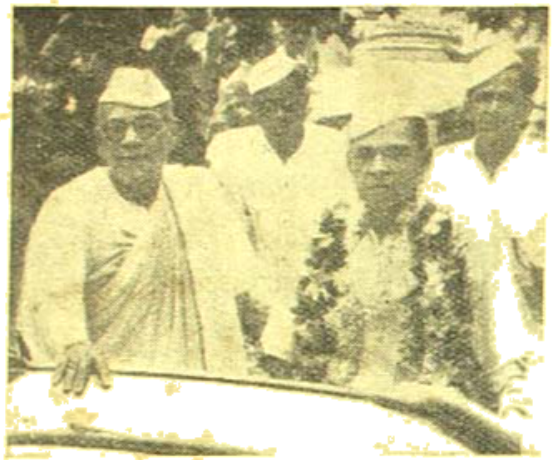

হাওড়া ষ্টেশন হইতে আই-এন-এ রিলিফ্ কমিটি অভিমুখে মোটরযোগে যেজর-জেনারেল এ-সি চ্যাটার্জ্জী ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

ফটো—পাঞ্চা সেন

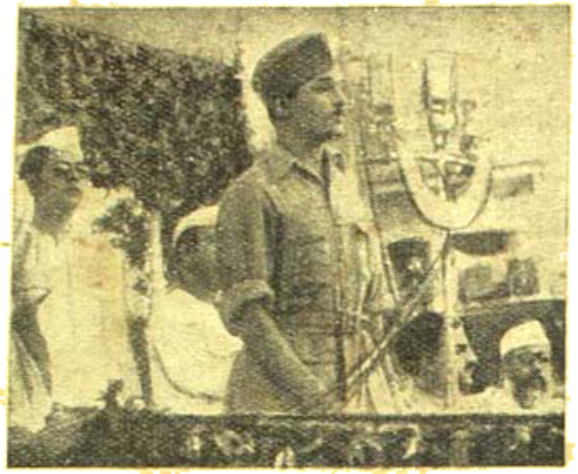

প্রত্নাবন্ধ পার্কে এক জনসভায় শাহ নওয়াজ ও মহাত্মার বক্তৃতা

ফটো—পাঞ্চা সেন

শশিভূষণ স্মৃতি-উৎসব—

গত ২রা জুন রবিবার অপরাহ্নে ২৪পরগণা দোদপুরের নিকটস্থ তেঘরিয়া গ্রামে স্বর্গত দেশকর্ম্মী শশিভূষণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের একবিংশ বার্ষিক স্মৃতি উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু উৎসবে যোগদিতা করেন এবং অধ্যাপক সুশীলকুমার আচার্য্য 'শশিভূষণ' বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ কার্য্য সম্পাদন করেন। ২৪পরগণা জেলাবোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র দাস, স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শশীবাবুর জীবন ও কার্য্যের কথা সভায় বিবৃত করেন। স্থানীয় বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের অধিকতর উন্নতি বিধান করিয়া উৎসবকে শ্রীমণ্ডিত করার চেষ্টা প্রয়োজন।

পরলোকে সুধীন্দ্র বসু—

আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু গত ২৬শে মে আমেরিকায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তথায় গমন করেন ও গত ৩০ বৎসর কাল তথায় অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আমেরিকায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচালকগণের তিনি অন্যতম। তাঁহার অসাধারণ মনীষিতা ও দেশপ্রেমের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ভুবারকান্তি ঘোষ—

লণ্ডনে যে বৃটীশ সাম্রাজ্যের সাংবাদিক সম্মিলন হইতেছে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য ভারত হইতে একদল সাংবাদিককে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। ঐ দলের সদস্যরূপে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ গত ২রা জুন বিলাতে গিয়া পৌঁছিয়াছেন।

খাল খনন সমস্যা—

কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত ৩০ মাইল দীর্ঘ ও ১ মাইল প্রস্থ এক নূতন খাল খনন করিয়া সে পথে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা করা হইয়াছে। হুগলী নদীর জল কমিয়া যাওয়ায় ও হুগলী নদীপথে সমুদ্রে যাইতে বিলম্ব হয় বলিয়া ঐ খাল খননের প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ঐ নূতন খাল খনন করা হইলে দেশবাসীর উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হইবে। যে সকল গ্রামের উপর দিয়া খাল যাইবে, সে সকল স্থানের অধিবাসী গৃহহীন হইবে ও তাহাদের চাষের জমী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহা ছাড়া নূতন খাল দিয়া জল যাইলে পুরাতন নদী ক্রমে মজিয়া গিয়া বহু লোকের ক্ষতি সাধন করিবে। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সৈলপতি চট্টোপাধ্যায়, খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও দেশ-প্রেমিক অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি এবিষয়ে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বিষয়টির প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মনে হয়, একদল বিদেশী ব্যবসায়ীর স্বার্থ-

সিদ্ধির জন্য এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। উহাতে যে অসংখ্য দেশবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, পরিকল্পনা প্রস্তুতকারীরা তাঁহারা সে বিষয়ে চিন্তা করেন নাই।

পাঁ নম্বর স্প্রিং ঘাটে ৺দেবীপ্রসন্নের দেবব্রত স্মৃতিমন্দির ভিত্তি স্থাপনে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে গণ্ডগোল—

বৃটীশ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ দেশীয় রাজ্যগুলিতে পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে। ফরিদকোট রাজ্যের প্রজারা শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ভীষণাকার ধারণ করিলে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তথায় যাইয়া শাসনকর্ত্তার সহিত প্রজাদের আপোষ করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজাসম্মিলনের সভাপতি। কাশ্মীরেও অনুরূপ গণ্ডগোল হইয়াছে। তাহা গুলীবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। কাশ্মীর প্রাচীন রাজ্য —তথায় শাসক হিন্দু, কিন্তু অধিকাংশ প্রজা মুসলমান। সেখানেও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। দেশীয় রাজ্য-সমূহের শাসনকর্ত্তারা যদি যুগের উপযোগী হইয়া না চলেন, তবে অশান্তি অনিবার্য্য। আজও কি তাঁহারা মনোভাব পরিবর্ত্তনে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন না?

পোষ্টকার্ডের মূল্য হ্রাস—

আগামী ১লা জুলাই হইতে পোষ্টকার্ডের মূল্য কমিয়া ৩ পয়সা স্থলে ২ পয়সা হইবে এবং রিপ্লাই কার্ডের দামও ৬ পয়সা স্থলে ৪ পয়সা করা হইবে। পোষ্টকার্ডের দাম ১ পয়সা হইতে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া ৩ পয়সা হইয়াছিল।

বেলেঘাটা পার্কে এক বিরাট জনসভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নারায়ণ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ফটো—কানন মুখোপাধ্যায়

বোম্বাইয়ে রূপায়তনম—

গত ১৭ই মে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ নৃত্যকলা কেন্দ্র রূপায়তনের ষষ্ঠ বাৎসরিক অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উদয় শঙ্করের পরিচালনায় একটী বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। বয়স্কিনী শ্রীযুক্তা গৌরক্ষ সঙ্গীত পরিচালনা করেন। ছাত্র-ছাত্রীগণ মণিপুরী, রঙ্গপূজা, পুষ্পচয়ন, পল্লীনৃত্য, ভারত-নাট্যম্, কথাকলি এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতসহ কয়েকটী নৃত্য প্রদর্শন করেন। সহরের বহু বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালী ভদ্রলোক কুমারী নাগরত্না, কুমারী অরন্তী গাঙ্গুলী, কুমারী বিমলা দিবেকর, কুমারী মীরা কপিকর, শ্রীনবীন পারেখ ও শ্রীখোপকারের প্রতিভার প্রশংসা করেন।

পরলোকে কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী—

নদীয়া রাণাঘাটের খ্যাতনামা তরুণ সাহিত্যিক কাশী-নাথ চক্রবর্ত্তী গত ৮ই বৈশাখ রবিবার মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। নিজের চেষ্টায় সামান্য অবস্থা হইতে অল্প দিনের মধ্যে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

বহুদিন রোগশয্যায় পড়িয়াও তিনি গল্প লিখিতেন। তাঁহার গল্প সকল মাসিক পত্রেই প্রকাশিত হইত। আবৃত্তি ও নাটকাভিনয়ে তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কাইনাথ চক্র

পরলোকে প্রফুল্লচন্দ্র বসু—

কলিকাতা দর্জ্জিপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ও থেনারেস পোষ্টাফিসের সহকারী কোষাধ্যক্ষ প্রফুল্লচন্দ্র

প্রফুল্লচন্দ্র বসু

বসু মহাশয় ৫৮ বৎসর বয়সে গত ১৩ই বৈশাখ পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি আইন ব্যবসায়ী অমরচন্দ্র বসুর পুত্র ছিলেন। বহু সঙ্গীতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

রাজবল্লহাটে বার্ষিক উৎসব—

রাজবল্লহাট হুগলী জেলার একটি বড় গ্রাম। তথায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে হেমচন্দ্র স্মৃতিপাঠাগার ও অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নামে অমূল্যচরণ স্মৃতি প্রত্নতত্ত্বশালা আছে। গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে তথায় যথাক্রমে পাঠাগার ও প্রত্নতত্ত্বশালার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবে সম্পাদক শ্রীযুক্ত পান্নালাল ভড় 'হেমচন্দ্র' সম্বন্ধে কবিতা পাঠ করেন ও অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। স্থানীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূদেব-চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের চেষ্টায় ও যত্নে গ্রামখানি দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ক্ষুদ্রদাস ভড় পাঠাগারের জন্য যে প্রকাণ্ড গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন তাহারই একাংশ প্রত্নতত্ত্বশালারূপে ব্যবহৃত হইবে ও পাঠাগার কর্ত্তৃপক্ষই প্রত্নতত্ত্বশালা পরিচালন করিবেন। ডাক্তার বিভূতিভূষণ দে, নিতাইচরণ দাস, মন্মথনাথ হালদার প্রভৃতির চেষ্টায় উৎসব সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল। রাজবল্ল-হাটে নূতন দাতব্য চিকিৎসালয় গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান হইতেছে। সেখানকার রাজবল্লভী দেবী ও বিরাট কালীমূর্ত্তি দর্শনীয় বস্তু। বার্ণিন কোম্পানীর চাঁপাডাঙ্গা লাইনে আটপুর ষ্টেশনে নামিয়া দূরে রাজবল্ল-হাট গ্রাম। স্থানীয় জনসাধারণের গ্রামপ্রীতি, গ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টা এবং সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রশংসনীয়।

কাণপুর শ্রমিকদিগের গৃহসমস্যা—

খাতনামা অর্থনীতিজ্ঞ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া কাণপুরের শ্রমিকদের গৃহ সমস্যা (Industrial Housing in Cawnpore) সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি সম্প্রতি তাঁর রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ভারতের শিল্প কেন্দ্র ও বর্ত্তমান সহরগুলি কোনরূপ পরিকল্পনা ব্যতিরেকে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইহাতে যে অবস্থা সমস্যার

সৃষ্টি হইয়াছে তাহার রূপ খুবই বিভীষিকাপূর্ণ। যুদ্ধে সহরের লোক সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। উত্তর ভারতে কাণপুর সর্ব্বপ্রধান শিল্পকেন্দ্র। বর্ত্তমানে ১৭১টি সুবৃহৎ মিল ও কারখানা এই সহরে অবস্থিত। যুদ্ধ পূর্ব্বেকার প্রায় ৪ লক্ষ হইতে কাণপুরের জন সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ৯ লক্ষে

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

পৌঁছিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ৪ লক্ষই শ্রমিক। উক্ত রিপোর্টে দেশ বিদেশের গৃহ সমস্যা ও বস্তি সমস্যা সমাধানের বহুবিধ উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং লেখক অবশেষে সমস্ত ভারতের ও সেই সঙ্গে কাণপুরের শ্রমিকদের গৃহসমস্যা সমাধান কল্পে নিজস্ব মতামত ও নির্দ্দিষ্ট পন্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সাধারণ শ্রমিকরা (unskilled wage earner) স্বাস্থ্যসম্মত বাসোপযোগী গৃহের ভাড়া দিতে অক্ষম। এতদাবস্থায় সরকারী তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে এই গৃহসমস্যার সমাধান কখনই সম্ভব নয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মিল-মালিকগণের নিজ নিজ শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ ব্যবস্থার বিরোধী। এই প্রথায় শ্রমিকদিগের মিলের বাহিরে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার স্বাধীনতার উপর অথথা হস্তক্ষেপ করা হয়। এই প্রথা শ্রমিকসঙ্ঘের প্রসারতা লাভের পক্ষেও প্রতিকূল। কোন কারণে মিলের চাকুরী খোয়াইলে এই সব শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে বসবাসের স্থানটুকুও খোয়াইতে হয়।

সেনভূম সাহিত্য সম্মেলন—

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ বাঁকুড়া জেলার 'তিলুড়িতে' সেনভূম সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন এবং পুরুলিয়ার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত অন্নদা চক্রবর্ত্তী প্রধান অতিথি ছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গের বহু স্থান হইতে প্রতিনিধিরা আসিয়া সম্মেলনে যোগদান করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতা, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ পাঠের পর যুগ্মসম্পাদক শ্রীযুক্ত গোলকপতি সেন বিভিন্ন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের প্রেরিত বাণী পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন। স্থানীয় জমীদার শ্রীযুক্ত রামময় রায়ের উৎসাহে ও যত্নে সম্মেলন সাফল্য মণ্ডিত হয়।

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম-এ, পিএইচ-ডি

রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ২৪পরগণা ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএচ্-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি স্বর্গত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের দৌহিত্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কবাগীশের পুত্র। জানকীবল্লভের বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রেস রিপোর্টার্স সম্মিলন—

গত ২৬শে ও ২৭শে জুন বাঁকুড়া চণ্ডিদাস চিত্রমন্দির হলে সুকবি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রেস রিপোর্টার্স সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত তারাপতি সাধু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত সদানন্দ সান্যাল

সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সকল উদ্যোগ আয়োজনের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্মিলনে একটি বঙ্গীয় প্রেস রিপোর্টার্স সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর

বাঁকুড়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক প্রেস রিপোর্টার্স সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন

ফটো—বাঁকুড়া দ্রষ্টব্য

সান্যাল উহার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত অনিলধন ভট্টাচার্য্য সাধারণ সম্পাদক হইয়াছেন। আগামী বর্ষে মুর্শিদাবাদে সম্মিলন হইবে স্থির হইয়াছে।

নেতাজী ভবন—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় জানাইয়াছেন যে তিনি ও তাঁহার দুই বন্ধু তাঁহাদের পৈতৃক বাসভবন ৩৮।২ এলগিন রোডের তিন চতুর্থাংশ (উহার মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর এক চতুর্থাংশ আছে) দায়মুক্ত করিয়া ক্রয় করিয়াছেন। তাহা পৃথক করা হইয়াছে। এই অংশে সুভাষচন্দ্রের শয়নকক্ষ ও পাঠাগার অবস্থিত। উহা শীঘ্রই ট্রাষ্টীডীড করিয়া দেশের কাজে দেওয়া হইবে ও উহার নাম 'নেতাজী ভবন' রাখা হইবে। ঐ বাড়ীর দুইটি ঘর (সুভাষচন্দ্রের ব্যবহৃত) বর্ত্তমান অবস্থায় রাখিয়া বাকী সকল ঘর আজাদ-হিন্দ-ফৌজের লোকজনের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু—

'চিকাগো ট্রিবিউন' পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ আলফ্রেড ওয়াগ প্রকাশ করিয়াছেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ফরমোজার তাইহকুতে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান নাই, তাঁহাকে ঐ দুর্ঘটনার ৪ দিন পরে ইন্দোচীনে দেখা গিয়াছিল ; কলিকাতা পুলিসের একজন কর্ম্মচারী দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়ায় সুভাষচন্দ্রের খোঁজ করিতে গিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র ভারতে প্রত্যাগমনের সুযোগ খুঁজিতেছেন। তিনি ভারতে ফিরিলে কেহ তাঁহাকে দণ্ড দানের সাহস করিবে না।

ডাক্তার শ্রীঅজিতকুমার বসু—

রায় বাহাদুর ডাক্তার চুনিলাল বসুর পৌত্র ও বিচারপতি স্যার চারুচন্দ্র ঘোষের দৌহিত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত অজিতকুমার

ডাঃ শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বসু

বসু এবার লণ্ডনের এফ-আর-সি-এস হইয়াছেন। গত বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস পরীক্ষায় পাশ করেন। ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আর কোন বাঙ্গালী উভয় উপাধি পান নাই। অজিতকুমার কলিকাতা ছোট আদালতের অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বসুর পুত্র।

নূতন রাষ্ট্রপতি—

১৯ই মে তারিখে সিমলা হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক আচার্য্য জে-বি কৃপালানী ঘোষণা করিয়াছেন—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কংগ্রেসের নূতন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে ১৯২৯ সালে

লাহোরে, ১৯৩৪ সালে লক্ষ্ণৌয়ে ও ১৯৩৭ সালে ফৈজপুরে তিনি কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। ১৯২৮ সাল হইতে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য আছেন।

পরলোকে বিজয়দাস দত্ত—

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ বিজয়দাস দত্ত মহাশয় গত ৫ই এপ্রিল ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আমেরিকার কর্ণেল

৺বিজয়দাস দত্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। অড়হর, নেপিয়ার ঘাস, চীনাবাদাম, সরাবীন প্রভৃতি চাষ সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করিয়াছিলেন ও বাঙ্গালা দেশে ঐ সকল জিনিষের প্রচার করিয়াছিলেন। ৮ বৎসর পূর্ব্বে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ষষ্টিতম জন্মোৎসব গত ২০শে মে নাটোরের মহারাজার সভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে সম্পাদিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত দামোদর মাদ খাগ্রা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গোপেশ্বর বাবুর আজীবন সঙ্গীত সাধনার কথা বিবৃতি করিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সঙ্গীত সম্বন্ধে গোপেশ্বরবাবুর দানের কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে গোপেশ্বর বাবু তাঁহার সারা জীবনের সঙ্গীত আলোচনার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন। গোপেশ্বরবাবুর সম্বর্দ্ধনা দ্বারা দেশবাসী বাঙ্গালার সঙ্গীত চর্চ্চার সমাদর করিয়াছেন।

মহানাদে প্রাচ্য-ভবন প্রতিষ্ঠা:—

হুগলী জেলার মহানাদ একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পালের

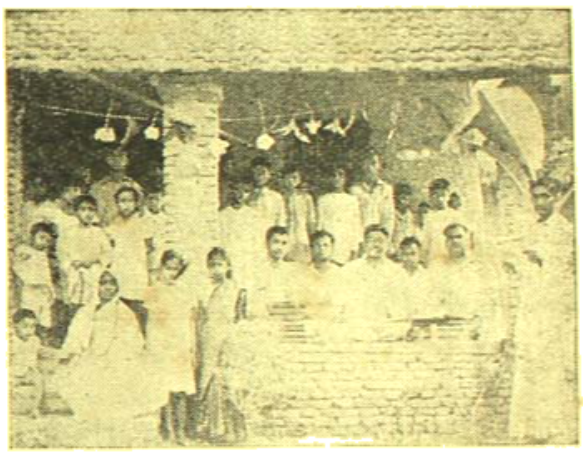

মহানাদে 'মনোরমা গ্রন্থাগার' ও 'প্রাচ্যভবনের' উদ্বোধনী সভায়
ফটো—বিকাশ কর

চেষ্টায় তথায় 'মনোরমা গ্রন্থাগার' ও প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য 'প্রাচ্যভবন' স্থাপিত হইয়াছে। গত ২১শে বৈশাখ বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র ঐ গ্রামে যাইয়া প্রতিষ্ঠান দুইটির উদ্বোধন উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। স্থানীয় জমীদার ডাক্তার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রশেখর কর তাঁহার স্বর্গতা পত্নীর নামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। মহানাদের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বাঙ্গালী মাত্রেরই দ্রষ্টব্য। ঐ গ্রাম বেঙ্গল প্রভিনিন্সাল রেলের পার্শ্ববর্ত্তী।

নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—

হাওড়া নিবাসী শ্রীযুত শশাঙ্কশেখর মল্লিক তাঁহার স্ত্রী কমলা দেবীর নামে হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার বিনোদ

ইউনিয়নের রোড়হল গ্রামে যে নূতন বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি

নূতন বিদ্যালয়

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস ঐ গ্রামে যাইয়া তাহার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

কলিকাতায় সম্বর্দ্ধনা—

আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিব দেওয়ান জেনারেল এ-সি-চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি দিল্লীতে মুক্তি লাভ করিয়া গত ৯ই মে ৪ বৎসর পরে কলিকাতায় আসিলে সহরবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিরাটভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। তিনি বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে আই-এম-এস চাকরী করিতেন ও বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টার ছিলেন। যুদ্ধের সময় সিঙ্গাপুর যাইয়া তিনি জাপানী কবলে যান ও পরে আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করেন। মণিপুরে অধিকৃত স্থানসমূহের তিনি গভর্ণর হইয়াছিলেন। ১৯৪৫ সালের ৬ই জুন সুভাষচন্দ্রের সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এক মাইল দীর্ঘ মিছিলে তাঁহাকে হাওড়া ষ্টেশন হইতে সহরে আনা হইয়াছে।

নিমলায় উৎসব—

গত ৮ই মে নিমলা বঙ্গীয় সম্মিলনীর সদস্যগণ ও ইউনিয়ন একাডেমীর ছাত্রগণ একযোগে কালীবাড়ীতে প্রতিমা মিত্র হলে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলি ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। সম্মিলনীর যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুত বিজেন মল্লিকের চেষ্টায় উৎসব সাফল্য-মণ্ডিত হয়। শ্রীযুত কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছাত্রগণ রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন।

দাদাঠাকুর

শ্রীনরেন্দ্র দেব

বাবাঠাকুরের তলায় ও ভাই, দাদাঠাকুরের পূজো!
আশীর পরেও পেরিয়েছে চার, হয়নি তবু কুঁজো।
পাল্লা দিয়ে ছুটতো যারা সবাই নিলো ছুটি,
একলা শুধু দাদু'ই আজও চলছে খুটি খুটি!
যে বয়সের মানুষ খোঁজে অবসরের ফাঁক—
সেই বয়সেই হঠাৎ 'দাদু' বাজিয়ে বাঁশীর শাঁখ,
দিনের শেষে দেবীর পূজা প্রথম করেন শুরু;
সবাই দেখে অবাক, বলে—পূজারী নয়—গুরু!
শুভ্র শুচি হাসির ফুলে সাজিয়ে পূজার ডালা
মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেয় ভক্তি অশ্রু ঢালা।
করুণ রসে সিক্ত সরস স্নিগ্ধ দুর্ব্বাদল—
দেবীর মুখে ফোটায় হাসি ঝরায় চোখে জল।

ভণ্ড যারা খুলনো মুখোস সেই কলমের টানে,
সহজ মানুষ ছড়িয়ে দিল উদার আলো প্রাণে;
গরীব যারা তাদের ঘরেও কী ধন আছে জমা,
পুরুষ বাঁচে পৌরুষে, না, নারীর পেয়ে ক্ষমা?
ধনীর বুকে নিঃস্ব কোথা সঙ্গোপনে কাঁদে,
কিসের জোরে কোমল জাতি কঠোর মনে বাঁধে—?
দাদুর 'কবুলতির' পাটায় সব পড়েছে ধরা
দুখের রাতের দেওয়ালী তাঁর হৃদয় আলো করা।
আত্মভোলা ছিলাম সবে সৃষ্টি-ঘন লোকে
তিনিই শেষে জানিয়ে দিলেন আমরা কী ও কে?
কলমোজারের কৈলাসে যে তিনিই কেদারনাথ
স্বয়ম্ভু সে শিল্পী শিবে জানাই প্রণিপাত।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺হরাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বিলাতে ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট দল বিলেতে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে প্রথম দু'টো খেলার মোটেই সুবিধা করতে পারে নি। অভ্যাসের প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণ এবং ভ্রমণের অবসাদে তারা স্বাভাবিক খেলা দেখাতে সক্ষম হয় নি। ক্রমশঃ দলের খেলার উন্নতি হলেও ভারতীয় দলের অমরনাথ মুস্তাক আলী এবং হাজারী এখনও পর্য্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারেন নি। মার্চ্চেন্টের মত শক্তিশালী ব্যাটসম্যানও প্রথম দিকে খুবই হতাশ ক'রেছিলেন। এখন তাঁর খেলা এমন খুলেছে যে, তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম 'ওপনিং ব্যাটসম্যান'-এর পর্য্যায়ে সম্মানীত করা হয়েছে। এতদিন বোলার হিসাবেই এস-ব্যানার্জির নাম ছিল। এবারের অভিযানে তিনি 'ব্যাটসম্যানে'র পর্য্যায়ে স্থান পেয়েছেন। তিনি এবং সিটিসারভাতে সারে দলের সঙ্গে খেলায় শেষ উইকেটের জুটিতে ২৪৯ রান তুলে ইংলণ্ডের শেষ উইকেটের ২০৫ রানের রেকর্ড ভেঙেছেন।

অমরনাথ ব্যাটিংয়ে হতাশ করলেও তাঁর বোলিং ভাল হচ্ছে। এবার দলের চৌখস ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে সুনাম পেয়েছেন বিনু মানকাদ। তাঁর বোলিং ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং প্রশংসনীয়।

ভারতীয় ক্রিকেট দল ওরসেষ্টার দলের কাছে তাদের এবারের প্রথম খেলায় ১৬ রাণে পরাজিত হয়েছে। ১৯৩২ সালের খেলায় ভারতীয় দল ৩ উইকেটে বিজয়ী হয়েছিল; ১৯৩৬ সালে ওরসেষ্টার দল পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়।

খেলা আরম্ভ হয় ৪ঠা মে, ফলাফল : ওরসেষ্টার—১৯১ (সিম্পসটন ৪৭ ; মানকাদ ২৩ রাণে ৪ উইকেট) ও ২৮৪ (হাওয়ার্থ ১০৫ ও সিম্পসটন ৬৩ ; মানকাদ ৭৪ রাণে ৪ উইকেট)

ভারতীয় ক্রিকেট দল—১৯২ (মোদী—৩৪ ; পার্কাস ৫৩ রাণে ৫ ও হাওয়ার্থ ৪৭ রাণে ৩ উইকেট) ও ২৬৭ (৯ উইকেট ; মার্চ্চেন্ট ৫১, আর এস মোদী ৮৪, ব্যানার্জী ৫৯ নট আউট ; হাওয়ার্থ ৫৯ রাণে ৪ উইকেট)।

এবারের প্রথম খেলায় ভারতীয় দল মাত্র ১৬ রাণে পরাজিত হ'লে বিলাতের ক্রিকেট মহল ভারতীয় দলের এ পরাজয়কে খুব অগৌরবের মনে করেনি। খারাপ আবহাওয়া এবং অনভ্যাসের দরুণই ভারতীয় দলের এ পরাজয়ের কারণ ঘটেছিল। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে আর-এস-মোদী এবং এস ব্যানার্জী দলকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন।

ভারতীয় দল বনাম অক্সফোর্ড ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট দল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের দ্বিতীয় খেলাটি সুরু করে।

৯ই মে খেলা আরম্ভ হয়। খেলার ফলাফল—

অক্সফোর্ড ঃ ২৭৬ (এম পি ডোনেলি—৬১, সেল—৪৭ ; মানকাদ ৫৮ রাণে ৪ উইকেট সিন্ধে ৭৩ রাণে ৪ উইঃ) ও ২৪৫ (৩ উইকেট ; ডোনেলি ১১৬ নট আউট ; নাইডু ৬০ রাণে ৩ উইকেট)

ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ ২৪৮ (হাজারী ৩৪, মোদী ৪৯)

১৯৩২ সালের ১৮—২০শে মে। ভারতীয় দল ৮ উইকেটে বিজয়ী হয়েছিল। ভারতীয় দল—৩২৪ ও ৩২ (২ উইকেট) ; অক্সফোর্ড—১৩২ ও ২১৯।

১৯৩৬ সাল, ৬—৮ই মে। খেলা ড্র। ভারতীয় দল ৩৫২ ও ১০৩ (৫ উইকেট) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ২০২ ও ২৯৭।

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম সারে ঃ

নিখিল ভারতীয় ক্রিকেট দল সারে দলকে তাদের তৃতীয় খেলায় ৯ উইকেটে পরাজিত করছে। এই জয়ই তাদের প্রথম। খেলা—১১, ১৩, ১৪ মে। ভারতীয় দল টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করে। সি-টি সারভাতে এবং এস ব্যানার্জী উভয়েই প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন। তাঁদের শেষ উইকেটের ছুটিতে ২৪৯ রাণ ওঠে। এই রাণ শেষ উইকেটের২৩৫ রাণের ইংলণ্ডের রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়ে নতুন রেকর্ড করেছে। ১৯০৯ সালে কেন্টের ফিরলার এবং এফ ডোসি ওরসেষ্টারসায়ারের বিপক্ষে শেষ উইকেটে ২৩৫ রাণ তুলে রেকর্ড করেছিলেন। পৃথিবীর শেষ উইকেটের রেকর্ড ৩০৭ রাণ। ১৯২৮-২৯ সালে মেলবোর্ণে ইণ্টার ষ্টেট ক্রিকেট খেলায় দু'জন অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড় উক্ত রাণ তুলে রেকর্ড করেছিলেন। এবার খেলায় সারের প্রথম ইনিংসে সি-এস-নাইডু ভারতীয় দলের পক্ষে প্রথম 'হ্যাট-ট্রিক' করেন; তিনি ১২ ওভার বলে ৩টা মেডেন নিয়ে ৩০ রাণ দিয়ে এটে উইকেট পান। সারের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৩৫ রাণে শেষ হলে তাদের ফলো-অন করতে হয়। ৩১৯ রাণ পিছিয়ে থেকে সারে দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। আরম্ভ খুবই ভাল হ'ল। তাদের দ্বিতীয় ইনিংস ৩৩৮ রাণে শেষ হল, আর জে গ্রেগরী ১০০ রাণ করলেন।

ফলাফল ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

৪৫৪ (সি-টি সারভাতে নট আউট ১২৪, এস ব্যানার্জী ১২২, গুল মহম্মদ ৮৯ এবং মার্চ্চেন্ট ৫৩ রাণ; এ বেডষ্টার ১৩৫ রাণে ৫ এবং পার্কার ৬৪ রাণে ৩ উইঃ) ও ২৪ (১ উইকেট)।

সারে ঃ ১৩৫ (এল ফিলটক ৬২; সি এস নাইডু ৩০ রাণে এটে, মানকাদ ৮ রাণে ২টো, ব্যানার্জী ৪২ রাণে ২টো, চাদারী ২০ রাণে ২টো উইঃ)

১৯৩২ সালের আগষ্ট ১৩, ১৫ এবং ১৬। খেলা ড্র। সারে—৩৮৭ (৯ উইঃ) ও ৯৫ (৩ উইঃ)। ভারতীয় ক্রিকেট দল—২০৪ ও ৩২২ (৮ উইকেট)

১৯৩৬ সালের ২০, ২২ এবং ২৩শে জুন। ষ্ট্রান কেনিংটন ওভাল। খেলা ড্র। ভারতীয় দল—২২৬ ও ৪২১ (৫ উইঃ)। সারে—৪৪২ ও ৫২ (৩ উইঃ)

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম কেম্ব্রিজ ঃ

ভারতীয় দল এক ইনিংস এবং ১৯ রাণে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে। এই নিয়ে তাদের এবার বার বার দু'বার জয় হ'ল। ভারতীয় দলের পক্ষে পতৌদী ১২১ এবং আর এস মোদী ১০৩ রাণ করেন। সারভাতে প্রথম ইনিংসে ৩৮ রাণে ২টী এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৮ রাণে ৫ উইকেট পেয়ে বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখান। ফলাফল: **কেম্ব্রিজ**—১৭৮ ও ১৩৮ (সাটারওয়ার্ক ৪৩); **ভারতীয় ক্রিকেট দল**—৩৩৫ (আর এস মোদী ১০৩ এবং নবাব পতৌদী ১২১)

১৯৩২ সালের ৮, ৯ ও ১০ই জুন। ভারতীয় দল ৯ উইকেটে বিজয়ী হয়েছিল। কেম্ব্রিজ—৯২ ও ২৭৪। ভারতীয় দল—৩০৮ ও ৫৯ (১ উইঃ)

১৯৩৬ সালের ৩০শে মে এবং জুন ১লা ও ২রা। খেলা ড্র। ভারতীয় দল—১৬১ ও ৩ (কোন উইকেট না গিয়ে)। কেম্ব্রিজ—২১৭।

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম লিসেষ্টার ঃ

বারিপাতের দরুণ খেলা বেশ সুবিধা হয়নি। খেলা ড্র গেছে। ব্যানার্জী, গুলমহম্মদ, নিম্বলকার, মোদী এবং সারভাতে এ খেলায় যোগদান করেন নি, বিশ্রাম নিয়েছিলেন। মার্চ্চেন্ট ১১১ রাণ করেন। উভয় দলের মধ্যে তাঁরই একমাত্র সেঞ্চুরী ছিল। অমরনাথ ব্যাটিংয়ে এবার কিছুই করতে পারছেন না তবে এ খেলায় তাঁর বোলিং মারাত্মক হয়েছিল।

ফলাফল—**ভারতীয় ক্রিকেট দল**—১৯৮ (মার্চ্চেন্ট ১১১; টিলে ৩৩ রাণে ৩ উইঃ) ও ১০৭ (৬ উইঃ ডিক্রেয়ার্ড; মার্চ্চেন্ট ৫৭; গুপ্তে ৩৩ রাণে ৩ উইঃ) **লিসেষ্টার**—১৪৪ (বেরী ৬৭; অমরনাথ ১৪ রাণে ৪ উইঃ) ও ২৪ (১ উঃ)

১৯৩২ সালের আগষ্ট ২০, ২২ ও ২৩। ভারতীয় দল ১ ইনিংস ও ১৫ রানে বিজয়ী হয়; ভারতীয় দল—৪১৮ (৮ উইঃ)। লিসেষ্টার সারার—১০৬ ও ২৯১)

১৯৩৬ সালের ২০, ২১ ও ২২শে মে। খেলা ড্র। ভারতীয় দল—৪২৬ ও ১৭১ (৬ উইঃ) লিনেষ্টার—৩২৭ ও ৮৭ (কোন উইকেট না পড়ে)

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম স্কটল্যাণ্ড :

ভারতীয় ক্রিকেট দল ১ ইনিংস এবং ৪৬ রানে স্কটল্যাণ্ড-দলকে হারিয়ে দেয়। নবাব পতৌদী অসুস্থ থাকার দরুণ মার্চ্চেণ্ট ক্যাপটেন হন। ভারতীয় দল টসে জিতে প্রথম ব্যাট করে। হাজারী ১০২ রাণ করেন। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে ২৪৭ রাণ উঠে। স্কটল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ১০১ রাণে শেষ হয়। সারভাতে ৩০ রাণে ৪টা উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি স্কটল্যাণ্ডের মার্শাল, ক্লার্ক এবং হুডকে চারের পর ৯০ রাণের মাথায় তৃতীয় ওভারের প্রথম তিন বলে 'বোল্ড' করে 'hat-trick' করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর মোট এভারেজ দাঁড়ায়—১৫ ওভার, ২০ মেডেন, ৪২ রাণ এবং ৭টা উইকেট।

ভারতীয় ক্রিকেট দল—২৪৭ (হাজারী ১০২, সারভাতে ৩০। ম্যাক্‌কেনে ৯২ রাণে ৬ উইঃ)। **স্কট-ল্যাণ্ড—১০১** (এট্‌কিনসন ৫৯; সারভাতে ৩০ রাণে ৫ এবং হাজারী ৩৯ রাণে ৩ উইকেট) ও ৯০।

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম এম সি সি :

ভারতীয় দল এম সি সি দলকে এক ইনিংস এবং ১৯৪ হারিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

২৫শে মে বিখ্যাত লর্ডস মাঠে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ক্যাপটেন এম-সি-সির ক্যাপটেন ভ্যালেনটাইনকে হারিয়ে নিজদলের মার্চ্চেণ্ট এবং মুস্তাক আলিকে ব্যাট করতে পাঠান। ৪০০০ হাজার দর্শকের সামনে খেলা সুরু হ'ল। প্রথম দিনের খেলার শেষে ভারতীয় দলের ৭ উইকেটে ৩৭৩ রাণ উঠল। মার্চ্চেণ্ট ১৪৮, হাজারী ৯৪ এবং মোদী ৪৮ রাণ ক'রে আউট হয়ে গেলেন। মার্চ্চেণ্ট তাঁর স্বাভাবিক দর্শনীয় খেলা দেখিয়ে পৃথিবীর খ্যাতনামা 'ওপনিং-ব্যাটস-ম্যানে'র মধ্যে অন্যতম প্রমাণ করলেন। ২৭শে মে দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ করলেন হিন্দেলকার ও সারভাতে। তাঁদের প্রথম ইনিংস ৪৩৮ রাণে শেষ হ'ল, হিন্দেলকার ৭৯ রাণ করলেন। সারভাতে ২১ নট আউট রইলেন। নবাব পতৌদী অসুস্থ বোধ করায় খেলতেই নামেন নি। এম-সি-সি দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৩৯ রাণে শেষ হ'ল। ইয়ার্ডলে দলের সর্ব্বোচ্চ ২৯ রাণ করলেন। অমরনাথ ৪১ রাণে ৪ এবং মানকাদ ৪০ রাণে ৩ টে উইকেট পেলেন। এম সি সি দলকে 'ফলো-অন' করতে হ'ল। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৬০রাণে ৩টে উইকেট পড়ে খেলা সে দিনের মত শেষ হ'ল। মানকাদ ১৩ রাণে ৩টে উইকেট পেলেন। বৃষ্টির দরুণ তৃতীয় দিনের খেলা দেরীতে আরম্ভ হ'ল। এম-সি-সি দলের দ্বিতীয় ইনিংসেও কোন সুবিধা হ'ল না। অমরনাথ এবং মানকাদের বোলিংয়ে এম-সি-সি দলের দারুণ ভাঙ্গন দেখা দিল। তাদের ১০৫ রাণে ইনিংস শেষ হ'ল। মানকাদ ৩৭ রাণে ৭ এবং অমরনাথ ৪২ রাণে ৩টে উইকেট পেলেন। অমরনাথ ব্যাটিংয়ে এবার তাঁর সুনাম অনুযায়ী সুবিধা করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর বল খুব কাজের হয়েছে। মানকা-দের তুলনা নেই। ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং—এই তিনটাতেই তিনি চৌখস।

১৯৩২ সাল। ভারতীয় ক্রিকেট দল—২২৮ (সি-কে নাইডু ১১৮); এম-সি-সি—২০০ (৭ উইকেট; সি-কে নাইডু ৩১ রাণে ৪ উইকেট) বৃষ্টির জন্য দেড় দিনের খেলা বন্ধ করা হয়। খেলা ড্র যায়।

১৯৩৬ সাল। এম-সি-সি ৪ উইকেটে বিজয়ী হয়। এম-সি-সি: ৩৮২ (মে হিউম্যান ১১৫, হেণ্ডেন ৮৮, আর ওয়্যাট ৬৫, জে এ্যাগেন ৫৪; ৭০ রাণে ব্যানার্জি ৩৬ইঃ) ও ৩৬ (কোন উইকেট না গিয়ে) ভারতীয় দল—১৮৪ (মুস্তাক আলি ৪৭) ও ২৩০ (জাহাঙ্গীর খাঁ ৮০ এবং ব্যানার্জি নট আউট ৪৭; সিমস ৬৪ রাণে ৪ উইঃ)

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম হাম্পসায়ার :

ভারতীয় ক্রিকেট দল ৬ উইকেটে হাম্পসায়ার দলকে হারিয়েছে।

হাম্পসায়ার—১৯৭ (জি হিল ৪৯; সি এস নাইডু ৩৩ রাণে ৩ উইকেট) ও **১৪২** (বিনী ৫৬; হাজারী ১৮ রাণে ৪ উইঃ)

ভারতীয় দল—১৩০ (মানকাদ ৩০; নট ৩৬ রাণে ৭ উইঃ) ও ২১২ (৪ উইঃ মোদী ৪১, হাকেল ৪০, মার্চ্চেণ্ট ৩৬)

১৯০২ সালে হাম্পসায়ার এক ইনিংস ১০৩ রাণে বিজয়ী হয়েছিল।

ভারতীয় দল : ৪১ ও ১১৯। হাম্পসায়ার : ২৭৩

১৯৩৬ সালে ভারতীয় দল ২ উইকেট বিজয়ী হয়।

ভারতীয় দল ১৯২ ও ১৯১। হাম্পসায়ার : ২৩৮ ও ১৪১।

ফুটবল লীগ ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা ১লা মে থেকে আরম্ভ হয়েছে। প্রথম বিভাগের লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলা শেষ হয়ে গেছে। মোহনবাগান ক্লাব ১৪ খেলায় ২৫ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম আছে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে তাদের খেলা হু গেছে। ইষ্টবেঙ্গল একটা কম খেলে ২২ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল ভবানীপুর ক্লাবের কাছে হেরেছে!!? তৃতীয় আছে ই-বি-রেলওয়ে, ১২ খেলায় ১৮ পয়েন্ট। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ১২ খেলায় ১৭ পয়েন্ট হয়েছে। ভবানীপুরের ১০ খেলায় ১৫ পয়েন্ট। গত বছরের মত এবারও শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে জোর প্রতিযোগিতা চলবে এবং এই দুই দলের মধ্যে যে কোন এক দল লীগ বিজয়ী হবে বলে আশা করা যায়। দ্বিতীয় বিভাগে মাড়োয়ারী ক্লাব উপস্থিত প্রথম এবং জর্জ টেলিগ্রাফ দ্বিতীয় আছে।

• • • •

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বিভিন্ন খেলায় এ বছর থেকে পুনরায় উঠা-নামা (Promotion & Relegation) চলবে বলে আই-এফ-এর সাধারণ সভায় স্থির হয়েছিল কিন্তু কোন বিশেষ সভায় উঠা-নামা এবারও বন্ধ থাকবে বলে বিবেচনা করা হয়। ফলে ভূনিয়ার ক্লাবগুলির মধ্যে উত্তেজনা এবং বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাদের অভিযোগ, যে অজুহাতে এতদিন লীগের খেলায় উঠা-নামা বন্ধ ছিল বর্ত্তমানে সেই অজুহাত অচল, যুদ্ধ শেষ হয়েছে সুতরাং এই উঠা-নামা পূর্ব্বের মতই এবার থেকে আই-এফ-এর সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী চলা উচিত। এরূপ প্রকাশ, এ বছর থেকেই উঠা-নামা নাকি সুরু হবে।

বেতারে খেলাধূলার প্রচার ঃ

অনেকদিন হ'ল ক'লকাতার বেতার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ ফুটবল খেলার মাঠ থেকে খেলার খবর প্রচার করে আসছেন। ইংরাজিতে খবর বলা হলেও খবর শুনিয়া অশিক্ষিত জনসাধারণের মনেও খেলার গুরুত্ব বিস্তার ক'রে আশা এবং নিরাশার সঞ্চার করতে লক্ষ্য করেছি। এ ছাড়া বেতার কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে বাংলাতে খেলাধূলা সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করেছেন, উদ্দেশ্য খুবই ভাল। কিন্তু বক্তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই বিষয়বস্তুকে পরিষ্কার ক'রে বলতে পারেন না এবং তাঁদের ভাষার জড়তা বিষয়বস্তুকে আরও দুর্বোধ্য করে তোলে। আসছে বার থেকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আরম্ভ করা হবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "উপনিবেশ" (৩য় পর্ব)—২৲
শ্রীপ্রবোধ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "তেপান্তর"—২৲
শ্রীঅজিতকুমার ঘোষাল প্রণীত "এই বিংশ শতাব্দী"—১৷৹
শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় প্রণীত উপন্যাস "রাঙ্গার নিশানে"—৩৲
জসীম উদ্দীন প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "রূপকথা"—১৷৹
সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মণিপুরের যুদ্ধ"—১৷৹,
"জাপানের কথা"—৸৵৹
প্রবোধ সরকার প্রণীত উপন্যাস "ধূলা বিলাস বিধি"—২৷৹
শ্রীনরীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত "বাংলার কুটীর শিল্প"—৸৵৹
অজিতকুমার গুহঠাকুরতা প্রণীত গল্পগ্রন্থ "অন্তরুট"—১৷৹
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "তোমাদের সুভাষচন্দ্র"—৪৲
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত গল্পগ্রন্থ "ঘুঘু"—২৲
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "বাংলার বাগীশ্বরীগণ"—১৷৹
কবীন্দ্র দত্ত প্রণীত "নতুন সুরের রূপকথা"—৸৵৹
শ্রীসুপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "ওঃ পরাজয়"—১৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটিকা "বিদ্রোহী"—৪৹
শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "অদ্ভুত আমাচক"—১৷৹
শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাস প্রণীত রূপকাহিনী "ইয়োরোপা"—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৷৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত.

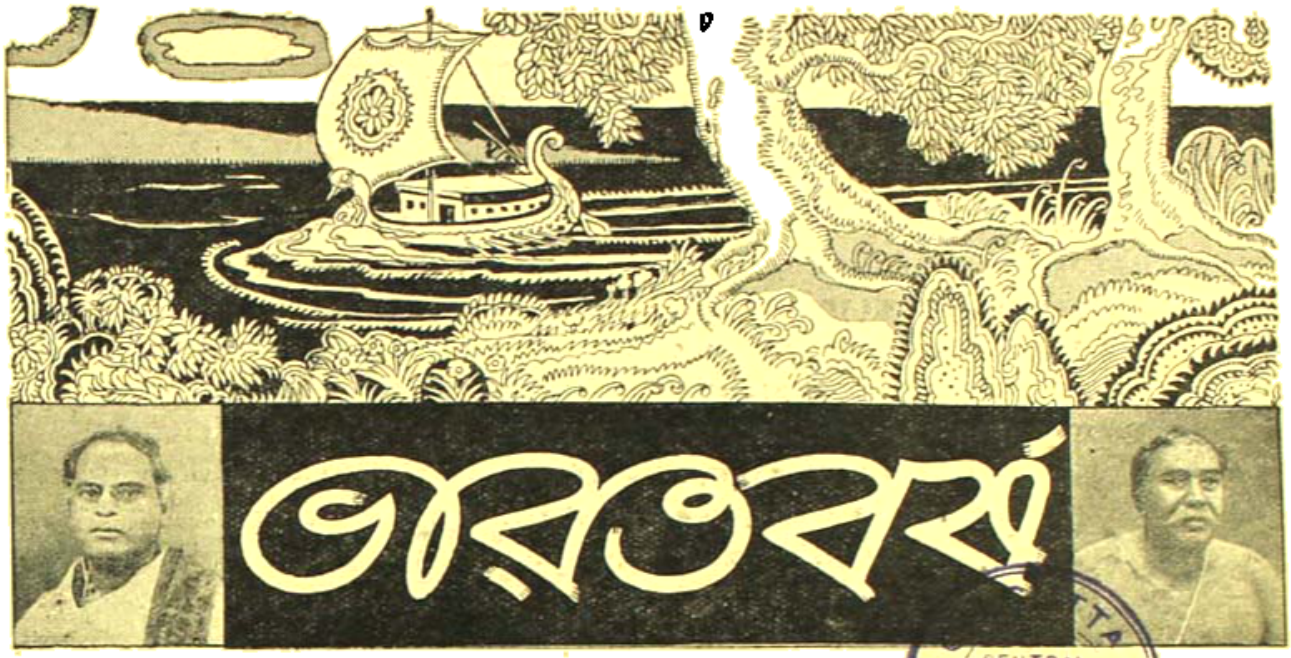

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শ্রাবণ—১৩৫৩

প্রথম খণ্ড | চতুস্ত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের শেষ রচনা

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএচ্-ডি

(১)

রবীন্দ্রনাথের অন্তিম পর্য্যায়ের রচনাগুলি—'প্রান্তিক' (জানুয়ারি, ১৯৩৮), 'আকাশ-প্রদীপ' (এপ্রিল, ১৯৩৯), নব-জাতক (এপ্রিল, ১৯৪০), 'সানাই' (জুন, ১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (জানুয়ারি, ১৯৪১), 'আরোগ্য' (মার্চ্চ, ১৯৪১), জন্মদিনে (এপ্রিল, ১৯৪১) ও 'শেষলেখা' (আগষ্ট ১৯৪১)—এই কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রকাশিত কবিতা-সমূহ ঠিক কালানুক্রমিক পর্য্যায়ে বিন্যস্ত হয় নাই—অনেক পুরাতন রচনা পরবর্ত্তীকালে মুদ্রিত গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ কবির জীবনের শেষবৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে—'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষলেখা'য়—রচনার পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত হয় নাই, সমস্ত রচনায় প্রায় একই ধারার অনুবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থগুলি সমগ্রভাবে আলোচনা করিলে উহাদের মধ্যে নূতন আরম্ভের সুষমা ও পূর্ব্বারব্ধ সুরের পরিণতি অনুভূত হয়। 'পূরবীতে' কবির কাব্যে যে আসন্ন বিদায়ের ম্লান গোধূলিচ্ছটা সঞ্চারিত হইয়াছে, মহাপ্রস্থানের যে ভূমিকা রচিত হইয়াছে, তাহাই পরবর্ত্তী রচনাসমূহের মূল সুর নির্দ্দেশ করে। আর গদ্য কবিতায় তিনি যে নূতন পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, আবেগের সুর না চড়াইয়া, ছন্দের নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ ও ঝঙ্কারের সাহায্য না লইয়া, গভীর ভাবানুভূতির সহজ নিরাভরণ অভিব্যক্তি দ্বারা তিনি যে চিরাচরিত কাব্যরীতির আমূল সংস্কারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাব তাঁহার সমস্ত পরবর্ত্তী-রচনায় অল্পাধিক পরিমাণে মুদ্রিত হইয়াছে। 'বলাকা'তে সর্ব্বপ্রথম তিনি ক্রমপ্রসারশীল ভাবোচ্ছ্বাসের অনুবর্ত্তনের নিমিত্ত প্রয়োজনে, নিয়মিত ছন্দবিন্যাসের বন্ধন অস্বীকার করেন; পরবর্ত্তী কাব্যসমূহে এই অনিয়মিত, মাত্রামুক্ত ছন্দের সাহায্যে তিনি জীবনের সাধারণ আবেষ্টনীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত নীচু সুরের বিচিত্র আবেশ ও ভাব-রোমন্থনের মৃদু প্রকাশভঙ্গী সৃষ্টি করিয়াছেন। গদ্য কবিতায় একেবারে ছন্দ বর্জ্জন করিয়া কেবল ভাবের অন্তর্নিহিত আবেগমের উপর নির্ভরশীল হইয়া তিনি দুঃসাহসিকতার চরম পরীক্ষায় ব্রতী হইয়াছেন। শেষজীবনের কবিতাগুলিতে তিনি আবার ছন্দবর্জ্জনের আতিশয্য পরিহার করিয়া মধ্যপথ অনুসরণ করিয়াছেন। এই দীর্ঘব্যাপী পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার পরিণত ফল তাঁহার শেষ রচনাগুলির আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'মহুয়ার' 'মহুয়ার'

দুই একটি কবিতাতে নূতন সুরের ইঙ্গিত মিলে, কিন্তু এই অভিনবত্বের প্রত্যাশা পরবর্তী রচনায় পরিতৃপ্তি লাভ করে নাই। এই সমস্ত কবিতার অন্তরালোকের প্রেরণা আসিয়াছে 'পূরবী' পূর্বস্মৃতি-পর্যালোচনার উদ্দেশ্য, বিদায়-ব্যথার অশ্রু-আভাসে করুণ, চয়ন প্রভৃতির প্রণাম্বিতে স্থির মনোভাব হইতে; ইহাদের বহিরঙ্গ নির্মিত হইয়াছে 'বলাকা' হইতে 'পূরবী' ও 'মায়াবী' পর্যন্ত প্রসারিত ছন্দো-পরীক্ষার ফল-বিচারের দ্বারা।

অতীতিবশে দয়ালস কবির এই রচনাগুলি আরও একটি কারণে পাঠকের মনঃপূত বিষয় উদ্রেক করে। কবিরা চির-তারুণ্যের প্রতীক ও চির-সুন্দরের উপাসক হইলেও বয়স প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না। বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কল্পনার সরসতা শুষ্ক হয়, ও তাঁহারা সচরাচর মৌলিক বিকাশ ছাড়িয়া অতীত সুরেরই পুনরাবৃত্তি করেন। যে সমস্ত ইংরেজ কবি—যথা ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, ব্রাউনিং ইত্যাদি—রবীন্দ্রনাথের প্রায় দীর্ঘজীবী ছিলেন তাঁহাদের শেষ বয়সের কবিতায় শুষ্ক, বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তির প্রভাব লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁহার শেষ কবিতাগুলির মধ্যেও কল্পনার সাবলীল স্ফূর্তি, প্রতিভার বিস্ময়কর মৌলিকতা, ভঙ্গি ও গঠন-পদ্ধতি-প্রণালী দুইটিরই পূর্ণমাত্রায় বিকাশ। বার্ধক্যের পরিণত অভিজ্ঞতাপ্রসূত জীবনদর্শন অন্তর, অম্লান সৌন্দর্যবোধের সহিত মিলিত হইয়া ইহাদিগকে অপরূপ অর্থগভীরতা-মণ্ডিত করিয়াছে। তাহাই এই কবিতাগুলি, তাহাদের সহজ কাব্যোৎকর্ষ ছাড়াও, দুঃসাধ্যসাধনের যে অতিরিক্ত মর্যাদা আছে, তাহা লাভ করিয়াছে।

এই কবিতাগুলির মধ্যে দুইটি বিভিন্ন ভাবের দুই আস্বাদ করে। প্রথম, ধার্মিক বিশ্বদৃষ্টির আশ্চর্য স্বচ্ছতা ও প্রসার; দ্বিতীয়, কাব্য-সাধনার উপর কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক রোগের অনুভূতির প্রভাব। এই দুইটি গুণই ইহাদের অনন্যসাধারণ আবেদনের হেতু। ধার্মিকতা রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতায় নূতন আবির্ভাব নহে—তাঁহার বয়ঃক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত রচনাই ইহার ঊর্ধ্বলোকে বিবিড়, ইহার সামঞ্জস্যের জ্যোৎস্নালোকে চঞ্চল। তিনি অন্তরের এই অনুভূতিকে, অন্তরালের অনুসন্ধানে নিবিষ্ট কখনও আবদ্ধ, অন্ত রাজ্যের আদর জীবন যাত্রার মধ্যে প্রাণশক্তির বিচিত্র, সন্ধ্যা—প্রভাত লীলা, অতীতের বিচ্ছেদদুঃখের দ্বারা ক্ষণিক আভাস-ইঙ্গিত ও মুহূর্মুহু স্পর্শ, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত অপরিচিত রক্তপথে ভাব-বিনিময় ও বিচ্ছিন্ন একাত্মতা-বোধ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে ধার্মিক অনুভূতির মত সহজ ও সর্বসঞ্চারী প্রসার, পৃথিবীর অন্য কোনও কবির রচনায় তাহার তুলনা আছে কি না সন্দেহ। যে সমস্ত কবির কাব্যে ধার্মিক তত্ত্বের প্রাধান্য, যাঁহারা কবিতায় মধ্য দিয়া ধার্মিক সমস্যার বিচার ও আলোচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহার কবিতা হইতে হয়ত জীবনসম্বন্ধে একটা বিশেষ মতবাদ সঙ্কলন করা যায়, কিন্তু ইহা তাঁহার কাব্যে গৌণ, মুখ্য নহে। তিনি কবিতার মধ্য দিয়া ধার্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর আসল স্বরূপকে—ইহার অনির্বাচনীয়-ব্যঞ্জনাকারী বিশ্বানুভূতি, জীবনকে অপার্থিব জ্যোতিতে রঞ্জিত ও অন্তরাত্মার অর্থপূর্ণতায় মহিমান্বিত করার সহজ প্রবণতা, অতীতের প্রতি আকুতি, অপ্রাপ্তির অনুসন্ধানের ব্যাকুলতাকে—সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি দিয়াছেন। মানবমনের ধারণাতীত রহস্যবোধকে ছন্দের জালে বন্দী করিয়াছেন। তাঁহার ধার্মিকতা তত্ত্ব-প্রতিপাদন নহে, নূতন সত্য ও অনুভূতির চমকপ্রদ আবিষ্কার। বস্তুতঃ ধার্মিক কবির আদর্শ অতিশয় দুরূহ। নিরাবর মৌলিকতা, সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় ভাব-ব্যঞ্জনার সহিত কাব্য-সৌন্দর্য ও সার্থক রূপায়ণের সমন্বয় সাধন খুব কম কবিই সাধ্যায়ত্ত। রবীন্দ্রনাথ যে এই দুরূহ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহাই তাঁহাকে ধার্মিক-ভাবপ্রবণ কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে।

ধার্মিক অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্থায়ী উপাদান হইলেও 'প্রান্তিক' হইতে যে পর্যায়ের আরম্ভ তাহার মধ্যে এই সুরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এতদিন ধার্মিক মনোভাবের প্রধান উপজীব্য ছিল এক পরাতত্ত্ব, মুহুর্মুহু আবির্ভাব-বিলয়শীল সত্তার অনুসরণ; ইহার মধ্যে লুকোচুরি খেলার লীলা, দোলাদোলা অনুভূতির বিচ্ছেদদুঃখ, পুলকিত বিস্ময় ও ক্ষণিক বিষাদের মেলা, পূর্ণ উপলব্ধির পরিবর্তে আভাস-ইঙ্গিতের আলো-ছায়ার কম্পন—এক কথায় কৌতূহলী তরুণ কবিচিত্তের উপর রহস্যবোধের ইন্দ্রজাল-রচনা—ইহারই প্রাধান্য ছিল। ইহাদের মধ্যে গভীর সত্তার যে ব্যঞ্জনা তাহা যেন ক্রীড়াচ্ছলে, লঘু চপল গতি-ভঙ্গীতে, বৃত্তাকারে কবির অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে। জীবনের সহিত মৃত্যুর সম্বন্ধ লইয়া কবি একদিন যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে সত্যের গাঢ়, নিরলঙ্কার গুরুতা যেন কল্পনার ইন্দ্রধনুর্বর্ণে রঞ্জিত ও পরিবর্তনশীল ভাবের আবোলনে আবেগ-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্ব-হিসাবে 'প্রান্তিকে' যে সত্য আলোচিত হইয়াছে তাহা পূর্ববর্তী কবিতার আলোচনার সহিত অভিন্ন। কিন্তু আলোচনার ভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক্। যে সত্যকে কবি এতদিন ক্রীড়াচ্ছলে আস্বাদন করিয়াছেন, লীলা-সঙ্গিনী-রূপে-কল্পনা করিয়া যাহার সঙ্গে প্রীতি-স্নিগ্ধ, পরিহাস-মধুর সম্পর্ক রচনা করিয়াছেন, বিস্ময়-যবনিকার অন্তরাল হইতে যাহার হাতছানি তাঁহাকে মহিমা মহিমা উন্মনা করিয়াছে, জীবনের সীমান্তরেখায় দাঁড়াইয়া আজ তাহাকে তিনি নূতন মূর্তিতে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। লঘু, তরল সুরের পরিবর্তে উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর, বিস্মিত কৌতূহলের পরিবর্তে স্থির, নিঃসংশয় উপলব্ধি, অনুযোগ-ক্ষোভ-গুঞ্জনের পরিবর্তে বিরাগক, প্রশ্ন অভিলক্ষণ—পরিবর্তনের দ্বারা সূচিত করে। এ যেন শুভ্র, অমৃত ভুবার-আবরণের নীচে তরঙ্গ-চাঞ্চল্যের সমাধি, কম্পিত, বিচ্ছিন্ন আলোক-রশ্মিসমূহের অচঞ্চল কেন্দ্রসংহতি। 'প্রান্তিকে' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে মৃত্যুর প্রতি এই মনোভাব খাঁটি ক্লাসিকাল রীতির প্রণাম, অবাধিল মহিমায় সুস্পষ্ট, অভিব্যক্তিহীন অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ একদিকে রোমান্টিক মনের সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সহিত ক্লাসিকাল রচনার ঋজু, প্রসাধনহীন-সুন্দর একাগ্রতাকে, অন্যদিকে ধার্মিক তত্ত্বালোচনার সহিত কাব্যসৌন্দর্যের সম্পূর্ণ সার্থক সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

'প্রান্তিকে' মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে কবি যে মতবাদ অভিব্যক্ত করিয়াছেন,

তাহা ভারতীয় সাধনার অধিকাংশ, উপনিষদ ও গীতার সত্যাশ্রয়ীত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। মৃত্যু যে জীবনের খণ্ডিত পরিচয়কে সম্পূর্ণ করে, আত্মার আদিম বিশুদ্ধ রূপের পুনরুদ্ধারের দ্বারা জীবন প্রক্ষিপ্ত ক্লেদ-গ্লানি মুছিয়া লয়, বিশ্বসত্য ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সহিত ইহার প্রচ্ছন্ন আত্মীয়তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, ইহলোকের অভিনেতার ছদ্মবেশ ত্যাগের ন্যায় জীবনের নানাবর্ণরঞ্জিত আবরণীকে পরিহার করাইয়া ইহাকে একাকীত্বের নিঃসঙ্গ মহিমায় শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে—এই সমস্ত ভারতীয় দর্শনের চিরপরিচিত সত্যকে কবি নূতন করিয়া অনুভব করিয়াছেন ও অপরূপ কবি-কল্পনার সাহায্যে ইহাদিগকে কাব্য-সৌন্দর্যে অভিষিক্ত করিয়া অরূপকে রূপের ইন্দ্রজালে বন্দী করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষির জ্ঞানদীপ্তি, নব আবিষ্কারের উন্মত্ত ঘোষণা দুর্বোধ ব্যবধানের পর, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত প্রতিবেশে, এক বিংশ শতাব্দীর কবির কণ্ঠে পুনরায় ধ্বনিত হইয়াছে। ইহা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নহে, ব্যাখ্যাতীত বুদ্ধিপ্রধান আলোচনা নহে, উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ, রক্তধারার স্পন্দনপ্রবাহে সঞ্চারিত, অধ্যাত্ম চেতনার নব উন্মেষ।

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ সকল হইতে বিদায় গ্রহণের বেলায় কবি তাঁহার এই স্বতঃস্ফূর্ত, সংশয়লেশহীন বিশ্বাসের সাহায্যে জয় করিয়াছেন। মৃত্যুর আসন্ন আবির্ভাবকে কবি প্রশান্ত ধীরতার সহিত বরণ করিয়া লইয়াছেন—পূর্ব কবিতার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, অপরিতৃপ্ত কৌতূহল, পরিচিতকে বিসর্জন দিয়া অপরিচিতের দিকে নিরুদ্দেশ-যাত্রার উৎকণ্ঠিত উত্তেজনা, বিশ্ববিধানের কর্তৃত্বারে আবেদনকম্পিত করাঘাত, সাগর সঙ্গমের অভিসারিণী নদীস্রোতের ন্যায়, তাহাদের সমস্ত কলকাকলী শান্ত নীরবতার মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াছে। কবি নিরাসক্ত উদাসীনতার সহিত তাঁহার অতিস্ব-চেতনাময় ব্যক্তিজীবনের ক্রমবিলীয়মান সত্তার ছবি আঁকিয়াছেন। জীবনের যথোচিত দান, অজস্র ঐশ্বর্যের প্রতি প্রসন্নচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন; নিজ অস্তিত্বের অকুণ্ঠিত জয়ঘোষণা করিয়াছেন; খ্যাতি-লোলুপতা, পরকালের মানদণ্ডে নিজের মূল্য যাচাই করিবার দীনতা নিঃশেষে বিসর্জন দিয়াছেন; জীবনের রক্তপথে যে অতীতের স্পর্শ রহিয়া রহিয়া তাঁহার সত্তা পরিচয়ের ইঙ্গিত বহন করিয়াছিল, সেইগুলিকে ধারাবাহিকতার সূত্রে গাঁথিয়াও অসমাপ্ত রচনা করিয়া কণ্ঠে পরিয়াছেন ও অন্তমুহূর্তের আধ্যাত্মিক আভিজাত্যে যেন তাঁহার মৃত্যুকালে অক্ষুণ্ণ থাকে এই প্রার্থনা জানাইয়া তিনি চিরবিরামের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কবির ভাষা এই মহিমাময় অনুভূতি ও চিন্তাপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন, এই চেতনাপ্রবাহী, সুরধারার ন্যায় তীক্ষ্ণ, দুর্গম পথে চলিতে তাহার অনভ্যস্ততার জন্য একবারও তাঁহার পদস্খলন হয় নাই। ত্রিংশবর্ষব্যাপক ইংরেজ কবি শেলি তাঁহার কাব্য-সমাপ্তির তোরণ-দেশে "জীবন কি?" এই অমীমাংসিত প্রশ্ন ক্ষোদিত করিয়া দিয়াছেন। অষ্টসপ্ততি-বর্ষীয় প্রাচ্য কবির শেষ রচনায় এই দুঃসমাধেয় প্রশ্নের যে উত্তর মিলিয়াছে তাহার অপেক্ষা সন্তোষজনক মীমাংসা কোন মানব কবির লেখায় মিলিবার আশা করা যায় না।

(২)

দ্বিতীয় পর্যায়ে রচিত গ্রন্থগুলির—'আকাশ-প্রদীপ,' 'নব-জাতক' ও 'সানাই'এর মধ্যে 'প্রান্তিকে'র এই সুর-গাম্ভীর্য শোনা যায় না। কবির কল্পনার সহজ মহিমা ও লঘু, পরিহাস-তরল সুরটি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নূতন আরম্ভের সূচনা কিছু কিছু অনুভূত হয়, কিন্তু এই সূচনাপূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। এই অভিনব সুরের লক্ষণের মধ্যে (১) প্রাত্যহিক জীবনের বিশ্লিষ্ট-বস্তু-বহুল ভূমিকার মধ্যে গভীর ভাব-ব্যঞ্জনা ও অতীতের অনুভূতির সহজ প্রতিষ্ঠা, (২) আগামী যুগের জীবন ও কাব্যাদর্শের পূর্বাভাস ও আধুনিক যুগের প্রয়োজনমূলক বাস্তিকতার কাব্যাভিষেক এবং (৩) অলস, শিথিল, কাব্য-সাধনার নিবিড় ঐকান্তিকতার আদর্শ হইতে স্খলিত, কল্পনার স্বচ্ছন্দবিহারে ও পলাতক, ক্ষণস্থায়ী ভাবানুভূতিসমূহের (moods) সার্থক রূপায়ন ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য (১) ও (৩) শ্রেণীর কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঠিক নূতন আবির্ভাব বলা যায় না; তবে ইহাদের সৌনঃপুনিকতা ও এই সুর আবাহনে কবির সিদ্ধহস্ততা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। দ্বিতীয় শ্রেণীর 'নবজাতক', 'পক্ষীমানব', ও 'সাড়ে নটা'—এই তিনটি কবিতায় বিষয়কর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। 'নবজাতকে' আগামী যুগের মানবের মধ্যে যে আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহার প্রত্যুদ্গমন সূচিত হইয়াছে। 'পক্ষীমানবে' যে আকাশবিমান বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত মারণাস্ত্রের মধ্যে ভীষণ প্রাণান্ত লাভ করিয়াছে, কবি তাহাকে শাশ্বত সৌন্দর্যবোধ ও নীতিজ্ঞানের দিক্ দিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন—আকাশের অসীম শান্তি ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের স্নিগ্ধ দীপ্তির সহিত তাহার আত্মীয়তা অস্বীকার করিয়াছেন। উড়োজাহাজ সম্বন্ধে আধুনিক ইংরেজ কবিদের রচনা ও দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কি আকাশ-পাতাল অন্তর! Spenderএর 'On an Aerodrome' কবিতাটি সম্প্রতি পর্যবেক্ষণের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য-সমষ্টির সন্নিবেশ মাত্র—শেষের দিকে সামান্য একটু ভাবোচ্ছ্বাস, একটু মৃদু প্রতিবাদ প্রায় বস্তুসূত্রের দ্বারা অভিভূত হইয়া ব্যর্থপ্রায় হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আলোচনাটিকে যে উচ্চ কবি-কল্পনা ও উজ্জ্বলিত ভাবাবেগের সুরে উন্নীত করিয়াছেন, ইংরেজ কবির পদাতিক, তথ্যভারাক্রান্ত কল্পনা সেখানে পৌঁছায় না। 'সাড়ে নটা'র কবি বেতারের বিদ্যুৎবাহিনী সঙ্গীতধারাকে বাস্তব তুচ্ছতার সংস্পর্শহীনা আদর্শ লোকবাসিনী অভিসারিকার ও মেঘদূতের যক্ষের বিরহগাথার তুলনা করিয়া প্রয়োগমূলক আবিষ্কারকে সৌন্দর্যলোকে উন্নীত করিয়াছেন, কাব্যের জিনিসকে কাব্যে স্থান দিয়াছেন। আধুনিক বস্তুতন্ত্রতা কেমন করিয়া কবি-কল্পনার দ্বারা রূপান্তরিত হইতে পারে, কেমন করিয়া ইহা প্রয়োজনের অন্ধ-নির্দিষ্ট বাঁধা পথ ছাড়িয়া সৌন্দর্যের লীলা বিলসিত শোভাযাত্রায় স্থান গ্রহণ করিতে পারে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলি তাহার চমৎকার প্রমাণ। আধুনিক ইংরেজ কবির মধ্যে কেহ কেহ—যেমন Louis Mac Niece ও Spender—ট্রেণের গতি সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহারা বস্তুলোক ছাড়াইয়া রূপের সঙ্কেত-লোকে

পৌঁছায় নাই। দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে কাব্যের আত্মীয়তা-স্থাপনের সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতায় যে এই সম্ভাবনা সার্থক হইয়াছে তাহা দাবী করা যায়।

প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা এই গ্রন্থগুলির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'আকাশ-প্রদীপে'—'ধ্বনি', 'ধনু', 'জল', 'নামকরণ' 'তর্ক', 'নবজাতক'—'এপারে-ওপারে' 'রাত্রি', 'অস্পষ্ট' 'সানাই'এ' 'সানাই'—এই সমস্ত কবিতা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটিতে অবচেতন মনের অতি সূক্ষ্ম, অনির্দেশ্য অনুভূতি, মোহাবেশের অপরাহ্ণ, রঙীন বুদ্বুদগুলি কল্পনার মায়াতন্তু নির্মিত জালে ধরা পড়িয়া পদ্য-ধ্বনি-ময় রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ('অস্পষ্ট', 'রাত্রি'—নবজাতক)। কতকগুলিতে পূর্ব স্মৃতি রোমন্থনের নিবিড় অবকাশসুখে সঞ্চরণশীল আপাত-দৃষ্টিতে অসংবদ্ধ টুকরা টুকরা খণ্ড সৌন্দর্যের সমাবেশ এক গভীর, সার্বভৌম সত্যের ব্যঞ্জনায় অর্থগৌরব ও রসসংহতি লাভ করিয়াছে—'আকাশ প্রদীপের' 'ধ্বনি', 'ধনু', 'জল' 'তর্ক' প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। 'নামকরণ' কবিতাটিতে একটা অকারণ খেয়ালের মাধ্যমে যে গভীর, সর্বব্যাপী সৌন্দর্যবোধ, নারীর রূপ মহিমার যে অতলস্পর্শ, নিখিলপ্রসারী রহস্যপূততা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও বিরল। 'এপারে-ওপারে' ('নবজাতক') ও 'সানাই' ('সানাই') কবিতায় বাস্তব জীবনের বিশৃঙ্খল, সৌন্দর্য সুষমাহীন, পুঞ্জীভূত বস্তুস্তূপের চাপে মুখ প্রতিবেশে অকস্মাৎ এক নিবিড় অনুভূতি বা অরূপের ব্যঞ্জনা। কালোর নিকষে সোনার আলোর ন্যায়, উদ্ভাসিত হইয়াছে—বিপরীত পটভূমিকায় ইহাদের আবেদন মধুরতম হইয়া উঠিয়াছে। 'প্রথমোক্ত কবিতায় বাঙ্গালী সংসার যাত্রার খুব স্বল্পপ্রচেষ্টা, ইতর আমোদ প্রমোদ ও জীবনের মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল গতিচাঞ্চল্যের ভিতর দিয়া যে সরল, সহজ প্রাণপ্রবাহ হিল্লোলিত হইয়া উঠে—কবি তাহার সহিত নিজের আত্ম-কেন্দ্রিক, প্রাণের গতিহীনতা হইতে বুদ্ধিবাদের উচ্চ শুষ্ক ভূমিতে উৎক্ষিপ্ত জীবনের তুলনা করিয়া সামাজের স্পর্শের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন—কবির এই মৃদু অভিব্যক্তির স্পর্শ বিহীনতাও কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। 'সানাই'এ বিবাহ-বাড়ীতে অশোভন লোকসমাগম, উদ্ভ্রান্ত ব্যস্ততা, নানাবিধ উপকরণ-বাহুল্য ও প্রতিবেশের কুশ্রীতার মধ্যে সানাইএর সুর ঊর্ধ্বলোকের এমন একটী ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা বহন করে, যাহার প্রভাবে পৃথিবীর সমস্ত অসঙ্গতি, সমস্ত রূঢ় ছন্দোহীনতা এক অনন্য অন্তর্দৃষ্টি সুষমায় পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই দুইটী কবিতায় প্রথম দিকের অসংলগ্ন, অপরিমিত বস্তু সমাবেশ পরিণতির মানদণ্ডে সার্থক কলাকৌশলের পরিচয় দিয়াছে—কবি কুহেলিকে সৌন্দর্য সৃষ্টির সোপানরূপে ব্যবহার করিয়া কুহেলিতে কাব্য প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আগুন জ্বালানোতেই কাষ্ঠস্তূপের সার্থক অস্তিত্বের সমর্থন। অবশ্য এই রকমের কবিতার সম্বন্ধে যে আপত্তি উঠিয়াছে তাহা বলা যায় না। অনেক স্থলে ইহাদের অবিন্যস্ত প্রাচুর্য্যের জন্যই অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয় নাই। কবি-কল্পনা আগুন জ্বালাইবার জন্য যে ফুৎকার দিয়াছে তাহা যথেষ্ট শক্তিশালী নহে; সময় সময় মনে হয় যে কবির এ বিষয়ে ইচ্ছারই অভাব। 'সানাই'এর "বাসাবদল' কবিতাটির উদ্দেশ্য বোধ হয় বিদ্রূপ তথ্যবিবৃতি। ইহার পিছনে কোন কাব্য-সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রয়াস বা সত্যের অনুভূতি কূটরূপ দেখা যায় না। "দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের ব্যাণ্ডেজের মত"—এই উপমার মধ্যে যে ছবির আভাস তাহা Eliot এর "He a patient etherised upon a tables" সহিত সাদৃশ্য মনে মনে পড়াইয়া দেয়। Eliotএর সমস্ত কবিতাটিতে ঘুমের ক্লান্তির ও অর্থহীন, যান্ত্রিক জীবনযাত্রার মূকতা এক তীব্রভাবে পরিকল্পিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে—প্রত্যেকটী রেখা, প্রত্যেকটী উপমা ভাবসংহতির প্রয়োজনে সার্থক হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের খোঁড়া কোন দিন বিকৃত প্রতিবেশের অঙ্গীভূত হয় নাই—ইহা কেবল খণ্ড কল্পনার বাহন মাত্র। আর মনে হয় যে এই খণ্ডত্বের অভিনব কবির সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত—তাঁহার কল্পনার উচ্চোচ্চলতা কেবল খেয়ালের রসে পদ্য সাজিয়াছে। "অসমতা" কবিতাটিতে প্রথমদিকের স্নেহ ও আবর্জনার গুণীকরণের সহিত শেষ দিকের প্রেমের কল্পলোকরচনার কোন সার্থক যোগ অনুভব করা যায় না—কবি যেন কেবল ডানার জোর দেখাইবার জন্য পদ্য বর্ণমালা হইতে অতীত যুগের স্মৃতি-মুখরিত তাম্র-রাজ্যের স্বচ্ছনীল আকাশে উড্ডীন হইয়াছেন। এই কবিতাগুলিকে প্রতিভার দুঃসাহসিক পরীক্ষা বা অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয়ের জন্য অসাফল্যের নিদর্শনরূপে ধরা যাইতে পারে। 'আকাশ প্রদীপে' 'মযূরের দৃষ্টি' ও 'কাঁচা আম' গভীরতর বা ছন্দোহীনতার প্রত্যাবর্তন। এই দুইটী কবিতায় কবিত্বের প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্যকণা ছন্দসঙ্গীতের চাপে নিবিড়তা লাভ করে নাই। ইহাদের মধ্যে নীহারিকাপুঞ্জের অস্থির চলক, তারকার সংহত-রশ্মি, সম্পূর্ণমণ্ডল দীপ্তিতে পরিণত হয় নাই। (আগামী বারে সমাপ্য)

বিবেক

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি প্রায় এগারোটা।

কালীঘাটগামী লাষ্ট্ ট্রামখানির ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের সামনের দিকের একটি সিটে ইন্দ্রনাথ চুপ ক'রে বসেছিল। তার লুব্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল—পাশের এক বৃদ্ধ আরোহীর পানে। চলন্ত ট্রামের ফুরফুরে বাতাসে বৃদ্ধ অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন। অনেকক্ষণ থেকেই বসে বসে তিনি ঢুলছিলেন, এখন ট্রামের গতি বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঢুলনিও বেশ বর্দ্ধিত হতে লাগলো। হঠাৎ একসময় তাঁর ক্রোড়স্থিত ক্ষুদ্রকায় সুটকেশটি—যেটি অত্যন্ত ধর ও সাবধানতার সঙ্গে তিনি নিয়ে যাচ্ছিলেন, নীচে পড়ে গেল।

ইন্দ্রনাথের চক্ষু দুটি সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সামান্য মাইনের কেরাণী সে, সংসারের নিত্যকার অভাব-অভিযোগের জ্বালায় অস্থির। সুতরাং সেই সব অভাবের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তাকে অনেক কিছুই করতে হয়। কথাতেই আছে—'অভাবে স্বভাব নষ্ট।' ইন্দ্রনাথেরও হ'য়েছে তাই। প্রথম প্রথম সে একটু অস্বস্তি বোধ করতো—বিবেক তার বাধা দিত, কিন্তু এখন এসব ব্যাপারে সে রীতিমত অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। তার মতে—যুদ্ধের বাজারে সকলেই যখন তাল বুঝে যথাসাধ্য দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে—ভালো মন্দ ধর্মাধর্ম কেউই যখন বিচার করছে না, তখন সেই বা কেন ধর্মের ভয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? তার ওপর এ কারবারে মূলধনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, শুধু একটু বুদ্ধি আর সাহস থাকলেই ব্যস্···কাজ ফাকাই।

বৃদ্ধের সুটকেশটি পড়ে যেতেই ইন্দ্রনাথ বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। সুটকেশের মধ্যে যে মূল্যবান কিছু আছে সে সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ ছিল না; বৃদ্ধের সাবধানতাই সে বিষয় তাকে সজাগ ক'রে দিয়েছিল। একবার লোলুপ দৃষ্টিতে সে সুটকেশটার পানে তাকালে···এমন সুযোগ উপেক্ষা করা সমীচীন নয়! ট্রামের অন্যান্য যাত্রীদের দিকে একবার সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিলে—নাঃ, তার ওপর কারো নজর নেই! তারপর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এক সময় সে ত্রস্ত হাতে সুটকেশটা তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবে ট্রামের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো এবং ট্রামের গতি একটু মন্থর হ'তেই ঝাঁ ক'রে নেমে পড়লো।

কিন্তু তার গন্তব্য স্থান সে এখান থেকে অনেকখানি—সেই কালীঘাটের শেষ প্রান্তে। এত রাতে এরকম অবস্থায় এতটা পথ হেঁটে যাওয়া কি উচিত?

ঠিক সেই সময় একটা রিক্সা পথের অপর প্রান্ত দিয়ে চৌরঙ্গী অভিমুখে ঠুং ঠুং ক'রে চলেছিল।

ইন্দ্রনাথ রিক্সাটা দেখতে পেয়েই ডাক্ দিলে—'এই রিক্সা, এই···ভাড়া যাবি?'

—'কেনো যাবে না বাবু।' রিক্সাওয়ালা রিক্সা ঘুরিয়ে তার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলে—'কুথা যাইতে হ'বে বাবু?'

—'শ্যা'নগর। কত নিবি?'

—'দশআনা বাবু।'

—'দশআনা! আচ্ছা ঠিক হ্যায়—চল্।'

ইন্দ্রনাথ রিক্সায় উঠে বসল। দর কষাকষির সময় তার নেই—এখন যা হোক ক'রে বাড়ী পৌছুতে পারলে হয়।

রিক্সায় বসে অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর অন্ধ একটা চাবির সাহায্যে টানাটানি করতে করতে সে সুটকেশটা এক সময় খুলে ফেললে। সুটকেশের মধ্যে কি বস্তু আছে তা না জানা পর্যন্ত সে যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না। সুটকেশের ডালাটা মুক্ত হ'তেই আনন্দে তার চক্ষু দুটি জ্বল জ্বল ক'রে উঠলো।···সুটকেশটি বহুমূল্য স্বর্ণালংকারে ও বাণ্ডিল বাঁধা নোটে প্রায় পরিপূর্ণ। গহনাগুলি সবই নূতন!

ইন্দ্রনাথ ভাবলে—ভদ্রলোক হয়ত' নিজ কন্যার কিংবা কোনও আত্মীয়-কন্যার বিবাহের জন্যই এসব তৈরী করিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তার মুখে এক প্রকার অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠলো। কার জিনিস, কার ভোগে আসে!···একজন হয়ত' সারাজীবন কতো পরিশ্রম ক'রে খেয়ে না খেয়ে উপায়ের পয়সা জমিয়ে রেখে গেল, আর একজন নিশ্চিন্ত

আরামে তা ভোগ করতে লাগলো। দুনিয়ার নিয়মই এই! লোকটি হয়তো···

নানা কথা ভাবতে ভাবতে সে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা সরু গলির দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে রিক্সাওয়ালাকে সম্বোধন ক'রে ব'লে উঠলো—'এই রোখো, রোখো। বাস্ বাস্, আর নয়।'

রিক্সা থামতেই সে সুটকেশটা শক্ত ক'রে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে নেমে পড়লো এবং রিক্সাওয়ালার প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েই দ্রুতপদে গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

খানিকটা যেতে না যেতেই পিছন থেকে কার আহ্বান শোনা গেল—'বাবু, বাবু।'

ফিরে তাকাতেই দেখলে—রিক্সাওয়ালাটা ছুটতে ছুটতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে দাঁড়িয়ে পড়লো। রিক্সাওয়ালাটা হাঁপাতে হাঁপাতে তার সামনে এসে বললে—'বাবু, আপনি এইটো রিক্সায় ফেলে আইছিলেন।' বলেই একখানি দশটাকার নোট সে তার দিকে এগিয়ে দিলে।

ইন্দ্রনাথ বিস্ময়ে নির্বাক। এও কি সম্ভব···এমন অপূর্ব সুযোগ পেয়েও এই দরিদ্র লোকটা তা গ্রহণ করতে চায় না! এর কাছে দশ টাকার মূল্য ও' অল্প নয়! তবুও··· কে যেন তার পিঠে সজোরে একটা চাবুক বসিয়ে দিলে। রিক্সাওয়ালার পানে বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর সে যেন কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গলা দিয়ে কথা বেরুলো না। রিক্সাওয়ালা তার হাতে নোটখানা গুঁজে দিয়ে একগাল হেসে বললে—গরীব আদমী বাবু, রিক্সা টেনে খাই, লেকেন চুরি ছুপাচুরি কভি করা নেই। অধর্মকা পয়সা ভোগ হোতা নেই বাবু। আচ্ছা বাবু যাতা হুঁয়।

রিক্সাওয়ালা চলে গেল। ইন্দ্রনাথের পা' দুটো কে যেন মাটির সঙ্গে এঁটে দিয়েছে। স্থির নির্নিমেষ নেত্রে রিক্সাওয়ালার গমন পথের পানে সে চেয়ে রইলো। তার মুঠির বাঁধন শিথিল হ'য়ে সুটকেশটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল।···

যুদ্ধোত্তর বৃটেন ও অ্যামেরিকার রাসায়নিক শিল্প

শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন এম্-এস্‌সি

আপনারা অনেকেই জানেন দ্বিতীয় মহাসমর সমাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে ও পরে বিভিন্ন মিশন ও কমিশনের সভ্যরূপে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি বিলাত ও অ্যামেরিকায় গিয়াছিলেন নূতন জ্ঞান-আহরণের জন্য। ভারতীয় রাসায়নিক শিল্প সমিতির প্রতিনিধিরূপে এবার আমারও বিলাত এবং অ্যামেরিকার যুদ্ধোত্তর পরিবর্তনের সুযোগ লাভ হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাসমর বিশ্ববাসীর চোখে আঙুল দিয়া দেখিয়ে দিয়েছে যে কারও নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য অপরের উপর নির্ভর করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। এই সত্য উপলব্ধি ক'রে তাকে কার্যে পরিণত ক'রতে অ্যামেরিকাবাসী যতদূর অগ্রসর হয়েছে তার তুলনা মেলা শক্ত। বিলাত ও অ্যামেরিকার যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান আমি দেখেছি তাহা অধিকাংশই রাসায়নিক-পর্যায়ের এবং এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা :—(১) ভেষজ বা ভারী কেমিক্যাল কারখানা, (২) ফাইন্ কেমিক্যাল কারখানা ও (৩) কেমিক্যাল যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান।

অনেকেই সম্ভবতঃ জানেন—সালফিউরিক অ্যাসিড, সোডা, কষ্টিক-সোডা প্রভৃতি যে সব রাসায়নিক দ্রব্য অপর অধিকাংশ রাসায়নিক-শিল্পের প্রাণস্বরূপ এবং যেগুলি বিরাট পরিমাণে প্রস্তুত হয়ে থাকে সেগুলিকে ভেষজ বা ভারী কেমিক্যাল বলা হয়। ঔষধপত্রাদি, যেমন পেনাসিলিন্, হাইড্রোক্লোরাইড্, ভিটামিন সি, সালফাপিরিডাসাইড্ প্রভৃতি পদার্থ টনে টনে প্রস্তুত হলেও সেগুলিকে বলা হয় ফাইন্ কেমিক্যাল। ভেষজ কেমিক্যাল কারখানা দেখতে গিয়ে সর্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাদের বিরাট আয়তন ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির প্রতি। সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানায় ধূমায়মান গন্ধক চুল্লী, যান্ত্রিক যন্ত্রের সাহায্যে চুল্লীতে গন্ধক সরবরাহের ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক আলোড়নে উত্তাপের যথাযথ নির্ণয় এবং গ্যাসের গতিবেগ দ্বিগুণীকরণ এবং 'লেড চেম্বার' প্রক্রিয়ার সোরার পরিবর্তে করলা গ্যাসের অ্যামোনিয়া থেকে প্রস্তুত অক্সাইড্ অব্ নাইট্রোজেনের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ওয়েলসের কারখানাতে দৈনিক ১০০ টনের কম সালফিউরিক অ্যাসিড্ প্রায়ই উৎপন্ন হয় না—অনেক ক্ষেত্রেই আবার দৈনিক ৪০০ টন সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়ে থাকে। অথচ আমাদের দেশে দৈনিক দশ বার টন সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হলেই আমরা খুব বেশী মনে করি। একটি প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয় আমার এই যে

যাঁরা সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাই সে অ্যাসিড অপর লাভজনক দ্রব্যসম্ভারে পরিণত করে থাকেন। জমির সার হিসাবে সুপার ফস্‌ফেট সুপরিচিত। সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানা সংলগ্ন বিরাট আয়তনের সুপার ফস্‌ফেট কারখানা-গুলি দেখে তাক্ লেগে যায়। এই সব কারখানায় দিবারাত্র কাজ হয় এবং সুপার ফস্‌ফেট কারখানার কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ ক'রে থাকেন। ঐ গবেষণাগারে মৃত্তিকা গবেষকগণের সাহায্যে সারের আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে বিভিন্ন ফসলের বিশেষ সম্বন্ধ তা স্থির করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগার প্রত্যেক জিলার কৃষিপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। জিলা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত কৃষিবিদ্‌গণ তাঁদের এলাকায় কৃষকদের সঙ্গে মিশে ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা হাতে কলমে অর্জন করছেন। সুতরাং কোন্ সার প্রয়োগে কৃষকের কি সুবিধা-অসুবিধা হচ্ছে অবিলম্বে জিলার কৃষিপ্রতিষ্ঠানের মারফত কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে ও সেখান থেকে সে খবর কারখানার প্রেরিত হচ্ছে এবং কারখানার কর্তৃপক্ষ তদনুসারে তাঁদের সারের আকৃতি-প্রকৃতি আবশ্যক মত পরিবর্তন ও সংশোধন করে নিচ্ছেন। গুঁড়া সার বেশীদিন রেখে দিলে পাথরের মত শক্ত ডেলা হয়ে যায় বলে আজকাল মোটা মোটা দানাযুক্ত সার ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। ফসলের প্রকৃতি অনুসারে উদ্ভিদ্-খাদ্যের প্রধান উপাদানগুলি বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে মিশ্র সারের প্রচলন আজকাল ক্রমশঃ বেশী দেখা যাচ্ছে। এদিকে কেন্দ্রীয় কৃষিগবেষণাগারে নূতন নূতন সারের উপযোগিতা সম্বন্ধে গবেষণার বিরাম নাই। ইউরিয়ার নাম অনেকেই শুনে থাকবেন। প্রাতঃস্মরণীয় স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর আবিষ্কৃত কালাজ্বরের অব্যর্থ ঔষধ ইউরিয়াষ্টিবামিনের কল্যাণে ইউরিয়া কথাটি না শুনেছেন এমন লোক কমই আছেন। এই ইউরিয়া একটি সাদা দানাদার পদার্থ; অ্যামোনিয়া এবং কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের রাসায়নিক সংমিশ্রণে আজকাল প্রভূত পরিমাণে ইউরিয়াও সব দেশে প্রস্তুত হচ্ছে এবং তার অধিকাংশ ইউরিয়া-ফরম্যালডিহাইড রেজিন নামক প্লাষ্টিক প্রস্তুত কল্পে নিয়োজিত হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে ইউরিয়া প্রয়োগে অ্যামোনিয়াম সালফেটের মত উপকার পাওয়া যায় কিনা তদ্বিষয়ে আজকাল জোর পরীক্ষা চলেছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ইউরিয়া একটি অপরিহার্য সাররূপে পরিগণিত হবে। সকলেই জানেন অ্যামোনিয়াম সালফেট জমির পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট সার। গুদামের অনেক অ্যামোনিয়াম সালফেটের কারখানায় ব্যবহৃত সালফিউরিক অ্যাসিড কয়লার সঙ্গে যে গন্ধক থাকে সেই গন্ধক থেকেই তৈরী হয়ে থাকে। বিশেষ প্রকারের চুল্লীতে কয়লা পুড়িয়ে কোক করবার সময় আলকাতরা প্রভৃতি উপকারী পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে একটি মূল্যবান মিশ্র গ্যাস পাওয়া যায়। এই গ্যাসে অন্যান্য দরকারী পদার্থের সঙ্গে অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন সালফাইড নামক গ্যাস থাকে। সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরী করতে লাগে প্রধানতঃ সালফার ডাই-অক্সাইড এবং ঘটক বা ক্যাটালিষ্ট হিসাবে দরকার হয় নাইট্রিক অক্সাইডের। কয়লার গ্যাসে প্রাপ্ত অ্যামোনিয়ার কিয়দংশ পুড়িয়ে নাইট্রিক অক্সাইড করা হয় এবং হাইড্রোজেন সালফাইড পুড়িয়ে করা হয় সালফার ডাই-অক্সাইড। সুতরাং এই দু'টি পদার্থের সাহায্যে কোক্-চুল্লীর সন্নিকটেই সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতের ব্যবস্থা হচ্ছে। তার পর এই সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে কয়লা গ্যাসে প্রাপ্ত অবশিষ্ট অ্যামোনিয়ার সংযোগে প্রস্তুত হচ্ছে অ্যামোনিয়াম সালফেট। এই উপায়ে বাহিরের গন্ধক আমদানি না করেও ঐ সব দেশে বহু টন অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রতি বৎসর প্রস্তুত হচ্ছে এবং সেগুলি উপযুক্ত বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বাবধানে জমিতে প্রয়োগ করায় অপর্যাপ্ত শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হচ্ছে। আর আমাদের দেশে এখনও প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টন কয়লা গ্যাস করে পুড়িয়ে কোক্ করা হচ্ছে; ফলে কয়লা থেকে যে সব উপাদানগুলি (বাই প্রোডাক্ট) পাওয়া যেত—প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের সেই অমূল্য সম্পদ বাতাসে মিশে যাচ্ছে। পদে পদে জাতীয় সম্পদের এরূপ শোচনীয় অপচয় হওয়ার ফলেই আজ শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে বাস ক'রেও আমাদের লক্ষ লক্ষ লোককে অনাহারে মরতে হচ্ছে। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই সব অপচয়ের প্রতিকার না করলে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষাই দায় হয়ে পড়বে।

সালফিউরিক অ্যাসিডের পরেই ক্লোরিন ও সোডা-ক্ষারক তৈরীর বিপুলকায় আদি সম্বন্ধিত প্রকাণ্ড কারখানাগুলি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেকেই জানেন লবণ জলের ভিতরে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিত করলে দুরকম উপাদান হয়—সোডিয়াম ধাতু ও ক্লোরিন গ্যাস পৃথক হয়ে পড়ে। এই সোডিয়াম ধাতু জলের সংস্পর্শে কষ্টিক দ্রবে পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উত্থিত হয়। বিশেষ ধরণের নির্মিত পাত্রে ঐ কষ্টিক দ্রব ঘনীভূত ক'রে হাইড্রোজেন গ্যাস পুড়িয়ে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাতে করে কষ্টিক গলিয়ে মূর্ধমান অবস্থায় সাহায্যে গুঁড়িয়ে সেগুলিকে পাতলা 'পটেটোচিপের' আকারে উপযুক্ত পাত্রে রাখা হয়। কষ্টিক তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে যে প্রভূত পরিমাণে ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় সেগুলিও বিভিন্ন শিরে নিয়োজিত হয়ে থাকে। ক্লোরিন গ্যাসকে বিশুষ্ক ও তরলীভূত করে সিলিণ্ডার এবং ট্যাঙ্কগাড়ী ভর্তি করে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে। তুলো, পাট ও কাগজ সাদা ধবধবে করার (bleach) জন্য এই ক্লোরিন প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বন্যা মারি দুরপোকা আরশুলা ও ক্ষেতের ফসল নষ্টকারী কীট পতঙ্গ বিনাশক ডি ডি টি ও গ্যামাক্সেসের নাম অনেকেই শুনেছেন। এগুলি তৈরী করতে অঢেল ক্লোরিন দরকার হয়। তারপর যে মনোক্লোরোবেনজিন ডিডিটির একটি প্রধান উপাদান সেই ক্লোরোবেনজিন থেকে কার্বনিক অ্যাসিডও তৈরী হয়ে থাকে। পেন্টাক্লোরোফিনল কাঠ সংরক্ষণে অত্যাবশ্যক বলে এবং ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ও ক্লাপ্‌থেলিন ইঁদোকা নাশকরূপে প্রমাণিত হওয়ায় এই সব উপকারী পদার্থ প্রস্তুত ব্যপদেশে ক্লোরিনের চাহিদাও অসম্ভবরূপে বেড়ে গিয়েছে। তার পর আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে ক্লোরিন সংযোগে এই সব পদার্থ প্রস্তুতকালে অজস্র হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও জন্মে। উপসাবস্তু বা হাইড্রোজাইট হিসাবে এই উপকারী অ্যাসিড এত অধিক পরিমাণে পাওয়া

যাচ্ছে যে মামুলী প্রথায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরী প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। হাইড্রোজেন দিয়ে তুলাবীজের তৈল প্রভৃতি শক্ত করা হয়ে থাকে। ঘানলা প্রভৃতি এই ভাবে তৈরী হয়। সোডিয়াম সালফাইড এবং সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুত করতেও এই হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনও রসায়নশিল্পই তথেনে একক দাঁড়িয়ে নেই। মূল শিল্পের সঙ্গে যে সব আনুষঙ্গিক পদার্থ বেরোয় সেগুলি তারা যথাযথ লাভজনক কাজে খাটানোর ফলে আসল উৎপন্ন দ্রব্যের দাম অনেক কম পড়ে। আমাদের দেশে টাটা কোম্পানীর জিয়াপুরের কারখানায় বর্তমানে কষ্টিক সোডা তৈরী হচ্ছে বটে, কিন্তু তার বাইপ্রোডাক্ট ক্লোরিন ও হাইড্রোজেনের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে উহাদের তৈরী কষ্টিকের দাম আমদানী মালের চাইতে বেশী পড়ে যাবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ক্যালসিয়ম কার্বাইডের কারখানা দেখার সুযোগ আমার ঘটে নাই। তবে কার্বাইড থেকে প্রাপ্ত অ্যাসিটিলিন গ্যাস থেকে প্রস্তুত অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড প্রস্তুত ও বিশুদ্ধীকরণ দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আজকাল তথেনে এই উপায়ে প্রস্তুত অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড থেকে ফোরোফরম তৈরী হচ্ছে; ফলে তার দামও অ্যালকহল ও ব্লিচিং পাউডার থেকে প্রস্তুত ফোরোফরমের চেয়ে অনেক সস্তা। আমাদের দেশে অ্যালকহল এবং ব্লিচিং পাউডারের যে দাম তাতে করে ফোরোফরম তৈরী করে প্রতিযোগিতার ওদের সঙ্গে দাঁড়াতে পারা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের মিরাপুর রাজ্যের উপকূল প্রদেশে ইলমেনাইট নামক খনিজ আছে। এই খনিজ সামান্য মূল্যে ঐ দেশে চালান দিয়ে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার টাইটেনিয়ম অক্সাইড নামক মূল্যবান্ পেন্ট প্রস্তুত হচ্ছে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে আমাদের রাসায়নিক কবির কথাটি মনে পড়ে গেল—"আমাদেরই ঘরে আছে অগোচরে কত অমূল্য ধন, চিনিতে না পারি অসহ যন্ত্রণা সহি মোরা আত্মীয়ন।"

ঐ সব দেশের অ্যাস্পিরিন, সালফোনঅ্যামাইড, অ্যাটেব্রিন, স্যালিসিলিক অ্যাসিড প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা দেখে বিরাট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান বলে মনে হয়। কারণ বর্তমান বিপুল আয়তনের উৎপাদনের কারখানাগুলিতে কোনও একটি জিনিষেরও অপচয় না হয় সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অসংখ্য যন্ত্রাদির সমাবেশে সাধন করা হয়ে থাকে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদক্ষ কেমিষ্ট এবং কিরূপ পাত্রে বা কোন্ প্রকারের যন্ত্রে সেই প্রক্রিয়া লাভজনক ভাবে সম্পন্ন হবে তা নির্ধারণ ও কার্যে পরিণত করার জন্য অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত থাকেন। ভিটামিন এ ও ডি'র নাম অনেকেই জানেন। কড্ লিভার অয়েলে এই পদার্থ থাকে এবং রুগ্ন শিশু ও প্রসূতীদের পক্ষে এই ভিটামিনগুলি কিরূপ উপকারী। অ্যামেরিকায় 'মলিকিউলার-ডিস্টিলেশন' নামক প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হওয়ায় সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে বিরাট আকারের এগুলি উৎপাদন করে মানুষের যকৃৎ-তেল থেকেও ঐ ভিটামিনগুলি পৃথক করে অল্প পরিমাণে তৈরীর শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে কলাচি ও বোম্বাই উপকূলে আরব সাগরের মাছের থেকে তাই দিয়ে মাছ-তেল প্রস্তুতের কারখানা হয়েছে, কিন্তু ঐ প্রকারে বিশুদ্ধ না করলে ঐ তেলে দেশের দরিদ্রকায়ের মঙ্গল কতদূর হবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

পেনিসিলিন প্রস্তুতের কারখানা ওদেশের আর একটি মর্মস্পর্শী বিস্ময়কর বস্তু। সুবৃহৎ কারখানায় অসংখ্য অভিজ্ঞ গবেষক, রাসায়নিক, চিকিৎসক ও ইঞ্জিনিয়ারের সমবেশে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চলছে কি করে দিনের পর দিন ঐ মহৌষধ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া ক্রমশঃ সহজতর করে পেনিসিলিনের দাম কমান যায় ও সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়। রেডিও তালতের উত্তাপ সাহায্যে উহা নির্বাত অবস্থায় শুষ্ক করবার পদ্ধতিও সাফল্য লাভ করেছে এবং তাতে ক'রে পেনিসিলিনের স্থায়িত্ব এবং কার্যক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে শুনা যায়। Infra red দ্বারা উত্তপ্ত নির্বাত পাত্রে কমলা লেবুর রস শুকিয়ে রাখলে সেই গুঁড়া পুনরায় জলে দিলে অবিকল টাটকা কমলা লেবুর রসের মত স্বাদ গন্ধ ও উপকারিতা পাওয়া যায়।

ঐ সব দেশের এবম্বিধ বিস্ময়কর শিল্পোন্নতি প্রত্যক্ষ করে স্বতই মনে হয়—আমরা পিছে রিয়ে এত পশ্চাৎপদ কেন? আমাদের মস্তিষ্কের জ্ঞেরের অভাব, না উদ্ভাবনী শক্তির অক্ষমতা—যার জন্য আমরা সর্বপ্রকারের শিল্পদ্রব্যের জন্যই পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছি। অ্যামেরিকায় তিনজন ভারত সন্তানের অসামান্য কৃতিত্ব ও শিল্পক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দেখে আমাদের হতাশ হবার কোনও কারণ নেই বলে মনে হয়। অ্যামেরিকার সীয়ান-অ্যামাইড কর্পোরেশনের একটি শাখায় গবেষণা শাখায় অত্যন্তসহ অধিষ্ঠিত আছেন ডক্টর সুধারাও। এঁর আদি নিবাস মহীশূর রাজ্যে। উত্তর চিকাগোর অ্যাবট লেবরেটরিতে পেনিসিলিন সুলভে উৎপাদন করে ডক্টর রাইচুর খান অতি উচ্চ স্তরের বলে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। মহারাষ্ট্র দেশবাসী ডক্টর কোকাটনুর বেনজিনলালডোনেট থেকে কার্বলিক অ্যাসিড তৈরীর একটি সহজ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে যশস্বী হয়েছেন। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত ভারতবাসী উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পেলে বলিষ্ঠ বিজ্ঞানের সত্যিকারের মৌলিকত্ব দেখাতে পারেন। অবশ্য ও বলাতির প্রতি একনিষ্ঠ মনঃযোগ দিয়ে কাজ করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুদৃষ্টির অধিকারী হলে আমাদের গবেষকগণও উচ্চাঙ্গের গবেষণা করতে পারেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই সঙ্গে যান্ত্রিকশিল্প জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হলে এবং দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত অসংখ্য ধনকুবেরগণ শিল্পপতিগণের আন্তরিক চেষ্টা থাকলে আমাদের দেশীয় গবেষক ও পরিচালকের সাহায্যেই নূতন নূতন লাভজনক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারবে। আশা করি সেই শুভদিন সমাগতপ্রায়।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪

মাণিকলাল বেলা ৯টার সময় গিয়ে বিনোদকে খবর দিলে—"উঠে পড়ুন, অনেক বেলা হয়েছে যে! সব রওনা করে দিয়েছি—বাড়ী খালি।"

বিনোদ এতক্ষণ কি অবস্থায় ছিলেন, তিনিই জানেন। —"এঁ্যা সত্যি বলছো, সত্যি সব চলে গেছেন?"

মাণিক—"আপনার সামনে মিছে কথা···

বিনোদ—"না, তা জানি, তবে—কিছু না খেয়ে সব···"

মাণিক—"রাতের খাবার পরে খেতে পারবেন কেনো? চা আর জলযোগ যা করিয়েছি, দিনে আর তাঁদের খেতে হবে না। কচি কাচার জন্যে দুধে কেবল দুধ দিয়েছি।"

"বাঁচালে"—বলে বিনোদ যেন স্বপ্নভঙ্গে উঠে বসলেন। —"একটু চা দেবে না?"

মাণিক—প্রস্তুত আছে—কোয়ার্টারে চলুন। মায়ের খবরটাওতো নেওয়া চাই। আর লেডি ডাক্তারকেও শত ধন্যবাদ দেওয়া চাই। তিনি না থাকলে যে কি হোত, ভাবতে পারি না! যে ফ্যাসাদ করেছিলেন!

বিনোদ। তাঁরা যে কষ্ট করে আসবেন, তা জানতুম না মাণিক। বড় সুখী করেছেন।

মাণিক। আজ্ঞে হ্যাঁ!—মেয়েরা কয়েদীর মত বিদেশে পড়ে থাকেন, একটা উপলক্ষ পেলে কষ্টের কথা তাঁদের মনেই আসতে পারে না—চলুন। বিনোদ অপরাধীর মত গিয়ে বাড়ী ঢুকলেন।

সেখানে রাণীও এইমাত্র যেন "মেজর-অপারেশনের" পর শুশ্রূষার আচ্ছন্নতা মুক্ত হয়েছেন। তিনি আনন্দ মধুর স্মিতহাস্যে—"যুব যা হোক্", বলে মাথায় হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। রাতের কাজ অবসন্ন অবস্থায় উৎসব বেশটাও তখনও বদলানো হয় নি।

—"এ কি—এসব কোথা থেকে এলো? একদম রাজকন্যা যে!"

—"আহা, কিছু যেন জানেন না। বাপ মায়ে তো মিছে রাণী নামটা রাখেন নি।"

—"ধার করা রাজকন্যে"?

অভিমানের সুরে—"ইস্—তা'হলে আমি পারতুম কি না, সে মেয়ে আমি নই।"

—"সে কি আর আমি জানি না", বলে বিনোদ একটু হাসলেন। অভিমান অপসৃত হোল।

বটুয়া চা আর একটা ডিসে একটা আপেল দিয়ে গেল।

সকালে আবার ফল কেনো? "নিয়ে যা বটুয়া—এর পরে দিস।"

লেডী ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করতে করতে—"হ্যাঁ, সকাল বটে—বেলা দশটা মাত্র। কাছারীতে বাবুদের কলম চলছে!"

বিনোদ—"আসুন, আসুন, শত নমস্কার। খুব বাঁচিয়েছেন। যে ভুল করেছিলুম, আপনি না থাকলে, তা থেকে মান রক্ষার পথ আমার ছিল না। আমি নিমন্ত্রণ পত্রই দিয়েছিলুম—যেমন দিতে হয়। কেউ যে আসবেন, সে দুর্ভাবনা মোটেই ছিল না। উঃ, কি রক্ষাই করেছেন, নচেৎ কোথাও পালাতুম।"

লেডি ডাক্তার সহাস্যে বললেন—"পালানো আবার কাকে বলে তা তো বুঝলুম না। কাল রাত থেকে খুঁজছি, ডাক্তারের পাত্তাই নেই। রাণীকে শুধালুম, রাজা কোথায়, দেখাই কাকে?"

—"এই তো দেখলুম—কোথায় গেলেন?"

—"এখন তো আওতানো বাসি ফুল দেখলেন। হ্যাঁ বলুন তো, হারছড়াটী কোথা থেকে গড়ালেন? বেহারে ও হার জন্মায় না—কি মানিয়েই ছিল! কিন্তু তাতে আমার কাজ বাড়িয়েছেন, সকলকে শিল্পীর ঠিক ঠিকানা দিয়ে চিঠি লেখবার হুকুম পেয়েছি—শাড়ীখানি সম্বন্ধেও। তাঁরা বোধহয় ভাবেন, সকলকেই যেন রাণীর মত মানাবে!" এই বলে হাসলেন তিনি—

বিনোদ—"কেন আর লজ্জা দিচ্ছেন!"

লেডী ডাক্তার—না ডাক্তারবাবু, আমি বাকিদের

হয়েছি, এখুনি চাচ্ছি না, আপনারা কথা কোন, আমি এখন চললুম।—আর দাঁড়ালেন না।

বিনোদ হতভম্ব—"মাণিক মাথা খেয়েছে দেখছি। একবার দেখতে হোল।" ঘরে ঢুকলেন—হার রাণীর গলাতেই ছিল, পিসীমা খুলতে নিষেধ করেছেন। শাড়ী বিছানাতেই ছিল, উল্টে পাল্টে ভালো করে দেখলেন। —"তোমার পছন্দ হয়েছে তো রাণী—পিসীমাকে প্রণাম করেছ তো?"

"ইস্—ভাগ্যিস বলে, ওটা বুঝি মেয়েদের শেখাতে হয়।"

"না তা বলছি না, হট্টগোলের মধ্যে পিসীমাও ব্যস্ত, আর তোমার অবস্থা নিজের হাল দেখেই বুঝতে তো পারছি।"

"নিজের সঙ্গে আর তুলনাটা কোর না।—পুরুষ বটে!"

"তাই ভাবছ না কি? আমার ঘশোভাগ্যিটে ঘসা পয়সার মত। খাঁটি তামা হলেও অচল! মাণিক ভীষের শরশয্যা বানিয়ে আমায় শুইয়ে রেখেছিল, মন কিন্তু ত্রিভুবন ঘুরছিল, স্থির ছিল না, এক মুহূর্তের।"

"ত্রিভুবন মানে?"

"তুমি, তোমার অবস্থা, লেডী ডাক্তারের বাড়ী ও ব্যবস্থা—আর বাইরের তাঁবু আমাকে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছিল।"

"ইস্—মশাদের বড় খাটুনি গেছে দেখছি!"

বাইরে কার ডাক্ শুনতে পেয়ে উঠে পড়লেন।

বিনোদ বাইরে গিয়ে দেখেন হাসপাতালের বড়কর্ত্তা দাঁড়িয়ে। নমস্কার করে এগুলেন। 'এসো' বলে, তিনিও তাঁর আপিসের দিকে চললেন। বিনোদ নানা কথা ভাবতে ভাবতে সঙ্গে সঙ্গ নিলেন।—কি ব্যাপার?

আপিসে বসবার পর C. S. বললেন—"তোমাকে আমি Chabra dutyতে পাঠিয়েছিলুম। ভাল কাজ করেছ, O/c কে খুসী করেছ তাতে আমাকেও তোষিক খুসি করা হয়েছে। কিন্তু দু'মাস পরে এসেই নির্বোধের মত এমন ভুলটা করলে কেনো? এত বাড়াবাড়ি করাটা কি ঠিক হয়েছে?"

বিনোদ। (কাতর ভাবে) আপনি আমার Boss, দয়া করে বিশ্বাস করুন।—এসব পিসিমার মেয়ে বুদ্ধিতে হয়েছে, আমাকে জানতে দেন নি। তাঁর হাতে কিছু ছিল—বিষবার সম্বল। বোধ করি সবই খুইয়ে থাকবেন। আমি এখনও সে সব খবর নিতে পারি নি। এসে আভাসেই একটু বুঝে, তাঁকে সে অবস্থায়—Advance Stageএ বাধা দিতে যাওয়া বৃথা জেনে নিজে অসুখের ভান করে Hospital bed নিয়ে পড়েছিলুম—কিছুতে Joinও করি নি Sir"—

সিভিল সার্জেন—"আমি তা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু তোমার অফিস কর্ত্তারা, সে কথা তো বুঝবেন না, অনেকেই সস্ত্রীক এসেছিলেন। সকলের মন তো সমান নয়। তার প্রবেশটা বেহার। বুঝতে পারছো?"

বিনোদ—আমি আপনাকে আর কি বলবো—দেখে শুনে আমার বুদ্ধিলোপ পেয়ে গেছে Sir, আপনি বাঁচান, সৎ পরামর্শ দিন—

সিভিল সার্জেন—এখন too late, বিনোদ,—তার মেয়েরা দেখে গেছেন, সেটা কত গুণ magnified হয়ে কি আকার ধরেছে তাতো বোঝ। বিশেষ হারের বর্ণনাটা —আর তার ওজন এতক্ষণ পঁচাত্তর ভরিতে পৌঁছে থাকবে। মেয়েদের দোষ দিচ্ছি না, তাঁদের আন্দাজ বইত নয়, সুমিষ্ট ভুল করতেই পারেন। বড় বড় ইকনমিষ্ট শাস্ত্রবিদ্‌রা কসেমেজে কাজ করেন—সোনার দর এখন একশোর ওপর ভরি চলেছে—তার ঊর্দ্ধগতি—

বিনোদ। বলেন কি, বিশ পঁচিশই জানি। ওর খোঁজের তো দরকার হয় না Sir, কি করে জানবো—

হঠাৎ একটু উত্তেজিত ভাবে—"আচ্ছা Sir—এটা যদি আমার শ্বশুর বাড়ীর present হয়, তাঁরা তাঁদের মেয়েকে দিয়েছেন। এমন তো হয়েও থাকে।"

সিভিল সার্জেন। (সহাস্যে) বলছিলে যে মাথা কাজ করছে না! এই ত অনেক দূর চলে গেছ!

বিনোদ। (একটু অপ্রস্তুত ও বিনীত ভাবে)—বিপদেও যে law নেই Sir—

সিভিল সার্জেন। যাক্ ও কথা। তোমাকে ভালবাসি, তাই সাবধান করবার জন্য ডেকেছিলুম। চাকরিই যখন মূলধন, সেটা বাঁচিয়ে চলো। আপিসে ভাল মন্দ লোক

থাকেন—আছেনও। এক O/cর Certificate এই "জেলসি Complex" এনেছে, তার ওপর এই সদারোহের বদান আমার ভাল লাগে নি। তাই কথাগুলো বললুম। যাও, সাবধান হয়ে কাজ কোর।

বিনোদ খুবই চিন্তিত চলেন। একটু নীরব থেকে শেষে বললেন—"কিছুই তো করি নি Sir, কি করে কি হয়েছে এখনো তা জানি না।—মা আছেন, অদৃষ্ট আছে, আর আপনি রইলেন—যা হয় করবেন।"

সিভিল সার্জেন। তুমি তো জানো বিনোদ, আমি independent (স্বাধীন) নই—আপিস পশ্চাতে আছেন। আমি সবি অনুমানের কথা বললুম—সাবধান থাকা ভালো। শেষ তুমি যা বলেছ—তাই সার কথা—মা আছেন। যাও ভেব না।

বিনোদ নমস্কার করে ধীরে ধীরে অন্যমনস্কভাবে ফিরলেন। "আমি সত্যই নিজে ও সব করিনি—মা জানেন। ভাল দেখায় না বলে কয়েকখানা নিমন্ত্রণপত্র লিখেছিলুম বটে"—

• • •

মাণিক মুখিয়েই ছিল। দেরী দেখে ছটফট করছিলো। ডাক্তারকে দেখে চমকে গেল—

"ব্যাপার কি বলুন দিকি? আপনাকে এমন দেখছি কেনো?"

বিনোদ। আমি তো বারবার তোমাকে বলেছি, চাকরি করা আমার দ্বারা চলবে না। তোমরা সেইটে এগিয়ে দিলে। বুঝছি, ভালো ভেবেই সব করেছ, কিন্তু —দেখছি—"শুভ হয়ে দোষ হইল"

মাণিক। (চিন্তিত ভাবে) সব বলুন দিকি শুনি, শোনাতে যদি আপত্তি না থাকে—

বিনোদ। তোমাকে বলতে আমার কোনদিনই কোন আপত্তি ছিল না, নেইও। তোমাকে বলবো না তো কাকে আর বলবো। বোসো—শোন।

তারপর এক এক করে সব কথা শোনালেন। পরে বললেন—তুমি তো জানো—O/C আমার সম্বন্ধে কি লিখেছেন তা জানি না—হাতের কথা, সাড়ির কথাও জানিনা। কিন্তু তার charge আমার ওপরেই চেপেছে। —তা ছাড়া আর কার ওপরেই বা চাপবে?

মাণিক। কিসে আর কেনো, তা তো বুঝতে পারছি না মশাই। চাকরিতে ঢুকে একটা কথা বুঝেছি বটে, "যদি অনিষ্টই না করতে পারলুম তো আমরা বড় কিসের?" বড়দের বড় কাজই তো খোঁচা খোঁজা। যারা under এ আছে তাদের ভয়ে ওঁদের তাওয়ারে অনিষ্ট করবার অস্ত্র অগুন্তি। কম পড়লে কারখানায় শিল্পীর অভাব নেই, তাদের কাজই অস্ত্র invent করা আর খুশিয়ে দেওয়া। বড়দের সন্তুষ্ট করে নিজের চাকরি বজায় রাখাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

—দেখে মধ্যবিত্ত সংসারে যেমকর্ম তো বাদ যায় না দেনা করেই হোক্ বা যেমন করেই হোক তা করতে হয়, হয়েও আসছে। অনেক তো দেখা হয়েছে, তার চেয়ে বেশীটে কিসে হয়েছে? তাতেও লোক একখানা গয়না দেয়, সিল্কের সাড়ীও দেয়, অন্ততঃ দেড়শো মেয়েও খায়। কি বেশীটে হয়েছে বুঝলুম না। প্রভেদটা কেবল বেহায়ে থাকা, এই তো?

বিনোদ। তাতো সব বুঝেছি মাণিক। ও কথা বলাও চলে না, বলে ফলও নেই—থাকে তো উলটো ফলই আছে।

মাণিকের সব কথা শেষ হয়নি, সে উত্তেজিতভাবেই বললে—

"সত্য কথাটা 'জেলসি'—আমরা থাকতে তাঁবেদারের আস্পর্দ্ধা সইব নাকি? তা হলে আর বড় হলুম কিসে? কিন্তু তাঁদের আঠা খুড়োরা মেয়ের বিয়েতে যখন শতাধিক বরযাত্রীদের সপ্তাহ ধরে লাড্ডু পুরী পেঁড়া খাওয়ায়, দিনরাত বাজনা আর বাঈ চলে—পাড়ার কাক পক্ষী তিষ্ঠুতে পারে না, সেটা বুঝি কিছু নয়? তখন সেটা 'প্রথামত।' অন্যদের প্রথা থাকতে নেই, পালনও করতে নেই। রামের বেলা কথা নেই—শ্যামের ঘাড় ভাঙা চাই।"

বিনোদ। অতো উত্তেজিত হচ্ছ কেনো। এর "প্যাথাটিক্" সাইডও রয়েছে যে। বিভীষণেরাও যে আছেন, তার সঙ্গে তাদের চাকরি বজায়, উন্নতি, বাড়ীর বেকারদের ব্যবস্থা, সব তো রয়েছে। আবার সংস্কৃত অক্ষরে দেখাও যে পড়া হয়েছে—"স্বকার্যম উদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞ" —তাঁরা তো অজ্ঞ নন্। বেচারাদের কার্য্যোদ্ধারের ঐ একটী অর্থাৎ মণিবের মন বুঝে—অন্যের ছিদ্রান্বেষণ। স্বজাতির অনিষ্ট চিন্তা—

মাণিক। স্বজাতি কি মশাই? বাঙালী কবে আবার কার স্বজাতি হল। যাক্, আপনি পাপ কথা থামিয়ে দিয়ে ভালই করলেন। মাকে ধরে আছেন সেইটা ঠিক রাখবেন, কোন চিন্তা নেই—ভাববেন না।

বিনোদ। নিজের সুবিধা আর জামায়ের চাকরির জন্য এসব বাপে করবে না তো কে করবে?

মাণিক। বলেন কি মশাই? অন্যের অন্ন মেরে?

বিনোদ। ওর মধ্যে অন্যরূপ আনছো কেনো—অন্য—অন্যই, নিজের চেয়ে তো তারা আপনার নয়—বড় নয়—

মাণিক। অন্যেরো যে প্রতিপাল্য আছে, আমাদের চাকরি তো কেবল নিজের জন্য নয়। কত জনের যে অন্ন মারা হয়। এত বড় পাপ—

বিনোদ। পাপ কথাটা সাময় ভুলে যাও। কখনো মাছ মারনি বুঝি? লম্বা সুতো ছেড়ে খেলিয়ে তুলতে দেখনি? ভগবানও long rope রাখেন, বেদার সুতো ছাড়েন—টেনে তোলেন না। মাছ তো হাতে আছেই, এক সময় হাতে আসবেই। তাঁর কাজ কে বুঝবে? সে বুঝতেও চাই না। ভাবছি—কালই রওনা হব? তারপর মা আছেন···

মাণিক। তবে আর কি? আমি আপনার মুখ থেকে কথাটিই শুনতে চাইছিলুম। ওর ওপর আর কথা নেই—থাকে তো সে সব বাজে। আমাদের সেই ভাঙা ঘরে চাঁদের আলোই ভালো। সেখানে রত্নিল সিংহাসন পাতাই আছে—নিম্ন মধ্যবিত্তদের বাজে কথাই বাঁচিয়ে রাখে, —চলুন। আগে বুঝতুম না, আপনিই বুঝিয়ে দিয়েছেন। আপনিও আর ভাববেন না। বড়দের "পারলিয়ামেন্টরি টক্", আনড়ার চেয়েও টক্ হয়ে গেছে। কেবল পরচর্চা আর পরের অনিষ্ট চিন্তায় বাহাদুরি।—চলুন মশাই—শুভস্য শীঘ্রম্—

বিনোদ। না আমি আর ভাবছি না মাণিক। ভাবছি—ও 'হার' ছড়াটা এলো কোথা থেকে, আর তার পরিণাম।

মাণিক। পরিণাম আবার কি মশাই? ফেলে দিতে হবে নাকি? এ সব ক্ষেত্রে উপহার বলে উপদ্রব থাকেই। যুধিষ্ঠির নিজের মনোমত গড়া জিনিস উপহার দিয়েছে। একথা কোথাও প্রকাশ করতে নিষেধও করেছে। মায়ের বড় পছন্দ হয়েছে, ও রাখতেই হবে হজুর—

"কি করে?"

"সে আমি ভেবে নিয়েছি মশাই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বিনোদ নীরব। বউমা চা দিয়ে গেল, বলে গেল—"স্নানের জল প্রস্তুত।"

"এ ছোকরার নাড়ীজ্ঞান দেখে অবাক হয়েছি"—বলে' বিনোদ হাসলেন।

মাণিক তাঁর হাসির অপেক্ষাই করছিল। বললে—অনেকদিন কিছু শোনা হয়নি। আপনার সে সব কথা কোথায় গেল? যাকে বলতেন "মধ্যবিত্তের সোনার কাটি সঞ্জীবনী সুধা—তার ক্ষুধা যে আমাকে পেয়ে বসেছে।"

উভয়ে হাসলেন।

বিনোদ। সত্যি মাণিক, তার চেয়ে আর ভালো কিছু নেই। কিন্তু নিজের জাত সম্বন্ধে বড় হতাশ হয়ে পড়ছি। বাংলার দুর্দিনই কেবল চোখে পড়ছে। কিছুদিন পূর্ব্বের আমরা সেই বাঙালী তো—যারা একদিন গেয়েছিল "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে" ইত্যাদি। তখন দেশ আর জাতিই ছিল তাদের সব। দেশ মানে অনেকেই হিন্দুস্থানই ভাবতো। কতটা ভালবাসার টানে সেটা হয়েছিল। সেটা ভাববার কথা। যাক্ আজ কেবল চাকরি নিয়ে কথাটাই—মনে আসছে অল্পদিন মধ্যেই সেই স্বদেশ বলে—মূল্যবান কথাটিকে "প্রদেশ" বলে কথাটি এসে, কত বড় আগ্রহে ও প্রেমে গ্রাস করে' ফেলেছে! মন্দ বলছি না, যদি না তাতে বিভিন্ন "প্রদেশ" বলে স্বাতন্ত্র্য এনে এক হবার "দেশ বুদ্ধিটিকে" নষ্ট করা হোতো। লোভে পাপ বেড়েই থাকে—স্বাভাবিক সেটা। তার ফলও সকলে জানেন, কিন্তু সামলাতে পারেন না। যাক্ সে কথা। আমার কথা বাঙালী নিয়ে। পূর্ব্বে বাঙালীরাই সকল দেশের (প্রদেশ বলছি না, তখন তা ছিলও না) সকল আপিসেই কাজ করতেন, প্রধানও ছিলেন, তাঁদের সংখ্যাধিক্যও ছিল। পরে স্থানে স্থানে স্কুল কলেজ বাড়ায় সেখানকার (children of the soil) যোগ্য হয়ে আপিসে ঢুকেছে। সেই অনুপাতে বাঙালীও কমছে। তাতে আক্ষেপের কিছু নেই, বরং সেইটাই উচিত ও দেশ-ভক্তদের আনন্দের কথা। বেহারে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে,

পাঞ্জাবে এখনো পূর্ব্ব সংস্রবে আপিসে কয়েক জন করে বাঙালীও আছেন এবং উচ্চস্থান অধিকার করেও আছেন —সময় হলেই যাবেন। কিন্তু নূতন লোকের যখন দরকার হয়, সকলেই নিজের নিজের জাত ঢোকাবার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াস পেয়ে থাকেন—সেটা অস্বাভাবিকও নয়। কেবল লক্ষ্য করবার কথা টা এই, তাতে মুসলমান, পাঞ্জাবী, মাদ্রাসীর স্থানও আছে, নাই কেবল বাঙালীর! যোগ্য লোক না পেলে সুযোগ্য বাঙালী যুবক কেউ উপস্থিত হলে, সে আপিসে এখনো কেউ বাঙালী বড়বাবু থাকলে, তিনিও ইতরের মত খিঁচিয়ে ওঠেন—বলেন এখানে কেনো—তোমাকে কে আসতে বলেছে—আমার চাকরি খেতে এসেছ! এখনি চলে যাও বলছি—ইত্যাদি।

যুবকটি যদি বলে—"বিদেশে বড় কষ্টে পড়েছি মশাই, চাকরি হওয়াহয়ি আমার ভাগ্যের কথা। আপনি দয়া করে' না হয় আমার দরখাস্তখানা আর পাঁচ জনের সঙ্গে কেবল পেস্ করে' দিন না। আমি বাঙালী, আপনি না দয়া করলে আর কে করবে বলুন।"

শুনে বাঙালী বড়বাবু অগ্নি শর্ম্মা হয়ে বলেন—" "বিরক্ত কর না—যাও বলছি।"—গরজ বড় বালাই, তবুও সে বলে "স্থানীয় যোগ্য Candidate যখন নাই, আপনি একটু বললেই হতে পারে। অন্য সব জাতই তো নিজের জাতের জন্যে চেষ্টা পাচ্ছে, আপনি বাঙালী—গরীবের দরখাস্তখানা দিন দয়া করে।

বাঙালী বড়বাবু অস্থিষ্ণু ভাবে—"যাবে না? দেখবে, —'চাপরাসী' বলে জোর হাঁক দেন!"

"যাচ্ছি মশাই, আপনার চাকরি বজায় থাকুক—দোহাই ও দরখাস্ত আর করবেন না।" বেচারা বিমর্ষ মুখে প্রস্থান করে। এই অবস্থা। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বদেশী যুগে এই বাঙালীর মুখ থেকেই moral courage কথাটি যখন তখন কানে আসতো। বোধ করি এ তারই reaction with vengance আত্মসম্মানবোধের সুদে আসলে খাস-রোধ! একেই বলে গোবেবি চাল, সে লাভ সুসুদ্ধুর পার হয়ে এসেছে—মন্ত্রী ছাড়লেই মাৎ।

"তার জন্যেও ক্ষোভ নেই, ক্ষোভ ওই চাকরির লোভ যা আত্মসম্মানকে আত্মসাৎ করেছে—মনুষ্যত্ব রাখছে না, ভবিষ্যৎও থাকছে না। চাকরি করা আর চলবে না মাণিক।"

মাণিক। আবার যে কাজের কথা আনলেন। আমার দরখাস্ত ছিল—বাজে কথার যে।

বিনোদ। (সহাস্যে) ভুলে গেছি। যেখানকার যা, সে আমাদের স্কুলের ভবনে না গুলে আসবেনা। তবে আজ থাক, কালই বেরিয়ে পড়ি চলো। O/Cর ভাবটা দেখি—

"যে আজ্ঞে, আমি পা বাড়িয়েই আছি।"

"সেই ভালো, বাজে কথা এখানে জমবে না।"

বটুয়া এসে বললে—"নাইবার জল দিয়েছি বাবু।"

উভয়ে নাইতে উঠলেন।

শ্রাবণে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

সজল আকাশ বেদনা গভীর
　　ঝর ঝর ঝরে জল;
বিরহের ধারা পরাণ ব্যাপিয়া
　　ধারা মত টলমল।
কে যেন কাহারে চাহিয়া আকুল,
কোথা যেন কার হয়ে গেছে ভুল;
দুখে তার ওই ঝরে বীণ সুর
　　বাঁধারে বিষাদ।

বাদরা এসেছে বিপুল বরণে
　　কালো ছায়া মেখে মেখে,
হারানো প্রিয়ার দুটী কালো আঁখি,
　　স্মরণে উঠিছে জেগে।
বরষার রূপে এ নয়ন ধারা
আজি ভরে করে হলো যেন সারা;
হৃদয় আজি কে সদা ফুলহারা
　　বিরহের বাঁশী-রেশে।

বিন্দুর ছেলে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

পারিবারিক স্নেহধারা স্বাভাবিক ও চিরনির্দিষ্টপথে প্রবাহিত না হইয়া ভিন্ন পরিখাতে প্রবাহিত হইলেই যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে পারিবারিক জীবনে যে বিপর্য্যয় ঘটে, তাহা লইয়া শরৎচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসিকা আছে। বিন্দুর ছেলে তাহাদের মধ্যে একখানি। বিন্দুর সন্তান হয় নাই। সে অম্বিকা ও অভিমানের তুঙ্গ শৈলের অন্তরালে অফুরন্ত মাতৃস্নেহের উৎসধারা লইয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল। সে তাহার বড়জায়ের সন্তান অমূল্যধনকে অবলম্বন করিয়া বাৎসল্যের তৃষ্ণ মিটাইতে চাহিল, তাহাতে পারিবারিক জীবনে বিপর্য্যয় কেন ঘটিবে? বিপর্য্যয় যাহাতে ঘটে লেখক তাহার আনুষঙ্গিক আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বিন্দুর সন্তানস্নেহ এত বেশি প্রবল করিয়া দেখাইয়াছেন যে বিন্দু স্বপোষ্যকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং অমূল্যর গর্ভধারিণী সেখানে দুষ্টা নারীর পর্য্যায়ে পড়িয়া গিয়াছে। বিন্দুর স্নেহাতিশয্য কতকটা স্বাভাবিক, কতকটা তাহার নিজেরই স্বভাবজ। এইরূপ স্নেহাতিশয্য যে অনেকটা স্বাভাবিক তাহা বুঝাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবিত ও মৃত গল্পের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

"পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো-বেশি (অর্থাৎ মায়ের চেয়েও বেশি) হয়। কারণ, তাহার উপরে অধিকার থাকে না, তাহার উপর কোন সামাজিক দাবি নাই, কেবল স্নেহের দাবি। কিন্তু কেবলমাত্র স্নেহ সমাজের মনকে ভাসাবার দাবি কোন দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না। কেবল অনিশ্চিত প্রাণের মনটিকে বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালবাসে।"

বিন্দুর স্নেহাতিশয্যই মানবের ক্ষুদ্র সংসারে একটা বিপর্য্যয় ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দুইভাইএর পরিবারে যে কোন একটি বধূ বাহির হইতে আসিয়া বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারিত সত্য, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অমূল্যধনই সবাসরা বধূ বিন্দুর ছদয় জয় করিয়া সে পথরোধ করিয়া রেখেছিল। শরৎচন্দ্র তৃতীয় একটি ব্যক্তির সহায়তা লইয়াছেন। এই তৃতীয় ব্যক্তি স্বয়ং পরোক্ষ জীব নয়। বিন্দুর মধ্যেই তিনি দুইটি নারীর একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। বিন্দুর দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বই তাহার প্রথম ব্যক্তিত্বের স্নেহাতিশয্যকে অবলম্বন করিয়া একটা বিপ্লব ঘটাইতেছে। এই বিপ্লবই এই উপন্যাসিকাখানির উপজীব্য।

বিন্দুর দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় এই—বিন্দু ধনাঢ্য অম্বিকাচরণের একমাত্র সন্ততি—অসাবারণ রূপসী। রূপ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ সে সঙ্গে আনিয়াছিল। "ছোটবৌ যে ওজনে রূপ ও টাকা আনিয়াছিল—তাহার চতুর্গুণ অহঙ্কার ও অভিমান সঙ্গে আনিয়াছিল।" মাধব গুরুজাতি পাশ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার এইরূপ বিবাহ সম্ভবপর হইয়াছিল। যাহাই হউক, বিন্দুর স্বামীও অযোগ্য নয়। স্বাস্থ্যসৌষ্ঠবও তাহার ছিল। অশিক্ষিতা ও বয়োলোকের আদুরে দুলালী বিন্দুর পক্ষে মাথা ঠিক রাখা কঠিন। সেজন্য বিন্দুর তেজ অসীম, মুখ কটুভাষী, মেজাজ রুক্ষ, কোনপ্রকার প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না, পরিবারের সকলের কাছে খাতির সে চায়। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র রঙের উপর রঙ চড়াইয়া বলিয়াছেন—তাহার মেজাজ গরম হইলে বা মনে কোন আঘাত লাগিলে তাহার আবার হিট হয়। কাজেই পরিবারের সকলেই সন্ত্রস্ত।

এইভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া শরৎচন্দ্র অন্নপূর্ণা, সন্তানবৎসলা উদারহৃদয়া বিন্দু ও কটুভাষিণী অভিমানিনী বিন্দু এই তিনটি নারীর মধ্যে অমূল্যধনকে অবলম্বন করিয়া একটা দ্বন্দ্বসংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা একটা Triangular action & reaction-এর রূপ ধরিয়াছে। এই সংঘর্ষের ফলে যে বৈচিত্র্যময় বিপর্য্যয় তাহাই হইয়াছে শরৎচন্দ্রের রসোপাদান। এই দ্বন্দ্বসংঘর্ষের অধিকাংশই বাচনিক। তুচ্ছ কথা লইয়া বাড়াবাড়ি রেষারেষি এবং মান অভিমানের পালা চলিয়াছে। ইহা এতই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার যে কথা-সাহিত্য ছাড়া অন্যত্র ইহার কোন মূল্য নাই। উপাদান বা উপজীব্য যাহাই হউক, শরৎচন্দ্রের অপূর্ব রচনাগুণে ইহা অপূর্ব রস সৃষ্টি করিয়াছে।

পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা অর্দ্ধশিক্ষিতা নারীদের রেষারেষি, রসকলহ ও মান অভিমানের ব্যাপার, সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি নাগরিক পাঠকপাঠিকার হাস্যোদ্রেকই করিবে। কিন্তু যাঁহারা রস কাহাকে বলে বুঝেন, তাঁহারা স্থান-কাল-পাত্রপাত্রীর কথা বিস্মৃত হইয়া ইহাতে রসের সার্বজনীন আস্বাদটুকু উপভোগ করিতে পারিবেন।

বিন্দুর ছেলে সাধারণ ছোট গল্প নয় বটে, পুরাপুরি উপন্যাসও নয়। সেজন্য শরৎচন্দ্র বিন্দুর চরিত্রের ক্রমবিকাশ দেখাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। চরিত্রের পরিচয় দিয়া প্রথম পরিচ্ছেদেই বিন্দুকে একেবারে উগ্রমূর্ত্তিতে রায়াকরে অমূল্যর ছদয়ের সিংহাসনে খাড়া করিয়াছেন।

অমূল্য ঠিক সময়মত দুধ পায় নাই ইহাতেই বিন্দুর অসহ্য অধীরতা—ইহাতেই বিন্দুর স্নেহাতিশয্যের অভিব্যক্তি আরম্ভ হইয়াছে। তারপর অমূল্য পাছে কোন দৈহিক আঘাত পায় এজন্য বিন্দুর উৎকণ্ঠা অন্নপূর্ণার চেয়ে ঢের বেশি, পরের ছেলের সঙ্গে তাহার তুলনা সে সহ্য করিতে পারে না, কিশোর বয়স পর্য্যন্ত সন্তানের অঙ্গস্পর্শ নাম স্নেহার্দ্রির একটি লক্ষণ, ভদ্রলোকের ছেলে যে ভাবে প্রতিপালিত হয় বিন্দু অমূল্যকে সেই ভাবে প্রতিপালন করে, তাহার আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদের জন্য সে এতই ব্যস্ত হয়ে, যে অন্নপূর্ণা অবাক হইয়া যায়। অমূল্যর জন্য সে স্বামীর সঙ্গেও কলহ করে, অমূল্যর গর্ভধারিণীর অধিকারও সে সজোরে হরণ করে। অমূল্য তাহার প্রাণাধিক, তবু সে অভিমানে আত্মহারা হইয়া অমূল্যকে মাঝে মাঝে লাঞ্ছিত করিয়া নিজেরই চরম নিগ্রহ সাধন করে। এইরূপ স্নেহাতিশয্যে

অমূল্যর ইহ-পরকাল নষ্ট হইবার কথা, কিন্তু বিন্দুর মাতৃস্নেহ একেবারে মুক্ত ও অন্ধপ্রকৃতির নয়। অমূল্যর সর্বাঙ্গীণ ভবিষ্যৎ কল্যাণই সে কামনা করিত, তাহার সংকল্প ছিল অমূল্যকে দশের মধ্যে একজন করিয়া তুলিতে হইবে। অমূল্য মণিবাবুর কৃতবিদ্য হইয়া উঠিবে—তাহার মা হওয়ার গৌরবই তাহার জীবনের লক্ষ্য। অমূল্যর সম্বন্ধে সে উচ্চ আশা পোষণ করে—সে বলে—"ও আমার যদি কোন দিন মা পড়ে তবে আমি পাগল হ'য়ে যাব।" বিন্দু অমূল্যর প্রকৃত কল্যাণ চায় বলিয়াই তাহার পারিবারিক জীবনে বিপ্লব ঘটিয়াছিল। অমূল্যর কল্যাণের জন্যই সে রমলা সংঘর্ষ করিতে না পারিয়া তাহার গর্ভধারিণীর স্নেহ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের কর্মফলের মাসীমার স্নেহাতিশয্যের সহিত বিন্দুর স্নেহাতিশয্যের পার্থক্য এইখানে। কর্মফলের বন্ধ্যা মাসীমা তাঁহার অন্তরের নিরাশ্রয় মাতৃমমতার একটি অবলম্বন পাইয়াছিল তাহার ভগিনীপুত্রে। এই ভগিনীপুত্র সন্তানের সামরিক অনুকল্প মাত্র। সে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া তাহার স্নেহের প্রকাশ করিত। যেমনই প্রৌঢ় বয়সে তাহার অঙ্কে একটি সন্তানের আবির্ভাব হইল—অনুকল্প (Substitute) তখন চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। বিন্দুচরিত্র শরৎচন্দ্র এমনভাবে পরিকল্পিত করিয়াছেন যে তাহাতে মনে হয়—তাহার অঙ্কে সন্তানের আবির্ভাব হইলেও অমূল্য অমূল্যই থাকিত—স্নেহপুত্রের মূল্য সে হারাইত না। বিন্দু যেন রামের সুমতির নারায়ণী ও 'মেজদিদি' হেমাঙ্গিনীর সহোদরা।

রামের সুমতিতে বিমলার আবির্ভাব যেমন অভিনব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া একটি ছোট গল্পকে উপন্যাসিকায় পরিণত করিয়াছে, বিন্দুর ছেলেতে এলোকেশী তাহার বারো-আনা-চার-আনা-চুলচেরা টেরিকাটা পুত্র নরেনকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তেমনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া গল্পটিকে অনেকটুকু আগাইয়া দিয়াছে। ইহাদের আসার আগে পর্যন্ত যে দুইভাবে ঘটনাস্রোত চলিতেছিল—তাহাকে ঘটনাস্রোতই বলা যাইতে পারে—উহা সম্পূর্ণ বাহ্যিক। উহার আলো রচনাপুঞ্জ ভেদ করিয়া অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছায় নাই। এই বাহ্যিক ঘন নিরবচ্ছিন্ন হৃদয়-মাধুর্য্যের প্রবাহে কেবল বুদ্বুদ মাত্র।

এলোকেশী-নরেনের আবির্ভাবের পর হইতে মাধুর্য্যের ধারাটিতে আবিলতার সঞ্চার হইতে থাকে। তারপর একদিন লবণা হলাহল উদ্গিরণ হইল। সেই হলাহল এলোকেশী নরেনকে স্পর্শও করিল না। ইহারা Catalytic agent এর কাজ করিয়া যায়। সেই হলাহলে সবচেয়ে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিল বিন্দু। পরিবারের বাকি চারিজন পরিজনও সে বিষ-জ্বালার অংশ লাভ করিল।

এই বিষও অন্তর হইতে উদ্গত হয় নাই। ইহার জন্মও ঘরে ঘরে—রসনায়। কাজেই ইহা সাময়িক জ্বালার সঞ্চার করিয়া যেমনভাবে শেষ পর্য্যন্ত বিলীন হইল। তাই শেষ পর্য্যন্ত পরিবারটির মধ্যে শান্তি ফিরিয়া আসিল। যেখানে অন্তরে বিরোধ নাই—সেখানে বাহ্যিক বিরোধ হৃদয়ধারাকে ক্ষণকালের জন্য আবিল করিলেও ঘাতে শরঘাতের নদীধারার মত তাহা আবার নির্মল হইয়া যায়। রোষ অভিমান ইত্যাদি সহজ মানুষকে কিছুকালের জন্য অপ্রকৃতিস্থ করে। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার কটুকথা, রোষ অভিমান ইত্যাদিই অভিব্যক্তি, হৃদয়ের অন্তস্তলের অভিব্যক্তি নয়—প্রকৃতিস্থ অবস্থা ফিরিয়া আসিলেই ঐ অভিব্যক্তি সে মানুষকে লজ্জাই দেয়, অনুশোচনার সৃষ্টি করে। শরৎচন্দ্র এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। তবু বিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত বাকী ছিল। সে কেবল নিজের কথাই ভাবিত, তাহার মিতভাষী বীর পাশ্বটির মনে যে যাদব ও অন্নপূর্ণার চরণে বিকাইয়া আছে তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করে নাই। সে অভিমান, অহমিকা ও অন্ধ মাতৃমমতার মোহজালের ফাঁকে ফাঁকে যাদব ও অন্নপূর্ণার মহত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরিবারের অন্তর্পুরুষ জীবন-সত্যটিকে হৃদয়ঙ্গম করে নাই। তাই তাঁহার নিদারুণ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

তাহা ছাড়া, সে রূপ, যৌবন, অর্থ ও লক্ষ্মীশ্রী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু মাতৃজীবনের তপস্যার বল সঙ্গে আনে নাই। সে অতি অনায়াসে অমূল্যকে অঙ্কে পাইয়াছিল। শুদ্ধমাতৃ রূপে বিন্দু, বিন্দু বিন্দু করিয়া বুকের শোণিত দান করে নাই। অমূল্যকে লাভ করিবার জন্য সে কোন তপস্যাই করে নাই। অতি সহজেই সে মা হইয়াছিল, কিন্তু মা হওয়ার কোন দুঃখই সে স্বীকার করে নাই। সেই তপস্যা, সেই দুঃখ-স্বীকার তাহার বাকি ছিল। সামান্য বাহ্যিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত বিন্দুকে দিয়া তাহাই করাইয়াছেন।

মায়ের মত দুঃখিনী এ সংসারে কে আছে? সন্তান মাতৃহৃদয়কে যে ধূলায় লুটাইয়া যায়। মা হইতে ছেলে কি মান-অভিমান, ঔদ্ধত্য-অহমিকা চলে? বিন্দু মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিতেছিল। শরৎচন্দ্র তাহাকে দুঃখ বেদনায় দহন করিয়া প্রকৃত মা করিয়া তুলিয়াছেন।

অন্নপূর্ণা দুঃখীর কন্যা—সমস্ত জীবন দুঃখকষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। যাদবকে তিনি জননীর স্নেহে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন! যাদবের উপর তাঁহার অফুরন্ত অধিকার ছিল—সে অধিকার তাহার পত্নীর উপর তিনি খাটি করিতেন। বিন্দুর অহমিকা তাঁহার অসহই হইত, কিন্তু বৈমাতুর অমূল্যধন দুইজনের মধ্যে এমন বাঁধন বাঁধিয়া দিল যেবিন্দুর সকল উপদ্রবই তাঁহার সহনীয় হইয়া উঠিল। যতদিন পর্য্যন্ত সে বিন্দুর সকল উপদ্রবই সহিয়া চলিত। কিন্তু সে সাধারণ দুঃখ ঘরের বধূ। কোন কিছুর অতিশয্য তাহার অশোভন মনে হইত। তাই সে মাঝে মাঝে বিন্দুর আচরণে রোষ করিত। তাহা ছাড়া, বিন্দুর মত বাক্‌সংযমী মেয়েদের সঙ্গে সব সময়ে ঠিক তাল রাখিয়া সে চলিতে পারিত না, কখনও প্রতিবাদ করিত, কখনও আবোল-তাবোল বলিয়া ফেলিত, যাহা বলা উচিত নয় এমন কথাও দুই একটা বলিয়া ফেলিত।

সে সোজা মানুষ, সোজা পথে চলিত, ঘুরপেঁচ বুঝিত না। এলোকেশী ও নরেনের আচরণের মধ্যে বিদ্বেষতা আছে—তাহাও সে বুঝিত না, সন্তানের ভবিষ্যৎ কল্যাণ কিসে তাহাও সে বুঝিত না। সে ভাবিত, আর পাঁচজনের ছেলে যেমন করিয়া মানুষ হয় তাহার ছেলেও তেমনি

করিয়াই মানুষ হইবে। অন্নপূর্ণার তুলনায় বিন্দুর রূপ অনেকটা মার্জ্জিত ও মূল্যবান্।

অভিমানের আঘাত বার বার সহ্য করিতে করিতে বিরক্তিমাখা অন্নপূর্ণার অন্তরেও অভিমান জাগিয়া উঠিল। অন্নের যেমন একটা অভিমান আছে—দারিদ্র্যেরও তেমনি একটা অভিমান আছে। এই দারিদ্র্যের অভিমান চরমতম দুঃখ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু অন্নের কাছে অবনত হয় না। অন্নপূর্ণা চরমতম দুঃখ স্বীকার করিতেই প্রস্তুত হইল। অন্নকুণ্ঠিত অবস্থায় দুইজনের মধ্যে যাহাই হউক, অন্নপূর্ণা বিন্দুর হৃদয়ের মর্ম্মস্থলের সংবাদ রাখিত, বিন্দুকে সত্যই ভালবাসিত এবং অভিমানের দ্বারা তাহার স্নেহের মহাপ্রাণতাও নষ্ট হয় নাই। তাই সে শেষ পর্য্যন্ত সকল অপমান ভুলিয়া বিন্দুকে বুকে টানিয়া লইল। অবশ্য এজন্য শরৎচন্দ্রের আয়োজন মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে—বিন্দুকে মৃত্যুশয্যায় টানিয়া আনিয়াছেন। (শরৎচন্দ্রের অনেক রচনাতেই পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধের মধ্যে মাত্রা-সাম্য ও ভার-সাম্য নাই।) বিনা বিচ্ছেদে একজন অন্যজনের মূল্যমর্য্যাদা—সম্যক্ উপলব্ধি করে না। বিচ্ছেদের অবলালোকেই অন্নপূর্ণা ও বিন্দু দুজন দুজনকে ভাল করিয়া চিনিল।

শরৎচন্দ্র বিন্দুচরিত্র ফুটাইয়াছেন বহুভাবের দ্বারা, আর মাধব চরিত্র ফুটাইয়াছেন বিভাবে। মাধবের কাছে ও অন্নপূর্ণার কাছে মাধব যে কত ধনী তাহা বুঝাইবার জন্য একবার মাত্র মাধব বিন্দুর কাছে অনেকগুলি কথা বলিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলি যেমন প্রখর, তেমনি সুন্দর। পুরুষ চরিত্রগুলি ঠিক বিপরীত। অনেকটা সাংখ্যের পুরুষ। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসিকায় দেখাইতে চাহিয়াছেন—অন্তঃপুরের নারীগণ যাহা লইয়া ঘরকন্নাই করে তাহা যে কত তুচ্ছ কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা আমাদের শিক্ষিত পুরুষগণ যেন বুঝেন। তাহা ছাড়া, যাহার পক্ষে আর্থিক লাভালাভের কোন সংস্পর্শ নাই তাহা লইয়া উপার্জ্জনক্ষম পুরুষরা আদৌ মাথা ঘামায় না। কখনও হাসিয়া, কখনও এক আধটি কথা বলিয়া তাহারা বালকবালিকাদের কথায় মত স্ত্রীলোকদের কথাও উড়াইয়া দেয়। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত অন্তঃপুরের মর্ম্মস্পর্শী তাহাদিগকেও স্পর্শ করে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তখন পুরুষদের সমাধ হইয়া উঠিতে হয়। সেই পুরুষগণ আপন স্ত্রীর বিষাদই নতশিরে বহিয়া লয়। তাহারা ভাবে আর সকলকে ত্যাগ করা যায়, স্ত্রীকে ত ত্যাগ করা যায় না। আর সকল-চিন্তা পুরুষগণ ভাগাভাগি বিচার করিয়া একটা সুসঙ্গত ব্যবস্থা করে। অন্নপূর্ণা-বিন্দুর মত মেয়েমানুষ মাধবকেও স্পর্শ করিল। অন্নপূর্ণা যখন মাধবের কোন দান গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না, তখন মাধবের ক্ষোভের আর অবধি রহিল না, স্ত্রীর প্রতি তাহার অভিমান হইল অত্যন্ত দারুণ। কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া একটা তুমুল কাণ্ড বাধানো বা লোক হাসানো, একটা ব্যাপার ঘটানো মাধবের-চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি নয়। সে মনে মনে স্ত্রীকে একরূপ প্রেমলোক হইতে দূরে সরাইয়া দিল। মাধবের ক্ষোভ ও অভিমান কেমন বিভক্তভাবে লেখক ফুটাইয়াছেন—তাহা বেশ শিল্পীরই নিদর্শন। মাধবের ক্ষোভ অভিমান এমনই পুরুষোচিত এবং সুসঙ্গত যে বিন্দুরও তাহা উপলব্ধি করিতে বেশ বিলম্ব ঘটিয়াছে। মাধব অবশ্য ইহাও জানিত—এ বিচ্ছেদ টিকিবে না। বিন্দুর হৃদয়বত্তার প্রতি তাহার প্রত্যয় ছিল। সে জানিত, অন্নপূর্ণাই সব মিটাইয়া দিবে। সে নীরবে পুনর্মিলনের মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ভাশুরের সহিত ভ্রাতৃবধূর স্নেহমধুর সম্পর্কের কথা আমাদের দেশের সাহিত্যে কোথাও নাই। বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম। আমাদের সমাজে ভাশুর ভ্রাতৃবধূর মধ্যে বাক্যালাপও নাই—দেখাসাক্ষাৎও নাই। অন্ততঃ শরৎচন্দ্রের পশ্চিম বাঙ্গালার হিন্দু পরিবারে তাহা ছিল না। কাজেই এ সম্পর্কটি সাহিত্যেও স্থান পায় নাই। দেখাসাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ না থাকিলেও ভ্রাতৃবধূ সেবাপরিচর্য্যা অভিপ্রসঙ্গ নিত্যই ভাশুরের কাছে পৌঁছায় এবং ভাশুরের স্নেহও ধানাভাবে ভ্রাতৃবধূ অন্তঃপুরের অন্তরালে থাকিয়াও অনুভব করে। কাজেই উভয়ের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক আমাদের পারিবারিক জীবনে পরোক্ষভাবে বর্ত্তমান আছে। সাহিত্যে ইহা শরৎচন্দ্রের প্রথম আবিষ্কার। ইহাকে শরৎচন্দ্র সুপ্রকট করিয়া তুলিবার জন্য অবশ্য একটু বেশিমাত্রায় emphasis দিয়াছেন।

মাধব দরিদ্র ছিলেন, ভাইকে বি-এল পাশ করাইয়া মোটা করিয়া পণ আদায় করিবার একমাত্র সঙ্গতি অসামান্যা রূপসী বিন্দুর সঙ্গে ভাইএর বিবাহ দিয়াছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত সংসারের প্রতি না তাকাইয়া তিনি মাধবের কল্যাণের দিকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, মোটরেরা অসন্তুষ্টা। মোটরেরা বিন্দু তাঁহার কন্যার স্থান অধিকার করিয়াছিল—কেবল কন্যা নয়, জননী ও কন্যা যেন একাধারে। তাহার কোন দোষ ত্রুটী তিনি স্বীকার করিতেন না। বিন্দু ও মাধবের চরিত্র-মহত্ত্ব ও স্নেহাতিশয্যের মর্য্যাদা স্বীকার করিত। দুই জায়ে যে দ্বন্দ্ব কলহ হইত তাহা মাধবের কানে যাইত; কিন্তু তাহা অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। বিন্দু যে তাঁহাকে কোন বিশিষ্ট গুণের দ্বারা বশীভূত করিয়াছিল তাহা মনে হয় না। প্রাণাধিক ভ্রাতা মাধবের সে পত্নী—ইহাই তাঁহার স্নেহাতিশয্যের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি যাহাকে সন্তান করিয়া বাহির করিয়া ঘরে আনিয়াছেন সে যে অসামান্যা, এইরূপ একটা আত্মগৌরবও তাঁহার মনে ছিল।

তাহাছাড়া, অসঙ্কুচিত মন লইয়া মাধবের কন্যা তাঁহার অতি সাধারণ ঘরে আসিয়াছে—স্নেহাতিশয্যের পক্ষে ইহাও কারণ। অনুন্যের প্রতি স্নেহার্দ্র বিন্দুকে একান্তরূপে গুণবতী করিয়াও তুলিল। মাধব উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছে, আর এমন লক্ষ্মী প্রতিমা ঘরে আসিয়াছে; মাধব তাই নিশ্চিন্ত হইয়া আফিস যাইতেন আর গুড়গুড়ি টানিতেন। মাধবের উপার্জ্জন বাড়িতেছিল। মাধবের মনে ধারণা হইল—ঐ লক্ষ্মী প্রতিমা ঘরে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সংসারে শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হইয়াছে। ইহাও মাধবের স্নেহাতিশয্যের কারণ।

কিন্তু এই মাধবকেও আঘাত পাইতে হইল। বিন্দু অন্নপূর্ণাকে স্নেহের ছলে এমন কথা শুনাইল যাহাতে অন্নপূর্ণা ছেলের বিয়ে দিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—বিন্দুর বা বিন্দুর বাপীর অর্থ গ্রহণ করিবে না। মাধব

বিন্দুর অপ্রকৃতিস্থ মুহূর্তের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু অন্নপূর্ণার মৃত সংজ্ঞাকে উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। কাজেই যাদবকে তড়বড়ি বাড়িয়া উষারাণের জন্য বৃদ্ধ বয়সে ১২ টাকা মাহিনায় চাকরি স্বীকার করিতে হইল। বিন্দুকে অপরাধিনী মনে না করিয়া তিনি বোধ হয় নিজের অদৃষ্টকেই দায়ী করিলেন। তবে বিন্দুর হৃদয়ের অভিজাত-কণাগুলির উদারতা ও মহত্বের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা হারান নাই। তাহা ছাড়া, তিনি যাদবকে ভালো করিয়াই চিনিতেন। তাই তিনিও মাধবের মত ধীরে সুস্থিরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বিন্দুর উদ্ধত অভিমান তাহার নিজের আলাযন্ত্রণা যেমন বাড়াইতেছিল পুনর্মিলনে তেমনি বিলম্ব ঘটাইতেছিল। অন্তরই অপেক্ষা বিন্দুর নিজেরই যাদবের দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল। অন্নপূর্ণার জন্য প্রয়োজন হইতে পারে, যাদবের জন্য বিন্দুর জীবনে চরম মুহূর্ত সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে বিন্দুর কোন মানসিক পীড়া হয় নাই। অত্যধিক অভিমানই পীড়া, অত্যধিক অভিমানভরে তাহারা যারা করে বিন্দু তাহাই করিতেছিল। এইরূপ চরিত্র লক্ষ্য করিয়াই প্রবচন আছে —তাহাদের ত মচকাবে না। বিন্দু ঔষধপথ্য ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতে বসিয়াছিল। মাধবকে যে ভাবে মৌখিক উইলের কথা বলিয়াছিল, তাহাতে মাধব জীবনের আশা নাই ইহাই স্থির করিয়াছিল। জীবনের আশা নাই বলিবারও প্রয়োজন ছিল অন্নপূর্ণাকে আনিবার জন্য। যাদব অমূল্য অন্নপূর্ণা আসিবামাত্র বিন্দু হয় হইল—সংঘাতিক রোগ হইলে তাহা সম্ভব হইত না। যাহাই হউক, বিন্দুর স্নেহার্দ্র ও অভিমানিক লীলায়, মাধবের নিষ্ক্রিয়তায় ও মিতভাষণে ও যাদবের অন্ধ স্নেহাতিশয্যে একটু বেশি মাত্রায় Emphasis পড়িয়া Realistic রচনাকে Idealistic করিয়া তুলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত একমাত্র অন্নপূর্ণা চরিত্রই এই রচনায় বাস্তবতার স্নেহস্পর্শ।

---

* শ্রীমান বেবনারায়ণ গুপ্ত বিন্দুর ছেলেকে নাট্যরূপ দিয়াছেন। এই নাট্যরূপেই বিন্দুর ছেলের রসরূপ আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই নাট্যরূপকে বিন্দুর ছেলের ব্যাখ্যাবিবৃতিও বলা যাইতে পারে; কথাবস্তুর যেখানে যেখানে অবকাশ বা ফাঁক ছিল, নাট্যকার তাহা ভরিয়া দিয়াছেন। নাট্যকারের সংযোজন শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে একাত্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শরৎচন্দ্রের অপূর্ব রচনাভঙ্গীর মর্যাদা-হানি হয় নাই। তবে ইহাতে নাট্যকারকে অনেক স্থলে যাজনা হরণ করিতে হইয়াছে—রঙ্গমঞ্চকে অভিনয়োপযোগী করিতে হইলে ইহা অনিবার্য। অপরাপর চরিত্রগুলি মূল চরিত্রগুলির পরিপুষ্টির জন্যই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসিকায় অবতারিত হইয়াছিল। নাট্যকার নাটকের কলা-কৌশলের প্রয়োজনে সে চরিত্রগুলিরও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া অমূল্যর বাল্যচরিত্র ইহাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অমূল্য যাহাতে একটা গুণ্ডা না হইয়া পড়ে, সেদিকে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল—সেই উদ্দেশ্যেই অমূল্য চরিত্রের অবতারণা। নাট্যরূপে অমূল্য আরও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নাট্যরূপে কয়েকটি গান সংযোজিত হইয়াছে। সেগুলির মধ্যে যাদবের রচিত বাৎসল্যরসের গানটির সংযোজনায় প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর রসবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘণ্টাবার দুঃখের ঐ কথা-গুলিতেই সমগ্র রচনাটির প্রাণবস্তু নিহিত আছে। নাট্যোপযোগের দিক হইতে ঘণ্টাবার ও বিন্দুতে কোন তফাৎ নাই।

উদাসী

শ্রীকমল মৈত্র

কে তুমি উদাসী ফিরিছ একাকী
কাহারে ডাকি'
কাহার আশায় বাঁধিছে তোমার
চপল আঁখি।

খুঁজিছ যারে
পাও কি তারে
বাঁধিতে কভু
হৃদয়ে মাঝি'।

পথের মাঝেই নানান কাজে
লুকায়ে আছে,
আঁখির তারায় স্বপন ঘোরায়
জড়ায়ে লাজে।
তোমার গানে
নিবিড় টানে
চলিতে দানে
তোমারে ডাকি।
বৃথাই বুঝি ফিরিছ খুঁজি তাহারে ডাকি।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

৫

আমরা যখন প্রাসাদ ত্যাগ করিলাম তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্র তখন পশ্চিমে চলিয়াছে। রাজপথে জনসমাগম বিরল। বিপণীসমূহের লোকজন তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় শেষ করিয়া দোকান-পাট বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। আমাদের রথের শব্দ শুনিয়া, এই নিশীথ সময়ে কে যায় তাহা জানিবার জন্য, পথিপার্শ্বে বিপণীসমূহের অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বার হইতে ও গৃহসকলের গবাক্ষ হইতে কেহ কেহ আমাদিগের দিকে চাহিয়াছিল।

কতক্ষণে আমরা শিবিরে আসিয়াছিলাম ; পিতা সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—

"আর্য্য মহাস্থবির, কক্ষপের কথাগুলি উপলব্ধি করিতে পারিলেন কি ?"

—করিয়াছি তাত এবং তাহাই ভাবিতেছি।

—কি ভাবিতেছেন, আর্য্য ?

—ভাবিতেছি, অনেক কথা ; কিন্তু এখন পথে সে সকল কথার আলোচনার স্থান নহে এবং তাহার সুবিধাও হইবে না। কক্ষপের অনুচরের সমগ্র গন্ধারদেশ পরিব্যাপ্ত। মিথ্যা ও বিদ্বেষ-প্রসূত সংবাদ এই সকল চর কক্ষপ ও তাঁহার কর্ম্মচারীগণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থ ও বিদ্বেষ আমাদের জাতীয়তার, একপ্রাণতার ও ঔদার্য্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। আমরাই আপনাদিগের প্রতি যখন কর্ত্তব্যবিমুখ, তখন বিজাতীয় ও বিদেশী শাসক যে প্রজার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য ভুলিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? এখন আর্য্য সাম্রাজ্যের চারিদিকে শত্রু—মহত্ত্বার ক্রমে ঘন হইয়া যবনের সাম্রাজ্যকে ছাইয়া ফেলিতেছে। রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ও বিশ্বাস-ঘাতকতা। আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থকে সকলেই বড় করিয়া দেখিতেছে। শাসকবৃন্দ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ, দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া সন্ত্রস্ত ও ভীত। তাহারা বুঝিয়াছে যে এই প্রাচ্য যাবনিক সাম্রাজ্যে এখন জরা ও দুর্বিনীতা আসিয়া দেখা দিয়াছে।

—কিন্তু অত্যাচার ত কমে নাই—বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে—জনসাধারণকে উৎপীড়নে ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

—তাত, আপনি ভুলিতেছেন—এখন এইরূপ অবস্থাই স্বাভাবিক—দুর্ব্বলের হস্ত হইতে যখন শাসন দণ্ড স্খলিত হইবার উপক্রম হয় তখন প্রথম মুষ্টিতে দৃঢ় করিবার প্রয়াস মানবসমাজের ইতিহাসে একটা চিরন্তন সত্য।

—আর, আমরাও কত ক্ষুদ্র, কত নীচ, কত স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি। আজ এই যবন শাসনের দুর্দ্দিনেও আমরা আমাদের শাসক প্রভুদের দ্বারদ্বারে লেলেহিহা কুকুরের মত তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি এবং সুযোগ বুঝিয়া পদলেহন করিতেছি।

—ইহাও পরাধীনতার একটা অনিবার্য্য ফল। জাতীয়তার পরিধি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে—ব্যক্তিগত স্বার্থে পর্য্যবসিত হয়। ইহার অন্তরালবর্ত্তী ফল অন্তর্দ্রোহ—তাহাও আমাদের মধ্যে যথেষ্ট দেখা দিয়াছে। আমাদিগকে একেবারে দুর্ব্বল ও অক্ষম করিয়া ফেলিয়াছে। এই নির্জ্জীব দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চার না হইলে আর কোনও আশাই নাই। আমাদিগকে সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন করে নাই—আমরা নির্জ্জীব—জীবনহীন—আমরা মৃত। এই মৃত দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চারের আবশ্যক, তবে এই জাতীয় দেহের আধ্যাধি দূর হইবে। এই জাতির পুনর্জন্ম না হইলে আর রক্ষা নাই। আমূল পরিবর্ত্তন,—বিপ্লব,—তাহা না হইলে আর রক্ষা নাই।

—তাহা হইবারও ত কোনও আশা দেখা যাইতেছে না!

—হয় ত একটা অভিনব অভ্যুদয়ে বর্ত্তমানকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিবে। প্রাচীন রাজ্যের ভগ্নস্তূপ হইতে নূতন জাতীয়তার সৃষ্টি হইবে। কিরূপে যে হইবে তাহা হয়ত আমাদের এখনও কল্পনাতীত। অন্তরালবর্ত্তী মানবের জলোচ্ছ্বাস যেমন শুষ্ক ধরিত্রীর মৃত ও নষ্ট উর্ব্বরতাকে সঞ্জীবিত করে, জাতীয়তার পুনর্জন্ম মানব-সমাজে অনেকটা সেইরূপই হইয়া থাকে।

—সে ও এখন একটা আশার স্বপ্ন রচনা মাত্র। তাহার সম্ভাবনা এখন সুদূর ভবিষ্যতের অঙ্কোপরি নিহিত।

—কে জানে?—হয়ত শীঘ্রই হইতে পারে। যাহ্নিক-গন্ধার সাম্রাজ্যের সুদূর চক্রবালে যে ক্ষুদ্র একখানা মেঘ দেখা দিয়াছে, তাহার সংবাদ রাখেন কি, তাত? এই আপাতক্ষুদ্র মেঘখণ্ড যে সর্ব্বগ্রাসী হইয়া সমগ্র আকাশকে ছাইয়া ফেলিবে না—এমন কথা কে বলিবে?—একটা প্লাবন যে আসিবে—তাহার পূর্ব্বাভাষ ইতিমধ্যেই দেখা দিতেছে।

—কিন্তু সুবিধা পাইলেই কি যবনিকগণ আসিয়া আমাদের রক্তশোষণ করিবে?—আর আমরা তাহাদের পদধূলি অঙ্গে মাখিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব?

—কিন্তু আমাদের জাতির অদৃষ্ট লক্ষ্যে এখনও একেবারে আমি

হতাশাস হই নাই ;—দুঃখের কারণ কথাতে—অদৃষ্টের নির্মম তাড়নায় —কালের গতিতে—হয়ত এক অভিনব অভ্যুদয়ে—এক নবীন প্রাণ-সঞ্চারে মৃত সঞ্জীবিত হইবে। হয়ত সেদিন শীঘ্রই আসিবে।

—শীঘ্রই ?—কত শীঘ্র ?—এই আমার মোহে আর আমাদের কতদিন কাটিবে। অনেক দিন ত এইরূপ আশার ছলনায় আমরা ভুলিয়া আছি ;—আরও কতদিন আমরা নিশ্চেষ্ট জড়পিণ্ডের মত এই নবীন অভ্যুদয়ের আশায় বিমুগ্ধ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া থাকিব—কবে আমাদের আশাপরিবর্তন সংঘটিত হইবে তাহার প্রতীক্ষা করিয়া ?

কিছুক্ষণ উভয়ে মৌন রহিলেন। তাঁহাদের কথায় আমার অন্তরে একটা অভিনব বাসনা ও প্রেরণা অনুভূত হইতেছিল।

পিতা বলিলেন, "আর কতদিন এইরূপে শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় আমাদের কাটিবে ? এই বাহ্লিক গান্ধারের ধর্ম্মভূমি কত জাতির রক্তে রঞ্জিত হইল—কতবার কপিশার ও বক্ষুর নির্ম্মল রজতধারা লোহিত হইয়া গেল—কত পুরাতনের ভিরোভাবের সহিত নূতনের আবির্ভাব হইল ! কিন্তু আমাদের জড়ত্ব আর ঘুচিল না। আমরা সেই নিষ্ক্রীয় হইয়াই পড়িয়া রহিলাম,—সে শুভ মুহূর্ত্ত আর আসিল না,—মৃতদেহে আর নূতন প্রাণসঞ্চার হইল না।"

—কিন্তু, তাত, কবে যাখিবেন আমরা কত হীন হইয়া পড়িয়াছি,—কিরূপ জড়ত্বে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—এই মোহের ঘোর কাটিতে কিছু সময় লইবে ত ? এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের মধ্য দিয়া যদি আমাদের দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা প্রবুদ্ধ হয়, আর বাহিরের আক্রমণ যদি বর্ত্তমানকে ঘুচিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের সেই ঈপ্সিত দিবস শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে।

পিতা মহাপুরুষের সব কথা ভাল করিয়া মনঃসংযোগপূর্ব্বক শুনিলেন কি না, জানি না। তিনি কিয়ৎক্ষণ মৌনী হইয়া থাকিবার পর একটা ব্যথাপূর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"আজ আমরা কত হীন ও দুর্ব্বল ! গৃহ-বিবাদে ও বিলাস-ব্যাতকতায় সতত বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত। বাহির হইতে যে শত্রু আসিতেছে তাহাদিগের সকলকেই আমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়া লইতে হইতেছে। তাহাদের পদাঘাত আমরা হাসিমুখে সহ্য করিতেছি !—উৎপীড়িত হইয়া উৎপীড়নের প্রতিকার করিবার সামর্থ্য বা অধিকার আমাদের নাই। প্রতিকারের প্রয়াসমাত্রই রাজদ্রোহ। আমাদের দেশ আজ আমাদের নয়,—কক্ষে আজ আমরা গৃহহীন প্রবাসী,—গৃহে থাকিলেও আজ আমরা স্বদেশের ও স্বজনের সকল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত,—এই জীবনের অবসানেই আমাদের সকল দুঃখের শেষ,—মৃত্যুই আমাদের মুক্তি,—আর কোনও পথ নাই।

—তাত, আপনি যথার্থই বলিয়াছেন—মৃত্যুই আমাদের সকল দুঃখের—সকল যন্ত্রণার অবসান আনয়ন করিবে।—কিন্তু সেজন্যও মরিতে ত আমরা শিখিলাম না—যে মরণে একটা জাতি সঞ্জীবিত হইয়া উঠে—যে মৃত্যু নির্জ্জীব জীবনের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। আমাদের মত জন কয়েকের মৃত্যুতে যদি দেশ বাঁচিয়া উঠে—জাতি প্রবুদ্ধ হয়—তাহা হইলে এইরূপ বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। এ মরণ কেবল যে আমাদের দুঃখযন্ত্রণার অবসান আনয়ন করিবে তাহা নহে—ইহা অবসান—ইহা জাতিকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিবে—তাহাদিগের মধ্যে অভিনব প্রেরণার সঞ্চার করিবে।

—কিন্তু এই অবসানের কথা কেমনে কে বুঝাইবে—আমাদের দেশের জনসাধারণ কিরূপে ইহা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিবে—কিরূপে এই মহাসত্য প্রতিধ্বনি করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে—তাহা জানিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে কে ?—কেই বা সাধারণকে কর্ম্মপন্থা দেখাইয়া দিবে ?

—তাত, নিশ্চিন্ত থাকুন, সবই হইয়া যাইবে, কাহারও বা কিছুর অভাব হইবে না। সময়ের প্রতীক্ষা করুন।

—আমি ত হতাশ হইয়াছি !

—ধৈর্য্য ধরুন ; সময় আসুক সব ঠিক হইয়া যাইবে ; শীঘ্রই আসিবে সেদিন। প্রতীক্ষা করিয়া থাকুন সেই শুভদিনের।

মহাপুরুষ মৌন হইলেন। উভয়ের আর কোনও কথা হইল না ; এবং তাহার সময়ও ছিল না, কারণ তত ততক্ষণ বিহারদ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল।

পিতা-পুত্রে আমরা তখন মহাপুরুষের সহিত রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বিহার দ্বারে তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া বিদায় লইলাম। তিনি বিহারে প্রবেশ করিলে আমরা রথে পুনরারোহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রয়াণ করিলাম।

রাত্রি অধিক হইলেও পথিপার্শ্বস্থ কোনও কোনও গৃহে তখনও আনন্দের কলরোল শ্রুত হইতেছিল। পথেও দুই একজন বিলাসী আত্মবিস্মৃত দুষ্কৃত স্খলিত পদে ধীরে ধীরে গমন করিতেছিল। কেহ বা তাহার অবিবাহিতা প্রিয়ার উদ্দেশে জড়িতস্বরে প্রণয় সঙ্গীত গাহিতে প্রয়াস করিতেছিল। কোথাও বা বারবিলাসিনী তাহার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া যাত্রীকের সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত ছিল—বোধ হয়, উৎসবানন্দের পর প্রেমিক বিদায় লইতেছিল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের প্রথমার্দ্ধে আমরা প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে আর্য্যপালক ও তাঁহার পুত্র প্রজ্ঞাবর্দ্ধন আমাদের প্রাঙ্গণে আমাদিগের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। তাঁহারা এত শীঘ্র গৃহে ফিরিয়াছেন দেখিয়া আমরা ঈষৎ বিস্মিত হইয়াছিলাম। রাত্রি অধিক হওয়াতে আমরা অধিকক্ষণ বিশ্রম্ভালাপে অতিবাহিত না করিয়া পরস্পরের নিকট বিদায়গ্রহণ করিতে তৎপর হইলাম। আর্য্যপালক ও তাঁহার পুত্র আমাদিগের নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং আমরাও যথোচিত সৌজন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিদায় দিলাম।

ইতি দেবব্রতের আর্য্য চরিতে গৃহপ্রত্যাগমন নামক পঞ্চমবিবৃতি।

৬

বৈশাখী পূর্ণিমায় আমি মুণ্ডিতশীর্ষ হইয়া যথাবিধি স্নান করিয়া শ্বেত পীতবাস পরিধানপূর্ব্বক উপবেশন পালন করিলাম এবং দীক্ষা গ্রহণোদ্দেশে মহাপুরুষের নিকট উপনীত হইলাম। আমার সঙ্গে পিতা, মাতা ও চিত্রলেখা গিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে মহাপুরুষের হস্তে

দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিলেন। পুরুষপুর বিহারের নিয়মানুসারে দীক্ষার পর এক বৎসরকাল আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক বিহারের ভিক্ষাবাসে ভিক্ষুগণের সহিত বাস করিতে হইয়াছিল এবং তাঁহাদের ব্যবস্থা ও বিধি-ব্যবস্থা চলিতে হইয়াছিল।

সন্ধ্যার সময় সংঘারামের চৈত্যগৃহে ভিক্ষুদিগের পাতিমোক্ষ সংঘ * সংগঠিত হইল; এবং বৈশাখী পূর্ণিমায়, পাতিমোক্ষ সংঘে, আমি সদ্ধর্মী বলিয়া গৃহীত হইলাম। অনুষ্ঠান শেষ হইলে সন্নিহিত ভিক্ষু ও শ্রমণগণের সহিত আমি চৈত্যগৃহের বাহিরে আসিলাম। সেদিন উৎসবপালন নিষেধ। আমার মঙ্গলে ধর্মশ্রবণ আরম্ভ হইল। অনেক সদ্ধর্মী গৃহপতি-গণ উৎসবপালনান্তে সপরিবারে ধর্মশ্রবণোদ্দেশ্যে মণ্ডপে সমবেত হইয়াছিলেন। আমিও তাঁহাদের সহিত এই ধর্মসভাতে স্থান পাইয়াছিলাম।

প্রথম প্রহরান্তে, যখন ধর্মশ্রবণ হইয়া গেল, তখন আর্য্য মহাসুবির বেদীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সুমধুর স্বরে গাহিলেন—

আমি প্রণমি তোমার চরণে।
দুরন্ত মারে করি পরাজয়,
সংসারের যত গ্লানি, দুঃখ ভয়
মুছিয়া দিয়াছ—
নিয়ত অক্ষয়,
তাই, এসেছি তোমার সকাশে।
আমি প্রণমি তোমার চরণে।
তোমার করুণা
অমিয় নিঝর,
সুধা ধারা তারে—
করে নিরন্তর,
আমি করিয়াছি পান,
পেয়েছি সন্ধান
তৃষ্ণা। বিহীন
প্রশান্ত নির্বাণ;
তোমায় স্মরণ করে।
তথা রাখ মোরে তব ভবনে।
আমি প্রণমি তোমার চরণে।

এই মঙ্গল গাথা আবৃত্তির পর আমরা সকলে ভগবান্ সম্যক্ সম্বুদ্ধের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। সকলে বিলম্বিতকণ্ঠে "ত্রিশরণ" † আবৃত্তি করিলাম।

"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।" ‡

ধর্মশ্রবণে সপরিবারে সমাগত গৃহপতিগণ, সঙ্ঘের ভিক্ষু ও শ্রমণমণ্ডলী বিদায় গ্রহণ করিলে আর্য্য মহাসুবির আমাকে সঙ্গে করিয়া আমার বিহারবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া গেলেন। কক্ষটি আর্য্য মহাসুবিরের শয়ন কক্ষের পার্শ্বে অবস্থিত। আয়তনে প্রশস্ত—একপার্শ্বে বিস্তৃত শয্যা—অন্যদিকে গৃহকোণে একটি ধাতুময় দীপাধারে একটি ধাতুনির্ম্মিত প্রদীপ জ্বলিতেছে। কক্ষের অন্য কোণে একটি ধাতুনির্ম্মিত কলসী ও একটি ঝারি—দুইটাই জলপূর্ণ—এবং ভিক্ষুর নিত্যব্যবহার্য্য অন্য কয়েকটি তৈজসপত্র রক্ষিত আছে। শয্যার নিকট কুম্ভতলে একখানি প্রশস্ত ব্যাঘ্রাসন বিস্তৃত।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া আর্য্য মহাসুবির আমাকে বলিলেন—

"এই কক্ষ তোমার বিহারবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভিক্ষু-জীবনের পবিত্রতা তোমাকে একমাসকাল অতি সতর্কতা ও কঠোরতার সহিত পালন করিতে হইবে। এখন, তোমার এই দীক্ষার পর, কয়েকটি কথা তোমাকে আমার বলিবার আছে।—আমার সহিত গর্ভকুটে আইস।"

মহাসুবির আমাকে লইয়া সংঘারামের চৈত্যগৃহে প্রবেশ করিলেন। চৈত্যের পৃষ্ঠপ্রাচীরে একটি গুপ্ত কীলকে চাপ দিবামাত্র প্রাচীরের এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সরিয়া গেল এবং নীচে নামিবার সোপানশ্রেণী দৃষ্ট হইল। সোপানের অলিন্দে দীপশ্রেণী পূর্ব্ব হইতেই জ্বলিতেছিল। মহাসুবির আমাকে নিম্নে অবতরণ করিতে বলিলেন। আমি নামিলাম। মহাসুবির সোপানাবলীর শীর্ষে দণ্ডায়মান হইয়া অপর একটি কীলকের সাহায্যে অপসৃত প্রস্তরখণ্ডকে যথাস্থানে সন্নিবেশপূর্ব্বক আমার সহিত অবতরণ করিতে লাগিলেন।

সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া আমরা একটি প্রশস্ত কক্ষে উপনীত হইলাম। গৃহটিতে সাধারণ বাতায়ন বা গবাক্ষের সম্পূর্ণ অভাব। বায়ু চলাচলের জন্য গৃহের ছাদের ও নিম্নের অলিন্দের চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি সুবৃহৎ ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলি মূলের দ্বারা সংঘারামের প্রাচীরের ভিতর দিয়া বাহিরের উষ্ণ বায়ু কক্ষ মধ্যে আসিতেছে ও গৃহের বদ্ধ বায়ুকে বাহিরে মুক্ত করিয়া দিতেছে। বাহির হইতে সংঘারামের প্রাচীর-শিখরে ও গাত্রে যে অসংখ্য বৃহদাকার জালাবৃত ছিদ্র দৃষ্ট হয়, আজ তাহাদিগের সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম। প্রকোষ্ঠটি ভূগর্ভে এবং সংঘারামের চৈত্যগৃহের ঠিক নিম্নে অবস্থিত।

---

* পাতিমোক্ষ সংঘ ভিক্ষুদিগের পূর্ণিমা সম্মেলন। এই সম্মেলনে যে সংঘে ভিক্ষু ও শ্রমণগণ আপনাদিগের কায়মনোবাক্যে আচরিত পাপের বিবরণ সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাপন করিয়া বৌদ্ধ মতানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত লাভ করেন এবং ইহাতে নবীন দীক্ষার্থীগণও দীক্ষা লাভ করিয়া সদ্ধর্মী বা বৌদ্ধ বলিয়া গৃহীত হন। পাতিমোক্ষ সংঘ প্রতি পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

† তৃষ্ণা—আকাঙ্ক্ষা, মানসিক তৃষ্ণা।

‡ নির্ব্বাণ—মোক্ষমুক্তি, নির্ব্বাণ।

* (পালি) তিসরণং বা সরণগমনং। ইহা সর্ব্বাস্তিবাদী (হীনযান) বৌদ্ধদিগের প্রাথমিক দীক্ষামন্ত্র বা creed.

† (পালি) "বুদ্ধের শরণ লইলাম। ধর্ম্মের শরণ লইলাম। সংঘের শরণ লইলাম।"

ঘরের আয়তন বেশ প্রশস্ত। প্রস্থে প্রায় ত্রিশ হস্ত এবং দৈর্ঘ্যে ও উচ্চতায় যথাক্রমে ষাট ও চতুর্দশ হস্তের ন্যূন হইবে না। এই কক্ষের একপ্রান্তে বর্ষর নির্ম্মিত পঁচিশটি সুবৃহৎ আধার রক্ষিত ছিল। আধারগুলি সুরক্ষিত এবং ইহাদের উপরকার আবরণগুলিতে সংলগ্ন এক একটি প্রস্তর কীলক সাহায্যে উত্থাটিত হয়। প্রত্যেক আধারের সম্মুখের গাত্রে এক-একটি লিপি খোদিত আছে।

কক্ষটির চারিকোণে ও মধ্যস্থলে দশটি করিয়া পঞ্চাশটি প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং ইহাদের উজ্জ্বল আলোকে কক্ষটি উদ্ভাসিত। গৃহপ্রান্তে, প্রস্তরাধারগুলির সম্মুখে একখানি পশুলোম নির্ম্মিত আসন বিস্তৃত। আর্য্য মহাস্থবির আমাকে এই শয্যার উপর বসিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং বসিলেন; আমিও তাঁহার সহিত উপবেশন করিলাম। আমরা উভয়ে পরস্পরের সম্মুখে বসিয়াছিলাম যাহাতে কথোপকথনের সুবিধা হয়।

মহাস্থবির বলিলেন "দেবদত্ত, আজ বৈশাখী পূর্ণিমা—সঙ্ঘশীর্ষগণের* অতি শুভদিন—আজ এই অমল শুভ্রবাসরে তোমার দীক্ষা হইল—আশা করি ও আশীর্ব্বাদ করি যেন অদ্য এই শুভদিনের শুভ সূচনা তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে সার্থকতা ও সাফল্য আনয়ন করে। তোমার জন্মদিনে আমি অদ্য পাতিয়া গণিয়াছিলাম। গণনা করিয়া যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা জীবনে কখনও অপর কোনও জাতকের ভাগ্যে দেখি নাই। সন্দেহ হইল ভুল হইয়াছে—খড়ির অঙ্ক মুছিয়া ফেলিলাম, আবার গণিলাম—সেই একই ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ। বিশ্বাস হইল না—আবার খড়ি পাতিলাম—অনেক ভাবিলাম—অনেক করিলাম—বুঝিলাম ভুল হয় নাই। তোমার কোষ্ঠী দেখিলাম—আমার গণনার সহিত মিলিয়া গেল। বুঝিলাম যে আমাদের মধ্যে আজ এক অভিনব প্রতিজ্ঞার উদয় হইয়াছে। তখনই জানিয়াছিলাম যে ধর্ম্ম ও সংঘকে বিধর্ম্মীর নির্য্যাতন হইতে তুমিই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। যাঁহার পথ চাহিয়া আমরা এতদিন বসিয়া আছি তিনি আসিয়াছেন।—যে দিনের উদয়ের আশায় আমরা উৎসুকমনে সুদূর গগনপ্রান্তে এতদিন চাহিয়া চাহিয়া কাটাইয়াছি, আজ তাহার রক্তিমরাগ পূর্ব্বদিকচক্রে দেখা দিয়াছে। অদ্য এই শুভ পূর্ণিমায়—এই পবিত্রতম চৈত্যের গর্ভগৃহে তোমাকে ডাকিয়া আনিয়াছি কেন জান?—দেখিতেছ তোমার সম্মুখে মাল্য চন্দন রক্ষিত হইয়াছে—আজ তোমার অভিষেকের দিন। কিন্তু তোমার এই অভিষেকের কথা কেবল তুমি আর আমি জানিব। আর জানিবে জনকয়েক যুবক—যাহাদিগকে আমি দরিদ্র, উৎপীড়িত ও সহায়হীন সাধারণের রক্ষাকল্পে সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই ব্রতীসংঘের অদ্য হইতে তুমি নেতা হইলে। নূতন ব্রতীদের প্রতি পূর্ণিমায় ব্রতগ্রহণের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানের তুমি অদ্য হইতে পৌরহিত্য করিবে, আমি তোমার সহায়তা করিব মাত্র। ব্রতীসংঘের সকল অনুষ্ঠান ও সম্মেলন এই পবিত্র গর্ভগৃহে হইবে এবং তাহাদের সময় ও কার্য্যসূচী যথাসময়ে আমি তোমাকে অবগত করিব। এখন তুমি এই পবিত্রতম স্থানে, অদ্য এই শুভ পূর্ণিমাবাসরে, আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর যে দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সংঘের জন্য, তুমি আপনার সকল চিন্তা বিস্মৃত হইবে,—সকল সুহৃদকে জানাইয়া দিবে,—সংসারের সকল হীন ও ক্ষুদ্র বাসনাকে ছিন্ন করিবে,—আপনার সকলপ্রকার ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিবে,—তোমার এই অভিনব কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবে। মানুষের প্রতি মানুষের পাশব অবিচার ও অত্যাচার—নির্ম্মম, নিষ্করুণ নিষ্ঠুরতা—দূর করিতে চেষ্টা করিবে। তজ্জন্য যদি কঠোর ও নির্ম্মম হইতে হয় তাহাও হইবে। —শপথ কর!"

আমি আমার দীক্ষাগুরু আর্য্য মহাস্থবিরের জানুস্পর্শ করিয়া বলিলাম—"শপথ করিলাম, আর্য্য!"

—তবে আইস! ব্রতগ্রহণ কর! আজ হইতে তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর এই বিশাল প্রদেশের জনসমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। ইহা একপ্রকার প্রব্রজ্যা; আপনার সকল সুখদুঃখ—মঙ্গলামঙ্গল—বিসর্জ্জন করিয়া জনসমাজের ঐহিক মঙ্গলকামনায় নিরত থাকিবে;—অত্যাচারীর উচ্ছেদসাধন করিবে;—বিধর্ম্মী, নিষ্ঠুর, মায়োপাসক যবনকে ধর্ম্মভূমি বাহ্লিক-সম্ভার হইতে বিতাড়িত করিবে,—কিংবা যদি আবশ্যক হয় ত তাহাদিগকে বধ করিয়া নির্ম্মূল করিতেও দ্বিধা বোধ করিবে না। শপথ কর!

—শপথ করিলাম, আর্য্য!

নিকটে একটি পাত্রে পুষ্পমাল্য ও অন্য একটি ক্ষুদ্র পাত্রে রক্তচন্দন রক্ষিত ছিল। আর্য্য মহাস্থবির আমাকে সুরভি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন এবং অঙ্গুলি দ্বারা এক বিন্দু রক্তচন্দন লইয়া আমার কপালে টীকা রচনা করিয়া দিলেন।

আমি আর্য্য মহাস্থবিরের পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

মহাস্থবির বলিলেন "আজ যে এই রক্তচন্দনের টীকা তোমার কপালে অঙ্কিত করিয়া দিলাম—দেখিও যেন তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। তুমি আজ যে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে সে রাজ্যে সুখ ও বিলাস বর্জ্জিত। সে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আত্মত্যাগ দিতে হইবে। —তাহা যেন কখনও বিস্মৃত হইও না।"

—কখনও ভুলিব না, আর্য্য।

—দেশ ও ধর্ম্মের উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক অর্থের আবশ্যক —তাহাও এই প্রাচীন সংঘকর্ত্তৃক বহুদিন হইতে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। ঐ যে পঁচিশটি বর্ষর নির্ম্মিত সুবৃহৎ রত্নাধার দেখিতেছ —উহাতে এই সুমহান্ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অর্থ সঞ্চিত আছে। এস তোমাকে তাহা দেখাইয়া দি। এই সকল সঞ্চিত অর্থ আজ হইতে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম—দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সংঘের জন্য, আর্ত্তের জন্য, আবশ্যকবোধে ইহার সদ্ব্যয় করিবে।

আমরা উভয়ে উঠিয়া এখন রত্নাধারটি নিকট গেলাম, দেখিলাম তাহার উপরে খোদিত রহিয়াছে "শ্রেষ্ঠী অবরয়ানের দান।" একটি কীলক সাহায্যে রত্নাধারের আবরণ উদ্ঘাটিত হইল। দেখিলাম এই সুবৃহৎ আধার স্বর্ণ বিনারে পূর্ণ। পঁচিশটি আধারই এইরূপ

* বৌদ্ধদিগের।

ধর্মসঙ্ঘের পরিপূর্ণ এবং পঞ্চবিংশ বিজ্ঞিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধর্ম ও সঙ্ঘের মঙ্গলকামনায় এই ধর্ম পুরুষপুরের সঙ্ঘের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। আর্য্য মহাসুবির এই সকল রত্নাধারের গুপ্ত ধনরত্নসমূহ আমাকে দেখাইয়া আবরণগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।

মহাসুবির এই গর্ভগৃহে রক্ষিত ধনসমূহ দেখাইয়া আমাকে পুরস্কার করিতে বলিলেন, এবং তিনিও পূর্ব্বের ন্যায় আমার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন—

"সকলই আজ তোমাকে দেখাইয়া দিলাম—সকল কথাই প্রকাশ করিলাম—যাহা কিছু সঙ্ঘের হস্তে ন্যস্ত ছিল তাহা আজ তোমাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু যদি তুমি তোমার কর্ত্তব্যে অবহেলা কর—যদি বেদ, ধর্ম, সঙ্ঘ ও রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধনের সুযোগ তোমার নিজের স্বার্থের জন্য অবহেলা কর—যদি অসংযত হৃদয়ে নারীর প্রলোভনে পড়িয়া তুমি তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হও, —তাহা হইলে আমার আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অভিসম্পাত তোমার মস্তকে বর্ষিত হইবে—ঐতিহাসের অভিশপ্ত সিংহ তোমাকে ধ্বংস করিবে —বেদব্যাপ্ত সমস্ত অত্যাচার ও অবিচারের ভার তোমাকে নিষ্পেষিত করিবে—বিমর্দ্দিত করিবে।

—স্বীকার করিলাম—শপথ করিলাম—আপনার কর্ত্তব্যপথ হইতে জীবনে কখনও বিচ্যুত হইব না—আর যদি কখনও হই—তাহা হইলে যে কোনও শাস্তি আপনি আমার জন্য ব্যবস্থা করিবেন তাহা আমি নতশিরে গ্রহণ করিব।

—বৎস, এখন তুমি আমার ব্যবস্থার অতীত। তুমি এখন হইতে আপনার ব্যবস্থা আপনি করিয়া লইবে। শাস্তি বা পুরস্কার এ সব এখন তোমার অধিকার। সঙ্ঘের ভার গ্রহণ করিলে এখন হইতে তুমি আপনার কর্ত্তব্য আপনি নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। অদ্য হইতে তোমার অনুমতি ব্যতীত এই গর্ভগৃহে কেহ প্রবেশ করিবে না। আমি এখন হইতে তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া, তোমার আদেশানুসারে, এই সকল ধর্ম রক্ষা করিব। জনসাধারণের হিতকল্পে যেরূপভাবে ইচ্ছা সেইরূপে তুমি এই অর্থের সদ্ব্যয় করিবে। এখন এস—এই গর্ভগৃহের আরও একটি গুপ্ত পথ আছে তাহা দেখাইয়া দি। এই পথ আর কেহ জানে না। আবশ্যক হইলে এই পথ দিয়া তুমি গমনাগমন করিতে পারিবে।"

আমরা উভয়ে উঠিলাম। গর্ভগৃহের উত্তরদিকে এক পার্শ্বে একটি লৌহ কীলক দেখাইয়া দিয়া মহাসুবির আমাকে বলিলেন—

এই কীলকটি বামদিকে ঠেলিয়া দিলে গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত হইবে। দ্বারের অপর পার্শ্বে এইরূপ আরও একটি কীলক আছে; তদ্দিক দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে সেটিকে দক্ষিণ দিকে ঠেলিতে হয়। দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য বিপরীত দিকে ঠেলিবে।

আর্য্য মহাসুবির এই কথা বলিয়া দূরকোণ হইতে দুইটি মশাল লইয়া প্রজ্বালিত করিলেন। একটি আমার হস্তে দিয়া এবং অপরটি স্বয়ং বাম হস্তে লইয়া, দক্ষিণ হস্তে কীলকটি বামদিকে হেলাইলেন।— ভিত্তিগাত্রের একটা সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সরিয়া গিয়া এক অন্ধকারময় প্রশস্ত সুড়ঙ্গ পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। আমরা মশাল হস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মহাসুবির আপন দিকে লৌহ কীলক বিপরীত দিকে ঠেলিয়া গুপ্তদ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ইতি বেলভেত্তর আত্মচরিতে অভিষেক নামক ষষ্ঠ বিবৃতি। (ক্রমশঃ)

মনস্তাত্ত্বিক

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়

[প্রহসন]

যাদুকর যাদবনাথ : Spring Fantasia গোছের।—দৃশ্যটা একটু ফিকে হয়ে আসতেই প্রযোজক বললেন, নমস্কার! আসুন প্রথমেই আপনাদের সঙ্গে আজকের অভিনয়ের পাত্র-পাত্রীদের একটা মোটামুটি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। পরেশ বাস-মা-মরা ধনী সন্তান, স্নেহশীলা মাসিমা' হেমাঙ্গিনী ঠাকরুণের কাছে ছোট থেকে লালিত-পালিত-বর্দ্ধিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, দর্শনশাস্ত্র ও অর্থ-বিজ্ঞানে এম-এ দিয়েছে। অশোক, সুশ্রীল, উমেশ প্রভৃতি তাঁর বন্ধু. অবশ্য বা সহপাঠী। সুশীলা হেমাঙ্গিনী ঠাকরুণের কন্যা, সবে ম্যাট্রিক্ পাশ করেছে। ঘাসী, সরমা প্রভৃতি কেউ সবজান্তা, কেউ সবজান্তী না-হয়েও যাদুকরী। আশে-পাশের ঝাড়িতে থাকে।

হেমাঙ্গিনী ঠাকরুণ একটু খুনকায়। স্বামী চন্দ্রনাথ—নিরীহ, ভীরুকায়, মেহাৎ ভালোমানুষ। স্ত্রী তাঁর নিজের মেয়ে-পরিধি এখন কিছু অসামান্য মনে করেন না এবং এ-নিয়ে কেউ কোন মন্তব্য করলে বিলক্ষণ চটে যান।

আরেক একটি পাত্রী আছে—পুষ্পী। এর পরিচয় দেবেন পরে।

এখন বৃত্ত সুরু হচ্ছে দারুণ উৎকণ্ঠার ভিতর। আজ পরেশের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হ'বে। সকাল-সকাল খেয়ে পরেশ বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি। যে-কোন মুহূর্ত্তে আসতে পারে। বেলা গড়িয়েছে অনেকটা: হেমাঙ্গিনী দেবী একটু ছট্‌ফটি দিচ্ছেন—তাঁর জানাতেই বলছি—এমন সময়

এখানেই প্রযোজক থামলেন

প্রথম দৃশ্য

সুশীলা ছুটে ঘরে ঢুকল। বন্ধুকে দাঁড়ালে সে, কেননা হেমাঙ্গিনীর নাসিকা গর্জন শোনা যাচ্ছে। সন্তর্পিত কণ্ঠে সুশীলা মা'কে ডাকল।

সু। মা'! ওমা? (বাধাপ্রাপ্ত নাসিকা গর্জন)—বলি, কা'রা সব বেড়াতে এসেছেন—দেখবে এসো!…

হে। নাঃ, তোর জ্বালায় এ-বাড়িতে তিষ্ঠোবার কা'র সাধ্যি। রোগা শরীরটা নিয়ে আর পারিনে বাবু। সারাটা দিন সংসারের খাটি পুইয়ে নেই বা একটু গড়াচ্ছি, অমনি সুরু হয়েছে ঘেয়ের চীৎকার। বাঘ পড়েছে, না ডাকাত?

সু। বাঘ নয়। ডাকাত-ও নয়। পাড়া থেকে সবাই বেড়াতে এসেছেন, দেখেই না'সে। বাণীর বিদি—সেই এলাহাবাদে যা'র বিয়ে হয়েছে, নরদার মা', সাদা, রাঙুর পিসি, বাণী তো আছেই—আরো সব: তা'দের সবাইকে কি চিনি নাকি আমি? সব জন আছেন ঐ ঘরে।

হে। বাপ্‌রে। কর্ম্ম যা' বাকিল করেছ একখানা—পারি নে আমি। ঘোড়াটার পরীক্ষায় কি হয়েছে তা'র ঠিক নেই কিন্তু: দুর্ভাবনায় চোখ বুজতে পারি নে—তুই আছিস শুধু সারাখানা বাড়ি চষে বেড়াতে। বিয়ে আর তা'দের এখানেই।

ফুস্‌ফাস্‌ করে বেরিয়ে গেল সুশীলা। দরজায় কিসে শব্দ হ'ল। হেমাঙ্গিনী ঠাকরুণ চমকে উঠলেন

হে। উঃ ঠিক যেন টাটু ঘোড়া। কী মেয়ে যে হয়েছে! সারা দিন ধস্তিপণা, বাপের আদরে মাথাটা গায়ে নষ্ট হ'য়ে। বিয়েটা দিয়ে ফেলতে পারি হয়। মেয়েটার দিকে চাওয়া যায় না, ঠিক যেন কলাগাছের মত বেড়ে যাচ্ছে।

মহিলার দল একে-একে প্রবেশ করতে লাগলেন—চুড়ি, ভাগাল ইত্যাদির শব্দ

—মাথাটা বুঝি তুলতেই পারছেন না আজ? সুশীলার কথায় যেন দুঃখ ম'ল?

—পরেশের বুঝি আজ পরীক্ষার খবর বেরুবে? তা' সে তো খুব ভাল ভাবেই পাশ করবে?

—সুশীলার মুখে আপনার কথা শুনি কত! রোজই ভাবি বেড়াতে আসব—তা—

—এ তো ভাল কথা নয়, এযেতো দুখ্‌দে। ভাল ডাক্তার দেখান—এমনি কথা সব

হে। অসুখ করেছে বুঝি? তেমন কিছু নয়। আসলে মেয়েটা যেন জানবরে আমার—একটুতেই দিশেহারা হয়ে পড়ে। যত দায় আমার যেন; কর্ত্তার দিকে তেমন টান নেই কিনা!…কদিন ধরে যেন দুর্ভাবনা যাচ্ছে।

বাণী। সুশীলা তো কিছু বলে নি মাসি মা'? ব্যাপার কি?

হে। পরেশ আবার কি করবে ঠাকুরই বলতে পারেন।

সরমার মা। এ বিয়ে যেন ভাঙ্গবেন বলুন দেখিনি? পরেশ আমাদের সোনার টুকরো ছেলে, প্রতিযোগিতায় জলপানি পাচ্ছে। সরমা তো বলে পরেশবাবুর মত ভাল ছাত্র দর্শনের ক্লাসে আর নেই।

হে। তা' সে যা' বলেছে সরমা ঠিকই। তবে কি জানেন, সেই লক্ষ্য দুখ কি আর আছে? আজকাল সব কিছুতে গোলমাল আর ঝিমাট, কত রকম কাণ্ডকারখানা হচ্ছে তা'র ঠিক নেই কিছু। গুষ্টিরা কি আর সাধে ফরি দিদি!

বাণীর দিদি। বাণী বলছিল যে ব্যবহারে নাকি পরেশবাবুর খুব সুখ্যাতি। যে-রকম পড়তে দেখতুম—বাবা—ভীষণ ভাল ছাত্র নিশ্চয় পরেশবাবু।

হে। তাই তো বলি, তুমিই বাণীর দিদি!—সে' দিন বিয়ে হ'ল, জামাই তোমার থাকে পশ্চিমে—দিল্লী, বা আগ্রা। তোমার চেহারাখানা তো বেশ ফিরে গিয়েছে; পশ্চিমের হাওয়া তো…

সু। দিল্লী-আগ্রা নয় মা'—এলাহাবাদ। এই তো হল গেলুম আমি তোমায়!

হে। ওই হ'ল তোর দোষ। দুই এযের একটু পাবটাব খাওয়াবি না, আমার কুল শোধ্‌াতে লাগবি মাষ্টারণীর মত? এই মেয়ের জ্বালায় আর পারি না।

সবার তরল হাসিতে ঘর ভরে উঠল। ঝড়ের মত ঢুকল পরেশ—মাসীমা', ও মাসিমা, ও সুশীলা—বলি ম্যাটাবের কাণ্ডখানা দেখলে তো? উঃ অনেক লোক রয়েছেন যে এখানে!! এক ছুট বেরিয়ে গেল; ঢুকল সুশীলা

সু। শোন মা' দাদা ভাল পাশ করেছেন। কিন্তু ভাখ বাণী, দাদা মহাসাধের Experimental Psychologyতে তয়ানক কম নম্বর পাওয়াতে First Class Second হয়ে গ্যাছেন।

বাণী। বলিস কি?

সু। এই তো জেনে এলাম। ওরো তো মা' তোমাদের পাস, মোক্ষা, অর্থ, সুতি, গুণ্ডা—আরো-আরো সব রেখে যাচ্ছি। যারা ফেলে গেছে। এখনই খাবার দাও দিয়ে পরীক্ষককে লাগিয়ে দেবেন দু'এক ঘা। জানো তো—একটা ফৌজদারী না-হলেই হয় এখন।

মা'। তোকে আবার ডাঁটা খেতে না-হয় দুখী। যে-রকম গোলমাল হয় করেছিস।

সু। তা' যা' হয় দেখব। দাদা তো বলছেন একবার বেড়াতে যা'বেনই। চল্‌লাম আমি দাদার কাছে। আর কিছু দরকার পড়লে ডিকে ডেকো মা'—ঘুম থেকে তুলে দিচ্ছি।

সুশীলার প্রস্থান। সকলে: আচ্ছা আর এক সময় আসব। পরেশ এসেছে এখন। যা'বেন আমাদের বাড়ি একটু ঘুরে আসবেন। তা'তে কিছু হয় নি। আমরা তো কাছেই রয়েছি। না, কষ্ট করে আপনাকে আর উঠতে হ'বে না। অসুখ শরীর—ইত্যাদি

বাণী। আমি একটু পরে যাচ্ছি দিদি।

হে। সেই ভাল মা'। তুমি একটু ডেকে যাও তো ওদের?

দিয়ার প্রবেশ

দি। মা' ডেকেছেন আমায়?

হে। সুশীলা বলেছে তো? তা' এ-ও যদি তোমাদের বাধা, এতো মুস্কিল তোমাদের চোখে আছে। এদিকে দুশ্চিন্তায় আমরা চোখ বুজতে পারছি নে একটু। ঘুমে আছ—বাপু ঘুমে আছ। এমনটি যেমাদিনী ঠাকুরুণ ভিন্ন আর কেউ সহ্য করবে না।

দি। পা হাত পা' টিপে দেব মা'?

হে। ঠাকুরুণকে আগে বল, ওদের চা আর খাবার দিতে। মা সেও ঘুমিয়েছে?

দি। উঁহুন ধরেছে, দিদিমণি ঠাকুরুণকে তুলে দিয়েছে। পা'টা টিপে দি একটু?

হে। তা' দিতে হয় যাও। মোট কথা অত ঘুমিও না তোমরা। ঘুমিয়ের সুখ দুঃখটা একটু বুঝতে শিখো।

পরেশ, সুশীলা ও বাণীর প্রবেশ

বা। মেজেছেন মাসীমা' আর্ট স্কুল পেয়ে যাবার সুখের অবধা?

হে। বল্, সব খুলে বল্। সব শুনছি আমি।

এ সব ক্ষেত্রে যেমাদিনী বিশেষ গার্জেনের অভিনয়ের পরিচয়ী

প। ভালো না মাসীমা', কবে কোন্ সুখে যাই পড়ে পাস্ করে বসে আছেন এক-একজন প্রফেসার। নোতুন কোন বিষয় দামনে বসলেই যে-কায়দায় পড়েন। এতো ফেটেফুটে একেবারে up-to-date অথরিটি ছেড়ে দিলেলাম। কিন্তু বুঝলে না। খারাপ নম্বর দিল Experimental Psychologyতে? অথচ এর জন্যেই আমার হ'বে জীবনে প্রতিষ্ঠা! এ দুঃখ আমার জীবনে ঘুচবে না মাসি?

হে। পাশ করেছিস তো?

প। আমাদের পারীর অধ্যাপকবাবু, পূর্বস্মৃতি আর ইউরোপের অভিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতার দব নিয়ে এত বড় আলোচনাটা নোতুন ভঙ্গীতে করলাম...উঁহুঁ হুঁ। এ দুঃখ···

হে। যদি পাস্ করেছিস্ তো? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। তোরা সব মী করে বেড়াচ্ছিস কি আমার দিকে? কথা কইছিস না কেন?

প। করেছি। ঘাটারা ফেরেও করে দিয়েছে আমায়। ফেলে একবার।

হাত কড়মড় করে উঠল পরেশ

হে। (হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন) আজ যদি দিদি বেঁচে থাকতেন। এ-দুঃখ আমি আর সইতে পারি না। দিদি গো!

হ। চলে আয় বাণী, চলে এসো মামা। ভাল পাস্ করে এসেছে মামা—মা'র মত কান্না। এখুনি মা-কাণ্ডে চলছে না? চলে এসো তোমরা। মা'কে শান্ত করেই হিস্‌হিস্ খেয়ে যাই আমি।—ঐ তাখো, বাবা এসে গেছেন। ···বাবা, বাবা কাই ক্লাস্ পেয়ে পাস্ করেছে। এবারে একটা বিয়ের যোগাড় দেখো। (যেতে যেতে)—চলে এসো তোমরা আমার ঘরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুশীলার ঘর। বাণী, সুশীলা, পরেশ, চরণদাস চা খেতে খেতে

চ। রিসার্চ করতে যদি হয় হয়, তবে তাতেই আমি তাঁ: বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

প। সবার সঙ্গে পরামর্শ করে নেবি।

চ। পুরুষীক, অশোক, উমেশ ওরা সবাই আসবে সন্ধ্যার পরে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বুঝে দেখো।

সু। বাবা, তুমিও দেখছি ভীষণ কাজের লোক হয়ে উঠলে। এখনই আবার দেখাপড়া, রিসার্চ সুরু করা কেন?

চ। সে কথা ঠিক। তবে পরেশ মনস্তত্ত্বে খারাপ নম্বর পেয়ে যে রকম দুঃখিত হয়েছে, তা'তে একটা ডক্টরেটটে ওকে নিতেই হ'বে।

বা। আমি ফেলসপাইয়ের পক্ষে আছি।

চ। আমি উল্টো এখন; অনেক আসবে করেকজন।

চরণদাসের প্রস্থান

সু। জানো বাবা, পুষ্টিকে আর পাওয়াই যাচ্ছে না দুপুরের পর থেকে? এতো খাওয়াই পরাই শুধু—অথচ তাখো ছিরে পাড়ার যত বাজে বিড়ালের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরে বেড়াবে।

বা। খবর্দার সুশী। পুষ্টির দিকে তোর স্নেহের জিঞ্জিরও তাৎপর্য তোকে এত করে বুঝিয়ে দিলাম বা।

সু। তা' তো দিলেন। কিন্তু পুষ্টিকে না দেখলে যে ভালই লাগে না আমার, তার কি?

বা। বাসীমা কি বলেছেন জানো?

পা ও সু। কি? কি বলেছেন মা?

বা। বলেছেন, পুষ্টির উপর সুশীলার যে-রকম মায়া পড়েছে তা'তে ওদের বাড়ি যাবনাত্রীর সঙ্গে ওটাকেও পাঠাতেই হ'বে।

পরেশের ও বাণীর উচ্চহাস্য। সুশীলা গরগর করে উঠল, কারুর সহ্য হ'বে না পুষ্টিকে। ওকে নিয়ে আর পারি নে আমি। দেখি এল কি না। চা পর্যন্ত খেলে না হতভাগী। সুশীলার প্রস্থান

বা। পরেশদা' আজ কিন্তু গল্প করতে হ'বে। এখন তো পরীক্ষার চিন্তা নেই।

প। কোন্ গল্পটা বলব বলো। ভাল কথা—তোমাকে বাবা বলতে বারণ করিনি আমি?

বা। হুঁ। সেই যে মেয়েটা কী সব অদ্ভুত ঘর দেখে চেঁচাচ্ছে "ভিক্টরিয়ান" "ভিক্টরিয়ান" বলে?

প। ঠিক, ঠিক—মনে পড়ছে। বলবো যাইকি?

বা। আর সেই গল্পটা। সেই যে ছেলেটা এক বাপ্ তাড়াইছে, খেয়েও ঘুমোত না। অথচ একটা কবিতা পাঁচ বার ধীরে ধীরে আবৃত্তি করলেই ঘুমিয়ে পড়তো···

প। নিশ্চয় বলবো। আরও একটা নোতুন গল্প বলবো।

বা। আচ্ছা পরেশ দা—পরীক্ষার ফলাফলের খুবি খুশিছে—মানে, তোমার খাওয়ার উন্নতি হ'য়েছে। তোমার ধাইসেস্‌টা তো আরো শক্ত হয়েছে?

প। অথচ জানো, আমি ডায়েট্-টায়েট্ করিনে?

বা। তা'লে কি করে হ'ল? বাবা তো বলেন যে, সীজারম্যান্ বা এমনই একজন বার symptom অনুসরণ না করলে ধাইসেস্ বার হ'তে হ'বে না? সাইকোলজী?

প। "যদ্"। তাই বীন্, কেন হ'বে না? জানো আসল ব্যাপারটা হ'চ্ছে যথার্থ—

বা। সাইকলজী?

প। নিশ্চয়। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র হচ্ছে একেবারে আদিম। এর চেয়ে সংস্কার আর কিছুতেই আবশ্যক নয়। জোড়া হ'লে, সমাজ একটু টেম্পারেচার উঁচুলে আমরা চাই কি ডাঃ রায়কে ডেকে বসি। অথচ যত লোক রোগে; অসাধ্য, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি লোক তোমার আশে-পাশে কিল্‌বিল্ করছে; দম হচ্ছে মিয়ে অসুখ।

বা। বলো কি পরেশ দা'?

প। অসুখ বই কি! কেউ পুরোপুরি মানসিক স্বাস্থ্যের মালিক নয়। মানসিক হিসাবে একেবারে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ খুব কমই পাবে। প্রত্যেকেরই একটু-আধটু গোলমাল আছে। কেন? বলিশি, বাবা বলবে না? অথচ এই গোলমালের বিষয় তা'রা নিজেরাই বুঝতে পারছে না।

বা। বুঝতে পারছে না কেন? মনের তো ব্যথা-বেদনা, শান্তি-অশান্তি আছে। দেহের অসুখ হ'লে যেমন উদ্বেগ হয়, মনের—

প। তা' কেমন করে হ'বে? গোলমাল ঘটে—তোমাকে তো কতবার বলেছি—অবচেতন বা অচেতন মনের জটিলতা থেকে। সচেতন মনে গোলমাল সহজেই ধরা যায়।

একটা বিড়ালের ডাক শুনা গেল

বা। আমায় কিন্তু রীতিমত ভয় করছে পরেশ দা'।

প। দাঃ, বৃত্তি বাস্তবিকই ক্যাকাল্‌টী নয়। বার-বার নিষেধ করছি তোমায়—

বা। অবচেতন মনে আমার কোন গোলযোগ ঘটেনি তো? আমি যে কবে কার দেখব তা' কিন্তু বলা যায় না।

ছুটতে ছুটতে সুশীলার প্রবেশ

সু। পুষীকে তোমরা দেখেছ? অবাক হয়ে তাকিয়ে আছ সব··· আসতে-আসতে দেখলুম পুষীকে এদিকেই আসতে।

সু ও বা। কই না।

সু। চুপ্-চুপ্। পুষী! হতভাগী গেল কোথা? চুপ্-চুপ্। চা খাবি যে? আজ ওকে কিছুতেই বেড়াতে দেব না, বুঝলে দাদা? ও মা—ঐ যা পুষী তোমার পেছনে দাদা? তোমরা কেউ দেখলে না? খুব দাইকোলজী জানিস বুঝি।

প। তাই তো।

বা। জানিস?

সু। কী?

বা। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোলমেলে?

সু। Experimental Psychologyর কথা বলছিস্ তো? সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

বা। আরে না, না—তোর বেড়াল মানে পুষীর কথা বলছিলাম। ওটা ভুতুড়ে নিশ্চয়। মাঝে মাঝে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়। তোর তো বয়সের বদ্যি? তুই সব দেখতে পেলি যে। অথচ তাখ,. চেয়ে তাখ—দাদাই এখন দেখতে পাচ্ছি, তোর কোলে বসে বিশ্যি গোঙরাচ্ছে।

পুষীর দম্ভবিহীন ডাক শুনা গেল। বোধহয় ওদের ভাষায় "হিয়ার, হিয়ার।" বললে। পুষীকে আদর করতে-করতে সুশীলা বেরিয়ে গেল।

বা। পুষীকে যা' ভালবাসে সুশীলা, একটা বন্দুক দিলে আর রক্ষে থাকবে না।

প। কেন?

বা। চুন্-থান্ পাড়ার সমস্ত বেড়াল ও সাবাড় করে ফেলবে এক দিনে। ওরাই তো পুষীকে কিনে যায় সুশীলার কাছ থেকে ভুলিয়ে।

প। জেলাসি! লেক্ জেলাসি। এর মানব জন্মী আর রূপ আছে। তোমার অনুমান সত্যি হ'লে বলতে হয় যে সুশীলার জেলাসিটা বিশ্রী। অনেকটা শুকনোর কথা মনে করিয়ে দেয়। তদ্ভাৎ এই যে···

বা। ওর স্নেহই তো স্বাভাবিক। আপনি তো সেদিন বলছিলেন।

প। সুশীলার মত একটি মেয়ের পক্ষে···

নরমাকে নিয়ে সুশীলার প্রবেশ—

সু। এসেছেন তো দয়া ক'রে। কিন্তু ব্যাপার বড় গুরুতর। তা'কে অভিনন্দন জানাবেন বসুন? আপনাকে নিশ্চয় অবাক করে দেবে: যে-রকম Experimental Psychologyতে মনোনিবেশ করেছে।

বা। আমার কথা থাকতে থাক তুই। যে কোন একটা বিষে অসম্ভব বোঝা পড়লে মানসিক স্বাস্থ্যের হানি ঘটবে। যে-পণ্ডিত সব ভুলে গিয়ে কেবল বই আর বইয়ের কথায়···

প। একাগ্রতা আর অসুস্থ খেয়াল এক নয়।

সু। পিসীমা'র কাছে জানলুম আপনার সাফল্যের কথা—এইমাত্র। তাই এলাম পরেশবাবু। Congratulations।

বা। ধন্যবাদ।

সু। ঐ যে পুষী ছুটে গিয়েছে। পুষীই আমাকে শেষ করবে একদিন।···পারি যে। (আগামীবারে সমাপ্য)

স্বাধীনতার রূপান্তর—কোরিয়া

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

প্রথম মহাসমরের সময় কোরিয়ার বিপ্লব আন্দোলনের কথা বলা প্রয়োজন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কোরিয়ায় যে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন চলেছিল সেই আন্দোলনের নেতা সিঙ্গম্যান রী ১৯১৯ সালে কোরিয়াতে এক অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জাপানীরা তখন এই আন্দোলনের নেতাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে। বিতাড়িত নেতৃবৃন্দ প্রধানতঃ আমেরিকা ও সাইবেরিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিঙ্গম্যান রী চলে যান আমেরিকায়। সেখান থেকে তিনি কোরিয়া সম্পর্কে প্রচার চালাতে থাকেন। তিনি খোলাখুলি ভাবেই সোভিয়েট-বিরোধী। আমেরিকানরা তাঁরই প্রচার থেকে কোরিয়া সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞানলাভ করে।

দ্বিতীয় মহাসমরের সময় নির্ব্বাসিত কোরিয়ান নেতাদের আন্দোলন চলে দুইটী বিভিন্ন ধারায়। কয়েকজন নেতা চুংকিংয়ে গিয়ে মার্শাল চিয়াং-কাইশেকের আশ্রয়ে একটী অস্থায়ী কোরিয়ান গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন। কিম-কু হলেন এই গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার। আমেরিকা থেকে সিঙ্গম্যান প্রভৃতি ১৯১৯ সালের অবশিষ্ট নেতারা তাঁকে সমর্থন জানালেন। কিন্তু কিম-কু কোনমতে চিয়াং-কাইশেককে কোরিয়ানদের বিপ্লবী সেনাবাহিনী গঠনে রাজী করাতে পারলেন না। ফলে কোরিয়ান যুবসম্প্রদায়ের তিনি আস্থা হারালেন। এদিকে চীনা কম্যুনিষ্টদের আশ্রয়ে কোরিয়ান স্বাধীনতা লীগ গঠিত হল। এই লীগ উত্তর চীন ও মাঞ্চুরিয়ায় স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করতে লাগল এবং কোরিয়ার গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলে। কাজে কাজেই কোরিয়ার যুবসম্প্রদায়ের উপর এই স্বাধীনতা লীগের প্রভাবপ্রতিপত্তিও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেল। জেনারেল কিম-মুচেং ও কিম-হলদেউংয়ের সৈনাপত্যে তারা প্রায় এক লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করলে। তারপর রাশিয়ানরা যখন উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করল তখন স্বাধীনতা লীগ লালফৌজের সহযোগিতা করতে লাগল। লালফৌজ তাদের পুলিসের কাজে নিয়োগ করলে এবং কোরিয়ান সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ স্থাপিত হল। এইভাবে রাশিয়ানরা কোরিয়ান জনসাধারণ দ্বারা গঠিত সাধারণতন্ত্রকে সমর্থন করে' এবং চীনা কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে' অল্পকালের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সুতরাং কোরিয়ার উত্তরার্দ্ধে রুশ শাসনাধীন এলাকার জনগণ প্রকৃতপক্ষে স্বায়ত্তশাসন পেয়েছে এবং অধিগিরি ব্যবস্থাকে রাশিয়া সাফল্যমণ্ডিত করেছে বলা চলে।

দক্ষিণার্দ্ধে মার্কিণ সেনানায়করা সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি অবলম্বন করলেন। কোরিয়ান সাধারণতন্ত্র ও পিপল্‌স্ কমিটিসমূহ তাঁরা স্বীকার করলেন না। জাপানী অফিসারদের জায়গায় তাঁরা মার্কিণ সামরিক অফিসার নিযুক্ত করে কাজ চালাতে লাগলেন। কোরিয়া সম্পর্কে নিজেদের কোন জ্ঞান না থাকায় তাঁরা ওয়াশিংটন থেকে সিঙ্গম্যানরীকে বিমান যোগে আনিয়ে এক সুরক্ষিত প্রাসাদে রাখলেন এবং তাঁর সমর্থনপুষ্ট চুংকিংস্থ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ও কিম-কুকে শিউলে আনালেন। মার্কিণ অধিনায়ক হজ ঘোষণা করলেন যে কিম-কু ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা কোরিয়ান নাগরিক হিসাবে এসেছেন, গভর্ণমেণ্টের কোন মর্য্যাদা তাঁদের দেওয়া হয় নাই। তাঁরা কিন্তু কোরিয়াতে এসেই বিবৃতি প্রচার করতে লাগলেন মন্ত্রিসভার সদস্য বলে ঘোষণা করে' এবং লোকের সঙ্গে মন্ত্রীরূপে দেখা সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। আমেরিকানরাও তাদের যে ভাবে নানা প্রকার সুবিধা দিতে লাগলেন, তাতে লোকের মনে ধারণা জন্মাল যে কিম-কু গভর্ণমেণ্টকে আমেরিকানরা স্বীকার করে নিয়েছে।

এদিকে কোরিয়াতে যাঁরা গুপ্ত আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তাঁরা কিম-কু গোষ্ঠীকে খুব সুনজরে দেখলেন না। কোরিয়ানরা অবশ্য তাঁদের সকলকে বিদেশে জাপ-বিরোধী প্রচার কার্য্যের জন্য শ্রদ্ধার চোখেই দেখত। কিন্তু কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে কোনরূপ সংযোগ

না থাকায় জনসাধারণ তাদের হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছিল না। এমন সময় তাঁদের নিজেদের আচরণে তাঁরা জনসাধারণের শ্রদ্ধার আসন থেকে একেবারে নেমে গেলেন। কোরিয়ান সাধারণতন্ত্র গঠিত হলে পিপল্‌স কমিটীসমূহ এই সাধারণতন্ত্রের সভাপতিপদে সিঙ্গম্যানরীকে বরণ করে নিতে চাইলেন। কারণ ১৯১৯ সালের বিপ্লবের সময় তিনি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট করেছিলেন। সিঙ্গম্যানরী ওয়াশিংটন থেকে দেশে ফিরে এলে যখন তারা তাঁর কাছে গেল, তখন তিনি সভাপতির পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হলেন। কিম-কু, কিম-কিউসিক প্রভৃতি সকলে ও কোরিয়াবাসীদের এই গণপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে অস্বীকৃত হলেন। এই ভাবে তাঁরা জনসাধারণের সহানুভূতি হতে নিজেদের বঞ্চিত করলেন।

কিম-কু'র দল কোরিয়ার ধনী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে জোর দহরম মহরম চালাতে লাগলেন। অবশ্য তাদের এরূপ করবার কারণ হল আমেরিকানদের ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতি টান। তাঁরা ভাবলেন যে এই ভাবেই তাঁরা আমেরিকানদের সমর্থন পাবেন। এমি করে কিম-কুর দল ও সাধারণতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ সুরু হল। ডিসেম্বর মাসে যখন মস্কোতে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের বৈঠক হয় তখন কোরিয়াতে সাধারণতন্ত্র ও কিম-কু'র দল উভয়েই কোরিয়ার গভর্ণমেণ্ট বলে প্রচার করতে থাকে। জেনারেল হজ তখন ঘোষণা করলেন যে বর্ত্তমানে মার্কিণ সামরিক শাসন ছাড়া কোন গভর্ণমেণ্টই কোরিয়াতে নেই। এর পরেও সাধারণতন্ত্র যখন কয়েক স্থানে কাজ চালাতে লাগল জেনারেল হজ তখন তার প্রতিনিধিদের কারারুদ্ধ করলেন। তা সত্ত্বেও পিপল্‌স পার্টি ও কম্যুনিষ্ট পার্টির নির্দ্দেশে কেন্দ্রীয় কমিটি নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলল অকুতোভয়ে।

মস্কো সম্মেলনের পর সমগ্র কোরিয়ায় যে গণবিক্ষোভ সুরু হয় কিম-কু'র দলও সেই সুযোগে ক্ষমতা হস্তগত করবার চেষ্টা করে। তারা আমেরিকানদের সহিত অসহযোগ ঘোষণা করে এবং পুলিসবাহিনীকে বিদ্রোহে আহ্বান জানায়। কিন্তু জনসাধারণের উপর কিম-কু দলের প্রভাবের অভাবে তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জেনারেল হজ কিম-কু ও কিউসিককে ভবিষ্যতে সদাচরণের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করিয়ে নেন। কিম-কু' দলের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও মস্কো সম্মেলনের পরে অছিগিরি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোরিয়ায় যে গণ-বিক্ষোভ হয়েছিল কোরিয়ার ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

আমেরিকানদের শাসন ব্যবস্থাতেও কোন উন্নত পন্থা অবলম্বন করা হয় নি। সামরিক কর্তৃপক্ষ কোরিয়ান ধনিক ও বণিক সম্প্রদায়ের সাহায্যে জাপ কাঠামোকেই বজায় রেখে চলেছে। জাপানীদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও কল কারখানা ইত্যাদি অধিকার করে মার্কিণ সেনা-বিভাগের লোকেরা নিজেরাই পরিচালনা করতে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোরিয়ান ব্যবসায়ীদের হাতে পরিচালন ভার দেওয়া হয়। আমেরিকানরা কোরিয়ান চাষীদের দুঃখ লাঘবের কোন চেষ্টাও করে নি। কেবল জাপ জমিদারদের স্থান নিয়েছে মার্কিণ খাজনা আদায়কারীরা। রাজধানী সিউলে মার্কিণ সামরিক গভর্ণমেণ্ট ৩৫ হাজার জাপানী গৃহ ও দোকান অধিকার করেন। কোরিয়ার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হাতে এইগুলির পরিচালনা ভার দেওয়া হয়। কোরিয়ান জমিদারগণ পূর্ব্বের মতই প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে চলেছে—ফসলের তিন ভাগের দুভাগ চাষীর এবং একভাগ জমিদারের। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমেরিকানরা সাধারণ লোকের তুলনায় অবস্থাপন্ন লোকদেরই পছন্দ করে। কৃষিপ্রধান কোরিয়ার চাষী, মজুর ও সাধারণ লোকের অবস্থা উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা যায় নি। সুতরাং জাপ শাসনের পরিবর্ত্তে মার্কিণ সামরিক শাসনে দক্ষিণ কোরিয়ার অধিবাসীরা উপকৃত হয়েছে বলে মনে হয় না।

এশিয়ার এই দেশটীতে আমরা সোভিয়েট ও মার্কিণ পদ্ধতির পাশাপাশি যে চিত্র দেখতে পাই তাতে মার্কিন ব্যবস্থাকে আমরা বৃটীশ ব্যবস্থার অনুরূপ বলে মনে করতে বাধ্য হই। সুতরাং সেখানে পাঁচ বছরের অছিগিরি কত বছরে যে বিদায় নেবে কে জানে?

প্রৌঢ়

শ্রীজুড়নজীবন মুখোপাধ্যায়

প্রৌঢ়ত্ব ষোল-আনা বাস্তবতা; কাজেই সাহিত্যেও যেমন তার উচ্ছ্বাসের স্থান নেই, সংসারেও তার দেনা-পাওনা সবই নিরস। কবিতার উৎস ফুলকে নিয়ে, কিন্তু ফলেই যখন তার পরিণতি, অর্থাৎ যখন তার সাংসারিক প্রয়োজন সব থেকে বেশী তখন সে ভাবরাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত। যৌবনের মাধবীকুঞ্জে যে কুহরব চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত ক'রেছিল তার স্মৃতিটুকু আছে, হয়ত একটু উপলব্ধিও আছে কিন্তু অনুভূতির অবসর নাই। তার প্রকাশ ধৃষ্টতা। গৃহিণী বলবেন রোগের লক্ষণ। তবুও অনাবিল কর্ত্তব্য ও কার্য্যের মধ্যে একটু আনন্দ, একটু উপভোগের আকাঙ্ক্ষা মাঝে মাঝে মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে।

সেইজন্যই একদিন শনিবারে একখানা সিনেমার টিকিট্ কিনে বাড়ী ফিরলুম। একটু স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও এ বয়সে লোভ হয়, তাই একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ টিকিট্ নিয়েছিলাম। বেরুবার সময় গৃহিণী ব'লেন, "সেকেণ্ডে চ'লে কোথায়?"

অপরাধীর স্বরে উত্তর দিলাম "এই একটু বায়স্কোপ যাচ্ছি, একখানা পাশ পেলাম কিনা।" শেষ কথাটা অবশ্যই মিথ্যা—কিন্তু যে মিথ্যাতে কারও অপকার বা ক্ষতি হয় না বরং কারও উপকারের সম্ভাবনা তাহা সত্য ভাষণের মতই সুফলপ্রসূ ও মঙ্গলকর।

গৃহিণী মন্তব্য ক'রেন, "সাতজনের মাথা ব্যথা প'ড়ে গেছে তোমায় পাশ দিতে, মিথ্যে কথা বল কেন? এ বয়সে সখ মেটে আর বাঁচি নে।"

কৌতুকহাস্যে উত্তর দিলাম—"ধরা না প'ড়ে উপায় কি? অন্তর্যামী কিনা, আমার প্রাণে যা' আছে তোমার প্রাণে তা' আপনিই প্রকাশ।"

রসিকতা বিচলিত ক'র্ল না। রাগত মুখে ব'ল্লেন, "ঢ্যাঁটামো অনেক শুনিছি, ক্ষান্ত দাও।" বাস্তবিক এ বয়সে গৃহিণীর অভিমান, ঠোঁট উল্টিয়ে মৌন থাকা, দীর্ঘ শ্বাস ফেলা, সজল চোখ এ সব মনে হ'লে হাসি আসে। ও মুখে শুধু মানার শাসন ও তিরস্কারের ভঙ্গী, গৃহিণীপনার পূর্ণ বিকাশ। হায় রে প্রৌঢ়ত্ব!

একটু সকাল সকাল বেরিয়ে সিনেমা-গৃহে আসন গ্রহণ কর্লাম। সাম্নের দিকে থার্ডক্লাশ ভদ্র যুবকবৃন্দে ভর্ত্তি। আমার নিকটবর্ত্তী সীটগুলিতে অর্থাৎ সেকেণ্ড ক্লাশে 'প্রকৃত ভারতের' সান্নিধ্য অনুভব কর্লাম। অর্থাৎ দেশীয় সৈন্য, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি অবাঙ্গালী মেয়ে পুরুষ, 'হাতের কাজের' লোক যাকে বল্‌বেন ফ্যাক্টরী প্রভৃতির শিক্ষক ও মজুরের দল—এঁরা সকলেই বিরাজমান আছেন। মনে হ'ল মাছ মাংস সব্জী বিক্রেতারাও অনেকে আছেন। এই যে বহু বিষয়ের এক শ্রেণীতে সমাবেশ এ শুধু সম্ভব হ'য়েছে অর্থের সমতা থেকে ও সাধারণ গৃহস্থ ভদ্রলোক যে আর্থিক বিষয়ে এক ধাপ নীচে পেছিয়ে গেছেন সেটাও যেন উপলব্ধি হ'ল। 'সাম্য' 'সাম্য' যতই করি, এই অবসরটুকুতে একটী পরিচিত অথবা সমশিক্ষিত বা সমশ্রেণীর ভদ্রলোককে পার্শ্বে পেলে যে আনন্দলাভ কর্ত্তুম ও দুই পার্শ্বের দু'টী খালি সীটে এইরূপ দুইজন প্রতিবেশীকেই মনে মনে যে আকাঙ্ক্ষা কর্ছিলুম—তা প্রকাশ না ক'র্লে মিথ্যা ভাষণ হবে।

আকাঙ্ক্ষা ক'র্লেই ত আর সফল হয় না। পার্শ্বদেশে এসে যিনি আসন পরিগ্রহ ক'র্লেন তাঁর পরিধানে সবুজ রঙের লুঙ্গি, গায়ে লাল ছিটের হাফ-হাতা 'কুর্ত্তা', মাথায় একটা সাদা গোল টুপি, চুলে তীব্র গন্ধ কেশ-তৈল। গ্রীবাদেশে যত্ন দীর্ঘ ও পুষ্টিহীন কেশগুচ্ছ—যাকে সাধারণে "ছাগল-দাড়ি" ব'লে অভিহিত করে। কিয়ৎক্ষণ পরে অপর পার্শ্বে যিনি আসন গ্রহণ ক'র্লেন তিনি একজন মহিলা—বয়স ত্রিংশ-ঊর্দ্ধে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, গণ্ডদেশে কৃত্রিম গৌরবর্ণের আভাস আছে, অধর ও ওষ্ঠের লালিমাও স্বাভাবিক মনে হয় না। বোধ হয়, নার্স, অথবা টেলিফোন্ বা অন্য কোন অফিসের কর্ম্মচারিণী। সঙ্গী অভাবে একাকিনী, আমারই মত অবসর সময়ে আনন্দ আহরণে সমাগতা।

সাম্‌নের দিকের আসনশ্রেণী থেকে পিছনে দৃষ্টিক্ষেপ সুরু হ'য়েছে। যুবকের দলের কতকগুলি আমার দিকেও কয়েকবার তাকিয়ে দেখ্‌লো। মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌লো। কাজেই অপরের অনুমান শক্তিকে ভিন্ন পথে প্রচলিত ক'র্ব্বার জন্য পার্শ্বস্থিত পুরুষ-প্রতিবেশীর সহিত বাক্যালাপ সুরু ক'রে দিলাম। তখনও ছবি আরম্ভ হ'তে পাঁচ মিনিট বাকী।

বন্ধুটীর পরিচয় পেয়ে বিশেষ খুসী হ'লুম। ইনি রাজমিস্ত্রিদের 'ঠিকাদার'। আজকাল 'কাজ-কামের' সুবিধা হওয়া সত্ত্বেও 'মাল-মশলা' ও 'মজুরের' অভাবে আশানুরূপ অর্থোপার্জ্জন হ'চ্ছে না ইত্যাদি। প্রাণের মধ্যে আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। কয়েক মাস ধ'রে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও একটা 'মিস্ত্রী' পাওয়া যাচ্ছে না যে একান্ত প্রয়োজনীয় দু'চারটা কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। ভাঁড়ার ঘরে কয়েকটী 'তাক' না থাকাতে মহার্ঘ্য আহার-সম্ভার তছরূপ হ'চ্ছে, ছাদের জল নিকাশের নল কেটে গেছে; দু'এক স্থানে বালির কাজ একান্ত প্রয়োজন। গৃহিণী বিস্মাদই করেন না যে গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণ ও 'রাজমিস্ত্রী' স্বয়ং রাজার থেকেও দুর্লভ হ'য়ে প'ড়েছে। এই ঠিকাদার বন্ধুটীর সাহায্যে আমার বাড়ীর উক্ত কার্য্য-গুলি যে সম্পন্ন হবে, তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে এই কাজটি যে উদ্ধার করা সম্ভব হবে এই আশায় অভিনয় দর্শনের আনন্দ খর্ব্ব হ'য়ে গেল। সেই প্রৌঢ়ত্ব; সাংসারিক সুবিধার আনন্দ অন্য সমস্ত আনন্দকে পিছনে ঠেলে রেখে দিয়েছে।

ছবি আরম্ভ হ'ল। বাঙ্‌লা গল্প। প্রত্যেক চরিত্রটী অসাধারণ। মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা নিয়ে এবং সত্যকার মানুষকে নিয়ে 'ছবি'র গল্প নাকি জমে না। তাই দেখ্‌ছি গৃহকর্ত্তা ধনী ও অর্দ্ধোন্মাদ কলে ইংরাজীতে পুরো eccentric বলা চলে। আধুনিক যুগের বিশিষ্ট অভিনেতা এই অংশে অভিনয় ক'র্ছেন। গৃহিণী বর্ষীয়সী হ'লেও সম্পূর্ণ আধুনিকা বা তা' হ'তেও অধিক। আধুনিকত্ব সৃষ্টি করেন ও আধুনিকাদের নেত্রীত্ব করেন। সভা-সমিতি ও বিবিধ সঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্টা। একমাত্র কন্যাকে অশেষ প্রকারে শিক্ষিতা ক'র্ছেন। কন্যার সঙ্গীতের সুর মিষ্ট না হ'লেও তাঁর ধারণা বিপরীত ও সে ধারণা পৌরুষতা ও অনুমোদন করার জন্য একটী যুবকের দল সে বাটীতে অপরাহ্ণ ও অবসর-সময়ে একটী পাকা আশ্রয় পেয়ে নিয়েছে। তারাও সকলেই অর্দ্ধোন্মাদ—কেন না রাজত্ব ও রাজকন্যা পাওয়ার লোভে সকলেরই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে; জামাতৃপদের উমেদারি ক'র্ত্তে ও কন্যাটীর প্রেম আকর্ষণ করার জন্য তাদের বেশভূষায়, বাক্যে ও ভঙ্গীতে যে নব নব রূপের প্রযোজনা সম্পাদন করে তাহা সত্যই পরম হাস্যকর। একদিকে এই মার্জ্জিত পাগলা-গারদ, অপরদিকে মজুর-সঙ্ঘের চিত্র। মজুরেরা চায় যে ধনিক ও তাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠান থাকুক, তবে তাদের কিছু পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিক। তাদের নেতা দাড়ি কামায় না, পর্য্যাপ্ত মদ খেয়ে নেশা-করার সু-দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল ক'রে রাখে ও একজন রমণী শ্রমিকের প্রতি আদর্শ কমিউনিষ্ট প্রেমে বিভোর হ'য়ে পড়ে। এ প্রেমে বাধা নাই, বন্ধন নাই, মনের একাগ্রতা ও হৃদয়ের নিষ্ঠার প্রয়োজন করে না, একজনের পায়ে দাসত্ব-স্বীকার করার গ্লানি থেকে মুক্তি আছে। এখানে পুরুষের তপস্যা গাছতলায় ব'সে মদ খাওয়া—যতক্ষণ না প্রিয়তমা সহানুভূতি ও অনুকম্পাতে গ'লে প'ড়ে, অপর কোনও পুরুষ-প্রেমিকের সাহচর্য্য ত্যাগ করে এসে হাত ধরে তুলে নিয়ে যায়।

ইন্টারভ্যাল্ হ'লো। প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্ব'লে উঠ্‌লো। ঠিকাদার মশাই জিজ্ঞাসা ক'র্লেন "বাবু মশায়, তামাসাটা ঠিক বুঝ্‌তে পার্ছি না। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবেন।" তার অপরাধ কি? কোন্ সমাজের কোন্ চিত্র যে দেখ্‌ছি তা নিজেই বুঝ্‌তে পারছিলুম না। তবুও তাকে বুঝিয়ে দিলাম এবং সেই সঙ্গে আমার বাটীর প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্য্যটা সম্পন্ন ক'রে দেওয়ার একটা প্রতিশ্রুতিও আদায় ক'রে নিলাম। আমার ঠিকানাটাও তাকে একটা কাগজে লিখে দিলাম। হঠাৎ একটা শীতল হাওয়ার সবেগ তরঙ্গ ব'য়ে গেল। বাইরে খুব মেঘ হ'য়েছে। বৈশাখ শেষের প্রচণ্ড বর্ষণ এক ঘণ্টা ধ'রে অক্লান্তভাবে যে ধারাপাত করলে তাতে পথ ঘাট ডুবে গেল। ছবি ততক্ষণ শেষ হ'য়েছে।

গাড়ী পাওয়া অসম্ভব। পার্শ্বের মহিলাটী বিপর্য্যস্তভাবে ব'ল্লেন—"কি ক'রে বাড়ী ফেরা যাবে।" জ্যোৎস্নারাত্রি ছিল, কিন্তু মেঘান্ধকারে চন্দ্রদেব অন্তর্হিত। রাস্তা ঘাটও জলে জলময়। দু-চারখানা রিক্সা কেবী ভাড়ার প্রত্যাশায় হাঁটু

জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার গাড়ী বা ট্যাক্সির চিহ্নও নাই।

যাত্রীর তুলনায় রিক্সার সংখ্যা অত্যন্ত কম। যাঁরা মেয়েছেলে নিয়ে এসেছেন তাঁরা যে কোনও ভাড়াতে রিক্সা বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছেন। আমি মতলব ঠিক ক'রে ফেলেছি। দু'বারের সিনেমার টিকিটের দাম দিয়ে এক মাইল পথ যাওয়ার জন্য রিক্সা নেবো না। জুতো-টা হাতে ক'রে হেঁটে চ'লে যাবো। মনকে প্রবোধ দিলাম, দুনিয়ার বিধান, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে।

মহিলাটী পাশে-এসে ব'ল্লেন, "মশায়, আমি ত জলে নেবে গিয়ে রিক্সা ডাক্‌তে পারছি না; আমাকে দয়া ক'রে সাহায্য করুন—রিক্সা একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিন।"

অন্যমনস্কভাবে কহিলাম—"অনেক ভাড়া চাইছে।"

"নিরুপায়, বাড়ী ত পৌঁছুতে হবে।"

"তা বটে"—রিক্সা ঠিক ক'রে তাঁকে উঠিয়ে দিলাম। বকা-ছোক্‌রার দল আমার দিকে তাকিয়ে বোধ হয় চিন্‌বার চেষ্টা করছিল। আবার হড়-হড় ক'রে বৃষ্টি এল। মহিলাটী ব'ল্লেন, "হেঁটে কেমন ক'রে যাবেন। আমিও ত মানিকতলায় থাকি—একই দিকে—আসুন, উঠে আসুন।"

বৃষ্টিতে কেউ কোনও দিকে লক্ষ্য করার অবসর পাচ্ছে না, সেটা লক্ষ্য ক'রে নিয়েই রিক্সাতে উঠে পড়লাম ও ব'ল্লাম "দেখুন, ভাড়াটা কিন্তু দু'জনে আধা-আধি দেবো। দু'জনেই যখন পরস্পরের অপরিচিত তখন কারও উচিত নয় বাধ্যবাধকতার মধ্যে যাওয়া।" তিনি রাজী হ'লেন। আমিও পাশাপাশি বস্‌লেও এই 'ভাগাভাগির' ব্যবস্থাতে পরস্পরের ব্যবধানটা বজায় রাখ্‌তে পেরে সন্তোষলাভ কর্লাম। এই যে সাংসারিক হিসাব এটা প্রৌঢ়ত্বের। এ বয়সে বিচার ও মীমাংসা যেমন ক'রে বহু দার্শনিকও মনস্তত্ত্ব তথ্যের সামঞ্জস্য বিধান করে, মনের আবেগে ভেসে যায় না—এ-টা প্রণিধানযোগ্য নয় কি!

পরদিন ঠিকাদার মশাই বাড়ীতে এসে যখন কাজ সুরু ক'র্লেন গৃহিণী হেসে ব'ল্লেন, "ভাগ্যিস্ সিনেমায় গিয়েছিলে, পোড়া যুদ্ধের বাজারে যেন সব জিনিষের মড়ক হ'য়েছে—নইলে মিস্ত্রী পাওয়া যায় না, বালি সিমেন্ট মেলে না। মাঝে মাঝে সিনেমায় যেও, যদি এমন কাজ বাগিয়ে আস্‌তে পার।"

এক চক্ষু হরিণ

অধ্যাপক শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ

হাতে-নাতেই ধরিয়া ফেলিলাম। রেজিষ্টারী খুলিয়া চোখে পড়িল সরোজ গত চারদিনই present, অথচ ওকে কলেজে দেখি নাই। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। নীরেন সরোজের proxy দিতেই ধরিয়া ফেলিলাম। সাতদিনের percentage তৎক্ষণাৎ কাটিয়া দিলাম এবং পড়ানো শুরু করিবার আগে ছোটোখাটো ব্যাপারে নৈতিক শিথিলতাই যে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল, একটি তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র বক্তৃতায় তাহা ছেলেদের সমঝাইয়া দিলাম।

বাসায় ফিরিয়া B.A পরীক্ষার খাতা দেখিতে বসিয়াছি গৃহিণী একটি চিঠি দিয়া গেলেন। ছোট্ট চিঠি—

জামাইবাবু:

দিদির চিঠিতে জানলাম আমাদের centreএর Economics First Paper আপনার কাছে গেছে। Bar F. N. 15 Registerd NO 2593 of 1942 আমার বন্ধু নিরুপমা রায়। ও ভাল দেয়নি—মোট ২৬ নম্বর উত্তর করেছে। অন্য Paper গুলোতে পাশ করে যাবে। ওকে পাশ করানো চাই-ই। আমার বিশেষ অনুরোধ জানবেন। মনে করবেন আমার কাগজ। ইতি—

রমা

রমা মেজো শ্যালিকা—সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। ওর তীক্ষ্ণ রসনাকে ভয় করি, স্বীকার করিতে লজ্জা নাই। সুতরাং—

গেজেটে পাশের তালিকায় Bar F. N. 15এর নাম ছিল।

সংস্কৃতির বিনিময়

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

একাধিক পুরাণে একটি কৌতুকপ্রদ শ্লোক আছে।

কপিবানরযূথেন রাঘবোপাশ্রিতাম্
গায়ন্ নৃত্যন্ ভ্রমন্ যত্রে বিভ্রাণ্ডুম্বুরিম্বন্।

যত্র তত্রুক বা বানরযূথ দেখে আরোহণ করিয়া নৃত্য ও গান করিতে করিতে আপনাকে রক্ষিপক্ষিতে গমন করিতে দেখিলে দৈত্য উপস্থিত জানিবেন।

বৃত্তান্তলক্ষণের মাহাত্ম্যমণ্ডিত এই শ্লোকটির কোথাও সুবকর ভাষ্য বা টীকা দেখি নাই। তাই নিজেরই ভাষ্য করিতেছি।

আমরা—কোটি কোটি ভারতবাসী যুগ যুগ ধরিয়া রামনামে মত্ত হইয়া বহু বানর ও ভল্লুক সেবাদলের সাথে জানকীসন্ধান-লীলায় উল্লসিত হইয়াছি। বহু বানর ও ভল্লুকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মহানন্দে জানকীর উদ্ধার কামনায় ভারতের দক্ষিণ সীমানা দুর্বাদিকায় যাত্রা করিয়াছি। আমরা যুগ যুগ বহুবানর ও ভল্লুক সেনার সাহায্যে সেই জলযাত্রার সাধনায় যুক্ত হইয়াছি। সেই সাধনায় কাঠবিড়ালীটিও কিছু অংশ দাবী করিয়াছে। আমাদের মনকে মোহন করিয়া কৃত্তিবাসী ছন্দ শোনাইয়াছে, কেমন করিয়া বহুবানরশ্রেষ্ঠ হনুমান আপন পুচ্ছেও (সেও ইতি আছে) পাহাড় চূড়া বহিয়া আনিয়া সেতুবন্ধ নির্মাণে বানরকে সাহায্য করিয়াছিলেন, শেষে ক্রুদ্ধ হইয়া জলের মাথায় পাহাড় চাপাইতে গিয়াছিলেন—এমন কি কেমন করিয়া তিনি কাঠবিড়ালীকে অর্জন করিয়াছিলেন। যুগ যুগ ধরিয়া আমরা লাঙ্গুলমহিমার স্বপ্ন দেখিয়াছি, লাঙ্গুলমহিমার সাগরলঙ্ঘন কীর্তন করিয়াছি, লাঙ্গুলাস্ফালনে লঙ্কাবিজয়ের অঙ্কেক অঙ্ক রচিত করিয়াছি। বহু বানর ও ভল্লুকের লাঙ্গুলমহিমার জন্য দক্ষিণদেশে যাত্রা করিয়াছি। আমরা ঘরিয়াছি। বহু বানর ও ভল্লুকের উল্লাসে যেদিন উল্লসিত হইয়াছি, সেই প্রথম স্বপ্নের দিন হইতে আমরা তিলে তিলে মরিতেছি। যেদিন হইতে বেকবাদি মানবজাতি বীর বানরজাতিকে বহু বানরের নামে লাঙ্গুলে শোভিত করিয়া, অতীতের বীর্য্য-অভিমানের গরিমাকে কলঙ্কিত করিয়া মহা-ভক্তিতে আমরা নমস্য হইয়াছি, শাস্ত্রবচন অনুযায়ী সেদিন হইতে আমরা তিলে তিলে মরিতেছি। বীর্য্যমণ্ডিত অতীতকে যেদিন হইতে বিকৃত করিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি, সেদিন হইতে আমাদের সংস্কৃতিতে বিকৃতি আসিয়াছে।

তাই রক্ষরাক্ষসের গল্প আমাদের ভাল লাগিয়াছে, হিড়িম্বা ও তাড়কা রাক্ষসীকে মহাশক্তি ও বীরনমস্যা রূপে অঙ্কিত করিয়া রাক্ষসমহাত্ম্য গাহিয়াছি। কিন্তু বীর-হিড়িম্বার মিলনের মধ্যে যে অনাবিষ্কৃত ইঙ্গিত রহিয়াছে, কোনও দিন তাহা ধরিতে পারি নাই। মানবে ও রাক্ষসে শত্রুশাসক সম্বন্ধ নহে। মানবী ও রাক্ষসী সভ্যতায় পরস্পরে শত্রুশাসক সম্বন্ধ।

বীর্য্যশুল্কায় যে রাজাদের পরিমা, তাহারই মুখ্যশাসক ইক্ষাকু-সন্তান বীর্য্যবান্ রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে কৃত্তিবাসী কাঠবিড়ালী ও মহানুভূতি জানাইয়া ধন্য হইল। সংস্কৃতি ও অতীত সভ্যতার বিষয়ে আমাদের অজ্ঞানতা তথাপি আমরা স্বীকার করিব না;

মহাভারতের প্রায় রাজকুমার যদি রাক্ষসকুমারীর প্রেম নিবেদনে ক্ষণেকও প্রীত হইতেন, তবে সীতাহরণ হইত না, লঙ্কাকাণ্ড বাধিত না। রাজকুমার অনার্য্যার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলেন। মানব-সংসারে বাধিল দ্বন্দ্ব। আশ্চর্য্য এই, অশোক-কাননে সীতাকেও রাক্ষসীরা সম্ভাষণ করিল অনার্য্যা বলিয়া। রাক্ষসী-সংস্কার সীতাকে ইহাই বুঝাইতে চাহিল—'ধর্ষিতা যখন পতিকুলে বিরাজিতে চাহিয়াছে, তখন জীবনটাকে ভোগ করিয়া লও, ভিখারী নিঃস্ব রামের জন্য এখন অনার্য্য অযোধ্যা।'

রাজরাজ আপন কন্যা মধোদরীকে দান করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত সন্ধি করিয়াছেন। মানবে রাক্ষসে সংমিশ্রণ হইয়াছে। রাবণ-ভ্রাতা রাক্ষস কুবের অলকার অধিপতি—যক্ষরাজের রাজা। সুতরাং রাক্ষস ও যক্ষও রামায়ণ যুগে বিশেষ যুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের নবম অধ্যায় অনুসারে, কয়েকটি ব্রহ্মসন্তান ক্ষুধা হইয়াই ক্ষুধা-কাতর হইয়া জলরাশি পানে উদ্যত হইল, অন্য কতকগুলি সন্তান তাহাদের কবল হইতে জলরাশি রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইল। এই রক্ষাকারক সন্তানসমূহ 'রক্ষা করিব' বলায় রাক্ষস নামে পরিচিত হইল, এবং যাহারা জলরাশি পান করিয়া ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহারা যক্ষ নামে অভিহিত হইল। লঙ্কায় যক্ষ ও রাক্ষসের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই যক্ষ ও রাক্ষসের পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণ। হিমালয় ও হেমকূটেই যক্ষ রক্ষ সভ্যতা ও শিল্পের সর্বাতন বিকাশ, কিন্তু সাম্রাজ্যলিপ্সা তাহাদিগকে বহুদূর দক্ষিণরাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিল।

মেরোদণ্ডের তৃতীয়াংশে মনুবংশীয় রাজা ত্রিবিন্দুর অপ্সরা কন্যা ইলবিলার সহিত পুলস্ত্যের বিবাহ হয়। তাঁহাদের সন্তান বিশ্রবা ঋষি। সেই বিশ্রবা ঋষির পত্নী বৃহস্পতিগোত্রসম্ভূতা বেদবর্ণিনীর সন্তান কুবের। সুতরাং রামায়ণযুগে অযোধ্যার ও অলকার রক্তের সম্বন্ধ ঘনীভূত হইয়াছে, যক্ষ ও মানব সংস্কৃতি পরস্পরে মিশিতেছে। মহাভারতের যুগেও যক্ষের রাজ্য রহিয়াছে—কিন্তু মনুবংশের বিস্তারমুখে তাহা ক্ষীণতর হইয়া পূর্বপ্রান্ত হইতে বসিয়াছে। ক্রমে যক্ষরাজ্যের রাজা হইল মনুবংশীয়, সুতরাং পৌরাণিক রীতি অনুসারে যক্ষেরাও রাজার নামে হইল মানব। যেমন তেমনি

করিয়া অনন্তকালের মানবজিহ্বা হইয়া এই সিদ্ধান্তকে সার্থক করিয়াছে।

সেই বিপ্রদাস ঋষির অসবর্ণা রাক্ষসকন্যা কৈকসীর সন্তান রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও সূর্পনখা। রাক্ষসের পিতামহী ইলবিলা মনুবংশীয় রাজকন্যা, সুতরাং সন্তান রাক্ষসরাজবংশের সহিত ভারতের মনুরাজবংশের রক্তের সম্বন্ধ রহিয়াছে। আর অলঙ্কায় ও বর্ণলঙ্কায় বৈষয়িক সম্বন্ধ। যক্ষ ও রাক্ষস সংস্কৃতি ধর্মেরও তাই যেন পরস্পর বৈষয়িক সম্বন্ধ।

বিভীষণ পত্নী সরমা গন্ধর্বকন্যা। সুতরাং রাক্ষস ও গন্ধর্ব সংস্কৃতির নিকটও তাঁহাদের উভয়ের নাম চির-জায়া। দেখিতেছি, একটি রাজবংশেই মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব ও ঋষির রক্ত সমবয়, এক সভ্যতার রাজসংস্কৃতিতে সার্বজনীন ধর্ম, সংস্কার ও লক্ষ্যতার সাদৃশ্যসম্বয়। সারা পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য যিনি হরণ করিয়া আনিলেন—চৌর্যবৃত্তিতে নহে, আপন বীর্য্য বলে, যিনি যক্ষ রাজর্ষি ও মহর্ষিকে লঙ্কায় করিয়া আপন তপোবলে সেই বীর্য্যশক্তি অর্জন করিলেন, ত্রিভুবনকে উপেক্ষা করিয়া তাঁর অযজ্ঞায় বিনাশ আয়ব্যয়জনীর গন্ধনেশায় আট দৈত্য-দানবের হুঙ্কার নহে, তাহা অমরের ও রাজসূয় যজ্ঞকারী রাজন্যের ন্যায় বীর্য্যগরিমা। তপোবলে মহাকালকে যিনি স্তম্ভিত করিলেন, যমকে যিনি পুত্তলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র করিলেন, যিনি ইন্দ্রকে করিলেন খর্ব, তিনি যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে আপন বীর্য্যশক্তিকে নিবেদন করিলেই, 'দুষ্প্রবৃত্তি দশানন' এ অপবাদ আসিত না, শাস্ত্রবাদী সে মহারাজ শক্তিকে কুণ্ঠিত করিত না। রাক্ষস ধর্মদ্রোহী নহে, তাই যজ্ঞশাস্ত্রে মানব কথার তাহার উল্লঙ্ঘন ধর্মের ও লোকনীতির লঙ্ঘন নাই। রাক্ষস বিধাতার কিছু স্বতন্ত্র সৃষ্টি নহে, ধর্মধ্বজ যে অবিশ্বাস করিল সেই-ই রাক্ষস—অমানব করিলে তো কথাই নাই। দানব সন্তান হইলেও প্রহ্লাদ তাই 'দানব প্রহ্লাদ' নহেন, 'ভক্ত প্রহ্লাদ'। তিনি ধর্মধ্বজ-বিরোধী। যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব ও দানবের ধর্মই হইল ভোগ ও বিলাস। যক্ষ সে ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করে, আর গন্ধর্ব ভোগ করে কাম। রাক্ষস ও দানব, ঐশ্বর্য্য ও কাম নীতির সাধক তো বটেই, অধিকন্তু পরধর্মে অসহিষ্ণু। রাক্ষস ও দানব হইয়া কেহ ধর্মগ্রহণ করে না, জন্মিয়া হয় দানব রাক্ষস। চন্দ্রবংশের যাদব পাণ্ডব তাই না কখন হইল রাক্ষসরাজ, তেমনই তো জরাসন্ধ ও শিশুপাল হইল দৈত্যদানব।

ত্রপ্যভিমানী গন্ধর্বেরা আপনাদের সংরক্ষিত যোষির মধ্যে নিহিত চাহিত। ললিতকলায় ও রূপসর্জনায় তাহাদের বিলাসমধুর দিন ছিল গান্ধার বন্ধ। গান্ধারে প্রকাশ তাহাদের ঐতিহ্যের বাহিরে, তবে ঋষিরাজবংশের বিরুদ্ধে তাহাদের আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। সেই গন্ধর্বকুল হইতে বেদবিজয়ায় কর্তৃক কন্যাহরণ পৌরাণিক ভারতের মৈথুনিক কাহিনী। গন্ধর্বকন্যার মধ্য দিয়া গান্ধর্ব সংস্কার অতি সহজেই বিভিন্ন জাতি যেমন যেক্ষরাক্ষস যক্ষ প্রভৃতির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া গেল।

অমরাবতীর ঐশ্বর্য্যে শক্তিমান্ দেবজাতি ধার্মিক ধর্ম প্রবর্তিত করিয়া ত্রিভুবনের নর-নারীর নিকট হইতে যজ্ঞের দক্ষিণা নামে দেবরাজ ইন্দ্রের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যজ্ঞীয় কর্মের নামে দেবজাতির এই ধার্মিকতা প্রশ্নহীন মানবেরা মানিল না, তাহারা বারে বারে ধর্ম লুণ্ঠন করিল, দুষ্টের শিষ্টের সেই ইন্দ্রপূজা হইতে বারে বারে বেদলঙ্ঘনা হরণ করিল। মানবেরা (মনুবংশীয় রাজগণ) দেবযাজনের সম্বন্ধে দৈব-জাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া, অথচ দেবজাতি-প্রবর্তিত যাজ্ঞিক ধর্ম গ্রহণ করিয়া, বেদ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাহ্য হইতে একরকম বঞ্চিতই রহিলেন। অন্যদিকে, দানবেরা দেব-ঐশ্বর্য্যে বলবান হইয়া দেবলঙ্ঘনার মদ্য দিয়া অমরাবতীর আভিজাত্য সুধা পান করিলেন। দেব-ইন্দ্রকে পদানুত করিয়া দানবরাজ অমরাবতীর সিংহাসনে আপন পার্শ্বে যেদিন দেবমর্য্যাদা প্রহ্লাদকে দানব ইন্দ্রাণী করিয়া লইলেন, যেদিন দানব কর্তৃক ইন্দ্র পরিবর্তন হইলেও ইন্দ্রাণীর পরিবর্তন হইল না, সেদিন হইতেই দেব-আভিজাত্য গোপনে দানব-মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া লইল। গন্ধর্বের মতো আপন যোষির মধ্যে দেব-আভিজাত্যকে দেবতারা সংরক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন, মানবের সহিত এত প্রিয়সম্বন্ধ থাকিলেও তাই দেবকন্যার আত্মনিবেদনে মানবকুল অলঙ্কৃত হয় নাই, তাই মা মানব-কন্যাও দেব-পত্নী হইতে পারে নাই। দানবেরা দেবজাতির সেই মনঃপীড়নতার সুযোগ লইয়া দেব-আভিজাত্যকে বারে বারে লুণ্ঠন করিয়া দানব-মর্য্যাদার সহিত মিলাইয়া দিল। পৌরাণিক ভারতে অমরাবতীর যে আসন ছিল, রামায়ণ যুগে তাহা আর নাই। পৌরাণিক যুগে দানবকেই দেবজাতির অপকারক বলা হইয়াছে, কিন্তু রামায়ণে রাক্ষসরাজ রাবণ দেবদানব ও ঋষির অপকারক। দেখিতেছি, দেবদানব সমমর্য্যাদাভুক্ত হইয়াছেন। মহাভারত যুগে দেবজাতির মাহাত্ম্য কাল্পনিক ও গল্পকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুষ্টের শিষ্টের তাড়িত অমরাবতীকে মানবেরা বন্টন করিয়া লইয়াছে।

দানবজাতি দেবতাদের পরে আভিজাত্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের আভিজাত্যের ক্ষয়ও তাই দেবজাতির কিছু পরে আরম্ভ হইয়াছে। যেদিন দানব নন্দিনী পদ্মিনী চন্দ্রবংশকে অলঙ্কৃত করিলেন, সেদিন হইতেই মানব-আভিজাত্য দানবের নিকটে মর্য্যাদা লাভ করিল। মহাভারত যুগে বাসবকুলগৌরবের চরণে দানব কন্যা উলূপী আত্মনিবেদনে মানব-আভিজাত্যের যুগ-শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। মহাভারতের যুগ হইতে দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ ও রক্ষের আভিজাত্য ও সংস্কৃতির সহিত মানবের আভিজাত্য ও সংস্কৃতির রাসায়নিক মিশ্রণ হইয়া, পৌরাণিক ভারতের স্থানে নবীন ভারত জাত হইল। মনুবংশীয়গণের অবলম্বিত ধর্ম সার্বজনীন ধর্ম হইয়া সকল জাতিকে এক করিয়া মানব করিয়া লইল।

রামায়ণের বানরজাতি দেবগন্ধর্ব রক্ষ সম্বন্ধে জাত। এই বীর্যবান্ জাতির সহিত অগ্নি-মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই রাঘব কর্তৃক লঙ্কাবিজয় সম্ভব হইয়াছিল। তাহারাই করিল জানকী-সন্ধান, তাহারাই দেখাইল পথ, তাহারাই করিল সেতুবন্ধ। জানকী রাবণকে অনুরোধ করিয়া এক বৎসর কাল সময় ভিক্ষা লইয়াছিলেন রামচন্দ্রকে প্রতীক্ষা করিবেন বলিয়া। সেই এক বৎসর অতীত হইলে মহাকাব্যের সীতা যে কি হইত কে জানে। হনুমান্ যেদিন জানকীর সন্ধান পাইলেন আর সাত

কিংবদধিক দুই মাসকাল বাকী। ইহারই মধ্যে সমগ্র মানবজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কুমারিকায় আসন, লঙ্কা ও ভারতের সংযোগ স্থাপন এবং রাবণবিজয়, বিদ্যুৎবাহিনী বানরসেনার সেই অমিত-কীর্ত্তি পৌরাণিক ভারতের চির অমর পূজা হইয়া রহিবে। সেই বেদমন্ত্রদ্রষ্টার আভিজাত্য-মণ্ডিত বানরজাতির অমর সেনানী 'মহাবেগো হনুমান্ সত্যবিক্রমঃ' জাতীয় জীবনের কোন্ কন্দরে লাঙ্গুল-দোলিত হইলেন?

কৌতুকের বিষয় এই, বালিবধ বালী যখন রামচন্দ্রকে প্রশ্ন করিলেন, বানরজাতির জাতিবিষয়ে তিনি কেন হস্তক্ষেপ করিলেন, তখন রামচন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন যে ইক্ষ্বাকুদের রাজ্যে বালী কর্ত্তৃক সুগ্রীব জীবিত থাকিতে সুগ্রীব-পত্নী অর্থাৎ ভ্রাতৃজায়াকে ভোগ মানব-ধর্মবিরোধী, সুতরাং বালী অ-ধর্মী এবং বধ্য। কিন্তু সুগ্রীব যেদিন বীর পত্নীকে অসঙ্কোচে পুনরায় গ্রহণ করিলেন, সেদিন বানরজাতি ধর্ম-নিয়মে তৎ-পত্নী রুমাকে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হইল না। মনুসংহিতার রাঘবভ্রাতৃযুগল কেমন করিয়া ইহা সহিলেন? কেমন করিয়াই বা রামায়ণ ও ইতিহাস তখনও যে সম্বন্ধ স্বীকার করে নাই, যুবরাজ অঙ্গদও বীর মাতার যে নূতন সম্বন্ধে লক্ষিত—বিধবা তারা কর্ত্তৃক সুগ্রীবের মহারাণীর পরিচয় গ্রহণ, ইহাতে রাঘবযুগল মানসে সম্মতি দিলেন? বানরজাতির সহিত মানবের সম্প্রীতির ফলে, মানবশাস্ত্রের নূতন সংস্কার হইল, নূতন বিধানের সংস্থান হইল। মানব সংহিতা এ সম্বন্ধ স্বীকার করিল। ইক্ষ্বাকুকুলের গৌরব স্বীকার করিল বলিয়া, বানরজাতির রাজবংশ অযোধ্যার মানবরাজের অধীনে মানব গৌরব লাভ করিল। উভয় জাতির মধ্যে সম্প্রীতি ও সংস্কৃতির বন্ধন স্থাপিত হইল।

এমনি করিয়া সকল জাতির সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম ও আভিজাত্যকে আপনার সংহিতাকার দ্বারা মর্য্যাদা দান করিয়া মানব পরিচয় সার্ব্বজনীন হইল। যে মানবজাতির পরকলত্রাহরণবৃত্তি পৌরাণিক শাস্ত্রে স্থ নিন্দিত, সেই মানবেরই বৃত্তিতে কৌরব কর্ত্তৃক পরকলত্রাহরণ শাস্ত্রে নিন্দিত হইল না, প্রশংসিত হইল। মানব সংস্কারকে মানব যুগধর্মে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে। বাৎস্যায়নের শাস্ত্রও হয়ত যুগধর্মে স্মার্ত্তশাস্ত্রেরই মানব সংস্করণ এবং মনুর সার্ব্বজনীন সংস্করণ হইতে পারে। অধুনাকার মনু-সংহিতা সর্ব্বধর্মাশ্রয়ী এবং সার্ব্বজনীন।

আমাদের একটি সনাতন সংস্কার আছে যে রাক্ষস সর্ব্বগ্রাসী, অন্ততঃ যজ্ঞভক্ষণকারী। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ কথা অনুসারে, সূর্য্যে তিন কোটি লম্বেষ্ঠ নামক রাক্ষস সূর্য্যকে প্রতিদিন গ্রাস করিতে উদ্যত হইত। ক্রমে এই কারণে সূর্য্যের সহিত তাহাদের দারুণ যুদ্ধ হয়। এই সময় ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যায় উপাসনা করিয়া ওঙ্কার সংযুক্ত ও গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত মহাজল নিক্ষেপ করেন, সেই জল বজ্ররূপ ধারণ করিয়া ঐ সমস্ত দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছে।

অর্থাৎ অগ্নি ও সূর্য্যোপাসনা স্বরূপ ওঙ্কারমন্ত্রকে বহু সংখ্যক গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বৈদিক যজ্ঞধর্ম্মবিস্তারের মূলে পৌরাণিক ভারতের বহু শক্তি-শালী সংস্কৃতি বাধা দান করিয়াছে। ভারতীয় মানবের নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে যাহারা সম্মত হয় নাই, তাহারাই রাক্ষস। তাই রাক্ষসে ও দেবমানবে সঙ্ঘর্ষ। পুরাণকার বলিতেছেন, শুক্লযজুরেই যজ্ঞশক্তিতে রাক্ষসের হইল নিধন, বৈদিকাগ্নি হইল সর্ব্বসম্মত।

বর্ণনায় অধীশ্বর ত্রিভুবনপতি রাবণ রাজা ব্রহ্মরাক্ষসকুলের সাদরমান গ্রহণে আগ্রহান্বিত হইতেন। মহাকাব্য যখন এই কথা স্পষ্টভাবে বলিতেছে, তখন রাবণ রাজা রাক্ষস হইলেন কেন? বেদিতেছি, বেদাগ্নি যাঁহার তপোধন, তিনিই দেবকবির অপকারক। মীমাংসা এই যে, যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া অনার্য্যাবর্ত্তবাসী দেবমানব জাতির অধিপতি ইন্দ্রের নামে সঙ্কল্প কি দক্ষিণাদান, অর্থাৎ আধিপত্য স্বীকার—ত্রিভুবনজয়ী রাঘবরাজার পক্ষে এ অসম্ভব। আপন তপোবলে ত্রিলোক বিজয়ের শক্তি যিনি অর্জ্জন করিয়াছেন, এই ঋষিপুত্র সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা মহারাজ রাক্ষস হইয়া গেলেন রাক্ষস দেশের রাজা বলিয়া? না ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া?

যজ্ঞাগ্নি তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই, পরাভূত করিল জায়। বর্ণনাবিভ্রমের ফলে, সর্ব্বজাতির সহিত রক্ত সম্পর্কিত, সর্ব্বজাতির সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত, সকল তীর্থসঙ্গমে স্নাত, ভবাকার সেই অপূর্ব্ব আভিজাত্যের সহিত সারা ভারতের বিনিময় হইল সেতুবন্ধ পথে।

বুলেট্ বনাম মলাট্

আমিনুর রহমান

অনেকদিন পর সে দিন কলেজষ্ট্রীটে এক বইয়ের দোকানে বিশুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বিশুদা আমার 'পোষ্টকার্ড' বইখানা বেরুবার আগে খুবই উৎসাহ দিয়েছিলেন তাই জিজ্ঞেস করলুম "এই যে বিশুদা, এতদিন কোথায় ডুব মেরে ছিলেন? সেই ডামাডোলের বাজারে একদিন যা দেখা, আমার কাছ থেকে একখানা বই নিয়ে গেলেন, সেই থেকে আর পাত্তাই নেই। তারপর কেমন লাগল বইখানা?" বিশুদা একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন "আরে রেখে দেও তোমার ঐ 'পোষ্টকার্ড', কি ফ্যাসাদেই না পড়েছিলুম ঐ অলুক্ষণে বইটা পড়তে নিয়ে।" আমি ত তাজ্জব বনে গেলুম। সামান্য একটা গল্পের বই পড়তে দিয়েছিলুম তার জন্য কোন মানুষ যে ফ্যাসাদে পড়তে পারে কিম্বা আমাকে না-হক্ খানিকটা কথা শুনতে হতে পারে তা আমার ধারণার অতীত ছিল। এতকাল ত বন্ধুবান্ধবদের

কাছ থেকে বইটার তারিফ শুনেই এসেছি, কারও সর্ব্বনাশ ডেকে আনতে শুনিনি। বিশুদার থামা হবার কারণ ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম "কেন বইটার দোষ কোনখানটায় পেলেন?" বিশুদা সমান উত্তেজনার সঙ্গেই বললেন "দোষ কোনখানটায় নেই তাই শুনি? বলি কোন প্রেসে ছাপিয়েছ হে?" বইটার ছাপা চমৎকার হয়েছে বলেই আমার ধারণা, তাই বললুম "কেন বেশ ঝরঝরে ছাপা হয়েছে ত?" বিশুদা বিদ্রূপ করে বললেন "হ্যাঁ ঝরঝরে বলে ঝরঝরে, একেবারে ঝরে পড়ছে, এদিকে আমার যে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হতে চলেছিল সে খবর রাখ?" আমি অধীর হয়ে বললুম "কোই না ত? কেন কি হয়েছিল?" বিশুদা ভেংচি কেটে বললেন 'হয়েছিল আমার শুষ্টির মাথা, বেঘোরে প্রাণটা খোয়াই নি তাই চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি। উঃ এখনও ভাবলে গা শিউরে ওঠে, পেলুম যদি একবার তোমাকে সে দিন, তাহলে—" দোকানে মিঃ সরকার আর মিঃ রায় আমাদের আলাপ আলোচনা বেশ উপভোগ করছিলেন, এতক্ষণে তাঁরাও অধৈর্য্য হয়ে পড়লেন। বিশুদাকে বাধা দিয়ে বললেন "ব্যাপারটা আগে খুলে বলুনই না।" বিশুদা তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনবার শ্রোতা পেয়ে একটু যেন তৃপ্ত হলেন, তারপর বলতে সুরু করলেন "আরে ভাই দুর্ভোগের কথা আর বল কেন। সে দিন ঠিক কি বার ছিল মনে নেই তবে ট্রাম বাস সব ষ্ট্রাইক, পথে ছাত্রদের প্রসেসন, গুণ্ডাদের গুণ্ডামি, পুলিশের লাঠি, আর মিলিটারীর গুলি সবই তাক্ বুঝে চলছে। আমি ঐ অকালকুষ্মাণ্ডর লেখা বইখানা বগলদাবা করে গেলুম ছকুখানসামা লেনে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। বন্ধুটি চোদ্দ নম্বর বাড়ীতে থাকেন আমি খুঁজে মরছিলুম একশ চোদ্দ নম্বর বাড়ী। দুপুর রোদে টো টো করে ছকুখানসামা লেনের আঁকা বাঁকা গলি ঘুঁজি কতক টহল দিয়ে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়ী মুখো হয়ে হাঁটা শুরু করলুম। রাস্তায় তখন লরী পোড়ান আর পুলিশের চেঙ্গাদিদুই-ই চলছিল। সেই দুর্য্যোগের মধ্যে কোন রকমে প্রাণটা হাতে নিয়ে এগলি সেগলির ভেতর দিয়ে হন্ হন্ করে পা চালিয়ে এগুচ্ছিলুম। গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত, দর দর করে ঘাম ঝরছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে এসে আটকা পড়লুম। রাস্তায় লোক জমে জমে ভীড় হয়েছে, আর এগুনো যায় না। নিজের অজ্ঞাতসারে কখন ভীড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছি হঠাৎ কোত্থেকে একটা মিলিটারী পুলিশের গাড়ী হুশ করে বেরিয়ে এসে চুচারটে দুম দুম করে গুলি ছুঁড়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচসাতটা লোক টুপটাপ করে পড়ে গেল। অধিকাংশ লোক বাপ্ বাপ্ বলে পড়ি কি মরি করে পালাল। একদল ছোকরা আহতদের উদ্ধারে ছুটে এলো। একটা রেড্ক্রস্ মার্কা সিভিলসাপ্লায়ের লরী এসে দাঁড়াল, আহতদের ধরাধরি করে তাতে তোলা হল। এরই মধ্যে তিন চারটে ছোকরা—বলা নেই কওয়া নেই—ধাঁ করে আমাকে পাঁজা করে তুলে নিয়ে গিয়ে লরীতে চাপিয়ে দিল। আমি ভয়ানক রকম আপত্তি করলুম "আরে কোরছেন কি মশাই, ছাড়ুন ছাড়ুন, আমার চোট লাগে নি।" কে কার কথা শোনে। একজন বখাটে ছোকরা আবার সান্ত্বনা দিতে লাগল "নার্ভাস হবেন না, ভয়ের কোনই কারণ নেই, এক্ষুণি হাসপাতালে গিয়ে ফার্ষ্ট এড্ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ ট্যাণ্ডেজ করে আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হবে।" গেরো আর কাকে বলে, পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে, এরা কি সহজে রেহাই দেবে। তাও আবার লরীতে বসে থাকবার জো নেই, ঘরে বেঁধে শুইয়ে দিয়েছে। একটা ডাক্তার ছিল লরীতে, দেখে ত মনে হল ঘোড়ার ডাক্তার, উঃ চেহারা দেখেই রুগি কোল্যাপস্ মেরে যায়। তিনি একে একে সবার ক্ষত পরীক্ষা করছিলেন, পাছে বেশি রক্তপাতে পথেই না রুগি কাবার হয়ে যায়। আমার কাছে এসেই ফড়্ ফড়্ করে নতুন জামাটার বগলের কাছটা হাতখানেক ছিঁড়ে ফেলল। আমি হাঁ হাঁ করে উঠলুম, গুণ্ডা গোছের দুই ছোকরা আমাকে আরও শক্ত করে চেপে ধরল, নোটে নড়তেই দিল না। ডাক্তার আমার কাঁধ, বগল, বুক ভাল করে দেখে বললেন, "কোই হে, এর কোন্ জায়গাটা থেকে ব্লিডিং হচ্ছে।" আমি তেরিয়া হয়ে বললুম "আপনাদের মাথা আর মুণ্ডু হচ্ছে, খামকা রক্ত পড়তে যাবে কেন মশাই, আমার লেগেছে নাকি?" একটা ছোকরা বলল "লাগে নি ত রক্তে জামা ভিজল কি করে, নিশ্চয় কোথাও কুপেট লেগেছে।" আমি ঘাড় কাত করে চেয়ে দেখি সত্যিই ত জামার বগলের কাছটা

লালে লাল হয়ে গেছে, আমি একেবারে আঁৎকে উঠলুম, ভাবলুম হয়ত হাতে বুলেট লেগেছে, তাইতো হাতটা অবশ হয়ে গেছে, সেই জন্য হয়ত জ্বালা যন্ত্রণা বোধ করতে পারছি না। আমার মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করতে লাগল, চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলুম, সব যেন কেমন ঘুলিয়ে গেল, আমিও ক্রমে এলিয়ে পড়লুম। যখন জ্ঞান হল আমি তখন মেডিকেল কলেজে। চোখ চাইতেই সেই বগাটে ছোকরাটা বলে উঠল "বলিহারি সাহস মশায়ের, খুব ভড়কে দিয়েছিলেন আমাদের। যান এখন বাড়ী যান্।" আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম "কি করে যাব? ব্লিডিংএ শরীর বড় দুর্ব্বল হয়ে গেছে, আমার যে উঠবার শক্তি নেই।" ছোকরাটা বিদ্রূপ করে বলল "রক্তপাত না ঘোড়ার ডীম। উঠুন, উঠুন, বেড খালি করুন। আর এই নিন আপনার বই। ভবিষ্যতে কোন দিন লাল মলাটের বই বগলে করে রাস্তায় ঘুরবেন না।" লাল মলাটের বই? তখন হুঁশ হল তাইত 'পোষ্টকার্ড' বইটার কভার ডিজাইন এত বেশি লাল কালি দিয়ে ছেপেছে যে এমনি হাতে করলেই হাত লাল হয়ে যায়, আর দুপুর রোদে তা বগলে করে ঘুরলে রং চুঁইয়ে পড়বে সে আর আশ্চর্য্য কি। বড্ড অপ্রস্তুত হয়েছিলুম, তার ওপর ভীড় করে সবাই তামাসা দেখছে, লজ্জায় মুখ দেখান দায়। কোন রকমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। তাতেই কি বিপদের শেষ। আমার ঐ ছেঁড়া লাল জামা আর উদ্ভ্রান্ত চেহারা দেখে রাস্তার কয় করে দুশ দশ জন লোক সহানুভূতি দেখাতে এলো "আহা বড্ড লেগেছে দেখছি, গোলমালটা কোন ধারে বেধেছিল? কোন জায়গায় গুলি লাগল? হেঁটে যাবেন না, মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন"···ইত্যাদি। অতি কষ্টে সেই সব তাল সামলে বাসায় পৌছুলুম। ভাবলুম বাঁচা গেল। কিন্তু জের তখনও মেটে নি, বাড়ীর মধ্যে পা দিয়ে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেলুম। গিন্নির সামনে পড়তেই আমার ঐ অবস্থা দেখে একেবারে আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো "ওমা একি সর্ব্বনাশ হল গো, আমার কি উপায় হবে গো, কে কোথায় আছিস শীগগির আয় রে, মুখপোড়া সাহেবদের মরণ হয় না রে",···অর্থাৎ আমাকে কিছু বলবারই ফুরসৎ দিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে শিল শিল করে লোক জমা হতে লাগল। পাড়া-পড়শি, মেয়ে-মদ্দা, ছেলে-বুড়ো, সবাই আমাকে ঘিরে হাহুতাশ করতে সুরু করে দিল। উঃ তাদের বুঝিয়ে ওঠা কি চাট্টিখানি কথা। সবাইকে ঠাণ্ডা করে নাওয়া খাওয়া সারতে বেলা পাঁচটা বেজে গেল, আর এদিকে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলুম সেই সকাল আটটায় সময় শুধু এক কাপ চা খেয়ে। আচ্ছা বলুন দেখি মশাই, কার না রাগ হয়। এমনটি হবে জানলে ও হতভাগাটাকে বই ছাপবার পরামর্শ দিতুম।

আমার দোষ যে কোন খানটায় হল, তা এখনও বুঝলুম না। যাক্ লাভের মধ্যে একটা ছোট গল্পের প্লট পাওয়া গেল।

জৈন কর্মবাদ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি, ডি-লিট

জৈনদিগের মতে ব্রত পালন, ভিক্ষু এবং ধর্ম্মির সেবা, নিয়মকে অনুধাবন, এবং ধর্ম্মবিশ্বাসিদিগকে দান, এই সব অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তুসমূহের দ্বারা কর্ম্মকে নিষ্ট করা যায়। জৈনেরা বিশ্বাস করে যে পার্থিব বস্তুর প্রতি মমতা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। মানবের দেহ, মন এবং বাক্য পার্থিব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কর্ম্মের সৃষ্টি হয়। রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ ও মানকে প্রশ্রয় দিলে কর্ম্ম বিপাক হয়। মিথ্যা বিশ্বাস হইতেও কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। হিন্দুদিগের মতে পাপকর্ম্মের জন্য ভগবান মানবকে শাস্তি দেন; কিন্তু জৈনেরা বলেন কর্ম্ম মানবকে সৃষ্টি দেয় এবং ইহা নিজে নিষ্ট হয়। হিন্দুরা মনে করেন যে কর্ম্ম নিয়তিরূপ, কিন্তু জৈনদিগের মতে ইহা সাকার। জৈনেরা স্বভাব, প্রাণি এবং মানব হিসাবে কর্ম্মকে ভাগ করে। কর্ম্মের আত্মার সহিত নিত্য সম্বন্ধ আছে। জৈনেরা বলেন যে কর্ম্ম আট প্রকার—(১) জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্ম অর্থাৎ আত্মার নিকট হইতে জ্ঞানকে লুক্কায়িত রাখা; (২) দর্শনাবরণীয় অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্বাস হইতে আত্মাকে দূরে রাখা; (৩) বেদনীয় কর্ম্ম অর্থাৎ আত্মার সুখের স্পৃহা ও দুঃখের তিক্ততা আত্মায় করায়; (৪) মোহনীয় কর্ম্ম অর্থাৎ ইহা পার্থিব মমতা এবং ইন্দ্রিয় সুখ হইতে উৎপন্ন হয়; (৫) আয়ুকর্ম্ম অর্থাৎ কতদিন ধরিয়া প্রাণী ইহজগতে বাস করিবে তাহা নির্ণয় করে; (৬) নাম কর্ম্ম অর্থাৎ ইহা চারটী অবস্থার মধ্যে কোনটী আত্মাদের গতি হইবে তাহা নিরূপণ করে, এবং কর্ম্মের অনেক বিভাগ আছে; (৭) গোত্র-কর্ম্ম অর্থাৎ গোত্র কিংবা জাতি মানবের জীবন, পেশা, বাসস্থান, বিবাহ,

খাদ্য এবং বর্ণশাসন প্রভৃতি বিষয়গুলি নির্দ্ধারণ করে। গোত্র কর্ম্মের দুইটী প্রধান ভাগ আছে। প্রাণী উচ্চ বংশে কিংবা নীচ বংশে কোথায় জন্মগ্রহণ করিবে কর্ম্ম তাহা স্থির করে। আর একটী কর্ম্মের আমরা উল্লেখ করিতে পারি ; ইহা অন্তরায় কর্ম্ম নামে বিহিত। এই কর্ম্ম লাভ, ভোগ, উপভোগ এবং বীর্য্যের অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত।

জৈনদিগের মতে আত্মা সর্ব্বপ্রথমে কর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রভাব অনুভব করে এবং সত্য সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আত্মা পুনর্জ্জন্মের দ্বারা পক্কতা লাভ করে এবং কোনটী সত্য কোনটী মিথ্যা বিচার করিতে সমর্থ হয়। মানব তাহার অতীত সৎকার্য্যের ফলে কিংবা গুরুর শিক্ষার ফলে প্রকৃত ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে, আচারের সার্থকতা বুঝিতে পারে এবং বারটী ব্রত অবলম্বন করে। জৈনেরা বিশ্বাস করে যে যখন মানব অযোগী কেবলীগুণস্থানকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সমস্ত কর্ম্ম নষ্ট হয় এবং সিদ্ধিলাভের জন্য মোক্ষের দিকে ধাবিত হয়।

বৌদ্ধদিগের মতে ভারতবর্ষের কোন একজন প্রাচীন পূর্ণী কর্ম্মবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক। সূত্রকৃতাঙ্গ নামে জৈনগ্রন্থে ভারতবর্ষে তৎকালীন প্রচলিত অনেকগুলি কার্য্যবাদের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম কার্য্যবাদ কিংবা কর্ম্মবাদের অন্তর্ভুক্ত। জৈনগুরু মহাবীরের মতে কার্য্যবাদ এবং অকার্য্যবাদ বিভিন্ন ; অজ্ঞানবাদ এবং বিনয়বাদও বিভিন্ন। গৌতম বুদ্ধেরও ইহাই মত। বৌদ্ধধর্ম্মের কার্য্যবাদ এবং জৈনদিগের সম্যগ্‌দৃষ্টি এক নহে। অকার্য্য, নাস্তিকতা এবং শীলব্রত পরামর্শ (অর্থাৎ আচারধারী) জৈন সম্যগ্‌দৃষ্টির অন্তর্গত। জৈনদিগের কার্য্যবাদ বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অকার্য্যবাদ, অজ্ঞানবাদ, বিনয়বাদ এবং আরও অনেক প্রকার কার্য্যবাদ হইতে ইহার প্রভেদ কি সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

জৈনগ্রন্থ সূত্রকৃতাঙ্গের মতে অকার্য্যবাদ ছয় প্রকার :—(১) ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীগণ বিনষ্ট হয়। দেহাবসানে মানবও নষ্ট হয়। প্রত্যেক মানবের আত্মা আছে এবং যতদিন দেহ থাকে ততদিন আত্মা থাকে। (২) যখন মানব কোন কার্য্য করে বা অপরকে কোন কার্য্য করায় তাহার আত্মা কোন কার্য্য করে না কিংবা অপরকে কোন কার্য্য করায় না। (৩) পাঁচটী পদার্থ আছে এবং আত্মা ষষ্ঠ পদার্থ। এই ছয়টী পদার্থ নষ্ট হয় না। (৪) মানবের নিজের নিজের আত্মা সুখ, দুঃখ এবং মোক্ষ অনুভব করে। সৃষ্ট জগৎ দেবতার দ্বারা শাসিত। ইহা অনাদি হইতে উৎপন্ন। জগৎ অসীম এবং অনন্ত। এই সকল মত বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত চারিটী প্রধান দার্শনিকের মতের অনুরূপ, যথা :—বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত অজিতের নাস্তিকবাদ, কাত্যায়নের অনন্তবাদ এবং কাশ্যপ ও গোশালের অদৃষ্টবাদ। আত্মা দেহ হইতে পৃথক থাকিতে পারে না। দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে জীবন শেষ হয়। জৈনদিগের মতে ছয়টী পদার্থের আরম্ভ ও শেষ নাই। তাহারা অনন্ত। সমস্ত বস্তুর আত্মা আছে। তাহারা ব্যক্তির দ্বারা সঞ্চিত, প্রকাশিত এবং নিম্নস্তরভাবে সংশ্লিষ্ট। কেহ কার্য্য মানে এবং কেহ মানে না। ইহারা উভয়েই অদৃষ্টকে বিশ্বাস করে। অদৃষ্ট যেহেতু ইহারা জগতে সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

জৈন উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের মতে জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাই অজ্ঞানবাদ। অজ্ঞানবাদীরা মনে করে যে তাহারা খুব বুদ্ধিমান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ভাব সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের শীলব্রত পরামর্শ এবং জৈন অজ্ঞানবাদ অভিন্ন। শীলব্রত পরামর্শ শব্দের অর্থ এই যে কতকগুলি শীল এবং কতকগুলি ব্রত পালনের দ্বারা মানব বিশুদ্ধতা লাভ করে। যাহারা বিনয়বাদ ঘোষণা করে তাহাদের মতে ধার্ম্মিক লোক দুশ্চিন্তার নিয়মাবলী উপলব্ধি করিয়া ধার্ম্মিক জীবনের চরমোৎকর্ষ লাভ করে।

নিম্নলিখিত কার্য্যবাদগুলি জৈনদিগের নিকট ভাল বলিয়া মনে হয় না :—(১) বিশুদ্ধ মানবের আত্মা মোক্ষ প্রাপ্ত হইলে পাপ কর্ম্ম হইতে দূরে থাকে কিন্তু এই অবস্থাতেও আত্মা দোষের দ্বারা পুনরায় কলুষিত হইতে পারে। (২) যদি কোন মানব দেবতার নিকট বলির ইচ্ছায় একটী লাউকে শিশু মনে করিয়া আঘাত করে তাহা হইলে সে হত্যাপরাধী হইবে। যদি কোন মানব একটী লাউকে ভাজিবার উদ্দেশ্যে কোন একটী শিশু মনে করিয়া ভাজে তাহা হইলে সে হত্যাপরাধী হইবে না। মহাবীরের মতে নিজের কর্ম্মের দ্বারা নিজের সুখের অবস্থা আনয়ন করা যায়। নিজের কর্ম্মের দ্বারা মানবের সুখ দুঃখ আসে। ব্যক্তিগত-ভাবে মানব জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং একবার পতিত হইলে আর উঠিতে পারে না। মানবের রাগ, বিজ্ঞান, বেদনা, বুদ্ধি সকলই তাহার নিজের। সকল প্রাণী তাহার কর্ম্মহেতু এই জগতে জন্মগ্রহণ করে। পাপী লোক নূতন কর্ম্মের দ্বারা পুরাতন কর্ম্মকে নষ্ট করিতে পারে না। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কার্য্য হইতে বিরত হইয়া কার্য্যের বিনাশ সাধন করে। ইহাই জৈনদিগের "নবতত্ত্ব"। ইহা ক্রিয়াবাদ (কার্য্যবাদ) হইতে বিকশিত। কর্ম্ম দুই প্রকার, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। আত্মা কর্ম্মের প্রভাব অনুভব করে। পাপ এবং পুণ্য সকল প্রকার কার্য্যই আত্মাকে জন্ম এবং মৃত্যুর সহিত সংশ্লিষ্ট করে। সুব্রত পালনের দ্বারা আত্মার উপর কর্ম্মের সংগৃহীত ফল বিনষ্ট হয়। জৈনদিগের মতে ইহাই নির্জ্জরা। সংক্ষেপে বলিতে হইলে মহাবীরের মতে জন্ম কিছুই নহে, জাতি কিছুই নহে, কর্ম্মই সর্ব্ব এবং কর্ম্মনাশের উপর মানবের ভবিষ্যৎ সুখ শান্তি নির্ভর করে।

আত্মার কার্য্যকেই কর্ম্ম বলে। কর্ম্মই আত্মাকে নিজের উৎপত্তি স্থলে কিংবা পূর্ব্বজ্ঞান এবং চিরশান্তির স্বাভাবিক অধিকারে নিবদ্ধ করে। চার প্রকার অনিষ্টকর কার্য্য (ঘাতির কর্ম্ম) আত্মাকে পার্থিব জগতে বদ্ধ করিয়া রাখে। চার প্রকার অনিষ্টকর কর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। (১) যে কর্ম্ম জ্ঞান নাশ করে, (২) যে কর্ম্ম বিশ্বাস নাশ করে, (৩) যে কর্ম্ম আত্মার বিকাশের অন্তরায় হয়, এবং (৪) যে কর্ম্মের দ্বারা আত্মা প্রতারিত হয়। জৈন অন্যান্য বিষয় কর্ম্মের স্থান উচ্চে। জৈনধর্ম্ম কর্ম্মজনিত পাপগুলিকে দূর করিতে মানবকে শিক্ষা দেয়।

জৈন কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা

করেন তাঁহারা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে পারেন :—১। সূত্র-কৃতাঙ্গ, ২। উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, ৩। উপাসকদশাঙ্গ সূত্র, ৪। অন্তকৃদ্দশাঙ্গ সূত্র, ৫। উত্তরাধ্যয়নসূত্র, ৬। প্রজ্ঞাপনাসূত্র, ৭। নন্দীসূত্র, ৮। অনুযোগদ্বার, ৯। দশবৈকালিক সূত্র, ১০। উত্তরাধ্যয়নসূত্র, ১১। বিপাকশ্রুতাঙ্গ, ১২। দশাশ্রুতস্কন্ধ, ১৩। বৃহৎকল্প, ১৪। ব্যবহারসূত্র, ১৫। নিশীথসূত্র, ১৬। আবশ্যকসূত্র, ১৭। পিণ্ডনির্যুক্তি, ১৮। ওঘনির্যুক্তি। অধ্যাপিকা শ্রীমতী হীরাকুমারী জৈন, এম-এ, সাহিত্যরত্ন, জৈনদর্শনশাস্ত্রী, ২০। পঞ্চাস্তিকায়সময়সার, ২১। বিনয়, ২২। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২৩। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, ২৪। জৈন সূত্র (এস-বি-ই), ২৫। সংপ্রতি মহাবীর, তাঁহার জীবন ও শিক্ষা ২৬। জিমেস্ ষ্টিভেন্সন্ প্রণীত দি হার্ট অব্ জৈনিজম্, এবং ২৭। বাহার ও ঘোষ প্রণীত এপিটম্ অব্ জৈনিজম্।

নেই তাই খাচ্চ

শ্রীমোহিতকুমার গুপ্ত

ওমা একি হলো ?

রমানাথ সামনে দাঁড়াতেই সকলে একটা ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠল। সন্ধ্যার আবছায়ায় রমানাথের মুখটা খুব স্পষ্ট না দেখা গেলেও সে যে বিশেষ ভয় পেয়েছে, মনে হলো না। তবে কি যেন একটা অভাবনীয় ঘটে গেছে সে ভাবটা সকলের মুখেই পরিস্ফুট।

এই রকম তীব্র আহ্বানেও রমানাথ নিরুত্তর রইল। স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে নীরবে সে পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ালো। ঘুরতেই মুখোমুখি হলো বাড়ীর ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। খেলাধুলো সাঙ্গ করে হাস্‌তে হাস্‌তে, নাচ্‌তে নাচ্‌তে তারা এইমাত্র বাড়ী ফিরলো। রমানাথকে প্রথমে ভাল করে লক্ষ্য করেনি। তাদের হর্ষোল্লাসের মাঝে রমানাথের মুখটা যেন হঠাৎ ক্যামোফ্লেজ-মুক্ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মত দ্রষ্টব্য হয়ে উঠলো। রমানাথকে কেন্দ্র করে বারকয়েক তারা লাট্টুর মত ঘুরে গেল। তারপরই অদম্য উৎসাহ-ভরা গ্যাসে-পোরা বেলুনের মত ছেলেপিলেগুলো এদিক ওদিক ছিট্‌কে পড়ল। সকলেরই চোখে-মুখে যেন লেখা "ওমা, একি ?"

বিস্ময়সূচক অস্ফুট-শব্দের-হাউইয়ে জায়গাটায় হাওয়া গেল বদ্‌লে। ছোট বড় নানা রকম সাইজের হাউই পেটফেঁসে বেরোবার চেষ্টা করতে লাগল। তার মধ্যে কেউ কেউ যেন আবার সফেন-উচ্ছ্বসিত খাঁটি বাঘরণের-সোডার বোতল। ফুস্‌-ফুসে হাসি, কুল্‌-কুলে হাসি, আর খুক্‌-খুকে হাসির উচ্ছ্বাসে ঘরটা ভেসে যাবার দাখিল।

বর্ষীয়সীরা মন্তব্য করলেন—ছি ছি, কি ঘেন্না! মেয়ে-পুরুষে আর তফাৎ রইল না।

রমানাথ তখন প্রায় সদর দরজার কাছে। কি যেন ভেবে হঠাৎ সোজা চলে গেল তিন-তলায়। যাবার সময় শুনতে পেল, তখনও পুরোদমে হল্লোড় চল্‌ছে। কি বিশ্রী, বিট্‌কেল, এ-ম্যা এবং আরো কত কি।

রমানাথকে ওপরে যেতে দেখে একতলা, দোতলায় যে-যেখানে ছিল হুড়্‌দাড়্‌ করে বেরিয়ে এলো। সিঁড়ির পাশে সকলেই ব্যগ্রোৎসাহে ভিড় করে রইল চাতকের মত তিনতলা অবধি দৃষ্টি চালিয়ে। সম্প্রতি এক শাহন্‌শাহকে দেখে কলকাতার শহর ঠিক এমনই ভাবে ঝুঁকে পড়েছিল।

বড়ের মত রমানাথ যেই ওপরে গেল, নিমেষে নিস্তব্ধ হয়ে গেল বাড়ীটা। তিন-তলায় অকস্মাৎ ভিসুভিয়াসের তাণ্ডবলীলা সুরু হয়ে গেল।

'কেন জিজ্ঞেস করলি ?'

'মত সব অনাছিষ্টি।'

'আমাদের কালে কখনো এমন ছিল না।'

বলা বাহুল্য, রমানাথও চুপ করে ছিল না। তারও গলা শোনা গেল—'আমার ইচ্ছে।'

আবার সব চুপচাপ। দেখতে দেখতে সিঁড়ির ভিড় পাতলা হয়ে বাড়ীময় সব ছড়িয়ে পড়লো। কুচোকাচাগুলো চাঁচাছোলা গলায় যথারীতি চীৎকার সুরু করে দিলে—দিল্লী চলো, ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ, জয়হিন্দ। বৌয়েরা সেলায়ের কলে, কুটনোয় বঁটিতে, পানের বাটায় ও মেয়েরা অভ্যাসমত কেউ কেউ বারান্দায়, জানালায় বা ছাদের আল্‌সের পাশে চলে গেল।

রমানাথ যখন নীচে নাম্‌লো, সিচুয়েশন্ তখন একরকম নর্ম্যাল্ বলা যেতে পারে। ছেলেপিলেগুলোও চেঁচিয়ে

চেঁচিয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রমানাথ ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলে। দেওয়ালের ব্র্যাকেটে সবুজ আলো রমানাথের চোখে খুব মনোরম ঠেক্‌লো। আশ্চর্য্য, আলোর তলায় ওয়াল্-ক্লকের কাঁটা দুটোও সটান্ হয়ে শুয়ে পড়ে স'-নটা বাজিয়ে রেখেছে এরি মধ্যে! পাক্কা দু'ঘণ্টা কেটে গেছে?

কতক্ষণ তাকিয়ে ছিল রমানাথের আন্দাজ নেই। হঠাৎ দেখলে ঘড়ির কাঁটা দুটো বেমালুম কখন্ সাফ হয়ে গেছে। এখন স'-নটা কি আড়াইটে বোঝবার কোন উপায় আর নেই। কাঁটা নেই অথচ ঘড়ি! কোন মানে হয় না। কি দরকার অত বড় একটা কাঁচ-বাঁধানো কাঠের ফ্রেম্‌কে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখবার? এক-দুই-তিন থেকে বারোটা রোমান্-সংখ্যা-আঁকা ঘড়ির ডায়াল্‌টার ওপর রমানাথের দৃষ্টি অঙ্কের মত চলাফেরা করতে লাগলো।

কাঁটাশূন্য তেলা ডায়াল্‌টার ওপর রমানাথের অত্যন্ত করুণা হলো। বারোটা অঙ্ক বুকে নিয়েই গর্ব্বে ঝক্‌মক্ করছে, অথচ বেচারার এ জ্ঞান নেই যে যার জন্যে তার কদর সেই সময়ের-ঠিকেদার যমজসেপাই বড়-ছোট দুই-কাঁটা উধাও হয়েছে। দম্-দেওয়া দুটো ফুলে-ফুলে চোখ দিয়ে ঘড়িটা রমানাথের দিকে চেয়ে-চেয়ে বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে মনে হলো। দুটো ফুলে চোখই তার ক্রোধে জ্বলে উঠলো—কী, আমাকে করুণা? বোকা কোথাকার, কাঁটা এক-ভজন গেলে দু'ভজন আস্‌বে। কিন্তু কল্-কব্জা বিগড়োলে দুশো কাঁটা থাক্‌লেও তাকে ঘড়ি কেউ কল্‌বে না। কল্‌বে—'বোড়া!'

চিরস্তারে রমানাথের ক্ষুব্ধ মন আস্ফালন করে উঠলো এবং মুখ থেকে ফস্‌কে বেরিয়ে এলো—'ঘোড়ার ডিম্'।

জান্‌লার পস্‌খস্ আওয়াজ শুনে রমানাথ তাকিয়ে দেখে সেনের বুড়ো ঘোড়াটা গরাদেতে নাক ঘস্‌ছে। শ্যামবাজার থেকে শালার ঘোড়া অসময়ে কেন? রমানাথের শালার ঘোড়ার গাড়ীর বিজনেস্। ঘোড়াটার মুখ দিয়ে ফলকে-ফলকে ফেনা গড়াচ্ছে, আর ফুরের খটাখট্ ঘর্ঘণে শান্-বাঁধানো ফুটপাথ থেকে আগুনের ফুল্‌ঝুরির মত।

রমানাথ বল্লে—কি খবর?

ঘোড়াটা হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লে—ডাকলে কেন?

রমানাথ আশ্চর্য্য হয়ে গেল—সেকি? তোমায় ত আমি ডাকিনি।

আল্‌বৎ ডেকেছ, নইলে এম্‌নি আমি ছুটে আসিনি।

রমানাথ বল্লে, কখন আবার তোমায় ডাকলাম?

আর এক ঝলক্ ফেনা উগরে, পায়ে আগুনের ফুল্‌ঝুরি উড়িয়ে চিঁহিঁ-হি আওয়াজে কানে তালা ধরিয়ে দিলে একরোখা ঘোড়াটা—ঘড়িও দেখতে জান না বল্‌তে চাও? স্বাকামী করে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কখন ডাক্‌লাম? কটা বেজেছে নিজেই দেখ না?

ঘোড়াটারও যত রোষ, ঘড়িটাও যেন তত হাসিতে ফেটে পড়ছে। এদিকে নাক-মুখ দিয়ে হড়হড় করে ফেনা গড়াচ্ছে, আর ওদিকে ঘড়ির স্প্রিংটা ঘড়-ঘড় করে এক-নাগাড়ে উল্টো দিকে ঘুরে আদ্ধা হয়ে চলেছে। বিশ্রী আওয়াজে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়।

রমানাথ প্রাণপণে কানে আঙুল দিয়ে চেপে রইল।

সেনের ঘোড়া দাঁত বার করে বল্লে—খবরদার আর যেন মুখ আল্গা করো না। মনে করেছ যে ঘোটক-সম্প্রদায় চিরকাল বাঙালীর ঐ অর্ব্বাচীন উক্তি নির্ব্বিবাদে সহ্য করে যাবে? যখন-তখন কায়দার মাথায় যে 'ঘোড়ার ডিম্' বলে বসো, তাতে আমাদের আভিজাত্যে কত বড় আঘাত লাগে তা জাতীয়তাকামী হয়েও তোমরা বুঝতে পার না?

রমানাথ জিজ্ঞেস কর্‌লে—কেন?

ঘোড়া তার চিঁহি গলায় বল্লে—ঘোড়ার 'বাচ্চা' বল্লে ক্ষতি নেই, কিন্তু 'ডিম্' অসহ্য। আমরা যদি তোমাদের বলি 'মানুষের ডিম্'—মাথা ঝন্‌ঝিন্ করে না তাহলে? গোঁফ সুড়্‌সুড়্ করে না? একটুতেই ত গোঁফে তা' দিতে সুরু করো—পাখীদের ডিমে তা' দেওয়ার মত।

কেঁদো কাঠবিড়ালীর লেজের মত একজোড়া সুপুষ্ট গোঁফ রমানাথের নাকের নীচে বন্দুকে ব্যা-দেওয়ার মত টং-করে আস্ফালন করে উঠলো—ভীষণ রাগে ও অপমানে। গোঁফের সরু ডগা দুটো পুষির লেজের মত পাকিয়ে কয়েকবার কেঁপে উঠ্‌ল। রমানাথ বল্লে, তোমার কোন যুক্তি আমি শুনতে চাই না। আসছে ইলেক্‌শনের পর এসেম্‌ব্লিতে তোমাদের পার্টি-রিপ্রেসেণ্টেটিভ্ মারফৎ দাবী পেশ করো, তখন দেখা যাবে। কাপুরুষের মত নিরীহ

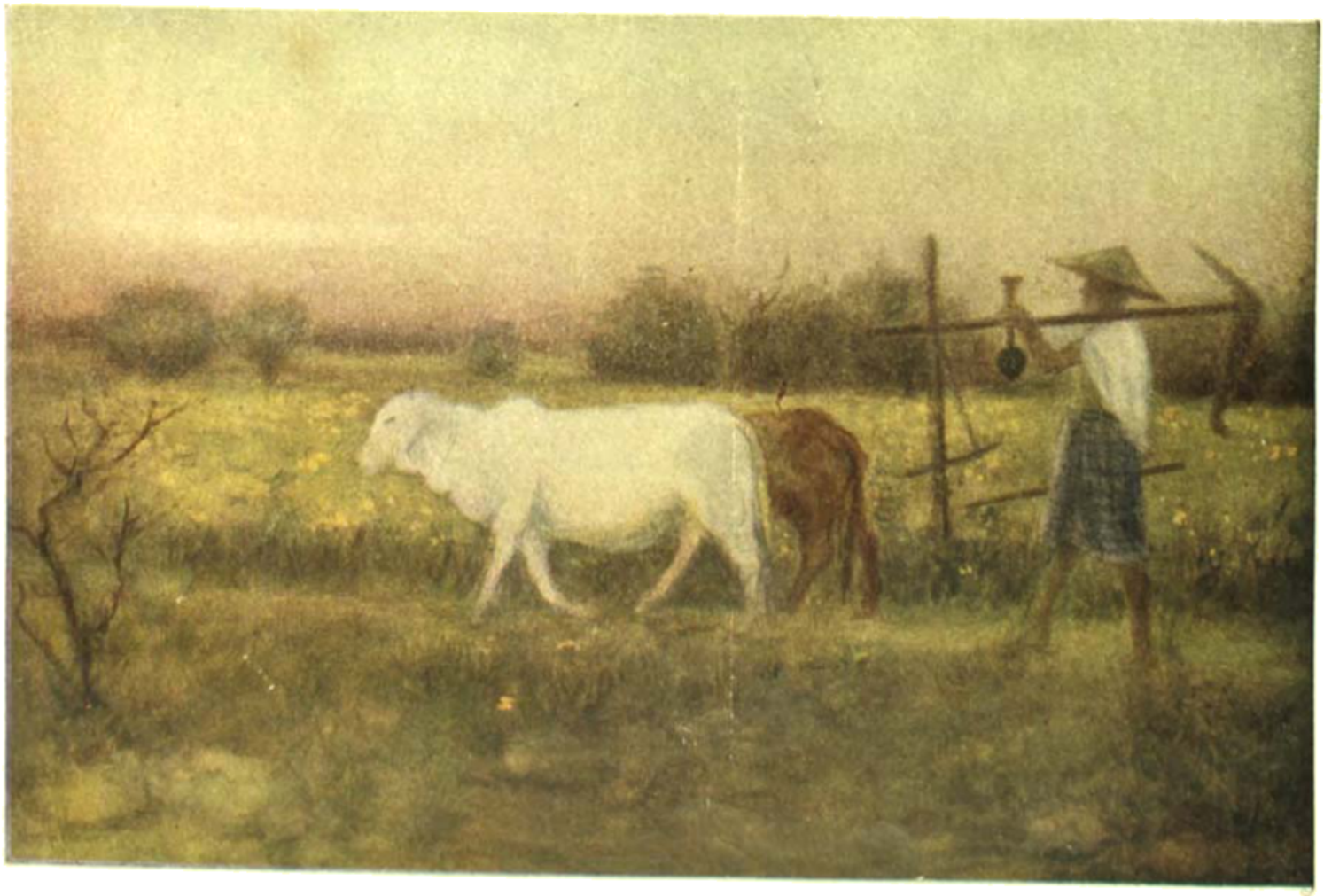

শিল্পী—হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

সাঁঝের পল্লী

ভারতবর্ষ আর্ট স্টুডিও

লোককে একা পেয়ে বাড়ীতে আক্রমণ করো না, ভাল হবে না। বি স্পোর্টস্‌ম্যান্-লাইক্।

'ভেরি-ওয়েল'—মনে থাকে যেন কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা থেকে রেস্-গ্রাউণ্ডে বেটিংএর পেছনে আমরাই আছি। সেনের ঘোড়াটা হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো। তারপর চিঁহি-হি শব্দে দশদিক কাঁপিয়ে ক্ষুরে ক্ষুরে আগুনের ঝিলিক্ তুলে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘোড়াটা।

একি দিনকাল হলো, বাংলাভাষীও ব্যবহার করা যাবে না প্রাণ-খুলে? রমানাথ নিষ্ফল আক্রোশে গজরাতে লাগ্‌লো।

ঠিক্ তাই—ঘড়িটা টক্ করে বলে উঠলো—ভাষা আছে ব্যবহারের জন্যে, অপব্যবহারের জন্যে নিশ্চয় নয়।

চোপ্‌রাও, এক ঘুঁসিতে তোমার বাঁদরামি ঘুচিয়ে দেবো।

ঘড়িটা হেসে উঠ্‌লো।—সুইজারল্যাণ্ডের মত কারখানা থেকে গড়ে-পিটে, ঘসে-মেজে আমি এসেছি। আঘাতের ভয় আমি করি না। আঘাতের ভেতরেই আমার জন্ম, আমার প্রাণ। তা ছাড়া, তুমি আজ যদি আমার ছেলেমানুষী করে ভাঙো, কালই আবার ছুটবে মিস্ত্রীর কাছে আমাকে তৈরী করবার জন্যে। ঠিক কিনা? শুধু মাঝখান থেকে তোমার হাত কেটে রক্তারক্তি হবে। তার চেয়ে ছুটো মজবুত কাঁটা নিয়ে এসো। বুকে আমার বিঁধে দাও, সময় শুনে বাঁচি। কতক্ষণ আর এ ভাবে থাকব?

সুইজারল্যাণ্ডের কাঁটা ত আমার নেই। এখানকার কাঁটায় তোমারও আভিজাত্য হানি হতে পারে ত? রমানাথ ব্যঙ্গ করল।

তোমার টাক ঢেকেছ পরচুলো দিয়ে, তাতে যদি তোমার মাথা নীচু না হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কাঁটা দিয়েও আমার মান বাঁচানো চল্‌বে বলে মনে হয়—ঘড়ি জবাব দিলে।

বেশ, আমি তোমার কাঁটা দেবো। কিন্তু ঘোড়ারা কি সত্যি সত্যিই ক্ষেপে গিয়ে ধর্মঘট করবে শেষ পর্য্যন্ত, যদি বাংলাভাষা থেকে ঐ কথাটা বাদ না দেওয়া হয়?

না, হঠাৎ বাদ দিয়ে বস্‌লে বাগ্‌দেবী রুষ্টা হতে পারেন। কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরং একটা বোর্ড তৈরী করা হোক্ অবিলম্বে, অনুসন্ধান করা হোক্ কথাটার অন্য কোন ভাল অর্থ আছে কি না। যদি থাকে ত ভালই, অভিধানগুলোয় একটা শুদ্ধিপত্র সেঁটে দিলেই হবে। আর তা যদি নিতান্তই অসাধ্য হয়, তাহলে সরকারের অনুমতি-ক্রমে একটা ট্যাক্স বসিয়ে দিলেই হবে ঐ কথাটার ব্যবহারের ওপর। একবার ব্যবহার করলে এক সিকি, দু'বার দু'সিকি, তিনবারে তিন এইভাবে। সেই টাকা দিয়ে ঘোটক-কুল-উন্নয়িনী সভা প্রতিষ্ঠা করে রাস্তায় রাস্তায় পোষ্টার্ দিয়ে ঘোড়ার পুষ্টি, কৃষ্টি অর্থাৎ ক্ষুরের উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

'এতেই কি ঘোড়ারা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে? কাঁকা বুলির ওপর তারা আস্থা স্থাপন করবে কেন? তারা যদি বলে ঐ কথাটার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চাই-ই-চাই। নইলে রেসে ঘোড়া দৌড়বে না, কর্পোরেশনে ময়লা ফেলবে না, প্রাইভেট মালিকদের উল্টে রাস্তায় ফেলে দেবে, গাড়ী টেনে থানায় ফেলে দেবে, কোচম্যান্‌দের চাট মারবে?

ঘড়িটা বিজ্ঞের মত জবাব দিলে, বেশীদিন ভাঁওতা দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করলে, ঐ রকম হওয়া আশ্চর্য্য নয়। আজকাল দিনকাল বড় ভাল নয়। কেঁচো খুঁড়তে সাপ হামেশাই বেরোচ্ছে। তার চেয়ে প্রধান প্রধান ঘোড়ার আস্তা থেকে প্রতিনিধি ডেকে রেস্ গ্রাউণ্ডে একটা ইমার্জেন্সি মিটিং কল্ করুন কালই, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

তা হলেই হবে? রমানাথ প্রশ্ন করলে।

তবে একটা কথা, তাদের দ্বিতীয় অবশ্যম্ভাবী অভিযোগটা সম্বন্ধেও অবহিত থাকবেন একটু।

কথা—রমানাথ জিজ্ঞাসা করলে।

ওদের ঘাড়ের রোঁয়া আর লেজের ভার ছেঁটে-কেটে লঘু করতে চেষ্টা করবেন না। ওরা 'ডিম্' আন্দোলনে সফলকাম হলেই 'রোঁয়া' আর 'লেজ' আইটেম্ ছুটো নিয়ে ভীষণ উঠে পড়ে লাগ্‌বে।

তুমি এত কথা কি করে জানলে?—রমানাথ আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ তিনটাই আমার অনুগত শিষ্য—সে কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন, রমানাথবাবু? ওদের মারফৎ সব খবরই আমি রাখি। ঘড়ি খুব মুরুব্বি চালে জানালো।

তাহলে আমার ভবিষ্যৎটা একবার বল দেখি—অনুনয় করলো রমানাথ।

ঘড়ি কিক্ করে হেসে বল্লে—ওপর-চালাকি ক'রো না মাইরি। ছেলে কড়ি মাখ তেল। সোজা কারবার, ঘারপ্যাঁচ নেই। আমার কাঁটা দুটো জোটাও আগে, পরে অন্য কথা। তুলিয়ে ভালিয়ে অনেক গোপনতত্ত্ব জেনে নিয়েছ।

দেবো, দেবো, নিশ্চয় দেবো।

তিন সত্যি করলে ত?

হ্যাঁ—রমানাথ বল্লে। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ বল।

ঘড়ি বল্লে—আজ নগদ কাল ধার।

কিন্তু আমার ধার ক্ষুর-ধার—বলে উঠ্‌লো টেবিলের কোনে-রাখা কামাবার ব্লেডটা। রমানাথ সেদিকে তাকাতেই চুম্বকের মত তড়াক্ করে ব্লেডটা লাফিয়ে রমানাথের শক্ত গোঁফ-জোড়াটা কুচ্ করে দিলে কেটে। পাইলটের বুকে আঁটা "জোড়া-পাখা" সিম্বলের মত গোঁফ জোড়াটা একটা ভাইভ্ দিয়ে ঘড়িতে গিয়ে কাঁটার জায়গায় আট্‌কে গেল। সুইজারল্যাণ্ডের কাঁটা দুটোর বদলি হিসেবে গোঁফ-জোড়াটা এখন কিছু বেমানান্ হলো না।

ঢং ঢং করে গোটাকতক ঘণ্টা বাজিয়ে ঘড়িটা সোল্লাসে বলে উঠ্‌লো—থ্যাঙ্কস্, বিগ্ ব্রাদার ব্লেড।

'নাকের বদলে নরুন্ পেলাম্'। বন্ধুত্বের ঋণ অপরিশোধ্য। তোমাকে চাইলে লোকে আমাকে স্মরণ করবে আজ থেকে—তোমার নতুন নাম দিলাম—'লেভেন্-ও-ক্লক্'।

খুশীতে ব্লেড চক্‌চক্ করে উঠ্‌লো।—থ্যাঙ্ক্ ইউ লো মাচ। কিন্তু নামটা আমার 'ভলারের দেশ' থেকে রেজিষ্ট্রি করিয়ে দাও। নইলে লক্ষ্মীর মত "মেয়েদের ব্রত কথা"য় থাকবো আমি চিরাবদ্ধ হয়ে—জগদ্বিখ্যাত হওয়া আমার ভাগ্যে ঘট্‌বে না।

ঢং করে একটা ঘণ্টা দিয়ে ঘড়ি বল্লে—তথাস্তু।

একটা বাজতেই রমানাথ চোখ খুলে দেখ্‌লে একটা আরশোলা তার দীর্ঘবিলম্বিত গুঁয়ো দিয়ে তার সদ্যো নির্গুন্ধ ঠোঁটের ওপর সুড়্‌সুড়ি দিচ্ছে।

আরশোলাও তাকে টেক্কা দিলে আজ গোঁফে।

এত বছরের পুরোন নেহাৎ আপনার গোঁফ-জোড়াটা বিকেলে কামানো এতোক্ বাড়ীর সকলের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছে। আয়নিতে ভাল করে দেখে রমানাথ মনে মনে বল্লে, বড় জোর মাস খানেক। তার মধ্যে গজিয়ে উঠ্‌বে নিশ্চয়ই।

স্বপ্নটা মনে পড়তেই রমানাথের হাসি পেল বেদম্। কি বিদঘুটে।

গোঁফ হারিয়ে গল্প লাভ? সেই ছড়াটা রমানাথের মনে পড়ল—

নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।

সাধ

শ্রীবীণা দে

সাধ হয় মনে ও রাঙা চরণ
দু'তে দি' সরম জলে,—
সকলেরই জলে ধরিয়া সিনান
দুটাই ও পরতলে।
মনে সাধ হয় পরশিতে তায়,
ছুঁতে লাগে মনে ভয়,—
কী জানি কী হবে বুঝিবে বাজিবে
মম সবে প্রেমার জয়।

সখী, বঁধু সে কোমলতম—
কেমনে হইল আমার এ দেহ-
পেলব দুরুহ দম?

বড় সাধ হয় দুড়ি' ও হৃদয়
মালা হ'তে দুলে থাকি,—
তবে হয় নীর হয় যেন
কিছু নাহি রয় বাকি।

নঞ্জুতৎপুরুষ

বনফুল

১৪

"দেখলেন? দেখলেন কাণ্ডটা?" দিলীপ ঢুকেই ফুলল পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে গেল।

"আপনার কপালটাই খারাপ" পুরন্দরবাবু উত্তর দিলেন—অর্থাৎ যা ভেবে এসে ছিলেন। বুকের ব্যথাটা এখন বেড়ে উঠছিল যে ভেবে মিষ্টি উত্তর দেবার ধৈর্য্য থাকছিল না তাঁর আর।

"আমার প্রতি সহানুভূতিবশতঃই আপনি রেজলেটটা দেখতে দেন নি নিশ্চয়"

"সময় পেলাম কোথা···"

"আপনার কষ্ট নিশ্চয়ই হয়েছিল, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আপনি"

"খাঁ কষ্ট হয়েছিল বই কি" ব্যথা হয়ে পুরন্দরবাবুকে বলতেই হল। তিনি সংক্ষেপে ব্যাপারটা বর্ণনা করলেন—পারুলের আগ্রহাতিশয্যেই যে রেজলেটটা নিয়ে এসেছেন তাও বললেন।

"পারুল অত জোর না করলে কিছুতেই নিতাম না আমি···এমনিতেই তো নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেছি"

"পারুল আপনাকে সম্মোহিত করে' ফেলেছিল, সোজা কথা বলুন না"

"কি যা তা বলছেন। এখনই তো দেখলেন যে পারুলের আপনার উপর বিদ্বেষের কারণ আমি নই। কিন্তুরে অন্য লোক আছে"

"আরে। কিন্তু আপনিও সম্মোহিত হয়েছিলেন"

ফুলল চেয়ারে বসে' গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল।

"আপনি কি ভাবছেন ঠোঁটাটার ভয়ে ভড়কে যাব আমি? কালই চাটনি বানিয়ে ফেলব ব্যাটাকে, ফুলল। ঠোঁটা দিয়ে যেমন করে মশা তাড়ায়, ঠোঁটা দিয়ে ধুলো ঝাড়ে—তেমনি করে' ফিরে করব"

এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে' আবার ঢাললে। বেশ 'মাই ডিয়ার' হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

"পারুলবালা দিলীপকুমার, দাশিকজোড় আমার, দরি দরি—হি—হি—হি" রাগে বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল তার। আর একটা ঘায় পড়ল খুব জোরে—এক ঝলক বিদ্যুতের আলো জানালা দিয়ে ঢুকল। বৃষ্টিও সুরু হল মুষলধারে। ফুলল উঠে জানালাটা বন্ধ করে' দিলে।

"আপনাকে জিম্মেন করছিল যায় পড়লে আপনি জল খায় কি না। হি—হি—হি। আপনার মরণও পঞ্চাশ মাইলেরে—খাঁ—খিঃ খিঃ—"

নৈশাচিক ভাব ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

"মনে হচ্ছে রাতটা এখানেই কাটাবেন আপনি" অতি কষ্টে পুরন্দরবাবু কথাগুলো উচ্চারণ করলেন। ব্যথাটা বেশ বেড়ে উঠছিল—"আমি শুয়ে পড়ছি, আপনি যা খুশী করুন"

"এই বৃষ্টিতে যেতই কি করে' বলুন"

"বেশ তো থাকুন না, যত খুশী মদ গিলুন, গিলে শুয়ে পড়ুন"

পুরন্দরবাবু সোফাটায় লম্বা হয়ে শুলেন এবং মৃদু আর্ত্তনাদ করলেন।

"রাত্রে থাকতে বলেছেন আমাকে? ভয় করবে না আপনার?"

"কিসের ভয়?" মাথা তুলে প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

"না, কিছু নয়। সেবার ভয় পেয়েছিলেন না? তাই বলছি—"

"এত বারে কথাও বলতে পারেন"

পুরন্দরবাবু রেগে বেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলেন।

ফুললের মুখে একটা অদ্ভুত নীরব হাসি ফুটে উঠল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। সমস্ত দিনের মানসিক ও দৈহিক উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যথায় চোখে ঘুমুতে পারলেন না বেশীক্ষণ, ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম ভেঙে গেল। আস্তে আস্তে উঠলেন তিনি বিছানা থেকে। ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে, সমস্ত ঘরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরতি, টেবিলের উপর খালি বোতলটা পড়ে রয়েছে, আর একটা সোফায় ফুলল ঘুমুচ্ছে। চিৎ হয়ে ঘুমুচ্ছে, জামা জুতো কিছু খোলে নি। পুরন্দরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে খানিকক্ষণ। দুঃখ হল। জাগালেন না তাকে। আস্তে আস্তে ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, ব্যথায় চোখে শুতে পারছিলেন না। ভয় করছিল তাঁর এবং ভয় করবার কারণও ছিল। এ রকম ব্যথা মাঝে মাঝে বছরে দু'একবার হয় তাঁর, এর বরখবারা জানা আছে ভাল করে'। নিদারুণ ব্যথা। প্রথমে কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ভাব হয়, তারপর বুকের কোন একটা জায়গায় কাঁপের কাছে বরাবর টন টন করতে থাকে। তার পর বেড়ে চলে ক্রমশঃ। দশ ঘণ্টা যায় ঘণ্টা চলে, শেষে মনে হয় প্রাণটা বেরিয়ে গেল বুঝি। বছর খানেক আগে সেবার হয়েছিল। এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন যে হাত পর্য্যন্ত বাড়তে পারছিলেন না—ডাক্তারে পাতলা সুপ ছাড়া আর কিছু খেতে দেয় নি। পরে একবার ক্রমাগত বমি হয়ে তবে কমল। সেক দিলেও কমে যায় অনেক সময়। যখন কমে তখন হঠাৎ কমে যায়।···দেখতে দেখতে ব্যথাটা বেড়ে উঠল খুব। হৃদ বন্ধ হয়ে আসছে যেন। এত রাত্রে ডাক্তার ডাকা মুস্কিল—হুট করে ডাকতেও চান না—কতকগুলো বাজে খরচ এসে যাবে এতে। ব্যথায় কাতরাতে লাগলেন···কাতরাণির শব্দে ফুললের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসল সে এবং হতভম্ব হয়ে রইল খানিকক্ষণ। পুরন্দরবাবু ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন।

"আপনার ব্যথাটা বাড়ল না কি? শেক দিন, কম্‌ফেড্। চাকরটাকে ডাকব?"

"না থাক"

কিন্তু দুখন ব্যস্ত হয়ে উঠল। এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল যেন তার একমাত্র ছেলের প্রাণ-সংশয়। পুরন্দরবাবুর কথায় কর্ণপাত না করে' সে চাকরটাকে উনুনে ষ্টোভ জেলে গরম জল চড়িয়ে দিলে।

"দু'তিন কাপ গরম গরম চা খেয়ে ফেলুন"

নিজেই চা করলে। চা খাইয়ে তার পর গরম গরম জলপ্রেস দিতে লাগল পুরন্দরবাবুর পেছি আর জয়লের লাহাবো।

"খুব গরম গরম দিন, খুব গরম গরম"

পুরন্দরবাবু যত আপত্তি করতে লাগলেন, দুখনের উৎসাহ তত বাড়তে লাগল।

"আর একটু চা খাবেন? জল আছে এখনও, খুব গরম খেতে হবে কিন্তু"

আবার সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আধ ঘণ্টা পরে ব্যথাটা সত্যি কমল। দুখনের ইচ্ছে ছিল আরও কিছুক্ষণ জলপ্রেস দেওয়া, কিন্তু পুরন্দরবাবু আর কিছুতেই রাজি হলেন না।

"এবার শুতে দিন একটু"

"বেশ বেশ। ঘুমোন—"

"আপনি যাবেন না, থাকুন। ক'টা বেজেছে?"

"পৌনে দুটো"

"থাকুন আপনি, যাবেন না"

"না, যাব না"

মিনিটখানেক পরে পুরন্দরবাবু দুখনকে ডেকে মৃদুকণ্ঠে বললেন—"আপনি, আপনি আমার ছেলে চেয়ে বেশী মহৎ। আমি সব বুঝতে পারছি, নয়···অনেক ধন্যবাদ আপনাকে"

"ঘুমিয়ে পড়ুন, বাতি নিবিয়ে দিচ্ছি আমি"

পা টিপে টিপে দুখন নিজের বিছানার দিকে চলে গেল।

বাতি নিবিয়ে দেবার পর পুরন্দরবাবু যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা স্পষ্ট করে ছিল তার। কিন্তু যতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন জেগে ওঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি ঘুমুতে পারছেন না, নিদারুণ ক্লান্তি সত্ত্বেও কিছুতেই ঘুম আসছে না তাঁর। শেষে তাঁর মনে হতে লাগল যেন জেগে জেগে কিসের একটা ঘোরে আছেন তিনি, তাঁর আশপাশে কি সব ছায়া মূর্তি ঘুরছে, তাদের কিছুতেই ঠাওরাতে পারছেন না—অথচ এটা যে স্বপ্ন—সত্যি কিছু নয়—এ জ্ঞানও তাঁর আছে। ছায়ামূর্তিগুলো সবই পরিচিত: স্বরমা ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে বলে, কপাটটা খোলা রয়েছে, আসছে যাচ্ছে, সিঁড়িতে ভীড় জমে গেছে। ঘরের মাঝখানে যে টেবিলটা আছে···তার পাশে কিন্তু একটিমাত্র লোক বসে আছে··· ঠিক একমাস আগে যেমন দেখেছিলেন তেমনি। ঠিক আগের মতো যেমন দেখেছিলেন এবারও লোকটা টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে বসে আছে, চুপ করে বসে আছে, একটি কথা কয়ছে না। কিন্তু এবার লোকটা যেন বেঁটে...অনেকটা দুখনের মতো। "সেবারও দুখনকেই দেখেছিলাম তা কি" পুরন্দরবাবু ভাবতে লাগলেন। লোকটার মুখের দিকে ভাল করে' চেয়ে দেখলেন—এ অন্য লোক। বেঁটে কেন এত? আশ্চর্য! চীৎকার, কোলাহল, কলরবে চতুর্দিক ভরে উঠল। দরজার চেয়ে এবার লোকগুলো যেন আরও বেশী উত্তেজিত, সবাই ঘর-মুখী আর সবাই তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁকে লক্ষ্য করে' সবাই কি যেন বলছে—চীৎকার করেই বলছে—কিন্তু কি বলছে বুঝতে পারলেন না তিনি ঠিক। "এ কিন্তু নয়, নয়,"—দু'একবার ভাবলেন তিনি—"ঘুম আসছে না, তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখছি শুধু"—কিন্তু ওই চীৎকার, ওই লোকের ভীড়, ওদের তর্জন গর্জন এত বেশী রকম জীবন্ত যে মাঝে মাঝে সন্দেহও হচ্ছিল। সত্যি স্বপ্ন? উঃ কি চীৎকার! এরা চায় কি? কিন্তু···যাই, তা না হলে দুখনের ঘুম ভেঙে দেওয়া ঠিক। ওই তো কোণায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তারপর হঠাৎ এক কাণ্ড হল···আগের বারও ঠিক এমনি হয়েছিল। সবাই একসঙ্গে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেল, কিন্তু দুয়ার দিয়ে বেরুতে পারছে না, আর একদল ঢোকবার চেষ্টা করছে। যারা ঢোকবার চেষ্টা করছে তারা যেন ভারী কি একটা বস্তু বয়ে আনছে—সিঁড়ির উপর তাদের পদশব্দ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে একটা গুরুভার বহন করে' আনছে তারা, কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছে—হাঁপিয়ে পড়েছে। ঘরের মধ্যে যারা ছিল তারা চীৎকার করে' উঠল সমস্বরে—এসেছে, এসেছে। সকলের দৃষ্টি পুরন্দরের উপর পড়ল গিয়ে, সকলেই সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখাতে লাগল—এমন ভাবে যেন এইবার পুরন্দরকে কবলের মধ্যে পাওয়া গেছে। এটাকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে আর সাহস হল না পুরন্দরবাবুর। তিনি বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে গিয়ে বুকো আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে সকলের মাথার উপর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন কি আসছে ওরা। বুকের ভিতরটায় হাতুড়ি পিটছে কে যেন। তারপর হঠাৎ—আগেরবার যেমন হয়েছিল—ঠিক তেমনিভাবে ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল—ঠিক তিনবার। এত স্পষ্ট, এত বাস্তবিক যে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিন্তু সেবার যেমন দরজার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন এবার তা গেলেন না। কি জেনে যে গেলেন না, বস্তুত কোন ভাবনা সে সময় তাঁর মনে এসেছিল কি না, তা বলা শক্ত—কিন্তু কি করা উচিত তা কে যেন তাঁর কানে কানে বলে দিলে। তিনি একটা আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েই বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন এবং দুখন যেখানে শুয়েছিল সেই দিকে ছুটে গেলেন। হাত বাড়াতেই আর একটা হাতের সঙ্গে ধাক্কা লাগল এবং সে হাতটা তিনি মুঠো করে' চেপে ধরলেন —ও, তাহলে একজন তাঁর বিছানার কাছে মুঁকে দাঁড়িয়েছিল এসে। ঘরে অন্ধকার বিশেষ নেই, জোরের আলো ঘরে ঢুকছে। হঠাৎ একটা তীব্র যন্ত্রণা তিনি অনুভব করলেন তাঁর যে হাতের আঙুল-গুলোতে—যেন একটা ধারাল ছুরি কিম্বা ক্ষুর তিনি মুঠো করে' ধরেছেন···সঙ্গে সঙ্গে হাতের একটা গুরুভার পতনের শব্দ হল।

পুরন্দরবাবু দুখনের চেয়ে অবশ্য তিন গুণ বেশী শক্তিশালী, তবু যেন কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হল—পুরো তিনটি মিনিট। তারপর তিনি তাকে চিৎ করে' কেবল তার হাত দুটো বেঁকিয়ে পিঠের দিকে নিয়ে গেলেন, তারপর তাঁর মনে হল হাত দুটো গুণে উচিত। ফাটা গু হাত দিয়ে

পুরন্দরবাবু হাত তুলে নমস্কার করলেন। 'লবু'ও প্রতি-নমস্কার করে' বললেন, "কাজে আপনি ছিলেন, তা না হলে কি মুশকিলেই যে পড়তাম"

পুরন্দরবাবু লবঙ্গকে নিয়ে কেবিনারে ঢুকলেন।

একটু পরেই পরিচয় হয়ে গেল ভাল করে'। পুরন্দরবাবুর পরিচয় শুনে লবু একটু হেসে বললেন—"আপনিও বেড়াতে বেরিয়েছেন? চলুন না আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার। আমরা একটা বাড়ি নিয়েছি সেখানে একখানের জন্যে। চলুন না, যাবেন?"

"বেশ তো। দিন দশেক পরে যেতে পারি"

মুগল পালিতের মুখখানা কালো হয়ে গেল।

বীরেনবাবু হাত ঘড়ি দেখে বললেন—"আর বেশী দেরী নেই কিন্তু। এবার ওঠা যাক—"

পুরন্দরবাবু হরিদ্বারে যাবেন শুনে বীরেনও একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল। চা খাওয়া কোনরকমে সেরে সে লবুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রেণে উঠল। মুগল পালিত বসে রইল। ওরা চলে যেতেই সে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে ঘনিষ্ঠকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—"সত্যিই আসছেন আপনি হরিদ্বারে?"

"আপনি একটুও ঘাবড়ান নি দেখছি"—হেসে ফেললেন পুরন্দরবাবু—"আপনি সত্যিই ভেবেছেন আমি যাব? পাগল না কি, আবার সব কোথায় যা—যা—যা—"

মুগল পালিতের মুখও উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"ও যাচ্ছেন না তাহলে—"

"না যাচ্ছি না, তার নেই আপনার"

"কিন্তু উনি যদি জিজ্ঞেস করেন কেন এলেন না কি বলব আমি?"

"যা খুশী বলবেন। বলবেন আবার পা ভেঙে গেছে—"

"বিশ্বাস করবেন না সে কথা"

"না করলেই বা। ও বাবা, সিঁড়ির ভয়ে যে একেবারে অস্থির দেখছি" মুগল হাসবার চেষ্টা করলে একটু কিন্তু পারলে না। পুরন্দরবাবুর হাতটা কশাঘাত করলে যেন তাকে।...গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। পুরন্দরবাবু ঠিক করে' ফেলেছিলেন এ গাড়িতে আর যাবেন না, এখানেই ব্রেক জার্নি করবেন। ট্রেণের মাটিকর্মে থাকতে তাঁর ভারী ভাল লাগে। জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়েছিলেন।

পুরন্দরবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—"এই বীরেনবাবুটি কে"

"ও আমার দূর সম্পর্কের একজন ভাই হয়। ভাল ফুটবল খেলত। একটা চাকরিও করে' দিয়েছিলাম, কিন্তু রাখতে পারলে না। সবই মাটি করেছে শুধু—"

পুরন্দরবাবুর মনে হল—"বাঃ, ঠিক জুটে গেছে, ষোলকলা পূর্ণ একেবারে"

"মুগলদা, আসুন না"

বীরেন গাড়ি থেকে ডাকতে লাগল।

মুগল পালিত উঠতে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ পুরন্দরবাবু তাকে বললেন—"এখন যদি আপনার স্ত্রীকে গিয়ে বলি যে আপনি রাজে আমাকে খুন করতে গিয়েছিলেন কেমন হয় তা হলে"

"অ্যাঁ, কি যে বলেন" মুগলের মুখ পাংশু বর্ণ হয়ে গেল।

"মুগলদা, মুগলদা ও মুগল দা—"

বীরেনবাবুর জড়িত কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।

"আচ্ছা যান আপনি"

"সত্যিই আপনি আসছেন না তো?"

"শপথ করব? ট্রেণ ছাড়ছে যান"

এই বলে' পুরন্দরবাবু লবঙ্গর মাতৃসুলভ ভঙ্গীতে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন শেক হ্যাণ্ড করবার জন্যে। বাড়িয়েই কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হল, মুগল হাত বাড়ালে না। এমন কি সরিয়ে নিলে।

গাড়ি ছাড়বার তৃতীয় ঘণ্টা পড়ল।

মুহূর্তে দু'জনের মধ্যে কি একটা কাণ্ড ঘটে গেল যেন। কি একটা যেন ছিঁড়ে গেল, কেটে গেল। পুরন্দরবাবু হঠাৎ ঝাঁপুইতে মুগলের ঘাড়টা ধরে কাটা হাতটা তার মুখের সামনে ধরে বললেন—"এই হাত আমি বাড়িয়ে দিতে পারলাম, আর আপনি সেটা নিতে পারলেন না"

মুগলের ঠোঁট কাঁপতে লাগল, সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে—"আর পাপিয়া?"

হঠাৎ তার ঠোঁট, গাল, থুতনি সব থর থর করে কেঁপে উঠল, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

পুরন্দরবাবু তাকে ছেড়ে দিয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"মুগল দা, কি করছ তুমি, ট্রেণ যে ছাড়ে—"

গার্ডের হুইসল্ শোনা গেল।

মুগল পালিত হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল এবং চলন্ত ট্রেণে লাফিয়ে উঠে পড়ল। পুরন্দরবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে'।

সম্পূর্ণ

উপমা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

উজল চোখে কাজল দিলে—
কবির চোখে হয় প্রতীতি

যেমন কালো ভৃঙ্গ বলে—
পরশনে আমায় প্রীতি।

শাক ও গাড়ী

ভাস্কর

সেদিন বাজারে গিয়াছিলাম।

এটা সেটা কিনিবার পর দেখি বাজারের একপাশে একখানি কলাপাতার উপর একরাশ ন'টে শাক। জিজ্ঞাসা করিলাম, কত করে?

ছ'আনা সের।

ন'টে শাক ছ'আনা সের! বল কি? কত করে দেবে ঠিক করে বল।'

আজ্ঞে ছ'আনা করে।

তিন আনা করে দেবে?

না।

চার আনা করে?

আজ্ঞে না। ছ'আনার কম হবে না।

আচ্ছা, দাও এক পোয়া।

শাক ওজন হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার পাল্লায় ফের নেই তো।

এই দেখুন না।—বলিয়া দাড়ীপাল্লা তুলিতেই ডানদিকটা ঝুঁকিয়া পড়িল অনেকখানি। দোকানী অপ্রস্তুত হইয়া একমুঠা শাক তুলিয়া ফেলিয়া দিল ঝুড়িতে। বলিলাম, এমনি করে লোককে ঠকাও বুঝি? বলিতেই আরও সঙ্কুচিত হইয়া আরো একমুঠা শাক ফেলিয়া দিল ঝুড়ির ভিতর।

বলিলাম, প্রায় একপয়সার শাক ঠকিয়ে নিচ্ছিলে।

বাড়ী ফিরিয়া বাজারের জিনিষপত্র গুছানোর সময়ে, কেমন করিয়া শাকওয়ালা আমাকে ঠকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং কেমন করিয়া তাহার ঠকাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি, এমন সময়ে চাকর আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। বলিল, লোক বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

এনভেলাপের মধ্যে একখানি বিল। দি গ্রেট এশিয়াটিক মোটর এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড পাঠাইয়াছে। কয়দিন ধরিয়া গাড়ীর এঞ্জিনটা একটু নষ্ট করিতেছিল। উহাদিগকে বলিয়াছিলাম, কারবুরেটরটা একটু পরিষ্কার করিয়া দিতে। এটা তাহারই বিল।

বিলে কাজের তালিকা দেওয়া আছে—এঞ্জিনের ঢাকনি খোলা, কারবুরেটরের দিকে চাহিয়া থাকা, পেট্রলের নল খুলিয়া দেওয়া, চোকলেভারের মুখের স্প্লিট-পিনের ডগা একত্র করা, পিন টানিয়া বাহির করা, লেভার সরাইয়া রাখা, অ্যাকসিলারেটরের স্প্রীং খোলা, এঞ্জিনের গা হইতে কারবুরেটর খুলিয়া আনা, ফ্লোট চেম্বারের ঢাকনি খোলা, ফ্লোট বাহির করা, ফ্লোট-চেম্বারের তলার পিতলের তারের জাল খুলিয়া বাহির করা, ছোট ছোট বরুরেক দিয়া জেটগুলি খোলা, জেটের মুখে ফুঁ দেওয়া, সরু তার ঢুকাইয়া জেটের মুখ পরিষ্কার করা, জেটগুলি পুনরায় রেঞ্চ দিয়া আঁটা, জালের ছাকনি পুনরায় বসান, ফ্লোটটিকে পুনরায় চেম্বারে বসান, চেম্বারের মুখ ঢাকনি দিয়া বন্ধ করা, ঢাকনির উপরের স্প্রীংক্লিপ পুনরায় আটকাইয়া দেওয়া, এঞ্জিনের গায়ে কারবুরেটর পুনরায় আঁটিয়া দেওয়া, চোক্-লেভারের ডগা আটকানো, স্প্লীট্-পিন পরানো, পিনের মুখ ফাঁক করিয়া চাপিয়া দেওয়া অ্যাক্সিলারেটরের স্প্রীং পুনরায় আটকানো, কারবুরেটর টিউন করা, নেকড়া দিয়া মোছা, এঞ্জিনের ঢাকনি বন্ধ করা, ট্রায়ালের জন্য পেট্রল খরচ আড়াই গ্যালন, ইত্যাদি—মোট খোক—৬৭৸০ বিলের পরিমাণ শুনিয়া গৃহিণী চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, কি একটু পরিষ্কার করতে অত টাকা!

এমন বেশি আর কি বিল করেছে। বিলিতি দোকান হ'লে—

বাহিরে লোক অপেক্ষা করিতেছিল। বিলের টাকা লইয়া স্বচ্ছন্দমনে চলিয়া গেল।

গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি

শ্রীগান্ধী সেবক

বাংলায় গান্ধীজীর অবস্থানকালে তাঁহার আশ্রমস্থল সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে বাংলার-কংগ্রেস-কর্মীদের এক সম্মিলন হয়। গান্ধীজী কংগ্রেসকর্মীদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনাকালে গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের ভিত্তির উপরই আলোচনা করেন। রাষ্ট্রভাষা অর্থাৎ হিন্দুস্থানী শিক্ষার উপর জোর দিয়া তিনি আলোচনা আরম্ভ করেন এবং উপস্থিত সকল কংগ্রেস কর্মীদের নিকট হইতে ছয়মাসের মধ্যে হিন্দুস্থানী শিক্ষার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন।

ঐ সময়ে গান্ধীজী লিখিত Constructive Programme নামক পুস্তিকার সম্পূর্ণ প্রতিলিপি কোন কোন ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় উহা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা বাংলার প্রত্যেক কর্মীর কর্মপথের সহায়ক হইবে।

বাংলার তথা ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থাকে ভিত্তি করিয়া এই গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির কয়েকটি বিষয় লইয়া বর্তমান প্রবন্ধে সামান্য আলোচনা করিব। বস্তুতঃপক্ষে গঠনমূলক কর্মসম্বন্ধে গান্ধীজী গত ২৫ বৎসর যাবৎ এত বলিয়াছেন, এত আলোচনা করিয়াছেন যে ইহার সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই—তবুও মনে হয় বিষয়টি আমাদের সম্মুখে যতই তুলিয়া ধরা হইবে, যতই ইহা লইয়া আলোচনা করা যাইবে, ততই ইহা হইতে নূতন আলোক, নূতন প্রেরণা পাওয়া সম্ভব হইবে। গান্ধীজী কর্মের সুত্ররূপ আঠারশবিধ সংগঠন কার্যের তালিকা দিয়াছেন—১। সাম্প্রদায়িক ঐক্য ২। অস্পৃশ্যতা বর্জন ৩। মাদকতা নিবারণ ৪। খাদি ৫। অন্য গ্রাম-শিল্প ৬। গ্রাম-পরিচ্ছন্নতা ৭। বুনিয়াদি শিক্ষা ৮। বয়স্ক শিক্ষা ৯। নারী সেবা ১০। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যজ্ঞান ১১। প্রাদেশিক ভাষা ১২। রাষ্ট্রভাষা ১৩। আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠা ১৪। কিষাণ ১৫। শ্রমিক ১৬। আদিবাসী ১৭। কুষ্ঠরোগী ১৮। ছাত্র; ইহা ছাড়া আইন অমান্যের প্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। গান্ধীজী এই আঠারশবিধ সংগঠনকার্যের সূচী দেওয়ার সময় বলিয়াছেন যে, এই সূচী স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে। ইহা কর্মপথের প্রদর্শক মাত্র। দেশসেবকগণ ইহা হইতে সংগঠন কার্য সূচী—অন্য কথায় স্বরাজ সংগঠনের কর্মধারার আভাস পাইবেন—এবং নিজের কর্তব্যপথ ঠিক করিতে পারিবেন। অহিংসার কার্যকরী রাস্তা হইতেছে এই সংগঠনকার্য।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে অহিংসপন্থা অবলম্বন করিয়া যদি আমাদিগকে স্বরাজ পাইতে হয়—'যদি' বলি কেন—বর্তমান সময়ে অহিংস পথ ছাড়া আর কোন পথই দেখা যায় না। তাহা হইলে অহিংসাকে কার্যকরী (Dynamic) অহিংসায় পরিণত করার একমাত্র পথই গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির অবলম্বন। গান্ধীজী অনেক বার বলিয়াছেন, অহিংসা ভীরুর ধর্ম নহে—তাহা অলসের—কর্মবিমুখের ধর্ম নহে—অহিংসা স্বতই কর্মপ্রেরক—প্রাণময়। অহিংসা কর্মপ্রেরণাই আনে—কর্মবিমুখতা আনে না। গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি ও অহিংসা একে অপরের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত—একটিকে বাদ দিয়া অপরটি চলিতে পারে না—এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কাজ করিলে—অহিংসার বিকাশ—অহিংসার শক্তির প্রকাশ যেমন প্রবল হইতে প্রবলতর হয়, তেমনি অহিংসাকে ভিত্তি করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে গান্ধীজী প্রবর্তিত এই সংগঠন পদ্ধতি ছাড়া আর কোন পথই নাই। যে-রাষ্ট্র হিংসার ভিত্তির উপর পরিচালিত হয় তাহাকে যেমন রাষ্ট্র-সংরক্ষণ, রাষ্ট্র-পরিচালনা ও রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য এক রকমের সংগঠন কার্য করিতে হয়—যেমন সৈনিকদের শিক্ষা ও সৈন্য পোষণ ও সংরক্ষণ, অস্ত্র তৈরী ইত্যাদি—যাহা গত যুদ্ধের অনেক পূর্ব হইতেই জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ করিয়া আসিতেছিল, সেইরূপ যে-সমাজ বা রাষ্ট্র অহিংসার ভিত্তির উপর পরিচালিত হইতে চায় সেই সমাজ বা রাষ্ট্রকেও অহিংসার দৃষ্টিতে সংগঠনকার্য অবলম্বন করিতে হয়। গান্ধীজীর প্রবর্তিত গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি—এই অহিংস সমাজ ও রাষ্ট্র রচনারই কর্মপদ্ধতি। এই দৃষ্টিবিন্দু অবলম্বন করিয়া আমরা দেশের বর্তমান পরিস্থিতির দিক হইতে কয়েকটি বিষয় মাত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য

রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার আমদানী—ইংরাজ রাজত্বের একটী কীর্তি—ইংরাজ রাজত্বের স্থায়িত্বের গুপ্ত হিসাবেই তাহারা এই জিনিসটীর সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহা একটা কৃত্রিম সৃষ্টি। একটু তলিয়া দেখিলেই এই কৃত্রিম সৃষ্টি চোখে পড়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে ভারতবর্ষে বহু রকম ধর্মনীতি ও উপাসক সম্প্রদায় আপনা আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে—এক একজন ধর্মনায়ক এক এক সময়ে ভারতবর্ষের জনসমাজের সম্মুখে ধর্মের এক একটা বিশেষ রূপ তৎসাময়িক পরিবেশের মধ্যে উজ্জ্বলভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ধার্মিক-জীবনযাত্রার বিশেষ রীতি ও পদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছেন। কত লোকে তাহা গ্রহণ করিয়াছে—কত লোকে করে নাই। যে লোকসমষ্টি সেই রীতি বা জীবনযাত্রার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে তাহারাই একটা বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায় নামে ক্রমে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার কালের প্রভাবে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। এই ধর্মপথের বৈচিত্র্য কখনো রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তি অবলম্বন করিতে প্রয়োচিত বা বাধ্য করে নাই। বৃহত্তর ভারতবর্ষ যখন যে

ধর্মাবলম্বী রাজার শাসনে রহিয়াছে সেই ধর্মের প্রভাব অনেকখানে অধিক হইয়াছে—কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অটল করিয়া রেখার অথবা স্থায়ী করে নাই। মুসলমান রাজত্বের সময়ও ইহাই দেখা যায়। খ্রিষ্টিয়ান পাদ্রীরা ও মোঙ্গলেরা এদেশে আসিয়া যেন জয় করিয়া এদেশবাসীই হইয়া পড়েন। তাঁহারা ভারতবাসীই হইয়া যান—তাঁহাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন-পোষিত সাম্প্রদায়িকতার বিষের গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু ইংরাজ এ দেশকে আত্মসাৎ করিয়া এদেশবাসী হন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশের পোষণ-ক্ষেত্র হিসাবেই এদেশকে ব্যবহার করিতে থাকেন—স্বদেশকে পুষ্ট করার একটা উৎস হিসাবে ভারতবর্ষকে তাঁহাদের হাতে রাখিতে চান। ভারতবর্ষের অধীনতার মূলে—সমাজব্যবস্থা—সভ্যতা গভীর ভাবে করিয়া আছিকার ভায়—অষ্ট্রেলিয়ার ভায় বিজেতার উপনিবেশ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন—কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদে ভারতবর্ষের সভ্যতাকে ধ্বংস করিতে ইংরাজ সমর্থ হন নাই—যদিও সেই সভ্যতার আজ যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা কঙ্কালের মতই আছে। ভারতবর্ষের সভ্যতাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টার পরিণাম সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষরূপ অস্ত্রে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রভোগে আধিকার তাহারই দ্বারাই হয়। বিষকে তাহারা একটা রীতিনীতি আইনের পুতুলায় গোপন করিয়া আসিতেছেন।

আমরা যদি একটু ভাবিয়া দেখি তবে সহজেই দেখিতে পাই হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ধর্মের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহনশীলতাই উক্ত ধর্মের মূলনীতি। অপরকে বলপূর্বক ধ্বংস করিয়া প্রভাব বিস্তারের শিক্ষা কোন ধর্মই দেয় না। কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে কবির কোন প্রসিদ্ধ সমালোচনার একটি উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে Islam teaches tooth for tooth—ইসলাম আঘাতের বদলে আঘাতের শিক্ষাই দেয়—তবুও একথা জোরের সহিতই বলিতে হয় যে কখনোই ইসলাম এইরূপ শিক্ষা দেয় নাই—না দেয় না। বিচারপতি আমীর আলী প্রণীত The spirit of Islam নামক প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য। সমস্ত ধর্মনীতিই অনধিকারীর ব্যাখ্যায় ধর্মের মূলনীতি হইতে বিকৃত হয়—অপব্যাখ্যার ব্যাখ্যাত নীতির নীচে চাপা পড়ে এবং বর্তমান যুগে সর্বক্ষেত্রেই তাহা হইতেছে—সত্য অসত্যের নীচে চাপা পড়িতেছে। এইরূপ অবস্থাতেই মহান চিন্তানায়ক ও মহান ধর্মনায়কের আবির্ভাব হয় এবং রাষ্ট্র ও সমাজ সংশিক্ষা ও সংচিন্তার আলোক পাইয়া সত্যপথের সন্ধান পায়—

ইসলামের শিক্ষার মর্ম

যখন মোহম্মদের অনুবর্তীরা তাঁহার স্বজাতি কোরাইশদের দ্বারা উৎপীড়িত হইতে থাকেন, তখন মোহম্মদ তাঁহাদিগকে উৎপীড়নের হাত হইতে বাঁচার জন্য খৃষ্টান রাজার দেশ আবিসিনিয়ায় পাঠাইয়া দেন। সেখানে অন্য ধর্মীয়দের প্রতি উদারতা প্রকাশ করা হইত। কোরাইশরা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আবিসিনিয়ার রাজার নিকট মোহম্মদের অনুবর্তীদের আশ্রয় না দিতে ও তাঁহাদিগকে তাহাদের হাতে অর্পণ করিতে বলিয়া পাঠায়। রাজা তখন মোহম্মদের অনুবর্তীদের নিকট তাহাদের ধর্মের মর্ম কথা জানিতে চান—মোহম্মদের অনুবর্তীদের মুখপাত্র জাফর তখন বলেন—

"Jaffer acting as spokesman for the fugitive spoke" Thus: "O king, we were plunged in the depths of ignorance and barbarism; we adored idols, we lived in unchastity, we ate dead bodies, and we spoke abominations; we disregarded every feeling of humanity, and the duties of hospitality and neighbourhood; we knew no law but that of the strong, when God raised among us a man, of whose birth, truthfulness, honesty and purity we were aware; and he called us to the unity of God,.....He forbade us the worship of idols; and enjoined us to speak the truth, to be faithful to our trusts, to be merciful and to regard the rights of neighbours; he forbade us to speak evil of women,.....and to abstain from evil; to offer prayers, to render alms, to observe fasts. We have believed in him, we have accepted his teachings and his injunctions. For this reason our people have risen against us.....(Page 27-28)

তাৎপর্য—"হে রাজা! আমরা অজ্ঞতা ও বর্বরতার মধ্যে ডুবিয়া ছিলাম। আমরা পুতুল পূজা করিতাম—আমরা দুর্নীতির মধ্যে বাস করিতাম—আমরা মৃতদেহ আহার করিতাম—এবং কুবাক্য বলিতাম—মানবতার সর্ব অনুভবই আমরা করিতাম—পরের জোরের আইন ছাড়া অন্য কোন রীতিই আমাদের ছিল না। এমন সময় ঈশ্বর আমাদের মধ্যে এমন একজন মানব প্রেরণ করিলেন—যাঁহার আত্মপরিচয়, সত্যনিষ্ঠা সাধুতা পবিত্রতা সম্বন্ধে আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের একত্ববোধের মধ্যে আহ্বান করিলেন,.....পুতুলপূজা করিতে নিষেধ করিলেন এবং সত্যবাক্য বলিতে, আমাদের উপর ন্যস্ত বিষয়ে বিশ্বাসরক্ষা করিতে, ঘরশীল হইতে, প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে আদেশ করিলেন;..... নারীজাতির সম্বন্ধে মন্দ কথা বলিতে—পাপ কার্য ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন—উপাসনা করিতে—দান করিতে—উপবাস করিতে আহ্বান করিলেন—আমরা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়াছি তাঁহার শিক্ষা ও নির্দেশ মানিয়া লইয়াছি। এই জন্যই আমাদের স্বদেশের লোকেরা আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে—"

ইসলাম ধর্ম কি উহার শিক্ষা যেন এই কথা কাটি হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়—আঘাতের প্রতি আঘাত এই শিক্ষার জন্য নাই।

ইসলাম রাষ্ট্রে সহনশীলতা

ইসলাম ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রে পরধর্মীয় প্রতি কিরূপ আচরণ প্রদর্শিত হইবে সেই সম্বন্ধে মোহম্মদের কিরূপ উদার নির্দেশ ছিল নিম্ন উক্তি হইতে বুঝা যাইবে—

"To (the Christians of Najran and the neighbouring territories, the security of God and the pledge of His

prophet are extended for their lives, their religion, and their property—to the present as well as the absent and others besides; their shall be no interference with (the practice of) their faith or their observances; nor any change in their rights or privileges, no bishop shall be removed from his bishopric; nor any monk from his monastery, nor any priest from his priesthood, and they shall continue to enjoy everything great and small as hereto-fore; no image or cross shall be destroyed; they shall not oppress or be oppressed; they shall not practice the rights of blood vengeance as in the days of ignorance; no tithes shall be levied from them nor shall they be required to furnish provisions for the troops-" (Page 246-247)

"নাজরান এবং পার্শ্ববর্তী স্থানের (খ্রীষ্টান) অধিবাসীদিগের—তাহাদের জীবন, ধর্মবিশ্বাস, এবং বর্তমান ও অতীতের সম্পত্তি এবং অন্য সমস্ত অধিকার রক্ষা সম্পর্কে ঈশ্বরের আশ্রয় এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতিশ্রুতি অর্পণ করা যাইতেছে। তাহাদের ধর্মবিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানাদির উপর এবং তাহাদের অধিকার ও সুবিধাদির পরিবর্তনের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না; কোন বিশপকে তাঁহার বিশপত্ব হইতে, কোন সন্ন্যাসীকে তাঁহার মঠ হইতে, কোন পুরোহিতকে তাঁহার পৌরহিত্য হইতে বিচ্যুত করা হইবে না এবং তাঁহারা এতাবৎ ক্ষুদ্র বৃহৎ যা কিছু সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা ভোগ করিতেই থাকিবেন। কোন মূর্তি কিংবা ক্রুশচিহ্ন ধ্বংস করা হইবে না; তাঁহারা অত্যাচার করিবে না—অত্যাচারিতও হইবে না। তাঁহারা অজ্ঞতার যুগের মত রক্তারক্তির দ্বারা প্রতিহিংসার অধিকার পালন করিবে না। তাহাদের নিকট হইতে কোন দশমাংশ (কর) আদায় করা হইবে না এবং সেনাবাহিনীর আহারাদি তাহাদিগকে সংগ্রহ করিতে বাধ্য করা হইবে না। (পৃঃ ২৪৬-৪৭)

ইস্‌লামের আদর্শ সম্বন্ধে মোহম্মদের উপদেশ

"Cultivate humility and forbearence; comport yourself with piety and truth. Take count of your actions with your own conscience, for he who takes such counts reaps a great reward, and he who neglects incurs great loss. He who acts with piety gives rest to his soul; he who takes warning understands the truth; he who understands it, attains perfect knowledge." (Page 378)

"নম্রতা ও ক্ষমাশীলতা অভ্যাস কর; আচরণে ধর্মপরায়ণতা ও সত্য অনুষ্ঠান কর। নিজের বিবেকের সহিত কৃতকর্মের হিসাবনিকাশ কর; যে এইরূপ করে সে বহু ফল লাভ করে; যে অবহেলা করে, সে বৃহৎ ক্ষতি স্বীকার করে। যে ধার্মিকতার সহিত কার্য করে, সে নিজ আত্মাকে শান্তি দেয়; যে সাবধানবাণী শুনে সে সত্য উপলব্ধি করে; যে উহা উপলব্ধি করে, সে পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়।"

এই উক্তিগুলি হইতে ইসলামের শিক্ষা, অপর ধর্মের প্রতি আচরণ—ইসলামের আদর্শের মূল কথাগুলি জানা যায় এবং এই ধর্মনীতির উপলব্ধি করা যায়। আর অন্যান্য ধর্মের ন্যায়ই অব্যাখ্যাকারকের হাতে এই নীতিসমূহ বিকৃত হইতেছে।

এই সকল বিষয় বিচার করিয়া আমরা যদি একটী সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, বিভিন্ন ধর্মনীতি পরস্পরকে লঙ্ঘন করে—আঘাত করে না—নীতিগুলি মানবজীবনকে সদ্ভাবে পরিচালিত করার বিভিন্ন পথ মাত্র, তাহা হইলে এই বিদ্বেষ এক মুহূর্তেই উড়িয়া যায় ও রাষ্ট্র ব্যাপারে এই সাম্প্রদায়িক অনৈক্য লইয়া ঝগড়া হয় না।

ইংরাজ-শাসন-তন্ত্র যে আমাদের উপর আইন করিয়া এই বিরোধ চাপাইয়াছে তাহা আমরা এই কথাই বিচার করিলে সহজেই বুঝিতে পারি যে, যে ইংরাজ শাসনতন্ত্র তাহার শক্তি বজায় রাখার জন্য এই বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছে—সেই শাসনতন্ত্র তাহার স্বদেশের রাষ্ট্রক্ষেত্রে কি করিতেছে! আজ যদি পার্লামেন্টে প্রোটেষ্টাণ্ট, রোমান-ক্যাথলিক, লেবোডিষ্ট, ইহুদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্র এবং প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকিত—তবে কি সেই দেশেও রাষ্ট্রব্যাপারে ভারতবর্ষের মত সাম্প্রদায়িক অনৈক্য গড়িয়া উঠিত না? ইংরাজ জানে ইহা একটা কৃত্রিম সৃষ্টি এবং সেইজন্যই নিজের দেশে তাহা হইতে দেয় নাই। কোন দেশেই এইরূপ সাম্প্রদায়িকতার নীতি রাষ্ট্রব্যবস্থার অবলম্বন নয়।

খাদি ও গ্রামশিল্প

বর্তমানে খাদ্য ও বস্ত্রপরিস্থিতি এক সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে—চারিদিকে খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব। সংঘর্ষের ও সেবার মনোভাব লইয়া যদি আমরা এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হই তবে এই সংকটকে পরাভূত করার রাস্তা সহজ হইয়া পড়ে। গান্ধীজী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুতা কাটিয়া বস্ত্র স্বাবলম্বী হইতে দিনের পর দিন আহ্বান করিতেছেন, এই আহ্বানে যদি আজও আমরা সম্পূর্ণভাবে সাড়া দেই—তবে বস্ত্রের অভাব একটা কথা মাত্রেই পর্যবসিত হয়। গান্ধীজী চরখাকে ও শুধু স্বরাজের মোহনের দৃষ্টিতে দেখেন না, তিনি ইহাকে অহিংস রাষ্ট্র গঠনের-প্রতীক বলিয়া দেখেন। ইহা অহিংসের অস্ত্র ঘোষণা; ধনীকে দরিদ্রের সহিত এক হওয়ার পথ দেখান—দরিদ্রকে অস্ত্র দিয়া স্বরাজের সৈনিক হওয়ার শক্তি দেয়, রাষ্ট্রনায়কের বা রাষ্ট্রসেবকের হাতে স্বরাজের অহিংস অস্ত্ররূপে বিরাজ করে। ইহা স্বরাজলাভের সাধন অর্থাৎ অবলম্বন। পশুশক্তির আশ্রয়ে সৈনিকেরা বন্দুক কামান বিমান প্রভৃতি হাতিয়ার লইয়া যুদ্ধ করে—অহিংসার যুদ্ধের ইহা হাতিয়ার। একজনে বস্ত্র করা হোম করা লোক সেবার অস্ত্র ছিল—অগ্নি ছিল তাহার সাধন অর্থাৎ অবলম্বন। আজ আমরা ইহা মনে করিতে পারি বর্তমান ভারতের লোক-সেবাযজ্ঞের সাধন—অর্থাৎ অবলম্বন চরখা। আদর্শক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বস্তুতান্ত্রিক ব্যবহারিক ক্ষেত্র পর্যন্ত—চরখার স্থান বিস্তৃত। ইহা একদিকে যেমন স্বল্পসংকট দূরীকরণের হাতিয়ার, তেমনি অহিংসার ভিত্তিতে স্বরাজ-যজ্ঞের সাধন।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই চারিকে অবলম্বন করিয়া অনেক গ্রামশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে এবং উঠিতেছে। চরকা, অন্য গ্রামশিল্প ও কৃষি—একের সহিত অপরে যোগযুক্ত; কৃষির সহিত গো-সেবা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

ভারতবর্ষের সভ্যতার ধারার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় ভূমি, উদ্ভিজ্জ, গো-জাতি এবং মানুষ—এই চারের সমন্বয়ে এই সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষ গরুর সাহায্যে ভূমি কর্ষণ করিয়াছে—শস্যোৎপাদন করিয়াছে—সেই শস্য নিজে আহার করিয়াছে—গরুকে খাওয়াইয়াছে—গরুর সেবা করিয়া তাহাকে পুষ্ট করিয়াছে এবং গরু হইতে তাহার শ্রেষ্ঠ খাদ্য দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া মানুষ নিজে পুষ্ট হইয়াছে। এই ভাবে সর্বাঙ্গীণ শারীরিক পুষ্টিসাধনের পশ্চাতে একটী উদার চিন্তার প্রেরণা রহিয়াছে যাহা তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টিকে সাহায্য করিয়াছে। প্রাচীনকালের তপোবনের গো-পালন একটা কথার কথা নয়—জনক রাজার ক্ষেত্র-কর্ষণও একটা কথার কথা নয়। রামচন্দ্র রাজা হইলেন—মুনি ঋষিগণকে সহস্র সহস্র গো-দান করিলেন—মুনিরা এই গোধন লইয়া কি করিতেন? অবশ্যই আধুনিক কথায় তাঁহাদিগকে dairy farming এর ন্যায় বিরাট গো-সেবার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে হইত। শিক্ষদের শিক্ষার অবলম্বন তাহাই ছিল। মুনিরা ছিলেন Trustee অছি মাত্র। বিরাট গোধনের পরিচর্য্যা ও গো-জাত খাদ্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ—তাঁহারা অছির ন্যায় করিতেন—এবং শিষ্যদিগকে সেই শিক্ষায় শিক্ষা দিয়া মনুষ্যত্ব তৈরী করিতেন। এই সকল কথার উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে, এই বিষয়গুলি চিন্তা করিলে পথের সন্ধান পাওয়া যায়। আজ যদি এই সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখি—অসহায় গরুই—গোরুর সেবা করি, তবে ভূমি ও গোরু আমাদের খাদ্য দিবে, পুষ্টি দিবে। এই উভয়কে আমরা ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া খাদ্য এবং পুষ্টি পাই না—এখানে অর্থনীতির প্রশ্ন—সস্তা ও দুর্মূল্যতার প্রশ্ন আসে না। সহজভাবে ধরা যাউক আমার একটু জমি আছে—দুই চারিটা গোরু আছে—খাটিয়া যদি ফসল উৎপন্ন করি এবং সেই ফসল নিজে আহার করি—গোরুকে খাওয়াই, গোরুর নিকট হইতে জমির সার ও শ্রেষ্ঠ খাদ্য দুগ্ধ গ্রহণ করি তবে নিজের খাদ্যের অভাব, পুষ্টির অভাব, স্বচ্ছন্দে মিটাইতে পারি। একটী গ্রাম যদি সমষ্টিগতভাবে ইহা করে, তবে গ্রামের অভাব মিটাইতে পারে। নিজের ঘরে বা গ্রামে কিছু উদ্বৃত্ত হইলে অন্যকে দিয়া বিনিময়ে অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারি, দুর্দিনের জন্য সমষ্টিগতভাবে সংরক্ষিত রাখিতে পারি। গ্রাম-সেবকদের যদি এই মনোভাব আসে এবং গ্রামবাসীকে যদি এই দিকে উদ্বুদ্ধ করা যায়—তবে কে রাজত্ব করিতেছে—এবং সে কবে দুঃখ ঘুচাইবে এর জন্য বসিয়া না থাকিয়া আমরা সমস্ত দুঃখমোচনের ভার নিজেরাই হাতে লইতে পারি। কংগ্রেস-সেবক তথা গ্রামসেবক নিজেই নিজের জীবনের আচরণ দ্বারা ইহা দেখাইবেন, লোকে দেখিবে—শিখিবে—এবং তখন নিজেরা করিবে। আজকের বিরাট খাদ্য সংকটের সমাধানের পথ সহজভাবেই পাওয়া যায়। যদি আমরা ভূমি ও গোরুর দিকে তাকাই—একটু জমিও যদি অপব্যবহৃত হইতে না দেই—গোরুকে একটুও যদি অবহেলা না করি। খাদ্য তো শুধু চাউল আর ডালই নয়—শাক্ সবজি আমাদের খাদ্যে থাকেই না। ইহা খাদ্যের আট আনা অংশের প্রয়োজন মিটাইতে পারে; যদি জমির ও গোরুর প্রতি যদি উপেক্ষা না করি তবে এই আট আনা আরও সহজেই পাইতে পারি।

এই চতুঃসমন্বয় হইতে গ্রামশিল্প একটার পর একটী গড়িয়া উঠিয়া গ্রামকে তথা সমগ্র দেশকে স্বাবলম্বী করিতে পারে। এইরূপ প্রচেষ্টাই ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সমষ্টির শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সমগ্র দেশকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে—তখন স্বরাজকে কি কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে?

রাষ্ট্রভাষা

প্রথমেই বলিয়াছি গান্ধীজী গোরক্ষপুরের কংগ্রেসকর্মী সম্মিলনে উপস্থিত কর্মীদের দ্বারা ছয়মাসের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছেন। আমি অবশ্যই মনে করি কর্মীরা দৃঢ়তার সহিত সেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন এবং পালনের চেষ্টা করিতেছেন।

অনেকের মনেই এই প্রশ্ন আসে গান্ধীজী রাষ্ট্রভাষার জন্য এত আগ্রহশীল কেন? অনেকে আবার এইরূপ প্রশ্ন করেন, "আমি বাংলার কোন নিভৃত কোণে বসিয়া গ্রামের কাজ করিতেছি—আমার কর্মক্ষেত্রে বাংলা ছাড়া কোন ভাষারই ব্যবহারের প্রয়োজনই নাই। আমার রাষ্ট্রভাষা শিখিবার দরকারই বা কি, শিখাইবারই বা দরকার কি? আমার তো ভিন্ন প্রদেশবাসীর সহিত কথোপকথনের কোন যোগ নাই, প্রয়োজনও হইতেছে না। ইহা সত্ত্বেও গান্ধীজী প্রত্যেক কর্মীকে রাষ্ট্রভাষা শিখিতে বলিতেছেন কেন?"—কিন্তু গান্ধীজী কি শুধু রাষ্ট্রভাষার কথা বলিতেছেন—প্রথমে তিনি প্রাদেশিক ভাষা অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের সহিত যোগস্থাপনের কথা বলিতেছেন। তাহা ছাড়া সমস্ত ভারতের সহিত চিন্তাবিনিময়ের জন্য রাষ্ট্রভাষা অবলম্বনের কথা বলিতেছেন। এই চিন্তা-বিনিময় একটা প্রধান এবং মৌলিক বিষয়—যাহা সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রগত ঐক্য সম্পাদনের অবলম্বন। গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতিতে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে—সমস্ত প্রদেশ, জেলা, গ্রাম—এমন কি ব্যক্তি পর্য্যন্ত স্ব স্ব স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রার জন্য স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করিতেছে—অর্থাৎ বিকেন্দ্রীকৃত হইতেছে;—আবার ভাবের আদানপ্রদানের, চিন্তা-বিনিময়ের ভিতর দিয়া একটা বিরাট ঐক্য সাধন করিতেছে অর্থাৎ কেন্দ্রীকৃত হইতেছে—ভারতবর্ষের অখিণ্ড রাষ্ট্রের অখণ্ডত্ব সাধন—এই ভাবে বিকেন্দ্রীকৃত ও কেন্দ্রীকৃত হইয়া সাধিত হইতেছে—এই কেন্দ্রী-করণের জন্যই সার্বজনিক রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু ইহা প্রাদেশিক ভাষাকে অবহেলা করিয়া নয়।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমরা দেখিতে পাই—ইংরাজ আমাদিগকে আমাদের ভাবের ঘরে জব্দ করিয়াছে—তাই না তাহাদের শাসন এত সহজ, আমাদের এত মোহগ্রস্ত করিয়াছে! যে ভাবে তাহারা আমাদিগকে ইংরাজী শিখাইয়াছে—অর্থাৎ সোজা কথায় যেভাবে শিক্ষা দিয়াছে তাহাতে আমাদিগকে আগাগোড়া আমাদের স্বকীয় চিন্তাধারা হইতে বিচ্যুত ও

মোহগ্রস্ত করিয়া, ঘুরে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই ভাবের ঘরের পরাজয়ের গ্লানি দূর করিতে হইলে প্রাদেশিক ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষাই একমাত্র অস্ত্র। প্রাদেশিক ভাষার প্রতি অবহেলা এবং রাষ্ট্রভাষা না থাকা—আমাদিগকে জনসাধারণ হইতে এমন ভাবে দূরে রাখিয়াছে যে নিজ মাতৃভাষায় তাহাদিগকে কিছু বলিতে গেলে বুঝাইতে সক্ষম পর্য্যন্ত হই না—ইংরাজী শিক্ষিতের চিন্তা ইংরাজীকে অবলম্বন করিয়াই গঠিত হয় বলিয়া। এই জন্যই যদি কোন কর্মী বাংলার গ্রামে বসিয়া কাজ করেন এবং সেখানে রাষ্ট্রভাষা প্রয়োগের কোন ক্ষেত্রও না থাকে, তবুও সর্বভারতের সহিত চিন্তার যোগ ও বিনিময় এবং তাহা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চার করার জন্য তাঁহার রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আছে—শিখাইবারও প্রয়োজন আছে।

উপসংহার

গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় কেবল কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের সামান্য উল্লেখ মাত্র হইল বলা যায়। এখন কেবল একটী কথা সংক্ষেপে বলিয়াই শেষ করিব। গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের ফলে যে সকল গ্রাম-শিল্পের সৃষ্টি হইবে—তাহার উৎপাদন ও বিতরণ সমস্যাকে বর্তমান অর্থনীতি অর্থাৎ টাকার মাধ্যমে ও তাহার আভিজাত্য আঘাত দিবে—সস্তা বা মহার্ঘ্য এই প্রশ্ন গ্রামশিল্পকে আঘাত করিবে। মূলীন-শিল্প-সঞ্জাত এবং কৃষি-সঞ্জাত দ্রব্যমাত্রই আপেক্ষিক-ভাবে বিনাশশীল—টাকাটা সেইভাবে অবিনাশী পদার্থ। আমি বাজারে সবজি বা দুধ বিক্রয়ার্থ লইয়া গেলাম, দুইটাই বিনাশশীল—আমাকে তখনই বেচিতে হইবে। টাকাটা সেইরূপ বিনাশশীল নয়—আমার হাতে আছে—তাহার গায়ে না থাকিলে সেই শক্তিশালী হইল এবং তাহার নির্দ্দিষ্ট মূল্যেই আমাকে বেচিতে হইবে। এই মূলে এই টাকা পদার্থটি গঠনমূলক কর্মপদ্ধতিসমূহকে আঘাত করে—এই আঘাত হইতে বাঁচিতে হইবে। এইজন্য কংগ্রেসসেবক তথা গ্রামসেবক—গ্রামকে স্বাবলম্বী করার দৃষ্টিতে এই টাকার মাধ্যমের অহিতকারিতা নিজে বুঝিতে এবং অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। গ্রাম স্বাবলম্বী হইলে মুখ্যভাবে গ্রামের সামূহিক ধনবৃদ্ধি হইবে, তখন টাকা ধনের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও তাহার আভিজাত্য আপনা আপনি কমিবে। গঠনমূলক কর্ম-পদ্ধতির মূলে এই টাকার আভিজাত্যের পরাজয়ের সিদ্ধান্ত রহিয়াছে—ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। টাকার এই আভিজাত্য দূরীকরণের মধ্যেই আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠার পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ২-১২-১৩৪৯

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

বিশ্বপ্রথম আগে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
যে কবি, নিখিল চিত্ত সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ রসে
সিক্ত করি সিদ্ধাক্ষরে মেঘালোকে গাহিলে যে গান
আজিও রসিক চিত্ত ধ্বনি তার করিতেছে পান
আদিম-অমৃত-ধারা। মন্দাক্রান্তা ছন্দে ছন্দে তার
আন্দোলিত লক্ষ-হিয়া শ্রদ্ধাপুষ্পে তব বন্দনার
করিতেছে আয়োজন আজো বহু শতাব্দির পরে।
তারি সাথে কালিদাস, বন্দ তোমা নমস্কার করে।

অন্বেষণের পন্থামুক্ত করেছিল শকমর্দ্দ হরি'
একদা যাহারা—যাহারা আপন শির অর্ঘ্যাহত করি'
বেড়াইত ধরণীতে, তাহাদেরে শুনাইতে কবি
মধু-ঝরা মেঘদূত, তাহাদেরে দেখাইতে ছবি
বিচিত্র সৌন্দর্যে ভরা ভারতের নদী-গিরি-বন
বিরহ বেদনাপূর্ণ সৃষ্টিছাড়া মানুষের মন।
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি যাহারা করিয়াছিল পান
তব কাব্য-নির্ঝরের স্নিগ্ধ নীর, পাবে না সন্ধান
তাদের বিক্রয়, বীর্য, শুধগ্রাহী বিদগ্ধ-হৃদয়
আষাঢ়ের মাঝখানে। সে সকলি স্বপ্নের বিলয়।
নির্লজ্জ হইয়া মোরা পরস্পরে যাচা করি নত
বিনা প্রতিবাদে নহি প্রতিদিন অবনমিত শত,
নিষ্পন্দ হইয়া শুনি ঘুষিতের বিভা যাহাকার
জনবীরে অহীনা হেরি মনে আসি না ধিক্কার।

আজি এই বর্ষাগমে আষাঢ়ের আসন্ন-সন্ধ্যায়
তোমার অমর আত্মা আমি যবি আসিত ধরায়
মেঘদূতে যে মরমী, কোন্ গান উঠিত বাজিয়া?
কি ক্রন্দনে আন্দোলিত বিচলিত হত তব হিয়া?
ধাবিকার-প্রমত্তের নির্বাসিত যক্ষের লাগিয়া
ফেলিতে নয়ন-বারি, বেদনায় বিদে পাঠাইয়া
ধূম-জ্যোতি-সলিল-মরুত-সন্নিপাত মেঘদূত
তাহার প্রিয়ার লাগি। তোমার সে অশ্রুতে অশ্রুতে
দেখিতে বিশ্বিত বিশ্ব কবিতার নব মুক্তামালা
শুনিত কবির কণ্ঠে বিরহ-সঙ্গীত প্রাণঢালা।
স্বাধীনতা-হীন মোরা স্বাধিকার-প্রমত্তের বলে
কাটাই দুঃসহ কাল দুর্গতি-বন্ধুর-গিরি-তলে,
জীবন প্রকোষ্ঠ হ'তে খসি পড়ে মর্ম্মব্যথা-বলয়,
অতীত স্মরিয়া যত বেদনায় হয় অক্ষয়।
এ ভাগ্যির লাগি তুমি কারে দূত পাঠাইবে আজ?
কোন্ কাব্য বিরচিবে বাল্মীকির কবিকুলরাজ?

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

১৬

অমল আর কয়েক দিন বাড়ী আসিয়াছে কিন্তু মায়ের চোখে তাহার মানসিক ও সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিবর্ত্তন আত্মগোপন করিতে পারে নাই। অমল পালাইয়া পালাইয়া সংগোপনে একটা অব্যক্ত অপ্রকাশ্য বেদনার দহনে কঠিন শিলার মত ধীরে ধীরে যে শুকাইয়া যাইতেছে সেকথা মা বুঝিয়াছেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। অমল কোথা হইতে বুকে কাঁটা বিঁধাইয়া রক্তাক্ত দেহে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা তিনি বুঝেন নাই বটে, কিন্তু সে ক্ষতে শীতল জননী-স্নেহের প্রলেপ দিয়া আরোগ্য করিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু অমল কেবলই লুকাইয়া বেড়ায়, তাহার সাম্নে ধরা দেয় না।

অমল দ্বিপ্রহরে শুইয়াছিল—শ্রাবণের আকাশ মেঘ-মেদুর। পুরাতন দালানের স্বল্পালোকে গৃহ আরও অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। মাতা তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—তোর কি হয়েছে বল ত—

অমল মিথ্যা কথা কহিল—কিছুই ত হয়নি মা।

একটু হাসিয়া মা কহিলেন—তোকে এত বড় করলুম, আর আজ তোর মনকে তুই আমার কাছে গোপন করবি, এ কি সম্ভব? কি হয়েছে বল—

—পরীক্ষা ভাল হয়নি তাই। সেকেণ্ড ক্লাস হলে ত ভাল চাকুরী হবে না মা—

—ভাগ্যকে কেউ রোধ ক'রতে পারে না বাবা। পড়ার খরচ ওরা দিতে চেয়েছিল, যদি হ'ত, তবে হয়ত এমন খারাপ হতো না—কিন্তু ভাগ্য বলবান। সেজন্যে দুঃখ করিস্ নে। ভগবান দিলে সেদিন সমস্ত একসঙ্গে সুদে আসলে উঠে আসবে—

অমল কোন সান্ত্বনাই পাইল না। সে আর একটি প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মা তাহাই বলিলেন,—ভাল হোক মন্দ হোক্ পরীক্ষা ত হ'য়ে গেল, এখন গৌরীর মাকে কি ব'লবো। আমার কথায় তারা অন্য সমস্ত সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়েছে—আর গৌরীকে ঘরে না আন্লে আমারও যেন শান্তি নেই, ওর স্থান আর কেউ পূরণ ক'রতে পারবে না—

অমল জবাব দিল না। কি হাস্যকর তাহার জীবন? আজ মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি কি তাহার মধ্যে অবশিষ্ট আছে? জীবনের যত সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে সে ফেলিয়া আসিয়াছে বর্ষণমুখর সেই সন্ধ্যার—সে আর ফিরিবে না; কিন্তু যার এই ইচ্ছাকে, এই স্নেহ বাসনাকে সে কেমন করিয়া ফিরাইয়া দিবে?

মা ধীরে ধীরে কহিলেন—গৌরীকে তুই চিনিস্ না। আমি চিনি—তার অন্তরের কথা আমার কাছে গোপন নেই—তার অন্তর জলের মত স্বচ্ছ হ'য়ে আছে আমার কাছে। যেদিন তাকে ব'ললাম, আমার ঘরে বোধ হয় তোকে আর আনতে পারলাম না গৌরী, তখন তার মুখে যে বেদনা ভেসে উঠেছিল তা'ত আমার সবই জানা। জীবনে কোনদিন সুখ যাকে বলে তা ভোগ করিনি, তোর মুখের পানে চেয়ে দিনের পর দিন কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য ক'রেছি, কিন্তু প্রতিবাদ করিনি। তোকে আমি জোর ক'রবো না, তবে—

মা আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। নীরবে দুই বিন্দু অশ্রু মুক্ত করিয়া দিয়া তেমনিভাবে বসিয়া রহিলেন।

অমল স্তব্ধ ভাবিয়া যাইতে লাগিল—জীবনে সে ত কাহাকেও সুখী করিবার পক্ষে একান্তই অযোগ্য। মায়ের ইচ্ছা ও অনুরোধকে এখুনি মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারে—যেমন করিয়া অপর্ণারমা একটি কথায় তাহার তাসের ঘর উড়াইয়া দিয়াছিল—কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়। নিজের জীবনের প্রতি একটা চরম ধিক্কারে তাহার অন্তর বিষাক্ত হইয়াছিল তাই ভাবিল,—যদি পরের জন্যে সে আজ অকিঞ্চিৎকর জীবনের বাসনাকে ত্যাগ করে তবে তাহাতেই বা কি ক্ষতি? মাতা পার্শ্বে বসিয়াই অশ্রুমোচন করিতেছেন—গৌরী তাহারই জন্য মুখ ভার করিয়া বিষাদার্ত্ত চিত্তে দিন গণিতেছে।

অমল কহিল—আজ চাকুরী নেই। গৃহে অন্নের সংস্থান নেই, এই বুভুক্ষু গৃহের মাঝে আর একজনকে নিমন্ত্রণ ক'রে কি খেতে দেবে মা?

মা হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন—তোর জ্ঞানবুদ্ধি হবার আগে যে তোর ভাবনা ভেবেছে সেই আজ গৌরীর ভাবনা ভাববে। যে দিন হামাগুড়ি দিয়ে এই উঠানে ঘুরে বেড়াতিস্ সেদিন তোর ভাবনা কে ভেবেছিল? আজ তুই নতুন ক'রে আমার ভাবনা ভাবছিস্—তাই না?

অমল চুপ করিয়া রহিল, এ প্রশ্নের বিরুদ্ধে যুক্তি থাকিতে পারে কিন্তু জবাব নাই। স্নেহের গভীরতম প্রকাশের জবাব নাই, তাই অমল চুপ করিয়াই রহিল।

মা আবার বলিলেন—জোর ক'রে কখনই আমি তোকে বিয়ে দেব না। তবে আমার সারা জীবনের ইচ্ছা তোকে জানালাম, তোর যেমন ইচ্ছা করিস্। আমার জীবনের আজ শেষ, তোর আরম্ভ—কাজেই আমার ইচ্ছার আজ কোন মূল্য নাই—

অমল বিচলিত হইয়াছিল। সে প্রশ্ন করিল—গৌরীকে বিয়ে ক'রলে তুমি কি সত্যিই সুখী হবে মা?

মা বলিলেন—হ্যাঁ। পরকালে যেয়েও এ শান্তিকে আমি ভুল্‌বো না। তোকে কেবলমাত্র গৌরীর হাতে দিয়েই নির্ভাবনা হ'তে পারি, অন্য কোথায়ও রেখে আমার শান্তি নেই।

অমল সরিয়া হইয়া, কোন চিন্তা না করিয়া জবাব দিল—তবে তাই হোক্। তোমার ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করাই আমার তৃপ্তি। আমার কাছে এর চেয়ে বড় দেবার আর কিছু নেই—

শ্রাবণের শেষে এক শুক্লা রজনীর কর্ম্ম-কোলাহল-মুখরিত নিশীথে অমলের সহিত গৌরীর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—প্রচুর অর্থ ও বস্তুর অপচয় এবং অকারণ আড়ম্বরের মাঝে।

আজ ফুলশয্যার রাত্রি। ভিজা গাছের ফাঁকে শুভ্র জোছনা উঠানে, গৃহে, অমলের ফুল-সুরভিত শয্যায় আসিয়া পড়িয়াছে। বাগানের ভিজা পাতা হইতে একটা প্রথম যৌবনের মত চাপা উত্তপ্ত তৃষ্ণা যেন রহিয়া রহিয়া বাতাসে দীর্ঘশ্বাস নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিতেছে। আকাশের গায়ে শুভ্র, ধূসর, কালো নানা অবয়বের মেঘমালা পাল তুলিয়া চলিয়াছে—সুরের পানে।

উৎসব বাড়ীতে কর্ম্মকোলাহল প্রায় থামিয়া আসিয়াছে। পাড়ার এয়োস্ত্রীগণ মাঙ্গলিক আচার শেষ করিয়া বর-বধূকে ফুলশয্যায় রাখিয়া গিয়াছে। চারি পাশে গভীর নিশীথের একটা স্তব্ধতা রচিয়া রহিয়া শঙ্কিত শঙ্খে যেন ধরিত্রীর হৃৎকম্পন অনুভব করিতেছে—

অমল শয়নগৃহে একটা চেয়ারে বসিয়া, আলোটা সামনে রাখিয়া অনির্দ্দিষ্ট, বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ভাবনার মাঝে সমাহিত হইয়া ছিল। পার্শ্বেই শুভ্র মাল্যে শোভিত শয্যায় এক রঙীণ কাপড় পরিয়া অবগুণ্ঠিতা গৌরী নির্জ্জীব জড় পদার্থের মত স্পন্দনহীন দেহ এলাইয়া শুইয়া আছে। অমল সেদিকে চাহিয়া দেখে নাই।

মাতা উঠান হইতে আদেশ করিলেন—অমল, ক'দিন ঘুমোস্ নি। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়। শরীর খারাপ ক'রবে।

অমল আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল—অবগুণ্ঠিতা গৌরীর পাশেই। পূবের জানালা দিয়া মেঘাবগুণ্ঠিত চাঁদের ম্লান আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতিফলিত আলোকে গৌরীকে দেখা যায়। আত্মীয়পরিজনহীন বাড়ীখানি নীরব—

অমল ভাবিতেছিল—অপর্ণাকে লইয়া বালিগঞ্জের একখানা বাগান বেষ্টিত বাড়ীতে গৃহ রচনা করিবে কিন্তু আজ সে কোথায়? আজকার দিনে সেও হয়ত এমনি স্বামী পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাহারই কথা ভাবিয়া চলিয়াছে—না হয় পিতৃগৃহে একাকী শয্যায় পড়িয়া অতীতের সঞ্চিত স্মৃতি গণিয়া গণিয়া মনের নিভৃত কোণে সঞ্চয় করিতেছে। সে যেমন আজ জীবনের ঘনিষ্ঠতম, নিকটতম, প্রিয়তম সঙ্গীর সঙ্গে বৃহত্তর আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে চলিয়াছে, সেও হয়ত তেমনি করিবে—হয়ত করিবে না। হয়ত দু'দিনের ব্যসন বিলাসকে ভুলিয়া জীবনের সঙ্গে নূতন উদ্যমে চলিবে—

.....আর গৌরী! শয্যার একাংশ অধিকার করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে হয়ত তাহারই সম্বোধনের জন্য, দুর্ব্বলতম আহ্বানের জন্য অধীর প্রতীক্ষা করিতেছে। ও জগতে সম্পূর্ণ নিরপরাধা, বৎসরাধিক নীরব করুণ চাহনিতে কি চাহিয়াছে তাহা সেই জানে—হৃদয়ের মাঝে নিভৃত

কোণে হয়ত তাহারই মন্দির রচনা করিয়াছে। ওই কোমল, সুন্দর পবিত্র সহিষ্ণু নারীকে অসুখী করিবার মাঝে, তাহাকে বঞ্চিত করিবার মাঝে কোনো গৌরব নাই, কোন বীরত্ব নাই।

গৌরীর হাতের সোনার চুড়িগুলি জ্যোৎস্নালোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। সে হাতখানাকে ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিয়া কহিল—গৌরী এদিকে এসো—

গৌরী নড়িল না। অমলের হাতখানার মাঝে গৌরীর কোমল শুভ্র হাতখানি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—সেখানাকে ছিনাইয়া লইবার শক্তি তাহার নাই। অমল মৃদু আকর্ষণে গৌরীকে বুকের অতি সন্নিকটে টানিয়া আনিল—তাহার বুকের মাঝে গৌরীর ভীরু অন্তরের দুরু দুরু শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে—উন্মোচিত অবগুণ্ঠন, গৌরীর অনাবৃত অসাড় মুখখানি জ্যোৎস্নালোকে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে—

অমল ভাবিতেছিল—বালিগঞ্জের পার্কে জ্যোৎস্নালোকিত অপর্ণার সেই মুখখানির কথা—সে অতুল সৌন্দর্য্য তাহার অন্তরকে কি দুর্নিবার আকর্ষণেই না টানিতেছিল—কিন্তু তাহার উপরে ওষ্ঠ সংস্থাপিত করিয়া হৃদয়ের সুধা নিঃশেষে পান করিবার তৃষ্ণা তাহার মিটে নাই। সে পিপাসা বুকে লইয়া ফিরিয়াছে আজ নূতন লোকে আপনার তৃষ্ণা নিবারণ-কল্পে। অমল ধীরে নিঃশব্দে সেই জ্যোৎস্না-বিধৌত মুখখানাকে একটি চুমায় আরক্ত করিয়া দিল।

কম্পমান চকিত গৌরী জানিল না আজ সে যে চুম্বন তাহার দেহে লাভ করিয়াছে তাহা অন্তরের প্রান্ত দিয়া লুকাইয়া বালিগঞ্জ পার্কের জ্যোৎস্না-স্নাত আর একটি ওষ্ঠের উপর পড়িয়া তাহাকে কত বড় প্রবঞ্চনা করিয়াছে!

অমল অকস্মাৎ থামিয়া গেল—জীবনের প্রথম ব্যভিচারের অনুশোচনায়, আপনার নীচতায়, প্রবঞ্চনায়, একটা অপরিসীম লজ্জায় সে সঙ্কুচিত হইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়স্ফরিত উত্তপ্ত অশ্রু উৎসারিত করিয়া মনে মনে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—এই মানব হৃদয়! এই প্রেম! এই জীবন! আজ এমনি করিয়া অপর্ণা তাহার পার্শ্বে থাকিলে হয়ত তাহার ব্যভিচারী অন্তর গৌরীর ওষ্ঠ বারবার গোপন চুম্বনে রাঙাইয়া তুলিত। সমগ্র জীবনে এই ব্যভিচারের অভিশাপ বহ্নিশিখার মত পরিব্যাপ্ত হইয়া মানুষের অন্তরকে অতৃপ্তির অনলে পোড়াইয়া অঙ্গার করিয়া তুলিয়াছে। তার অহঙ্কার নিষ্ফল—একেবারেই নিষ্ফল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রায় সাত বৎসর পরের কথা।

অপর্ণা কার্ট্‌ ক্লাস পাইয়াছিল, কিন্তু অমল পায় নাই; সুতরাং প্রফেসারী চাকুরী তাহার জুটে নাই। বর্ত্তমানে এক সওদাগরী আফিসে সে চাকরী করে, বেতন আশি টাকা। অজিতবাবুর সহিত অপর্ণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে অমল ও তাহার জীবনের যোগসূত্রও ছিঁড়িয়া গিয়াছে। গৌরী আজ অমলের গৃহবধূ—তাহাদের একটি ছেলে—বয়স বছর চারেক হইবে। নাম সাধারণ—খোকা। অমল কবিতা লেখা ছাড়িয়া মাঝে মাঝে গল্প লিখে, কারণ তাহাতেই কিছু পাওয়া যায়। তাহার মা আজিও বাঁচিয়া আছেন—গৌরীর হাতে নিজ পুত্রকে দিয়া প্রস্থান করিতে পারেন নাই।

কয়েকদিন মাত্র হইল অমল নতুন বাসায় উঠিয়া আসিয়াছে—বাসা ভাল বলিয়া নয়, ভাড়া কম বলিয়া।

বড় একটা বাড়ীর ছায়ায়, কলিকাতা শহরের একটী নগণ্য গলিতে অমলের এই বাসা। দু'খানি ঘর একতলায়। বাড়ীটী একতলা তাই আলো বাতাস কিছু আছে, একটু বাঁধানো উঠান—তাহার এক পাশে একখানা ছোট টালির চালায় রান্নাঘর—পাশে কল, চৌবাচ্চা। অমলের কবি-মন নিরস উঠানের এক কোণে টবে করিয়া কয়েকটী ফুলগাছ করিয়াছে—তাহার পাশেই পাশের বড় বাড়ীখানার ভাঙা কাঁচকণ্টকিত বিরাট প্রাচীর। তার পরে ওই বাড়ী, আকাশ পর্য্যন্ত উঠিয়া ছোট বাড়ীখানার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ও বাড়ীর স্কুল বারান্দায় দাঁড়াইলে, এ বাড়ীর ভিতরে প্রায় সবই দেখা যায়, কিন্তু এ বাড়ী থেকে ও বাড়ীর ওই বারান্দা আর রঙীণ পর্দ্দার ঝটপটি ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। এক ঘরে মা ও তাহার পূজার সরঞ্জাম প্রভৃতি থাকে, অন্য ঘর অমলের বাস-গৃহ। ঘরের সামনের বারান্দাটা খোকার ক্রীড়াঙ্গন, ভাঙ্গা ঘোড়া, লাটি, ছেঁড়া ন্যাকড়া, পুরাতন পাঁজি প্রভৃতি নানা মহার্ঘ বস্তু সেখায় ক্রমাগতই সঞ্চিত হইয়া উঠে। খোকা কখনও নয় অবস্থায়

কখনও ইনের পরিয়া সমস্ত উঠান পরিক্রমা করিয়া বেড়ায় এবং ফাঁক পাইলে সদর দরজা পার হইয়া রাস্তায় চলিয়া যায় এবং বিস্মিত কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়া যাহা কিছু দেখে তাহাতেই অপূর্ব্ব আনন্দ প্রকাশ করে।

সেদিন শনিবার। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি, কলিকাতায় তখনও শীত পড়ে নাই। কিন্তু উত্তরের বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে। অমলের ফিরিবার সময় হইয়াছে তাই গৌরী সদর সদরজায় কান রাখিয়া কি যেন একটা সেলাই করিতেছিল। ঘন ঘন কড়ার শব্দ হইতেই সে উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল—অমলের কড়া নাড়িবার সুর তাহার কাছে পরিচিত—

অমল বাজার হইতে কিছু ফুলকপি প্রভৃতি তরকারী ও মাংস কিনিয়াছিল—বড় রুমালের পোটলাটা নাটকীয় ভঙ্গিতে গৌরীর মুখের নিকটে তুলিয়া ধরিয়া অমল আধুনিক সিনেমা-সঙ্গীতের সুরে মৃদু কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—তোমার তরে এনেছি বহি হিয়া, তুমি নিলে না প্রিয়া—

গৌরী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কৃত্রিম ক্রোধে কহিল—তোমার লজ্জা সরম হ'ল না? মা শুনলে কি ভাববেন বল ত? ছেলেটাও ত রয়েছে—

খোকা মায়ের পিছনে দাঁড়াইয়া এমন ভাবে হাসিতেছিল যেন সেও পিতার রসিকতাটা বেশ উপভোগ করিয়াছে। গৌরী তাহাকে সামনে আনিয়া কহিল—তোমার কাণ্ড দেখে খোকাও হাসছে—

—তোমার ছেলে ত, একটু অকালেই রসবোধ জন্মেছে—

গৌরী জবাব দিল—পৈতৃক ধারা ত পাওয়া চাই।

মাতা কহিলেন—অমল নাকি রে?

অমল দ্রুত সংযত হইয়া কহিল—হ্যাঁ মা। ফুলকপি আর মাংস এনেছি মা।

—বেশ, কিন্তু এত দেরী ক'রলি কেন?

—ওই বাজারেই একটু দেরী হল। তোমার সাধের বৌমা যা মাংস রাঁধেন তা'ত খাওয়াই যায় না—আজ মাংস রেঁধে একবার দেখিয়ে দিতে হবে—

মাতা কথা কহিলেন না—এ দাম্পত্য কলহকে মনে মনে তিনি উপভোগ করিতেন। কিন্তু গৌরী তাহাকে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—রাঁধুক মা আজ, আপনি কিন্তু দেখিয়ে দিতে পারবেন না।

মা হাসিয়া কহিলেন—আচ্ছা।

অমল যথেষ্ট বীরত্ব সহকারে রান্নাঘরে মাংস রাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গৌরী তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া ফাই-ফরমাজ খাটিতেছে—মসলা বাটা, তরকারী কুটিয়া দেওয়া, তোলা উনুনে আঁচ দেওয়া প্রভৃতি এবং পুত্র খোকা সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিয়া কখনও শিল হইতে পেয়া মসলা চুরি করিয়া তাহার নারিকেলের মালায় সঞ্চিত করিতেছে, কখনও মাতার চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে এবং গৌরীর ধমক খাইয়া শান্ত চিত্তে তাহা ঘোড়াকে জোড়া দিতে মনোযোগ দিতেছে।

গৌরী কার্য্যান্তরে গিয়াছে, অমল মাংস সিদ্ধ হইতে দিয়া হয়ত একটু ঘরে যাইবে তাই খোকাকে বলিল—এ দিকে আসিস্ নে খোকা, ওখানে বসে খেলা কর—

অমল চলিয়া গেল, খোকা হৃষ্ট মনে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখে কেহ কোথাও নাই, কেবল দূরের বড় বাড়ীটার বারান্দায় কে যেন বসিয়া বই পড়িতেছে। খোকা উনুনের নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে ভাবিল, কিরূপে শ্রদ্ধেয় পিতাকে সে সাহায্য করিতে পারে। বুদ্ধির অভাব ছিল না, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পিতাকে সে ঘটি হইতে জল ঢালিয়া দিতে দেখিয়াছিল, সে সংক্ষেপে এবং সত্বর বাকীজলটুকু কড়াইতে ঢালিয়া দিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিয়া দিল। চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই—দূরের সেই লোকটি তাহার দিকে চাহিয়া কেবল হাসিতেছে। সেও সগর্ব্বে নিজ কর্ম্মের গৌরবে একটু হাসিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল—

অমল ফিরিয়া দেখে ঝোল ত আদৌ কমে নাই বরং কড়াই পরিপূর্ণ হইয়া ফুটন্ত ঝোল নীরব হইয়াছে। অমল ডাকিল—মা এ দিকে এস, শিগ্‌গির—

মাতা আসিলেন। অমল অভিযোগ করিল—এই ভাখো, আড়ি করে কত জল দিয়ে গেছে তোমার বৌমা।

মাতা অবিশ্বাস করিয়া কহিলেন—গৌরী ত পাগল নয় যে, জল ঢেলে দেবে।

—না, তোমার বৌএর কি আর দোষ হতে পারে?

গৌরী আসিয়া দেখিল, আশ্চর্য্যও হইল—কিন্তু অমলের গাম্ভীর্য্য ও বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। অমল কহিল—দেখ, আবার হাস্‌ছে—

মা তবুও অবিশ্বাস করিলেন। অমল পুত্রকে প্রশ্ন করিল—খোকা তোর মা জল দিয়েছে কড়াইতে—না?

খোকা গম্ভীরভাবে কহিল—হ্যাঁ।

মাতা হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—খোকা, ঘটি নিয়েছিলি?

—হুঁ।

—এর ভেতরের জল কি হ'ল?

—জল? খোকা উঠিয়া আসিয়া কড়াইটা দেখাইয়া কহিল—এখানে দিলুম।

গৌরী হাসিয়া উঠিল। মা হাসিলেন, অমলও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—বংশ পরম্পরায় আমার কল্যাণে লেগেছ—ও মাংস কি আর খাওয়া যাবে?

গৌরী চিমটি করিল—উঠান বাঁকা কিনা! (ক্রমশঃ)

আজাদ হিন্দ সরকার

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

খৃষ্ট অব্দ ১৯৫৭এ ভারতবর্ষের কালরাত্রির আরম্ভ। ভারতবাসী কাল নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নরপতির বিশ্বাস ঘটাইয়া বাঙ্গালী বাস কাটিয়া কুমীর আনিয়াছিল। প্রায় দুইশত বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গালী সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে; তথাপি, প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইয়াছে অথবা পাপ খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মহাপাপের শাস্তিও মহান্!

একশত বর্ষ পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জনজাগরণের প্রাথমিক সূচনা দেখা দিয়াছিল। ১৮৫৭ সালে জনবিক্ষোভের সূত্রপাত। বৃটিশের ভাগ্য বিপর্য্যয়েরও তখনই আরম্ভ।

তাহার পর হইতে, ভারতের অন্তর্নিহিত ভাগ্যবিধি পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টার বিরত হয় নাই। ১৮৫৭ অব্দের কাহিনী চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের নামে ইতিহাস লোহিত আজও উজ্জ্বল। ১৯৪২ অব্দও স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিল। আমাদের সৌভাগ্য, খৃষ্টীয় অব্দ ১৯৪২কে আমরা চাক্ষুষ করিতে পারিয়াছি। ১৯৪২এ ভারতের ভিতরে ও বাহিরে যে জন বিস্ফোরণ হইয়াছে, তাহার পূর্ণাহুতি কবে হইবে জানি না, আমার সতর্ক, ১৯৫৭ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে কি না তাহাও বলিতে পারি না; তবে যেটুকুই সে-দিন হৌক না কেন, বজায়ছে, ১৯৪২এর প্রায়শ্চিত্ত যে হইয়াছে, স্থলে জলে অনলে অনিলে অন্তরে বাহিরে দিব্যাক্ষরে তাহা লিখিত থাকিতে দেখা যাইতেছে। ১৯৪২এর আগষ্ট মাসে ভারতের অন্যান্যের যে প্রতীক্ষার গুরুক্ষণে "কুইট্ ইণ্ডিয়া" ধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছিল, ভারত সীমান্তের পারেও সেই বিষয়ে কে-জানে কোন্ কুহক মন্ত্রে সেই "কুইট ইণ্ডিয়া" ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি ভীম গর্জ্জনে গুঞ্জিয়া উঠিয়াছিল।

এই সাবৃত্ত, এই সামঞ্জস্য, এই ঐক্যতানবাদিত সামগান একই সময়ে আর দূর সুদূরান্তে মহাসমুদ্র-ব্যবধানে দুইটি ভূখণ্ডে সম্ভব হইল কেমন করিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা আমি করিব না; কারণ,প্রয়োজনেরও অভাব ঘটে, যাহল্যও ঘটে! আমি কেবল এই কথা বলিব যে মনুষ্যের অগোচরে যোগ করি বা অন্তরীক্ষে বসিয়া যিনি ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছিলেন—বিশ্বের জড় ও জীবের ভাগ্য চিরদিন যিনি নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁহারই ইঙ্গিতে, ভারতের ভিতরে ও বাহিরে পরাধীনতার লৌহ-পিঞ্জর ছিন্ন করিবার উদ্যম বাসনা একই সঙ্গে—একই মাহেন্দ্রক্ষণে পরাধীন ভারতবাসীকে "কুইট ইণ্ডিয়া" মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল।

অসম্ভব সম্ভব হয়েও কি? ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে রাষ্ট্রীয় মহাসভার কর্ম্মপরিষৎ "কুইট ইণ্ডিয়া" মন্ত্র কুর্জ্জপত্রে লিখিয়াছিলেন। কাগজের-কলমের দাসী শুদ্ধ হইল-কি-হইল না, ৮ই আগষ্ট নিশান্তের পূর্ব্বেই রাষ্ট্রীয় সমিতির লোকজন পোটলীপুটলীসহ, আর গান্ধীজী পর্য্যন্ত, অজ্ঞাত স্থানে চালান হইলেন। অহিংসাব্রতধারী মানুষ কয়জন, গো-চারণের গতীসহ যেমন বৃষ্টিসন্ত গোপবালকের অগ্রে অগ্রে নিঃশব্দে চলে, সেইরূপ চলিতে চলিতে গো-শালায় প্রবেশ করিলেন; খাঁপ বন্ধ হইয়া গেল। পৃথিবীর সহিত কোন সম্বন্ধ রহিল না। কথায় কথায় সংযোগ ছিন্ন নহে, প্রকৃত পক্ষে সকল সংযোগই বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু "কুইট্ ইণ্ডিয়া"র গতি রোধ করিতে পারা গেল না; শব্দ ব্রহ্ম—শব্দময় ব্রহ্মাণ্ডের বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। কে জানিত যে শব্দও বিশ্বের বিশ্বাসে ভরা ছিল!—অনতিবিলম্বে বায়ুমণ্ডলও বিষাক্ত হইয়া উঠিল। আমেরিকার (আমেরিকার ত? না, চোরের মন বাটপাড়ে মারিল?) এ্যাটম্ বম তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই; বিশ্বযুদ্ধের রথী মহারথীগণ তখনও তাহার অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না। কিন্তু অহিংসার যজ্ঞপুতোদ্ভিত "কুইট্ ইণ্ডিয়া" শব্দময় সমগ্র ভারতবর্ষ কাঁপাইয়া দিল।

আমেরিকার এ্যাটম্ বম (আবার একবার জিজ্ঞাসা করি, এ্যাটম্ বম

আমেরিকার কটে ও।) জাপানের আয় দুইটি নগরীর উপরে বর্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে লাতবিন অর্ধশতক বৎসরের পুরাতন ও জটিল মহাব্যাধি—বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইয়াছিল। দুইটি ইতিহাস কথার ইতিবৃত্ত আজও লিখিত হয় নাই। এই দুই কোথায় কোথায় পড়িয়াছিল তাহার বিবরণ আজও অপরিজ্ঞাত। যে কিছু পরিমাণ সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে বিজয়ে, ইহাকে ধাঁটিয়া উঠিতে বিশ্বযুদ্ধজয়ী (জয়ী ও বটেই!) বৃটিশকেও নাজেহাল হইতে হইয়াছিল। ভারতের ভিতরে—বোম্বাই প্রদেশের লাতারা, বাঙ্গালার মেদিনীপুর, যুক্তপ্রদেশের বালিয়া, মাদ্রাজের। রাজধানীবাসী প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ইতিহাস রচনা করিয়াছে। আমাদের ভারতবর্ষে ইতিহাস পূজিত হয়। এই ইতিহাসও পূজা পাইবে।

আর ভারতের বাহিরে, দক্ষিণ পূর্ব-এসিয়া খণ্ডে, "দুইট ইণ্ডিয়ার" প্রতিনিধি স্বাধীন জয়ের বিকশিত করিয়া দিয়াছিল। ভারত-অভ্যন্তরে সিংহ, বিপ্লব, সিংহাসনের বিরোধ; আর বাহিরে, অস্ত্রের ঝনঝনাৎকার। প্রাচ্য বাড়ীর অন্তঃপুরাঙ্গনে কীর্তনের খোল করতালের ঝঙ্কার; আর বহিরঙ্গনে অস্ত্রধারী ঝেরোভাটের কলহ-কোলাহল।

১৮৫৭ ও পরবর্তীকালের ঘটনাবলীকে বিদ্রোহ ও বিপ্লব আখ্যায় অভিহিত করিলেও তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। ১৯৪২এর পরবর্তীকালের ইতিহাস যখন লিখিত হইবে—সেদিনের খুব বেশী বিলম্ব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না—তখন দেখা যাইবে যে এই সমরকার বিপ্লব বা বিদ্রোহ যাঁহারা ঘটাইয়াছিলেন, আর্ট ফর আর্টস্ সেক্, বিদ্রোহের জন্যই বিদ্রোহ, বিপ্লবের খাতিরেই বিপ্লব, তাহার উদ্দেশ্যেই তাহা, তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। ভারত ভিতরে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, ডু অর ডাই—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে; আর, ভারতের বাহিরে যাঁহারা ফুইট ইণ্ডিয়া সংগ্রাম পরিচালিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিধি লেখা, তাঁহার বাণী ছিল, তোমরা শোণিত দাও, আমি স্বাধীনতা দিব। দেখা যাইতেছে, কথা দুইটির মধ্যেও অপূর্ব সাদৃশ্য রহিয়াছে। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গের অর্থ বিশ্লেষণ করিলে স্বতঃই অনুমিত হয় একটা কিছু করিবার বা গড়িবার ইচ্ছা ছিল। কি করিবার বা কি গড়িবার বাসনা ছিল, তাহা ব্যক্ত হইতে পারে নাই। কারণ, আগেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবের কালী না শুকাইতেই লর্ড লিনলিথগো "রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে" করিয়াছিলেন। লর্ড লিনলিথগো করিৎ-কর্মা ও ঘরিত-গতি লোক, আজই, এখনই যাহা করা যাইতে পারে তাহা বা একটু পরের জন্য রাখিয়া দিবার ধৈর্য তাঁহার ছিল না।

তথাপি মনে হয়, গান্ধীজীর মনের মণি-কোঠায় কি বাসনা, পুষ্প-কোরকে রেণুর মত রত্নাকর-গর্ভে রত্নরাজির মত সংগোপনে বসতি করিতেছিল তাহার সম্যক গবেষণা আজ যদি না'ও হইয়া থাকে, একদিন তাহা হইবে; সেদিনও কি খুব দূরে? বিলম্বই বা। আজীবন সত্যাগ্রহী, নিঃসংশয়িতরূপে শান্তিকামী, অহিংসাব্রতচারী মানুষটি কোন্ কাজ করিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন (করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে), অনুসন্ধিৎসু ভারত একদিন তাহা বাহির করিবেই। সেই ত ভারতের বৈশিষ্ট্য। অতীতের গর্ভগৃহে ভারত চিরদিন আবদ্ধ। ভারতের বর্তমান যে অতীতের পটভূমিকাতেই পরিস্ফুট, ভারতবাসীর তাহা অজ্ঞাত নহে।

'নমক পাল' পূর্ণ ও আশ্রমকন্যার 'গোশালায়' আশ্রয় প্রাপ্ত হইবার পরে যেসময় যে সকল অনাচার ও অত্যাচারমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই সকল কার্য্য কি গান্ধীজীর করেঙ্গে-র অন্তর্ভুক্ত? বিশ্বাস করা কঠিন। দিকে দিকে টেলিগ্রাফের তার কাটা গেল, রেলের লাইন উপাড়িয়া ফেলিল, ডাকঘর পুড়িল, নির্দোষ নিরপরাধ মরিল, খালা জ্বলিল—এই সকল কাজ করিয়া করেঙ্গে—মরিতে বলা বা মরা কি গান্ধীজীর অভিপ্রেত ছিল? মনে ত হয় না। বরং মনে হয়, সাতারার পত্রী সরকার, মেদিনীপুরের গ্রাম-রাজ ও ভারতের বাহিরে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাই ঐ করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গের মধ্যে বাসনা অন্তর্নিহিত ও অব্যক্ত ছিল।

বিদ্রোহ, আমরা অনেকগুলি দেখিয়াছি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্রোহ পরিচালিত হইতে দেখা গিয়াছে। তাহার পশ্চাতে করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গের উদ্ভাবন ছিল কি? বড় জোর, "শালের বেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই," ঐ পর্যন্ত। বাঙ্গলায় অগ্নিযুগও দেখিয়াছি। 'আনন্দ মঠের' বঙ্গ অনুকরণে কতকগুলা হত্যা ও লুণ্ঠন। যেসময় আতঙ্কের সৃষ্টি ছাড়া, কৈ, করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গের মত সর্বত্যাগের আদর্শ খড়িয়া উঠিতেও ত দেখি নাই। ১৯১৯ হইতে একার পর একার নানা রকমের আন্দোলনই ত আসিল—রাউলাট বিদ্রোহ, খিলাফৎ আন্দোলন, ডাণ্ডী মার্চ, লবণ সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য—এমন আরও কত আন্দোলন আসিল, যেন ওলট পালট করিতে চাহিল; সাথে সাথে লোক জেলে গেল, হাজার হাজার লোক মরিল, শতকে শতকে সর্বস্বান্ত হইল—কিন্তু কৈ, সাতারার মত জেলা শাসন, মেদিনীপুরের মত গ্রাম রাজ, আজাদ হিন্দ সরকারের মত স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথা ত শুনা যায় নাই। যাঁহারা নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রাদি পাঠ করেন, তাঁহারা অবশ্যই সাতারার পত্রী সরকার, মেদিনীপুরের গ্রাম রাজ ও সুভাষের আজাদ হিন্দ সরকারের আংশিক বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন এবং ইহাও তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে ইংরাজের রক্ত চক্ষু, ধমকি পমকি দেখান, কঠিন আদেশ, সমুদ্যত বন্দুক সত্ত্বেও যতটুকু খবর বাহির হইতে পারিয়াছে তাহাতেই আশ্রয় ভারতের অনমনীয় দৃঢ়তা, অজ্ঞাতপূর্ব সঙ্ঘবদ্ধতা, বর্ণনাতীত সংগঠনকুশলতা দেদীপ্যমান হইয়াছিল। বৃটিশের অপরিমেয় পশুবল—অপরিসীম ধনবল, জলবল, অস্ত্রবল, ছল-কল-কৌশল অবহেলা ও উপেক্ষা করিয়াই ভারতের ভিতরে ও বাহিরে ভারতবাসী উন্নতশির কীর্তবক্ষ অবলম্বন পদবিক্ষেপে তাহার ফুইট ইণ্ডিয়া অভিযান অক্ষুণ্ণভাবে পরিচালিত করিয়াছিল। তাহার মুখে, তাহার চোখে, তাহার বুকে লিখিয়া রাখিয়াছিল, করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে।

প্রোত-ছায়া তটিনীর মত, ভারতের গণ-সরকার ও গ্রাম-রাজ আজ মিলিয়ে হইয়াছে। দক্ষিণপূর্ব এসিয়া খণ্ডের আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টও অবলুপ্ত, কিন্তু সর্ষপের প্রেতাত্মার মত তাহাদের ছায়া-দেহ আজও

ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে স্থলে জলে প্রান্তরে কান্তারে অণুতে পরমাণুতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে জয় হিন্দ হাঁকিয়া ফিরিতেছে। মানুষ আজ এক ভাষায় কথা কহে ; এক ভাবধারায় চিন্তা করে ; আজ তাহার এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য ; আজ তাহার কামনা বাসনা সাধ অভিলাষ—করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে। ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দোচীনে, মিসরে, পারস্যে, ইরাণে, পালেষ্টাইনে করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গেরই তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। কলিকাতার রাজপথে—ধর্মতলা ষ্ট্রীটে, বোম্বাইয়ের জাহাজ ঘাটে, অমৃতসরের শস্ত্রাগারে—আর কত নামই বা করিব?—সর্বত্রই ঐ করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে জয় হিন্দ রবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বাস্তব-অবিশ্বাসী এতদ্ভয়ের সংযোগ দেখিতে পায় না ; কিন্তু চক্ষুষ্মান বাস্তববাদীর সে ভ্রম হইবার নহে। আজিকার ভারতবর্ষে, "জয় হিন্দ" ইতঃপোপিত মুমূর্ষুকেও উজ্জীবিত, উদ্দীপ্ত করে। দ্বাদশবর্ষ প্রান্তিতে জননীর যে আনন্দ, "জয় হিন্দ" ধ্বনিতে ভারতবাসীর আজ সেই আনন্দ ; সে যেন তাহার হারানিধি অমূল্য সম্পৎ ফিরিয়া পাইয়াছে। বঙ্গোপসাগরে যেটুকু ফাঁক ছিল, জয় হিন্দ তাহা ভরিয়া দিয়াছে।

১৯২১ হইতে ১৯৩৩ বৃটিশের ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তি, বিহারের ভূমিকম্পের মত নাড়া দিয়াছিল। বাণিজ্যিক বৃটিশ, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের অধীশ্বর বৃটিশের সম্রাটের প্রবল প্রতাপ প্রতিনিধিকেও দীন-দরিদ্র ভারতের এক অর্ধ উলঙ্গ ফকিরের সহিত একাসনে বসিয়া একই কাগজখণ্ডে লিখিত সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর দান করিতে হইয়াছিল। কলমও এক কি-না তাহা অবশ্য জানা যায় নাই, তবে এক হওয়াই সম্ভব। সেদিনের কথা আজও আমাদের মনে আছে। বিলাতে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স আহ্বান করিয়া অধীন ও অবনত ভারতের সঙ্গে যুক্ত পড়া করিতে হইয়াছিল। কৌপীন-সম্বল ফকিরের যাত্রায় বিলম্ব হয়, বৃটিশ সিংহ শৈল হইতে বোম্বাই পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেণ ছুটাইয়াছিল। বোম্বাইয়ে জাহাজকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। লণ্ডনের রাস্তায় আইন কানুন টেমস্ নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া এই অর্ধ উলঙ্গ ফকিরের সুবিধা করিয়া দিতে পথ পায় নাই। ফকিরের মোটরের অগ্র অগ্র তাহার ডিগেচ ঘণ্টা বাজাইয়া রাস্তা সাফ্ রাখিত। বৃটিশ জানিত, ঐ ফকিরই করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে—করিতেও পারে, মরিতেও পারে। আবার, রাখিলেও রাখিতে পারে, মারিলেও মারিতে পারে।

১৯১৯ সালে আর লণ্ডনে কনফারেন্স নহে। সম্ভব হইলে খাস্ পার্লিয়ামেণ্টও ভারতে আসিয়া হাজির হইত। তাহার প্রয়োজন হয় নাই। সন্ধ্যাগমন আসিয়াছে, বিসর্জনকর্ম আহরণ করিয়া লইতে পারা যাইবে। গরজ বড় বালাই! 'যবনে যবন মড়ে ওবনে রক্ষিত' ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স দুই মাসাধিককাল এই গরজে, ছুটি-ছাটা আম-পাকা জাম-পাকা কাঁঠাল-পাকা গ্রীষ্মে উত্তপ্ত প্রয়ং দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন। বড়ই "অবেক সমস্যে" ভাব। 'অধিক বিলম্বসূর্বক নমস্কারপিবং কার্য্যকরেৎ' সুবচন স্মরণ করিয়া আলাপ (প্রলাপ?)ও আলোচনা চালাইতেছেন। ফিরোজের বিরহিনী নারীর রীতি গীত হইতে শুনা যাইতেছে—

"আমি বিলাইতে চাই আমারে।"

চাকা যে ঘুরিয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যুদ্ধকালের কুটনের ভাগ্য-বিধায়ক বুল-ডগানেন উইনষ্টন চার্চিল বাঁধা দাঁতে মোটা চুরুট ধূত করিয়া বেদিন বক্তৃতায় ও সদর্পে ঘোষিত করিয়াছিলেন যে "বৃটিশ মহা-সাম্রাজ্যের নীলাম-বিক্রয় ঘটাইবার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই" এবং "বৃটিশের যাহা আছে, চিরদিনই তাহা থাকিবে" সেইদিন, অন্তে না জানিলেও, অন্তের জানিবার সুযোগ না থাকিলেও, তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না যে গঙ্গা নদীর পাড় ভাঙ্গিতে সুরু করিয়াছে এবং গঙ্গার ভাঙ্গন্ এমন নহে, ভাঙ্গন্ একবার সুরু হইলে শেষ যে কোথায় তাহা জানাও যেমন সম্ভব নহে, কল্পনা করাও তেমনই অসম্ভব। হিটলার-মুসোলিনী-তোজো এক পক্ষে, চার্চিল-রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিন অন্য পক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে যখন নরমেধযজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন তখন আমাদের জানা না থাকিলেও, ইংলণ্ডে চার্চিল ও ভারতে লিনলিথগোর নিশ্চই অজ্ঞাত ছিল না যে নীলামের ইস্তাহার প্রস্তুত ; ঘণ্টা বাজিতে যেটুকু বিলম্ব।

ঘণ্টা বাজিতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। বিশ্বরণাঙ্গনের যখন অবসান ঘটিল, নীলামের ঘণ্টা তখনই ঘোরস্বরে বাজিয়া উঠিল। তাহার পূর্বোক্তার, অর্থাৎ যুদ্ধকালীন ঘটনা এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন আছে।

বিচিত্র দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ ; অতোধিক বিচিত্র প্রবৃত্তি আমাদের এই ভারতের অধিবাসীর। পরাধীনতার বেদনা, লাঞ্ছনা, গ্লানি, অপমান, নির্যাতন ও বিদীর্ঘন ম্যালেরিয়ার পালা জ্বর, দুর্ভিক্ষের অন্নাহার, অর্দ্ধাহার, অনাহারের মত নিত্যসাথী পা-সহা হইয়া গিয়াছে। বিশ্বের মানব-জাতি যখন স্ব স্ব দেশের স্ব স্ব জাতির স্বাধীনতা রক্ষণে, স্বাধিকার সংরক্ষণে, এবং কি অধিকার সম্প্রসারণে জীবনমরণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত, আমার দেশ ভারতবর্ষের নরনারীও স্বাধীনতা অর্জনকামনে "কুইট ইণ্ডিয়া" মন্ত্র মাতিয়াছে, ভারতের বাহিরেও "দিল্লী চলো" হুঙ্কারিতেছে, সেই সময়েও বিচিত্র-এই-দেশ ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর মনুষ্য ইংলণ্ডের চার্চিল-আমেরীর ধরাধাক্ষিণ্যের ধরণার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তৃতীয়ভাব ধারণ করতঃ নিষ্ক্রিয় স্থাণুবৎ অবস্থান করাই গৌরব বোধ করিলেন। শুধু কি তাহাই? এই আনবিক রশ্মির যুগেও মধ্যযুগীয় বর্বরতা, সভ্যতাবর্জিত, অবলুপ্তপ্রায় কোঁতা অস্ত্রের সন্ধান করিয়া কলহানলে সমিৎ নিক্ষেপ করিতেও লজ্জা বা দ্বিধা বোধ করিলেন না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটা বিরাট শক্তিশালী অংশের, দর্শকের ভূমিকা অভিনয়েই কালাতিবাহিত হইল। বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ!

(ক্রমশঃ)

গীতায় কৃপাবাদ

শ্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

শ্রীভগবানের কৃপায় কী না হয়। তিনি কৃপাসিন্ধু, যাহার একবিন্দু পাইলে জীব নশ্বর-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। এহেন অমূল্যনিধি কে না চায়? কিন্তু ইহা পাইবার উপায় কি? এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একদল বলেন শ্রীভগবানের কৃপা পাইতে হইলে আমাদের কিছুই করণীয় নাই, ইহা অহেতুকী, অর্থাৎ ইহা কোন কারণ সাপেক্ষ নহে। প্রকৃত প্রকৃত নির্বিশেষে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তিনি কৃপা করেন। কৃপাক্ষেত্রে কখনই ভাল মন্দ বিচার করেন না। নিজের পুরুষকার দ্বারা কেহ কখনও তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারে নাই ও পারে না। ইহা সম্পূর্ণ তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার কাজে আমাদের কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। এই শ্রেণীর লোককে অতঃপর আমরা কৃপাবাদী নামে অভিহিত করিব।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা ঐ মত একেবারেই অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, যে কৃপায় কণিকামাত্র পাইলে জীব চিরতরে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া যায় তাহা কখনও বিনামূল্যে বিতরিত হইতে পারে না বা অযাচিত ভাবে পাইবার বস্তু নহে। উহা পাইতে হইলে উপযুক্ত মূল্য দেওয়া অর্থাৎ আমাদের যথাসর্বস্ব প্রদান করা প্রয়োজন এবং যথাসর্বস্ব প্রদান করিয়াও উহা উপযুক্ত মূল্য হইল না মনে করিয়া ভক্ত কাতর কণ্ঠে বলিয়া থাকে, প্রভু আমি অতি অধম, আমার কোন ক্ষমতা বা গুণ নাই; নিজ গুণে আমায় কৃপা করো। ইহাকে কি অহেতুকী কৃপা বলা হইবে, না ইহা প্রকৃত ভক্তের বিনয়োক্তি মাত্র? তাঁহারা বলেন কৃপা কখনও অহেতুকী হইতে পারে না। ভক্তি বরং অহেতুকী হইলেও হইতে পারে, যথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তি, কিন্তু কৃপা কখনই অহেতুকী হইতে পারে না।

কৃপাবাদীরা তাঁহাদের মতের সমর্থনে সর্বদাই বলিয়া থাকেন, জীবমাত্রই রক্ষা করিবার জন্য শ্রীভগবান যে সমস্ত বস্তু দান করিয়াছেন যথা—জল, বায়ু, আলোক, উত্তাপ, অন্ন, মূল প্রভৃতি জীবের জীবন-রক্ষার বস্তু, সে সমস্ত সম্বন্ধে সাধু অসাধু ভাল মন্দ বিচার করেন নাই, ভাল মন্দ নির্বিশেষে সকলেই তুল্য রূপে উহা ভোগের অধিকারী। সূর্য রশ্মি ও চন্দ্র কিরণ রাজপ্রাসাদেও যেরূপ, দরিদ্রের পর্ণ-কুটিরেও তদ্রূপই পড়িয়া থাকে। বায়ু, জল যেমন সাধুর জীবন রক্ষা করে, তেমনই অসাধুরও জীবনরক্ষা করিয়া থাকে। কূপের জল যেমন পবিত্র স্থানে পড়িয়া থাকে অপবিত্র স্থানেও ঠিক তদ্রূপই পড়ে; ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাঁহার এ সমস্ত কৃপার দান অহেতুকী। এই কৃপা লাভ করিতে জীবকে কোন বেগ পাইতে হয় না, অর্থাৎ অযাচিতভাবে ভালমন্দ নির্বিশেষে সকলেই পাইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে ইহাই শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এখন দেখা যাক, সত্যই কি ইহা অহৈতুকী কৃপা। সত্যই কি চিরদিন যাবৎ জীবের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য প্রযত্ন হইয়াছে? ইহার বিচার করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে শ্রীভগবান জীব সৃষ্টি করিয়াছেন কি জীবের হিতের জন্য, না তাঁহারই কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? শাস্ত্রকারগণ বলেন, তিনি একা ছিলেন, লীলা করিবার জন্য বহু হইয়াছেন। তাহা হইলে জীব তাঁহার লীলার বস্তু, সেই জীবকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা ত তাঁহার অবশ্যকরণীয়, নচেৎ জীব লুপ্ত হইয়া গেলে তাঁহার লীলা চলিবে কিরূপে! সুতরাং কেবলমাত্র জীব রক্ষার ব্যাপারে তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজ প্রয়োজনেই করিয়াছেন। উহাকে জীবের প্রতি কৃপা কিরূপে বলা যাইতে পারে? জীবের যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হয় অর্থাৎ জীবের পরিবর্তে শিবের প্রাপ্তি হয় ভগবানের এমন কোন পারমার্থিক দানকে কৃপা বলা যায়। উহা কখনও অহেতুকী হইতে পারে না এবং পাত্রাপাত্র নির্বিচারে প্রদত্ত হয় না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে শ্রীভগবানকে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইতে হইত। রাম ও যদু দুজনেই মহাপাপী, তন্মধ্যে রাম অধিকতর পাপী। আজীবন তাহারা দুষ্কার্য করিয়া কাটাইয়াছে, মৃত্যুর কোন দিন সৎকার্য করে নাই; ইহাদের মধ্যে রামকেই ভগবানের কৃপা হইল, সে উদ্ধার হইয়া গেল। ইহা কি ভগবানের যোগ্য কর্ম? একথা বলিলেও কৃপাবাদীরা বলিয়া থাকেন, ভগবানের কার্যের সমালোচনা করিবার মানুষের কি অধিকার আছে? তাঁহার কার্য তিনিই ভাল বুঝেন, তিনি সর্বশক্তিমান, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তবে তিনি স্বৈরাচারী করেন, যাহা ইচ্ছা করেন না। আমরা অনেক সময় বুঝিতে পারি না তাই ঐরূপ ভাবি। এক্ষণে দেখা যাক শ্রীভগবান শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কি উক্তি করিয়াছেন :—

শ্রীভগবান কহিলেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং। গীতা ৯-২৯

অনুবাদ :—

সর্বভূতে সম আমি, দ্বেষ্য প্রিয় কেহ নাই।
যে ভজে ভকতি ভরে সে আমাতে আমি তায়।

অর্থাৎ আমি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কাহাকেও ভাল বা মন্দ বাসি না; সকলেই আমার কাছে সমান। তবে যাঁহারা ভক্তি ভরে আমার ভজনা করেন, কেবল তাঁহারাই আমার আপনার ও কৃপাভাজন হইয়া থাকেন।

আরও বলিয়াছেন :—

অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং * বহাম্যহং। গীতা ৯-২২

অনুবাদ :—

যে সবে অচিন্ত্য ভাবে ভাবে মোরে অনন্য আর।
যোগ ক্ষেম বহি আমি নিত্যযুক্ত সে সবার।

তবেই দেখা যাইতেছে ভগবান বিনা কারণে বা হেতুতে কাহাকেও কখনই কৃপা করেন না, যাঁহারা নিজ নিজ সুকৃত কার্য্য দ্বারা তাঁহার প্রিয় ও আপনার হইতে পারেন কেবল তাঁহারাই তাঁহার কৃপাভাজন হইতে পারেন।

এই শ্লোকের প্রতিধ্বনি শ্রীমদ্ভাগবতেও শুনিতে পাওয়া যায়, যথা—

"ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তম, নচাপ্রিয় দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এবা
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা, সুরদ্রুম যদ্বৎ উপাশ্রিতো যঃ।" ভাঃ ১০-৩৮-২১

অনুবাদ :—

নাহি কেহ সুহৃত্তম নাহি কেহ প্রিয় তার,
নাহিক অপ্রিয় দ্বেষ্য নাহি কেহ উপেক্ষার।
তথাপি যে যথা ভজে তারে ভজে ভগবান ;
কল্পতরু আশ্রিতের যথা ফল করে দান।

অর্থাৎ কেহ তাঁহার শত্রু বা মিত্র আপনার বা পর নাই। সকলকেই তিনি সমভাবে দেখিয়া থাকেন। তবে যাঁহারা ভক্তিভরে তাঁহার ভজনা করেন শ্রীভগবান তাঁহাদিগকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। যেমন কল্পতরু আশ্রিতদিগকে ফল প্রদান করিয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার শরণাগত না হইলে কেহ তাঁহার কৃপালাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। গীতাতে অন্য স্থানে শ্রীভগবান নিজ মুখেও ঐ কথা বলিয়াছেন যথা—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"।
* * * * * গীতা ৪-১১

অনুবাদ :—

যে ভাবে যে সেবে মোরে তুমি তারে তথা।

যে আমাকে যেরূপ ভাবে ভজনা করে আমিও সেই ভাবেই তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করি, অর্থাৎ যে—যে ফলের কামনায় আমার আশ্রয় লয় সেই ফল প্রদানের দ্বারা আমি তাহাকে পরিতৃপ্ত করি। তবেই দেখা যেল তাঁহার শরণাগতি ভিন্ন আমাদের উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। শরণাগত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ভজনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই আমাদের কার্য্য সিদ্ধি হয়, নচেৎ "অহৈতুকী কৃপা, কৃপা" বলিয়া চিৎকার করিলেও কিছুই হয় না।

এখন দেখিতে হইবে সে উপাসনা কিরূপে করা যাইতে পারে। ইহার উত্তর শ্রীভগবান গীতাতেই দিয়াছেন।

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্।" গীতা ১২-৬, ৭

অনুবাদ :—

সর্ব্ব কর্ম্ম সঁপি মোরে মম পরায়ণ,
অনন্য মনে যে মোরে করয়ে ভজন,
অর্পিত আমাতে চিত্ত, করি আমি তার
মরণ-সংসার-সিন্ধু হইতে উদ্ধার।

অর্জ্জুনের গীতা শেষ করিবার সময় যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও অহৈতুকী কৃপার কোন উল্লেখ নাই, থাকিতেও পারে না, যথা—

"অন্যন্না ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।" গীতা ১৮-৬৪

অনুবাদ :—

পূত মন মোরে মোতে রাখ ভক্তিমন,
পাবে মোরে, এ প্রতিজ্ঞা, তুমি প্রিয়জন।

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" গীতা ১৮-৬৬

অনুবাদ :—

সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি একা আমার আশ্রয় লও।
সর্ব্ব পাপে তরাইব শোক তুমি নাহি কর।

গীতাতে এরূপ শ্লোক বহু আছে, উদাহরণ সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

এইখানে একটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীমান অর্জ্জুন ভগবানের প্রিয়সখা ছিলেন, এমন ব্যক্তির যে পর্য্যন্ত আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগত শিষ্য হইতে না পারিয়াছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত পরম গুহ্য গীতারহস্য শুনিতে পারেন নাই এবং শ্রীভগবানও সে পর্য্যন্ত ইহার গূঢ় রহস্য তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন নাই। অর্জ্জুন বলিলেন :—

"কার্পণ্য দোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম সংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" গীতা ২-৭

অনুবাদ :—

দৈন্য দূষিত চিত্ত, ধর্ম্ম বিমোহিত,
জিজ্ঞাসি তোমারে আমার।
কহ নিশ্চে ভাল হবে, নিশ্চয়ও আমারে তবে
(আমি) শিষ্য তব লইনু শরণ।

---

* কোন বস্তু লাভ, করার নাম যোগ, তাহার রক্ষা করার নাম ক্ষেম।

হে বাসুদেব, আমি আমার বন্ধুগণের ভাবী বিনাশজনিত, দুঃখ এবং কুলক্ষয়াদি জনিত দোষ অনুভব করিয়া আয়ত্বারা হইয়াছি অতএব আমি বর্ত্তমান বিষয় সম্বন্ধে হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি আমার পক্ষে যাহা প্রকৃত শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করেন তাহা বলিয়া দিন। পুরুষোত্তম, আমি শিষ্যভাবে আপনার শরণাগত হইলাম। আপনি আমাকে বর্ত্তমান বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করুন। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তিনি ভাবনোধাক্যে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে না পারিয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত শ্রীভগবান অর্জ্জুনের ন্যায় প্রিয় সখাকেও অহৈতুকী কৃপা করেন নাই, আর আমাদের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিদিগকে অযাচিত ভাবে কৃপা করিবেন ইহা মনে করাও ধৃষ্টতার কার্য্য।

কৃপাবাদীরা একটি হাতের বহির দেখাইয়া অপর পক্ষকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, সেটি হইতেছে জগাই মাধাই উদ্ধার। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়াছেন তাঁহাদের নিকট ইঁহারা সুপরিচিত। ইঁহারা নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণকুমার, জ্ঞান হইয়া অবধি দুষ্কার্য্যে রত ছিলেন। এমন দুষ্কার্য্য ছিল না যাহা তাঁহারা করেন নাই। তাঁহাদিগকে দেখিলে লোকেরা স্ত্রী পুত্র সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া দূরে পলায়ন করিত। তাঁহারা সর্ব্বদাই মদ্যপানে রত হইয়া থাকিতেন। একদিন তাঁহারা শ্রীচৈতন্য প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে বাধা দেন এবং অবধূত নিত্যানন্দকে প্রহার করেন। সেই দিনই তাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাহাই মনে হয় বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে আর সেরূপ হয় না। এই দুই ব্যক্তির এইটিই প্রথম জন্ম নয় ইহা নিশ্চিত।* তাহার পূর্ব্বেও অনেকবার জন্ম হইয়াছে এবং জন্মান্তরের কর্ম্মফল অনেক সঞ্চিত ছিল। প্রথমে তাঁহারা দুষ্কর্ম্মের ফলে দুরাচারী হইয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের সুকৃত কর্ম্মের ফলভোগের কাল উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গেলেন, এইরূপ মনে করাই কি সঙ্গত নয়?

সুতরাং এখানে অহৈতুকী কৃপার কথা তুলিবারও কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ইহা সত্য বটে ভগবান ফলদাতা, কিন্তু জীব নিজ কর্ম্ম ফল ফল পাইবার যোগ্য না হইলে কিরূপে ফল পাইতে পারে। আর একটী কথা আমরা প্রত্যেক লৌকিক ব্যাপারে দেখিতে পাই; কারণ বা হেতু ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নিত্য। জগন্নাথই বা ইহার ব্যতিক্রমে কার্য্য করিবেন কেন? তিনি তাঁহার নিয়মকৃত বিধান লঙ্ঘন করিলে জগতে যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া জগত ঘোর দুঃখে পতিত হইবে, ইহা কখনই তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি শ্রীভগবান সর্ব্বজীবে সমদর্শী, জীবগণ তাহাদিগের নিজ নিজ কার্য্যদ্বারা তাঁহার প্রিয়, কৃপার বা অকৃপার পাত্র হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে একটি লৌকিক দৃষ্টান্তও দেখান যাইতে পারে। আমরা সংসারে দেখিতে পাই পাখির পিতা সকল সন্তানকেই সমান স্নেহে এবং সকলেরই মঙ্গল কামনা করেন, কিন্তু কার্য্যগুণে কেহ আপনার, কেহ বা পর হইয়া যায়। যে পিতার আদেশ উপদেশ পালন-পূর্ব্বক পিতার অনুগত হইয়া থাকে সেই পিতার প্রিয় ও কৃপার পাত্র হয়। যাহারা তাহা না করে এবং পিতার বিদ্বেষাচরণ করে, পিতার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চাহে না তাহাদের প্রতি পিতারও স্নেহ মমতা থাকে না এবং তাহারা পিতার কৃপালাভ করা দূরে থাকুক পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পিতার ত্যাজ্যপুত্র নামে অভিহিত হয়। ঈশ্বর পিতার পক্ষেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? এ সম্বন্ধে সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেরই এক মত। বাইবেলের অবিবেচনী পুত্রের (Prodigal son) দৃষ্টান্তটি অতি সুন্দর। ইহা সর্ব্বজনবিদিত, সুতরাং প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

উল্লিখিত সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে শ্রীভগবান হেতু বা কারণ ব্যতীত কাহাকেও কৃপা করেন না। গীতা গ্রন্থেও কোন স্থানে অহৈতুকী কৃপার উল্লেখ বা ইঙ্গিতমাত্র নাই এবং ইহার অনুকূলে কোন যুক্তিও দেখা যায় না—কথাটি শুনিতে বড় ভাল। আমরা যাহা ইচ্ছা করিব, ভগবানের আদেশ উপদেশ মানিব না, বৈধ-বৈধ ভালমন্দ কার্য্যের বিচার করিব না, ভগবানের নাম করিব না এবং তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিব না, আর তিনি আসিয়া অজস্রধারে আমাদের উপর কৃপা বর্ষণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা লাভের বিষয় কি হইতে পারে। ইহা বাতুলবিহীন অলস ব্যক্তির কল্পনা মাত্র। এই মতবাদ সংসারে প্রবল হইলে ইহা সমূহ অমঙ্গলের কারণ হইবে। এমন সোজা পথ ছাড়িয়া কে আর ভগবানকে লইয়া মাথা ঘামাইবে, তাঁহার ভজনা বা উপাসনা করিবে? বিনা ব্যয়ে বস্তু পাইলে কে উহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিবে? তবে বেনামী বস্তুর মূল্য কোন কালেই নাই ও থাকেও না। উহা পাওয়া বা না পাওয়া উভয়ই সমান। উহাদ্বারা কিছুমাত্র অবস্থোন্নতি হইবার সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং এই মতবাদ একেবারে প্রশ্রয় না দেওয়াই মঙ্গলের বিষয়।

---

* টীকা—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।"

গীতা ৪—৫

অনুবাদ—

বহু জন্মগত পার্থ তোমার আমার,
জানি সব, নাহি কিছু জান তুমি তার।

শ্রমিকদলের পররাষ্ট্রনীতি

শ্রীনগেন দত্ত

ইংলণ্ডের শ্রমিকদল ধারে ও ভারে দুই ভাবেই কাটিতেছেন। রক্ষণশীল দল হইতে পৃথক হইয়া নিজেদের দলগত মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি সাম্রাজ্যের গুরুতর সমস্যা সমাধান করিবার কাজে শ্রমিকদল হাত দিয়াছেন। কাজে হাত দিয়া যে পরিমাণ কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন তাহাতে খাদু রক্ষণশীলেরাও অবাক হইয়াছেন। মিঃ চার্চ্চিলও বেভিন সাহেবের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি সেদিনও পার্লামেণ্ট আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে আমি মিঃ বেভিনের নীতির অনুকূলপাতী নই; তাহা হইলে বিষয়টা দাঁড়াইতেছে এইরূপ যে পররাষ্ট্রনীতিতে কি শ্রমিকদল কি রক্ষণশীল দল এক অঙ্কের পৃষ্ঠ কতদূর করিয়া চলিতেছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইল যে অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল-দলকেও শ্রমিকদল হার মানাইয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিঃ চার্চ্চিল মার্কিণের একপ্রকার আষ্টে-পৃষ্ঠে লগাটে বাঁধিয়াই যুদ্ধে নামাইয়াছিলেন। যুদ্ধে মার্কিণের যতটা লাভ না হইয়াছে তাহার চাইতে ব্রিটিশের লাভ হইয়াছে প্রচুর। সে এযাত্রার মত বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঁচিবার ব্যাপারটাই রক্ষণশীলেরা যাহা ঠিক করিয়াছিল, শ্রমিকেরা করিয়াছে তাহার অন্যরূপ। মূল্যমান ইংলণ্ড যাহা করিয়াছে, শান্তিকামী ইংলণ্ডও আজ তাহাই করিতেছে। যুদ্ধের সময়কার ইঙ্গ-মার্কিণ মিতালীর কথা বাদ দিয়া শান্তির সময়কার মিতালীর কথাই ধরিতেছি। প্যালেষ্টাইন সমস্যায় শ্রমিকদল মার্কিণের ল্যাজে বাঁধিয়া লইয়াছেন,ব্যাপারটা এই—যদি গোলযোগ ঘটে তবে উভয়েই দাঁড়াইব। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যেমন রক্ষণশীলদল স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে মধ্য-প্রাচ্যের ইসলামের বেশভূষির উপর প্রত্যক্ষ শাসন ও পরোক্ষ প্রভাব রাখিতে হইলে আর একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আঁতাত প্রয়োজন, তেমনি তথাকথিত প্রগতিপন্থী শ্রমিকদল বুঝিয়াছে যে মধ্য-প্রাচ্য শাসন করিতে হইলে একটু নব্যপন্থী সাম্রাজ্যবাদী আঁতাত প্রয়োজন হইবে। ইংলণ্ড আজ নানা কারণে ফরাসীর সহযোগিতা পাইতেছে না। তার মধ্যে প্রধান কারণ হইল ফরাসীর আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন। এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনকে শ্রমিকদল ঠিক ঠিক খাপিয়া লয় নাই।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেভ্রে চুক্তি অনুসারে ফরাসী সিরিয়া ও লেবাননের উপর যে রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব পাইয়াছিল তাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্য্যয়ের মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছে। তাছাড়া ফরাসীর আভ্যন্তরীণ ভাঙ্গাগড়া ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ দুই নীতিকেই প্রভাবান্বিত করিবে, এই অবস্থায় ফরাসীর পররাষ্ট্রনীতি অথবা ঔপনিবেশিক নীতি ইংলণ্ডের সঙ্গে তাল মিলাইয়া না-ও চলিতে পারে। প্রাক্-যুদ্ধকালীন ইঙ্গ ফরাসী পররাষ্ট্রনীতি যেমন এ-ওর কোল ঘেঁষিয়া চলিয়াছিল, তেমনি যুদ্ধোত্তরকালীন ইঙ্গ-মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতিও এ-ওর কোল ঘেঁষিয়া চলিবে। ইহাই হইল শ্রমিকদলের নব্য পররাষ্ট্রনীতির গতি।

মার্কিণদের রাজা নাই কিন্তু রাজত্বের বালাই আছে, তাই তাহারা ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যের সঙ্গে নিজেদের জড়াইয়া লইয়া সাম্রাজ্য পালনের দীক্ষা আরম্ভ করিতেছে। পোর্টো-রিকো, পানামা ও ফিলিপাইনে মার্কিণরা যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের মানসপুত্র ভাই ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আসলে মার্কিণরাও ঘাব পাইয়াছে। তাই এবারে শ্রমিকদলের সঙ্গে হাত মিলাইয়া প্যালেষ্টাইন কমিশনের লভ্য হইয়াছে; পক্ষান্তরে শ্রমিকদলও নব্যসাম্রাজ্যবাদী মার্কিণদের সঙ্গী করিয়া নিজেদের শ্রমিক আদর্শগত ধর্ষকর্ষ বজায় রাখিতেছেন। শ্রমিকদলের পররাষ্ট্রনৈতিক ধর্ষকর্ষ এইরূপ বথা—প্যালেষ্টাইনে, ইহুদি-আরব সমস্যা; ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা; বার্মায় চীনা-ভারতীয়-বার্মাবাসীর সমস্যা; সিংহলে ভারতীয় সিংহলবাসী সমস্যা। ইরাণীং বার্মায় আবার হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, আফ্রিকায় নিগ্রো-কাল সমস্যা—ইহার প্রত্যেকটিই কিন্তু শ্রমিক সরকারের হাতে দানা বাঁধিয়াছে। এখন হইতে পারে যে এই সব ভেদনীতি রক্ষণশীলদলের সৃষ্টি—ইহার জন্য বেচারী শ্রমিকেরা কি করিবে। উত্তর হইতেছে, শ্রমিকদল আজও এমন কোন নীতি প্রচার করেন নাই যাহাতে এই ভেদ বৈষম্যমূলক নীতির খণ্ডন হইতে পারে। শ্রমিকদলের দৃষ্টিভঙ্গি যদি বৈপ্লবিক হইত তবে তাহারা নিজেদের মত করিয়া হাতে পাইয়া বিধর্ম্মীকে জানাইয়া দিতেন যে আজ হইতে রাশিয়ার মত extraterritorial Rights যেখানে যাহা আছে তাহা প্রত্যাহৃত হইল। এই সব বিষয় ইংলণ্ডের শ্রমিকদল জানেই চতুর। মিঃ বেভিন মিশরের আলোচনা প্রসঙ্গে পার্লামেণ্টে একথা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে তিনি সাম্রাজ্য ভাঙ্গাইতে নারাজ। আবার মিঃ এট্‌লি জনৈক লোকের মত কহিতেছেন যে, ভারতবর্ষ যদি চায় তবে সাম্রাজ্যের বাহিরে থাকিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের বহু এবং বিচিত্র পুথল আছে, যদি এমন হইত যে একটি পুথল পায়ে বাঁধা আছে তাহা কাটিলেই মুক্ত হওয়া যাইবে, তবে না হয় চেষ্টা করা যাইত। সাম্রাজ্য হইতে মুক্ত হইবার স্বাধীনতা ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদিকেও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাই তাহারা কি এক পা-ও নড়িয়াছে? তার কারণ সাম্রাজ্যের সমাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও ধর্মনৈতিক ধারা এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে ও এমনভাবে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের মুঠার মধ্যে রহিয়াছে যে এক মুলুকাই নীতি ছাড়া অন্য নীতিতে ইহার সর্ব্বাধীন মুক্তি নাই। কিন্তু মুলুকাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাহা করিয়াছে, আজ এটম বোমার যুগে তাহা

কতটা সম্ভবপর তাহাও ভাবিবার। সাম্রাজ্যবাদীদের ভেদ-নীতির প্রধান উপজীবিকা হইল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ইহা অন্তর্বিপ্লবের সব দেশেই আছে। যেখানেই সাম্রাজ্যবাদীরা থাবা মারিয়াছে সেখানেই ঘা হইয়াছে। ব্রিটিশ সিংহের থাবার ঘা আর শুকাইতে চাহে না—অর্থাৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা আর ফুরায় না। ইংলণ্ডের শ্রমিকদলও এই সমস্যা ফুরাইতে দিতে চাহে না। তার প্রমাণ আরব-ইহুদি সমস্যা, হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা, মালয়-চীন-গ্রীকদের সমস্যা। প্রতিবিধান শুধু সদাসর্বদা, আর কিছুনা।

পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন

পেরানো পেরানো কোলাকুলি চলিতে পারে, যুধ্যমানও হইতে পারে—কিন্তু মেটি হয় না মেটি হইতেছে মিল-মিশ। ইতি চতুষ্টয়ের পররাষ্ট্র-সচিবেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন—একটা মিলমিশ করিতেই হইবে। প্রথম একদফা চেষ্টা হইয়া গিয়াছে, সেবারে ইতালীকে লইয়া অর্থাৎ ইতালীর পূর্বকার উপনিবেশগুলি লইয়া রীতিমত বড়ি টানা-টানি হইয়া গিয়াছে। এই সব বড়ি টানাটানির প্যাঁচে পড়িয়া বিশ-শান্তি বন আটকাইয়া রহিয়াছে—কোনো দিক ছাড়িতে পারিতেছে না। সেবার বেভিন সাহেব বলিয়াছিলেন যে লিবিয়ার প্রতি তাহাদের একটা কর্তব্য আছে, কেননা ব্রিটেন লিবিয়াবাসীদের স্বাধীনতা দিবে এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ব্রিটেন গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আরব জাতিগুলিকে স্বাধীনতা দিবে বলিয়া এক উচ্চাঙ্গের প্রচার চালাইয়াছিল—সমস্ত আরব আজ পর্যন্ত কি পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে তাহা বিশ্ববাসী মাত্রেই জানেন। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ব্রিটেনকে মিশর ত্যাগ করিতেই হইবে, সুয়েজখালের উপকূলে মিশরের কোল ঘেঁষিয়া যদি পরোক্ষ প্রভুত্ব ও বিমান ঘাঁটি বজায় রাখা যায় তবে মিশরের রণনৈতিক গুরুত্বের খানিকটা ক্ষতিপূরণ সম্ভব হইতে পারে। তাছাড়া আণবিক বোমার আবিষ্কারের পর হইতে বিশ্বরাজনীতিতে ভীষণ ওলট-পালট সুরু হইয়া গিয়াছে। তাছাড়া যুদ্ধের রীতি ও তাহার কলা-কৌশলেও খানিকটা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। আণবিক বিজ্ঞান যুদ্ধবিশারদদের বুদ্ধির বহর বুলিয়া দিয়াছে—পূর্বে যে সব বুদ্ধির বহর দিয়া শত্রুপক্ষ নিধনের রীতি আমদানী করিত সে সব বুদ্ধির বহর-কবাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে অথবা মূল্যহ্রাসের দর বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তাই কূটনীতিও নতুন করিয়া শাখা-প্রশাখা মেলিতেছে। তাই বেভিন সাহেব লণ্ডন ও স্বাধীন লিবিয়ার জন্য মাথা ঘামাইতেছেন। সেখানে বেভিন সাহেবের সাথে বাদ সাধিয়াছিল মলোটভ। তিনি লিবিয়াকে আন্তর্জাতিক যৌথ-শাসনের-মধ্যে আনিতে চাহিয়া যৌথাকে চিল মারিয়াছিলেন। ফল উভয় পক্ষে হুল ফুটানো হইয়াছিল মাত্র। আসল সমস্যার সমাধান হয় নাই। তারপর ত্রীপলি ইতালীর নিকট যে ক্ষতিপূরণ চাহিয়াছিল তাহাতে আমেরিকা আপত্তি করিয়াছে—এই ফাঁকে যে ও ঘোলাত আমাকেই মন্থন করিতে হইবে। অতএব যাহাতে কিছু কম হয় তার ব্যবস্থা হউক, তার অর্থ আমেরিকার সঙ্গেও ত্রাণিয়ার মন কষাকষি চলিবার উপক্রম হইয়াছিল—এই সব দ্বন্দ্ব ও বিরোধের পটভূমিকা পূর্বাঞ্চলের সম্মেলন হইতেই রচনা হইয়া আছে। একবার শুধু এর যে কোন একটা ঘড়ির টান দিলেই সেতারের মত সমস্ত তারগুলিতে প্রতিধ্বনি শোনা যাইবে। করত ঘটিয়াছেও তাহাই। মিঃ মলোটভ এবার খুব জোর করিয়া ইতালীর ক্ষতিপূরণের সমস্যাটা ঝাঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। এবার মিঃ বেভিন ও মিঃ বার্নস্ দুই-ই একযোগে একসুরে বলিতেছেন—যে যা টাকাটা দেওয়া হইবে যাই কি, তবে "টাকা প্রদান শুরু অধিকৃত দেশ হইতে এবং ইতালীর বাণিজ্য ও যুদ্ধ আয়ের হইতে পূরণ করা হইবে।" মিঃ মলোটভ ইহাতে ঘোরতর আপত্তি জানাইয়াছে এবং ইহা যে অন্যায় অযৌক্তিক এমন মতামত প্রকাশ করিয়াছে। ফরাসী পররাষ্ট্রসচিব মিঃ বিদো মলোটভের মতের খানিকটা পাশ কাটিয়া আসিয়া বলিয়াছেন যে ইতালীর যদি বছর দুয়েকের মধ্যে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় তবে মলোটভের দাবী মিটিতে পারে। ইতালীর যদি সেই "সুদিন" আসে তাহা হইলে চলিতে পারে। মলোটভ দাবী করিতেছেন যে ইতালীর সেনি অবোৎপাদন ব্যবস্থার উপর হইতে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকাটা শোধ করিয়া দেওয়া হউক। বেভিনের আপত্তি এইখানটায় সবচেয়ে বেশী, তিনি বলেন যে রাষ্ট্রসংঘে ইতালীকে "সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত রাষ্ট্র" বলা হইয়াছে; সোভিয়েট ও ফরাসীর ইতালী সম্পর্কে এইরূপ প্রস্তাবের ফলে অনুগ্রহের ব্যাপারটি মাঠে মারা যায়। অতএব বেভিন সাহেব এই দিক কিছুতেই না করিয়া পারেন না। ইতালীর আসল বিরোধ এতদিনে দানা বাঁধিয়াছে। ওয়ারস্ ও মস্কোর আপত্তি সত্ত্বেও ব্রিটেন ইতালীতে সোল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ দিয়া যাইতেছেন। এটা মলোটভ কিছুই প্রীতির চক্ষে দেখিবেন না এবং ইহা লইয়া যে সোলযোগের সূত্রপাত হইবে তাহার পরিণতিতে বড় বড় সমস্যা আসিয়া জুড় হইবে। সে ক্ষেত্রে ইস-মার্কিন আঁতাত আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিবে। ইতালীতে সোলবাহিনী রক্ষার গুরুদায়িত্ব ব্রিটেন মাথা পাতিয়া কেন লইতেছে ইহা লইয়া একটা জিজ্ঞাসাবাদ অবশ্যই হইবে। তাছাড়া সৈন্যাধ্যক্ষ এডাল্ যদি দশ সহস্র সৈন্যের নিকট যে ভাষণ দিয়াছেন তাহাতে বর্তমান সোল-সরকারকে রীতিমত মস্কোর 'তাঁবেদার' বলা হইয়াছে। এই তাঁবেদারী খেতাবটা মলোটভ কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা বলা মুস্কিল।

ইতালীর মধ্যে থাকিয়া বর্তমান সোল সরকারকে সাহায্য করিবার মতলবটা এ ভাবে ভাঁজিলে, ফরাসী সীমান্তে থাকিয়া সেন সরকারকে সাহায্য করিবার মতলবও কোন কোন পক্ষ ভাঁজিতে চাহিবে, সে অবস্থায় বেভিন সাহেব কি করিবেন?

ফরাসী নির্বাচনের পর

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ তালা-পড়ার মধ্যে অনেকেরই মনে হইয়াছিল যে, ফরাসী বুঝি সমাজতন্ত্রী বা কম্যুনিষ্ট হইয়া গেল। আসলে যে ব্যাপারটা ঘটিয়াছে, তাহা পরবর্তী নির্বাচনে অল্প প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ফরাসীর বড়কর্তারা ঘাঁক ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। ফরাসী সমাজ-তন্ত্রীও হয় নাই, কম্যুনিষ্ট হবার কথা এখন ভাবিবার অবসর হয় নাই। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ফলে যারা ঘোরা ফেল এম্-আর-পি,

সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্ট তিন দলই আসিয়াছে; তবে এই-আর-পি দলে ভারি। ইতিপূর্ব্বে দেখা গেছে যে, সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্ট দলের সংহতির বিরুদ্ধে এই-আর-পি দল বিরোধিতা করিয়াছে এবং তখনই অনেকের মনে হইয়াছিল যে ফরাসী রাষ্ট্রপন্থী হইবে কি দক্ষিণপন্থী হইবে। কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রী উভয় মিলিয়া যে শাসনতন্ত্রের বিধান রচনা হইয়াছিল তাহার প্রতিবাদ একমাত্র এই-আর-পি করিয়াছে—ফলে এইরূপ হইতে পারে যে রাষ্ট্রপন্থী সংহতি ঠাঁহাইতে গিয়াই এই-আর-পি বেশী দক্ষিণপন্থী ঘেঁষা হইয়া গিয়াছে। তবে কোন কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞ দর্শকের মত যে যাহার হইতে এই-আর-পি যতই দক্ষিণপন্থী ঘেঁষিয়া চলুক না কেন তাহাকে অন্ততঃ অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রী দলের সহযোগিতায় সরকার গঠন করিতে হইবে। বস্তুত পরবর্ত্তী ঘটনায় তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী কিঁয়ো যে সরকার গঠন করিবেন তাহাতে কম্যুনিষ্ট দল সহযোগিতা করিবেন স্থির করিয়াছেন; তবে এই সম্মিলিত সরকারকে বেতন ও পেনসন সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট প্রগতিমূলক নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই অবস্থায় এই-আর-পিকে একেবারে দক্ষিণপন্থী থাকিয়া কাজ চালান মুস্কিল হইবে। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার বা চিন্তা করিবার আছে। ফরাসীর বর্ত্তমান সরকারের ঔপনিবেশিক নীতি কি হইবে? ইন্দো-চীনের বেতারা বর্ত্তমানে ফরাসীতে যে আলোচনা চালাইতেছেন তাহার ফলাফল দেখিয়া বিচার করা যাইবে ফরাসী সরকার কতটা প্রগতিপন্থী এবং কম্যুনিষ্ট দলের প্রগতিমূলক নীতি কতটা সত্য তাহাও প্রমাণিত হইবে তাহাদের সেই ঔপনিবেশিক নীতির সমর্থনের সঙ্কটকালে। বর্ত্তমান বিশ্ব রাজনীতির আলোড়নের কথা এতটা সরকার তাহার নিজের দেশের জনসাধারণের ওপর কিরূপ ব্যবহার করিল বা সেই সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করিল—তাহা খুব বড় কথা নয়। সত্যিকারের সেই সরকার প্রগতিমূলক কিনা তাহার পরীক্ষাস্থল হইল নিপীড়িত দেশগুলি।

ইতালীতে সাধারণতন্ত্র

ইতালীতে আবার সাধারণতন্ত্রের দিন ফিরিয়া আসিয়াছে। রাজা উধাও হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। House of Savoyএর প্রভুত্ব ও শাসন আজ আশী বছর পরে জনসাধারণের দাবী তলায় পড়িয়া নিজ অবনতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। তবুও রাজতন্ত্রবাদীরা লড়িতে ছাড়ে নাই। কিন্তু যে জনসাধারণ এতদিন রাজতন্ত্রের এবং তার পক্ষপাতী ফ্যাসিষ্টতন্ত্রের নিষ্পেষণের রথচক্রে নিষ্পেষিত হইয়াছিল আজ তারা তাদের দুঃখের শেষ দীপ জ্বালিয়া নিবেদন করিয়াছে। ইতালী রাজতন্ত্রমুক্ত হইয়াছে। ইতালীতে শান্তিবর্ত্তির জয় সফল হইয়াছে।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বাংলার বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কট

বাংলায় আবার ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষোত্তর মহামারীতে যাহারা মরিয়াছিল, তাহারা একরূপ মরিয়া বাঁচিয়াছে, কিন্তু সেই ভীষণ দুর্দিনে যে অভিজ্ঞতার ফল অযাচিত খাইয়া ও খাদ্য হারাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের দুর্মতি এবং ভগবানের অনুগ্রহলাভের ভয় দেখিয়াছিল, এবারের দুর্ভিক্ষে তাহাদের আর রক্ষা নাই। গত দুর্ভিক্ষের পর প্রেমটী কমিটি ও দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন খাদ্য-উৎপাদন ও সংগ্রহ এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধের যে সকল সংপরামর্শ দিয়াছিলেন তাহাদের মূল্য অনস্বীকার্য্য হইলেও এই হতভাগ্য দেশের কপালে কমিশন দুইটির অভিজ্ঞ সদস্যদের সৎপরামর্শদান অরণ্যে রোদন হইয়াছে। যাহাদের হাতে বাংলার খাদ্যনীতি পরিচালনার ভার ছিল, তাঁহারা অবিমিশ্র অকর্ম্মণ্যতায় এই প্রদেশে শুধু তাঁহার অভাবই ডাকিয়া আনেন নাই, বাংলার খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে অবিরাম মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে ভারতের অপরাপর প্রদেশগুলির ও পৃথিবীর সমৃদ্ধতর দেশগুলির সহানুভূতি হইতে বাংলাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। আজ বাংলার আকাশে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, কলিকাতার মত সহরে পুলিসের সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও অনাহার বিস্তৃত ছিন্ন জমাইতেছে, জুন মাসের প্রথম ১০ দিনেই কলিকাতা হইতে পুলিস সংগ্রহ করিয়াছে ৩০৭ জন নিরন্নকে, অথচ পশ্চিমবঙ্গের ধানুকা জেলায় প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষ শুরু হইবার পরও এপ্রিল মাসে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ব্যক্তিগত খাদ্য প্রতিনিধি মিঃ হুভার যখন ভারতের অভাবগ্রস্ত অঞ্চলগুলি স্বচক্ষে দেখিতে আসিলেন, তখন বাংলার খাদ্যকর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে একবার বাংলায় আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। বাংলার চরম খাদ্যসঙ্কট অনুভূত হইয়াছে গত মাস হইতেই, এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজধানী কলিকাতার একান্ত রাজপথের উপর দুজন প্রৌঢ়লোক অনশনে মৃত্যুবরণ করিয়াছে; আশ্চর্য্যের কথা, বাংলাসরকারের খাদ্যব্যবসায়ীদের ডিরেক্টর ১৯শে এপ্রিলও কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাংলায় কখনো খাদ্য বস্তুত আজে বলিয়া এখানকার অবস্থা ভারতের অনেক প্রদেশের চেয়ে ভাল। বাংলাসরকারের খাদ্যবিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এস-কে-চ্যাটার্জ্জি

৭১শে যে বেতারে যে বিবৃতি প্রকাশ করেন, তাহাতেও তিনি এ বৎসর দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা না থাকার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। সরকারী কর্মচারীদের কথা বাদ দিতেছি, জনসাধারণের বিশ্বাসের পাত্র ও অবলম্বনস্বরূপ মুসলীম লীগের দলবৃদ্ধ বর্দ্ধমানে বাংলার পল্লীতে বসিয়াছেন। এই লীগদলীয় প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দি গত ৩রা জুন চাঁদপুরের এক সম্বর্দ্ধনা সভায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাংলায় যে অভাব হইয়াছে তাহা চোরাবাজার ও আড়তে হইয়াছে, দুর্ভিক্ষের জন্য হয় নাই। কেন্দ্রীয় পরিষদের বিগত অধিবেশনে কংগ্রেসী দলনেতা শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয় যখন কলিকাতার পথে দুইজন নিরন্নের মৃত্যুর সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলার খাদ্য পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা চালাইবার চেষ্টা করেন, তখন বাংলার লীগনেতা মিঃ এ আর সিদ্দিকি এইরূপ নিরন্নের মৃত্যুকে কলিকাতার মত সহরের সাধারণ ঘটনারূপে অভিহিত করিয়া বাংলার খাদ্যপরিস্থিতি লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অভিমত দেন। একদিকে এইভাবে যখন প্রত্যেক অন্যকে অস্বীকার করিয়া কর্তৃপক্ষ চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়াছেন, অন্যদিকে তখন তাঁহাদেরই পরিচালনার ত্রুটিতে বাংলার বিভিন্ন খাদ্যগুদামে রাশি রাশি খাদ্য পচিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া দেশের অন্নাভাব আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। বলা বাহুল্য, বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীরা এবং অসহায় জনসাধারণের একমাত্র আশ্রয়স্থল মন্ত্রীমণ্ডলী যখন বাংলার খাদ্যপরিস্থিতির শোচনীয়তা অস্বীকার করিতেছেন, তখন বিগত দুর্ভিক্ষের বিভীষিকাগ্রস্ত এই হতভাগ্য দেশে আবার মন্বন্তরের কিপ্রতর পদধ্বনিই স্বাভাবিক। অবস্থা যেরূপ, তাহাতে কর্তৃপক্ষ এখনও সচেতন না হইলে এবং বাহিরের সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া না গেলে এবারের দুর্ভিক্ষে ১৯৪৩ সালের চেয়ে বেশী ক্ষতি বাংলাকে সহ্য করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় খাদ্যবিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত বিক্রমাদিত্য স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সমগ্রভাবে ধরিলে ভারতের এবারের খাদ্যের অবস্থা ১৯৪৩ সালের চেয়েও খারাপ।

অবশ্য বাংলাদেশের অবস্থা এমনিই ভাল নয়। ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে স্বীকার করেন যে, ৪জন লোকবিশিষ্ট প্রতি কৃষক পরিবারের অন্ততঃ ৫ একরের বেশী জমি থাকা আবশ্যক। বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ কৃষক, অথচ বাংলার ৭৪ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে মাত্র ২০ লক্ষ পরিবারের ২ হইতে ৫ একর জমি আছে। চাষীদের অবস্থা গত দুর্ভিক্ষের সময় আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার চাষীরা ৭ লক্ষ ১ হাজার একর বাসজমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ সাল পর্য্যন্ত সেই বিক্রীত জমির মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ৯০ হাজার একর চাষীদের হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলা বিস্প্রয়োজন, যে জমি হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশেই গত দুই বৎসর ধরিয়া স্বাভাবিক ফসল উৎপন্ন হইতেছে না। ইহার উপর ১৯৪৪ সালে পূর্ব্ববঙ্গে অতিবৃষ্টি এবং পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টির জন্য প্রভূত পরিমাণ ফসল নষ্ট হইয়াছে। মোটের উপর পরিচালকবর্গের অযোগ্যতা ছাড়া প্রকৃতির অভিশাপও বাংলার এই অভাবের অন্যতম কারণ। বাংলাসরকারের খাদ্যবিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, এবার এই প্রদেশে মোট ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য কম পড়িবে। এ বৎসরের মোট খাদ্যউৎপাদন ধরা হইয়াছে ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন। আমাদের মনে হয়, খাদ্যপরিস্থিতির শোচনীয়তা ঢাকিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্তৃপক্ষ ঘাটতির পরিমাণ কম করিয়াই প্রচার করিতেছেন। ষ্টেটসম্যান পত্রিকা অনুমান করিয়াছেন যে, এই ঘাটতি অন্ততঃ ১০ লক্ষ টন হইবে। এই অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

প্রকৃত ঘাটতি যতই হউক, খাদ্যনীতিতে দূরদর্শিতার অভাবে এবং সরকারী ব্যবস্থার লক্ষণীয় ত্রুটির ফলে চোরাকারবারীরা কর্মব্যস্ত হইয়া উঠায় এবৎসর গত দুর্ভিক্ষের ন্যায় বাংলার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে চরম সঙ্কটের ভিতর দিয়া দিন কাটাইতে হইবে। বাংলাসরকারের রেশন এলাকায় খাদ্য যোগাইবার যেমন দায়িত্ব আছে, রেশনহীন ঘাটতি এলাকায় খাদ্য পাঠাইবার তেমনি কর্ত্তব্য আছে। অথচ সরকারের মজুত খাদ্যের পরিমাণ যেরূপ তাহাতে এই কর্ত্তব্য পালন বাংলাসরকারের পক্ষে সত্যই কঠিন। বর্ত্তমান রেশন এলাকার সহিত নূতন আরও ৮টি সহর যুক্ত হইতেছে। ফল তো দাঁড়াইবে রেশন এলাকা আরও বাড়িবে। চাষীদের পক্ষে আমন ধান উঠিবার পরে বাজারে শস্য পাঠাইবার সময় জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস। এই চারমাস চলিয়া গিয়াছে। বাংলাসরকার আশা করিয়াছিলেন যে ৯৭ লক্ষ টনের শতকরা ৫০ ভাগ আশ্বিন মাসের মধ্যে সাধারণভাবে বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসিবে। বাজারে যতই আসিয়া থাক, বাংলাসরকার প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে মাত্র ১ লক্ষ ৯০ হাজার টন চাউল মজুত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সম্প্রসারিত রেশন এলাকার লোকসহ বর্ত্তমান মন্বন্তরোত্তীর্ণ ৫৫ লক্ষ লোকের সারা-বৎসরের অন্ন যোগাইতে হইবে। কাজে কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খাদ্যসংগ্রহ ব্যবস্থায় বাংলা সরকার আশানুরূপ যোগ্যতার পরিচয় দেন নাই। বাহির হইতে ভারতে যে সাহায্য আসিবে, পূর্ব্বেকার হিসাব-বাতিল করাইয়া বাংলা যদি ঘাটতি প্রদেশ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে এবং সেই সাহায্যের একটি বড় অংশের আমদানির হইতে পারে, তবু সমস্যা সমাধানের আশা করা যায়। সমস্যা যে কত জটিল, তাহা বাংলার বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণে। আমেরা বাহিরে চাউলের মূল্য পৌঁছিবার সংবাদ হইতেই বুঝা যাইবে। গত ১২ই জুনের ষ্টেটসম্যানে যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন স্থানের প্রতিমণ চাউলের নিম্নরূপ সর্ব্বোচ্চ দর দেখা যায়:—মুন্সিগঞ্জ—৩১৷০ আনা, নারায়ণগঞ্জ (ঢিরপুর ও কদমরহাট) ৩৫ টাকা, ঢাকা সদর—৩০ টাকা, বোয়ালিয়া ৩৫ টাকা, ফরিদপুর ৩৬ টাকা, সিরাজগঞ্জ ২৯ টাকা। ময়মনসিংহ উদ্বৃত্ত অঞ্চল হিসাবে চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু ডেলী ওয়ার্কারের বিশেষ সংবাদদাতা ইহাকে এখন ঘাটতি অঞ্চল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাতেও চাউল ক্রমে দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। তদনুরূপ মাত্র কয়দিন আগে একটি অসহায় নিরন্ন স্ত্রীলোক তাহার শিশুকন্যাকে বিক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া পুষ্করিণীতে ডুবাইয়া

যাহিতে যায়, কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের চেষ্টায় সিণ্ডিট রক্ষা পায়। নোয়াখালি প্রভৃতি কয়েকটি শহরে নিয়ন্ত্রণ রদ করিয়া শোভাযাত্রা করিয়া কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সকল অবস্থা বিশৃঙ্খলার দেশের চরম সঙ্কটের ইঙ্গিত দিতেছে। দুর্ভিক্ষ কমিশন তাহাদের রিপোর্টে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, চাউলের মূল্য অসম্ভব বেশী হওয়ার জন্যই ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ এত তীব্র হইয়াছিল। এবার ইতিমধ্যেই বাংলার নানাস্থানে বেআইনী চাউলের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে সর্বনাশ আসন্ন বলিয়া অনুমান করা কঠিন নয়।

এই ভীষণ দুর্বিপাক হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সরকারী কর্তৃপক্ষকে যে অসীম সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থতা লইয়া সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। বাহির হইতে যথাসম্ভব আমদানীর সহিত বাংলার যেখানে যত চাউল আছে সমস্ত এখন সংগ্রহ করা দরকার। যাহাতে এক মুষ্টি চাউল এদেশ হইতে বাহিরে যাইতে না পারে তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে প্রতিশ্রুতি দিতেই হইবে। শুনা যাইতেছে এখনও নাকি বীরভূম-জেলা হইতে প্রতি মাসে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মণ চাউল বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। বরিশাল হইতেও একইরূপ অভিযোগ আসিয়াছে। এই সব অভিযোগ সত্য হইলে আর্ত দেশবাসী গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বহীনতা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না।

দেশে খাদ্যশস্য যথাসম্ভব সংগ্রহ করিবার সহিত গভর্ণমেণ্টকে খাদ্য আমদানী, সংরক্ষণ, বণ্টন ও অপচয় নিবারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া খাদ্যনীতি পরিচালনা করিতে হইবে। বাংলাকে আগে যথেষ্ট চাউল দেওয়া হইয়াছে, এখন ভারতবর্ষ যে সাহায্য পায় বাংলা তাহার বিশেষ ভাগ পায় না। বাংলা সরকারের উচিত, বাংলার শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতির প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উপযুক্ত সাহায্য আদায়ের সর্ববিধ ব্যবস্থা করা। বর্তমান অবস্থায় যোগ্য উপদেষ্টা কমিটির সাহায্যে একটি সুনির্দিষ্ট খাদ্য পরিকল্পনার কার্যকারিতাই বাংলা সরকারকে দায়িত্বহীনতার লজ্জা হইতে রক্ষা করিতে পারে। যেখানে যেখানে অন্নের অভাবে মানুষ মরিতেছে, সেই সব জায়গাকে অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করিয়া স্থানীয় অসহায় অধিবাসীদের আইনসঙ্গত সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা অবিলম্বেই করিতে হইবে। বিদেশী যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি জানিতে চাহেন, বাংলার পরিস্থিতি তাহাদের জানাইয়া দেওয়ার ফল ভাল হইবারই কথা। দুঃখের বিষয় বাংলা সরকার এবিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন।

গভর্ণমেণ্ট যদি সাধু ও দায়িত্বশীল হন, খাদ্য তথা মানুষের প্রাণ লইয়া চোরাকারবারীদের ছিনিমিনি খেলা করিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। চোরাকারবার দমনের জন্য সরকারের যে কোন কঠোরতার কেহই বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। এ বিষয়ে চাকার রিলিফ অফিসার মিঃ গফুর সুন্দর একটি পরামর্শ দিয়াছেন। মিঃ গফুর বলিয়াছেন যে, যে অঞ্চলে মানুষ না খাইয়া মরিবে, সেই দুর্ঘটনার জন্য তথাকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীকে দায়ী করিতে হইবে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী চোরাকারবারের প্রশ্রয় না দিলে ইউনিয়নের মধ্যে চোরাকারবার জাঁকিয়া উঠা কঠিন, কাজেই অন্নাভাবের সঠিক সংবাদের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীকে দায়ী করিলে যথেষ্ট সুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে। তবে সংবাদাদি প্রদানের দ্বারা নিজেদের জড়াইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকায় এই সব লোক হয় তো শেষ পর্যন্ত প্রকৃত বিষয় বিস্তার করিয়া চৌকীদার প্রভৃতিকে হাত করিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে সঠিক তথ্যাদি কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর নাও হইতে পারে। এই জন্য সবচেয়ে ভাল হয় যদি স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্যদের ন্যায় জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কমিটিকে এই সংবাদ সরাসরি প্রেরণের এবং খাদ্যনীতি পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান অবস্থায় সরকারী কর্মচারীদের কার্যপ্রণালী একেবারে ত্রুটিমুক্ত না হইলে মুনাফাখোরদের উৎপাত তথা দেশবাসীর কষ্ট দূর হইবার আশা খুবই কম।

অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্যধারা এই প্রদেশের অধিবাসীদের স্বার্থের অনুকূল নয়। জাতির চরম সঙ্কট সময়ে জাতীয় মন্ত্রীসভার আবশ্যকতা এখন অত্যধিক। দুর্ভিক্ষ এড়াইবার জন্য নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা পার্টির ওয়ার্কিং কমিটি সম্প্রতি বাংলায় একটি দল-নিরপেক্ষ মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তাঁহারা আর যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রদেশ হইতে সর্বপ্রকারে খাদ্য-রপ্তানী বন্ধ করা, বাহির হইতে আমদানী ব্যবস্থায় উন্নতিসাধন করা, সর্বত্র সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করা, খাদ্য সংগ্রহ ও লাভ করার বর্তমান সরকারী নীতি বর্জন করা, মজুত সরকারী খাদ্যের অপচয়ের জন্য সরকারী কর্মচারী ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীকে পৃথক অথবা যুক্তভাবে দায়ী করা, ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাভাবিক পথ খুলিয়া দেওয়া, মুনাফা-খোরদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার ও সদ্য ফাঁসীদণ্ড দিবার ব্যবস্থা করা, খাদ্য সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠন করা, চাউলের মূল্য হ্রাস করা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবস্থানুযায়ী কৃষক প্রজা পার্টির এই সব প্রস্তাবের গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং এইগুলি যাহাতে কার্যকরী হয় তজ্জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

বাংলা সরকারের হাতে মজুত শস্যের অবস্থা যেরূপই হউক, সমগ্র প্রদেশে রেশন এলাকা সম্প্রসারণ করিয়া বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণই নিঃসন্দেহে বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। রেশন এলাকায় খাদ্য বরাদ্দ করিতে করিতে বর্তমানে যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে লোকের প্রাণ বাঁচানই দুষ্কর। কিন্তু এই খাদ্যসঙ্কোচ যদি সারা দেশের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করিতে না পারে, তাহা হইলে রেশন এলাকার লক্ষ লক্ষ লোকের এত দুর্ভোগ নিরর্থক। সমগ্র দেশে রেশনিং চালু হইলে গভর্ণমেণ্টের খাদ্য সংগ্রহের যেমন সুবিধা হইবে তেমনি চোরাকারবার অনেকই কমিয়া যাইবে। তবে এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে নির্ভর করিতে হইবে জাতীয়তাবাদী নিঃস্বার্থ দেশসেবীদের লইয়া গঠিত কমিটিগুলির উপর। অবশ্য বর্তমান গভর্ণমেণ্টের কাঠামো যেরূপ তাহাতে তাঁহাদের দ্বারা দেশের কল্যাণকর এত ব্যবস্থা হইবার আশা দুরাশামিশ্রিত বলিয়াই মনে হয়।

সম্প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এবং আন্তর্জাতিক খাদ্য ও জাতি সংগঠনের ডিরেক্টর জেনারেল স্যার জন অরেড বয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের হিসাব করিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৪৭ সাল শেষ হইবার আগে কিছুতেই বর্তমান খাদ্য সঙ্কটের অবসান হইবে না। বলা বাহুল্য, খাদ্যের দিক হইতে স্বভাবতঃ ঘাটতি বাংলাদেশের সঙ্কটও অন্ততঃ ১৯৪৮ সালের প্রথম অবধি চলিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কাজেই এখন বাংলা সরকারের দায়িত্ব বোধ থাকিলে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় প্রকার খাদ্য পরিকল্পনাই এক সঙ্গে কার্যকরী করা উচিত। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সর্ববিধ ব্যবস্থা এবং সমগ্র প্রদেশে রেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই ভাবে সারা বাংলায় রেশনিং প্রবর্তিত হইলে বাংলা সরকারের পক্ষে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের ব্যবহার্য নিম্নশ্রেণীর চাউলের উপর ছুর্ভিক্ষ প্রতিরোধক নীতি অনুযায়ী সরকারী অর্থ সাহায্য প্রদানের সুবিধা হইবে। এই অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন এখনও যথেষ্ট, কিন্তু এদিক হইতে বাংলা সরকারের উদাসীন্য বিস্ময়কর। সাবসিডি হিসাবে এতদিন ব্রিটিশ সরকার বৎসরে ২৫ কোটি পাউণ্ড খরচ করিতেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের এই অর্থ সাহায্যে ব্রিটেনের জনসাধারণ কম মূল্যে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছে। এবারের নূতন বাজেটে ব্রিটেনের চ্যান্সেলর-অফ-এক্সচেকার ডাঃ হিউ ডাল্টন ১৯৪৮ সালের এই প্রকার সাবসিডির পরিমাণ ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ধরিয়াছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, ব্রিটেনের নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদের তুলনায় ভারতের তথা বাংলার এই শ্রেণীর লোকেদের সাবসিডির প্রয়োজন অনেক বেশী। ভারতীয় স্বার্থের প্রতিকূল বহু বিষয়ে এদেশের শাসনকর্তৃপক্ষ সাতসমুদ্র পারের ব্রিটিশ সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণে ব্যগ্রতা দেখান, এই গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণের কল্যাণকর ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সাবসিডি পরিকল্পনা তাঁহাদের অনুপ্রাণিত করে না কেন?

অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য

অষ্ট্রেলিয়া একটি দ্রুত উন্নতিশীল দেশ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে অষ্ট্রেলিয়া ক্রমশঃই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। ভারতবর্ষও যতই ব্যয়ের শাসনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ততই তাহার বহির্বাণিজ্য সম্প্রসারণের অধিকতর সুযোগ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। এতকাল ভারতের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল না। যুদ্ধের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরনির্ভরশীলতা বাড়িয়া যাওয়ায় ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতের পণ্য লেনদেনের অবস্থা এখনই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, আশা করা যায় যত দিন যাইবে এই বাণিজ্যের পরিমাণ ততই লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইবে। উভয় দেশই প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ, অষ্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা ভারতের তুলনায় অনেক কম হইলেও অষ্ট্রেলিয়দের জীবনযাত্রার মান ভারতীয়দের তুলনায় অনেক উচ্চ। কাজেই এই দুইদেশের বহির্বাণিজ্য প্রসারিত হইলে উভয় দেশই উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই।

বর্তমানে ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক কোন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় ভারত গভর্নমেণ্টের বাণিজ্য কমিশনারের সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৪৬-৪৭ সালের রিপোর্ট হইতে মোটামুটি বুঝা যাইবে। এই রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৪৬ সালের আর্থিক বৎসরে ভারত হইতে মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল অষ্ট্রেলিয়ায় চালান গিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে, অর্থাৎ যুদ্ধ বাধিবার পূর্ববর্তী বৎসরে ভারত হইতে মাত্র ৩০ লক্ষ পাউণ্ডের পণ্য অষ্ট্রেলিয়ায় রপ্তানী হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, যুদ্ধের মধ্যে শিল্প বাণিজ্যের বহু বিপর্যয় সত্ত্বেও ভারতীয় পণ্যের এই রপ্তানী বৃদ্ধি বিশেষ আশার কথা। ১৯৪৪-৪৫ সালে মোট ১ কোটি ৬৪ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের অষ্ট্রেলিয় মাল ভারতে আমদানী হয়। ইহার পরবর্তী বৎসরে ভারতে আমদানী-কৃত অষ্ট্রেলিয় পণ্যের পরিমাণ ছিল ৮৮ লক্ষ ২৪ হাজার পাউণ্ড। ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় যে সব পণ্য চালান গিয়াছে তন্মধ্যে তিসি, চটের থলে, শিমুল তুলা, সুপারী, মশলার গুঁড়া, চামড়া, লাক্ষা প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় কার্পেটের অষ্ট্রেলিয়ায় প্রভূত চাহিদা দেখা গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় একমাত্র ভারতবর্ষ হইতেই তিসি চালান যায়। ১৯৪৩-৪৪ সালে ও ১৯৪৪-৪৫ সালে যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৬১ হাজার পাউণ্ড ও ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার মূল্যের তিসি ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় চালান গিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া হইতে আলোচ্য সময়ে ভারতে প্রধানতঃ মাখন, পনীর, মধু, মাংস, দুধ, সর, বিস্কুট, ময়দা, ঘোড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য এবং কয়েক প্রকার ধাতু, যন্ত্রপাতি, চিনামাটীর জিনিষ, কাঁচের জিনিষ, ঔষধ, সার, পশম, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি আমদানী হইয়াছে।

ভারতের বিরাট বাজারে অষ্ট্রেলিয় দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকিলেও চেষ্টা করিলে ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় পণ্য রপ্তানীর পরিমাণও অনেক বাড়াইতে পারা যায় বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। অষ্ট্রেলিয়া হইতে যে সব জিনিষ ভারতে আমদানী হয় তন্মধ্যে পশম প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র পণ্য ছাড়া অপর সকল জিনিষই ভারতে সহজেই যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা চলে। পক্ষান্তরে তিসি, পাট, তুলা, চামড়া বা কার্পেটের ন্যায় যে সব দ্রব্য এখন ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় রপ্তানী হইতেছে, তাহাদের চাহিদা ক্রমবর্ধমান এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় বাণিজ্য কমিশনার তাঁহার ১৯৪৬-৪৭ সালের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, পণ্যাদি প্রেরণের সময় ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ পণ্যের গুণ ও পণ্য প্রেরণের সুব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে অষ্ট্রেলিয়ার এই সকল দ্রব্যের কাটতি নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাইবে। বাণিজ্য কমিশনার ভারতীয় ব্যবসায়ীকুলকে কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট পণ্য প্রেরণ সম্বন্ধে এবং ঘুণযুক্ত কেরোসিন বা মোড়ক লাগানো, সুষ্ঠুভাবে প্যাক করা প্রভৃতি বিষয়ে যত্ন লইতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং সর্বশেষে উভয় দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারের ব্যবসায়িক খুঁটিনাটীর সম্পূর্ণ খোঁজখবর লইতে বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সহিত তাহার বাণিজ্য প্রসারিত হইবে সত্য, কিন্তু ঘরের কাছে অষ্ট্রেলিয়ার সহিত তাহার বাণিজ্য সম্পর্ক অবশ্যই ঘনিষ্ঠতর হইবে। ভারত-অষ্ট্রেলিয়া বাণিজ্যের যে ক্রমোন্নতি এখন দেখা যাইতেছে, সামান্য বল লইলেই এবং মোটামুটি পারস্পরিক হৃদ্যতা বজায় থাকিলেই তাহা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকিবে বলিয়া মনে হয়। অষ্ট্রেলিয়ার লোক সংখ্যা ক্রমশঃ লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। এ সময় ভারতীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ ভারত-অষ্ট্রেলিয়া বাণিজ্যে পণ্য লাভের দিক হইতে ভারতের পক্ষে সাধ্যমত অনুকূল বাণিজ্যিক গতিতেই খুশী না হইয়া অথবা শুধু তাঁচাবাল রপ্তানী না করিয়া বাণিজ্য কমিশনারের পরামর্শমত এবং নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্ববিধ ভারতীয় পণ্যের বৃহত্তর বাজার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির দিক হইতে তাঁহারা মহান অবদান রাখিয়া যাইবেন সন্দেহ নাই।

২৭।৩।৪৬

ভারতে বৃটিশ মন্ত্রিমিশন

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

২

বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের ১০ই মে তারিখের ঘোষণার পর গত জুন মাসে দিল্লীতে বর্ধাবয়োবৃদ্ধ নেতাকুলের আদি ও অকৃত্রিম বাসভবনে মিঃ জিন্নার সভাপতিত্বে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে। সভায় সদস্য সবগুলিই উপস্থিত ছিলেন, ইহা ছাড়া মৌলানা মজির আহমদ ওসমানী বৈঠকে যোগদানের জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। সিমলায় মন্ত্রিমিশন ও বড়লাটের সহিত মিঃ জিন্নার যে সকল আলোচনা হইয়াছিল এবং গত জুন অধিবেশন বসিবার পূর্ব্বে বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের সময় মিঃ জিন্নার যে কথাবার্ত্তা হয়, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যকে তিনি তাহাই বিবৃত করেন। পরদিন দুইবার অধিবেশন বসে এবং তাহাতেই বিগত প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁহাদের আলোচনা শেষ করেন। ৭ই জুন প্রাতে মুসলীম লীগ কাউন্সিলের যে বৈঠক হয় তাহাতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মতামত পেশ করা হয়। এই লীগ কাউন্সিল মিঃ জিন্নার মতে তাঁহাদের পার্লামেন্ট। বিভিন্ন প্রদেশের নির্ব্বাচিত ৩৭৪জন প্রতিনিধি ইহার সদস্য। কাউন্সিলের উদ্বোধনকালে লীগ প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্না বলেন—বৃটিশ ও হিন্দুগণ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠায় যদি সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের অসম্মতি সত্ত্বেও আমরা উহা অর্জ্জন করিব। পাকিস্থান ছাড়া আমাদের অন্য কোন লক্ষ্য নাই। মন্ত্রিমিশন সার্ব্বভৌম পাকিস্থান পরিকল্পনাকে অস্বীকার করায় তীব্র নিন্দার কারণ হইয়াছেন। তবে যদিও তাঁহারা কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই এইরূপ করিয়াছেন তাহা হইলেও আসলে পাকিস্থানের ভিত্তি তাঁহাদের প্রস্তাবের মধ্যে রহিয়াছে। হিন্দুগণ এই প্রস্তাব পাইয়া বড়ই খুশী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা একটি চিনি মাখান বড়ি মাত্র। চিনি গলিয়া যাইলেই আসল বড়ি বাহির হইয়া পড়িবে। তিনি আরও বলেন যে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব লীগ ওয়ার্কিং কমিটি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তবে লীগ কাউন্সিল এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। তারপর কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যকেই তিনি নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ জানান। মিঃ জিন্না বলেন যে কাউন্সিল হইতে সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হউক এবং এই কমিটিই গোপন বৈঠকে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক।

পরদিন মুসলীম লীগ কাউন্সিলের সভায় অধিকাংশ সদস্যের ভোটে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রায় তিনশতাধিক উপস্থিত সদস্যের মধ্যে মাত্র ১০জন সদস্য ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সভায় অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্ট গঠন সম্পর্কে বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের সহিত লীগের পক্ষ হইতে কথাবার্ত্তা চালাইবার ভার মিঃ জিন্নার উপর সমস্ত ভার দেওয়া হয়।

মিঃ জিন্নাকে বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে দেখিয়া দেশবাসী অনেকেই খুশী হন। কারণ ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান উদ্দেশ্যে এ পর্য্যন্ত যত আলোচনা হইয়াছে মিঃ জিন্নার অনমনীয় মনোভাবের জন্যই সমস্ত ফাঁসিয়া গিয়াছে। এইবারও প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লির ১৫ই মার্চ্চের বক্তৃতার পর হইতে মন্ত্রিমিশনের ঘোষণার পর পর্য্যন্ত যত প্রকার সম্ভব আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু মিঃ জিন্না শেষ পর্য্যন্ত দেখিলেন যে প্রতিবাদ করিয়া বিশেষ সুবিধা হইবে না; তাই যতটা পাওয়া যায় এই ভাবিয়াই মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

৬ই জুন হইতে বোম্বাইএ দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাঁহাদের মন্ত্রিদের সম্মেলন সুরু হয়। মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী গণপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং নবগঠিত শাসনতন্ত্র ও অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় রাজ্যগুলির কি ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হইবে তাহাই আলোচনা হয়।

৯ই জুন বিভিন্ন শিখদলের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এক পরিষদ সম্মেলন হয়। সম্মেলনে মাষ্টার তারা সিং শিখদিগকে মিলিতভাবে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে বলেন। পরদিন সহস্রাধিক শিখ তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মীয় আবাসী গুরুদ্বারের সম্মুখে বিরোধিতা

করিবার শপথ গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার সময়ে প্রায় এক লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল।

৯ই জুন অপরাহ্নে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিল। বৈঠকে এগারজন সদস্য ব্যতীত মহাত্মা গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন। ১০ই যে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার পর কংগ্রেস তিনদিনব্যাপী যে সভায় অধিবেশন করেন সেই অধিবেশনে বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের নিকট হইতে তাঁহাদের পরিকল্পনার অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ বিষয়গুলির স্পষ্ট বিবরণ চাওয়া হয়। সেই সকল প্রশ্নের উত্তরে বড়লাট যাহা জানান ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি আজাদ সদস্যদের সম্মুখে তাহাই বিবৃত করেন। বড়লাট রাষ্ট্রপতি আজাদের নিকট অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ও কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যে পত্র দেন ওয়ার্কিং কমিটি তাহা সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করেন। বড়লাট জানান যে, সমস্ত ব্যাপারে অন্তর্বর্তীকালীন গভর্ণমেণ্টকে অবাধে কাজ করিবার সুবিধা দান করা হইবে। ফলতঃ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিবে, কারণ বাহির হইতে ইহার উপর কোনও চাপ দেওয়া হইবে না।

ঐদিন ওয়ার্কিং কমিটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে সমস্ত নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সংখ্যা সাম্যনীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন।

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসকে জানান যে অন্তর্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্টে মোট ১২জন সদস্য থাকিবে, তন্মধ্যে ৫জন কংগ্রেসের, ৫জন লীগের, অপর দুইজনের মধ্যে একজন শিখ আর একজন ভারতীয় খৃষ্টান—তাঁহাদিগকে বড়লাট মনোনীত করিবেন। বড়লাট কংগ্রেসের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই মিঃ জিন্নাকে এমন আশ্বাস দিয়াছিলেন যে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে মুসলীম লীগকে কংগ্রেসের সমান আসন দেওয়া হইবে, এবংকি লীগ সদস্যদের কোন্ কোন্ বিভাগের ভার দেওয়া হইবে তাহারও আভাষ দিয়াছিলেন। মিঃ জিন্না এই আশ্বাসেই আগ্রহের সহিত মন্ত্রিমিশনের দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি উভয় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের এই অযৌক্তিক সংখ্যা-সাম্যের প্রস্তাব অস্বীকার করিলেন।

১১ই জুন মধ্যাহ্নে মহাত্মা গান্ধী লাটভবনে বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলোচনা কালে বড়লাট মহাত্মা গান্ধীকে মিঃ জিন্নার সংখ্যা-সাম্যের দাবী মানিয়া লইবার জন্য কংগ্রেসে নিজ প্রভাব প্রয়োগের অনুরোধ জানান। এই সংখ্যাসাম্যের নীতি অযৌক্তিক ও অন্যায় বলিয়া মহাত্মা গান্ধী বড়লাটকে জানাইয়া দেন। ইহাছাড়া গণপরিষদে বাঙলা ও আসামের ভোটারদের ভোট এবং বাধ্যতামূলক প্রাদেশিক মণ্ডলে যোগদানের আপত্তি জানান।

১২ই জুন সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনাসভায় গণপরিষদে ইউরোপীয়ানদের ভোটাধিকারের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন তাঁহারা শাসকজাতির লোক। আইনতঃ সমস্ত নির্ব্বাচিত হইতে, এমন কি নির্ব্বাচনে ভোটদানেরও অধিকার তাঁহাদের নাই। বাঙলা ও আসামের ভোটারদের উল্লেখ মহাত্মা গান্ধী করেন—তাহাদের দোহাই তাঁহারা যেন দরিদ্র ভারতবাসীর শাসনকার্য্যে এবার হস্তক্ষেপ না করেন। তিনি ভারতের ভোটারদের বিশেষ করিয়া বাঙলা আসামের ভোটারদের গণপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণে জিদ না করিতে অনুরোধ জানান।

ইহার কয়েকদিন পরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের ভোটারগণ তাঁহাদের এক মিলিত সভায় ঘোষণা করেন যে তাঁহারা গণপরিষদে কোন সদস্য প্রেরণ করিবেন না।

ইহার পরে বড়লাট মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনা করিয়া আর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইহাতে তিনি জানান যে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে ১২ জনের পরিবর্ত্তে ১৩ জন সদস্য থাকিবে। এই ১৩ জনের মধ্যে ১ জন তপশীলী হিন্দু লইয়া কংগ্রেসের ৬ জন, মুসলীম লীগের ৫ জন, শিখ সম্প্রদায়ের ১ জন ও ভারতীয় খৃষ্টান ১ জন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহারা লীগের অসঙ্গত দাবী কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন না। ভারতের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানের সংখ্যা একচতুর্থাংশের কম বই বেশী নহে। মুসলীম লীগের বাহিরে কংগ্রেস, জমিয়ৎ-উল-উলেমা, মোমিন, আহরার প্রভৃতি বিভিন্ন দলে অসংখ্য মুসলমান রহিয়াছে। ইহাদের বাদ দিয়া মুসলীম লীগকে ভারতের সকল মুসলমানের প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া কল্পনা করিলেও তাঁহারা অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে মোট সদস্য সংখ্যার এক চতুর্থাংশের বেশী দাবী করিতে পারেন না। কোনও গণতান্ত্রিক নীতির বিচারে এক-চতুর্থাংশকে এইরূপ প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই উচিত নহে। লীগ অধিকাংশ মুসলমানের প্রতিনিধিস্থানীয় একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মাত্র, আর কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী মুসলমান সহ ভারতের সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস ১৪ জন সদস্য লইয়া অস্থায়ী সরকার গঠনের দাবী করেন এই ১৪ জনের মধ্যে ১০ জন কংগ্রেসের ও ৪ জন লীগের।

বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন একটা মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত বিশেষ করিয়া আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। সমস্ত আলোচনা যাহাতে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত না হয় তাহার জন্য মন্ত্রিমিশন ও বড়লাট যথেষ্ট চেষ্টা করিতে থাকিলেন। ১৩ই জুন তারিখে তাঁহারা অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন সম্পর্কে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে জানান যে ১৪ জন সদস্য লইয়া অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে। তাঁহারা নিম্নলিখিত এই ১৪ জনকে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য আহ্বান জানাইলেন।

কংগ্রেস—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু
সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব
সি রাজা গোপালাচারী
জগজীবন রাম (অনুন্নত)

লীগ—

মিঃ এম, এ, জিন্না

নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ

আবদুর রব নিস্তার

খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন

নবাব মহম্মদ ইস্‌মাইল খাঁ

শিখ—

সর্দার বলদেব সিং

তফসীল খৃষ্টান—

ডাঃ জন মাথাই

পার্শী—

স্যার এন, পি, ইঞ্জিনিয়ার

তাঁহারা বিবৃতিতে আরও জানাইলেন যে, আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ মনোনীত হইলে পরামর্শক্রমে অন্য কাহাকেও তাঁহার স্থলে পুনরায় আমন্ত্রণ করা হইবে।

বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন বলিলেন, এখন যে ভাবে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে ভবিষ্যতে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের জন্য ইহাকে বনীয়ৎ হিসাবে গণ্য করা হইবে না। উপস্থিত অসুবিধা অতিক্রম করিয়া যাহাতে একটি শক্তিশালী সর্ব্বদলীয় সরকার গঠনের জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে।

এই বিবৃতিতেই আরও বলা হইল যে, কংগ্রেস ও লীগ অথবা উহাদের মধ্যে একটি দল যদি উপরোক্ত বিষয়ে কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্টে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক হয়, তবে ১৬ই মে তারিখের ঘোষণা মানিতে ইচ্ছুক এবং সমস্যার প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া অস্থায়ী সরকার গঠন করা হইবে।

বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের একান্ত এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ-আলিকায় দেখা যায় যে মুসলীম লীগকে ভারতীয় মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। যে ৫জন মুসলমান সদস্য অস্থায়ী সরকারে আমন্ত্রিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই লীগসমর্থক। সুতরাং অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে যোগদানে লীগের কোনও আপত্তি রহিল না। তাহারা যোগদানের জন্য প্রস্তুতই রহিলেন। মুসলীম লীগ দেখিলেন যে বড়লাট যদিও ১২ জনের পরিবর্ত্তে ১৪ জন সদস্য লইয়া অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে যাইতেছেন তাহা হইলেও লীগকেই একমাত্র মুসলমানের প্রতিনিধিস্থানীয় হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে, এবং বর্ণহিন্দুর সহিত মুসলমান সদস্যের সংখ্যাসাম্য রক্ষা করা হইয়াছে। মিঃ জিন্না বড়লাটকে শুধু এইটুকু জানাইয়া দিলেন যে আর যেন কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা না হয়। বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের এই প্রস্তাবে লীগের দাবীকে যেমনি মানিয়া লওয়া হইয়াছে কংগ্রেসকে ঠিক তেমনি ভাবেই অস্বীকার করা হইয়াছে। কংগ্রেস ইহার জন্মকাল হইতেই জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, দেশের মুক্তি সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। কত ক্ষেপ, কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া তাহারাই আজিকার এই রাজনৈতিক আলোচনার সুযোগ আনিয়াছে। কিন্তু বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন কংগ্রেসকে মুসলমানেরও প্রতিষ্ঠান বলিয়া অস্বীকার করিলেন। মন্ত্রিমিশন গত তিনমাস যাবৎ মৌলানা আজাদকে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হিসাবে জানিয়া তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনা চালাইলেন, তবুও তাঁহারা কংগ্রেসকে মুসলমানেরও প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে মুসলমান প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা হইতে কংগ্রেসকে বঞ্চিত করিলেন। এমন-কি মুসলমানপ্রধান উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে যেখানে কংগ্রেসী মুসলমানেরই আধিপত্য রহিয়াছে, লীগের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই, সেখান হইতেও একজন লীগ সদস্যকে মনোনীত করা হইল।

কংগ্রেস বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের এই প্রস্তাব কখনই স্বীকার করিতে পারেন না। ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইলে কংগ্রেসকে তাহার আত্মসত্তার বিলোপ করিতে হয়। এতদিনের প্রতিষ্ঠা তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। মিশন কংগ্রেস মনোনীত শিখ ও তফসীল খৃষ্টান সদস্য গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মিঃ জিন্নাকে তুষ্ট করিবার জন্য কংগ্রেস মনোনীত জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে গ্রহণ করিলেন না। কংগ্রেস অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে ডক্টর জাকির হোসেনের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু মিশন তাঁহার স্থানে গঠনতন্ত্রের নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী মুসলমানের নিকট পরাজিত মিঃ আবদুর রব নিস্তারকে গ্রহণ করিলেন। ইহা ছাড়া কংগ্রেস অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু কংগ্রেসের সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই মিশন হরেকৃষ্ণ মহাতাবকে তাঁহার স্থানে গ্রহণ করেন। কংগ্রেস ইহারও তীব্র প্রতিবাদ জানান।

অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্টে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান, একজন মহিলা সদস্য না লওয়ায় এবং শরৎচন্দ্র বসুর স্থলে হরেকৃষ্ণ মহাতাবকে গ্রহণ করায় মহাত্মা গান্ধী মিশন প্রস্তাবের বিশেষ প্রতিবাদ করেন। তাহা ছাড়া সরকার পক্ষের স্যার এন, পি, ইঞ্জিনিয়ার এবং নির্ব্বাচনে পরাজিত লীগ সমর্থক আবদুর রব নিস্তারকে গ্রহণ করাতেও তিনি আপত্তি জানান।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটকে জানাইলেন যে শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে গ্রহণ করিতে হইবে। স্যার এন, পি, ইঞ্জিনিয়ারের স্থলে অন্য কোনও পার্শীকে লইতে হইবে। আর প্রস্তাবিত অস্থায়ী সরকারে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান সদস্য নাই, উহাতে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান এবং লীগের ৫ জনের অতিরিক্ত আর একজন লীগ সদস্য গ্রহণ করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা হউক। অস্থায়ী সরকারে আরও দুইজন অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণ করা যদি একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবে কংগ্রেসের যে ৫ জন বর্ণ হিন্দুর নাম করা হইয়াছে তাহার একজনের পরিবর্ত্তে কংগ্রেস একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রেরণ করিবে, তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

কংগ্রেসের এই দাবীর পর বড়লাট হরেকৃষ্ণ মহাতাবের পরিবর্ত্তে শরৎচন্দ্র বসুকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় আপত্তিতেও

তেমন কোন বিষয়ের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু জটিলতার সৃষ্টি হইল জাতীয়তাবাদী মুসলমান লইয়া। মিঃ জিন্না বড়লাটকে এক পত্রের দ্বারা জানাইয়া দিলেন যে, কোনও অহিন্দুর পরিবর্তে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে লওয়া হইলে লীগ তাহা মানিয়া লইবে না। মিঃ জিন্নার এই অসঙ্গত ও অন্যায় দাবীই বিঘ্নের সৃষ্টি করিল। কংগ্রেসের এই প্রস্তাব অনুযায়ী ৫ জন হিন্দু এবং ৪ জন মুসলমান লইয়া গভর্ণমেণ্টে স্থান পাইত। কিন্তু মিঃ জিন্না এখনি বলিয়া বসিলেন যে কোনও জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে মুসলমানের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করিতে আদৌ স্বীকৃত হইবেন না। বড়লাটও মিঃ জিন্নার এই জিদের কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। ফলে হইয়াই অন্তর্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্টে যোগদানের প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস বড়লাট ও মিশনের ১৬ই জুনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কংগ্রেস যে হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মিলিত প্রতিষ্ঠান—এই সত্য বিসর্জ্জন দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না।

২৬শে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রিমিশন ও বড়লাটের ১৬ই জুনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ঐদিন ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের পর একটি দীর্ঘ পত্রে কমিটির সিদ্ধান্ত বড়লাটকে জানাইয়া দেওয়া হয়। পরদিন কংগ্রেস প্রকাশ্য সভা সম্বলিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে বলা হয় যে, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা, কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন। স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের মত ইহারও শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন, কংগ্রেস তাহার জাতীয়তা পরিত্যাগ করিয়া কোন গভর্ণমেণ্টে যোগদান করিতে পারেন না। কৃত্রিম বা অসঙ্গত সংখ্যা-সাম্যও তাঁহারা মানিতে পারেন না। আর কোনও সম্প্রদায়কে কোন বিষয় বাতিল করিবার অধিকার দিতেও সম্মত নহে।

এইভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী দীর্ঘ আলোচনার পর মন্ত্রিমিশনের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব বর্জ্জন করিয়া মিশনের দীর্ঘ-মেয়াদী প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। কংগ্রেসের নিকটে মিশন প্রস্তাবের একটি গ্রহণ ও একটি বর্জ্জন ছাড়া উপায় রহিল না।

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করায় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর আশীর্ব্বাদ ও পূর্ণ সমর্থন লাভ করেন। গণপরিষদের কাজকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নিকট তাঁহার আবেদন জানান। তিনি তাঁহাদিগকে গণপরিষদের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে বলেন এবং নিজেরও পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

কংগ্রেস মন্ত্রিমিশনের সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে পর ২৭শে জুন বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন একযুক্ত বিবৃতিতে জানান যে, সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া অন্তর্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্ট গঠনের যে আয়োজন চলিতেছিল তাহা সম্ভবপর হইল না বলিয়া আমরা দুঃখিত। তবে আমাদের ১৬ই জুন তারিখের বিবৃতির অষ্টম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পুনরায় এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে যুক্তিযুক্ত। যে পর্য্যন্ত না একটি অন্তর্বর্ত্তীকালীন সরকার গঠিত হইতেছে ততদিন ভারতের শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য সাময়িকী কর্ম্মচারীদের লইয়া একটি "কেয়ারটেকার" বা তত্ত্বাবধায়ক গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে। তাঁহারা আরও বলেন যে মন্ত্রি-মিশনকে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৃটিশ মন্ত্রিসভা ও পার্লামেণ্টের সম্মুখে তাঁহাদের বিবৃতি দিতে হইবে। তাঁহাদের পক্ষে আর ভারতে অবস্থান সম্ভবপর নয়। অতি শীঘ্রই তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিবেন। দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল এবং দেশের [illegible] এখন শাসনতন্ত্র রচনার কার্য্য চলিতে পারিবে বলিয়া মন্ত্রিমিশন ও বড়লাট আশা প্রকাশ করেন।

এদিকে বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের ১৬ই জুনের ঘোষণা অনুযায়ী অন্তর্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্ট গঠন আপাততঃ স্থগিত হওয়ায় লীগ প্রেসিডেণ্ট মিঃ জিন্না ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। তিনি জানাইলেন, বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের এইরূপ কার্য্যকে মুসলীম লীগ কোনরূপেই সমর্থন করিতে পারেন না। মিঃ জিন্না জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন, ১৬ই জুনের বিবৃতির অষ্টম অনুচ্ছেদে ইহা স্পষ্ট ভাষায় যে কোনদল অন্তর্বর্ত্তী-কালীন গভর্ণমেণ্টে যোগদান করিতে ইচ্ছুক থাকিলে তাহাদের লইয়াই সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে। মুসলীম লীগ রাজী থাকায় তাহাকে লইয়া অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন না করার জন্য মিঃ জিন্না বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনকে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে দায়ী করিলেন।

বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন মিঃ জিন্নার এই অভিযোগ খণ্ডন করিয়া বলেন যে তাঁহারা আদৌ বিশ্বাসভঙ্গ করেন নাই। তাঁহারা ১৬ই জুনের বিবৃতির অষ্টম অনুচ্ছেদ অনুযায়ীই কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইলেন, অষ্টম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যদি কোনও দল অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে যোগ দিতে অসম্মত হয়, তবে ১৬ই যে তারিখের মূল প্রস্তাব মানিয়া লইতে ইচ্ছুক, যথাসম্ভব প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া অস্থায়ী সরকার গঠিত হইবে। কংগ্রেস ১৬ই যের মূল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে যাইয়া কংগ্রেসকেও তাহার সঙ্গে আসিতে হয়। তাই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন আপাততঃ বন্ধ থাকিল। বিবৃতিরই অন্যান্য অন্তর্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্ট গঠনের বিষয় নূতন করিয়া আলোচনা করা যাইবে। মিঃ জিন্না আরও অভিযোগ করেন যে তাঁহার ওয়ার্কিং কমিটি অধিবেশনের দেখে তাঁহাকে কংগ্রেসের অস্বীকৃতির কথা জানান হয়। কিন্তু বড়লাট বলেন যে ঐদিন রবিবার ২৯শে জুন দুপুরে কংগ্রেসের অস্বীকৃতি প্রাপ্তির পর অপরাহ্নে মিঃ জিন্নাকে আহ্বান করিয়া তাঁহারা ইহা জানাইয়াছেন এবং অষ্টম অনুচ্ছেদের বেলায় কি করিয়াছেন তাহা জানাইয়া তাঁহার মত চাহেন। ঐদিন সন্ধ্যায় লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসে। অবশেষে মিঃ জিন্না গণপরিষদের নির্ব্বাচন আপাততঃ বন্ধ রাখিবার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বড়লাট তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

২৯শে জুন এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে যতদিন না বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত পুনরায় আলাপ আলোচনা চালাইয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়, ততদিন একটি অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক

সরকার কাজ করিবে। ইহা বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছেন। তদনুসারে সম্রাট শাসন পরিষদের সদস্য হিসাবে তার জর্জ স্পেন্স, স্যার এরিক কোট্‌স, স্যার রবার্ট হাচিন্স, স্যার কাওয়াস জিহাঙ্গীর, স্যার আকবর হায়দারী, মিঃ এ, এ, ওয়াস ও জন্মীলাট স্যার রুড অচিনলেকের নাম অনুমোদন করিয়াছেন।

বড়লাট মন্ত্রিমিশনের সহিত বিভিন্নভাবে যে সব বৈঠক করিয়াছেন—

স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স—সদস্য

স্যার পেথিক লরেন্স—ভারত-সচিব ও কমনওয়েলথ রিলেশন্স

স্যার এরিক কোট্‌স—অর্থ

স্যার কাওয়াসজি জিহাঙ্গীর—যুদ্ধকালীন যানবাহন, রেলওয়ে, বিমান ও ডাক

স্যার রবার্ট হাচিন্স—কৃষি ও খাদ্য

স্যার আকবর হায়দারী—শ্রম, পূর্ত, খনি, বিদ্যুৎ, প্রচার, স্বাস্থ্য ও চারুকলা

স্যার জর্জ স্পেন্স—শিক্ষা ও আইন

মিঃ এ, এ, ওয়াস—বয়াই, শিল্প ও সরবরাহ।

এই তালিকা বড়লাটের পূর্বের শাসন পরিষদের সদস্যদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয়।

২৮শে জুন তারিখে মন্ত্রিমিশন দিল্লী ত্যাগ করেন। বিমান ঘাঁটিতে বিদায় দিবার পূর্বে ভারত-সচিব লর্ড পেথিকলরেন্স সাংবাদিকদের বলেন—আমরা যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাতে যদি শীঘ্র ভারতের স্বাধীনতা লাভের সুবিধা হইয়া থাকে তবে তাহা আমাদের অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইবে।

ঐদিন রাত্রে করাচীতে সিন্ধু গভর্ণরের অতিথিরূপে থাকিয়া পরদিন ৩০শে জুন সকালে লর্ড পেথিকলরেন্স, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স সহ করাচী হইতে ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন।

মন্ত্রিমিশন প্রায় তিনমাসকাল ভারতে অবস্থান করিয়া আমাদের স্বাধীনতা লাভের পথে কিছুটা অগ্রসর করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মহাত্মা গান্ধী পূর্বেই বলিয়াছেন যে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবে স্বাধীনতার বীজ রহিয়াছে। তাই কংগ্রেস কার্যপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করায় তিনি ইহাকে আশীর্বাদ করিয়া পূর্ণ সহানুভূতির প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বিশদ-প্রস্তাবের মধ্যে নিহিত সেই স্বাধীনতার বীজকে আজ মহীরুহে পরিণত করিবার দিন আসিয়াছে। আজ ব্যক্তিগত দলগত স্বার্থের কথা উপেক্ষা করিয়া সকল সম্প্রদায়ের মুক্তিকামী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের লইয়া গণ-পরিষদকে একটি প্রকৃত সার্বজনীন পরিষদে পরিণত করিতে হইবে। অন্তর্বর্তী যেসব সহযোগিতা স্বাধীন ভারতের শাসন-তন্ত্র গঠনে অগ্রণী হইল, ইহাই আমাদের একান্ত কাম্য।

মুক্তিসেনা

শ্রীশান্তশীল দাশ

নব জাগরণ আসে দিকে দিকে,
জাগার লগ্ন এসেছে আজ,
দীর্ঘ দিনের দুর্গতি টুটিছে
বন্দীরা লভে মুক্ত সাজ।
মৃত্যুরে আর করে না শংকা,
ঘুচে গেছে আজ মৃত্যুভয়,
মরণের কাছে বুক পেতে দেয়
কিশোর সেনানী বীর্যময়।
দুর্গম পথ, আঁধার রাত্রি,
দুরন্ত মাঝে শংকাহীন
মুক্তি সেনানী চলে দলে দলে
অবিরাম গতি, রাত্রি দিন।
অসংখ্য 'মার' বাধা যেন পথে
বিনয় হাতে আজ হানে ;
রক্ত ঝরণী দান ক'রে যায়,
মরণেও নাহি শংকা মানে।
চক্ষে তাদের নূতন স্বপ্ন,
অযুত সাহস বক্ষে ধরে,
চলেছে আপন লক্ষ্যের পথে
বিশ্ব বিজয় তুচ্ছ ক'রে।
দেবতার বরে জয়ী আজ তারা,—
দুর্গম যত পন্থ হো'ক,
আসুক ঝঞ্ঝা, কাল মহামারী,
সহস্র বাধা, মৃত্যুলোক,
তাদের গতি যে দুর্বারনীয়
রোধিবার আছে শক্তি কার ?
'মার্চ' করে চলে বীরদলে
অন্তর ভেদি ওঙ্কারে।
নূতন-প্রভাত-সূর্য তাদের
শিরে যেন তার আশীষ দান,
দিকে দিকে আজ ওঠে জয়গান,
বিশ্ব জগত মহানন্দ।

মধ্যবিত্তগণের দুরবস্থা—

বাঙ্গলা দেশে দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহ কিরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে, সে সম্বন্ধে ভারতীয় সংখ্যা-বিজ্ঞান সমিতি গত ১৯৪৫ সালের মে হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৪ মাস তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১৮ শত পরিবারের হিসাব সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন—যে সকল পরিবারের মাসিক আয় ৫০ টাকা বা তাহা অপেক্ষা কম, তাহাদের আয়ের শতকরা ৮৯ ভাগ শুধু খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। আর যাহাদের আয় ৫১ টাকা হইতে ১০০ টাকার মধ্যে তাহাদের আয়ের শতকরা ৭৮ ভাগ খাদ্য ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। কাজেই শিক্ষা, চিকিৎসা, কাপড় চোপড়, যাতায়াত, আমোদ প্রমোদ, সামাজিকতা প্রভৃতির জন্য তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হয়। মধ্যবিত্ত পরিবার-সমূহের ব্যয় কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, সমিতি তাহারও হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন। ১৯৩৯ সালে যে পরিবারের মাসিক ব্যয় ছিল ১০০ টাকা, ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে তাহার ব্যয় হইয়াছে ২৮২ টাকা—অথচ আয় কাহারও ঐ অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। এই ত আহারের অবস্থা। কলিকাতা সহরে বাসস্থানের অবস্থা আরও ভীষণ। প্রতি পরিবারের লোক সংখ্যা ৬ জন ধরিলে দেখা যায়, মোট ৪২৮টি পরিবারের মধ্যে ১৯০টি পরিবার মাত্র ১ খানি ঘরে, ১৪৭টি পরিবার প্রত্যেকে মাত্র ২ খানি ঘরে বাস করে। ৪২৮এর মধ্যে মাত্র ২৫টি পরিবার ৬ খানি করিয়া ঘর-ওয়ালা বাড়ীতে বাস করে। সমিতি এই হিসাব প্রকাশ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কি মধ্যবিত্তগণের এই দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য কোন ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন।

রেল কর্ম্মচারীর নোটীশ ও আপোষ—

সমগ্র ভারতের রেলকর্ম্মীরা গত ২৮শে জুন হইতে এক-যোগে ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করার নোটীশ দিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে যে অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হইত, যুদ্ধ শেষে তাহা বন্ধ করা হইয়াছে, অথচ বাজারে জিনিষের দাম না কমায় ঐ আগে তাহাদের পক্ষে সংসার প্রতিপালন করা অসম্ভব হইয়াছে। রেল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের দাবী সম্বন্ধে বিবেচনার ব্যবস্থা করায় আপাততঃ ধর্ম্মঘট বন্ধ আছে। তিনটি দাবীই প্রধান ছিল (১) যুদ্ধের সময় যে সকল অস্থায়ী লোক লওয়া হইয়াছে, তাহাদের কর্ম্মচ্যুত করা হইবে না—তাহারা চাকরী বজায় পাকিবে (২) বেতন, ভাতা ও চাকরীর অন্যান্য সর্ত্ত সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে—সে জন্য যে কমিশন বসিয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ মত রেল কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত উদ্বৃত্ত আয় কর্ম্মীদিগকে প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন। বেতন ও ভাতার পরিমাণ বাড়িবে। (৩) যতদিন না কমিশনের নির্দ্দেশ পাকাভাবে গৃহীত হয়, তত-দিন পর্য্যন্ত কর্ম্মীরা অধিকতর ভাতা প্রভৃতি পাইবেন। দেশের সর্ব্বত্র লোক অভাবগ্রস্ত—কাজেই রেল-কর্ম্মীরা সকলের কথা বিবেচনা করিয়া নিজেরা অপরকে অসুবিধার মধ্যে না ফেলিয়া এই সকল ব্যবস্থায় সম্মত হইয়াছেন। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে রেল কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান প্রতিশ্রুতি মত কাজ করিয়া রেল-কর্ম্মীদিগের অসুবিধা দূর করিতে চেষ্টা করিবেন।

কাশ্মীর রাজ্য ও পণ্ডিত নেহরু—

কাশ্মীর রাজ্যে প্রজা সাধারণের সহিত রাজার বিরোধ চলিতেছে। তাহার ফলে প্রজাদলের নেতা সেখ আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সেখ আবদুল্লার পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা ও রাজার সহিত প্রজাদের আপোষ করিবার জন্য কাশ্মীর যাইতেছিলেন। রাজার লোক তাঁহাকে বাধা প্রদান ও গ্রেপ্তার করিয়াছিল। পণ্ডিত নেহরু নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মিলনের সভাপতি; যেখানে দেশীয় রাজাদের সহিত প্রজাদের বিরোধ বাধে, পণ্ডিত নেহরু তথায় যাইয়া বিরোধ মিটাইয়া

দিয়া থাকেন। কাশ্মীরের মহারাজা তাহা না করিয়া পণ্ডিতজীকে গ্রেপ্তার করায় সারা ভারতে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজা পণ্ডিতজীর সহিত পরামর্শ করিয়া আপোষ ব্যবস্থা করিলে তাঁহার সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি তাহা না করায় রাজ্যের অশান্তি দিন দিন বাড়িয়া যাইবে। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত মহারাজা পণ্ডিতজীকে আটক না রাখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন ও তাঁহাকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বৃটীশ ভারতের প্রজারা যে সময় স্বাধীনতা লাভের জন্য জীবন পণ করিয়া চেষ্টা করিতেছে, সে সময় কাশ্মীরের মহারাজা কি করিয়া যে প্রজাদিগকে রক্তপ্রবাহ দ্বারা শাসন করিতে চাহেন, তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা যায় না।

পুলিয়াছে। তাহার ফলে মোট কলেজের সংখ্যা হইল ১০৫টি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চশিক্ষা দিন দিন কিরূপ প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা এই কলেজের সংখ্যার হিসাব হইতেই বুঝা যায়। গত ১০ বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪২টি নূতন কলেজ খোলার অনুমতি দিয়াছেন। এ বৎসর ১৭টি স্থান হইতে নূতন কলেজ খোলার অনুমতি চাওয়া হইয়াছিল—১০টি স্থানকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সহর ছাড়া গ্রামেও যে কলেজ চালান যায়, লোক এখন তাহা বুঝিয়াছে। সে জন্য ৭টি গ্রামে নূতন কলেজ হইয়াছে। ১২টি কলেজে শুধু বালিকা-দিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তন্মধ্যে ৮টি বাঙ্গালায় ও ৪টি আসামে অবস্থিত। বাঙ্গালায় মৈমনসিংহ জেলা আয়তনে

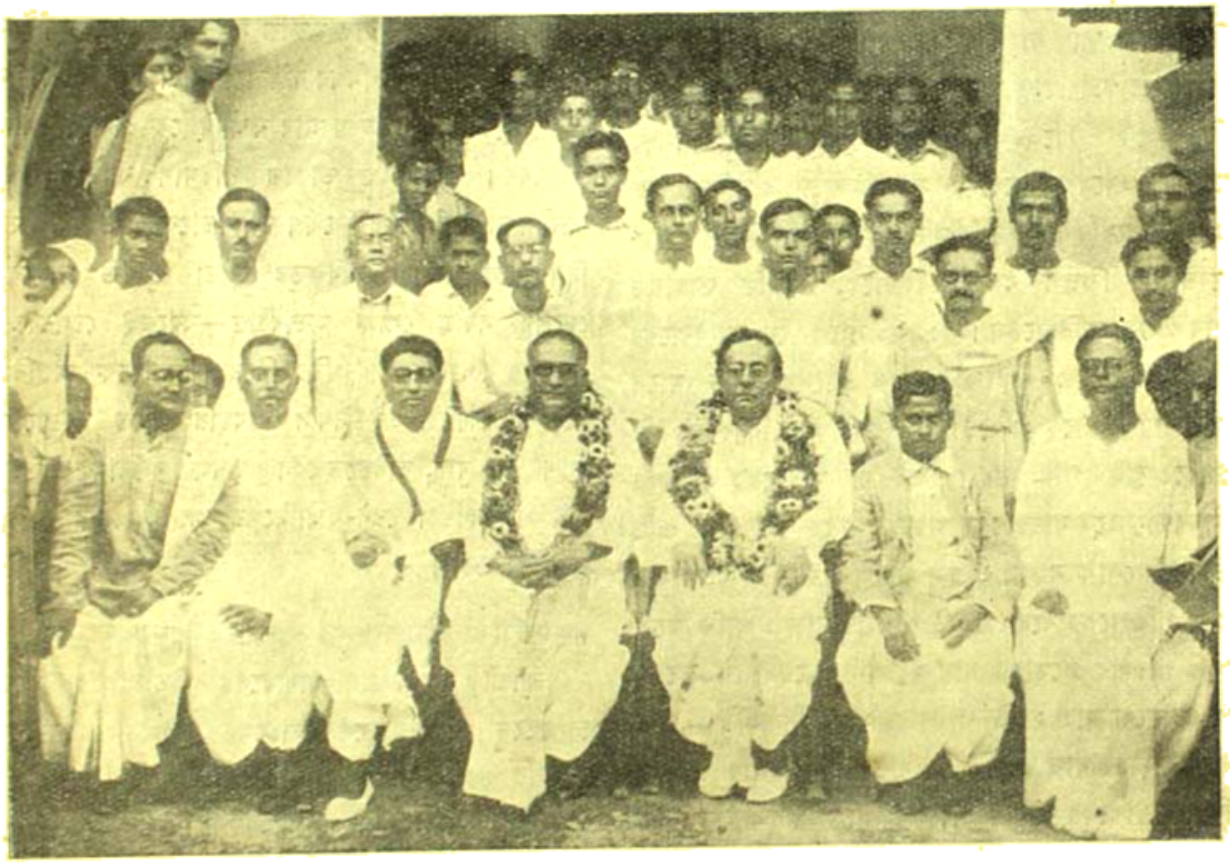

নিখিলবঙ্গ প্রজাপার সম্মেলন—আড়িয়াদহ

বাঙ্গালা ও আসামে কলেজ—

গত বৎসর বাঙ্গালা ও আসামে মোট ৯৫টি মাত্র কলেজ ছিল। বাঙ্গালায় ছিল ৭৯টি ও আসামে ছিল ১৬টি। এ বৎসর বাঙ্গালায় ৭টি ও আসামে ৩টি নূতন কলেজ

সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সেখানে ৪টি কলেজ চলিতেছে। বাঙ্গালায় মেডিকেল শিক্ষার স্থানের অভাব অত্যন্ত বেশী। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে এবার ১১০ জন ও কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ১১৭ জন নূতন ছাত্র গ্রহণ করা হইবে।

দুইটি কলেজে প্রবেশার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ১০০০ ও ১১৪০ জন। কাজেই বহু ছাত্রই চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে না। গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হইয়া এ বাবদে অধিক অর্থ ব্যয় করিলে উচ্চ শিক্ষার প্রসার অনেক অধিক হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু—

রেঙ্গুনে 'নেতাজী ভাণ্ডার কমিটী'র সদস্যগণের বিচারে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের গত ১লা জুলাই বিমানে রেঙ্গুন যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বহু বৃষ্টির জন্য সেদিন কোন বিমান রেঙ্গুন যাত্রা করিতে পারে নাই, শরৎবাবুকে দমদম বিমান ঘাঁটি হইতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে যোগদানের জন্য ৩রা জুলাই রেলে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। ৮ই জুলাই বিমানে তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা। ২০শে জুলাই নাগাদ তিনি রেঙ্গুনে যাইবেন।

যুক্তপ্রদেশে ভাঙ্গন আরম্ভ—

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী অনাচার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে, যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস দলের মন্ত্রীসভা তাঁহাদের সকলের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত উত্তর বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলার ব্যবস্থা করা হইবে।

কাগজের কল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব—

শ্রীযুক্ত কে, কে, সেন চট্টগ্রামবাসী খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। গত ১৫ই জুন বাঙ্গালার সাময়িক পত্র সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট' পত্রিকা অফিসে সম্বর্দ্ধনা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন—"আমি কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করার সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করিয়াছি। বাঙ্গলায় এত অধিক কাগজ ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু বাঙ্গালীদের একটিও কাগজের কল নাই। চট্টগ্রাম জেলায় ২০ মাইল দীর্ঘ ও ২০ মাইল প্রস্থ এক জঙ্গল আছে। তথায় প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায়। সেই বাঁশ দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিলে সারা বাঙ্গালার অভাব দূর করা যাইবে। গঙ্গার ধারে বা কুষ্টিয়ার পড়াই নদীর ধারে ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন করিয়া একটি কল প্রতিষ্ঠা করিলে প্রত্যহ ১৫।২০ টন কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। সেই কাগজ বাজারে ৯ পয়সা পাউণ্ডের স্থলে ৫ পয়সা পাউণ্ডে বিক্রয় করা চলিবে। শ্রীযুক্ত সেন যাহা বলিয়াছেন, বাঙ্গালার ধনী ব্যবসায়ীদের সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্যে অগ্রসর হওয়া উচিত।

শ্রীমান সুব্রত রায়চৌধুরী—

দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসী শ্রীযুত গুপ্তেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান সুব্রত তাঁহার বিবিধ জনহিতকর কার্য্যের জন্য ছাত্রাবস্থাতেই খ্যাতি অর্জ্জন

শ্রীযুক্ত সুব্রত রায়চৌধুরী

করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে যাইয়াও ভারতের মুক্তি আন্দোলনে ও তথায় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষা ব্যাপারে অগ্রণী হইয়া সুনাম লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিনিটি কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করিয়াছেন। পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য তাঁহাকে 'একজিবিসন' নামক বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে। এবার গণিত পরীক্ষায় শ্রীযুত দত্তাপত্তি ও অর্থনীতি শাস্ত্রে শ্রীযুত আই-জে-পেটেল নামক দুইজন ভারতীয় ছাত্রও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—

কলিকাতা পুস্তকপ্রকাশসংঘের সভাপতি শ্রীযুত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে প্রকাশক সংঘ গত ৬ঠা মে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সভায় কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় সভাপতির

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিদায় সম্বর্দ্ধনা

করেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্য রমেশবাবু পুস্তক প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সভায় রমেশবাবু তাঁহার অভিভাষণে প্রকাশক-গণকে সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতার সঙ্গে পুস্তক ব্যবসায় চালাইতে অনুরোধ করেন।

ঘুস গ্রহণ ও চোরা বাজার—

মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত টি প্রকাশম্ মাদ্রাজে ঘুস গ্রহণ ও চোরা বাজার বন্ধ করিবার জন্য এক বিরাট পরি-কল্পনা প্রস্তুত করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এই নূতন বিভাগে যাঁহারা কাজ করিবেন, তাঁহাদের নাম বা পরিচয় প্রকাশ করা হইবে না। এমন কি কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারী এই বিভাগে যাইবেন, তাহাও গোপন থাকিবে। এই বিভাগের লোকগণ বাজারে বাজারে ঘুরিয়া সাধারণের অভাব অভিযোগের কথা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবেন। এখন সকল দোকানী প্রত্যেক খরিদ্দারকে ঐ বিভাগের লোক মনে করিয়া সাবধানতা অবলম্বন করিতেছে—ফলে মাদ্রাজে ঘুস-গ্রহণ ও চোরা বাজার কয়দিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চোরা বাজার ধরিবার জন্য এই গোয়েন্দার দল গঠন মাদ্রাজে অসামান্য সাফল্য আনয়ন করিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে বোধ হয় চোরা বাজার ও ঘুস গ্রহণ ব্যবস্থা অন্যান্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা বেশি। বাঙ্গলার মন্ত্রীমণ্ডল কি শ্রীযুত প্রকাশমের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কাজে অগ্রসর হইতে পারেন না?

'ইলাবাসে' নবীনচন্দ্র উৎসব—

গত ৬ঠা মে কলিকাতা বাণীগঞ্জ হিন্দুস্থান পার্কে কবি শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের বাসগৃহ ইলাবাসে

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সভাপতিত্বে নবীনচন্দ্র শতবার্ষিকী

ফটো—বীরেন ভাদুড়ী

সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনের উদ্যোগে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক সভা হইয়া গিয়াছে। কবি

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সভায় পৌরহিত্য করেন এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত কালীপদ তর্কাচার্য্য, রাজা কিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, অধ্যাপক রবিরঞ্জন মিত্র মজুমদার, শ্রীযুত জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি এবং সভাপতি মহাশয় স্বয়ং কবি নবীনচন্দ্রের প্রতিভার আলোচনা করিয়াছিলেন।

পরলোকে বাণী দেবী—

অধ্যাপক কবি শ্রীযুত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাণী দেবী গত ৩০শে জুন রবিবার টাইফয়েড রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মাত্র ২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করিতেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে তিনি নিজ জীবন গঠন করিয়াছিলেন।

ব্যবস্থা পরিষদে প্রথম সভা—

গত ১৪ই মে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের প্রথম অধিবেশনে লীগ দলের মনোনীত খাঁ বাহাদুর নুরুল আমিন ও মিঃ তোফাজ্জল আলি যথাক্রমে পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটী স্পীকার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের বিরোধী প্রার্থীরা কম ভোট পাইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন।

পরলোকে প্রেমসুন্দর বসু—

ভক্তসাধক হরিসুন্দর বসুর পুত্র অধ্যাপক ডাক্তার প্রেমসুন্দর বসু গত ২৭শে এপ্রিল ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার ভাগলপুরস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রেমসুন্দর-বাবু পণ্ডিত, ধর্ম্মপ্রাণ ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি ১৯১২ সালে এম-এ পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯৩০ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-লিট এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এচ্‌ডি উপাধি পাইয়াছিলেন। বহু বৎসর ভাগলপুর কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯২১ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সেবা করেন। ১৯২৫ সালে তিনি শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি ভাগলপুর সদাকৎ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, মহিলা কলেজের অধ্যাপক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভাগলপুর শাখার সভাপতি ও নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক ছিলেন। রাজনৈতিক জগতে মহাত্মা গান্ধী ও ধর্ম্ম জগতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার আদর্শ ছিল। ১৯৩০ সালে বিদেশ ভ্রমণের পর তিনি আপনার জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

পরলোকে রাজিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী—

খ্যাতনামা পণ্ডিত রাজিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী গত ২৯শে বৈশাখ বরিশালে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ফরিদপুর জেলার ধাগুকার অধিবাসী। গত ৪৬ বৎসর কলিকাতা কুমারটুলীতে টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতেছিলেন।

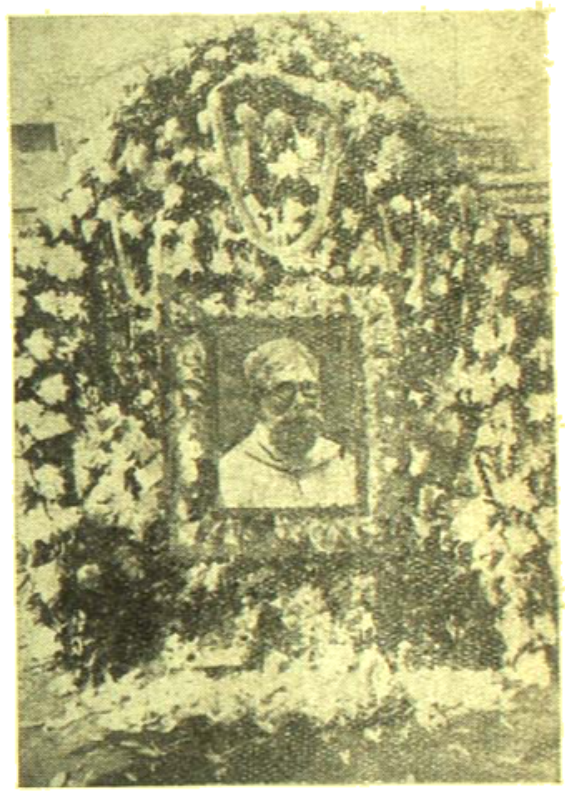

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত ফটো—হারক বাবু

রেল-বিভাগের অপব্যয়—

নিখিল ভারত রেল শ্রমিকসংঘের সহসভাপতি ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন -গত ৫ বৎসরে সৈন্যদিগকে ভাড়া ও অন্যান্য বাবদে সুবিধা দেওয়ার ফলে রেল বিভাগের দুইশত কোটি টাকা আয় কম হইয়াছে। তাহা ছাড়া গত ৫ বৎসরে লাভের ২২৫ কোটি টাকা ভারত গভর্ণমেণ্টের সাধারণ তহবিলে দান করা হইয়াছে। কাজেই রেলের আয় কম বলিয়া যে শ্রমিকদের কম বেতন দেওয়া

হয়, একথা ঠিক নহে। রেল-কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলেই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে পারেন।

পরলোকে সরলা রায়—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডক্টর পি-কে-রায়ের পত্নী ও খ্যাতনামা দেশনেতা দুর্গামোহন দাসের কন্যা সরলা রায় গত ২৯শে জুন রাত্রিতে ৮৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সারা জীবন প্রচার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা সেক্রেটারী এবং গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভার সদস্য ছিলেন ও নিখিল ভারত মহিলা

সরলা রায় শিল্পী—শ্রীসুকুল বসু

সম্মিলনের সভানেত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন কন্যা বর্ত্তমান।

জগতের পরিবর্ত্তন—

গত ১১ই জুন ইটালী দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাইনর গ্যাসপারী প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন ও সম্রাট স্বয়ং দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গত ৪ঠা জুলাই ফিলিপাইন স্বাধীনতালাভ করিয়াছে ও তথায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফিলিপাইন মার্কিণ যুক্তরাজ্যের অধীন ছিল, মার্কিণ স্বেচ্ছায় উক্ত দেশকে স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। জগতের এই সকল ঘটনা স্মরণীয়। পরাধীন ভারত কবে স্বাধীনতালাভ করিবে?

শ্রীযুক্ত আনন্দ সহায়—

শ্রীযুক্ত আনন্দ সহায় পূর্ব্বে জাপানে ও চীনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছিলেন, পরে তিনি নেতাজীর আজাদ-হিন্দ-গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। গত বৎসর সাইগনে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সিঙ্গাপুর জেলে আটক রাখা হয়। গত ৩রা মার্চ্চ তিনি মুক্তি লাভ করিয়া পরে ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার কন্যা আশা 'ঝান্সীর রাণী' সৈন্যদলে সাব-অফিসার ও তাঁহার ভ্রাতা সত্যদেব সহায় সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহারাও আনন্দ সহায়ের সহিত ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বাঙ্গালার মৎস্যজীবীদের দুরবস্থা—

গত ৩রা জুলাই মঙ্গলবার কলিকাতা সরকারী দপ্তর-খানায় এক সাংবাদিক সম্মিলনে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এচ্-এস্ সারওয়ার্দ্দী বাঙ্গালা দেশের মৎস্যজীবীদের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা আলোচনা করিয়াছেন। সুতার অভাবে তাহারা জাল বুনিতে পারে না ও জালের অভাবে মাছধরা ছাড়িতে বাধ্য হয়—এই অবস্থা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র। সম্মিলনে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আবদুল গফরাণ এবং কমিশনার মিঃ এস-এন-রায় ও ডিরেক্টার জেনারেল মিঃ এস-কে-চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যতদিন না চোরাবাজার ও ঘুসগ্রহণ বন্ধ হয়, তত দিন শুধু আলোচনা দ্বারা কোন সুফল পাওয়া যাইবে না।

মেয়র-কমিশনার এ-সি চ্যাটার্জ্জীর সভাপতিত্বে কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে দেশবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিক পালন ফটো—পাল্লা সেন

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধি—

গত ১লা জুলাই বোম্বাই আমেদাবাদে রথযাত্রা উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে ৩১ জন নিহত ও ২১০ জন আহত হইয়াছে। ঢাকা, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানেও ঐ দিন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়াছিল। তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনা নিরীহ ভারতবাসীদিগকে কি ভাবে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা তাহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কবে যে ভারতের হিন্দুমুসলমান জনগণের মনে সুবুদ্ধির উদয় হইবে, তাহা কে জানে?

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য—

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির উদ্যোগে ও দিল্লীস্থ ভারতগভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস মহাশয়ের চেষ্টায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বার্ষিক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভাইস-চ্যান্সেলার সার মরিস গাওয়ার বাঙ্গালার কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বা সাহিত্যিক-যুগ সম্বন্ধে

এ বৎসর বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেছেন। দিল্লীতে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের চেষ্টা এই প্রথম সাফল্যমণ্ডিত হইল—ইহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই আনন্দ ও গৌরব বোধ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আমরা প্রয়োজন মনে করি। দিল্লী-প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে সংহতি না থাকায় তথায় বাঙ্গালীদের কোন চেষ্টাই শীঘ্র সাফল্যমণ্ডিত হয় না। অথচ দিল্লী সহরে বহু সরকারী ও বেসরকারী বাঙ্গালী বাস করেন। তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইয়া প্রবাসে বাঙ্গালীর সন্ধান রক্ষার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইলে তাহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কল্যাণজনক হইতে পারে ও নানা কার্য্য উপলক্ষে যে সকল বাঙ্গালী সর্ব্বদা দিল্লীতে যাতায়াত করেন, তাঁহারাও লাভবান হইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী শীল—

খ্যাতনামা সাংবাদিক ও লণ্ডনস্থ ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী শীল বহুবৎসর পরে ভারতে আসিয়াছেন। গত ১লা জুলাই কলিকাতায় ভারতীয় সাংবাদিক সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক সভায় সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন—শীঘ্র জগতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি আরও বলেন—ভারতের সমস্যা শুধু আমাদের সমস্যা নহে —ইহা সমগ্র জগতের সমস্যা। কাজেই শীঘ্র এ সমস্যার সমাধান হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক
সৌর-অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে
মেয়র জেনারেল
এ-সি চ্যাটার্জ্জী
বক্তৃতা—তারক দাস

জেলে বন্দীদের অবস্থা—

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় দণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদ দত্ত সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্ত্তী একটি চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন কর মধ্যে মধ্যে উন্মাদ হইয়া যান। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন বাতে ভুগিতেছেন। সুরেশ দাশ, হেম বক্সী, নলিনী দাশ ও সুনীল চট্টোপাধ্যায় রোগে ভুগিতেছেন। ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বল ও প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীও হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছেন। আন্দামান-হিন্দ-ফৌজের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ডপ্রাপ্ত পবিত্র রায়, হরিদাস মিত্র ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্যও ভাল নাই। ইহাদের মুক্তির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন।

মহাত্মা গান্ধীর ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা—

মহাত্মা গান্ধী গত ৩০শে জুন যখন দিল্লী হইতে পুনা যাইতেছিলেন, তখন পথে পুনা হইতে ৬৮ মাইল দূরে তাঁহার স্পেশাল ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা করা হইয়াছিল। আরোহীদের প্রবল ঝাঁকানি লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু কেহ আহত হন নাই। লাইনের উপর কে বা কাহারা অনেক পাথর রাখিয়া দিয়াছিল। ঐ দিন সন্ধ্যার উপাসনার সময় গান্ধীজি বলেন—"কেহ আমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে, ইহা আমি ভাবিতেও পারি না। জনগণের সেবা করিবার জন্য আমি ১২৫ বৎসর বাঁচিব বলিয়া আশা করি।" উক্ত দুর্ঘটনা সম্বন্ধে রেলকর্ত্তৃপক্ষ তদন্ত করিতেছেন।

আজাদ-হিন্দ-ফৌজ সম্মিলন—

আগামী ২১শে অক্টোবর কলিকাতায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজ সম্মিলন হইবে। সে জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে সভাপতি, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীকে সাধারণ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যালয়—কলিকাতা ১নং উডবার্ণ পার্কে স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতাবাসী সকলকে এই সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সহিত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষ—

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সহযোগী সম্পাদক স্বামী সোগানন্দজী সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়াছেন—

তমলুক—সুতাহাটা থানার ২নং ইউনিয়নের হোড়খালি, পার্ব্বতীপুর, রামনগর, আগাদোর, উদ্ধবদল, ১নং ইউনিয়নের এঁড়েখালি ও কুখরাহাটীর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ দেখিলাম—বহু পূর্ব্বেই চাষী ও অন্যান্য গ্রামবাসীগণ ধ্বাস্তাভাবে বিশেষ ভাবে বিপন্নগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ৯নং ইউনিয়নের বিরিঞ্চি বাড়িয়া মাধবপুর হরিপুর, বাণেশ্বর চক, চাঁপি প্রভৃতি গ্রামসমূহের অবস্থা আরও শোচনীয়। গোলাপচকের মুসলমান পাড়ার দুস্থ অর্দ্ধনগ্ন নর-নারীগণের অবস্থা যাহা দেখিলাম, তাহাতে অবিলম্বে তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করা আবশ্যক বলিয়া মনে হইল। গবর্ণমেণ্টের টেষ্ট রিলিফের ফলে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিগণ কিছু কিছু কার্য্য পাইয়াছে ও পাইতেছে; কিন্তু সে কার্য্যও প্রায় শেষ। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ যাহারা ৫০ হইতে ১০০ বিঘা জমির মালিক তাহাদেরও দুই বেলা অন্ন জুটিতেছে না, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। পার্ব্বতীপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আমরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ২০ জন ছেলেই না খাইয়া স্কুলে আসে।

বিগত দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুতাহাটা থানার হোড়খালি নামক স্থানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষোত্তর সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া সেবাকার্য্য চালান হইতেছে। সেখান হইতে ঔষধপথ্য, বার্লি প্রভৃতি বিতরণ করা হইতেছে।

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

বাঙ্গালার নেতা ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার সভাপতি। মহাসভার এক অধিবেশন উপলক্ষে তিনি দিল্লী গিয়াছিলেন। গত ১৭ই জুন বিমানে দিল্লী হইতে ফিরিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া

মেদিনীপুর দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলের সেবাকার্য্যে হোড়খালী সাহায্য চিকিৎসালয়

পড়েন। ফুসফুস যন্ত্রের দুর্ব্বলতা ও অন্যান্য উপসর্গের জন্য কয়দিন তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়াছিল। শ্রীভগবানের কৃপায় তিনি এখন ক্রমে সুস্থ হইতেছেন। বাঙ্গালা দেশে আজ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অভাব খুবই বেশী। আমরা প্রার্থনা করি, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের সেবায় নিযুক্ত থাকুন।

ভারতে মার্কিণ প্রতিনিধিদল—

ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মার্কিণ দেশ হইতে একদল প্রতিনিধি এদেশে আসিয়াছেন। তাঁহারা গত ১লা জুলাই কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিলেন—তাঁহাদের নাম (১) ডক্টর থিয়ডর স্কাল্ল—নেতা (২) জন রেশপ (৩) জোশেফ উইলেন (৪) মিস্ মেরী কেলার (৫) ব্রাডনি শিখ (৬) ডাঃ পিকার।

সঙ্গে আরও ২ জন আছেন—টলিষ্ট ও হোরেস আলেকজাণ্ডার। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে কি ভারতবাসী মার্কিণ হইতে খাদ্য-সাহায্য লাভ করিবে—না শুধু দেখিয়াই তাঁহারা কর্ত্তব্য শেষ করিবেন?

শিক্ষকদের সম্মান—

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকরূপে বহু বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশের শিক্ষকগণের অভাব অভিযোগ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি নিজেও কলিকাতার ভূতনাথ মহামায়া

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত

ইনিষ্টিটিউশন নামক একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। শিক্ষকগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করিয়াছেন।

পরলোকে খাঁ বাহাদুর মোমিন—

পরলোকগত নবাব আবদুল জব্বারের পুত্র খাঁ বাহাদুর এম-এ-মোমিন গত ১৮ই জুন ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান, ওয়াকফ কমিশনার প্রভৃতি পদে কাজ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার কাসিয়ারা গ্রামে তাঁহার বাস ছিল।

শিক্ষা বিভাগের নূতন ডিরেক্টার—

হুগলী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল খান বাহাদুর এ-এম-এম-আসাদ বাঙ্গালার সরকারী শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। ডিরেক্টার মিঃ এ-কে-চন্দ বর্ত্তমান লীগ মন্ত্রিসভার অধীনে কাজ করিতে অসমর্থ হইয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ছুটী লইতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, রাজসাহী কলেজের প্রিন্সিপাল স্নেহময় দত্ত ও কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল রায়বাহাদুর জিতেন্দ্রমোহন সেন তিনজন হিন্দু শিক্ষাব্রতীর দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে। লীগ মন্ত্রিসভার পরিচালনাধীন গভর্ণমেণ্টে সবই সম্ভব।

শ্রীযুক্ত ভূষারকান্তি ঘোষ—

বিলাতে যে ভারতীয় সাংবাদিক দল গিয়াছেন তাঁহাদের গত ২২শে জুন ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডেন' পত্র সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ ফটো—প্রাণ সেন

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ সাম্রাজ্যের সাংবাদিক সংঘ প্রতিনিধিদলের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনার উত্তর দিয়াছিলেন। ঘোষ মহাশয় বক্তৃতায় ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহের স্বাধীনতার দাবী জানাইয়াছিলেন।

অধ্যাপক বি-সি-গুহ—

ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ফলিত রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহাকে ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগে চিফ টেকনিকাল পরামর্শদাতা করা হইয়াছিল। তিনি ৬ মাসের জন্য সম্মিলিত

রাষ্ট্রসংঘের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কমিশনের কার্য্যে ৬ মাসের জন্য বিলাত গিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব বোধ করিবেন।

অধ্যাপক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী—

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী এম-এ মহাশয় সম্প্রতি

ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এচ্-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন—

২৪পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে গত ৩১শে মার্চ্চ ১৯৪৬ রবিবার শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ্র (ডি, পি, আই) মহাশয়ের সভাপতিত্বে আরিয়াদহ গ্রামে নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জেলা পরিষদের পক্ষ হইতে সমাগত সুধীগণকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন ও একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত সুশীল ঘোষ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ২৪পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার রায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় পরিষদের উন্নতি কামনা করিয়া একটী মনোজ্ঞ অভিভাষণ পাঠ করেন ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় সভাস্থ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে দেশবন্ধুর সমাধি মন্দির

ফটো—বিমলেন্দু কর

কম্পাউণ্ডার ধর্ম্মঘটের অবসান—

গভর্ণমেণ্ট হাসপাতালসমূহের কম্পাউণ্ডারগণ ১২ দিন ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করার পর গত ২৮শে জুন হইতে তাঁহারা আবার কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার মাসিক ২০ টাকা ও মফঃস্বলে মাসিক ১০ টাকা বাড়ী ভাড়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। সকলেই সপ্তাহে ১দিন ছুটী পাইবেন এবং বেতনের হারও শীঘ্রই বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা—

বাঙ্গালার উচ্চতর পরিষদ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ৯টি সদস্যপদ খালি হইয়াছিল। লীগ দলের ৬ জন ও কংগ্রেস দলের ৩ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—তাঁহাদের নাম—

কংগ্রেস দলের (১) শ্রীপতিরাম রায় (২) চারুচন্দ্র সান্যাল (৩) সৈয়দ বদরুদ্দোজা। লীগ দলের (১) সি-এ-ক্লার্ক (২) তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (৩) ইউসুফ আলি চৌধুরী (৪) সৈয়দ আবদুল মজিদ (৫) মহম্মদ তৌফিক (৬) খান বাহাদুর আবদুল লতিফ চৌধুরী।

লেখিকার সম্মান প্রাপ্তি—

বিখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীকে এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'লীলাপদক' পুরস্কার

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

দিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মান লাভে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি!

ডাক্তার রামমনোহর লোহিয়া—

খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রী নেতা ডাক্তার রামমনোহর লোহিয়া গোয়ায় যাইয়া সেখানকার পর্ত্তুগীজসাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ফলে তথায় তাঁহাকে ৪৪ ঘণ্টা থানায় আটক থাকিতে হইয়াছিল। গোয়ার অধিবাসীরাও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিতেছেন। ডাক্তার লোহিয়া সেই আন্দোলন সমর্থন করিতে গিয়াছিলেন।

পরলোকে ডাঃ মদনমোহন দত্ত—

হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার খ্যাতনামা পাট ব্যবসায়ী প্রসন্নকুমার দত্তের পুত্র ডাক্তার মদনমোহন দত্ত এল-এম-এস গত ২৮শে জুন তাঁহার কলিকাতা সার্কুলার রোডস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মদনবাবু ১৯০৪ সালে ডাক্তারী পাশ করিয়া ১৯০৫ সাল হইতে মেডিকেল কলেজে কাজ করেন। তিনি দেশীয় ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ৪ বৎসর 'ডাঃ চন্দ্র বৃত্তি' পান ও কিছুকাল কসৌলীতে

ডাঃ মদনমোহন দত্ত

জলাতঙ্ক রোগের গবেষণা করেন। ১৯১৯ সালে তিনি ক্যাম্বেলে ফিজিওলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন—বহুবৎসর তিনি ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির পরীক্ষক ছিলেন। তিনি অমায়িক ও সরল ব্যবহারে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। চিকিৎসকগণের নাট্য সংঘ, খেলাধূলা প্রভৃতিতেও তিনি উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন।

ভ্রম সংশোধন—

ভারতবর্ষের গত বৈশাখ সংখ্যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্রখানি ঢাকার মডার্ণ ইলেক্ট্রো ষ্টুডিও কর্ত্তৃক ফটো গৃহীত। ভ্রমক্রমে উক্ত ষ্টুডিও'র নাম উল্লেখ করা হয় নাই। সে জন্য আমরা দুঃখিত।

ভ্রমণ-কাহিনী

রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

দেশ ভ্রমণের ন্যায় এমন চিত্তচমৎকারী ব্যাপার খুব কমই আছে এবং ভ্রমণ বৃত্তান্তের ন্যায় সরস, শুচিতা-সমন্বিত, কল্পনাপ্রসারী পাঠ্যও বোধ হয় বিরল। অ-দেখা দেশ যেন দূর হইতে হাতছানি দিয়া ডাকে, আর—একবার-দেখা দেশ বন্ধুর মতো পরিচিত স্বরে সম্ভাষণ করে। কিন্তু এমনটি বেশী দিন থাকিবে কি না সন্দেহ। কারণ বিজ্ঞানের প্রসাদে দেশকালের ব্যবধান সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। তিন মাসের ক্রেশকর ভ্রমণ যখন তিন দিনে সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে চলিয়াছে, তখন কোনো দেশ আর রহস্যমণ্ডিত থাকিবে কি? ভ্রমণ বৃত্তান্তের মোহ হয়ত আর তেমন থাকিবে না। কিন্তু মানুষের মনে যে আদিম চঞ্চলতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা হয়ত কোনো দিন শান্তিলাভ করিবে না এবং নূতন নূতন দেশ-দর্শনের অশান্ত স্পৃহাও পরিতৃপ্ত হইতে চাহিবে না। সিনেমার কল্যাণে এই অতৃপ্ত চঞ্চলতা আরও বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

দেশ-ভ্রমণ যদি ভৌগোলিক অভিজ্ঞতা-লাভেই পর্যবসিত হইত তাহা হইলে তাহার নূতনত্ব হয়ত অচিরে লোপ পাইতে পারিত। কিন্তু ভ্রমণবৃত্তান্ত শুধু ভৌগোলিক সংস্থানের বিবরণ নহে, সে সকল বিবরণ সাহিত্যের কোঠায় পৌঁছিতে পারে না। রসোত্তীর্ণ হইতে হইলে, নদনদী পাহাড়-প্রান্তরের অতীত এক রাজ্যের সহিত পাঠকের পরিচয় লাভ করাইতে হয়, যাহা চির নূতন। ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্য দিয়া আমরা পাই পর্যটকের মানস-জগতের স্পর্শ। প্রত্যেক পর্যটকের একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সেইজন্য একই দেশ—আমার দেখা তোমার দেখা নয়; এবং তোমার দেখা আমার দেখা নয়। দেখিবার এমন একটি বৈচিত্র্য আছে, যাহা ব্যক্তি-মানসের রূপে রসে মিশিয়া অপূর্ব হইয়া উঠে। নায়াগ্রাপ্রপাতই হউক, আর সুইট্‌জারল্যাণ্ডের আল্‌প্‌স্‌ই হউক, ইহারা চিরন্তনের এক একটি টুক্‌রার মতো কালের অস্থির প্রবাহকে উপেক্ষা করিয়া বিরাজমান রহিয়াছে। কিন্তু দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গী তাহাদিগকে নবীনতার মোড়কে পুরিয়া পরিবেশন করে। আমরা চাই তাহাই উপভোগ করিতে। এমন কি চিত্রশালা প্রভৃতি অচির-প্রতিষ্ঠানগুলিও যোগ্য পর্যটকের চিত্তরসে চর্চিত হইয়া উপভোগ্য হইয়া উঠে।

আর দেশ ত মাটির নয়। দেশের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাহার আধিভৌতিক উপাদানের বহু উর্দ্ধে। বিরহী যক্ষ যেমন ধূমজ্যোতি-সলিলমরুদ্‌সন্নিপাতকে অতিক্রম করিয়া মেঘের কলেবরে এক পরম রসাল প্রাণসত্তার কল্পনা করিয়াছিলেন, তেমনি দর্শক যদি 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' মাটীর পৃথিবীকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন, তবেই তাঁহার বৃত্তান্ত সার্থক হয়। একই দেশ তাহার সৌন্দর্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য লইয়া দেয় ভক্তের নিকট, রসিকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে, তাই তাহার চিত্র আমাদের প্রাণে লাগায় নূতন নূতন সাড়া। বিশ্বের চিরন্তন আলেখ্যকে রসিক সমাজের জন্য নূতন নূতন রঙে আঁকিয়া লইতে হয়; তবেই তাহা প্রাণস্পর্শী হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একখানি পুরাতন ভ্রমণবৃত্তান্তের একটি পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিলে অন্যায় হইবে না। রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ ইয়ুরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন জলপথে। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত Three Years in Europe নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। লোকের আগ্রহ দেখিয়া লেখক ইহার বাংলা অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে তিনি একস্থলে ইয়ুরোপের সংস্কৃতির একটি তুলনামূলক সমালোচনা দিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিচয় পাওয়া যায়, উহাই গ্রন্থখানির প্রধান আস্বাদ্য বিষয়।

"……পাছে জীবিকানির্বাহের কোন স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিলে জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, সেই ভয়ে ইংলণ্ডীয় মহিলারা, হয় উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হন, নয়

চিরজীবন পিতামাতার গৃহে বাস করিয়া আদতে কাল হরণ করেন। চিরদিন জনকজননীর অধীনতা নানা অসুখ-প্রসবিনী জানিয়া কাজে কাজেই যুবতীগণ বিবাহ করিতে ব্যাকুলা হন। ইংলণ্ডীয় যুবাপুরুষেরা আত্মমর্যাদা ও গৌরব পাছে ক্ষয় হয়, এই ভয়ে আপনার মানের উপযুক্ত-রূপ পরিবার-প্রতিপালনের উপায় স্থির না করিয়া সহসা বিবাহ করিতে স্বীকার করেন না।···বিবাহের বাজারে যুবা পুরুষ তত পাওয়া যায় না, কিন্তু যুবতী স্ত্রী এত অধিক পাওয়া যায় যে তন্মধ্যে অনেকে অ-বিক্রেয় হইয়া ফিরিয়া যান।···আমাদের দেশে পিতামাতা যেমন কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হন, ইংলণ্ডের যুবতীগণ আপন আপন বিবাহ জন্য সেইরূপ ব্যস্ত, অথচ মাতাও সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন না। সভা মধ্যে যুবতী কন্যা স্বাধীনতা প্রকাশ করেন না, সংযত-মনোরঞ্জিনী ও চারুশীলা হন।···এবম্বিধ কৌশল ও প্রতারণা দ্বারা সভ্য জাতির মধ্যে রমণীগণ পুরুষের মন আকর্ষণ ও বিবাহ সম্পাদন করিতে যত্ন করেন। এরূপ চতুরতা নিতান্ত গর্হিত না হইতেও পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা যে মানবপ্রকৃতি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে যে বিবাহ প্রণালী প্রচলিত আছে, অনেকে তাহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন।···কিন্তু ইংলণ্ডীয় যুবকগণ স্বেচ্ছামত দারপরিগ্রহ প্রথানুসারে স্বাভরূপ স্বভাব-যুক্তা রমণী বাছিয়া লইতে পারেন, সুতরাং বিনা বিবাদ বিসম্বাদে জীবনযাত্রা-নির্বাহের ও চিরকাল দাম্পত্য-প্রণয়ের সুখসম্ভোগের অমোঘ উপায় স্থির করিতে পারেন—তিনি একথা বলেন তিনি হয় ইংরাজী কুসংস্কারাপন্ন, নয় নিজে প্রেম-সরোবরে নিমগ্ন। কল কথা এই যে, অস্মদ্দেশীয় বালক যেরূপ ভাবী স্ত্রীর স্বভাব কিছুই জানিতে পারে না, ইংলণ্ডীয় যুবা পুরুষগণ শুভ-বিবাহের দিন পর্যন্ত ভাবী পত্নীর প্রকৃত স্বভাব প্রায়ই জানিতে পারে না।"

এই যে সামাজিক জীবনের চিত্রটি পর্যটকের লেখনী মুখে ব্যক্ত হইল, ইহা সকলের পক্ষেই উপভোগের সামগ্রী এবং লেখকের মানসলোকের যে আলোকে উহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই সাহিত্যের সম্পদ্।

আর একজন সাহিত্যিক আই-সি-এসএর ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রহণ করা যাক্। শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ যুবক এবং সাহিত্যপ্রেমী। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে (ইয়োরোপা ২য় সংস্করণ—বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত) সাহিত্যিক মানসের যে ছাপ পড়িয়াছে, তাহাতে ইহাকে সাধারণ ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। লেখকের অন্তরস্পর্শী দৃষ্টিভঙ্গীতে ইয়ুরোপের যে বর্ণচ্ছটা ফুটিয়াছে, তাহা ঐ দেশের ছবিটি নূতন করিয়া আঁকিয়া লইয়াছে। রবিরশ্মি সকলের চোখেই শ্বেত শুভ্র উজ্জ্বল। কিন্তু স্ফটিকের মধ্য দিয়া দেখিলে যে রঙের উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যেমন বিচিত্র, তেমনি নয়নমনোহর। লেখক সেইরূপ শুভ্র সূর্য কিরণকে তাঁহার মনের স্ফটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার বর্ণনা সার্থক আনন্দবহ হইতে পারিয়াছে। দেবেশচন্দ্র কোনও উদ্দেশ্য লইয়া ভ্রমণ করেন নাই। তিনি দেখিয়াছেন অনেক, শিখিয়াছেনও অনেক; কিন্তু তাঁহার অন্তর-সঞ্চিত ও মনীষাদীপ্ত অভিজ্ঞতা কখনও উপদেশের ভার পাঠকের মনের উপর চাপায় না। তাঁহার দৃষ্টিও যেমন উদার, লিখিবার ভঙ্গীও তেমনি মনোমুগ্ধকর। রচনার গুণে সামান্য ঘটনাও চিন্তাকে জাগায়, কল্পনাকে জাল বুনিতে প্রেরণা দেয় এবং আনন্দের মোহ বিস্তার করে। ইয়োরোপা সেইরূপ একটি সার্থক রচনা। ভ্রাম্যমানের চিত্তাকর্ষণ মনের স্পর্শ ইহার প্রতি পত্রে পাওয়া যায়। সাহিত্যের রসে পাক করিয়া তিনি ইংলণ্ডের লেক্ ডিষ্ট্রিক্ট্, জার্মাণী, স্পেন, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি যে সকল বহু পরিচিত স্থানের বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাই এই ভ্রমণবৃত্তান্তকে সত্যই অতুলনীয় রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সাহিত্যিক মনের স্পর্শ, কবিজনোচিত চিত্ত-বৈভব এই স্বল্পায়তন গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছে। তাঁহার লেখায় সন তারিখের বালাই নাই। তাহার কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্য দেশকালের ব্যবধানকে স্বীকার করে না। লেখকের দৃষ্টি যে সাহিত্যের রস সৃষ্টিতে ব্যাপৃত ছিল তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। দুই একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে আশা করি।

"লণ্ডনে 'ক্যামিলি' খুব কম, 'হোম' আরও কম। সামাজিক রীতি নীতি বন্ধন সব যেন আধুনিকতার বন্যা-স্রোতের মুখে একে একে ভেসে গেছে। তার ফলে

ঘরকে পর ক'রে পুরুষ বেরিয়েছে একা; নীড় থেকে নারী এসেছে বাহিরে একাকিনী। পুরুষের হৃদয়ের বিচরণ-ক্ষেত্র বেড়ে গেছে অনেক, আর নারী হয়েছে সাহসিনী। সে আর পুরুষের কাছে অর্দ্ধেক সৃষ্টি ও অর্দ্ধেক কল্পনা নয়। পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে সে জীবিকা-অর্জ্জনেও, তাই তার সম্মানের আসনটুকুও প্রতিযোগিতার বাজারে নেমে সসম্মানে লোপ পেয়ে গেছে। এখন আর কেহ তাকে বাসে বা ট্রেণে অভিবাদন ক'রে বসবার জায়গা ছেড়ে দেবে না; সে-ও তা চায় না। সে চায় পুরুষের কাছে সমান ব্যবহার; সে হচ্ছে সহকর্ম্মিণী, সহধর্ম্মিণী হওয়া তার কাছে আজ বড় কথা নয়। সে হচ্ছে আগে কম্‌রেড, পরে কামিনী। নারী হারিয়েছে তার লালিত্য, যদিও যৌবনের লাবণ্য তার বেড়েই গিয়েছে হয়ত। সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে তার মধ্যে খেলায়, ব্যায়ামে ও নানাভাবে প্রাণ স্ফূর্ত্তি পেয়েছে; কিন্তু প্রাণপ্রিয়া মূর্ত্তি নিয়ে উঠতে পারছে না। তাই সে আর বিপুল রহস্যের অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নেই। সে হচ্ছে তবু নারী, কবিতার নারিকা সে নয়। • • •

• • • • "That it fades from kiss to kiss" একথা যে জেনেছে তাকে মূল্য দিতে হয়েছে বহু; তার হৃদয় তাই হয়ে উঠেছে চঞ্চল ও অনেকনিষ্ঠ। পথে পথে কত নব পরিচয়, নব অনুভব, স্মৃতির পথ বেয়ে কত মূর্ত্তির আনাগোনা; তার মধ্যে কোন্‌টি প্রতিমা হ'য়ে পূজা পাবে তার কি ঠিক? আর তার বিসর্জ্জনের সময় আসবার আগেই অন্য মূর্ত্তির ছায়া এসে পড়তে পারে। হয়ত একটি আগেরটির চরণচিহ্ন পর্য্যন্ত মুছে লোপ করে দিল, কারণ স্মৃতি ও প্রীতির আসন জুড়ে বসে থাকতে পারে না। জীবন্ত এরা—চায় জীবন্ত প্রেম। স্মৃতি হিমশীতল, তার মধ্যে ত প্রাণময়তার কবোষ্ণ স্পর্শ, নিশ্বাস-সুরভি নেই। • • • • এ-সব আদর্শ নিয়ে কিন্তু আধুনিকার আসা কম নয়। স্বাধীনতার কল্যাণে না টিকুক তার বর, না জুটুক বর, না ঘটুবে হয়ত জীবনে প্রিয়তমের আবির্ভাব।……"

(নগর ও নাগরিক)

১৮৬৮ আর ১৯৩৫—ইংলণ্ডের নারী সমাজের অবস্থা কত বদলাইয়া গিয়াছে। আমাদের মধ্যে সাহিত্যের ধারণাও কত বদলাইয়াছে; মিঃ দত্ত ও মিঃ দাসের রচনা হইতে তাহারও একটু আভাস পাওয়া যায়।

ভার্সাইয়ের যে চিত্র লেখক ইয়োরোপায় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা যেন জীবন্ত। আমি নিজে সেই অনুপম নগরী দেখিয়াছি। লেখকের বর্ণনায় আবার চক্ষুর সম্মুখে সেই অনিন্দ্য অপ্‌সরীর রূপ নূতন সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। একটু পড়িয়া শুনাই:

"…রাজ-সমারোহ ও বিলাসের দিক্ দিয়ে ভার্সাই ছিল প্যারিসের সম্পূরক। এখানকার বিরাট্ প্রাসাদের চারিদিকে দিগ্‌বলয় যে শ্যাম-অরণ্যানীর সৌন্দর্য্যে আচ্ছন্ন তার মধ্যে যে চতুর্দ্দশ লুইয়ের ফ্রান্সের মূর্ত্তি লুকিয়ে আছে। এত রূপ ও পাপ, ঐশ্বর্য্য ও বড়যন্ত্র, বিলাস ও বিফলতা বুঝি ইয়ুরোপে আর কোথাও ছিল না। কত সুন্দরীর নৃত্যচটুল চরণাঘাতে এ প্রাসাদের মর্ম্মর এইমাত্র বুঝি মুখরিত হয়ে উঠেছিল; কক্ষ হতে কক্ষান্তরে যেতে বাতাসে কলগাস্তের আভাস এখনি ভেসে আসতে পারে; লালসার অতৃপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস বুঝি এই ক্ষুধার্ত্ত পাষাণে লেলিহান শিখা বিস্তার ক'রে স্পর্শ রেখে গেছে।…"

(বিশ্বের পিয়ারী)

'ইয়োরোপা'র অনেক স্থলে দুর্লভ চিত্রশিল্পিতার ছাপ পড়িয়াছে। সেইজন্য একবার পড়িয়া তৃপ্তি হয় না, বহুবার পড়িয়া ইহার রসাস্বাদন না করিলে গ্রন্থকারের এই অপরূপ রূপসৃষ্টি সমন্বিত ভ্রমণ-সাহিত্যের মর্য্যাদা দেওয়া যাইবে না।

কাঙাল হরিনাথের বাউল সংগীত

শ্রীসুশান্তকুমার মজুমদার কাব্যনিধি

কলধর-গুরু কাঙাল হরিনাথের নাম বাঙলার সর্বজনবিদিত। বাঙলার ইতিহাসে যে সকল মহাপুরুষ দেশের ও দশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সিদ্ধ সাধক কাঙাল হরিনাথ তাঁহাদের অন্যতম। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন।

ইনং নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র বাউল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাউল সংগীতের আদি রচয়িতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত বাউল সম্প্রদায় হইতে সহজীয়া পন্থী ও সাঁইপন্থীদিগের উদ্ভব হইয়াছে। সহজীয়া পন্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাঙলার আদি কবি চণ্ডীদাস এবং সাঁই পন্থীদিগের নেতৃস্থানীয় গুরু ছিলেন স্বনামধন্য মহাত্মা লালন ফকির। তাঁহার আস্তানা ছিল কুষ্টিয়ার সন্নিকটস্থ কালীগঙ্গা নদীর তীরবর্তী সিটড়া গ্রামে। সেই আস্তানাটি অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙলার মহাকবি চণ্ডীদাস বাউল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সহজীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাঁহার রচিত পদাবলী রাধাকৃষ্ণের লীলামৃত বর্ণনায় বাঙলা দেশকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। অপরপক্ষে মহাত্মা লালন সাঁইজীর সংগীত-গুলি বহুলাংশে বাউল সংগীতের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মোটের উপর, বাউল সংগীতের উৎপত্তি নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র হইতেই হইয়াছিল।

বীরভদ্ররচিত সংগীত কদাচিৎ বাউলদলের মুখে শোনা যায়। কিন্তু সিদ্ধসাধক স্বনামধন্য কাঙাল হরিনাথই সমগ্র বাঙলা দেশে ইহা বহুল পরিমাণে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কুমারখালিতে প্রথম প্রথম ইহার বড় প্রচার ছিল না। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সি-আই-ই মহোদয়, স্বর্গীয় পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ধমানরাজের), স্বর্গীয় রায় কালিকা সেন বাহাদুর (জমিদার), স্বর্গীয় মৃত্যুগোপাল সরকার, স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, ও কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের সহায়তায় একটী বাউল সংগীতের দল সংগঠিত হয়। এই বাউল দল 'অচিন ফকিরের দল' নামে পরিচিত ছিল। কিছুদিন পর কিকিরচাঁদ নামক একজন গ্রামমান ফকির দৈবক্রমে তাঁহাদের দলে যোগদান করেন। কিকিরচাঁদ ফকিরের নামানুসারে এই দলের নাম রাখা হয়—'কিকিরচাঁদ ফকিরের দল।' এই দল সংগঠনকালীন কাঙালের দৃষ্টি এইদিকে নিপতিত ছিল না। তিনি 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা এবং সাধন কার্যেই সময় অতিবাহিত করিতেন। কিছুদিন পরে কাঙাল এই দলের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া সংগীতগুলি 'কাঙাল ফকিরচাঁদে' ভণিতায় অভিহিত করেন। এই বাউল দলের সর্বপ্রথম সংগীত—'ভাব সব দিবানিশি, অবিনাশী, সত্য পথের সেই ভাবনা।' এই গানটীর রচয়িতা ছিলেন স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার। প্রফুল্লচন্দ্র ও প্রসন্নকুমারেরও অনেক সংগীত কুমারখালী এবং, এবং, প্রেস হইতে প্রকাশিত 'বাউল সংগীত' নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে। তবে, এই প্রবন্ধটি কাঙালের নামে প্রচারিত। সমগ্র সংগীতগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, কতকগুলি 'কাঙাল কিকিরচাঁদে' ভণিতায় রচিত, সেগুলি কাঙাল স্বয়ং রচনা করিয়াছেন এবং যে গানগুলি মাত্র কিকিরচাঁদ ভণিতায় রচিত, সেগুলি অক্ষয়, প্রসন্ন, প্রফুল্ল অথবা অন্যকোন রচিত বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু কোন্ গানটী কাহার রচিত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

কাঙাল হরিনাথের ধর্মজীবন ভাব এবং বাউল সংগীতের মধ্য দিয়া সাহিত্য চর্চা তাঁহাকে বাঙালীর নিকট চিরস্মৃত করিয়া রাখিয়াছে। পুরাতন কবিদিগের কথা ধরাচন্দ্র, পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝা, মহাকবি চণ্ডীদাস, বাঙলা ভাষায় মহাভারতকার কাশীরাম দাস প্রভৃতি কবিগণ বাঙলা সাহিত্যকে ফল-পুষ্পে ও শাখা প্রশাখায় যে প্রকারে সুশোভিত করিয়া গিয়াছেন, কাঙালও তেমনি বাউল সংগীতের মধ্য দিয়া বাঙলা সাহিত্যকে স্রোতস্বতী কল্লোলিনীর ন্যায় উত্তাল তরঙ্গ মালায় উদ্বেলিত করিয়া তর তর বেগে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, অতি সহজ, প্রাঞ্জল ও ভাব মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় 'বাউল সংগীত' গ্রন্থে যে গানগুলি সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষিত সমাজে সুরের কথা, গোচারণকারী রাখালগণ, এমন কি নৌকাযাত্রী মাঝি মাল্লার মুখেও শোনা যায়। রাখালেরা গোরু চরাইতে চরাইতে বাল্যসুলভ চপলতায় উচ্চকণ্ঠে যখন গাহিতে থাকে—'আর কোবে এ রাখালি কতকাল' এবং মাঝি মাল্লারা দেশনীর তালে তালে স্রোতস্বতীর উর্মিমালার ঘাতপ্রতিঘাতাহত পতিতপাল নৌকার উপরে বসিয়া সুললিত কণ্ঠে যখন গাহিতে থাকে—'ভাই মাঝি! দাঁড়াল দাঁড়াল ডুবল্ তরী, ভবনদীর তুফান ভারী', তখন মহাত্মা কাঙালের সাহিত্য সাধনার কথা সহজেই মনে পড়িয়া যায়। সংগীতগুলির ভাষা, অতি সরল গ্রাম্য ভাষায় রচিত হইলেও ভাব-মাধুর্যে বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে উহার স্থান অতি উচ্চতে শুরে।

কাঙালের বাউল সংগীতগুলিকে প্রধানত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) দেহতত্ত্ব। (২) ভাবতত্ত্ব। (৩) সাধনতত্ত্ব। (৪) সমাজতত্ত্ব। (৫) দেব ও অভিমততত্ত্ব।

বাউল সংগীতের মধ্য দিয়া কাঙাল যত তত্ত্বেরই বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাউল সংগীতের সমস্তগুলির তত্ত্বপ্রবণ করিলে সাধারণত মনে এই পাঁচ প্রকার ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে। কাঙালের পুণ্য স্মৃতিপূত বাউল সংগীতগুলি নানা ভাবে, নানা প্রসঙ্গে অদ্যাবধিও কীর্তিত হইয়া থাকে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই মুখে কাঙালের কবি-কল্পনা বাউল সংগীতের মধ্যে সাহিত্য চর্চার একটী বাস্তব অভিব্যক্তি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺হরাংশুবেশর চট্টোপাধ্যায়

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের খেলা প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। প্রথম বিভাগের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এবারও লীগ পেল। লীগের খেলার শেষের দিকে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে যেমন উত্তেজনা তেমনি খেলায় জোর প্রতিযোগিতা চলেছিল। প্রথম বিভাগের লীগে মোহনবাগান বনাম ইষ্টবেঙ্গল দলের রিটার্ণ ম্যাচই এ বছরের যে শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলা সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এদের লীগের প্রথম খেলাটি ১-১ গোলে ড্র যায় এবং খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোন দলেরই তেমন ভাল হয় নি। লীগের রিটার্ণ ম্যাচে মোহনবাগান ক্লাবের আক্রমণ ভাগ খেলার প্রথম থেকেই একযোগে ইষ্টবেঙ্গল দলের রক্ষণভাগ একাধিকবার আক্রমণ ক'রে তাদের বিপর্যস্ত ক'রে তুলে; ঐ দিনের খেলার প্রথমার্দ্ধে মোহনবাগান দলের কম ক'রে তিন গোলের ব্যবধানে অগ্রগামী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু ভাগ্যদেবী তাদের সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। অনেকদিন পর মোহনবাগানের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে চমৎকার বল আদান-প্রদানে বোঝাপড়া দেখা গেল। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা অদ্ভুত প্রেরণা নিয়ে খেলে আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের বল জুগিয়েছিল। ইষ্টবেঙ্গলের আক্রমণ ভাগের তুলনায় রক্ষণভাগের খেলাই দর্শকদের চোখে পড়ে। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের কেউ খেলার যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে নি, তারা সমর্থকদের হতাশ করেছে। ঐ দিনের খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধে মোহনবাগান দল একটি চমৎকার গোল করে। রেফারী অফসাইডের অজুহাতে গোলটি বাতিল করেন। এ গোল সম্পর্কে দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট মত বিরোধ দেখা দেয়। রেফারী যথেষ্ট সন্দেহজনক অবস্থায় অফ্‌সাইডের নির্দ্দেশ দেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর বিবৃতি মোটেই সন্তোষজনক হয় নি। দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রায় ৬ মিনিট বেশী খেলানোর কারণও বোঝা গেল না। মোহনবাগানের আরও দুটো খেলা বাকি—স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং ভালহৌসীর সঙ্গে অন্ততঃ খেলা ড্র করতে পারলেও মোহনবাগান এবার অপরাজেয় থাকবে। এ রেকর্ড কোন ভারতীয়দল করতে পারেনি। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এ বছরের লীগের খেলায় ভালই খেলেছে, দুর্বল দলের কাছে পয়েন্ট নষ্ট করে নি। সুতরাং তাদের এ সম্মান অর্জ্জন সম্পর্কে সন্দেহ করার কারণ নেই। লীগে তারা মাত্র একটা খেলায় হেরেছে লীগের প্রথমার্দ্ধে মহমেডান দলের কাছে ১-০ গোলে। ভাল খেলা ছাড়াও ভাগ্যদেবী, রেফারীর ত্রুটি বিচ্যুতি এবং অনুকূল ঘটনা তাদের সহযোগিতা করেছে। এই প্রসঙ্গে মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে তাদের দুটি খেলার ঘটনাই উল্লেখ করা চলে। মোহনবাগানের সঙ্গে প্রথম খেলায় মেজর হলওয়েল গোলের নির্দ্দেশ দিয়ে পরে লাইন্সম্যানের নির্দ্দেশ মত মোহনবাগানের গোলটি অফসাইড্ অজুহাতে বাতিল করেন। রেফারী লাইন্সম্যানের থেকে ঘটনা স্থলের নিকটবর্ত্তী ছিলেন এবং সেইমত খেলার অবস্থা অবলোকন করেই গোলের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। এই গোল বাতিলের ফলে খেলা ড্র যায়। রিটার্ণ ম্যাচেও প্রায় অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। মোহনবাগানের চমৎকার গোলটি লাইন্সম্যানের নির্দ্দেশমত অফ্‌সাইডের অজুহাতে রেফারী সার্জ্জেণ্ট ম্যাকব্রাইড বাতিল করেন। ফলে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব দুটি খেলাতেই পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। মোহনবাগান ক্লাবের দুর্ভাগ্য।

এ দুর্ভাগ্য ছাড়া মোহনবাগান ক্লাব খেলার দোষে স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে প্রথম খেলায় এবং এরিয়ান্স দলের সঙ্গে রিটার্ণ ম্যাচ ড্র করেছে। এই দুটি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট না করলে তারাই শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকতো। কাষ্টমস ক্লাব এবার লীগের তালিকার শেষ স্থান অধিকার করেছে সুতরাং তাদের দ্বিতীয় বিভাগে আসছে বছর থেকে খেলতে হবে। ভবানীপুর ক্লাব নামকরা খেলোয়াড় পেয়েও লীগে বিশেষ স্থান পেতে পারলো না। লীগের ২টো খেলাতেই তারা মহমেডান স্পোর্টিং দলকে হারিয়েছে—যা মোহনবাগান বা ইষ্টবেঙ্গল পারে নি। মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে তাদের কি দুর্ভোগ না পেতে হয়েছে! দুটো খেলার পরই খেলোয়াড়রা আহত হয়েছে এবং এক দল লোক ক্লাবের তাঁবু ভেঙ্গে ফেলেছে। পুলিশের হস্তক্ষেপেও বিশেষ কোন ফল হয় নি। কোন দলেরই সমর্থকদের পক্ষে এ রকম ব্যবহার শোভন নয়। ভবানীপুর ক্লাব ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে তাদের রিটার্ণ ম্যাচে নাম-করা খেলোয়াড়দের বসিয়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দল গঠন ক'রে দর্শকদের হতাশ করেছিল। এরকম পরিবর্ত্তনের কোন কারণ জানা যায় নি। নাম-করা সব খেলোয়াড়ই ত সুস্থ ছিল এবং এই ম্যাচের পূর্ব্বে তারা খেলায় যোগ দিয়েছিল এবং আশ্চর্য্যের কথা ঠিক পরবর্ত্তী ম্যাচে তাদের খেলতে দেখা যায়। ক্লাবের পরিচালক মণ্ডলী গুরুত্বপূর্ণ খেলায় যতদূর সম্ভব শক্তিশালী দল গঠনই ক'রে থাকেন—এ ক্ষেত্রে তার উল্টো ব্যবস্থা দেখছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গত বছর লীগের রিটার্ণ ম্যাচেও ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলায় ভবানীপুর ক্লাব ইসমাইল এবং তাজমহম্মদের মত নাম-করা কয়েকজন খেলোয়াড়কে বসিয়ে তাদের জায়গায় অন্য খেলোয়াড় মনোনয়ন ক'রে দল তৈরী করেছিল। ভবানীপুরের ঐ সব খেলোয়াড় সুস্থ দেহেই মোহনবাগান গ্রাউণ্ডে দলের খেলা দেখতে এসেছিল। এবার লীগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ভবানীপুর দলের এ রকম খেলোয়াড় পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে নি বলেই জনসাধারণ কোন যুক্তিই খুঁজে পায় নি, সত্যই আশ্চর্য্যের কথা।

ব্রিস্টলে ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

জুন ৮, ১০ ও ১১। **ভারতীয় দল**—৩৭৬ (৬ ডিক্লেয়ার্ড ; এল অমরনাথ নট আউট ১০৪, মানকাদ ৮৬, হাজারী ৭৯, ভি এম মার্চ্চেণ্ট ৫২) ; **গ্লামরগ্যান**—১৪৯ (মানকাদ ৬৮ রানে ৪ এবং সারভাতে ৩০ রানে ৫ উইকেট) ও ৭৩ (৭ উইকেট ; মানকাদ ৩১ রানে ৩, এবং সারভাতে ১৯ রানে ২ উইকেট)। খেলা ড্র।

জুন ১২, ১৩ ও ১৪। **কেম্ব্রিজ সার্ভিসেস**—১ম ইনিংস—২৪১ (৪ উইকেটে ডিক্লে ; ডিউরাস নট আউট ৯৯) ও ১৩৫ (হাজারী ৬৬ রানে ৭ উইকেট পান) ; **ভারতীয় দল**—১৫৯ ও ১১৬ (৫ উইকেট ; মার্চ্চেণ্ট এইবার প্রথম গোল্লা করেন)। খেলা ড্র।

জুন ১৫ ১৭ ও ১৮। **ভারতীয় দল**—৩৪৫ (৫ উইকেটে ডিক্লে ; পতৌদির নবাব নট আউট ১০১, মার্চ্চেণ্ট ৮৬, ভি এস হাজারী ৪৯ ; ৭২ রানে বাটলার ২ এবং জেমসন ৪৮ রানে ২ উইকেট পান।

নটিংহ্যাম্পসায়ার—২৪ (১ উইকেট) ; বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায়। খেলা ড্র।

প্রথম টেষ্ট ম্যাচ ঃ

২২শে জুন লর্ডস মাঠে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের তিনদিনের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হ'ল। ভারতীয় দলের ক্যাপটেন পতৌদির নবাব টসে জয়লাভ ক'রে দলের প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ নিলেন। পরিষ্কার আবহাওয়া এবং খেলার উপযোগী মাঠ। ভারতীয় দলের ওপনিং ব্যাটসম্যান মার্চ্চেণ্ট এবং মানকাদ ব্যাট করতে নামলেন। দর্শকসংখ্যা খেলার সূচনায় ২৫,০০০। বহু দর্শক যানবাহনের ভীড়ের জন্য টিকিট কিনেও যথাসময়ে মাঠে পৌছতে পারেনি। মার্চ্চেণ্ট প্রথম খেলে বাউলের প্রথম বল মেরে দু' রান তুললেন। আধ ঘণ্টা খেলার পর দলের ১৪ রান উঠলো। দলের ১৫ রানে মার্চ্চেণ্ট নিজস্ব ১২ রান ক'রে বেডসারের বলে ক্যাচ তুলে গিবের হাতে ধরা দিলেন। অমরনাথ তাঁর স্থানে এসে বেডসারের শেষ বলটা আটকালেন। কিন্তু বেডসারের পরবর্ত্তী ওভারের বলে এল-বি-ডবলউ হলেন, কোন রান না করেই। অমরনাথ দর্শকদের নিরাশ করলেন। বেডসারের বলের সুন্দর 'লেংথ' এবং 'ইন-সুইঙ্গারস' ভারতীয় দলের খেলার সূচনাতেই এরকম বিপর্য্যয়ের কারণ ঘটালো ; টসে জয়লাভের সুযোগ পেয়েও ভারতীয় দলের বিশেষ সুবিধা হ'ল না। লাঞ্চের পর খেলার বেশ ভাঙ্গন ধরলো। নবাব পতৌদিকে ইংলণ্ডের

নতুন টেষ্ট খেলোয়াড় এগিন বেডসারের বলে চমৎকারভাবে ধরে ফেললেন এবং এক রান পরে গুলমহম্মদ রাইটের বলে বোল্ড হ'লেন। দলের এই ভাঙ্গনের মুখে হাফিজ এসে আর এস মোদীর জুটী হলেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গেই খেলা আরম্ভ করলেন। হাফিজকে তাঁর ২০ রানে বেডসার একবার আউট করবার সুযোগ নষ্ট করলেন। হাফিজ মোদীর থেকে খুব তাড়াতাড়ি রান তুলতে লাগলেন। ৫০ মিনিটে নিজের ৪৩ রান তুলে বাউসের বলে দলের ১৪৭ রানে বোল্ড হলেন। সপ্তম উইকেটের জুটীতে ৫০ মিনিটে ৫৭ রান উঠে। এর পর দলের ১৫৭ রানের মাথায় ৮ম এবং ৯ম উইকেট পড়ে গেল। ২৩০ মিনিট খেলে ২০০ রানে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল। আর এস মোদী নট আউট ৫৭ রান করলেন, তাঁর রানই দলের সর্ব্বোচ্চ হ'ল। বেডসার ২৯·১ ওভার বলে ১১টা মেডেন নিয়ে এবং ৪৯ রান দিয়ে ৭টা উইকেট পেলেন। বেডসার এই প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেললেন। ভারতীয় দলের ব্যাটিং খুবই 'স্লো' হয়েছে।

চা পানের পর ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস আরম্ভ করলো। সূচনা খুব ভাল হ'ল না। অমরনাথ প্রথম বোলিং আরম্ভ করলেন; তাঁর সঙ্গে জুটী হলেন হাজারী। ইংলণ্ডের ১৬ রানের মাথায় পর পর বলে অমরনাথ হাটন এবং কম্পটনকে আউট করলেন। ঠিক এর পরের বলে হ্যামণ্ড প্রায় রান-আউট থেকে অব্যাহতি পেয়ে অমরনাথের hat-trick নষ্ট করলেন। ইংলণ্ডের ৭০ রানের মধ্যে অমরনাথ আরও ২টো উইকেট পেলেন। ইংলণ্ডের নাম-করা ব্যাটসম্যান হ্যামণ্ড, হাটন এবং ডেনিস কম্পটনকে যথাক্রমে ৩৩,৭ এবং শূন্য রানে আউট করে বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখালেন। ব্যাটিংয়ে তিনি নিরাশ করলেও তাঁর বোলিং মুখ রক্ষা করলো। ২০ ওভার বলে ১৩টা মেডেন নিয়ে এবং ৪২ রান দিয়ে তিনি ঐদিন মোট ৪টে উইকেট পান। দিনের শেষে ৪ উইকেটে ইংলণ্ডের ১৩৫ রান উঠলো। হার্ডষ্টাফ এবং গিব যথাক্রমে ৪২ এবং ২৩ রান ক'রে নট আউট রইলেন। সরকারীভাবে জানা গেল ২৯,০০০ দর্শক প্রথম দিনের খেলায় উপস্থিত ছিল।

দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ করলেন ইংলণ্ডের নট আউট ব্যাটসম্যান হার্ডষ্টাফ এবং গিব। দর্শক উপস্থিত হয়েছে ২০,০০০ হাজার। অমরনাথ নতুন বল নিয়ে নার্শারীর শেষ দিক থেকে বল দিতে আরম্ভ করলেন। অমরনাথের দ্বিতীয় বলে হার্ডষ্টাফ এক রান করলেন। গিব ঐ ওভারের সব বল ঠেকিয়ে গেলেন। হাজারী বল দিতে লাগলেন প্যাভিলিয়নের দিক থেকে। ইংলণ্ডের রান খুব ধীরে উঠতে লাগলো। ১৪৭ মিনিট ইনিংস খেলার পর হার্ডষ্টাফের ৫০ রান পূর্ণ হ'ল। হার্ডষ্টাফের এই নিয়ে পর পর চারটে 'হাফ-সেঞ্চুরী'। ৮৫ মিনিট ব্যাট ক'রে হার্ডষ্টাফ শত রান পূর্ণ করলেন। টেষ্ট খেলায় তাঁর এই চতুর্থ সেঞ্চুরী এবং ভারতীয় দলের বিপক্ষে প্রথম। ১৯৩৮—৩৯ সালের সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে খেলায় তিনি ৩টে সেঞ্চুরী করেন। গিব বেশ সুবিধা করতে পারছিলেন না, ৪৫ মিনিটে ১৩ রান উঠলো। ভারতীয় দলের ফিল্ডিং খুব ভাল হচ্ছিল। বোলিং এত ভাল হচ্ছিল যে, দশ মিনিটে মাত্র একটা ক'রে রান উঠছিল। ইংলণ্ডের ২০২ রানে গিব মানকাদের বলে কাট মেরে স্লিপে প্রায় বুক সমান ক্যাচ তুলে ফেলেন। হাজারী এ সুযোগ নষ্ট করেন। ইংলণ্ডের ২৫২ রানে গিব ৬০ রান ক'রে মানকাদের বলে স্লিপে হাজারীর হাতে ধরা পড়ে আউট হ'লেন। হার্ডষ্টাফ এবং গিবের জুটীতে ১৭৫ মিনিটে ১৪২ রান উঠে। গিব ৪টে বাউণ্ডারী করেন। লাঞ্চের সময় ইংলণ্ড ৮৬ রানে এগিয়ে গেল। এদিকে ৬টা উইকেট পড়ে গেছে। হার্ডষ্টাফ নট আউট ১২৮। লাঞ্চের সময় গেট বন্ধ হয়ে যায়। মোট ২৬,৮০০ টাকার বিক্রী হয়। লাঞ্চের পর জোর বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিল। "ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস নিউসপেপার্স" পুরস্কার ঘোষণা করলো—দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের যাঁরা সেঞ্চুরী করবেন তাঁরা প্রত্যেকে ৫০ গিনি ক'রে পাবেন; এছাড়া বোলিং এ্যানালিসিসে যিনি শ্রেষ্ঠ হবেন তিনি এবং তাঁর পরবর্ত্তী বোলারও ২৫ গিনি করে পাবেন। লাঞ্চের পর ৫০ মিনিট খেলার পর ৩৭৭ রানে ম্যেলসের উইকেট ২৫ রানে পড়লো। বেলা ৪টার সময় মোট ৩৮৫ মিনিট খেলার পর ৪২৮ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল। হার্ডষ্টাফ ২০৫ রান করে নট আউট রইলেন। ইনিংসের পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে হ'লে ভারতীয় দলের তখন ২২৮ রান প্রয়োজন।

মার্চেণ্ট এবং মানকাদ ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের

খেলা আরম্ভ করলেন এবং প্রথম থেকেই দৃঢ়তার সঙ্গে নির্ভীকভাবে খেলতে লাগলেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতীয় দলের ৪ উইকেটে ১৬২ রান উঠলো। মার্চেন্ট ২৭, মানকাদ ৬৩, মোদী ২১ ক'রে আউট হলেন। হাজারী এবং পতৌদি যথাক্রমে ২৩ এবং ১৬ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

তৃতীয় দিনের খেলায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা পুনরায় অকৃতকার্য হ'লেন। পতৌদি ২২, অমরনাথ ৫০ ক'রে আউট হলেন। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৩৪ মিনিট খেলার পর ২৭৫ রানে শেষ হ'ল। বেডসার ৩২'১ ওভার বল দিয়ে ৫টে মেডেন নিয়ে এবং ৯৬ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পেলেন। স্মাইলস পেলেন ৩টে ১৫ ওভার বলে ২টো মেডেন নিয়ে ৪৬ রান দিয়ে। রাইট ৬৮ রানে পেলেন ২টো উইকেট।

ইংলণ্ড লাঞ্চের ৩৫ মিনিট আগে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। জয়লাভের জন্য ইংলণ্ডের আর মাত্র ৬৮ রান প্রয়োজন। লাঞ্চের পূর্বেই কোন উইকেট না হারিয়ে এ রান তুলে ফেললো হাটন এবং ওয়াসব্রুক যথাক্রমে ২২ এবং ২৪ রান ক'রে। ২ রান অতিরিক্ত উঠলো। ইংলণ্ড ১০ উইকেটে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে পরাজিত করলো।

ভারতীয় দল—ভি মার্চেন্ট, ভি মানকাদ, এস অমরনাথ, ভি এস হাজারী, আর এস মোদী, নবাব পতৌদি, (ক্যাপটেন), গুল-মহম্মদ, আবদুল হাফিজ, সি সি এস নাইডু, এস জে সিঙ্কে, ডি ডি হিন্দেলকার।

ইংলণ্ড—ডবলউ হামণ্ড (গ্লুসেষ্টার, ক্যাপটেন), সি এ গিব (ইয়র্কসায়ার)—উইকেট কিপার, লেন হাটন (ঐ), বিল বাউন্স (ঐ), টম স্মাইলস (ঐ), জো হার্ডষ্টাফ (নটিংহাম), ডেনিস কম্পটন (মিডলসেক্স), চার্লি ওয়াসব্রুক (লাঙ্কাসায়ার), জে টি এ্যাকিন (ঐ), ডগলাস রাইট (কেণ্ট), এলেক্ বেডসার (সারে)।

জুন ২৩, ২৭, ২৮।

ভারতীয় দল—৩২৮ (মার্চেন্ট ১১০, মোদী ৬৩, অমরনাথ ৫২, ক্লার্ক ৬৩ রানে ৩ এবং রবিনসন ২৭ রানে ২ উইঃ) ও ১৭১ (১ উইঃ মার্চেন্ট নট আউট ৭২ এবং অমরনাথ নট আউট ৮২ রান।

মর্থ হাম্পটনসায়ার—৩৬২ (ক্রকস ৮২, টিমস ১০৭, ব্যারোন ৬৪ ; মানকাদ ২৯ রানে ৫ এবং সিঙ্কে ৬৮ রানে ৩ উইকেট)। খেলা ড্র।

জুলাই ১, ২।

ল্যাঙ্কাসায়ার—১৪০ (সি ওয়াস ব্রুক ৫৮, ব্যানার্জী ৩২ রানে ৪ ও অমরনাথ ৪৮ রানে ৩ উইঃ) ও ১৮৫ (এ্যাকিন ৫৫, মানকাদ ১৭ রানে ৩ উইকেট)।

ভারতীয় দল—১২৬ (পতৌদি ৩১, সি এস নাইডু ২৯ ; পোলার্ড ৪৯ রানে ৭ উইঃ) ও ২০০ (২ উইঃ মার্চেন্ট নট আউট ৯৩ এবং পতৌদি নট আউট ৮০)।

ভারতীয় দল ৮ উইকেটে জয়ী হয়েছে।

উইম্বলডন টেনিস ঃ

বিখ্যাত উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলসের ফাইনালে ফ্রান্সের yvon petra ৬-২, ৬-৪, ৭-৯, ৫-৭ ও ৬-৪ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার জিওফারী ব্রাউন্‌কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়েছেন। এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে এই তাঁর প্রথম জয়। yvon petra লম্বায় ৬ ফিট ৭ ইঞ্চি এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাউনের বয়সের তুলনায় ৯ বছরের বড়। খেলার শেষে বলেছেন "Brown gave me the hardest game of my life and he is a wonderful player and his two-handed fore-hand is very powerful…" petra স্বাসক্লাব চ্যাম্পিয়ানশীপের জন্য শীঘ্রই ফ্রান্সে ফিরে যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে ফরেষ্ট হিলে ইউনাইটেড ষ্টেটস চ্যাম্পিয়ানশীপে যোগদানের জন্য যাত্রা করবেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস পাউলিন বেট্‌জ (ইউনাইটেড ষ্টেটস) ৬-২, ৬-৪ গেমে মিস লুইস ব্রাউকে (ইউনাইটেড ষ্টেটস) হারিয়েছেন।

পুরুষদের ডবলসে টম্ ব্রাউন এবং জ্যাক ক্রামার (ইউনাইটেড ষ্টেটস) ৬-৪, ৬-৪, ৬-২ গেমে জিওফ ব্রাউন এবং ডেনি পেলসকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে টম ব্রাউন ও মিস ব্রাউ (ইউঃ) ৬-৪, ৬-৪ গেমে জিওফ ব্রাউন এবং মিস ডোরোথি বুণ্ডিকে (ইউঃ) পরাজিত করেছেন।

খেলার মাঠ না যুদ্ধক্ষেত্র ?

ফুটবল খেলায় জয়লাভের জন্য দু'পক্ষে জোর প্রতিযোগিতা খুবই স্বাভাবিক এবং ফলে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে উদ্দীপনা এবং উত্তেজনা উপেক্ষণীয়। এ রকম প্রতিযোগিতামূলক খেলা মোটেই নিন্দনীয় নয়, বরং এ রকম খেলাই খেলোয়াড়দের খেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করে এবং দর্শকরা খরচা করে খেলা দেখেও তৃপ্তি পায়। কিন্তু খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে খেলোয়াড়রা যখন যে কারণেই হউক খেলার আইন উপেক্ষা ক'রে সংযম হারিয়ে ফেলে তখন খেলা আর খেলার পর্য্যায়ে থাকে না। এ অবস্থায় যে খেলা যুদ্ধে পরিণত হয় তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। সম্প্রতি ক'লকাতার মাঠে প্রথম বিভাগের লীগের কয়েকটি খেলায় তার পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথম সূত্রপাত হয় ভবানীপুর বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের প্রথম খেলায়। সে খেলায় ভবানীপুর ১-০ গোলে জয়ী হয়। খেলার শেষে ভবানীপুর দলের খেলোয়াড়রা উচ্ছৃঙ্খল দর্শক কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তারা ভবানীপুর ক্লাব টেন্ট পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে মারপিট করে এবং তাঁবু নষ্ট করে; ইট পাটকেল, সোডার বোতল নিক্ষেপের ফলে বহু নিরীহ পথচারী এবং মাঠের দর্শকেরা আহত হয়। প্রকাশ, পুলিশ এই উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে আয়ত্তে আনবার কোন বিশেষ উৎসাহ দেখায় নি। এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে ঐ দুই দলেরই রিটার্ণ ম্যাচে। ভবানীপুর এ খেলায় ১ গোলে জয়লাভ করলো বটে কিন্তু তাদের তাঁবু লুটো হ'ল, খেলোয়াড়রা আহত হ'ল। এরকম ঘটনার অবসান এইখানেই হ'ল না।

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের রিটার্ণ খেলায় উভয় দলের খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের মধ্যে আশা নিরাশার কি উঠানামা—ঠিক এই সন্ধিক্ষণে ইস্টবেঙ্গল দলের নাছার বীভৎসভাবে মোহনবাগান ক্লাবের গোলকিপার ডি সেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দর্শকদের মধ্যে প্রথম উত্তেজনা সৃষ্টি করলেন; তার পর রাখাল মজুমদার বল ছেড়ে মোহনবাগানের একজনকে লাথি মেরে খেলার মাঠের আর একদফা আবহাওয়া নষ্ট করলেন। রেফারী সতর্ক ক'রে ফাউল দিলেন। কিন্তু এইখানেই এর শেষ হ'ল না। দর্শকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে গেল খেলার ঠিক পর। মোহনবাগান ক্লাবের তাঁবু ক্ষতিগ্রস্ত হল, সভ্যরা আহত হ'লেন। মোহনবাগান ক্লাব আই এফ এ অফিসে জানিয়েছেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তাঁবুর দীমানা থেকে ইট এবং সোডার বোতল এসে মোহনবাগান ক্লাবের তাঁবু নষ্ট করেছে, সভ্য এবং দলের সমর্থকদের আহত করেছে। এই ব্যাপারে নাকি অপর পক্ষের কোন কোন সভ্য জড়িত আছেন এবং তাঁদেরই উৎসাহে একদল উচ্ছৃঙ্খল দর্শক এ কাজে সহায়তা করেছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেছেন। এই ঘটনা সম্পর্কে আই এফ এ যদি যথাযথ কঠোর ব্যবস্থা না করেন তাহলে মোহনবাগান ক্লাব আই এফ এ কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত ফুটবল টুর্ণামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করবেন স্থির করেছেন।

যতদূর জানা যায়, মোহনবাগান ক্লাব তার দীর্ঘ দিনের জীবনে কখনো কোন দলের বিপক্ষে এমন কি খেলায় হেরে গিয়ে আইনের সুবিধা পেয়েও দলের স্বার্থের জন্য 'protest' ক'রে নি। এই তাদের প্রথম। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ইউরোপীয় দল এবং রেফারীদের মধ্যে যখন ভারতীয় বিদ্বেষ প্রকট হয়ে উঠে তখন জাতির সম্মানার্থে মোহনবাগান ক্লাব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।

আই-এফ-এ বর্তমানে ভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এখন দেখা যাক্ আই-এফ-এ এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। খেলার মাঠে খেলা পরিচালনা করা ছাড়া মাঠের দর্শকদের নিরাপত্তার ভার তাদের উপরই, কেবল পুলিশের উপর চাপিয়ে দিয়ে পরিচালকমণ্ডলী নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে অযোগ্যতার পরিচয় দেবেন।

* * * *

আই-এফ-এর পরিচালনার মধ্যেও বহু ত্রুটি আছে। সে সব ত্রুটি সংশোধনের কোন রকম লক্ষণ নেই। সব থেকে বড় ত্রুটি আই-এফ-এর সুপারিশে যে সব রেফারী খেলা পরিচালনা করেন তাঁদের বেশীর ভাগই খেলার মাঠে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। কি রকম কষ্ট স্বীকার ক'রে এবং সমস্ত সম্মান বিসর্জন দিয়ে খেলার মাঠের টিকিট সংগ্রহ ক'রে জনসাধারণকে মাঠে যেতে হয় তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

আই-এফ-এর সভ্যবৃন্দের নেই। থাকলে জনসাধারণের প্রতি তাঁরা এতখানি কঠোর হ'তেন না।

যুগের অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে; আই-এফ-এর পরিচালকমণ্ডলী যদি তাঁদের খুশিমত বিচার বুদ্ধি নিয়ে জনসাধারণের অভাব অভিযোগ উপেক্ষা ক'রে জেদ বজায় রাখেন তাহলে খুবই ভুল করবেন।

• • • •

দায়িত্বশীল এবং কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমর্থন করবেন এবং আমরাও করি; কিন্তু প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ যেমন কেউ সমর্থন করে না তেমনি আমরাও করি না।

এই প্রসঙ্গে খেলার মাঠে যে সব অপ্রিয় ঘটনার উল্লেখ করা হ'ল তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়—পরাজয়ের ফলে একদল সমর্থকদের বিক্ষোভ অন্যদিকে বিজয়গর্ব্বে আর একদল সমর্থকদের উন্মত্ততা বলা চলে। এই দু'য়ের ফলাফল কতখানি জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর এবং পীড়াদায়ক তা ঘটনা থেকেই উপলব্ধি করা যায়। জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য এই সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার কঠোর ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া উচিত। (২।৭।৪৬)

সাহিত্য-সংবাদ

সদ্য-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "এই পৃথিবী"—৩৲
শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু প্রণীত "বাঙ্গালা সাহিত্য" (১ম খণ্ড)—৭৲
শ্রীনাবুক প্রণীত উপন্যাস "পৃথিবীর মানুষ নয়" (১ম-২য় খণ্ড)—১।০
শ্রীজনরঞ্জন রায়-সম্পাদিত "দুঃসময়"—৷০
গোপাল ভৌমিক প্রণীত "মেহেরী"—২৲
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস"—৩৲
বনশ্রী-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "পিনাকীর পরাজয়"—২৲
সতীকুমার নাগ প্রণীত "ছোটদের নেহেরুজী"—১।০
শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী-সম্পাদিত "বাংলা বর্ষলিপি" (১৩৫৩)—১।০
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত "সপ্ত সমুদ্রের রণাঙ্গনে"—২।০
রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত "জন্মভূমি" (দশহরা সংখ্যা)—১৲
সুবোধ বসু প্রণীত উপন্যাস "নবচেরী"—২।০
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত রহস্যোপন্যাস "পুতলীর ধাঁধা"—১৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এবার আশ্বিন মাসের মধ্য ভাগেই শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজা। সেজন্য মহালয়ার পূর্ব্বেই সকল গ্রাহকদের নিকট কাগজ পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে আমরা আশ্বিনের প্রথমেই কার্ত্তিক সংখ্যা, ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আশ্বিন সংখ্যা এবং শ্রাবণের তৃতীয় সপ্তাহে ভাদ্রের সংখ্যা প্রকাশ করিব। বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক যথা সময়ে বিজ্ঞাপনের কপি প্রেরণের ব্যবস্থা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

CENTRAL LIBRARY CALCUTTA UNIVERSITY

কার্য্যাধ্যক্ষ, ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভাদ্র—১৩৫৩

প্রথম খণ্ড | চতুস্ত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

উমার যৌবন

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

এলো যৌবন প্রাবণের মত শৈলদুহিতার অঙ্গতটে,
শিরিষের রূপবাহুতা ঘটে।
অরুণ কিরণে বিকশিত আননিলয়
হ'লো তনু তার মোহনতম,
সুকুমার চতুরস্রশোভি
তুলী-দিয়া-আঁকা যেন বা ছবি।
নীল গরিমায় ভরিয়া উঠিল যেখানে যা ছিল অপূর্ণতা,
মন পল্লবে পুলকিতা যেন শৈললতা।

এলো যৌবন চরণে উমার নখর আগে,
পায় ভক্তিতে রঞ্জিত করি রক্ত-রাগে,
অরুণ রথের বরুণের ছাতি উজলিয়া—
জোছনুলি ধীরে তুলি তুলি গিরিসুতা যবে যায় চলিয়া
হাঁটিতে মাটিতে ফুলারবিন্দ ফুটায়ে যায়,
ফুটে যা শাখায় তা-ই পায় পায় সারা আঙিনায় লুটায়ে যায়।

এলো যৌবন উমায় চলনে ভক্ত করিয়া মৃত্তিকায়,
জাগে নব লীলাভঙ্গী তায়।
যৌবন-ভারে গিরিজা ধরাল-গমনে চলে,
এমন চলন শিখিল সে কোথা? কবিরা বলে,—
ঐ যে নূপুর ঘুমুর ঘুমুর যায়রে যায়,
ভুবন-মুহিতা কমল পায়
লীলাঙ্কিত সে পদক্ষেপের মঞ্জীর ধ্বনি শিখিতে গীতি,
লভিবার তরে প্রতি-শিখায় পুরস্কৃতি
রাজহংসীরা শিখাল তারে
চলন-ভঙ্গী অলস গমনে শ্রোণির ভারে।

এল যৌবন তেজাগি চরণ উৎপলে
রসায় নব কান্তি আনে।
কদলীযুগল চারু বর্তুল অনতিস্থূল
অনতিকীর্ণ ক্রমশঃ ক্ষীণ,

শ্রীপুষ্টি তার কি আর ক'ব ?
রূপ-বিধাতার সৃষ্টি সব ;
করিতে তাদের সুষমান্বিত
বিধির বিধির ভাণ্ডার হ'লো নিঃশেষিত,
বাকি অঙ্গের উপমা-কার্য্য করিতে শেষ
উপাদান তবে নিঃস্ব বিধাতা সহিল কত না যাতনা-ক্লেশ।

এলো যৌবন উমার উরস তরঙ্গিতে,
দিল যে কান্তি নাহি তা ভরতে নাহি তা' কদলী তরঙ্গিতে ·
সুষমাটীনের উরস উপমা দিবার ছলে
হয় করভোরু নয় মনোরু করিয়া বলে ;
চির কর্কশ করি-করভের কি গৌরব ?
অতি সুকুমার তরুণী উমার উরস উপমা অসম্ভব
তাহার সঙ্গে। কদলী তরুরও উপমানে আছে অযোগ্যতা,
অতিশৈত্যতা দোষে সে দুই, তুলিও না আর তাহার কথা।

এলো যৌবন উমার মেখলা-ধারণ-ধামে
মণ্ডিত যাহা রবিচ কবিচ কাঞ্চীদামে—
সেই শ্রোণিদাম কত অভিরাম বুঝানো যায়,
শুধু এই বলি বুঝানো যায়,—
তিন ভুবনের অন্য নারীর অলঙ্কার
চন্দ্রশেখর অঙ্কে যা ল'য়ে প্রতিষ্ঠিত
চির-সৌরবে লভিবে ঠাঁই,
তার কান্তির বর্ণনা করি, সাধ্য নাই।

এলো যৌবন উমার অঙ্গে সুষমার আর নাই যে সীমা
আনে কটিতটে নব তনিমা।
কটিতট তার বেদীমধ্যের মতন ক্ষীণ,
উর্দ্ধে তাহার হ'লো আসীন
মকরকেতুর আরোহণে কিম্ব সোপানের
সুবলিত চারু ললিত ত্রিবলি রম্যতর।

এলো যৌবন উমার তনুর উরঃস্থানে
অসিতচুচুক স্ফীত পাণ্ডুর উরোজ-যুগলে ধরিয়া আনে।
ব্যবধানে আজ যেন অবকাশ কিছু না রাজে,
মৃণাল-তন্তু তাও যে পশিবে তাদের মাঝে।
এলো যৌবন উমার বাহুতে লভার করি বর্ত্তুলতা,
বলি এইবার তাহারি কথা।
শিরীষের সাথে উপমা তাহার কভু না মানি,
সে ফুলদলের পেলবতা জানি,
শিরীষ-কুসুম-সম সুকোমল বাহুযুগলের
সিঞ্চিতে সুরসে হারাল একদা নিজ জীবন।
উমা-বাহুপাশে বাঁধিল যে স্নেহে কণ্ঠখানি,
তার বন্ধনে বন্দী হইল শিবাক-পাণি।
তাহার সাথে
শিরীষদলের উপমা চলে কি বর্ণনাতে ?

এলো যৌবন উমার কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত,
মুক্তাফলের মালিকা তাহাতে বিলম্বিত,
মুক্তাফলের বাড়িল কি শোভা, কণ্ঠের শোভা বাড়িল তায়,
দুয়ের মিলনে বুঝা না যায়।
একের হয়েছে ভূষণ আর
মুক্তার ভূষা উমার কণ্ঠ, কণ্ঠের ভূষা মুক্তাহার।

এলো যৌবন উমার মুখে
ইন্দু কমলে এক সাথে রমা বিরাজ করেন আজিকে সুখে।
নিশীথে চন্দ্রে বিহার করিয়া যাহাতেন তিনি কমলালয়,
দিবসে চন্দ্রে যাহাতেন তিনি কমলে করিয়া সমাশ্রয়।
পেয়ে উমা মুখ শ্রীসমতায়
রহিল না আজি সে ক্ষোভ আর।

এলো যৌবন শৈলসুতার দন্তাঙ্কুরে
হাস্য যাহায় আজ' পরে।
লোহিত কুসুম কিসলয় যদি হ'তো মিহিত,
হ'ত যদি মোতি প্রবালের পরে সমারোপিত,
উপমা চলিতে পারিত তাতে
উমার অরুণ অধর-পর শুভ্র মধুর হাসির সাথে।

এলো যৌবন উমার মধুর কণ্ঠরবে।
অমৃতস্রবী কণ্ঠে কথা সে কহিত কবে
কেমনে বুঝাব সে স্বরের সুর মধুর কত ?
কোকিলের স্বরও পীড়িত কর্ণ বেসুরো বেতারা বীণার মত।

এলো যৌবন উমার লোচনে দৃষ্টির তার চপল করি'
মায়ুকলন নীলোৎপলের উপমানেরে সফল করি',
হরিণীবিহারিণী হরিণীর কাছে উমা কি পাইল দৃষ্টি তার ?
অথবা হরিণী বিরিঞ্চালয়
দৃষ্টি-ভঙ্গী করে হরণ,
এ বিধা কে করে নিরাকরণ ?

এল যৌবন উমার ভ্রূযুগে নীলাঞ্চল থরিথায়,
যেন অঞ্জন-শলাকাঙ্কিত পুলকাঙ্কিত অনঙ্গ তায়।
যেরি যারা তার লজ্জা করে
আপন ধনুর গুণের গর্ব্ব আর না করে।

এলো যৌবন শৈলসুতার মৌলি-দেশে,
ঘন কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশে।
চমর-বধূরা প্রথম-কৃষ্ণ পুচ্ছ-লোমের গর্ব করে,
লালন করে এ সম্ভারে বহু যত্ন করে,
পশুদের যদি লজ্জা থাকিত, তাহারা তবে,
উমার কেশের গুচ্ছ হেরিয়া সগৌরবে
মত্ত হতো না পুচ্ছ-ভারে,
পুচ্ছ বলিয়া গণিত তারে।

এলো যৌবন রূপ-বিধাতার চরম বাসনা পূর্ণ করি'
উমার সকল অঙ্গ ভরি',
বিশ্বের যত উপকরণ রূপ-উপাদান লুটায়ে পেয়ে
যেখানে যা সাজে সেখানেই তার সন্নিবেশে,
একটি পাত্রে সবগুলি বিধি ঢেলার তরে
উমা-তনুখানি সৃজন করে।
সব উপমান মিলিয়াছে যেথা কোথায় মিলিবে তার উপমা ?
ভিন্ন-ভিন্ন রূপ-লাবণ্যে সে যে ত্রিলোভমা।

(কুমার-সম্ভব)

কর্মযোগ—কর্মফল

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

কর্মফল কি ? কর্মফল বলতে ঠিক কি বোঝায় ?

কর্মের প্রেরণা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, যত্ন, উৎসাহ, ধৃতি, দক্ষতা—এর কোনোটিকেই যেন কর্মফল ব'লে না ভাবি, বিশেষ ক'রে প্রেরণা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যকে—কেননা এরা কর্মেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কর্মের পরিণতি বা ফল নয়। এদের পরিত্যাগ করলে কর্মকেই তো পরিত্যাগ করা হল। প্রেরণা-বিহীন, লক্ষ্যশূন্য, নিরুৎসাহ, অলস কাজ আমার কাম্য নয় কি ? সে তো কাজ নয়, ফাঁকি। কাজে ফাঁকি দিলে নিজেকেই ফাঁকিতে পড়তে হয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই আমাদেরি দেশে। গীতা বলেছেন কর্মফলে উদাসীন, নিরাসক্ত হও। আমরা উল্টা বুঝে কর্মের লক্ষ্য সম্বন্ধে, উদ্দেশ্যে, উৎসাহে, ধৃতিতে, যত্নে উদাসীন হ'য়ে স্বাধীনতা হারিয়েছি, মান সম্ভ্রম প্রভাব প্রতিপত্তি সবই আমাদের গেছে। বিশ্বের জাতি সঙ্ঘে জানী হয়েও আমরা ভিক্ষুক। অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী হয়েও আমরা পরের কাছে দাসত্ব করছি।

সঙ্গ, আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সমস্ত শব্দই কর্মফল প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে গীতায়—একথা যেন না ভুলে যাই। বনস্পতি যেমন ফল ফলাবার জন্যে অতন্দ্রিতে কাজ ক'রে চলেছে, তার ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, আলস্য উদাসীন নেই, মানুষও তেম্‌নি 'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ' হ'য়ে কাজ করুক। তরুর মতোই সমস্ত প্রয়াসকে সফল করাই তার ব্রত হোক্। আবার ঐ তরুর মতোই সমস্ত ফলটিকে নিঃস্বার্থে দান করাই তার প্রার্থনা হোক্। "সর্বাঙ্গ পরিত্যাগী"—গীতার-ব্যবহৃত এই কথাটির আসল অর্থটি ভুললে চলবে না। ইহলোকে এবং পরলোকে ফলাকাঙ্ক্ষা ক'রে যে কর্মোদ্যম, তাকেই বলে "আরম্ভ", কাজ সুরু করাকে গীতার ভাষায় আরম্ভ বলে না।

এবার ধরা যাক্ সিদ্ধি-অসিদ্ধি, জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দার কথা। উদ্যম, লক্ষ্য, প্রেরণা, ধৃতি, দক্ষতা, উৎসাহ প্রভৃতি যেমন কর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এগুলি সে রকম নয়। আবার এরা কর্মের সাক্ষাৎ "পরিণতি" বা "ফল" বলতে যা বোঝায় ঠিক তাও নয়। তবে কর্মফলের সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে তা সবাই জানে। তরুকে ফল সুদ্ধ করতে দেখলে বলি—তার উদ্যম সিদ্ধ হয়েছে। নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে তুমি যখন দরিদ্রের জন্যে একটি চিকিৎসালয় গড়ে তুললে, তখন বলি তোমার চেষ্টা ও কর্ম সফলযুক্ত হয়েছে, তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ, তুমি যা করতে চেয়েছিলে তা তুমি লাভ করেছ, তুমি স্তুতির যোগ্য। সিদ্ধি-অসিদ্ধি, জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ প্রভৃতি বিষয়ে ত্যাগের নির্দেশ গীতা দেন নি, কেননা এগুলি কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও আসলে কর্মফল নয়, তাই গীতা বলেছেন এ সবে সমান থেকো। "তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী", "সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ", "সিদ্ধ্য সিদ্ধ্যঃ সমোভূত্বা", "সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ", "বিহায় সর্বসঙ্কল্পান্ যঃ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ", "সমঃ দুঃখ সুখঃ ধীরঃ", "তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরঃ"—প্রভৃতি নানা শ্লোকাংশ গীতা থেকে উদ্ধৃত ক'রে একথা দেখানো যেতে পারে। এর মানে অতি সহজ। কাজের ফল যদি আশানুরূপ না হয়, সিদ্ধি যদি না আসে, তাই ব'লে ভেঙে পড়লে চলবে না। আবার কাজের ফলটি খুব ভাল হয়েছে ব'লে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পাড়া মাথায় ক'রে বেড়ানোও নয়। দুঃখ সুখে, জয়-পরাজয়ে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে কি রকম থাকবে ?—সমঃ ধীরঃ, স্থবঃ। আপনাতে আপনি সংযত হ'য়ে, ধীর, মৌনী থাকবে। নিজেকে গুটিয়ে পড়তে, গড়িয়ে পড়তে, ভেঙে পড়তে দেবে না। সিদ্ধি-অসিদ্ধি, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতির সঙ্গে সুখ দুঃখ নাড়ীর যোগে বাঁধা। সুখ দুঃখকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, সুখ দুঃখে সমান থাকবে, এই হল গীতার নির্দেশ। অনেক ধর্মমত আছে—যাতে বলে ধর্মানুমোদিত এই এই কাজ করলে তুমি পাপ থেকে বাঁচবে, দুঃখকে এড়িয়ে যেতে সুখকে লাভ করবে। কিন্তু গীতা এমন কোনো দুঃখ এড়াবার 'শর্টকাটের' নির্দেশ দেন নি। বাস্তবিক দুঃখ জিনিষটা

তো এড়িয়ে যাবার নয়, যার দুঃখ নেই, এ জগতে সেই যে সব চেয়ে বড়ো দুঃখী, সব চেয়ে বড়ো দুর্ভাগা। আমাদের মনুষ্যত্ব দুঃখের দ্বারাই দুর্গম, সাধনা, তপস্যা, অভ্যাস, যজ্ঞ—সমস্তই দুঃখের দ্বারা দুর্গম। জগতে যা-কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বরের, কিন্তু তাঁর এই এক বিধান আছে, মানুষ আপন দুঃখের দ্বারাই তাঁর জিনিসকে নিজের জিনিস করতে পারবে। যাং ঈশ্বরও আমাদের বহু দুঃখের দ্বারা আমাদের—তিনি আমাদের দুঃখ রাতের রাজা। ওঁকে আমরা কী দিতে পারি? পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং—সে সব তো ওঁরি জিনিস। ওঁকে দিতে পারি শুধু আমাদের দুঃখে-ভরা চোখের জল, যা একমাত্র আমাদেরি নিজস্ব। আমাদের পিতৃপ্রপিতামহগণ দুঃখকে কোনো দিন এড়িয়ে যেতে বলেন নি, বলেছেন বক্ষকে বিস্তারিত করো, চিত্তকে, বৃহৎকে বরণ করো, পড়ুক সেখানে দুঃখের বজ্র—হে বীর, তুমি বিচলিত হয়ো না—বক্ষের বিস্তার দ্বারা দুঃখের গুরুত্বকে বিদীর্ণ করতে।

শ্লোকে শ্লোকে, অধ্যায়ে অধ্যায়ে গীতা বারংবার বলেছেন—কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করতে হবে, কর্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করতে হবে। আর কোনো সাধনা, আর কোনো তপস্যা যদি সাঙ্গ করতে পারো, গীতা বলেছেন, যদি তোমার হৃদয়কে, বুদ্ধিকে ঈশ্বরে নিবিষ্ট করতে অসমর্থও হও, যদি ঈশ্বরের প্রীতির জন্যে সমস্ত কাজ করতে সক্ষম নাও হও, তবু

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্। ১২।১১

যদি এ সব করতে নাও পারো, তাহলে আমাতে (ঈশ্বরে) যোগ আশ্রয় ক'রে (ঈশ্বরে কর্মসমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় ক'রে) সংযত চিত্তে সমস্ত কর্মফল ত্যাগ করো।

সুতরাং কর্মযোগের সব থেকে বড়ো কথা হচ্ছে সর্বকর্মফল ত্যাগ করো। কর্মমাত্রেই বন্ধন রচনা করে। যুক্তিবাদী তবে কি সর্বকর্ম ত্যাগ করবেন? গীতা বলেছেন সেটা অসম্ভব। বেঁচে থাকতে গেলে কিছু না কিছু কাজ করতেই হবে। অতএব কর্মফল ত্যাগ করো, কর্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করো, তাহলে কর্ম আর তোমায় বাঁধবে না। এই কথাটি খুব যে শক্ত কথা তা নয়, আপন মনে ধীরভাবে ভেবেই এর যথার্থ অর্থটি উপলব্ধি করতে হবে। যে সত্যগুলির ওপর কর্ম প্রতিষ্ঠিত তারা কখনোই দুর্বোধ্য অটিল নয়। জটিলতা দুর্বলতারই আবাহন। গীতার রাজযোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে কর্মযোগের ব্যবহারিক অনুষ্ঠান বোঝাতে গেছে শ্রীভগবান বলেছেন—তা 'সুসুখং কর্তুম্'—তার আচরণ অতি সুখেই, অতি সহজেই করা যায়। কাজেই খুব যে কষ্টে-সৃষ্টে, খুব যে কায়ক্লেশে ফলকর্ম ছেড়ে কর্মযোগের তত্ত্ব বুঝতে হবে, আর তা বোঝাতে গেছে জটিল তর্কজালের অবতারণা করতে হবে তা মোটেই নয়। কর্মযোগ 'সুসুখং কর্তুম্',—এর প্রণিধানে, এর আলোচনায়, এর আচরণে আনন্দ আছে, সে-আনন্দ আমাদের মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে খেলে যায়।

'কর্ম' বলতে কি বোঝায় এর পূর্বে সে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। গীতা মানুষকে যে-কর্ম করতে আহ্বান করেছেন সে হচ্ছে সর্বজীবের যাতে মঙ্গল হয় এই রকম কর্ম। কর্মের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন গীতা—

"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ।"

এ শ্লোকাংশটির মানে নিয়ে অনেক মতভেদ থাকলেও এর মোটামুটি অর্থ বুঝতে কোনো কষ্ট নেই। কর্ম হচ্ছে সেই ত্যাগ যা সেই সৃষ্টি (সৃষ্টি মানেই তো ত্যাগ) যার দ্বারা সর্বজীবের জীবনধারণের উপায়সমূহ বিহিত হয় (ভূত—জীব; ভূতভাব—জীবের জীবন, জীবের জীবনধারণ; তারি উদ্ভব—সর্বজীবের জীবনোপায়সমূহ বিধান করা)—এক কথায়, সর্বজীবের মঙ্গল করা বলতে আমরা যা বুঝি, তাই। কর্মের এই সংজ্ঞাটি মনে রাখলে কর্মফলত্যাগের ঠিক অর্থটি বুঝে নিতে আর কোনো গোল থাকে না। কর্ম মানে যখন কায়মনোবাক্যে সর্বজীবের মঙ্গল সাধন, তখন কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা যা-কিছুই উদ্ভূত হোক্ না,—অপরের মঙ্গল, অপরের কল্যাণ, কর্মীর পুণ্য—সে সবের ওপরে কর্মীর আর কোনো অধিকার নেই; বিসর্গের জন্যে, ত্যাগের জন্যে, পরমমঙ্গল সৃজনের জন্যে যখন কর্মের আরম্ভ, তখন পরিপূর্ণ ফলত্যাগেই কর্মের স্বাভাবিক পরিণতি।

এমনি ক'রে কাজ করলে কাজ আর বন্ধনের কারণ হয় না, সে নিজেই নিজের বন্ধন ক্ষয় ক'রে চলে যায়। পা' দুখানি পথ চলবার জন্যেই তৈরি হয়েছে, কিন্তু যে-মুহূর্তে আমাদের চলার শেষ হল, সে-মুহূর্তে পা' দুটি পথ ছেড়ে ঘরে এসে পৌঁছায়। পথকে না ছাড়লে তো ঘরকে পাবার উপায়ই নেই। হাত দুখানি কাজের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু যে-মুহূর্তে কাজের শেষ হবে, সেই মুহূর্তেই হাত দুটিকে কাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিতে হবে; নইলে কাজের যে সমাপ্তিই হয় না, নইলে হাত যে জোড়াই থেকে যায়। তাই হাত দুটির কোনো কিছুকে আঁকড়ে থাকলে চলবে না, প্রাণপণে যা করেছি, প্রাণপণে তাকে ছেড়ে চলে আসতে হবে। এরি নাম কর্মফলত্যাগ।

আর এক দিক থেকে ভাবা যেতে পারে। ফলত্যাগের মানে যখন ভাবি, ফলবৃক্ষটির কথা তখন মনে পড়ছে না? ফলের উপমা ফলবৃক্ষের দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করছে। এই যে আমাদের প্রতিবেশী বনস্পতি মায়ের মতো স্নেহচ্ছায়ায় ঢেকে রেখেছে, প্রতি বৎসর ফুলফলের অজস্র উপহার তার অন্তরলোক হতে বহন ক'রে আনছে আমাদের জন্যে—'মিতং কুরু কর্মযং' বস্তুত হচ্ছে এ-বাণী তার পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায়। কী অজস্র প্রাণশক্তিতে সে কম্পমান, কী অকলঙ্ক স্নিগ্ধিবিধীন তার প্রচেষ্টা! বহু বৈশাখের দিনে তার যে-মূর্তি দেখেছি, সে শুধু মহাযোগীর উপস্থাকেই মনে করিয়ে দেয়—

"কঠোর তপে মগ্ন জগে, তৃষিত তরুমূল,
ধরিয়া পড়ে পাতা—
বনস্পতি তবুও তোলে মাথা।" (রবীন্দ্রনাথ)

কিসের জন্যে তার এ সাধনা? ধরিত্রীর জরাজীর্ণতা, মরুময় বন্ধ্যাভার,

রৌদ্রদগ্ধ বিরলতরু মুচির দিয়ে, তাকে শ্যামল ক'রে, মনোরম ক'রে সাজাবার ভার নিয়েছে এই তরু—

"মৃত্তিকার যে হীন সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তি দান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে, মুগ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
লহরি সমুদ্র-ঊর্মি দুর্গম দ্বীপের শুষ্ক তীরে
শ্যামলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিলে অমরা শিরায়
সুস্থির শৈলের বক্ষে, প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যান-লিপি লিখি দিলে পল্লব অক্ষরে
ধূলিরে করিয়ে মুগ্ধ, চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
বাঁধিলে আপন পান্থ।" (রবীন্দ্রনাথ)

মানুষের মনের মৃত্যু তার অন্ধকার কোটর থেকে অহরহ: পরুষকণ্ঠে হাঁক দিচ্ছে, মানুষের সব আনন্দকে সে গ্রাস করতে চায়, তার জীর্ণকন্থা উন্মুক্ত ক'রে রসহীন উষর বিস্মৃতির মরুভূমিতে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। কে তাকে এই ধ্বংসের হাত হতে বাঁচাবে? কে নিয়ে যাবে বীজে বীজে নবজীবনের সঞ্জীবনী ধারা?—বনস্পতির মতো মানুষের কর্মযোগী। কে তার জন্য ভূমিকে রেখে, কে তাকে নিদারুণ পরাভব হতে রক্ষা ক'রে অনন্ত প্রাণরসে, অনন্ত যৌবনে তাকে পরিপূরিত করবে? —বনস্পতির মতো মানুষের কর্মযোগী।

জেনে রাখো, তরুজীবনে সকল উদ্যম, সকল প্রেরণা, সকল কর্মের সার্থকতা তার ফলে। কেননা এই ফলের দ্বারাই সে তার প্রাণের ধারাকে ধরণীতে অক্ষুণ্ণ রাখবে, যে-ব্রত নিয়ে সে এসেছে,—"মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান মরুর দারুণ দুর্গ হ'তে"—তারি উদ্‌যাপন হবে এই ফলেরি দ্বারা। কিন্তু, "সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্,"—কিন্তু এক পরমতম আশ্চর্য এই ভাখো, যার জন্যে তরুর এতবড়ো সাধনা, তার এতবড়ো তপস্যা—সেই ফলটিকেই তরু কখনো নিজে ভোগ করে না। নিঃশেষে একে বিলিয়ে দেবার জন্যেই সে কেবলি নিজেকে প্রস্তুত ক'রে তুলছে। জীর্ণপত্রপাতের যা-কিছু তার পায়ের তলায় পড়ে যায়, তাকে-সে মাটির রসের সঙ্গে গ্রহণ করে, পরিপাক করে, কিন্তু বৃন্তচ্যুত হ'য়ে বীজটি যখন পড়ে মাটিতে, তখন তার বেলা সম্পূর্ণ অন্য নিয়ম। তরুর শত সহস্র ভূমিষ্ঠ শিকড়ের একটি শিকড়ও এই বীজের দিকে যাবে না—বনস্পতির কঠোর নিষেধ আছে সেখানে। মানুষকেও তার কর্মফলটি এম্‌নি পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরকে নিবেদন ক'রে দিতে হবে, কঠোর নিষেধ যেন থাকে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ওপর—খবরদার, এ তোমার ভোগের জন্যে নয়।

আবার ভাখো যতদিন ফলটি না পাকে, শক্ত মুঠিতে তরুরা তাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকে, আপন সবুজ পাতার মধ্যে সবুজ ফলটিকে ছদ্মাপনে রক্ষা করে, "ফলেষু চ ধৃতব্রতাঃ"—উদ্‌যাপনের যে দেরি আছে, তাই এই ছদ্মবেশ এবার। কিন্তু ফল যেই পাকল, আর তাকে লুকিয়ে রাখবার প্রয়োজন নেই, তাকে এখন দিয়ে দেবার দিন এসেছে। তাই তার রঙ যেন বদলে। আর তাকে আঁকড়ে ধরবার দরকার নেই, তাকে এখন ছাড়তে হবে—তাই ত্যাগের বৈরাগ্যে বোঁটার আকর্ষণ শিথিল হয়ে এল। তরু তাতে সঙ্গ দিল ঢেলে, নিমন্ত্রণ পাঠালে বাতাসে। ভূমিষ্ঠ পথিক এল, পাখীরা এল। যে এল, সেই প্রসাদ পেয়ে গেল। বীজগুলি ছড়িয়ে পড়ল স্থান হ'তে স্থানান্তরে, দেশ হ'তে দেশে। এম্‌নি ক'রে তরু তার প্রাণের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখল, এমনি ক'রে সে মৃত্যুকে করল উপহাস, এম্‌নি ক'রে তার মুক্তি এল। এ না ক'রে সে যদি ফলটিকে আঁকড়ে ধরে থাকত চিরদিন, কিংবা নিজে ভোগ করত—বিষয়ী মানুষ যেমন ক'রে বিষয় আঁকড়ে থাকে, বিষয় ভোগ করে—তাহলে স্বার্থ তার বৃহদ্বর্থকে গ্রাস করত, শুকিয়ে যেত তার প্রাণের প্রবাহ, আসত তার মহতী বিনষ্টি:, তার চরম সর্বনাশ।

কর্মফলত্যাগী মানুষটিও ঠিক ঐ বনস্পতির মতো। এ জগতে মানুষ যদি একটিমাত্র হ'ত, তাহলে আর ভাবনা ছিল না, সে যা করতো তাই শোভা পেতো। কিন্তু মানুষ তো একটি নয়, তাই তাকে সকলের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হবে, নিজের শ্রমের অন্ন সকলের সাথে ভাগ ক'রে খেতে হবে। এরি নাম মঙ্গল, গীতায় এরি নাম 'কর্ম'। সবাইকে বাদ্বিয়ে রেখে নিজে যে বড়ো হতে চায়, সকলের ঘরে যে তার অভুক্ত লোভের ভাগ বসাতে চায়—তার সেই অভ্যাসকে ঈশ্বর সহ্য করেন, ক্ষমা করেন না। একদিন আসে—যখন তার সেই গগনস্পর্শী দম্ভের প্রাসাদ খান্ খান্ হ'য়ে ভেঙে পড়ে, যেখানে যেখানে তার প্রভুত্ব ছিল, নির্যাতন ছিল, সেখানে সেখানে ঘরঘরিয়ে মাটি কেঁপে ওঠে। কত দর্পের সৌধচূড়া এম্‌নি করে ভেঙেছে, ভাঙছে, ভবিষ্যতে ভেঙে পড়বে। অন্যায় চিরস্থায়ী হয়েছে, এমন দেশ কেউ ভাখাতে পারো, এমন ইতিহাস কেউ কি পড়েছো?

প্রাচীন ভারতবর্ষ তারস্বরে ঘোষণা করেছে ঐ ভয়ের পথ, ঐ লোভের পথ, ঐ অন্যায়ের পথ, অধর্মের পথ পরিত্যাগ করো,—

"অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।"

অধর্মের দ্বারা আপাততঃ বৃদ্ধি পাওয়া যায়, আপাততঃ ভাল হয়, আপাততঃ শত্রুগণকে পরাজিত করা যায়, কিন্তু সমূলে বিনাশ পেতে হয়।

আমাদের বেদ অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে তাই একটিমাত্র পথই দেখিয়েছে, মঙ্গলের পথ, কল্যাণের পথ। আমাদের উপনিষৎ বলেছেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো। কর্মযোগীর যা-কিছু সাধন, যা-কিছু তপস্যা, যা-কিছু ব্রত, যা-কিছু প্রচেষ্টা সমস্তই কেবল পরের মঙ্গলের জন্যে। তাঁর কাজে যখন ফল ধরে, বহু আয়াসে, বহু প্রযত্নে সে-ফলটি তিনি পাকিয়ে তোলেন, একান্ত নিঃশেষে ক'রে একদিন তাকে সকলের মাঝে বিলিয়ে দেবার জন্যে। তিনি নিজে তা গ্রহণ করেন না, কেন না তিনি জানেন নিজে নিলে মঙ্গলের স্রোত আর বইবে না, স্বার্থের দরজাটুকায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই ত্যাগের দ্বারা তাঁর কাজ ক্রমাগত আনন্দের মাঝে মুক্তিপেতে থাকে, কাজ আর তার হ'য়ে

দুটি চোখ বসে থাকে না। বিষয়ীর বিষ তাকে মৃত্যুকালেও শান্তির শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে দায় না, জীবনকালেও তারে অনন্ত ভয়। এই বুঝি তরী ডুবল, এই বুঝি ধন লুণ্ঠিত হল, এই বুঝি ধান ভাঙল, মাইল মারল! ত্যাগ আমাদের কাছে বড়ো কঠিন, কেন না, আমাদের ভালবাসা যে ভাগে নি। আমরা শুধু নিজেকে ভালবাসি, তাই নিজের দিকে সব কিছু টেনে রাখতে চাই। এত একরকমের ত্যাগ, যা-কিছু সবকে নিজের দিকে ত্যাগ, এবং তাতেই আমাদের আনন্দ, কেন না নিজের দিকেই যে আমাদের ভালবাসা আছে, আকর্ষণ আছে। নিজের দিক থেকে ভালবাসা যখন অন্যদিকে যাবে, তখন সেদিকে ত্যাগও আনন্দময় হয়ে উঠবে। কর্মযোগী হলেন আদর্শ প্রেমিক, সকলের প্রতি তাঁর অন্তরের টান আছে, কাকেও তিনি ঘৃণা রাখেন না, সবাই তাঁর আপন। তাই তাঁর কর্মফল পরের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার দ্বারা তাঁর সমস্ত কাজই আনন্দের মাঝে মুক্তি পেতে থাকে, কর্ম আর কোনো বন্ধনই রচনা করে না। এমনি ক'রে তাঁর জীবন ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ মুক্তির মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে, তাঁর প্রেম, তাঁর আনন্দ সকল সীমা অতিক্রম ক'রে অসীমতায় ছড়িয়ে যায়, তিনি "ব্রহ্মভূতায় কল্পতে", ব্রহ্ম হ'য়ে উঠতে থাকেন, তিনি ব্রহ্মভূতঃপ্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি,—ব্রহ্ম-দৃষ্টি প্রসন্ন দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে অমৃতলাভ করেন।

আমাদের দেশের এই কর্মযোগের শিক্ষা—যা অনন্তকালীন রাষ্ট্র বিপ্লব, অশ্রুপাত, রক্তস্রোত, সব কিছুকে অতিক্রম ক'রে আজও আমাদের চিত্তের দ্বারে দ্বারে করাঘাত ক'রে ফিরছে,—আমরা যেন তাকে আজ দ্বার খুলে দিই, অবনতমস্তকে হৃদয়ের শ্রদ্ধায় তাকে যেন গ্রহণ করি। বাইরেকার কোনো তন্ত্রমন্ত্র আমাদের কিসেরই বা প্রয়োজন? যার ঘরে অমূল্য ভাণ্ডার, সে যাবে অপরের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে! আমাদের আজকের এই দৈন্য, এই লজ্জা, এই হীনতা—এ কেবল আমরা নিজেদের এই উদার আদর্শ হারিয়েছি বলেই। যে যেখানে আছো সবাই কর্মযোগের ব্রত অবলম্বন করো, নিজেকে আর হীনহীন অধম পাপিষ্ঠ বলে ভেবো না, নারায়ণ অবমানিত, নিজেকে আর অবমাননা কোরো না, নারায়ণ অবসাদগ্রস্ত, নিজেকে আর অবসাদগ্রস্তও কোরো না। মনে রেখো, কর্মযোগ কিছুই দুষ্কঠিন কাজ নয়, দুরূহ কাজ নয়, ভুলো না গীতার মাতৈঃ বাণী, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। কেন নিজেকে দুর্বল ভাবো? কেন অবমাননা নিজেকে? তুমি যে-খাঁটি,—সেই-খাঁটিই আছো, তুমি যে সোনা,—সোনায় কখনো কলঙ্ক পড়ে? শুধু নিজেকে ঝাড়িয়ে ঝেড়ে, ঘষে মেজে উদ্ভাসিত হও। নাইবা থাকল আমাদের হাতের রাজপ্রাসাদ, পীতমের পতাকা, অস্ত্রাগারে উদ্যত সঙ্গীন। ও পথ আমাদের দেশের পথ নয়, ও মত, আমাদের আর্য পিতৃপিতামহদের মত নয়, ও পথে কল্যাণ আসবে না, মঙ্গল আসবে না। অন্যায়কারিদের ভগবান্ একদিন বোঝাবেন তবে ছাড়বেন, অন্যের চূড়া একদিন ভাঙবেই ভাঙবে, একদিন আসবেই আসবে—যেদিন সমস্ত মিথ্যা, সকল ভণ্ডামি সূর্যোদয়ে তিমিররাশির মতোই নিঃশেষে দূর হ'য়ে যাবে, যেদিন এই আমাদেরই দেশের আদর্শ কর্মযোগীর ধ্যান-মৌন পাত শক্তির রূপ, তাঁর অতন্দ্রিত সেবার ব্রত, তাঁর ঈশ্বরে কর্মফলসমর্পণ জগৎসংসারকে অতি ঘোর প্রমত্ততা হতে বাঁচাবে।

সাদাসিধা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দেখব যারা সহজ সাদা—
রহস্য তার লুকিয়ে আছে,
দুর্গম ও দুরূহ যা,
প্রেমের বাহি দূর আর কাছে।
সব মন্ত্র যেমন ফুল,
লাবণ্য যা যেমন রূপ,
নীলিমা যা সাগর জলে
সমীর বুকে অমল রূপে।

২

সাদা আলোক সহজ সরল
তাতেই তো সাত রঙের খেলা,
সাদা মানুষ খেলায় হাসে
মহাভাবের কুতুহলে।
সাদা শিবের বক্ষ পরে,
রক্তময়ী মূর্তা করে,
কান্তিতে তার কান্ত ভুবন
ধন্য ভুবন তাহায় যাচে।

৩

অপূর্ব ওই সৌম্যরূপে
মুগ্ধ যা হই নিত্য দেখে,
কোন সুদূরে? কিন্তু তারাই
ললাট লিপি মোদের লেখে!
সাগর টানে যে অঙ্গুলি,
ফেলায় হানে যে বজ্রাগ্নি,
বুকের সেতার সেই যে বাজায়
সুখর ধরা যার আওয়াজে।

৪

অচেনা মন কেমন করে—
তবু তাঁরে বলবো চিনি?
চোখ ও মনে লাগছে ধাঁধাঁ
তিনিই ভুবন, ভুবন তিনি,
সবই জটিল, সবই সোজা,—
জড় কি চেতন যায় না বোঝা,
সাজা এবং সজা যে যা
সব পাথারের তাঁরে তাঁরে।

মনস্তাত্ত্বিক

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়

[প্রহসন]

তৃতীয় দৃশ্য

সপ্তাহখানেক পরে এক রবিবার। চরণদাস, পুণ্ডরীক, উমেশ, অশোক, পরেশ

চ। টাকা তো অনেক লেগে যা'চ্ছে দেখছি। কলেজের অবৈতনিক বিভাগে হ'তে পারে না?

অ। পরেশ চাইছে রীতিমত একটা ক্লিনিক্ খুলতে। স্বাধীনভাবে রিসার্চ করতে পেলেই তো খুব ভাল।

উ। তা' ছাড়া যদি ফিটিরিয়া ইত্যাদি কেস আমার এখানে রীতিমত আরাম করতে পারি? তাহলে ক্লিনিক্ চালাবার খরচা উঠতে ক'দিন লাগবে আর?

পু। ব্যাপারটা-যে ভাল সে-কথাতো স্বীকার করেন আপনি?

চ। কেউ লেখাপড়া করবে, নূতন জ্ঞান আহরণ করতে চেষ্টা করবে, এটাকে খারাপ বলবো কেন পুণ্ডরীক?

পু। তা'লে তো হয়েই গেল! শুভস্য শীঘ্রং।

চ। কিন্তু অভিজ্ঞ ডাক্তার বা অধ্যাপকের সাহায্য ছাড়া হঠাৎ এতগুলো টাকা খরচ করে বসা—তা' পরেশ তো রয়েছে এখানে, যা' ভাল বোঝ—

প। আমাদের Experimentalএর চার্জে সেই পণ্ডিতটিই রয়েছেন পথ আগলে। মানুষ যা' বিশ্বাস করে না—চাকুরীর খাতিরে তাই দিনের পর দিন কি করে বক্তৃতা করে বলতে পারেন?

চ। তাঃ গুহর কথা বলছিস্? কেন, চমৎকার লোক তো!

পু। চমৎকার না হাতী।

অ। পরেশ বলছে যে তাঃ গুহ আসলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে অবিশ্বাসী। অথচ তা'ই অধ্যাপক তিনি। নেহাৎ ঠাণ্ডা মরম মতবাদ তবু বরদাস্ত করেন, নূতনত্ব বা বাড়াবাড়ি হ'লে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন।

উ। মতভেদ পণ্ডিত সমাজে থাকবে: কিন্তু মনস্তত্ত্ব যখন অঙ্ক নয় যে দুই আর দু'য়ে চার হয় বলে মানতেই হ'বে।

চ। সে তো সত্যি।

প। কিন্তু তা' বলে ভিন্ন মতাবলম্বীর উপর অসহিষ্ণু হওয়া ভাল?

চ। তা' কেন হবে? একটা বিরুদ্ধ মতের বিচার ধীরভাবে না করতে পারলে শিক্ষাই তো মাটি হ'ল।

প। সেজন্যই বলতে চাই আমি যে ওর অধীনে মামুলী অনুসন্ধান করে—যখন প্রাচীন ভারতে আধুনিক মনোবিজ্ঞান বা এরিস্টটলের কিছু একটা—আমার লাভ হ'বে না।

চ। সে যা' ভাল মনে কর। টাকা তোমার নিজেরই রয়েছে কিছু। পুণ্ডরীক যে estimate দিয়েছে, তা'র সঙ্গে অবশ্য টাকাই তোমার আরো। ও-রকম গোটাকয় ক্লিনিক্ তোমার অর্থে হ'তে পারে। কিন্তু টাকা থাকলেই যাচ্ছা খরচ করাটা ঠিক নয়।

উ ও পু। যাচ্ছা খরচ বলছেন কেন?

চ। আসলে তোমাদের পরীক্ষের বিরুদ্ধে আমি নই। শুধু বিঃ গুহ যদি অবিশ্বাসী করে থাকেন তবে অন্য কারুর অধীনে কাজ করা যায় না কি? ওকালতির মত মামুলী পেশাতেও আমরা কতকাল শিক্ষানবিশী করেছি।

পু। যদি আমরা ঠকি, তখনো নিজের ভাগ্য যাচাই হ'তে থাকবে না।

অ। এখানে স্বাধীনভাবে ক্লিনিক্ থাকলেও তো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান চলতে পারে। অথবা···সেখানকার আইডিয়া এখানে এসে develop করা চলতে পারে।

চ। কি বল পরেশ, চেক্ লিখে দেব? না হয় আরো একটু ভেবে দেখ। আমার আবার অঙ্কের ঠিকাতে হ'বে খানিকটা সময়।

প। ক্লিনিক্ করেই দেখা যাক্ না, আরও হ'তে পারে। চেক্টা পরেই নেব। আরো একবার দরকারী জিনিসপত্রগুলি খুঁটে কিনে দেখে আসছি ওদের নিজে। অনের মাপে সব হ'লেই ভাল। বাইরে থেকে যে-সব যন্ত্রপাতি আনতে হ'বে, তার অর্ডারটা কিছুদিন পরেই না-হয় দেওয়া যাবে।

বন্ধুদের নিয়ে পরেশের প্রস্থান। এলেন হেমাঙ্গিনী

হে। ওরা সব চলে গেল? টাকার কথা কি বলছিলে? মিথি-জামাইবাবু কি ওর জন্য কিছু রেখে যান নি?

চ। রেখেছেন। সে-কথা সকলের মোকাবিলা বলাই তো আমি।

হে। তা' পরেশ যখন ডাক্তার হবে, ডাক্তারখানা লাগবে না ওর?

চ। ডাক্তারখানার টাকা আমি দিচ্ছি। কিন্তু পরেশের সে সব ছেড়ে ঘরকার একটি বৌ—তা' তুমি দেখছ নিশ্চয়?

হে। তা' আর দেখছি নে। বয়স হয়েছে, এত ভাল পাস্ করলে, চোখে খুব নেই নেই চিন্তায়।

চ। সে তো দেখতেই পাচ্ছি গিন্নী। ঘুম চটে গেলেই তো—অবশ্য খুব অনেকখানি হ'ল—মানস কাজ হাসিল হ'ল না। একটা

সমস্ত ঠিক কর্‌তে হ'বে ; ছেলের আবার ছেয়ে পছন্দ হওয়া দরকার, মেয়ে-পাওনার কথা স্থির কর্‌তে হ'বে, ছাড়ায় কি কম ?

হে। পরেশ তো বল্‌ছে আগে দুর্গার বিয়ে দিতে।

চ। তুমি তো জান হেম, দুর্গার বিয়ে নিয়ে আমাদের কোন ভাবনা নেই। দুর্গা তোমার দেখতে ভাল, আমাদের একটীমাত্র সন্তান। ওকে বিদায় কর্‌লেই তো সংসারটা শূন্য হয়ে যা'বে···তা'ই —তা' সে যখন ইচ্ছে ওকে পাত্রস্থ করা চলে, টাকা পয়সা দরকার হ'লেও তো কোন কষ্টই হ'বে না···

হে। ওকে বিয়ে দিয়ে এখানেই রাখা চলে না ? মেয়েটাকে ছেড়ে পরেশও যদি দেখে চাকুরী পেয়ে যা কিছু করে কোথাও সরে যায়···

চ। তা'ই বুঝি তাড়াতাড়ি ক্লিনিক্ খুলিয়ে পরেশকে এখানে পক্ষ করে রাখতে চাইছ ? ধন্যিমাগি হেম ! তুমি যদি শ্যামা-গায়ে ওকালতি করতে, আমি বিনা বলছি আমার চেয়েও তোমার পসার হ'ত। তা' ছাড়া কিশোরটাও···

হে। তা' আমার বুঝি তো তবু তুমি যাও না ?

চ। নেই বা আমার ! কেন ?

হে। কই দুর্গার বিয়ের কথাটায় তো হুঁ-হাঁ করছ না।

চ। বর-আমাই ? ওতে আমার মত নেই, জানো ত ? বিমলাথ তো চমৎকার ছেলে তোমার। ৬ মাস যাবেই ফিরবে। ওদের বিয়ে হ'লে মেয়ের সংসার, নাতি নাত্‌নীর মুখ দেখে আমরা কাশী-পুরী কোথাও চলে যা'ব। কলকাতা আর ভাল লাগে না। পরকালের কথা তো ভাবতে হয় বেশ ?

হে। কিন্তু পুণ্ডরীকই বা খারাপ হ'ল কেমন করে ? পরেশ বলছিল যে এক বিমল যা' ছাড়া কেউ নেই ; গরীবের সংসার।

চ। চাকুরী করে খা। কি খাওয়াবে ওরা এক্-এ পাস করে ?

হে। পুণ্ডরীক তো আইনও পড়ছে। তুমিই আপিকল্ করতে পার।

চ। কিন্তু বিমলাথের সম্বন্ধে তো এক রকম পাকাই বলতে পার। বলরামের সঙ্গে ছোটবেলায় পড়েছি, তারপর এ অবধি এক সঙ্গে কাজ কর্ম করছি। তা'রই কাছে কথা দিয়ে রাখব না···

হে। সে আমি দেখব। মোটা সংসারখানাই তো আবার মাথায় ! কিন্তু কথা কেন দিতে গেলে তুমি ? জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে কি আগে থেকে বলতে পারে কেউ ? বাপী বলছে দুর্গারও অমত হ'বে না। বিলাত-ফেরৎ বিমলাথ—দুর্গাকে কষ্ট দেয় যদি, আমরা তা'কে শাসন করতে পারব ? পুণ্ডরীক থাকবে আমাদের এখানে, আমাদের একঘরে।

চ। বেশ, বেশ। তা' তুমি আরো একটু ভেবে রেখ। বিমলাথের বাড়ির চাল একেবারে বেস্ট সমাজনী। বিলাত ফেরৎ আগে যা' হ'ত এখন তা' হয় না। বাপীতো দুর্গার কথা বলেছে, দুর্গা বাপীর কথা বলেনি কিছু ? পরেশের তো অনেক যায়গা থেকে এখান আসছে, রীতিমত অস্থির হয়ে উঠেছি আমি—বিশেষ করে হাইকোর্টে বসুমাতৃদের মহলে। তুমি আবার মেয়ে কি বল্‌বে তা'ই জিজ্ঞাসা করছি। ডিতে-খুতে চাইছে অনেকেই।

হে। তা' আমায় চাইবে না ! পরেশ কি আমাদের তেম্‌নি ছেলে ! কিন্তু দুর্গাকে তো কিছু জিজ্ঞাসা করিনি ?

চ। তা' সুযোগ বুঝে জেনে নেয়া যাবে। আমি তা'লে উঠি। অবশ্য আপনার কথা আছে। পুণ্ডরীক ?

অতে পুণ্ডরীকের প্রবেশ

পু। দেখেছেন, ডাক্তারের আপনার অহঙ্কারের কথা ?

চ। কি হ'লো ?

পু। একে বলে অভদ্রতা ? আপনার কোন সম্মানই রাখলে না। ব্যাটাকে···

চ। স্থির হয়ে বলো পুণ্ডরীক। কথাটা খুলে বলো তুমি।

পু। সেই ঝুনঝুনওয়ালার কথা। কাল পর্যন্ত ঠিক—আপনি ফোনে বলেও দিলেন—ঘরটা ভেবে ক্লিনিকের জন্য। সেই ভেবে মাপমত জিনিসপত্র ঠিক্‌ঠাক্ করলাম গোটা পঞ্চাশ ঘরটা ঘুরে বিস্তর হয়রানি হয়ে আর ২১।/- আনা ট্রাম্‌ভাড়া করে। এখন বল্‌লে বাবুদেরও মৈষ শুধু ঔর মাহুলীর ব্যবস্থা করেন তো আমি দু'খানা ঘর দিব। কেশিটেল্‌তি দিব। ঐসব ভিটিরিয়া-ভিটিরিয়া আমি বুঝি না। ঐসব কারবারের জন্য ঘর হ'বে না।

হে। এত বড় কথা ! আমার ঘরই তো পড়ে আছে দু'টো। এখানে করো তোমরা ডাক্তারখানা !

চ। (আতঙ্কিত) এখানকার ঘর—মানে আমার বৈঠকখানার পাশে ভিটিরিয়া···

হে। যা হয়, বাগানের ধারের ঘরটা দিচ্ছি। শিহনের গলির ওপর মুখ থাকবে। হলো তো ? ঝুনঝুনওয়ালা ঘর ভেবে যা হল পরেশ আমার ডাক্তার হ'বে না ? ছেড়ে যাও তুমি ও-রকম অহঙ্কার ?

চ। তা' তো নিশ্চয়। আমি আজই ঝুনঝুনওয়ালাকে ডেকে বল্‌ব।

পু। আমাদের হলে ঐসব বুজরুকী, লোক-ঠকানো কারবারে তা'র পাটনায় হ'তে ? দেখুন তো মা ?

হে। (তাইত, ঠিক বলেছ বাছা। তোমরা লেখাপড়া শিখে রোগ আরোগ্য করবে, না লোকটা চাইছে ঠকিয়ে পয়সা···

দুর্গার প্রবেশ

দু। তুমি এখানে কখন আসা হ'ল মা' তা' কি করে জানব বলো ? সারাটা বাড়ি খুঁজতে-খুঁজতে বাপি করে দেছে আমায়।

হে। কেন, এক দণ্ড আড়াল হ'লে কী এমন হনমুন বেঁধে যায় তোদের ?

দু। কমলা বলছে, ঠাকুর বলে আছে, চাল দেবে না বের করে ? ভাঁড়ারের চাবীটা তো ওদের কাছেই দিয়ে দিতে পার ? যাও মা হয় আমাকেই ?

হে। যাও পুণ্ডরীক তুমি রান্নির এখানেই খেয়ে যাবে। ঠাকুরকে বলিস, একটু বুঝে সুঝে রান্না করতে।

পু। আমি ওদের খবরটা দিয়ে আসি মা'। ওরা বোধ হয় ঘাড়োয়ারীর সঙ্গে একটা রফা করবার জন্ত বসে আছে। দরকার কি তাকে ভড়িয়ে—দিয়ে আসি যে। খবরটা পেলে পরেশদাই যা' খুশী হ'বে।

পুণ্ডরীকের প্রস্থান

যো। যাই দেখি ঠাকুরকে সব বলে আসি। খুশী যা' হয়েছে—ও আবার হ'বে দাসাহী। বলে, চাবী ফেলে দাও ওদের হাতে। তাহলে আর রক্ষে আছে!

যোগমায়ীর প্রস্থান

চ। বোস্ দেখি মা' ব্যাপারটা একটু স্থির হয়ে।

হ। তুমি রাগ করেছ বাবা?

চ। কেন রে?

হ। ক' দিন থেকে দেখ পুষ্টীর যজ্ঞ ব্যামো, কিছুই খেতে চায় না। রাত্তিরে কেবল ডাকে। গলায় শিকল দিয়েছি বলেই নাকি খালই দেখে, বাবার ডাক্তারখানাটা না-হওয়া অবধি কিছুই ঠিক করা যাচ্ছে না। মনটা তাই বেজায় খারাপ; তোমার কাছে আর বলতে পারি না। রাগ করেছ তুমি?

চ। রাগ করিনি। তুই কদিন আসিস্‌নি, ওদিকে পাকা চুলে সাবাটা করে গেল প্রায়। সেদিন তো বিষনাথের বাবা বলেই ফেল্‌লে, চরণ-যে বুড়ো হয়ে গেলে?

হ। ইস্। উনি বুঝি বুড়ো হ'ন নি?

চ। উনি বুড়ো হ'লেই বুঝি তোর বাবাকেও বুড়ো হ'তে হ'বে? বুড়ো হ'লেই তোর মাকে নিয়ে কাশী চলে যা'ব খুশী।

হ। হুঁ। আমি কালই তোমার ঠিক করে দেব। একটা পাকা চুলও কেউ বা'র করতে পারবে না। বাবা···তোমার বিষনাথ কবে ফিরবে বিলাত থেকে?

চ। এই এলো আর কি। তোর বাবীমা' কিন্তু সেদিন বার বার বলছিলেন—তোকে নিয়ে যেতে।

হ। চলো না বাবা? পোড়া অজেনগুলো হাড়বেই না তোমাকে—কি করে যাই বল। ওদিকে পুষ্টীর হয়ে উঠেছে শক্ত ব্যামো···

চ। কিন্তু তোর বাবার বিয়েটা তাড়াতাড়ি না-দিতে পারলে তো চলছে না খুশী। পুষ্টীর অসুখ, তোর মা'র তো চোখে ঘুম নেই—তুই আর কত দাবলাবি। রোজ বোধ হয় ছিপ্‌সিন্ খাচ্ছিস?

হ। ও-কথা বলো না বাবা। আমি ওর মধ্যে একেবারে নেই—বলে দিচ্ছি।

চ। তুই না-থাকলে আমার উপায়টা কি হ'বে এ-সংসারে, বল। পুষ্টীর চেয়েও আমি তোর কৃপার পাত্র।

হ। উহু—দাদার বিয়ে এক ভীষণ ব্যাপার। চেহারা যা'ই হোক্, সম্পূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য হওয়া চাই-ই। এর চেয়ে রাজকন্যা আর আকেক রাজত্বও ভাল ছিল!

চ। কেন, মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন মেয়ে তো অনেক রয়েছে। রাঁচীর বাইরেই তো বেশীর ভাগ লোকের বাস।

হ। তুমি-আমি বললে কি হ'বে? দাদা বলুক যে সম্পূর্ণ মানসিক সুস্থ লোক নাকি কোটিতে একটি মিলা ভার। কি করি বলো ত?

চ। কেন, বাণী, সরমা—এদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখ না।

হ। বাণী অবশ্য মন্দ দেখেবা—তবে কিছুই বলা যায় না। ওদিকে ভূত বকে নাকি খুব। বাবা বার-বার বলেও নামলাতে পারছেন না।

চ। সরমা তো চমৎকার মেয়ে! বাণীর চেয়ে তো সরমা অনেক ভাল আমার মতে।

হ। দাদা বলেন, ওর কপালটা এত ছোট যে ব্রেন্ কিছুতেই ভাল হ'তে পারে না।

চ। বলিস কি! বাণীতো কোন রকমে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। ওদিকে সরমা প্রথম বিভাগে আই-এ অবধি পাশ করেছে: বেশ একটু গম্ভীরও?

হ। তা' কি করবে বল? দাদা বলেন—এখন বয়ত হচ্ছে না; ভবিষ্যতে সরমার সম্বন্ধে তাঁর কথা প্রমাণিত হ'বেই।

চ। তা' কি জানিস খুশী, ছোট কপাল মেয়েদের পক্ষে একটা সৌন্দর্যের অঙ্গ বিশেষ আমাদের কালে। তা' পরেশের তো আমার দেদিকে লক্ষ্য নেই। মানসিক সুস্থতা···

হ। সে দেখা যা'বে বাবা। ক্লিনিকটার বন্দোবস্ত তাড়াতাড়ি করে দাও তুমি। দাদার আহার, নিদ্রা তো কেন বন্ধ হোক্। বাণীরও খুব উৎসাহ।

চ। ওর-ও বেড়াল আছে নাকি?

হ। উঁহুঁ। ও বোধ হয় নিজেই রোগী হয়ে পড়বে। (প্রস্থান) আমি ঠিক জানিনা বাবা।

চ। বেশ, বেশ। তোর মা'ই সব ঠিকঠাক্ করে দিয়েছেন। আমার শুধু টাকাটা তুলে দেওয়া। আজ রোববার, কালই ব্যাংক থেকে তুলে দেব।···অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন উঠা যাক্ খুশী।

হ। আমিও যাই বাবা। পুষ্টীর···

চতুর্থ দৃশ্য

তিন দিন হ'ল ক্লিনিক্ খোলা হয়েছে। কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছে পুণ্ডরীকের দল। স্থান: পরেশের ক্লিনিক্।

বুইলা। (প্রবেশ করে) কী ঘাস, কণীপত্তর এল!

পরেশ। কই আর এল। পুণ্ডরীক বলেছে দিন্‌গুলোই···

হ। পুষ্টীকে কবে take up করছ বল? এখন তো অবসর দেখ্‌ছি তোমার। হিষ্টিরিয়া কি মানুষ ছাড়া হ'তে নেই!

প। বেড়ালের কি মন আছে না কি?

হ। রিসার্চ করে তো আর দেখোনি!

প। Ideaটা ভাল অবশ্য! পড়ে দেখব।

হ। তোমার গুরুদেব তো শুনি প্রথমে মানুষের পরীক্ষা থেকে আরম্ভ করেছিলেন। পুষ্টী কি মানুষেরও অধম নাকি?

বাইরে থেকে বাণী। ভেতরে আসতে পারি খুশী?

দু। আর, আর বাপী।

প। এ কী চেহারা হয়েছে বাপী তোমার! খুব ঝড় বি বৃষ্টি গেল! স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছ?

ম। কাল ঐ লম্বুকর্ণ ডোমটার খপ্পরে কি সব আজে-বাজে প্রশ্ন করলেন—রাতে আর ঘুমুতে পারলাম না।

দু। বাপীই তা'লে ডিক্লিয়ে বৌনি করেছে বাবা! তোমার প্রথম ছবি!

প। হাঁ। ওর কেসটা খুব সহজ নয়। ওর স্মৃতির খাতায় তোমার একটা বড় সোনেযাল রয়েছে। তা' ছাড়া আবহাল খুব হচ্ছে না বলে লব' হচ্ছে। একাগ্রতারও ভীষণ অভাব। কাল কিছুতে ইপ্‌নোটাইজ্ করা গেল না। আচ্ছা আলো দেখিনি বাপী—ঐ ডোমটাতে···

দু। ডোমটাতে বলতে আবার বাবা।

ম। বাঁচ তুলবেন না তো?

প। বেশিক্ষণ সুখী হাতে-নাতে প্রমাণ! কাল তোমায় বললাম না যে ওটা ডেটিক্টর ডোম নয়; দিব্যি ভুলে বসে আছ?

ম। বলুন। এবার সুরু করুন ডেয়া। খাপস্!

দু। দেখি পুষীটা কি করছে····· সুশীলার প্রস্থান

প। ভাল নিদ্রার স্বপ্ন দেখেছ?

ম। হাঁ।

প। বল, খুলে বল। ডাক্তার আমি। কোন লজ্জা করবে না। সুকোলেও নিস্তার নেই। ইপ্‌নোটাইজ করে সব পেটের কথা টেনে বার করে ফেলব।

ম। ইপ্‌নোটাইজ্, তো করাই আছে! কথাও কি বাকী আছে কিছু?

প। বাজে কথা। কবে ইপ্‌নোটাইজ্ করলাম? আচ্ছা এখন তাকাও দিকি—সোজাসুজি—তাকাও বলছি। পড়বে না মোটে—তাকাও!

ম। লজ্জা নেই আমার!

প। মনে হয় না তো। কালকের স্বপ্নটা বলবে, না বেফাস্ট কেস্ ডাকব?

ম। সে কে আবার?

প। পুষী। বেড়ালের মন আছে কিনা বেশ বোঝে, মজার। সুশীলার Ideaটা কেলার নয়। মহামতি প্রহ্লাদ·····

ম। না, না·····এই সুর করছি আমি·····কাল শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসছে না···এপাশ-ওপাশ করছি।···পাশের ঘরে দিদি অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছেন। ছোট ছেলেটা ওঁদের···ঘুম নেই।

প। তারপর?

ম। তারপর আর কি ডাক্তার সাহেব, জানালাটা খুলে দিলাম। দেখি চাঁদ উঠেছে আকাশে। কলকাতার চাঁদ—দুর্লভ জিনিস সচরাচর—প্রকাণ্ড একটা সোনার থালার মত—দেখে আমার?···চেয়ে থাকলাম।

প। ঘাড় ব্যথা হ'ল, মাথাঝিম সব টন্‌টন্ করতে লাগল?

ম। ভীষণ ঘাম্ হোল। তাঁকিতে-তাঁকিতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

প। স্বপ্ন দেখলে?

ম। হাঁ। মস্ত একজন দেবতা—সোনার মত গায়ের রং, কী সুন্দর! —চাঁদের মাঝ থেকে নেমে এসে বললেন—তোকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি বাপী। তোর জন্যে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। তাই এলাম।

প। Interesting! তারপর? তোমার কষ্টটা কি?

ম। আমি বললাম এত করে আমাদেরকে সবাই বলছি। সে কি আমলেই ঘুমুতে পারছি না? না ঘুমের না ঘুমবার জন্য করছে?

প। চোখ বুজে ফেললে যে?

ম। ঘুম পাচ্ছে। চোখ বুজলেই সেই চাঁদের মত দেবতাকে দেখতে পাই আমি। এ-দুঃখ তোমায় কেন তাঁর সঙ্গে চলেই যাব আমি।

প। চোখটা খোল বাপী। এখনই তো আর মরণা হচ্ছে না? চোখ বুজলে তোমাকে বড্ড বোকা, বড্ড ছেলেমানুষ দেখায়।

ম। না। চোখ বুজলে বয়সটা বেমালুম ভুলে যাব আমি। তখন আর হয়ত বলতেই পারব না।

প। Serious case! বহুকাল তোমাদের দেখিনি।

ম। দেবতা প্রশ্ন করলেন, যা'কে তোর কথা বলছিস—সে কি ছেলেমানুষ? আমি বললাম, চল্লিশ বছর বয়স। ছেলেমানুষ হ'তে যা'বে কেন?

প। চল্লিশ বছর?

ম। হাঁ। দেবতা আবার প্রশ্ন করলেন, বুদ্ধি নাকি? বললাম, তার উল্টো বাং। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো পরীক্ষা ডাঙ্গারে ডাঙ্গারে উৎরেছে। দেবতা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আমার তখন কি ফাজ্। যদি বলে বসেন যে লোকটা ভণ্ড!

প। তারপর কী বল্লেন সেই মস্ত দেবতা?

ম। অনেকক্ষণ গেল। দেবতা চোখ বুজে থাকলেন। আমি কেবল কাঁদছি। জোরে উঠে দেখলাম পরেশ দা'—বয়টা আমার বিশ্বাস নয়। বালিশ আমার সত্যি ভিজে আছে চোখের জলে।

প। দেবতার কথা বলো বাপী। দেবতা কি বল্লেন না কিছু?

ম। দেবতা বললেন, তা'কেই তুই জিজ্ঞাসা করিস বাপী।

প। করেছিলে?

ম। করছি তো। জবাব পাচ্ছি কই। দেবতা বললেন, লোকটা ভণ্ড নয়—লোকটা আসলে মূর্খ। পরীক্ষা পাস্ করলেই কি আর লোক জ্ঞানী হয়।

প। (উচ্চকণ্ঠে) সুশীলা, পুষী, ও পুষীর মালিক!

দ্রুতবেগে সুশীলার প্রবেশ

দু। কি ব্যাপার? বাপীর দেবতা কি কান পাকড়েছে তোমার?

প। ইপ্‌নিস বলে যে তুই মাসীমা'কে যে এসব serious case

মোটেই নয়। বাণীর সম্পূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য রয়েছে ; ক্লিনিকে আর আসতে হবে না।

হ। মা' (চীৎকার) মা'…

প। আরে তোর মা' নয়। বাণীর মা'—বাণীমা'র কথা মনেই তোকে।

তৎক্ষণ ঈসকাঁসে করে হেমাঙ্গিনী ঘরে প্রবেশ করলেন

হে। চেঁচাচ্ছিস্ কেন এই সকালবেলা—কী যে…

হ। চলো ডিস্‌পির বাবার কাছে। দাদা রায় দিয়েছেন—বাণীর মানসিক স্বাস্থ্য একেবারে নিখুঁত। ক্লিনিক্ মানে কেল্লা ফতে।

প। আঁয়, সুখী !

হ। চুপ্ কর দাদা। বড় কম ভোগান্তি করে ছাড়লি তুমি। রাজ্যভরে মানুষের আর ঘিয়ে হচ্ছে না কিনা। চলো মা'।

হে। অত জোরে টান্‌ছিস্ কেন ! পড়ে যাবো যে। কী যে ঘটি একগাদা হয়েছিস্ তুই। (উভয়ের নিষ্ক্রমণ—বাইরে শাঁখ বেজে উঠল।)

পরমাণু-বোমা

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এসসি

"এই প্রচণ্ড তেজ যেমন মানবের কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে তেমনি ধ্বংসাত্মক কার্যেও অনুরূপ সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ডিনামাইট ফাটাইয়া বা বোমা বিস্ফোরণে যে রূপ কার্য করা হয় তাহার মূল কথা অতি অল্পকাল মধ্যে প্রচুর তেজ উৎপন্ন করা। তিল পরিমাণ ইউরেনিয়াম (২৩৫) প্রয়োগে একটি অতিকায় যুদ্ধ-জাহাজকে ঘায়েল করা যাইতে পারে—যে কার্য করিতে বর্তমানে হাজার হাজার মণ ভারী উপাদানের দরকার হয়।

আজ যাহা স্পষ্ট কল্পনার রহিয়াছে অদূর ভবিষ্যতে তাহা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। সেদিন কল্পনার কৌলীন্যের অবসান ঘটিবে। বর্তমান কালের শক্তি উৎপাদনকারী অতিকায় যন্ত্রদানবেরা ক্ষুদ্র ইউরেনিয়ম কণিকার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া অবসর গ্রহণ করিবে—একথা হয়ত নিছক কাহিনী বা কল্পনা নয়।"

—১৩৫১ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত কোন সাময়িক পত্রিকায় লিখিত লেখকের একটি প্রবন্ধের উপসংহারে উদ্ধৃতরূপ মন্তব্য ছিল। তারপর ১৩৫২ সালের ২১শে শ্রাবণ পরমাণু বোমার শক্তিতে জাপানের হিরোসিমা নগর নিমেষে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ২,৮০০০০ লোক মুহূর্ত মধ্যে ভস্মীভূত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক মহলে পরমাণু বোমার আবির্ভাব আকস্মিক বা অচিন্তনীয় না হইলেও নিখিল-বিশ্বজনের মনে অন্য কোন আবিষ্কারই এতটা অনুসন্ধিৎসা জাগায় নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মনেই প্রশ্ন—কি রহস্য সেই তেজ-বিশ্লেষণে, যাহার শক্তিমত্তায় যে মুষ্টি আতি বৎসরের পর বৎসর বিশ্বে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল তাহার পদ্মা নিবীর্য হইয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। এই গোপন শক্তির উৎস নিহিত রহিয়াছে পরমাণুর অন্তরে। পরমাণু বোমাকে চিনিতে হইলে পরমাণুর স্বরূপ জানিতে হইবে।

বিশ্বে পদার্থ অগণিত হইলেও মৌলিক পদার্থের সংখ্যা নির্দিষ্ট—মাত্র ৯২টি। এই ৯২টি মৌলিক পদার্থের স্বতন্ত্র গুণ ও ধর্ম রহিয়াছে। ইহাদের দুই বা ততোধিকের নানাপ্রকার সম্মিলন ও সংবিশ্লেষেই যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি। পদার্থের পরমাণু বা 'এটম' যাহাকে বলা হয়, তাহা এই ৯২টি পদার্থেরই সূক্ষ্মতম ও অবিভাজ্য অংশ। মৌলিক ৯২ রকম পরমাণু ছাড়া আর কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। পরমাণুকে একদাকালে অবিভাজ্য মনে করা হইত, কিন্তু পরবর্তীকালে পরমাণুর অবিভাজ্যতা পরীক্ষা দ্বারা খণ্ডিত ও মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এতাবৎকাল পরমাণুকে ভাঙা যাইত না তবে উহারা কখন কখনও নিজেরাই ভাঙে

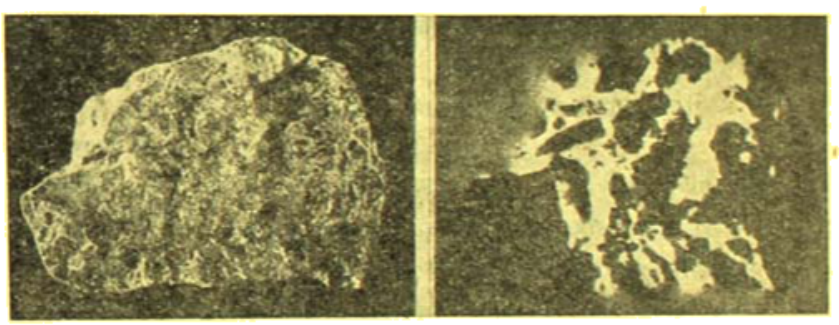

ইউরেনিয়ম কণিকা প্রতায় সিচরেড বিবাদোকে গৃহীত ফোটো (বামে)

অন্ধকারে গৃহীত ফোটো (দক্ষিণে)

সেটা বহু পরে ধরা পড়িয়াছিল। পরমাণু ভাঙিলে তাহা হইতে তিন রকম কণিকা পাওয়া যায়, তা সে পরমাণু যে পদার্থেরই হউক না কেন। অর্থাৎ পরমাণু ভাঙিয়া গেলে তখন আর তার মৌলিকত্ব থাকে না। পরমাণু তৈয়ারীর উপাদান মোটামুটি তিন জাতীয় ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। অধিক বিশ্লেষণে অবশ্য আরও তিন রকম কণিকার অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে, পজিট্রন, মেসন ও নিউট্রনো—তবে সেগুলি আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত। ইহাদের মধ্যে ইলেকট্রন খুবই

হালকা কণিকা এবং ইহার যে বিশেষ গুণ রহিয়াছে তাহারই প্রভাবকে আমরা বলি বেতার তড়িৎ। ইলেকট্রনকে তাই বলা হয় বেতার তড়িৎপ্রসূ। প্রোটন কিন্তু খুব ভারী কণিকা—অন্তত্তঃ লক্ষ ইলেকট্রনের তুলনায়। ইহার গুণ ইলেকট্রনের বিপরীত, বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে পজিটিভ তড়িৎপ্রসূ। নিউট্রনে কোন তড়িৎ সংস্রব নাই কিন্তু ইহার প্রোটনের মতই ভারী। এই তিন জাতীয় কণিকারা বিভিন্ন সংখ্যায় ছোট বাঁধিয়া এক একটা পদার্থের পরমাণু তৈয়ারী করে। এই ছোট বাঁধিবার একটা আইন আছে। সকল রকম পরমাণুতেই ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকিবে এবং তাহা ছাড়া ইলেকট্রন প্রোটনের সংখ্যানুযায়ী অল্পাধিক নিউট্রনও থাকিবে। মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস সব চেয়ে হালকা পদার্থ, ইহার পরমাণুর উপাদান ও গঠন খুবই সাধারণ—একটিমাত্র প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন।

পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রোটন ইলেকট্রনের পারস্পরিক অবস্থাটা অনেকটা আমাদের সৌরজগতের মত বলিয়া কল্পনা করা হয়। সূর্য

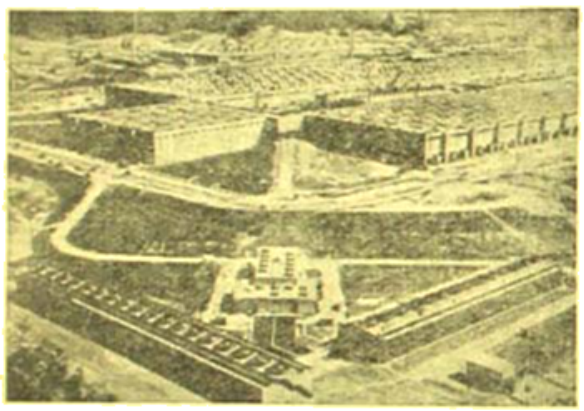

পরমাণু বোমার কারখানা (টেনেসী ভ্যালী)

(গ্রহদের তুলনায়) ভারী পিণ্ড—গ্রহগুলি অনেকটা দূরে থাকায় রশ্মির মুখকে পরিচালন করে। পরমাণুগুলির এক একটি খুব খুদে সৌরজগৎ। কেন্দ্রে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন, ভারী কণিকাগুলি। ইহারা খুবই শক্ত বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে আটকান থাকে। ইহাদের সে বাঁধন আলগা করা খুব সহজ ব্যাপার নয়—দুএকটাই ছুট, তবে এখন আর অসম্ভব নয়। এই কণাটা পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস। কেন্দ্রকের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায় প্রোটনের সমানসংখ্যক ইলেকট্রনেরা কতকগুলি নির্দিষ্ট কক্ষপথে। একজোড়া, দুইজোড়া, তিনজোড়া করিয়া প্রোটন ইলেকট্রন নিয়া একটার পর একটা পদার্থের পরমাণু তৈয়ারী হইয়াছে। হাইড্রোজেন যেমন সব চেয়ে হালকা পদার্থ তেমনি আবার ইউরেনিয়াম সব চেয়ে ভারী পদার্থ, হাইড্রোজেনের চেয়ে ২৩৮ গুণ ভারী। ইউরেনিয়মের কেন্দ্রকে আছে, ৯২টি প্রোটন আর তাহারই সঙ্গে ১৪৬টি নিউট্রন। কেন্দ্রকের বাহিরে ঘুরিবার ৯২টি ইলেকট্রন। পদার্থের পরমাণুর নিজস্ব গুণ ও ধর্ম নির্ভর করে পরমাণুস্থ প্রোটনের (তথা ইলেকট্রনের) সংখ্যার উপরে—কিন্তু পরমাণুর ওজন নির্ণীত হয় কেন্দ্রকের প্রোটন নিউট্রনের সংখ্যা দ্বারা। পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা পরিবর্তিত হইলেই এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয় কিন্তু কেন্দ্রকে নিউট্রনের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইলে পদার্থের মৌলিকত্ব বদলায় না—বদলায় কেবল পরমাণুর ওজন। এই রকম সমধর্মী অথচ বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর নাম 'আইসোটোপ'। 'আইসোটোপ'গুলি যেন মজার জিনিষ। দুইটি পরমাণু সর্বাংশেই এক—কোন কিছুতেই তাহাদের বিভিন্নতা ধরা পড়িবে না—কিন্তু ওজন করিয়া দেখিতে গেলে উহাদের বৈষম্য ধরা পড়িবে। অনেক মৌলিক পদার্থেরই এমনই একাধিক ওজনের পরমাণু আছে। হাইড্রোজেনের দুই রকম পরমাণু পাওয়া যায়। একটির কেন্দ্রকে মাত্র একটি প্রোটন—অন্যটির কেন্দ্রকে একটি প্রোটনের সঙ্গে জড়িত হইয়াছে একটি নিউট্রন। এই জন্য পরমাণুর ওজন দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে। এই ভারী হাইড্রোজেন পরমাণু কেন্দ্রকের নাম 'ডয়টরণ'। পূর্বোক্ত ইউরেনিয়মের পরমাণবিক ওজন ২৩৮, কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও এক জাতীয় ইউরেনিয়ম আছে যাহার কেন্দ্রকে নিউট্রনের সংখ্যা ১৪৬টির

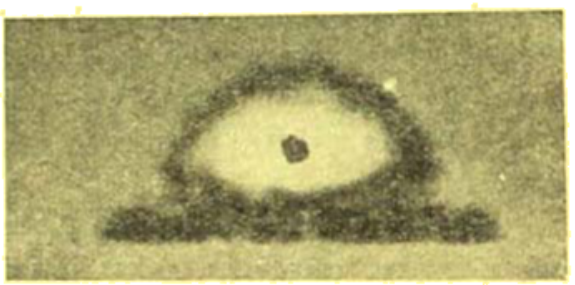

কিরণের তুলনা—মধ্যাহ্নের তাপমাত্রা সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় (৬০০০ ডিগ্রী)

স্থলে ১৪৩টি। এই জাতীয় ইউরেনিয়মের পরমাণবিক ওজন ২৩৫—ইহার বিশেষ নাম 'অ্যাকটিনো-ইউরেনিয়ম' সংক্ষেপে লেখা হয় ইউরেনিয়াম—২৩৫।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন—মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ৯২টি কেন? ৯৩ বা অতোধিক প্রোটন নিয়ে পদার্থের পরমাণু কেন্দ্রক তৈয়ারী হয় নাই কেন? এক, দুই, তিন, করিয়া ৯২টি প্রোটন নিয়া মোট ৯২টি পদার্থ তৈয়ারী করিতে করিতে প্রকৃতি হঠাৎ থামিয়া গেলেন কেন? কী তার রহস্য? ইহার উত্তর খুঁজিতে যাইয়া বিজ্ঞানী দেখিতে পাইলেন যে ঐ পর্যন্ত আসিয়া প্রকৃতি ওঁর নিজের আইনেই আটকাইয়া গিয়াছেন। প্রোটনের পজিটিভ-তড়িৎপ্রসূ সে কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তড়িতের ধর্মানুযায়ী সমজাতীয় তড়িৎ কণিকা পরস্পরকে দূরে ঠেলিয়া দেয়, একত্রে থাকিতে চায় না। হাইড্রোজেনের পরে দুইটি প্রোটন নিয়া গঠিত হইয়াছে যে পরমাণু তাহার নাম হিলিয়ম। ইহার কেন্দ্রকের গঠন বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, দুইটি প্রোটন ছাড়া সেখানে দুইটি নিউট্রনও আছে। পরস্পর বিকর্ষণকারী

দুইটি প্রোটনকে স্থায়ীভাবে একত্র রাখিবার জন্য সেখানে আরও দুইটি নিউট্রন জুড়িয়া দিতে হইয়াছে। এমনি করিয়া পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা বত বাড়িতে থাকে সেখানে সমতা ও স্থায়িত্ব রাখিবার জন্য আরো বেশী করিয়া নিউট্রন জুড়িয়া দিতে হয়; কিন্তু তারপর এমন একটা অবস্থা আসে যখন নিউট্রনের শক্তি দিয়াও প্রোটনদের আর বাঁধিয়া রাখা যায় না, কেন্দ্রক হইতে প্রোটন মাঝে মাঝে স্বতঃই বাহির হইয়া আসে। সবচেয়ে ভারী পরমাণু য়ুরেনিয়মের—৯২টি প্রোটন সেখানে একত্র রহিয়াছে—কিন্তু তার কেন্দ্রকে তাহন লাগিয়াই আছে। একটি একটি করিয়া প্রোটন কেন্দ্রক হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়—য়ুরেনিয়ম পরিণত হয় অন্য পদার্থে। য়ুরেনিয়ম থেকে রেডিয়ম—রেডিয়ম থেকে সীসা। সীসায় আসিয়া যখন পৌঁছায় তখন পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮২। তারপর আর ভাঙে না—তখন একটা স্থায়ী অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। রেডিয়ম ও য়ুরেনিয়মের যাহা কিছু ওপাধনী তাহা এই স্বতঃভঙ্গপ্রবণতা বা প্রোটন ইলেকট্রন মুক্ত

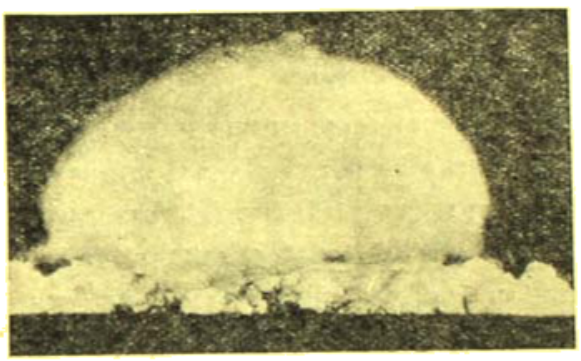

হিরোশিমার পরবর্তী অবস্থা, উত্তপ্ত বায়ু রাশি ক্রমে বড় হইতেছে।

করিয়া দিবার স্বভাবের জন্যই নিহিত। মোটের উপর বলা যায় যে ৮২টির বেশীসংখ্যক প্রোটন কেন্দ্রকে একত্রিত হইলেই উহারা অস্থির হইয়া উঠে এবং ভঙ্গপ্রবণ হয়, এই জাতীয় পদার্থগুলিই তেজস্ক্রিয় বা 'রেডিও একটিভ'। আণবিক ভঙ্গপ্রবণতা সত্ত্বেও ৮২টি পর্যন্ত প্রোটন নিউট্রনের সাহায্যে কোন রকমে একত্র থাকে, কিন্তু তার চেয়ে বেশীসংখ্যক এক সঙ্গে থাকিতে পারে না বলিয়াই মৌলিক পদার্থের সংখ্যা বিরাসব্বইতে আসিয়া শেষ হইয়াছে।

ইতালীর বিজ্ঞানী ফারমী চাইলেন বিষ্কর্ষার উপরে কেরামতী করিতে। তাঁহার খেয়াল চাপিল য়ুরেনিয়মের চেয়েও ভারী পরমাণু নির্মাণ করা চলিবে না কেন? তিনি পরিকল্পনা করিলেন য়ুরেনিয়মের কেন্দ্রকে ১টি নিউট্রন জুড়িয়া দিবেন। নিউট্রনের কোন তড়িৎ সম্পর্ক নাই, সুতরাং উহাকে স্থান দিতে কেন্দ্রকের প্রোটনের কোন আপত্তি হইবার কারণ নাই এবং য়ুরেনিয়ম কেন্দ্রকে একটি নিউট্রন স্থান পাইলে উহার ওজন হইবে ২৩৯। ফারমীর যুক্তিতে অবশ্য কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু পরমাণুকেন্দ্রকে নিউট্রন লাগিবে কি করিয়া? তৎকালে নিউট্রন পাওয়া যাইত বেরিলিয়ম থেকে। বেরিলিয়মকে রেডিয়মের সঙ্গে একসঙ্গে রাখিয়া দিলে বেরিলিয়ম পরমাণু কেন্দ্রক হইতে চীরকণা নিউট্রন বাহির হইয়া আসে। এই রকম বেরিলিয়মকে ফারমী য়ুরেনিয়মের সঙ্গে রাখিয়া দিলেন। যদি দৈবাৎ কোন নিউট্রন আপন গতিপথে য়ুরেনিয়মের পরমাণুকেন্দ্রকের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটায় (সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা কম) এবং তারই কোনটা সেখানে আটক পড়িয়া যায় তবেই নবতম পরমাণু তৈয়ারী হইবে। এমনি পরীক্ষা করিবার পর দেখা গেল, সত্যি নূতন কয়েকটি পদার্থের পরমাণু পাওয়া যাইতেছে। তাহারা য়ুরেনিয়ম নয় অন্য কিছু। ফারমী ভাবিলেন, নূতন পরমাণু তৈয়ারী করিয়াছেন। তারপর আরও পরীক্ষা চলিতে থাকিল। অবশ্য ফারমীর পরিকল্পনা বা শ্রম সে সব পরীক্ষায় সফল হইল না। জার্মানীর হান ও মিট্নার পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে ফারমীর পরীক্ষায় নূতন মৌলিক পদার্থ তৈয়ারী হয় নাই; তবে যাহা হইয়াছে তাহা আরও বিস্ময়কর, একান্ত অভাবনীয়, এ তাবৎকাল মানুষে যাহা পারে নাই তাহাই সম্ভব হইয়াছে। নিউট্রনের সংঘর্ষে য়ুরেনিয়ম পরমাণু ভাঙিয়া

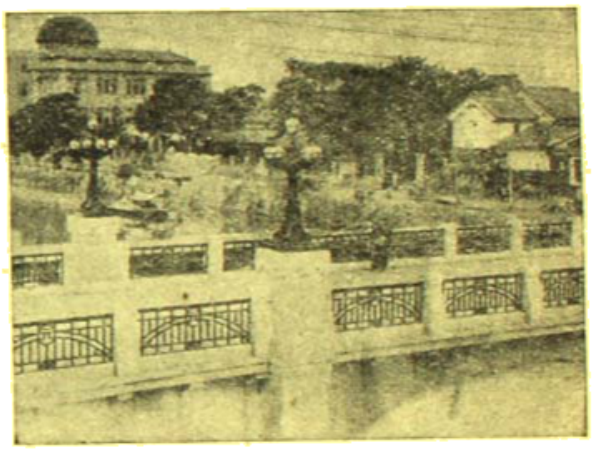

হিরোসিমা নগর

দুই টুকরা হইয়া গিয়াছে—একভাগে গিয়াছে ৫৩টি প্রোটন ও অপরভাগে রহিয়াছে ৩৯টি প্রোটন, একটি হইয়াছে বেরিয়ম ও অপরটি ইটনিয়ম জাতীয় পদার্থের ভঙ্গপ্রবণ পরমাণু।

ব্যাপারটি সত্যিই অসামান্য। এক মৌলিক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ তৈয়ারী করা মানুষের চিরন্তন স্বপ্ন। লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিবার জন্য ক্ষ্যাপা চিরকাল পরশপাথর খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। দৈবাৎ সেই পরশপাথরের সন্ধান পাওয়া গেল।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, য়ুরেনিয়ম পরমাণু ভাঙিয়া দুই টুকরা হইল কেন? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে য়ুরেনিয়ম পরমাণুতে প্রোটনেরা সব সময় অবস্থানেই থাকে, উহারা চায় বাঁধন ভাঙিতে। বাহিরের দিক হইতে নিউট্রনের আঘাত পাইয়া আঘাতটা সহ্য হইল। য়ুরেনিয়মের পরমাণু শুধু ভাঙিল তাই নহে, যে দুইটি খণ্ড হইল তাহারা প্রচণ্ডবেগে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। যে শক্তির বাঁধনে উহারা একত্রে থাকে উহাদের মুক্ত করিয়া দিলে সে শক্তি আত্মপ্রকাশ করে।

ইউরেনিয়মের পরমাণু ভাঙিবার পর দেখা গেল যে দুইটি খণ্ড হইতে উহাদের একত্রিত ওজনের মূল পরমাণুর চেয়ে সামান্য কম। যে পদার্থটুকু এইভাবে লোপ পাইল, তাহাই শক্তিরূপে দেখা দিল। তারপরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইল যে—পদার্থের পরমাণুতে প্রচুর শক্তি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে এবং তাহা উদ্ধার করা অসম্ভব। ইতিপূর্বে আইনষ্টাইন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে পদার্থের বিলোপ-শক্তি উৎপাদন সম্ভব। কয়লা পোড়াইয়া আমরা যখন তাপ উৎপাদন করি তখন কয়লার পরমাণুকে ভাঙিয়া সেই অক্সিজেনের পরমাণুর সঙ্গে। এই মিলন প্রসঙ্গে কয়লা খানিকটা তাপ ত্যাগ করে—কালিমা থেকে মুক্তি পাইবার অতিপাতরূপে দেয় সে তাপশক্তি। কয়লার পরমাণু অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়া গ্যাসে পরিণত হয়—এখানে পরমাণুর রূপান্তর হয়, বিলোপ নহে। আইনষ্টাইন বলেন, একগ্রাম কয়লার পদার্থকণার বিলোপ করিয়া দিতে পারিলে যে তাপ পাওয়া যাইবে তাহা আড়াইলক্ষ মণ কয়লাকে গ্যাস করিয়া যে তাপ উৎপন্ন হইবে তাহার সমান হইবে।

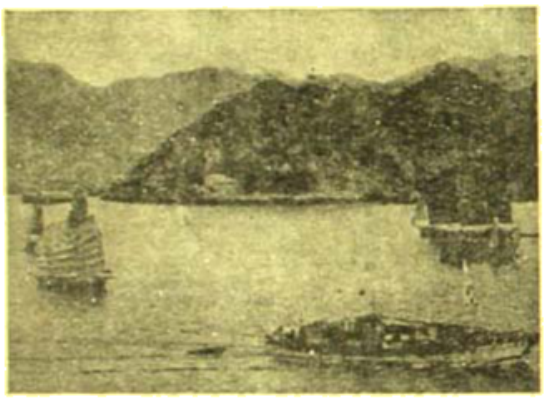

নাগাসাকী বন্দর

আইনষ্টাইন অবশ্য এটা সম্পূর্ণরূপে কাগজকলমের হিসাবে দেখাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে কয়েকটি রশ্মির পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে সত্য সত্যই পদার্থের বিলোপে তেজের উদ্ভব হইয়া থাকে। এখনে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে সূর্য ও নক্ষত্রেরা যে মোটেই ক্ষয় না হইয়া কোটি কোটি বৎসর তেজ বিকীরণ করিতেছে তার মূলেও এই তত্ত্বই। যেমনি পদার্থের সম্পূর্ণ বিলোপে তেজ পাওয়া যায় তেমনি পরমাণুর রূপান্তরেও (এক পদার্থ হইতে অন্যপদার্থে) তেজের উদ্ভব হয়। ইউরেনিয়ম যখন রেডিয়ম ভাঙিয়া যখন সীসা ও হিলিয়ম গ্যাসে পরিণত হয় তখন দেখা যায় মূল ইউরেনিয়মের যাহা ওজন ছিল উৎপন্ন সীসা ও হিলিয়মের একত্রিত ওজন তাহার চেয়ে সামান্য কম। রেডিয়ম হইতে যে তাপ ও তেজ নির্গত হয় উহা ঐ সামান্য পরিমাণ পদার্থের বিলোপের ফল। তারপরীক্ষায় পরমাণু খণ্ডীভূত হইবার পর খণ্ডদয় যে বেগপ্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাও ঐ প্রকার পদার্থের বিলোপসম্ভূত। বেগপ্রাপ্ত কণিকাকে বাধাপ্রদান করিলে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে উৎপন্ন তাপের হিসাব করিলে দেখা যাইবে, প্রতিটি পরমাণুর অন্তরে কি বিরাট শক্তি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। অর্ধ পাউণ্ড ইউরেনিয়মকে দুই টুকরা করিয়া দিলে যে তাপ পাওয়া যাইবে কয়লা পোড়াইয়া সেই পরিমাণ তাপ পাইতে হইলে মোটামুটি হিসাবে পাঁচলক্ষ টন কয়লার দরকার হইবে।

কিন্তু ইউরেনিয়মকে ভাঙা বড় সহজ নয়। নিউট্রণের আঘাতে ইউরেনিয়ম পরমাণু ভাঙে বটে, কিন্তু সে নিয়মটাই বৈশাখীন। একটিমাত্র ইউরেনিয়মের পরমাণুকে নিউট্রনে ছিন্ন ভিন্ন করিতে থাকিলে—একের পর ২৫টি শূন্য বসাইলে যে সংখ্যা হয়—তত্তটির ভিতরে একটি মাত্র ছিন্ন পরমাণুকেন্দ্রকে পৌঁছিবার সম্ভাবনা, বাকিগুলি ঐ পরমাণুর অন্তর দিয়া নির্বিঘ্নে চলিয়া আসিবে বা কেন্দ্রককে আঘাত করিলেও সেখানে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবে না। সুতরাং তারপরীক্ষার মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা থাকিলেও বৈজ্ঞানিক জগতে আণবিক্ষণের আশা জাগাইল না।

কিছুদিন পরে বোহর জানাইলেন যে ২৩৫ ওজনের ইউরেনিয়ম পরমাণুকে খুবই কম বেগের নিউট্রণ দ্বারাও ভাঙা যায় এবং এই পরমাণু বেশী তড়িৎপ্রবণ। এই ইউরেনিয়মের একটি মাত্র পরমাণু বিখণ্ডিত হইলে ৩টি নিউট্রণের জন্ম হয়, এই নবজাত নিউট্রনেরা আবার ইউরেনিয়ম পরমাণুকে ভাঙিবার ভাকে লাগে। এইরূপ ধারাবাহিক নিউট্রণের জন্মের ফলেই ইউরেনিয়ম বিভাজন সহজ ও নিশ্চিত হইয়া থাকে। ফরাসী কার্যের দ্বারা ইহাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল যে নিম্নিষ্ট বেগসম্পন্ন নিউট্রনের আঘাতে ভারী ইউরেনিয়মের রূপান্তরে ৯৩টি প্রোটনবিশিষ্ট একটি নূতন মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। এই নূতন পদার্থের নামকরণ হইয়াছে নেপচুনিয়ম; নেপচুনিয়ম আবার স্বতই নূতন আর একটি পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তাহার নাম প্লুটোনিয়ম। ইহাতে ৯৪টি প্রোটন থাকে। এই রকম কোন মৌলিক পদার্থের স্বাভাবিক অস্তিত্ব নাই। প্লুটোনিয়ম ইউরেনিয়মের চেয়ে বেশী তড়িৎপ্রবণ এবং এই জন্য ইহাকে ভাঙিয়া তেজ বিকাশের অপেক্ষাকৃত সহজ।

ইউরেনিয়মকে চূর্ণ করিয়া তেজোৎপাদনের সূত্র পাইয়া সকল দেশের বৈজ্ঞানিক মহলে এতদ্বিষয়ে যে কার্য চলিতেছিল ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহা-সমরে তাহা ভয়াবহ রূপ লইয়া দেখা দিল। পরমাণুর তেজকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। ইহাকে জ্বালে কার্যে ব্যবহার করিয়া পক্ষ উদ্ভাবনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক উৎসাহিত বিজ্ঞানী দল কাজে লাগিলেন। জার্মানীতে বাকি এই বিষয়ে অনেকটা কাজ হইয়াছিল, সে খবর অবশ্য এখন আর জানিবার উপায় নাই। আমেরিকা ও বৃটেনের সম্মিলিত চেষ্টায় কয়েকটি দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞানী এতদ্বিষয়ে ব্রতী হইলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে প্রচুর ইউরেনিয়মের খনির প্রস্তাব সংগৃহীত হইল। আমেরিকার টেনেসিভ্যালীর ওকরীজে পরমাণু বোমা তৈয়ারী করিবার জন্য প্রথমে একটি বিরাট কারখানা ও শহর নির্মিত হইল। এখানে লক্ষাধিক লোক কাজ করিত। প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল পদার্থই কারখানায় প্রবেশ করিত—কিন্তু খুব কম লোকেই জানিত, শেষ পর্যন্ত কি করিয়া কোথায় কি তৈয়ারী হইতেছে।

য়ুরেনিয়াম অতি দুষ্প্রাপ্য পদার্থ। পিচব্লেণ্ড নামক খনিজ প্রস্তরে খুবই সামান্য অনুপাতে য়ুরেনিয়ম পাওয়া যায়। বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় দ্বারাই য়ুরেনিয়মের উদ্ধার কার্য সম্ভব। তারপর উহাকে য়ুটোনিয়মে রূপান্তরিত করিতে হইবে, অথবা উহা হইতে য়ুরেনিয়ম—২৩৫কে পৃথক করিতে হইবে। আসল য়ুরেনিয়মের সঙ্গে এই য়ুরেনিয়ম থাকে ১৩৯ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। উহাকে সহজ উপায়ে পৃথক করা যায় না। খুব আয়াসসাধ্য প্রক্রিয়ায় দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়া ইহাকে পৃথক করিবার ব্যবস্থা আছে। এক গ্রামের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সংগ্রহ করিতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। আমেরিকার কারখানায় পরমাণু বোমা তৈয়ারী করিতে ৫০ কোটি পাউণ্ড খরচ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

অল্পই পরিমাণে য়ুরেনিয়ম-২৩৫ সংগৃহীত হইবার পর তদ্দ্বারা বোমা নির্মিত হইয়াছিল। এই বোমা নির্মাণের পদ্ধতি গোপন রাখা হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম অনুমান করিয়াছেন। এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা সম্ভব নহে। পরমাণু বোমার মূল কথা হইবে, সামান্য পরিমাণ য়ুরেনিয়ম—২৩৫ অথবা য়ুটোনিয়ম কোন একটা শক্ত আবরণের ভিতরে বন্ধ করিয়া লইতে হইবে। ইহার কাছেই থাকিবে নিউট্রন উৎপাদন করিবার কোন রাসায়নিক ব্যবস্থা। একটি বিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রথমে য়ুরেনিয়মের পরমাণুগুলিকে অল্প পরিমাণে কয়েকটি স্থানে পৃথক ভাবে রাখা হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল যে য়ুরেনিয়মের একটা ন্যূনতম মাত্রা আছে—যাহার কম পরিমাণ য়ুরেনিয়মকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিলেও ভাঙে না। এই ন্যূনতম মাত্রাতেও কম পরিমাণ য়ুরেনিয়মকে পৃথক রাখা হয়। তারপর যথাসময়ে যাহা ব্যবস্থা সমস্তটুকু য়ুরেনিয়ম একত্রিত হইলে নিউট্রনের সংস্পর্শে তখন বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের সঙ্গে প্রচণ্ড তাপ উদ্ভূত হয়—এবং ইহার ফলে বায়ু মণ্ডলে বিস্ফোরণের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

পরীক্ষার্থ প্রথম বোমা নিউ মেক্সিকোর অন্তর্গত আলমুকার্কের ১২০ মাইল দূরবর্তী স্থানে মরুভূমিতে বিস্ফোরণ করান হয়। ১৬ই জুলাই (১৯৪৫) পূর্বাহ্নে ৫-৩০ মিনিটে এই প্রলয়ঙ্করী বোমা বিস্ফোরিত হয়। ৪০ মাইল দূরে থাকিয়া প্রত্যক্ষদর্শীরা এই বিস্ফোরণের ফোটো গ্রহণ করেন। তাহাদের বিবরণীতে জানা যায় যে প্রথমে সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল একটা আগুনের গোলক দেখা গেল। দুই এক সেকেণ্ড পরে ইহার উজ্জ্বলতা একটু কমিয়া গেল এবং ধীরে ধীরে আকারে বড় হইতে লাগিল। তারপর ছত্রাকের আকৃতিতে বিরাট ও ভীষণ উত্তপ্ত বায়ুরাশি প্রচণ্ড শব্দ করিয়া গগন স্পর্শ করিল। এই বায়ু এত গরম হইয়াছিল যে ইহা হইতে আলো বিকীরিত হইতেছিল। সে যেন একটা নূতন সূর্য—তাহার প্রভায় সমস্ত দিক উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শব্দের সঙ্গে প্রচণ্ড কম্পন। বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত মেঘজাল ৫০ হাজার ফিট উর্ধ্বে উঠিল। যে লৌহ নির্মিত স্তম্ভ হইতে বোমাটি বিলম্বিত হইয়াছিল বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সেটি স্থান হইতে বাতাসে মিলাইয়া গেল। বায়ুমণ্ডলে যে বিস্ফোরণ ঘটিয়াছিল তাহাতে দশ হাজার গজ দূরবর্তী লোকেরা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে নাই। আলোর উজ্জ্বলতা চোখ ধাঁধাইয়া দিয়াছিল। বিশ মাইল দূরে বসিয়া কালো কাঁচের চশমা চোখে দিয়াও যে আলো দেখা গিয়াছিল তাহার উজ্জ্বল্য শাদা চোখে দেখা সূর্যালোকের চেয়েও অনেক বেশী।

এই পরীক্ষার পর ৬ই আগষ্ট (১৯৪৫) জাপানের হিরোসিমা বন্দরের উপর প্রথম বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। তার তিন দিন পর দ্বিতীয় বোমা পড়ে নাগাসাকীতে। প্রকাশ হিরোসিমাতে ২৮ হাজার ও নাগাসাকীতে ১০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, বেশীর ভাগ লোকই প্রচণ্ড তাপে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তারপর? পরমাণু গহ্বরের তেজ-ভাণ্ডার মানুষের কাছে এখন উন্মুক্ত হইয়াছে। য়ুরেনিয়মকে দুই টুকরা করিয়া যে তেজ পাওয়া যাইতেছে উহা প্রচণ্ড বটে, কিন্তু সমস্ত পরমাণুর অন্তর্নিহিত তেজ বিস্ফোরিত হইলে ইহা হইতে সহস্রগুণ তেজ পাওয়া যাইবে। কেহ কেহ মনে করেন পরমাণুকে সম্পূর্ণরূপে তেজে রূপান্তরিত করা অসম্ভব নহে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সে কৌশলও মানুষের করায়ত্ত হইবে। যদি সত্য হয় তবে সৃষ্টি ও সভ্যতা ধ্বংস করিবার শক্তি মানুষের হাতে আসিবে। প্রচণ্ড তেজ-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি হাতে পাইয়া ভবিষ্যতের মানুষ তাহাকে কি ভাবে ব্যবহার করিবে বলা যায় না। কিন্তু শক্তির এই অসদ্ব্যবহারে বিশ্বমানবের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একথাও নিশ্চিত যে এই রহস্য চিরকাল জাতিবিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। অদূর ভবিষ্যতে এই আবিষ্কারের স্বরূপ সকলের কাছে উন্মুক্ত হইবেই। সুতরাং ধ্বংস কার্যে ইহার ব্যবহার করিবার প্রশ্ন বৃহত্তর আর থাকিবে না। সেদিন মানুষের কল্যাণেই পরমাণুর তেজ ব্যবহৃত হইবে—এই আশা করা যাইতে পারে।

পরমাণু বোমার সাহায্যে ধরাপৃষ্ঠের অদ্ভুত পরিবর্তন সংঘটিত করান যাইতে পারে। বিরাট হ্রদ বা জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়া মরুভূমিকে শস্য-শ্যামলা করিয়া তোলা যাইবে। পৃথিবীর যে সব স্থান একান্ত শীতল (যেমন মেরুমণ্ডল) সেই সব স্থানে তাপের ব্যবস্থা করিয়া শৈত্য দূর করা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত জাহাজ বা রেলওয়ে ট্রেণ চালাইতেও পরমাণুর তেজ ব্যবহৃত হইতে পারে।

কিন্তু এত সব শুভ পরিকল্পনার মূলে রহিয়াছে মানুষের শুভবুদ্ধি। শুভবুদ্ধি জাগ্রত না হইলে নিশ্চয়ে পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। কৌতুক করিতে গিয়া বহুফুল যে ফুলের সৃষ্টি করিয়াছিল—ভবিষ্যতে সেই ফুলই হইল তাহাদের ধ্বংসের কারণ। কলির বৈজ্ঞানিক ফুলের পরিণতি কি হইবে কে জানে? ইটালীকেশরী জাপানী ও জার্মান বাঘেদুত্ত আজ হাল—ইহাদের আবিষ্কারই পরমাণু বোমার গোড়ার কথা—অক্ষ শক্তির দুই অংশীদারের প্রতিভা বিয়োজিত হইয়াছিল তৃতীয়ের ধ্বংসসাধনে। অদৃষ্টের কি পরিহাস।

হাসি ও অশ্রু

শ্রীমতী মীরা ঘোষ

১

ইতিহাসের অধ্যাপক, বিনয় কুমার দত্ত মহাশয় হাতে একটা অলস চুরুট ধরিয়া দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় গভীর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

"কিগো আজ কি শুধু খবরের কাগজ পড়লেই হ'বে নাকি? কলেজে যাবে না, সময় ত হয়ে গেল?" অধ্যাপক মহাশয় পত্রিকা হইতে মুখ তুলিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এই যে উঠি। ওঃ, অনেক বেলা হয়ে গেছে দেখি; জাগ্যিস্ তুমি ডেকে দিলে, না হ'লে ত আজ কলেজেই যাওয়া হ'ত না।"

পরম তৃপ্তিভরে মাছের ঝোলসহ ভাত খাইতে খাইতে বিনয়বাবু বলিলেন, "এত আয়োজন করতে পার তুমি অল্প সময়ের মধ্যে! চমৎকার হয়েছে মাছের ঝোল!"

"থাক্, আর বেশী বকতে হ'বে না, খাও এখন। ঠাকুরকে বলি মুড়িঘন্টটা এনে দিতে।" মণিকা চুড়ির গোছা নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া গেলেন।

সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া বিনয়বাবু তাঁহার বেতন-বৃদ্ধির সংবাদ মণিকাকে হাসিতে হাসিতে দিলেন। শুনিয়া মণিকা বলিল, "তা'হলে বল এবার আমার সেই নেক্‌লেস্‌টা কিনে দেবে?" পত্নীর মুখে প্রেমবিমুগ্ধ দৃষ্টি ফেলিয়া স্নিগ্ধ-স্বরে বিনয়বাবু উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়ই গো নিশ্চয়ই, ভাবনা কর'না, এবার তোমায় নেক্‌লেস্ আর একটা বেনারসী শাড়ী কিনে দোবোই।"

"আর দেখ, পরশু কণিকার জন্মদিন, আমাদের ত নেমন্তন্ন আছে, ওকে কি দেওয়া যায়?"

"যা ইচ্ছে তোমার, আমি কি কোনোদিন তোমার কথার ওপর কথা বলেছি, না কোনো আপত্তি জানিয়েছি? তুমিই ত আমার লক্ষ্মী, তুমিই ত আমার সব।" বিনয়বাবু তিন বছরের কন্যা রেণুকে গভীর স্নেহে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। মণিকা হাসিমুখে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

২

অতুল মার্চেন্ট আপিসের মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনের কেরাণী, ঘড়িতে দশটা বাজিবার শব্দে সচকিত হইয়া উঠিয়া সে কোনোরূপে কাক স্নান করিয়া আহার করিতে বসিল। অঞ্জলি স্বামীর গম্ভীর মুখ দেখিয়া কোনো কথা বলিতে সাহস পাইল না, নীরবে পরিবেশন করিতে লাগিল।

অতুল আপিসে পৌঁছিয়াই শুনিল যে বড়বাবু তাহাকে ডাকিতেছেন। বড়বাবুর ঘর; অতুল নতমুখে গিয়া দাঁড়াইল। "আজ পনের মিনিট লেট্। অসম্ভব হয়ে উঠেছে আপনাকে রাখা; একদিনও ঠিক সময় উপস্থিত হ'তে পারেন না, ভবিষ্যতে এরকম হ'লে আপনাকে রাখা সম্ভব হবে না।" অতুল কিছু একটা বলিতে যায়; কিন্তু বড়বাবুর বিকট ধমকে সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল নিজের আসনে। অন্যান্য সহকর্মীরা তাহার ম্লান মুখ দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতে লাগিল। পরিমল জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদা, বড়বাবু কি মাইনে বাড়িয়ে দেবার সুখবর দিলেন নাকি?" অতুল পরিমলের দিকে ফিরিয়া চাহিল, তাহার দুই চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। তাহার প্রতি একটু সহানুভূতি প্রকাশ করে পৃথিবীতে কি এমন একটীও লোক নাই?

সেদিন রুক্ষ মেজাজে অতুল গৃহে ফিরিল। অঞ্জলি ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর জন্য চায়ের বাটী ও খাবারের রেকাবি নিয়া আসিলে অতুল তিক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "গরীবের আবার ঘোড়া রোগ কেন? নিয়ে যাও ও সব, লাগবে না আমার। রোজ আপিসে যেতে দেরী হচ্ছে, একদিনও কি তাড়াতাড়ি রেঁধে দিতে পার না? যা না ছাই রাঁধ। চাকরী গেলে পারবে সব না খেয়ে মরতে?"

বীরু একটা কাঠের বলের জন্য পিতার কাছে আব্দার করিতেছিল; হঠাৎ অতুল তাহার গালে চড় বসাইয়া দিল, বীরু কাঁদিয়া উঠিল।—"খেয়ে ফেল আমাদের, মেরে ফেল ছেলেটাকে—"বলিয়া অঞ্জলি চোখ মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তুষার-শ্রী

শ্রীবিজেন মল্লিক

ছুয়ারীয় সাহিত্যে—বিশেষ করে ইংরাজী এবং রুশ সাহিত্যে তুষারের বর্ণনা অফুরন্ত। শীতের উল্লেখে বরফের বর্ণনা সেখানে অপরিহার্য। সুন্দর-শিয়ালী মন আমাদের সে বর্ণনায় হয়ে উঠে বড়ই মুগ্ধ। সাদা কিছু দেখলেই তাই আমরাও বিদেশী ভাষাতেই বলে থাকি—"Snow white"। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে "তুষার-শুভ্র" কথাটার বিশেষ চলন আছে বলে মনে হয় না। এর কারণ অবশ্য এই হ'তে পারে যে ভারতবর্ষের অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভাগ্যেই এই অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনের সৌভাগ্য ঘটে থাকে। সাধারণতঃ একমাত্র শীত ঋতুতেই আমাদের দেশের উচ্চ পর্বতশ্রেণীগুলির উপরে তুষার পাত হয়ে থাকে। কিন্তু শীতকালে আমরা প্রায় সকলেই ঐ সকল স্থান ত্যাগ করে সমতল ভূমিতে নেমে যাই; সুতরাং তুষার-শ্রী বর্ণন আমাদের ভাগ্যে বড় একটা ঘটে উঠে না।

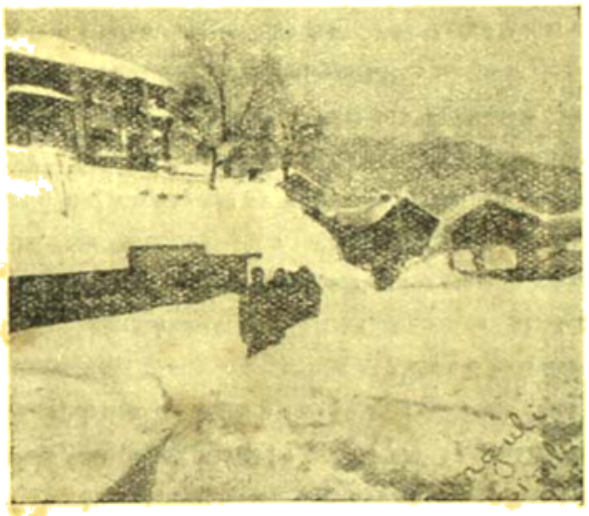

তুষারপাতে শিমলার দৃশ্য—১

কেন্দ্রীয় এবং পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট উভয়েরই গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শিমলায় কিছুদিন নিরবচ্ছিন্ন থাকার ফলে তুষার পাত সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এখানে তারই একটু আভাষ দেবার চেষ্টা করব।

বারো মাসই শীতের আমেজ থাকায় শিমলাকে শীতপ্রধান দেশ বলা চলে। সাধারণতঃ শীতের সময় এখানকার টেম্পারেচার ২২°।২৩° ডিগ্রীতে নেমে থাকে। সে সময়টা এখানকার অধিবাসীদের পক্ষে খুবই কষ্টকর সময়। বাংলাদেশের শীতের সঙ্গে এখানকার শীত-বস্তুর কোন তুলনাই চলে না। এই ভীষণ শীতের হাত হ'তে রক্ষা পাবার জন্যেই পূর্ব শীতের প্রারম্ভেই বস্ত্রাদি বিক্রী ও সংগ্রহের ধুমধাম সুরু হ'ত। শীতের সময় এখানে পাইন, ডেল্, চীড় ও রডোডেন্ড্রন্ জাতীয় বৃক্ষ ছাড়া অন্য কোন গাছের পত্রাদি একটিও থাকে না—প্রবল তুষারই এগুলিকে শুষ্ক বৃক্ষ বলেই প্রতীয়মান হয়। অবশ্য শিমলা পাহাড়ে এই জাতীয় বৃক্ষই বেশী। এরা কিন্তু চির সবুজ—চির নবীন।

প্রাকৃতিক কারণে এখানে বৎসরে দুবার বরফ হয় বেশের আবির্ভাব। একবার হয় শীতের সময়, আর একবার হয় বর্ষাকালে। শীতের সময় মেঘ বর্ষণের ফলে শিমলায় তুষার পাত হয়। সেই তুষার পাত সত্যই এক অপূর্ব দৃশ্য! যে যে কতো সুন্দর তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব! সে সময় মনে হয় যেন অদৃশ্য শিল্পী বুঝি আকাশ থেকে তাঁর রঙের পাত্র উজাড় করে অজস্র শুভ্র রঙের হোলী-খেলা সুরু করেছেন।

তুষারপাতে শিমলার দৃশ্য—২

সুরু এই তুষার কণিকাগুলি মনে হয় ঠিক যেন পেঁজা তুলোর মত। মেঘে সেই পেঁজা তুলো একটু একটু করে জমতে জমতে ক্রমে গাছ পালা, রাস্তাঘাট, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি সব কিছুরই উপরে বিছিয়ে দেয় একটা মসৃণ-শুভ্র আস্তরণ। চারিদিক শুধু সাদা আর সাদা—অনন্ত সাদা, বুঝি যা তার শেষ নেই। ঘুরে ও কাছে যতদূর দৃষ্টি চলে বিস্তৃত-প্রসারী মেঘাবৃতা পৃথিবী, আর উপরে অনন্ত আকাশ জুড়ে তোষ বলদানো শুভ্র চন্দ্রাতপ। সত্যই অতুলনীয়!

তুষার পাতের পরই শীতের তীব্রতা তত বেশী অনুভূত হয় না, যত বেশী হয় তার পর রোদ উঠলে। নরম তুষার-ঢাকা পথে প্রথম পথ চলতে বেশ আনন্দ লাগে, কিন্তু শেষের দিকে বেশী লোক চলা-চলের ফলে হয়ে উঠে ক্রমেই কঠিন ও পিচ্ছিল। তখন পথে চলা খুবই কষ্টকর। লোহার পাইক আটা লাঠিতে ভর করে অতি সাবধানে

চলতে হয়, নতুবা পা পিছলে আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা প্রতি পদক্ষেপে। আছাড় খাব কি এমন ভাঙি খুবই কম। শীতপ্রধান দেশবাসীর বরফের খোলা তৈরী করে ছোঁড়াছুড়ি খুবই উপভোগ্য।

শিমলায় তুষার পাত সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন—"অগ্রহায়ণ মাসের অর্দ্ধেক যাইতে না যাইতেই এক প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া উৎফুল্ল নেত্রে দেখি যে, পর্বত তল হইতে শিখর পর্য্যন্ত বরফে আবৃত হইয়া ধবলগিরি বেশ ধারণ করিয়াছেন। বরফে শীতল বায়ুর নিঃশ্বাস আমি এই প্রথম উপভোগ করিলাম। দিন যত যাইতে লাগিল, শীত ততই বাড়িতে লাগিল। একদিন দেখি যে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘ হইতে ঘুনিত লম্বু তুলার ন্যায় বরফ পড়িতেছে। প্রথমটা বরফ দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে বরফ প্রস্তরের ন্যায় বুঝি শক্ত এবং কঠিন, এখন দেখি যে তাহা তুলার ন্যায় পাতলা ও

তুষারপাতে শিমলার দৃশ্য—৩

হালকা। হাত বাড়িয়া ফেলিলেই বরফ পড়িয়া যায় এবং যেমন শুষ্ক তেমন শুষ্কই থাকে। পৌষ মাসের একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে, দুই তিন হাত বরফ পড়িয়া সকল পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। মজুরেরা আসিয়া সেই বরফ কাটিয়া পথ মুক্ত করিয়া দিলে তবে লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। আমি কৌতূহলে আবিষ্ট হইয়া সেই বরফের পথেই চলিলাম। গ্রামে আর ফেরান বন্ধ হইল না। স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে অধীর এত দূর এত বেগে চলিয়া গেলাম যে, সেই শীত-কালে বরফের মধ্যে আমি ঘর্ম অনুভব করিলাম এবং শিউরের মত ঘর্মে আর্দ্র হইয়া গেল।"...বাস্তবিকই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের প্রাণেই সে সময় এক অজানিত আনন্দ রসের উদ্রেক হয়। সকলেই বেরিয়ে পড়েন প্রকৃতি-রাণীর সে সৌন্দর্য উপভোগ করতে। সাধারণতঃ বছরে প্রায় ৩।৪ বার এইরূপ তুষার পাত হয়ে থাকে।

ইংরাজীর ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসেই যে শিমলায় সর্বাপেক্ষা বেশী তুষার পাত। শিমলায় এক কালীন ১২।১৩ ফুট বরফ এর আগে আর কোন দিন পড়েছে বলে শুনা যায় না। যতদূর জানা গিয়েছে তাতে বলা চলে যে ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শিমলায় আর একবার তীব্র তুষার পাত হয়েছিল। সে সময়ে সবে একদিকে রেল গাড়ীর চলাচল সুরু হয়েছে। স্থানে স্থানে ৬।৭ ফুট বরফ জমায় সে সময় কয়দিন ট্রেণ বন্ধ ছিল।

১৯৩৪ সালের তুষার-ঝটিকা সম্বন্ধে অতিরঞ্জনের কয়েকটি কথাই জানাচ্ছি। যা সাধারণের জ্ঞানে ঘটে না।

ইংরাজী নব-বর্ষ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রে ভীষণ মেঘ করে বৃষ্টি এল। সন্ধীর রাত্রে সুরু হ'ল তুষার পাত। সকালবেলা দেখা গেল চতুর্দিক সাদা হয়ে গেছে। নব-বর্ষের সেই নব-প্রভাতে ধরণীর শুভ্র-মূর্ত্তি দেখে মনটা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবলুম, পৃথিবীর অশান্তির বুকিবা এ কোন এক মঙ্গলময় পরিণতির ইঙ্গিত।

মাঝে দুদিন বাদ দিয়ে আবার সুরু হ'ল তুষার পাত। দেখতে দেখতে রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি সব চাপা পড়ে গেল তুষারের স্তূপে। কুড়ি বছর আগে তুষারপাতের পর মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক রাস্তা-ঘাটগুলি পরিষ্কার করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এবার আর তা সম্ভবপর হ'ল না।

শিমলার প্রায় অধিকাংশ অধিবাসীই চাকুরী-জীবী। এই জন্যে তুষার পাতের মধ্যে দিয়েই কোন রকমে প্রাণ হাতে করে প্রথম ২।৩ দিন কাজকর্ম যথারীতি চললো। সে যে কী কষ্ট! শীতের দাপটে হাড়ের মধ্যে পর্য্যন্ত কাঁপুনি ধরে। ইতিমধ্যেই ৩.৪ ফিট বরফ জমে গেছে শিমলার নাম-করা রাস্তা-ঘাটগুলির উপর। একটা দিন যাচ্ছে, আর ভাবছি কালকের অবস্থা কী হবে। যাক, এমনি সময়ে একদিন চতুর্দিক আলো করে সূর্যদেব উদয় হলেন। সকলের মুখেই হাসি ফুটে উঠল—জানলাম যে, বরফ পতন শেষ হয়েছে।

কিন্তু—একি? ২।১ দিনের মধ্যেই আবার সুরু হ'ল তুষার পাত। এবার বোধকরি এর আর শেষ নেই—বিরামহীন, ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দেখতে দেখতে ৫।৬ ফিট বরফ জমে গেল। শিমলায় সর্ব্বত্রই ৭।৮ দিন ধরে একবারও সূর্যের দেখা নেই। দুর্দ্ধর্ষ শীত। শীতের প্রাবল্যে প্রতিটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিবশ হ'য়ে পড়ে। আগুন ছাড়া এক মুহূর্ত্ত থাকবার উপায় নেই। ঘরে ঘরে রীতিমত আগুনের ব্যবস্থা, তাই।

এই ভীষণ অবস্থার এখান থেকে লোকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু যাবে কোথায়! আগেই তো মোটর চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার ট্রেণও বন্ধ। কাজেই মানুষ পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত যখন শিমলা পরিত্যাগ করে চলে গেল, তখন আমাদের সকলকে এক রকম বাধ্য হয়েই শীতের অত্যাচার সহ্য করে নেতে হল মুখ বুজে। এই ফেরে সিভিল অফিসগুলি ২।১ দিনের জন্য বন্ধ করলেও মিলিটারী অফিসগুলির কাজ চলতে লাগল নিয়ম মাফিক। কত লোক রাস্তা চলতে চলতে আছাড় খেল—পড়ে গিয়ে আহত হ'ল—তার ঠিক নেই। আর যারা ঠিক ভাবে পৌঁছল—শীতাধিক্যে বুঝিবা মারা যায়। কত লোক যে শীতের জন্য

সঙ্গে হারিয়ে ফেললেন তার হিসাব কে রাখে? রাত্রি বাইরে আর আগুনের সেঁক দিয়ে ঘর রাখতে হয়েছে অনেককেই। এর উপর যখন তখন তুষার ঝেড়ে নামল—"একটা লোক চলতে চলতে রাস্তায় রাস্তায় পড়ে মারা গেল।"...."দুজন পাহাড়ী রাস্তা ঠিক করতে না পেরে গভীর খাদের ভেতর তলিয়ে গেল," ইত্যাদি। এর কতখানি যে সত্য তা ঠিক করে বলা যায় না। তবে যে বিশাল বরফ স্তূপের মধ্যে ২।১০ জনের প্রাণ হারান মোটেই আশ্চর্য ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ ২।৪ জন মারা গেছে বলে প্রমাণিতও হয়েছে।

যান-বাহন সব বন্ধ হয়ে গেল, ট্রেণ তো আগেই হয়েছে। অধিকাংশ তুষার বৃষ্টির ফলে ইলেক্ট্রিক লাইনগুলিও হয়ে পড়ল অচল। প্রতি মুহূর্তেই আলো নিভে যায়। সেবে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার সেল খারাপ হয়ে। ট্রেণ বন্ধ থাকায় চিঠি পত্রাদিও বন্ধ। আবার টেলিগ্রাফের এই অবস্থা। এক কথায় বিশ্ব-জগৎ হ'তে শিমলা বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল—প্রায় দু-দিনের জন্যে।

এর উপর আনুষঙ্গিক বিপদ তো আছেই—শীতাধিক্যে জলের কল সব বরফ হয়ে গেছে। ১৮ ডিগ্রী টেম্পারেচারে জলহীন মুখের কথা, সহিবার তৈল পর্যন্ত জমে গেছে। পানীয় জল দুর্লভ। আগুনের তাতে বরফ-গলানো জলে সব রকম কাজ চালান হ'ল। মাসের প্রথম তাপেই এইরূপ হওয়ায় খাদ্যাভাবেও অনেক কষ্ট গেছে। চাল-ডাল, নুন তেল, কাঠ কয়লা, প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ যা থাকার কথা তার সীমা ছিল না। এ-সময়ে যান-বাহন চলাচল যেমন অসম্ভব তেমনি কুলি-মজুর পর্যন্ত পাওয়া ভার। তার উপর দোকান-পসরা অধিকাংশই বন্ধ। আমদানি না থাকায় শাক-সব্জীর বাজার একেবারেই খালি। কাজেই অনেক গৃহস্থকেই অনেক কষ্টে দিন কাটাতে হয়েছে। এও ঠিক যে, আর ২।৩ দিন এরূপ তুষার-পাত চলতে থাকলে শিমলার অধিকাংশ লোককেই অবশ্যে মরতে হ'ত। গরলা আসা বন্ধ—দুধ নেই কারো ঘরে, দুধের জন্য বিলাতী টিনের দুধকেও দুষ্প্রাপ্য। এ অবস্থায় বাসি-দুধই শিশুদের একমাত্র পানীয়।

অবশেষে ১১ই জানুয়ারীর প্রভাতে শিমলার মুখের জাল ফুটে উঠল। সূর্য থেকে উঠে দেখা গেল যে অর্ধ-কাচ নির্মল নীল আকাশের বুকে সূর্যের সোনালী কিরণ ঝল্‌মল্ করছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখা যায় শুধু সাদা আর সাদা। এ যেন অনাদি অনন্ত দুগ্ধের ঢেউ—সমুদ্র—সীমাহীন, আর উপরে নির্মল নীল আকাশ। সে এক চোখ ঝলসানো দৃশ্য! অপূর্ব! ভাষায় তার বর্ণনা দুঃসাধ্য! প্রকৃতপক্ষে এই শুভ্র বরফের উপর প্রতিফলিত সূর্য-রশ্মি চক্ষের পীড়াদায়ক। এতে আশু দৃষ্টি হানিরও সম্ভাবনা আছে। সেই জন্যই এ-সময়ে সকলে রঙীণ চশমা ব্যবহার করে থাকেন।

এবার ঘর-দোর পরিষ্কার করার পালা। বাড়ীর ছাদে এত বেশী

তুষারপাতে শিমলার দৃশ্য—৩

বরফ জমে গেছে যে তার ভারে ছাদ ধসে বাড়ীগুলি প্রায় পড় পড় অবস্থা। শিমলা রেলওয়ে ষ্টেশন এবং আরো ২।৩টে বাড়ী ইতিমধ্যেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

যাই হোক এর দু-দিন পরে কালকা থেকে শিক্ষানবীশ ট্রেণকে অতিকষ্টে তারাদেবী পর্যন্ত আনা সম্ভবপর হ'ল। এই হ'ল শিমলার বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতার অবসান। বাকী পথটুকু বরফ কেটে ট্রেণ চলার উপযুক্ত করতে লাগ্‌লো আরো দু-দিন। তারপর যথারীতি ট্রেণ চলতে লাগল। আত্মীয়-স্বজন আপনার লোকেদের নিরাপত্তা জেনে স্বস্তি লাভ করল।

গান

শ্রীমতী কমলরাণী মিত্র

রাত-জাগা-পাখী ডেকে গেল' ঘুরে
বিহগী-বধূর দ্বারে—
শুভ্র-চাঁদিনী বিদায়-আবেশে
ঘুম গিরিতটে নামে!!
রজনীগন্ধা সারা রাত ধ'রে,
পদ্ম রেখেছে বুকে তার ভ'রে,
বিরহিণী জাগে—যদি রাজাধব
তা'র দ্বারে এসে থামে!
একে একে শেষ প্রহর ফুরালো,
শুকতারা হায় আকাশে মিলালো,
নয়নের জল শুকায় তুষার
আশাহত অভিমানে।

অর্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

রেখা—শ্রীরঞ্জন ভট্ট

রঙ্গমঞ্চের উপর যবনিকা ঘন ঘন করতালির মধ্য দিয়ে নেমে এল। দৃশ্যটা প্রেক্ষাগৃহ উন্মুখ আগ্রহে বহুদিন পরে প্রত্যাগত নায়কের নায়িকার প্রতি প্রণয় নিবেদনের হৃদয়গ্রাহী অভিনয় দেখে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল এতক্ষণ। সেই প্রশংসমান নীরবতার সমুদ্রে বারে বারে কলরবের ঢেউ উঠতে লাগল, আর অন্ধকারের উপর আস্তে আস্তে আলোর লীলা জাগতে লাগল। তার পরই আরম্ভ হল সব কিছু ছাপিয়ে সব অভিনয়ের প্রভাবকে নির্মম-ভাবে নিষ্পীড়ন করে চীৎকার—'চাই সোডা লেমনেট', 'চাই পান বিড়ি', 'চাপ কাটলিস চাই'। 'আশ্ কিরিমের' ফেরীওয়ালাও এই ঐকতান ভাবণে সমস্বরে যোগ দিল। রঙ্গজগতের অভিনেতা অভিনেত্রীরা যে স্বপ্ন রচনা করেছিল, পীঠপ্রদীপের সম্মুখে যে প্রেমের লীলা চলেছিল —সে সব মিথ্যা হয়ে গেল। সত্য যেন শুধু বাংলা রঙ্গমঞ্চের অনাবশ্যক অথচ অপরিহার্য্য এই বিশ্রী আবহাওয়া, এই অভিনয়ের পরিহাস এবং তার চেয়ে সত্য বলে মনে হল, একটী যুবক দর্শকের হাঁটুর উপর একটি সলজ্জ অথচ সক্রিয় চিমটী। প্রত্যুষের দৃশ্যপটের উপরও যবনিকা নেমে এল—কিন্তু বহু বহু আক্ষেপ ও বহু আকুলতা নীরব অন্ধকার ছড়িয়ে দিল তার স্বপ্নজগতের উপর।

চারদিকের কলরবের সঙ্গে অত্যন্ত অসমঞ্জস একটী কপোতকূজনের মত কিসফিসে কণ্ঠস্বর তার কানে এল—ওগো চল, আলো জ্বলে উঠেছে; এখনি বাড়ী পালাই চল, দু ঘণ্টা ত হয়ে গেল। সকলে উৎসুক ও সপ্রশ্ন নয়নে দেখল শুধু একটা উদীয়মান অবগুণ্ঠন এবং সেটী ক্রমশ নিষ্ক্রান্তিমুখী হবার উপক্রম করছে। একটী নববিবাহিত দম্পতীর অন্তর-লোকের উপর ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল। রঙ্গভূমি অধিকার করে রইল সংসারের রূঢ় আলোকও রুক্ষ কোলাহল।

ব্যাপারটা খুবই সামান্য। এমন ত কতই হচ্ছে আশপাশে ও আসছে শ্রবণগোচরে, পথে, ট্রামে, সিনেমায়, থিয়েটারে। নববধূ তার অনূঢ়া জীবনের বাবা-মা-ভাই-বোনের অন্তরালে গড়া নিভৃত আশ্রয় ছেড়ে নূতন শ্বশুরবাড়ীর আষ্টে পৃষ্ঠে আষ্টেপৃষ্ঠে এড়িয়ে আগ্রহে আকাঙ্ক্ষায় আকুল স্বপ্নে কল্পনায় বিহ্বল স্বামীর সঙ্গে প্রথম বাহিরে এসেছে। সরমে সঙ্কোচে পায়ে পায়ে জড়িত হয়ে পড়েছে চরণ, স্খলিত হয়েছে বচন—আর ক্ষুণ্ণ প্রত্যাহৃত হয়ে ফিরে গেছে একটি উন্মুখ আশাপূর্ণ মন। অল্প সময়ের জন্য প্রতিবেশী বা পথচারির কৌতূহল জাগিয়ে সে সব ক্ষণিকের দৃশ্য ও খণ্ডিত কথোপকথন নবপ্রণয়-সাগর-তীরের অনুর্ব্বর বালুকাবেলায় মিশে গেছে; নবোদ্ভিন্ন জীবনের একটি দৃশ্যের উপর চকিতে অতর্কিতে যবনিকা নেমে এসেছে —যদিও বাসরসঙ্গিনীদের করতালি ও কৌতুক রহস্য সে সরম ও সঙ্কোচের মুখে জলসিঞ্চন করবার জন্য তাদের কাছাকাছি কোথাও ছিল না।

২

প্রদ্যুম্ন কলকাতার সেই পাড়ার সেই বংশের ছেলে, যেখানকার বঙ্কিমীমারেখার বাহিরে আধুনিকতার সেনা এসে হানা দিয়েছে, এমন কি অগোচরে ভিতরে আনাগোনাও করছে, কিন্তু যেখানকার প্রাচীন প্রাচীনারা তাদের প্রাচীরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে শতাব্দীর গতি প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু অন্তঃপুরে না হলেও বহির্বাটিকায় শত্রুপক্ষ যে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করেছে এমন সন্দেহের প্রমাণ না হলেও অনুমান করবার কারণের অভাব নেই। প্রাচীনাদের মনের আনাচে কানাচেও যে সে সব না খোঁজা-করা করছে তা নয় এবং তাতে তাঁরা নিজেরাই খানিকটা বিস্মিত ততটা বিচলিত হচ্ছেন বলে মনে হয় না আজকাল। ভিতর বাড়ীতে শুশ্রূষার মত ঢুকে পড়েছে আধুনিক যুগের হাল্কা উপন্যাস—যাতে সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা বা প্রাচীনতার অস্থিরক্ষা কোনটাই সহজ হচ্ছে না। পাড়ার লাইব্রেরীটা ত শুধু আর এ

বাড়ীর কাজ তো হয় নি। বাড়ীর অল্পবয়সীরা সবাই নূতন নূতন বই আনছে সেখান থেকে। মোক্ষদাসুন্দরী সে সব চকচকে নক্সাটের ঝকঝকে ছাপার বই পড়তে বসে অলস দ্বিপ্রহরে বিরক্তিতে উঠে বসেন। বই সরিয়ে দিয়ে মোক্তা-মিশান একখিলি ছাঁচি পান চিবাতে চিবাতে মনে হয়, দেখাই যাক্ না বইটি শেষ পর্য্যন্ত কি রকম লিখেছে, সবটাই ত আর কিছু খারাপ হবে না; মাঝে মাঝে মনে হয় পড়তে বোধ হয় ভালও লাগে—জায়গায় জায়গায়। তাই খানিক পরে মেদবহুল বিপুল দেহটির পাশ ফিরিয়ে গরমের দিনের আরাম শীতল পাটীতে স্নিগ্ধ শান্তি-পুরীর স্বল্প বাহুল্যবর্জ্জিত আবরণে দেহ রক্ষা করে আবার পড়তে আরম্ভ করেন। হার্ট এবং অম্বল এই দুইয়ের ব্যামো তাঁর বহুকালের। তা বলে দুপুর বেলায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ার সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ নেই। আজকালকার ডাক্তারগুলিও সে রকম সুবিধার লোক নয়। এই সব বিলিতি চংএর বইয়ের মতই ওরা বিলিতি পোষাকে গা ঢেকে চিকিচ্ছে করতে আসে, আর সঙ্গে আনে নতুন নতুন যত আজগুবি কথা, বলে কি না একটু হাঁটাহাঁটি করুন, অন্তত গাড়ী করে বাইরে গিয়ে মাঠের মধ্যে, রোজ বেড়িয়ে আসুন। কেন? গাড়ী করে তো রোজ গঙ্গায় যাই নাইতে; সে অবশ্যি তেমন দূরের কথা নয়। উঃ ভারী ত জানে ওরা, আজকালকার

পদা প্যাকাটির উপর সুট চড়িয়ে

ছোকরারা; ওই ত সব পদা প্যাকাটির উপর সায়েবী সুট চড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। হাতে করে নিজের ব্যাগটিও বইবার বোধ হয় ক্ষমতা নেই, তাই বয় না। বলে কিনা, সুচি ছাড়ুন, সারা দুপুর ঘুমোনো ছাড়ুন। আরে বাবা, সেই যদি সাত-পুরুষের চুচি, আর সারাটা দিন ঝি-চাকর খাটিয়ে হায়রাণ হওয়ার পর এই একটুখানি গা গড়িয়ে নেওয়াই ছাড়তে হয় তবে তোমায় ডাক্তার ডাকলুম কেন?

স্বামী রামপ্রসাদ এখন নেই। আর থাকলেও তার উপস্থিতি এই কাহিনীর পক্ষে অবান্তর হত। বাইরের বৈঠকখানা পর্য্যন্তই তার পারিবারিক জীবনের উপর প্রভাব প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে। ভারতবর্ষে স্ত্রী জাতির মুক্তি প্রয়োজন বলে যারা গঙ্গাতীরের পত্রিকা থেকে তমসাতীরের টাইমস্ পর্য্যন্ত আলোচনা ও আলোড়ন করে বেড়াচ্ছে, তারা বোধ হয় বিবাহ বৃক্ষের ফল আস্বাদন করে নি এবং খুব সম্ভব তার কারণ যে তাদের বিবাহে ঈপ্সিতাদের বাপ-মারা মত দিচ্ছে না। অন্তত আমাদের মোক্ষদাসুন্দরীর সংসারের উপর আধিপত্য দেখে এ ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত করার জোটী নেই। সব খবর তিনি রাখেন—বাড়ীর ভিতরের এবং বাহিরের খবরও পৌঁছে দেবার লোকের অভাব নেই। তিনি এই মাত্র বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছেন

কৌশল্যা মোক্ষদা সংবাদ

যে দিদীর পাড়ে যেখানে দুপাড়ে দুটো আলাদা কলেজে মেয়েরা আর ছেলেরা পড়ত বলে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেই দিদীর এক পাড়ে ছেলেদের কলেজেও মেয়েরা চড়াও হয়ে পড়তে সুরু করেছে এ বছর থেকে। মাথা নাড়িয়ে নখ ঘুরিয়ে মুখে মোক্তা চড়াতে চড়াতে পাড়ার কৌশল্যা পিসি এসে এই খবরটী সাতঙ্গে এবং সত্য কথা বলতে কি একটু সাগ্রহেই দিলেন। যদিও ওরা কারো অনিষ্ট করে নি তবুও ওরা ত প্রতিবেশী, তার উপর বড়লোক। অতএব ওদেরও একটু চিন্তায় ভাবনায় থাকা ভাল সব দিক দিয়েই। কৌশল্যা কন্টিনেন্টাল সাহিত্য পড়েন নি, কিন্তু তাঁর মনের বিকাশ কন্টিনেন্টাল ছাঁচেই হয়েছে। কারণ সব শিক্ষার খবরটুকু পেয়েই তিনি রসের সন্ধান পেয়ে ফেলেছেন। জান না, মুখি দি, বিন্দে আর সুন্দরকে আর মালিনী মাসির সাহায্য নিতে হবে না। বাগানের মালীকেও

না কি চিঠিটা পত্তরটা এ হাত ও হাত বদল করে দিতে ভাববে না। কালো যমুনোর জলে ভাম ছায়রা ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য দিঘীর পাড়ে তৈরী হচ্ছে। সব নাকি জলে জলে সাঁতার শেখার জন্য নাম লেখাচ্ছে। মা গো মা, ক্ষমা ঘেন্না এদের একটুও যদি থাকত! কোথায় পাবনে পাবনে গোরোগে অমুবাচীতে গঙ্গাচ্চান করে পুণ্যি করে নেবে, না সেই ছেদোর জলে বেদের দল নৈরাত্মি পুড়ে গাচ্ছে। কৌশল্যা ত আর কলেজের ছাত্র ছিলেন না; তাই জানেন না কত পড়া ও পরীক্ষার জ্বালা জুড়াবার জন্য ছেলেরা আগে সাঁতার কাটতো ওখানে।

কৌশল্যা ত কুশল সংবাদ নিতে এসে মুখের মুখল চালিয়ে চল্লেন, আর ওদিকে মোক্ষদাসুন্দরীর ভাবনা ততক্ষণে দিঘীর জলে হাবুডুবু খেতে সুরু করেছে। বাড়ীর বাইরে গঙ্গার ঘাটের পথ, আর ইষ্টি কুটুমদের বাড়ীর সবই জানা আছে; তার বাইরে সবটা পৃথিবীই তার কাছে প্রায় অজানা অথবা অচেনা। দোষই বা তার কী? বাহিরে ঘোমটার গণ্ডীরেখার ভিতর থেকে সংসারের কতটাই বা আর দেখা যায়, কেমন করেই বা আর চেনা যায়? অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের চেয়ে তার দৃষ্টি শক্তি বেশী নয়। এ যুগের সঞ্জয়রা যেটুকু সংবাদ দিয়ে যায়, সেটুকু থেকেই বাহিরের সংসার-সমরের সঙ্গে তার পরিচয়।

ভাবনা ত সেই জন্যই। আবার এদিকে কর্পূরসেন সেই বালিগঞ্জ ছাড়িয়ে মাঠ কেটে কটা পুকুর বানিয়েছে। তাতে কয়েক জন ছেলে তাদের ভালবাসার দেবে, নিজে ডুবেও মরেছে। অবিশ্যি দীঘিতে এমন অঘটন নিশ্চয়ই কিছু হতে পারবে না। তার ডাইনে বাঁয়ে গেছে রাস্তা টেরাস; সেখানে প্রেম করে এক সঙ্গে ডুব দিতে নিশ্চয়ই লজ্জা করবে। লোকের চোখের সামনে ভর দিনদুপুরে ছোকরারা নিশ্চয়ই কিছু বেহায়াপনা করে বেড়াবে না। সায়েবরা আবার লোক কি-রকম কি-রকম। খেয়েদেয়ে কাও কতই না করে ওরা। আবার জোড়া জোড়া হয়ে লোক দেখিয়ে নাচে। তবে সায়েব যখন, মোক্ষদার ভরসা আছে যে তাদের দাপটে ছেলেরা মেয়েরা এক সঙ্গে পড়লেও এক ঘাটে নিশ্চয়ই জল খাবে না।

শেষ পর্য্যন্ত মোক্ষদাকে বিশেষ তেমন চিন্তান্বিত হতে না দেখে কৌশল্যা আর একটী বাণ নিক্ষেপ করলেন। আর শুনেছ, কলেজে যার সঙ্গে সব চেয়ে বেশী ভাব আমাদের বড়খোকার, তার নাকি নাম নীহারিকা। আমি ত শুনেই ভাবলুম—দরকার নেই এ সব কথা শুনে। পরে আবার ভাবলুম কানে যখন এসেই পড়েছে, এই শুধু একটীবার মুখিদিকে জানিয়ে আসি সময় থাকতে। ছেলে তোমার অবিশ্যি তেমন ছেলেই নয়। আর সবই ত ভগবানের হাতে। তবু ভাবলুম তোমায় না জানিয়ে দিলে অধর্ম্ম হবে আমার।

(ক্রমশঃ)

কবি কুমুদরঞ্জনের প্রতি

শ্রীগোপাল ভৌমিক

তোমায় আমার মাঝে জন্মের অমিল :
ব্যবধান বয়স ও মুখের
ঢেউ-ওঠা সমুদ্রের মত—
তোমাকে আমাকে করে বিচ্ছিন্ন বিরত।

তোমার চোখের দেখা কমল বাটিতে
সমুদ্রের ছিল সমারোহ :
বাস্ত-ভিটে আশপাশের আজকের আজের
সৌন্দর্য্যের ছিল যে-প্রবাহ—
তারই রেঁায়া দিয়ে আমি—
তোমার মানস-পটী কান্ত-বিবর্ত্তন—
মুক্ত করে মানুষের মন,
হৃদয়ে হৃদয়ে আনে স্বর্গীয় মরণ।

তোমার অনেক পরে আমরা এসেছি :
দেখেছি কখন যেন সমুদ্র প্রচণ্ড—
হয়ে গেছে ঘুমন্ত গভীর,
আকাশের বুক চিরে ঝঞ্ঝাটীর শিস—
মানুষে মানুষে ঝড়ে তীব্র ঘাতপ্রতিঘাত,
মানুষের লোভে জল
হৃদয়ের স্বর্গ অবলীন।
অনাগতের কাব্য তাই—
রূপ তীব্র সৌন্দর্য-বিহীন
এ মাটিতে পেতে চায় সোনাঝরা দিন।

তোমার আমার পথ ভিন্ন জানি—
লক্ষ্য ভিন্ন নয়,
আমাকে পাখেয় দিল তোমারই সঞ্চয়।

অতন্দ্রিতে হে অগ্রজ,
তরি আমি সে ঋণ স্বীকারে—
যে ঋণের সেতু বাঁধে সমুদ্রের এপার ওপার
তারই অভীপ্সায় রাখি মুক্ত নমস্কার।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের রাসায়নিক শিল্পের তুলনা

শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন এম্-এস্‌সি

সকলেই জানেন রাসায়নিক শিল্পে ভারতবর্ষ অতিশয় অনুন্নত। কোন্ কোন্ কারণে আমাদের দেশে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি হয় নাই বা হইতেছে না, সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকিলে যাঁহারা এই শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে চান তাঁহারা যেমন উপকৃত হইতে পারেন জনসাধারণের মনের অস্পষ্ট এবং অনেক স্থলে ভ্রান্ত ধারণারও তেমনি নিরসন হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া আমি আমার সামান্য অভিজ্ঞতা-প্রসূত কয়েকটি কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাসায়নিক শিল্পের অসামান্য উন্নতি দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া থাকি। ইহাদের উন্নতির মূলসূত্রের সন্ধান করিলে তিনটি প্রধান বিষয় চোখে পড়ে; যথা—শিল্প সম্বন্ধে উদার এবং কল্যাণকর রাজনীতি, শিল্পপতিগণের লোকহিতকর দৃষ্টিভঙ্গী এবং ফলিতবিজ্ঞান গবেষকগণের জনসেবাকল্পে একনিষ্ঠ সাধনা।

আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পের, বিশেষভাবে রাসায়নিক শিল্পের গোড়াপত্তন এবং উহার ক্রমোন্নতি কয়েকজন স্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছু স্বচ্ছল করা এবং তৎসঙ্গে দরিদ্র মধ্যবিত্তশ্রেণীর বহুলোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শিল্প-সম্বন্ধে জাতীয় পরিকল্পনার বিষয় তৎকালে এদেশে অনেকেই চিন্তা করেন নাই। গবর্ণমেণ্টও দেশীয় শিল্পের উন্নতির চেষ্টা ত করেন-ই নাই, বরং অনেক স্থলেই তাহার প্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহার ফলে দুই দুইটি পৃথিবী-আলোড়নকারী মহাযুদ্ধের পরেও আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য কোনও রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান এখন পর্য্যন্ত গড়িয়া ওঠে নাই। বিলাত ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির সহিত শিল্পনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং ঐ সম্মিলিত নীতির একমাত্র লক্ষ্য—কিরূপে দেশীয় শিল্পের প্রগতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব-সাধারণের তথা সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নততর করিয়া তোলা যায়। ঐ সব দেশের শিল্পবিজ্ঞানসংক্রান্ত গবেষণা-প্রতিষ্ঠানগুলিও জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে সতত যত্নবান। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া এমন সব সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিতেছেন যাহাতে তাঁহাদের স্বদেশবাসীর জীবনযাত্রার মানদণ্ড উৎকর্ষ লাভ করে। মানবসেবার পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত গবেষকগণের কেহ বা দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিষেধক আবিষ্কারে, কেহ বা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকর কার্য্যে, কেহ বা জনস্বাস্থ্য ও খাদ্য সমস্যা সমাধানকল্পে গবেষণায় তন্ময় হইয়া আছেন। তাঁহাদের চরিত্রের একটি অতি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা কখনো তাঁহাদের উপরওয়ালার সন্তোষ বিধানের জন্যই গবেষণা করেন না, তাঁহারা কাজের আনন্দেই কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা ঠিক ইহার বিপরীত ভাবই দেখিতে পাই। কি করিয়া কর্তৃপক্ষকে খুশী করা যাইবে—আমাদের গবেষকগণের ইহাই একমাত্র চিন্তা এবং এজন্য তাঁহারা অনেক সময় তাঁহাদের অনুসন্ধান-লব্ধ তিলকে তাল বলিয়া প্রচার করিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সাধকগণের মধ্যেও এইরূপ মনোবৃত্তি প্রায়শঃ অল্পাধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের রাসায়নিকগণের মধ্যেও ঐ মনোভাব সংক্রামিত হইয়াছে। সকলেরই এক চিন্তা—কিসে অল্প কাজে অধিকমাত্রায় বাহাদুরি লইয়া প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। বলা বাহুল্য, এইরূপ মনোবৃত্তি দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, ঐ সব দেশে গবর্ণমেণ্ট রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের উন্নতিবিধান করেন, রিসার্চ প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করেন এবং শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে জন-সাধারণের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে পরস্পর নিবিড় এবং আন্তরিক যোগ থাকায়

ফলে প্রত্যেকটি বিভাগই উপযুক্তভাবে বিকাশ লাভের সুযোগ পাইয়া থাকে।

আমাদের দেশীয় শিল্প যে উন্নত হইতে পারে নাই—শিল্প বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতাই তাহার অন্যতম কারণ, এ বিষয়ে সকলেই অবহিত আছেন। এমন কি, গত যুদ্ধকালীন দুই একটি উদাহরণেও আমার এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বুঝা যাইবে। বিলাত এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত বেনজিনের উপর কোনও শুল্ক ধরা হয় না এবং সেইজন্য ওদেশে বেনজিন যারপরনাই সস্তাদরে পাওয়া যায়; ফলে বেনজিন থেকে তৈরী ক্লোরোবেনজিন ও কারবলিক অ্যাসিডের দামও খুব সস্তা। অনেকেই জানেন এই পদার্থগুলি ডিডিটি এবং ফিনোল প্লাষ্টিক্‌স্‌এর অন্যতম উপাদান। সুতরাং উহারা যে অতি সস্তায় ডিডিটি ইত্যাদি তৈরী করিয়া নিজেদের চাহিদা মিটাইয়া পৃথিবীর, বিশেষতঃ এশিয়ার বাজার একচেটিয়া করিয়া লইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তারপর যুদ্ধের মধ্যে বিলাতে আমদানি গন্ধকের উপর মাশুল খরচা, যুদ্ধকালীন ইন্‌সিওরেন্স প্রভৃতির দরুণ খরচা ধরায় গন্ধকের দাম অসম্ভব বাড়িয়া যায়। কিন্তু সে দেশের শিল্প-সংরক্ষণশীল সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত খরচা নিজে বহন করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে যুদ্ধপূর্বকালীন দরে গন্ধক সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে যুদ্ধের সময়েও ওদেশের সালফিউরিক অ্যাসিড ও তাহা হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন পদার্থ, বিশেষতঃ দেশে অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে অপরিহার্য্য অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রভৃতি সারের দাম আদৌ বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমরা বিপরীত ব্যবহারই লাভ করিয়াছি। বিলাতের সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানার তাঁরা যে দরে গন্ধক পাইতেন আমাদিগকে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী দরে গন্ধক কিনিতে হইয়াছে।

আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকগণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত সমব্যবসায়ীদিগের প্রতি খুব হৃদ্যতাসূচক ব্যবহার প্রায়ই করেন না। দেশের শিল্প বিস্তারে তাঁহাদেরও যে যথেষ্ট হাত এবং দায়িত্ব আছে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিকগণও আবার কোন দিনই সে বিষয়ে বিশেষ সচেতন হন নাই। শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিভাবান্ গবেষকেরা নীরবে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা কখনও তলাইয়া দেখেন নাই যে দেশকে শিল্পসুষমায় এবং শিল্পপ্রধান করিয়া তোলার গুরুকর্ত্তব্য সম্পাদনে কারখানার হাতে কলমে অর্জ্জিত তাঁহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। দেশের ও জাতির চরম দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, আজ যাঁহারা ভারতবর্ষের শিল্প সংগঠনে মুখপাত্র হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই শিল্পবিষয়ে প্রত্যক্ষসম্বন্ধে তিলমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। বিলাত ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কারখানার বৈজ্ঞানিকগণের সমিতি হইতেই কার্য্যতঃ দেশের শিল্পসংক্রান্ত নীতির প্রবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন ও পরিচালনা হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও অগৌণে এরূপ সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য্য। এরূপ সমিতি যে কারখানার বৈজ্ঞানিকগণের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের জন্যই প্রয়োজন তাহা নহে; বরং দেশের সত্যকার উন্নতির জন্যও এরূপ সমিতির সার্থকতা বিদ্যমান। আমরা রাসায়নিক শিল্পের প্রতিনিধিরূপে আমেরিকার যেখানেই গিয়াছি সেখানেই আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি। আমেরিকার লোকদের মুখে শুনিলাম—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের পরেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিকগণকে তাঁহারা সম্মান করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এই সব বৈজ্ঞানিকও তাঁহাদের চরিত্র এবং কার্য্যাবলীর গুণে ঐরূপ সম্মানের যথার্থ অধিকারী। আমাদের কারখানার বৈজ্ঞানিকগণকে আরও উচ্চস্তরের কর্ম্মধারা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ইহাতে তাঁহারা যে শুধু নিজেরাই লাভবান হইবেন তাহা নহে, পরন্তু তাঁহাদের 'অবনত' মাতৃভূমির মুখও ইহাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। দেশের শুরুভারপ্রাপ্ত নির্দ্দিষ্ট কোন ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ বোর্ড দেশীয় কোনও ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সমিতিকে মানিয়া না লওয়ার মনোভাব শিল্পক্ষেত্রে উন্নতির পথে প্রভূত অন্তরায় ঘটাইয়াছে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শিল্পজাত সামগ্রীর এবং কাঁচামালের আমদানি রপ্তানির সুবিধার উপর দেশের শিল্পবিস্তার ও তাহার উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। অনেকেই জানেন, বিদেশ হইতে আমদানি শিল্পজাত দ্রব্যাদি ভারতবর্ষের করাচি, বম্বে, কলম্বো, মাদ্রাজ, কলিকাতা বা রেঙ্গুন যে কোন

বন্দরেই আসুক, ভাড়া সর্ব্বত্রই এক। ইহাতে বিদেশী-মালের দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ অনেক সুলভ হয়। কারণ, কলিকাতার কোনও কারখানার মাল বিদেশী মালের সঙ্গে সমগুণবিশিষ্ট হইলেও উহা যখন বম্বে বা করাচিতে পাঠান হয়, তখন পথে এত ভাড়া পড়িয়া যায় যে তাহাতে বিদেশী মালের সঙ্গে উহার প্রতিযোগিতা করা শক্ত হইয়া পড়ে। উপযুক্ত আইন প্রণয়ন দ্বারা এই কু-প্রথার নিরসন না হইলে দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির এই অসুবিধা দূর হইবে না।

রেলওয়ের ভাড়া সম্বন্ধেও অনেক গলদ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—কোনও মালের কলিকাতা হইতে বম্বে পর্য্যন্ত যে ভাড়া, কলিকাতা হইতে বম্বের আগের ষ্টেশন পর্য্যন্ত তাহার ভাড়া অনেক বেশী। সেইরূপ বম্বে হইতে কলিকাতার যে ভাড়া—বম্বে হইতে হুগলি বা বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ঐ মালের ভাড়া অনেক বেশী। রেলওয়ের এই নীতির মূলে রহিয়াছে বিদেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা প্রদান। উল্লিখিত কারণে দেশের কাঁচামাল চালান দেওয়া বা বিদেশী শিল্পজাত সামগ্রী এদেশের বড় বড় বাজারে চালিয়া দিবার ইহাই মস্ত একটা কৌশল। সুতরাং রেলওয়ের এই নীতির আশু পরিবর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

রেলওয়ের যে অ-সরল নীতির উল্লেখ করা হইল, একটু অনুধাবন করিলেই তাহার মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। সামরিক এবং রাজনীতিক উদ্দেশ্য লইয়াই ভারতবর্ষের রেলপথের প্রবর্ত্তন ও প্রসার আরম্ভ হয় এবং বৃটিশ বাণিজ্যনীতি ইহার পরিচালনে বরাবর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। দেশীয় বাণিজ্যনীতির সহিত ইহার যে কোনও সম্বন্ধ আছে তাহাও কেহ ভাবে নাই। বিলাত এবং আমেরিকায় রেলপথের প্রবর্ত্তন এবং তাহার ভাড়া প্রভৃতি এমনভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যাহাতে দেশের শিল্পসম্ভার সর্ব্বত্র বিস্তারলাভের প্রকৃষ্ট সুযোগ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্প ক্রমোন্নতির পথে ধাবিত হয়। ভাড়া নির্দ্ধারণের সুবিধার জন্য ও মালপত্রের নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার নিমিত্ত দেশের সর্ব্বত্র একই গেজের রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হওয়াও সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

আমাদের অনেক সময় বলা হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা বাজার থেকে ভারতীয় শিল্পের কাঁচামাল বা যন্ত্রাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা হউক। এই স্তোক-বাক্য ভারতীয় শিল্পের পক্ষে নিতান্তই নিরর্থক, যতদিন না সস্তায় এই মালগুলি ভারতীয় কারখানায় পৌঁছানর ব্যবস্থা হয়। সবচেয়ে সস্তায় কেনা মালের উপরেও যখন ইচ্ছামত ভাড়া এবং ইনসিওরেন্সের শুল্ক ধার্য্য হয় এবং এই শুল্কের বা ভাড়ার হারের হ্রাসবৃদ্ধি করার ক্ষমতা যতদিন আমাদের হাতের মধ্যে না আসে ততদিন ঐ সস্তার কোনও মানেই হইবে না। এই কারণেই আমাদের নিজেদের নৌবহর সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যথা-সম্ভব রেলওয়ে সাইডিংএর ধারে বা কোনও সামুদ্রিক বন্দরের সান্নিধ্যে স্থাপন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান যুগের রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত ঔষধাদির দোষে আমরা এ যাবৎ কোনও মৌলিকত্ব দেখাইতে পারি নাই বলিয়া অনেকেই আমাদের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন। কথাটি সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে আমরা মৌলিকত্বের অধিকারী হইতে পারি না। আমাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে রসায়নশাস্ত্রে পারদর্শী যে সকল গবেষক কর্ম্মরত আছেন তাঁহারা উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পাইলে বিবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির উপযুক্ত প্রতিষেধকের আবিষ্কার করিতে পারেন তদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের কেমিষ্টরা কোনও নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিলে প্রাণীর উপর পরীক্ষা ব্যতীত হাসপাতালের রোগীদের উপরে তাহার রীতিমত পরীক্ষা করান আবশ্যক। বিলাত ও আমেরিকার হাসপাতালের অবারিত সাহায্য ও সুবিধা পাওয়া যায় বলিয়া কোনও নূতন ঔষধ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের শরীরে তাহার কিরূপ ফলাফলের সম্ভাবনা তাহা অবিলম্বে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে হাসপাতালের প্রকৃষ্ট সুযোগ দিবার ব্যবস্থা না হইলে এক্ষেত্রে সন্তোষজনক ফল আশা করা সুদূরপরাহত। এরূপ সুবিধার অভাব বশতই আমাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের রাসায়নিকগণ সাধারণতঃ অন্যান্য দেশের প্রচলিত ও পরীক্ষিত ঔষধের যে গুলির পেটেণ্টের বাধা নাই সেগুলির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বা অনেকটা কাছাকাছি নাম দিয়া সাফল্যের সহিত প্রস্তুত

করিয়া বাজারে দিতেছেন। নূতন ঔষধ আবিষ্কারের পথে আর একটি অন্তরায়ও বিদ্যমান। দেশীয় চিকিৎসকগণ সমানগুণসম্পন্ন ঔষধ পাইলেও আজকাল সাধারণতঃ বিদেশী ঔষধের প্রতি সমধিক পক্ষপাত দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং ভারতবর্ষে প্রস্তুত নূতন ঔষধের প্রতি তাঁহাদের কিরূপ মনোভাব হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আশা করি, দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিকিৎসকগণেরও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইবে। সুদক্ষ রাসায়নিক, জীবদেহে ঔষধের পরীক্ষাকারী বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকগণের মধ্যে সহানুভূতি ও পরস্পর নিবিড় সৌহার্দ্যের সৃষ্টি না হইলে উল্লিখিত বিষয়ে উন্নতির আশা অল্প।

আমেরিকাতে দেখিলাম 'Food & Drug' 'খাদ্য ও ঔষধ বিভাগ' অনুমোদন না করিলে কোনও ঔষধ বা পথ্য বাজারে চালু হইতে পারে না। আর আমাদের দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, জন-স্বাস্থ্য বিভাগ বিখ্যাত ঔষধ-প্রস্তুতকারী কাহাকেও কুইনিন দিতেছেন না—ফলে এই সব কারখানার কুইনিন দ্বারা প্রস্তুত ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক বহুদিনের জনপ্রিয় ঔষধ আর তৈরী হইতেছে না। এই সুযোগে কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা জনপ্রিয় ঔষধের কাছাকাছি নাম দিয়া ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক বিনা বাধায় বাজারে ছাড়িতেছে। ইহাতে জনস্বাস্থ্য কি ভাবে রক্ষা পাইতেছে তাহা জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও জনসাধারণ ভাবিয়া দেখিবেন।

সুপ্রতিষ্ঠিত ঔষধপ্রস্তুতের কারখানাসমূহ বহুদিন যাবৎ ঔষধের গুণ রক্ষণ সম্বন্ধে আইন প্রচলন করার আন্দোলন করিতেছে এবং কেন্দ্রীয় আইন সভায় ইহা ১৯৪০ সালে গৃহীতও করা হইয়াছে। কিন্তু সরকার তাহা কার্য্যকরী করিতে এখনও সমর্থ হন নাই। পক্ষান্তরে, সরকারের বৈদেশিক কর্মচারিগণ কেবলই প্রচার করিয়া বেড়ান—দেশীয় ঔষধ ভাল নয়। কিন্তু নিরপেক্ষ বিশ্লেষণাগারে এবং এই যুদ্ধের সময় ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে দেশীয় ঔষধ বিদেশাগত ঔষধ হইতে খারাপ ত নয়ই, বরং সদ্যপ্রস্তুত বলিয়া ইহার গুণাবলী অনেকাংশেই ভাল।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞান পারদর্শী লোকের অভাব অত্যন্ত বেশী। রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি ইহাতে বড় বেশী বাধা পড়াইতেছে। বিলাত ও আমেরিকার রাসায়নিক কারখানা দেখিলে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা বলিয়া মনে হয়। দেশে কেমিক্যাল কন্‌ষ্ট্রাকসন্ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেমিক্যাল কারখানার আবশ্যক যন্ত্রাদি তৈরীর সুব্যবস্থা না হইলে রাসায়নিক শিল্পে আশানুরূপ উন্নতিলাভ আমাদের পক্ষে সুদূরপরাহত। কারণ, বিদেশ হইতে আমদানী যন্ত্রপাতিতে সব সময় সুফল পাওয়া যায় না। দেশের কাঁচামাল ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুযায়ী যন্ত্রাদির অবয়ব ও গঠন প্রণালী নিরূপিত না হইলে কার্য্যক্ষেত্রে অশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রীর কথাও চিন্তা করা দরকার। যাহারা কলে কাজ করিবে তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের সহিত প্রতিষ্ঠানের লাভালাভ সাক্ষাৎভাবে জড়িত। আমাদের দেশের লোকের দারিদ্র্য তাহাদের কর্মক্ষমতা হ্রাসের একটি প্রধান কারণ। আবার কর্মক্ষমতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিকেরও অল্পতা-প্রযুক্ত দেশের দারিদ্র্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় শিল্পপতিগণের সহানুভূতিসম্পন্ন দূরদৃষ্টি দ্বারা জনসাধারণের এই শোচনীয় অবস্থা হইতে নিষ্কৃতির উপায় স্থির করিতে না পারিলে দেশীয় শিল্পের উন্নতির পক্ষে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইবারই সম্ভাবনা।

আমাদের 'ভিত' রাসায়নিক শিল্পগুলির (basic chemical industries) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা এস্থলে প্রয়োজন মনে করি। দ্বিতীয় মহাসমরের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, পৃথিবীর রসায়নশিল্পের কেন্দ্র আটলান্টিক মহাসাগরের এপার হইতে ওপারে গিয়া পড়িয়াছে এবং যে দেশে গিয়া পড়িয়াছে সে দেশের লোকের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যেরও সীমা পরিসীমা নাই। ফলে, সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ-সম্পন্ন এবং রাসায়নিক ও রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় অনুন্নত ক্ষুদ্র জাতিগুলির পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখাই দায় হইয়া পড়িয়াছে। আজ পৃথিবীতে এমন জাতি প্রায় নাই বলিলেই চলে, যে জাতি আমেরিকার সঙ্গে রাসায়নিক শিল্পে প্রতিযোগিতা করিতে পারে। এই নিদারুণ সত্য ভারতীয় রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধারগণকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে এবং কোন্ পথ অবলম্বন করিলে তাঁহারা

নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া এই সংকট হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন তাহা নির্ণয় করা একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ উদ্বেগজনক অবস্থার মধ্যে কোনও বৃহদায়তন নূতন শিল্পে ব্রতী হইতে ইতস্ততঃ করা অস্বাভাবিক নয়। রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অদম্য উদ্যমে গবর্ণমেণ্ট কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে আধুনিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত বিরাটকায় রাসায়নিক-শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করিয়া দেশকে শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ করিবার অন্য কোনও পথ নাই। এই পন্থা অবলম্বন করাতেই জাপানে এত দ্রুত শিল্পোন্নতি সম্ভব হইয়াছিল। ক্যালসিয়ম কারবাইড্, শিল্প, কৃত্রিম রবার, রঞ্জন পদার্থ, পাথুরিয়া কয়লা হইতে পেট্রল প্রস্তুত, কৃত্রিম সার উৎপাদন প্রভৃতি প্রত্যেকটি রাসায়নিক শিল্প স্থাপনেই রাজসূয় যজ্ঞের মত অজস্র অর্থব্যয় প্রয়োজন; তদ্ভিন্ন উপযুক্ত যন্ত্রাদি আমদানি বা প্রস্তুত হইলেও তাহা পরিচালনার জন্য যন্ত্রবিজ্ঞান পারদর্শী বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ-গণের সাময়িক সাহায্য গ্রহণও অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। এই সকল শিল্প স্থাপন করিয়া দেশীয় লোকদিগকে উহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সুদক্ষ করিয়া তুলিবার পর এবং উপযুক্ত সংরক্ষণনীতি প্রভৃতির সাহায্যে ঐ সব কারখানার উৎপন্ন সামগ্রী যখন দরে ও গুণে বৈদেশিক দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে তখন গবর্ণমেণ্ট উহার পরিচালনার ভার উপযুক্ত দেশীয় শিল্পপতিগণের হস্তে ন্যস্ত করিবেন। রাসায়নিক শিল্পে পাশ্চাত্য দেশগুলি যেরূপ সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে আধুনিক শিল্পে অনুন্নত কোনও দেশের পক্ষে দ্রুত শিল্পসমৃদ্ধ হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। নানা পন্থা বিস্তৃতে অবতার। এখন দেশের চিন্তাশীল ও জাতীয়তামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ প্রতিপত্তিশালী লোকদের প্রধান কর্ত্তব্য—তাঁহারা পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়া গবর্ণমেণ্টকে এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে অগৌণে বাধ্য করা। নতুবা আমাদের দরিদ্র দেশ বৈদেশিক পণ্যের চাপে ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া ভারত মহাসাগরের অতলে ডুবিয়া যাইবার পর চোখ খুলিলে কোনই লাভ হইবে না।

যতদিন না উল্লিখিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতেছে, ততদিন আমাদের দেশীয় রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান লক্ষ্য হইবে তাহাদের সংশ্লিষ্ট গবেষণাগারের কেমিষ্টদের সাহায্যে তাঁহাদের চলতি মালগুলির সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন করা এবং যে সব রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামাল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় সেই সব শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহাদের সাধ্যমত আকারের নূতন নূতন শিল্পের সূত্রপাত ও তাহার বিকাশ সাধন করা। যে সকল উদ্ভিজ্জ ও খনিজ পদার্থে ভারতবর্ষের একচেটিয়া অধিকার, সেগুলির রপ্তানি প্রায় বন্ধ করিয়া তাহা হইতে যথাসম্ভব বৃহদায়তনে এদেশেই পণ্যসম্ভার তৈরীর প্রবল প্রচেষ্টা সর্ব্বাগ্রে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অবশ্য এক্ষেত্রেও গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতিরেকে সাফল্য লাভ দুঃসাধ্য—তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাজনীতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্পোন্নতি তথা জনকল্যাণ-কল্পে গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক সাহায্যদানে কুণ্ঠিত হইবেন না।

মহাসাগর

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ

বার বার তুমি তটের উপরে পড়,
গর্জ্জিয়া কভু, কভু বা মিনতি করি
প্রাণপণে বল, "সাড়া যাও, যাও সাড়া"
তীর নির্ব্বাক্, ফিরে যাও সর্ব্বরি।

কিসের আশায় চঞ্চল তব মন?
সে কোন্ অভাব—যাহা কভু মিটিল না?
কাহায় লাগিয়া ক্রন্দন কর বৃথা?
কোন্ সুর শুনি যোলাও হাজারো কণা?

কার তরে তব উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বাস!
ও চাহ কাহাকেও—উর্ম্মিমালায় বাঁধা?
কোন্ সুদূরের আহ্বান শুনিয়াছ?
না পাওয়ার দুঃখে ঘুমিয়া ঘুমিয়া কাঁদো।

হে মহাসাগর! নহ শুধু বারি ভূপ,
মানুষের হিয়া তোমাতে পেয়েছে রূপ।

চোর

শ্রীসন্তোষকুমার দে

সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী দৈনিক কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগের ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। নানা প্রতিষ্ঠান হ'তে সময়ে অসময়ে আমরা—সংবাদপত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট লোকেরা, নিমন্ত্রণ পেয়ে থাকি, তাই নিমন্ত্রণপত্র পাওয়াটা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিন অফিসে এসে যে নিমন্ত্রণ পত্রখানি পেলাম তার মুদ্রণ-পারিপাট্য, গঠন-সৌষ্ঠব ও নিমন্ত্রণের আহ্বান মুহূর্তেই বুঝিয়ে দিলে এটি অসাধারণ, এমন নিমন্ত্রণ কালেভদ্রে মিলে। পত্রখানি নিয়ে এসেছিল একজন স্মার্ট সুট-পরা নবীন যুবক বললে—মিষ্টার মৈত্র বিশেষ করে বলেছেন—আপনাকে যেতেই হ'বে। পূর্বের সামান্য পরিচয় মনে পড়িল—নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের সুসজ্জিত কক্ষে মিষ্টার মৈত্রের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। যদিও তিনি অন্যান্য সকল অতিথিদের যত্ন আপ্যায়ন করে বেড়াচ্ছিলেন, তবু তারই মধ্যে আমার দিকে যে তাঁর বিশেষ যত্ন প্রকাশ পাচ্ছিল তাতে আমি স্বতই কুণ্ঠিত বোধ করছিলাম। সাহেবিখানা দু' একবার যে না খেয়েছি তা নয়, কিন্তু অদ্যকার আয়োজনটা এতই আড়ম্বরপূর্ণ ছিল যে আমি অভিভূত না হয়ে পারি নি। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অধিকাংশ সরকারি চাকুরে, শ্বেতচর্মও কয়েকজন আছেন। সুতরাং পার্টি বেশ জমে উঠেছিল।

সভা ভঙ্গের পর বিদায় নিবার সময় মিষ্টার মৈত্র আমাকে তাঁর নিজের গাড়ীতে তুলে নিলেন। যতক্ষণ সাথে সাথে থাকলেন তাঁর আলাপে ব্যবহারে তার আভিজাত্য, শিক্ষা ও সজ্জনতার সহস্র পরিচয় পেলাম।

এই পরিচয় আমার পক্ষে আনন্দদায়ক হ'লেও কখনই রক্ষা করা চলেও না—যদি না তিনি নিজেই আমাকে আবার নানা উপলক্ষে তার গৃহে আমন্ত্রণ জানাতেন।

বিলাত-ফেরত এনজিনিয়ার, একটা বড় কারখানার মালিক, যুদ্ধের চাহিদা মিটিয়ে মোটা টাকা আয় করেছেন, এসব কথা জানতে বিলম্ব হল না। আমাকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর কারখানাও একদিন দেখিয়ে দিলেন। নিজে সাথে থেকে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনলেন। আমি সোৎসাহে বললাম—আপনি কর্মবীর, ভারতকে আপনি মহিমাময় করে তুলবেন।

মিষ্টার মৈত্র হাসতে হাসতে বললেন, কথাটা কেবল মুখে না বলে কাগজের মারফতই বলুন না, দেশের লোকে কথাটা জানুক।

পূর্বেই বলেছি, আমি একটা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী দৈনিকের বিজ্ঞাপনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। সহকারী সম্পাদকদের ধরে একটী চমৎকার 'রাইট-আপ' লিখে মিষ্টার মৈত্রের ব্লক করে ছেপে দিতে বেগ পেতে হল না। যে দিন কাগজে তাঁর কথা বের হল সেই দিন বৈকালিক চা পানের নিমন্ত্রণ পেলাম তাঁর কাছ হতে, টেলিফোনে। যথা সময়ে গেলাম তাঁর বাড়ীতে। খুব আপ্যায়িত করে বসালেন। চা পানের পর বললেন—মিষ্টার দে (ঐটাই অধুনা ভদ্রভাষা, নাম ধরে আহ্বান করা রীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার) খুব তো কর্মবীর, ভারতের শিল্পাধিনায়ক, যেনো তেনো—বড় বড় কথা লিখেছেন আমার নামে। বস্তুত আমি তো ওসব কিছুই নই।

ভাবলাম কথাটা বিনয়ের, তাই বললাম—আপনি কি তা আমরা জানি, জানে দশজনে। সূর্যের পরিচয় নিজেই প্রকাশ পায়।

এবার মিষ্টার মৈত্র অন্তরঙ্গভাবে বললেন, ওটা আপনার স্নেহের কথা। আমি একটা কাজের কথা বলেছিলাম। ভাবছিলাম যুদ্ধতো চিরদিন থাকবে না, এখনি সময় থাকতে কিছু একটা ইনডাস্ট্রি যদি গড়ে তুলতে না পারি, তবে আর কবে করবো। এখন লোকের হাতে টাকাও প্রচুর, আর ওয়ার-সাপ্লাই দিলে কোম্পানীর দাঁড়াতে দুবৎসরও লাগবে না। কি বলেন, প্রজেক্টটা কেমন মনে হয়?

সম্পূর্ণ সমর্থন করলাম তাঁর পরিকল্পনা। ভারতকে যন্ত্রপাতির জন্য বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হ'লে স্বাধীন ভারতেরও মৌল দৈন্য ঘুচবে না। যন্ত্রপাতির বড় কারখানা মিষ্টার মৈত্রের মত বিশেষজ্ঞের হাতে হওয়া দরকার।

যথাসময়ে কোম্পানী রেজিষ্ট্রি করে তার কাগজপত্র মিষ্টার মৈত্র আমাকে দেখিয়ে বললেন, এবার সব আপনার কাজ। আপনার সহায়তা ভিন্ন কিন্তু এক পা-ও আর এগুবে না।

কী যে বলেন, এবার আমি বিনয় প্রকাশ করলুম। আমার হাত দিয়ে কাগজে মাসে চারবার অর্দ্ধ পৃষ্ঠা করে বিজ্ঞাপন বের হ'ল। তার কমিশনের মোটা টাকাটায় বড় মেয়েটির বিবাহের গহনা হ'তে পারবে হিসাব করে আমিও মনে মনে খুসী হয়ে উঠলাম। আমার ডিরেক্ট বিজিনেস্, এতে আর ছ্যাচড়া বিজ্ঞাপনের দালালদের ভাগ দিতে হবে না।

বিজ্ঞাপনের ফল ফলল, হুড় হুড় করে শেয়ার বিক্রি হতে লাগল। ইতিমধ্যে মিষ্টার মৈত্র দিল্লী ঘেরে যথাসময়ে তৈল সিকন করে কোম্পানীর মূলধন বিশগুণ বৃদ্ধি করবার অনুমতি নিয়ে এলেন। বিরাট আড়ম্বরের সাথে কোম্পানীর কাজ সুরু হল।

বলা বাহুল্য নূতন কোম্পানীর সাথে আমার দহরম-মহরমটা বেশী মাত্রাতেই ছিল। মিষ্টার মৈত্র আমার দ্বারা বোধ হয় উপকৃত হয়েছিলেন, তাই যখনই যেতাম খুব খাতির করতেন।

কথাটা বাইরের লোকের পক্ষেও জানা কিছু অসম্ভব নয়। একদিন সেই সুবাদেই একজন বৃদ্ধ ও তার বালক পুত্র আমার বাড়ীতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁর কথা প্রথমে আমার অদ্ভুত মনে হ'ল, তবু পরছিদ্রান্বেষণ বোধ হয় মানুষের স্বভাব, তাই সকল কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। তিনি বললেন, মিষ্টার মৈত্র বিলাত-ফেরত এনজিনিয়ার বটে, কিন্তু তিনি কপর্দকশূন্য অবস্থায় কলকাতায় এসেছিলেন। বৃদ্ধ রাধেশবাবু তাঁকে তাঁর কারখানায় চাকরী দেন। অল্পদিন পরেই যুদ্ধ বাধল, তখন মিষ্টার মৈত্র যুদ্ধের কাজে চলে যাওয়ার হুমকি দেখিয়ে রাধেশবাবুর কাছ হ'তে একটী পাকা লেখাপড়া করে কারখানার ভার নেন। রাধেশ বাবু বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হ'লেও বৃদ্ধ হয়েছেন, সকল কাজ পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন, পুত্রটিও নাবালক। ফলে অচিরাৎ মিষ্টার মৈত্রই কারখানার মালিক সেজে সরকারি অর্ডারধরে মোটা টাকা পিটতে লাগলেন। রাধেশবাবুকে প্রথমে মাসে চার পাঁচ শত টাকা করে দিতেন, শেষ পর্যন্ত তা-ও বন্ধ করেন। লেখাপড়ার সর্ত অনুযায়ী কারখানার ভাড়া বাবদই মাসিক হাজার টাকা হিসাবে চার বছরে আট-চল্লিশ হাজার টাকা বাকী, এ বাদে রাধেশবাবুর অনেক কাঁচা মাল গুদামে ছিল তাও মিষ্টার মৈত্র নিয়ে মাল তৈরীতে ব্যবহার করছেন তার দাম দেন নি। তারও দাম পঞ্চাশ হাজারের কম হ'বে না।

বললাম, চার বছর চুপ করে থাকলেন কেন? এক-দিনে সেতো আপনাকে ঠকায় নি।

বৃদ্ধ ওষ্ঠে তালুতে একটা হতাশা ব্যঞ্জক শব্দ করে বললেন—সে অনেক কথা প্রাণতোষবাবু। আপনি যখন এতটা শুনলেন, আরও না হয় শুনুন। আমি বিপত্নীক। আমার স্ত্রী যখন মারা যান তখন এই ছেলে ছোট, তার উপরে আমার একমাত্র কন্যা। আমিই এদের মানুষ করেছি, সত্যি বলতে কি সংসারের দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে ঘেরে কারখানার কাজে আমার অনেক শাফিলতি হয়েছিল। তাই যখন ও ছেলেটি এসে কারখানার ভার নিলে, আমি রেহাই পেলাম। কাজ কর্মও বেশই চালাচ্ছিল। আমার বাড়ীতেও সে ছেলের মতই ঘোরা-ফেরা করত। বুঝতেই পারেন, মনে অনেক আশা করেছিলাম, আজ বুঝছি সেটা অন্যায় হয়েছিল। ইচ্ছা হয়েছিল, মৃণাল—আপনাদের মিষ্টার মৈত্রের নাম মৃণাল মৈত্র, আমার পুত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আসন সহজেই অধিকার করবে। কিন্তু ভুল বুঝেছিলাম। ওদের চোখে বিলাতি নেশা, বাঙ্গালী মেয়ে বোধ হয় চোখে লাগে নি।

আমি রাধেশবাবুর কি সহায়তা করতে পারি বুঝতে পারলাম না। তবু সান্ত্বনার সুরে বললাম, আপনার ছেলেকে আর আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে আপনার কন্যাও নিশ্চয় সুখী হবেন। তবে মিষ্টার মৈত্র এমন করছেন কেন?

রাধেশবাবু দুঃখের হাসি হেসে বললেন—আপনি কেন, শতকরা নিরনব্বই জন বাঙ্গালী আমার মেয়েকে দেখে সুন্দরীই বলবে সে কথা আমি জানি। কিন্তু ওই তো বললাম, ওদের চোখে বিলাতী নেশা। মিস্ ডরোথি না কে একজন মেয়েকে মৃণাল ভালোবাসে শুনতে পাচ্ছি।

আরও কদর্য কাণ্ড কি করেছে জানেন? এই নূতন

কোম্পানীর কারখানায় নিয়ে এসেছে সব আমারই করিগর, আমারই মেসিন, লেদ, মোটর—রাতারাতি। এ সর্বনাশের কি প্রতিবিধান করা উচিত তা আমি ভেবে পাচ্ছিনা। আপনি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জেনেই আপনার কাছে এসেছি, যদি দুইকুল রক্ষার কোন উপায় করতে পারেন। নতুবা কেস আমাকে করতেই হবে। এ বৃদ্ধ বয়সে মামলায় হেরে যদি ছেলেমেয়ের হাত ধরে পথে বেরে দাঁড়াই, তবু এ মামলা আমাকে করতে হবে। ন্যায়ধর্ম আমার দিকে, দেখি কী হয়।

মিষ্টার মৈত্রকে আমি বলে বুঝিয়ে দেখব আশ্বাস দিয়ে বৃদ্ধকে বিদায় দিতে হ'ল। তিন দিন পরে তিনি সাক্ষাৎ করবেন বলে গেলেন। তিনি চলে গেলে আমি সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম। ক্রমে রাধেশবাবুকে ছেড়ে চিন্তাটা আমার নিজের উপর এসে পড়ল। মিষ্টার মৈত্র কি আমার নাগাতেও কাটান ভেঙে কোষ খান্ না কি? বিজ্ঞাপনের দরুণ একটি পয়সা আজ পর্য্যন্ত আদায় হয়নি। বিল সরকার যেয়ে বকুনি খেয়ে আসে। পার্সনাল বিজিনেস বলে টাকা আদায়ের ভার আমিই নিয়েছিলাম। টাকা চাইবার আগেই একটা সোনার সিগারেট কেস্ উপহার। দশহাজার টাকার উপরে কিন্, একটি পয়সা পাইনি। একদিন তো হাসতে হাসতে বলেই ফেলেন, আরে মশাই লিমিটেড কোম্পানীর টাকা, ও অমন একটু আধটু দেরিতে আমার হয়েই থাকে। যদি মানেজিং ডিরেক্টার কিছু বলে, আমায় বলবেন এবং একদিন তাকে শুদ্ধ কিয়পো-তে ডিনার খাইয়ে দেব।

অবশ্য আমরা মনে মনে একটা বিচার করেছিলাম। ভারতকে স্বাধীন করে তুলতে যে যন্ত্রশিল্প প্রয়োজন তারই মহৎ উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত এই নূতন কোম্পানীকে দাঁড় করবার সহায়তা করতে বিলের টাকাটা দু'দিন না হয় দেরী করেই নেব। তাতে আর আমাদের কাপড় উঠে যাবে না। কিন্তু আজ বুঝতে পারলাম এক নূতন ফ্যাসাদ বাধিয়েছি। একাউন্ট্যান্টকে ফাঁকা দিয়ে এই কিস্তিগুলির জন্য আমার প্রাপ্য কমিশনের টাকাটা পর্যন্ত আমি পকেটস্থ করে ফেলেছি, তার কিছুটা ব্যয় পর্যন্ত হয়ে গেছে! ব্যাপারটা কতদিন পারি চাপা দিয়ে রাখাই নিরাপদ, জানাজানি হলেই নিন্দুকেরা হাততালি দেবে। আর আমি তো মানুষের নিন্দুক আর শত্রুর অভাব নেই।

রাধেশবাবুকে কিন্তু মিষ্টার মৈত্রের নিন্দুক বলে মনে হ'ল না। তাই অফিস-ফেরতা গেলাম সেদিন মিষ্টার মৈত্রের কাছে। যেয়ে দেখি অফিসে সে এক কেলেঙ্কারী ব্যাপার। মিষ্টার মৈত্র খুব চোখ রাঙ্গিয়ে একজন শ্রমিককে গালাগালি দিচ্ছেন, তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখাচ্ছেন। আমি যেতেই মিষ্টার মৈত্র শ্রমিকটিকে ছেড়ে আমাকে ধরে বলা সুরু করলেন, দেখুন ছোটলোকের সাহস, বলে বাড়ীতে অসুখ, তাই টাকা দেখে লোভ সামলাতে পারেনি।

মিষ্টার মৈত্রের তিরস্কার গর্জন, আর শ্রমিকটির আসন্নাবিক ক্রন্দনের মধ্য হ'তে যে কাহিনী আবিষ্কার করলাম তা হ'ল এই যে, মিষ্টার মৈত্র বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বাথরুমে ঢুকেছিলেন, টেবিলে দশখানা দশটাকার নোট রেখেছিলেন। শ্রমিকটি কারখানার একজন ওস্তাদ ফিটার, কি দরকারী কথা বলতে মিষ্টার মৈত্রের চেম্বারে ঢুকে তাঁকে না পেয়ে দশখানা নোটের চাপা তুলে মাত্র দুইখানা নোট নিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন সময় মিষ্টার মৈত্র এসে ধরে ফেলেছেন। হৈ চৈ শুনে অনেক লোক জড় হয়েছে। শ্রমিকটি কাঁদতে কাঁদতে বলছে—স্যার, রাধেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি পঁচিশ বছর তাঁর কাছে কাটিয়েছি, কোনদিন কিছু ঘটেনি। আজ এসেছিলাম আপনার কাছে কিছু ধার চাইতে। বাড়ীতে স্ত্রী পুত্র সবাই অসুস্থ, অর্থাভাবে চিকিৎসা হয় না। সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা আমার মা আজ তিনদিন হ'ল সিঁড়ি হ'তে পড়ে পা ভেঙে ফেলেছেন। ডাক্তার বলেছে এক্সরে করাতে হ'বে, কিন্তু টাকার অভাবে তাও হয়ে ওঠেনি। তাই আপনার টাকা হ'তে মাত্র দু'খানি নোট নিয়েছিলাম, হপ্তা পেলে আবার এমনি গোপনেই রেখে যেতাম—চুরির মতলব থাকলে তো সব টাকাই নিতে পারতাম।

আমার ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আর কি!—হুমকি দিয়ে উঠে মিষ্টার মৈত্র ম্যানেজারকে হুকুম দিলেন—আমি কোন কথা শুনতে চাইনে, ওকে থানায় নিয়ে যান। চোর যে, তার সাজা পাওয়াই উচিত।

অচিরাৎ আদেশ পালিত হ'ল।

আমি বাধা দিতে পর্যন্ত পারলুম না, কেমন কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগল। চোর যে তার সাজা পাওয়াই উচিত। মিষ্টার মৈত্র কি ঠিক কথাই বলেছেন? সমাজ কি সকল চোরকে সাজা দেয়, না দিতে পারে। সাজা পায় যারা গরিব। দু দশ টাকা যারা চুরি করে। যারা হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা চুরি করে—তারা সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তি, তাদের বাড়ী গাড়ী কোন ব্যাঙ্ক সব কিছুই হয়—আদর সম্মান প্রতিপত্তি সব কিছুই তো তাদের জন্যে; ওই শ্রমিকটি যদি ফিরে এসে বলে, তুমি মিষ্টার মৈত্র, আমার মনিব রাধেশবাবুর আটচল্লিশ হাজার টাকা ভাড়াবাবদ চুরি করেছ। কাঁচা মাল চুরি করেছ পঞ্চাশ হাজার টাকার, চলো থানায়···কি ফল হবে? মানহানির মামলা করাও তো সম্মানজনক ব্যাপার। মিষ্টার মৈত্র যদি অধিক উত্তেজনাবশে ওকে খুন করে ফেলেন তাতেও দোষ নেই, সমাজ ধর্ম ও আইন আদালত তাকে ক্ষমা করবে, কেননা যে ভাবেই হ'ক তিনি টাকা করেছেন।

পচ্ করে একটা টার্কিশ সিগারেট ধরিয়ে একগাল কড়া ধোঁয়া ছেড়ে মিষ্টার মৈত্র হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট কেন্ হতে বসেছে। চলুন চলুন, পথেই কথা হবে; শশব্যস্ত হয়ে তিনি কোট পরে নিলেন; টাই টেনে ঠিক করে প্যাণ্টের ভাঁজটায় হাত বুলিয়ে জুতাটা শুদ্ধ পা সজোরে মেঝের কার্পেটে গা দিয়ে এক মুহূর্তে তিনি তৈরী হ'য়ে নিলেন। পথেই রাধেশবাবুর কথাটা বলব ভেবে আমিও তার সাথে বেরলাম।

অধুনা অনেক দিনই মিষ্টার মৈত্রের সাথে এমন সময় বেরিয়ে হোটেল যেতাম, সেখানেই চায়ের সাথে অন্ত পানীয় অভ্যাস করছিলাম। আজ কিন্তু গাড়ী চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে ক্যাসকাটা ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে ছুটল। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় চলেছেন?

মিষ্টার মৈত্র যেন ধ্যানভঙ্গ হয়ে ইহজগতে ফিরে এলেন, বল্লেন ডরোথির কাছে। ও, বলিনি বুঝি তার কথা আপনাকে, চলুন না আলাপ করে দেব। ইহুদি মেয়ে, কলকাতার সেরা সুন্দরী। চান তো আপনার ম্যানেজিং-ডিরেকটারকে একদিন নিয়ে আসবেন। সে আমার একার সম্পত্তি নয়, বিস্তরাজের উপায় মাত্র।

মোটরের চাকার নীচের রাস্তার কোঁ কোঁ করে আওয়াজ উঠেছে, সোঁ করে গাড়ীটা একটা বাঁক ঘুরল।

আজাদ-হিন্দ-সরকার

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ভারতের অতি বড় দুর্ভাগ্য! ভারতবর্ষ যখন ন্যূনাধিক দুইশত বৎসরের অক্লান্ত-চেষ্টায় Tata Steel নির্মিত লৌহ নিগড় ভঙ্গ করিবার জন্য তনুমনঃধন উৎসর্গ করিয়াছে তখন আরও একটী রাজনৈতিক দলের দর্শন মিলিল। অহীরাবণের পুত্র মহীরাবণের মত, এই দল ভূমিষ্ঠ হইয়াই রণ রঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যে বৃটিশ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ক্রিমিন্যাল-রেজিস্ট্রেশনে বাঁধিয়া রাখিতে আদেশ দিয়াছে; যে বৃটিশ, কুরুরাজ দুর্যোধনের মত ভারতকে কোনদিন সূচাগ্র ভূমি ছাড়িয়া দিবে না শুনাইয়া দিয়াছে; যে বৃটিশ, ভারতবর্ষকে মহা আহবে লিপ্ত করিবার পূর্বে একটি সুখের কথাতেও ভারতের মতামত জানিবার প্রয়োজন দেখে নাই, আইন পড়িয়া, যে-আইন রচনা করিয়া, সে-আইনের মাধ্যমে নির্মাণ করিয়া ভারতের জন, ভারতের ধন পরমানন্দে উৎসর্গ করিয়া দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে নাই। সগর্বে এই দল বৃটিশের যুদ্ধেরও নামকরণ করিল, জনযুদ্ধ। ভারতের জনগণকে বৃটিশকে সহায়তা দান করিতে আহ্বান দিল। বিচিত্র দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ; অতীতের বিচিত্র—বিচিত্রাধিক বিচিত্র এই ভারতের অধিবাসী। সেদিনের কথা স্মরণ করিতেও হাসি আসে; লজ্জা হয়।

ট্রামে কিম্বা বাসে চাপ-ক্যাটলেট্ চলিতেছি—আর মা-কালীকে জোড়া পাঁঠা (যদি পাওয়া যায়, তবেই দিব) মানত করিয়া বলিতেছি যে-যা, যত্রক করো, কলকাতা কিন্তু থাকা চাই, মরিলে আর ত পারি না: অকস্মাৎ ব্রহ্ম কেশ, শুষ্ক আনন মলিন বসন ঘোড়-কর্পর প্রবেশ; কাহাকেও গুঁতাইয়া, কাহাকেও ধাক্কাইয়া, কাহাকেও ঘুষ লাগাইয়া, তাহারই মধ্যে স্থান করিয়া লইয়া, হঠাৎ—বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত হুঙ্কার ত্যাগ—"আপনাদিগের রক্ত দিতে হবে" তৈলসিক্ত-

শুক্ল কেশ মুহূর্তে খাড়া হইয়া উঠিল ; বিরল আননে অনল জ্বলিয়া উঠিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উত্তেজিত হইয়া উঠিল ; অন্তরিন্দ্রিয় যেন এক মুহূর্তে দুইটি মার্চ্চ সুরু করিয়া দিল—"জাপানীদের রুখতে হবে।" মাথাটিতে মনে হইল, বুঝি বা জাপানী বোমেটেরা উইণ্ডিজির আকাশ পার হইয়া টানার পুলে চড়াও হইয়াছে, আর রক্ষা নাই ! একমাত্র উপায়—"জাপানীদের রুখতে হবে।" যখন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে, সৈকত প্রাণ করতলে পুরিয়া ভাবিয়া সারা হইতেছি যে কি উপায়ে রুখিব—কামড়াইব—না, আঁচড়াইব—না হাওয়ায় মুষ্টি ছুঁড়িয়াই বা মাথা কাটাইব (মাথা যদি জাপানী খেলনার মত হয়, তাহা হইলে আমার মুষ্টিতেও কাটিতে পারে !) ঘোড়ু-অশ্বের প্রস্থান। প্রস্থান না বলিয়া অন্তর্ধান বলিলেই ভাল হয়। অবসর নাই, বড় তাড়া, "জাপানীদের রুখতে হবে !" আমার কাহাকেও গুঁতাইয়া, কাহাকেও হাতাইয়া, কাহাকেও ঘুষাইয়া, কাহাকেও আধাইয়া টানার পুল কিম্বা গ্রামরাজ্যের চৌহদ্দির উদ্দেশে ছুটিতে হইল। আমরা মা-কালীর নিকট অন্ত আরতি শেষ করিলাম, যে মা, রুখতে পারি আর নাই পারি, বাড়ী ফিরে যেতে যেন পারি !

ভাল হৌক মন্দ হৌক ভারতের সংস্কার আছে, এখানে পাঁচটাকে একবার ধীরা পড়িলে আর তাহা ফিরে হয় না। ধারা বদল, মন বদল, পাঠকা বদলের মত পতি বা পত্নী বদলের রীতি বা রীতি আজও প্রতীচীতে প্রচলন হয় নাই। শুক্ল ভাল, শিক্ষিত বেথাণী, শুক্লতর বিদ্যা অর্জ্জনে আগ্রহ দুর্নিবার থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ দুইশত বৎসরের মধ্যে ভারতবাসী পাঠান বা মোগলের গ্রহণে শুক্ল ইলোরোপের মত নৈপুণ্য আজও আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ভারতে বৃটিশের পতিয়ের অবসানে ঘটাইতে ভারতবর্ষ বদ্ধপরিকর ; কিন্তু পতান্তর গ্রহণের বিন্দুমাত্র বাসনা তাহার নাই। বৈধব্যে বিবাহ ভারতের কোনদিনই ছিল না, আজও নাই, একাদশীর উপবাসে তাহার অভ্যাস আছে। ভারতের শিরোভূষণ তুষারকিরীটিনী হিমালয়ের ন্যায় ভারত নারীর বৈধব্যও বহু পুরাতন। বৃটিশকে "কুইট-ইণ্ডিয়া" করিতে বলিয়া, বেলুচিস্তের বালু হতে শীতবরণ (?) বরবাণী জাপানীকে সুস্বাগতম্ করিতে চাহিবে ভারতবর্ষের জীবিত নরনারীদিগের মধ্যে সে বৈরাচারেচ্ছা কেহ পোষণ করিত বলিয়া শুনা যায় নাই। তবু যে যুদ্ধে, বাদুড়ঝোলা কাঁদ চক্ষু মুদি পাঁঠা ঠাকড়াইয়া জাপানীদের রুখিবার দরকার হইয়াছিল, ইহাই ত অশেষ বিস্ময় ; তাহার উপর আবার জনযুদ্ধের রাড়া। রুশকি লড়াই রামকি লড়াই ! রুশকি লড়াই রামকি লড়াই যুদ্ধার কাণাঘুষা কালাপাহাড় হইয়া বিরাজিল। কিন্তু লোকে বলে, অভিসারিকার প্রেম নিকষিত হেম, যেন এ-সি কারেণ্ট—ছোঁয়াচ লাগিবামাত্র মরণ ধ্রুব। সাম্যবাদী রাশিয়ার নবীন প্রেমে ভগবান তথুনঃ কমিটনিষ্টগণ যেমনে ঐচকা টানে খানিকটা বিশ্বাস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল বৈকি ! কমিটনিষ্ট কি সত্যই ভাবিয়াছিল, মার্ক্সারের মধ্যে, শার্দ্দুলের মাঝে, মুষলের যৌবনে অরুচি হইয়াছে ? বৃটিশ তাহার সাম্রাজ্যলিপ্সা বিসর্জ্জন দিয়াছে ? মার্ক্সার ইন্দ্রাণীজাতীয়ের বাঘা ছাড়িয়া দিয়াছে ? ন্যায় অন্যায় বারুক ও বরযাত্র উপেক্ষা করতঃ তপোবন পর্ব্বতকন্দরে বুঝ ভগবান্ রত হইয়াছে ? যুবক যুবতীগণ চন্দ্রমল্লিকা মধু যামিনীতে ফুলের তলে বসিয়া (বা শুইয়া) "ধরিবার কিবে আর কি যম আছে সংসারে" গাহিতেছে ? সত্য সত্যই কি কমিটনিষ্ট আত্মারা এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিল ? কে জানে বাপু ; আমি ত বুঝি না !

যে সময়ে যে পৃথিবীময় ভ্রাতৃবিদ্বেষের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল ইহাই বা অস্বীকার করিবে কে ? আমেরিকার মাতৃষ্বসা রুজভেল্ট (তাঁহার আত্মার সদ্গতি হৌক !) জোর গলায় ঘোর চিৎকার—চতুর্বিধ স্বাধীনতার গাহনা গাহিতেছেন ; তাঁহার মামাতো ভ্রাতা (অর্থাৎ মেসফুয়ো) চার্চিল অতলান্তিক মহাসাগরকে জাহাজে বসিয়া অতলান্তিক সন্ধন্ধে সাধা কালিতে থাকার সংযুক্ত করিয়া পৃথিবীকে অভাব হইতে, পীড়ন হইতে, ভয় হইতে,শোষণের কবল হইতে বিশ্বচরাচরে মুক্তি দিবার অভয় বাণী শুনাইতেছেন ; যুদ্ধের অবসানে এই পচা পুরাতন শ্রৌঢ় পৃথিবীতে নূতন স্বর্গ, নূতন মর্ত্ত্য সৃষ্টির আধারে আধারে ধরিত্রীর মনন রসসিক্ত করিয়া তুলিতেছেন। লোকের ভুল হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু কুলটার পক্ষে পাতিব্রত্যের মত, পরম ধার্ম্মিক হকের ধর্ম্মাচরণের মত, বৃটিশের শোষণ-বিমুক্তির সকল সম্বন্ধে যাহাদের ভ্রান্তি হইবার নহে, তাহারাই একদিকে 'কুইট-ইণ্ডিয়া" ও অন্যদিকে "দিল্লী-চলো" করিয়াছিল। মহীরাবণের পুত্র মহীরাবণ তাহাতে বড়ই রাগ করিয়াছিল। বিশ্বের মুক্তি প্রদাতা, বিশ্বশান্তির স্বাধীনতা বিধাতা বৃটিশের জীবন-মরণ যুদ্ধের সময়ে যাহারা বৃটিশকে কুইট-ইণ্ডিয়া করিতে বলে, মহীরাবণ গালি দিয়া তাহাদের ভূত ভাগাইয়া দিয়াছিল। আর দিল্লী-অভিযাত্রীগণ তাহাদের নিকট ঘিয়ুরাকর, ছুইসলিং, পঞ্চমবাহিনীর সৌহৃদ অর্জ্জন করিল। বিচিত্র-বেশ আমাদের ভারতবর্ষ ; অতোধিক বিচিত্র তাহার সর্ব্বংসহা প্রকৃতি। পচা পুকুরের পঙ্কও তাহাতে কিন্তু ভারতের সরিকুটার অন্ত নাই। আজও তাই মহীরাবণ মধুর-সম্বন্ধে মুখ দেখাইতে পারিতেছে।

কিন্তু একটা কথা আমরা ভাবিয়া পাই না। ভারতীয় কমিটনিষ্টরা কি আজও রাশিয়ার প্রেমের ঘোরে মশগুলচিত্ত ? উত্তানশিরা ? মুক্তমনা —দিবাস্বপ্ন, কি এখনও ভাঙ্গে নাই ? যুদ্ধের সময়ে বিজয় ঘোড়ায় সেক্টাসুরের রসি কষিতে কষিতে যে-বৃটিশ ব্রজবেশ পরিহরি বিশ্বভক্তজন বন্ধুবেশ যীশুখৃষ্টের পক্ষসাম আবৃত্তি করিতে করিতে সিমলা শৈলে আসিয়া পিতৃদত্ত প্রাণ ও দুইশত বৎসরের দুর্জ্জয় মান রক্ষার সমর্থ হইয়াছিলেন এবং দিনে অদিনে, ক্ষণে অক্ষণে, সময়ে অসময়ে স্বাধীনতার ধর্ম্মবাণী শুনাইয়া ব্রজবাসীকে ভবিষ্যতের সুখসাম্রাজ্যের সুখ ভরসে মাখন তোলার ঘোল দিতেছিলেন, আমেরিকার যৌলতে যুদ্ধজয়ের পরে, সেই ব্রজবেশে শুক্ল প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সে কি বীরপণা ! সে শৌর্য্য, সে বীর্য্য দেখিয়া ব্রজবাসী অবশ্য তারকব্রহ্মনাম নাম স্মরণ না করিয়া পারিতেছে না। শুধু ব্রজবেশই যা কেন, ইলোরেশিয়ার বেশ, জাপানী বোমেটে দেখিয়া হাসা দিয়াছিল, বৎস ভঙ্গ কোন্ কচু বনে লুকিয়া অমূল্য জীবন রক্ষা করিল ; আর যেমন যুদ্ধ শেষ হইল, অমনি কচুবনের সিংহাসনারোহণের মত আস্ফালন আসিয়া সিংহলরাজের দেখে কে ? ইশাটীনে দেখ, বীরবর কয়াসী 'যায় প্রাণ ভিক্ষে দেগে যায়' করিয়া ফ্রেঞ্চ ফীল্—চন্দ্রী পরিপাটি করিতে এক লহমা বিলম্ব করে নাই, যুদ্ধান্তে প্রাণ বদলে ফিরিয়া

আলাবাইটের হাতে মাথা কাটিতেছে। আর সকলের মূলে—জলে স্থলে—জনযুদ্ধওয়ালাদের পরম মিত্র বৃটিশ, ফোরসেট দাগাইয়া বলিতেছে, মিঃ গান্ধীর্ণটি কি করিতে আছে? পরমাপহরণ মহাপাপ। যাহার যাহা ছিল, তাহাই তাহার থাক্! মহাজনের মহাবাক্য শুনিয়াও যাহারা পরমাপহরণজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইবে বৃটিশ তাহাকে বিন্দুও ক্ষমা করিবে। কেননা, গীতা বলেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

বৃটিশই দুষ্কৃতবিনাশ সাধুজনের পরিত্রাণ ও ধর্মরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে ও দেশে দেশে সম্ভব হইতেছেন। কিন্তু আমি ভাবি কি, ইহাতেও যদি ভ্রান্তি নিরসন না হয় তাহা হইলে ভ্রান্তিতেও সংশয় জাগে না কি? আর যদি ভুল বুঝিয়া থাকে—ভুল কাহার না হয়?—মানুষমাত্রেরই ভুল হয়। পৃথিবীর পরিত্রাতা পরমপিতা যীশুপুত্র ইয়াহুও বলিয়াছেন, টু আর ইজ হিউম্যান্! অর্থাৎ কি-না ভুল মানুষেরই হয়, গরু ভেড়ার হয় না। মহীয়াবলগণ ভ্রম ও ত্রুটী স্বীকার করে না কেন?

'হুইট ইজিজ' অর্থ, ভিন্নী ব্যাঙও বিকল হইয়াছে, আর্মেনী সভ্যতা—আপাদ বিগতপ্রাণ—ভি, ফর ভিক্টরি (ভ্যানিশ করে।); তথাপি বৃটিশ ভারতের সহিত যুঝাপড়া করিতে চাহে কেন? সরল ভঙ্গ আলাই। খাদ্যে গোরালা ঢেলা করে। বৃটিশ ভারতবাসীকে 'তু' ডাক দিয়া বিলাতে না লইয়া গিয়া নিজেরাই ভারতে আসিয়া যুঝাপড়া করিতে বদ্ধপরিকর হইতেছে। কেন গা? ভারতবর্ষ সাবালক হইয়াছে; আর তাহাকে স্নেহ-অন্ধে বশ্যতাযান রাখা শোভন ও সঙ্গত হয় না? এখন তু ছোড়ন কর্মে—তাহাকে স্বাধীনতা দিতে হয়। ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবির পার্লিয়ামেন্ট সৌধাভ্যন্তরে, হাউস অফ কমন্সের সভার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া প্রথম মন্ত্রী এ্যাটলি স্বেচ্ছায় এই শুভ সঙ্কল্পবাক্য করিয়াছিলেন, সেদিন (বোধ হয়) স্বর্গে দেবতারা দুন্দুভি নিনাদ করিয়াছিলেন; অপ্সরী-কিন্নরী পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল; আর আমেরিকা বক্স বক্স করিয়াছিল; বৃটিশের ঘুটলেন্ডীয় কবি রবি ঠাকুরের কবিতা রিসাইট করিয়া গগন কাটাইয়া ফেলিয়াছিল।

"বন্ধু তোমারে হে রাজমন্ত্রী! চরণপদ্মে নমস্কার"

কিন্তু ভারতবাসী জানে, তাহার ভিক্ষ অভিজ্ঞতায় ভালই জানে, কৃপণের বাড়ীর কলার। না খাঁচাইলে বিশ্বাস নাই। কিন্তু সে কথা থাক্; অথবা সে কথা এখন থাক্। আমি আজাদ-হিন্দ-সরকারের কথা বলিতেছি, সেই কথাই বলি।

একদিনের জন্য হৌক, অথবা এক সপ্তাহের জন্য হৌক, কিম্বা এক মাস বা এক বৎসরের জন্য হৌক, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার যিনি গঠন করিয়াছিলেন তাঁহার সাধনা বিফল এবং বিফলতায় বিষাদ-প্রমাদ হইলেও, ভারতবাসীর আজাদী আকাঙ্ক্ষাকাননে সে যে পূর্ণিমার দুগ্ধাভিষেক দিয়া গিয়াছে, বৃটিশ যদি তাহা না বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে বৃটিশের রাজনৈতিক বুদ্ধির ভাণ্ডারে গোমাতিত্বিক পদার্থ আছে বলিয়া জ্ঞান করা কঠিন হইয়া পড়ে।

১৯৪২ সালের আগে পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন একটা বিরাট পরাভব আন্দোলনের মধ্যেই পর্য্যবসিত ছিল। বিদেশী ও বিজাতি বৃটিশের অনিচ্ছার বিরুদ্ধে মান অভিমানের পালা গাহিয়াই আমরা চলিতেছিলাম। বৃটিশের মানা অনুরোধ (দুরাশার অনুরোধের অভাব হয় না!) নানা অজিলা, নানা বায়নাকা—বৃটিশ দিবে না, আমরাও ছাড়িব না। যাহারা আন্দোলন করিয়াছে, তাহাদিগকে কারাগারে পুরিয়াছে, বলপ্রয়োগ বাজেয়াপ্ত করিয়াছে, নির্য্যাতন, নিষ্পীড়ন—সঙ্গত ও অসঙ্গত, সঙ্গত ও অসঙ্গত, সভ্যতাসঙ্গত ও অসভ্য এবং মর্ম্মরোচিত আচরণও যে করে নাই এমনও নহে, প্রতিবাদে কারাগারে আরও জনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে; লাঠি বরষণ করিতে আরও লোক, গোলাগুলির মুখে বুক পাতিতে কাতারে কাতারে আরও অনেক মরদানী আসাইয়া আসিয়াছে। কংগ্রেস মুকের মুখে ভাষা, দুর্ব্বলের বুকে বল, ভীরুকে সাহস, কাপুরুষকে নির্ভীক করিয়া ভারতবর্ষকে অগ্রদূত—যজ্ঞ তুরঙ্গমে লইয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের কথামাত্র অবকাশ না থাকিলেও ১৯৪২ পরবর্ত্তীকালের 'কুইট ইণ্ডিয়া' তুলনায় সে সমস্তই নিষ্প্রভ ও অনুল্লেখ্য হইয়া পড়িয়াছে।

স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া ভারতবাসী অনন্ত দুঃখ, অশেষ কষ্ট বরণ করিয়াছে, গৃহ সংসার অতলে ভাসাইয়াছে, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াছে, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, বন্দুকের গুলির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, হাসিমুখে, গান গাহিতে গাহিতে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়াছে, তবু স্বাধীনতা কি, স্বাধীনতার রূপ, স্পর্শ, গন্ধ কিরূপ, স্বাধীনতার স্বাদ কেমন, স্বাধীনতার বাতাস মলয়ানিলের মত স্নিগ্ধ মধুর কি-না এ সকলের সহিত প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোন পরিচয়ই তাহার ছিল না। এই ভারতবর্ষ তাহার দেশ, তাহার জন্মভূমি, তাহার স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি, এই মাটি তাহার মা-টি, ভারতবর্ষ তাহার, সে'ও ভারতবর্ষের—কিন্তু তাহার দেশে তাহার অধিকার নাই, কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহার জন্মভূমি-মাতৃভূমিতে সে যেন প্রবাসী, পরদেশবাসী, তাহার মা-টিকে মা বলিয়া ডাকিবার, মাতৃজ্ঞানে তাহাকে পূজার বেদীতে বসাইয়া পূজা করিবার স্বাধীনতাটুকুও তাহার নাই। মাতৃভূমি অঙ্কিত করিলে অপরাধ হয়, মা'র রূপগুণের স্তব রচনা করিলে রাজদ্বারে লাঞ্ছিত হইতে হয়। তাহার দেশ অন্যে শাসন করে, শোষণ করে। পরের বরাদ্দ কণামাত্র পাইয়াই তাহাকে তুষ্ট থাকিতে হয়। সে চাষের মালিক, গ্রামের মালিক সে নহে। বন্দুকে তাহার অমৃতে বুভুক্ষিকার ব্যবস্থা—এ দুঃখ বড় দুঃখ। এ বৈষম্য ধর্ম্মান্তিক বৈষম্য। অন্তর্তাপাগ্নি অধিক কাল কংগ্রেস এই বৈষম্য দূর করিবার বিবিধত চেষ্টা করিলেও ভারতবাসী তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারে নাই; স্বাধীনতার মন্দনকাননের পারিজাত সৌরভ আঘ্রাণ করিতে পারে নাই। নেতাজীর আজাদ হিন্দ, সরকার সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিয়াছে; অল্পকাল স্বল্পকালের জন্য হইলেও স্বাধীনতার সৌরভ, স্বাধীনতার আস্বাদ অনুভব করিয়া ভারতবাসী অল্পকালের তরেও স্বল্পকালের জন্যও বড় হইয়াছে।

একি কম গর্ব্বের কথা যে ভারতবর্ষের স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ইংলণ্ড-আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিয়াছিল? একি অল্প গৌরবের কথা যে ভারতবাসী বিদেশীর সম্পর্ক

যেমন করিয়া বিদেশীর সংস্রব রহিত করিয়া, বিদেশীর কবল হইতে বিদেশ সাধন করিয়া বিদেশীর রাজ্যে স্বকীয় শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছি! মণিপুরে তাহার পতাকা, ইংকেলে তাহার পতাকা, কোহিমায় তাহার পতাকা, আবাবান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তাহার ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা পতপত শব্দে উড্ডীন থাকিয়া বিদেশীয় ভারতের গৌরব, ভারতের মর্য্যাদা প্রচারিত করিল। আজ মনে পড়ে বিজয়সিংহের পতাকা একদিন ভারতের বাহিরেও উড়িয়াছিল। আজ মনে পড়ে ভারতবর্ষ দূরে দূরে দেশে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু সে সকলই কাহিনীমাত্র; অতীতের স্বপ্নমাত্র। তবে ভারতের সান্ত্বনা ও বৈশিষ্ট্য যে ভারত তাহার অতীতকে বর্ত্তমানের মতই সত্য করিতে জানে।

জার্ম্মানী, ইতালী, জাপান প্রভৃতি অস্ত্র-শক্তি যেদিন পৃথিবীর ত্রাস ছিল, দুর্জ্জয় ও অসমসাহসের জাতি বলিয়া বিঘোষিত হইত, সেইদিনও, তাহারাও, ভারতের এই অস্ত্রহীন—আত্মার দিক, সত্যাগ্রহকে স্বীকার করিয়াছে, তাহার সহিত রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহ হইয়াছে, এই দুর্জ্জয় ও অত্যাশ্চর্য্য পৃথিবীর ইতিহাস কি অস্বীকার করিতে পারিবে? ইতিহাস মিথ্যার খেলাতী তাহা জানি, কিন্তু জাগ্রত ভারতের সহস্র দৃষ্টি অভিক্রম করিয়া মিথ্যার প্রচার আজিকার দিনে, তত সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ভারতের লাটপ্রাসাদে ইউনিয়ন জ্যাক উড়িতেই আমরা দেখিয়াছি। ভারতের নগরে নগরে বৃটিশের কেনা গোলাম দোকান, এমন কি, সৌখিনকালের ইউনিয়ন জ্যাক্ উড়াইয়া ভারতবাসীকে তাহারা অসম্মানের, অবজ্ঞাভরে ব্যঙ্গ করিয়াছে, উপহাস করিয়াছে। আমাদের মন, আমাদের মনও এমনই অভ্যস্ত, এমনই পরাধীনতাগ্রস্ত হইয়া গিয়াছিল যে ইউনিয়ন জ্যাককে লাইয়ের বৈজয়ন্ত প্রতিপাদ করিতেও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পরে একদিন আসিয়াছে যেদিন, আমাদের দেশে, আমরা কোন কোনদিন আমাদের পতাকা উত্তোলন করিয়াছি; পতাকার তলে দাঁড়াইয়া প্রত্যহ অঞ্জলি করিয়া দিয়াছি। ইংরাজ ইহা দেখিয়াছে। দেখিয়া হাসিয়াছে, খেলাঘরের খেলাযোরে উপহাস করিয়াছে। আমার যেদিন খুসী হইয়াছে, সেদিনই আমাদের সেই পতাকা ছিঁড়িয়াছে, পদতলে দলিত করিয়াছে। বজ্র আঘাতে, নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার মত আমাদের খেলাঘরের খেলা ভাঙিয়া দিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ আঘাতের মানরক্ষার জন্য নর নারী প্রাণ দিয়াছে। শক্তিমদমত্ত বৃটিশ ফিরিয়াও দেখে নাই। মাথায় বৃটিশের লাঠি পড়িয়াছে, তথাপি পতাকা ধরাচ্যুত করে নাই; বন্দুকের গুলিতে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, শিখিলমুষ্টি পতাকাখানি পরিত্যাগ করে নাই! ভারতের ঐতিহ্যের ইহাই ছিল চূড়ান্ত নিদর্শন।

তারপর একদিন আসিল যেদিন আমার সেই পতাকাখানি—ভারতের স্বাধীনতা-সাধনার পবিত্র প্রতীক সেই ত্রিবর্ণরঞ্জিত চরকাঙ্কিত পতাকাখানি—স্বাধীন ভূখণ্ডে, স্বাধীন জলস্থলে স্বাধীন বায়ুস্তরে দেদীপ্যমানে উড্ডীন হইয়াছে শুনিলাম। শুনিতে শুনিতে চোখে জল আসিয়া পড়িল। গর্ব্বে, আনন্দে, গৌরবে উল্লাসে প্রাণের ধারা বহিল। মনে হইল, স্বপ্ন। নয়ন মার্জ্জনা করিয়া দেখিলাম, স্বপ্ন নহে, সত্য। তখন মনে হইল, মরি না কেন! স্বাধীনতা সূর্য্যের রশ্মিটুকু থাকিতে থাকিতে, স্বাধীনতার সমীরণটুকু বহিতে বহিতে এ ছার নশ্বর জীবন তার মহিমা করি না কেন। আমার চোখের জলে বুক ভাসিল; বুঝি বা উল্লাসের চাপে হৃদয়ের স্পন্দন রুদ্ধ হইল। হায় রে! তবু তুমি আমি সে দৃশ্য চোখে দেখি নাই! স্বাধীন আকাশে স্বাধীন ভারতের স্বাধীন পতাকা স্বাধীন বাতাসে দোলাদুলি করিতে যাহারা দেখিয়াছে, যাহারা সেই পতাকা অভিবাদন করিয়াছে, আজ এতদিন পরে, এতদূর দেশে বসিয়া তাহাদের গৌরবপরিপূরিত ক্ষীত বক্ষের পরিপূর্ণ অনুভূতির কণামাত্রও কি আমরা অনুভব করিতে পারি? হয় ত পারি; হয় ত পারি না। তা যদি না'ও পারি, তাহাতেই বা কি আসে যায়? আমার দেশে, আমার ভারতবর্ষ তীর্থপ্রত্যাগতের পায় বন্দনার যে রীতি ছিল, আজিকার ভারতবর্ষে, অতীতগৌরবে গৌরবান্বিত ভারত তাহারই পরাধীনসংস্করণে আমার হিন্দ, সহকারের পাইক পরাভিকেরও পায় বন্দনা করিয়া বশ হইতে চাহিতেছে।

বন্দে মাতরম্।

জয় হিন্দ্।

ভুলো না আমায়

ভাস্কর

(জার্মান হইতে)

ফুটেছে সবুজ ঘাসের মাঝে
ছোট্ট ফুলটি,
তেমনি নীল তেমনি উজল
আঁখির মত, চোখটি।

যেন কথা সে বলিতে জানে না,
শুধু সে জানাতে চায়
চিরদিন ধরি একটি কথা
শুধু—ভুলো না আমায়।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সকলন

মশালের আলোকে দেখিলাম যে ভূগর্ভস্থ এই প্রশস্ত গুপ্তপথের ভিত্তি, ছাদ ও উভয়দেশ মর্ম্মরাচ্ছাদিত। মর্ম্মর সাধারণতঃ এ প্রদেশে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ইহা মর্ম্মদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। এই গুপ্তপথে চারিজন পরস্পরের পার্শ্বে একত্রে অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে। গর্ভগৃহে বায়ুপ্রবেশসাধনের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা আছে এই গুপ্তপথেও সেই প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। অনেকগুলি নাতিক্ষুদ্র নল এই পথের ভিত্তির উভয়দেশ ও উপরিভাগ হইতে গর্ভগৃহের দিকে গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে এইগুলিরও মুখ সংঘারামের প্রাচীর শিখরে উন্মুক্ত বায়ুতে মুক্ত।

আমরা মশাল হস্তে গুড়ঙ্গ পথে অগ্রসর হইলাম। আমাদের মশালের আলোক যেই মর্ম্মরে প্রতিফলিত হইয়া সেই গুড়ঙ্গ পথের বহুদূর অবধি আলোকিত হইয়াছিল। এই শতধারায় বিচ্ছুরিত আলোক পরিমার্জ্জিত মর্ম্মরে বহুবর্ণের সমাবেশে এক অপূর্ব্ব শোভার সৃজন করিয়াছিল। সুদীর্ঘ গুড়ঙ্গ পথ বাহিয়া আমরা চলিলাম। কতক্ষণ পরে আমরা এই পথের অপর প্রান্তে উপনীত হইলাম। এ প্রান্তেও একটি লৌহকীলক আছে। পূর্ব্বের ন্যায় মহাস্থবির ইহার সাহায্যে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। দেখিলাম যে অপর দিকের ন্যায় এদিকেও একটি গর্ভগৃহ আছে।

এই গর্ভগৃহও দেখিলাম অনেকগুলি রত্নাধারে সুসজ্জিত এবং বায়ু চলাচলের জন্য এখানেও ঠিক সেই একই প্রকার ব্যবস্থা আছে। আমরা গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া রত্নাধারগুলির দিকে অগ্রসর হইলাম। এ গৃহেও পঞ্চবিংশটি রত্নাধার আছে—সকলগুলিই সুবর্ণ দিনারে পরিপূর্ণ এবং সকলগুলিই অত্যন্তরত্ন ধনরত্নঃ পাঁচশ জন বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধর্ম্ম, সংঘ ও সাধারণ জনসমাজের কল্যাণকল্পে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত হইয়াছে। মহাস্থবির এই সকল বহুদিনসঞ্চিত ও বহুজনপ্রদত্ত ধন-রাশি আমাকে দেখাইলেন এবং বলিলেন—

"এই সকল সঞ্চিত ধনরাশি জাতি, সংঘ, ধর্ম্ম ও জনসাধারণের মঙ্গলকল্পে তোমার অনুজ্ঞামত ব্যয়িত হইবে। আজ আমি এই সকল তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। দেখিও যেন ইহাদের অপব্যয় হয়।"

—আর্য্য, আমি ত শপথ করিয়াছি। কিন্তু এই সকল সঞ্চিত ধনরাশির ব্যয়ব্যবস্থাবিধানের জন্য আপনার উপদেশ ব্যতীত আমি অগ্রসর হইতে অক্ষম। আপনি আমাকে পথ দেখাইবেন—আপনি আমাকে শিক্ষা ও উপদেশ দিবেন—আপনার উপদেশ, শিক্ষা ও আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমি কর্ত্তব্যপালনে ব্যাপৃত থাকিব।

এই গর্ভগৃহ হইতে একটি সোপান-শ্রেণী উপরে উঠিয়া গিয়াছে। আমরা এই সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া উপরের দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বের ন্যায় কীলক সাহায্যে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। আমরা একটি নাতিক্ষুদ্র চৈত্যগৃহে একটি চৈত্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মহাস্থবির গর্ভগৃহে অবতরণপথের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। আমরা চৈত্যগৃহ হইতে বাহিরে আসিলাম।

বাহিরে দাঁড়াইয়া পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় একবার চারিদিক দেখিয়া স্থানটা ঠিক করিয়া লইলাম। এ স্থানে পূর্ব্বে অনেকবার আসিয়াছি, এই চৈত্যগৃহও অনেকবার দেখিয়াছি। কখনও কখনও পৌর্ণমাসী রজনীতে দুই-একজন শ্রমণ, ভিক্ষু ও দূরির এই চৈত্যগৃহে দীপ জ্বালাইতেন—ধূপ-ধুনা পোড়াইতেন—তবে এখানে বহু জনসমাগম কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। এই দেবায়তন হইতে বাহিরে আসিয়া মহাস্থবির আমাকে সঙ্গে লইয়া অনতিদূরে একটি ঘন নিবিড় বনভূমির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একটি সঙ্কীর্ণ বনপথ দিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা ভূপেক্ষাকৃত একটি মুক্ত ও প্রশস্ত স্থানে উপনীত হইলাম। স্থানটি বড় মনোরম বলিয়া মনে হইল। ইহা চতুর্দ্দিকে বনবৃক্ষরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ইহার এক প্রান্তে একটি প্রাচীন প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ কালের ধ্বংসলীলার সাক্ষ্য দিতেছে। মহাস্থবির দাঁড়াইলেন এবং আমাকেও দাঁড়াইতে বলিলেন। আমি দাঁড়াইলাম।

মহাস্থবির উত্তরীয়ের অভ্যন্তর হইতে একটি ধাতুনির্ম্মিত ক্ষুদ্র বংশী বাহির করিয়া তিন বার বাজাইলেন। ঐ বংশীর তীব্র, উচ্চ শব্দ শাণিত ছুরিকার মত বনানীর সেই নিস্তব্ধনিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বহুদূরে গিয়াছিল। বংশীর শব্দের প্রতিধ্বনি মিলাইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অরণ্যবেষ্টিত প্রান্তরে জনসমাগম দৃষ্ট হইল। বহুসংখ্যক সশস্ত্র যুবক আসিয়া আমাদিগকে—মহাস্থবিরকে এবং আমাকে—ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন। আমরাও প্রত্যভিবাদন করিলাম। এই অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদন বাবনিক রীতিতে হইয়াছিল। সম্মুখে চারিজন উন্মুক্ত অসি হস্তে দাঁড়াইলেন এবং পশ্চাতে আর সকলে

বৃত্তাকারে চক্রব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহাদের হস্তে খুলও কটিতটে ক্ষুরীতে আবদ্ধ কোষবদ্ধ কৃপাণ উজ্জ্বলে বিলম্বিত। মহাস্থবির বলিলেন,—

"এই যে শতসংখ্যক যুবক দেখিতেছ ইঁহারা সকলেই আমাদের অভিনব আত্মরক্ষাকল্পে দীক্ষিত। জনসাধারণকে অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ করা ইহাদের ব্রত। অত্যাচারী সকলের কবল হইতে নিরীহ দুর্বলকে মুক্ত করাই এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য। এই অভিনব বাহিনীর অঙ্গ হইতে তুমি অধিনায়ক হইলে; ইঁহাদিগের অধ্যে অনেকেই হয়ত তোমার পরিচিত ও বন্ধু। এস আমরা এই নবগঠিত বাহিনী পরীক্ষা করি। সম্মুখে যে এই চারিজন উন্মুক্ত অসি হস্তে দণ্ডায়মান, ইঁহারা এই বাহিনীর নায়ক।"

মহাস্থবির যথার্থই বলিয়াছেন এই বাহিনীর প্রায় সকলেই আমার পরিচিত এবং অনেকেই আমার বিশিষ্ট বন্ধু। চারিজন নায়কের মধ্যে একজন আমার লোহোপম প্রজ্ঞাবর্দ্ধন ও অপর একজন ব্রাহ্মণ সৌম্যির কটীর পুত্র, আমার বাল্যবন্ধু, শেখর। প্রজ্ঞা ও শেখর প্রীতিপূর্ণ নেত্রে আমার প্রতি চাহিল, আমিও শিরঃসঞ্চালনে তাহাদিগকে প্রত্যভিবন্দিত করিলাম।

মহাস্থবির ও আমি বাহিনী পরীক্ষণ শেষ করিয়া ঘাঁটিকেন্দ্রে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম। মহাস্থবির একবার বংশীধ্বনি করিলেন। নিমেষের মধ্যে সকলেই বনের ঘনান্ধকারে মিলাইয়া গেল।

আমরাও বন হইতে বাহির আসিলাম এবং সূর্য্যের চৈত্যের সম্মুখে উপনীত হইলাম। দেবায়তন হইতে নদীতট অবধি একটি প্রশস্ত পথ আছে। আমরা এই পথ ধরিয়া নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

কপিলা আজ জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা হইয়া লালসাময়ী অভিসারিকার ন্যায় বৃদ্ধস্বয়ম্বরসভায় যেন প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে চলিয়াছে। এ অভিসারের শেষ নাই। কোন সুদূর অজ্ঞাত স্থানের দিকে তার এই অনন্ত অভিযান। কোন এক অজ্ঞাত শুভক্ষণে বিশ্বনিয়ন্তার তাহার প্রিয়তমের জন্য তাহার চিরঈপ্সিত গমন রচনা করিবে, এই আশায় যেন সে কূলে কূলে পূর্ণা হইয়া ছলিয়া চলিয়াছে। এই অভিসারে—এই অনন্ত অভিযানে—আছে কেবল অসীম আকাঙ্ক্ষা—অনন্ত লালসা—তাহার বোধ হয় কখনও অবসান নাই—শেষ নাই। এ পিপাসার বোধ হয় তৃপ্তি নাই;—ইহাই কি সুখ?—এই তৃপ্তিহীন পিপাসা—এই অনন্ত আকাঙ্ক্ষা—এই মরীচিকার পশ্চাতে অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় চিরদিন ছুটাছুটি করাই যদি সুখ হয়, তবে দুঃখ যে কি তাহা ত বুঝিতে পারি না।—অবশ্য, তৃপ্তির সহিত সব ফুরাইয়া যায় বলিয়াই লালসাকে আমরা বড় করিয়া দেখি।—কারণ, তাহা আশাপূর্ণ।—তৃপ্তি বর্ত্তমান—লালসা ভবিষ্যৎ। অদূরে অসুচ্চ শৈলশ্রেণী কপিলাকে চুম্বন করিয়া এক বিশালকায় সুপ্ত দৈত্যের ন্যায় দিগন্ত অবধি দেহ প্রসারিত করিয়া পড়িয়া আছে।

আমরা নদীতীরে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির বিমল উৎসব উপভোগ করিতেছিলাম। আমাদের অনতিদূরে স্রোতস্বিনীতীরবর্ত্তী শিলাতলে দেখিলাম যেন কে বসিয়া আছে। এই মানবমূর্ত্তি সৌম্যদর্শন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল ও ধীরে ধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিকটে আসিলে বুঝিলাম যে ইহা স্ত্রীমূর্ত্তি। আরও কাছে আসিলে দেখিলাম যে এই নারীমূর্ত্তির পরিধানে গৈরিকবাস, আলুলায়িত কৃষ্ণ কেশরাশি পৃষ্ঠদেশে, স্কন্ধে ও অঙ্গের উপর জড়াইয়া পড়িয়াছে,—বায়ুভরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে,—উড়িতেছে; মুখমণ্ডল দৃপ্ত, অনাবৃত, স্থির, শান্ত ও উদার।

মহাস্থবির তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে? মা, বন্ধুদেবী? এ সময়ে এখানে কেন মা?"

বন্ধুদেবী হাসিলেন, বলিলেন—

"আমার আবার সময়-অসময়, স্থান-অস্থান?"

তাহার পর কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বন্ধুদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আজ একটা তোমাদের কি উৎসব হইয়া গেল, স্থবির?"

—আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, আমাদের সে উৎসবের কথা ত তুমি জান, মা!

—সে উৎসব নয়—আমি বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসবের কথা বলিতেছি না।—আজ তোমাদের রাজার অভিষেক হইল না?

মহাস্থবির একটু চমকিত হইলেন। সে ভাব সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কি করিয়া জানিলে, মা?"

—কি করিয়া জানিলাম?—আশ্চর্য্য হইলে?—আমি অনেক কথা জানি।

পরে আমার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"এই যে রাজা! তুমিই রাজা নও কি? তুমিই পারিবে—গড়িতে যা পার, ভাঙ্গিতে তুমি পারিবে।—এমন করিয়া ভাঙ্গিবে যে ধূলা রাশি ভিন্ন যেন তাহার আর কোনও চিহ্ন না থাকে। আর একটা কথা মনে রাখিও—সেটা রমণী।—নারীকে সর্ব্বদা দূরে রাখিও। সকল প্রমাদের মূলে নারী। তবে ভাঙ্গিবার জন্য তাহার সহায়তা আবশ্যক। ভাঙ্গিবার জন্য তাহার সাহায্য লইবে; তাহার পর তাহাকে পদদলিত ও ছিন্ন বিন্নাধার মত দূরে ফেলিয়া দিবে। তারপর গড়িবার চেষ্টা করিবে—মনে রাখিও, দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই তিনটি অমৃতপথ গড়িবার পোষান।—কিন্তু গড়িতে তুমি পারিবে না।—তুমি ভাঙ্গিবে—চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, সাম্রাজ্য, সিংহাসন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সব ধূলির সহিত মিশাইয়া দিবে, তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না।"

তাহার পর কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন "কিন্তু তোমার আকাশে মেঘ উঠিবে—তোমার সকল আকাশ ছাইয়া ফেলিবে। দিবসে সূর্য্য থাকিবে না—রাত্রে জ্যোৎস্না থাকিবে না—চন্দ্রমা থাকিবে না—গ্রহনক্ষত্র থাকিবে না—থাকিবে কেবল অন্ধকার—সূচীভেদ্য অন্ধকার—আর তাহার মধ্যে থাকিবে বিদ্যুৎ, বজ্র ও ঝঞ্ঝা—সব ওলট-পালট হইয়া যাইবে—সব জমিয়া চুরিয়া একাকার হইয়া যাইবে—থাকিবে কেবল অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার।"

আমরা স্তম্ভিত হইয়া বন্ধদেবীর কথা শুনিতেছিলাম। তাঁহার কথায় এবং তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টির মধ্যে আমি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম,—আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম,—এরূপ অন্তর্মুখী দৃষ্টি,—নয়নের এরূপ অলৌকিক জ্যোতি,—এরূপ মুগ্ধ করিবার শক্তি আর কখনও কাহারও দেখি নাই,—আমার সকল বাহ্যজ্ঞান এক প্রকার পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বিরত হইলেন, কিন্তু তখনও যেন তাঁহার কথাগুলির প্রতিধ্বনি এক অপূর্ব্বশ্রুত ও অলৌকিক সঙ্গীতের সুমধুর মত আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিতেছিল—আমার মনের অন্তরতম স্থলে যেন লুটাপুটি করিতেছিল,—আমার দেহের সকল তন্ত্রীগুলি যেন ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিতেছিল। যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইলাম তখন দেখিলাম যে বন্ধদেবী চলিয়া গিয়াছেন। মহাস্থবির যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—

"মা চলিয়া গিয়াছেন!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "উনি কে?"

মহাস্থবির বলিলেন, "উনি সন্ন্যাসিনী। চল সংঘারামে ফিরিয়া যাই!" মহাস্থবির যেন একটা অস্বস্তির স্পর্শে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা নদীতীর অবলম্বন করিয়া বিহারাভিমুখে চলিলাম। অনতিদূরে, চৈত্যগৃহের নিকট হইতে, নারী কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইতেছিল,—

তারে খুঁজে খুঁজে ফিরি
পাইনা দেখিতে,
আছে সে-যে মম অন্তরে,
তার অস্তিত্বের আঁখি
দেখিছে সতত,—
আমি শুধু ঘুরি আঁধারে।

আমরা ঘুরে চলিয়া গেলাম। ক্রমে রমণীকণ্ঠ মিশীথিনীর নিস্তব্ধতায় মিশিয়া গেল।

মহাস্থবির বলিলেন "মা গাহিতেছেন"।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে সন্ন্যাসিনীসংবাদ নামক সপ্তম বিবৃতি।

আবার ফাল্গুনের পূর্ণিমা আসিল। বসন্তের আজ পৌর্ণমাসীতে বন্ধনোৎসব। এ উৎসবে যবন, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন, সকলেই কোনও না কোনও প্রকারে যোগ দিয়া থাকেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ,—অর্হৎ ও প্রবর্গগণ—কেবল ইহার বিরুদ্ধবাদী। তাঁহারাই কেবল এই উৎসব হইতে দূরে থাকেন এবং ইহাকে মারোৎসব নামে অভিহিত করেন। তবে গৃহীগণের পক্ষে তাঁহাদের এ সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের তেমন কঠোরতা নাই। বিধি-নিয়ম প্রবর্ত্তনসময়ের কঠোরতা কালে শিথিল হইয়া পড়ে। শুনিয়াছি পূর্ব্বে মহারাজ প্রিয়দর্শী * প্রচার ও অনুশাসনের দ্বারা মিথ্যা ধর্ম্মের † নীতিবিরুদ্ধ ও শিষ্টের অনুষ্ঠানসমূহ নাকি নির্ম্মূল করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। তখন কতটা ভাল সংসাধিত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু বর্ত্তমানে সে প্রচেষ্টার সাফল্যের বিশেষ কোনও নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন এই "মিথ্যা" ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনেকগুলি আমোদোৎসব তাহাদের প্রাচীন সঙ্কীর্ণ-গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সম্ভ্রান্ত গৃহীগণের মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।—আমরাও এই উৎসব সমূহে কখনও কখনও যোগ দিয়া থাকি—আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি—পরিচিত ও বন্ধু-বান্ধবদিগের সম্মেলনে ও আলাপে তৃপ্তিলাভ করি। গৃহিগণ কখনও আমাদিগকে এই সকল আনন্দোৎসবে যোগদান হইতে বিরত করিবার জন্য কোনও প্রকার নিষেধ-বিধির প্রবর্ত্তন করেন নাই। আর সাধারণ মানুষ কি কেবল ঈশ ও চর্য্যা পালন করিয়া, ধর্ম্মনীতির কঠোর বিধি-বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া, জোগবিলাসহীন নিরস জীবন কাটাইবে? তাহা কি সকল জন-সাধারণের পক্ষে সম্ভব? শুনিয়াছি ব্রাহ্মণাধর্ম্মের কোন পুরাণ-গ্রন্থে নাকি লিখিত আছে যে কে একজন দেবতা অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষপান করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্য তিনি নীলকণ্ঠ হইয়া ওই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা দেবতার কথা, কবির কল্পনার সৃষ্টিও হইতে পারে, তাহাও আবার বহু দেবতার মধ্যে একজন।

এই বসন্তোৎসবে বাল্হিক-প্রদেশের যবনগণ সকলেই বিশেষভাবে যোগ দিত। এই সকল উৎসব লইয়াই ইহাদের ধর্ম্ম। জনসাধারণের সম্মেলনে এই সকল ধর্ম্মোৎসব সম্পাদিত হইত। ব্রাহ্মণাধর্ম্মের বসন্তোৎসবে সম্মিলিত হইয়া যবনেরা তাহাদের বসন্তোৎসবের অনুষ্ঠান করিত।

ডিওনিসিঅস্ যাবনিক গান্ধর্ব্বদেবতা। বসন্তোৎসবে তাঁহার গুণগান হইয়া থাকে। বসন্তোৎসবে ডিওনিসিঅসের অর্চ্চনা যবনদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ। তাঁহার মূর্ত্তিকে বেষ্টন ও প্রদক্ষিণ করিয়া আনন্দোন্মত্ত নরনারীগণ, বিশেষতঃ যবন-যবনীগণ, মৃত্য করে ও বসন্তের আবাহন গান গাহিয়া উৎসবানন্দ মুখরিত করে। সুরার স্রোতে বহিয়া যায়। মৃত্য, গীত, সোডাধারা, জীবনের সকল সুখ, তুচ্ছ ও আবর্জ্জনার চরিতার্থতাই ডিওনিসিঅস্ উৎসবের অঙ্গীভূত। যবন যুবক-যুবতীগণ পশুর ন্যায় সরল ও স্বাধীনভাবে এই উৎসবের দিনগুলি কাটাইয়া দিয়া থাকে।

একাবর্ডম ও আমি, সুশোভন আদি পরিধান করিয়া, উৎসবের সোডাধারা বর্ষণসময়ে, নগরের প্রধান রাজপথে, সাধারণ জনসংঘের মধ্যে, দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যবনেরা মধুমাসকে "এলাফেবোলিওন্" বলে। এই মাসে বাল্হিক-প্রদেশে সাম্রাজ্যে যবনদিগের বসন্তোৎসব হইয়া থাকে। আমাদিগের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এই উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। ঐ দিবস উৎসবের শেষ হইয়া থাকে। আমরা এই উৎসবের সমারোহ ও আনন্দোল্লাস দেখিবার উদ্দেশ্যে ও সেই আনন্দের একটা লহরী আমাদের যাবন-প্রবাসের জন্য অনুভব করিতে, পথপ্রান্তে জনতার মধ্যে অপেক্ষা করিয়া

* অশোক।

† বৌদ্ধগণ অপর ধর্ম্মকে "মিথ্যা দৃষ্টি" বা "মিথ্যা ধর্ম্ম" বলিয়া থাকেন।

রহিলাম। পথিমধ্যে পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে বৃক্ষচ্ছায়া স্থলে যে সকল প্রস্তর বেদিকা আছে তন্মধ্যে একটী প্রস্তাবর্জন ও আমি অধিকার করিয়া বসিলাম।—অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, বাবনিক বসন্তোৎসবের শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য।

কিয়ৎক্ষণ পরে সঙ্কেত জনতার মধ্যে একটা কলকোলাহল উত্থিত হইল। আমরা বুঝিলাম যে শোভাযাত্রার কোনও বিমর্দন দর্শক-মণ্ডলীর মনঃক্ষোভের কারণ হইয়াছে। আমরা উহা উত্তমরূপে দেখিবার জন্য বেদিকার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। প্রথমে দেখিলাম পীত চীনাংশুক-পতাকাসমূহ বসন্তের মৃদু সমীরণে আন্দোলিত হইতে হইতে আমাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা আমাদিগের নিকট আসিল। পথের দুই ধারে সারি দিয়া পীতকেতনবিশোভিত সুদীর্ঘ ধ্বজ বহন করিয়া পতাকীর দল চলিল। ইহাদিগের মধ্যে আসিল একদল বংশীবাদক—তাহারা মৃদঙ্গের সহিত বাঁশীতে উৎসবের তরল মধুর উচ্ছ্বাসকে মূর্ত্তিত করিয়া তুলিল। তাহাদের পর আসিল গায়ক-গায়িকার দল—তাহারা গাহিতে-ছিল বসন্তের আবাহন গীতি। ইহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া বাঁশী ও বীণার সহিত সুর মিলাইয়া এবং মৃদঙ্গের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে উৎসবের আনন্দপ্রবাহকে উচ্ছল ও প্রাণস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা যে গান গাহিতেছিল তাহার সকল কথা আমার মনে নাই, কিন্তু যতটুকু শুনিয়াছিলাম তাহা আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল, এবং সেই জন্যই বোধ হয় তাহার কতকটা আজও আমার স্মরণে আছে। তাহারা গাহিতেছিল,—

আজি এসেছে বসন্ত,—মধুর বসন্ত আজি এসেছে!
ফুলদলের কলি ফুটায়ে তুলায়ে
আজি মুকুল সমীর নাচিছে!
ফুলেতে ফুলেতে চুমিয়া চুমিয়া,
ফুলের পরাগ মাখেতে মাখিয়া,
সোহাগে, আদরে, উল্লসিত প্রেমে
চলিয়া চলিয়া পড়িছে!

গায়কের দল চলিয়া গেল—তাহাদের সঙ্গীত কীর্ত্তন হইতে কীর্ত্তনতর হইয়া অবশেষে, তাহার মধুরিমা উৎসবের সাধারণ কলকোলাহলের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। এই গায়ক-গায়িকাগণের পর নর্ত্তক নর্ত্তকীরা আসিল; তাহারা বীণা, বৃষভ ও মুরলীর সঙ্গীতের সহিত তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতে নাচিতে চলিল। নানা ভাবময়ী নৃত্য ও সুসঙ্গত মুরলী ও বীণাধ্বনি আমরা সকলে উপভোগ করিতে লাগিলাম। কিন্তু যাহা সুন্দর ও মধুর, যাহা উপভোগ্য, তাহা চিরদিনই চঞ্চল ও ক্ষণিক—প্রভাত সূর্য্যের অরুণিমার মত—এই বসন্তেরই মুকুলিত নবীন পল্লবের মত—কিশোরীর যৌবনের পূর্ব্বরাগের মত—কোথায় কখন মিলাইয়া যায়—আর রহিয়া যায় কেবল অতৃপ্তির আক্ষেপ, তৃষ্ণার জ্বালা ও লালসার তীব্রতা।

নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেলে যুবকিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিভিন্ন দেবতা-গণের জন্য সুসজ্জিত নরনারীগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহাদের সর্ব্বশেষের রথখানিতে বাবনিক পানদেবতা ডিওনিসিয়স্ আবির্ভূত হইলেন। আর, দেখা গেল, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পানোন্মত্ত নরনারীগণ নানারূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবভঙ্গী প্রদর্শনপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে।

দেবতাদিগের এই শোভাযাত্রার পর আসিল একদল ব্যায়ামপ্রদর্শক ও কন্দুককৌড়ক। ইহাদের মধ্যে নরনারী উভয়ই ছিল। ইহারা বহু প্রকার ব্যায়াম ও কন্দুক ক্রীড়ার কৌশল প্রদর্শন করিতে করিতে চলিল।

ইহাদের পশ্চাতে আসিল একদল মল্ল। তাহারা স্থান বিশেষে দাঁড়াইয়া আপনাদের যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল।

সর্ব্বশেষে সুবেশসুরেশ কতক গুলি স্ত্রীক রথারোহণে চলিলেন। তাঁহাদের বহির্ব্বাসপানের যে চরম হইয়াছিল তাহা তাঁহাদের আরক্তিম মুখমণ্ডলে ও নয়নের অরুণিমায় প্রকাশ পাইতেছিল।

এই শোভাযাত্রার পর জনতা ক্রমে তরল হইতে লাগিল। আমরাও বৃহদ্রঙ্গালয়ের উদ্যোগ করিতেছিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি এমন সময়ে দেখিলাম যে অদূরে একটা কি কাণ্ড হইতেছে। অনেক লোক একদিকে ছুটিতেছে এবং সমকণ্ঠনিঃসৃত একটা কলরবও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আমরা কৌতূহলবশতঃ সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম যে একজন পানোন্মত্ত যবনযুবক পথের দুই পার্শ্বে যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে তাহাকেই মারিতেছে।

আমি যুবকের নিকট গিয়া তাহাকে সাবধান হইতে এবং ক্ষুব্ধ প্রত্যাসন্ন করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে বলিলাম। সে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিল। আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। আমি অগ্রসর হইয়া তাহার নাসিকা লক্ষ্য করিয়া একটা মুষ্ট্যাঘাত করিলাম। তাহার নাসিকা হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল এবং সে ভূতলে পতিত হইল। তাহাকে পতিত হইতে দেখিয়া এই জনতার উপস্থিত যবনগণের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের মধ্য হইতে পাঁচ-ছয়জন যুবক প্রস্তাবর্জনের ও আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমার হস্তে যবনের লাঞ্ছনা তাহাদের অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছিল। আমরা তাহাদের সাধর সম্ভাষণের ত্রুটি করিলাম না। আমাদের মুষ্ট্যাঘাতে ও পাদতাড়নায় তাহারা সকলেই ধরাশায়ী হইয়াছিল। যাহারা আমাদের মুষ্ট্যাঘাতের আস্বাদগ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের সকলেরই মুখমণ্ডল রক্তাপ্লুত হইয়াছিল। কোলাহল বাড়িয়া গেল।—জনতার কেহ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—কেহ পলাইয়া গেল—কেহ বা বৃথা চীৎকারে গণ্ডগোল বাড়াইল। নগর-পালের ও চৌদ্ধারিদিগের শান্তিরক্ষক প্রহরীগণ, অধিকতর অশান্তি হইতে নগররক্ষা করিবার জন্য এবং নিজ নিজ দেহের ও মনের সম্যক্ শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে, ঘটনাস্থল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান, এমন কি, তথা হইতে দৃশ্যমান সমস্ত রাজপথ হইতে, কোনও এক অজানা শান্তির রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছিল। প্রহৃত যুবকগণের ব্যাকুল আহ্বানে তাহাদের অস্তিত্বের কোনও নিদর্শন পাওয়া গেল না; কোলাহল বাড়িল মাত্র।

প্রহৃত যবন যুবকগণ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া পরস্পরের মধ্যে কত কি

জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল তাহা শুনিতে পাওয়া গেল না। তবে মাঝে মাঝে তাহারা আমাদিগের দিকে চাহিতেছিল, তাহাতেই বুঝিলাম যে এ ব্যাপার এইখানেই শেষ হইবে না। তাহারা যে আমাদিগের প্রতি বিশেষ প্রীতিভরে চাহে নাই তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। এমন সময় পেশকার কোথা হইতে আসিয়া আমাদিগের নিকট জুটিল। সে বলিল—

"তোমরা যুদ্ধে যাও—এখানে আর বিলম্ব করিও না—বিলম্ব করিলে বিপদের সম্ভাবনা। উহারা কি করিবে তাহার সংবাদ আমার নিকট পাইবে এবং তাহার ব্যবস্থাও পরে করা যাইবে। আমি এখন এখানে রহিলাম।"

প্রত্যাবর্তন ও আমি জনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া ধীরপদে পূর্বাভিমুখে ফিরিয়া চলিলাম। বুঝিলাম দেশের এখানে একা নাই, আপনাদের সমবেদনের আবশ্যক হইলে অভাব হইবে না।

আমাদিগের প্রত্যাবর্তনমুখে অদূরে দেখিলাম ডেমিট্রি অপ্ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গেল। তাহার সেই কুটিল নয়নপ্রান্ত আমার প্রাণের মধ্যে খানিকটা জমাট অন্ধকার ঢালিয়া দিয়াছিল।

ইতি দেবব্রতের আত্মচরিতে পোতাশ্রয়াভিমুখে নামক অষ্টম বিবৃতি।

(ক্রমশঃ)

অভিনয়

নাটক

শ্রীকানাই বসু

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহেন্দ্রবাবুর কক্ষ। একপাশে ছোট নিচু খাটে বিছানা পাতা, অপর পাশে দেয়ালের ধারে একটি ছোট টেবল হারমোনিয়ম, দুই তিনটি চেয়ার, দেয়ালে বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ছবি। একটি ছোট বুকশেলফে বই, একটি দেয়াল-আলমারি, একটি ড্রেস।

খাটের উপর তাকিয়া-কোলে, গড়গড়ার নল হাতে বৃদ্ধ মহেন্দ্র। তাঁহার সম্মুখে একটি নুড়ো খেলিবার ছক, ডান হাতে গুটির ঘুঁটি চালিবার কাঠের লম্বা কৌটা। খাটের ধারে তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া তাঁহার তরুণী কন্যা রাধা উপবিষ্টা।

রাধা। না, না, না, আমি তোমার সঙ্গে খেলব না, কিছুতেই খেলব না। আর যদি কোনদিন খেলি তো কী বলেছি।

মহেন্দ্র। বাঃ, এ বাপু তোমার অন্যায় রাগ। খেলব না বলেই খেলব না? তবে খেলতে বলেছিলে কেন? এ কী অন্যায়! খেলার মাঝখানে খেলা ছেড়ে দেওয়া—

রাধা। বেশ, অন্যায় রাগ তো অন্যায় রাগ। আমার সবই অন্যায়! তবে আবার খেলতে বলছ কেন?

মহেন্দ্র। বেশ তো, তুমি যে রকম বলছ, সেই চালই তো দিচ্ছি।

রাধা। সে তো এখন দিচ্ছ। কিন্তু কেন তুমি মিছিমিছি ভুল চাল দেবে? আমি ঠকিয়ে আমাকে জিতিয়ে দেবার মতলব। আমি কিন্তু বুঝতে পারি না, তা?

মহেন্দ্র। হুঁ। তোমাকে ঠকাব, আমি? আমার বাবা এলেও পারবে না, আমি তো ছেলেমানুষ।

ঘড়িতে চারিটা বাজিল। শুনিতে পাইয়া রাধা ব্যস্ত হইয়া ঘড়ির দিকে চাহিল ও খাট হইতে নামিল।

রাধা। ঐ যাঃ, চারটে বেজে গেল? তোমার যে সাড়ে তিনটের ওষুধ খাবার কথা। না, আর খেলা নয়।

বলিতে বলিতে সে পাশের আলমারি হইতে ঔষধের শিশি, গ্লাস, জলের ঘটি বাহির করিল।

মহেন্দ্র। (গম্ভীর মুখে) কে ওষুধ খাবে?

রাধা। কে আবার খাবে? যে রোজ খায়।

মহেন্দ্র। না, সে আর খাবে না। সে ঠকায়, সে জোচ্চোর, সে মিথ্যেবাদী—তাকে আর ওষুধ খাওয়ানো কেন?

তাকিয়া কোল হইতে নামাইয়া তাহাতে ভর দিয়া তাহাকে টানিতে লাগিলেন।

রাধা। (ঔষধ ঢালিয়া কাছে আসিয়া) ও বাবাঃ, ঠকাও বলেছি বলে ছেলের আমার অভিমান হয়েছে। (মাথায় হাত বুলাইয়া) না বাবা, লক্ষ্মী বাবা, তুমি ঠকাও না, তুমি খুব লক্ষ্মী ছেলে, ওষুধটুকু খেয়ে ফ্যালো। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।

মহেন্দ্র। না।

রাধা। এখনই আবার ব্যথা ধরবে। তখন—

মহেন্দ্র। ধরুকগে। আমি ওষুধ খাব না।

রাধা। হাঁ খাবে। এখুনি যদি ওষুধ খাও, তাহলে সেই নতুন গানটা শোনাব, আর বেলা করলে একদিনও কিন্তু গান শোনাব না, হাঁ।

মহেন্দ্র। তবে আগে শোনা।

রাধা। যাঃ। তার মানে আরও দশ মিনিট ওষুধ না খেয়ে কাটুক,

কেমন? সে হচ্ছে না। তুমটি তুমি চুক করে খেয়ে যাও, আর আমিও চুক করে গানটা ধরি।

মহেন্দ্র উঠৰ হাতে লইলেন। রাধা অর্গানের সামনে টুলে বসিল। সে একবার বাজাইয়া বাপের দিকে চাহিল, মহেন্দ্র উঠবের গ্লাস মুখে তুলিয়াছেন। রাধা গান ধরিল—

তোর বুকের মাঝে যে ধন আছে বাইরে কেন খুঁজিস তারে?

নিজে গহন বনে মরলি ঘুরে, মনের কোণে চাইলি নারে।

এমন সময় বাহির হইতে বিক্রমজিৎ প্রবেশ করিল। প্রথমে কেহ তাহাকে দেখে নাই, সে-ও দরজার উপর দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত পরে রাধা মুখ ফিরাইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়া গান থামাইল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া বিক্রমকে দেখিলেন।

বিক্রম। (উভয়কে) নমস্কার। নমস্কার। (ভিতরে আসিল)

রাধা। নমস্কার, আসুন আসুন। (তাহার মুখভাব বিস্ময় বোধ হইল)

মহেন্দ্র। নমস্কার। আ—আপনি—

রাধা। (জোর করিয়া প্রফুল্লতা আনিয়া) আপনি কবে এলেন? কেমন আছেন? কোথায় উঠেছেন আপনি?

বিক্রম। এই তো পরশু সন্ধ্যায় এসেছি। উঠেছি একটা হোটেলে। (মহেন্দ্রের প্রতি) আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি ইতিপূর্বে। আমারই নাম বিক্রমজিৎ ঘোষ।

মহেন্দ্র। বিক্রমজিৎ—

বিক্রম। আমি—কী পরিচয় যে দেব, যার পরিচয়ে আমার পরিচয়—

রাধা। চিনতে পারছ না বাবা? এঁর কথা তুমি তো কত শুনেছ আমার কাছে। ইনিই তো ডাক্তার ঘোষ। জলপাইগুড়িতে আমাদের বাসার পাশেই—

মহেন্দ্র। জলপাইগুড়ি? আপনিই ডাক্তার ঘোষ? আপনিই—

কী জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া চাপিয়া গেলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল। তারপর চেষ্টার সহিত মুখে হাসি ফুটাইয়া সম্ভাষণ করিলেন।

মহেন্দ্র। আসুন, আসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন। আমি খুশী হলুম, ডাঃ ঘোষ, আমি খুশী হলুম।

বিক্রম আসন গ্রহণ করিল।

কী অন্যায় আমার! ছি ছি ছি, আপনার কথা তো আমাদের প্রায়ই হয়, হয় না রাধু? অথচ—এই দেখ রাধু, বুড়ো হওয়ার কুফল দেখ। এ সম্বন্ধে ভালো একটা Essay লিখতে পারা যায়, নাম দেবে—Evils of old Age—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

রাধা। আমি আসছি বাবা, একমিনিট। চায়ের জলটা চড়াতে বলে আসি। রাধা ভিতরে গেল।

রাধার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রের হাসি মিলিয়া গেল। তিনি হাতের ইসারায় বিক্রমকে কাছে ডাকিয়া চুপে চুপে কী যেন বলিলেন। বিক্রম বিস্মিত গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। কণকাল পরে—

মহেন্দ্র। এখানকার ঠিকানা আপনি পেলেন কী করে?

বিক্রম। আপনার পুরোনো ঠিকানায় গিয়েছিলুম। সে পেয়ে তখানকার পোষ্ট-অফিসে খোঁজ করলুম। ধরাতলে পোষ্টমাষ্টার অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন। তাঁরই কাছে—

মহেন্দ্র। হাঁ, উঠে আসবার সময় তাঁকে একটা চিঠি দিয়েছিলুম বটে, চিঠিপত্র কিছু এলে—

এমন সময় রাধা প্রবেশ করিল। মহেন্দ্র বলিলেন—

চিঠিপত্র কিছু পেয়েছেন নাকি তার কাছ থেকে?

বিক্রম। (সবিস্ময়ে) চিঠিপত্র?

মহেন্দ্র। এই অভিলাষের চিঠির কথা বলছি। আপনাকেও কিছু দেয় নি বোধ হয়?

বিক্রম। (বিস্ময়ের ভাণ) আজ্ঞে না।

মহেন্দ্র। ঐ তো হয়েছে মুস্কিল। এখানে তো একদম কোন খবর দেয় না। শুনতে পাই ওদের নাকি শপথ করতে হয়—বাড়ীঘর আত্মীয়-পরিজন কিছুর সঙ্গে কোন যোগ রাখতে পারবে না। সন্ন্যাস ত্যাগ থাকে বলে। আর কাকেই বা বলছি। ওদের ব্যাপার যেন আপনি আমার চেয়ে কিছু কম জানেন।

বিক্রম। আজ্ঞে না—

মহেন্দ্র। (অল্প হাসিয়া) থাক থাক। কিছু বলতে বলছি না আপনাকে।

বিক্রম। আজ্ঞে, তা নয়—

মহেন্দ্র। হাঁ, হাঁ বুঝেছি। কিন্তু কী কাণ্ডটা করলে বলুন দেখি। অত টাকার চাকরি, অমন একলোটে সব গেল। তা থাক, এখন কতদিনে যে ওরে ফিরবে তা কে জানে। আজকালকার ছেলেদের এই patriotismটা আমি বুঝে উঠতে পারি না। কংগ্রেস যার যার বলছেন ওসবে কিছু হবে না, কিছু হবে না। শুধু এই সব বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলেরা যে কেন এই রকম secret society ক'রে এমন করে স্ত্রী-পুত্র ঘর-সংসার ত্যাগ করে—

বিক্রম। খুব ঠিক কথা। আমার সঙ্গে এই নিয়ে অভিলাষের ভীষণ তর্ক হতো, এখন কি ঝগড়াই হয়ে গেছে কতবার। কিন্তু বড় গোঁয়ার, কিছু মনে করবেন না, আপনার জামাই বটে, কিন্তু আমার বন্ধু ছিল—ও ছিলই বলি, এখন ওদের ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে বলায় বিপদ ঘটতে পারে—কী বলেন— (ঘনিষ্ঠ হাসিল)

মহেন্দ্র। সত্যিই তো।

বিক্রম। তাই বলছি—ও বরাবরই বড় head-strong। আর চিঠির কথা বলছেন—এই সেদিন ওদের দলের একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হল। তারই কাছে মধ্যে মধ্যে ওর খবর পাই। বলে—ভালই আছে অভিলাষ। কিন্তু কোথায় আছে সেটা কিছুতেই জানালে না। ছেলেটিকে আমি খুব চুকথা শুনিয়ে দিলুম—আপনার লোককে একখানা চিঠি কি আর কোনও কৌশলে পাঠানো যায় না, যা, পাঠালেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সমস্তাটা একেবারে অন্তর্হিত হয়ে যায়!

মহেন্দ্র। বেশ বলেছেন। খুব ঠিক কথা। এই শোন্ রাধা, আমিও তো ঠিক ঐ কথাই বলি। বলি, ভাল থাকার দরকার না হয় এর তার মুখে শোনা, কিন্তু হাতের লেখা একটা—

বিক্রম। না, ওদেরও বলবার একটা দিক আছে। বলে নিজের নিজের, তার ভাল মন্দ সুবিধে অসুবিধে বিচারের অধিকার আমাদের নেই। যাই বলুন, ওদের ওই disciplineটা একটা wonderful জিনিস। কিন্তু আমার কথা যদি বলেন, ওই পথটার দিকেই আমার সহানুভূতি বেশি ঘোঁষে। (রাধার প্রতি) আপনি আমাকে কাপুরুষই বলুন আর ভীরুই বলুন, ও খুনোখুনীর পথে আমার মন আমি কিছুতেই মেলাতে পারি না। যদিও আমার নাম বিক্রমজিৎ।

(বলিয়া হাসিতে লাগিল)

রাধা। এই কারণে যদি আপনাকে ভীরু কাপুরুষ বলতে হয়, তা হলে তো সবার আগে মহারাজীকেই ভীরু বলতে হয়। ওঁর চেয়ে খুনোখুনির বিরুদ্ধে তো আর কেউ নেই।

বধূ ভূত্যের প্রবেশ, হাতে জলের ঝারিকা।

বধূ। চায়ের জল ফুটছে টিমটিমি।

বধূ ঝারিকা পাঠাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

রাধা। ওঃ, আমার কী ভুলো মন। (উঠিয়া) চায়ের কথা ভুলে গিয়ে বসে বসে গল্পই করছি।

বিক্রম। না, না, ওর জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না, আপনি বসুন মিসেস্ সেন।

মহেন্দ্র। ব্যস্ত হওয়া আর কী। ঐ হল ওর প্রধান কাজ। এই বুড়ো বাপটাকে তো চা খাইয়েই বাঁচিয়ে রেখেছে। তবে শুধু চা নয় রাধু, ওর সঙ্গে—

রাধা। বাবা যেন কী মনে করে আমাকে। আমার বুঝি ওটুকু আক্কেলও নেই। (ঘরজার কাছে দাঁড়াইয়া) কিন্তু বাবা, তুমি বেশি কথা কইবে না, জেনে রেখো। ডাঃ ঘোষ গল্প করবেন, তুমি শুনবে। নয়, তুমি শুনবে আর ডাঃ ঘোষ গল্প করবেন।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

মহেন্দ্র। (অপকাল নীরবতার পর) তোমাকে কী বলে আশীর্বাদ করব তা জানি না। তোমার বুদ্ধি ও বিবেচনা—

বিক্রম। আমি আর কী করেছি। সামান্য দুটো কথা—

মহেন্দ্র। এই সামান্যতেই তুমি অসামান্য করেছ, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ—তোমাকে তুমিই বলছি বাবা—

বিক্রম। কী আশ্চর্য! তাই তো বলবেন। আপনি আমার পিতৃতুল্য।

মহেন্দ্র। তুমি আমার অভিলাষের বাল্যবন্ধু। সেই অভিলাষ (কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া)—অনেক ভেবে, অনেক কেঁদে তবে আমি জামাই করেছিলুম। তারও বাপ মা ছিল না, আমারও ছেলে নেই, জামাই বলে মনে করিনি— (কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল)

বিক্রম। আপনি স্থির হোন, মহেন্দ্রবাবু। এখনি মিসেস্ সেন আসবেন। অমন ব্যাকুল হলে—

মহেন্দ্র। না, না, ব্যাকুল আমি হইনি। ব্যাকুল হব কখন! ব্যাকুল হবার আমার অবকাশ নেই, এক মিনিট অবকাশ নেই বিক্রমবাবু।

বিক্রম। আপনি আমাকে বীরু বলেই ডাকবেন। আমার ডাক নাম বীরু।

মহেন্দ্র। আচ্ছা, তাই ডাকব।

বিক্রম। আমি খালি অবাক হয়ে যাচ্ছি আপনার অসাধারণ শক্তি দেখে। আমার এই পাঁচ মিনিট অভিনয় করতেই কী বিশ্রী ঘোর হচ্ছিল। আর আপনি এই প্রায় এক বৎসর কাল কী করে যে কাটিয়েছেন, তা আমি ভাবতেও পারছি না।

মহেন্দ্র। ভাবতে আমিও পারছি না। কিন্তু শুধু এই ঘরনা আমি প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিট করে চলেছি। বৃদ্ধ বয়সে নারায়ণের নাম দিনে একবার নিতে পারি না, কিন্তু এতাবৎ লক্ষ মিথ্যে কথা কয়ে চলেছি, এই বেটাটার জন্যে। (অপকাল নীরবে কাটিল।) কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায় কী ছিল। আমি যে তাকে জলপাইগুড়ি থেকে নিয়ে আসবার সময় বলে এসেছিলুম—আমি নিজে এসে রেখে যাব। মা আমার সবে সংসার সাজিয়ে বসেছে। সাজানো সংসার। একটা মাস যেতে না যেতে আমি কী করে তাকে বলি যে তার সেই সাজানো সংসার ভগবান পুড়িয়ে দিয়েছেন!

বিক্রম। কিন্তু এই Terrorist দলের পরই বা কী করে—

(রাধা বিস্ময়ের ভয়ে কথা শেষ করিল না।)

মহেন্দ্র। কি জানি কেমন করে বলব। ওই সময়ে পাড়ার একটি ছেলে ঐরকম হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়, আর কিছু ভেবে পেলুম না। জান তো সে কী রকম উগ্র স্বদেশী ছিল। কিন্তু তুমি ভাবছ এই বুড়ো লোকটা এই বয়সে এত বড় জোচ্চুরি কেন করলো।

বিক্রম। আপনি কেন এসব কথা বলে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন, মহেন্দ্রবাবু? আপনি আর কথা বলবেন না। আমি কিছু ভাবিনি।

মহেন্দ্র। এসব কথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে এতদিন ধরে কাকেও বলতে পারি নি, সে বোঝাতেও যে বুক ভেঙে যাচ্ছিল।

বিক্রম। কিন্তু এখন থাক না। কী দরকার—

মহেন্দ্র। তোমার শোনার দরকার নেই, কিন্তু আমার যে বলার দরকার। তোমার সেই চিঠি যখন পেলুম, তখন ওপরের ঘরে রাধার বন্ধুরা এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে। কেন জান? দুদিন পরে ও চলে যাবে, দিন ঠিক হয়ে গেছে, আমি যাব রাখতে। মায়ের হাসি, গান আমি নিচের ঘর থেকে শুনছি আর ভাবছি—এই মেয়ে চলে গেলে আমি থাকব কী করে। চলে যেতে আর দুদিন বাকি, তোমার চিঠি এল।

বিক্রম। সেই চিঠি যেদিন লিখেছিলুম, সেদিন আমার মনে হয়েছিল—যদি নিরক্ষর হতুম তাহলে এ কর্তব্য আমাকে করতে হত না।

মহেন্দ্র। তখন ওপরে গান গাইবে রাধা। আমি পারলুম না তাকে গিয়ে বলতে যে ওরে হতভাগী, আর গান গাসনে, আর হাসিসনে, বিধবা মেয়েকে অত হাসতে নেই, অমন গাইতে নেই। (ক্ষণকাল নীরবে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়া রহিলেন, তারপর) বিধবা মেয়ে নিজের দুর্ভাগ্য না জেনে সবার সঙ্গে মনে গাইতে লাগলো, হাসতে লাগলো, বড়দের সঙ্গে মনে খাওয়া খাওয়া করলো,—আমি জলভরা চোখের দুটো করে বাড়ী থেকে পালিয়ে বেড়ালুম। দিনলুম অনেক রাতে। তার পরদিনও মন স্থির করতে পারলুম না, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালুম। তার পরের দিন আমার মনে হল দুটো রাত যদি জীবনে না জেনে শুয়ে কেটে যেতে পারে তাহলে—

বিজয়। বুঝেছি। অভিলাষ বরাবরই ঐরকম ছিল, তাই এটা অসম্ভব শোনায় নি।

মহেন্দ্র। শুধু সেই জন্যেই নয়। তারপরই আমি পড়লুম রোগে। মাস খানেক ভোগে গেল তারই খোলসটায়। সেই পোলসাল আজও কাটল না। ঈশ্বরের মনে আরও কী আছে! এককালে বড় দুঃখ ছিল যে অমন জানাই হল, রাধার মা দেখে যেতে পারলেন না। আর এখন ভাবি, তিনি বড় বেঁচে গিয়েছেন, এই শেল বুকে পড়েনি তাঁর। বড় বেঁচে গিয়েছেন।

তাঁহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

মেয়েলী রাধার কণ্ঠ :—

রাধা। বাবা, তোমায় কিন্তু এখন চা করিনি।

বলিতে বলিতে সে এক হাতে এক কাপ চা ও অন্য হাতে এক রেকাবে খাবার লইয়া প্রবেশ করিল। মহেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া বলিলেন।

রাধা। এই নিন, বীরুবাবু, একটু চা খেয়ে নিন, তারপর আপনার গল্প শুনব।

বিজয়। এ কী করেছেন। চায়ের সঙ্গে এতগুলো গিলতে তো আমি পারব না।

রাধা। গিলতে আপনাকে বলছে কে? আপনি চিবিয়ে খান না। কী বল বাবা? ও, রাগ হয়েছে বুঝি? না গো বাবা, তোমার চা এনেছি, বাইরে রেখে এসেছি। আর রাগ করতে হবে না।

বাহিরে গিয়া চা লইয়া আসিল। ইতিমধ্যে মহেন্দ্র চক্ষু মুছিয়া লইলেন।

মহেন্দ্র। (চা লইয়া) রাধা, না, ভদ্রলোককে শুধু চা' টা খাওয়াবে?

বিজয়। শুধু কেন? এই দেখুন না, এক থালা খাবার।

মহেন্দ্র। ও খাবারের কথা আমি বলছি না। আমি বলছি চায়ের সঙ্গে একটু মিষ্টি দেবে না? হাঁ মানু?

বিজয়। না, না, চায়েতো মিষ্টি দেওয়াই হয়েছে। চমৎকার চা হয়েছে।

রাধা। ঐ শোনো, তোমার মত সবাই চায়ে ঐ মিষ্টি চায় না। চিনিতেই হয়।

মহেন্দ্র। (ইঙ্গিতে বিজয়কে অর্থাৎ দেখাইয়া) চায়ের সঙ্গে মিষ্টিটা —বুঝলেন বীরুবাবু?

বীরু। (চায়ে চুমুক দিয়া) হাঁ, সত্যিই তো। চায়ে মিষ্টি একটু কম কমই লাগছে। কম কি, মিষ্টি একদম পড়েই নি।

মহেন্দ্র। ঐ দেখ মানু। আমার দোষ নেই।

রাধা। না, তোমার দোষ নেই, তা বইকি! তোমার চালাকি আমি বুঝি না, না? তুমি বড় দুষ্টু, হচ্ছ বাবা। কিন্তু এখন আমি গান করতে পারব না। তাহলে সন্ধ্যের সময় তোমাকে শুধু শুধু খেতে হবে।

মহেন্দ্র। মারে, এতো আমার জন্যে বলছি না। বীরুবাবু শুনতে চাইছেন। আমার কী? আমি শুনবই না।

বিজয়। এ কী! আপনাদের কলকাতায় কি আজকাল সম্বন্ধেও চিনি দেওয়ার রীতি নেই? এযে শুধু রাঙ্গা গুলো চটকে দিয়েছে।

রাধা। ও মা! বীরুবাবুকে আপনজন ভালমানুষটি। বাবার কাছে এরই মধ্যে আপনি মিথ্যে কথা বলছেন? কেন, সোজা করেই তো হয় গান গাইতে?

মহেন্দ্র। আর কত সোজা ক'রে বলবে মা? সোজা করেই তুমি গাও কি না! জানেন বীরুবাবু, আজ দশ বৎসরের মধ্যে আমাকে একখানা গান শোনায় নি, এমন স্নেহময়ী মেয়ে আমার।

রাধা। ও মা গো। কী মিথ্যে কথা বলতে পার তুমি! ধন্যি ছেলে তুমি! দিন পড়ে অন্তত পাঁচছটা গান তোমাকে রোজ শোনাই না? এই যে সেদিন মিনিটও হয় নি, তোমায় গান শোনাচ্ছিলুম। বীরুবাবু এসে পড়লেন, বলুন না বীরুবাবু, শোনেন নি? সত্যি কথা বলবেন।

মহেন্দ্র। বীরুবাবুকে বলতে হবে কেন? আমি বলছি, হাঁ, বীরুবাবু আসবার আগে তুমি গান গাইছিলে। কিন্তু সে কি আমাকে শোনাবার জন্যে? বীরুবাবু, শোনো। আমার মাঠাকুরুণটি গান করেন—রাধা, তুমি যাও, গান গাইছি। রাধা, গান গাইতে গাইতে বুকে মালিশ করে দি, লক্ষ্মী হয়ে শোও তো। রাধা, পরশু দিন সেওড়াফুলিতে ভীষণ বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, জানলে দিয়েছে। আজ তোমার চায়ে বন্ধ, তার বদলে একটা গান গাইছি। এর নাম রাধার গান গাওয়া। একদিন বলে না যে, বাবা, তোমাকে শোনাব বলে একটা গান গাইছি। শুধু শোনার গান নয়, মালিশ করার গান নয়, চান করার গান নয়।

বিজয় ও রাধা হাসিতে লাগিল।

রাধা। (হাসিতে হাসিতে) তা কী করব। তুমি যা অবাধ্য হয়েছ। গানের সুর না দিলে যে একটা কথা শোন না।

রাধা অর্গানের সামনে বসিল। একবার বাজাইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—

রাধা। বাবা, একটা গান শুনবে?

মহেন্দ্র। কেন মা, বুড়োমানুষকে ঠাট্টা? ও গান তো আমার জন্যে নয়, ও আমি শুনব না।

রাধা। হাঁ, শুনবে না। তাই বইকি। তোমটা গাইব বল?

বিজয়। তবে কিছু মনে না করেন তো বলি, যে গানটা শুনব

গাইছিলেন সেইটে যদি গাব। তারি চমৎকার লাগছিল। আমি রপ্তও করলুম।

মাঝা গান আরম্ভ করিল। মহেন্দ্রবাবু শুনিতে শুনিতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়া ক্রমে চক্ষু মুদিলেন।

গান

তোর বুকের মাঝে যে জন আছে,
বাইরে কেন খুঁজিস তারে,
কিছে গহন মনে মরিস ঘুরে,
মনের কোনে চাইলি যারে।
রজনী দিন যে তোরে ঘিরে
প্রেমের বাঁশী বাজায় ফিরে,
ওই কৃপণ প্রেমে ফিরালি, হায়,
জীবন ভুলে ফিরবি ধীরে।
তোর নয়নে বাঁধ তীর্থ-বারি, হৃদয়ে দেবালয়,
প্রাণের বাঁশী মন্ত্র দেবা, মিলবে পরিচয়।
আর ভক্তমা দিবি নিজেরে ফাঁকি,
মোহের বোঁঝা কাটবে নাকি,
এই ভুবন ভরা আলোকে শুধু
তুই কি রবি অন্ধকারে।

রবীন্দ্রনাথ

যুদ্ধকালীন শিল্প-সংরক্ষণ ব্যবস্থা

শ্রীচিন্তামণি কর

মহাযুদ্ধের শেষ হইয়াছে। ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৫ যেন একটা রোমাঞ্চকর মহা দুঃস্বপ্ন। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বাস্তবাশ্রয় নির্ভর মন, স্বপ্নাবলির আজ অঙ্গে নামিয়া যেমন কৌতূহলী হয়; আজ যুদ্ধান্তে, জগতের হইয়াছে। স্বপ্নে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়া বাস্তবে ফিরিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু মহাযুদ্ধ দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটাইয়া উপলব্ধি করিতেছি, যাহা যাহা স্বপ্নে হারাইয়াছি, জাগিয়া তাহা ফিরিয়া পাইব কিনা সন্দেহ।

রঙীন কাচ নির্ম্মিত চিত্র ফলকের পুনরুদ্ধার ও যুদ্ধবিদ্ধস্ত রঙীন কাচের ছবির (Stained Glass) ভগ্নাংশ সংশোধন

রণাঙ্গন বহির্ভূত আশ্রয়ে বসিয়া মহারণের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির দৈর্ঘ্য প্রস্থে বৈষম্যের বিচারে, খেয়ালী ১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বর মাসে সংগ্রামব্রত পারী যেন এক যাদুকরের দণ্ডাঘাতে, সকল আলোকসজ্জা আভরণ

ও আনন্দ সহিত এক আধার কুহকটিকায় নিমজ্জিত হইয়াছিল। আজ মায়াজালমুক্ত পারী, বাস্তবে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়া যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ হয়, এতদিন মোহ এমনভাবে কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

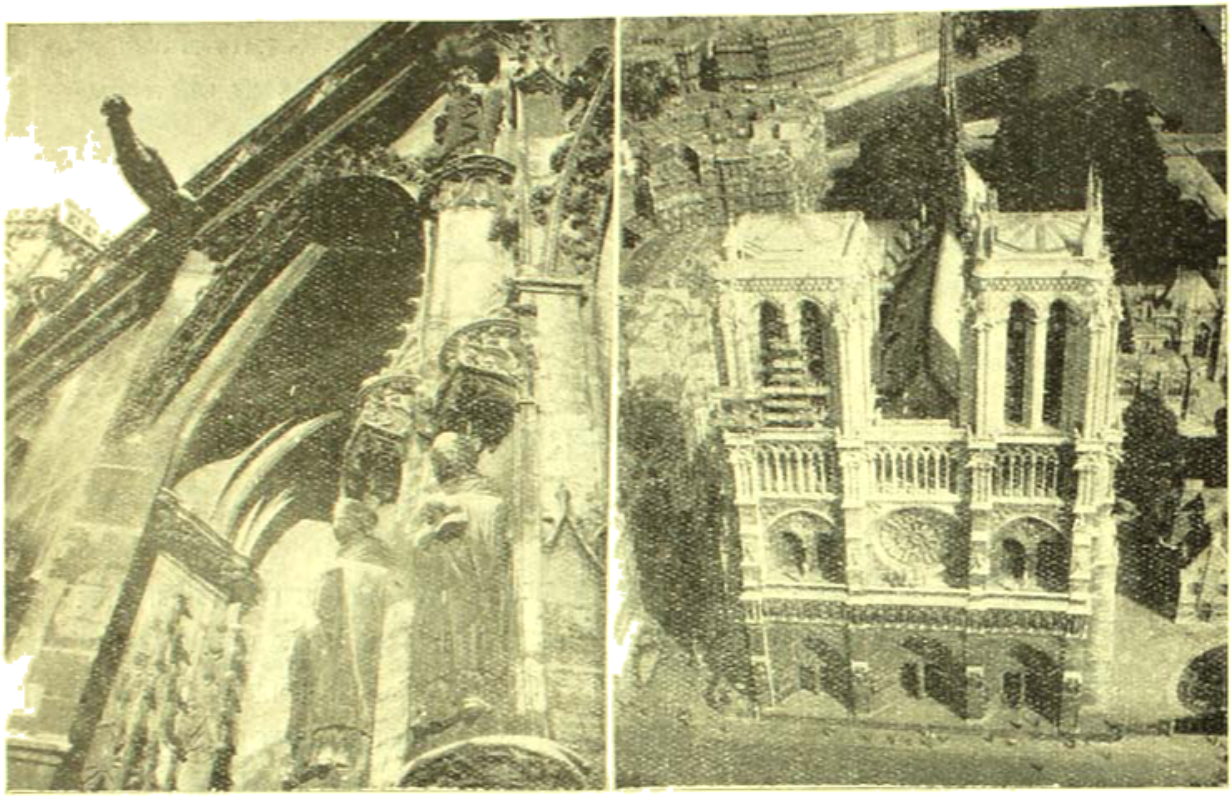

পারীর নোতর দাম গির্জ্জা ও-দাঁ। ফোয়েনা লোজেরোয়া গির্জ্জার প্রবেশদ্বার

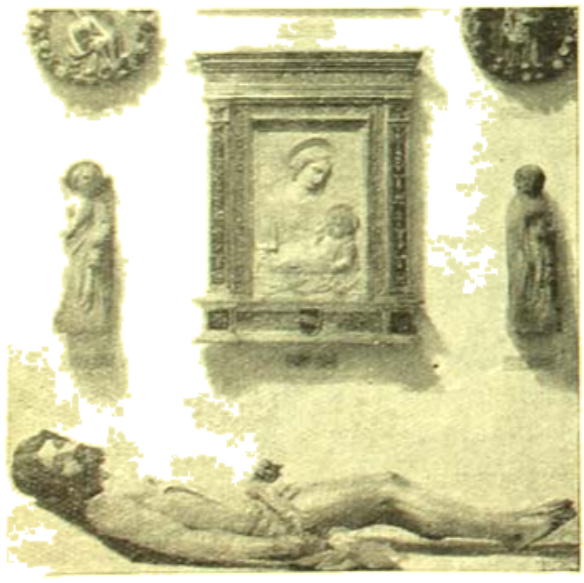

পুস্তরএ রক্ষিত কাষ্ঠনির্ম্মিত যীশুর পরান মূর্ত্তি (সপ্তদশ শতাব্দী)

পারীর বুলভারের পাশে মাঝে মাঝে যে সব অপূর্ণ পাথর বা ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি শহরের শিল্প গৌরব ঘোষণা করিত, তাহারা যেন হঠাৎ কোথায় উবিয়া গিয়াছে। গির্জ্জাগুলিতে, গবাক্ষালঙ্কৃত রঙ্গীণ কাচখণ্ডে তৈরী চিত্রফলকগুলির নাঝ দিয়া সূর্য্যালোক যে মোহের সৃষ্টি করিত, তাহার অবর্ত্তমানে এখন মনে হয় যেন গির্জ্জাগুলি, গলিতমাংস কঙ্কালের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। শিল্প নিদর্শন-শূন্য বিখ্যাত সংগ্রহশালাগুলি নিরাভরণা বিধবার ন্যায় শোকাচ্ছন্না। যুদ্ধনিবন্ধনে শ্রেষ্ঠ শিল্পসংগ্রহগুলির কি দশা হইয়াছে কে বলিতে পারে! জার্ম্মাণ রণদেবতা লালসামৃত রসালয়ে তাহাদের কতগুলির সমাধিলাভ ঘটিয়াছে, তাহার হিসাব নিকাশ আজিও শেষ হয় নাই।

কিন্তু যুদ্ধের ক্ষত ফ্রান্সের অঙ্গ হইতে মিলাইতে না মিলাইতেই ফরাসী শিল্পপ্রতিনিধিগণ পারীর সংগ্রহ-শালাগুলির দ্বার পুনঃউদ্ঘাটন করিয়াছেন। অলঙ্করণশূন্য গীর্জ্জার গবাক্ষে কাচখণ্ড নির্ম্মিত চিত্রফলকগুলি সাজাইতে তৎপর হইয়াছে। শূন্য পাদপীঠে, যুদ্ধান্তকাল পর্য্যন্ত অন্তর্হিত মূর্ত্তিগুলি পুনরায় স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিতেছে।

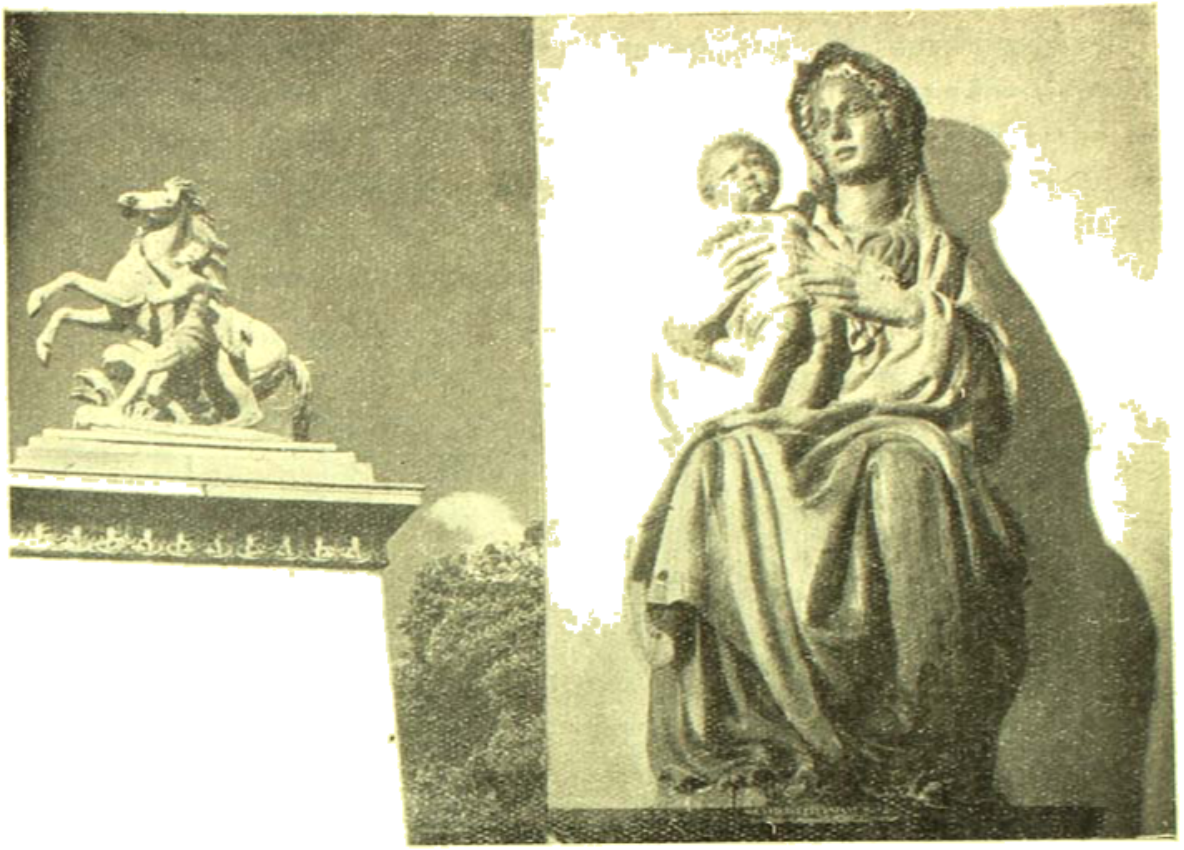

লুভরএ রক্ষিত মানুষ্মূর্ত্তি এবং প্রাদ্ ভা লা কঁকর্দ-এ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত "মাওলির অশ্ব"

ভূগর্ভস্থ কক্ষে রক্ষিত মূর্ত্তিসমূহ

রমণীগণী পারী সন্ধ্যাসন্ধ্যা নব আবরণ দিয়া, রণক্লিষ্ট আননে হাসি টানিয়া সর্ব্বস্বচ্যুত রিক্ত পারীবাসীর প্রাণে আশার বাণী আনিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান পারীর এই নব আবরণ ও হাসিটুকুর পুনরাবির্ভাবের পশ্চাতে রহিয়াছে শিল্পবিশেষজ্ঞগণের মহা আয়োজন, শিল্প-সংরক্ষকগণের ছয় বৎসরের কঠোর পরিশ্রম, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা। সংশোয়াদোনাদ উন্মত্ত জগতে মানবীয়তা ও সংস্কৃতিকে নিভৃত আশ্রয়ে নিরাপদে রাখিবার জন্য এবং যুদ্ধশেষে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা বহু বিপদ এবং কালের মধ্যেই শিল্প বস্তুগুলি যথাযোগ্য আশ্রয়ে নিরাপদে রাখিবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছিল। স্মৃতিসৌধ ও স্তম্ভবিলম্বিত ভাস্কর্য্য নিদর্শনগুলিকে বালিভরা বস্তার বর্ম্মে আবৃত করা হইয়াছিল। সৌধনিশ্চিত মঞ্চে সাজান বালুভরা বস্তার রক্ষাবরণ বৈমানিক আক্রমণের আঘাত প্রতিঘাত করিবার পক্ষে যথেষ্ট দৃঢ় ছিল। যাহাতে বস্তাগুলি ভার্ণ হইয়া শুদ্ধাদি জন্মাইয়া রক্ষাবন্ধন শ্লথ না হয়, তাহার জন্য কয়েকদিন অন্তর বস্তাগুলির উপর ক্লোরেট অব পটাশ ছিটাইয়া তাহার আশঙ্কা দূর করা হইত।

যুদ্ধের প্রতিশ্রুত চারবা

যুদ্ধের-এ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সাংবোশ্‌ গেঁয়ের বিজয় মূর্ত্তি

এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিয়াছিলেন, আজ রণক্লান্ত জগত কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদের স্মরণ করিতেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বেই প্রায় বারো বৎসর যাবৎ ফরাসীশিল্প সংরক্ষণ-বিশেষজ্ঞ সর্ব্ববিধ ধ্বংস হইতে শিল্প সম্পদের রক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষাদি করিতেছিলেন। সেই কারণে যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই, মূল্যবান শিল্পনিদর্শন সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সকল উপাদান ও রক্ষণ কার্য্য নিপুণ কর্ম্মীগণকে একত্রিত করিয়া ছইমাস প্রাস গু লা ফঁর্কদ এর "ও বেলির" (প্রস্তর স্তম্ভটী) মাটির স্তূপে আবৃত করা হইয়াছিল। গীর্জ্জা ও বিজয় তোরণ পাত্র সংবলিত ভাস্কর্য্যগুলিকে যথোচিত সুদৃঢ় আবরণ দেওয়া সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করা হয় নাই।

বিখ্যাত নোতর দাম গীর্জ্জার সংরক্ষণকল্পে, কেবল সম্মুখভাগটির জন্যই ষাটহাজার বালিভরা বস্তার প্রয়োজন হইয়াছিল। ফ্রান্সের বরেণ্য, প্রস্তরে গঠিত গীর্জ্জাগুলির ভূগর্ভস্থ বিশালময় কক্ষসমূহ শিল্পরত্নাবলী

রক্ষার পক্ষে উপযুক্ত আশ্রয়ের কাজ করিয়াছিল। শিল্প সম্ভার গীর্জাগুলির আশ্রয়ে লইয়া যাইবার পূর্বে তাহাদের প্রত্যেকটিতে কতখানি স্থান সংকুলান ও কতগুলি শিল্প নিদর্শনকে আশ্রয়দ্ব করা যাইতে পারে এবং পুনরায় সেগুলিকে স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ করিতে যাহাতে কোন বাধা বিপত্তি না ঘটে, তাহার জন্য যথাযথ মাপ জরিপাদি লইয়া প্রায় আটমাসকাল পরিশ্রমের পর বিপদ তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় মূর্তি ও জীর্ণ চিত্রের প্রত্যেকটি ফাটল বা দাগ তালিকায় দাখিল করা হইয়াছিল। সেগুলি নাড়াচাড়া করিবার সময় যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় তাহার সাবধান বিজ্ঞাপনী প্রত্যেক মূর্তি বা চিত্রের রামগুলির পাশে লিখিত ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত সুদৃঢ় সাঁ সুলপিস গীর্জার ভূগর্ভস্থ খিলানময় আশ্রয়, গোলা ও বোমার আক্রমণ সহনক্ষম বিবেচিত হওয়ায় পারীর ভাস্কর্যসংগ্রহ তথায় যুদ্ধান্তকাল পর্যন্ত রক্ষিত ছিল। কাচনির্মিত চিত্রফলকগুলি নোতরদাম, সাঁ স্তাপেল, সাঁ তোত্রিয়েন-দ্য-ম, সাঁ জেরমা লোজেরোয়া সাঁ, জেরাবতে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গীর্জার ভূগর্ভস্থ নিরাপদ কক্ষে স্থানলাভ করিয়াছিল। বিশ্ববিশ্রুত চিত্রগুলি জার্মান লুণ্ঠনকারীদের কবল হইতে রক্ষা করিতে দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে সেগুলিকে প্রয়োজন বিশেষে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল ভাল য় সোমার ও ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিম প্রবেশের ৪৬টি

সাঁসুলপিসের ভূগর্ভস্থখিলানে রক্ষিত মূর্তিসমূহ

দুর্গ এইভাবে ফ্রান্সের চিত্রসম্পদকে বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের সংগ্রহালয় ভেরাসাইএ ফরাসী শিল্পসংরক্ষণ সমিতি, মূর্তিগুলিকে উন্মুক্ত উদ্যানে দৃষ্টিভ্রম আবরণের অন্তরালে গোপন রাখিয়াছিলেন।

সকল শিল্পনিদর্শনগুলিকে পুনরায় পূর্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। ভূগর্ভস্থ প্রাগৈতিহাসিক খিলানের নীচে অপেক্ষমান মূর্তিগুলি এক অভিনব দৃশ্যের

অবতারণা করিয়াছে। গলিত বালির বন্যা সঙ্কীর্ণ গলিপথের বিলানের কুক্ষিশায়ী মূর্ত্তির মুখ বা অবয়বাংশের উপর পড়া ম্লান আলো পুরাতন পাণ্ডুরতাকে আরো বিকট করিয়াছে। প্রত্যেক মূর্ত্তির কণ্ঠাবলম্বিত পরিচয়জ্ঞাপক ধাতুফলক দেখিয়া মনে হয় যেন সেগুলি একাকী ভ্রাম্যমান শিল্পর পথভ্রষ্ট না হইবার সঙ্কেত। খণ্ডিত-অঙ্গ মূর্ত্তিগুলির অবয়বাংশ তাহাদের পাশেই উপযুক্ত আধারে রক্ষিত। সেগুলির অধিকারীর নাম ও তাহাদের পুনঃ সংস্থানের উপদেশ প্রভৃতি আধারের উপর লিখিত।

প্রত্যেক মূর্ত্তিই বিষণ্ণভাবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া যেন প্রশ্ন করিতেছে, কবে গবাক্ষপ্রবিষ্ট সূর্য্যালোকধারা তাহাদের অঙ্গ পুনরায় স্নান করাইবে, ধূপ আমোদিত হর্ম্মে ভক্তকণ্ঠনিসৃত প্রার্থনাবাণীর নিনাদ তাহাদের কর্ণ তৃপ্ত করাইবে। আঁধারাবৃত কক্ষে তাহাদের অপেক্ষার বোধহয় আজ শেষ হইয়াছে। ধ্বংসাগ্নির ধূম ত্রাস হইতে সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবার পূর্ব্বেই শিল্প-সুন্দরেরা ধীরে ধীরে পুনরাসন পরিগ্রহ করিতেছেন। জগৎ ভাবিতেছে ইঁহাদের আসন পরিত্যাগ ও পুনঃ পরিগ্রহের মধ্যে যে বিরাট প্রলয় ঘটিয়া গেল তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে কিনা!

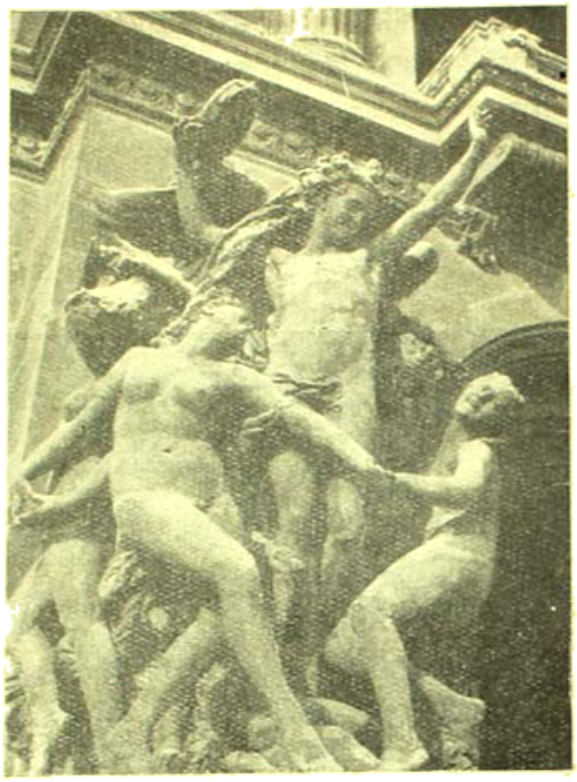

পারীর অপেরাভবনের প্রসিদ্ধ নৃত্যকারীর মূর্ত্তি (ফারগো গঠিত।

নব্য রসায়নী-শিল্প

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

পূর্ব্ববর্ত্তী "রসায়ন শাস্ত্র ও নামগ্রিক স্বাধীনতা" প্রবন্ধে দেশের ও জনগণের নামগ্রিক স্বাধীনতা না থাকিলে ক্রমে ক্রমে যে জাতির সৃষ্টিশক্তি বন্ধ্যা হইয়া যায় তাহা দেখান হইয়াছে। স্বাধীনতা হীনতায় অনুসন্ধিৎসু মনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি যাদবপুর কলেজের সমাবর্ত্তন অভিভাষণে স্বাধীনতার পূজারী জহরলালজী ভারতের পতনের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া যে সমাধানে পৌঁছিয়াছেন তাহা এখানে পাঠকদিগকে উপহার দিই। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, অঙ্ক ও কারিগরী বিদ্যার উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন, "আমি যখন এই সকল কথা বলি তখন আমি বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তাহার তুলনা করি না; তৎকালীন পৃথিবীতে ভারতবর্ষ কারিগরী বিদ্যায় অগ্রসর ছিল, বহু শতাব্দ বৎসর ধরিয়া ভারতে ইঃ, লোহা, তাম্র ও ইস্পাত তৈয়ারী হইত। ভারতীয় বিজ্ঞানে 'শূন্য' চিহ্নের তুল্য এক বৈপ্লবিক উদ্ভাবন।" তিনি প্রসঙ্গতঃ ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্রের উল্লেখ এবং অন্যান্য দেশে তাহার ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, উপনিবেশ স্থাপন ও সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি-প্রচারের কথা করেন। তিনি ভারতের বর্ত্তমান দৈন্যের কারণ দিতে গিয়া বলেন যে স্বাধীনতা হারাইবার সঙ্গে ভারতের দেহে যে একটি কঠিন আবরণ দেখা দিল তাহা ভেদ করিয়া সে (ভারত) আর বাহির হইতে পারিল না; লোকে এমনও মনে করিত "কালাপানি" পার হওয়া অধর্ম্ম, তাহাকে স্পর্শ করা যাইবে বা যাইবে না ইহা লইয়াই সে যেন বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িল।"

কালের প্রভাবে ভারতের ভাগ্যাকাশের চাকাও ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, চারিদিকেই নিজেকে গড়িয়া তুলিবার জন্য যাহার যেমন শক্তি তিনি প্রয়াসী হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেও বহু মনীষীর সাধনায় শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্লেষণ-ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিতেছে। ইহাদের মধ্যে নব্য

রসায়নী শিল্পের গোড়া পত্তনের কথাই বেশী অভিনব, কতকটা রূপ-কথার কাহিনীর মত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্নস্থানে কলিকাতা ও বোম্বাই নগরীতে আমাদেরই কতিপয় বিদেশী বণিক বন্ধু রসায়নী শিল্পের সূত্রপাত করেন। সেই সময় রসায়নী শিল্পের মধ্যে স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য কেবলমাত্র গন্ধক-দ্রাবক ও দুই একটী ক্ষারের দ্রাবক তৈয়ারী হইত। এই সকল কারখানার মোটামুটী শিক্ষিত দুই একজন দেশীয় মিস্ত্রির সাহায্যে কার্ষ্টিকচক্র দিয়ে, মাধ্যাকর্ষণ যন্ত্র এবং আদমস্ সওল প্রমুখ কতিপয় ফরাসীদের অনেকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গন্ধকদ্রাবক তৈয়ারীর কলকারখানা নির্মাণ করেন। এই কারখানাগুলি হাত-চালক ক্ষুদ্র ছিল; কোন কোনটীর বৈনিক উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ ১০।১২ হন্দর ছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এইরূপ একটী কারখানা ১০০০৲ টাকায় খরিদ করেন। বলা বাহুল্য এই হাজার টাকাও ক্রেতা নগদ দিতে পারেন নাই; বিক্রেতাও ভাগ্যদোষেই সম্মত ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগিগণ উক্ত কারখানা চালাইতে গিয়া দেখিলেন যে মানিক অনভিজ্ঞ মিস্ত্রিদের সাহায্যে মাত্র দুইখানা সীসার ঘর (১০′×১০′×৭′) তৈয়ী করিয়াছেন; কাঁচামালের অপচয় এত বেশী যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহা চালান অসম্ভব। এই হাজার টাকা অবশ্যই যে অভিজ্ঞতা শিক্ষিত হয়, দশ বৎসর পরে তাহা কাজে আসে। বৃহত্তর ভাবে দেশীয় মূলধনে সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত এসিডের কারখানা হিসাবে বেঙ্গল কেমিক্যালের মাণিকতলা কারখানার পুরাতন 'চেম্বার প্লাণ্ট' ঐতিহাসিক মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানেও এই প্রতিষ্ঠানের পাণিহাটী কারখানার চেম্বার প্লাণ্ট 'রিকভারী' ব্যবস্থা হিসাবে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভারতে স্থাপিত কণ্টাক্ট প্লাণ্টের মধ্যে তৃতীয় ও বঙ্গ দেশের সর্ব্বপ্রথম প্লাণ্ট এই কারখানায় চালু আছে। আরও উল্লেখ-যোগ্য এই যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রেরণায় ভারতের নানা স্থানে ভারতীয় মূলধনে সংস্থাপিত গন্ধক-দ্রাবক তৈয়ারীর কারখানা আজ পঞ্চবিংশতি সংখ্যা অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর হিসাবের অনুপাতে ইহাও নেহাৎ নগণ্য বলিলেও চলে। ভারতের জনসংখ্যা সমস্ত পৃথিবীর জন-সংখ্যার ১৯ ভাগ। এই বিপুল জনসংখ্যার অনুপাতে দ্বারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ গন্ধক-দ্রাবক তৈয়ারী হয় তাহার মাত্র ০'০০৩% ভাগ ভারতে হয়। ইহার কারণের মধ্যে প্রধান এই যে, গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric Acid) এর উৎপাদন গন্ধক আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে। কেন্দুঝিহারের খনিপাথী কো-কি-মুলতাবে এবং মাক্তিতে পুরাতন আগ্নেয়গিরির পার্শ্বে কিছু গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পরিমাণ ও উৎকর্ষে অত্যন্ত হীন বলিয়া এতদিন ইহা লইয়া কোনও কাজ হয় নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধে গন্ধক পাওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া যাওয়ায় গভর্ণমেণ্ট এই খনিতে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। এই কারণে আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা বৈদেশিক গন্ধকের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমরা প্রধানতঃ ইতালী-দেশীয় গন্ধক লইয়া কাজ করিতাম; আমেরিকান গন্ধকের আমদানী সম্ভবতঃ ৭।৮ বৎসর হইতে সুরু হইয়াছে। আচ্চা দেশে গন্ধক খনির তৃতীয় সন্ধান স্থান আসান। কিন্তু বিশুদ্ধতায় ইহা হীন ও আর্সেনিক দুষ্ট বলিয়া ব্যবহারে অসুবিধাজনক। এই তিন শ্রেণী গন্ধকের মধ্যে আমেরিকার টেক্সাস উপসূলের গন্ধক বিশুদ্ধতায় শ্রেষ্ঠ। ১৯২৯-৩০ এই পাঁচ বছরের বিশেষ হইতে আমদানী গন্ধকের পরিমাণ ১৮০০০ টন, কিন্তু আমদানী গন্ধক-দ্রাবক ঐ সময়ে ভারতে তৈয়ারী গন্ধক-দ্রাবকের মাত্র ১.৩% অংশ। দ্রাবক আমদানী ও রপ্তানীর অসুবিধার জন্যই আমাদের এই ব্যবসা গড়িয়া উঠিতেছে, কারণ উৎপন্ন পণ্যের মূল্য হারাহারি হিসাবে বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। বৈদেশিক বণিকদিগের ইহা বিশেষ জানা আছে বলিয়াই রপ্তানী দ্রব্য তালিকায় গন্ধকের দাম, গন্ধক-দ্রাবক অপেক্ষা অনুপাতে অনেক অধিক। ১৯২৯-৩০ এই পাঁচ বছরের হিসাবে প্রতি বৎসরে ভারতে উৎপন্ন দ্রাবকের মোটামুটী পরিমাণ ছিল ৩০৮৮ টন। বর্ত্তমানে এই পরিমাণ আরও বাড়িয়াছে। ভবিষ্যৎ ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শিল্পের কাঁচা মালের বিষয়ে কোন চিন্তাই করা হইতেছে না। পৃথিবীতে যতরকমে গন্ধক ব্যবহৃত হয় তাহার মাত্র ১৭.৫% ভাগ বিশুদ্ধ গন্ধক (Brimstone), বাকী গন্ধক প্রকৃতির অপরাপর স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। যেখানে বিশুদ্ধ গন্ধক নাই সেখানে স্থানীয় গন্ধক-দূষ্ট প্রকৃতির খনিকে কেন্দ্র করিয়াই তাহারা শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে জার্ম্মানীর কথা। সে দেশে গন্ধক নাই, কিন্তু প্রাকৃতিক খনি কয়লা ও আয়রণ-প্রাইট হইতেই সেই দেশ গন্ধক আহরণ করিয়া থাকে এবং কলকারখানা বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে যে প্রকৃতির গুণের অপচয় হইবার সম্ভাবনা সেখানে নাই। ইংলণ্ডেও সকল কারখানা বিশুদ্ধ গন্ধকে চালিত হয় না। ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ডের কয়লার খনিতে পাইরাটীস প্রস্তর প্রচুর পাওয়া যায়। সেখানে এই জন্য অনেক কারখানা এমন ভাবে গঠিত হইয়াছে যে পাইরাটীস পোড়াইয়া গন্ধক দ্রাবক তৈয়ারী হয়। পাইরাটীস ব্যতীত তৃতীয় প্রাকৃতিক উপাদান দস্তা পূর্ণ খনিজ প্রস্তর (Zinc Blend)। গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হিসাবে দেখানে কেবলমাত্র দ্রাবক তৈয়ারী করিবার জন্য বিশুদ্ধ গন্ধক খরচ হইয়াছে ১৮০০০০ টন, সেখানে পাইরাটীস, জিঙ্ক ব্লেণ্ড ও স্পেণ্ট অক্সাইড খরচ হইয়াছে ৫৩৭,৫৩১ টন। ভারতে যে সামান্য পাইরাটীস আছে তাহার কোনও সন্ধান হয় না। ঘাটশিলার তাম্র প্রস্তুতের কারখানার কপার পাইরাটীস অবশ্য ব্যবহৃত হয়। জানা গিয়াছে, তাম্র প্রস্তুত করিবার সময় বৎসরে ৮০০০ টন গন্ধক-দ্রাবক তৈয়ারী হইবার উপযুক্ত গন্ধক-ডায়োক্সাইড (SO2) বাতাসে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। জিওলজিক্যাল বিভাগের Survey Report হইতে জানা যায় যে আসাম ও পাঞ্জাবে গন্ধক সমধিক পরিমাণ প্রচুর আছে। বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইহার গন্ধক ডায়োক্সাইড (SO2) হিসাবে আলাদা করিয়া দ্রাবকে পরিণত করা যায়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ইহা কার্য্যকরী ও প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু বণিকদিগের আগ্রহ ও উদ্যম যতদিন কাজে পরিণত হইতেছে না।*

* M. R. Mandlekar, Indian Chemical Society, Industrial edition, Vol III
Science & Culture, P 509 of 1939-40

উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও পাঞ্জাবে জিপ্‌সাম প্রস্তর (Gypsum) প্রচুর পাওয়া যায়। জার্ম্মান দেশে Gypsum হইতে Cement প্রস্তুত করিবার সময় যে Sulphurous gas নির্গত হয়, জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকের হাতে তাহা হইতে Sulphuric Acid তৈয়ারী হইতেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্ম্মানিকে একঘরে করিয়া রপ্তানীর তৈয়ারে যাহাতে করিবার জন্য ব্রিটেন তাহার সোরা (nitre) পাওয়ার পথ বন্ধ করিলে জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক বিপাতার দান জল ও বাতাস হইতে হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন লইয়া এমোনিয়া তৈয়ার করেন। এই "এমোনিয়া" বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাহাদিগে nitric এসিড এ পরিণত হয়। এই nitric এসিড যেমন এক দিকে explosivesএর প্রাণ, তেমনি ইহা তৈয়ারীর একটী প্রধান উপাদান ; অপর দিকে বৈজ্ঞানিক উপায় এমোনিয়া ও জিপ্‌সাম নূতন পদ্ধতিতে সংযোজিত করিয়া এ্যামনসালফ্‌ তৈরী করিলেন। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে এই এ্যামনসালফ্‌ ammon sulph সার হিসাবে আজ সর্ব্বত্র আদৃত হইতেছে। একঘরে জার্ম্মানী বুদ্ধির কৌশলে একটিলে দুইয়ের ফসল ও জমির সার তৈয়ার করিয়া যুদ্ধ ও যোদ্ধার খোরাক সরবরাহের পথে বহুত যোজন আগাইয়া গেলেন। বিদ্যা ও বুদ্ধির কৌশলে নানা নূতন আবিষ্কার করিয়া বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক যেমন নিজ নিজ দেশকে আজ নির্ভর ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন তেমনি বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণকে জ্ঞানের খোরাকও প্রচুর জোগাইয়াছেন। জ্বালানী কয়লা তৈরী করিবার জন্য পাথুরে কাঁচা কয়লা আলো বাতাসহীন হাঁড়িতে তোয়াইলে (Destructive distillation) যে বাষ্প পাওয়া যায় তাহা পরিশুদ্ধ করিবার সময় গন্ধক-দ্রাবকের বরফার মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা হয়। এই সময় চিনির মতন যে পাদা দানা পাওয়া যায় তাহাই Ammon Sulphate। যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশে একমাত্র এই উপায়ে ইহা প্রস্তুত হইত। ভারতে এখনও ২।১টী প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতিতে তৈয়ার হইয়া থাকে। কেবল মাত্র মহীশূরে প্রকৃতির দান জল ও বাতাস হইতে ammonia, nitric acid ও ammon sulphate তৈয়ারী হইতেছে। পৃথিবী এতদূর অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় অধিকাংশ কয়লা-খনির মালিকেরা ইট পোড়াইবার ভাটার মত ভাটী করিয়া আগুনে তৈলাক্ত পদার্থ পোড়াইয়া জ্বালানী কয়লা তৈরী করিয়া থাকেন। সেরোক্ত পদ্ধতিতে জ্বালানী কয়লা তৈরী করিতে কোটি কোটি টাকার মূল্যবান তৈলাক্ত পদার্থ শুধু নষ্ট হয় না, প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের দাহিকা শক্তি অতি নিম্নস্তরের হইয়া থাকে। এই আটীন অপচয়ের বিষয় যথাস্থানে বিস্তৃত বলা হইবে।

জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার অপর উল্লেখযোগ্য সার সুপার ফসফেট-চৈব ও অমৈব দুই ভাবেই তৈয়ারী করা যায়। মৃত জীবজন্তুর হাড়চূর্ণ কিম্বা প্রাকৃতিক ফসফেট প্রস্তর গন্ধক-দ্রাবকের সহিত মিশাইয়া ইহা তৈরী হইতে পারে। বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে এইরূপ সস্তা দ্রাবক আমাদের দেশে তৈয়ারী হয় না বলিয়া এই প্রয়োজনীয় শিল্পও আমাদের দেশে গড়িয়া উঠিতেছে না, কেবলমাত্র মাদ্রাজ অঞ্চলের স্যালী কোম্পানী আংশিক বৃহৎভাবে আমদানী অমৈব উপাদান হইতে এই সার তৈয়ারী করিয়া থাকেন, অথচ আমাদের পূর্ব্ব হাড় আমাদের দেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যায়। সস্তা বিদ্যুৎ ও সারের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা এইবার বিশ্ব যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া বুঝিয়াছি ও শিখিয়াছি।

কাব্যে লিখিত 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা' আজ কল্পনা হইলেও। যন্ত্র প্রাণের আহুতির পরে সংখ্যাতত্ত্বেরা আজ প্রমাণ সহকারে জানাইতেছেন যে আমাদের দেশে জনবৃদ্ধি শতকরা ৯০ জন কৃষি ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের অন্নের সংস্থান করিতে অসমর্থ, কিন্তু ইংলণ্ডের ষ্টেট্‌সে জাতির শতকরা ২০ জন কৃষক পরিবারে অনেক কম জমি লইয়াও সমস্ত জাতির অন্ন ব্যতীত পৃথিবীর অপর সোনার্দ্ধের অনেক আয়োজন আজ সমস্যা মিটাইয়া থাকে। এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে নবীন জনস্রোত মানুষের অধিকারে আনিয়া সস্তা বিদ্যুতে ও যৌথ বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতিতে চাষী করিয়া। মানুষের মতন বাঁচিতে হইলে আমাদের ও সাবা পথাঃ।

গন্ধক দ্রাবক প্রস্তুতের অপর বৃহৎ শিল্প তুঁতে, ফিটকারী ও তৎশ্রেণীর এলুমিনিয়াম্‌ সালফেট। ছোটনাগপুর ও জব্বলপুর অঞ্চলে প্রচুর তাম্রমিশ্রিত প্রস্তর (Copper Pyrites) ও বক্‌সাইট পাওয়া যায়। রসায়নাগারে উক্ত প্রস্তরচূর্ণ গন্ধক-দ্রাবকের সহিত মিশ্র করিলে তুঁতে ও এলুমিনিয়াম সালফেট তৈয়ারী হয়। এলুমিনিয়াম সালফেট পুনরায় এমোনিয়াম্‌ কিম্বা পটাসিয়াম্‌ সালফেটের সহিত যুক্ত হইলে ফিটকারী প্রস্তুত হইয়া থাকে। বক্‌সাইটের দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক দান এলুমিনিয়াম্‌ ধাতু। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার এলুমিনিয়াম তৈজসপত্র তৈয়ারীর জন্য আমদানী হইত। এরোপ্লেনের অবয়ব প্রস্তুত করিবার জন্য ইহার একান্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও ভারতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারীর কোনও ব্যবস্থা ছিল না। যুদ্ধের অবাধ বীভৎসতার মধ্যে ও মঙ্গলের প্রসন্ন মূর্ত্তির ছায় গভর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে এবং আনুকূল্যে সম্প্রতি এই ধাতু নিষ্কাশনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের তিন দিকে সমুদ্র, অথচ এখানে লবণ—মনুষ্যের প্রাণীর ধারণের অন্যতম সস্তা ও প্রধান উপাদান-লোণা পানী-বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে লোকে হিমসিম খাইয়া যাইতেছে। অথচ আমাদের দেশের রাজশক্তি লবণ তৈয়ীর সাহায্য কখনও করেন নাই। প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এডেন, গুজরাট, সিন্ধু ও মাদ্রাজে যে লবণ-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে অপ্রচুর, কিন্তু এই লবণ উৎপাদনের ডিক ও কষার জলে (Bitterns) যে পরিমাণ magnesium chloride ও mag sulph পাই হয় তাহার হিসাব শুদ্ধিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। জার্ম্মাণদেশে Stassfurt deposit হইতে বৎসরে ১২০০০ টন mag. chloride প্রস্তুত হয় ; আর ভারত ও এডেনের লবণ কারখানার Bitterns এর জলে বৎসরে ১২০০০ টন mag. chloride পাই হয়। Mag sulph এর হিসাব আর অধে অধে দিলাম না। অথচ Salem হইতে magnesite আনাইয়া mag sulph তৈয়ারী করিতে

যায়। পেষোক্ত উপায়ে এক বেঙ্গল কেমিক্যালই বৎসরে ১০০০ টন mag sulph তৈয়ারী করিয়া থাকেন। সস্তা লবণ ও সস্তা বিদ্যুৎ না থাকায় আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় অপর দুইটী শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে না। প্রথম, তরল ক্লোরীন; দ্বিতীয়, কষ্টিক সোডা। কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে তরল ক্লোরীন চূণের সহিত মিশাইলে ব্লিচিং পাউডার উৎপন্ন হয়। এদিকের মতন ক্লোরীনও তীব্রকারক (কষ্টিক সোডা) কেন্দ্র করিয়াও বহু শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে সাবান ও প্রয়োজনীয় ব্লিচিং পাউডারের অভাবে সাধারণ লোকে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমদানী বন্ধ হওয়ায় দুইটী প্রয়োজনীয় ভারী রসায়নী শিল্প, পটাশ পারম্যাঙ্গানেট ও সোডিয়াম ডাইক্রোমেট ভারতে প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে এবং স্থায়ী শিল্প হিসাবে দাঁড়াইবার যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছে।

আমাদের দেশে চূণ ও কয়লা প্রচুর আছে, কিন্তু কারিগরী শিল্পের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় রসায়ন। কারবাইড শিল্পের পত্তন এদেশে সম্ভব হইতেছে না কেবলমাত্র সস্তা বিদ্যুতের অভাবে। অথচ সস্তায় কারবাইড তৈয়ারী সম্ভব হইলে ভবিষ্যতে এসিটিক এসিড, এসিটোন, রবর জাতীয় দ্রব্য, কিম্বা নকল রবার তৈয়ারীর আশা করিতে পারা যায়। টেনেসী উপত্যকার ন্যায় নদী শাসন হইলে আমাদের এই নদীমাতৃক দেশে বিপুল বৈদ্যুৎতিক শক্তি সৃষ্টি হইতে পারে।

ঝিনিদি ক্রমেই দীর্ঘ হইতেছে। বস্তুতঃ লবণ, কয়লা ও লবণকে কেন্দ্র করিয়া বহু জৈব ও অজৈব রসায়নী দ্রব্য গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেক প্রাথমিক পণ্য পুরবার বহু শিল্পের জননী অথবা ধাত্রী। ইহার মধ্যে লবণ-ভ্রাবকের বৈশিষ্ট্য অন্যতম। জৈব ও অজৈব বহু শিল্পের প্রাণ এই ভ্রাবক। এই জন্য রাসায়নিকের দৃষ্টিতে যে দেশে লবণের খরচ খুব বেশী, সেই দেশ তত বেশী সভ্য। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে পৃথিবীর উৎপন্ন লবণের পরিমাণ ও লবণের উপর একান্ত নির্ভরশীল শিল্পের কিছু হদিস পাওয়া যাইবে। এই তালিকা দৃষ্টে রাসায়নিক জগতে আমাদের দুরবস্থা বুঝিতে পাঠকের অসুবিধা হইবে না। ঘরে বাইরের অসম প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ভারতীয় রাসায়নিককে আত্মরক্ষা করিতে হইতেছে। ব্যাধি এইরূপ গুরুতর যে ইহার পরিবর্তন সহজসাধ্য নহে। কারণ এই যে ভারতীয় অধিকাংশ রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানই কেবলমাত্র স্থানীয় বাজারে বৈদেশিক মাল আমদানীর অসুবিধার সুবিধা লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেক মালিকই আপাতঃ অনাহার লভ্য সন্তুষ্ট এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টিহীন। অনেকেই স্থান নির্ব্বাচনের সময় কাঁচামাল, কয়লা, জলের সুবিধা অসুবিধা, রপ্তানী আমদানীর হিসাব খতাইয়া দেখেন নাই। কোন কোনও শিল্পপতি কোনও রকমে শিল্পজগতে সুনাম প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন নিজ ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সচেষ্ট না হইয়া অপর নূতন কোনও ব্যবসায়ে বেশী মোজদার হইবার সম্ভাবনায় সময় ও অর্থ ব্যয় করা পছন্দ করেন। ইহাতে তাঁহার পূর্ব্বতন প্রতিষ্ঠার হানি ত করেনই, উপরন্তু নূতন উদ্যমে ও ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপালাভে বঞ্চিত হন। এই সকল নানা কারণে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের জন্য বহু প্রতিষ্ঠানেরই সর্ব্বভারতীয় পরিকল্পনা রচনা করিবার শক্তি ও যোগ্যতা নাই। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা থাকিলে সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনা করিয়া রাষ্ট্রের যাবতীয় শক্তিকে তাহা পরিপূরণ করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারিত। কিন্তু এই দেশে বিদেশী শাসকের যুক্তিই অভিনব। তাঁহাদের মতে রপ্তানী ও আমদানীকারক দালালের চেয়ে সাক্ষাৎ পণ্য উৎপাদকের সংখ্যা যেখানে ন্যূন, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দালালদের সহায়তাই কর্ত্তব্য। কিন্তু দিন আসিতেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশের বুঝ বুঝি, যন্ত্র আঁটুনি ঢিল হইয়াছে। সারা দেশ আজ পণ্যাগারূপের বন্যায় প্লাবিত। সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠা খুলিলেই নিত্য নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনের ঘোষণা জানিতে পারা যায়, কিন্তু অতীতের ন্যায় এই সকলও ব্যর্থ হইবে যদি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা ইহার পিছনে না থাকে। নদী-শাসন হইতে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি, সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, রাসায়নিক শিল্প ও কারিগরী বিদ্যা আজ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এই জন্য প্রথমেই জাতীয়তামূলক সামগ্রিক পরিকল্পনা দরকার। ইহার জন্য চাই সততা ও নবীন রাষ্ট্রীয় চেতনা, চাই অবশ্য সাহস ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠা।

পৃথিবীর উৎপন্ন লবণের হিসাব

দেশ	১৯০৯	১৯১০	১৯১৪	১৯১৯	১৯২০	১৯২৫	১৯৩০
অষ্ট্রিয়া	১২৮৪৩	—	২০৩১৪	১০১৭৩	—	১১১৩৬	—	—
চিলি	৪৪০৮	৩৭৬৩	১০,০০৮	১৮৯১০	১৩১২৯	১১৩৮০	৮৯২৩	১৮১৮৪
ক্রাস	২২০০	—	—	২২২২	—	২৭২	১৪৭	—
গ্রীস	১০০০	—	—	২২৩৮	—	২২৪৩	১১৮০	—
ইতালী ও সিসিলি	৪৩৫০৬০	৪২৩৪৬০	৩৭৭৮৪৩	২২৩১৬	২৪৮৪৮২	২৪৬৩৯২	২৮৩২৪৯	৩৪৩০১
জাপান	৩৬৩১৭	৪৩১৫১	৭৫৩০৮	১৭৩৮২	১৮৮৭৪	৩৭১০৮	৮৯৪৮২	৬১৩৭২
স্পেন	২১৭৫০	—	৪৭১৮০	৮৯৪৮৬	—	৬৮৩৭১	৭৭৭১১	—
ইউনাইটেড, ষ্টেটস্	৩০৩,০০০	২৪৭০৬০	৩৪৭৪৯১	৪৮০৮০০	১২৬৫২৪৩	১৪৪৪৯০৪	১৪০৯২৩২	২৫৪৮৮৭

সাধনা ও সিদ্ধি

শ্রীকিতীশচন্দ্র কুশারি

আজ সকাল হইতেই হারাধন উপবাসী। তবে উপবাসটা নির্জলা নয়। রাস্তার কল হইতে জলপান তাহাকে করিতে হইয়াছে অনেকবার—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা একসঙ্গে মিটাইবার জন্য। ফলে ক্ষুধাও মিটে নাই, তৃষ্ণাও যায় নাই। সর্বগ্রাসী ক্ষুধাগ্নির সঙ্গে সর্বনাশা তৃষ্ণার শিখাটুকু অনুক্ষণ লাগিয়াই আছে। একমুষ্টি অন্নের জন্য তাহাকে সারা কলিকাতা সহর একরকম চষিয়াই বেড়াইতে হইয়াছে। এই ভ্রাম্যমান অবস্থায় সে অনেক অযাচিত উপদেশামৃত পান করিয়াছে, অনেক কটূক্তি সহিয়াছে, অনেক লাঞ্ছনাই হাসিমুখে বরণ করিয়াছে, কিন্তু অন্ন জুটে নাই। দক্ষোদরের জ্বালায় আর এক দফা ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ক্লান্ত পদযুগল আর চলিতে চাহিল না এবং শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হইয়া হারাধন কর্জন-পার্কের একটা বেঞ্চির কোণ ঘেঁষিয়া একেবারে অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল।

শীতের সন্ধ্যা। অঘ্রাণ মাসের শেষ দিকেই এবার শীতটা একটু জাঁকিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কর্জন পার্কের হিমশীতল বাতাস হারাধনের কাছে খুবই সুখসেব্য বলিয়া মনে হইতেছে না, বরঞ্চ ক্রমশঃ অস্বস্তিকর হইয়া উঠিতেছে। মানুষের সহিত প্রকৃতির বিরোধ অত্যন্ত পুরাতন, সনাতন বলিলেও চলে। মানুষের কাছে বারংবার পরাভূত হইয়াও প্রকৃতি সুযোগমত প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে না। অনাধারক্লিষ্ট হারাধনের গায়ে পাতলা সার্টের উপর সূতির কোট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা ও পরণে সূতির প্যান্টালুন থাকিলেও, ইহাদের সমবেত চেষ্টা শীতের নির্মম আক্রমণ কোন মতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। তাহার হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। খানিকক্ষণ দাঁতে দাঁত চাপিয়া ধরিয়া সে শীতের শীতল অনুভূতিটাকেই অস্বীকার করিতে চাহিল, যেমন করিয়া এই অতি সত্য বাস্তব জগতটাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা করে বুদ্ধিমান দার্শনিকেরা, বুদ্ধির প্যাঁচ করিয়া ও যুক্তির গোলকধাঁধা দিয়া। শেষ পর্যন্ত হারাধনকে উঠিতে হইল এবং ঠাণ্ডা হাত দুইটা প্যান্টের পকেটে ঢুকাইয়া চারিদিকে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মানুষের নাকি অতি দুঃখেও হাসি পায়। সত্যই তাই। প্রমাণ এই হারাধন। হারাধন মনে মনে না হাসিয়া পারিল না। এই বিড়ম্বিত লাঞ্ছিত জীবন, এই কুৎসিৎ কুশ্রী বিকৃত জীবনযাত্রা, আশা ভরসাহীন অনাগত ভবিষ্যত—ইহারই মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টাই একটা মস্ত কৌতুকের ব্যাপার। একবার এক পাগলের সঙ্গে একটা কুকুরের বিরোধ বাধিয়াছিল লালপাতার খাবারের ঠোঙা লইয়া। দুই পক্ষেই সমান টানাটানি চলিতেছিল। পাগলের কাণ্ড দেখিয়া কয়েকজন দর্শকের দন্তরুচিকৌমুদি ক্ষণে ক্ষণে বিকশিত হইতেছিল। হারাধন অবশ্য হাসে নাই। আজ তাহার মনে হইল হাসাটাই স্বাভাবিক। ইহাইত এই দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে সর্বশ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনয়। আশ্রয় মানুষের জন্য, অথচ কত লোক নিরাশ্রয়! আর আহারের প্রাচুর্য ও ভোগের ঐশ্বর্যের মধ্যে দুর্ভাগা অনাহারীর অস্তিত্ব একেবারে বেমানান, খাপছাড়া। রাজপথ চলিবার জন্য, কিন্তু চলিতে চলিতে অকস্মাৎ পা পিছলাইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়া হাস্যকর।

হারাধন সজোরে পা চালাইয়া নির্জন পার্কটা পরিক্রমণ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল দেহের ঠাণ্ডা রক্তে একটু উষ্ণতার আমেজ আসিয়াছে, ক্লান্তির ভারটা ক্রমশঃ কাটিয়া যাইতেছে। একবার দৌড়াইয়া লইলে বোধ হয় শরীরটা আরও একটু গরম হয়। হারাধন চারিদিকে নজর বুলাইয়া লইল। সন্ধ্যার অন্ধকারেও রাস্তায় লোক চলাচলের বিরাম নাই। রাস্তা হাঁটিবার জন্য, দৌড়িয়া চলিবার জন্য নহে। নিয়মের বিচ্যুতিই অস্বাভাবিক। সুতরাং এই ভিড়ের মধ্যে দৌড়ান খুব বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। এমন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড দেখিলে হয়ত জনতার সঙ্গে পুলিসই তাড়া করিবে চোর বলিয়া—নয়ত খাতাল মনে করিয়া।

হারাধন চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া গেল।···পুলিশ? জেল? মস্তিষ্ক তাহার অতিমাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠিল। অবসন্ন মগজে বিদ্যুৎবেগে চিন্তাশক্তি ছুটাছুটি সুরু করিয়া দিল···জেল? ঠিক হইয়াছে, হারাধন ভাবিল, আহার ও আশ্রয়ের জন্য আজ সেই তার কাম্য। জেলে যাওয়া এখন লজ্জার বিষয় নয়। জেলও এখন তীর্থধাম। যদি কোন উপায়ে আজ রাত্রিতেই জেলে প্রবেশ করিবার পথ সে প্রশস্ত করিতে পারে তাহা হইলে আহার ও আশ্রয় দুই সহজলভ্য হইয়া উঠিবে—শুধু আজিকার রাত্রির জন্য নহে, আগামী কয়েকমাসের জন্য সে নিশ্চিন্ত—কোন কিছুই দাবী করিতে হইবে না, ভিক্ষা ত নহেই। একেবারে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, নিরাপদ আশ্রয়, আর নিশ্চিন্ত জীবন যাত্রা। কিন্তু কারাগৃহের লৌহ কপাট সে খুলিবে কেমন করিয়া! হারাধন শিস্ দিতে সুরু করিল, আর ভাবিতে লাগিল—চুরি! ডাকাতি! পকেটকাটা!—

অকস্মাৎ সে লাফাইয়া উঠিল এবং অতি দ্রুতবেগে চৌরঙ্গীর দিকে অগ্রসর হইল। রাস্তাটা পার হইয়াই হারাধন দেখিল একটা হোটেল। উজ্জ্বল দীপালোকিত হলঘরে সাহেব মেমের পানভোজন চলিতেছে। উর্দ্দীপরার দল চরকির মত ফুলস্তবক শোভিত টেবিলে টেবিলে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। ফুটপাতে দাঁড়াইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে মূল্যবান সান্ধ্য-পরিচ্ছদ-শোভিত পানভোজনকারীদিগকে আর একবার হারাধন ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তারপর সে নিজের পোষাকের দিকে চাহিল। পাৎলুনের উপর সে খুব বেশী ভরসা করিতে পারে না, কারণ পাৎলুনের কৌলিন্য আজ আর নাই। এখন একমাত্র ভরসা ওপেন ব্রেষ্ট কোট। দেখা যাউক এই ওপেন ব্রেষ্ট কোটটা তাহাকে বাঁচাইতে পারে কিনা! ভিতরে প্রবেশ করিয়া কোনমতে একটা টেবিলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে, কোটটাই হইবে প্রকাশমান আভিজাত্যের ধ্বজা—নেপথ্যস্থিত কাপড়জুতার চুঁচার কীর্ত্তন কেইবা আর শুনিতেছে আর দেখিতেছে। তারপর ইংরাজি খাদ্য তালিকা হইতে ইচ্ছামত—। হারাধন একটু ভাবিল এবং বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিল, ইচ্ছামত অর্ডার দিলে খাদ্যের মোট দামের সহিত শেষ পর্য্যন্ত তাহার সুতির ওপেন ব্রেষ্ট কোটের কোনই সঙ্গতি থাকিবে না। তখন একটা সন্দেহজনক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া পুলিশের হাতে ত যাইতে হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্দীপরা খানসামাদের কোমল-করস্পর্শিত কর্ণ বিমর্দ্দন অথবা গলাধাক্কা কাউণ্টার হিসাবে নির্ব্বিবাদে হজম করিতে হইবে! একেবারে পেরাল ও পরস্তার দুই!

হারাধন প্রস্তুত হইল। জুতা জোড়াকে রুমাল দিয়া একবার ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লইল, কোট ও পাৎলুনের খোঁচ-খাঁচগুলি টানিয়া টুনিয়া সমতল করিবার বৃথা চেষ্টা করিল এবং অবশেষে সার্টের কলারটা ঘাড়ের উপর উঁচু করিয়া তুলিয়া দিয়া অনাহারক্লিষ্ট মুখে শুষ্ক হাসি টানিবার অভিনয় করিতে করিতে সে একেবারে হোটেলের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এত সূক্ষ্ম চিন্তাপ্রসূত প্ল্যানটা কিন্তু হোটেলের প্রবেশ পথেই ফাঁসিয়া গেল। অর্থাৎ প্রবেশ পথেই নির্দ্দয় দারোয়ানের সশব্দ তাড়া খাইয়া হারাধন ছিট্‌কাইয়া আসিয়া আবার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল।

পৃথিবীতে যাহাদের আশা করিবার অধিকার আছে হতাশার বেদনা ভোগ করে তাহারাই। অবশ্য হারাধন এই দলের নহে। সংসারের ভাগ্যবান অপর পাঁচজনের জীবনের স্বচ্ছলতার মত দারিদ্র্যই তাহার পরিচিত পরিবেশের মধ্যে অতি সহজ ও স্বাভাবিক। এজন্য তাহার কোন নালিশও কাহারো কাছে নাই। সম্মুখস্থ জিতল-বাসিনী ধনাগৃহিণীর প্রতি দরিদ্রনীনা কুটীরবাসিনীর দৃষ্টির মতই নিজের দৈন্যে হারাধন নির্ব্বিকার; অবশ্য এই নির্ব্বীর্য্য নির্ব্বেদ তাহাকে অভ্যাস করিতে হইয়াছে ঠেকিয়া ঠেকিয়া। নিয়তির নিয়মে সংসারে যাহারা দরিদ্র তাহাদের বন্ধু নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, দেশ নাই, গৃহ নাই। এই সংসারটাকে যদি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহা হইলে নিঃস্বের দল সেই সংসার সমুদ্রে শৈবালের মত—অহরহ অবিরত স্রোতের টানে ভাসিয়া ডুবিয়া চলে। কোথাও ক্ষণেকের জন্য হয়ত আটকাইয়া থাকে কিন্তু শিকড় গাড়িতে পারে না। চোদ্দ বছর বয়সে নিরাশ্রয় হারাধন আজ তাহার চোব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত সময়ের স্রোতে কেবল ভাসিয়াই চলিয়াছে এবং চলার পথে সে অনেক দেখিয়াছে, অনেক শুনিয়াছে। তাই মান অপমান সে বড় একটা গায়ে মাখে না। পরমহংস মহাত্মাদের কাছে

যেমন কাচ ও কাঞ্চন, হারাধনের কাছেও তেমনি মান ও অপমান তুল্য মূল্য। সুতরাং হোটেলের দরোজা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া একান্ত সপ্রতিভভাবেই সোজা উত্তরদিকে চলিতে চলিতে হঠাৎ মোড় ঘুরিয়া সে বর্ত্মতলার পথ ধরিল।

খানিক দূর গিয়াই হারাধন দেখিল—একটা পানের দোকান। দোকানের সামনে একজন প্রৌঢ় গোছের সুবেশ ভদ্রলোক পানওয়ালীর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে সিগারেট ধরাইতেছেন। দোকানের দরোজার কাছে একটা সুদৃশ্য দামী ছড়ি। রাস্তার ওপারে একটা পাহারওয়ালা রেলিংএ হেলান দিয়া দণ্ডায়মান—বোধ হয় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার গুরু দায়িত্বের ভারে একেবারে কাৎ হইয়া পড়িতে পড়িতে কোনমতে খাড়া হইয়া আছে! হারাধন সুযোগটা ছাড়িল না। সে ভদ্রলোকটীর কাছাকাছি আসিয়া চট্ করিয়া ছড়িটা তুলিয়া লইয়া নিজের গতিবেগ একটু বাড়াইয়া দিল।

বিস্মিত ভদ্রলোকটি চীৎকার করিয়া ডাকিল—অ মশাই, শুনচেন। ছড়িগাছটা আমার। ডাক শুনিয়া হারাধন থামিল এবং বীরপাদক্ষেপে খানিকটা আগাইয়া আসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল—তাই নাকি? তা এক কাজ করুন না? ঐ ত পাহারওয়া দাঁড়িয়ে আছে। দিন না আমাকে ধরিয়ে চুরীর দায়ে।

ভদ্রলোকটী হারাধনের কথায় কেমন যেন একটু বিপন্ন বোধ করিল এবং খানিকটা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—হ্যাঁ, তা—না। দেখুন এটা যদি আপনারই হয়, তা আপনিই নিন। এই খানিকক্ষণ আগে একটা চায়ের দোকানে এটা আমি পেয়েচি। আমি ভুল ক'রে—

হারাধন মনে মনে হাসিল, কিন্তু মুখে গাম্ভীর্য্য যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া বলিল—চমৎকার ভুল ত আপনার!

বাঙ্গ প্রতিবাদ করিবার জন্য আর অপেক্ষা না করিয়া ছড়ির ভূতপূর্ব্ব মালিক বুদ্ধিমানের মত সরিয়া পড়িল। হারাধন ছড়ি হাতে আগাইয়া চলিল। জীবনে সফলতা লাভ করিবার সুযোগ খুব বেশী পাওয়া যায় না, অথচ এমন একটা অব্যর্থ চাল কেমন করিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল! কিন্তু দমিবার লক্ষণ তাহার দেখা গেল না। ছেলেবেলাকার একটা ইংরাজি কবিতার কথা মনে পড়িয়া গেল—ট্রাই, ট্রাই, ট্রাই এগেন।

চলিতে চলিতে হারাধন অকস্মাৎ একটা খাবারের দোকানের সামনে থামিয়া গেল। বৈদ্যুতিক আলোকোদ্ভাসিত কাঁচ বসানো আলমারীতে নানাবিধ মিষ্টান্ন স্তরে স্তরে সজ্জিত। মিষ্টান্নের মোহন মনোহর মধুর রূপে ও গন্ধে তাহার বিস্মৃতপ্রায় ক্ষুধা-বোধটা আবার অতিশয় উগ্র হইয়া উঠিল এবং সে একান্ত নিঃশঙ্কচিত্তে দোকানে প্রবেশ করিয়া খানদশেক লুচি, গোটা দুই সন্দেশ, দুইটা রাজভোগ ও একগ্লাস পানীয় জলের হুকুম করিয়া একটা টেবিলের সাম্‌নে চেয়ার টানিয়া বসিয়া শিস্ দিতে সুরু করিয়া দিল। পকেটে একটা পয়সাও নাই। সেই জন্য হারাধন চিন্তিত নহে। বরঞ্চ সে খুসীই। জমার অঙ্ক যাহার শূন্য, হিসাব করিয়া খরচ করিবার ভাবনা তাহার নয়। হারাধন পরম সন্তোষের সহিত পান ও ভোজন শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দোকানদার দাম চাহিয়া বসিল। হারাধনও প্রস্তুত ছিল, বলিল—পয়সা ত আমার কাছে নেই।

বিস্মিত দোকানদার প্রশ্ন করিল—মানে?

মানে? হারাধন হাসিয়া জবাব দিল—এর মানে আর কি বুঝিয়ে বলব বলুন। যদি বলতাম, ব্যাগশুদ্ধ পয়সাগুলো বাড়ীতে ফেলে এসেছি কিংবা গোটা ব্যাগটাই গাঁটকাটায় কবলে গেছে, তা'হলে প্রশ্নোত্তরের দরকার হ'ত। বিশ্বাস না হয় পকেটগুলো খুঁজে দেখতে পারেন।

কথা শেষ করিয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে হারাধন তাহার দুই হাত উপরে তুলিয়া ধরিল।

এই অদ্ভুত ধৃষ্টতায় বিক্রেতা অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিল—খাবার আগে বল্লেই পারতেন, পয়সা নেই।

অতি প্রশান্ত হাস্যে হারাধন বলিল—তাতে আর কি লাভ হ'ত বলুন। মাঝখান থেকে আমার খাওয়াটাই বন্ধ হ'ত।

দোকানদার এবার রোষার মত ফাটিয়া পড়িল এবং মুখ ভেংচাইয়া বলিল—খাওয়াটাই বন্ধ হ'ত। রসিকতা করবার আর জায়গা পান নি, না? হাস্‌তে লজ্জাও হয় না? জোচ্চোর কোথাকার।

হারাধন বলিল—যদি আমি জুচ্চুরি করেচি মনে

করেন তবে ওইত আপনার কোন রয়েচে। পুলিশ রেন্ত কোয়ার্টারে বল্লেই ত—

দোকানদার হারাধনের বক্তব্যটা শেষ করিতে দিল না, পুনরায় মুখ বিকৃতি করিয়া বলিল—বল্লেই ত পুলিশে ধরে নিয়ে যায় না? তোমার মত লোকারকে পুলিশে দিয়ে আমি আদালত আর ঘর করি। কি কল? অত কাঁচা ছেলে আমায় পাও নি। পুলিশের দাওয়াই আমরাও জানি। এই রেমো—বেটাকে ঘাড় ধরে বার করে দেত।

প্রভুভক্ত রামচন্দ্র হুকুম তামিল করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব বা দ্বিধা করিল না এবং স্বীয় শ্রীহস্তদ্বয় অর্দ্ধচন্দ্রের মধ্য দিয়া যে বিপুল গতিবেগ সে হারাধনের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত করিয়া দিল, ভাগ্যে তাহা ফুটপাতের গ্যাসপোস্টে ধাক্কা লাগিয়া প্রতিহত হইয়া থামিয়া গেল, নতুবা ধর্ম্মতলার খণ্ডিত আকাশের নীচে তাহাকে ভূমিশয্যাই গ্রহণ করিতে হইত। হারাধন কোনমতে টালটা সামলাইয়া লইল, কিন্তু আকস্মিক আঘাতের বেদনায় তাহাকে খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। তারপর আর কোনদিকে না চাহিয়া আবার চলা সুরু করিয়া দিল।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস বলিয়া একটা মহাজন বাণী আছে। যে অনামা ভদ্রলোকটী এই নিদারুণ অতি সত্যটী একদা আবিষ্কার করিয়াছিল, হারাধন চলিতে চলিতে সেই মহাজনকে স্মরণ করিয়া মনে মনে নিজের সশ্রদ্ধ প্রণতি না জানাইয়া পারিল না। তাহার মনটা দমিয়া গিয়াছিল, এই মহাজন বাণী যেন তাহাকে নবমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। জীবনের যে নিষ্করুণ অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন একটী পরম সত্যবোধ জাগ্রত হইতে পারে, সে নির্য্যাতনের তুচ্ছতম অংশও কল্পনা করিতে না পারিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। হারাধন ভাবিল, আজিকার এই ব্যর্থতা, এই লাঞ্ছনা সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতার কাছে কতই অকিঞ্চিৎকর অনন্তপ্রবহমান সীমাহীন মহাকালের কাছে ক্ষণতম মুহূর্ত্তের মত।

হারাধন দ্রুত পা চালাইয়া দিল। কলিকাতার জনবহুল রাজপথে দ্রুত চলিবার বিপদ অনেক। হারাধনও বিপদে পড়িল। তাহারই আগে আগে একটী তরুণী চলিতেছিল। ঘণ্টায় দশ মাইল হিসাবে চলার নেশায় হারাধন তাহার অগ্রবর্ত্তিনীকে প্রথমে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সে তরুণীকে যখন দেখিতে পাইল তখন একমাত্র হাত দিয়া ভদ্রমহিলার বরাঙ্গ স্পর্শ করিয়া ঠেলিয়া দেওয়া ছাড়া প্রত্যাসন্ন প্রবল সঙ্ঘর্ষ এড়াইবার আর কোন উপায়ই ছিল না। সে উপস্থিতবুদ্ধিমতই কাজ করিল এবং সম্মুখে দেখিল একজন লালপাগড়ী তাহার দিকে গম্ভীর মুখে চাহিয়া আছে। চকিতে হারাধনের চোখে আবার আশার আলো দেখা দিল। তরুণীর কাছে দস্তুরমাফিক ক্ষমা প্রার্থনার কথাই প্রথমে তাহার মনে আসিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে এই দুর্ব্বলতাটাকে সে সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া দিল এবং তরুণীর দিকে অগ্রসর হইয়া অতি অভদ্রের মত প্রশ্ন করিল—আহা, লাগে নি ত?

পরমাশ্চর্য্যের বিষয় তরুণীকে কিছুমাত্র রুষ্ট হইতে দেখা গেল না বরঞ্চ সে মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল—না। তার পরে কণ্ঠস্বরে রসিকতার মধু ঢালিয়া দিয়া তরুণীই আবার প্রশ্ন করিল—আপনার?

হারাধন কেমন যেন হইয়া গেল। ধাক্কা লাগিবার পর একান্ত স্বাভাবিকভাবেই যে কাণ্ডটা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহার জন্য সে অবশ্য প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু ভূমিকম্পও হইল না। অগ্ন্যুৎপাতেরও কোন লক্ষণ দেখা গেল না, আকাশ ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া মাথায়ও ভাঙ্গিয়া পড়িল না। বরঞ্চ তাহার দিকে একটা মদির মধুর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তরুণীই বলিল—আপনার?

হারাধন সুমুখে চাহিয়া দেখিল, পাহারাওয়ালা সাহেব চলিতে চলিতে গান ধরিয়াছে—আরে মেরে সেঁইয়া। সাহেবের আর অনর্থক দাঁড়াইয়া থাকিবার আবশ্যক নাই। কারণ অতীত কালের সুরসভাশোভিনী উর্ব্বশী মেনকা রম্ভার উত্তরাধিকারিণী যাহারা অধুনা নিশাচারিণী ও রাজপথ বিহারিণী, ভাগ্যক্রমে তাহাদেরই একজন এক্ষণে তাহার নবলব্ধা সঙ্গিনী। সে মনে মনে হাসিয়া জবাব দিল—লেগেচে বুকে।

তরুণী হাসিয়া বলিল—তা'হলে ত চিকিৎসার প্রয়োজন। —তারই আয়োজনেই ত বেরিয়েচ; হারাধন জবাব দিল। তারপর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর নীচ হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিল—এইটেরই এখন অভাব। পকেট একেবারে গড়ের মাঠ। ঠিকানাটা দিয়ে দাও, রোগী নিজেই গিয়ে হাজির হবে।

তরুণীর মুখের বর্ণান্তর দেখিবার জন্য হারাধন আর অপেক্ষা করিল না, সরিয়া পড়িল।

একটা প্রায়ান্ধকার গলি দিয়া হারাধন হাঁটিতেছে। ভাবনার তাহার শেষ নাই। মদ্যও তাহার মন্দ লাগিতেছে না। সে বোধ হয় আজিকার রাত্রির জন্য কলিকাতার পুলিশ কমিশনার বনিয়া গিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার অপরাধের সে ঊর্দ্ধে এবং পিনাল কোর্ডের কোন ধারাই তাহাকে আজ ধরিতে পারিতেছে না। যাহার যাহা ভাবনা, সিদ্ধিও তাহার সেইরূপ হয়—এই ধরণের একটা কথা আছে। কিন্তু কই তাহার বেলায় ত এই অতি প্রাচীন ঋষি বাক্যের অন্তর্নিহিত নীতিটুকু কোন কাজেই লাগিতেছে না? ভাবিতে ভাবিতে হারাধন আবার বড় রাস্তায় আসিয়া উঠিল। রাত্রি বাড়িয়া যাইতেছে, রাস্তায় লোক চলাচল কমিয়া আসিতেছে। এখন আর কিবা করা যায়।

কিছুই কি আর করিবার নাই? হারাধন উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। আচ্ছা, রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া রাজদ্রোহ প্রচার করিলে কেমন হয়? তারস্বরে চীৎকার করিতে সুরু করিলেই তাহার চারিদিকে ভিড় জমিয়া যাইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ও তৎসঙ্গে রাজপথে যান চলাচল বন্ধের দায়ে ধৃত হওয়া খুবই অসম্ভব নয়। কিন্তু দৃশ্যটা আবার হাস্যাস্পদ না হইয়া উঠে। কি অদ্ভুত ব্যাপারই না আজ ঘটিতেছে!—বিশ্বাস করিবার কথা নয়—একেবারে উপন্যাসের গল্পের মত। যাহা ঘটিবার নয় তাহাই ক্রমাগত ঘটিতেছে—একান্ত স্বাভাবিকভাবে অতি সহজে; যাহা অবিশ্বাস্য তাহাই সম্ভব হইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও সে ভাগ্যগুণে আইনের কবল হইতে হয়ত রক্ষা পাইয়া যাইতে পারে। মস্তিষ্কবিকৃতির অজুহাতে নিজেকে অপরের হাস্যাস্পদ করার মধ্যে কোন দণ্ডবিধির স্থান বোধ হয় নাই।

হারাধন চলিতে লাগিল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। কোথায় চলিয়াছে, আর কেনই বা সে চলিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেও হয়ত বলিতে পারিবে না। রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতেছে, জনবিরল রাজপথে শীতের তীব্রতা অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। বুক স্থানের শীতল বাতাস হইতে শীতার্ত্ত দেহটাকে বাঁচাইবার জন্যই বোধ হয় সে চলিতে চলিতে হঠাৎ বাঁ দিকের গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। গলিটার মুখেই একটা মন্দির, মন্দিরের দ্বার ঈষৎ খোলা—খোলা দ্বারের ফাঁকে মৃদু প্রদীপ শিখার ক্ষীণ আভা। দুয়ারের সামনে একটু রোয়াক। হারাধন ধীরে ধীরে রোয়াকটায় বসিয়া পড়িল। শ্রান্ত দেহে ও উত্তপ্ত মস্তিষ্কে যেন সে একেবারে ভাসিয়া পড়িয়াছে। দেহের ভিতরের শিরা উপশিরাগুলি শিথিল শ্লথ। এই খানিকক্ষণ আগের উন্মাদনা, উত্তেজনা যেন ধপ্ করিয়া নিভিয়া গিয়াছে—উন্মত্ত, উত্তাল রক্তে ক্লান্তির প্রশান্তি। হারাধন যেন একটা সুগভীর শ্রান্তির মধ্যে এলাইয়া পড়িতেছে। সে পিছনের দেওয়ালটার মাথা রাখিল।

বোধ হয় অনেকক্ষণই সে এই দেওয়ালে মাথা রাখিয়া পড়িয়াছিল। অকস্মাৎ সে উঠিয়া বসিল—যেন তন্দ্রা হইতে জাগিল। কানে একটা করুণ মধুর সুর ভাসিয়া আসিতেছে, বোধ হয় মন্দিরের ভিতর হইতে। হারাধন উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। সে এ পর্য্যন্ত জীবনে কখনো শ্রদ্ধা করিয়া কোন গান শোনে নাই। তথাপি হারাধন মুগ্ধ হইল—মোহিত হইল সেই সুর শুনিয়া। সে সুর এই নিশীথ রাত্রে একটি ক্ষীণ প্রদীপ শিখাকে বেড়িয়া বেড়িয়া বাহিরের অন্ধকারের বুকে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। সে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল—হে নিরাশ্রয়, তোমার আশ্রয় ভগবান। হে সর্ব্বহারা পথিক, তোমার দীনতা, কলুষ, হিংসা-দ্বেষ তুমি অতিক্রম কর—তুমি ভগবানের শরণ লও।

গানের মধ্যে বোধ হয় এই কয়টা কথাই আছে এবং এই কয়টি কথাই কেবল সুরের মূর্চ্ছনায় বারংবার ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, হারাধনের সমস্ত হৃদয়টা যেন গলিয়া গেল; মনে পড়িল মায়ের কথা, নিজ শৈশবের স্মৃতি, বাড়ীর ঠাকুর ঘরের ছবি, ঠাকুরের কাছে মায়ের পূজারিণী মূর্ত্তি। তাহার মা তাহাকে কতদিন বুকে জড়াইয়া, কাছে বসাইয়া ভগবানের কথা শুনাইয়াছেন, জীবনের সর্ব্বপ্রকার আঘাত অপমানের মধ্যে, সংসারের সর্ব্বপ্রকার বিরোধ-সংঘাতের মধ্যে, একমাত্র ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে, তিনি উপদেশ দিয়াছেন। একান্ত অকারণেই তাহার চক্ষু দুইটী অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল এবং কেমন যেন একটা অদ্ভুত মোহন মধুর আকর্ষণ সে মনে মনে অনুভব করিতে লাগিল।

হারাধন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঈষন্মুক্ত দুয়ারটা ধীরে ধীরে খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই—বাহির হইতে গম্ভীর কণ্ঠ শুনিল—কৌন হায় রে!

চমকিত হারাধন পিছনে চাহিয়া অন্ধকারের মধ্যেও দেখিল—পাহারাল্লা।

• • • •

পরের দিন সহরের দৈনিক প্রভাতী কাগজে নিম্নলিখিত একটি সংবাদ বাহির হইল—প্রায় মাসাধিককাল পূর্ব্বে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের শ্রীশ্রীবৃন্দাবন জীউর মন্দিরস্থিত বিগ্রহের বহুমূল্য অলঙ্কার অপহৃত হয়। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত সেই অপহৃত অলঙ্কার উদ্ধার করিতে পারে নাই। কল্য গভীর রাত্রিতে উক্ত মন্দিরের সম্মুখে একজনকে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া বিটের কনেষ্টবল তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

অমরাবতী

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

অমরার নিকেতন, চিরকালের চিরন্তনিয়ার স্বপ্ন—স্বর্গধাম কালুসের মত কোথায় মিলাইয়া গেছে? মানবের কামনারাজ্যের মহারাণী সেই দেবেন্দ্রাণীকে কোন্ রুক্ষ মরুবোধহীন কালরাক্ষস হরণ করিল? অপ্সরার নূপুরঝঙ্কারী কেমন করিয়া কোন্ অকাম্য-রণে ব্রত হইয়া গেল? সন্ধ্যাকন্যা আপন ফুলগৌরব ভুলিয়া ফুলসাজে জ্যোৎস্নালোককে মধুর করিয়া আর তো কোনও মানব কি দেবকে ভাগ্যবান্ করিতে অভিসার রচনা করে না। রাক্ষসের এত সৌরাত্ম্য—যুগে যুগে স্বর্গ যাকে জয় করিয়াছে, কোন্ অতলে গাঢ় হইয়া গেল? স্বর্গ কোথায় গেল?

অতীতের বার্ত্তা গোপনে অলক্ষ্যলোকে জানাইয়া গেছে—স্বর্গ যায় নাই, স্বর্গ ধ্বংস হয় নাই, হইতে পারে না—স্বর্গকে মানব জয় করিয়া লইয়াছে। বিদেহী পিতৃপুরুষের ভৌতিক স্বর্গধাম নহে, মহাজ্যোতিষ্কের মাঝে কল্পনার অমর সুখধাম নহে, কনকমেরুশিখরে যেখানে ছিল পারিজাত বন, ছিল উর্ব্বশীনূপুরমুক্ত সুরেন্দ্র-সভা, যে দেশে আনন্দ ছিল শুধু, যে নগরীর তোরণদ্বার মন্দাকিনীজলপূত, সেই সৌরাণিক স্বর্গ মানব অতীতে এক মাহেন্দ্রক্ষণে জয় করিয়া লইয়াছে। মানবের প্রতি জন্মলগ্নে প্রতি কীর্ত্তিকলাপে যে দেবতারা স্বর্গবিমান হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতেন, প্রতি কাব্যে মহাকাব্যে নাটকে ও পুরাণ কথায় যে দেবাশীর্ব্বাদ-বৃষ্টি সাহিত্যের মরুদ্যান মুকুরিত করিত, সৌরাণিক ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রণয় গগনে যে স্বর্গ বিমানমুক্ত বিদ্যুদ্গতিতে বিলাস করিত, মানবকন্যার স্বয়ম্বরে যাঁরা মোহন চাতুর্য্যের অভিনয় করিয়া কাব্যধারা উজ্জ্বলিত করিয়াছেন, যাঁরা অক্ষিপ্ত মানবের বিজয় অশ্ব হরণ করিয়া স্বর্গের পরিচয় দিয়াছেন—আবার মানবশ্রেষ্ঠকে ইন্দ্রত্বে বরণ করিয়া গুণগ্রাহিতায় মহিমান্বিত হইয়াছেন, যাঁরা মহর্ষির তপোবন ক্ষুব্ধ করিতেন অপ্সরার ভ্রূভঙ্গিমায়, ক্রুদ্ধ মহর্ষির অভিশাপ গ্রহণ করিয়াও যাঁরা তপোবনের শুষ্ক বল্লরীকে ফলভারে সমৃদ্ধ করিতেন, পুরাণ-কথা স্বর্গীয়তত্ত্ব আলোচনার পথে অকস্মাৎ যে আলাপ ভক্তহৃদয়ের আবাসে মূক কাব্যবিকাশে অমর্ত্যিকতার পরিচয় দান করে—স্বর্গকে ক্ষেত্র করিয়া সে সব কাহিনী, সেই কনকমেরু-মহিমা মহাকালের ক্ষুব্ধপটে সৌরব-লিপি অঙ্কিত করিয়া পুঞ্জে মিলাইতে পারে না। মানব সেই কনকমেরু শিখর জয় করিয়াছে। সৌরাণিক স্বর্গরাজ্য আজ মানবের ইতিহাসে এক স্বর্গময় অধ্যায়।

কনকমেরুর সর্ব্বোচ্চ শিখরে ছিল ধনদ রাক্ষসের অলকাপুরী ব্রহ্মলোক। মহাকবি কালিদাসের অতুলনীয় উপমায় পৃথিবীর মানবস্তরে যে মধ্যপুরীর হিমাচল, সৌরাণিক কনকমেরুর সেই হিমাচল-কটীর এবং হৃদয় সেই হিমাচলশৃঙ্গ। সেই হিমাচলশৃঙ্গেই অযোধ্যম দুরারোহ তীর্থে স্বর্গের স্বর্গধামের শেষ সোপান। হিমাচলের পরস্পরাগত শৃঙ্গমালায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি আটজনের জন্য যে বিভিন্ন পুরী, তাহারই সমষ্টি লইয়া অমরাবতী। সেই হিমাচলেই—পশ্চিমে স্বর্ণময় যাহার যেখানে পর্ব্বতশ্রেণী সাগরে মিশিয়াছে, পূর্ব্বে মলয় উদয়াচল যেখানেও সাগর পর্ব্বতশ্রেণীকে গ্রাস করিয়াছে, উত্তরে হৃদয়ে ও ক্রমাগত কনকমেরু, মন্দর, মলয় ও শ্রীকণ্ঠ পর্ব্বত ও অন্যান্য শৃঙ্গমালা এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য ও সহ্যমালয়, এই শিলাময় নিকেতনে দেবমানব স্থপতিরা আপন আপন আভিজাত্য রচনা করিয়াছিলেন। সৌরাণিক বেরুনিকার পঞ্চমমেরিকাণ সোজা অলঙ্কারহীন করিলে, কনকমেরু ও হৃদয়ের স্থান বর্ত্তমান পামীর সহিত সমগ্র হিমালয় অঞ্চল বলিয়াই অনুমান হয়। বর্ত্তমান কাশ্মীর ছিল রাক্ষস, কি গন্ধর্ব্ব পুরী। পাঞ্জাব প্রদেশের বর্ত্তমান জলন্ধর সৌরাণিক জলন্ধর পুরীর নাম বহন করিতেছে। মানব জলন্ধর স্বর্গ জয় করিয়া হিমাচল চূড়া বিজিত করিয়া যখন মহাদেব শঙ্করের নগরীর তোরণ-দ্বার হরাকম্পিত করিল, তখনই শঙ্করীর্ষো তাহার হরার চিরন্তন হইয়া গেল। পুরাণগাত্র যজ্ঞযজ্ঞের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন—কনখল। আজও আছে সেই হিমাচল,সেই মানস ও বিন্দু সরোবর, নাই পারিজাত বন বৈজয়ন্ত কি চৈত্ররথ, নাই সুধা কি অমরকাহিনী। বর্ত্তমানের কেদার, বদরী ও

অবশ্যই বিশ্বপুরাণে। শতরাষ্ট্রগুলির সহিত অপরিচিত বলিয়া মনে হয় না। হিমাচলের প্রতি অবাধিকৃত তুষারঠীর্থে স্বর্গ-আরিহাত্যের কত স্মৃতি লুপ্ত রহিয়াছে। স্বর্গবতীর অবরোহিকা পর্বতমালার মধ্যপথে কোথাও ইহার স্বীয় পরিচয় এখনও রহিয়াছে। আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই সংজ্ঞার অতীত প্রাগৈতিহাসিক সমগ্র মানব জাতিকে বিশ্ব করিয়া আর্য্য সংস্কৃতির বিজয় অভিযানে বর্ত্তমান আমরা যখন গৌরব বোধ করি, তখন মানব-সভ্যতার এক বিশাল অধ্যায় পার্শ্বে রহিয়া যায়, দেবতাদের সংগ্রামকে আরব্যরজনী ও গল্পসহরীর কাহিনীর মত আমরা পাঠ করিয়া যাই বিনা প্রশ্নে ও কৌতূহলে।

এই হিমাচলেই কল্পপুত্রেরা স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সারা পৃথিবীকে তাঁহারা বিজয়ধর্ম্মে ভোগ করিয়া আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইলেন। সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অমৃত উঠিল, সারা সমুদ্রাকল জল করিয়া যে মধু সঞ্চয় হইল, সদাগরা পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য দোহন করিয়া যে শক্তিলাভ হইল, আপনাদেরই বৈমাতৃক ভ্রাতা মানবদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া কেবল রাজনীতির প্রথম সূত্র আত্মীয়বিদ্বেষের রচনা করিলেন। যজ্ঞেরও সমুদ্র মোহন করিল। যজ্ঞেরও ঐশ্বর্য্যবান্ হইল। মানবের তাই যজ্ঞের ঐশ্বর্য্যসম্ভারে ঈর্ষান্বিত হইয়া সমুদ্রাকলের যজ্ঞভাগ হরণ করিয়া লইল। কেবল সমস্ত সমুদ্ররাজ্যকে সপ্ত পাতালে ভাগ করিয়া যজ্ঞকে তাহাদের অধিপতি করিলেন। ইন্দ্র হইলেন তাঁহারও উপরে। ইন্দ্র ও যজ্ঞ রাজ উপাধি মাত্র। পাতাল রাজ্য জনশূন্য ছিল না। পাতালবাসীদের নাম হইল নাগ। সেই বিশাল নাগরাজ্য লইয়া চিরকাল দেবমানব, যজ্ঞ ও ইন্দ্রে বিবাদ ও সংগ্রাম। গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের ইতিহাস এখনই তো সংগ্রামমুখর, অন্ত পৌরাণিক ভারতের দেবমানব যাগযজ্ঞে যেখানে পরস্পরের ঐশ্বর্য্য-গরিমা ক্রয়:পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছে, যেখানে দেবমানব দ্বিতের ক্রমশ: রাজনীতি তুলিয়া জাতি দ্বিষেরই অবলম্বন করিয়াছে, সেখানে যে সব মানবসভ্যতার জন্ম হইয়াছে, সেই পৌরাণিক কথায় আমরা কতটুকু মূল্য দিয়েছি।

অমরাবতীর আটটি পুরীতে আটটি পুরসভা। ব্রহ্মসভা, বিষ্ণুসভা ইত্যাদি নামে সভাগুলির পরিচয় এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি ইঁহারাই আপনাদের পরিচিত সভাগুলির অধিনায়ক বা সভাপতি। ইন্দ্রসভায় সভাপতি দেবরাজের মানবক-মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। সেখানে রাজনীতি আলোচিত হইত, কাব্য নাটকও সম্মানিত হইত, বীণাবাদ্যের অনুরণন রহিত না। সারা পৃথিবী হইতে করগ্রহণের প্রয়োজন ছিল না—সে চিন্তাও ছিল না, কারণ স্বর্গরাজ্যে ঐশ্বর্য্যসম্ভারের কোনও অভাব তো ছিল না। শুধু যজ্ঞভাগ গ্রহণেই অধিকার স্বীকৃত হইত। প্রতি যজ্ঞে অমরাবতীর আটটি সভাপতির জন্যই যজ্ঞভাগ রাখিতে হইত। এ এক আশ্চর্য্য বিধি।

পৌরাণিক যজ্ঞ শুধু হোমযজ্ঞ নহে—শুধু সোমযাগ নহে, শুধু বৈতানিকী নহে। যজ্ঞিয় পশুবীর্য্যের জন্যই যজ্ঞ আহূত হইত সত্য, কিন্তু সে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পাইতেন সারা ভারত—নিখিল মানব যজ্ঞ সম্বর্দ্ধ ও দেবতা। দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞভাগ পাইতেন বলিয়া মানবের চিরকালের আপত্তি, তাই তাঁহারা কোনও দিন আহ্বান পান নাই। তাই প্রতিবাদে ও হিংসায় তাঁহারা যজ্ঞে যজ্ঞে যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছেন। তাই মানবের সৌজন্য হইতে যজ্ঞ পাইবার নিমিত্ত নিখিলজন—আমন্ত্রণ। বৈদিযারণ্যে শুধু শাস্ত্রবিতর্কতরে যজ্ঞ আহরণ হইত না—যজ্ঞকে আহরণ করা এই কথারও সার্থকতা যে তাহা হইলে থাকিত না। প্রতি যজ্ঞে যজ্ঞ ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত হইত। নিখিলজনের সেই শ্রদ্ধার দানে উপাকরণের শক্তি ও বল রক্ষিত হইত, উপাকরণের যজ্ঞ অধিবাসীকে এইভাবে কণ্ঠে সংঘাত রক্ষীবাহিনী রাখিতে সাহায্য করা হইত। উপাকরণ ফলের পরিচয় পুরাণে কথার অভাব নাই। যজ্ঞভাগই ব্রহ্মসত্ত্ব, বিষ্ণুসত্ত্ব প্রভৃতির সংরক্ষণ হইত। সেই যজ্ঞভাগ গ্রহণেই ইন্দ্রের এত ঘনীভূত প্রকাশ সম্ভব। অশ্বমেধ রাজসূয় যজ্ঞবিধানে রাজাদের যেমন সম্রাটবিধানকল্প প্রতিষ্ঠিত হইত, যেমন শত অশ্বমেধে মানবরাজের দেবরাজত্ব লক্ষিত হইত, তেমনি ব্রহ্মযজ্ঞে উপাকরণ শক্তি সমৃদ্ধ হইত। সমৃদ্ধ উপাকরণ শক্তি ইন্দ্রসভাকে বড় মানিত না, কিন্তু ব্রহ্মসভা কি বিষ্ণুসভা প্রভৃতিকে শ্রদ্ধা করিত। তাই শক্তিমান্ ক্ষত্রিয়কে বারে বারে স্বর্গ প্রভৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অপূর্ব্ব সেই পৌরাণিক সভ্যতার বিধান, একদিকে রাজনীতির উপরে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে ধর্ম্মফলের উপরে ধর্ম্মাধিবাসকল্প। একদিকে ইন্দ্রসভার অধীনে সসাগরা পৃথিবীর শাসন ও ত্রাণ ভার, অন্যদিকে ব্রহ্মসভার অধীনে ও উপদেশে চালিত ইন্দ্রসভা। উপাকরণের ভারত সেই ব্রহ্মসভা বিষ্ণুসভা ও অন্যের-সভাকেই অক্ষয়ের শ্রদ্ধা দান করিয়াছিল। ভোগনিকেতন ইন্দ্রধাম মানবের আকাঙ্ক্ষিত নহে। যেমন পুরুষার রাজধানী ও বৈদিযারণ্যে ছিলেন ও বৈশ্য, তেমনি ইন্দ্রসভা ও ব্রহ্মসভা। বৈদিযারণ্যের স্বর্গ-গরিমায় পুরুষ প্রসূত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার মহারাজ সৌরকে মহর্ষিমণ্ডিত বৈদিযারণ্য বর্দ্ধিত করিয়াছিল। ক্ষত্রশক্তি পৃথিবীর রক্ষণ করিত, কিন্তু ব্রহ্মশক্তি তাহার ভরণ করিত। তাই ক্ষত্রশক্তি ও ব্রহ্মশক্তি উভয়ের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল। তাই স্বর্গেও ইন্দ্র-সভা ও ব্রহ্মসভা।

অযোধ্যা হইতে ইন্দ্রপুরী পর্য্যন্ত সমুদ্রগুপ্তের রথ চালনা করিয়াছিলেন। সেদিন ইন্দ্রসভার অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন 'অর্ব্বা' মানব। মর্ত্য হইতে স্বর্গ বেশী দূর নয়, তাই এ ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মসভা কি বিষ্ণুসভা? স্বর্গের আটটি সভাতেই মানব সভ্য অন্যের দিব্যপুরুষেরা সভ্য হইতেন। ইন্দ্রসভায় দিব্য মানব সভ্য হইয়াছেন—ইন্দ্রসভার অধিনায়কত্বও মানব করিয়াছে। ব্রহ্মসভায় দিব্য মানবেরা দেবগন্ধর্বের সহিত সভ্য হইয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্ম-সভার অধিনায়কত্ব? এখনও মীমাংসায় উপনীত হই নাই, কিন্তু জনক-কন্যার রাজর্ষির নাম ব্রহ্ম সভার পূর্ব্বে দেখিয়াছি। ইহা প্রমাণিত হইলে, ব্রহ্মসভা পর্য্যন্ত 'অর্ব্বা'র আয়ত্তাধীন ইহাই সিদ্ধ হইবে।

এখন এক উঠিতে পারে ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর—ইঁহারা কি সত্য দেবী ও মানবজাতি? যে শক্তির ব্রহ্মসভার পতি, তিনি তো মানবেরই জাতি।

প্রথম ব্রহ্মা ও বিষ্ণুও তাহাই। যেমন ঐশ্বর্য ও বীর্যশক্তির পরিচয়ে ব্যক্তিবিশেষের ইন্দ্রত্ব, তেমনই সাধনশক্তিও শিবত্বের পরিচয়ে ব্যক্তিবিশেষের ব্রহ্মত্ব ও বিষ্ণুত্ব বা শঙ্করত্ব। দক্ষরাজা যজ্ঞ করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধীনে একাদশ অবয়বপ্রাপ্ত যজ্ঞ হস্তে পিনাকপাণি রহিয়াছে, শঙ্করকে রুদ্রত্ব পরিচয়ে বিশেষ আমন্ত্রণ পাঠাইবার কারণ তাঁহার নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের এই অপূর্ব ইঙ্গিতে অনেকেরই খুশী হইবার কারণ থাকিবে না, কিন্তু পৌরাণিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব আলোকসম্পাৎ হইবে। কৈলাসে, শ্রীকণ্ঠে ও মন্দরে একই সময়ে শঙ্কর পার্বতী বিহার করিতেছেন, এই পৌরাণিক উক্তিতে ইহাই কি প্রমাণ হয় না যে পরবর্তী পৌরাণিক যুগে শঙ্কর পার্বতীর পাষাণী প্রতিমা ভক্তিতে প্রাণময়ী হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছে। তাই তো লিঙ্গপুরাণের মাহাত্ম্য। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অন্যান্য সুরসভায় এবং গন্ধর্বপুরেও সেই লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠার মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। তাই ব্রহ্মা বিষ্ণু কি শঙ্কর অনন্ত পরমাত্মা নহেন। প্রথম ব্রহ্মা, প্রথম বিষ্ণু ও প্রথম শঙ্করের মাধ্যমুলারে ব্রহ্মসভা বিষ্ণুসভা ও শঙ্করসভার অধিনায়কের পরিচয় হইয়াছে। ইহার আরও সূক্ষ্ম প্রমাণ আছে। অসংখ্য মানব বিশ্ব জয় করিয়া স্বর্গের সকল সুরসভা জয় করিয়া শঙ্কর শক্তিকে বীর্যে আহ্বানে করিলেন, মানবজাতিকে জানাইলেন—'শঙ্করকে জয় করিতে পারিলেই, তোমাদের ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব, শিবত্ব সকলই দান করিতে সক্ষম হইবে।' ইহার অর্থ এই যে শঙ্করকে পরাজিত করিতে পারিলেই স্বর্গকে সম্পূর্ণরূপে বিজিত করা যাইবে এবং ব্রহ্মসভা বিষ্ণুসভা শিবসভা প্রভৃতির অধিনায়কত্ব লাভ সম্ভব হইবে।

...উপরে মহাকাশে জ্যোতির্ময়ী অনন্তবাহিনী অলকানন্দা। সেই স্বর্গীয় ধারায় সৃষ্টি স্নান করিতেছে কল্পকল্পান্তে। তাহা হইতে নিম্নে বিশ্বে প্রাণধারা বহিতেছে—তাহাই অমৃত, তাহাই সোম। মহাযোগী ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর ও সিদ্ধগণ সেই অনন্ত সোমধারা লাভের জন্য যাচ্ঞা করেন। উপরে অনন্ত বিশ্বের রাজা কাহারা মহাযজ্ঞ করিয়া এই মহাসোম বিতরণ করিতেছেন! সেই পৌরাণিক সভ্যতার দিনে মানব সেই বিশ্বের কল্পকল্পের শিবরের স্বর্গধারা তুচ্ছ করিয়া হিমাচলের ত্রিযুগতীর্থে মহাস্বর্গ মহাসুখ কামনায় সাধনা করিয়া চলিয়াছিল। তাহাদের সেই সাধনায় মানব ক্রমশঃ বিবিধ ভাবসাধ লাভ করিয়াছে। দেবদানব যক্ষরক্ষ গন্ধর্ব ও মানবের পরস্পরে ক্রমসংমিশ্রণে যে বিশাল সভ্যতা গড়িয়া উঠিল, তাহাতে কল্পকল্পের মহিমা 'স্বর্গ' হইতে 'স্বর্গে' নামিয়া আসিল, হিমাচল নিষিদ্ধ রহিল না কোনও জাতির নিকট, 'স্বর্গ' আর দুরত্বলাভ পাইল না পূর্বের ন্যায়। মহাভারতের দিনে ক্ষীণ স্বর্গ মহিমা পুপ্ত হইয়া গেল নব মহামানব জন্মে। একই পুরুষে ভোগ ত্যাগ প্রেম বিলাস ও বিরাগের চরমতাসাধন, একত্র সর্বগুণসমবয়, নব ভারতের জন্মলগ্ন সূচনা করিয়া সেই বিরাট মহামানব পরিচয়, ধরার মাটির ধূলা মাড়াইয়া দিল, ত্রিযুগতীর্থের সাধনমার্গ মাটীর ধূলিকণার কাছে স্বীকার করিল, নূতন স্বর্গ রচনা হইল ধরার ধূলিকণায়।

অযোধ্যাপুরী স্নান হইয়া গেছে বহুদিন, কিন্তু মহাকালের হৃদয়স্পর্শে যে স্নান স্বর্গ লুকাইয়া আছে তাহার কামনা চিরমানবের অন্তরস্পর্শী।

লাখো বছরের ইতিহাসে তুমি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নির্বাক ছায়া-চিত্রের যেন প্রেমের নাট্যখানি
আধো ঘুম আর আধো জাগরণে, রচনা করেছ রাণি!
যে ঘর গোপন গুহাতে ঘুমায় তাহারে জাগায়ে দেবে
প্রত্যাবর্তন গাহিলে যে গীতি এসে ধীরে ধীরে হেসে।
অভিনব সুর তোমাতে আমাতে—বলো—সে কি অভিনয়!
জয় পরাজয়ে পরিচয় আর প্রীতিবাধা বিলয়।
সেই কবেকার আলাপন লয়ে বোলা দিল অন্তরে,—
আলিঙ্গনের গূঢ় চাহনি নৈশ ভোজের পরে।

দশমীর চাঁদ যথা গগনে শুভ্রা তিথির মাঝে,
একটু উষ্মা উসলিয়া উঠি মিলালো ধরার কাছে।
কবিতার মত হেরিনু তোমারে লীলাচঞ্চল ভঙ্গী,
অঞ্জনদীর মোহানা হারায়ে তুমি মোরে দিলে বরা।
ঘরের সীমায় পরালে আমারে কণ্ঠে বাহুর মালা,
বাহিরে আকাশ তারকায় চাকা, ভিতরে প্রদীপ আলা,
দূরের রাত্রি-স্মৃতি বিজড়িত তোমার কুটীর দ্বারে,
যবে ফিরেছিনু আবেশে আবেশে সন্ধ্যা অভিসারে।

মনে হয় যেন তোমারে দেখেছি আদিম উষার ক্ষণে,
আনমনা তুমি বেণীতে লতিকা জড়ায়ে সন্তোপনে
দূরপানে চেয়ে অরণ্য পথে ছিলে ভাবে বিহ্বল,
প্রথম কাব্য-ছন্দের বোলে চঞ্চল অবিচল।

বহু যুগে কোন্ তমসা নদীর উতলা উদাস কূলে,
পর্ণকুটীর প্রথম কবির হৃদয় উঠিল দুলে।

লাখো বছরের ইতিহাসে তুমি অশ্রু হাসির রেখা,
যুগে যুগে মোরে নব নব রূপে মায়ালোকে দিলে দেখা।
সভ্যতা চলে প্রগতির পথে, তুমিও প্রগতিময়ী,
আদিম চেতনা কামনা তোমারে তথাপি ক'রেছে জয়ী।

বাসনার বাতি জ্বলিছে তেমনি যৌবন শিখা ধরি
তোমারে পাওয়ার বাসনায় মন গানে ওঠে গুঞ্জরি।
তুমি আছ তাই সব সুন্দর জীবনের উদ্যানে,
চলে গেলে কভু জানিবে কি চাঁদ অনন্ত লীলাকাশে!

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

১৭

আহারাদির পরে অমল কি একটা পড়িতে পড়িতে গৌরীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। গৌরী মাতার জলযোগের বন্দোবস্ত করিতেছে—

গৌরী ঘরে ফিরিয়া আসিল খোকার দুধ লইয়া। খোকাকে তুলিতে যাইবে এমন সময় অমল বলিল—দাঁড়াও ও উঠ্‌লে খাওয়াবে। সে অঙ্কগুলো হয়েছে তোমার? এবার পরীক্ষা তোমায় দিতেই হবে···

গৌরী অনাহিকে একটু হাসিয়া কহিল—তাই, এবার দিতেই হবে। কিন্তু অঙ্ক যে সব ভুল—

—ভুল? কখনই না, চেষ্টা করেছিলে।

—হুঁ।

অমল বই বাহির করিয়া নিবিষ্টমনে কি যেন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল—এত সোজা ফ্যাক্টর। এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনস বি ফরমুলার—এই ছাখো—

গৌরী মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে অমলের মুখের পানে চাহিয়া আছে—খাতার সাদা পৃষ্ঠায় কি লেখা হইতেছে সেদিকে তাহার মন ও চোখের কোনটাই নাই।

অমল আগ্রহে বুঝাইতেছে—এই ছাখো, টোয়াইস এক্সকে যদি এ ধরি, তবে—

গৌরী অমলের রুক্ষ চুলগুলির ভিতরে আঙুল পুরিয়া দিয়া কহিল—এঃ, তোমার ত চুল পেকে গেছে, এই যে পাকা চুল—

অমল ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—রাখো এখন পাকা চুল, এ ফ্যাক্টরটা বুঝলে?

গৌরী গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়া কহিল—কিছুই বুঝিনি!

—যা বলেছি, শুনেছ—

—কানে ত তুলো দিয়ে নেই যে শুনবো না—

—তবে, বুঝলে না কেন?

—বা রে! তুমি বুঝোতে পারলে না, তার আমি কি ক'রবো—

গৌরী হাসিতেছে দেখিয়া অমল ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—এত ছেলেকে বুঝোতে পারলুম আর তোমাকে পারলুম না?

—ঐ রকমই বুঝিয়েছ—নিজে না পেরে শেষে কেবল ধমক আর বকুনি—গৌরী এইবার হাসিয়া ফেলিল!

অমল খাতার উপর পেন্সিল রাখিয়া একান্ত হতাশায় চুপ করিয়া গেল। গৌরী বুঝিল, অমল সত্যই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে তাই কহিল—ও অঙ্ক এখন হবে না—ইতিহাস পড়ি, কেমন?

অমল উৎসাহিত হইয়া বলিল—পড়, আচ্ছা কাল যা শিখেছ ব'ল ত—বল কলম্বস কে?

গৌরী গম্ভীরভাবে ক্ষণিক চিন্তা করিয়া কহিল—মহম্মদ তোগলকের বেরাই—

অমল রাগে ক্ষোভে বই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—যাও, তোমার কিছু হবে না। আমি আর কিছু বলব না, তোমার যা ইচ্ছে হয় কর—

গৌরী পিছন ফিরিয়া কেবল হাসিতেছে, অমল ক্রোধে গম্ভীর মুখখানা মলিন করিয়া বসিয়া আছে। গৌরী আড়চোখে চাহিয়া চাহিয়া অমলের ক্রোধ উপভোগ করিতেছিল। বইখানা কুড়াইয়া লইয়া কহিল—ইস্ আমার বইখানা ছিঁড়ে দিলে ত? মার কাছে বলে দেব—উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সম্ভবতঃ একটু করুণা বোধ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল—আচ্ছা, তুমি রাগ ক'রলে?

—না রাগ ক'রবে না। এতে রাগ হয় না কার?

—আচ্ছা, কলম্বসের মেয়ের সঙ্গে তোগলকের ছেলের বিয়ে কি কিছুতেই হতে পারে না?

অমল চুপ করিয়া রহিল—

গৌরী কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখখানা বিরস করিয়া বলিল, —আচ্ছা এমনও ত হতে পারে যে, গোপনে বিয়ে হ'য়েছিল, গন্ধর্ব্ব মতে। ওই ইতিহাস যাঁর লেখা, তিনি জানেন না।

অমলের ক্রোধ উবিয়া গিয়াছিল, সে বলিল—তোমার লেখাপড়া হবে না!

—লেখাপড়া আমার দরকার নেই।

—দরকার নেই ? বল কি ? এই বিরাট পৃথিবীতে কত কি আছে, সভ্যতার কি উন্নতি হ'ল, এ সমস্ত জানবারও কি ইচ্ছে হয় না তোমার ?

—তুমি জানো, ওই ত আমার হ'ল। ধোপার খাতা লিখ্‌তে পারি, চিঠি লিখ্‌তে পারি, বাজার খরচ ও দুধের হিসাব রাখতে পারি, আবার কত পড়বো ?

—হাঁা—বিদ্যে একেবারে গজ্‌ গজ্‌ করছে, আর কি জান্‌বে ? ছেলেমেয়ে কি ক'রে মানুষ ক'রতে হয়, সে সব না জান্‌লে তারা ত মারা যাবে—

—তুমি ত এত পড়েছ, সে সব জানো ?

—জানি বৈ কি ?

—তবেই ত আমার জানা হ'ল, তুমি যেমনটি বলে দেবে, আমি ঠিক তেমনটি ক'রবো, তা হ'লেই ত হবে।

—আর আমি ম'রে গেলে—তখন ?

গৌরী চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ছিঃ, তুমি অমন কথা ব'ললে—যাও তোমার সঙ্গে আর আমার কথা বলার দরকার নেই, খুব হ'য়েছে—হাসি ঠাট্টার মধ্যে—

গৌরী একেবারে মর্মাহত হইয়াছে এমনি অভিমান-ক্ষীত মুখ লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। অমল তাহার হাত-খানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—ওটা কথার কথা, আচ্ছা ব'সো, একটা মজার কথা বলি শোনো—খুব মজার কথা—

গৌরী অত্যন্ত গম্ভীরভাবে চেয়ারটায় বসিলে সে বলিল—আচ্ছা এমন দেশ আছে জানো, মানুষে মানুষ খায়, মানুষের মাংস খেতে ভালবাসে—

—ও সব গাল-গল্প, আমি বিশ্বাস করিনে। তোমার যত সব আজগুবি কথা !

—বিশ্বাস কর আর নাই কর, আছে। এ জান্‌তে তোমার কৌতূহল হয় না।

—খুব।

—তবে না পড়লে জান্‌বে কি ক'রে ?

—তুমি গল্প কর, আমি শুনি, তা হলেই হবে। খোকা যে বিরক্ত করে, পড়বো কখন ?

অমল পরাজিত হইয়া বিষয়ান্তরে মন-সংযোগ করিল—আচ্ছা এমন দেশ আছে জানো, যেখানে বিয়ে নেই ; মেয়ে পুরুষ সব স্বেচ্ছাচারী।

গৌরী তাহার ডাগর চোখ দুইটি মেলিয়া ধরিয়া বলিল—ও তুমি সেই দেশে যাবে বুঝি ? সেই জন্যেই এই সব খুঁজে খুঁজে বের ক'রছো—

অমল হাসিয়া কহিল—সেই তোমার উচিত শাস্তি, আমাকে তুমি অবহেলা কর। হিন্দুর যদি তালাক দেওয়া থাকতো, তবে তোমাকে এমন জব্দ ক'রতুম—

গৌরী হাসিয়া কহিল—আবার বিয়ে করতে ?

—ক'রতুম বৈ কি।

—কাকে ? অপর্ণাকে না ?

অমল চমকাইয়া উঠিল। বিবাহের পরে এই সাত বৎসরের মাঝে এই প্রথম গৌরীর মুখে অপর্ণার নাম সে শুনিল। মনের কোণে অপর্ণা আজ মৃত নয়, তাই গৌরীর মাঝে সে অপর্ণার সম্পূর্ণতাকে চাহিয়া চাহিয়া নিরাশ হয়। অমল জবাব দিল না, অত্যন্ত কাতর দৃষ্টিতে সে গৌরীর পানে চাহিয়া রহিল। গৌরী বুঝিল না তাই বলিল—অপর্ণার মত লেখাপড়া কি আমি শিখতে পারি ? শুধু শুধু পরিশ্রম কর কেন ?

অমল নিঃশব্দে উঠিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। একটি কথায় সমস্ত আলোচনা সে বন্ধ করিয়া দিল—আমার ভুল হ'য়েছে ক্ষমা ক'রো—

শাশুড়ী, স্বামী, ঠাকুর, গণ্ডাখানেক চাকর, একজোড়া কি, দারোয়ান, টেলিফোন, মোটর, রেডিও, লাইব্রেরী, প্রচুর মাসিক পত্রিকা—এই লইয়া অপর্ণার সংসার। একটি সন্তান তাহার হইয়াছিল কিন্তু চারদিন মাত্র জীবিত থাকিয়াই মারা গিয়াছে। কাজ-কর্ম্ম নাই, প্রচুর অর্থ, অলস সময় কখনও গান করিয়া কখনও বই পড়িয়া সে অতিবাহিত করে। কখনও দোতলার কুলবারান্দায় বসিয়া বই পড়ে, নীচের ফুল বাগান হইতে মাঝে মাঝে একটা মৃদু সৌরভ ভাসিয়া আসে। বাগানের পার্শ্বেই একটা প্রাচীর, তারপর একটা একতলা ছোটো বস্তী। কয়েক হাত প্রশস্ত একটা বাঁধানো উঠান, টালির চালার রান্নাঘর। এখানে একটী বধূ আর তাহার দরিদ্র স্বামী বাস করে। উহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা এবং উপভোগ করা তাহার একটা কাজ।

বেলা এগারটা। অজিত কোর্টে গিয়াছে। অপর্ণা ইজিচেয়ারে শুইয়া, বুকের উপরে একখানা ইংরাজি

উপন্যাস খুলিয়া, অদূরে ঐ বধূটির কাজ অনিচ্ছাকৃত ভাবেই দেখিতেছিল। সে ভাবিতেছিল—তাহার জীবন ওই দম্পতির নিবিড়তায় ভরিয়া উঠে না কেন? এই সাত বৎসরে তাহাদের মধ্যে নৈকট্য গড়িয়া না উঠিয়াছে এমন ত নয়, তবুও একটা অস্বচ্ছ পর্দ্দার মত তাহাদের দুইটি মনের মাঝে কিসের যেন একটা ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে—সবই আছে কিন্তু পরিপূর্ণতা নাই, একটা একাকীত্ব অজ্ঞাত অস্বস্তির গোপন কাঁটার মত অন্তরকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়। ভাবে—এই পৃথিবীর জনারণ্যের মাঝে সে অমল কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বিদায় দিনে অমলের সেই বিষণ্ণ মলিন ছলছল মুখখানি আজ প্রাচুর্য্যের প্রলেপে প্রায় অদৃশ্য, তবুও দেহাতীত একটা বাসনা-শঙ্কিত আঁখি মেলিয়া জাগিয়া আছে—অদূরে নীচে ওই বধূটি একখানা নীল বাপেরহাটের শাড়ী পরিয়া কলতলায় বসিয়া জামা কাপড়ে সাবান দিতেছে। স্বামীর পাঞ্জাবী, গেঞ্জি, বালিশের ওড়, একবার ধুইয়া রৌদ্রে দিল কিন্তু নীল বেশী হইয়াছে মনে করিয়া পাঞ্জাবীটায় আবার সাবান দিতে আরম্ভ করিল। পরিশেষে স্নান করিয়া, ভিজাচুল পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া ঘরে গেল—

একটি শিশু মাঝে মাঝে উঠানে বারান্দায় খেলা করিয়া বেড়ায়—অপর্ণা তাহার সুদৃঢ় পদক্ষেপ ও চলিবার ভঙ্গিটি চিনে। সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া এক টুকরা সাবান পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। এক বালতি রান্নার জল আলাদা তোলা ছিল, সেই জলে সাবান গুলিয়া সে সবত্র পেটে মাখিয়াছে, যতই ফেনা হইতেছে ততই সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপন মনে হাসিতেছে—উল্লাসে মাঝে মাঝে কিছু ফেনা মাথাতেও তুলিয়া দিতেছে। একবার তাহার দিকে চাহিয়া হয়ত তাহার এই অভাবনীয় কর্ম্মপটুতা দেখাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিল—

আনন্দের আতিশয্যে অবশেষে সে বালতীর মধ্যে বসিয়াই সাবান সহ জলক্রীড়া আরম্ভ করিল। জল ছিটাইয়া, মাখায় দিয়া আপন মনেই হাসিতেছিল। যেমন করিয়াই হোক, সাবানের ফেনা বোধ হয় কিছু চোখে গিয়াছে—জ্বালা করায় হঠাৎ তারস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অভিমন্যুর মত বালতি-ব্যূহের প্রবেশ পথ তাহার জানা ছিল, কিন্তু বাহির পথ তাহার জানা ছিল না।—অপর্ণা আপন মনে হাসিয়া উঠিল।

বধূটি হন্ত-দন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া পুত্রের এই দুর্গতি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। অপর্ণার দিকেও চাহিয়া দেখিল, সেও হাসিতেছে। সম্ভবতঃ কহিল—যেমন দুষ্টু! ক্ষোভও হইবার কথা। রান্নার জলটুকু সে নষ্ট করিয়াছে—

পুত্রকে বালতি-মুক্ত করিতে করিতে আর একবার সে দিদির খুলবারান্দার পানে চাহিল। সুন্দর শান্ত তাহার মুখখানি—কপালে সিন্দুর বিন্দু চিক্ চিক্ করিতেছে। এই মুখখানিতে সিঁদুরের ফোঁটা যেমন মানায়, তেমন বোধ হয় আর কারও নয়—

নিশীথ গভীর রাত্রি—

কলিকাতার কোলাহল থামিয়া গিয়াছে—রাস্তা জনশূন্য। ক্বচিৎ রিক্সার ঠন্ ঠন্ শব্দও নাই। আকাশের গায়ে একখানি চাঁদ ম্লান-জ্যোৎস্নায় পৃথিবীকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অমল একাকী টেবিলের সাম্নে বসিয়া আছে—সম্ভবতঃ একটা কবিতা লিখিবার উদ্যোগ করিয়াছে—পাশের খাটেই গৌরী পুত্রকে বুকের মাঝে জড়াইয়া শুইয়া আছে।

কবিতার মাত্র একটি লাইন লেখা হইয়াছে—জগতের জনারণ্যে আজি আমি একান্তই একা—

অমল ভাবে—সত্যই ত সে একা। আজিকার এই উদাস মন নিরাশ্রয়ের মত যেন কাহাকে চাহিতেছে—কিন্তু সে কে, কি তাহা বোঝা যায় না। আজ সে যেমন করিয়া তাহার একাকীত্বকে অনুভব করিতেছে, যেমন ভাবে বেদনা পাইতেছে, গৌরী ত তাহা পাইতেছে না। নিবিড় বাহুবন্ধনের মাঝে তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার বেদনাকে দূর করিতেছে না। জীবনে যাহাদের সঙ্গ সে পায়নি, মন বার বার সেই না-পাওয়াকে পাইতে চাহিতেছে। কোথায় অপর্ণা, কোথায় রমলা—তাহাদের অতীত স্মৃতি আজ দূরাগত বীণাধ্বনির মত তাহাকে নিষ্ঠুর আকর্ষণে লইয়া চলিয়াছে—গৌরীর মাঝে সে মানসীকে পাওয়া যাইবে না—মনের এ ব্যভিচারের নিবৃত্তি নাই। গৌরীর বুকে মুখ লুকাইয়া জীবনস্বপ্ন সফল চোখে দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দেয়।

অমল মনে মনে ঠিক করে—গৌরীকে পরীক্ষা দেওয়ার

তাগিদ দিয়া যায় নাই। সে পাশ করিলেও সে তাহাকে যেমন করিয়া চাহিয়াছে গৌরীর মাঝে তাহাকে পাওয়া যাইবে না—বৃথা তাহার এই অত্যাচার। বুকের মাঝে গৌরীকে লইয়া সে বারবার কেবল প্রবঞ্চনাই করিয়াছে—

অমল গৌরীর মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মুখে তাহার একটা অপ্রকাশ্য বেদনার অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গৌরী হয়ত আলো দেখিয়াই সহসা জাগিয়া উঠিয়া বসিল। অমল ধীরে ধীরে বলিল—গৌরী, তুমি ঘুমিয়েছিলে—না?

—হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—চারিপাশে এই নিস্তব্ধতা, আজ আমার মন উন্মাদ কল্পনায় তোমাকে নিঃশেষে পান করতে চায়। আকাশের জোছনার মত আমার অন্তর তোমার সমস্ত অঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। তোমার কি ইচ্ছে করে না, এমনি ক'রে সমস্ত অন্তর দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখতে?

গৌরী কিছু বুঝিল না, অপ্রাসঙ্গিক জবাব দিল—ঘুমিয়ে পড়েছি বলে রাগ ক'রেছো?

অমল হাসিল, কিন্তু সে হাসি কান্নারই রূপান্তর মাত্র। তাহার সমস্ত অন্তর সহসা যেন কঠিন বাস্তবের প্রাচীরে প্রহত হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সে বলিল—না তুমি ঘুমোও—

—তুমি শোবে না?

—হ্যাঁ, শোবো বৈ কি?

গৌরী পুনরায় শয্যাশ্রয় করিল। অমল তেমনি করিয়াই বসিয়া রহিল—সে যেমন করিয়া, যে পথে গৌরীকে চায়, তেমনি করিয়া সে ত তাহাকে পায় না—তাহার অন্তরের সুখ দুঃখের সাথী ত সে নয়। যে রাঙ্গা মানুষের মন একা—সেথা গৌরীও যেমন অবান্তর, অপর্ণাও তেমনি। অপর্ণার বধির অন্তরও তাহাকে এমনি করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। মানুষের চাওয়া পাওয়ার রূপ, পরিকল্পনা বিভিন্ন, তাহাদের সুখ দুঃখ বিভিন্ন, এ জগতে কি তাহারা একজন আর একজনকে পাইতে পারে? তাহা একান্তই অসম্ভব, তাই মানুষ না-পাওয়ার বেদনায় আপন অঙ্গ উৎপাটিত করিয়া দিয়া আপনাকে অঙ্গ সমুদ্রের মাঝে চির একাকী করিয়া রাখিয়াছে। যাহারা চাহে নাই তাহারা পাইয়াছে, যাহারা চাহিয়াছে তাহারা পায় নাই। ভালবাসা লইয়া এ জগতে সুখী হওয়া চলে না—ভাল না বাসিলে সুখী হওয়া হয়ত সম্ভব হইতে পারে—

অমল ধীরে নিঃশব্দে আসিয়া গৌরীর শয্যা পার্শ্বেই শুইয়া পড়িল, কিন্তু মনে মনে হাসিয়া বলিল—তবুও কত ব্যবধান।

আকাশে থালার মত উজ্জ্বল চাঁদ উঠিয়াছে—

অপর্ণার ঘরের সম্মুখে কুলবারান্দায় একরাশ শুভ্র আলো আসিয়া পড়িয়াছে। একখানা ইজিচেয়ার টানিয়া সে বসিয়াছিল। তাহার স্বামী এখনও শুইতে আসে নাই, হয়ত কোনো কাজে বৈঠকখানায় আছে। দূরের দীর্ঘ কালো নারিকেল গাছের উপরে, একখানা শুভ্র মেঘের পাশে চাঁদ স্থির হইয়া রহিয়াছে। নারিকেল গাছের হিম-সিক্ত পাতা জোছনায় চিক্ চিক্ করিতেছে—

অপর্ণা ভাবিতেছে কত অবান্তর কথা—এমনি এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে বাগীগঞ্জ পার্কে অমল কম্পিত হস্তে তাহার হাতখানিকে আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু সে কোথায়, কত দূরে? সে ইচ্ছা করিলে তাহাকে সুখী করিতে পারিত, কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে মাত্র দুই ফোঁটা চোখের জলে বিদায় করিয়াছে। তাহার মন আজ সেই হারানো মানুষটিকেই অজিতের মাঝে খুঁজে, কিন্তু অজিত অজিতই, তাহার মাঝে অমলের হৃদয় স্পন্দন নাই।

বিবাহিত জীবনের মাঝে অমলও কি এমনি ব্যভিচার করিয়া চলিয়াছে? অজিতের বক্ষস্পন্দনে সে যেমন করিয়া অমলের স্পন্দন অনুভব করিতে চায় সেও কি তেমনি অপর্ণাকে অন্য দেহের মাঝে চাহিয়া অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে—মানুষের মন কি এমনি চিরন্তন ব্যভিচার-লিপ্ত?

কে যেন ঐ ঘুমন্ত ছোট বাড়ীখানির উঠানে একাকী পদচারণা করিতেছে। সম্ভবতঃ ঐ বধূটির স্বামী, ঐ ঘুমন্ত ছেলেটির পিতা। কিন্তু আপনার এই আনন্দময় গৃহ হইতে নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া ও কেন এমন একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে?—মানুষ কি সর্বত্রই একা?

অপর্ণা ভাবিয়া পায় না—

অজিত আসিয়া প্রশ্ন করিল—অপর্ণা শোও নি?—এখানে ব'সে কি ক'রছো—

—ব'সো, কেমন সুন্দর জোছনা উঠেছে, দেখেছ?

—হ্যাঁ, সত্যিই। অজিত আর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। প্রশ্ন করিল—তুমি এখানে ব'সে কি এত ভাবো বল তো?

—কি সুন্দর মোছনা।

—মোছনা ত এখন, অন্য সময় কি ভাবো?

অপর্ণা হাসিয়া কহিল—তোমাকে একদিন দেখাবো। ওই বাড়ীর ছোট্ট দুরন্ত একটী ছেলে, একটি দুষ্টু বৌ আর তার স্বামী থাকে, তাদের জীবনযাত্রা দেখলে তোমারও হাসি পাবে—

অপর্ণা শিশুটির সাবান ও বালতি ব্যূহে প্রবেশের কাহিনীটী বর্ণনা করিলে, অজিত হাসিয়া কহিল—ও তাই নাকি? আচ্ছা একদিন দেখবো—

অপর্ণা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—ভাখো স্বামীটি এখন কেমন পায়চারি ক'রছে। এত আনন্দের মাঝেও ও যেন একা—না?

অজিত বিশেষ কিছু বুঝিল না—সংক্ষেপে জবাব দিল, হুঁ।

ক্ষণিক পরে অপর্ণা প্রশ্ন করিল—আমাকে বিয়ে করে তুমি কি সত্যই সুখী হ'য়েছ?

—হ্যাঁ, আমার না পাওয়া ত কিছুই নেই। তোমাকে না পেলে এ প্রশ্ন হয়ত উঠ্‌তো—

—তুমিই সুখী।

—কেন? তুমি সুখী হও নি?

অপর্ণা জবাব দিল না। অজিত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কহিল—কি জবাব দিলে না যে!

—আমি বল্‌ছিলুম যে কম চায় সেই সুখী হয়, যে বিরাট কিছু চায় সে সুখী হ'তে পারে না। যারা সত্যিকার ভালবাসে, তারা তাই চিরদিনই তাদের মনে একা—

অজিত সম্ভবতঃ কিছু বুঝিল না তাই বলিল—তোমাদের ফিলজফি কিছু বুঝি না, তবে তোমার কথায় সন্দেহ হ'চ্ছে তুমি হয়ত সুখী হও নি।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—বিয়ের সাত বৎসর পরে অকস্মাৎ এই সন্দেহ তোমার হ'য়েছে—যা হোক্।

অজিত অপর্ণার হাতখানা নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিল—না না, তোমার মনে যদি কোনও দুঃখ থাকে, তাই ঐ কথা ব'ল্‌লুম।

অপর্ণা কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া অদূরে পাণ্ডুর নিষ্প্রভ চাঁদের পানে চাহিয়া রহিল। অজিত সযত্নে তাহার দেহ নিজের বুকের সন্নিকটে টানিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে নিজের মুখখানি অবনত করিতেছিল। অপর্ণা চক্ষু মুদিয়া সেই স্পর্শটুকুর অপেক্ষা করিতেছিল—এমনি করিয়া পার্কে বসিয়া জ্যোৎস্নামাত অমলের মুখখানিও নামিয়া আসিবার প্রতীক্ষা সে করিয়াছিল। তাহার মাঝে সেই মুখখানিই ভাসিয়া উঠে—সে তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া শিহরিয়া উঠে। এ কি নিষ্ঠুর ব্যভিচারবৃত্তি!

সেদিন রবিবার।

অপরাহ্নে সমস্ত উঠানে ছায়া পড়িয়াছে। অপর্ণা ঘুম হইতে উঠিয়া আসিয়া বারান্দায় বসিল—একখানা বই তাহার হাতে ছিল, কিন্তু সেটাকে না খুলিয়াই সে ছোট ছেলেটিকে ঐ বাড়ীর উঠানে খুঁজিতেছিল। এমনি সময়ে বারান্দার কোণে বসিয়া সে সাধারণতঃই নানারূপ ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, কখনও দুইপায়ের ভিতরে একখানা লাঠি দিয়া দ্রুতবেগে সমস্ত উঠানে অশ্বারোহণ করে। চুরি করিয়া মাঝে মাঝে কিছু জল লইয়া যাইয়া তদ্বারা নানারূপ প্রক্রিয়া করে—

অপরাহ্নের ছায়া ওদের বারান্দাটায় যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে বসিয়া স্বামী-স্ত্রী দুইজনে ক্যারম খেলিতেছে এবং খোকাটি অত্যন্ত শান্ত ভাবে তাহা দর্শন করিতেছে—ঘুঁটি পড়িলে উবু হইয়া তাহা কুড়াইয়া কুড়াইয়া জমা করিতেছে, মাঝে মাঝে বোর্ড হইতেও দুই একটা চুরি করিয়া লইতেছে। স্বামীটি পিছন ফিরিয়া বসিয়া—কেবল তাহার দীর্ঘ দেহ ও কোঁকড়া চুলগুলি দেখা যায়।

অজিত অপর্ণার পাশে আসিয়া বসিল। কহিল—কি প'ড়ছো?

অপর্ণা কোন জবাব দিল না, কেবল ইঙ্গিতে ক্রীড়ানিরত দম্পতীকে দেখাইয়া দিল।

অমল ক্যারম খেলিতেছিল—রবিবার অপরাহ্নে অমনি একটু খেলা করা তাহার অভ্যাস—কারণ এটা অন্যান্য নাগরিক আমোদ-প্রমোদের মত ব্যয়সাপেক্ষ নয়।

বোর্ডের ঘুঁটি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল, অমল একটা ঘুঁটিকে দেখাইয়া দিয়া কহিল—এই যে এটা রয়েছে—

গৌরী প্রতিবাদ করিল—কখ্খনও না, ওখানে থাকতেই পারে না। ঘুঁটি তুমি তুলেছ—আচ্ছা চোর ত।

—ছিলো, বহুক্ষণ আছে। নেকামি ক'রো না।

খোকা নিবিষ্ট মনে খেলা দেখিতেছিল, সে মাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাবাকে আঙুলে দেখাইয়া কহিল—চোর।

অমল ধমক দিল—ধ্যেৎ, পাজি ছেলে। চুপ কর্—

খোকা ধমক খাইয়া উঠিয়া গেল এবং কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিল। গৌরী কহিল—আর কত খেল্‌বে, রাঁধতে হবে না? সব কাজ পড়ে রইল—

অমল তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল—থাক্‌গে, রবিবার একটু না হয় রাত্তির হল—

গেম শেষ হইয়া আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গৌরী মাঝে মাঝে ঘুঁটি চুরি করিয়াও অনিবার্য্য পরাজয় হইবে বুঝিয়াছিল। খোকা আবার আসিয়া মায়ের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং মায়ের সাহায্যার্থ দুই একটা ঘুঁটি মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে বসাইয়াও দিতেছিল।

ঐরূপ একটি ঘুঁটি সন্নিবেশকালে খোকা ধরা পড়িয়া গেল এবং আর একবার ধমক খাইয়া আসিয়া নিজকর্ম্মে মন দিল। গৌরী কহিল—খোকাকে বক্‌লে কেন?

—ঘুঁটি চোর—তোমার দেখাদেখি—

—তুমি চোর, তুমি ত ঠেটামি কচ্ছ।

—তুমি যে ঘুঁটি চুরি ক'রলে—

বেশ তোমার মত ঠেটার সঙ্গে খেল্‌বো না। গৌরী সমস্ত ঘুঁটি ভণ্ডুল করিয়া দিয়া ছুটিয়া পালাইল।

অমল কহিল—দাঁড়াও—সে পিছন পিছন ছুটিয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে গৌরীকে ধরিয়া ফেলিল। অমলের সবল বাহু বেষ্টনীর মাঝে গৌরী অসহায়ের মত কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া কহিল—ছাড়ো, ছাড়ো, খোকা রয়েছে যে—

অমল শাস্তি দিবার জন্যে ওষ্ঠ আনত করিতেছিল, গৌরী কহিল—ছিঃ ছিঃ ছাড়ো, ওই স্যাখো বারান্দায় কারা—

অমল সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে অদূরের বড় বাড়ীর ঝুলবারান্দায় দুইটি লোকের অবস্থিতি বুঝিতে পারিয়া গৌরীকে ছাড়িয়া দিল।

পুত্র উঠানের প্রান্ত হইতে তাহার মায়ের প্রতি এই ঘোর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়া উদ্যত লাঠি হস্তে পিতাকে শাসন করিবার মানসে ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু লাঠির ভারে পড়িয়া গিয়া তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে গৃহ হইতে ঠাকুমা সন্ধ্যা আহ্নিক ফেলিয়া আসিয়া কহিলেন—কি হ'ল বৌমা!

অমল হাত দুলাইয়া কহিল—ধরিত্রী তুমি দ্বিধা হও—

এবং নিঃশব্দে সে গৃহে ফিরিয়া গেল, অদূরের ঝুলবারান্দায় বসিয়া কাহারা যেন হাসিতেছে মনে হইল।

গৌরী ছুটিয়া আসিয়া কানে কানে কহিয়া গেল—কেমন জব্দ? (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের শেষ রচনা

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি এচ্-ডি

(৩)

তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাই সংখ্যায় বেশী। 'আকাশ-প্রদীপে' 'ছায়া', 'জানা-অজানা' 'পাখির ভোজ' 'ধাম্য', 'সময়-হারা' 'চাকিরা চাক বানায় যবে' ও 'সানাই' এ 'স্মৃতির ভূমিকা', 'পরিচয়' 'অপঘাত' প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতাগুলিতে কল্পনার একটা চেষ্টাবিহীন শিথিলতা, অলস স্বপ্নস্বপ্ন-বিহার, পরিমিতিহীন ঘনিষ্ঠাপন্ন ছন্দের আঁকা-বাঁকা পথ বাহিয়া সহজ-ক্রিয়াশীল একটানা ভঙ্গীতে আপনাকে ছড়াইয়া দিবার প্রবণতা লক্ষ্য-গোচর হয়। কল্পনার জগৎ যেন উচ্চতর, সার্থকতর

রশ্মি-নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া আপনার খুসী মত কাব্যের রঙ্গকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই স্বেচ্ছাবিহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ অনুশীলন ও সাধনার প্রভাবে তাঁহার মনের সহজ গতি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিরই অভিমুখী। তবে সৌন্দর্য্যের মানদণ্ড সব সময় সমান উন্নত হয় নাই। এই সমস্ত কবিতায় কবি সৌন্দর্য্যের শেষ বিন্দু নিংড়াইয়া লইতে চেষ্টা করেন নাই—তাহার পরিপূর্ণ পাত্র হইতে যেটুকু উপচাইয়া পড়িয়াছে, তাহার মূলক পরিণতি হইতে যাহা বিন্দু বিন্দু ঝরিত হইয়াছে তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

অঙ্কের সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ বঙ্কন-রেখা, লঘু, চটুল প্রাণধর্ম্মের বিপরীতমুখী হইতেছে, বাস্তব প্রতিবেশের তীব্র তুলিকা তিনি কাব্য সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রাবল্যকে প্রতিরোধ করিয়াছেন। 'জানা-অজানায়' স্বরের পুরাতন আসবাব-পত্র ও বস্তু-সঞ্চয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার ভিতর দিয়া অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে মূল্য-নিরূপণের তারতম্য, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বিশদীকৃত হইয়াছে—ঘড়ির গায়ার মধ্যে একটু অতিরিক্ত লিঙ্গের ইঙ্গিত বলসিয়া উঠিয়াছে। 'ঘরমা' কবিতাতে দৈনন্দিন জীবন-ব্যবহারে চটুল চাঞ্চল্য, ও তাহার ক্যাম্বিসের বাঁধা-সাদাসিধা অভিজ্ঞতার উপর অকস্মাৎ একটা ঘন বিস্ময়ের যবনিকা টানা হইয়াছে—প্রাণধারার খুব্‌রয়াশি, কৃত্রিম জীবনযাত্রার বিপুল আয়োজন ও যন্ত্র-স্পন্দন এক মুহূর্ত্তে ভোজবাজীর ন্যায় বিলীন হইয়াছে। 'সবর হারা'র বর্ত্তমান কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, ঘরপাড়া, মৌলভক্তই শিল্পী জীবনের চরম প্রেরণোজ্জ্বল অবসাদ এক পোড়ো বাড়ী ও উৎসব সংসারযাত্রার অতিপরিচিত রূপকে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে—শেষে এই দীর্ঘ, আয়ুজনযুগে স্বপ্ন-নিঃশ্বাস প্রতিরোধে শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির চিরন্তন মূল্য সম্বন্ধে মহাকালের আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হইয়াছে। ঘরোয়াত্বের চিত্রে কল্পনার অভাব, অপরিচিত বিস্ময়, অনাস্বাদিত বস্তুপুঞ্জের যবনিকা সম্বন্ধেও ইহার অনিয়ন্ত্রিত শৈথিল্যের পরিচয়।

'ঢাকীরা ঢাক বাজায়' কবিতায় কবি একটী পুরাতন ছড়ার সুর অবলম্বন করিয়া ইহার কাল-বিস্মৃত, অন্তর্নিহিত করুণ আবেদনটী নূতন করিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও বর্ত্তমানের একটী অনুরূপ দুর্ঘটনাকে অতীতের এই অংশটী, দুঃখহারা সুরের সহিত গাঁথিতে চাহিয়াছেন। 'বধূ' কবিতায় ঠাকুরমার ছড়া যেরূপ ভাবে কবির অনুভূতিকে উদ্দীপিত করিয়াছে, এখানে সেরূপ উদ্দীপনার অভাব। এখানে গ্রথিত সুরটিকে আশ্রয় করিয়া কবি অলস কল্পনার জাল বুনিয়াছেন, আধুনিক যুগে অন্ধ-শিল্পীর তরুণী নায়কীর অনাহত পুরাতন গানের বিস্মৃতিবিদূর করুণ মায়ার ভাব-মণ্ডলের মধ্যে ধরা দেয় না। 'পাখির ডোকে' নিত্য-সঞ্চারী কল্পনা পাখীর হৃদ-হিল্লোলিত স্নেহভঙ্গী, সহজ আত্মীয়তা ও অকস্মাৎ উদ্বেলিত, অসহায়ী হিংসার মধ্যে আদিম প্রাণের লীলা ও তাহার ক্ষণিক ব্যতিক্রমের পর পুনরায় স্বাভাবিক ছন্দের অনুবর্ত্তনের সুন্দর প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বর্ণনা ও তাহার মধ্যে উদ্ঘাটিত সত্য—এই উভয়ের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'অনন্ত' আর একটি চমৎকার পাখী—কবিতা। 'সানাই' এ 'স্মৃতির ভূমিকা'তে প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের একটি সুন্দর রেখাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির ক্রমে অন্তর জগতের আর কোন সুগভীর ছবি পরিস্ফুট হয় নাই—ঘর-সম্পূর্ণ ভূমিকা কোন গল্প ফাঁদে নাই। 'অপঘাতে' একখানি অপরাহ্নের পাণ্ডুর আভাসস্নিগ্ধ ম্লান ছবির উপর আসিয়া পড়িয়াছে বৈশাখীদের তীব্র পরিহাস, আকস্মিক দুর্দ্দৈবের বিপর্য্যয়—তবে সে বেদনা ছিন্নতাতে পড়ার বাস্তবতার অবসাদ-জীবনের উপর তাহার অভিঘাত অনেকটা মৃদু চন্দনের প্রলেপে বসিয়া গিয়াছে। 'পরিচয়ে' এক তরুণী যাহার রোমান্টিক ভাবমুগ্ধতা সাংসারিকতার প্রখর উত্তাপে তখনও উষিয়া যায় নাই, দীর্ঘ বিলম্বিত ছন্দে, অতি-বিস্তৃত বর্ণনা-বাহুল্যের সহিত অপরিচিত কবির প্রতি তাহার প্রেম নিবেদন, পরিচয়ে মোহভঙ্গ, অপরার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজয়ের গ্লানি ও দমস্ত বিকৃতি ও বেদনার মধ্য দিয়া প্রেমাস্পদের সত্য পরিচয় লাভের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে—এই বর্ণনায় ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গগুলি ও চরম পরিণতির বিবর্ত্তন কোনটাই খুব স্পষ্ট ফোটে নাই।

ইহা ছাড়া 'সানাই'এ কতকগুলি গীতধর্ম্মী ক্ষুদ্র কবিতা আছে—যথা 'নতুন বউ', 'বিদায়', 'যাবার আগে', 'পূর্ণা', 'ছায়াছবি' 'বেলা-বেলা', 'আধো-জাগা', 'গানের জাল', 'মরিয়া' ইত্যাদি। এই কবিতাগুলিতে মুহূর্ত্তের পলাতক ভাব, কল্পনার ক্ষণিক খেয়াল, মনের রঙীন ও উদাস মূর্চ্ছনা গানের সুরে ও লঘু ছন্দে বাজিয়া উঠিয়াছে। 'বলাকার' গভীরতর সুরের পর হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই ধরণের গীতি-কবিতার সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। অনিয়মিত ছন্দের অতি-প্রসার ঠিক ছোট গানের ধরা পরিসরের মধ্যে অনবদ্য ভাব-সংহতির অনুকূল নহে। যে ধৃতি গভীর বক্তব্যের উদ্বোধনে ব্রতী তাহা ক্ষণিক সুন্দরের মীড়-মূর্চ্ছনা তুলিবার নিপুণতা হারায়। সুদূর প্রসারী মার্গসঙ্গীত চিত্ত খেয়ালী প্রেমের অতিক্ষুদ্র কল-কাকলী ও ভাবের ক্ষণিকতাকে অভিভূত করে। তথাপি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুরাতন বাদ্যযন্ত্রের উপর যে অধিকার হারান নাই, এই সমস্ত ছোট কবিতার অনেকগুলিতে তাহার প্রমাণ মিলে। কোন কোন কবিতায় তুলিকার লঘু স্পর্শে, ব্যঞ্জনায় সুনিপুণ ইঙ্গিতে, ছন্দের শিথিল মন্থর-ধ্বনিতে এক একটী পলাতক ভাব সার্থক রূপ লইয়াছে। কোন কোনটিতে বা চিন্তার ভার একটু বেশী গুরু বা সংহত শিল্পপ্রয়াস একটু বেশী মাত্রায় প্রকট হইয়া গানের মাধুর্য্যের হানি করিয়াছে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ এখনও জীবন পর্য্যন্ত গান গাহিবার কণ্ঠ ও মনোভাব হারান নাই। তাঁহার মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন অন্তিম জীবনেও হালকা গানের সুর রহিয়া রহিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা যাইতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত ছন্দের মাধ্যমে বর্ণন-প্রভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কবি মোটের উপর সন্তোষজনক ফল পান নাই। কয়েকটী কবিতায় উদ্দাম, শিথিল, অবাধ-প্রসারিত কল্পনা বিনা অন্তর্নিহিত পরিমিতি-বোধের সাহায্যে একটা অবিচ্ছিন্নরূপে সংহত হইয়াছে—স্নেহা-সক্তারী বাষ্পরাশি আকিয়া বাঁকিয়া এক সম্পূর্ণ ভাবমণ্ডল গঠন করিয়াছে। তথাপি মনে হয় অনেক স্থলে কবি এই ছন্দের প্রভাবে অতিপল্লবিত বিস্তার ও সুদূর অতিভাবণের দিকে প্রবণতা দেখাইয়াছেন। বিশেষতঃ 'সানাই'এর অনেকগুলি কবিতায় এই প্রবণতার উদাহরণ মিলে। যে সরলীয়, অর্থঘন সংক্ষিপ্ত শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রাণ, যাহাতে একটী শব্দেরও পরিবর্ত্তন বা স্থানান্তরকরণ সম্ভব নহে, যাহার সম্বন্ধে Coleridge বলিয়াছেন—"Poetry is the arrangement of the best words in the best order," যাহার অর্থব্যঞ্জক অনুরণন পুষ্পসৌরভস্নিগ্ধতার অক্ষরের ন্যায় মনকে প্রফুল্লিত করিয়া অনির্ব্বাণ গুঞ্জনধ্বনি তোলে—কাব্যের

সেই উচ্চতম আদর্শ এই শ্রেণীর কবিতায় সর্বত্র রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

৪

'এইবার কবি-জীবনের শেষ বৎসরের রচনাগুলি—'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'নবজাতকে', ও 'শেষ লেখা'র আলোচনা করিব। এই রচনাসমূহ একটি বিশেষ ও অসাধারণ শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কবি কাব্যের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা—মৃত্যুর সঙ্গে পাঁড়ার আক্রমণ ও রোগমুক্তির কাব্য-কাহিনী—অভিব্যক্ত করিয়াছেন। পৃথিবীর আর কোন কবির রচনায় আমরা ঠিক এই বিষয়টী পাই না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ হয়ত সাময়িক অনিদ্রার প্রভাবে তাঁহার স্বাভাবিক স্থির প্রশান্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। কোলরিজের কবিতা আগাগোড়া অস্বস্থ মনোবিকার ও আফিঙের নেশার অর্ধ-অন্ধকার ও অবাস্তব রঙে রঞ্জিত কল্পনায় চিহ্নাঙ্কিত। শেলির অতি-উত্তেজিত কল্পনা ও অবাস্তব প্রবণতা অনেকাংশে মানসিক অসুস্থতা হইতে উদ্ভূত। ব্রাউনিং অর্ধ উন্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ নর-নারীর চিন্তাধারার অসংলগ্নতা ও আচরণবিকৃতি নাটকীয় পদ্ধতিতে ফুটাইয়াছেন। ব্রাউনিং-দ্বারা মরণের বিলম্বিত আবির্ভাবের প্রতীক্ষাজ্বালা-তলে তাঁহার অপরূপ জীবন-মাধুর্যকে প্রেম-গাথার রক্ত-পথে মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগের প্রভাব ঠিক প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় না—মানসিক অবসাদ, জীবনরসের অনিয়ন্ত্রিতগতিবেগ, আবেগের আতিশয্য ইত্যাদি লক্ষণগুলি শারীরিক ব্যাধি অপেক্ষা মানস সংস্থিতির অসাধারণত্ব হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের কতকগুলি কবিতার মধ্যে ব্যাধিক্লিষ্ট দেহ-মনের বিক্ষোভ, উত্তপ্ত, অস্বাভাবিক স্পর্শ, বিকারের আবিল দৃষ্টি যেমন স্বাভাবিকভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার অন্য কোথাও তুলনা মিলে না। অবশ্য কবির শিল্পোৎকর্ষ এই রোগগ্রস্ত অবস্থার উপর জয়ী হইয়া ইহার বিকারের খণ্ডমূর্তগুলিকে অনবদ্যকাব্যরূপ দিয়াছে, কিন্তু সমস্ত সচেতন শিল্প-সৃষ্টির ভিতর দিয়া রোগ-যন্ত্রণার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস, ব্যাধি-জর্জর কল্পনার ক্ষীণতা ও বিকারগ্রস্ত প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। এই অভিভূত অনুভূতি কবির দার্শনিকতা,—জীবনের সত্যরূপে তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস, চরম দুর্ঘটনা ও লাঞ্ছনার মধ্যে অপরাজিত মানবাত্মার জয়গান, মৃত্যুর স্বরূপের প্রশান্ত উপলব্ধি—অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজ অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও সহজ সৌরভের পরিচয় দিয়াছে। একদিকে ব্যাধির অভিভব ও পীড়নের স্বীকার, অন্যদিকে ইহাকে অতিক্রম করিয়া আত্মার বিজয়-ঘোষণা—এই দুই সুরের সম্মিলন এই কবিতাগুলিকে এক অতুলনীয় গাম্ভীর্য ও মহিমা দিয়াছে। 'আরোগ্যে' কবিতাগুলিতে জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির সহজ রূপটী নবজাতকবুদ্ধ কবির চক্ষুতে আবার প্রথম অনুভবের বিস্ময়মণ্ডিত হইয়া অপরূপ, নবীন সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। অনুভূতির এই উত্তেজিত বিস্ময়, সৌন্দর্যের এই অভিনব আবিষ্কার, কৌতূহলের এই সতেজ, নবীন উন্মেষ ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে এক স্বর্গোদ্যানতার শিহরণ রাখিয়া গিয়াছে। কবিতাগুলির ক্ষুদ্র আয়তন, উহাদের আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ততা; রোগাভিভব-মুক্ত কল্পনার শ্রীমাবদ্ধ সক্রিয়তার, ইহার পক্ষবিস্তারের সঙ্কুচিত পরিধির বহিঃবিস্তর্পন। পূর্ববর্তী পর্যায়ের অতিভাষণ-প্রবণতা এখানে সমস্ত বাহুল্য পরিহার করিয়া একটী অপরূপ কৃশতা ও বজ্রদীপ্তি অর্জন করিয়াছে; এক একটী কবিতাতে যেন মন্ত্রের মন্ত্রাক্ষরত্ব ও নিগূঢ় অধ্যাত্মশক্তি নিহিত হইয়াছে। মহাযাত্রার পূর্বে কবি যে শেষ অর্ঘ্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে সহজ অথচ সুগভীর অধ্যাত্ম অনুভূতি, বিশ্ব-সৌন্দর্যের নূতন উপলব্ধি, জীবনের নিকট বিদায়গ্রহণ ও মৃত্যুকে অভিনন্দন জানানোর প্রশান্ত, মোহাবেশহীন মহিমা সরল, অনাড়ম্বর, অথচ আশ্চর্যরূপ দ্যুতিমান্ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

রোগযন্ত্রণার প্রভাব কয়েকটী কবিতার সুস্পষ্ট ছায়াপাত করিয়াছে। 'রোগশয্যায়'এর ৭ সংখ্যক ও ২৯ সংখ্যক কবিতায় রোগীর গভীরতম একাকীত্বের আসন্ন ভাবহে ব্যঞ্জনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। স্নেহ সেবার দুর্লভতম স্তরের মধ্যে রোগীর অন্তরাত্মাই জীবনীশক্তি বিসর্জনের প্রাণলীলায় সমর্থন পায়; কিন্তু নিঃসঙ্গতার সম্ভাবনা তাহার কল্পনার জগতের নির্মম, উদাসীন্যমাখা, ক্রূর ছবিগুলি অঙ্কিত করে। এই ক্ষুদ্র কবিতা দুইটিতে ব্যাধিজর্জর দেহের মায়াহীনতা, সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে অতলস্পর্শ সত্তা-আস্বাদের উপলব্ধি চমৎকার ফুটিয়াছে। 'রোগশয্যায়'এর ৩ সংখ্যক ও আরোগ্যের ৭ সংখ্যক কবিতায় পীড়ার বেদনার তীব্র উপলব্ধির সঙ্গে মানবাত্মার অপরাজেয় সহিষ্ণুতার জয়গানের দুই বিপরীত সুরের সার্থক সমন্বয় হইয়াছে। ৯ সংখ্যক কবিতায় রোগগ্রস্ত মনের রচনাপ্রয়াস আদিম অন্ধকারে প্রথম সৃষ্টির অপূর্ব, বিকলাঙ্গ শিশুমূর্তির উপমায় প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে কবির প্রকাশন-শক্তি কল্পনার অস্পষ্টতার উপর জয়ী হইয়াছে; অনুভূতির ঘোরে অর্ধ-সচেতন মনে এলোমেলো, বিশৃঙ্খল চিন্তা-কল্পনার ঠেলাঠেলি ও প্রকাশ-ব্যাকুলতা অসাধারণ তীব্রতার সহিত অনুভূত ও অভিব্যক্ত হইয়াছে। ১২ সংখ্যক কবিতায় রোগীর ঘরের বদ্ধ, সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রা স্রোতোবেগ হইতে বিচ্ছিন্ন, শৈবালদল-গঠিত ঝীলের সহিত উপমিত হইয়াছে। এই স্তিমিত, মৃদুস্পন্দিত আব-হাওয়ার ছোট-খাট সেবা-শুশ্রূষা-পরিচর্যাগুলি অপূর্ব মধুর রসসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে—"দুঃখের পাত্রে সুধা-ভরা" কয়েকটী দিন লক্ষিত হইয়াছে। ১৯ সংখ্যক কবিতাতে রোগীর অসহায় অবস্থা করুণ পরিহাসের স্নিগ্ধস্পর্শে জ্বালা ও উত্তাপ হারাইয়াছে। 'শেষ লেখা'র শেষ দুইটী কবিতা রবীন্দ্রপ্রতিভার অস্তিমরশ্মি-বিচ্ছুরণ—মরণের দুর্ভেদ্য জটিলতার মধ্যে বিশ্বাসের পথরেখার দুঃসাধ্য, ক্লেশ-সঙ্কুল প্রচেষ্টার বাণী-রূপ। মৃত্যুর আসন্ন আবির্ভাবের প্রাক্কালে, কল্পনার বাসকক্ষ-তাঁর মধ্যেও, কবি ইহার অবাস্তব ছলনায়, ইহার ঘুমোস-পরা বিভীষিকার স্বরূপটী উদ্ঘাটিত করিয়াছেন; চরম অন্ধকারের নীরন্ধ্র-প্রায় ব্যাপ্তির মধ্যে আত্মার আলোক-বর্তিকাটি শিথিল-কম্পিত হস্তে ঊর্ধ্বে ধরিয়াছেন। মৃত্যু-বিভীষিকা ছায়া-বাজির ন্যায় অবাস্তব। ইহা আঁধারের পটভূমিতে উৎকীর্ণ শিল্প রচনা; ইহার মধ্যে আছে সত্যের পরিবর্তে শিল্প-নৈপুণ্য। মৃত্যুর ছলনা, ইহার ছদ্ম-আশ্বাসের প্রতারণা সহজ বিশ্বাসের সহজ মহিমার নিকট ব্যর্থ হইয়া

যায়—মেঘের অন্তরাল হইতে ইহার যাত্রা-পথ-নির্দেশ এই কর্মে ঠেলিয়া প্রেরিত হয়। মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ-দুইটি কবিতার টেনিসনের কবিতার (Crossing the Bar) দিগন্তীন বিষাদের ভাব-রেশ বা ব্রাউনিংএর কবিতার (Prospice) তার পক্ষকে বলহীন কল্পনা করিয়া তাহার উপর জয়লাভের সুলভ গৌরব-ঘোষণা নাই। ইহাদের মধ্যে মরণের মায়া-জাল-ভেদ, ইহার দুরুহেয়ের রহস্য উদ্ঘাটনের মতো গৌরব সহজ, আবেগহীন ভাষায়, তত্ত্ব-আবিষ্কারের নিরাসক্ততায় প্রতিফলিত হইয়াছে। মরণ-সাহিত্যের মধ্যে ইহাদের মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

এই মৃত্যু-রহস্যের রচনাগুলির মধ্যে 'প্রান্তিকে'র দার্শনিকতার সুর আবার নিঃসন্দিগ্ধ প্রত্যয়ের সহিত ধ্বনিত হইয়াছে। 'প্রান্তিকে'র উদাত্ত-গম্ভীর কণ্ঠস্বর মৃত্যুর রহস্যময়তার ফলে একটু করুণ হইয়াছে, কিন্তু দ্বিধা বিষাদের আলোক পূর্ববৎ অবলম্বিত ও অম্লান রহিয়াছে। অপ্রত্যক্ষ সত্য প্রমাণ করিতে ভাষার যে তীব্রতা ও কণ্ঠস্বরের যে অতিরিক্ত জোরের প্রয়োজন হয়, প্রত্যক্ষ সত্যের কথা বলিতে তাহার পরিবর্তে সহজ, আবেগহীন প্রকাশ-ভঙ্গীই যথেষ্ট। শেষ গ্রন্থগুলিতে মৃত্যু-রহস্য ব্যক্ত করিতে গিয়া কবির ভাব ও ভাষার অনুরূপ পরিবর্তনই লক্ষিত হয়। যাহা ইতিপূর্বে প্রকাশের মহিমান্বিত পাণ্ডীত্য, শব্দের গাঢ় সংহতি ও প্রকাশ-ব্যঞ্জনার সমাহিত-প্রার্থী ছিল, তাহা এখন সোজা, ঘরোয়া কথায়, চোখে-দেখা বিষয়ের অভ্যুক্তিহীন বিবৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশলাভ করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'রোগশয্যা'র ২০ সংখ্যক কবিতাটি উদ্ধারযোগ্য।

রোগ দুঃখ রজনীর নিবিড় আঁধারে
যে আলোক বিচ্ছুরিত ক্ষণে ক্ষণে দেখি
মনে ভাবি কী তার নির্দেশ।
পথের পথিক যথা জ্বালায় প্রদীপ
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
সেই মত যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অনিমেষে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ-পারাবার ;
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈত্র শেষে—তীর্থ পথে।

এখানে কবি উপনিষদের দার্শনিক পরিবেশ ছাড়াইয়া প্রত্যক্ষ অনুভূতির সহজ সরলভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন।

'আরোগ্যে'র ৮ সংখ্যক কবিতায় অবসানের সুরটী কি প্রশান্ত প্রতীক্ষা, কি পরিতৃপ্ত সমাপ্তিবোধ, কি পূর্ণতার ব্যঞ্জনা মধুর করিয়া ধ্বনিত হইয়াছে।

পশ্চিমের তীর হতে অস্তগিরি শিখর আড়ালে,
গুরু আমি দিনান্তের পান্থশালা-দ্বারে,
দূরে দীপ্তি যেন অগ্নি অগ্নি
শেষ তীর্থ-মন্দিরের চূড়া।
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা এ জগতের যা কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রা-সুখে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জাগায়ে।
যাহে মনে,…নহে দূর, নহে বহু দূর।

'আরোগ্যে'র ৩০ সংখ্যক ও 'জন্মদিনে'র ২৭ সংখ্যক কবিতায় সন্ধ্যার বহিঃরূপের সহিত অন্তরাত্মার গূঢ়ার্থতার কি আশ্চর্য সমন্বয় হইয়াছে। দিন যেমন আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতে মনস্তত্ত্বীয় অন্ধকারের অন্তরালে আত্মগোপন করে, সেইরূপ জীবনের সত্যরূপ-উপলব্ধি মৃত্যু-যবনিকার ক্ষণিক অন্তরালে সম্পূর্ণতা লাভ করে। সন্ধ্যার বৈরাগ্য, চরম আত্মোৎসর্গ, নবীন দিনের আবাহনের জন্য বিলুপ্তির অন্তরালে তপঃ-সাধনা—এক কথায় ইহার সমস্ত অধ্যায় প্রতিবেশটী—তাহার ধূসর-ম্লান মুহূর্তটির কেন্দ্রবিন্দুর চারিদিকে চরম কলা-কৌশলের সহিত ব্যঞ্জিত হইয়াছে। নিখিল বিশ্বের—প্রভাতের আলোক, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রাণলীলার-সহিত মানবাত্মার আত্মীয়তা আবার নূতন করিয়া অনুভূত হইয়াছে এবং এই গ্রন্থগুলির প্রায় প্রত্যেক কবিতাতেই সেই অনুভূতির আনন্দময় অভিব্যক্তি। 'আরোগ্যে'র ৮ সংখ্যক কবিতাটি এই দার্শনিক অনুভূতি-পরম্পরার একটা চরম পরিণতি সূচিত করে। ইহাতে আমরা কবির cosmic Imagination—বিশ্ববিধানের রহস্যভেদকারী কল্পনার চূড়ান্ত উদাহরণ পাই। "শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য-প্রাঙ্গণে" নটরাজের স্তব্ধ নিঃসঙ্গতা, অপরিমেয়-বিস্তারব্যাপী সৃষ্টি-উৎসবের অবসানে স্রষ্টার রহস্যাবগুণ্ঠিত, দুরবগাহ মৌনতা, অফুরন্ত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের একের মধ্যে সংহরণের ধারণাতীত লীলা—এই পরিকল্পনার বিরাট মহিমা কবি কত সহজে আয়ত্ত করিয়া কিরূপ অবলীলাক্রমে ও স্বল্প পরিসরের মধ্যে অভিব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়-স্তম্ভিত হইতে হয়। অস্তাচল চূড়ায় দাঁড়াইয়া রবি যে শেষ রশ্মি বিকীরণ করিয়াছেন তাহাতে ধর্ম-কর্তব্যের সুবর্ণময় সংযোগ-সেতু রচিত হইয়াছে, তাহা মরণোত্তর রহস্যকে মর্মস্পর্শী করিয়া এপার-ওপারের পরিচয়-সূত্রটিকে অক্ষয় ও বাধামুক্ত করিয়া দিয়াছে। রোগের আবিল আত্মহতার শিহরে কবির দিব্যদৃষ্টি —অসাধারণ স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভেদী শক্তি লাভ করিয়াছে।

এই রোগের ঘনঘর্ষিতায় কবি আরও কতকগুলি নূতন শক্তি অর্জন করিয়াছেন। সমবেদনযুক্ত পৃথিবীর প্রাত্যহিক জীবনাবর্তনকে এক নূতন চোখে দেখে। ইংরেজ কবি যে তাঁহার একটী কবিতায় বলিয়াছেন যে রোগশয্যা হইতে উত্থিত ব্যক্তি নবজন্মের প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও সঙ্গীত-ধ্বনির জন্য কৃতজ্ঞতার ঋণ উদ্বুদ্ধ দেখিতে পায়। রবীন্দ্র-

যাদের কয়েকটি কবিতায় ইংরেজ কবির এই সাধারণ উক্তি অনেকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সহজ, সাধারণ জীবনযাত্রার প্রতি প্রত্যুষপ্রসবের যে সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা ইহার সৌন্দর্য্যের সব উপলব্ধি হইতে প্রসূত। 'রোগশয্যায়' এর ৬ সংখ্যক কবিতায় চড়ুই পাখীর আনন্দ-কূজন অন্তরঙ্গী ও গ্রাম্য ভাষার গান অভিনন্দিত হইয়াছে—এই অতি ক্ষুদ্র, জীবনের ক্ষুদ্রতম আত্যন্তিকতার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, সম্পূর্ণরূপে রোমান্সের আবাসন্ন-বর্জ্জিত পাখী যে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ তাহার সরলতা দৃষ্টিভঙ্গী, রোগের সমীকরণ শক্তির প্রভাব। ইহার ১৭ সংখ্যক কবিতায় ও 'আরোগ্যের' ২২ সংখ্যক কবিতায় রোগীর অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর, সংবেদনশীল মন কমলালেবুর উপহারের মধ্যে মাতার স্নেহ-অনুমান-উৎপন্ন কল্পনায় শ্রীড়াশীল প্রজাপতিবৃত্তির অনুশীলন ও প্রকৃতির স্নিগ্ধ মৈত্র্য অনুভব করিয়া রসনা-বিলাসের এক উচ্চতর তৃপ্তির সন্ধান পাইয়াছে। এই অবসাদেরিত তীক্ষ্ণ-চেতনা-সম্পন্ন কবি প্রভাতের আলোয় প্রসন্ন স্পর্শ প্রতি রক্তধারায় অনুভব করিয়া ইহাকে অস্তিত্বের প্রতি সম্মানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ('রোগশয্যায়' ৩২)। পলাশের রক্তিম সৌন্দর্য্য যেন কবির অবলুপ্ত যৌবনের প্রতি সুন্দরের অকৃপণ অভ্যর্থনা, অন্তর-দাবদীপ্ত প্রকৃতির পূর্ব্ব-বন্ধন স্বীকার ('আরোগ্য, ১)। প্রথমদিনে '৩' সংখ্যক কবিতায় একটু দুঃখ অনুযোগের সুর শোনা যায়—তাহা প্রকৃতির কার্পণ্যে নহে, নিজের শক্তিহীনতায়। পলাশের রক্তাক্ষর রচিত মর্ম্মিক নিমন্ত্রণলিপি কবির নিকট পৌঁছিয়াছে, কিন্তু কবি তাঁহার দুঃখের কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া এই নিমন্ত্রণ উপভোগের আনন্দ হইতে বঞ্চিত। মানুষের পরিবর্ত্তনে প্রকৃতির উদাসীন্যের চিন্তা এই কবিতায় একটু ছায়াপাত করিয়াছে, তথাপি ইহাতে অপরিমার্জ্জিত ইষৎ তিক্ত স্বীকৃতি আছে।

'রোগশয্যায়' এর ২৭ সংখ্যক কবিতা সহজের সৌন্দর্য্যানুভূতির শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি। এই ক্ষুদ্র কবিতাটির মধ্যে প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় ও দীর্ঘ অন্তরঙ্গতার সূক্ষ্মদর্শিতা এক অপরূপ সমন্বয়ে মিলিত হইয়াছে। এখানে প্রকৃতির জীবনস্পন্দনের সঙ্গে কবির রোগাক্রান্ত মুক্ত জীবনের মিষ্টি একাত্মতা, কোন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যবর্ত্তিতার নয়, প্রত্যক্ষ অনুভব-নিবার সাহায্যে, কোন অতীন্দ্রিয় রহস্যবোধের ভিতর দিয়া নয়, চক্ষুকর্ণস্পর্শের সহজ অথচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গ্রহণ-শক্তির অনুশীলনে উপলব্ধির বিষয়ীভূত হইয়াছে। নবজাত শিশুর আদিম কৌতূহলে যেন জন্মান্তরার্জ্জিত অভ্যাসদৃষ্টির রহস্যভেদকারী স্বচ্ছতায় মার্জ্জিত হইয়া এই অপূর্ব্ব আবলোকনের মধ্যদিয়া জীবনের চরম সত্যকে বিকশিত করিয়াছে।

খুলে যাও দ্বার,
নীলাকাশ করো অবারিত,
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ বক্ষে মোর করুক প্রবেশ,
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্ব্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়,
আমি বেঁচে আছি তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্ম্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ;
এ প্রভাত
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে মোর মন
যেমন সে ঢেকে রেখ নবশিশু ধাত্রীর কোলে।
ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে
তারি নিঃশেষ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে
তারি পুণ্য অভিষেক করি আজি পান।
সমস্ত জন্মের সত্য এক খানি রত্নহার রূপে
দেখি ঐ নীলিমার বুকে।

উপনিষদের ঋষি যে দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই দৃষ্টি, আবার বহু শতাব্দীর ব্যবধানে, এক বিংশ শতাব্দীর কবির চিত্তে, বহুমুখী অভিজ্ঞতার বজ্রধারায় অভিঘাত হইয়া, মানবজীবনের চরম অভিপ্রায় ও অর্থকে নিখিল-প্রকৃতি-পরিব্যাপ্ত আনন্দ-শতদলের মর্ম্মকোষ হইতে উৎসারিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

বহির্বিশ্ব

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

প্যালেষ্টাইন

আরবদের ক্ষেপাইয়া কাজ ভাল হয় নাই। পরন্তু সমস্যার গুরুত্ব বাড়িয়াছে, তাল-গোল পাকাইয়া যে গেরো বাঁধিয়াছে তাহা ছাড়াইতে অনেক তেল নুন খরচ করিতে হইবে। ইহুদী সন্ত্রাসবাদ আজ যতই তীব্র ও প্রখর রূপ পরিগ্রহ করুক না কেন, তাহার কোন ভবিষ্যৎ নাই। উত্তেজনা দিয়া আন্দোলন গড়িয়া তোলা যায় না, সাময়িক বহ্নারম্ভ প্রকাশ করা যায় মাত্র। ইংলণ্ডের সংরক্ষণশীল মন্ত্রিসভা হাসিতে খেলিতে সাম্রাজ্যের গলায় ফাঁস বাঁধাইয়াছেন। তাহারা গত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় ব্যালফুর সাহেবের মারফৎ এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়া ইহুদিদের সস্তা দরের এক সান্ত্বনা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু কে জানিত যে

এই ফাঁকা ঘোষণা এত গোলযোগ বাধাইবে। ফাঁকা ঘোষণা করিতেছি এই জন্য যে—ঘোষণার মধ্যে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে যদি প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীরা কোন প্রকার ওজর আপত্তি তুলিয়া তথাকথিত 'জাতীয় বাসভূমি' সৃষ্টি করিয়া তোলে, সে ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার তাহার নীতিতে নিরপেক্ষ হইবেন। সংরক্ষণশীল দলের পররাষ্ট্রনীতিতে সেই নিরপেক্ষতা রক্ষা হয় নাই। তার কারণ মধ্যপ্রাচ্যে ফরাসীর আগমন। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এলাকায় যাহাতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য সংরক্ষণশীলদল কম তৎপরতা দেখায় নাই। গত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর জাতিসংঘের মৌলতে যে রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব ব্রিটেন ও ফরাসী মধ্য-প্রাচ্যের আরবদেশগুলির উপর পাইয়াছিল, তাহা লইয়া রীতিমত কূটনৈতিক ঘুঁটি চালাচালি হইয়া গিয়াছে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন তাহার কাগজ-কলমে লিখিয়া-দেওয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হয় নাই। যে প্রকারেই হউক ইহুদি-সমস্যা সমাধান প্রথমে আরবদের বিরুদ্ধেই গিয়াছিল। লর্ড পীল কমিশন যাহা রায় দিয়াছিল তাহা আরব জাতি মানিয়া লয় নাই, বরং তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আরবরা করিয়াই আসিয়াছে।

মিঃ এটনি ইডেন ব্রিটেনের পররাষ্ট্রসচিব থাকা-কালীন আরবদের সত্তায় বাজীমাৎ করিবার তালে ছিলেন। খণ্ড ছিন্ন রাজনৈতিক প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করিবার আশায় তিনি আরব যুক্তরাষ্ট্রের এক সংহতির ঘোষণা প্রকাশ করেন; মূলতঃ ইহা আর একটি রাজনৈতিক চাল। কেন না আরবজাতির নব্য রাজনৈতিক চেতনাকে বিপথগামী হইতে না দিয়া—অর্থাৎ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যাইতে দিয়া নিজেদের কোলে ঝোল টানা যায় কিনা তাহারই অপচেষ্টা মাত্র। এই অপচেষ্টায় আরবজাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি রীতিমত সাহায্য করিয়াছে। বিষয়টি হইতেছে এই যে, আরবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি পরস্পর-বিরোধী ও নিজেদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় পঙ্গু। এ অবস্থায় কোন বিশেষ প্রভাবশালী রাষ্ট্র যদি কোন সংহতির জন্য সাহায্য করে তবে সত্যই একথা মনে হইবে যে বড় উপকার করিল। কিন্তু ব্রিটেনের অতি-বড়-মিত্র-ও কোনদিন এই সত্য গোপন করিতে পারিবে না যে, ব্রিটেন বিনা স্বার্থে কোথাও জলে নামিয়াছে। যেখানেই সে জলে নামিয়াছে সেখানেই সে ঘোলাটে জল হইতে কিছু না কিছু তুলিয়াছে। মোদ্দা কথা, ব্রিটেন চায় যে আরববাসীরা ঐক্যবদ্ধ হউক। ইহাতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনও সাহায্য করিবে। কিন্তু কেন সাহায্য করিবে? গত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর নবীন আরববাসীরা স্থির বুঝিয়াছিল যে ব্রিটেন যতদিন পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে বহাল আছে ততদিন পর্যন্ত কোন প্রগতিমূলক চিন্তাধারার ঠাঁই আরব রাজ্যে হইবার জো নাই। এখানে কথাপ্রসঙ্গে আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লার কথা বলিতে চাই; দেশের মধ্যে নবীন চেতনা আনিতে গিয়াই ত বেচারা ফাঁসাদে পড়িল। আরবের ক্ষেত্রেও সেইরূপ অনেকটা হইতে চলিয়াছিল। আরবের প্রগতিমূলক চিন্তাধারা মূলতঃ সিরিয়া লেবানন প্রভৃতি দেশ হইতে ছড়াইয়াছে। খুব সম্ভব আরব-ভাষাভাষী রাজ্যখণ্ডের মধ্যে সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি দেশই বেশী পরিমাণে গণতান্ত্রিকভাবাপন্ন। তা ছাড়া ট্রান্সজোর্ডন, ইরাক, অসির, হেজাজ, সৌদিআরব প্রভৃতি দেশগুলি সামন্ততান্ত্রিক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীপ্রভুত্বভোগী স্বেচ্ছাচারীর আবাসভূমি। এই সামন্ত রাজ্যগুলি যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণকে শোষণ করিয়া রাজত্ব করিতে পারিবে ততদিনই ব্রিটেন নিশ্চিন্ত থাকিবে। সেই জন্যই ব্রিটেনপ্রভাবশ্লিষ্ট কতিকয়েক প্রতিনিধিকে লইয়া ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্যে একটি সংহতির স্বপ্ন দেখিতেছে। ইহা যে জনগণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার অবহেলা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। আরবজাতির ধর্মসংস্কার ও সামাজিক সংস্কার ব্রিটেনের প্রভাবের স্থায়িত্বের কারণ হইয়াছে। তাই এই কারণ যত বেশীদিন বজায় থাকে ততই মঙ্গল। সাম্রাজ্যের বিমান পথটি নিরঙ্কুশ রাখিতে হইলে আরব জাতিকে হয় তার স্বাধীনতা মূল্য দিতে হইবে, নয়ত রাজনৈতিক প্রভাবের প্যাচে ফেলিয়া পৃথক্‌লিত মেষশাবকে পরিণত করিতে হইবে। রক্ষণশীলদল দ্বিতীয় পন্থা চেষ্টা করিয়াছিল আরব যুক্তরাষ্ট্রের নামে। ফল উল্টা হইয়াছে, আরবের রাষ্ট্রগুলি আজ নিজেদের অসহায় অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। আরব জাতির রাজনৈতিক মুক্তির প্রয়াস ক্রমশই বৃঢ় হইতেছে, তাহারই প্রমাণ আজ আরব-লীগ।

প্যালেষ্টাইনকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্যা আজ দেখা দিয়াছে তাহা ক্রমশই যুদ্ধের আরবজাতির মুক্তির আন্দোলনে পরিণত হইবে এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নূতন করিয়া চালিয়া সাজাইবে; অটোমান সাম্রাজ্যের চাপে পড়িয়া যে আরব জাতি এতদিন নিজের সত্তা হারাইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রকারের আত্ম-কলহের মধ্য দিয়া আজ ব্যাপক সংহতির দিকে চলিয়াছে। আরবের সমস্যাকে আজ বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখিবার সময় আসিয়াছে, গোটা আরব জাতি হয়ত একটা বাহ্য ইহুদি সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট আন্দোলনের বাবে ঝাঁপাইয়া পড়িবে; ইহুদিরা আজ যতই বোমা লইয়া আস্ফোশ প্রকাশ করিতেছে, ততই তাহারা আরবদের সহানুভূতি হারাইতেছে। তাহাদের যদি আরব রাজ্যখণ্ড প্যালেষ্টাইনের মধ্যে বাস করিতে হয় তবে আরবদের সহানুভূতিই একমাত্র সহায়। ব্রিটেনের শ্রমিক দল যদি সত্যই বৈপ্লবিক বুদ্ধিসম্পন্ন হয় তবে তাহারা আরব জাতির জনগণের মুক্তির কথা ভাবিয়া ব্যাপক ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করিবেন।

দার্দানেলিস

তুর্কীতে নির্বাচন কার্য্য চলিতেছে। তুর্কীর রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম গণতান্ত্রিক মতে বিরোধী দলকে তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ দেওয়া হইল; এই পর্য্যন্ত দুই শ্রেণীর বিরোধীদল তুর্কীর রাজনৈতিক জগতে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে একদল গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে জাতীয় নির্ব্বাচনকে গ্রহণ করিতে চায়, আর একদল নির্ব্বাচনকে বয়কট করিয়া তাহাদের মতামত জ্ঞাপন করিতেছে, শেষোক্ত দল অপেক্ষাকৃত বিদেশী প্রভাবের বাহন হইয়া পড়িয়াছে; ইহার কর্ত্তা যিনি তিনি এককালে কোমিনটর্নের একটি শাখার অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি তুর্কীর সমাজতান্ত্রিক চাষী ও মজদুর দলের নেতা। যাহা আশা করা গিয়াছিল তাহাই ঘটিয়াছে। তুর্কী শত চেষ্টা করিয়াও বৈদেশিক প্রভাব হইতে মুক্তি পায় নাই। রাষ্ট্রের মত তুর্কীর সমস্ত আভ্যন্তরীণ রাজনীতি আজ বিদেশী প্রভাব গ্রাস করিতে সুরু করিয়াছে। পটস্‌ডামে বিশ্বশক্তি-বর্গের যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহাতে স্থির হয় যে তুর্কীর দার্দানেলিস্ প্রণালী সম্বন্ধে যদি নূতন করিয়া কোন বিবেচনা প্রয়োজন হয় তবে তাহা ৩ শ রাষ্ট্র নিজেরাই করিবেন। বস্তুত তাহাই ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের মুখে তুর্কীর রাষ্ট্রপতি ইনেনু দার্দানেলিস প্রণালীর নিরাপত্তার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে শুধু দার্দানেলিস্ প্রণালীর কথাই এককভাবে বিচার করিবার নহে, কেননা গোটা ইস্তামবুলের নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়াইয়া পড়িয়াছে। কাজেই বিষয়টি আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ধারণ করিয়াছে। তুর্কীর ইস্তামবুল যদি ত্রিয়েস্তের মত আন্তর্জাতিক এলাকা হইয়া দাঁড়ায় তবে ভয়ের কথা অবশ্যই আছে বলিতে হইবে—এমন কোন ব্যবস্থা তুর্কী মানিয়া লইতে চাহিবে কি? অথচ দার্দানেলিসের সমস্যায় তুর্কী বাদে ব্রিটেন ও রাশিয়ার স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রহিয়াছে। এবারে আবার নূতন সমস্যা মার্কিণদের লইয়া দেখা দিয়াছে। কেননা পটস্‌ডাম আলোচনায় মার্কিণরা অংশীদার ছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মন্‌ট্রে কন্‌ভেনশনে মার্কিণরা কেউ ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান দার্দানেলিস্ সমস্যায় মার্কিণরা কেউকেটা হইয়াপড়িয়াছেন; মার্কিণদের আস্থানী বিজয় যে কি পরিমাণ ফল প্রসব করিয়াছে তাহা এখন বেশ বোঝা যাইতেছে। মার্কিণরা নাকি দার্দানেলিস্ সমস্যায় রীতিমত উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে। অবশ্য এইরূপ উৎসাহ প্রকাশের নিগূঢ় কারণ কি তাহা অভিজ্ঞ পাঠক বুঝিয়া লইবেন। আমরা শুধু বলিতে চাই যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ রাজনীতির যে শিশুর চলাচল রাষ্ট্রপতি মনরো এক মহা নীতির বাঁধন দিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন—সেই শিশু সাবালক হইয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি ম্যাকিনলের আমলে প্রথম শিকল ছিঁড়িল, অর্থাৎ পথ চিনিল। ফিলিপাইন অধিকার হইল, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ প্রশান্ত-মহাসাগরে পাইকপর তর করিয়া ভাসিতে সুরু করিল। চীনদেশের তীরে তাহা (Open door) মুক্তদ্বার নীতির দাবী জানাইল এবং তাহা কালে পূর্ণ হইল। সেই যে অভিযান সুরু হইয়াছে তাহা আজ পর্য্যন্ত বন্ধ হয় নাই। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিণরা যুদ্ধ করিয়া ঠকিয়াছে কেহ কেহ তাহা মনে করেন, কেননা অনেক টাকা মারা গিয়াছে। লোকসানটা সামলাইয়া লইতে হইবে ত? কাজেই এবার আর ছাড়াছাড়ি নাই। যেখানেই সুবিধা

পাইতেছে—সেইখানেই মার্কিণরা ভদ্রলোকের মত দাঁড়াইয়া কথা শুনিতেছেন, আর সুযোগ পাইলেই বসিয়া পড়িতেছেন। ইহাই হইল এযুগের সম্প্রসারণ নীতি। পটস্‌ডাম্ আলোচনার সময় হয়ত ভদ্রলোকের মত সব কথা শুনিয়া রাখিয়াছে এবং কোথায় রন্ধ্র পথ আছে তাহাও অনুসন্ধান করিয়া রাখিয়াছে। আজ যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে, অবস্থা অনেকটা শান্ত—তাই এই সুযোগে মার্কিণ স্বরাষ্ট্রসচিব বার্ণেস দার্দ্দানেলিসে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছে। মার্কিণরা ইতিমধ্যেই তুর্কীর পররাষ্ট্র সচিবের নিকট এক নোট পাঠাইয়াছেন এবং সেই নোটের সারাংশ মিঃ বার্ণেস যথামত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রিটিশ তরফের খবর হইতেছে যে তুর্কীরা মার্কিণদের লইয়া খুব নাচানাচি করিতেছে—অর্থাৎ মার্কিণরা যাতে দার্দ্দানেলিস্ সমস্যায় যোগদান করে তাহাই তুর্কীর ইচ্ছা। গত কয়েক বছর ধরিয়া তুর্কী রাষ্ট্রের অধিনায়ক যে পরিমাণ কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে যে তিনি তুর্কীর স্বার্থ বিশেষভাবে রক্ষা না করিয়া কোন কাজে হাত দিবেন তাহা আমরা মনে করি না; সোভিয়েট মনোভাব ইতি-পূর্ব্বে গত জুন মাসের নোটএ প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া অভিজ্ঞ পর্য্যবেক্ষক মনে করেন। কেননা গত জুন মাসে ইস্তাম্বুলে সোভিয়েটের তরফ হইতে যে নোট প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে তুর্কীর বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে প্রস্তুত। আর দার্দ্দানেলিসের নিরাপত্তা-রক্ষার জন্য সোভিয়েটকে ঘাঁটি দেওয়া হউক, কেননা সোভিয়েট তুর্কীর সঙ্গে একযোগে প্রণালীর নিরাপত্তার রক্ষার দায়িত্ব লইতে রাজি আছে। তুর্কী ইহার উত্তরে এক গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনার প্রস্তাব করিয়াছে।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ভারত সরকারের ঋণসংগ্রহ নীতি

ভারতবর্ষে এখন কাঁচাই টাকার রাজত্ব চলিয়াছে। যুদ্ধের আগের তুলনায় দেশে পণ্য কমিয়াছে, কিন্তু টাকা বাড়িয়াছে প্রায় সাত গুণ। এই প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতির ফলে একদিকে যেমন পণ্যাদির মূল্য অসম্ভব রকম চড়িয়াছে, অন্যদিকে তেমনি টাকার ব্যবহারিক মূল্য কমিয়া যাওয়ায় সঞ্চয়ীকৃত টাকা হইতে আর আগের হিসাবে লভ্যাংশহারে ব্যাজ পাইতেছে। যুদ্ধের মধ্যে দেশে আশানুরূপ শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয় নাই বলিয়া লোকে পাহাড় প্রমাণ টাকা যাহে জমা রাখিয়াছে, কিন্তু ব্যাঙ্কগুলিও টাকা খাটাইবার ভাল ব্যবস্থা করিতে না পারায় আমানতের সুদের হার অত্যন্ত কমাইয়া দিয়াছে। ব্যাঙ্কের সুদের হার এইভাবে কমিয়া যাওয়ায় জন্য অনেকে আবার সোনার বাজারে ও সরকারী ঋণপত্রের উপর টাকা খাটানোর পক্ষপাতী হইতেছে। যুদ্ধবিরতির এক বৎসর পরে এখনো দেশের প্রচণ্ড পণ্যাভাব কমিবার এখন কিছু লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, কাজেই আশা করা যায় যে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির এখনো দীর্ঘদিন মোটা লাভ হইবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভ হইলে সোনার ডিভিডেণ্ডের চাহিদাও দীর্ঘকাল রক্ষিত হইবে। এই জন্যই এখনকার চড়া বাজারেও লোকে সোনা কিনিবার আগ্রহ দেখাইতেছে। সরকারি ঋণপত্র সম্বন্ধেও একই কথা। চলতি সোনার মত সরকারী ঋণপত্রগুলিও যে কোন সময়ে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যায়। ভারত সরকার ঋণপত্র-সমূহের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই সুদের হার এখানকার দস্তা টাকার বাজারের হিসাবে লোভনীয় সন্দেহ নাই। কাজে কাজেই দেশের অর্থবান ব্যক্তিগণ এবং বুঁকিদারেরা সোনার ও ঋণপত্র কিনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইতেছে এবং তাহাদের প্রচণ্ড চাহিদার চাপে তেজী বাজার আরও তেজী হইয়া উঠিতেছে।

আগে ভারতে যখন দৈনিক দুই শত কোটি বা তাহারও কম টাকার নোট চলিত, তখন বেশী সুদের প্রতিশ্রুতি না দিলে ভারত সরকার প্রয়োজনমত ঋণসংগ্রহ করিতে পারিতেন না। তখন তাঁহারা শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হিসাবেও ঋণপত্রের উপর সুদ দিয়াছেন। স্বাধীনভাবে ঋণসংগ্রহের জন্য তাঁহারা ২৭২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার মেয়াদীহীন ৩% আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি কিস্তিতে বাজারে ছাড়িয়াছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে অবশ্য ভারতে টাকার পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি করিয়া বাড়িতে থাকে। যানাভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রচণ্ড খরচ চালাইতে ভারত সরকারকে প্রচুর টাকা ধার করিতে হয়। এই সময় লোকের হাতে অনেক টাকা জমিয়া যায়, অথচ সেই টাকা লাভজনকভাবে নিরাপত্তার ভিত্তিতে খাটাইবার কোন পথ তাহারা খুঁজিয়া পায় না। এই সব লোকের নিকট হইতে ভারত সরকার শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা সুদে কিস্তির ঋণপত্রে প্রায় বারো কোটি টাকা সংগ্রহ করেন। সেদিকে

আরও কম সুদে টাকা পাওয়া সম্ভব হয় এবং শতকরা বার্ষিক ২৸০ আনা সুদের কিছু পরিমাণ ঋণপত্র তাঁহারা বাজারে ছাড়েন। ১৯৪৫ সালে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে শতকরা বার্ষিক ২৸০ আনা সুদের সরকারী ঋণপত্রও বাজারে ছাড়া হয়।

বাজারে এরূপ টাকার প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকার অকস্মাৎ ৩৸০ আনা সুদের অস্থায়ী কোম্পানীর-কাগজগুলি শোধ করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই কোম্পানীর কাগজ অল্পতর সুদের ঋণপত্রে রূপান্তরিত করিবার আয়োজন করায় সুদের বাবদ ভারত সরকারের বৎসরে বেশ কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে। ভারত সরকার ১৯৪৯ সালের ২৩শে মে এক বিজ্ঞপ্তিতে ৩৸০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ বাতিলের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ৩৸০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের মালিকেরা ইচ্ছা করিলে কাগজের উপর লিখিত মূল্যের সমপরিমাণ নগদ টাকা ফিরাইয়া লইতে পারিবেন, অথবা এই লিখিত টাকার হিসাবে তাঁহারা সমমূল্যে ১৯৮৮ সালে পরিশোধিতব্য শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা সুদের ১৯৪৮ সালের অবতারদন লোন কিম্বা শতকরা ৯৯ টাকা দরে ১৯৭৩ সালে পরিশোধিতব্য শতকরা বার্ষিক ২৸০ আনা সুদের ঋণপত্র ক্রয় করিতে পারিবেন। কোম্পানীর কাগজ এই ভাবে পরিবর্ত্তনের সময় ১৯৪৯ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ধার্য্য হইয়াছে।

গত আষাঢ় মাসের ভারতবর্ষে '৩৸০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ বাতিলের সিদ্ধান্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা সুদের বাবদ খরচ বাঁচাইবার এই সিদ্ধান্তের জন্য ভারত সরকারকে অভিনন্দিত করিয়াছি। বাস্তবিক যেখানে শতকরা বার্ষিক ২৸০ আনা সুদে জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা পাওয়া যায়, সেখানে এই গরীব দেশের একশত কোটি টাকা বৎসরে বহাল করিয়া দেওয়ার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা ভারত সরকারকে ব্রিটেনে অবরোধাবদ্ধে সঞ্চিত ভারতের ১৮শত কোটি টাকা ষ্টার্লিং পাওনা হইতে রেলওয়ে সংক্রান্ত ঋণপত্রগুলি পরিশোধ করিয়া বৎসরে সুদের বাবদ ৩০ কোটি টাকা বাঁচাইবার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। তাছাড়া আমরা ভারত বলিয়াছিলাম যে, ৩৸০ আনা সুদের ঋণপত্রে হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি বহু জনহিতকর ও মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠান চলে, ঋণপত্র পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের বাজেটে বিপর্য্যয় দেখা দিবে এবং তাহাতে বিরাট জাতীয় ক্ষতির সম্ভাবনা। দুঃখের বিষয়, ভারত সরকার এবারও সেদোক্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দুইটির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য, এই অমনোযোগিতার ফলে ৩৸০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ বাতিলের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে অসুবিধাগ্রস্ত দেশবাসীর নিকট ভারত সরকার কিছুতেই প্রশংসাভাজন হইতে পারেন না।

যাহা হউক, ঋণের উপর লক্ষ্য টাকার সুদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারত সরকার যে তাঁহাদের ঋণসংগ্রহ নীতির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন, ইহার ফল দেশের অর্থনীতির উপর ভালই হইবে। সরকারী ঋণপত্রের সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় লোকে এখন বেশীর শিল্পাদিতে টাকা খাটাইতে অপেক্ষাকৃত অধিক উৎসুক্য অনুভব করিবেন। তাছাড়া ঋণপত্রের সুদের হার কমার সঙ্গে সঙ্গে ডিপার্ট ব্যাঙ্কের সুদের হার কমিবারও আশা করা যায়। বাস্তবিক টাকার বাজারের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়—ভারত সরকার ঋণপত্রের সুদের হার কমাইবার দিকেই এখন নজর দিবেন। সম্প্রতি তাঁহারা ৩৫ কোটি টাকার যে নূতন ঋণপত্র বিক্রয় করিয়াছেন, তাহার জন্য সুদ দেওয়া হইয়াছে শতকরা মাত্র ২৸০ আনা। বাজারে টাকার প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে ভারত সরকার এমনি আশান্বিত যে, ১৯৫১ সালে পরিশোধনীয় ৩৫ কোটি টাকার ঋণপত্র বেচিবার জন্য তাঁহারা মাত্র ১দিন (১৯৪৯ সালের ১লা আগষ্ট) সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, অতঃপর ভারত সরকার যে সকল ঋণপত্র বাজারে ছাড়িবেন, সেগুলির সুদের হার শতকরা বার্ষিক ২৸০ টাকার আশপাশে থাকাই স্বাভাবিক।

ব্রিটেনের নূতন মার্কিণ ঋণলাভ

সুদীর্ঘ সাতবছর কাল অত্যন্ত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কাটাইয়া অবশেষে ব্রিটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ৩৭২ কোটি ডলার বা প্রায় ১২ শত কোটি টাকা ঋণলাভে সমর্থ হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটেনকে ঋণ ও ইজারা নীতি অনুযায়ী প্রচুর অর্থ ধার দেয়। যুদ্ধ থামিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এই ঋণপ্রদান ব্যবস্থার অবসান ঘটে। কিন্তু সেই সময় সমরবিজয়ী ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা এমনি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, মার্কিণ ঋণ বন্ধ হইবার পর তাহার অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যুদ্ধের হাঙ্গামায় বাণিজ্যজীবী ব্রিটেনের বহির্বাণিজ্য দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সমরপণ্য উৎপাদন কারখানাগুলিকে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের কারখানায় রূপান্তরিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই বহির্বাণিজ্য পুনর্গঠন করা প্রয়োজনসাপেক্ষ। ব্রিটেনের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক ঋণসংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে অদূরভবিষ্যতে সার্বজনীন কর্ম্মসংস্থান অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটেনের নবগঠিত শ্রমিক মন্ত্রিসভা বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতপ্রবর লর্ড কিনেসকে, নূতন মার্কিণ ঋণসংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় পাঠান। কিনেস মিশন যুক্তরাষ্ট্র সভাপতি ও সিনেটারদের বুঝাইয়া দেন, ব্রিটেনের এই ঋণলাভের উপর পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক প্রভাবের প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। যাহা হউক, অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ ঋণদানে আংশিক সম্মতি দিয়া এই সম্পর্কে একটি বিল সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে উপস্থাপিত করেন। অধিকাংশ আমেরিকান এই ঋণের সপক্ষে থাকিলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ও নিঃস্ব ব্রিটেনকে নূতন ঋণদানে আপত্তি জানান। তাঁহারা ব্রিটেনের স্যালেস্টাইন নীতির জটিলতার জন্য মার্কিণ ইহুদিও ইংরেজদের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া যান এবং প্রতিনিধিপরিষদে ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক বিলটি যখন উপস্থাপিত হয় তখন ইহা বাতিল করিয়া দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। মার্কিণ কংগ্রেসের ডেমোক্রেট সদস্য মিঃ

ইসাহুয়েল সেনার এই বিদ্রোহ প্রদর্শনকারীদের নেতৃত্ব করেন। যাহা হউক, বিরোধী দলের তীব্র বাদানুবাদ সত্ত্বেও মার্কিন সেনেটে ৪৩-৩৪ ভোটে ও প্রতিনিধি পরিষদে ২১৮-১৪৪ ভোটে বিলটি গৃহীত হইয়াছে। পরিষদ বিলটি গ্রহণ করিবার পর গত ১২ই জুলাই মার্কিন সভাপতি ট্রুম্যান আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরদান করিয়া বিলটিকে আইনে পরিণত করেন।

অবশ্য যুদ্ধের সময় ব্রিটেনকে ঋণী করার আমেরিকার স্বার্থ ছিল বলিয়া ঋণ ইজারা রীতি অনুসারে মার্কিন সাহায্যের জন্য ব্রিটেনের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না, কিন্তু এখানের এই নূতন ঋণের জন্য ব্রিটেনকে কতকগুলি সর্ত মানিয়া লইতে হইয়াছে। এইসব সর্তের মধ্যে মার্কিন ঋণ অপেক্ষা সুবিধাজনক হারে নূতন সাম্রাজ্যিক ঋণ লাভের ব্যবস্থা না করা, কোন প্রকার আন্তর্জাতিক শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাবে উৎসাহী হইবার অধিকারী না থাকা, সাম্রাজ্যিক ডলার পুল তুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি প্রধান। ব্রিটেন সাম্রাজ্যিক ডলার পুলের যৌক্তিকতা যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যভুক্ত সকল দেশের ডলার উপার্জন স্বচ্ছন্দে নিজের কাজে লাগাইয়াছে এবং ফলে ব্রিটেনের পণ্য বাজারে ভারল্যও রক্ষিত হইলেও ভারতের মত দেশে দুইটি পণ্যাগার ও ভারবহ মুদ্রানীতি দেখা দিয়াছে। অটোয়া চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন যে সাম্রাজ্যিক সুবিধা পাইয়াছে তাহারও মূল্য কম নয়। এই সব সুবিধা আর একবৎসরের মধ্যে স্বল্পাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া এই নূতন ঋণলাভে ব্রিটেনের যতখানি বল আশঙ্কিত হয় নাই। এই বলের জোর: মিঃ চার্চিল প্রকাশ্যভাবে অভিযোগ করিয়াছেন যে, অধিক গভর্নমেন্ট সাম্যবাদ ঋণলাভের বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকাছে ব্রিটিশ সমর বিভাগকে বিকাইয়া দিতে চলিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ব্রিটেনের বর্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া অধিক বল ও অধিকাংশ ব্রিটিশ জন-সাধারণ এই ঋণলাভের সংবাদে খুশী হইয়াছেন। এই ঋণের হিসাবে লব্ধ অর্থের দ্বারা ব্রিটেনের শিল্পবাণিজ্যের প্রভূত সুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাম্রাজ্যিক অন্যান্য সুবিধা না লইয়াও এইবার ব্রিটেন দ্বিগুণ পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে। ব্রিটিশ অর্থসচিব ডাঃ হিউ ডালটন এই ঋণলাভকে ব্রিটেনের আর্থিক পুনর্গঠনের পক্ষে মহান সুযোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাঁহাদের এলাকার খনিগুলির মার্কিন উত্তোলিত ১০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ হইতে ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনকে অন্ততঃ ৮ কোটি পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রতি আউন্স খাঁটি সোনা ৮ পাউণ্ড ১২ শিলিং ৬ পেন্স দরে ব্রিটেন এই স্বর্ণ কিনিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, এইভাবে মার্কিন স্বর্ণ ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ লাভ করায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষে বহির্বাণিজ্য ও মুদ্রাব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করা বিশেষ কঠিন হইবে না।

স্থির হইয়াছে, পঞ্চকরা ২ টাকা হারে ঋণ পরিশোধ ব্রিটেনকে ১৯৫১ সাল হইতে মোট বেয়াল্লিশ টাকা ৩০টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং ব্রিটিশ প্রীতি বিবেচনা করিলে ঋণের সর্ত আর একটু সুবিধাজনক হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মিঃ বেভিন উপস্থিত আন্তরকার উপায় হিসাবে যে সর্তে ঋণলাভ করিয়াছে, তাহাও যথেষ্ট আশাজনক সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান এখন যে পর্যায়ে নামিয়াছে তাহাতে ব্রিটেনকে যুদ্ধের আগেকার হিসাবে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ অবিলম্বে অন্ততঃ বেড়াইতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলোচ্য ঋণ না দিলে এই বাণিজ্য সম্ভবপর হইত, তথা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে হাত দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইত। ঋণদান বিল আইনে পরিণত হইবার মাত্র দুই দিনের মধ্যে, অর্থাৎ ১৩ই জুলাই যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের হিসাবে ঋণের একাংশ (৩০ কোটি ডলার) বিট ইন্ডিজ কেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছেন। ঋণলাভ এইভাবে স্বরান্বিত হওয়ায় ব্রিটিশ অর্থসচিবের পক্ষে পুনর্গঠন পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকরী করা অবশ্যই সম্ভব হইবে।

ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা যে ১৮৭৫ কোটি টাকা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় পচিতেছে, ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল না হইলে তাহা আদায় করা নিঃসন্দেহে কঠিন। ইঙ্গ-মার্কিন ঋণচুক্তিতে ভারতের কথা বিশেষ বিবেচিত হয় নাই, বরং তাহার ফলে পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক ব্লক সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া ভবিষ্যৎ যেন ভারতবর্ষের পক্ষে অন্ধকারই কথা। তবু মার্কিন ঋণ ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ লাভ করায় ব্রিটেন অল্পদিনের মধ্যে স্বচ্ছল হইয়া উঠিবে বলিয়া ভারতবাসী ভারতের আর্থিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একমাত্র ভরসা পাওনা ষ্টার্লিংগুলি শীঘ্র ফিরিয়া পাইবার আশা করিতে পারে।

২৩।৭।৪৬

অভিনয়

শ্রীরমোলা দে

মিথ্যা মানুষ করে অভিনয় জীবনের পথে
খেতপাথরের অট্টালিকাতে, ছিটাবেড়া খেতা ঘরে,
সেখানে ক'জন সত্যবাদীর হয়? পূর্ণিমায় পটে
মুখস খুলি আল ক'রে ব'লে কারো সুখ্যাতি রটে!

আলোকমঞ্চে সুখে দেয় হায় অগণিকের করতালি
ধরিত্রী-মাঝে সম্রাট যেথা প্রহর-ঘণ্টাবাদী।
দেখা যাঁরে কেন নিশা লভি না? আসল শ্রীরূপ এসে
সেথা অভিনয় ক'রে চলে যাই সেথা অন্তরে রেখে।

বাঙ্গালার আজ্ঞাপরিস্থিতি—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসদলের সদস্যগণের পক্ষ হইতে বাঙ্গালার খাদ্যপরিস্থিতি সম্বন্ধে এক পুস্তিকা প্রচার করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—"বাঙ্গালা সরকার আজ দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই না করিয়া জনগণের জীবন তুচ্ছ করিয়া মুসলেম লীগকে শক্তিশালী করিবার জন্য যে অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার কোন কোন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে খাদ্য সরবরাহকারী নিয়োগ করা হইয়াছে, ফলে মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া হিন্দুদিগকে সাগরা দান করা হয় নাই। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, ঘাটতি অঞ্চলে চাউলের মণ ৩০ হইতে ৪০ টাকা—যে স্থানে ঘাটতি কম, সেখানে চাউলের মণ ১৮ হইতে ২১ টাকা। কোন কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে, জনসাধারণ অনশনে দিন কাটাইতেছে, কোন কোন স্থানে লোক অভাবে কচু সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। জলপাইগুড়ি, বগুড়া ও চট্টগ্রামের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এখনও চাউল অজ্ঞাতস্থানে রপ্তানী করা হইতেছে। খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থায় দুর্নীতি আছে। নূতন রেশনিং প্রথা আদৌ সন্তোষজনক নহে। চাঁদপুরে হিন্দুগণকে ও ঢাকা জেলার এক স্থানে নমশূদ্রগণকে বাদ দিয়া মুসলমানদিগকে শুধু চাউল দেওয়া হইয়াছে। মৈমনসিংহ-কিশোরগঞ্জে মুসলমানগণকে ছাড়া অপর কাহাকেও খাদ্য শস্য দেওয়া হয় না। মুন্সীগঞ্জে মুসলমানের দোকানগুলি পরীক্ষা করা হয় না। ঐ বিবৃতিতে বিশেষভাবে চোরাবাজার, বর্ত্তমান দুর্নীতি ও অব্যবস্থার নিন্দা করা হইয়াছে।"

বন্যার প্রকোপ—

এবার বাঙ্গালা ও আসামের বহু স্থানেই ভীষণ বন্যায় লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে চট্টগ্রামের অবস্থা সর্ব্বাধিক শোচনীয়। তথায় ৫ দিনে ২১ ইঞ্চি বারিপাতের ফলে সমগ্র উপত্যকাভূমি বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ করিম জানাইয়াছেন—"মোট ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই তবে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, উহা ১৯৩১ সালের মেদিনীপুরের ভয়াবহ বন্যার ক্ষতিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।" চট্টগ্রামের নেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন জানাইয়াছেন যে, বন্যায় চট্টগ্রামের তিন লক্ষেরও অধিক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার গভর্ণর নিজে চট্টগ্রামে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল দেখিতে গিয়াছিলেন। আসামে কামরূপ, নওগাঁ, শিবসাগর ও লখীমপুর ৪টি জেলা বন্যার ফলে দারুণ দুর্গতির কবলে পড়িয়াছে। জলে মরা মানুষ ও গরুর গোলা ভাসিতেছে। ইন্দ্রল ও নাগুা নদীতে জলবৃদ্ধির ফলে ইন্দ্রল সহর জলমগ্ন হইয়াছে। তিমাপুর-মণিপুরপথে ডাক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নোয়াখালিতে ফেণী ও মুহুরী নদীর বন্যায় ফেণী মহকুমা সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া গিয়াছে। সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর জলবৃদ্ধিতে ১২টি ইউনিয়ন জলমগ্ন হইয়াছে। ঐ স্থানের ১ লক্ষ অধিবাসী বহির্জগত হইতে সম্পর্করহিত হইয়া গিয়াছিল। চট্টগ্রামে ফটিকছড়ি, রাওজান, রাহুনিয়া, হাটহাজারী, পটিয়া, সাতকানিয়া, মিরসরাই, কুতুবদিয়া ও চাকরিয়া এই ৯টি ইউনিয়নের লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বন্যা সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে সভাপতি করিয়া কলিকাতায় এক কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। শরৎবাবুর নির্দ্দেশমত মেজর জেনারেল শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (আজাদ-হিন্দ সরকারের মন্ত্রী) চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন ও নিজে সকল সাহায্য কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কলিকাতা ১১৬ লোয়ার সার্কুলার রোডে কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ত্রিপুরা জেলায় গোমতী নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া সোনামুরা সাবডিভিসন—ইউনিয়ন পূর্ণভাবে এবং

বামনপাড়া, বুড়ীচং ও চাঁদনা ইউনিয়ন আংশিকভাবে প্লাবিত হইয়াছে। কাবেরী নদীর জলবৃদ্ধির ফলে ১০ মাইল জমীর আউস ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নদীয়া জেলার মেহেরপুর অঞ্চলেও লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আসাম ও বাঙ্গালার বন্যা সাহায্যে সকলকে অর্থদান করিতে নিবেদন জানাইয়াছেন। আসামের কাছাড় জেলার বন্যার ফলে ৮ শত গ্রামের দুই লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া শিলচরের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রশঙ্কর দত্ত সংবাদ দিয়াছেন।

কলিকাতায় মহিলা সম্মিলনে সমাগত শ্রীযুক্তা হংস মেটা ও রাজকুমারী অমৃত কাউর ফটো—পাল্লা সেন

রুশিয়ায় শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে—

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি, খ্যাতনামা শ্রমিক-নেতা শ্রীযুক্ত এস-এ ডাঙ্গে বর্ত্তমানে রুশিয়ায় আছেন। তিনি ৪ঠা জুলাই তথায় এক সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া ভারতীয় শ্রমিকদের দুর্দ্দশার কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন —ভারতে ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদিগকেও কারখানায় কাজ করিতে দেওয়া হয়। ভারতে বাসস্থানের অভাবের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি—

ভারতের কাপড়ের কলসমূহের মালিকগণ ১লা আগষ্ট হইতে কাপড়ের দাম বাড়াইয়া দিয়াছেন। মোটা কাপড়ের দাম শতকরা ৮ টাকা বাড়িবে। অথচ এই মূল্য বৃদ্ধির কোন কারণ নাই। সম্প্রতি মিলমালিক সমিতি অতিরিক্ত আয় কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। বস্ত্রের মূল্য এখনই খুব বেশী—ইহার উপর মূল্য বাড়িলে লোকের আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। এ বিষয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া উচিত। যুদ্ধের সময় মিল-মালিকগণ প্রভূত লাভ করিয়াছেন। কাজেই এখন লাভের পরিমাণ কম হইলেও তাঁহাদের তাহা সহ্য করা কর্ত্তব্য।

বিলাতে ভারত-কথা প্রচার—

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ বিলাতে যাইয়াও তথায় ভারতের কথা প্রচার করিতেছেন। ৯ই জুলাই লণ্ডনের 'টাইম্‌স' পত্রে তাঁহার এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—ভারতের ৩০ কোটি লোক কংগ্রেসকে মান্য করে—আর মাত্র ৯ কোটি লোক মুসলেম লীগের ভক্ত। এ অবস্থায় কি করিয়া লীগ-নেতা কংগ্রেসের সহিত সমানসংখ্যক প্রতিনিধি দাবী করেন, তাহা বুঝা যায় না। ভারতবাসী মুসলমানগণ সকলেও লীগের ভক্ত নহে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের মুসলমানগণ কংগ্রেসের অধীনে কাজ করিতেছেন।

শ্রেণীতে বস্ত্র রক্ষণ—

নোয়াখালি জেলার জেলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় ৫ জন সরকারী কর্ম্মচারী ৭ মাসে মোট এক হাজার গজ কাপড় নিজেদের ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিয়াছে। এ অবস্থায় সাধারণ লোককে যে বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইয়া দিন যাপন করিতে হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এই সকল কর্ম্মচারীকে কি উপযুক্ত শাস্তিপ্রদানের কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না? তাহা করা না হইলে চিরকাল এইরূপ দুর্নীতি চলিতে থাকিবে।

শ্রীযুক্ত রজনীপামী দত্ত—

শ্রীযুক্ত রজনীপামী দত্ত ভারতবাসী, তিনি বিলাতে থাকিয়া বৃটীশ কম্যুনিষ্ট দলের নেতা হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ভারত ভ্রমণে আসিয়াছেন। ৭ই জুলাই লাহোরে এক সভায় তিনি বলিয়াছেন—বৃটীশ মন্ত্রিমিশন যে স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা দ্বারা জনগণ মোটেই উপকৃত হইবে না। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টগণ

উপকৃত হইতে পারেন। দিল্লী ও সিমলায় যেমন সকল আপোষ চেষ্টা বিফল হইয়াছে, গণপরিষদেও তাহাই হইবে।

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস—

৭ই জুলাই বোম্বায়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে যোগদান করিয়া মহাত্মা গান্ধী ভারতের কংগ্রেস নেতাদিগকে ধীরভাবে সকল বিষয় বিবেচনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি সকলকে গণপরিষদের মধ্য দিয়া স্বদেশী শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—যাহারা প্রকৃত সত্যাগ্রহী, তাহাদের কেহ ঠকাইতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা জয়লাভ করে। তিনি সভার পূর্ব্ব ১ ঘণ্টাকাল এ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

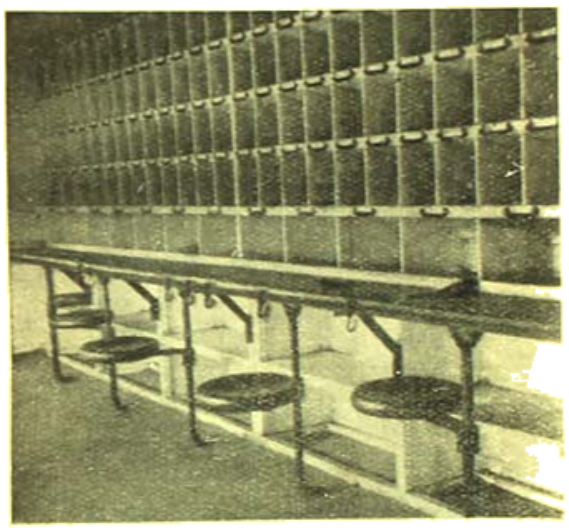

ডাক বর্ষটের জন্য বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আগত আর-এম-এসএর খালি কামরা ফটো—পান্না সেন

৯ই আগষ্ট পালন—

কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ উভয়েই আগামী ৯ই আগষ্ট 'বিপ্লবের স্মৃতিদিবস' রূপে সকলকে ঐ দিন পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পরাধীন ভারতবাসীদের ঐ দিন স্বাধীনতা লাভের উপায়ের কথা আলোচনা করিতে বলা হইয়াছে।

পদ্মরাজকে পদ্মরাজ উপাধি—

বাঙ্গালার হিন্দু-মহাসভা আন্দোলনের অন্যতম নেতা পদ্মরাজ জৈন মহাশয় গত ৬ই জুলাই পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি লোকমান্য তিলকের শিষ্য ছিলেন; পরে ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে ও ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছিলেন। মোপলা বিদ্রোহের পর তিনি হিন্দুমহাসভা আন্দোলন আরম্ভ করেন। বহুকাল তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা ও নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সাধারণ-সম্পাদক ছিলেন। ১৫ বৎসর তিনি হিন্দু অবলা আশ্রমের সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ, হায়দ্রাবাদ সত্যাগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহার ত্যাগ ও কার্য্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

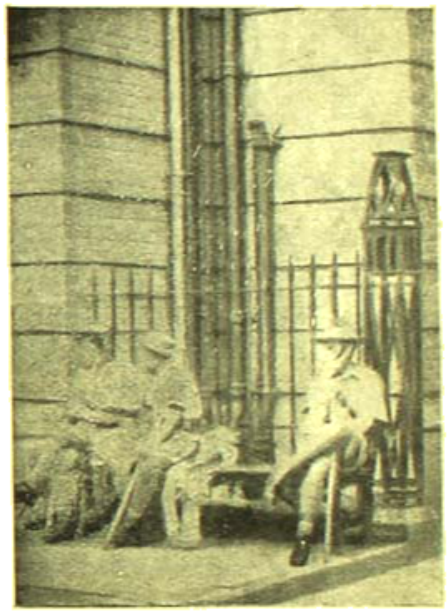

ডাক বর্ষটের ফলে সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা ফটো—পান্না সেন

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—

ভারত গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা ও বিহার গভর্ণমেণ্টের সহযোগে ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া দামোদর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। দামোদর নদে ২টি, বরাকর নদে ৩টি এবং কোনার ও বোকারো নদে ১টি করিয়া মোট ৭টি বাঁধ দেওয়া হইবে। ফলে প্রচুর ইলেকট্রিক শক্তি উৎপাদন করা যাইবে ও ৭ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমীতে জল সেচের ব্যবস্থা হইবে। এখনই ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ মাইল একটি পথ প্রস্তুত করা হইতেছে—তাহার পর মইথনে ২ লক্ষ ঘন গজ মাটী সরাইয়া প্রথম বাঁধ প্রস্তুত হইবে। পরিকল্পনা

বিরাট. কার্য্যতঃ ইহা কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহা দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া থাকিবে।

রেঙ্গুনে শ্রীশরৎ বসু—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার পুত্র শ্রীমান শিশির বসু ও সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ভিখানীকে সঙ্গে লইয়া ২০শে জুলাই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বিমানে ২১শে জুলাই রেঙ্গুনে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত দীননাথের গৃহ অশোক ভিলায় অতিথি হইয়াছিলেন। কয়দিন অবস্থানের পর ২৭শে জুলাই তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

ঢাকা বর্ত্তমানে কলিকাতা হইতে কর্ম্মোপলক্ষে যাইতেছেন ফটো—পান্না সেন

বিদেশ হইতে নির্ব্বাসিতদের আমন্ত্রণ—

খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুত ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌয়ে আছেন। তিনি ১৪ বৎসর জার্ম্মানী ও আমেরিকায় ছিলেন। রাজনীতিক কারণে তাঁহাকে ভারতে ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা শ্রীযুত বীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ আব্দুল হাকিম, পাঞ্জাবের সর্দ্দার অজিৎ সিং, অবনী মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র নাথ সেন, জি-এন-সান্যাল, হরেন্দ্র গুপ্ত, মধ্যপ্রদেশের পেণ্ডুরং খানকোজা প্রভৃতিকে এখনও ভারতে আসিতে দেওয়া হইতেছে না। তাঁহারা যাহাতে সত্বর ভারতে ফিরিয়া আসিতে পারেন, সেজন্য সকলকে আন্দোলন করিতে বলিয়াছেন ও ঐ সম্পর্কে তিনি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও আচার্য্য নরেন্দ্র দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

১৯৪২এর অত্যাচারীদের দণ্ড—

বিহার ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী জনগণের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাদের দণ্ডদান ব্যবস্থার প্রস্তাব গত ১৬ই জুলাই গৃহীত হইয়াছে। প্রথমে অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া অপরাধী স্থির করা হইবে। এই প্রস্তাবের পরই কয়েকজন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাকরীর মেয়াদ শেষ না হওয়া সত্ত্বেও চাকরী হইতে অবসর গ্রহণের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

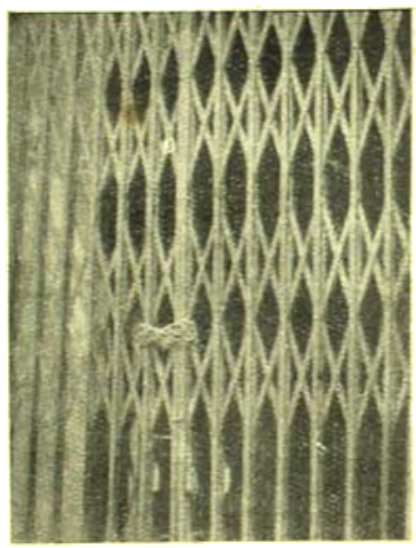

ঢাকা বর্ত্তমানে তালাবন্ধ অবস্থায় বেঙ্গল টেক্সিসেলের বড়বাজার শাখা ফটো—পান্না সেন

সিন্ধুদেশে মন্ত্রিমণ্ডল সমস্যা—

বর্ত্তমানে সিন্ধু প্রদেশে মুসলেম লীগ নেতা সার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লার নেতৃত্বে মন্ত্রিমণ্ডল কাজ করিতেছে। সম্প্রতি মুসলেম লীগদলের ২ জন সদস্য লীগের সংস্রব ত্যাগ করিয়া বিরোধী দলে যোগদান করায় লীগ ৬০ জন মোট সদস্যের স্থানে মাত্র ২৫ জন সদস্য পাইয়াছেন। কাজেই বিরোধী দল এখন সংখ্যাধিক্য দলে পরিণত হইয়াছে। বিরোধী দলের নেতা মিঃ জি-এম সৈয়দ সে জন্য মন্ত্রীমণ্ডলের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া নিজে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল রচনা করিবার ইচ্ছা গভর্ণরকে জানাইয়াছেন।

নিজামের রাজ্যে শাসন সংস্কার—

হুজুর নবাব হায়দ্রাবাদের নিজামের শাসন পরিষদের সভাপতিরূপে ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী অক্টোবর মাসে ঐ রাজ্যে নূতন শাসন সংস্কার প্রবর্তনের সঙ্গে নূতন ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হইবে। ১৯৩৯ সালে যে শাসন সংস্কারের প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহাই এতদিনে কার্য্যে পরিণত করা হইবে। রাজ্যের আয় ১৩ কোটী টাকা বাড়িয়াছে। ঐ বর্দ্ধিত আয় যাহাতে জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয়িত হয় হুজুর নবাব সেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যগুলিতেই অধিক কুশাসন দেখা যায়—ক্রমে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহারা সকলেই উপকৃত হইবে।

পরিষদ গৃহে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের ভাষণ ফটো—পান্না সেন

কবি নজরুল ইসলাম—

খ্যাতনামা কবি কাজি নজরুল ইসলাম গত কয় বৎসর দারুণ রোগে শয্যাগত আছেন। নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা তাঁহার জন্য মাসিক ২ শত টাকা সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করায় তাঁহার অর্থাভাব কিছু কমিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালায় ৯৩ ধারার শাসনের সময় সহসা সে বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। পরে অনেক চেষ্টায় ১৯৪৬ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত সরকার কবিকে ঐ বৃত্তি দিতে সম্মত হন। সম্প্রতি সুরাওয়ার্দ্দী-মন্ত্রিসভা কবির বৃত্তিটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নজরুলের মত সর্ব্বজনপ্রিয় কবির সংখ্যা কম—কাজেই তাঁহার এই অর্থাভাব দূর করার সংবাদে সকলে আনন্দিত হইবেন।

কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র উৎসব—

গত ৭ই জুলাই রবিবার সকালে ২৪ পরগণা কাঁঠালপাড়া গ্রামে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক বাসগৃহে বঙ্কিমচন্দ্র উৎসব হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটী শাখার উদ্যোগে সভা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম অনুষ্ঠানে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ

ফটো—শ্রীধীরেন আঢ়ুরী

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন ও শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নারায়ণ গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত অতুলচরণ দে পুরাণরত্নের উদ্যোগে সভা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় ইলেকট্রিক সরবরাহ—

কলিকাতার ইলেকট্রীক সরবরাহের একচেটিয়া অধিকার এখন কলিকাতা ইলেকট্রীক সাপ্লাই কর্পোরেশনের হাতে। উক্ত কর্পোরেশনের লাইসেন্সের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে নোটীশ দিয়া ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় ইলেকট্রিক সরবরাহের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। বাঙ্গালায় ৯৩ ধারার শাসনের সময় গভর্ণর মিঃ কেসি কর্পোরেশনের সহিত নাকি এমন এক

চুক্তি করিয়াছেন, যাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট যথাসময়ে নোটীশ দিলেও ১৯৫০ সালে ইলেকট্রিক সরবরাহের ভার হাতে পাইবেন না, ১৯৭০ সাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য কর্পোরেশন যে হারে ইলেকট্রিকের দাম গ্রহণ করে, তাহা অত্যন্ত বেশী। বিদেশী মূলধনে গঠিত কর্পোরেশন এদেশে ব্যবসা করিয়া অত্যধিক লাভ করে। গভর্ণমেণ্ট ঐ ভার লইলে কলিকাতায় ইলেকট্রিকের দাম কমিয়া যাইত ও তদ্দ্বারা গৃহস্থ, ব্যবসায়ী—সকলেই উপকৃত হইতে পারিত।

পরলোকে প্রতীপচন্দ্র মুখার্জ্জি—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাধ্যক্ষ (চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার) মিঃ জি, সি, মুখার্জ্জির কনিষ্ঠ

৺প্রতীপচন্দ্র মুখার্জ্জি

পুত্র প্রতীপচন্দ্র অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। ২১ বৎসরের তরুণ যুবক প্রতীপের অটুট ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য বাঙ্গলাদেশের যুবক সমাজের ঈর্ষার বিষয় ছিল। সরল, অনাড়ম্বর ও বিনয়নম্র মধুর ব্যবহারে প্রতীপ যুবসমাজের আদর্শ ছিল। ক্রীড়ামোদী ও খেলোয়াড় হিসাবেও সে সমাজে আদর লাভ করিয়াছিল। গত বৎসর সেণ্ট জেভিয়ার্স হইতে প্রশংসার সহিত বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসামের অন্তর্গত ছাতুক আসাম-বেঙ্গল-সিমেণ্টের কারখানায় সে হাতে-কলমে বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিল। প্রতীপের জনক-জননীর শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের জানা নাই। এই দুঃসহ পুত্রশোক যাঁহার প্রাণ, সান্ত্বনা একমাত্র তিনিই দিতে পারেন।

পাবনার শ্মশানঘাটে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজা

ফটো—পান্না সেন

৫ হাজার বৎসরের পুরাতন সভ্যতা—

রাজপিপলা রাজ্যের কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানের ফলে গুজরাট ও মধ্যভারতে নর্ম্মদা উপত্যকায় ৫ হাজার বৎসরেরও অধিক পুরাতন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ঐ সভ্যতা নাকি মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতা অপেক্ষাও প্রাচীন। ইন্দোর রাজ্যে মহেশ্বর নামক স্থানে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের একটি সমগ্র সহর পাওয়া গিয়াছে। উহা পুরাণে লিখিত মহিষমতী নগর বলিয়া ধরা হইয়াছে। আরও বহু স্থান খনন করা হইতেছে, তাহার ফলে পুরাতন সভ্যতার অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া মনে হয়।

পরলোকে কিরণচাঁদ দরবেশ—

ফরিদপুর জেলার খালিয়া নিবাসী কবি কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীধামে শ্রীশ্রীবিজয় কৃষ্ণ মঠের মোহান্তরূপে বাস করিতেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল—কিরণচাঁদ দরবেশ। গত ১৭ই আষাঢ় ৬১ বৎসর বয়সে তিনি মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দেশ সেবক, সমাজ সংস্কারক ও শিল্পী ছিলেন। তিনি বারাণসীর বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার রচিত ২০ খানি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি স্বর্গত অশ্বিনীকুমার দত্ত,

বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির সহিতও একত্র কাজ করিয়াছিলেন ও পরে কাশী বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি হইয়াছিলেন।

স্যার মহম্মদ আজিজল হক—

সার মহম্মদ আজিজল হক ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিব ছিলেন। বঙ্গলাট পুরাতন শাসনপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। খাঁ-বাহাদুর এম-এ মোমিনের মৃত্যুতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) যে সদস্যপদ খালি হইয়াছিল, সার আজিজল বিনা বাধায় সেই পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা হইতে গণপরিষদেরও সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে সরকারের মন্ত্রীরূপে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে, বিলাতে হাই কমিশনাররূপে তিনি ইতিপূর্ব্বে কাজ করিয়াছেন।

পরিষদ ভবনের প্রাঙ্গণে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এচ-এস-সুরাবর্দী কর্ত্তৃক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আদেশ দান
ফটো—পান্না সেন

সিংহলে ভারতবাসী—

মহাত্মা গান্ধী গত ১২ই জুলাই পুনায় প্রার্থনার সময় বলিয়াছেন—সিংহলে সিংহলবাসী ও ভারতবাসীর মধ্যে বিবাদ থাকা উচিত হইবে না। ভারতীয়গণ শ্রমিকরূপে সিংহলে গিয়া নানারূপ দুঃখ কষ্টের মধ্যে কাজ করিয়াছিল। এখন তাহাদের পক্ষে দেশে ফিরিয়া আসা সহজসাধ্য নহে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী সিংহলে ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একদল প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আশা হয়, তাঁহাদের মধ্যস্থতায় সিংহলে ভারতবাসীদের অসুবিধার অবসান হইবে।

আসাম বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মিলন—

গত ৩রা ও ৪ই শ্রাবণ আসামের শিলংয়ে নিখিল আসাম বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমার সম্মিলনে যোগদান ও বক্তৃতা করেন। আসামের এডভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত পরেশলাল সোম প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলুইএর বাণী পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করেন ও জননেতা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সভার দুইদিন ব্যাপী অধিবেশনে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল।

টেলিফোন অফিসের সম্মুখে মহিলা ধর্ম্মঘটী ফটো—পান্না সেন

বাঙ্গালার গ্রামাঞ্চলে বিজলী—

বাঙ্গালা দেশে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রামাঞ্চলের প্রায় ২২ শত বর্গমাইল স্থানে ইলেকট্রিক সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট হইতে শিল্পোন্নতির জন্য এই চেষ্টা হইতেছে। গৌরীপুর হইতে কৃষ্ণনগর হইয়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত বিজলী সরবরাহ করা হইবে। রাণাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, শক্তিগড়, রসুলপুর, মেমারী, বৈঁচি, পাণ্ডুয়া ও মগরায় বিজলী যাইবে। শান্তিপুর হইতে কালনাতেও

তার যাইবে। প্রায় ১২৭ মাইল তার খাটাইতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন।

কোগ্রামে কবি-সম্বর্দ্ধনা—

গত ১লা আষাঢ় রবিবার সকালে বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামে বাঙ্গালার পল্লীকবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের গৃহে তাঁহাকে সাহিত্য বাসরের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। কবি সুদূর পল্লীগ্রামে অজয় ও কুনুর নদীর সংযোগ-স্থলে যে নিভৃত কুঞ্জে বাস করেন, কলিকাতার একদল সাহিত্যিক তথায় গমন করিয়া কালিদাস দিবসে তাঁহাদের শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় কবিকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য,হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুকুমার রায়-চৌধুরী, মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু লেখক ও কবি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অনেকে যাইতে না পারিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কবির গৃহে সকলে অতিথি হইয়াছিলেন এবং তোরণ নির্ম্মাণ,নহবৎ প্রভৃতির ব্যবস্থা দ্বারা অতিথিদের অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। কবি নিজে, তাঁহার পুত্রগণ ও স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান ও অতিথিদের দেখাশুনা করিয়াছিলেন। কোগ্রামে চৈতন্য-মঙ্গল প্রণেতা লোচন দাসের শ্রীপাট—সকলে তাহা এবং স্থানীয় মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির ও বিগ্রহদর্শন করিয়াছিলেন।

অভিনন্দনরত কবি কুমুদরঞ্জন

পাটনায় বর্ষামঙ্গল—

গত ১৫ই আষাঢ় পাটনার কিশোর দলের উদ্যোগে পাটনা লেডী টমসন হলে প্রভাতী ও বেহার হেরাল্ড সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দারের সভাপতিত্বে বর্ষামঙ্গল উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রঞ্জিতসিংহ উহার প্রযোজনা ও পাটনা মিউজিক ক্লাব সঙ্গীত সংযোজনা করিয়াছিলেন। বিহারের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জগলাল চৌধুরী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতায় ক্যান্সার হাসপাতাল—

ক্যান্সার (কর্কট) রোগ দুরারোগ্য। কলিকাতায় তাহার চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা নাই। সে জন্য কলিকাতা চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই এক শত শয্যাসহ একটি ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবেন। ১০০ শয্যার মধ্যে ৭০টিতে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করা হইবে। চিকিৎসার জন্য ৬০ হাজার টাকা মূল্যে এক হাজার মিলিগ্রাম রেডিয়াম সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে সভাপতি ও ডাক্তার সুবোধ মিত্রকে সম্পাদক পরিচালক করিয়া হাসপাতাল কমিটি গঠিত হইয়াছে। হাসপাতালের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

মাদ্রাজে পঞ্চায়েতের সুমতি—

মাদ্রাজে ব্যবস্থাপরিষদের অধিবেশনের উপযুক্ত সুপ্রশস্ত হল নাই। সরকারী দপ্তরখানা গৃহের যে হলে পরিষদের অধিবেশন হইত তথায় অফিস, বসিবার ঘর প্রভৃতির স্থান ছিল না। মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত টি-প্রকাশম সে কথা গভর্ণরকে জানাইলে গভর্ণর সহরের মধ্যস্থিত ৩ শত বিঘার উপর যে লাট-প্রাসাদে নিজে বাস করিতেন, তাহা ব্যবস্থা পরিষদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। অতঃপর গভর্ণর

সহরের বাহিরে ছোট একটি প্রাসাদে বাস করিবেন। লাটপ্রাসাদে ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনের উপযুক্ত হল ও অন্যান্য গৃহ প্রভৃতি আছে।

ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম দশ জন—

১৯৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ১০ জন পরীক্ষার্থী প্রথম দশটি স্থান অধিকার করিয়াছেন—(১) সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পিরোজপুর গভর্ণমেণ্ট হাই (২) ব্রজমোহন মন্ত্রী—কালিম্পং এস-ইউ-এম ইনিষ্টিটিউসন (৩) প্রবীরকুমার সেনগুপ্ত—পাবনা জি-সি (৪) রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার—বগুড়া ধুনচাচিয়া হাই (৫) অমলকুমার চক্রবর্ত্তী—ঝালকাঠি গভর্ণমেণ্ট হাই (৬) অমলেন্দুজ্যোতি মজুমদার—পাবনা জি-সি (৭) রণজিৎকুমার তালুকদার—বড়পেটা হাই (৮) সন্তানন্দ দাস—কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা (৯) অমিয়কুমার ভট্টাচার্য্য—দার্জ্জিলিং গভর্ণমেণ্ট হাই (১০) অনাদিনাথ দাস—স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ স্কুল।

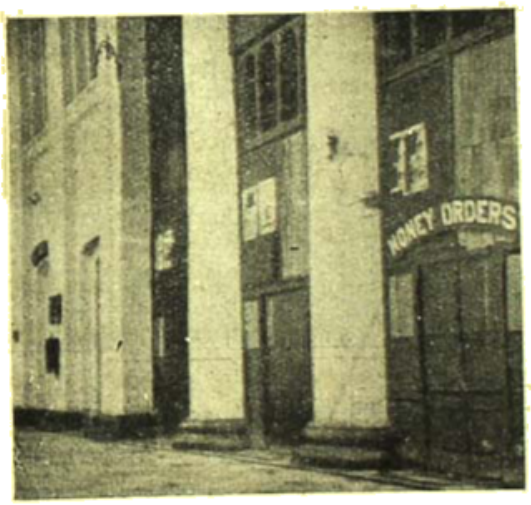

ধর্ম্মঘটকালে বিনামূল্যে কর্ম্মীদান করিবার জি-পি-ও ফটো—পান্না সেন

প্রাথমিক শিক্ষকগণের ধর্ম্মঘট—

বাঙ্গালা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনের হার খুবই কম। তাঁহারা বেতনবৃদ্ধি ও অন্যান্য সুখসুবিধা লাভের জন্য বহু দিন হইতে আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। সে জন্য তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের অনাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এক সপ্তাহ কাল ধর্ম্মঘট করিবেন স্থির করিয়াছেন। ভোট লইয়া দেখা গিয়াছে, শতকরা ৯০ জন শিক্ষক ধর্ম্মঘট করার পক্ষপাতী।

আনন্দবাজারের কালিদাস উৎসব—

গত ৭ই জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় ২৪ পরগণা আনন্দবাজার ওয়ালডি ষ্টিটে কবি শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে কালিদাস উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবে শতাধিক

সাহিত্যবাসরের উদ্যোগে কালিদাস উৎসব
ফটো—শ্রীবীরেন ভাদুড়ী

সাহিত্যিক সমবেত হইয়াছিলেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কালিদাসের কাব্য আলোচনা করিয়া সভায় বহু কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ, আবৃত্তি, বক্তৃতা হইয়াছিল। হেমন্তকুমার সকলকে আদর অভ্যর্থনা প্রভৃতির দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন।

খদ্দর ও মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধী গত ২৫ বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী সকলকে খদ্দর পরিধান করিতে অনুরোধ করিতেছেন। খদ্দর পরিধানের প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান বস্ত্রাভাবের যুগে অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন। বস্ত্রাভাবে বহু লোক এখন খদ্দর ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেছেন। গান্ধীজী গত ১১ই জুলাই পুনার প্রার্থনা কালে সকলকে আবার চরকায় সুতা কাটিতে ও খদ্দর ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সে কথা কেহ কি শুনিবে?

রাজবন্দীদের মুক্তিদাবীতে কলিকাতায় নারী শোভাযাত্রা

ফটো—পান্না সেন

বর্দ্ধমানের সদর সি-পি-ওতে গণপরিষদের দাবি

ফটো—পান্না সেন

নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি—

গত ৬ই ও ৭ই জুলাই বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় একদিকে যেমন মৌলনা আবুল কালাম আজাদের স্থলে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু নূতন সভাপতি হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যদিকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নূতন ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিয়াছেন। নূতন দলে পুরাতন দলের পণ্ডিত নেহরু ছাড়াও নিম্নলিখিত ৬ জন আছেন—মৌলনা আজাদ, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ, খান আবদুল গফুর খাঁ, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও শ্রীযুক্ত সি-রাজাগোপালাচারী। নূতন হইয়াছেন—মিঃ রফি আমেদ কিদওয়াই, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীমতী কমলা দেবী (কর্ণাটক), রাও সাহেব পটবর্দ্ধন (মহারাষ্ট্র), মিঃ হকরুদ্দীন আহমদ (আসাম), সর্দ্দার প্রতাপ সিং (পাঞ্জাব), শ্রীমতী মৃদুলা সারাভাই ও ডাক্তার রামকৃষ্ণ কেসকার। শ্রীমতী মৃদুলা ও ডাক্তার কেসকার সাধারণ সম্পাদক হইবেন ও শ্রীযুক্ত পেটেল কোষাধ্যক্ষ থাকিবেন। ডাক্তার কেসকার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য নহেন, তাঁহাকে সদস্য করিয়া লইতে হইবে।

গণপরিষদ ও কংগ্রেস—

কংগ্রেসের বামপন্থী কর্ম্মীরা গণপরিষদে যাইতে অসম্মত হওয়ায় ও কংগ্রেসের শুধু দক্ষিণপন্থী কর্ম্মীরা পরিষদের সদস্য হওয়ায় এই কার্য্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সর্ব্বত্র প্রশ্ন

হইতেছে। সেজন্য পণ্ডিত জহরলাল নেহরু গত ১১শে জুলাই সন্ধ্যায় দিল্লীতে রামলীলা ময়দানে এক জনসভায় এ বিষয়ে কংগ্রেসের কথা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—কংগ্রেস ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থার জন্যই গণপরিষদে যোগদান করিবেন। যদি তাঁহাদের সে চেষ্টা বিফল হয়, তাহা হইলে তাঁহারা গণপরিষদ হইতে চলিয়া আসিবেন ও সঙ্গে সঙ্গে গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবেন।

কাশীতে বাঙ্গালী ছাত্র—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৬ সালের পদার্থবিদ্যায় এম্-এস্‌সি পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্র শ্রীমান বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯৪৪ সালে বি-এস্‌সি পরীক্ষায় তিনি পদার্থবিদ্যা ও গণিতে অনার্স লইয়া প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

আলজেরে চিকিৎসক দল—

ভারতীয় কংগ্রেস হইতে গত এপ্রিল মাসে আলজেরে যে চিকিৎসক-দল প্রেরিত হইয়াছে তাহারা ৮টি কেন্দ্রে কাজ করিতেছে। এ পর্য্যন্ত তাহারা ৪ হাজার রোগীর চিকিৎসা করিয়াছে। সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, কোটাভারু, তাইপিং, তালুক আনসন, সাঙ্গেবাতানি, রাউব ও দেরেনবামে তাহাদের কেন্দ্র রহিয়াছে। ভারতবাসী, মালয়বাসী ও চীনা সকল জাতিকেই চিকিৎসা করা হয়। ভারতীয় কংগ্রেসই সকল ব্যয়ভার বহন করে এবং ভারত হইতে ঔষধ ও যন্ত্রাদি প্রেরিত হয়। সাড়ে তিন বৎসর যুদ্ধের গোলমালে অধিকাংশ লোক অনাহারে থাকায় এখন ঐ অঞ্চলে বসন্তরোগ খুব বেশী। চিকিৎসকগণ এখনও কয়েক মাস তথায় থাকিবেন। তাঁহাদের এই কার্য্য প্রশংসনীয়।

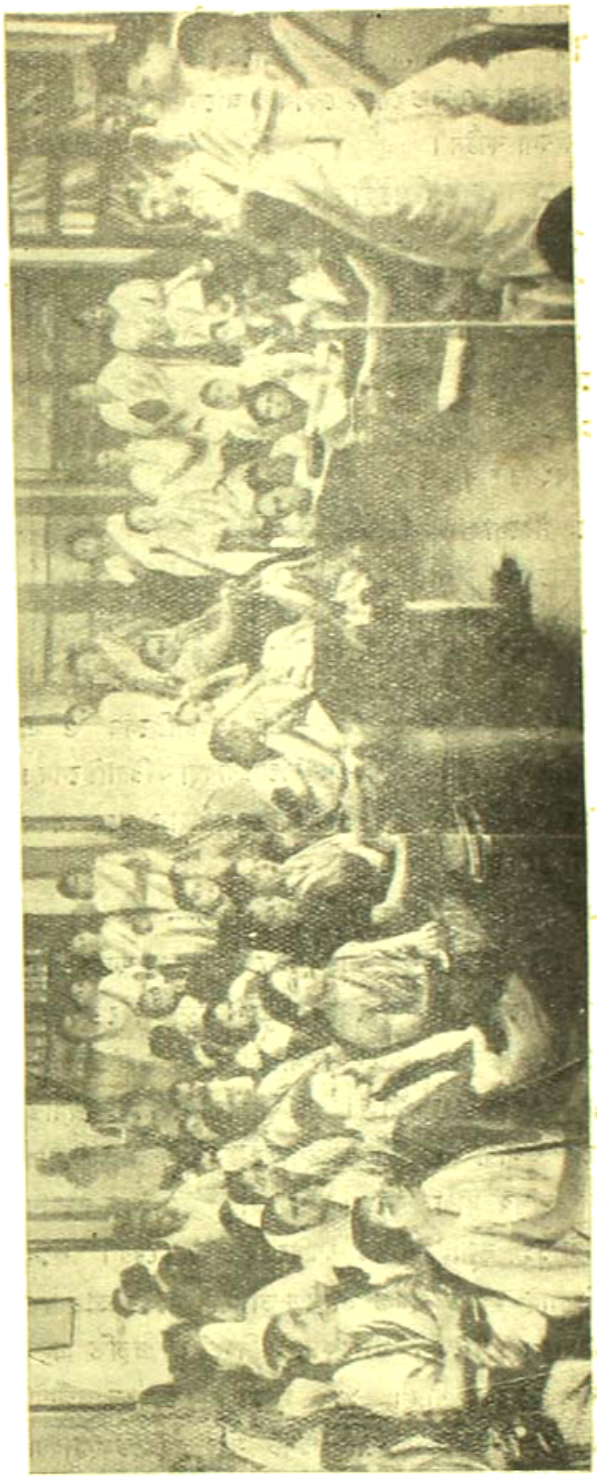

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের উদ্যোগে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে মহিলা সভা ফটো—পাল্প সেন

জার্ম্মাণীতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দী—

১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল জার্ম্মাণীতে ৮২১০ জন যুদ্ধবন্দী ছিল। তাহাদের প্রায় সকলকে এখন স্বদেশে-

পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রায় ২৫০ জন বন্দীর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই—হিসাবে এই সংখ্যা পাওয়া যায়। আরও কত লোক কোথায় আছে বা মারা গিয়াছে, তাহা বলা কঠিন।

পরলোকে শিল্পী শশিভূষণ পাল—

খুলনা মহেশ্বর-পাশা শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শিল্পী রায় সাহেব শশিভূষণ পাল গত ১৬ই আষাঢ় ৬৯ বৎসর বয়সে স্বগৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গ্রামে বাস করিয়া শিল্প প্রীতি ও অসাধারণ উৎসাহের জন্য জনপ্রিয় হইয়াছিলেন ও ঐ অঞ্চলের তরুণগণকে শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৯২২ সালে গভর্ণর লর্ড লীটন তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

রায় সাহেব শশিভূষণ পাল

সমগ্র ভারতে ডাক ধর্ম্মঘট—

ভারতের ডাক ও তার বিভাগের নিম্নতম কর্ম্মচারীরা কোন কালেই জীবনধারণের উপযুক্ত বেতন পাইতেন না। অথচ ডাক ও তার বিভাগে কর্ম্মীদের মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত দুর্নীতি প্রবেশ করে নাই। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সেই সামান্য বেতনে কর্ম্মীরা পরিবার প্রতিপালনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া বেতন বৃদ্ধির দাবী করে। সে দাবী উপেক্ষিত হওয়ায় তাহারা ১১ই জুলাই হইতে ধর্ম্মঘটের নোটীশ দেয়। ফলে ৮ই জুলাই হইতে সমগ্র ভারতে ডাক বিভাগের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। পার্শেল, প্যাকেট, মণিঅর্ডার প্রভৃতি গ্রহণ ও বিলি বন্ধ হইয়া যায়। ১১ই হইতে শুধু নিম্নতম কর্ম্মীরা ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে—ক্রমে ধর্ম্মঘট সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ২১শে জুলাই হইতে ডাক বিভাগের কেরাণীরা পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘটে যোগদান করে—ফলে সেভিং ব্যাঙ্কের কাজও বন্ধ হইয়া যায়। তার ও টেলিফোনের কর্ম্মীরাও ঐ সময় ধর্ম্মঘটে যোগদান করে। ফলে ভারতে এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ডাক ও তার বিভাগ ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীন—পূর্ব্বে ঐ বিভাগে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইত বটে, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন

ধর্ম্মঘটকালে জি-পি-ও'র সম্মুখে প্রেসিডেন্সী পোষ্ট মাষ্টার
ফটো—পাল্ল সেন

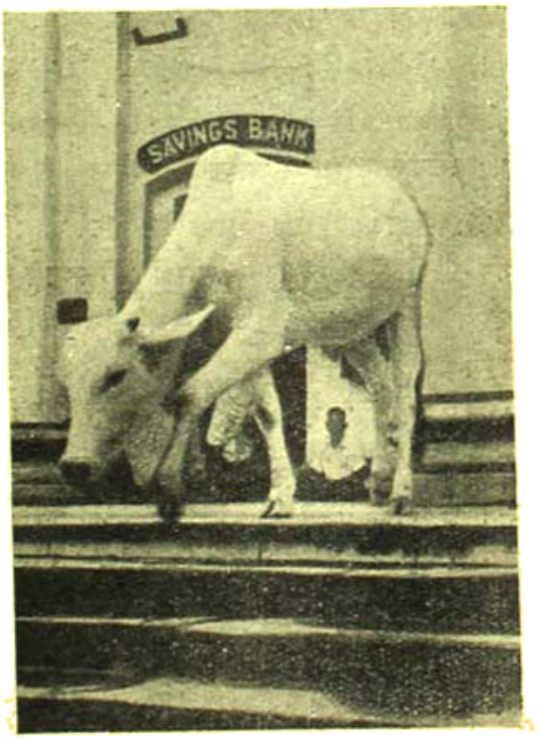

ডাক ধর্ম্মঘট জনবিরল জি-পি-ও'র সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সম্মুখের দৃশ্য
ফটো—পাল্ল সেন

ঐ বিভাগে ব্যয় অপেক্ষা আয় যথেষ্ট অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ দরিদ্র কর্মীদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করায় গত ১ মাসকাল ধর্মঘট চলিয়াছিল। পত্র যাতায়াত বন্ধ থাকিয়া লোক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাহারও কোন খবর লইতে পারে না। মণিঅর্ডার বন্ধ থাকিয়া যাহারা মাসিক মণিঅর্ডারের টাকার উপর নির্ভর করিয়া সংসার প্রতিপালন করে,তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। তার অফিসে কাজ নাই—ফটকে পুলিশ পাহারা বসিয়াছিল। টেলিফোন অফিসগুলি তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। কলিকাতার যে বড় পোষ্টাফিসে সর্বদা লোক-সমাগত হইত, তাহা পশুর আশ্রয়ে পরিণত হইয়াছিল। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত মঙ্গলদাস পাকবাসা, নিখিল ভারত পোষ্টম্যান ও নিম্নতম কর্মচারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভি-ডি ডালভি—ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদের সহিত আপোষ সম্বন্ধে কয়দিন ধরিয়া আলোচনার পর আপোষ হইয়াছে। ২রা আগষ্ট ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

ভারতে শিক্ষাপ্রসার—

বোম্বায়ে সম্প্রতি জাতীয় উন্নয়ন কমিটীর সভায় শিক্ষা বিষয়ক সাব কমিটীর রিপোর্ট আলোচিত হইয়াছিল। ভারতের শতকরা মাত্র ১০ জন লোক লেখাপড়া জানে। বাকী ৯০ জনকে অবিলম্বে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। সেজন্য সকল শিক্ষিত ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষকের কাজ করিতে হইবে। এই বিরাট ব্যাপারে বৎসরে দুই শত কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে—বর্তমানে ভারতে শিক্ষা-বাবদে বৎসরে মাত্র ৩১ কোটি টাকা ব্যয় হয়। কি ভাবে এই কাজ সত্বর সম্পাদন করা যায়, কমিটী তাহার নির্দেশ দিয়াছেন। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে সত্বর কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। এই বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়টি সর্বস্তরে যাহাতে আলোচিত হয়, সেজন্য শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই অবহিত হওয়া উচিত।

পাটের দামে পাটচাষীর অংশ—

সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট' পত্রিকা কয়েকটি ধারা-বাহিক প্রবন্ধে বাঙ্গালার পাট সমস্যার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় পাটচাষীর বৎসরে অন্যূন ৪০ কোটি টাকা অযথা ক্ষতি হইতেছে এবং এই বিপুল অর্থ প্রধানতঃ ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ইংরেজ বণিকদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। নাজিমুদ্দিন-সুরাবর্দ্দি মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে প্রথম পাট ও চটের দর আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই দর বাঁধার কার্য্য অত্যন্ত অন্যায় ভাবে সাধিত হইয়াছে। ভারতীয় মধ্য জাতি পাটের কলিকাতার দর নিম্নতম ১৫ টাকা ও উচ্চতম ১৭ টাকায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়, অথচ ১০০ গজ চটের দাম ২৮ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। ১০০ গজ চট তৈয়ারী করিতে ৩৫ সের পাট লাগে। ১৩ টাকা মূল্যের পাট একবার কলের ভিতর ঘুরিয়া আসিলেই ২৮ টাকার জিনিসে পরিণত হয়। ১০০ গজ চট তৈয়ারী করিতে ২ টাকা ও কলের ন্যায্যলাভ ১ টাকা মোট ৩ টাকা পড়ে। সুতরাং ১৩ টাকা ও ২৮ টাকার মাঝখানে যে ১২ টাকা থাকিয়া যাইতেছে তাহা কলওয়ালারা লইতেছে। পাটকলের শতকরা ৯০টি ইংরেজের। পাট-চাষীর শতকরা ৯০ জন মুসলমান। লীগ মন্ত্রিমণ্ডল আইন সভায় ৩০টি য়ুরোপীয় ভোটের জন্য স্বয়ংশীর রক্ত জল-করা ৪০ কোটি টাকা বৎসরের পর বৎসর ক্লাইভ ষ্ট্রীটকে উপঢৌকন দিতেছেন। ভারতের মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪০ জন বঙ্গদেশে বাস করে। অতএব মুসলমান সমাজকে দারিদ্র্য নিমজ্জিত করিতে হইলে পাটের দর নামাইয়া রাখা ছাড়া উপায় আর নাই, মুসলেম লীগ মন্ত্রিমণ্ডল তাহাই অবলম্বন করিতেছেন। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে পাট ২৪ টাকা মণ বিক্রয় হইয়াছিল। প্রায় এক মাস পাট কাটা আরম্ভ হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডল যদি আরও কিছু কালক্ষেপ করিতে পারেন তাহা হইলে এ বৎসরের সমস্ত পাট চাষীর হাত হইতে বাহির হইয়া যাইবে। তখন কিছু করার থাকিবে না।

গণ-পরিষদ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

বোম্বাই নগরে গত কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে ৮ই জুন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হয় তাহা একদিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, বিদায় প্রস্তাবিত অন্তবর্তী-কালীন গভর্ণমেণ্ট গঠন পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গণপরিষদে যোগদানের যে সিদ্ধান্ত করেন, সেই বিষয়ের আলোচনার জন্যই মূলতঃ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই অধিবেশন। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রায়শঃ কংগ্রেসের পদ হইতে দুইটি দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল থাকিয়া কংগ্রেসের যে গুরুদায়িত্ব বহন করিয়া আসিতেছিলেন, এই অধিবেশনেই তিনি তাহা নূতন রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর হস্তে সমর্পণ করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নবনির্বাচিত সদস্যগণও এইখানেই প্রথম মিলিত হইলেন এবং পণ্ডিত নেহরু তাঁহাদের মধ্য হইতে ওয়ার্কিং কমিটীর জন্য নূতন সদস্য নির্বাচন করিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মোট ৬০০ জন সদস্যের মধ্যে প্রথম দিনের অধিবেশনে ২৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও যোগদান করেন।

পরদিন অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত, গণপরিষদে যোগদানের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে অনুমোদন করেন। ২০৮জন প্রস্তাবের পক্ষে এবং ৫৪জন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। বিরোধী দলের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুৎ পটবর্ধন, অরুণা আসফ আলি প্রভৃতি কংগ্রেসকে গণপরিষদ বর্জনের সিদ্ধান্ত করিতে বলেন। তাঁহাদের যুক্তি, প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ত্যাগ না করিলে জাতির বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হইবে। আমরা প্রস্তাব "দুইটি ইণ্ডিয়া"—"ভারত রাষ্ট্র" স্বীকার সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। আপোষ আলোচনার মধ্য দিয়া না গিয়া জাতি তাহার শক্তি ও আত্মবলিদানের মধ্য দিয়াই স্বাধীনতা অর্জন করিবে।

শ্রীযুক্ত মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতায় বলেন—আমি জানি যে প্রস্তাবিত গণপরিষদ সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে। তাহাতে বহু ত্রুটি রহিয়াছে। আমরা এত বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি, গণ-পরিষদের ঐ সকল ত্রুটিকে ভয় করিব কেন? এই গণপরিষদকে পরীক্ষা-মূলকভাবে গ্রহণ করিয়া দেখিতে হইবে। আমার বিশ্বাস, ঠিকভাবে কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিলে এই গণপরিষদ প্রকৃত স্বদেশী গণপরিষদে পরিণত হইবে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের অভিভাষণে বলেন—আজ আমাদের শক্তি বুঝিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট গণপরিষদ গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে গণপরিষদের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই গণপরিষদই ভারতের শাসনতন্ত্র স্বাধীনভাবে রচনা করিবেন। আর মন্ত্রীমণ্ডল গঠন প্রসঙ্গের ইচ্ছাধীন ধরিয়া রাখিতে হইবে। অধিবেশনের উপসংহারে পণ্ডিত নেহরু জানাইয়া দেন যে, কংগ্রেস গণপরিষদে যাইতে সম্মত হইয়াছেন বটে, কিন্তু যে মুহূর্তে কংগ্রেস দেখিবেন যে প্রস্তাবিত গণপরিষদে অবস্থাবশতঃ স্বাধীনতা লাভের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সেই মুহূর্তেই কংগ্রেস উহা ত্যাগ করিয়া আসিয়া উহাকে বন্ধ করিবেন এবং বাহিরে আসিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্র সমিতি কর্তৃক গণপরিষদ পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পূর্ব্ব হইতেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনের আয়োজন করিতে থাকেন। ওয়ার্কিং কমিটি এ বিষয়ের জন্য একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করেন, তাঁহারা ২৭শে জুলাই বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রীদের নিকট নির্ব্বাচন সম্পর্কে নির্দ্দেশাবলী পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশ মোটামুটি এই যে, গণপরিষদকে যথাসম্ভব সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিমূলক করিতে হইবে। গণপরিষদে যাহাতে মারী, ব্রহ্মদেশী, ব্রিটিশ, ভারতীয় খৃষ্টান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, পার্শী এবং বিশিষ্ট অকংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ স্থান পান তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটি গণপরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারে যথাসম্ভব নিরপেক্ষতার উর্দ্ধে উঠিয়া এইরূপ ঘোষণা করেন। তাঁহারা এই মূলনীতির পরিচয় দিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের প্রশংসাভাজন হন। ইহার ফলে কংগ্রেসের বাহিরেরও বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি গণপরিষদে আসিবার সুযোগ পান।

মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী গণপরিষদে সমস্ত নির্ব্বাচনের মিলন হইল যে, প্রত্যেক প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদ সেই প্রদেশের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরা কেবল ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। গণপরিষদের জন্য ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য বা পরিষদের বাহিরের লোকও প্রার্থী দাঁড়াইতে পারেন। পরিষদের মুসলমান সদস্যরা মুসলমান, শিখ সদস্যরা শিখ এবং অন্য সকলে সাধারণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। সিঙ্গেল ট্রান্সফারেব্‌ল ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচন হইবে। কায়ারত্ন সাম ব্যবস্থা পরিষদের একজন সভ্য কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং অন্য একজন কর্তৃক সমর্থিত হইলেই তিনি নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে পারেন। তবে প্রার্থী যে প্রদেশ হইতে দাঁড়াইবেন সেই প্রদেশের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিবেন এবং অন্য কোন প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী হন নাই, এইরূপ এক ঘোষণা পত্র মনোনয়ন পত্রের সঙ্গে সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে।

গণপরিষদে নির্ব্বাচনের জন্য ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়কে মন্ত্রিমিশন মোট তিনভাগে ভাগ করেন। সাধারণ, মুসলমান ও শিখ। মুসলমান ও শিখ ছাড়া সকলেই সাধারণের অন্তর্ভুক্ত। বৃটিশ পক্ষ এই গণপরিষদে ইউরোপীয় দলকে 'সাধারণের' মধ্যে ধরিয়া তাহাদেরও প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা স্বীকার করায় এক সমস্যার সৃষ্টি হইল।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্যবস্থা-পরিষদসমূহে ইউরোপীয়দিগকে কয়েকটি করিয়া আসন দেওয়া হয়। এক বাঙলা দেশের ব্যবস্থা পরিষদেই তাঁহারা ২৫টি আসন পান এবং আসামে পান ৮টি। তাঁহাদের জনসংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া এক অস্বাভাবিকভাবেই তাঁহাদিগকে অধিক পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালের সেন্সাস হইতে দেখা যায়, বাঙলা দেশের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে তাঁহাদের সংখ্যা শতকরা '০৯, কিন্তু ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহাদের আসন সংখ্যা ২৫০-এর মধ্যে ২৫। আর আসামে তাঁহাদের সংখ্যা মাত্র শতকরা '০৪। মিশন প্রস্তাবের—প্রতি ১০ লক্ষে একজন—অনুযায়ী যদিও তাঁহারা একটি আসনও পাইতে পারেন না, কিন্তু 'সাধারণের' মধ্যে ধরিয়া যদি তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় তাহা হইলে বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের ২৫ জনের মধ্য হইতে অন্তত ৫।৬ জন নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহাতে হিন্দু সমাজের যেমন ক্ষতি হইবে, কংগ্রেসেরও তেমনি আসন সংখ্যা কমিয়া যাইবে। কারণ গণপরিষদে ইউরোপীয়গণ যে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবেন তাহা সুনিশ্চিত। ইউরোপীয়গণ এতদিন ধরিয়া নিজেদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং সরকার পক্ষ সমর্থন করিয়া, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়াই আসিতেছেন।

গণপরিষদে ইউরোপীয়দের ভোটাধিকার সম্বন্ধে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, মিশন-প্রস্তাবে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে ভারতীয়গণই তাঁহাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। আইনতঃ সৌধিক ভিন্ন নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। আর প্রতি দশ লক্ষে একজন করিয়া ধরিলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহারা নির্ব্বাচনে যাইতে অক্ষম। কয়েকজন আইন-বিশেষজ্ঞ মহাত্মা গান্ধীকে এ বিষয়ে জানান যে, আদালতে এ প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ইউরোপীয়দের দাবী মোটেই টিকিতে পারে না। মহাত্মা গান্ধী ইউরোপীয়দিগকে গণ-পরিষদের নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ না করিবার জন্য অনুরোধ জানান। ইহার পর বাঙলা আসামের ইউরোপীয় দল নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। অন্যান্য প্রদেশের কয়েকজন ইউরোপীয় সভ্য নির্ব্বাচনে যোগ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে নির্ব্বাচনে কোনরূপ প্রভাবান্বিত হয় নাই।

কংগ্রেস ও লীগ গণপরিষদে যোগদান স্বীকার করায়, সকল প্রদেশেই যথাসময়ে নির্ব্বাচনের সাড়া পড়িয়া গেল। জুলাইএর প্রথম দিকেই প্রদেশে প্রদেশে জনোনয়ন পত্র দাখিল করিবার শেষ তারিখ ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইল এবং সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হইল। কংগ্রেস, লীগ ও স্বতন্ত্র দলগুলি নিজ নিজ মনোনীত প্রার্থী পাঠাইবার তোড়জোড় করিতে লাগিলেন। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় কিন্তু একিকে ঘেঁসিলেন না। তাঁহারা মিশন পরিকল্পিত 'ঘ' বর্গভুক্ত মুসলীম লীগের কবল না হইতে মুক্তিলাভ। শিখেরা প্রথম হইতেই মিশন প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে থাকেন। তাঁহারা সভা সমেলন করিয়া, শপথ করিয়া, মিশন প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ দিবস ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, তবুও তাঁহারা অটল। শেষে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর অনুরোধে তাঁহারা মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। ৪ জন কংগ্রেস মনোনীত এবং ১ জন পরিষদ বোর্ড মনোনীত প্রার্থী মোট ৫টি শিখ আসনের জন্য মনোনয়ন পত্র পেশ করেন। কিন্তু মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ মুহূর্ত্তেই তাঁহারা ৮ জনই আবার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেন। শিখ সম্প্রদায় এই ভাবে গণপরিষদ বর্জ্জন করিবার স্থির করিলেন।

সকল প্রদেশেই বিভিন্ন দল যথাসময়ে নিজ নিজ প্রার্থী প্রেরণ করিলেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও দাঁড়াইলেন। বাঙলার জন্য মোট ৩০টি আসন নির্দ্দিষ্ট, তন্মধ্যে ৪টি মুসলমান ও ২৭টি সাধারণ। কংগ্রেস ২৭টি সাধারণ আসনের মধ্যে ২৬টির জন্য প্রার্থী মনোনীত করেন। তন্মধ্যে ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় হইতে ১ জন, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় হইতে ১ জন, তপশীলী দল হইতে ৩ জন, হিন্দু মহাসভা হইতে ১ জন, শুর্খা সম্প্রদায়ের ১ জন, জমিদার পক্ষের ১ জন, মাড়োয়ারী ১ জন এবং কংগ্রেসী বর্ণহিন্দু ১৩ জন। বাঙলার কংগ্রেসদল তাঁহাদের মনোনয়নে সকল যোগ্য ব্যক্তিকেই যে গ্রহণ করেন এমন নহে, মনোনয়ন ব্যাপারে কয়েকজন যোগ্যতর ব্যক্তি বাদ পড়িয়া যান। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের মনোনয়নের বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহারা যথাসম্ভব সকল দল ও সম্প্রদায় হইতেই প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। এমন কি যে শুর্খা সম্প্রদায় গণপরিষদে স্থানলাভের কল্পনাও করেন নাই, কংগ্রেস তাহাদের মধ্য হইতেও একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। সাধারণ আসনের জন্য কংগ্রেস বাতীত, স্বতন্ত্র হিসাবে কয়েকজন হিন্দুমহাসভা, কমিউনিষ্ট ও তপশীল প্রার্থীও দাঁড়াইলেন। বাঙলার বাহির হইতে আসিয়া আম্বেদকর স্বতন্ত্র তপশীলপ্রার্থী হিসাবে রহিলেন।

মুসলীম লীগ ৪টি মুসলমান আসনের জন্য ৪৩ জনকে মনোনয়ন করেন। এই ৪৩ জনের মধ্যে অবাঙালী মুসলমান লীগনেতা নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ, মিঃ, এম,এ, এইচ,ইস্পাহানীও রহিলেন। মুসলীমলীগের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের মনোনীত এই সকল প্রার্থী ছাড়া আরও বহু লীগ সমর্থক স্বতন্ত্র হিসাবে দাঁড়াইলেন। লীগ সমর্থক ছাড়াও কয়েকজন স্বতন্ত্র মুসলমান প্রার্থী রহিলেন।

১৭ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে বাঙলার ভোটপর্ব্ব সমাধা হয়। ভোটে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বাঙলা হইতে গণপরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

সাধারণ—শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিরণশঙ্কর রায়,

শ্রীহরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী, শ্রীমতী লীলা রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীশিবরঞ্জন সেন, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র মজুমদার, শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী, শ্রীবরদাচন্দ্র গুহ, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (কংগ্রেস মনোনীত বর্ণহিন্দু) শ্রীঅনন্তদেব খাসকত্ত, শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন ঠাকুর, শ্রীরাধানাথ দাস, শ্রীবিশ্বচন্দ্র বর্মা, শ্রীবজ্রন রায়, শ্রীনাগুভোষ মল্লিক, (কংগ্রেস মনোনীত তপশীলীহিন্দু) ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস মনোনীত হিন্দুমহাসভা প্রার্থী) মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাব (কংগ্রেস মনোনীত রমিয়ার), শ্রীঃবীরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় (কংগ্রেস মনোনীত মাড়োয়ারী), মিঃ ফ্রাঙ্ক এন্টনী (কংগ্রেস মনোনীত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান), ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস মনোনীত ভারতীয় খৃষ্টান), শ্রীচরণ সিং গুরুং (কংগ্রেস মনোনীত গুর্খা), ডাঃ আম্বেদকর (তফসিল তপশীলী), সোমনাথ লাহিড়ী (কমিউনিষ্ট)।

মুসলমান—নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ, স্যার আজিজুল হক, মিঃ এইচ, এস, সুরাবর্দী, খান স্যার মাজিমুদ্দীন, মিঃ এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী, মিঃ কে, সাবাবুদ্দীন, মিঃ আবুল হাসেম, মিঃ রাজীব আহসান, খানবাহাদুর এ, এম, আবদুল হামিদ, মিঃ ফজলুল রহমান, মিঃ মজিবর রহমান খাঁ, মিঃ আবুল কাসেম খাঁ, খানবাহাদুর ইব্রাহিম খাঁ, মৌলভী সিরাজুল ইসলাম, মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ, ডাঃ মহম্মদ হাসান, মিঃ মহবুবুল হক, খানবাহাদুর আবদুল্লা আলমাহমুদ, ফজলুল হক, সাহেবাদা ইউসুফ মিয়াঁ, মহম্মদ আবদুল্লাহ আলবাকী, মিঃ এম, এম, আলি, খানবাহাদুর এম, আলতাফ, আহম্মদ, খানবাহাদুর ফজলুল করিম, খানবাহাদুর খিজিরুদ্দীন পাঠান, মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক ইতিহাসিক হুসেন কুরেশী, মিঃ মহম্মদ হাসান, মিঃ মহম্মদ হুসেন মালিক, মিঃ কে গুরুদ্দীন, মৌলানা সাদিক আহম্মদ উস্মানি, বেগম ইক্‌রামুল্লাহ, (লীগপ্রার্থী) মিঃ এ, কে, ফজলুল হক (তফসিল)।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আগে পরে কয়েক দিনের মধ্যেই নির্বাচনের পালা শেষ হইল। নির্বাচন শেষে দেখা গেল, কংগ্রেস অন্তরঙ্গ বিরোধক সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছেন। মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, আসাম ও সিন্ধুর সকল "সাধারণ" সদস্য পদগুলিই কংগ্রেস অধিকার করেন। গণপরিষদে মোট ২১৬টি সাধারণ আসনের মধ্যে মাত্র ৯টি কংগ্রেসের অধিকারের বাহিরে যায়। সেগুলি বাঙলার ২টি, উড়িষ্যার ১টি, বিহারে ৩টি এবং যুক্তপ্রদেশে ৩টি। অবশ্য এই ৯টি আসনের মধ্যে ৬টির জন্য কংগ্রেস কোন প্রার্থী মনোনীত করেন নাই। কংগ্রেস বাঙলার ১টি, উড়িষ্যার ১টি এবং বিহারের ৩টি আসন ছাড়িয়া দেন। বাঙলার ১টি আসনে কংগ্রেসের পরাজয় হয়। কংগ্রেসপ্রার্থী বিশ্বনাথ কুণ্ডুকে পরাজিত করিয়া তফসিল প্রার্থী ডাঃ আম্বেদকর নির্বাচিত হন। আর যুক্তপ্রদেশের ৩টি আসনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে। এই ৯টি আসনে রহিলেন, বাঙলা হইতে নির্বাচিত কমিউনিষ্ট প্রার্থী সোমনাথ লাহিড়ী, তপশীলী নেতা ডাঃ আম্বেদকর, যুক্তপ্রদেশের স্যার পদম্পৎ সিংহানিয়া, খানবাহাদুর মহারাজাধিরাজ, স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব প্রভৃতি।

অপর পক্ষে ৭৮টি মুসলমান আসনের মধ্যে ৭৩টি আসন মুসলীম লীগের হস্তগত হয়। এই পাঁচটিতে নির্বাচিত হন, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে কংগ্রেস প্রার্থী মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, খাঁন আবদুল গফুর খান, যুক্তপ্রদেশ হইতে কংগ্রেস প্রার্থী রফি আহম্মদ কিদোয়াই, বাঙলা হইতে কৃষকপ্রজা দলের নেতা মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক এবং পাঞ্জাব হইতে একজন ইউনিয়নিষ্ট সদস্য।

গণপরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা ৩৮৯ তন্মধ্যে বৃটিশ ভারতের ২৯২ জন এবং দেশীয় রাজ্যের ৯৩। ইহা ছাড়া দিল্লী, আজমীর-মারোয়াড়, কুর্গ ও বেলুচিস্থানের ৪ জন গণপরিষদে যোগ দিবার অনুমতি পান। দিল্লী ও আজমীর মারোয়াড়ের সদস্যরা কংগ্রেস দলের আর কুর্গের প্রতিনিধিরা কংগ্রেস সমর্থক, ইহারা "ক" বর্গভুক্ত এবং বেলুচিস্থানের প্রতিনিধি "খ" বর্গভুক্ত সদস্যের দলভুক্ত।

নির্বাচনে কংগ্রেস ও লীগ দুইটি প্রধান দলের জন্য কংগ্রেস সভাপতি মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত কংগ্রেসের সকল নেতা ও উপনেতাই গণপরিষদে প্রবেশ করিলেন। বোম্বাই হইতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, সেন্ট্রিপ্রদেশ হইতে রাজাগোপালাচারী, যুক্তপ্রদেশ হইতে পণ্ডিত নেহরু, মধ্যপ্রদেশ হইতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল, বিহার হইতে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বাঙলা হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, আসাম হইতে শ্রীগোপীনাথ বরদলই, উড়িষ্যা হইতে হরেকৃষ্ণ মহতাব, পাঞ্জাব হইতে দেওয়ান চমনলাল, উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ হইতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান আবদুল গফুর খান প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা গণপরিষদে আসিলেন। মহাত্মা গান্ধী গণপরিষদে যোগদান না করিলেও বরাবরের মত কংগ্রেসের উপদেষ্টা হিসাবে রহিলেন। খ্যাতনামা আইনজ্ঞ স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু স্বাস্থ্যহানির জন্য গণপরিষদে যাইতে পারিলেন না। আর মিঃ এম-আর-জয়াকরের কলেজের পড়া বৎসরের ইংলণ্ড হইতে আসিয়া না পৌঁছানর প্রযুক্ত তিনিও সময় নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। (পরে জনৈক সদস্য পদত্যাগ করায় তিনি সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।)

এদিকে লীগপক্ষেরও সকল লীগ নেতাই গণপরিষদে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। তবে কংগ্রেস গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার মধ্যে অন্তরঙ্গ বিরোধক বিপুল ভোটাধিক্য লাভ করেন।

কেন নির্বিবাদেই গণপরিষদের সাধারণ ও মুসলমান আসনের জন্য সদস্য নির্বাচনকার্য সমাধা হইয়া গেল। শিখসম্প্রদায় গণপরিষদ বর্জন করিলেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁহাদিগকে গণপরিষদে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, দেশীয় রাজ্যেও নির্বাচনের তোড়জোড় চলিতেছে, ঠিক এমনি সময়ে মুসলীমলীগ হঠাৎ বাঁকিয়া বসিলেন। ২৮শে জুলাই নিখিল ভারত মুসলীম লীগ কাউন্সিল বোম্বাইএ তিনদিনব্যাপী অধিবেশনের শেষ দিনে ঘোষণা করেন যে—মুসলীমলীগ বৃটিশ মন্ত্রিমিশন ও বড়লাটের প্রস্তাবিত যৌথ ফেডারী পরিকল্পনা ও অন্তর্বর্তী সরকার গঠন—এই উভয় প্রস্তাব প্রত্যাহার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাবে বলা হয়—বৃটিশ তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। বর্তমানে গণপরিষদে যোগদান মুসলমানগণ

আত্মঘাতী বলিয়া মনে করেন, তাই তাঁহারা বিপদগ্রস্তের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহারা আর একপ্রস্থাব বৃটিশের তীব্র নিন্দা করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত খেতাব বর্জ্জনের জন্য মুসলমানদিগকে নির্দ্দেশ দেন। এই নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই সভায় অনেকজন মন্ত্রীবরেণ্য, যথা রাজাজী, স্যার প্রভৃতি খেতাব ত্যাগ করেন।

গান্ধী ও জিন্নাসাহেবের উভয়ের বক্তব্য ভারতে গণপরিষদ গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতান ভিন্নমুখী ও পরস্পর বিরোধী। ইঁহারা গণপরিষদ বর্জ্জন করায় যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ফলে গণপরিষদ সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিল। অতঃপর কংগ্রেস ও বৃটিশসরকার উপর ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যভার নির্ভর করিতেছে। ৩১।৭।৪৬

কাশীধামে শঙ্করাচার্য্যের মঠ

অধ্যাপক শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম্-এ

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ প্লাবিত ভারতভূমিতে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভারতের সীমায় প্রবেশপথগুলিতে প্রিয়তমা শিষ্যদের যেরূপভাবে 'মঠ' প্রচারের জন্য শিলালেখ খোদিত করাইয়াছিলেন সেইভাবে ভারতের চারি কোণে চারিটি মুখ্য মঠ স্থাপনা করেন ইহা চিরপ্রসিদ্ধ আছে। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ, সুদূর দক্ষিণে রামেশ্বরক্ষেত্রে সুমেরী মঠ, পশ্চিম সমুদ্র দ্বারকাক্ষেত্রে সারদা মঠ এবং হিমালয়ের বদ্য শিখরে কেদারবদরীক্ষেত্রে যোশী মঠ এবংবিধ হিন্দুধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া উহার গৌরব বিঘোষিত করিতেছে। উক্ত চারি মঠে যথাক্রমে আচার্য্য হস্তামলক, আচার্য্য সুরেশ্বর, আচার্য্য পদ্মপাদ ও আচার্য্য ত্রোটক আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন, ইহাও প্রখ্যাত আছে।

কিন্তু অনেকে ইহা অবগত নহেন যে পুণ্যতীর্থ ৺কাশীধামেও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এক মঠ স্থাপন করিয়া উহাতে তাঁহার পাদুকা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক বৌদ্ধ দমনের জন্য উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করেন। সম্প্রতি আমি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছি যে কাশীতে ফলগুবিনায়ক পল্লীতে শারদা মঠ নামে অদ্যাবধি সেই মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পাদুকাও সেখানে সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে। অদ্যাপি পঞ্চ-পাদুকা তৎশিষ্যগণ কর্ত্তৃক নিত্য অর্চ্চনা ও আষাঢ়ীয় গুরুপূর্ণিমা দিবসে ষোড়শোপচারে পূজা পাইয়া থাকে। কাশীধামে গোদাবরী নদীর দক্ষিণে ও বরণার পশ্চিমকূলে ঐ শারদা মঠ অবস্থিত ইহাই মঠের পুরাতন কাগজপত্রে পাওয়া যায়। কাশীর মধ্য দিয়া যে এক কীর্ণকায় গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইত, ইহা 'ডেফরীন' পুল যাঁহারা দেখিয়াছেন সেই সকল লোকের নিকট শুনা যায়।

এই মঠের আর একটি বৈশিষ্ট্য যে ইহা বাঙ্গালী পরিচালিত একমাত্র শঙ্করাচার্য্যের মঠ। কথিত আছে যে ইহা পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র মহাপুরুষগণ পরিচালিত হইতেছিল এবং কালক্রমে উহা যখন অবলুপ্তির উপক্রম হয়, তখন কাশীবাসীর দর্শনাভিলাষে যখন সদ্গুরু একজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী আসিয়া এই মঠের ভেলা হইয়া মঠ মহাদেবানন্দ তীর্থস্বামী নামে খ্যাতিলাভ করে। এই মহাত্মা হইতে বাঙ্গালীর এই প্রাচীন কীর্ত্তি অদ্যাবধি কাশীতে সগৌরবে রহিয়াছে এবং বর্ত্তমান সন্ন্যাসী বাঙ্গালী-মঠাধীশ মঠের পরিচালনা করেন।

বর্ত্তমানে এই মঠ রাজরাজেশ্বরীনামে প্রসিদ্ধ এবং ইহারও মূলে একটি ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। কিংবদন্তী আছে যে, মহাদেবানন্দ তীর্থের পরে ব্রহ্মপ্রকাশানন্দ তীর্থস্বামী সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া মহা উগ্র তপস্যা দ্বারা দেবী অন্নপূর্ণাকালীকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি কাঁসি নরেশ মহারাজ চৈত সিংহের সমসাময়িক ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের দ্বারা অকারণ আক্রান্ত হইয়া যখন তিনি পলায়ন করেন তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজের আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে আদেশ প্রদান করেন। সেই সময় উক্ত ব্রহ্মপ্রকাশানন্দ তীর্থস্বামী একদিন দেখিতে পান যে, একজন লোককে সোয়ারেরগণ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি উহাকে তাহার বন্ধনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ ব্যক্তি উত্তর দেয়—সে চৈৎসিংহের প্রাতুষ্পুত্র মহিমনারায়ণ সিংহ এই অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। এই বলিয়া ঐ ব্যক্তি সাধুর চরণে পতিত হয়। সাধু তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, তখন তোমার ভয় নাই। যদি দেবী ভদ্রকালী সত্য হন এবং গুরুদত্ত আমার মতি থাকে তাহা হইলে অদ্য তোমার প্রাণরক্ষা হইবে এবং এতদ্ব্যতীত তুমিই রাজা হইবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল এবং সেই অবধি রাজা মহিমনারায়ণ সিংহ সস্ত্রীক এই মঠে দীক্ষা লইয়া ইহার শিষ্যরূপে পরিগণিত হইলেন। সেই হইতে এই মঠের নাম রাজরাজ মঠ এবং শিষ্যপরম্পরায় এই মঠ কাশী নরেশ মহারাজ-দিগের সেবা পাইয়া আসিয়াছে এবং রাজপ্রসাদে মঠের সম্পত্তি ও মর্য্যাদারও বহু প্রসার হইয়াছিল। ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই পক্ষে গৌরবের বস্তু।

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়—এই মঠ এখন নানা কারণে হতগৌরব হইয়া ভৈরবদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির কর্ণধার শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় কাশীধামে চৈতন্যমঠের পুনরুদ্ধারে প্রশংসনীয়-ভাবে যত্নবান্ হইয়াছেন। কাশীধামে বাঙ্গালী পরিচালিত এই মঠটির বিলুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশু উদ্যম বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

শ্রীকেত্রনাথ রায়

৺হুগাপ্রসন্নের চট্টোপাধ্যায়

বিলাতে ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ

ইংলণ্ড ঃ ২৯৪ ও ১৪৩ (উইকেটে ডিক্লেঃ)

ভারতীয় দল ঃ ১৭০ ও ১৪২ (৯ উইকেট)

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ড্র হয়েছে। ২০শে জুলাই ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয়। খেলার আগের দিনে এবং রাত্রে প্রবল বারিপাত হয়। খেলার দিনও সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে থাকে। উইকেট ঢাকা থাকলেও মাঠের অবস্থা খেলার উপযুক্ত ছিল না। ফলে লাঞ্চের আগে খেলা আরম্ভ হ'ল না। বেলা ১-৫০ মিনিট সময়ে পতৌদি টসে জয়লাভ করেও ইংলণ্ডকে ব্যাট করতে দিলেন : প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ গ্রহণ না করায় সকলেই আশ্চর্য্য হ'ল। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন খেলার শেষ দিকে পিচ শক্ত হ'লে ভারতীয় দল 'best wicket'এ খেলার সুবিধা পাবে। ভিজে মাঠে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা মোটেই সুবিধা করতে পারলো না। খারাপ আবহাওয়ার দরুণও ২৫,০০০ হাজার লোক মাঠে খেলা দেখতে এসেছিলো। ৮১ রানে ইংলণ্ডের প্রথম উইকেট পড়লো, ওয়াসব্রুক ৫২ রান করে আউট হলেন। চায়ের সময় এক উইকেট হারিয়ে ইংলণ্ডের ১২৪ রান উঠে। ডেনিস কম্পটন অমরনাথের বলে এল-বি-ডবলউ হ'লেন ৫১ রান ক'রে। দলের রান তখন ১৫৬। দলের ১৮৩ রানে হাটন তিন ঘণ্টা ব্যাট ক'রে ৬৭ রান ক'রে মানকাদের বলে মুস্তাকের হাতে ধরা পড়লেন। মাত্র সাত রান যোগ হওয়ার পর ইলণ্ডের ১৯৩ রানে হার্ডষ্টাফ ৫ রান ক'রে অমরনাথের বলে খুব সহজ ক্যাচ তুলেন, মার্চ্চেণ্টও খুব সহজে তাঁকে ধরে নিলেন। দিনের শেষে ইংলণ্ডের ৪ উইকেটে ২৩৬ রান উঠল। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৯৪ রানে শেষ হ'ল। দলের সর্ব্বোচ্চ রান করলেন হ্যামণ্ড ৬৯। অমরনাথ ৯৬ রানে ৫ এবং মানকাদ ১০১ রানে ৫টা উইকেট পেলেন।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস সুবিধার হ'ল দলের সর্ব্বোচ্চ ৭৮ রান করলেন মার্চ্চেণ্ট। তারপর মুস্তাকের ৪৬ রান উল্লেখযোগ্য। পতৌদি ১১ রান করলেন; এর পর দু অঙ্কের আর কারও রান উঠলো না। বোলিং মারাত্মক হ'ল বেডসার এবং পোলার্ডের। ২৯ ওভার বলে ৯টা মেডেন নিয়ে এবং ৪১ রান দিয়ে বেডসার পেলেন ৪টা উইকেট; পোলার্ড পেলেন ৫টা, ২৭ ওভার বলে ১৬টা মেডেন নিয়ে এবং ২৪ রান দিয়ে। ভারতীয় দলের শেষ ৯টা উইকেট পড়েছে মাত্র ৪৬ রানে। খেলার শেষের দিকে আধ ঘণ্টা খেলায় ভারতীয় দলের দুটে উইকেট পড়ে গিয়ে ১০ রান উঠে। ইংলণ্ড ১২৪ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে হাটন এবং ওয়াসব্রুক। চিরপরিচিত 'ইংলিস পলিসি' মত ইংলণ্ড উইকেট হারিয়েও দ্রুত রান তুলে তাড়াতাড়ি ইনিংস ডিক্লেয়ার করার উদ্দেশ্যে খেলতে লাগলো। অমরনাথ আহত হওয়ার ফলে ভারতীয় দল দুর্ব্বল বোধ করতে লাগলো, যদিও তিনি তাঁর সুনাম অনুযায়ী বোল করতে লাগলেন। অমরনাথ ইংলণ্ডের মোট সাত রানে হাটনের উইকেট পেলেন। এরপর ওয়াসব্রুক তাঁর নিজস্ব ২৩ রানে এবং দলের মোট ৪৮ রানে মানকাদের বলে এল বি ডবলউ হলেন। এর পরই ভারতীয় দলের বোলারদের হাত খুলে গেল। দলের ৬৮ রানে হ্যামণ্ড

৮ রান ক'রে ধরা পড়লেন। দলের ঐ রানেই হার্ডস্টাফ এলেন এবং কোন রান না করেই অমরনাথের বলে বোল্ড হ'য়ে বিদায় নিলেন। এদিকে ডেনিস কম্পটন দলের এ ভাঙ্গনের মুখে দলকে রক্ষার জন্য খুব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলছেন। গিব তাঁর জুটি হয়ে শূন্য রান করে অমরনাথের বলে মোদীর হাতে আটকে গেলেন; দলের রান তখন ৮৪, এদিকে ৫টী উইকেট পড়ে গেছে। লাঞ্চের সময় দেখা গেল ইংলণ্ড ২০৮ রানে অগ্রগামী আছে হাতে তখনও অর্দ্ধেক উইকেট জমা। অমরনাথ আহত অবস্থায় ৩৮ রানে ৩টে উইকেট পেয়েছেন; মানকাদ পেলেন ২টো ২৩ রানে। বিশ্রাম সময়ে দর্শক সংখ্যা ২০,০০০ হাজারে দাঁড়ান। খেলার অবস্থা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উত্তেজনা-মূলক তা সকলেই অনুভব করতে লাগলো। অমরনাথ লাঞ্চের সময় ডান হাতের কনুইয়ের আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিয়ে সেই অবস্থায় বল করতে নামলেন। কম্পটন তাঁর ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটী ইকিনকে নিয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে ফেরেন। ভারতীয় দল খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়লো; ফিল্ডিং খুবই খারাপ হতে লাগলো। যেখানে মাত্র এক রান হবার কথা সেখানে একটা সামান্য ভুলের জন্যে ইংলণ্ড তিন রান করার সুবিধা পেতে লাগলো। ইংলণ্ডের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটীই ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের শ্রেষ্ঠ জুটী প্রমাণিত হ'ল। ইংলণ্ড ৫ উইকেটে ১৫৩ রান ক'রে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলো। হাতে সময় তিন ঘণ্টা, খেলায় জিততে হলে ভারতীয় দলের ২৭৮ রানের প্রয়োজন। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হ'ল। কোন রান হবার আগেই মার্চ্চেন্ট ধরা পড়লেন; দলের ১ রানে মুস্তাক ১ রান ক'রে এবং দলের ৫ রানে ক্যাপটেন পতৌদি ৩ রান করে আউট হলেন। দলের মোট ৭ রানে ভারতীয় দলের নামকরা তিনটে উইকেট পড়ে গেল। সারা মাঠে কি উদ্দীপনা! ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ জয়লাভের পথ অনেকখানি নিশ্চিন্ত এবং সুগম হয়ে গেল।

দলের এই পতনের মুখে চতুর্থ উইকেটের জুটী হাজারী এবং মোদী দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ভারতীয় দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করলেন। তাঁদের জুটীতে ৭৪ রান উঠে। দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে দলকে রক্ষা করে 'test honours' সম্মান ভাগ ক'রে নেওয়ার সমস্ত কৃতিত্ব মোদী এবং হাজারীর প্রাপ্য। হাজারী ৪৪ এবং মোদী ৩০ রান করেন। এই প্রসঙ্গে হার্ডিষ্টের ৩৫ এবং সোহনীর ১১ রান ও উল্লেখযোগ্য। বেডসার দু'দলের মধ্যে সব থেকে বেশী ৭টী উইকেট পেলেন ২৫ ওভার বলে ৪টে মেডেন নিয়ে এবং ৫২ রান দিয়ে। পোলার্ড পেলেন ২টো ৬৩ রানে ২৫ ওভার বলে ১০টী মেডেন দিয়ে।

ইংলণ্ড: হাটন, ওয়াসব্রুক, কম্পটন, এমণ্ড (ক্যাপটেন), হার্ডষ্টাফ, গিব, ইকিন বেডসার, পোলার্ড ভোস ও রাইট।

ভারতীয় দল: মার্চ্চেন্ট, মুস্তাক আলী, হার্ডিষ; মানকাদ, হাজারী, মোদী পতৌদি (ক্যাপটেন), অমরনাথ, সোহনী, সারভাতে ও হিন্দেলকার।

ভারতীয় দল: ৫০৩ (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

সাসেক্স: ২৫৩ ও ৪২৭।

ভারতীয় দল ৯ উইকেটে সাসেক্স দলকে হারিয়েছে। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে ভি এম মার্চ্চেন্ট ২০৫, ভি মানকাদ ১০৭, পতৌদি ১১০ (নট আউট) এবং লালা অমরনাথ ১০৬ রান করেন।

সাসেক্সদলের দ্বিতীয় ইনিংসে কষ্ট ২৩৪ রান নট আউট থেকে ব্যাটিংয়ে সাফল্যলাভ করেন; এ ছাড়া জেমসের ৭৯ রান উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় দল: ৬৪ ও ৪৩১

সোমার সেট: ৫০৬ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)।

সোমার সেট তিনদিনের খেলায় ভারতীয়দলকে এক ইনিংসে এবং ১১ রানে শোচনীয় ভাবে হারিয়েছে।

ভারতীয় দল প্রথম ব্যাট ক'রে মাত্র ৬৪ রানে ইনিংস শেষ করে। পতৌদি দলের সর্ব্বোচ্চ ২৯ রান করেন।

এণ্ড্রুজ ৩৬ রানে এবং বাউস ২৭ রানে ৫টা উইকেট পান। সোমার সেট প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৫০৬ রান করে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করেন। গিমব্লেট ১০২, ল্যাংগ্রীজ ৭৪ এবং লী ৭৬ রান করেন। ওয়ালফোর্ড ১৪১ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৩১ রান করে। মার্চ্চেন্ট ৮৯, পতৌদি ৭৬, অমরনাথ ৪৮, হার্ডিষ ৪১, সোহনী ৪২ রান, হিন্দেলকার ৩০ এবং সারভাতে নট

আউট ৬৬ রাণ করেন। দ্বিতীয়বার সারভাতের সঙ্গে জুটী বেঁধে ৫২ রান করেন। ৩১-১ ও ২ আগষ্ট

ল্যাঙ্কাশায়ার : ৪০৬ ও ১৭২

ভারতীয় দল : ৪৫৬ (৮ উইঃ)

খেলা ড্র যায়।

ভারতীয় দলের পক্ষে উল্লেখযোগ্য রান মার্চেন্ট নট আউট ১৫২, মুস্তাক ৬০, হাকিম ৪৩, সোহনী ৬৪, মানকাদ ৪০ ; ইকিন ১২০ রানে ৩ পার্সিক ৬৪ রানে ২ এবং প্রাইস ৬৭ রানে ২টী উইকেট লাভ করেন।

ল্যাঙ্কাশায়ার দলের প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান ওয়াসব্রুক ১০৮, ইকিন ১৩২, হোয়ার্ট ৭৩। সোহনী ৮২ রান দিয়ে ৪ এবং মানকাদ ১৩৪ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছিলেন।

ভারতীয় দল : ৩৪০ (৯ উইকেটে ডিক্লে) (পতৌদি ১১২, মোদী ৯২, গুলমহম্মদ নট আউট ৬২ রোডেন ১০৪ রানে ৫ এবং কম্পনর ৬০ রানে ২ উইঃ)

ডার্বিশায়ার : ৩৬৬ (মার্শ ৮৬, ইলিয়ট ৬১ ; সিডে ১০৯ রানে ৪ উইঃ এবং মানকাদ ৬৯ রানে ৬ উইঃ) ও ২০৯ (ইলিয়ট ৪৪, রেডিস ৫০ ; মানকাদ ৫০ রানে ৩ উইঃ, অবরনাথ ৩৩ রানে ৩ উইঃ)

ভারতীয় দল ১১৮ রাণে বিজয়ী হয়েছে।

ইয়র্কশায়ার : ৩০০ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ও ৬৪ (কেহ আউট হয়নি)

ভারতীয় দল : ৪৯০ (৫ উইকেটে ডিক্লে:)

বৃষ্টির জন্য শেষের দিনের খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ না হলে ভারতীয় দলের এ খেলায় জয়লাভের যথেষ্ট আশা ছিল। ইয়র্কশায়ার দলের প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান শিব ৭১, ওয়াটসন ৫৫, হ্যালিডে ৫১ ; মানকাদ ৫৬ রানে ৩ এবং হাজারী ৭২ রানে ২ উইকেট পান।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে হাজারী ২৪৪ রান ক'রে নট আউট ৫১ রান উল্লেখযোগ্য। মানকাদ বিলাতের খেলায় এই প্রথম সেঞ্চুরী করেন। হাজারীর নট আউট ২৪৪ রান, মার্চেন্টের ২৪২ রানের রেকর্ড ভেঙেছে এবং 'English season' এ সর্বোচ্চ রান সংখ্যা বলে স্বীকার করা হয়েছে। হাজারী ২৪টী বাউণ্ডারী করেন।

ফুটবল লীগ :

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ২৪টী খেলায় ৪৩ পয়েন্ট ক'রে পর্যায়ক্রমে দু'বার লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল। তারা মাত্র মহমেডান স্পোর্টের কাছে হেরেছে, ড্র করেছে ৩টি খেলা। মোহনবাগান এক পয়েন্ট পিছনে থেকে লীগে রাণার্স-আপ্ হয়েছে। মোহনবাগান এবার লীগে একটা খেলাতেও হারেনি, ভারতীয় দলের মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবই প্রথম লীগের খেলায় অপরাজেয় রেকর্ড করলো।

দ্বিতীয় বিভাগে লীগ পেয়েছে জর্জটেলিগ্রাফ, রাণার্স আপ পেয়েছে রাজস্থান ক্লাব।

তৃতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে রোপাওদে হাট ; পোর্টকমিশনার রাণার্স আপ হয়েছে। চতুর্থ বিভাগে লীগ পেয়েছে বেঙ্গল এ সি।

পাওয়ার লীগ :

পাওয়ার মেমোরিয়াল ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগের খেলায় ভবানীপুর ক্লাব ২-০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। পাওয়ার লীগ খেলায় ভবানীপুর ক্লাবের এই প্রথম সাফল্য। মোহনবাগান ক্লাব 'এ' গ্রুপ থেকে ১৩টা খেলায় ২৬ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হয়। অপর দিকে ভবানীপুর ক্লাব ১৩টা খেলায় ২৪ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান পায়। এই লীগের খেলায় উভয় দলই অপরাজেয় ছিল। ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব এ বছরের প্রথম পরাজয় স্বীকার করে। ভবানীপুর ক্লাবের এ কৃতিত্ব সত্যই প্রশংসনীয়।

ইণ্টার অফিস লীগ :

ইণ্টার অফিস ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বিভাগে বাটা স্পোর্টস ক্লাব এবারও লীগ বিজয়ী হয়েছে। রাণার্স আপ্ হয়েছে বেঙ্গল কেমিক্যাল।

আই এফ এ শীল্ড :

আই এফ এ শীল্ডের খেলা ২৫শে জুলাই থেকে আরম্ভ হয়েছে।

আই এফ এ শীল্ড খেলার পূর্বের মত আর সে প্রবল প্রতিযোগিতা এবং উদ্দীপনা নেই। এর একমাত্র কারণ

পূর্ব্বের মত দুর্দ্ধর্ষ মোরাদল এই প্রতিযোগিতায় আর যোগদান করছে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সব ফুটবল দল খেলতে আসে, তারাও খুব শক্তিশালী নয়—এখানের স্থানীয় দলের কাছে অনায়াসে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধি দলের খেলা এবং খেলার ফলাফল দর্শকদের কাছে মোটেই আনন্দদায়ক নয় এবং পীড়াদায়ক। মফঃস্বলের ফুটবল খেলোয়াড়দের উৎসাহদানের জন্য ইষ্টার জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা নামে পৃথক একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হ'লে খেলার সত্যিকারের উৎসাহদান করা হবে এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হবে। অবিশ্য মফঃস্বলের শক্তিশালী দলকে আই-এফ-এ প্রতিযোগিতা থেকে একেবারে বাদ দিতে বলছি না তাদের যোগদান করতে আমরা সর্ব্বদাই আহ্বান করছি। কোন অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে এবার স্থানীয় দল যে শীল্ড পাবে তা খেলার ফলাফল থেকে ধারণা করা যায়।

খেলার মাঠের গণ্ডগোল ঃ

ভবানীপুর-মহমেডান স্পোর্টিং এবং মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের লীগের খেলার শেষে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ক'লকাতার ফুটবল মাঠে ঘটেছিল তার শেষ সংবাদের (latest news) উপর ভিত্তি ক'রে গতবার আলোচনা আরম্ভ করা হয়েছিল। তার পর অনেক ঘটনা এবং রটনা হয়ে গেছে। মোহনবাগান ক্লাবের অফিস থেকে আই-এফ-এ অফিসে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের তাঁবুর সীমানা থেকে ইট-পাটকেল এবং সোডার বোতল এসে মোহনবাগান ক্লাবের তাঁবু নষ্ট করেছে, সভ্য এবং দলের সমর্থকদের আহত করেছে। এ ব্যাপারে নাকি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কোন বিশিষ্ট সভ্য জড়িত এবং তাঁরই উৎসাহে এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল দর্শক এ কাজ করেছে বলে মোহনবাগান ক্লাবের সম্পাদক অভিযোগ করেছিলেন। এর পর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক মিঃ জে সি গুহ এই শেষের ঘটনা ভিত্তিহীন বলে বিবৃতি দিয়েছেন এবং প্রকৃত দোষীর নাম প্রকাশ করতে 'চ্যালেঞ্জ' করেছেন। ১২ই জুলাই ইডেন গার্ডেনে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের তাঁবুতে আই-এফ-এর এক সভা হয়। সেই সভায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক মিঃ জে সি গুহ যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা ১৩ই জুলাই তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় সে সংবাদ থেকে উদ্ধৃত করা হ'ল—

"...The usual hour of play had nothing to do with it, he thought,...Mr. Guha also felt, that better result might be arrived at, if the two clubs had formed a joint Enquiry"

মিঃ গুহ শেষের দিকে ভাল প্রস্তাবই দিয়েছেন; কিন্তু 'the usual hour of play had nothing to do with it, he thonght...That the I. F. A. had no jurisdiction in this matter—এই উক্তির সমর্থন করা যায় না। খেলা আরম্ভ হবার পূর্ব্বে খেলার মাঠে সমর্থকদের মধ্যে কদাচিৎ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু খেলার সময় রেফারীর ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য অথবা খেলোয়াড়দের ফাউল খেলার ফলেই স্বভাবতই দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। সুতরাং খেলার সময়ের ঘটনা উপলক্ষ করে যে সব গণ্ডগোলের সৃষ্টি সে সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার এবং দায়িত্ব আই-এফ-এর নিশ্চয়ই থাকা উচিত। খেলা পরিচালনা করতে গিয়ে রেফারীরা যদি বারবার অজ্ঞতা হেতু দর্শকদের মধ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেন এবং প্রস্তুত হ'ন অথবা খেলোয়াড়রা যদি খেলার আইন ভঙ্গ ক'রে অভদ্রতার পরিচয় দেন তাহলে এসব ব্যাপারে আই-এফ-এর পরিচালকমণ্ডলীর কি কোন দায়িত্ববোধ থাকে না? খেলার মাঠে যে সব গণ্ডগোলের উৎপত্তি তা যখন খেলার সময়ের ঘটনা এবং ফলাফল উপলক্ষ করে, তখন পুলিশের উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আই-এফ-এ যদি দায়িত্ব এড়িয়ে যায় তাহলে কি তার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করা যেমন পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে অশোভন এবং অযোগ্যতার কারণ তেমনি খেলা পরিচালনা ব্যাপারেও এ কথা বলা চলে। মাঠে উপস্থিত সকলের মনোবৃত্তি এক নয়, সুতরাং তাদের নিয়ন্ত্রণ করা আই-এফ-এর পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয় আমরা তা স্বীকার করি; কিন্তু সকলেই যদি নিজ নিজ কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করে তাহলে গণ্ডগোলের পরিমাণ

নিশ্চয়ই কম হবে। আই-এফ-এ-র কর্ত্তব্য রেফারী নিয়োগের ভার নিজে গ্রহণ ক'রে রেফারীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া, খেলার আইনের বই প্রকাশ ক'রে দর্শকদের মধ্যে প্রচার করা এবং ফুটবল খেলার প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যবহারিক (practical) কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করা।

সেদিনের মাঠের দর্শকমাত্রেই স্বীকার করবেন মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলার সময়ে কয়েকটি ঘটনার ফলে দর্শকদের মধ্যে প্রথম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খেলার অব্যবহিত পরে ক্যালকাটার সাদা পোষাকীর সামনে এক খণ্ডযুদ্ধও হয়ে যায়; এর পর মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের সম্মিলিত মাঠে যে ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে 'the usual hour of play had nothing to do with it' এবং the I. F. A. had no jurisdiction in this matter এ উক্তি কি খুবই যুক্তিপূর্ণ হবে?

আই-এফ-এ-র অপর এক সভায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক মহাশয় মোহনবাগান ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য, খেলোয়াড়োচিত ভদ্রব্যবহার এবং 'big brothers' প্রভৃতি কথার উল্লেখ করে মোহনবাগান ক্লাবকে সম্মানিত করেন এবং এ ব্যাপারে মিটমাটের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রকাশ, ঐ সভায় মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিনিধি তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ ক'রেছিলেন। সাময়িকভাবে এই সব গণ্ডগোল মেটাবার চেষ্টা করা ছাড়া যাতে ভবিষ্যতে খেলার মাঠে এ রকম ব্যাপার না ঘটে তার চেষ্টা প্রত্যেক ক্লাবেরই করা উচিত। খেলার সময় দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মাঠ ছেড়ে ট্রামে বাসে রাস্তায় রাস্তায় নানা রকম অঙ্গভঙ্গি এবং উক্তি দিয়ে যে ভাবে আনন্দ প্রকাশ করা হয় তা আমরা কোন দলেরই পক্ষ হয়ে সমর্থন করি না। আশার কথা আই-এফ-এ-র পরিচালকমণ্ডলী খেলার মাঠের অপ্রিয় ঘটনা দূরীকরণে অগ্রসর হয়েছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

অপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল প্রণীত উপন্যাস "জীবন ও মৃত্যু"—৩৲
শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় প্রণীত "মিস্ লতিকা চৌধুরী"—১৷৹
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত "মৃত্যুর পরপারে" (১ম খণ্ড)—৩৲
শৈলেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "তোমার পতাকা যারে দাও"—২৲
রমাপতি বসু প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "আগামীকালের কবিতা"—১৷৹
শ্রীচাঁদমোহন চৌধুরী প্রণীত গল্প গ্রন্থ "যাদের ডাক"—২৲
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দত্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "যৌবন বাঁশী"—১৲
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "প্রান্তিক"—৩৷৹
ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত "প্রেমানন্দ" (২য় ভাগ)—২৷৸৹
রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ প্রণীত 'বৈষ্ণব রসসাহিত্য'—৸৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এবার আশ্বিন মাসের মধ্যভাগেই শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজা। সেজন্য মহালয়ার পূর্ব্বেই সকল গ্রাহকদের নিকট কাগজ পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে আমরা আশ্বিনের প্রথমেই কার্ত্তিক সংখ্যা ও ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আশ্বিন সংখ্যা প্রকাশ করিব। বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথা সময়ে বিজ্ঞাপনের কপি প্রেরণের ব্যবস্থা করুন, ইহাই প্রার্থনা। কলিকাতা-ব্যাপী ছাপাখানা ধর্ম্মঘট আসন্ন—যদি তাহা ঘটে, তাহা হইলে যথাসময়ে কাগজ প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ, ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আশ্বিন—১৩৫৩

প্রথম খণ্ড	চতুস্ত্রিংশ বর্ষ	চতুর্থ সংখ্যা

পরীক্ষায় দুর্নীতির কারণ নির্ণয়

শ্রীউমাপতি ঘটক

গত কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টার-মিডিয়েট প্রভৃতি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাশের (Pass) সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। ইংরেজি ও গণিতে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাই অনেক বেশী। পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে দুর্নীতিও দেখা দিয়াছে। পরীক্ষাকালে বহি-পরীক্ষার্থীর খাতা হইতে নকল করা বা পাঠ্য-পুস্তক সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া নকল করার অভিযোগ আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। পরীক্ষা হলে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাঘাত অপরাধে গার্ডের লাঞ্ছনা—ভাইস-চান্সেলারের গাড়ী আটক করিয়া পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া দিবার অনুরোধ—পরীক্ষার সময় প্রশ্ন কঠিন মনে করিয়া দলবদ্ধভাবে পরীক্ষা বর্জন করা—এ সকল ব্যাপার পূর্বে দেখা যায় নাই।

অনেকেই হয়তো বিবাদ করেন যে বর্তমান বর্ষবট ও হরতালের যুগে এ-ও এক-প্রকার বর্ষবট ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু আমাদের মনে হয় এই ব্যাপারে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও একটা প্রকাণ্ড গলদ থাকিয়া গিয়াছে। ছাত্রশ্রেণী অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে অনেকের বিশ্বয় হই করে না; কিন্তু দুর্নীতির প্রশ্রয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে ছাত্রগণ কি কিছুই শিখে না? তাহাদের শিক্ষা কি ভ্রান্ত পথে চালিত হইতেছে?

এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহু ছাত্রছাত্রীর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা স্থগিত রাখিয়াছেন। পরীক্ষার সময় আলোচ্য ছাত্রছাত্রীগণ একে অপরের খাতা হইতে প্রশ্নোত্তর নকল করিয়াছিল—ইহাই ইহাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। এই অভিযোগের মীমাংসা হইতে কতদিন লাগিবে কে জানে? কিন্তু ততদিন পর্যন্ত ইহারা কলেজে বা স্কুলে ভর্তি হইতে পারিবে না। পড়াশুনা একেবারে বন্ধ। এ এক ত্রিশঙ্কু—অবস্থা।

ছাত্রগণের এই প্রকার মনোবৃত্তির কারণ হয়তো অনেক আছে। বর্তমানে হাই স্কুলের শিক্ষকগণ শিক্ষাদান কার্যে অবহিত আছেন কিনা এ প্রশ্নও উঠিতে পারে। কিন্তু সে কথা আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

আমাদের মনে হয়—যাহারা নূতন বিধানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা

দিতেছে—এই গোলযোগটা যেন তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই কারণে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পুরাতন ও নূতন বিধানের মধ্যে পার্থক্যটা কি ধরণের তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষাকে গ্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ভাষায় একটী প্রশ্ন-পত্র রচিত করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ইতিহাস ও ভূগোল অবশ্যপাঠ্য ছিল না; কিন্তু এখন এই দুইটি বিষয়কে অবশ্য পাঠ্যের (Compulsory) তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ইংরেজির একটী প্রশ্নপত্র বর্দ্ধিত হওয়ায় ইংরেজির পূর্ণমার্ক (Fullmarks) এখন ২০০ স্থলে ২৫০এ পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে শতকরা ৪০ নম্বর পাইলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া যাইত, এখন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে হইলে শতকরা ৬০ নম্বর পাইতে হয়।

পূর্ব্বে (১৯১০ খৃষ্টাব্দে) ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার অবশ্য পাঠ্য বিষয়গুলির গুরুত্ব এইরূপ ছিল :—

বিষয়	পূর্ণমার্ক
ইংরেজি	২০০
বাঙ্গালা	১০০
সংস্কৃত	১০০
গণিত	১০০
মোট	৫০০

ইহা ছাড়া কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয় ও পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে যে কোন দুইটিকে মনোনীত করিতে হইত। অতিরিক্ত বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান ছিল এই কয়টি :—

বিষয়	পূর্ণমার্ক
গণিত	১০০
মেকানিক্স (Mechanics)	১০০
সংস্কৃত —	১০০
ইতিহাস —	১০০
ভূগোল —	১০০

সুতরাং অবশ্যপাঠ্য ও অতিরিক্ত বিষয়গুলির পূর্ণমার্ক ছিল—৭০০। ইহার মধ্যে ৩০০ নম্বর পাইলেই ছাত্রগণ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে (First Division) উত্তীর্ণ হইত। পূর্ব্বে ইংরেজির সমস্ত প্রশ্নই ছিল ব্যাকরণ ও রচনাদি (Composition) সম্বন্ধে। তখন বাঙ্গালা হইতে ইংরেজিতে অনুবাদের যে প্রশ্ন থাকিত তাহার পূর্ণমার্ক ছিল ৭০; (এখন সেই স্থলে ৫০ হইয়াছে) ইহার পর ১৯২৩ সাল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইংরাজির জন্য পাঠ্য পুস্তক হইতে প্রশ্ন থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ১৯২৮ সালে যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হয় তাহার ইংরেজি ভাষার প্রশ্ন পত্রের বিভিন্ন-বিভাগে পূর্ণমার্ক এইরূপ ছিল :—

(ক) প্রথম প্রশ্নপত্র (১০০)		পূর্ণমার্ক
১। বাঙ্গালা হইতে ইংরেজিতে অনুবাদ	—	৫০
২। রচনা (২টী) ...	১০×২	=৩০
৩। ব্যাকরণ সংক্রান্ত প্রশ্ন	—	৩০
		১০০
(খ) দ্বিতীয় প্রশ্ন পত্র (১০০)		
১। পাঠ্য পুস্তক হইতে প্রশ্ন		৫০
২। সংক্ষিপ্তসার রচনা		৫০
		১০০

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ইংরেজির ২০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বরের প্রশ্ন থাকিত পাঠ্যপুস্তক হইতে। বাকী ১৫০ নম্বরের প্রশ্ন থাকিত ব্যাকরণ হইতে; অবশিষ্ট ১২০ নম্বরের প্রশ্ন হইত রচনাদি বিষয়ে। সুতরাং পরীক্ষায় পাস করিবার জন্য ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, রচনা, অনুবাদ প্রভৃতি ভালভাবে শিখিতে হইত।

যে সব ছাত্রের গণিতে একটু পারদর্শিতা দেখা যাইত তাহারা অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে গণিত ও মেকানিক্স (Mechanics) গ্রহণ করিত। গণিতের এই তিনটি পেপারে ৩০০ পূর্ণমার্কের তাহাকাছি নম্বর তোলা তখনকার ছাত্রগণের মধ্যে একটা আনন্দজনক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল।

তখন বেশীর ভাগ ছাত্রই গণিত ও সংস্কৃতকে অতিরিক্ত পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করিত। ইহারা গণিত, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভালভাবে শিখিবার সুযোগ পাইত বলিয়া উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধায় পড়িত না।

নূতন বিধান

নূতন বিধানের পরীক্ষণীয় বিষয়সমূহের গুরুত্ব এইরূপ :—

বিষয়		পূর্ণমার্ক
ইংরেজি	—	২৫০
বাঙ্গালা	—	২০০
সংস্কৃত	—	১০০
ইতিহাস	—	১০০
ভূগোল	—	৫০
গণিত	—	১০০
মোট.....		৮০০

ইহা ছাড়া অতিরিক্ত কয়েকটি বিষয়কেও পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী বিষয় পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়; কিন্তু গ্রহণ করা বা না করা ছাত্রগণের ইচ্ছাধীন। ইহা অনেকটা ইণ্টারমিডিয়েট (Intermediate) পরীক্ষার চতুর্থ বিষয়ের (Fourth Subject) মত; পড়িবার বা পরীক্ষা দিবার কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। অতিরিক্ত বিষয়ে ছাত্রগণ যত নম্বর পাইবে, তাহা হইতে ৩০ নম্বর বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই তাহার নম্বর সঙ্গতির (Aggregate) সহিত যোগ করা হয়। এই সব স্বেচ্ছাধীন অতিরিক্ত

বিষয়গুলির মধ্যে গণিত, ভারতের শাসনব্যবস্থা (Public Administration) মেকানিক্স্ ও বিজ্ঞান প্রধান।

মূতন বিধানে অতিরিক্ত বিষয়গুলির অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, একটী অতিরিক্ত বিষয় গ্রহণ করিয়া পড়িবার আগ্রহ খুব কম ছাত্রেরই দেখা যায়। অঙ্ক কষিবার ভয় তাড়া যাই—কারণ ৩০ পাইবার দিকেই ঝোঁক বেশী। ৩০০ পাইবার জন্য উৎসাহ প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণ অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষা করে না। তাই ইংরেজি হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ শিক্ষা করার দিকে ছাত্রগণের আর তত অভিনিবেশ দেখি না। অন্যান্য বিষয়ের অবস্থাও তথৈবচ। বিজ্ঞান এখনও অতিরিক্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ইহাকেও অন্য পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে বলিয়া মনে হয়। এইবার আমরা ইংরেজি ভাষার কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা দেখাইয়াছি যে পূর্ব্বে ইংরেজিতে মূলমার্ক ২০০ শতের মধ্যে ১৫০ নম্বরের প্রশ্ন থাকিত ব্যাকরণ ও রচনাদি হইতে। তাহারও পূর্ব্বে পাঠ্যপুস্তক হইতে কোন প্রশ্ন থাকিত না। এখন ইংরেজির ২০০ নম্বরের মধ্যে ৭৫ নম্বরের প্রশ্ন থাকে ব্যাকরণ ও রচনাদি বিষয়ে। বাকী ১২৫ মার্কের প্রশ্ন থাকে পাঠ্যপুস্তকসমূহ হইতে। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কোন্ বিষয়ে নম্বর কিরূপে ভাগ করা হইয়াছে ও তাহার ফল কি হইয়াছে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব :—

ইংরেজি			দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র		
প্রথম প্রশ্নপত্র			পাঠ্যপুস্তক (গদ্য)	—	৫০
পাঠ্যপুস্তক (গদ্য)	—	৭৫	বাঙলা ইংরাজি অনুবাদ		২০
ব্যাকরণ	—	২৫	চিঠিপত্র রচনা	—	১৫
		১০০	সংক্ষিপ্ত রচনা	—	১৫
					১০০

তৃতীয় প্রশ্নপত্র মূলমার্ক
ক্রত পাঠের জন্য
নির্ব্বাচিত ২খানি পুস্তক হইতে — ৫০

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে বাঙ্গালা হইতে ইংরেজি অনুবাদের প্রশ্নের নম্বর ৫০ হইতে কমিয়া ২০ হইয়াছে। প্রবন্ধ রচনা (Essays) উঠিয়া গিয়াছে। ব্যাকরণের নম্বর ৩০ হইতে কমাইয়া ২৫ করা হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত রচনার জন্য যেখানে ৫০ নম্বর থাকিত, এখন সেখানে মাত্র ১৫ নম্বরের প্রশ্ন থাকে।

শিক্ষার্থিগণ যাহাতে বই পড়িয়া প্রস্তুত করিতে পারে তাহার জন্যই পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা বাড়ানো হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পাঠ্য বিষয়ও অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু পুস্তক পাঠ করিয়া তাহার বিষয়বস্তু মনে রাখিতে ছাত্রগণের এত সময় যায় যে তাহাদের Grammar ও Compositionএর জন্য অতি সামান্য সময়ই থাকে। ফলে ইংরেজিতে অনুবাদ, সংক্ষিপ্ত-রচনা, প্রবন্ধ-রচনা, অন্যান্য ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনুশীলনী, গণিত প্রভৃতির চর্চ্চা করা ছাত্রগণ আবশ্যক বোধ করে না। পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত ১২৫ নম্বরের প্রশ্নোত্তরে ভাল মার্ক তুলিতে হইলেও যে দেশের দিকে অধিক অবধানোযোগ দান করা উচিত তাহা ছাত্রগণ মনে মনে বুঝিলেও এ বিষয়ে যেন তাহাদের আর তেমন উৎসাহ নাই। ফলে ছাত্রগণের ইংরেজি শিক্ষার ভবিষ্যৎ কাঁচা থাকিয়া যাইতেছে। ইংরেজির এক পত্রের উত্তরে তাহারা যাহা লেখে তাহাতে থাকে অসংখ্য ভুল; বানানের ভুল ত' থাকেই, তাহা ছাড়া বাক্য-গঠনে (Sentence Construction) এত অদ্ভুত রকমের ভুল দেখা যায় যাহাতে মনে হয় যে ছাত্রগণ ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলিও আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ইংরেজিতে এইরূপ বিদ্যা লইয়া তাহারা কলেজে যাইয়া আরো মুস্কিলে পড়ে। ইহা ব্যতীত আরো অসুবিধা আছে।

এখন এক বাঙ্গালা ব্যতীত সকল বিষয়ের প্রশ্নপত্র রচিত হয় ইংরেজিতে। অঙ্ক ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ্য-পুস্তক বাঙ্গালায় রচিত। বাঙ্গালা মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্য্য চলে।

অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা গণিতের ব্যাপারে অসুবিধাটা একটু অধিক বলিয়া বোধ হয়। গণিতের বাঙ্গালা পরিভাষার (Terminology and Nomenclature) সহিত ছাত্রগণ পরিচিত; ইংরেজি পরিভাষা অনেকেরই জানা নাই। এরূপ স্থলে ইংরেজিতে রচিত প্রশ্ন সাধারণ ছাত্র ঠিক বুঝিতে পারে না।

তাহা ছাড়া, গণিতের প্রশ্নোত্তর লিখিবার কালে পাটীগণিত ও জ্যামিতির প্রশ্নোত্তর লিখিতে হইবে বাঙ্গালায়; কিন্তু বীজগণিতের উত্তর ইংরেজি বাঙ্গালায় মিশাইয়া লিখিতে হইবে। ইহাতে ছাত্রগণকে কিরূপ অসুবিধায় সম্মুখীন হইতে হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে মেকানিক্স্ শিখিবার কোন উপায় নাই। কারণ একটী মাত্র বিষয় অতিরিক্ত হিসাবে পড়া চলে। অতিরিক্ত গণিত লইলে আর মেকানিক্স্ লইবার উপায় নাই; অথচ অতিরিক্ত গণিত না লইয়াও মেকানিক্স্ গ্রহণ করা চলে। কিন্তু অতিরিক্ত গণিতের অনেক বিষয় জানা না থাকিলে ছাত্রগণকে মেকানিক্সের অনেক বিষয় একেবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিতে হয়। ইহা অনেকটা না বুঝিয়া মুখস্থ করার মত।

গণিতের যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক আছে তাহা পূর্ব্বেকার ইংরেজি পুস্তক হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু এই অনুবাদও এরূপ অদ্ভুত ভাষা-বিন্যাসের সৃষ্টি করে যে শিক্ষকেরই মনে হয় ইংরেজিটাই সোজা ছিল। সুতরাং ইহা ছাত্রগণের কিরূপ উৎসাহ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে পাঠ্য-পুস্তকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রতি বৎসরই পাঠ্য-পুস্তকের পরিবর্ত্তন হইতেছে। কোন একজন গ্রন্থকারের গ্রন্থ কেনই বা অনুমোদিত হইল—আবার পরবৎসরই সেই লেখকের পুস্তক কেনই বা পরিত্যক্ত হইল—তাহার কারণ খুঁজিতে যাইয়া এই কথাই মনে হয় যে, আমরা প্রত্যেক নির্ব্বাচন করি, পুস্তক নির্ব্বাচন করি না। এই প্রকার পুস্তক পরিবর্ত্তনের গোলমালের মধ্যে শিক্ষার ধারাবাহিকতা বা পরম্পরা (continuity) নষ্ট হয়। বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী হইতে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী পর্য্যন্ত এক

একটী শ্রেণীতে কি কি পেখানো হইয়াছে, তাহার হয়তো একটা হিসাব থাকে। কিন্তু—কোন কোন বিষয় শিখাইতে বাকী রহিল তাহার কোন হিসাব থাকে না; কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও দুশ্চিন্তা নাই।

পুস্তক বাহুল্যের ঘটা দেখিয়া অনেক ছাত্র পাঠ্য পুস্তকই ক্রয় করে না। বাজারে যে সমস্ত short-cut series কিনিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ ছাত্র তাহার সাহায্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করে।

যে সমস্ত শিক্ষক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী আছেন তাঁহারা এই দুর্মূল্যের বাজারেও বিদ্যালয় হইতে যে সামান্য বেতন পান তাহাতে তাঁহাদের ৫।৬ দিনের বেশী চলে না। ফলে অধিকাংশ শিক্ষককে প্রাইভেট টিউশনী (Private Tuition) করিয়া জীবন চালাইতে হয়। যাঁহারা সুর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১০।১১টা পর্য্যন্ত ৫।৬ স্থানে টিউশনী করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের স্নানাহার পর্য্যন্ত হয় না, বিশ্রাম ত' দূরের কথা। ইহার উপর আবার বিদ্যালয় তাঁহাদিগকে সপ্তাহে ৩০।৪০ ঘণ্টা (periods) পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়। তাই, অকালে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইঁহারা বিদ্যালয়েই বা কি পড়াইবেন—প্রাইভেট ছাত্রকেই বা কি শিক্ষা দিবেন তাহা আমরা জানি না। যেখানে একখানি মাত্র পুস্তক পড়াইতে বেড়ঘণ্টার মত সময় লাগে—সেখানে ছাত্র গৃহশিক্ষকের নিকট হইতে কতটুকু সাহায্য পাইতে পারে? অভিভাবকগণ গৃহশিক্ষকের উপর সমস্ত বিষয়ের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। ছাত্র কি শিখিতেছে বা শিখিতেছে তাহা তাঁহারা মোটেই খোঁজ করেন না; তবে পরীক্ষায় পাশ করিলেই হইল। ছাত্রও পড়িতে চায় না; সে চায় যে মাষ্টার মহাশয় পরীক্ষার পূর্ব্বে তাহাকে এমন কয়েকটী প্রশ্ন বলিয়া দিবেন, যাহার উত্তর মুখস্থ করিতে পারিলেই সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। যে শিক্ষককে দিনের মধ্যে ৫।৬ স্থানে পড়াইতে ছুটিতে হয়, তাঁহার পক্ষে টিউশনী বজায় রাখিবার জন্য যাহা যাহা করেকটী প্রশ্নোত্তর করানো ছাড়া আর উপায় কি? এ অনেকটা অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়ার মত। ছাত্র যাহা মুখস্থ করে, তাহা যদি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তেমন অসুবিধা হয় না; কিন্তু, মুখস্থ করার একটা সীমা আছে। ছাত্রের সামর্থ্য যেখানে ব্যর্থ হয়, সেখানে তাহার বিদ্রূপ চিত্ত অন্যায় পথে আত্মপ্রকাশ করে। তখন পরীক্ষার্থীদিগের পক্ষে সহ-পরীক্ষার্থীগণের খাতা হইতে, পুস্তক হইতে বা অন্য কোন লিখিত কাগজপত্র (Manuscripts) হইতে নকল করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। এরূপ স্থলে, লেখা-পড়া করা অপেক্ষা পরীক্ষায় নকল করার কৌশলটি আয়ত্ত করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর হয়। এ বিষয়ে তাহাদের যে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অভিনব। যেখানে তাহারা যাহা পায় সেখানে পরীক্ষাকেন্দ্রের গার্ডকে হলবরতভাবে সারসিটের ভাঁজ দেখাইয়া নিরস্ত করে। কত পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থিগণ গার্ডের চক্ষের সম্মুখে বই খুলিয়া নকল করে—তাহার সন্ধান কয়জন রাখেন? পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে দু' চারজন একটু সাহসিকতা দেখাইতে পারিলেই অপরাপর পরীক্ষার্থী তখন নকল করাটাকে একটা অধিকার বলিয়া মনে করে। তখন আর চক্ষুলজ্জাও থাকে না!

শিক্ষা-সমস্যার কথা উল্লেখ করিলে সমাধানের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে; এ সম্বন্ধে দু' একটী প্রস্তাব উত্থাপন করাও স্বাভাবিক।

প্রথমতঃ, ইংরেজি ভাষাটা যখন একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই—তখন এই ভাষা শিক্ষাটা যাহাতে ভালভাবে হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে যদি ইংরেজি ভাষায় কাঠামোটা শিক্ষার্থীদিগের আয়ত্ত করিবার সুযোগ না ঘটে, তাহা হইলে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে এই ভাষার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া সুকঠিন। আমাদের মনে হয়,—ইংরেজি পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা আরো কমাইয়া দেওয়া সমীচীন। তৃতীয় প্রশ্নপত্রটির (Third paper) বিলোপ সাধন করাই যুক্তিসঙ্গত। রচনাধিক্য নম্বর বর্জ্জিত করা উচিত। মাতৃভাষা হইতে ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য যে প্রশ্ন থাকে, তাহার নম্বর ২০ হইতে বাড়াইয়া ৫০।৬০ পর্য্যন্ত করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ গণিত বিষয়টি যাহাতে শিক্ষার্থিগণ সহজভাবে আয়ত্ত করিতে পারে তাহার জন্য কয়েকটি বিষয়কে অবশ্য পাঠ্য করিয়া অবশিষ্ট বিষয়সমূহকে অতিরিক্ত পর্য্যায়ে ফেলিলেই ভাল হয়। যেমন ইংরেজি, বাংলা, গণিত ও সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করিয়া ভূগোল, ইতিহাস, অতিরিক্ত গণিত, মেকানিক্স, বিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটিকে ঐচ্ছিক বিষয় করাই যুক্তিযুক্ত। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইটি বিষয় প্রত্যেক ছাত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ সাধারণভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রশংসনীয়; তবে ইংরেজি শিক্ষার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু গণিত বিষয়টি ইংরেজিতে পেখানোই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যতদিন না গণিত বিষয়টি উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিখাইবার ব্যবস্থা হইতেছে অন্ততঃ ততদিন পর্য্যন্ত উহা ইংরেজিতে শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা থাকাই বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থতঃ, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদিগকে যাঁহারা শিক্ষাদান করেন—সেই শিক্ষকগণের উপরই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনার ও কাগজ-পরীক্ষার (Paper Examination) ভার অর্পিত হওয়া উচিত। অনেক সময় দেখা যায় যে, যাঁহারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তকের সংস্পর্শেই থাকেন না, এরূপ ব্যক্তিগণের উপর প্রশ্নপত্রাদি রচনার ভার অর্পণ করা হইয়া থাকে। ফলে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখিয়া পরীক্ষার্থীর চক্ষুস্থির হয়। তাহা ছাড়া, বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ যে আদর্শে (Standard) শিক্ষাদান করেন, তাহা শিক্ষকগণেরই সুপরিজ্ঞাত।

পঞ্চমতঃ, বিদ্যালয়ে শিক্ষার সমস্ত ভার—পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন হইতে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্য্যন্ত—শিক্ষকগণের উপরই ন্যস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একজন প্রধান শিক্ষক থাকা আবশ্যক সন্দেহ নাই—কিন্তু তিনি শিক্ষকগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হওয়াই ভাল। বিদ্যালয় যখন একটী পবিত্র প্রতিষ্ঠান; তখন এখানে প্রধান শিক্ষক ও সহযোগী শিক্ষকগণের সম্পর্কের মধ্যে প্রভু ভৃত্যের ভাব থাকা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সকলের মধ্যে যাহাতে তিক্ততার সৃষ্টি না হয়—সহযোগী শিক্ষকগণের মধ্যে ভ্রাতৃভাব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি, শিক্ষকশ্রেণীকে সমাজে তাঁহাদের যথাযোগ্য আসন দান করিতে হইবে। শিক্ষকগণ যাহাতে স্বাধীন আবেষ্টনীর মধ্যে পাকিতে বাস করিয়া শিক্ষাদান কার্য্য চালাইয়া যাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইবে। শিক্ষককে এমন বেতন দান করিতে হইবে, যাহাতে প্রাইভেট টিউশনী না করিয়াও তাঁহার চলিতে পারে।

অঘটন

শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী

অঘটন ঘটিয়া গেল!

কথাটা গোড়া হইতেই বলি—

আমার বাল্যজীবনের স্কুলের সহপাঠিনী শৈলার পত্র পাইলাম, এবার সে গরমের ছুটিতে চারদিন আমার পল্লী কুটীরে আসিয়া কাটাইয়া যাইবে।

উদ্বেগে, আশঙ্কায় আমরা গৃহের সব প্রাণী কয়টিই ঘামিয়া উঠিলাম। মুহুর্মুহুঃ গলা শুকাইয়া যাইতে লাগিল। স্বামীত স্পষ্টই বলিলেন "এ ভারি অন্যায় বাপু! তাঁরা বড়লোক, সহরে লোক, অনেক বদখেয়াল তাঁদের থাকতে পারে, কিন্তু এ কেমন বদ খেয়াল? আমরা পল্লীর চাষা-ভুষো মানুষ। দেশের এখন চরম দুঃখ দুর্দ্দিন, এখন তিনি আসছেন কবিকল্পিত পল্লীশ্রী দেখতে। ফিরে গিয়ে তাঁদের সোসাইটিতে, আমাদের মূর্খতা, অজ্ঞতা, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি নিয়ে মস্ত একটা লেকচার ঝাড়বেন, তাঁর ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। বেশ ত আছো বাপু সব শহরে—বায়স্কোপে পল্লীচিত্র দেখ, কেমন পরিচ্ছন্ন বেশে চাষারা ধান কাটতে কাটতে গান গায়। চাষাণীরা জল আনতে যায় কেমন শান্ত মধুর গতিভঙ্গে। পুকুরে শতদলের শোভা—ফুলে, ফলে সুশোভিত পল্লীগ্রাম। এখন আসুক এখানে, বায়স্কোপের ছবির সঙ্গে মিলবে না, কবিতার ছন্দেও মিলবে না। তখন ঘতঘোষ বেটা এই দেশের লোকদেরই হবে। এইসব শহরে বড়লোকদের এনে দেশের বদনাম করা। তোমার আর কি?"

অপরাধীর ন্যায় বলিলাম "তা আমি কি করব? আমি ত তাকে আসতে লিখিনি—কখনও পাড়াগাঁ দেখেনি, বড়লোকের মেয়ে! যা খেয়াল ধরেছে বাবা তাতেই সায় দিয়েছেন। ওর মা নেই কি না। তা তোমার চাইতে আমারই ত ভাবনা বেশী, গোছান গাছান কর্ত্তে হবে। তাকে ত আর খেজুরের খেটের খাটে নামতে দোব না। তার চানের জল তুলতে হবে! কপাল দেখ না—দেশে একটা লোকও কি এখন সুস্থ নেই, সব জ্বর! ঝিটার জ্বর না হলেও যা কিছু আমার সাহায্য হোত। যাকগে তুমি ভেব না, তুমি রোজ একটা করে মাছ শুধু ধরে দিও, ব্যাস্।" দুদিন আপ্রাণ খাটিয়া বাড়ী ঘরের একটু শ্রী ফিরাইলাম।

যথাসময়ে শৈলা আসিয়া পড়িল, আদর আপ্যায়ন যথারীতিই হইল। দেবর ডাক্তার, বাইরের ঘরেই তাহার দুটো আসবাবপত্র নিয়া তাহার ডাক্তারী, শৈলার সঙ্গে তাহারও আলাপ করাইয়া দিলাম, কিন্তু আমার স্বামী অপেক্ষাও দেবরটী বেশী বিরূপ শহরের লোকের উপর। কাজেই খুব ভয়ে ভয়ে সতর্ক হইয়াই রহিলাম। মা দুর্গা, মা কালী, শ্রীমধুসূদন—যে যেখানে আছেন ডাকিলাম "চারটে দিন মান রক্ষে কর ঠাকুর।" শৈলা কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে বলিল—"আমি গ্রাম দেখতেই এলাম ভাই! বাড়ী কেন বসে থাকব? একটু ঘুরে আসি।" ঠাকুরপোকে বলিলাম "যাওনা ভাই শৈলাকে নিয়ে একটু ঘুরে এসো। আমি যে রান্না করব। তোমার দাদাকেও মস্ত একটা কাজ দিয়েছি, জান?" বিস্মিত শৈলা বলিল "কি মস্ত কাজ আবার তাঁকে দিলে? কই সত্যি তাঁর সঙ্গে দেখা হোল না ত?"

হাসিয়া বলিলাম "দেখা পরে করিস। তাকে মস্ত একটা মাছ ধরতে বলেছি তোর জন্যে। সহরে মানুষ কি দেব তোর পাতে। অন্তত একটা মাছ যদি পাই ত বেশ হয়।" ঠাকুরপো কথা কহে নাই একটিও। শৈলা শুধু একটি নমস্কার করিয়াছিল। তাহার স্বভাব অত্যন্ত অস্থির, কিন্তু নীরব ভাব দেখিয়া আমার ভয় করিতেছিল। সে বলিল "চললাম বৌদি, আমার মোটা-কতক রোগী আছে, ওঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় হবেনা, রোগিগুলো হা পিত্যেস্ করে বসে আছে, যা হোক ব্যবস্থা ত' তাদের করতে হবে কিছু একটা।" শৈলা বলিল "কেন? যা হোক ব্যবস্থা কেন? ওষুধ দেবেন না?" ঠাকুরপো উত্তর দিল, "ওষুধ? ওষুধ কোথা পাব? তিনশো টাকা পাউণ্ড কুইনাইন কিনে ওরা খেতে পারবে না, আমিও তত বড়লোক নই যে অমনি দেব।

যা অমনি পারি—অর্থাৎ ছাতেম, কালমেঘ, ওলক এন্ট্রাক্ট, আর কাষ্টর অয়েল, এস্পিরেন এইসব দিই। কিন্তু তাতে ত ম্যালেরিয়া সারে না। তবু ছাড়ে না সবাই দেখুন না—ঐ সব হতভাগাগুলো আসছে, আচ্ছা চলি তাহলে।" ঠাকুরপোর বক্তৃতায় শৈলা স্তম্ভিতা! তাকে বলিলাম "ও অমনিই। আচ্ছা তুই খোকার সঙ্গে যা। খোকা মাসীমাকে নিয়ে বষ্ঠীতলা, মাঠের পুকুরের দিকটা, বড় রাস্তা হ'য়ে সব ঘুরে এসোগে—তাহলেই দূর থেকে নাপ্‌তে পাড়া বাগ্দি পাড়াটা দেখা হবে, যা শৈলা একটু ঘুরে সাধ মিটিয়ে আয় গে। জুতোটা খুলে যাস কিন্তু, ভারী কাদা পথে।" খোকার সহিত শৈলা গেল, দুর্গা দুর্গা বলিয়া আমি রন্ধনশালে প্রবেশ করিলাম।

২

রান্না প্রায় হইয়া গিয়াছে, বাহিরের ঘরে শৈলার প্রবেশের সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম। প্রবেশ করিয়াই শৈলা বলিল "আচ্ছা সুরধনীবু, আপনারা কি মানুষ?" ঠাকুরপো একমনে বৃদ্ধি রোগিণীকে দেখিতেছিল, চমকিয়া শৈলার প্রতি চাহিল; স্বামী বেশ ধীরে সুস্থে আপনার নাকে কানে চোখে হাত বুলাইয়া এবং হাত পা গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "হ্যাঁ মানুষ বলেই ত মনে হচ্ছে! কেন আপনার কিছু সন্দেহ আছে নাকি?" উপস্থিত সকলেই আমরা হাসিয়া ফেলিলাম। আরক্তমুখে শৈলা বলিল "সেকথা বলছি না, ঠাট্টা করবেন না। সত্যিই গ্রাম বেড়িয়ে এসে মনে জাগল সংশয়—আপনাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে। মনুষ্যত্ব আপনাদের নেই।" গম্ভীরভাবেই স্বামী বলিলেন "আপনার মত কথা প্রথম প্রথম এসে গাঁয়ের লোককে আমিও বলেছিলাম। কিছুদিন পরে কিন্তু সব ঠাণ্ডা, মানুষ কেই বা সংসারে আছে বলুন ত'? আপনার আমার কারোরই মনুষ্যত্ব নেই বুঝলেন?"

স্বামীকে ঠেলিয়া পাঠাইলাম স্নান করিতে। শৈলার প্রশ্নের ভঙ্গীতেই ভয়ে আমার রক্ত জল হইয়া গিয়াছিল। তিনি অল্পেতেই চলিয়া যাওয়ায় নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু সর্ব্বনাশ বাধাইল ঠাকুরপো!

রক্তচক্ষু শৈলার দিকে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ তখন রুগী দেখছিলাম, বলুন ত হঠাৎ আমাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আপনার এত সন্দেহ-জাগল কেন? কিসে—দেখলেন অমনুষ্যত্ব সেটা বলতে হবে।" সতেজে শৈলাও বলিল "বলব নিশ্চয়ই! আপনি ডাক্তার, আপনার দাদাও একজন পণ্ডিত লোক। গাঁয়ে যে এমন মহামারী হচ্ছে তার কোন উপায়, প্রতিকার করেন কি আপনারা? আপনারা শিক্ষিত! আপনারাই যদি প্রতিবেশী সম্বন্ধে অতটা 'কেয়ারলেস্' হ'ন, তবে মূর্খ যারা তারা ত হবেই, আপনাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে তাই এ সন্দেহ আমার।" বিদ্রূপের বাঁকা হাসি হাসিয়া ঠাকুরপো বলিল—"আপনার মনুষ্যত্ব নিশ্চয় আছে? কিন্তু আমার রোগিণী ওই বুড়ী মা আপনার পাশে যখন দাঁড়াল, তখন অমন চমকে সরে গেলেন কেন বলুন ত? বুড়ী ব'লে? রোগী ব'লে? নোংরা ব'লে? কি জন্যে সরলেন? মানুষকে যারা ঘৃণা করে, তারাই যাচাই করে অপরের মনুষ্যত্ব? লম্বা লম্বা বুলি আওড়ালেই মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া যায় না। মনুষ্যত্বের পরিচায়ক কি কাজ করেছেন আজ পর্য্যন্ত? অথচ আমার দাদা! তাঁর ছেলে আজ দু'মাস স্কুলের মাইনে পায় নি, তা সত্ত্বেও বুড়ী রাসুর মাকে—প্রত্যেক মাসে পাঁচটি ক'রে টাকা দিচ্ছেন। ওর মৃত্যু-মুখ একমাত্র ছেলের নাম করে, দাদা নিজেই মণিঅর্ডারে ওকে টাকা দেন—নিজেই চিঠি লিখে ওকে পড়ে শোনান—আর বলেন বুড়ীমা তোমার রাসু চিঠি দিয়েছে। কত বড় মহাপ্রাণতা থাকলে মানুষ একাজ পারে তার ধারণা আছে আপনার? বুড়ী বলে ওকে ঘৃণা করেন, মূর্খ বলে আর পাঁচ-জনকে ঘৃণা করবেন, অসভ্য নোংরা বলে আর বাকী কজনকে ঘৃণা করবেন, ঘৃণা করাই ত আপনাদের ব্যবসা। শিক্ষিত সহরবাসী যারা তাদের এটা গৌরব, 'ফ্যাশ্' বলে নাকে রুমাল দেওয়াটাও একটা ফ্যাসন্। নয়কি? কিন্তু এই মূর্খ চাষাদের রক্ত জল করা ফল, ফুল, অন্নে আপনাদের দেহ পরিপুষ্ট, বৃদ্ধ আপনিও হবেন, রোগ হওয়াও বিচিত্র নয়। এমনটি ঠিক চিরকাল আপনিও থাকবেন না, এত দম্ভও তখন থাকবে না।"

আমি ঠাকুরপোর বক্তৃতার বহর দেখিয়া 'থ' হইয়া গিয়াছিলাম। ঠাকুরপো একটু থামিতেই শৈলাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া গেলাম, কাতর মিনতি পূর্ণ স্বরে বলিলাম "কিছু মনে করিস না ভাই শৈলা! ঠাকুরপো অমনি, কিন্তু ওর

অন্তর বড় দরাজ, দেশের লোকের জন্ত ও সমস্ত সময় কাজ করে, দেশের দুঃখীদের ওপর বড় ওর টান, তোর কথা তাই ওর বড্ড বেজেছে। তুই রাগ করিসনি শৈলা ?"

ধীরে ধীরে শৈলা বলিল "সবিতা! আমি বড়লোকের মেয়ে, শহরেই আজন্ম মানুষ কখনও পল্লীগ্রাম দেখিনি, কিন্তু সনৎবাবুর কথা শুনে আমি সত্যই পল্লীর অবস্থা বুঝতে পাচ্ছি; শহরে যারা ঘর বেঁধেছে তাদের সকলেরই দেশ আছে, কিন্তু তাদের পদধূলি দেশে পড়ে না, সবিতা! আমি রাগ করিনি, সনৎবাবুর কথা শুনলে কেউ রাগ করতে পারে না। অন্তরের খাঁটি কথায় উনি তিরস্কার করেছেন, খাঁটি সত্য কথাগুলিই উনি বলেছেন, আমার মনে একটা কথা আসছে, বলতে দ্বিধা করছি, পরে জানাব, আমি আজই ফিরতে চাই তুমি ব্যবস্থা করে দাও ভাই।···না না, কোন অনুরোধ রোধ না—বিশ্বাস করো রাগ আমি করিনি। আমি আবার আসব। আজই যাচ্ছি কেন জান? আবার আসবার পাশের ব্যবস্থা করতে।" শৈলা যাইবার জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ঠাকুরপোর ওপর রাগ হোল, বলিলাম "তোমাদের কথার খোঁচায়—অতত্র ব্যবহারে চলে যাচ্ছে শৈলা, তোমাদের অন্তর জলে পুড়ে যাচ্ছে জানি, কিন্তু তাই বলে ভদ্রমহিলার সঙ্গেও অমনি ব্যবহার করবে ?"

নির্ব্বিকারচিত্তে স্বামী বসিয়া রহিলেন, ঠাকুরপো কেবল বিদ্রূপ করিয়াই বলিল—"ভারি দুঃখিত বৌদি—তোমার বান্ধবীটি ব্যথা পেয়ে চলে যাচ্ছেন বলে। কিন্তু কি করব? গেঁয়ো লোক আমরা বুঝে চেপে কথা বলতে জানি না। তা ভেবনা তুমি, ওঁর এ দুঃখবৃত্তি দু এক ঘণ্টার বেশী স্থায়ী হবে না। যেখানে অবাধ আনন্দের আবহাওয়া সেখানে একবার পৌঁছলেই হয়।" আর ঘাঁটাইতে সাহস হইল না, আবার কতকগুলা কঠোর সত্য বলিবে হয়ত, শৈলাকে চক্ষের জলে বিদায় দিলাম, চকিতে শৈলার শুষ্ক গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া এইটাই মনে হইতে লাগিল যে গভীর দুঃখ বা ক্রোধে শৈলা এত গম্ভীর হইয়াছে। মিষ্টি কথা অনেক বলিলাম, মৃদু হাসিয়া সে শুধু বলিল—"ভুল বুঝো না সবিতা, আমি আবার আসব বলেই আজ চলে যাচ্ছি।"

৩

শৈলা সত্যই আসিল, সুন্দর অনাড়ম্বর তাহার বেশ-ভূষা, মধুর হাসিমাখা মুখে সে আমাকে প্রণাম করিল, সবিস্ময়ে তাহার প্রতি চাহিলাম, মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল "আজ আর বন্ধু নই সবিতা, আজ ছোট বোনের মর্য্যাদা নেবার ভিক্ষা চাইতে এসেছি—তোমাদের কাছে থাকবার ভিক্ষা চাইতে এসেছি ভাই।"

বলিলাম "তোর কথা হেঁয়ালীর মত লাগছে ভাই বুঝতে পাচ্ছি না" শৈলা বলিল "বাবার মত করিয়ে আশীর্ব্বাদ নিয়ে এসেছি ভাই, আরও কি বলতে হবে দিদি? বেশ বলব তবে—চল একেবারে তোমার দেওরের কাছে, তবে সুরথ-বাবুকে আমি আর মুখ ফুটে বলতে পারব না। বাবা আসছেন সঙ্ঘের ট্রেণে, তিনিই সব বলবেন, তার আগে তোমার একগুঁয়ে দেশ-সেবক দেওরের মত করাইগে।"

প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলাম। শৈলাকে জড়াইয়া বলিলাম—"সত্যি, শৈলা সত্যি? ঠাকুরপোকে বিয়ে করবি? তুই সুখী হবি চাই! আমি আশীর্ব্বাদ করছি, আমি নিশ্চয় বলছি—তুই সুখী হবি, ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোর মাথায় ঝরে পড়বে।" আনন্দে আর কথা জোগাইল না, শুধু শৈলাকে জড়াইয়াই রহিলাম।

ঠাকুরপো আসিয়া বলিল "কি বৌদি! এত উচ্ছ্বাস কাকে নিয়ে! ব্যাপার কি বল ত?"

শৈলা ঠাকুরপোকে প্রণাম করিতেই আমি একটু অন্তরালে গিয়া কান পাতিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। শৈলার কণ্ঠ শুনিলাম, সে কহিল "আমি এসেছি, আপনার বকুনি সেদিন মিষ্টি লেগেছিল তাই আবার এসেছি, জানি আমার এ ইচ্ছাকেও আপনি বড়লোকের খেয়াল বলে বিদ্রূপ করবেন তা করুন, আমার তিরস্কারে তিরস্কারে খাঁটি করে নিন, আপনার সহকর্ম্মিণী করে নিন, শুধু ফিরিয়ে দেবেন না। টাকার লোভ দিয়ে আপনার আসন টলাতেও আসিনি, বিদ্যার জন্ত নিতেও আসিনি, এসেছি আমাকে নিবেদন করতে। আপনি গ্রহণ করুন না করুন, নিবেদিত আমি হয়েই গেছি।"

স্নেহমধুর স্বরে ঠাকুরপো উত্তর করিল "শৈলা, আমি দেবতা নই! সাধারণ মানুষ! তোমার এ আত্ম-নিবেদন, তোমার এই সত্যকার ভালবাসা, আমার পক্ষে ত্যাগ করা অসম্ভব। কিন্তু শৈলা, আমি গরীব গ্রামবাসী! আমার জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য—আমার গ্রামবাসীদের

জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনা। পারবে তুমি আমার সংযোগিতা করতে?'

শৈলা কহিল—'পারব।'

—'দুঃখে পেছিয়ে গেলে চলবে না। অবশ্য আমি তোমায় প্রথম দেখেই বুঝেছি, তুমি পারবে: সেদিন তোমায় অনেক কড়া কথা বলেছি সেজন্য আমায় ক্ষমা কোরো। কিন্তু তবুও আমার সন্দেহ হচ্ছে। বাপের অতবড় সম্পত্তির মায়া ছেড়ে এই গরীবের সংসারে বাসা বাঁধতে পারবে ত? আমার বৌদির পাশে থাকতে পারবে ত? আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যদিও এটা অনধিকার, তবুও জিজ্ঞাসা করছি—তোমার পিতার তুমি একমাত্র মেয়ে, সম্পত্তির কি ব্যবস্থা হবে?"

শৈলা বলিল "সম্পত্তি আমার যৌতুক বলে বাবা তোমাকেই লিখে দিয়েছেন, কিন্তু তুমি ভেবনা সেটা দিয়ে আমি তোমায় বন্দী করবার ফিকির করেছি। এই সর্তে লেখা পড়া হয়েছে যে, তার আয় দিয়ে স্কুল হবে, হাসপাতাল হবে, আরও-যা কর্ত্তে মন চায় তুমি করবে, আমি মেয়ে স্কুলে মাষ্টারী যদি করি, তবে কিছু পাব মাইনে বলে, নইলে তোমার ঘাড়েই থাকব। তোমার বৌদি যা খান, যেমন ভাবে চলেন, তেমনিই আমি খাব—তেমনি চলব। যদি তাও না জোটে, তবে আমি স্কুলের চাকরী নিয়ে তোমার গ্রামেই থাকব, আমি তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়ে কাজ করব। তুমি বিশ্বাস করো, আমার মোহ চলে গেছে, যদি আবার কখনও কোনও মোহ, দুর্ব্বলতা আসে—তুমি তা দূর করে দিও।"

আমি আস্তে আস্তে তাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার উপস্থিতিটা হয়ত ওরা লক্ষ্য করে নাই। ঠাকুরপো শৈলার হাত দুটি ধরিয়া বলিল—"শৈলা আমারও মোহ এলে তুমি তা দূর করে দিও। আজই মনে হচ্ছে শৈলা, তুমি আর আমি নিরালা নির্জ্জনে শুধু বসে থাকি, কিন্তু আমার কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই আমাকে আমার দুঃখী দেশভাইদের তুলতে দিও না শৈলা।"

তেজীয়সাং ন দোষায়

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

ঐশ্বিরবাবু পাড়ার বড়দা, দুটীর দিনে তাঁর ঘরে আড্ডাটা খুব জমজমাট হয়ে ওঠে। চা, সিগারেট, পান, খরচের দিকে ঘরচ যেওয়া দরকার এবং তারই আনুসঙ্গিক তাস ও খরচের কাগজ, এককথায় জমানি একটা ক্লাব, কেবল মাসিক চাঁদা নেই।

সেদিন ক্রিকেলের একটু আগে অর্থাৎ দুপুর শেষ হবার পূর্ব্বেই আড্ডা যেবার সম্ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম, 'বড়দা'—

'এসো', ভেতর থেকে সাড়া এল।

ভেতরে গিয়ে দেখি বাবা একা তাঁর তক্তাপোষে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন, পাখাটা ঘুরছে পুরো জোরে, আর তারই হাওয়ায় খবরের কাগজের পাতাগুলো এধার ওধার উড়ে বেড়াচ্ছে।

দোর করে ঢোকার জন্য বাবাকে বল্লুম, 'কি বাবা, একা একা শুয়ে কি ভাবছেন'? কারণ বাবা হচ্ছেন সৌখীন জিজ্ঞাসিলাপী, অবসর পেলেই অভিনব চিন্তায় মগ্নি থাকেন।

বাবা বলেন, 'ভাবছি এই যে, সেকালের পণ্ডিতরা কত বুদ্ধি করেই না শ্লোক-কথা বলে গেছেন। ওঁরা বলেছেন, তেজীয়সাং ন দোষায়, অর্থাৎ সমাজপরিচালকদের ও জীবনযাত্রার যাবতীয় বিধি-নিষেধ ওঁরা মেনে চলেন, এইগুলি সাধারণ লোকের পক্ষে দোষ, কিন্তু তেজী যা শক্তিশালীর পক্ষে কোনটাই দোষের নয়। অর্থাৎ, হাতে ক্ষমতা থাকলে তুমি যা করবে তাই মানিয়ে যাবে।

হাসতে হাসতে বল্লুম, 'বাবা, এই সব পুরাণো শাস্ত্রের কথা আজকেই বা হঠাৎ উঠছে কেন'?

"উঠবে না? সেকেলে যা পৃথিবীটুকে কি সব্ ছাপায় চল্লো। এতকাল ধরে আমরা সবাই জানতুম যে, দোষীর বিচারে বিচারক যা সাব্যস্ত করবেন, দোষীকে তাই মেনে নিতে হবে, কিন্তু U. N. O-র মাইনে যেখা সেল, দোষীর বিচার হবে পুরোদমে, কিন্তু শাস্তি দেওয়া না-দেওয়া দোষীর খুসি। সমস্ত বিচারটি ৮৫০ বা মাফক করার সেই ক্ষমতা অপরাধীর হাতেই থাকবে। এই অভূতপূর্ব্ব অধিকার দেওয়ার কারণ কি জান? কারণ, এক্ষেত্রে অপরাধী হচ্ছে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র, তার হাতে আছে ক্ষমতা, সে তেজী'।

U. N. O-র খিঁচুড়িটা ভাল পড়া ছিল না, কাজেই তার কি উত্তর দেব, এমন সময় বাবা বলেন, 'দেখ, হাতে ক্ষমতা থাকলে পরের

যেন প্যাসেঞ্জারদের যার টুকরো করে ভাগ করা চলে, তা ইংরেজরা করছে, ২৮ এ জুলাইয়ের মেসবাসী নাকগুলোকে 'কম্পিউট' করে গভীরভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়, তা কংগ্রেস করলে, ঘরের পাশের মাল দিয়ে মিহুদুবনের খাওয়াতে গেলে অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইনে হাজতবাস করতে হয়, যা বাংলাদেশে রোজ তাস্তিবেই হচ্ছে, কাজেই সবগুলো একসঙ্গে করে এককথায় জেন্টীলম্যান্ ব যোগার ঘাড়ে আর কি বলবো বল' ?

কিন্তু বলতে হবে, তাই বলুন, দাদা, জেন্টীলম্যান্ ব যোগার আইনটা। কিন্তু সেকালের আমোদে যত মাতা হচ্ছে একালের দিনে তত নয়, তখনকার দিনে রাজা যা-ইচ্ছে তাই করতেন, এখনকার দিনে তা নয়, আইন কানুন মেনে সকলকেই চলতে হয়, এমন কি Constitutional Law পর্যন্ত তৈরি হয়ে রয়েছে। রাজশক্তিও বে-আইনী কোন কাজ করতে পারে না।'

উত্তেজিত হয়ে দাদা বলেন, 'তার মানে লৌক ঠকানো। সেকালের রাজারা দরকার ও খুশি মত কাজ করতেন, একালের রাজারা সেই-গুলোই বন্ধ করে আইন তৈরী করে নিয়ে তার পরে করে থাকেন। অর্থাৎ কি না ঘুরিয়ে নাক দেখানো। Whereas it is expedient বলে আইনের প্রথম অংশে অনেক ভণিতা করে একালের রাজারা প্রথম দাদা এমন করে তৈরী করেন যার অর্থাৎ হয়, 'আমার যাদা ইচ্ছা তাহাই করিব', পরের দাদায় তিনিই বলেন, 'আমার এইরূপ ইচ্ছা হইতেছে', এবং তৃতীয় দাদায় তিনি তখন বলেন 'অতএব আইনসঙ্গত-ভাবে আমি ইহাই করিতেছি।' এই ত আইনের ব্যবস্থা, আর তার প্রয়োগ। ও কথা আর বলে দরকার নেই।'

তর্কটা যেন ক্রমেই ঘোরাল হয়ে ওঠবার মত হচ্ছে, অথচ আমি একে প্রাণপণে এড়িয়ে যেতেই চাই। অতএব চুপ করেই রইলুম।

দাদা একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে বলেন, 'দেখ, জেন্টীলম্যান্ ব যোগার' এই একটি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন আইন নেই। ধনী, মানী এবং সংঘবদ্ধরা যা করে, ধনী, মানী ও সংঘবদ্ধদের সমাজ তারই তাত্ত্বিক করে। আমার অনেকে যা করে, বাকীকে সেটাই ঘাড়ে পিঠে বা চাপে পড়ে গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। সাধারণের মনের খাবার চিন্তাধারা পর্যন্ত জনসাধারণের চাপে চাপা পড়ে গুঁড়িয়ে যায়। তবে দোষ একটা দেবার বটনা। এই হাওড়ার পুল যখন নতুন তৈরী হয় এবং তখনও ঠিক মত ব্যবহার হতে আরম্ভ হয় নি, সেই সময় একদিন একা একা বেড়াতে গেছি, দেখি সোনের জোয়ার-মোটাকচক হিন্দুস্থানী বাচ্চা, কেউ একেবারে উলঙ্গ, কারুর বা একটা ছেঁড়া ময়লা প্যাণ্ট পরা, সব একসঙ্গে ফুর্তি করে লাফাচ্ছে। দুটি বাঙালী ভদ্রলোক আমার সামনে দিয়ে হাঁটছিলেন। তাঁরা তীব্রভাবে ধমক দিয়ে ছেলেগুলোকে সব থেকে সরালেন, এবং ওদের জন্যে যিনি একটু আগেই তিনি তাঁর বন্ধুকে বললেন, কি অসভ্য বাঁদর ছেলে সব, পুলের পাশের রেলিং একসঙ্গে একবাড়ি ঝুঁকে এমন কাণ্ড করছে যে দেখলে ভয় হয়। কথাগুলো শুনলুম, কোন মন্তব্য না দিয়ে নীরবে তাদের পেছন পেছন খানিক গিয়ে দেখা গেল কতকগুলো দাদা চামড়ার বাচ্চা, সাহেব বা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের ছেলেমেয়ে হবে, তারা একসঙ্গে দল পাকিয়ে যত চেঁচাচ্ছে তত লাফাচ্ছে, লুফন্ত লাফাতে লাফাতে আমার সামনের সেই প্রবীণ লোকটির গায়ে এসে পড়লো। ভদ্রলোক খানিক চটিয়ে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন এবং তার পরেই বলেন, দেখেছ, ছেলেগুলি কি স্মার্ট, আর কত এদের unity, সব সময় একসঙ্গে হয়েই এরা খেলাধুলা করে। সত্যি, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সেদিন বুঝলুম Smartness আর অসভ্যতার পার্থক্য। ধনী ও ক্ষমতাশালীর ছেলেরা দল পাকালে হয় unity, গরীব ও অশিক্ষিতের ছেলেরা একত্র হলে হয় পুলের পাশ'।

কোন কিছু উত্তর দেবার পূর্বেই দাদা বলেন, 'এরকম অনেকগুলি কত বলবো। এরকম জিনিষের কি সংখ্যা করা যায়। আমাদের দেশিকে চালাকী বা গোঁজামিলকে আমরা কত দেয়া করি। বিবেকানন্দের কথার কোটেশান দিয়ে যদি, চালাকীর দ্বারা কোন মহৎকার্য হয় না, অথচ ইংরিজিতে tactful কথাটা আমরা কত তারিফ করে বলি ; অমুক মাজিষ্ট্রেট, অমুক গভর্ণর কত tactfully manage করেছে। অর্থাৎ দায়ন্তে লোক চালাকী করে তার হয় বাহাদুরি, বড় লোক চালাকী করে সেটা হয় tactfully manage করা।

একটা কথা মনে পড়ে গেল। অজয় দাদা, 'আমাদের পাশের ঐ পদ্মা বাড়ীর একতোলার এক ভাড়াটে বউ তার স্বামীর অনুপস্থিতির সময় স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছিল বলে বাড়ীওয়ালা গিন্নী তাকে অসভ্য বিশেষণ আরও কত কি দিয়ে অপমান করলে, আর সেই বাড়ী-ওয়ালাই ছেলে সন্ধ্যের পর তার পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরলে যায়, তাতে সবাই বলে ছেলেটি স্মার্ট, ফরোয়ার্ড'।

দাদা বললেন, 'তা ত বটই, ধনী বাড়ীওয়ালার মেয়ে হয়ে ঐ বউটি যদি একটু তাহলে সেও হোত forward, কারণ অক্ষয়ের ইংরেজীটা 'জেন্টীলম্যান' দাদার মধ্যে পড়ে না। আমে অত কথার দরকার কি, আমাদের প্রোফেসার সেন সর্বদা যে সমস্ত বিস্তি করেন, সেগুলো আমরা Humour বলে উপভোগ করি, আর বাড়ীর সামনের পানওয়ালা তার একাংশও উচ্চারণ করলে সেটা হয় অশ্লীল, কানে আঙুল দেওয়ার মত, ছেপে গিয়ে সবাই আমরা বলি বেটা ছোটলোক, পাড়া - ছেড়ে দেয়ে তাড়াও ইত্যাদি। একটু ভেবে দাদা বলেন, ইংরাজী ও বাঙ্গা ভাষাতেই এরকম উল্টোভাব যেন লেগে রয়েছে। জীবন উকীলের কথায় লোকে আড়ালে বলে ঘুঘু, ওর উকিলী বুদ্ধির পাল্লায় পড়লে আর কি রক্ষে আছে,—অথচ তার সামনে বলে আপনি shrewd man, আপনার legal brain, আপনার সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধ্য আছে কার।'

একটু ভেবে দাদা বলেন এরকম কত বলবো, বাংলায় যাকে বলছি বেটার চাল নেই চুলো নেই হতভাগা উড়নচণ্ডে লোক, আমার কমিউনিষ্ট, (আর বাংলায় কমুনিষ্ট) বন্ধুরা তাকেই বলছেন proletariat। কমিউনিষ্ট করিয়া আমার সেই সর্বহারাদের নিয়ে হাজার হাজার কেতাবও বানিয়ে

ফেলছেন। এমনি ভাবে বাংলা ভাষার যাদের ছোটলোক বলে ধরা হোত', তারাই ইংরাজী আওতায় হলেন scheduled caste। দলাদলির মধ্যে যারা দুইয়ের তারা চিরকালই কোণঠাসা হয়ে আছি, দলের ঠাকুরদারী করতো, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় দুইয়েরা হলেন minority। রাজশক্তির সাহায্যে সেই সব ভাগ্যবান minority-র দলই majority-র চুলে কেঁচো হয়ে যায়,—কায়স্থদের ঐ কটি ছেলে যেমন করে ওর বাড়ী গোঁফওয়ালা সাড়ে ছ'ফুট লম্বা বাঙ্গাল নাকানি চোবানি খাইয়ে ছেড়ে'। একটু থেমে দাদা বলেন, 'তত বলছো, বাংলায় যে কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা হয়, এমন দারুণ অশ্লীল শব্দের ইংরেজীগুলো কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বের সাক্ষেপও অবাধায়ে উচ্চারণ করে তারই সম্বন্ধে কত গবেষণা চলে।'

খুব খুব আলোচনাটা বেশ ঘোলাটে হয়ে এসেছে। কবে কবে ঠিক, ছেড়ে দাঁচলুম। খবরের কাগজটা নাড়াচাড়া করে দাদা বলেন, 'এই দেখ না কেন, আর একটা মজা। বাঙালী কেরানী বিলেতে গিয়ে দেশের জন্য আনচান করলে বড়সাহেব খবর দেন Homesick বলে, ঘড়ঘড়ুত সেই সুরে সুর মিলিয়ে যাদুখো, তুলো ইত্যাদি অনেক কথাই বলে থাকেন, কিন্তু প্রবাসী আমেরিকান দৈনিকরা দেশে ফেরবার জন্য ছটফট, করলে তারা হোম Homo Loving Americans। সেটা হোল তাদের গুণ, তাতে উপন্যাসের কিছুই নেই। কেন? কারণ ওরা হচ্ছে তারা, তাদের হাতে আছে ক্ষমতা'।

কলুম, 'দাদা বিলেতে শুনেছি হোটেলে ১৩ নম্বর ঘর না কি থাকে না, ঐ সংখ্যাটি দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলে ওরা নম্বর দেয় ১২, তারপর ১২এ, তার পর ১৪'।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দাদা বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ ও সব অনেক আছে, বাজারে টেঁকিলে বলে নুনদানী থেকে নুন চাইতে গিয়ে নুন যদি টেঁকিলে পড়ে যায় তাহলেই সর্বনাশ, ধোয়া কাচতে হবে। একটা রেজলাইনের কাটিতে তিনজনে কখনই সিগারেট ধরাবে না, ধরালে তৃতীয় ব্যক্তির আবুক হইবি। এ সমস্ত তাদের জন্যে নির্দোষ ব্যবস্থা social custom,—আর আমাদের যা কিছু সবই Prejudice, যার বাংলা পরিভাষা হচ্ছে কুসংস্কার, শুধু সংস্কার বলেই আমরা ক্ষান্ত হই নি, জোর গলায় তাকে আমরা কুসংস্কার বলি। যেমন লোক গলায় মাদুলী পরলে হয় উপন্যাসের বস্তু, অথচ সাহেবরা কখন Talisman ধারণ করেন তখন আমরাই তা কত তারিফ করি। সারা লড়াইটায় বাড়ী ঘর থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র কত যে ৮-এর মাদুলী লটকানো তা ত দেখেছ, কিন্তু এ-তে উপন্যাসের কিছুই নেই। এদের মূলে আছে ঐ এক বস্তু, ক্ষমতাশালী যা করে তাই ভালো। চলিত বাংলায় একটা কথা আছে জানো, 'রাজায় যি বলে প্যারী যা করে তাই শোভা পায়, তোমার আমার মেয়ের পক্ষে যেটা অমার্জনীয়, রাজকন্যার পক্ষে সেটাই নির্দোষ এবং অত্যন্ত লোভনীয়'।

মুখ, গুরু, আমার এই যে ক্ষমতাশালীর যেমন জোর, তেমনি অধিকারও জোরও কম নয়। এখন খবরের কাগজে দুটো কথা আমরা হরদম পাচ্ছি, Progressive ও Reactionary, বাংলায় প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল। এ দুটোর মানে আমি কিছুতেই খুঁজে পাই না। অভিধানে থেকেও এর অর্থ ঠিক মেলে না। কারণ একই কাজ, একদল করলে সেটা হয় প্রগতিশীল, অর্থাৎ কিনা progressive, for the advancement of the country ইত্যাদি। অথচ ঠিক সেই কাজ অন্য দল করলে এরাই তার বিরুদ্ধে বলে Reactionary,—প্রতিক্রিয়াশীল দলের জন্যে দেশ ডুবে গেল ইত্যাদি। এ থেকে আমি মানে করেছি এই যে, আমি বা আমরা যা করি তা progressive বা প্রগতিশীল এবং ও বা ওরা যা করে তা Reactionary বা প্রতিক্রিয়াশীল'।

দাদা বলেন, 'এখানে তুমি অধিকার বলতে ব্যক্তির দিক দিয়ে, দলের দিক দিয়ে নয়, এটাই গণশক্তি। এই যে জেলীলাং বা ক্ষমতাশালী যাকে বলা হচ্ছে এ ক্ষমতাশালী কে? যে নিজেকে ক্ষমতাশালী বলে জানতে শিখেছে এবং ক্ষমতাটাকে সকলের তোয়াক্কা করতে চেষ্টা করে সেই। এটা হোল কাল্পনিক অধিকার বাস্তব প্রকাশ। একটা মজা দেখ, পেঁয়াজকুচির তুচ্ছ ব্যাপারে করলে সেইটাই কালক্রমে ধলিষ্ঠ মন বলে পরিচিত হয়। বর্তমান যুগটা এমনই হয়েছে যে, বিলাতী লোককে সবাই আমরা মুখগোরা বলে ধরে নিয়েছি, আর মজা হচ্ছে কে, যে নিজের চাক নিজের পিঠে তুলে নিজেই খুব জোরে বাজাতে পারে। ক্রিয়াকর্ম উৎসব বাড়ীতে 'বাটিয়ে' বলে সেই নাম যেন, যে সব থেকে বেশী ছুটোছুটি করে, খুব চেঁচায়, অকারণ বহু জিনিষ নষ্ট করে, অন্যকে কড়া কড়া কথা বলে এবং দরকারের সময়ে পা আড়াল দিয়ে ঘরে পড়ে। Busy with no business যতক্ষণ না হতে পারবে ততক্ষণ খাটিয়ে, কেজো বা Indispensable বলে পরিচিত হবার কোন সম্ভাবনাই তোমার নেই।

দাদার এই উত্তেজিত বক্তৃতায় বাধা পড়লো, বাইরে থেকে ডাক এলো, 'দাদা আছেন নাকি'?

দাদা বলেন, 'এই যে প্রোফেসার, এসো'। বলতে বলতেই প্রোফেসার সেন এসে ঘরে ঢুকলো। চেয়ার টেনে বসবার আগেই বলেন, 'বড়দা, এই যে আমাদের স্মৃতি বা মেমি আইনে বলেছে নারী জাতিকে 'অষ্টা দ্বকতি যৌবনে', এটা কি এখনকার দিনের বলা উচিত'।

আমার দিকে চেয়ে দাদা বলেন, 'ওই শোনো, অষ্টা দ্বকতি যৌবনে ওটার চলিত বাংলায় অনুবাদ কর দেখি, কি হয়'।

কলুম, 'দাদা ওসব সাহিত্য বা ব্যাকরণের আলোচনা থাক। তাতটা মাথাই, আসুন ডিনজনে কাটি, খেটাই আসল কথা।

দাদা বলেন, 'তা করতে পারো, কিন্তু ইংরাজী কাটি, খেটটা বাংলা করে বোলো না যেন, কারণ রাস্তা থেকে সেটা কেউ শুনতে পেলে শেষকালে হয়ত বা সি-আই-ডি লাগতে পারে'।

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

দ্বিতীয় দৃশ্য

অমরেশের ঘরের বাহিরে প্রশস্ত বারান্দা। এক পাশে একটি রালিঙ টেব্‌ল্ ও পান দুই বেতের চেয়ার। একটি চেয়ারে অমর উপবিষ্ট, অপর চেয়ারের সম্মুখে তাহার মাসতুতো ভগ্নী কনক, এইমাত্র চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। বেলওয়ে হইতে তাহার গানের শব্দ আসিতেছে।

কনক। (বিরক্ত ভাবে) নাঃ, আমাদের নিজেদের দোষেই আমাদের জাতের কখনো মুক্তি হল না। বিটিশ এ যাবে বই দিনেমাতে যাচ্ছে না তো। তবু এই অনুরাধাটা কী বোকা কখনো দেখ বিবি কাপড় ছাড়তে।

অমর। তুমিই দেখ। তোমার বন্ধু।

কনক। আর বসে থাকতে পারছি না আমি। বোঙ্গা, ভাই, তুমি একটি কাজ করবে?

অমর। কী শুনি?

কনক। শুনছি রেখা মিত্তিরের বল ঘোঁট পাকাচ্ছে, মিটিঙ পণ্ড করবার চেষ্টা করতে পারে। আমি একবার রেখার বাড়ি হয়ে যাই। তুমি অনুকে নিয়ে এসে আমাকে তুলে নিও।

অমর। আমি কি লেডিস ন্যাস বাকি? আমার আর কাজ নেই বুঝি? আমার নিজের পায়ের জুতোটা ছেঁড়ে, তার ওপর তোমা। বন্ধুকে ঘুরে নিয়ে বেড়াতে হবে? বিপদ ভঞ্জন নয়।

কনক। কী করব? এই শর্তে যে ওর বিবি ওর বাবার অনুমতি দিয়েছে। আমাকে এসে নিয়ে যেতে হবে। তবে আমার প্রতিতে তুমি এলেও আপত্তি করবে না। কলের গাড়ী আর কোথাও একলা যাওয়া আমা ওর নেই জানো তো? আমি এলাই, তুমি ওকে নিয়ে এস, বাইরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে।

অমর। তা যাও। আলাতন আর কী!

কনক। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) হাঁ, আলাতন বই কি। জন্ম জন্ম এত পুণ্যি হবে যে তোমার আলাতন হওয়ার আবটা মোটেই ফুরিয়ে না।

অমর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিল। কনক হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে অনুরাধা প্রবেশ করিল। অমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

অমর। এত দেরী করলে?

অনুরাধা। আপনি একলা বসে আছেন অমরবাবু? কনি কোথায়?

অমর। তোমার দেরি হচ্ছে দেখে ও একটু এগিয়ে গেছে। চল।

অনুরাধা। কী করব। বাবার কাছে একটি ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁর সঙ্গে চা করে দিতে হল।

বলিতে বলিতে অমরের পশ্চাতে অনুরাধা অগ্রসর হইতেছিল, কয়েক পদ গিয়াই সে থামিয়া গেল।

অমর। আবার দাঁড়ালে কেন?

অনুরাধা। আবার মানে? কখন দাঁড়িয়েছি?

অমর। যখনই দাঁড়াও। কিন্তু এদিকে পাঁচটা বেজে গেছে, সেটা খেয়াল করেছ?

অনুরাধা। করেছি। কিন্তু এদিকে যিনি গান গাইছেন, সেই গানটা। সেটা খেয়াল করেছেন?

অমর। বেশ। তবে গানই শোনো। তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কষ্ট করে শোনবার দরকার কী? বেতের চেয়ারে বসে পরমানন্দে—

অনুরাধা। আঃ, অমরবাবু, আপনি এত বকতেও পারেন। বাপ, বাবাঃ! এত বকলে কি গান শোনা যায়?

অমর। আমি তো গান শুনছি না।

অনুরাধা। আমি শুনছি তো।

অমর। তাই তো বলছি। আমার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাওয়া কেন? তার চেয়ে আমি বিদায় হই, তুমি নিরাপদে, নিরুপদ্রবে—

অনুরাধা। আবার কথা! উঃ, কী বক্‌তা দিয়েই শিখেছেন। নাঃ, চলুন, গান আবার থাক, আপনার বক্তৃতাই শুনিয়ে চলুন।

অমর। থাক। অনিচ্ছায় তোমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ কী? মিথ্যে কষ্ট দেওয়া।

অনুরাধা। অমনি রাগ হয়ে গেল? আপনাদের রাগের কাছে পারবার জো নেই।

অমর। ঠিকই বলেছ। অনুরাগের কায়দা তার নেই।

অনুরাধা। ওটা আবার কী রকম কথা হল?

অমর। বলছি, সত্যি কথাই বলেছ অনু। রাগের কাছে তুমি পারবে না।

অনুরাধা। কখখনো তা বলেন নি আপনি।

অমর। তবে কী বলেছি?

অনুরাধা। আপনি অমর—অমরেন—যে আমার বরে কেউ বসতে।

অমর। বল না অনুরাধা?

অনুরাধা। আপনি তাহলে যাবেন না তো?

অমর। আর গিয়ে কী হবে? তার চেয়ে গান শোনা ভাল।

অনুরাধা। তা বেয়াদব বলে বলেন নি। আমার আমাইবাবু বলতেন

—ওড়ের গলা নিয়ে আস্ফালন করে যত রাক্ষসকে মারা যায় না। বাড়ীতে আগুন লাগলে দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলের জোরে আগুন নিবানো যায় না। তার কি? (হঠাৎ হাসিয়া) ঐ দেখুন, আপনার ছোঁয়াচ লেগে আমি নিজে বক্তা হয়ে উঠ্‌লুম। ঐ জন্যেই বলে-সহবাসে। চলুন। আর দেরি করলে আপনাকে 'ভোট অব থ্যাঙ্কস্'এর বক্তৃতা দিয়ে ফিরতে হবে।

জয়ন্ত। দাঁড়াও অনুরাধা।

অনুরাধা। এই দেখুন। আবার দোষ নেই, এবার আপনি দেরি করে দিচ্ছেন।

জয়ন্ত। হাঁ দিচ্ছি। তুমি বড় ভয়ানক কথা বলেন। তোমার কথার অর্থ কী তা জান?

অনুরাধা। (কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত) তা বোধ হয় জানি। এমন কিছু ল্যাটিন, সংস্কৃত বা গ্রীক কথা আমি বলিনি যে অর্থ খুঁজতে শব্দ-কল্পদ্রুম ওলটাতে হবে। কিন্তু আপনি আসবেন, না কী?

জয়ন্ত। না, কেন মিথ্যে যাওয়া। তোমার যখন আমাদের সভার ওপর শ্রদ্ধাই নেই, আমাদের আন্দোলনকে তুমি বিশ্বাসই কর না—

অনুরাধা। এই সভা, আন্দোলনের ওপর শ্রদ্ধা বিশ্বাস কি আপনারই আছে জয়ন্তবাবু? বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আপনি কি বিশ্বাস করেন আপনাদের বক্তৃতা শুনে ইংরেজরা অনুতপ্ত হয়ে দেশে যাবার টিকিট কাটবে কোনদিন? জামাইবাবু একটি কথা বলতেন—বাড়ীশুদ্ধ লোক প্রাণপণে চীৎকার করলেই গরুর গা থেকে ছোঁক ছেড়ে যাবে না। তাকে গলাটিপে টেনে ছাড়াতে হবে। তার মুখে এক খাবলা নুন ফেলে দিতে হবে। বলতেন, গরুর ছোঁক ভলু পেট ওয়লে একদম আপনি যাবে। কিন্তু দেশের ছোঁক, যার ভরবার পেট নয়, তাকে ঘাচাবেন কী করে? গালাগালি দিয়ে? না, রক্তপাতের আগে এই নীতিকথা শুনিয়ে?

জয়ন্ত। ছোঁকের উপমা, উপমা হিসেবে শুনতে মন্দ লাগল না। কিন্তু মানুষ ছোঁকই নয়, আর উপমাও যুক্তি নয়, যা তুমি জানো। সুতরাং এর উত্তর তোমার জামাইবাবু ফিরে এলেই দেব।

অনুরাধা। কবে যে জামাইবাবু ফিরে আসবেন! দিদির মুখের দিকে চাইলে আমার কান্না পায়। আচ্ছা জয়ন্তবাবু, আপনার সঙ্গে তো এত লোকের আলাপ, জামাইবাবুর খবর একটু যোগাড় করতে পারেন না?

জয়ন্ত। চেষ্টা করে দেখতে পারি। যদিও ওঁদের খবর বার করা সহজ নয়। একটা কথা আর জেনে রিপ্লিজ হলুম অনুরাধা। ভালোই হ'ল বৃথা দুরাশায় আর কষ্ট পেতে হবে না। যে জিনিসের দুরাশা আমি করেছিলুম, মূলে শ্রদ্ধা না থাকলে তা দাঁড়াতে পারে না। (অনুরাধা নম্র দৃষ্টিতে চাহিল) বান্ধারদলের সেনাপতি হলে যাকে জেনেরা, ফুলের গয়া দিয়ে যে আস্ফালন করে, তাকে কখনও শ্রদ্ধা করা যায় না।

অনুরাধা। কেন যে আপনি এমন ভুল বুঝলেন তা জানি না। আপনার যারা একজন দেশসেবক মেতা, আপনিও আমাদের ভাই-সমান প্রাণবন্ধন। আপনাকে বান্ধারদলের সেনাপতি মনে করে অশ্রদ্ধা করব, এমনই কি বোকা আমি?

অভিমানে তাহার চোখ জল জল করিয়া আসিল।

অনুরাধা। আপনাদের মতন বেশি-পড়াশোনাও করেনি, অত চিন্তাশক্তিও আমার নেই। কিন্তু জামাইবাবুর মুখে শুনতাম—

জয়ন্ত। আবার জামাইবাবু? দেখ অনুরাধা, হিরো ওয়ারশিপ ভালো, কিন্তু ঈর্ষাও দুষের ব্যাধি নয়।

অনুরাধা। কার ঈর্ষা?

জয়ন্ত। সে তুমি বুঝবে না। বল, কী তোমার জামাইবাবুর মুখে শুনেছ?

অনুরাধা। তিনি বলতেন—কোন পথে কেমন দেশ স্বাধীন হবে জানি না। কিন্তু হবে একদিন তাতে তো সন্দেহ নেই। সেই স্বাধীন দিনে কি কেবল তাঁদেরই স্মরণ করবে যাঁরা লতাপাতার লালাসো অক্ষর আর জাহাজির মধ্যে ফুলের মালা গলায় দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন? আর যাঁরা আর এক নিঃসঙ্গ সঙ্কে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দড়ির মালা গলায় দিলেন—

জয়ন্ত। দেশ তাঁদের কোনদিন ভোলেনি, স্বাধীন দেশও ভুলবে না। কিন্তু মত আর পথ তো সকলের এক নয় অনুরাধা।

অনুরাধা। তা জানি।

জয়ন্ত। যদি নিশ্চয় করে জানতুম যে তোমার জামাইবাবুদের পথটাই অব্যর্থ—(হঠাৎ আত্মসংবরণ করিয়া চুপ করিয়া গেল)। কে জানে। থাক্। অন্ততঃ তোমার জামাইবাবুর খবরটার জন্য ওপথের লোকের সঙ্গে এবার ভাব করবার চেষ্টা করব।

অনুরাধা জল-ভরা কৃতজ্ঞচোখে তাহার পানে চাহিল।

নেপথ্যে কয়েক জনের কণ্ঠ শোনা গেল। পরক্ষণে ব্যস্তভাবে ফকর প্রবেশ করিল।

সে একবার নিজের হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া ইহাদের দুইজনের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল। ইহারা অপ্রস্তুত হইয়া অবাক-দিঠির সুরে বলিল—

জয়ন্ত। এত দেরি করে এই বেরুলো—

অনুরাধা। কী করব, বাবার জন্যে চা করতে হল যে।

ফকর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উভয়ের ভাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং বিনাবাক্যে অনুরাধার কাঁধ ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। নীরবে জয়ন্ত অনুসরণ করিল।

তৃতীয় দৃশ্য

ছোট ঘর। ভিতরে আসবাবপত্রের অতিশয় অভাব। ঘরে এক খানি ছবি একটি দেয়ালে, ছবিতে একটি ফুলের মালা। এক কোনে ঘড়ির আকারের খান দুই তিন কাপড়। মেঝের একধারে একটি জলচৌকির উপর একটি পিতলের পিলসুজ ও তাহার উপর মাটির প্রদীপ। প্রায় সন্ধ্যাকাল। বিমল ও তাহার পিছনে রাধা প্রবেশ করিল।

বিক্রম। বাঃ, এ ঘরটিতো বড় চমৎকার। ছোট ঘরটি, যেন ঠাকুর ঘর। তাদের ওপর বিছানায়, এ ছবিটি কার?

রাধার জবাব না পাইয়া সে পিছনে ফিরিয়া রাধার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—

কী? মিসেস সেন, এমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যে হঠাৎ? কই, ঘরের দুইটনা কোন দিকে বলুন তো?

রাধা। এ ঘরে ইলেকট্রিক আলো নেই।

বিক্রম। কেন? ঘরের অপরাধ?

রাধা। এমনি, দরকার হয় না। তবে ইলেকট্রিক না থাকলেও আলো আছে। দাঁড়ান, জেলে দিচ্ছি।

সে আলাইয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিল।

বিক্রম। (বিস্মিত হইয়া) মাটির সিদ্ধীম? কলকাতার সহরে দোতলার ঘরে মাটির সিদ্ধীম! সত্যি সত্যিই ঠাকুরঘর বানিয়েছেন নাকি? আরে বাঃ, ঐ তো ফুলের মালা দেওয়া রাধাকৃষ্ণের ছবিও রয়েছে, কী আশ্চর্য্য! আপনাদের আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়েদের আমার এসব আছে দেখিনি।

হাসিতে হাসিতে বিক্রম গিয়া প্রদীপ তুলিয়া ছবিটি নিরীক্ষণ করিল। নিমেষে তাহার হাসি মিলিয়া গেল। প্রদীপ নামাইয়া রাখিয়া ফিরিয়া গ্রাবেভুষ কুণ্ঠার সহিত বলিল—

বিক্রম। আমি বুঝতে পারি নি, আমায় মাপ করবেন।

রাধা। মাপ করবার কিছুই তো নেই। ওটা আমাদের বিয়ের সময়ের তোলা ছবি, তাকে আপনি রাধাকৃষ্ণের ছবি মনে করেছিলেন, সে তো গৌরবেরই কথা, নয় কি?

রাধা মৃদু হাসিল। বিক্রম হাসিমুখ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি ফুটিল না, মুখখানা বিকৃত হইল মাত্র।

রাধা। সে যাক। এখন আসল কথাটা বলি, কেন আপনাকে বাড়ী দেখাবার নাম করে ডেকে এনেছি ওপরে। বাড়ী দেখাবার কিছু নেই, ওটা নিতান্ত বাজে কথা। (রাধা চুপ করিল, বিক্রম বিস্মিত প্রত্যাশা লইয়া চাহিয়া রহিল।) আসল কথা—(কী বলিতে গিয়া হঠাৎ কথা বদলাইয়া বলিল) আচ্ছা, আমার বাবাকে কী রকম দেখলেন বলতে পারেন?

বিক্রম। চমৎকার লোক। ওয়াণ্ডারফুল ম্যান। অমন লোক আমি জীবনে দেখিনি।

রাধা। না, আমি সেকথা বলছি না। আমি ওঁর শরীরের কথা, স্বাস্থ্যের কথা বলছি। আপনার ডাক্তারী চোখে বাবাকে দেখে কী মনে হল আপনার?

বিক্রম। শরীর ওঁর খুব ভাল বলে অবশ্য মনে হল না। তবে মনই বা কী?

রাধা। আপনি হাসছেন বীরবাবু। কিন্তু তার দরকার নেই। আমার মনে হয়, বাবা আর বেশিদিন পৃথিবীতে আমাদের কষ্ট পাবেন না।

বিক্রম। না, না, মিসেস সেন, আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। যদিও আপনার ভাবনার আমি আগে কখনও দেখিনি। তবু ওঁর শরীরের গঠন দেখলেই বোঝা যায় আগে ওঁর গায়ে কী রকম ছিল। আর এ শরীর যে ওঁর ভাল শরীর, তা একবার চোখ পড়লেই বলা যায়। কিন্তু তাই বলে ওঁর জন্যে এত বেশী চিন্তিত হবার কোন কারণই নেই।

রাধা। চিন্তিত ওঁর জন্যে হইনি, চিন্তিত হয়েছি নিজের জন্যে। কথাটা বড় স্বার্থপরের মত শোনাল, না? আমার আমি-অন্ত প্রাণ। স্বভাবতই বাবার স্নেহ আমি বেশি করে পেয়ে এসেছি। এখন আমার আমার এই অবস্থার জন্যে বাবার স্নেহ বলুন, আমার বলুন, বোল আমার ওপর যদি কিছু থাকে, তা আমি ভোগ করে আসছি। কিন্তু সেই আমার জন্যে বাবাকে যে কষ্ট পেতে হচ্ছে দিনের পর দিন, তা মুছে ফেলি আর কত দিন পারবেন। (তাহার কণ্ঠ আবার রুদ্ধ হইয়া আসিল।) জানি না, বাবা চলে গেলে আমার কী দশা হবে, কিন্তু তবু ওঁর জন্যে দুঃখের শান্তি হবে।

বিক্রম। কী সব পাগলের মত বকছেন মিসেস্ সেন। আমি বলছি আপনার বাবার এখন কিছুই হয়নি, যার জন্যে—আর তাছাড়া আপনার নিজের সম্বন্ধেই বা ভাববার কী আছে তা তো বেশি না। আপনার স্বামী, যাকে অভিলাষের জন্যে অবশ্য—কিন্তু তাই বা কতকাল! চিরদিন কিন্তু পালিয়ে বেড়াবে না। আমার বিশ্বাস ও ধরা একবার—তবে মুস্কিল হচ্ছে ওটা অত গোঁয়ার—

রাধা। তিনি আপনার বন্ধু ছিলেন।

বিক্রম। বন্ধু তা কী হয়েছে? তা বলে এই সব সমর্থন করা যায়—না, না, এ আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। এ রকম ইডিয়সি—

রাধা। আপনারা অত বড় বন্ধু ছিলেন, তা আমি জানি। মিছিমিছি আমার জন্যে ওঁকে গালাগাল দেবেন না বীরবাবু। (বিক্রম বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল) আমি জানি আপনি ইচ্ছে করে গাল দিচ্ছেন না, সত্যি করেও দিচ্ছেন না। কিন্তু এই বা কতদিন চালাবেন?

বিক্রম। (সবিস্ময়ে) কতদিন চালাব! কী কত দিন চালাব মিসেস সেন?

রাধা। আপনাদের দুজনের জন্যে কী সময় ছিল তা আমার জানতে বাকী নেই। আমাকে তিনি কতদিন বলেছেন, আপনাদের শুধু স্নেহটাই আলাদা ছিল। সেই জন্যেই বলছি বীরবাবু, বাবা যে কষ্ট পাচ্ছেন আপনি আমার সেই কষ্ট বাড়ে দেবেন কেন? বাবাকে খুলে বলতে পারি না, কিন্তু আপনাকে বলছি—আমি জানি।

বিক্রম। আ—আপনি জানেন? কী জানেন?

রাধা। (এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া) জানি,—আমি জানি—আমি বিধবা—(দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ক্রন্দনের আবেগ রোধ করিতে চেষ্টা করিল। বিক্রম নীরবে নতমুখে রহিল। কয়েক পরে—) আপনার চিঠি আমার কবিম পরেই সেটা আমার হাতে পড়ে। অবশ্য বাবা তা জানেন না। তখন তাঁর হার্ট নিয়ে ভয়ে মানুষে টানাটানি চলেছে, আশেপাশে উঁকিঝুঁকি কথা বলা বারণ।

বিক্রম। তাই আমার দুখানা চিঠির জবাব পাইনি।

রাধা। হাঁ, সে চিঠিও আমি দেখেছিলুম, কিন্তু বাবাকে দেখাই নি। কিন্তু সে থাক।···বাবাকে আপনি আমল দেবেন না। আমার বাবার মতো সরল লোক আমি দেখিনি, আমার বাবার মত দুর্বল লোকও পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে। ওঁর সরলতার একটা বড় পরিচয় ছিল ওঁর সত্য-নিষ্ঠায়। তিনি নিজে বলতেন ওটা ওঁর দুর্বলতা। কিছুতেই তিনি কথা বানিয়ে বলতে পারতেন না—কিন্তু আপনার বোধ হয় এসব শুনতে ভাল লাগছে না।

বিক্রম। আমার খুব ভাল লাগছে। আপনি বলুন।

রাধা। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

বিক্রম। দাঁড়ানো আমার অভ্যাস আছে রিলেস্ সেব।

রাধা। বাবা বলতেন, যেটা হয়নি সেটা হয়েছে বলতে পারা, যেটা 'হাঁ' সেটা 'না' বলতে পারা, এত তো একরকম কথাই; এ যে আমি পারি না সেটা অক্ষমতা ছাড়া আর কী? মিথ্যে কথা, অতি নিষ্ঠুর মিথ্যে কথাও তিনি যে মুখ দিয়ে বার করতে পারতেন না; তার জন্যে কী রকম লজ্জিত হতেন, তা আপনি দেখেন নি তাই বিশ্বাস করতে পারবেন না।

বিক্রম। খুব পারব রিলেস সেব, আপনার বাবার যে অসাধারণ মনের পরিচয় পেয়েছি তাতে ওঁর সম্বন্ধে কিছু বিশ্বাস করতে আমার অসুবিধে হবে না।

রাধা। কিন্তু সেই বাবা আমার এই বুড়ো বয়সে আমার জন্যে এই যে অবর্ণনীয় মিথ্যে কথা, এই যে অন্ধ হলবার জীবন যাপন করে চলেছেন,—এই কি চলবে ওঁর জীবন ভোর? এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না বীরুবাবু।

বিক্রম নিরুত্তর রহিল

আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাই বাবার বুকের ভেতর দুটো চিন্তা হু হু করে জ্বলছে। একটা আমার দুর্ভাগ্যের চিন্তা, আর একটা তার চেয়ে বড়—আমার এই মিথ্যার চিন্তা। এর ওপর ওঁর সবাই যদি—তবে বুঝি ওঁর এই মিথ্যার বেয়াল ভেঙে যায়। এ কী নিদারুণ অবস্থা বলুন তো। আমার মত হতভাগী মেয়ে সংসারে অনেক আছে, কিন্তু এই হতভাগী মেয়ের জন্যে বৃদ্ধ বয়সে এমন বেড়া-আগুনের জ্বালা আর কোন বাপকে সইতে হয়েছে শুনেছেন? শুনেছেন বীরুবাবু?

বিক্রম নীরবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে শুনে নাই

রাধা। (অতি ব্যাকুল কণ্ঠে) আপনি ওঁকে রক্ষা করুন বীরুবাবু, আপনি আমাকেও বাঁচান। এমন ভয়ে আমি আর পারি না যে—

উদ্গত ক্রন্দন রোধ করিতে রাধা মুখে অঞ্চল পুরিয়া দিল।

বিক্রম। আপনি স্থির হোন রিলেস সেব।

কণকাল কেবল রাধার আত্মসংবরণ করিতে।

রাধা। ঐ বাবা উঠেছেন, চলুন নিচে যাই।

বিক্রম। চলুন। কিন্তু উনি কি আপনাকে ডাকলেন? কই, আমি তো শুনতে পাইনি।

রাধা। না ডাকেন নি এখনও। কিন্তু ঘুম ভেঙে গেছে ওঁর। আমি বুঝতে পারি। খুব ডাকলেই আমাকে খুঁজবেন···ঐ ডাকছেন, শুনতে পেয়েছেন? (জানালার কাছে সরিয়া উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিল) যাই বাবা।

বিক্রম। হাঁ, চলে যান।

রাধা। যতক্ষণ জেগে থাকেন, আমাকে চোখে চোখে রাখবেন। কেমন জানেন?

বিক্রম। সে তো আপনি বলেন, আপনি-মরা প্রাণ, অত্যন্ত ভালবাসেন আপনাকে—

রাধা। না, শুধু সেই জন্যেই নয়। সে তো আগেও বাসতেন। এখন এ ওঁর আমাকে আগলে রাখা।

বিক্রম। হুঁ।

রাধা। আপনি বোঝেন নি। আমার ওপর বাবার বিশ্বাস অটল। সে আসলে রাধা নয়। এ আমাকে আগলে রাখেন সমস্ত বিশ্বসংসার থেকে। পাছে ওঁর চোখের আড়ালে কোনও ছিদ্র দিয়ে কোন রকমে এই পোড়া-কপালের খবর আমার কানে এসে পৌঁছয়, বুঝেছেন?

বিক্রম। (ঘাড় নাড়িয়া)। পায়ে ওঁর তালের ঘর ভেঙে যায়।

রাধা। তাই আমাকেই বিশ্বসংসারের বাইরে সবার চোখের আড়ালে এইটুকু আশ্রয় খুঁড়ে নিতে হয়েছে। যখন বড্ড অসহ্য হয়, এই সকল লাজ ছাড়তে এইখানে পালিয়ে আসি। এইখানেই আমার নিজের জীবন, আর তাই আমার প্রকৃত বেশ। (আঙুল দিয়া ঘড়ির উপরকার পাখা খাম দেখাইল।)

বিক্রম। ও কাপড় কার?

রাধা। বাবা খান পরেন। তারই দুখানা আমি এনে রেখেছি। বাবার ওপরে ওঠা বারণ। সবাই জানে এখানে আমি পুজো-আহ্নিক করি। কিন্তু পুজো আহ্নিক আমার কিছু নেই। খালি ঐটুকু, ঐটুকু মাত্র আমার সম্বল আছে। (ছবিখানি দেখাইল)

বিক্রম কথা কহিতে পারিল না। নিঃশব্দে ছবির পানে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখে জল আসিল।

রাধা। বীরুবাবু, আপনাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।

বিক্রম। কী বলুন?

রাধা। আমাকে কি খুব খুঁজেছিলেন? আমি যে ওঁর অজিজ্ঞা লঙ্ঘন করে চলে এসেছিলুম বীরুবাবু, আমাকে ডেকেছিলেন তিনি?

বিক্রম। (মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিয়া) অন্য কোন কথা ছিল না তার মুখে। দুটোদিন তো মোটে খুঁজেছিল—আচ্ছা আমি নিচে যাই। আপনি আসুন।

বিক্রম আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া যেন পলাইয়া গেল। রাধা ধীরে ধীরে প্রদীপটি ঘুরিয়া দিয়া রাখিয়া পরার অঞ্চল দিয়া জানু পাতিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। আর তাহার অঞ্চ বাধা মানিল না। অবরুদ্ধ ক্রন্দনের বেগে তাহার দুইখানি কাঁধ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল। কণপরে বেদনার্ত বিক্রমের কণ্ঠ শুনা গেল।

বিক্রম। আপনাকে একটিমাত্র কথা—

দুঃখিতে বলিতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া ক্রন্দনরতা রাধাকে দেখিয়া বিক্রম নিঃশব্দে পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

পূর্ব্বরাগ ও মিলন

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন "রতির্যা সাঙ্গমাৎ পূর্ব্বং"—প্রথম দর্শনে অথবা শ্রবণে যে রতি উৎপন্ন হইয়া নায়ক নায়িকাকে অনুরক্ত করিয়া তুলে, মিলনের পূর্ব্ববর্ত্তী সেই দশা বিশেষের নাম পূর্ব্বরাগ। আলঙ্কারিক শ্রীল কবিকর্ণপুর বলেন চিত্তরঞ্জনকারী ধর্ম্মের নাম রতি। এই রতি প্রীতি, মৈত্রী, সৌহার্দ্দ এবং ভাব নামেও অভিহিতা হয়। এই চিত্তাকর্ষিকাবৃত্তি সংপ্রয়োগ-বিরহ ও অসংপ্রয়োগ-বিরহ ভেদে দ্বিবিধা। সংপ্রয়োগ-বিরহই প্রধানতঃ রতি নামে পরিচিত। সংপ্রয়োগ অর্থে স্ত্রীপুরুষ ব্যবহার। সখার পত্নী ও পতির সখীতে যে চিত্তানুরঞ্জন তাহার নাম প্রীতি, সখীর সঙ্গে সখীগণের এবং সখার সঙ্গে সখাগণের স্বভাবসিদ্ধতাই মৈত্রী। এই মৈত্রী অন্তঃস্পর্শোচিত্ত ও প্রীতি মনোবৃত্তিময়ী। চিত্তরঞ্জকতা বিকারসহিত ও নিরপেক্ষ হইলে সৌহার্দ্দ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ এবং বেশাদিতে যে রতি তাহাই ভাব। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন —"সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। রতিগাঢ় হইলে তারে প্রেম-নাম কয়" এই প্রেম ক্রম পরিপাকে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ অনুরাগ ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। কবিকর্ণপুর সংপ্রয়োগ-বিরহা রতির পূর্ব্বরাগ, রাগ, অনুরাগ, প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও মহারাগ এইরূপ ক্রম নির্ণয় করিয়াছেন। নির্ব্বিকারচিত্তে প্রথম বিকারের নাম ভাব।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাশয়ও দর্শন এবং শ্রবণ পূর্ব্বরাগের এই বিবিধ হেতু নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রজালে, সাক্ষাতে, স্বপ্নে ও চিত্রপটে দর্শনের কথা বলিয়াছেন। শ্রবণের বিষয় বলিতেছেন বন্দী, সখী এবং দূতমুখে শ্রবণ। পদ্যাবলী গ্রন্থেকদেশের মধ্যে একস্থানে শ্রীল চণ্ডীদাসের পদেই ইন্দ্রজালের উল্লেখ পাওয়া যায়। পদকর্ত্তৃগণের রচনায় শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগে শ্রবণের মধ্যে "বংশীধ্বনি" একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। "বাঁশ" শ্রবণ এইরূপ আর একটী বৈশিষ্ট্য। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধমাধব নাটকে শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগে একটী শ্লোকেই শ্রবণ এবং দর্শনের বড় চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন। শ্লোকটী এই—

একস্তত্রভবেন পুলকতি যতিঃ কুকেতি মায়াক্ষরং
সাত্রোন্মাদ পরম্পরামুপনয়ত্যন্যঃ স্মরাবিষ্কলঃ।
এষ স্নিগ্ধ ঘন দ্রুমত্বিষি মে নয়ঃ সকৃদ্বিষ্কলাৎ
কষ্টং ধিক্ পুলকব্রজং রতিরসস্পর্শেন মূর্চ্ছিঃ শ্রেণী।

এই শ্লোকের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন কবিরাজ গোবিন্দ দাস। কবি লিখিয়াছেন—

সজনি মরম মাঝারে বহু জাগি।
কুলবতী চিত পুলকে ভেল আকুলি
জীবন ভিতে সুখ লাগি।
পাখিক শবদ্ধ রাব শ্রবণ হুই আধর
ইহধান মন চুরি কেল।
না জানিয়ে কো ঐ ছে মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি লেল।
না জানিয়ে কো ঐ ছে পাট পরপাতলি
মন ভেলমর তিমি তাঁতি।
চকিত হইয় হাম যাঁহা যাঁহা যাইয়ে
তাঁহা তাঁহা রোকিয়ে যাতি।
গোবিন্দ দাস কহয়ে শুন সুন্দরি
অতএ কাহ বিশোয়াস।
যাকর বাঁশ মুরলীরব তাকর
পটে ভেল সো পরকাশ।

বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে গতানুগতিক পথিকের সংখ্যা বড় কম নহে। একই বিষয় লইয়া—পূর্ব্বরাগ, মিলন, রূপোদ্গার, মান, আক্ষেপানুরাগ যাহা একজনের পর আর একজন কবি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বক্তব্যের এই আবর্ত্ত-বন্ধনে প্রবেশ করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কত নাম না জানা ফুল, কত নাম না জানা পাখী, কত নামহীন বন্যজন বাহিনী গিরি নির্ঝরিণী, কত সুন্দর শুক তৃণ লতাগুল্ম। গন্ধে গানে রূপে রসে উৎসবের এক বিচিত্র সমারোহ। আর তাহারই মাঝখানে প্রেম-উৎসব আনন্দ-চঞ্চল কিশোরী, গোলকের সম্পদ ভূলোকে আসিয়া লীলায় মাতিয়াছেন। বৈষ্ণব কবির রচিত পদে যেখানে সেখানে মহাকবির উপযুক্ত হুই একটী পংক্তি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, আপনি করিয়া কৃতার্থ হইবেন। একটী অতি সাধারণ পদ তুলিয়া দিলাম, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দেখিয়া বলিতেছেন—

সজনি অপরূপ পেখলু বালা।
দিঠকর নয়ন দিগন্তে ভেল ভোর
তা পর জলধর মালা।
চঞ্চল নয়নে হেরি মুখ সুন্দরী
মুচকায়ই ভিতি গেল।
চৌদিকে মুনিগণ মদনমন্ত্র উপজল
জিবইতে সংশয় ভেল।

অরবিন্দ নয়নে খঞ্জনে আবনা খেলিয়ে
অনুখণ সোই খেয়ান।
তা কর পিরিতিক চিতি লাখি লখু কিয়ে
আধুল অখির পয়ান।
মরমক বেদন তোহে পরকাশল
তুঁহু অতি চতুরি সুজান।
সো পুন মধুর মুরতি ধরণায়বি
রাধাবল্লভ গান।

এই পদের দ্বিতীয় পংক্তিতে একটু হিজালী আছে,—চাঁদ এবং মদন মিলিত মুখমণ্ডল। চাঁদের মত মুখ—তাহাতে অধর, গণ্ড, নেত্র, নাসিকা ও মদ-পংক্তি মদনের পঞ্চবাণ—বান্ধুলী, অম্বুজ, নীলপদ্ম, তিলফুল ও কুন্দ শ্রেণী। জলধরমালা কেশরাশি।

কবিগণ রাধার পূর্ব্বরাগেই সবিশেষ রস পরিবেশন করিয়াছেন। দেখিবার ও দেখা দিবার সে কত ভঙ্গিমা, রূপের এবং ভাবের সে কি বিচিত্র বর্ণন পারিপাট্য। নাম শুনিবার, বাঁশীর গান শুনিবার সে কি সুন্দর পরিবেশ। বৈষ্ণব কবির দেহ বিলাস,—সেও এক অপরূপ বৈভব। স্তনের সঙ্গে শম্বুর উপমা বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যত্রই দেখিয়াছি। "আধি ধরল জনু মদক ফটোরা" এবং একটী রুচিসম্মত পরিমার্জ্জিতা, একটী পরিচ্ছন্না আনিয়া দেয়। বৈষ্ণব কবিতায় সম্ভোগ বর্ণনেও বৈশিষ্ট্য আছে।

পূর্ব্বরাগের প্রথম দর্শনের সময়ে আবছায়া ভাব হইতেই আছে। বর্ত্তমানের পূর্ব্বরাগে তেমন বিভোর দেখা যায় না। কিন্তু কিশোরীর পূর্ব্বরাগ প্রায়ে কহিয়া ফিরায়ে। কি সাহিত্যে কি জীবনে সর্ব্বত্র যুবতীর ছড়াছড়ি। এই কারণেই নবোঢ়া মিলনের মাধুর্য্য উচ্ছ্বাসই প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। বৈষ্ণব কবির সযত্নশিক্ষা আজকাল বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। নবোঢ়ার প্রথম মিলনের সেই লজ্জা মিশ্রিত ভীতি, সেই সঙ্কোচ মিশ্রিত কৌতূহল, সেই অনভ্যস্তের মাধুর্য্যের আস্বাদন-লালসায় হৃদয় উদাসীন, আবশ্যিক চুম্বন আলিঙ্গনাবেগ···সাহিত্য হইতে—তথা জীবন হইতেও প্রায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদকর্ত্তা শ্রীমতীকে বলিতেছেন—

শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ।
আজু হাম যেব তোহে উপদেশ।
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
হেরইতে পিয়ামুখ মোড়বি গ্রীব।
পরশিতে দুহুঁ করে ঠেলবি পানি।
যৌন করবি কহঁ পুছইতে বাণী।
যব হাম সোপব করে কর আপি।
সাধসে করবি উলটি মোহে কাঁপি।
বিদ্যাপতি কহ ইহ রসঘাট।
কামকলা সোই শিখায়ব নাট।

কিন্তু সখী শিক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। অনঙ্গের প্রভাবেই তাহাকে ইতি বিষয়ক শিক্ষা দিয়াছে। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন—

যদি সখি আঁচরে ওই উপজল।
বৈঠে না বৈঠয়ে হরি পরিরভ।
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস অভিলাষে আধোরস নাহ।
নূতন মাধব নূতন নাগরী।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঁয়ারি।
পরশিতে তরসি করয়ি কর ঠেলই।
হেরইতে নয়ন নয়ন জল গলই।
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপ।
চুম্বনে নয়ন পটাঞ্চলে ঝাঁপ।
পুতলি ভীত পুতলি সম গোরি।
চিত্ত লিখিনী অলি রহই আগোরি।
গোবিন্দ দাস কহই পরিণাম।
রূপাক রূপে মদন ভেল কাম।

সখী রাধাকে কুঞ্জ মধ্যে লইয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণ করে সমর্পণ করিলেন। রাধা উল্লসিতা হইয়া সখীর আঁচল ধরিতেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের শয়ন পর্য্যন্তে বসিয়াও বসিতেছেন না। সখী কুঞ্জ মধ্য হইতে বাহিরে আসিলে রাধাও আসিতে চাহিতেছেন। রসাভিলাষী নায়ক পথরোধ করিলেন। মুগ্ধ মাধব, মুগ্ধা রমণী। নায়ক সুরসিক, নায়িকা গোঁয়ারি—গ্রাম্যবধূর্ব। নায়ক স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে তরাসে হাত ঠেলিয়া দেয়। যখন বেষ্টিতে ফেলে বাঁধিয়া ফেলে। জোর করিয়া আলিঙ্গন করিলে কাঁপিয়া উঠে। চুম্বন করিতে গেলে আঁচলে মুখ ঢাকে। গৌরী রাধা ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত পুতুলের মত শুইয়া রহিলেন। নয়ন চিত্রিত পুত্তলীকে আগলিয়া রহিল। গোবিন্দদাস পরিণাম বলিতেছেন। রূপের রূপে কাম ভুলিয়া গেল। সৌন্দর্য্য কামকে বিলুপ্ত করিল। পরিপূর্ণ বিদগ্ধতার শুদ্ধ সৌন্দর্য্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই কামগন্ধহীন, বৈষ্ণব কবিগণ এই সত্যেরই সাক্ষাৎ দ্রষ্টা।

অনঙ্গের হাত-কমল কেমন করিয়া রূপে রূপে পরিপূর্ণ পরশনে বিকশিত হইয়া উঠে, অঙ্গের পরতে পরতে কেমন করিয়া একটীর পর একটী কাঁজ খুলিয়া যায়—একটী উদ্ভট শ্লোকে তাহার মধুর আলেখ্য দেখিয়াছি।

কৃতাজ্ঞঃ কান্তো যা নমনমনি ন ভেদঃ প্রথয়তঃ
ক্রমাদ্ বিশ্লিষ্যন্তৌ নবরস ইতি প্রাপ্য বয়সঃ।
অতোঽন্যো যৎ ভোগান্ অনু পরিচয়ন্তৌ বিরতয়ো
ক্রমাদ্ যত্র যাতে বিরতমনসঃ স্তাবধিকম্।

যারা প্রথমে কান্ত ও কৃতাজ্ঞে কোন প্রভেদ দেখিতে পাইত না। দুই তিন মাস যাইতে ক্রমে তাহার কাজের প্রতি সে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল, বুঝিতে পারিল এক একজন মানুষ। ক্রমেই বুঝিল সে আমার প্রিয়, আমি তাহার প্রিয়তমা। বৎসরের মধ্যেই যারিকা অখিল সুখের প্রিয়তমত্ব দেখিতে পাইল।

কিন্তু প্রেম করিয়া বিপদ ঘটিল। চণ্ডীদাস নাম্নায়িত একটী পদে শ্রীরাধা বলিয়াছেন—

হইতে হইতে অধিক হইল সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে তনু জর জর পাগলী হইনু কেনু।

শ্রীকৃষ্ণকে পাইলাম, কিন্তু পাওয়ার মত পাইলাম কৈ? মিলন হইল, কিন্তু সে মিলন এত ক্ষণস্থায়ী কেন? যাহাকে চাই, তাহাকে সর্ব্বদা তো দেখিতে পাই না, সাধ মিটাইয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিবার সৌভাগ্য হয় না। মরমে লজ্জা আছে, বিরহ আছে, দৃষ্টিপাতে প্রতিবাদী আছে, পথে ভয়জন আছে, বহু ভবেরও বিমুখতা আছে। কেবা বাঁধি করে প্রেম তার এত আশা। একজন উদ্ভট কবি বলিতেছেন—

কা বা ন যাতি মধুরাং যদি বিপ্রলাপ,
কা বা ন যাতি হরণে যমুনাজলস্য।
কা বা ন পশ্যতি মুরারি মুখারবিন্দম্
হা বিদ্ধি বিধে মরিজনে কুলটাপবাদঃ।

যদি বিরহের জন্য কোন গোপী মথুরায় না যায়, যমুনার জল আনিতেই বা কে যায় না, তবুও মুরারির মুখপদ্ম তো সকলেই দেখে, হা বিধি বিধি, কেবল আমার কপালেই কুলটাপবাদ!

দেশে দেশে কালে কালে মানুষ এই কলঙ্কই অঙ্গভূষণ করিয়াছে। যুগে যুগে জাতি এই অপবাদ মাথা পাতিয়া লইয়াছে। চিহ্নিত অঙ্ক চিহ্নিতা বেষিকারূপে পরিচয়ে গর্ব্ববোধ করিয়াছে। মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছে—

কানুপরিবাদ মোর ভেল সার সফল করিল বিধি।

বলিয়াছে—

তবে ধরি কুলডালা বাহিরিব কুলবালা
তবে না পুরিবে মনো সাধ।
এমন হইবে যিবি সাধিব তবের সিদ্ধি
তবে হইবে কানুপরিবাদ।

এই সুখ এই দুঃখ, এই আনন্দ এই বেদনা লইয়াই রাই কানু সঙ্গে সঙ্গতা হইয়াছেন।

সৌরভে আসরি রাই সুবাগরি
কনকলতা সম সাজ।
হরি চলন ভলে ভোরে আওয়ালি
কুঞ্জে কুঞ্জরম রাজ।
অবকিয়ে করব উপায়।
কাল ভুজগ ভোরে ভোড়ি মুখবি সখী
গমন উচিৎ না যুয়ায়।
ঐছন চাক কপাবণ মণ্ডিত
কিয়ে বিবরাজল বিধি।
রাইক অধর পুরব অনুমানিয়ে
ঘনানক সংশয় বীথি।
এছু সন্দেহ দীঠ কিয়ে ভীতহি
পুলকিনী কাঁপয়ে রাই।
গোবিন্দদাস কহ যেলি সবহুঁ সখী
মুরুখ পরল অবধাই।

দুঃশাসন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শীতের শিশির ভেজা ধূসর আকাশে
নবারুণ রক্ত-রাগ সূর্য্যাচলে ভাসে,
নরীষের গাঢ় ডালে রক্ত যেন লাল,
বস্তঃ গাত্রে তাহাদের মুখস্রাবি ছুটেছে ভয়াল—
অদৃশ্য হস্তের কোন শিল্পীর ইঙ্গিতে
পুত্রহারা জননীর কান্নার দরদীতে,
যুদ্ধ নাকি হ'য়ে গেছে শেষ!
আজো কিন্তু ফিরে নাই শান্ত পরিবেশ।
আজো জাগে দুঃশাসন রক্ত পানে আশে,
ফিরাক বিশাল তার বাহুদেহে ত্রাসে;
অত্যাচারী আজো আছে বাকি—
অসহায় মানবের রক্ত পান বাকি।

* * *

মত্তশনী স্পর্দ্ধা ভরে অত্যাচারী আজ দুঃশাসন
সেও আসে, আসে ওই তোমারে যে করিবে শাসন,
বুকে ব'সে কণ্ঠ ভরি যত রক্ত করিয়াছ পান
আসে ভীম গদা হাতে উরু ভাঙি সেই রক্তে করিবারে স্নান,
তুমি যে বাঁচিয়া আছ এতকাল সে কেবল মোদের ক্ষমায়,
কিন্তু কিন্তু রক্ত কিরে হ'য়ে আছি মোরা ক্ষীণকায়।

যে পৃষ্ঠনে বাঁধি তুমি এতকাল করিয়াছ শত অত্যাচার
এইবার হবে কেবা তাহার বিচার।
ওর বক্ষ রক্ত মাখি ভীমসেন দেখে যেবে বেণী,
আকুলিত কেশে তাই অপেক্ষিছে আজ যাজ্ঞসেনী।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

ডাক্তার বিনোদ নানা কথা ভাবতে ভাবতে ফিরলেন। সাহেব ইঙ্গিত করেছেন—সব কথা তৃতীয় কাকেও বলবার নয়। দেরীও হয়েছে—মাণিক সব কথা শুনতে চাইবে। কিন্তু মাণিকের নিষেধ রক্ষা করাও আমার কর্ত্তব্য—আমি তো নিজের ইচ্ছায় কিছু করছি না—

মাণিক সেই পূর্ব্বপরিচিত দৌলতখানার সামনে, ডাক্তারের জন্য পথ চেয়ে হান্‌টান্ করছিল। তাঁকে দেখতে পেয়ে—আঃ বাচালেন মশাই! আপনার অসম্ভব বিলম্ব দেখে কি চিন্তাতেই পড়ে রয়েছি! নন্দবাবু না এলে—আমি আপনার খবর নিতে বেরিয়ে পড়তুম।

ডাঃ। এ আবার কোন নন্দ হে? 'ও'য়ের কোটায় যার ছন্দ-পতন হয়?

মাঃ। আজ্ঞে হ্যাঁ। খবরটা সুবিধের নয়। তাঁর সর্ব্বত্রই যাতায়াত আছে কি না। আমাদের দু'জনকে প্রসিদ্ধ দু'জায়গায় বদলির প্রস্তাব টাইপ্ হচ্ছে দেখে এসেছে। তাতে আবার আমাদের কাজের বিশেষ সুখ্যাত করে বলা হয়েছে—এসব কাজের লোককে এখানে ফেলে রেখে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা নষ্ট করা হচ্ছে। আমি যোগ্যতার অসম্মান করতে চাই না, তাদের Chance দিতে চাই। আশা করি O/C আমার প্রস্তাবে একমত হবেন, খুশীই হবেন—ইত্যাদি। আরো-আছে—ছ'মাস আমাদের কাজ দেখে আমাদের বেতন বৃদ্ধিও করে দিতে পারেন। সে কথাটা "Provided" বলেও আছে।

ডাক্তার সহাস্যে বললেন—বলো কি মাণিক? এত বড় খুশখবর শুনে তুমি অমন হয়ে রয়েছ কেনো?

মাণিক (সবিস্ময়ে)—আপনি কি বলছেন হুজুর? আপনার মন বোধহয় অন্যত্র ছিল, ভালো করে সব কথা শোনেন নি। দূরে যেতে রাজী আছি, কিন্তু আপনাকে ছেড়ে অন্য কোথাও নয়। ফলে—চাকরিই ছাড়তে হোল, একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস শেষ বিদায়ের ব্যথা জানিয়ে দিলে! ভগবান আছেন।

ডাঃ। তবে আর কি, তাঁর উপর সব ছেড়ে দাও।

মাঃ। আমি কি আমার জন্যে ভাবছি হুজুর।—বলে' মুখ নত করলে—

কথাটা ডাক্তার বুঝেছিলেন। সত্যটা তাঁর মনে জাগ্রতই ছিল। মাণিকের পিঠে স্নেহ-বিজড়িত হাতটা বুলিয়ে বললেন—ভেবনা মাণিক, আমাদের উভয়েরি এক পথ, তুমি যাবে কোথা?

মাণিক। আমার ভাও আর ঠিক নেই, বাড়ীঘরও বোধহয় যেতে বসেছে। নন্দর কাছে শুনলুম—খুড়োমশাই নাকি এসেছিলেন—প্রকাশ্যে নয়। কর্ত্তার ডাক পেয়ে কি স্বইচ্ছায়, তাও জানি না।

শুনে ডাক্তার চমকে গেলেন। "ব্যাপার কি?"

মাঃ। ব্যাপার—"মেয়ে ব্যাপার" ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আমরা তো কোন গর্হিত কাজ করিনি। সেই "হার"ই এর মূলে কাজ করছে। মেয়েরা কড়া কড়া দশকথা শুনিয়েছেন, তিনি বড় অপদস্ত হয়ে প্রতিকারের প্রতিজ্ঞা করেছেন। নিজের ক্ষমতাটা দেখিয়ে দিতে চান।

ডাঃ। তা তোমার উপর কেনো? সে তো আমার করা। তার তরে তো আমি দায়ী—

মাঃ। নন্দ সব কথা জানে না। তবে, ষড়যন্ত্র কোথা থেকে সুরু হলে সুফল দেয়, সেটা বড়রাই বোঝেন।

শুনে ডাক্তারের মুখের ভাব মুহূর্ত্তে বদলে গেল, সে রহস্যপ্রিয় জ্যোতি ও গৌরবর্ণ সহসা বিবর্ণ। মাণিককে থামিয়ে দিয়ে নিজে একেবারে নীরব। মাণিক ভীত। দশ মিনিট কারো মুখে কথা নেই।

হঠাৎ বলে উঠলেন—"বলে না—সে বড়রাই বোঝেন। ভুলে গেলে—বড়দের ওপরও একজন আছেন যিনি বড়দের চেয়েও বোঝেন। ভেব না, সত্য হলে—বিপদ সমূহ ঘনালেই বোধ হচ্ছে বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই তার মিথ্যার ওপর নির্ভর। মিথ্যা টঁ্যাকে না। চাকরি না হয় নাই রইল, না করাই ভালো—তিনি দয়া করে বদনাম থেকে বাঁচিয়ে দিলেই যথেষ্ট। তা তিনি দেবেন, সে বিশ্বাস আমার দৃঢ়। একটু থেমে বললেন—প্রদীপ নেভবার

আগে একবার হেসে নেয়—দেখে থাকবে। আমাদেরি বা সেটা বাদ যাবে কেনো? দেড় ঘণ্টা আগে তা স্বাদ মিটিয়ে সেরে ফেলেছি। তোমাকে এখনও বলা হয়নি—তুমি কেনো ঠকবে!—বলে ডাক্তার সহজ হাসি হাসলেন।

মাণিক কিছু বুঝতে পারছিল না, ডাক্তারের পরিবর্তন দেখে অবাক্! এ আবার কি?

ডাক্তার বললেন—"ভালো করে শোনো, রসময়ের লীলা বৈচিত্র্য লক্ষ্য কোরো।" এই বলে নূতন চাকরি নিয়ে মাস খানেক পরে আসাম অঞ্চলে যাবার কথা, খাওয়া পরা ও বেতনের কথা, ক্রমোন্নতির কথা, প্রবৃত্তি আশাতীত স্বপ্নসম কথা মেমসাহেবের অসুখের কথা, তাঁকে আনতে যাবার কথা, অর্থাৎ সাহেবের ইঙ্গিত বাঁচিয়ে যতটা বলা সম্ভব, একে একে সব বললেন। দেড় ঘণ্টা পূর্বে চাকরির এই ঐশ্বর্য্য উপভোগ চুটিয়ে করেছি মাণিক। এখন তুমি কি বলো শুনি।

—এ গরীবকে ও কথা আর কেনো শোনালেন হুজুর। বাড়ী যদি থাকে মনে মনে হাঁড়ির ব্যবসাই স্থির করলুম। এ অদৃষ্টে ও সব আমিরি সইবে কেনো! বহুভাগ্যে আপনাকে পেয়েছিলুম, আপনার বদলে আমি রাজঐশ্বর্য্যও চাই না। কিন্তু আজ যে আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। যাই করুন—আর যেখানেই যাকুন, আপনার চাকর তো দরকার হবে?

ডাক্তার অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, মাণিককে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—"দুঃখকষ্টই মানুষকে মানুষ করে মাণিক। একটা কথা বুঝতে পারছি না—সত্যই কি এই সামান্য কারণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পদস্থ লোকে, আপনাকে হারিয়ে হিংস্র পশুর অধম হয়ে যেতে পারে? আমার অনুমানে নিশ্চয়ই ভুল আছে। 'হার' একটা তুচ্ছ কারণ হতে পারে। সে নিয়ে চেয়ারম্যান Floormanকে Floored না করে ছাড়বেন না, স্বস্তি পাচ্ছেন না, সে কি একটা কথার মত কথা? নাঃ, আরো কিছু আছে।"

মাণিক আর চুপ করে শুনতে পারলে না, বললে—"আমার মনে হয়, সেটা জেলসি। সে জাগলে—মানুষ অন্ধ হয়। তখন সে সব কিছু করাতে পারে।"

ডাঃ। আমার মত নগণ্যের ওপর তাঁর জেলসি আসবে কিসে? ওটা আমারও একবার মনে হয়েছিল, পরে নিজেকে বড় বানাবার কারণ খুঁজে না পেয়ে হেসে তা ত্যাগ করেছি। এখন তুমি আবার কি বলতে চাও বলো—শুনি।

মাণিক। অত ভুলে যাচ্ছেন কেনো? O/C আমাদের (বিশেষ আপনার) সম্বন্ধে আপিসে কি লিখেছেন, তা আমরা কেউ জানি না, কিন্তু হাসপাতালের মজলিসে, সে কথার ইসারা ইঙ্গিত টিকাটিপ্পনিসহ করতে, ছোট বড় কেউই তো বাকি রাখেন নি—একবার নয়—পাঁচবার। সাহেবের সেটা Ordinary Certificateএর মত হলে তাঁরা তার উল্লেখও কেউ করতেন না—চেপে যেতেন। তাতে নিশ্চয়ই এমন কিছু থাকতে পারে, যা বড়দের বদহজমের জিনিস, প্রত্যেক উদ্গারে তাঁদের স্মরণ করায় ও ক্রমে অসহ্য হয়ে প্রতিকার খোঁজায়। জেলসি অতি ভয়ঙ্কর জিনিস, কাজও করে ভয়ঙ্কর। পরিণাম ভাবতে দেয় না। সেইরূপ কিছু থাকা অসম্ভব নয় বলে মনে হয়। পদস্থদের পদের অভিমান বড় বিপদের বস্তু Sir—

ডাক্তার—আচ্ছা থাক—সকালে আমাকে তুলে দিও। উঠেই আমি একবার সাহেবের কাছে যাবো। তাঁর ঠিক নেই, বেরিয়ে যেতে পারেন। তাঁকে আমি ভাল করেই চিনেছি, প্রখর বুদ্ধি ধরেন। এ বিষয়েরও কিছু না কিছু খবর তাঁর কাছে আছেই, নচেৎ ও ইঙ্গিতটা করতেন না—Boardএ তোমাদেরও চাকরি আর চলবে না—বলতেন না।

"চা খেয়ে যাবেন তো?"

"না—সেখানে গিয়েই খাব। তিনি না খাইয়ে ছাড়বেন না। এই বিশেষ অনুগ্রহটাই বুঝতে পারছি না। অবিশ্বাসীর প্রতি তা কি সম্ভব? যাক্—সব কথা শেষ করে' আসবো, আর কিছু করা নয় মাণিক। কিছু থাকে তো দাও, খেয়ে শুয়ে পড়ি।"

"কাপড়টা ছেড়ে মুখহাত ধুয়ে নিন, সব প্রস্তুত।"

"তুমিও খেয়ে নাও—এক সঙ্গেই বসবো।" মাণিকের মনের অবস্থা ডাক্তার বুঝতে পারছিলেন। এক সঙ্গেই বসালেন।

"একি? মাছ কোথায় পেলে?"

সঙ্কুচিত স্বরে মাণিক বললে—"কি করে খবর পেয়েছে জানি না—যুধিষ্ঠিরই পাঠিয়েছে।"

"ভালই করেছে, চলুক। সবই মায়ের ব্যবস্থা। যতক্ষণ তাঁর কৃপা আছে—সবই আছে।"

আহারাদির পর, সেই পরিচিত খাটিয়ায় শুয়ে হাসতে হাসতে—"আর কিছু দেবে নাকি ?"

"আজ্ঞে—এই নিন না" বলে 'গোল্ড-ফ্লেকের' কৌটো খুলে এগিয়ে দিলে।

"দাও—যতক্ষণ মেলে, সদ্ব্যবহার করাই উচিত, আজ দরকারও আছে। পরে ঘাসজলের সঙ্গে বিড়ি তো আছেই। তোমায় কাছে বাকাদত্ত আছি—বত্রিশ সিংহাসনে না বসলে—বাঁচবার কথা—I mean বাজে কথা আসবে না।

"আর থাক মশাই—আপনি শুয়ে পড়ুন।"

"সে কি কথা! আমার যে ঘুম হবে না। আমি ডাক্তার মানুষ তুমি অমন মুষড়ে গেলে—মকরধ্বজ চাই যে."

মাণিকের মুখে দুঃখের হাসি দেখা দিলে।

"ওসব কিছু নয় মাণিক, ভেব না। বলছিলে না—'মেয়ে ব্যাপার ?' ওঁদের শাস্ত্রীয় নাম 'শক্তি'—জানো তো ?—মনে আছে বোধহয়—অনেকদিন থেকে বলে আসছি—দেশের চিন্তা বড়কেউ করেনি, কখনো করিওনি। দেশ তো চিরদিনই আছে। দেশ যে কি ও কাদের, সে খোঁজে দরকারই ছিল না। লোক একটা দেশে জন্মাবে না তো কোথায় জন্মাবে—তাই জন্মেছি। চারটি খেতেও হয়, তাই খাওয়া। এর দোকানে ওর দোকানে গুল্তুক মেরে আর গল্প করে তাঁদের দিন কেটে যেতো, ঘুমুলেই রাত কাবার। মিছে দেশ দেশ করে' মরা কেনো ? দেশ তো পড়েই আছে! এই ছিল আমাদের পট্টনে শতবর্ষ পূর্ব্বের সাধারণ কথা।"

"গ্রামে তাঁকে সকলে "পিন্-গোবিন্দ" বলে ডাকতো, বোধ করি তাঁর pinএর মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল বলে—তাঁর প্রার্থনা ছিল বটে—'না, আমি কিছুই চাই না, আমার কিছুই কাজ নেই। সকালে ঘুম ভাঙলে বালিশের নীচে হাত দিলেই যেন একখানি করে দশটাকার নোট পাই—বেশী চাই না, তোমাকে বিরক্ত করতেও চাই না মা।' আকাঙ্ক্ষা তাঁর ওইটুকুই ছিল। তাই ছিল দেশের পুরুষদের পরিচয়। দেশ বলে ঝঞ্ঝাট জোটেনি।

"ছেলেরা ইংরিজি পড়ে এখন 'দেশ দেশ' করছে। সেটা—না টাকা, না পয়সা, কেবল দেশ আর দেশ। পুরুষদের রোজগার করতে হয়, তারা টাকা পয়সাই বোঝে ও চায়, দেশ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে ? এই ভাব অবলম্বনে তাঁরা গজিয়ে উঠেছিলেন। শিক্ষিতদের দেশটাই, আর পাঁচটা কাজের মধ্যে একটা হয়ে পড়ে, কিন্তু তাতে অন্তরের সাড়া ছিল না, ছিল ভদ্রতা বজায় রেখে, ভদ্রসেজে ভদ্র বুলিতে (ইংরিজিতে) বাচা বাচা স্টেজে বক্তৃতা করা—বাহবা পাওয়া। তাতে যে কিছু কাজ হয়নি তা বলছি না—দেশের মানেটা প্রাণে অনুভব পৌঁছুতে থাকে, যেমন জগন্নাথের রথ টানতে অনেকেই দড়িটা কেবল ছুঁয়ে থাকে, তাবে পুণ্যের share পাবে। ফাঁকিটা কিন্তু জগন্নাথের অগোচর থাকে না। তাতে অনেকে তাঁর চাকার মুখেও যায়। গেছেও।

"তাই আমরা so called (নামে) পুরুষেরা defeated, আমরা অনেক বড় বড় লম্বা লম্বা কথা করেছি, তার চেয়েও পেল্লায় পেল্লায় statement বার করেছি। পরে নানা পণ্ডিতের নানা মনোরথ একসঙ্গে চলবার পথ পায়নি, ওস্তাদের বৈঠকখানাতেই ঐ বৈঠকের পর তা মচকে গেছে। আমরা defeated রয়েই গেছি। তখন গাঙ্গুলী মশায়ের পুরাতন অমর বাণী নূতন করে দেখা দিয়েছে—'না জাগিলে আর ভারত ললনা', বুঝলে মাণিক ?"

মাণিক। একটু খুলে বলুন Sir—মেয়েরা রথ চালাবে নাকি ?

ডাক্তার। সুভদ্রার কাজটার কি অবস্থা পড়ে গেলো ? ঝাঁসীর লক্ষ্মী বাঈ যে এই সেদিনের কথা হে। শক্তির-জাত কি চিরদিন রান্না আর কান্না নিয়ে থাকতে পারেন নাকি ? পথে ঘাটে কি চোখ বুজে চলো মাণিক ? মায়েদের কপালের রক্ত টিপ্ গুলোর বাড়বৃদ্ধি লক্ষ্য করছো না ?—একেবারে যে কাপালিক মার্কা—অরুণোদয়। আর আমরা খোল ঘাড়ে করে হরিবোল ধরেছি। কিন্তু খস্তাল বিনা বেতালে কাজ হয় না, হয় কেবল দাসত্ব, O/C আজ তাই সেই পথ প্রশস্ত করবার প্রস্তাবও করেছেন। কছু পূর্ব্বে সে কথা তোমায় বলেছি। ভাবলেই শক্তির-লীলা বুঝতে পারবে। তাঁরা হাসতে হাসতে তাঁদের চিরপ্রথা মত কর্ত্তাকে কি দু-একটা কথা বলে থাকবেন, তার শক্তির প্রভাবটা তাঁকে স্পর্শ করে-ও তা কেউটের বিষের মত হাড়ে হাড়ে injected হয়ে তার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে, এখন গঙ্গামহরার কাছে ছুটতে হবে, বাঁচবার উপায় দেখতে হবে। ঘুম ধরেছে শুয়ে পড়। ভেব না—মা আছেন। বলে ডাক্তার পাশ্ ফিরলেন। (ক্রমশঃ)

আজাদ হিন্দ সরকার

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

৫

আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠাতা সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির অথবা 'ঈশ্বরের পুত্র' ছিলেন (!) না। ছিলেন, রক্তে মাংসে, মেদে ও মজ্জায় গঠিত নশ্বর জগৎ ও মর্ত্যের মানুষ। বিংশ শতাব্দীতে, এই পৃথিবীতে যে-পঞ্চ কোটী মানুষ বসতি করে, তাহাদেরই একজন। দেহের রক্তমাংস যেমন উপকরণ, দোষ গুণও তেমনই দেহের অঙ্গ বা অংশ অথবা উপকরণ। কোন মানুষের দেহে মাংসের আধিক্য,কেহ অতি ক্ষীণকায়; কাহারও রক্তের চাপে শরীর অসুস্থ, কেহ বা রক্তাল্পতায় কাতর। গুণ কাহারও অধিক, কেহ বা বহুদোষের আকর; নির্গুণ কিম্বা নির্দোষ মানুষ সুদুর্লভ। আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারেন নাই। আর দশজনের মত, তাঁহার শরীরও দোষ এবং গুণের আগার হইতে বাধ্য। আমি তাঁহার গুণের অথবা দোষের তালিকা সঙ্কলন করিতে বসি নাই; তালিকা প্রণয়নের প্রয়োজনআছে বলিয়াও আমি মনে করি না। সমস্ত পরিহার করিয়া,তাঁহার একটি মহৎ দোষের কথাই আমিবলিব।

সুভাষবাবুর বৃটিশ-বিদ্বেষ ছিল, ওজনাতিরিক্ত। এত অধিকমাত্রাতেই এই 'বস্তুটি' ছিল যে মাপিয়া পাওয়া যাইত না এবং আমার বিশ্বাস তিনি স্বয়ং সাধ্যমত চেষ্টা করিলেও ইহা গোপন করিতে পারিতেন না। পারার ঘা যেমন গোপন করা যায় না, সুভাষের বৃটিশ-বিদ্বেষও তেমনই চাপা থাকিত না। ঐ দোষ হয়ত আরও অনেকের আছে; হয়ত তিন শত নিরানব্বই কোটী নরনারীরই আছে, আশ্চর্য্য নহে। যে কয়জন লোক এখনও সংক্রমণমুক্ত আছে, ১৯৪৬ সালের বাকী কয় মাস গত হইলে দেখা যাইবে তাহাদের ব্যাপ্টিজম্ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গান্ধীজী পৃথিবীতে একজনই আছেন, দুইজন গান্ধীর সংবাদ ত শুনি নাই। তবে সুভাষচন্দ্রের মত অসঙ্কোচে অকুণ্ঠকণ্ঠে বৃটিশ-বিদ্বেষ ব্যক্ত করিতে আর কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া আমি অন্ততঃ মনে করিতে পারিতেছি না। অনেকে বলেন, তাঁহারা বৃটিশের নীতির বিদ্বেষী, কিন্তু বৃটিশকে বিদ্বেষ করেন না। অনেকে ভদ্রতার আভরণ ফেলিতে ইচ্ছা করেন না, অন্তরে, অথবা ভিতরে যাহাই কেন থাক্ না। বৃটিশ ছিল সুভাষের জাত শত্রু।

বৃটিশ বিনাশ বা বৃটিশের বিলোপ সাধন জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম পবিত্র ব্রত হিসাবে সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শত্রু বিনাশে বল, ছল, কল ও কৌশল সমস্তই প্রযোজ্য, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বসমাজে বিধান আছে। সুভাষ সেই বিধানানুযায়ী কাজ করিয়াছেন। যে অস্ত্র অহিংসাময় বরণ করিয়াছিল, শত্রু নাশ জন্য সেই অস্ত্রই জিঘাংসার রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়াছিলেন; যে মণিবন্ধে শান্তিকামী গান্ধীজীর শান্তিমন্ত্রপূত পবিত্র রাখী বাঁধিয়াছিলেন, সেই করে বৃটিশশোণিতলিপ্সু ক্ষুরধার খড়্গ ধারণেও দ্বিধা করেন নাই। দ্রুপদ রাজার সভায় কৃত্রিম মীনাক্ষী বিদ্ধ করাই ভিক্ষুকবেশী ফাল্গুনীর লক্ষ্য ছিল, বৃটিশের দিল্লীর লাল কেল্লাও তেমনই ছিল, সুভাষের লক্ষ্য। বনবাসী, ফলমূলাহারী চীরধারী ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনের দুরন্ত ক্ষাত্র-তেজও ক্ষত্রিয় গর্ব্ব যেমন অজ্ঞাতবাসের গোপনীয়তা উপেক্ষা করিয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় পৃথিবীর রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যুক্ত করিয়াছিল, গান্ধীজীর অহিংসাময়ের মহোচ্চ-শিক্ষা সত্বেও তেমনই সুভাষের বৃটিশ-বিদ্বেষ প্রসূমিত হইয়া হিংস্রকরে কৃপাণ ধারণ করিয়া হিংসাবৃত্ত চরণে দিল্লী অভিযানে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল।

আমার উক্তির কদর্থ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াই আমাকে সতর্ক হইতে হইতেছে। ব্যক্তিগতভাবে কোন বৃটিশ বা ইংরাজকে সুভাষচন্দ্র বসু বিদ্বেষের চোখে দেখিতেন, আশা করি একথা কেহ মনে করিবেন না। যে বৃটিশের শোষণে ভারত শোণিতশূন্য পাংশুবর্ণ, অন্তঃসারশূন্য অসার; অস্ত্রবলে, শস্ত্র তেজে যে বৃটিশ ভারতকে নৈঃস্ব্য দান করিয়াছে; যে বৃটিশ বিজিত ভারতবর্ষকে আপন স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে বলে নিরস্ত্র, কৌশলে অসহায় ও অনাহারে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে; ভারতের সহিত যে

বৃটিশের শাসন ও শোষণের সম্পর্ক, খাদ্য ও খাদকের সম্প্রীতি, সেই বৃটিশ তাঁহার বিদ্বেষের বিষয়বস্তু। এই বৃটিশ কোনও মানুষ নহে; এই বৃটিশ আদৌ হয়ত বৃটিশ জাতির কেহ নহে, এই বৃটিশ সেই বৃটিশ, যাহার শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় ভারত কঙ্কালসার, নির্জীব, মুমূর্ষু ও মৃতকল্প। এই বৃটিশ বুর্জ্জ আইনে, অর্ডিন্যান্সে, টেরিফে, এক্সপোর্টে, ডিফেন্স রুলসে। এ বৃটিশ একটা প্রক্রিয়া মাত্র। এ বৃটিশের দেহ বাস্তব না হইতে পারে, বরং ইহার বায়বীয় দেহ হওয়াই সম্ভব। নারীর পতিত্ব যেমন, পুত্রের অন্তরে পিতৃত্ব যেমন, সন্তানের হৃদয়ে মাতৃত্বের আসন যেমন, ইহাও তেমন। পতিত্ব যদি কল্পনাতীত ভাবের স্বর্গরাজ্য না হইত, তাহা হইলে মদ্যপ, দুশ্চরিত্র ভণ্ড ও লম্পট পতিকেও সাধ্বী স্ত্রী কখনও পূজা করিত না, পদাঘাতে বিদূরিত করিত। কিন্তু ভাবরাজ্যের চিন্তাধারায় পতিত্ব এমনই এক পূজ্য আসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে যে ব্যক্তিবিশেষ যেমনই কেন হোক না, পতিত্ব পূজ্যই। পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, পুত্রত্ব, প্রভুত্ব সব ঐ এক কথা। পুত্র, দুই অক্ষরের ঐ শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মধুচক্রবিনির্গত মধুর মত অপত্যস্নেহ ঝরিয়া পড়িতে থাকে; স্নেহে উদ্বেলিত মাতার হৃদয় সাগরের উচ্ছ্বসিত বারি বালু-বেলার আছাড় বিছাড় করিতে থাকে। এখানে সুপুত্র কুপুত্র, সুমাতা কুমাতা ভেদ নাই। মা ও সন্তান! সুভাষের বৃটিশও সেই বৃটিশত্ব, যাহা নিঃশেষে শোষণ করে; শোষণ করিবার জন্য শাসন করে; শাসন অবাধ ও অব্যাহত এবং অপ্রতিহত রাখিবার জন্য গোটা জাতিটাকে নিঃসহায়, নিঃস্ব, নিরস্ত্র, ক্লীব ও পঙ্গু করিয়া রাখে; নিরস্ত্র জনতার উপর কামান চালাইয়া শান্তিরক্ষা করে; নির্ব্বিচারে নরহত্যা করিয়া বলে, বিদ্রোহ দমন করিতেছে! সুভাষের বৃটিশ সেই বৃটিশত্ব, যাহাতে ভারতবাসী তাহার স্বদেশ, তাহার মাতৃভূমি, তাহার জন্মভূমি ভারতবর্ষকে মা বলিয়া ডাকিলে, রক্তনেত্রে ভ্রূকুটি করে; মাতৃপূজার মন্দিরকে রাজদ্রোহের আগার বোধে ধ্বংসের আদেশ দেয়; দেশসেবককে, মাতৃপূজারীকে আমরণ কারাবাস করিতে হয়। সুভাষের বৃটিশ সেই বৃটিশত্ব, যাহা পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া মিথ্যার বেসাতি করে; মিথ্যার বেসাতিতে অতীতের গৌরব বিকৃত করে; ক্রীতদাসের কণ্ঠে স্বর্ণপদক ঝুলাইয়া দিয়া ক্রীতদাসের মহত্ত্ব প্রচার করে। সুভাষের বৃটিশ সেই বৃটিশত্ব—যাহা ভারত-বাসীকে ভারতবাসী নামে পরিচিত করিতে শিক্ষা না দিয়া ভারতবাসীকে শত ভাগে, শত স্তরে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করিতে উৎসাহিত করে। ধর্ম্মের বিভাগ, সম্প্রদায়ের বিভাগ, জাতির বিভাগ, জাতির ভিতরে খণ্ড জাতির বিভাগ, বেড়ার গায়ে বেড়া, পাচীনের পরে পাচীন তুলিয়া দিয়া বৃটিশত্ব সাধুতার ভাণ করিয়া বলে, হায় হায়, ইহারা মিলিতে পারে না কেন! মেয়েলি কথায় বলা যায়, 'চোরকে বলে চুরী করিতে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকিতে।' ভারতবাসীরা ঝগড়া করিয়া, মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরে, বৃটিশ পরমানন্দে পুডিং ভক্ষণ করে।

প্রশ্ন হইতে পারে বোধ হয় যে, এই বৃটিশত্ব (মূর্ত্তিহীন বিগ্রহখানি) কোথায় বসতি করে? উত্তরে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বৃটিশের সওদাগরী আফিসে তাহার বাস, গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে তাহার নিবাস, থানায় তাহার বসতি, আদালতে তাহার আবাস! রেলে যাও, কলে যাও, কারখানায় যাও, ব্যাঙ্কে যাও, জাহাজে উঠ, হোটেলে খানা খাইতে যাও, দেখিবে, জগদীশ্বর যেমন সর্ব্বত্রবিরাজমান, বৃটিশত্বও তেমনই সর্ব্বত্র-পরিদৃশ্যমান। হিমগিরি হিমালয় যেমন ত্রিপথগা ভাগীরথীর উৎস, রাজধানী দিল্লীর লালকেল্লা তেমনই বৃটিশত্বের উৎস। সুভাষ সেই লালকেল্লার ধ্বংস কামনা করিয়াছিলেন। লালকেল্লার গোরা সৈন্য বা প্রাসাদাভ্যন্তরস্থ বড়লাট তাঁহার লক্ষ্য নহে; লক্ষ্য সেই বৃটিশত্ব।

বৃটিশ-বিদ্বেষ-বিষের সূচনা কবে ও কোথায় এবং কেমন করিয়া হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। বাল্যে ও কৈশোরে ইংরাজী ভাষা, ইংরাজের পোষাক-আষাক, ইংরাজের আচার ব্যবহারের উপর প্রীতির অভাব যে ছিল না, তাহা ত আমরা ভালই জানি। আমার স্নেহশালিনী পাঠিকা ও ধৈর্য্যশীল পাঠক, সাবধান! একটি ছোটখাট ডিম্বাকৃতি এ্যাটম্ বম্ব নিক্ষেপ না করিলেই যে নয়!—ত্রুটী মার্জ্জনীয়। প্রেমময় যীশুর বংশধরগণ কোনরূপ 'ওয়ার্ণিং' না দিয়াই হিরোসিমা ও নাগাশাকিকে আমবিক বম্বের উপহার দিয়াছেন। আমি কিন্তু ততটা ধর্ম্মপ্রাণতা দাবী করি না, তাই অগ্রিম 'নোটিশ' দিয়া বোমা ছুঁড়িলাম। সুভাষ যখন মাষ্টার সুভাষচন্দ্র বোস, কটক স্কুলের ফার্স্ট ও কোরমোস্ট 'বয়', তখন বৃটিশের

হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট জেনেরালের পদ বা চাকুরীটাই ছিল সুভাসের সার্থক-জীবনের 'টার্গেট'—চরম লক্ষ্য। হাই-কোর্টের জন্য নহে, আমার ইহাও দেখিয়াছি যে যৌবনাগমের পূর্ব্বেই দৃষ্টিভঙ্গী উজান বহিতে সুরু করিয়াছিল। 'স্বদেশের ধূলি স্বর্গ রেণু বলি' শিরে ধারণ করিবার আকাঙ্ক্ষা চিত্ত ভরিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত বৃটিশ বিদ্বেষের কোনই সংস্রব নাই। তখন স্বদেশ প্রেমের বাণ ডাকিয়াছে, দুকূল প্লাবিয়া পল্লী নগরী প্রান্তর কান্তার ভাসিয়া গিয়াছে, সে পুণ্য সলিলে অবগাহন করিয়া কে না ধন্য হইয়াছে? সে উত্তাল উন্মাদ প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধতা করিতে গিয়া ইন্দ্রের ঐরাবতও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে! তাহার পর, বন্যার জল, সাগরের বারি সাগরে ফিরিয়া গিয়াছে, পলি পড়িয়া আছে। পলিও স্বাদেশিকতার স্মৃতিপূত, পবিত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু বিদ্বেষমুক্ত—বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নাই। নদীর পলি-মাটির মতই কোমল, মসৃণ, উর্ব্বর ও মৃদু-সুরভিত। প্রেসিডেন্সী কলেজের যে ঘটনাটি 'নেতাজী' সুভাষচন্দ্রের নাম সংযুক্ত হইয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সেই ঘটনার সহিতও বিদ্বেষের সংস্পর্শ নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক-বর্গের সহিত সুভাষের সম্পর্ক কতটুকু বা কতখানি ছিল অথবা আদৌ ছিল কি-না, পরে ও প্রবন্ধান্তরে আমি তাহা সন্ধী সাধীর বুদ্ধিভঙ্গিতে নিরাকরণ করিবার বাসনা গোপণ করি। ওটেন-নাট্যের নায়ক যিনিই কেন হোন না, নাটকের একমাত্র 'ম্যাস' ছিল, অশিষ্টের শাসন। অশিষ্ট ছাত্রের প্রতি শিক্ষক যে ঔষধ প্রয়োগ করেন, অতীব দুর্জ্জন শিক্ষকের উদ্দেশ্যে তাহাই ব্যবস্থিত হইয়াছিল। তবে ব্যবস্থা যে নীতিশাস্ত্রবিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি: এই পৃথিবী কি কোন নীতিশাস্ত্রের পাতা রেল লাইনের উপর দিয়া হড় হড় গড় গড় শব্দে গড়াইয়া চলে? আমার ত তাহা মনে হয় না। দিনের আলো, রাত্রির অন্ধকার, নীতির ন্যায় ও দুর্নীতির অন্যায়—পৃথিবীময় ইহাই শাশ্বত ও সনাতন! সে যাহাই হোক, বিদ্বেষের সূচনা তখনও হয় নাই। তবে উই লাগিয়াছিল। আমার ভাঙ্গা ঘরের তালের কড়িখানি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অঙ্কুর অটুটই ত দেখিতাম। হঠাৎ যেদিন ভাঙ্গিয়া পড়িল দেখিলাম, অলক্ষ্যে উই পোকা সেখানিকে নিঃশেষে জলপান করিয়াছে।

বৃটিশ-জাতির পুরুষ বা নারী আদিলে ঘর ঝাড়ু দেয়, জামা কাপড় কাচে, জুতা বুরুষ করে' দেখিয়া সুভাষের বড় আনন্দ। অন্তরে অসুখের সূচনা হইয়াছিল—তাহার পরিচয় বিলাত হইতে লিখিত (কোন বন্ধুকে) একখানি পত্রের একটি ছত্রে তাহা অভিব্যক্ত হইতে দেখা যায়। "ইংরাজ আমার জুতা সাফ করিতেছে, যখনই দেখি আমার আনন্দ হয়।" আমাদের ভারতবর্ষে আমরা বৃটিশের বুট লেহন করিতে বাধ্য! এ বড় দুঃখ।

বৃটিশের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ হওয়ার কথা জানা যায় সেইদিন, যেদিন আই-সি-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, শিক্ষানবিশীর সূচনাতেই—ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জ্জন—বোধনে বিজয়া হইয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র ঘটনাটি এইখানে বলিব। ঘটনা ক্ষুদ্র হইলেও পরিণতি বিরাট। বটের বীজ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, কিন্তু বট বিটপীকুলশ্রেষ্ঠ! কিন্তু ঘটনাটি বলিবার পূর্ব্বে, আমার সুধীরা পাঠিকা ও সুধী পাঠকের 'মুখ বন্ধ' করা আবশ্যক।

আমি শুনিয়াছি (এবং দেখিয়াছি) সুভাষচন্দ্রের জীবন-কথা বহুজন বহুভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। যাঁহারা এই প্রয়োজনীয় কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বহু বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিও আছেন, আবার অনভিজ্ঞ ভাগ্যান্বেষীও থাকিতে পারেন, আমি জানি না। এমন একটা "বিষয়" পাইলে কাহার না হাত সুড় সুড় করে? পরাধীন দেশের, পরপদানত জাতির মধ্য হইতে এমন এক শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন বীর পুরুষের উদ্ভব হইতে দেখিলে লেখক-সমাজের হস্ত কণ্ডূয়িত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ত বটেই, যাহাদের 'কোন কালে ছিল না চাষ, ধানকে বলে দুব্বোঘাস'-পর্য্যন্ত 'বিদ্যা, তাহারাও যদ্যপি 'কাস্তে ভাঙ্গিয়া' লেখনী গড়াইয়া ফেলে, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। সেক্সপীয়ারের কল্পিত চরিত্রাবলী অবলম্বনে শত ব্যক্তি শত প্রবন্ধ রচনা করিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র চিত্রিত নরনারীর কত রকম ব্যাখ্যা কত জন করিল; রবিবাবুর কবিতার কত ভাষ্যই ত বাহির হইতেছে! আর এমন একটা জীবন্ত মানুষের জলন্ত চিত্র অবলোকন করিলে কাহার ভাবনাগরে না আলোড়ন হয়! মানুষটিও আবার দূরের মানুষ নহে। মানুষটি আমার ঘরের পাশে জন্মিয়াছে, আমার পাশের ঘরেই তাহার বসতি ছিল।

তাহাকে সকলেই দেখিয়াছে। যে লোক চাক্ষুষ দেখে নাই, সে'ও তাহার ছবি দেখিয়াছে; অহরহ তাহার কথা শুনিয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তা, হাবভাব, চালচলন, আচার ব্যবহার, সমস্তই হয় চোখে দেখা, না হয় কাণে শোনা। আমি যে ভাষার কথা কহি, সেই তাহার ভাষা; আমার ভাব ও অভাব, তাহার ভাব ও অভাবের সহিত এক সূত্রে আবদ্ধ; আমার সুখদুঃখে তাহার সুখদুঃখ ওতঃপ্রোত বিজড়িত। সেই প্রিয় পরিচিত লোকটি একদিন আমাকে ভাই, আমার মা'কে মা বলিয়া ডাকিত, আমার ভগ্নীকে ভগ্নী বলিয়া আহ্বান দিত, সেই লোকটি! আমার জন্মভূমি, তাহার জন্মভূমি। আমার ভারত, তাহার ভারত। আমার জন্মভূমির দুঃখে তাহার নয়নে দরবিগলিতধারা। আমার ভারতের বন্ধন মোচনের জন্ম সারাজীবন দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে; সারাজীবন কারাবাস করে। দারিদ্র্যকে মাথার মণি করিয়াছে; দৈন্য তাহার চিরসাথী। সম্পদকে হেলায় বিসর্জ্জন দিয়াছে; বিপদ তাহার পথের পথিক। দেশকে ভালবাসিয়াছিল, দেশবাসীকে ভালবাসিয়াছিল বলিয়াই না সে সর্ব্বত্যাগী! দেশের দুঃখ, দেশবাসীর দুর্দ্দশা তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়াছিল বলিয়াই না মরণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর পথে গমন করিয়াছিল? এ সেই লোক! ভক্তি গদগদ-কণ্ঠে সে 'মা' বলিয়া ডাকিত, মা, জননী জন্মভূমি আহ্বানে সাড়া দিতেন কিনা জানি না, তাহার দেশের লোক চক্ষুর সম্মুখে তাহার সেই জীর্ণবাসা, জীর্ণদেহা, হৃতসর্ব্বস্বা, মলিনাননা জননী জন্মভূমিকে দেখিতে পাইত। মনে হইত তাহার কণ্ঠের মাতৃনামই মূর্ত্তিধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা। যেদিন তাহার আহ্বান আসিল সমগ্র ভারতবর্ষ অবিচলিত নিষ্ঠাভরে বিশ্বাসসঙ্কোচহীন পদ বিক্ষেপে তাহাকে অনুসরণ করিল। একদিকে ভারতবর্ষ, অন্যদিকে বৃটিশ সেদিন যে অভিনব দৃশ্য দেখিল, তাহা শুধু অভাবনীয় নহে, অবিশ্বরণীয়ও বটে! এই সেই লোক! সেদিন গান্ধীজীও আচ্ছন্ন, অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন। সেদিন শুধু ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হইয়া এই মানুষটির পানে স্তব্ধ ও নির্ব্বাক নির্নিমেষে চাহিয়াছিল। সেই লোক একাকী, এই পরাধীন দেশে, বিশ্বের অবজ্ঞাত দাসানুদাস জাতির মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়া যেদিন প্রভাতের অরুণরাগরঞ্জিত ভারতের বিমল বিস্তৃত নরনারীর স্তম্ভিতস্তব্ধ নয়ন সমক্ষে বিরাট বিশাল হিমাচলসদৃশ মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইল, সেদিন সেই মুহূর্ত্তে শতাব্দীর পর শতাব্দীর স্তূপীকৃত বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকা বিমুক্ত হইয়া মেবারের রাণা প্রতাপের বীর্য্য, মারহাট্টা ছত্রপতি শিবাজীর শৌর্য্য মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের তেজোদীপ্ত হইয়া নিখিল ভারতবর্ষের আত্মাকে যেন বেত্রাহত সুপ্ত সারমেয়ের মত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল। মানুষটি কোথায় কেহ জানে না। জীবিত কিম্বা মৃত, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। তা পারে না সত্য; কিন্তু দিগন্ত হইতে দিগন্ত ব্যাপ্ত ভারতবর্ষের মানবদেহে যেখানে প্রাণের স্পন্দন আছে সেইখানে—সেই বক্ষে কাণ পাতিলে শুনা যাইবে, প্রতি স্পন্দন একই ভাষায় কথা কহিতেছে। ভাষা দুর্ব্বোধ্য নহে, বলিতেছে, নিরাপদীর্ঘজীবেষু। কোটী কোটী নরনারীর শুভেচ্ছা কি বৃথা হইতে পারে? কিন্তু যদি বৃথাই হয়, তাহাতেই বা কি! হোক বৃথা, হোক মিথ্যা। তথাপি এই ভারতবর্ষ উৎকর্ণ হইয়া তাহার পদধ্বনির প্রতীক্ষা করিবে। সুদীর্ঘ দিবস ও বিনিদ্র রজনীর মাঝে মর্ম্মর ধ্বনির সঙ্গে হৃদয়ের উত্থানপতন অনুভব করিবে। প্রোষিতভর্তৃকার উপমা আমি দিব না; কিন্তু দিলেও অন্যায় হইত না। এমন অনন্ত আশা লইয়া কি কেহ কোন কালে কাহারও আসা-পথ চাহিয়াছে?

সে যাহাই হোক, বেত্রাঘাতে সুপ্তিভঙ্গে মানুষ দেখিল তাহাদের সেই পরম প্রিয়, পরম আদরের মানুষটি মূর্ত্তিমান গীতার মত বলিতেছে—

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত—

কোথায় ছিল স্কটলণ্ডের পর্ব্বতশিখরনিবাসী রবার্ট ব্রুস। কোথায় ছিল ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি! কোথায় ছিল জর্জ্জ ওয়াশিংটন! কোথায় ছিল রাশিয়ার ট্রট্‌স্কি লেনিন! কোথায় ছিল বাঙ্গলার বার ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া—যশোরের প্রতাপাদিত্য, কোথায় ছিল বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন রাজা নবাব সিরাজদ্দৌলা! বিভ্রান্ত ভারতবর্ষ সেই একটি মানুষের মধ্য দিয়া যেন শত শতবৎসরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস প্রত্যক্ষীভূত হইতে দেখিল। সুপ্ত হৃদয়ের তারে তারে ধীর মধুর করুণ গীতিস্বরে যে বাসনা ঝঙ্কৃত হইতেছিল মানুষ অকস্মাৎ দেখিল সেই বাসনা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হইয়া, সৌন্দর্য্যের আরাধনার প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ ধারণ করিয়া তাহার হৃদয় চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া মূর্ত্তিমান। বিশ্বাস করা কি সহজ,

না বিশ্বাস করিতে সাহস হয়? আমরা যখন আরব্যের ডি ভেলেরার কাহিনী পাঠ করি, বুক দশ হাত হয়; ফরাসী বিপ্লব আমাদিগকে একটা অজানা অচেনা রাজ্যে টানিয়া লইয়া যায়; আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ আর কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের মহারণের পার্থক্য আমাদের নিকট অত্যন্ত অল্প বলিয়া অনুভূত হয়; ১৮৫৭ সালের ভারতের ইতিহাসখানিকে আমরা অন্তরের মূলধন নৈবেদ্য সহযোগে পূজা করি!. কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! কল্পলোকে বিচরণে চির-অভ্যস্ত ভারতবাসী অকস্মাৎ একদিন দেখিল, স্বপ্ন নহে, ভ্রম নহে, গল্প নহে, গাথা নহে, কাহিনী নহে, অথচ স্বপ্নের মোহমদিরামণ্ডিত, গল্পের মত গঠন-পারিপাট্য, গাথার মত মধুর, কাহিনীর মত চিত্তবিভ্রান্তকর এই প্রত্যক্ষ দর্শন!

বিংশ শতাব্দীতে, অস্ত্রশিক্ষাহীন, শস্ত্রবলহীন দুর্ব্বল ভারতবাসী ভারতেরই সীমাভ্যন্তরে বৃটিশের রাজ্যের ভিতরে, বিতাড়িত বৃটিশের রাজ্যখণ্ডে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিল! এমন লোকের জীবন বৃত্ত লিখিয়া ধন্য হওয়ার আগ্রহও যেমন স্বাভাবিক, পাঠক-পাঠিকার জনতাহওয়াও তেমনই স্বাভাবিক। যে গল্পে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের বর্ণনা আছে সে গল্প শুনিতে মৃতকল্পদেহে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়; আর সে গল্প লিখিতেও যেমন, শুনিতেও তেমন। সে গল্প যে গোটা জাতির সম্পৎ; সে গল্প ত কাহারও ইজারা মহল হইতে পারে না। তাই শুনিয়াছি, অনেকেই লিখিয়াছেন, এখনও লিখিতেছেন এবং আশা করিতে পারি যে, পরেও লিখিবেন। তাঁহাদের সহিত আমার বিরোধ নাই—বিরোধ হইতেও পারে না, কিন্তু আমার মুস্কিল এই যে আমি কাহারও কোন লেখাই পড়ি নাই (মায় নিজের লেখা পর্য্যন্ত!)। সেই জন্য মাঝে মাঝে মনের আগে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিতেছি না ত? রোমন্থনে আমার জন্মগত ও প্রকৃতিগত অনভ্যাস, অপিচ নিদারুণ অরুচি আছে।

ক্রমশঃ

অচিন্ত্যভেদাভেদ মতবাদ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বিএস-সি

অপরকল্প স্থানের বৈজ্ঞানিক (মায়াবাদী) বন্ধুকে চটাইয়াছিলাম। বেয়াড়াটা যে আমাদের একটা জাতীয় ধাত তা আমিও বুঝি, তিনিও বুঝেন। সমস্ত তিতিক্ষায় গুণসম্পন্ন লোকেরই বেদান্তে অধিকার। আমরা—যাহারা ব্যাড ম্যালেরিয়া কমিলে ভাবিয়া হই, ছেলেমেয়েদের পীড়ায় উদ্বিগ্ন হই, কেহ অপমান করিলে ক্রুদ্ধ হই, রাজনীতির তর্কে সমর উত্তেজিত হই—সে উহ্য সমস্যাদি গুণসম্পন্ন এমন বলা যায় না।

তর্কটা এইরূপ হইয়াছিল। "জগৎ মিথ্যা", "হাঁ"; "যাহা কিছু দেখিতেছি সব মিথ্যা", "হাঁ"; "আপনি মিথ্যা", "আমি মিথ্যা" "হাঁ"। "সমস্ত মিথ্যা—তাহার মানেটা মিথ্যা?" তিনি চটিলেন, "এ আপনি কি বলিতেছেন"।

অচিন্ত্যভেদাভেদব্যাপারটা—কতকটা স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) এর মত। তবে উহা যেন ফলাও—অজ্ঞেয়বাদের মত শুষ্ক নয়। ঈশ্বর অচিৎ-জীবের সহিত ভিন্নও বটেন, আবার অভিন্নও বটেন।

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। ঘটীতে তরল জল রহিয়াছে। থালায় শক্ত বরফ রহিয়াছে। ইংরেজ যেরূপ স্নো (snow) পড়ে—তুষার মত। ফুটন্ত জল উপরে যাইবার পূর্ব্বে কুজ্ঝটিকার মত দেখায়। মেঘেরও ঐরূপ মূর্ত্তি। আবহমণ্ডলে অনন্ত জল রহিয়াছে—উহা অদৃশ্য বাষ্পীভূত। উত্তরাপ বা বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে জলের অন্য অবয়বও বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিগ্রাহ্য। জলের যে ঐ বিবিধ অবস্থার কথা বলা হইল উহার মধ্যে কোনটি উহার স্বরূপ অবস্থা?

ব্রহ্ম সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা যাইতে পারে। অব্যক্ত ব্রহ্ম—ব্রহ্মের এক অবস্থা—ব্যক্ত ব্রহ্ম—তা বিরূপ ব্রহ্মের আর এক অবস্থা। দুইটি অবস্থার কোনটাই অসত্য হইবে কেন।

ভাগবতের মোক্ষস্তোত্রে—ব্রহ্ম স্তোত্র। উহাতে ব্রহ্মের ঐরূপ বর্ণনা আছে। "অরূপায়োরুরূপায় নমঃ"—তিনি অরূপ এবং উরুরূপ (বহুরূপ) তাঁহাকে নমস্কার। বিশ্বরূপরূপ অধিকরণে অধিষ্ঠিত, ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে জাত, ব্রহ্মরূপ কর্ত্তা দ্বারা কৃত, এবং ব্রহ্মই এই বিশ্ব হইয়াছেন।

"অধিষ্ঠিতং যদ্রূপেণ যেনেদং স্ব ইদং স্বয়ং" (ভাগবত)।
"অধিষ্ঠিতোহাত্মে যত উপাদানাৎ যেন কর্ত্রা স্ব ইদমেব ইদং—
বিশ্বং তদস্তি" (স্বামীটীকা)।
"সোঽয়ং বিশ্বসৃজো বিশ্ববিশ্বং বিশ্বেশ্বরঃ।
বিশ্বাত্মানমজং-ব্রহ্ম-প্রণতোঽস্মি পরং পদং। (ভা)

যিনি বিশ্বের সৃষ্টি কর্ত্তা, যিনি বিশ্ব এবং বিশ্বাতিরিক্ত যাহা কিছু, বিশ্ব যাহার সম্পত্তি, সেই জন্মহীন (অজ) বিশ্বের আত্মা যিনি, তাঁহার পরম পদকে নমস্কার করি।

পূজা

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

মা ডাকলেন—বিশু চল একটু গঙ্গাস্নান করে আসি।

আমি বল্লাম—বেশ তো তোমার খেয়াল মা। একে সন্ধ্যা হয়ে আসছে তার ওপর দেখো দিকি, বোধ হয় ঝড় উঠবে এখুনি। আমি বাবা এখন স্নানটান করতে পারবো না।

…অগত্যা যেতে হ'ল।

প্রতিদিন আমরা এই ঘাটেই স্নানে আসি। কিন্তু একি! গঙ্গার জল হঠাৎ কমে গেল কেন? এযে কেবল বালি! বাঃ আকাশের রং, জলের রং, মাটির রং সব যে এক হয়ে গেল! হঠাৎ একি হল! এযে এক অপূর্ব্ব, অদ্ভুত দৃশ্য! রংটা ঠিক লালও নয়, অথচ গেরুয়াও নয়। সূর্য্যদেব পাটে বসেছেন—তারই শেষ রশ্মি চারিধারে বিচ্ছুরিত!……এ যেন অদ্ভুত এক স্বপ্নের রাজ্য! মাকে ডাকলাম—মা…! দেখলাম না তো পাশে নাই…। তিনি তখন আরও এগিয়ে গেছেন—সেখানে একজন লোক পূজায় মগ্ন। কিন্তু মার দৃষ্টি ছিল গঙ্গার অপর পারে! মুখে তাঁর এক অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছে। মাকে এমন ভাবে এই প্রথম দেখছি। মা মুখে কিছুই বলতে পারলেন না, কারণ তিনিও বুঝি অভিভূত হয়ে পড়েন নি। কেবল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল!…একি!… যে বাদ্যকে কোন মন্দির হতে নিঃসৃত কোন দেবদেবীর পূজার বাদ্য বলে ভ্রম করেছিলাম সে যে ঐ অপর পারের বিশাল জাতীয় পতাকার তলে একত্রিত ঐ বিশাল বাহিনীর রণবাদ্য!…পূজারই বাদ্য তবে—দেশমায়ের পূজা। ভারতে এ দৃশ্য তো কখনও স্বপ্নেও দেখি নাই!…দেখতে লাগলাম সেই ঝড়ো হাওয়ায় আমাদের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা আকাশে উড়ছে; কিন্তু ঝড় না উঠলে এতো বড় পতাকা হয়ত উড়তো না। সমগ্র, স্থান এবং দৃশ্য আমাদের মৃত দেহেও প্রাণের স্পন্দন জাগায়।

…এ পারে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম ওপারের দৃশ্য—কানে ভেসে আসতে লাগলো—পূজারীর উচ্চারিত মন্ত্রের সুমধুর স্বর, আর ওপারের বাদ্যের রেশ।

…মনে হ'ল মা গঙ্গা যেন কাঁদছেন—ও রে অবুঝ। আর সময় আসবে না, এই বেলা পার হয়ে যা!

ওপারের ওরা ছিল রণমদে মত্ত, তাই হয়তো মার স্বর শুনতে পেল না। আর এপারের আমরা যার সে আহ্বান শুনেও গা ঝেড়ে উঠতে পারলাম না—শতাব্দীর আলস্য ছেড়ে। …দৃষ্টি গঙ্গার দিকে পড়তে দেখলাম জল বাড়ছে। পূজারী মার দিকে একবার তাকালেন, আবার আমার দিকে। বল্লেন—যাও আর সময় নেই!—সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে এলো রণবাদ্যের গম্ভীর শব্দ। মা পূজারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি? উত্তর—ঐ দেখো ও-পারে তোমার ছেলের মত শত শত ছেলে জাতীয় পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা আজ পণ করেছে কি জানো? দেশমাতার বন্দিত্ব মোচন করবে!…আমি একজন পূজারী, জগৎ পিতার কাছে তাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করছি।

পূজারীকে দেখলাম।…যেন চিরপরিচিত, তবু এই পরমাত্মীয়কেও চিনতে পারলাম না!

পূজারী মাকে বল্লেন—দেশ-মায়ের সেবায় তোমার ছেলেকেও-দাও মা। আর কি সময় পাবে! মা, তুমি কি জান না যে মা বলে তোমার ছেলের ওপর তোমার যেমন অধিকার আছে, ঠিক সেই অধিকারই আছে দেশ-মায়ের—তার ছেলেমেয়েদের ওপর। যাও যুবক—জল বাড়ছে।

মাকে বল্লাম—যাই মা।

মা সাধারণ মায়ের মন নিয়ে হাত বাড়ালেন আমায় ধরতে। পূজারী গম্ভীর স্বরে ভর্ৎসনা করলেন—স্বার্থপর।

মা তখন মায়ের মত আমায় বল্লেন—বল আসি।

বল্লাম—আসি।

মা বল্লেন—এসো।

পূজারী এক অদ্ভুত হাসি হাসলেন।

গঙ্গার জল তখন বেশ বেড়েছে—এক বুক জল। আমি ঝাঁপ দিলাম।

…কানে এলো ভাই ডাকছে—দাদা? মুখ ফিরিয়ে বললাম—পিছু ডাকনি!

ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভাই তখনো বলছে—দেরী হয়ে গেল যে!

বল্লাম—হ্যাঁ সত্যই দেরী হয়ে গেল।…আজ সপ্তমী না? ভাই বল্লে—"হ্যাঁ কাল মহাষ্টমী।"

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যবস্থা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার

(১)

কয়েকদিন হ'ল কলিকাতার একটী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভারতীয় ব্যাঙ্কের কর্মকর্ত্রী দেখা করতে এলেন—ব্যাঙ্কের সহকারী কোষাধ্যক্ষ এক লাখ ছিয়াশি হাজার টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। সবিস্তৃত বিবরণ শোনার পর কর্মকর্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলাম—বলতে পারেন ব্যাঙ্কের ঘর কেন হয় প্রায় সর্ব্বত্রই ভারতীয় ব্যাঙ্ক জড়িত থাকে কেন? বিদেশী ব্যাঙ্কে এ রকম ব্যাপার দেখতে পাই না? ভদ্রলোক প্রথমটা একটু বিস্মিত হলেন, বোধ হয় আশা করেছিলেন দেশী, বিদেশী সর্ব্বত্র একই হবে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে যুক্তি তর্ক চলে না। তিনি তখন বললেন—"আমাদের ঘোষণাটি যদি আপনার নজরে পড়ে থাকে, আমাদের জানাবেন, আমরা সাবধান হতে পারি।"

উপরের চুরিটী আর একটু তলিয়ে দেখলেই অনেকগুলি ব্যাপার সকলের চোখে পড়বে। আমি সর্ব্বদা বলে থাকি "চুরি যেখানে সেখানেই ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত অসাবধানতা থাকতেই হবে।" তবুও করতে গিয়ে কি পাওয়া গেল—মাস খানেক আগে নূতন লোক রাখা হয়েছে—কোথাকার লোক কি বৃত্তান্ত কোন খোঁজ করা হয় নাই; দুইজন গণ্যমান্য পরিচিত লোকের নাম ঘরখাতে বসানো ছিল, নিয়োগের আগে তাঁদের কাছে কোন খোঁজ নেওয়া হয়নি। চুরির পর দেখা গেল তাঁরা উহাকে মোটেই চেনেন না। যেসের-টীকানায় যে নামের লোক পাওয়া গেল না; এমন কি কালীতলায় যে টীকানা ব্যাঙ্কে দেওয়া ছিল সেখান থেকে চুরির সাত দিন আগেই তিনি সপরিবারে সরে পড়েছেন। বেশ বোঝা গেল ভদ্রলোক চুরি করার মতলবে এঁটে বেনামীতে ব্যাঙ্কে ঢুকেছিলেন। জনসাধারণের টাকা, ব্যাঙ্কের কত বড় দায়িত্ব—অথচ লাখ, লাখ টাকা হাতে দেবার আগে লোকটীর একটু পরিচয় নেওয়া কেহ দরকার মনে করলেন না। টেলিফোন তুলে Referee দুজনকে জিজ্ঞাসা করলেই মুহূর্ত্তে পরিচয় নেওয়া চলতো, বিশেষ পক্ষে তিন আনা খরচ করে চিঠি লেখাও চলতে পারতো। ব্যাঙ্কের নিয়ম ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা জমাবত নেওয়া তাও পুরো নেওয়া হয় না। যে লোক দিনান্তে চার পাঁচ লাখ টাকা লেন দেন করবে তার কাছ থেকে ৫০০০৲ হাজার টাকা জমা নেওয়ার ব্যবস্থা খুব সমীচীন মনে হয় না। অন্যান্য অসাবধানতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ নাই করলাম। এই সব দেখে শুনে অনেক সময় মনে হয় ব্যাঙ্ক পরিচালকেরা অনেক চুরিতে ভাগ বসান।

ব্যাঙ্কে চুরি, জুয়াচুরি হয় নানান রকম, কিন্তু দুইটী জিনিষ সর্ব্বত্র দেখা যায়। প্রথমতঃ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরা নিজেরা, কোন কোন ক্ষেত্রে, বাহিরের লোকের সাহায্যে চুরি করে; দ্বিতীয়তঃ, বাইরের লোক ব্যাঙ্কের অসাবধানতা এবং লোভের সুযোগ নিয়ে থাকে। কয়েকটী দৃষ্টান্তে বিষয় আমার বক্তব্যটী পরিষ্কার বোঝা যাবে।

Crossed cheque ভাঙ্গে পাঠানো দৈনন্দিন ব্যাপার। সকলে জানেন cross করলেই নিরাপদ—ভাঙ্গাতে হলে ব্যাঙ্ক মারফত ভাঙ্গাতে হবে। অথচ Crossed cheque ভাঙ্গানো যে কত সহজ তুকতোকী না হলে অনেকেই উপলব্ধি করেন না। দেশী ব্যাঙ্কগুলি বেঁচে থাকলে বেনামীতে একাউন্ট খোলা অসাধ্যসাধ্য। অনেক বড় বড় চোর ব্যাঙ্ক থেকে চেক চুরি আমাদের বাতিব্যস্ত করে রেখেছিল। চুরি হত ডাকঘর ও ব্যাঙ্ক থেকে। ডাক-পিয়নরা চিঠি দেখে—ভেতরে কি আছে আন্দাজ করে খুলে দেখে নেয়। কিছু না দেখে ফিরি হয়; চেক দেখে চিঠি গায়েব হয়ে যায়। আর চুরি করে ব্যাঙ্কের পিয়ন। ডাকঘর থেকে চিঠি আনার সময়। এ ছাড়া আর একরকমের চুরিও দেখা গেছে। পোষ্ট অফিসে বহু সাধারণ চিঠি অনেকের আসে। এই বক্সগুলিতে অল্প দামের তালা লাগানো থাকে, যে কেউ এসে তালাখুলে চিঠি নিয়ে যেতে পারে। কলেজের একটী ছেলেকে চিঠি নিয়ে সরে পড়ার সময় সাদা পোষাক পরা মোতায়েনী সিপাই ধরে ফেলে। কতকগুলি পুরানো কেসও সঙ্গে সঙ্গে কিনারা হয়ে গেল। চুরির পর চেক ভাঙ্গানো অতি সহজ। কোন দেশী ব্যাঙ্কে—ছোট হলে কথাই নেই—বিনা পরিচয়ে মিথ্যা নাম ঠিকানা দিয়ে কয়েক টাকা জমা দিয়ে একাউন্ট খোলা; দিন বা পরের দিন crossed চেকখানি জমা দেওয়া এবং চেক ভাঙ্গিয়ে এসে কয়েক টাকা ফেলে রেখে টাকা তুলে নেওয়া। চেক হারিয়েছে খবর পেতে প্রেরকের অনেক সময় লেগে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে দুই তিন মাস লেগেছে।

অল্প কয়েকদিন হল একটী লোকের সাত বৎসর জেল হয়েছে। এর কাজ ছিল ডাক পিওনদের কাছে চেক্ কেনা এবং যাকে তাকে মিথ্যা নামে একাউন্ট খুলে চেক্ ভাঙ্গিয়ে নেওয়া। কয়েক মাসের ১৮ খানি চেকে ১০,০০০৲ হাজার টাকা নিতে পেরেছিল।

Crossing তুলে ফেলেও Bearer চেক করা চলে এবং দু এক ক্ষেত্রে এই চতুর লোকেই তাও করেছিলেন। সবগুলি কেসগুলিতেই ভারতীয় ব্যাঙ্ক জড়িত।

চেক চুরি যখন প্রবলভাবে চলছে—বিনা পরিচয়ে একাউন্ট খুলতে নিষেধ করে নির্দ্দেশ পাঠানোর কিন্তু ফল হল উল্টো—কোন আইনে আমি হুকুম জারি করেছি তার জবাব দিহি করতে হল অনেক। হুকুম নির্দ্দেশ মাত্র। আমার নির্দ্দেশ হল অগ্রাহ্য। দু এক জায়গায় ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী কিছু পয়সা খেয়ে পরিচয়পত্র সই করে দিলেন; সুন্দর ব্যবস্থা। কেউ দেখে দেখে, কেউ ঠেকে শেখে—কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার কয়েকটী ব্যাঙ্ক উপর্য্যুপরি এই রকম একাউন্ট খুলে চুরির সাহায্য করে চলেছে অথচ এদের আইনের ফাঁদে ফেলতেও পারা গেল না। পরিচালকদের দায়ু উদ্রেক সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া কি স্বাভাবিক?

ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষতি করা বা ইহাদের প্রতি সাধারণের আস্থা হানি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কতরকমের কেস আমরা দেখেছি এবং ব্যাঙ্কের কোথায় দোষ ছিল, সাধারণের বিশেষ করে ব্যাঙ্কারদের জানিয়ে দিয়ে সাবধান করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

ইতি

শ্রীসময় সরকার এম্-এ, বি-টি, বি-এল্

সমুদ্রের ধারে বালির উপর একটা ডেক্-চেয়ারে শীর্ণ দেহটাকে এলিয়ে দিয়েছে জয়ন্তী। সামনেই উদার সমুদ্র অসীম নীলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তীরের দিকে বিপুল গর্জনে একের পর এক বিরাট ঢেউ আছড়ে ভেঙে সাদা হয়ে যাচ্ছে, আর কিছুদূর থেকে সমুদ্র যেন শান্ত হয়ে গেছে, শুধু কালো জল কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে উঠ ছে। জয়ন্তী চুপ করে সামনের দিকে চেয়ে আছে—করুণ চোখের উপর পড়েছে দিনান্তের রক্তিম আভা। পাশেই একটা ছোট্ট টিপয়ের উপর খান দুই বই, আর শ্লেটে ঢাকা জলের গ্লাস। জয়ন্তীর মনের সামনে একের পর এক কতকগুলা স্মৃতির ফিল্ম্ সরে যাচ্ছে।

বি-এ পাস করার পর একদিন চিরঞ্জীতের সঙ্গে দেখা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে।

'নমস্কার, মিঃ ব্যানার্জী—'

'ওঃ আপনি, মিস্ মিটার! নমস্কার। কেমন আছেন?'

'ভালই। আপনি এবার কি পড়ছেন—এম্-এ পড়ছেন ত ইংলিশে?'

'তাছাড়া আর কি করি—' স্মিত হাস্যে বললে চিরঞ্জীৎ 'আপনিও আসছেন ত?'

'হ্যাঁ, আমাদের কলেজের কারোর খবর জানেন?'

গল্প করতে করতে ওরা ভর্তি হতে গেল এম্-এ ক্লাসে।

* * * * * *

'আসুন না আজ বিকালে ইডেন গার্ডেনে—সেখান থেকে গঙ্গার ঘাটে একটু বেড়াতে যাওয়া যাবে।'

'বেশ ত, আমি নিশ্চয়ই আসব।'

'আপনি কিন্তু ডক্টর রায়ের শেলীর নোটটা নিয়ে আসবেন। আর সেই সঙ্গে আপনার কাছ থেকে শেলীর Pantheismটা বুঝে নেব। আপনি ত master of Shelley হয়ে বসে আছেন।'

'তাই আমাকে মাষ্টারী করতে ডাকছেন?' হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্ল চিরঞ্জীৎ।

* * * * * *

চলুন মিস্ মিটার, আজ ক্লাশ পালিয়ে মেট্রোতে 'মেরী ওয়ালেস্কা' দেখে আসা যাক্।

অন্ধকার হলে ওরা বসে আছে পাশাপাশি। সামনে নেচে চলেছে একটি মধুর প্রেম-কাহিনী, যার নায়ক ছিলেন বিশ্ববিজয়ী নে পোলিয়ঁ।

জয়ন্তীর ডান হাতখানি চিরঞ্জীৎ আস্তে আস্তে টেনে নিল নিজের বাম হাতের মধ্যে। জয়ন্তী বাধা দিলে না, নিঃসঙ্কোচে তুলে দিলে নিজেকে চিরঞ্জীতের হাতে। চিরঞ্জীৎ হাতের উপর একটু চাপ দিয়ে ডাকলে আবেশময় লঘুকণ্ঠে—'জয়ন্তী!'

'কি বলছ চিরঞ্জীৎ?'—প্রেম-বিনিময় করলে জয়ন্তী।

* * * * * *

চিরঞ্জীৎ, কেন তুমি আমাদের প্রেমকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইছ? আমি তোমাকে ভালবাসি, এবং বাস্ব চিরকাল, তুমিও তাই করবে, প্রেমের সার্থকতা কি তাতেই নয়?

'জয়ন্তী, তুমি কান্ত রাখ। সংসারে নেমে এস। Platonic love কাব্যের কথা—বাস্তব জগতে তার স্থান নেই। তুমি আমাকে ভালবাস, কিন্তু তার জন্য তোমার ত্যাগ কই? তোমার বাবা-মার এই বিয়েতে মত নেই—সেইটাই কি আমাদের ইতিহাসের বড় কথা হবে? তোমার এইটুকু সাহস নেই তুমি আমার হাত ধরে পৃথিবীতে বেরিয়ে আসতে পার?'

'চিরঞ্জীৎ, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না; কিন্তু সামাজিক নীতি অস্বীকার করে তাকে আঘাত করা কি উচিত?'

'থাক্, তোমার কাছ থেকে সামাজিক নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনার মত অবকাশ আমার নেই। তুমি তোমার

Platonic love নিয়েই থাক। জেনে রাখ আজ থেকে আমরা পরস্পরের কাছে মৃত।'

জয়ন্তীর উত্তরের কোন অপেক্ষা না করে চিরঞ্জীৎ ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

* * * * * *

জয়ন্তীর মনটা ডুকরে উঠল, মনের ব্যথা লাঘব করবার জন্য সে ধীরে ধীরে পাশের টেবিল থেকে একখানা বই নেবার জন্য হাত বাড়ালে। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল একটি যুগলের প্রতি—তারই প্রায় হাত চারেক দূরে। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারলে না জয়ন্তী। হ্যাঁ, চিরঞ্জীৎ! তার দীর্ঘ গৌর দেহ যৌবনের শিখরে আরোহণ করে উন্নত হয়ে উঠেছে।

'চিরঞ্জীৎ—'

চিরঞ্জীৎ চমকে উঠল—'কে? জয়ন্তী? সে কি বেঁচে উঠেছে তার কবর থেকে?'

শ্রীলতা বললে—'তোমাকে ডাকছেন উনি।'

ওরা এল জয়ন্তীর সামনে। একি সেই জয়ন্তী?

'কেমন আছ চিরঞ্জীৎ? বছর পাঁচেক তোমার খবর পাইনি কোন।'

ভাল—'কিন্তু তুমি?' তীক্ষ্ণ চিরঞ্জীতের কণ্ঠস্বর।

জয়ন্তী চিরঞ্জীতের প্রশ্নের উত্তর দিলে না। বললে—'তুমি বেস লোক ত', এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না? বেস, আমিই আলাপ করে নিচ্ছি। ইনি তোমার স্ত্রী নিশ্চয়?'

'তোমার নামটি কি ভাই?'—জয়ন্তীর কণ্ঠে পরিচিতার স্বচ্ছন্দ সুর।

'শ্রীলতা—'

আমি তোমার চেয়ে অনেক বড় তাই তুমি বলছি, রাগ করছো না ত? জয়ন্তীর মিষ্ট কথায় শ্রীলতার ভারী ভাল লাগল জয়ন্তীকে।

কিছুক্ষণ আলাপের পর ওরা বিদায় নিলে। কথা দিলে জয়ন্তীদের বাড়ী 'সাগরিকা'তে ওরা আসবে।

ফেরার পথে শ্রীলতা বললে চিরঞ্জীৎকে—'কই, তুমি ত আমাকে কোনদিন বলনি ওর কথা?

চিরঞ্জীৎ জয়ন্তীমনস্ক হয়েছিল। প্রথমটা ভাল করে শোনেনি শ্রীলতার প্রশ্ন, তাই বললে—'কি বলছ?'

শ্রীলতা বুঝলে চিরঞ্জীতের মন কোথায় রয়েছে। সে তার প্রশ্নটা আবার করলে।

'জয়ন্তী আমার সঙ্গে বি-এ ও এম্-এ পড়ত।' সংক্ষিপ্ত উত্তর চিরঞ্জীতের।

'সে ত বুঝলুম, কিন্তু ওর কথা আমার কাছে হঠাৎ চেপে গিয়েছিলে কেন?'

'হয়ত বাধ পড়ে গিয়েছিল অন্যমনস্কতার জন্য।' চিরঞ্জীৎ এখনও চেপে গেল জয়ন্তীর সঙ্গে ওর পূর্বসম্পর্ক।

ঠোঁট উল্টিয়ে বললে শ্রীলতা—'কি জানি বাবা, কিছু ব্যাপার ছিল নাকি তোমার ওঁর সঙ্গে?'—স্বামী সম্বন্ধে স্ত্রীর সন্দেহের সৌরভ।

পরের দিন বিকালে একটু আগেই শ্রীলতা বেরুল বেড়াতে চিরঞ্জীতের সঙ্গে। প্রথমেই ও গেল জয়ন্তীর বাড়ী। জয়ন্তী ওদের পেয়ে আনন্দে মুখরা হয়ে পড়ল। ও যেন খুশীর আকাশে একটা বলাকা, মুক্তপক্ষ হয়ে উড়ে চলছে। মাঝে মাঝে খুকখুক কাশি ওকে বাধা দিতে লাগল, আর পরিশ্রান্তি।

শ্রীলতা বললে—'আপনি অত বেশী কথা কইবেন না, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন—আমরা এবার উঠি।'

জয়ন্তী বললে—'আর একটু বস। তোমরা এসেছ, আমার কত আনন্দ? চিরঞ্জীতের দিকে চেয়ে বললে—হয়ত তোমাদের সঙ্গে আর দেখাই হবে না পরে। খোঁজ ত' আমার নেবে না।'

শ্রীলতা বললে—'উনি না নিলেও আমি নেব।'

জয়ন্তী চিরঞ্জীতের সঙ্গে তাদের ছাত্রজীবনের গল্প করতে লাগল। শ্রীলতা হল শ্রোতা। হঠাৎ এক সময়ে শ্রীলতার নজর পড়ল জয়ন্তীর বিছানার ধারে তেপায়া টুলের উপর দুখানি বইয়ের প্রতি। ওর মনে পড়ল এই বই দুখানিই সে যেন সমুদ্রের ধারে জয়ন্তীর কাছে দেখেছিল। বুঝলে বই দুখানি ওর খুব প্রিয়। সামান্য একটু ঔৎসুক্য জাগল শ্রীলতার: হাত বাড়িয়ে একখানা বই টেনে নিলে—রবীন্দ্রনাথের মহুয়া। প্রথম পাতা খুলতেই চেনা অক্ষর পড়ল চোখে—'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার পথী।' সই রয়েছে চিরঞ্জীতের—তারিখ পাঁচ বছর আগেকার।

ওর শরীরের রক্তটা ছলাৎ করে উঠ্‌ল। কম্পিত হাতে এখানা রেখে অপর বইখানা টেনে প্রথমেই উল্টাল অভিজ্ঞানের জন্য—চিরঞ্জীৎ মুক্তা ছড়িয়ে গেছে শেলীর পাতায়—

The desire of the moth for the star
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow.

শেলীর লাইনগুলা শ্রীলতার বুকে হান্‌লে শেল। তন্দ্রতা রক্ষার জন্য আর দু একটা পাতা নেড়ে-চেড়ে ও বইখানিকে রেখে দিলে যথাস্থানে। জয়ন্তী আর চিরঞ্জীতের সম্পর্ক বুঝ্‌তে ওর আর বাকী রইল না কিছুই। ওর সামনের পৃথিবী যেন দুলে উঠ্‌ল, দৃষ্টিশক্তি যেন হরে গেল আপনা, কি একটা নৈরাশ্যে ও যেন আচ্ছন্ন হল। তবু নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রাখলে শ্রীলতা।

সন্ধ্যার একটু আগে ওরা উঠল। শ্রীলতা বল্‌লে—আপনার আজ আর বাইরে যাওয়া হল না।

জয়ন্তী বল্‌লে—'তার চেয়ে আমার শরীরের অনেক উপকার হল তোমাদের দেখে। আবার আস্‌ছ কবে?'

শ্রীলতা অধর দংশন করে মনে মনে বল্‌লে—'হবে না, পাঁচ বছর পরে নাগরের দেখা পেয়েছ।' মুখে বল্‌লে—'আস্‌ব আর একদিন।'

ওরা ফিরল বাড়ীর দিকে।

পথে শ্রীলতা কোন কথা বল্‌লে না চিরঞ্জীতের সঙ্গে। ওর সর্বশরীর তখন দহন কর্‌ছে ঈর্ষ্যার অনল। চিরঞ্জীৎকে ও নিজের বলেই জানে, সে যে কোনদিন আর কারও ছিল এ-চিন্তাও সে মনে সইতে পারে না। চিরঞ্জীৎ এতদিন তাকে যে-ভালবাসা দিয়ে এসেছে সেটা আজ তার মনে হল শুধুই অভিনয়ের আবরণে ছলনা। কোনদিন কিন্তু সে বুঝতে পারে নি যে চিরঞ্জীতের সোহাগ-আদর-অভিমান সবই মৌখিক। একদিন যে সে অন্যের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় করেছিল, কোনদিন শ্রীলতা ত' সে সন্দেহ কর্‌তে পারে নি! জয়ন্তী-চিরঞ্জীতের ব্যাপার তার জানা না থাক্‌লেও, সে যে প্রমাণ দেখেছিল তাতে দুজনের অতীত সম্পর্ক সম্বন্ধে তার এতটুকু সন্দেহের অবকাশ ছিল না। শ্রীলতার যেন মনে হল জয়ন্তীর কাছে সে পরাজিত, অপমানিত হয়েছে। জয়ন্তী যে-ফল একবার আস্বাদ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, শ্রীলতা সেইটাই পথের ধার থেকে কুড়িয়ে পরম তৃপ্তি সহকারে উপভোগ করেছে। ঘৃণায় শ্রীলতার নরম ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত হল। পাশে চলমান চিরঞ্জীতের প্রতি একটা ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ্‌লে চিরঞ্জীৎ আত্মসমাহিত হয়ে চলেছে, শ্রীলতা যে পাশে পাশে চলেছে সে হুঁসও বুঝি তার নেই। শ্রীলতা আরও জ্বলে উঠল, তার ইচ্ছা হল দৌড়ে গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে শান্ত হয়।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে শ্রীলতার দেখা হল এক পরিচিতার সঙ্গে। সে দাঁড়িয়ে একটু আলাপ কর্‌লে। চিরঞ্জীৎ গতি রোধ করে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের আলাপ শেষ হতে চিরঞ্জীৎ শ্রীলতাকে বল্‌লে—এস লতা, এইখানে একটু বসা যাক্ দুজনে।

শ্রীলতা কোন কথা না বলে এগিয়ে চল্‌ল। চিরঞ্জীৎ কিছু বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে ক্রোধে তার মুখ গম্ভীর। চিরঞ্জীৎ বুঝতে পারলে না কি ব্যাপার হয়েছে। সে ওর কাঁধের উপর আলতোভাবে হাত রেখে প্রীতিভরে ডাক্‌লে—লতু……

শ্রীলতা ছট্‌কে সরে গিয়ে বল্‌লে—'আমাকে ছুঁয়ো না, ভণ্ড কোথাকার—'

চিরঞ্জীৎ এতক্ষণে খাঁচ করে নিলে যে শ্রীলতার এই অমিলের ব্যবহার নিশ্চয়ই জয়ন্তীর সঙ্গে তার সম্পর্কের সন্দেহ-প্রসূত। পাছে সমুদ্রের ধারে একটা এমন কিছু ঘটে যা' অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই ভয় করে' চিরঞ্জীৎ আর কিছু বল্‌লে না। আর মিনিট কয়েক গেলেই তারা বাড়ী পৌঁছাবে, তখন শ্রীলতাকে প্রশমিত করাই সুবিধা। সে ভাবতে লাগল—কি সে করেছে যে জন্যে শ্রীলতা তার উপর রাগ কর্‌বে? শ্রীলতাকে কি সে হৃদয়-ভরা ভালবাসা দেয় নি? কোন কার্পণ্য কি সে করেছে? জয়ন্তীর সঙ্গে অতীতে যা ঘটেছে সে ত' বিস্মৃতির অতলতায় লুপ্ত হয়ে গেছে। জয়ন্তীর জন্য কোনরকম দুর্বলতা পোষণ করে সে ত' শ্রীলতাকে তার প্রাপ্য থেকে একাংশও বঞ্চিত করে নি। তারুণ্যের আকাশে প্রভাত রবির দু' একটা নবরশ্মি যে আলোকপাত করেছিল সে ত' কবে মিলিয়ে গেছে—আকাশের শূন্যতায় কোন দাগ না রেখেই। আজ শ্রীলতা কেন কল্পনায় সেই আলোক-রেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে? বিয়ের

পরেই সে শ্রীলতাকে জয়ন্তীর কথা বলে নি, কারণ সে চায় নি তাদের দুজনের প্রেমের সম্পর্কের মাঝখানে এমন একজন এসে দাঁড়াক, যে প্রেমকে অবমাননা করেছে, প্রেমের মর্য্যাদা দেয় নি। জয়ন্তীকে সে তাই স্মৃতিগ্রাহ্য মনে করে নি। রাতের স্বপ্ন যেমন দিনের আলোয় আবছা হয়ে শেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তেমনিই বাস্তবজীবনের জয়ন্তীর কোন চিহ্ন রাখতে সে সচেষ্ট হয় নি। শ্রীলতাকে জয়ন্তীর গল্প শোনান কি অবান্তর, গল্পের মতই হত না? এই সব চিন্তার মধ্যে সে বাড়ীতে এসে পৌছাল। হাত-পা ধুয়ে অন্যদিনের মত বারান্দায় ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে শুয়ে রইল। সন্ধ্যা তখন ধীরে ধীরে বেশ জমে উঠেছে। সমুদ্রকে একটা জমাট কালো দেখাচ্ছে, আর গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে যাচ্ছে ফস্ফোরসের চুম্‌কি। অন্যদিন এমনি সময়ে শ্রীলতা একটা মোড়া নিয়ে চিরঞ্জীতের পাশে গিয়ে বসে, কিন্তু সেদিন বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেলেও শ্রীলতা এল না। চিরঞ্জীৎ শ্রীলতার সঙ্গে একটা আপোষে আস্‌বার জন্য ছট্‌-ফট্‌ করছিল। শ্রীলতা যে ভেবে রাখবে—চিরঞ্জীৎ আজও জয়ন্তীর প্রেমকে ফুলদানিতে আরক দিয়ে জিইয়ে রেখেছে, সে তা' হতে দেবে না, কারণ কথাটা সত্যি নয়। জয়ন্তীর বর্ত্তমানের শারীরিক অবস্থা দেখে চিরঞ্জীৎ আন্তরিক দুঃখিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সমবেদনা তার অনেক অংশ অধিকার করেছিল।

চিরঞ্জীৎ শ্রীলতার সন্ধানে বারান্দা থেকে ভিতরে এল। শোবার ঘরে দেখে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে শ্রীলতা শুয়ে। এমন অসময়ে শ্রীলতাকে শুয়ে থাকতে দেখে চিরঞ্জীৎ ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'লতু, তোমার শরীর খারাপ লাগছে?'

শ্রীলতা নিরুত্তর। চিরঞ্জীৎ বিছানায় উঠে আদর করে মাথায় হাত বুলাতে গিয়ে টের পেলে শ্রীলতা কাঁদছে। শ্রীলতার মুখখানি জোর করে টেনে এনে চিরঞ্জীৎ স্নেহকণ্ঠে বললে—'একি, তুমি কাঁদছ লতু? কেন?'

আদরের বাতাসে শ্রীলতার ক্রন্দনের গতিবেগ বেড়ে উঠল ও সেই অনুযায়ী তার শরীর ফুলে ফুলে, দুলে দুলে উঠতে লাগল। এর জন্য চিরঞ্জীৎ প্রস্তুত ছিল না। সে ভেবেছিল শ্রীলতা হয়ত তার সঙ্গে ঝগড়া করে জবাবদিহি চাইবে, কিংবা রাগের বশে তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেবে। ও কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারলে না যে এই ব্যাপার এতখানি গড়াতে পারে কি করে? কি করে এই অপ্রিয় অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবে তা সে ভেবে পেলে না। শ্রীলতার আঁচলখানি টেনে নিয়ে সে জোর করে শ্রীলতার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললে—'ছিঃ, কেঁদ না লতু—তুমি কেন মন খারাপ করছ বলত?—'

শ্রীলতা ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস দমন করে অশ্রুসিক্ত আননে বললে—'জয়ন্তীকে তুমি ভালবাস্‌তে এ কথা আমাকে বলনি কেন?'

আগামীবারে সমাপ্য

কবিতা-লক্ষ্মী

শ্রীবাণীকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়

আগে নাই কতকাল। ছিলে দূরে দূরে।
এতদিন পরে মনে পড়িল বন্ধুরে?
একথা শোনাতে তুমি বাঁশিতে আমার
দিয়েছিলে বৈশাখের ঝড়ের ঝঙ্কার।
ঘরে ঘরে বিরহের করিনু অর্চ্চনা।
নয়না মিলায়ে গেলে। করেছি কামনা
মনে মনে কতবার। ধরেছি বিরাগ।
আজ যবে সমাজের অবরে আগার
খুলে খুলে, মুক্ত করে বাঁধি একা একা,
সেইক্ষণে পুনরায় তুমি দিলে দেখা।
দেখিলাম—করুণায় ছল ছল আঁখি।
সর্ব্ব দুঃখ ভুলে গেনু কোলে মাথা রাখি।
জীবনের সাহারায় তুমি মরুদ্যান।
তুমি আশা, তুমি আলো, তুমি মোর প্রাণ।

জার্ম্মানীতে ইঙ্গ-মার্কিন মিতালী

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, কাহার না কাহার উপর চড়িয়া বসা। ইঁহারা যেখানে আস্তানা গাড়িয়াছে, সেখানকার রস নিংড়াইয়া তবে ছিবড়ে সবাইকে দিয়াছে। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন যে, এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি আজ ইটন জাতির উপর জাঁকিয়া বসিয়াছে। আমরা অবশ্য জাতিগত কোন বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনায় যাব না। কেন না Julian Huxley সাহেব বলিয়াছেন যে "Racialism is a myth, and a dangerous myth," আমরাও তাহা মনে মনে স্বীকার করি। কাহার মধ্যে তাহা করি-চাই-নাই-করি। কেননা ইংল্যাণ্ডে উইলিয়ম লয়েড জর্জের তাড়া খাইয়া যাহারা নিয়া আমেরিকা মহাদেশের নিউ-ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের জন্ম তুলিয়াছিল, তাহাদেরই কাহার আজ বিভিন্ন নামে বিদ্রোহের গুলি করিয়া বহাল তবিয়তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হাক্সলি সাহেবের নিজের দেশে তাহারা ঢোকেনে ঢুকিতে পায় নাই। যে গণতন্ত্রের জন্ম ইংল্যাণ্ড তুলিয়াছিল, তাহা স্মাট্স্ সাহেবও বহন করিয়াছেন। তিনিও গণতান্ত্রিক মতে দক্ষিণ আফ্রিকায় Racialism যে myth তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আসলে সবাই শুদ্ধচিত্তবাদী। যাক সে কথা, জার্ম্মানী ইংরেজের গণতন্ত্র ঠিক হজম করিতে পারিতেছে না। ইংরেজ যে প্রকারের গণতন্ত্র পরাজিত জার্ম্মানীর উপর চাপাইয়াছে তাহাতে জার্ম্মান জাতি আদি বসুধৈব ডাক ছাড়িতেছে। জার্ম্মান জাতির আজ আহার্য্য দ্রব্য কিছুই নাই। তাহা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, অবশ্য ইঙ্গ-মার্কিণ বোমা সবই জার্ম্মানীর ধ্বংস করিয়াছে। মার্কিনের বড় বড় সমর-নায়কেরা জাপানকে সায়েস্তা করিবার সময় উগ্র ভাবে বলিয়াছেন, যে জাপানের শিল্প ধ্বংস করিয়া যাও। জাপানকে কৃষিজাত উৎপাদনকারী জাতিতে পরিণত কর। জার্ম্মানী সম্বন্ধে অবশ্য সেই শাস্তির উক্তি ধ্বনিত হয় নাই। তার কারণ জার্ম্মান জাতির শিল্পপ্রতিভা নষ্ট হইলে য়ুরোপীয় সভ্যতার পতন হইবে। কিন্তু এশিয়ার কোন জাতির শিল্পপ্রতিভা নষ্ট হইয়া গেলে তেমন কোন ক্ষতি নাই। আণবিক বোমার মোটামুটি পরীক্ষা কার্য্য অবশ্যই জার্ম্মানীর উপর করা যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই, কথা উঠিতে পারে তখন পর্য্যন্ত অস্ত্রশস্ত্রের কল পুরাপুরি সঠিক ছিল না। আমাদের বক্তব্য হইতেছে, কল সঠিক হইলেও উহা জার্ম্মানির উপর পড়িত না, পড়িত এশিয়ার হতভাগ্য জাতিগুলির উপর। য়ুরোপ ও আমেরিকা যে সৌভাগ্য আজ সঞ্চয় করিয়াছে তাহা এশিয়ার রক্ত শুষিয়াই। তাহা লইয়া আক্ষেপ করিয়া কি হইবে। শুধু বলিয়া লইতে হইবে যে ইংরেজ জাতির গণতন্ত্র পৃথিবীর সেরা। কিন্তু সেরা জিনিষটি জার্ম্মানীতে গিয়া আদৌ বাঁচে নাই। কেননা, মিত্রাই অভিযোগ আসিতেছে, জার্ম্মানীর খাদ্য পরিস্থিতি ভয়াবহ। রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংরেজ অধিকৃত এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করিতেছে না বলিয়া অভিযোগ প্রতিনিয়তই আসিতেছে। যে কাহার সঙ্গে সহযোগিতা করে নাই তাহা লইয়া সবার চাইতে ইংরেজের অভিযোগ বেশী। কিন্তু, কেন এই অভিযোগ? ইংরেজ ও আমেরিকার, উভয়েরই জার্ম্মানীর শিল্প-সম্পদের প্রতি লোভ আছে কিন্তু যে লোকগুলি এই অতুল শিল্প-সম্পদ গড়িয়া তুলিয়াছে তাহারা বাঁচিয়া থাকুক চাই না-ই থাকুক তাহাতে আসিয়া যায় না। সুতরাং সাংবাদিকেরা খবর দিতেছেন যে ইংরেজ-অধিকৃত জার্ম্মান এলাকায় খাদ্যপরিস্থিতি দিনে-দিনে চরম অবস্থায় পৌঁছাইতেছে। ইহা বাজালা দেশ নহে, যে দুষ্কৃতে আর মানুষে একই খাদ্য দ্রব্য লইয়া যুদ্ধ করিবে, এবং আর সবাই নিশ্চিন্ত মনে তাই দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখিবে। জার্ম্মান জাতির যদি ঐরূপ কোন যুদ্ধ দেখিতেই হয় তবে তাহারা তাহাদের মতন করিয়া দেখিবে। একথা গণতন্ত্রবাদী ইংরেজ জানে। তাই মিত্র মার্কিণদের ডাকিয়া কহিতেছে, যে ভাবেই হোক, তোমাদের ও আমাদের অধিকৃত জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক সমস্যাটা একই ভক্তাপুরে বসাইয়া বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। আমেরিকা তাহাতে আপত্তি করে নাই; সে করিবার কারণ রাশিয়া। মার্কিণরা ইংরেজদের অষ্টে-পিষ্টে লজাটে বাঁধিয়াছে ও নিজেরাও খানিকটা পরিমাণে বাঁধা পড়িয়াছে, অবশ্য এমন মোটাটাই বাঁধা পড়ায় মার্কিণরা খাবড়ায় না, যদি য়ুরোপের বাজার ঠিক থাকে। কিন্তু এইখানেই রাশিয়া গোল পাকাইয়াছে, কলকাঠির মধ্যে রাশিয়া যে ভাবে হাত পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িয়াছে, ও বাণিজ্য ব্যবস্থার মোড়ল মোড়ল সব সমস্ত ধনকান শক্তিকেন্দ্রের সহিত পাতাইতেছে, তাহাতে মার্কিণদের দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে।

ইংল্যাণ্ডও অবশ্য প্রচুর মন্ত্রিসভা আছে, এবং তাহারা রাশিয়ায় Good Will Mission-ও পাঠাইতেছে কিন্তু তাহাতে খাবড়াইবার কারণ নাই। কেননা ইংল্যাণ্ডের খাদ্য নাই। যদি জার্ম্মানীর খাদ্য সমস্যা মিটাইতে হয় তবে মার্কিণদের ধরজার ধর্ণা না দিয়া উপায় নাই। যে ভাবেই হোক মুরিয়া-ফিরিয়া মার্কিণদের সঙ্গে আঁতাত করিয়া চলিতে হইবে। তাই জার্ম্মানীতে যাহাতে Economic front-এ সেই আঁতাত রক্ষা হয় তার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের মত হইতেছে চেষ্টার প্রয়োজন নাই, উহা ত অনিবার্য্য ঘটিবেই। কাজেই অসতবাণীর উহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথা হইতেছে যে, এত গাহার করিয়া যে রাশিয়ার আক্রমণ অসতবাণীর সম্বন্ধে দিন দিন চলিতেছে, সে রাশিয়াই কিনা শেষে টেঁসে যাবিনু। অর্থাৎ জার্ম্মান জাতির উপর রাশিয়ার সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইয়াছে ও

জার্ম্মান জাতির নিকট হইতে আসিয়া সুবাস অর্জ্জন করিতেছে। ৮ই আগষ্ট (১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ) ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন, These men come from the shattered idle flahr, across the line at night and have their imagination fired by tales of a modern land of promise, a land where furnaces never go out and machines are never idle." ইহা অবশ্য বার্ণ ও সেক্টর সাংবাদিকদের কথা।

শান্তিপর্ব্বের বনিয়াদ

ইয়োরোপে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছে তাহাতে মার্কিণেরা তেমন ভাবে জড়াইয়া পড়ে নাই। তাহারা যে কোন প্রকারেই হউক মঃ আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগর (তাহার অন্য নাম টীনকে ঘিরিতে হইবে) লইয়া ব্যস্ত ছিল। গত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ অর্থাৎ বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মার্কিণরা প্রশান্ত-মহাসাগর হইতে মুখ ফিরাইয়া একবার ইয়োরোপের দিকে তাকাইল। মার্কিণবাসীদের যে মন নিরপেক্ষ অথবা নির্লিপ্তির মালিক অভ্যাস, তাহা একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। স্পষ্টই বুঝিয়াছিল যে বিশ্বরাজনীতিতে বৈর্ব্যক্তিক সাধনার দিন চলিয়া গিয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যাহাদের দেখা গিয়াছিল যে জার্ম্মানীর ডুবোজাহাজের আক্রমণে মার্কিণের নিরপেক্ষতানীতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সবাই একযোগে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে জার্ম্মানী বড় খারাপ লোক। কিন্তু যে সমস্ত জাহাজ বোঝাই করিয়া সম্ভারাপকরণ মিত্র-শক্তির সাহায্যের জন্য আসিত, তাহা ডুবাইয়া যদি বাধা দেওয়া না হইত তবে জার্ম্মানী যে কবিন বাঁচিয়াছিল সে ক'দিনও বাঁচিত কিনা সন্দেহ। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিছক আত্মরক্ষার দায়েই মার্কিণের জাহাজ জার্ম্মানী আক্রমণ করিয়াছিল। যাই হোক, বিশ্বরাজনীতিতে বৈর্ব্যক্তিক সাধনাবাদী মার্কিণদের সাধনা ত্যজিতে হইল। তাহারা যুদ্ধ শেষ করিতেই যুদ্ধে নামিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে প্রেসিডেন্ট উইলসন সাহেব শান্তিপর্ব্বে যে সব উদার নীতি লইয়া গবেষণা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যতঃ ঘটিয়া ওঠে নাই। লয়েড জর্জ্জ ও ক্লিমেন্‌স্‌ দুই দুরন্ত মিলিয়া উইলসন সাহেবের সব উদারনীতি ব্যর্থ করিয়া দিল। মার্কিণরা প্রেসিডেন্ট উইলসনের জাতিসঙ্ঘের পরিকল্পনা মানিয়া লয় নাই। অর্থাৎ তাহারা জাতি সঙ্ঘের নৈতিক দায়িত্ব, ও প্রত্যক্ষ যোগা-যোগ উভয়ই এড়াইয়া গিয়াছে। প্রেসিডেন্ট উইলসন তাহার ঘাবস-পুত্র জাতিসঙ্ঘকে লইয়া ফাঁপরে পড়িলেন। শেষে ইঙ্গফরাসী কূট-নীতিতে দীক্ষিত হইয়া জাতিসঙ্ঘ রাজনৈতিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা করিল। প্রেসিডেন্ট উইলসন, ক্ষুদ্র জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লইয়া যে পরিমাণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা সবই ভেস্তে গেল, ইহা মার্কিণেরা চোখের সামনেই দেখিয়াছে, তারপর ক্ষতিপূরণের টাকাগুলি সব ঘরে আসে নাই। ফ্রান্স রুরেটোরিয়ার জমিয়া যাহা চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহাতে কি ফল হইয়াছে বলা মুস্কিল। তবে মার্কিণরা বিশ্বব্যাপী যে বাণিজ্যিক ঘাটতির স্রোত বহিয়াছিল তাহার 'তোড়ায়' তাহারাও জড়াইয়া পড়িয়াছিল ইহা দেখা গিয়াছে। ইহা বলা যাইতে পারে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিণরা যাবার নাই। কিন্তু তাহারা ইতালী বিতেও করুণ করে নাই। রুজভেল্টসাহেব গণতন্ত্রবাদী, একথা তারস্বরে জগতবাসীকে জানাইবার এত প্রয়োজন কি ছিল? গণতন্ত্রের জোয়ার লইয়া তিনিও আর কোন বেশে যাত্রা করেন নাই। অন্য ঢাকে দিয়াইয়া—আমি বড় ভাল লোক—তাহা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি যে খুব ভাল লোক তাহাতে তাঁহার প্যান-আমেরিকান আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিই প্রমাণ করিতেছে। গোটা আমেরিকার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উপর অসীম প্রভুত্ব বজায় রাখিবার যে সব কিকির বাহির ও বিপদত্রাণ সঙ্ঘের দরকার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে মনে হয় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মাথে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসলে যে ইহা গোল বস্তুর একদিক তাহা পরে খুলা গিয়াছিল। হিটলার যুরোপে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে মার্কিণ প্রেসিডেন্টের বিচলিত হইবার কারণ কি থাকে? কিন্তু যে ভাবেই হোক বাণিজ্যব্যাপারে 'ক্যাশ-কেরি' নীতি প্রথমে মার্কিণরা অনুসরণ করিয়াছিল। তারপর যুদ্ধে যোগদান হইতে সুরু করিয়া লিজ-এণ্ড-লেজ বিল পর্য্যন্ত পাশ করিয়াছে। জুলে জাপানের বিরুদ্ধে না হয় অভিযোগ আছে—কেননা সে পার্লহারবার অতর্কিতে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু জাপানের প্রতিনিধি যে মার্কিণদের ঘরগার ধর্ম্ম বিরাও দর্শন পায় সৃষ্টি অথবা ঐরূপ আরও বিচিত্র অভ্যাস আছে—যেমন হাউই ও ক্যালিফোর্নিয়া হইতে জাপানী বিতরণ ইত্যাদি ইত্যাদি তাহা হয়টার ও এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা প্রভৃতি সংবাদপ্রতিষ্ঠানের প্রচারের ফলে আর চাপা পড়িয়াছে। জাপান সম্বন্ধে কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু জার্ম্মানী? মার্কিণদের বিশ্ব রাজনীতিতে নির্ব্বিকারবাবু প্রেসিডেন্ট ম্যাকিন্‌লে সাহেব ভঙ্গ করিয়াছেন; আজ প্রায় সাতচল্লিশ বছর পরে এক নব্য নীতি যুরোপে মার্কিণদের মারফৎ জড়াইয়া পড়িতেছে। বিশ্বরাজনীতিতে কবেকি ব্যবসাবার ইংরেজ বহুদিন হইতেই যুরোপীয় সন্ধি বা শান্তিসম্মেলনে যোগদান করিয়াছে তাহার আগমন বা নিষ্ক্রমণ কিছুই আকস্মিক নহে। মার্কিণেরা এতদিন পরে প্রেসিডেন্ট উইলসনের মন বুঝিয়াছে, নীতি তাঁহার পাইয়াছে। তাই আজ শান্তিসম্মেলনের দরটাই ঘুড়িয়া বসিয়াছে। দল ভাগাভাগি যাহা হইয়াছে তাহা বেশ স্পষ্ট, একদিকে যেমন ইঙ্গ-মার্কিণ ঐতিহ্য দানা বাধিয়াছে, সোভিয়েট তেমন নিজেকে ঘিরা তাহার ভয় শিষ্য খাড়া করাইয়াছে। এখন কথা হইতেছে ফরাসীকে লইয়া, গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূর্য্যে ফরাসী মধ্য-যুরোপে ছোট ছোট রাষ্ট্র লইয়া যে আঁতাত গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়াছে, শুধু ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া নয়, গড়িবার অতীত তাহা হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিণ দলে ভিড়িবার পক্ষে ফরাসীর বড় বাধা হইল রাইন। এই রাইন লইয়া ফরাসীর সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণ মনকষাকষি চলিতেছে ও চলিবে। ফরাসীতে প্রগতিমূলক চিন্তাধারার ঠাঁই পাইয়াছে। তাহার সমাজতন্ত্রীরা বা কম্যুনিষ্টরা তাহাদের নীতির সারবত্তা বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছে, ইহার পর যদি এমন নীতি ফরাসী গ্রহণ করে যাতে যুদ্ধ ও যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলাইতে হয় তবে ফরাসী জনগণ কি ভাবে দাড়া দিবে তাহা বলা মুস্কিল। সন্ধিসর্ত্তে

ইতালীকে যে ভাবে বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে তাহা লইয়া ইতালীতে রীতিমত আন্দোলন সুরু হইয়াছে। ফরাসী যদি ইতালী ও আর চারটি রাজ্যের ভাসসঙ্গত দাবী লইয়া দাঁড়ায় তবে সে তাহার দুর্গ মেরুদৃঢ় ভিত্তির পাইবে। লোকার্নোতে তাহার বিশিষ্ট মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া সব দফারফা মেটাতে সুরু করিয়াছে। তাহাতে কাহারো সুবিধা হইয়াছে, কাহারো অসুবিধা হইয়াছে, কাজেই নীতিগত পার্থক্যটা এখানে ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে। সেই রকম একটা বিশেষ নীতিকে কেন্দ্র করিয়া যদি ফরাসীর বৈদেশিক নীতি গড়িয়া উঠে তবে ফরাসী নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে নতুবা তাহাকে ইঙ্গ-মার্কিণ নীতি বাহক হইয়া দুঃখালে থাকিতে হইবে। তাছাড়া ইঙ্গ-মার্কিণ এতাবিত শান্তির রূপ যে কি হইবে তাহা কেহই সঠিক বলিতে পারে না। কেননা ফ্রোয়াইট হাউস, ডাউনিং ষ্ট্রীট কি ভাবিতেছে তাহা শান্তি সম্মেলনের অধিকাংশই জানে না, আসল শান্তির সর্ত লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে রচিত হইতেছে।

সিদ্ধৈকবীরো মঞ্জুশ্রী—বিক্রমপুর

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমরা এখানে যে সিদ্ধৈকবীরো মঞ্জুশ্রীর ছবি দিতেছি, এই মূর্তিটি আমি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে বিক্রমী গ্রামের পূর্বপ্রান্ত-সীমায় একটি ঘটকুন্তলে একান্ত অবহেলায় মাটিতে পড়িয়া আছে দেখিতে পাইয়াছিলাম। তৎকালে ১৩১৭ সালে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল চন্দ মহাশয়ের সাহায্যে উহার আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম। অনেকদিনের কথা, এই মূর্তিটির কথা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। আমার নিকট যে ফটোগ্রাফখানি ছিল এবং নেগেটিভ্‌খানি ছিল তাহারও সন্ধান মিলিল না। কথা-প্রসঙ্গে নগেন্দ্রবাবু একদিন আমাকে বলিলেন যে তাঁহার গ্রামে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত হলধিয়া দুর্গা-পূজাকালের ঐ মূর্তির একখানি ফোটোগ্রাফ আছে; সেই ফটোগ্রাফখানি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়া দেখিলাম যে উহা হইতে ব্লক প্রস্তুত করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু তরুণ চিত্রশিল্পী শ্রীমান মৃদুল মজুমদারের সাহায্যে তাহা সম্ভব হইয়াছে। মৃদুলবাবু বিবর্ণ ও বিলুপ্ত-প্রায় আলোকচিত্রখানা হইতে মূর্তিটির স্বরূপ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে রেখাঙ্কন দ্বারা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এখানে মঞ্জুশ্রীদেবের যে চিত্র প্রকাশ করিলাম, তাহা মৃদুলবাবুর শিল্প নৈপুণ্যগুণে, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

আমরা এইবার মঞ্জুশ্রীদেবের পরিচয় দিতেছি। একান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক বৎসর হইল মূর্তিখানি অপহৃত হইয়াছে, জানি না কোথায় আছে!

মহাযানী বৌদ্ধদের নিকট মঞ্জুশ্রীদেব বিশিষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তির আসন পাইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ইঁহাকে একজন যক্ষীয় বোধিসত্ত্বরূপে অর্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট মঞ্জুশ্রীদেব জ্ঞান প্রতি-মূর্তি, বুদ্ধি বিজ্ঞান এবং বাগ্মিতার প্রতীক্; এক সময়ে মহাযানমতাবলম্বীদের মধ্যে মঞ্জুশ্রীদেবের পূজার প্রচলন ছিল অত্যন্ত অধিক—তাঁহারা নানা মন্ত্র, নানা বিধির জপে ও ধ্যানে এই দেবতার অর্চনা করিতেন। মহাযান হীনযানানুযায়ী মঞ্জুশ্রীদেবের পূজা করিতে যাঁহারা অক্ষম, তাঁহারা যদি শুধু মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা মঞ্জুশ্রীর ধ্যান করেন তাহা হইলেও সুফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন—এ বিশ্বাস সেকালে ছিল। কবে কোন্ সময়ে বৌদ্ধ দেবদেবীগণের মধ্যে মঞ্জুশ্রী আসিয়া আবির্ভূত হইলেন তাহার

মঞ্জুশ্রী

সঠিক কালনির্ণয় করা সুকঠিন। গান্ধার এবং মথুরায় মূর্তি শিল্পে ইহার সন্ধান মিলে না। অশ্বঘোষ, নাগার্জুন এবং আর্যদেব তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থ মধ্যে মঞ্জুশ্রীর নামোল্লেখ করেন নাই। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' বা 'অমিতায়ুর্জ্ঞানসূত্রে' সর্বপ্রথম মঞ্জুশ্রীদেবের নাম উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি ৩৫০-৪১৭ খৃঃ অঃ মধ্যবর্তীকালে চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহার পরবর্তীকাল হইতেই বৌদ্ধদের লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে এবং ফাহিয়ান্, ইউ-য়ান-চাং, ইৎসিঙ্গ প্রভৃতি চৈনিক পর্যটকদের ভ্রমণ বিবরণীতে মঞ্জুশ্রীদেবের উল্লেখ দেখিতে পাই। সারনাথ, নালন্দ, বজ্রাসন ও নেপালে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও মঞ্জুশ্রী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। 'অবলোকিতেশ্বর' মূর্তির বহু পরে মঞ্জুশ্রী মূর্তি মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের মধ্যে পূজার আসনখানি লাভ করিয়াছেন। অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, আর্যদেব, আনন্দ প্রভৃতি মনীষীরা যেমন ঐতিহাসিক পরিব্রাজকদের সমকালে বোধিসত্ত্বরূপে পূজিত হইয়াছেন, তেমনি মঞ্জুশ্রীও ছিলেন একজন মহামানব, পরে নিজ সাধনাবলে দেবতারূপে অর্চিত হইতেছেন এবং "বোধিসত্ত্ব" আখ্যা পাইয়াছেন। মঞ্জুশ্রীদেব ছিলেন একজন বিখ্যাত স্থপতিশিল্পী এবং পূর্তবিদ্যাবিশারদ। কি ভাবে কোন্ সময়ে তিনি চীন হইতে নেপালে আসিয়া, সে দেশের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি করিলেন তাহা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়, সম্ভবতঃ তাহা হইবে চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি। চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে এসিয়া মহাদেশের সর্বত্র যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ও মহাযান পন্থীদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল—সেখানেই মঞ্জুশ্রীদেব আপনার আসনখানি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন। আমাদের এখন স্মরণ রাখিতে হইবে যে মঞ্জুশ্রীদেবের পরিকল্পনা ভারতবর্ষের নিজস্ব—অন্য কোন দেশের কোন দেবতার আদর্শানুকরণে তাঁহার মূর্তি পরিকল্পিত নহে। নেপালের বহু ক্ষেত্রে বর্ণানুক্রমিক বহু পুরাণে মঞ্জুশ্রীদেবের মাহাত্ম্যসূচক বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

'সাধনমালাতে মঞ্জুশ্রীদেবের চল্লিশটি ধ্যান এবং প্রায় চৌদ্দ প্রকারের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা আছে। মূর্তির বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতি অনুরূপ, ধ্যানও বিভিন্ন রূপ। তাঁহার নামও অনেক, যেমন—বাগীশ্বর, মঞ্জুঘর, মঞ্জুঘোষ, অর্পচন, সিংহকর্ণীর, বাক্, মঞ্জুদুন্দার, যন্ত্রাবেলন, নামসঙ্গীত, ধর্মধাতু-বাগীশ্বর, দ্বিরচক্র, মঞ্জুনাথ ও মঞ্জুবজ্র। সাধারণতঃ মঞ্জুশ্রীর একহস্তে তরবারি এবং অপর হস্তে পুঁথিযুক্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। সিংহকর্ণীরা মঞ্জুশ্রী মূর্তির ধ্যান এইরূপ:

"সিংহকর্ণীরো ভগবান্ চন্দ্রসমপ্রভঃ চন্দ্রোপরিস্থো ভগবান্ খড়্গখোতকরাঢ্যো দ্বিভুজ একমুখঃ শুক্লঃ খড়্গপর্যাঙ্কিনিষণ্ণালঙ্কারভূষিতঃ পঞ্চ-বীরক-শেখরঃ.....বামে নীলোৎপলধরয়ানঃ দক্ষিণে বরদঃ.....তস্যতো ভগবতো বোধনা অস্মোভাঃ দেবতায়াঃ.....পূজাঃ কুর্যাৎ।...সাধনমালা A. 74. N, 56. C. 57.

সিংহকর্ণীরা মঞ্জুশ্রী এক মুখ, দ্বিভুজ, বর্ণ শুক্ল, খড়্গপর্যাঙ্ক আসনে বিকশিতপদ্মোপরি উপবিষ্ট—দিব্যালঙ্কার ভূষিত, পঞ্চ বীরক শেখরঃ অর্থাৎ জটামুকুটশোভিত শিরোপরি—যথাক্রমে বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য বিরাজিত আছেন। মঞ্জুশ্রী দেবের বাম হস্ত দ্বারা নীলোৎপল ধৃত, দক্ষিণ হস্ত বরদ মুদ্রা শোভিত। সিংহকর্ণীরা মঞ্জুশ্রীর উভয় পার্শ্বে সূর্যপ্রভা এবং উপকেশিনী—ইঁহাদের বাম হস্ত দ্বারা পদ্ম ধৃত এবং দক্ষিণ হস্ত বরদ মুদ্রা, কেশিনী এবং উপকেশিনী দুই পার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন। ইঁহারা দুই জনেও চন্দ্রপ্রভা ও সূর্যপ্রভার ন্যায় পতি মঞ্জুশ্রীদেবের সমতুল্যা শক্তির অধিকারিণী।

সিংহকর্ণীরা মঞ্জুশ্রীর সহিত দ্বিভুজ লোকেশ্বর বা লোকনাথের প্রভেদ অতি অল্প, সে জন্য বিশেষ বা বৈষম্য লক্ষ্য করা সুকঠিন হইয়া পড়ে—কেবল ইঁহাদের আসন, আকৃতি, শীর্ষোপরি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ, পদ্ম ধৃত হস্ত ও বাম মুদ্রা সকলই এক প্রকারের। এই জন্য সাধারণতঃ এই শ্রেণীর মূর্তি লোকনাথ বা লোকেশ্বর নামেই আখ্যাত হইয়া থাকেন।

বিক্রমপুরের নানা পল্লী হইতে দ্বিভুজ লোকনাথ, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি বহু মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের বিবরণ ও পরিচয় পূর্বেও প্রকাশ করিয়াছি।

বিক্রমী এবং তন্নিম্নবর্তী পল্লী ভাকটইতোষ প্রভৃতি স্থানে যে সকল মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল তাহা এখন ঘাসলার নানা ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হওয়ায় ফলে, সকলের সন্ধানও মিলিতেছে না। বিক্রমী গ্রামের সিংহকর্ণীরা মঞ্জুশ্রী বা লোকনাথ মূর্তিখানিও এইভাবে অন্যত্র হওয়ায় ফলে বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইয়াছে।*

* এই প্রবন্ধ লিখিতে আমি শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত The Indian Buddhist Iconography নামক গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

আগমনী

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

এস শাশ্বতী। চির-শান্তিপ্রতিমা অতীতের চিরন্তনী
এস বাঞ্ছা দেবতা অনন্তযাত্রী ধরণীর প্রাণস্পন্দা।
আজি অবশেষে মহে লক্ষযামের দীর্ঘ-বিফল রজনী,
আজি মৃত্যু-করুণ ক্রন্দনভরে ধরা-বিপুলা ধরণী।

এস দুর্দম-শত দুঃখ বিপদে আশ্রিতজন-শরণা
এস সিক্তিত প্রেমভক্তি-কুসুমচন্দনে চিরবরণা।
এস শান্তিরূপিণী-'সাধনা' নহে—সর্বনাশিনী 'শক্তি'
এস দৈত্যদানব পাপব-পঙ্ক, বিশ্ববিপদ-মুক্তি!

অর্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

রেখা—শ্রীরঞ্জন ভট্ট

৩

কিন্তু প্রদ্যুম্নর আমার সে রকম ছেলেই নয়। কোন রকম বেলেল্লা বেচাল্লাপনার মধ্যে সে নেই। এই ত গত অঘ্রাণে তার বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে কই সে ত পর হয়ে যায় নি একটুও। ভাঁড়ার ঘরে আনাজ কোটার সময় পান চাইবার দরকার হলে মার কাছেই এসে চায়। কলেজের শেষ পাশটা এবার দেবে, কিন্তু সন্ধ্যে হতেই বাড়ী ফিরে এসে সোজা একবারে ভেতর বাড়ীতে চলে আসে। মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করে খবরাখবর নিয়ে তবে পড়তে বসে, এমন চাঁদের টুকরো ছেলে। আর হবে নাই বা কেন? কেমন চাঁদের মত মেয়ে বৌ এনেছি আমাদের ঘরে।

হাঁ, তা চাঁদের মত বটে। চাঁদের মতই মনে হয় হিম শীতল, কিন্তু জানিয়ে রেখেছে প্রদ্যুম্নর মনকে। চাঁদের মতই অনুভূতিহীন কিন্তু অজস্র অনুভব জাগিয়ে দিয়েছে। চাঁদের মতই পৃথিবীর কাছে জড়পিণ্ড মাত্র, যদিও তার স্নিগ্ধ আবেশময় সুষমামণ্ডিত উপস্থিতি বাড়ীর আত্মীয়স্বজনে কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের অতীত ক্ষেত্রে বিরল দুর্লভ অনুভূতির মুহূর্ত্তগুলিকে জ্যোৎস্নার আলোয় ভরে তুলে, কিন্তু অসুবিধাও বহু। এত বড় বাড়ী, এত কুটুম্বপরিজন। তাদের এড়িয়ে বা উপেক্ষা করে সংসারের আর একজনকে দেখতেও যে ছাই সহজে পাওয়া যায় না এ বাড়ীতে। আর সুরধুনীও তেমনি। কেবল মার চারদিকে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। ভাঁড়ার ঘরের আনাজের আনাচে কানাচেই তাকে পাওয়া যাবে; তাও পান চাইতে নিজেই যদি না ঢুকে আসি ভিতর বাড়ীতে, সুরোর আবার লজ্জা হয়। তার চকল চলমান চরণ দুখানি মাটীর উপর মায়া ছড়াতে ছড়াতে সরে যায়। কবি ঠিকই বলেছেন—

"যাহা পদ্ম অরুণ চরণে চলি যাত
তাহা তাহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।"

কিন্তু এই নূতন কনে, এই মায়াবিনী মানবীটী কেমন করে বুঝে ফেলে যে তারই উদ্দেশে আসছে আর একজন; পানটা অভিনয় মাত্র, প্রাণটা অভিমুখে আসছে তারই।

কি লজ্জার কথা। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের লজ্জা নেই, সময় অসময় নেই। বাড়ী শুদ্ধ সবাই না জানি কত হাসে মনে মনে, কত গণিতা করে, আলোচনা করে তার ঠিক নেই। এই সে দিন বিয়ে হল, আর খালি রাত দিন কাছে আসতে চায়। কিছু কথা কওয়া, কিছু পিছু নেওয়া, কিছু পুলকের ছোঁয়া—এ ছাড়া আর তার কিছুতেই চলে না। সেই জন্যই ত মুস্কিল। না হলে ওকে ত খুবই ভাল লাগে। কত ভালবাসে, কত আদর করে; কত কথা কত কবিতা বলে—তার সবটা বোঝাও যায় না। এত কবিতা যদি, সংস্কৃত শোলোক বলে, ইংরিজি পদ্য বলে—সব বুঝতে পারলে কত মজাই না হোত। মহাকালী পাঠশালাতে এত বেশী শেখায় নি যে কলেজের পাশের কথা সব বুঝতে পারব। কিন্তু যদি শেখাত, তাহলে কেমন ভাল হত। অবশ্য না বুঝলেও শুধু শুনেও সুখ আছে। মুস্কিল এই যে বাড়ী ফিরে যখন যাই সে সব কথা সইয়ের কাছে তেমন গুছিয়ে বলতে পারি না। এই যা দুঃখ। তা তাদের যে এমন সব কথাই খুলে বলতে হবে তেমন কোন বাধ্য-বাধকতাও নেই ত আর।

কিন্তু যাই বল, বড় সাংঘাতিক লোক হচ্ছে সে। কিছুতেই ঠেকান যায় না। বলে কিনা সংস্কৃত কবিরা মুখকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করে বড় সেকেলে কাজ করেছেন। আজকালকার কবিরা মুখকে বইয়ের সঙ্গে তুলনা করেছে না কি। এই বলে জার্মাণীর কি একটা কবিতা আওড়ালে। নামটাও যেন কি রকম—'হাইনে'।

বেচারা নাকি সারা জীবন শুধু হায় হায় করে কাটিয়েছে ভাগবেসে। কিন্তু এখন অনুক্ষণে কবির কবিতাই বা তুমি কেন বসে বসে খাতার পাতা ভরিয়ে লিখেছিলে? সে-ই কবির একটা কবিতা আবার প্রায়ই আওড়ায়। সে দিন সে জন্তই ত বললে, "এল আজ আর ছাপার বই পড়তে ভাল লাগছে না, অন্ত কিছু পড়া যাক্।" সে আবার কি? বই ছাড়া লোকে আর কি পড়ে? শুনে হেসে একটু কাছে এসে বললে, "কেন? তোমার মুখখানি।" আমিই বা হেরে যাব কেন? বললাম, "তাহলে আর পাশ করেছ; যা বিদ্যে হবে বোঝাই যাচ্ছে।" সে বললে, "এত বিদ্যা হবে যে পণ্ডিতরা যেন আমার সঙ্গে পারবে না।" কি রকম? সেটা কি রকম বিদ্যা? অমনি "হাইনে" বেরিয়ে এল।

"সুদূর আকাশে নিচল হয়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে তারা,
শতেক বছর করে চাওয়াচায়ি হতাশ প্রণয়ে হারা;
কি জানি কি ভাবে মধুর মহান্ কহিছে তাহারা কথা
বড় বড় যত পণ্ডিতজনা বুঝিল না তার ব্যথা—
বুঝেছি আমি, প্রতিটী আখর এ হিয়ে গিয়েছে গাঁথি'
পড়েছি আমার পিয়ার দু'খানি করিয়া যে পাতি পাতি।"

এরা দেখছি সবাই এক ভাষায় কথা কয়। আমার বিনু সইয়ের বরও ঠিক এই রকম ধরণের কথা বলেছিল। এক কথাই কি সবাই এরা মুখস্থ করে রেখেছে না কি? না, বিয়ে হলে সবারই মাথায় সরস্বতী চাপে বইয়ের পাতা ছেড়ে? আমি ত কিন্তু—যাই বল—পারতাম না অন্তের ধার করা কথায় নিজের মনের কথা বলতে। আমার লজ্জা দেখে ভণিতা করে বললে, "অয়ি বিম্বাধরোষ্ঠে, আমি জানু পেতে সবিনয়ে ওই রক্তাধরে একটা চুম্বন মুদ্রণ করবার অনুমতি প্রার্থনা করছি।" বিনু কিন্তু এর উত্তরে চমৎকার বলেছিল। বলেছিল সে—"তা, তা তুমি মুদ্রণ করতে পার; কিন্তু দেখো, যেন প্রকাশন করো না।"

আমারও ইচ্ছা হচ্ছিল ওই রকম উত্তর দিতে। তা বলা কি আর হল ছাই? চুপ করে অপ্রস্তুত হয়ে আছি দেখে বলল, বিম্বাধরের অমৃত দিতে কার্পণ্য যদি করো ক্ষতি নেই, হলা পিয়সহি, কমুকণ্ঠের হলাহল পিয়েই আমি নীলকণ্ঠ হয়ে থাকতে রাজী আছে। অতএব এই আমি তোমার কণ্ঠে নিলাম।

কেবল রবি ঠাকুরের কথাই কিছু কিছু বোঝা যায়। তা ও সব না। সেদিন কিনা বলল,

"বধূরে যেদিন পাব
ডাকিব মহুয়া নাম ধরে"

আমার এত লজ্জা হচ্ছিল, আবার ভালও লাগছিল শুনতে। তাই একটু আশাবার জন্ত চোখ পুরিয়ে মুখ ফিরিয়ে কণ্ঠস্বরে রাগ ছড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি কি মহুয়া ফুল, না মহুয়া মদ? না আমি মানুষ নই এই ঠিক করেছ?" তা-ও কি পার পাবার উপায় আছে? একেবারে সেই কথাসরিৎসাগর। চট করে জবাব দিলে, "অর্দ্ধেক মানবী তুমি।"

৪

সত্যই সে অর্দ্ধেক মানবী। সারাটা দীর্ঘ দিনের দুঃসহ ব্যবধানের পর ক্ষণস্থায়ী রাত্রির নিভৃত প্রণয় গুঞ্জনের সব কওয়া-কথা ও না-কওয়া ব্যথা ছাপিয়ে এই একটা বর্ণনা নানা ব্যঞ্জনায় বর্ণসুষমায় প্রদ্যুম্নর মনের আকাশকে রাঙিয়ে রেখেছে। কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। অবশ্য বড়লোকের ছেলে ও এই বংশের ছেলে বলে বয়স একটু বেশীই হয়ত হয়েছে। তবু তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেহই এখনি বিয়ের কথা ভাবতেও পারে না। সে বড় সেকেলে ব্যাপার; একালে তাকে স্বীকার করে নিতে হবে প্রায় সকলকেই। কিন্তু এখন সামনে রয়েছে বিস্তীর্ণ কল্পনা ও স্বপ্ন রচনা করবার সময়। এমনি কি কেহ উদ্বাহবন্ধনে বাঁধা পড়তে চায়—উদ্বাহ হয়ে জীবন যখন যৌবনকে আহ্বান করছে বিচিত্র বিকাশ ও বহুধা অভিজ্ঞতার জন্ত? বন্ধুরা তাই প্রদ্যুম্নর এই উদ্বন্ধনের ব্যাপার আলোচনা করবার জন্ত আহ্বান করল এক জরুরী ক্যাবিনেট মিটিং।

প্রস্তাবিত বিবাহ সংবাদ। এর চেয়ে বেশী উত্তেজনামূলক ঘটনা মিত্রমণ্ডলের মন্ত্রণা সভার আগে কোন দিন আলোচিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ, এক বাংলার অধ্যাপকের ক্লাশে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' পাঠের সময় হা হতাশ ও বুক চাপড়ান উচিত হবে কিনা সে বিষয়ে বাদানুবাদ ছাড়া। কলেজের বাইরে মাঠের কোণার গাছের ছায়ায় এই মিত্রমণ্ডলের বিশেষ অধিবেশনগুলি যখন তখন আহ্বান করা হয়। যখন কোন জরুরী কাজ থাকে না, তখন অকাজকেও

কার্য্যসূচীভুক্ত করতে এদের আপত্তি হয় না, বিশেষ করে অধ্যাপকের যদি পাঠ গ্রহণ বা নিদ্রাসাধনের দিকে কোন পক্ষপাত থাকে। ও দুটোই এদের মন্ত্রণাসভায় যাবার প্রয়োজন বোধ লাগিয়ে দেয়। আর আজ ত বিশেষ কারণই ঘটেছে।

শুনে ঘুষি পাকিয়ে সমাদ্দার বলল, "দেখ্, দেশোদ্ধারের উদ্দেশ্য নিয়ে সুযোগ পেলেই সাহেব পেটাবার যে সাধনা আমরা করব বলে ঠিক করে রেখেছি, তা থেকে একজন সভ্যও কমে গেলে আমরা দুর্ব্বল হয়ে যাব। তোকে আর ক্যালকাটা মোহনবাগানের খেলায় গোরার নাকের সামনে হাততালি দেবার সময় খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটা বালিকা উদ্ধার করে এমন কিছু বীরত্ব তোর হবে না। এতদিন ধরে শেখাচ্ছি সকালে যোগাভ্যাস আর বিকালে জিমনাসিয়াম কর্, তা ত করলিই না; এখন যাচ্ছিস বিয়ে করতে। তা কর্, ভালই। আশা করি, প্রেমাভ্যাসের প্রাণায়ামটা ভাল করেই করবি।"

রাজীবের রাস্তা রাজনীতি। সেও একই সুরে গাইল। তবে বলল যে তাকে কোন দিনই জোয়ানের দলে পাওয়া যাবে না তা সে আগে থাকতেই জানত। কারণ যত উপনেতা হনুনেতা এদের জনসভায় জোয়ালে বেঁধে বেঁকি সাধিয়ে, তাদের চেয়ারে চড়িয়ে বেড়ানতে তাকে কখনো রাজীব রাজী করাতে পারে নি। তাই একটু থেমে আবার বলল, "থাক্, ভালই হয়েছে। তোকে ত আমরা ভাল করেই চিনি। গেলবার যখন ভীষণ শীত সুরু হল তুই শুধু একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আসতিস। তখন জিজ্ঞেস করলাম তোর ঠাণ্ডা লাগছে কি না—তুই বলিস যে যখনি মনে হয় ঠাণ্ডা লাগছে অমনি সামনের টেষ্টের কথা ভাবি আর সর্ব্বাঙ্গে ঘাম করতে আরম্ভ করে। তা ভালই হল; এখন আর বোধ হয় শার্টেরও দরকার হবে না। হার্ট এমনিতেই গরম থাকবে। হ্যাঁ, তবে বেশী গরমে যেন ভর্জ্জিত না হও বাবা, সেটুকু বলে রাখি।" রহস্যের ইঙ্গিত পেয়ে সবাই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করে উঠল, "সে কি রকম? সে কি রকম?" রাজীব বলল, "বিশেষ কিছু নয়, এই এখন ভার্য্যা অর্জ্জন করে ভর্জ্জিত হবেন, আবার তিনি বাপের বাড়ী ফিরে গেলেই ভার্য্যা দ্বারা বর্জ্জিত হয়ে ভর্জ্জিত হবেন। মোট কথা, প্রদ্যুম্নর কপাল পুড়ল।"

কেশব সব ছেড়ে পরের ভার লাঘব করবার ভার নিয়েছে এবং সেজন্য সবে একটী বিপদ্-বান্ধব সমিতি খুলেছে। প্রদ্যুম্নের কাছ থেকে একটা মোটা অঙ্কের চাঁদা চাইতে পারে নি নেহাৎ নিজের বন্ধু বলেই। শত্রুরা অবশ্য ওর সমিতি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে। বলে যে ওটা শুধু তৎপুরুষ সমাস নয়, বহুব্রীহিও বটে। বিপদে যে ওরা বান্ধব তা ঠিক নয়, বরং বিপদ্ই ওর এবং ওর বান্ধবদের বান্ধব; খেলাটা সিনেমাটা চাঁদার পয়সায় তোফা চলে যায়। কিন্তু আমরা জানি সেটা ঠিক কথা নয়। এটা হচ্ছে সেই বয়স—একমাত্র যে বয়সে বাঙ্গালী স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে, সংসারের সঙ্গে স্বর্গের সন্ধি স্থাপন করবার প্রয়াস পায়। কেশব এতক্ষণ মাটীর সঙ্গে পিঠের সন্ধি রক্ষা করে শুয়েছিল্। হঠাৎ সে যুদ্ধ ঘোষণা করে উঠে বসল। "বিয়ে তোকে করতেই হবে প্রদ্যুম্ন। আমার বিপদ্ বান্ধব সমিতি সবান্ধবে তোর বিপদে মাসকৌচা মেরে পরিবেশন থেকে আরম্ভ করে বাসর ঘরের শত্রু-ব্যূহ ভেদ ক'রে উত্তরা উদ্ধার করে আনা পর্য্যন্ত সব কিছুই করবে। জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেল একটী কোমল হস্তের স্পর্শ না পেয়ে। 'এতটুকু ছোঁয়া লাগে, এতটুকু কথা শুনি'। আরে বাবা, ওই এতটুকু ছোঁয়াই লাগুক আমাদের যে কারো একজনের কপালে, তারপর আমরা কত কথাই শুনব।" উত্তেজনায় ভাবাবেগে ও বিপদ্ বান্ধবদের বন্ধুর শীঘ্র স্ত্রীসম্পদ্ লাভের সম্ভাবনায় তার যুদ্ধ ঘোষণাটা শান্তি স্থাপনেরই সামিল হয়ে দাঁড়াল।

বাঙ্গালীর বার্থরাইট

এবার সবাই নীহারিকাকে ছেঁকে ধরল। সে কেন একা চুপ করে থাকবে? সে হচ্ছে এই বিক্রমাদিত্যহীন নবরত্ন সভার আধুনিক কবি সমন্ত। কবি হওয়া বাঙ্গালীর বার্থরাইট অর্থাৎ জন্মসত্ব। নীহারিকা সেই জন্মসত্ব খাটিয়ে চলেছে। তবে লম্বা চুল, খোলা পাঞ্জাবী বা খোলা চাদরের সে পক্ষপাতী নয়। চেনা বামুনের পৈতের মত ছাত কবিরও বেশভূষার দরকার নেই। শার্টের আস্তিনটা গুঁটিয়ে সে যেন কেশবকে এক হাত নেবে এরকম ভাবে বলল, "দেখ, বিয়ে নিয়ে অনেক রসিকতার কথা ইংরিজীতে আছে। ওরা বলে আমার আগে অন্ত অনেক লোকই ত বিয়ে করে রেখেছে, তবে আমি আর করি কেন? কিন্তু আমি বলি যে ভাল, তোমরা সবাই বিয়ে করো। বিয়ে আর বিদ্যা দুই-ই সমান, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে এবং বিয়ে কর বা না কর তোমার জন্মরটা দাতব্য করে খরচার খাতায় লিখে রাখ। ও এমনই জিনিষ যে দিলে কমে না; বরং একটী দিলে তখন দুনাকার দুটি হয়ে ফিরে আসে। এই ধর না প্রদ্যুম্ন যদি আজ বিয়ে করে, ওর মন কি আর ওর একার থাকবে? দুটী হয়ে যাবে। আমরা বুঝতেই পারব না কোন্‌টা কখন বাজছে। বৈরাগী বাজায় একতারা আর অনুরাগী সাজায় সেতারের ঝঙ্কার।

ক্রমশঃ

অমৃত

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

দনুজদলনের জন্ম যে বাসুকি আপন জীবন তুচ্ছ করিলেন, তাঁহারই রক্তলাঞ্ছিত বিশাল নাগজাতির জন্যে 'দেবত্বে' এই কলঙ্কটুকু ভিন্ন, আর কিছু মিলিল না। ইন্দ্রের পরম সুহৃৎ নাগরাজ বাসুকি তাই গরল বরণ করিলেন। তখন নীল দনুজকুলের অবাধিপত্য বীপরাজ্য একের পর এক নাগজাতির অধীনে আসিতেছিল, কিন্তু নবপ্রতিষ্ঠিতা কনকবেলা-শিখরের অধরাবতী আদিনাগজাতি সেই সমৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষ্যা গোপন করিতে পারিল না। দনুজকুলের নাগরাজ দেবসখিতা অস্বীকার করিয়া ভাগ্যের ভাবায় মুদ্রাঙ্কণে গমন করিল, তথাপি সেই পাতালরাজ্যের ঐশ্বর্য্যমহিমায় দেবকবি আপন কাব্যোল্লাস সংবৃত করিতে পারেন নাই। তখন হিমালয় রাজ্যের অন্যান্য দু একটী নাগরাজ্য আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিল, কিন্তু সমৃদ্ধশালী প্রতিবেশী দেবরাজ্যের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সমুদ্ররাজ্যের নাগজাতি ভারতের হিমালয় ক্রোড়ে দেব-নাগের এই মৈত্রীতে খুশী হইতে পারে নাই। খুশী হইবেই বা কেমন করিয়া? সেই মৈত্রীর সুযোগ লইয়া, এক নাগজাতির প্রতিষ্ঠার দ্বারা আর এক নাগজাতিরই সর্ব্বনাশ প্রচেষ্টা চলিল, যখন দেবরাজ প্রতিবেশী হিমালয়স্থান নাগজাতি সুবীল সমুদ্রের বিশাল জাতি নাগজাতির সর্ব্বনাশে ও দেবরাজ বিস্তারে দেবজাতির সহায়ক হইল, তখন পাতাল হইতে ব্রহ্মাতল পর্য্যন্ত অসংখ্য 'ফণা' গর্জ্জিয়া উঠিল, তখন আপনাদেরও ভয় বুঝিয়া ভারতের নাগজাতি বাসুকীর প্রতিনিধিত্বে গরল উদ্গার করিল। দেবদানব রাজ্য চঞ্চল করিয়া উঠিল। দেবদানবের সমুদ্র মন্থন বুঝি বা ব্যর্থ হইতে চলিল। শুধু ব্যর্থ নহে, অমরাবতীকে নাগজাতি গ্রাস গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

কোথা ছিলেন ভগবান, নাগজাতিকে প্রণাম করিয়া, নাগফণা আপনি গ্রহণ করিয়া, তাহাদের প্রতি আপনার ও সমস্ত হিমালয় সন্তানের প্রীতি প্রকাশিত করিলেন। ভগবান কণ্ঠে ধরিলেন নাগমালা, নাগজাতিকে প্রীতির বন্ধনে সম্বাধিত করিলেন, তাই অনাবিষ্কৃত সমুদ্র-দেশে দেবদানব রক্ত রক্তসঙ্কর্ষ ও নাগের সম্মিলিত অভিযান আরম্ভ হইল, সেখানে কটমাকারীর চাতুর্য্যে দেব কিম্বা অসুরাস্ত্রের সন্ধই হইল না।

কে মহাকৌতুকজিত্র কাণে কাণে বলিয়া দিল সমুদ্রমন্থনের অমৃত দেবতারা গোপন করিয়াছে। সেই মুহূর্ত্ত হইতে অমৃতের জন্য সন্ধান চলিল। দানব রক্তরক্তসঙ্কর্ষকিত্র ও নাগ সমুদ্রমন্থনের ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়া অমৃতের জন্য সর্ব্বত্র পণ করিল। দেবতারা হাসিলেন, কিন্তু অমৃতের সন্ধান জানাইলেন না।

কোথা অমৃত? কোথা অমৃত ফল? অমরাবতীর গুপ্তাগারপুর লুণ্ঠিত হইল কিন্তু সন্ধান মিলিল না। ইন্দ্রের আশ্রয়ে হইল তথাপি অমৃত মিলিল না। অত্যন্ত অভিমানী এই দেবজাতি, অসুরের তাহাদের অভিযান বিশেষতর হয়, অমৃতের সন্ধান আরও গূঢ় হইয়া উঠে। যেদিন অমরাবতীর প্রভু হইল, যেদিন ইন্দ্রসভার অপ্সরার ভ্রূভঙ্গে ঊর্ব্বশীপুর মুহূর্ত্তায় ইন্দ্রের পরিমায় উদ্ভাসিত হইল, সেদিন দেবরাজ শচীকে আপন সিংহাসনে আপনারই পার্শ্বে বসাইল, সেদিন অখিল স্বর্গ জেনে গেল, ইন্দ্রাণীকেও বিজয়সামগ্রী হিসাবে লভিয়াছি, অমৃতের সন্ধান আর কেউ খুঁজে নহে। দুরেন্দ্রাণীকে একদিন আনিয়া যেদিন ভাগবত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—'অমৃত কোথায়?' উত্তরে ইন্দ্রাণী হাসিয়া শুধু আকাশের দিকে আপন তর্জ্জনী প্রসারিত করিলেন।

বাহুযুগ্ম প্রসারিত করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিলেন, স্বর্গমর্ত্য পাতাল আলোড়িত করিলেন, কিন্তু অমৃত মিলিল না। দেবগণ আবার স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন, আবার অমৃতগর্ব্বে ত্রিজগতের সম্মুখে মহিমান্বিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

মানব যেদিন অমরাবতীর সিংহাসনে বসিল, সেদিন নন্দনকাননে কোথাও শুধু আসে অমৃত ফলিল। কোনও দেবকন্যা সে অমৃতবার্ত্তা জানাইয়া নূতন ইন্দ্রকে সুখী করিল না, এমন কি কোনও দেবজ্যোতি সে সংবাদ গোপনে বহিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল না। ইন্দ্রসভার অধিবেশনে দেববৈতালিক অমৃতমহিমা কীর্ত্তন করিত, প্রাতে, সায়াহ্নে, দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ। সেই অমৃতমহিমা সারা বিশ্বে ছড়াইত, শুধু করিলে বৈতালিক দেখাইয়া দিত সন্ধ্যারাগরঞ্জিত আকাশ।

তাইতো ত্রিভুবনের বিস্ময়, দেবতারা আকাশের মাঝে অমৃত লুকাইল কোথায়? দানবরাক্ষসেরা যুগে যুগে স্বর্গলুণ্ঠন করিয়া স্বর্গের ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া আপন নগরীকে যখন সমৃদ্ধ করিত, তখনও তো দেবকন্যাকে যখন বিলাসে মায়ায় ভুলাইয়া প্রশ্ন করিত—'দেবকন্যা, অমৃত কোথায়? কোন্ পারিজাত বনে?', তখন দেবকন্যা হাসিয়া বলিত—'হিমাচলে'। স্বর্গলক্ষ্মী ত্রিভুবন-বিজয়ী পরিমাণেও দেবকন্যা শ্রদ্ধা করিত না। রাবণরাজা অশোক কাননে স্বর্গ হইতে পারিজাত আনিয়া রোপণ করিলেন, দানবী তাহাতে খুসী হইল, কিন্তু দেবকন্যা বলিল—'এ কি পারিজাত! এ তো কনকত'!' আশ্চর্য্য দেবকন্যার মতি, হিমাচলের পারিজাতবন হইতে ইহার কিসের বৈষম্য কোথায়? হিমাচলের পারিজাত বনে কি অমৃত লুকান আছে? কেমন সে অমৃত?

...অমৃত পান করিয়া দেবতারা অমর হইয়াছিলেন—তাই কি দেবতার উপর চিরকালের এই ঈর্ষা ও দ্বেষ? পুরাণে পাই উক্ত হইয়াছে, অতিমান-হীন অতীত দেবগণ বর্ত্তমান অভিমানী (রাজ্যাধিষ্ঠাতা) দেবগণের সমান হইলেও কল্পিত নামে ও রূপে অতীত বলিয়াই অভিহিত হন। শুধু দেবতারা অমর নাম পাইলেন কেমন করিয়া? স্বর্গের মহিমা যে কোনও দিন মৃত্যু কর্ত্তৃক কলঙ্কিত হয় নাই, অমরাবতী নগরে মৃত্যু যে নিঃশব্দে আসিয়াছে গিয়াছে, কিন্তু কোনও দিন ছায়ার কালিমা রাখিয়া যায় নাই। চিরযৌবন শুধু সে রাজ্যের নন্দন কাননে, চির-যৌবনের বৈতালিকী সে রাজ্যের পাখীর সঙ্গীতে। মৃত্যু যেখানে বার্ত্তা আনে নবযৌবনের, নবীনের গান গাহিয়া যারা চলে যায়, সেখানে সে মৃত্যুগামী চির যৌবন স্রষ্টা, চিরযৌবনের অমৃত। এ শক্তি তাহারা পাইল কোথায়? দেবতা যে অমৃত পান করিয়াছে সে অমৃত নন্দন-কাননের বাতাসে আসিয়া আসে অলক্ষ্যে শুধু দেবতারই জন্য? মানব ও মানবও তো স্বর্গ জয় করিয়াছে, নন্দনবন মন্দার তো তাহাদের জন্য অমৃত ফুরাইল না। তাই দানবরাক্ষসরাজন আপন আপন পরাক্রমে নন্দনকানন নিঃশেষিত করিয়া স্বর্গ চূর্ণ রচনা করিল, কিন্তু চিরকামনা চিরকালের স্বপ্ন অমৃত মিলিল না। দেবতা অমর যা হইয়াও অমর নামে ভূষণ লাভ করিলেন, আর দেবতার সঙ্গী হইল চিরকামনার স্বর্গ।

যে মন্ত্রার পর্ব্বতকে কেন্দ্র করিয়া সমুদ্রমন্থন হইয়াছিল, মন্থনকারীদিগকে সেই মন্ত্রারে কল্পতরু অমৃতের সন্ধানে যাইতে হয়। দেবতারাও যে অমৃতের সন্ধানী এ গোপন সংবাদ ত্রিভুবন জানিত না। দেবতারা অমৃতাহারী এই অপরাধে অমরাবতী মুষ্ঠিত হইল বারে বারে, তথাপি দেবতারা চিরকাল অমৃতাধিকারী সাজিয়া অপরূপ কৌতুক করিয়া চলিলেন। শুধু ত্রিজগতের বিশ্বাস ঐ স্বর্গে কনকমেরুশিখরে কোথাও নিশ্চয়ই লুকানো আছে অমৃত—কোনও গুহায়, কোনও বৃক্ষমূলে, কোনও শিলাতলে। কোনওদিন মর্ত্যবাসী মানব আসিয়া দেবতাকে প্রশ্ন করিল—'অমৃত কোথায়?' দেবতা বলিলেন—'অন্তরে'।

কৈলাসে শিখরে হৈমবতী উমা, যেখানে নন্দা ও অলকানন্দা নিত্য অমরাঙ্গনাদের সহিত লীলা করিতেছে, যেখানে অনন্ত নির্ঝরের ঝরঝরে বিরত মিলিতেছে কিন্নরগান, তাহারই দক্ষিণে দেবসিদ্ধ্য বকুলকুঞ্জ-পুঞ্জে রুদ্রদেবের সাথে অপর্ণা উমার মিলন হইয়াছিল। যেখানে রমণী-রত্ন উমা রুদ্রের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, যেখানে শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত কিরাতবেশে বিহার করিয়াছিলেন, যেখানে রুদ্রদেবের বহুবিধ পুষ্পকানন, যেখানে গিরিগুহাবিহারিনী সুলোচনা কিন্নরী বল্কিণী ও অপ্সরাগণ সুখে বিলাস করে সেখানের উমাবন ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে, অর্দ্ধনারীদের শঙ্কার বিভূতি সেখানে ত্রিকালকে বিস্ময়ে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

শঙ্কর ও পার্ব্বতী অতীত হইয়াছেন। নিখিল যক্ষগন্ধর্ব্বরা মহাকালমন্দিরে তুষারশুভ্র শঙ্করপার্ব্বতীর যৌথ মূর্ত্তিকে সম্মুখে বসাইয়া গীতে কণ্ঠে আরাধনা করিতেছে। মহাকালমন্দির হইতে সারা হিমাচল বাহিয়া সমতলে নির্ব্বরস্বপ্নীতে সে সন্ধ্যারতির মহিমা মাখিয়া আসিতেছে। সেই কৈলাসে উমাবেষ্টনকণ্ঠে মহাকালতলে যেখানে মহাকাল আসিয়া থামা দিয়াছে, সন্ধ্যারাগসম অধর-রঞ্জনে নিখিল নরনারী সিদ্ধচারণগণকে সেখানে কোনও দিন প্রশ্ন করিয়াছিল—'অমৃত কোথায়? কোথা সেই ত্রিলোক-কামনা অমৃতভাণ্ড?'

উত্তর মিলিয়াছিল—'মহাকালকরে'—

—'কোথা মহাকাল?'—

—'ঐ তো সম্মুখে!'—

হিমাচলের তুষারতীর্থে মহাকাশ মহাকালের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাই হিমাচলের প্রতি শিলায় কোমল অমৃতস্পর্শ। সেই হিমাচলের শিলায় গোপন বাহিয়া দেবগন্ধর্ব্ববালা অলকানন্দা নামিত, সেই শিলাস্রোতের উপর তাহারা লীলাচঞ্চলা ফিরিত, সেই শিলাপথ বহিয়া তাহারা নন্দনে পারিজাতবনে চিত্ররথ কি বৈভ্রাজে ফুলচয়নে যাইত। অলক্ষ্যে তাহাদের অঞ্চলে সঞ্চিত হইত অমৃত।

দেবতারা অমৃতের ঘাম সঞ্চিতছিলেন। সে অমৃত তাঁহারা নিখিল জনের নিকট হইতে গোপন করেন নাই, বরং বিলাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিভুবন কামনার অমৃতভাণ্ডটির জন্য ঘুরিয়াছে, অমৃত যে কিসে মাখিয়া রহিয়াছে তাহা দেখিবার বুঝিবার ধৈর্য্য তাহাদের নাই। সমুদ্রমন্থনের দিনটি হইতে সকলের সন্দেহ, দেবতারা কোথায় অমৃতভাণ্ড

লুকাইয়া রাখিয়াছে। কৌতুক করিয়া দেবতারা কলসমূলে অমৃতহীন অমৃতভাণ্ড লাগাইয়া রাখিলেন। স্বর্গকী দানব বলিল—'অমৃতভাণ্ড শূন্য করিয়া দেবতারা অমৃত পান করিয়াছে'—বিস্মিত হইলেও দেবতা কৌতুক তোলেন নাই, বলিলেন—'অমৃতভাণ্ড শূন্য হইবার নহে—

দানব দেবতার নিকট নারী করিল—'অমৃতপূর্ণ সেই ভাণ্ড কোথায় লুকাইয়াছ?'

দেবতা বলিলেন—'জানি না'—

দানব সরোষে মন্তব্য করিল—'শঠ!'

এমনি করিয়া দুরন্তপ্রাণের অমৃতভাণ্ডের সন্ধান মিলিল না, দেবতার 'শঠতা' কখনও ধরা পড়িল না।

আকাশে সহস্রকোটী তারায় জ্যোতির্বন্তিত যে আলোকসাগর রহিয়াছে, তাহা হইতে কোন্ অপূর্বক্ষণে পূথ্বী স্বর্গকী উৎপন্ন হইল, কোন্ আলোকসেবী ঐরাবতের দন্তিত ক্রীড়া করিতে করিতে বিক্ষিপ্তকণা হইল। বিক্ষিপ্ত সেই স্বর্গকীধারা সুমেরুশৃঙ্গে পতিত হইল। সুমেরু-শৃঙ্গকে চারিধারে বেষ্টন করিয়া, পঞ্চপর্বতকে ঘটাবেষ্টনী করিয়া, ঘুরিয়া বাহিয়া সেই স্বর্গকী পর্বত হইতে পর্বতান্তে ধাবিত করিয়া মৃত্যুলীলায় বাহিল। সেই অন্তরবর্তী চৈত্ররথ কানন প্রবাহিত করিয়া অরুণোদয়রোধককে মুখর-মুখর করিয়া তুলিল। সেথা হইতে স্বর্গনির্ঝরে কৈলাস পর্বতে পতিত হইল। এমনি করিয়া নব নব ধারায় নব কুলে নব ছন্দে নব নব লহরী তুলিয়া পর্বত হইতে পর্বতে সঞ্চালিত হইয়া স্বর্গকী নামিল মর্ত্যে—সারা ভারতের বক্ষে। হিমালয় গলিয়া এ-ধারার প্রোত বহিল ভারতের আদ্যমূলঘাট। তথাপি দেবতার অমৃতগোপনকারী বলিয়া যে দুর্নাম তাহা ঘুচিল না।

মহাসৃষ্টির ছন্দতালে হিমাচল শিখরে শিখরে কন্যার তুলিয়া নব নব গীত রচনা করিয়া চন্দ্রকিরণী নব্যা অলকাবন্যার সাথে মিলিয়া চলে, আলোক ও নিভৃতের সংযোগে লীলা করিয়া, শ্রীকানন ও কন্দরের পথে বাচিয়া ঘুরিয়া। যেথা আকাশ যেখানে বাতাস ও আনন্দঘন সংযোগের সাথে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছে, সেইখানে স্বর্গকিনীর হৃদ্কমল তুলিয়া সুরাকরের স্নেহকরের সাথে মিলাইয়া এমনি খুশীভরে যাহারা লীলা করিত, যাহারা সে দেশের শিলাময় পথে অমৃতের লাবণ্য বিলাসে চিরযৌবনের স্পর্শ লাভ করিত, যাহারা মানসে ও আনন্দঘনে অমরের অমৃতলাবণ্যকে দুহসিত করিত, কোনও দিন তাহাদের এশ্ন করা হইয়াছিল—'এত খুশী এত যৌবন উচ্ছল, কি কারণে?'

তাহার উত্তর ছিল—'অমৃতের আভাসে—'

প্রশ্ন হইল—'কী সে অমৃত?'

আকাশে বাতাসে শিলাপথে নব ছন্দ আঁকিয়া পরম খুশীর সাথে তাহারা উত্তর দিত—'আনন্দ।'

ছায়ার কান্না

শ্রীমৃণাল সেন

বারটা বাজিয়া গিয়াছে, সহরের এক সিনেমা দেখিয়া ফিরিতেছি। শীতের রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ। ট্রামওয়েজের ক্রমাগত ছরাৎ ছরাৎ শব্দ ও মাঝে মাঝে রিক্সার ঠুন ঠুন আওয়াজ—এই দুইটীও রাত্রির নীরবতার সহিত মিলিয়া একটা ভয়াভয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। কবির ভাষায় রাত্রিটী হয়ত ছিল অভিনব, কিন্তু আমার কাছে অন্ততঃ সেই সময়টুকুর জন্য ভয়াবহই হইয়া উঠিয়াছিল বটে। ভাবিলাম, রিক্সা ডাকি, কিন্তু হায়, পকেট ফাঁকা! কি আর করি! পা চলিতে লাগিল। মনকেও ভয়াবহ অন্ধকারের এলোমেলো চিন্তাধারা হইতে রেহাই দিয়া প্রতিষ্ঠা করিলাম প্রেক্ষাগৃহের রূপালী পর্দায়।

সেদিনের ছবিটীর নায়িকা ছিল এক ভিখারিণী—নর্তকী, আর নায়ক এক জমিদার পুত্র—বিশেষ পারিবারিক কারণে পলাতক। সহরের চৌমাথার মোড়ে প্রকাণ্ড ভিড়ের মাঝে সুকণ্ঠী নায়িকা তাহার আসর জমাইয়াছিল, আর সেই ভিড়েরই ক্ষুদ্র অংশীদার হইয়া দেখা মিল পলাতক নায়ক। তারপর?—সে অনেক কিছু।···সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম ভিখারী মেয়েটীর কথা, নায়কের কথা ও তাহাদের প্রথম প্রণয়ের দিনের কথা।

সত্য, আমি বড় বেশী ভাবি। নায়ক নায়িকার ভিতরে ভুল বোঝাবুঝিতে হতাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা বা তাহাদের মিলনে দুই ফোঁটা আনন্দাশ্রু বিসর্জন করা—এইগুলি আমার একেবারে স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বন্ধুরা এই জন্য আমাকে Sentimental আখ্যা দিয়াছে এবং ইহা লইয়া সকাল সন্ধ্যায় ঠাট্টা তামাসা করে। তবে হাঁ, আমার সহিত বন্ধুদের পার্থক্যও যে বিশেষ কিছু আছে

তেমনও বোধ হয় না। যখন আমি নিরালায় বসিয়া নিহত এন্টোনিওর পাশে দণ্ডায়মানা রাণী ক্লিওপেট্রার বিষাদময়ী রূপ কল্পনা করিতে গিয়া দুই একবার উঃ আঃ করি, অথবা চন্দ্রমুখীর বিতংস ও অবাঞ্ছিত জীবনের আড়ালে সুন্দরের সন্ধানের চেষ্টা করি—ততক্ষণ হয়ত বন্ধুরা হোটেলে বসিয়া, পাড়াইয়া, টেবিস চাপড়াইয়া, গলা বাজাইয়া গ্রেটা-গার্বোর টেক্‌নিকের বৈশিষ্ট্য বা তাঁহার পারিবারিক জীবনের গোপনীয় ঘটনাবলী লইয়া তুমুল তর্কের সৃষ্টি করিয়া তোলে, যেন গানে বলিতেই অজ্ঞান। পার্থক্য এইটুকু—আমি Sentimental ও তাহারা Critic—অবশ্য তাহাদের ভাষায়।

ভাবিতেছিলাম নায়ক নায়িকার কথা আর করুণাময় ভগবানের কথা। দুইজনের ভিতর মনের অমিল এমন কুৎসিতভাবে দেখা দিয়াছিল, ভগবান সহায় না হইলে মিলন তো দূরের কথা, শেষ পর্য্যন্ত যে কি ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইত কে জানে! তাই তো ভাবি, ভগবান সত্যই করুণাময়। • • • • বাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। চিন্তাগুলি আচম্‌কা হোঁচট খাইয়া সঙ্কুচিত হইল। কড়া নাড়িলাম।

• • • • ঘুম আসিতেছে না, এপাশ ওপাশ করিতেছি। চোখ বুজি—দেখি নায়িকাকে—চোখ মেলি—দেখি আর কোন ছবি। লেপ মুড়ি দিয়া, হাত পা গুটাইয়া নির্জীবের মত পড়িয়া রহিলাম। • • • •

ছোট্ট এক নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া পথ বাহিয়া চলিয়াছে, আর নদীরই পারে ছোট্ট পাহাড়ের নিরালা কোলে আমি আমার কুটীর বাঁধিয়াছি। আকাশে চাঁদ হাসিতেছে, পৃথিবীর বুকে সুরভিত জ্যোৎস্না ভাসিতেছে। তাহারই মাঝে কুটীর থেকে অদূরে একখণ্ড পাথরের উপর বসিয়া সাহের গায়ে হেলান দিয়া শুভ্রবসনা এক তন্বী মালা গাঁথিতেছে ও গাহিতেছে। প্রকৃতির সজীব নীরবতা আমাকেও অনেক আগেই কুটীরের বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে। মেয়েটি এবং তাহার গান—দুই-ই প্রকৃতির অংশবিশেষ হইয়া এক অভিনব আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে। চারিদিক হইতে আনন্দের লহরী উঠিয়াছে, যেন—"অঘুমিয়ে, মুকুলিছে, মঞ্জরিছে প্রাণ, শতেক সহস্ররূপে গুঞ্জরিছে গান শত লক্ষ সুরে।"—আকাশে চাঁদ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; মেয়েটি হাসিতেছে, গাহিতেছে 'দৈবের চঞ্চল অংশীদারটি আর আড়ালে থাকিতে পারিল না—ঝড় উঠিল—তবু চাঁদ হাসিতেছে, বনবালা গাহিতেছে।

একটা দম্‌কা হাওয়ায় আধখানা মালা ছিঁড়িয়া আমার গায়ে আসিয়া পড়িল। ঝড় বাড়িল, চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকাইল, গান থামিল। বাতাস জোরে বহিতে লাগিল। আধখানা মালা মেয়েটির দিকে বাড়াইয়া দিলাম।

একটা ধাক্কায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, সূর্য্যের আলো ঘরটাকে ভরিয়া রহিয়াছে, আর মাথার কাছে চা হাতে রামশরণ দাঁড়াইয়া আছে। মেজাজ চড়িয়া গেল, এত চমৎকার স্বপ্নটা মাটী করিয়া দিল। বেটা একেবারে নীরস কাঠ! কিন্তু মেজাজ দেখাইব কাহার উপর? রামশরণ চা'র কাপটা টেবিলের উপর রাখিয়া দৌড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল; বলিয়া গেল, রাস্তায় খাসা নাচগান চলিতেছে। তাইত'! একটা উৎকট সুরের ভাঁজ কানে আসিল। উৎসাহিত হইয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম রাস্তার ওপারে পানের দোকানের সম্মুখে গৃধিনী-কণ্ঠী, বিকশিতদন্তী, কৃষ্ণকায়া এক বিশালদেহী প্রৌঢ়া কুমারী মাজা দুলাইয়া, গ্রীবা বাঁকাইয়া একযোগে হাত পা চোখ ইত্যাদি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কসরত দেখাইতেছে এবং আনুষঙ্গিক ক্রিয়া চলিতেছে।—"বহুৎ আচ্ছা", "কেয়াবাৎ" প্রভৃতি মুহুর্মুহুঃ জয়োধ্বনিতে নর্ত্তকী দ্বিগুণ উল্লসিত হইয়া আবহাওয়াকে আরও সরগরম করিয়া তুলিতেছে। বুঝিলাম সমঝদারদের কেহ পানওয়ালা, কেহ বা বিড়িওয়ালা, আর কেহ রামশরণ শ্রেণীর রসজ্ঞ নাগরিক।

দুইটি পয়সা লইয়া প্রৌঢ়াকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলাম। অপ্রত্যাশিত ভাবে দক্ষিণা পাইয়া প্রৌঢ়া একটু মুচকি হাসিয়া জানালার পাশে আসিল এবং হস্তপদ সঞ্চালনের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। আবার ঝড় উঠিল, কিন্তু বাতাস এইবার বিপরিতমুখী। ঝড়ের মুখে জানালা বন্ধ হইয়া গেল। নিজেকে আবার বিছানায় এলাইয়া দিয়া সিলিংএর কড়িকাঠ গুণিতে লাগিলাম। সত্যিই রামশরণের মত রসাল লোক পৃথিবীতে কয়জন মেলে!...হুঁস হইল চা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে। রামশরণের উদ্দেশে আর একবার

সম্রদ্ধ প্রণাম ঠেকাইয়া চা'র টেবিলটা কাছে টানিয়া লইলাম।

"Thou hast thy music too"—পাশের বাড়ীর স্কুলে-পড়া মেয়েটি Keatsএর "Ode to autumn" কবিতার রসগ্রহণ করিতেছে।—"Thou hast thy music too; Thou hast মানে তোমার আছে, Thou hast মানে……।"

চা'র কাপটা মুখের কাছে তুলিতেই রবীন্দ্রনাথের কথাটি মনে পড়িয়া গেল—"আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী ?"

জাফরনগরের শের

শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়

গত বছরের মত এবারও অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম থেকেই বাঘের উপদ্রব সুরু হয়। সাতখানা গ্রামের লোক ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। জাফরনগরের বীর আসরে নেমেছেন।

আজ হিজুলী, কাল হাসানপুর, তার পরের দিন জাফরনগর, প্রত্যহই গো হত্যার সংবাদ আসতে থাকে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বীরের অভিযান হয় সুরু। প্রত্যহই খোরাকের জন্য চাই একটা আস্ত গরু, আর তাছাড়া জলযোগের জন্য দেশী কুকুর, ছাগল ও ভেড়া প্রায়ই প্রয়োজন হয়।

স্থানীয় শিকারী মহলে সাড়া জাগে। কেউ জানোয়ার চলা পথের উপর মাচা বাঁধলেন, কেউ মরী'র উপর বসে রাত কাটালেন, কেউবা লোক দিয়ে জঙ্গল ঘিরিয়ে বন পেটালেন; কিন্তু সবই বিফল হল। জাফরনগরের বীর যে বিভীষণের পরমায়ু নিয়ে এসেছে, ওকে মারে কে ?

সংবাদটা মহাকুমা হতে সদরে গেল এবং সেখান থেকে গেল কলকাতা সহর পর্য্যন্ত।

এবার কলকাতা হতে মোটর বোঝাই হয়ে শিকারীর আমদানী হতে লাগলো; কিন্তু ফল কিছু হল না। তারা টিকিন কেরিয়ার খালি করে ক্লান্ত দেহে ফিরে যেতে লাগলো।

সংবাদ পেয়ে আমেরিকান সৈনিকের দল এসে তাঁবু গাড়লেন জাফরনগরের বনের কিনারে। উজ্জ্বল তাদের স্বাস্থ্য, লোভনীয় তাদের পরিচ্ছদ, আর সকলের হাতেই একটা করে দামী মানুষ মারা রাইফেল।

গ্রামে গ্রামে সাড়া জাগে। এবার বাঘ মরবে নিশ্চয়ই। আমেরিকান কায়দায় শিকার আরম্ভ হ'ল। জাফরনগরের বীরের উপর একটা গুলিও পড়ল; কিন্তু ফল সেই পূর্ব্বের মতই রয়ে গেল।

তাঁবু উঠলো; কিন্তু গোহত্যা থামলো না। চৈত্র মাসের মধ্যে-ই বীর "সেঞ্চুরী আপ" করলে।

অবশেষে :

২৪শে জ্যৈষ্ঠ। সকাল থেকেই আকাশ বাদল নেমেছে। বিকেল বেলা তরুণ শিকারী শঙ্করনাথ কেবল চায়ের পেয়ালাটী শেষ করেছে এমন সময় বন্ধু অপূর্ব্বকুমারের চাপরাশী এসে সংবাদ দিল, জাফরনগরে গত রাতে এক বৃহৎ গরু মেরেছে, ডাক্তারবাবু (অপূর্ব্বকুমার) আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, এখুনি যেতে হবে।

শঙ্করনাথ মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে মনটাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলে; কিন্তু গাজনের সন্ন্যাসী চড়কের বাজনা শুনলে নাকি আর স্থির থাকতে পারে না—তাই তা'কে সেই দুর্য্যোগের মধ্যে দিয়েই যাত্রা করতে হ'ল।

ওরা যখন জাফরনগরে এসে পৌছাল তখন মেঘলা দিনের সন্ধ্যা নামতে আর বেশী দেরী ছিল না।

গত রাতে যার গরু নিহত হয়েছিল সেই পথ দেখিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌছে দিয়ে গেল। নিবিড় জঙ্গলের মাঝে মৃত গরুটা পড়ে আছে। পাশেই নরম কাদার উপর পড়ে রয়েছে জাফরনগরের বীরের পদচিহ্ন।

অপূর্ব্বকুমার শঙ্করনাথকে সেই পদচিহ্ন দেখিয়ে বলে, —ঘোঁয়া দেখে আগুনের গুরুত্বটা বোঝ।

শঙ্করনাথ মোটা গলায় শুধু একটা হুঁ দিল।

আকাশ থেকে আবার এক পশলা বৃষ্টি নামলো। এবার ওদের মুস্কিলে পড়তে হ'ল। কাছাকাছি বসবার মত একটাও গাছ নেই। আর এখন এত দেরী হয়ে গেছে যে গ্রামের থেকে লোকও উপকরণ নিয়ে এসে মাচা বাঁধবার সময় পাবে না। এদিকে বনের বুকে সন্ধ্যার ছোঁয়া লেগেছে।

অন্য কোন উপায় না পেয়ে ওরা মৃত গরুটার কাছ হতে হাত কুড়ি দূরে একটা বন তুলসীর ঝোপের মধ্যে ঢুকে বসে পড়লো।

অন্ধকারে ডুবে গেল সারা বনানী। পাশাপাশি

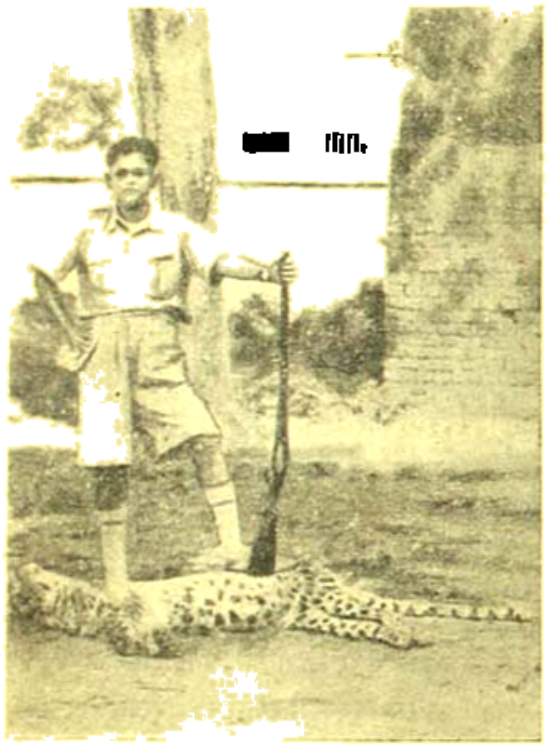

জাফরনগরের নিহত শের

স্থিরাসনে বসে দুই বন্ধু বাঘের ধ্যানে মগ্ন হ'ল। এদিকে জাফরনগরের বনের বনিয়াদি মশককুল ওদের ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণ করলে—তাদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ তারা কিছুতেই সহ্য করতে রাজী নয়। এর উপর প্রকৃতির অত্যাচার সুরু হ'ল। শরৎকালের মত এক একখানা মেঘ ভেসে আসে, আর ওদের সঙ্গে একটু রসিকতা করে যায়।

বীর সাধকদ্বয়কে মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়। হাত পা ও মুখের অনাবৃত অংশে মশক স্পর্শে যে জ্বালা ধরে, বিরহের জ্বালার চেয়ে সে জ্বালা কিছু কম নয়।

রাত মনে হয় তখন আটটা হবে, খস্ খস্ করে একটা শব্দ এলো আর সেই শব্দটা মৃত গরুটার কাছ পর্য্যন্ত এসে থেমে গেল। দুই বন্ধুর স্নায়বিক কেন্দ্রে জেগে উঠল চেতনা।

অপূর্ব্বকুমার বন্দুক তুলে ধরে টর্চ্চের বোতাম টিপলে। অন্ধকারের কাল পর্দা ভেদ করে ছুটলো আলোর তীর। আর সেই আলোতে বন্ধুদ্বয় দেখতে পেলো, মৃত গরুটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বৃহৎ শেয়াল।

চোখে আলোর ধাঁধা কাটতেই শেয়ালটা খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দ করে ছুটলো বনের মধ্যে, আর শঙ্করনাথ মোটা গলায় উচ্চারণ করলো—"হোপলেস্"।

আলো নিভে গেল। আবার সুরু হল সাধনা। রাত প্রায় তখন ৯'টা হবে সেই সময় ওদের কানে ভেসে এলো আবার জানোয়ারের পদশব্দ।

অপূর্ব্বকুমার ফিস্ ফিস্ করে বল্লে—শালার শেয়ালটা জ্বালালে। শঙ্করনাথ অপূর্ব্বকুমারের গায়ে একটা চাপ দিয়ে আলো জ্বালাবার সঙ্কেত করে। নিতান্ত অনিচ্ছা ভরে অপূর্ব্বকুমার টর্চ্চএর বোতাম টিপলে। সাদা আলোর মধ্যে দিয়ে সে দেখতে পেলো মাত্র কুড়ি হাত দূরে মৃত গরুটার উপর দীপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে জাফরনগরের বীর। অপূর্ব্বকুমারের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল।

সময়ের সমুদ্র হ'তে মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড ঝরে পড়ে! শঙ্করনাথের বন্দুকের দক্ষিণ নল হতে অগ্নি বর্ষণ হ'ল—নিস্তব্ধ বনানীর মাঝখানে জেগে ওঠে বেমানান শব্দ।

অপূর্ব্বকুমারের হাতের আলো নিভে গেল। উত্তেজনায় ওদের স্নায়ুমণ্ডলীতে আক্ষেপ জেগেছে—তাই ওদের নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত তালে। গভীর অন্ধকারের মাঝে, বুকে এক অজানা আশঙ্কা নিয়ে বসে আছে দু'জনে, কারও মুখ দিয়ে কথা সরে না।

দু'টো মিনিট চলে গেল। এবার নিস্তব্ধতা ভেঙে অপূর্ব্বকুমার বল্লে, এমন সুযোগ জীবনে কম আসে, এত বড় জানোয়ারটা ফস্‌কে ফেললি।

হতাশা মিশ্রিত সুরে শঙ্করনাথ জবাব দিল—আমি আর

এর চেয়ে বেশী কি করতে পারি, ঠিক ত মাথা হেঁটেই মেরেছিলাম।

অপূর্ব্বকুমার আলো জেলে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—দেখি গুলিটা কোথায় গিয়ে বিঁধলো। হয় মাটিতে, নয় মৃত গরুটার গায়ে ঠিক বিঁধেছে।

গরুটার চার পাঁচ হাত কাছে গিয়েই অপূর্ব্বকুমার চীৎকার করে উঠলো—ওরে বাঘ পড়েছে, বাঘ পড়েছে।

শঙ্করনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—পালিয়ে আয় শীগ্‌গীর পালিয়ে আয়, লেপার্ডকে বিশ্বাস নেই।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর দুই বন্ধুতে বন্দুক বাগিয়ে ধরে এগিয়ে চল্‌লো। কাছে এসে দেখলে জাফরনগরের বীর একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে। ব্রহ্মতালুর মধ্যে দিয়ে গুলিটা প্রবেশ করেছে, আর সেখান দিয়ে সধবার সিঁথীর সিঁদুর রেখার মত মোটা ধারার টুক্‌টুকে লাল রক্ত ধারা বইছে। মৃত গরুটাকে আলিঙ্গন করে পড়ে আছে জাফরনগরের বীর।

মাতৃভাষী মুখে শঙ্করনাথ বল্লে—বল্লাম মাথা হেঁটে মেরেছি। দেখেছিস এক ইঞ্চি নড়ে নি, একেবারে ঘুঘুর মত পড়েছে।

জঙ্গল থেকে বীরের মৃতদেহ নিয়ে আসা হ'ল জাফরনগর পল্লীতে। এবার সুরু হ'ল জনসমাগম। সেই দুর্য্যোগপূর্ণ রাতে দাবানলের মত সংবাদটা ছড়িয়ে পড়লো গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে। দলে দলে লোক আসছে নিহত বীরকে দেখতে।

এতদিন বীরের উপর যার যত সঞ্চিত ক্রোধ ছিল, পদাঘাতের মধ্য দিয়ে তা বর্ষিত হতে লাগলো নিহত বীরের মুখের উপর।

অপূর্ব্বকুমার শঙ্করনাথকে বল্লে—আমাদের দেশের লোকগুলো মানুষ হ'ল না, কি ভাবে বীরের সম্মান দিচ্ছে দেখ্‌।

মোটা গলায় শঙ্করনাথ বল্লে—সর্বকালে সর্ব দেশে নিহত বীরকে ঐ ভাবেই সম্মান দেয়। মুসোলিনীর কথাটা একবার ভেবে দেখ্‌না।

রাত্রি প্রায় বারোটার সময় নিহত বীরকে ঘোড়ার গাড়ীর মাথায় তুলে জীবিত বীরদ্বয় গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে সহর অভিমুখে যাত্রা করলে।

বীরশূন্য জাফরনগরের বনানী আজ শোকাচ্ছন্ন। গভীর রাত্রিতে গ্রামবাসীরা শুনতে পায় বিধবা বাঘিনীর বিলাপ ধ্বনি।

সাতখানা গ্রামের লোক বিধবা বাঘিনীর বৈধব্য যন্ত্রণা ঘোচাবার ভার দিয়েছে শঙ্করনাথকে।

দেখা যাক্ শঙ্করনাথ কি করে।

১৬ই আগষ্ট

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

আমার আকাশে নাহি চাঁদ, নাহি আলো,
নিশীথ-গগনে জীবনের যাত্রা খুঁজি—
হিমাদ্রি-নিকাশ মিলাইতে গিয়া তুলি,
মাথার উপর ভেঙে যায় যেন কালো।

আমার প্রাণের পর আশা ভাষা গান,
ব্যর্থ হইয়া জনের যেইলে কাঁদে ;
যেথায় মানুষ যাত্রায়—খিঁচিয়া টানে,
বিশ্বিনী তাই স্বাধীন নিঃশ্বাস্।

আমার হিয়ার দ্রুত কম্পন থামি।
প্রকৃতির সাথে সাড়া দিয়ে দিয়ে ক্লেদ—
মানুষ ও পশু ; পশু-মানবের মনে,
ঘরে ও বাহিরে আজিকে প্রবাস গণি।

আমার তোমার দুর্য্যোগ রাতে পড়
লক্ষিত হোল অভিশাপ, হাহাকার !
গুণিতে হইবে ভুলের মাশুল তার—
১৬ই আগষ্ট ৪৭ চাপায়েছে শর।

তোমার আমার কৃত-কর্ম্মের ফলে—
আগামী দিনের কলঙ্ক হোল জমা,
ইতিহাস তবু এরে ক্ষমিবে না ক্ষমা।
দুখ যাবে থাকো দু'ফোঁটা চোখের জলে !

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

১৮

সেদিনও তেমনি জোছনা উঠিয়াছিল—

অপর্ণা জোছনায় বসিয়া কি যেন সব ভাবিয়া যাইতেছিল, অজিত আসিয়া পাশে বসিয়া প্রশ্ন করিল, কি দেখছো—

—আজ ওদের কেমন দেখলে ?

—সুন্দর, বেশ আছে। কিন্তু ছেলেটাই সব চেয়ে বেশী দুষ্ট—পাঠি নিয়ে যে ছুটে এসেছে !

অপর্ণা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রশ্ন করিল—ওরা খুব সুখী বলে মনে হয় না ?

—নিশ্চয়ই, এমন সুন্দর গৃহ যার, তার অভাব কি ?

অপর্ণা কহিল—এর মাঝে ও নেহাতই হয়ত একা, তাই প্রসুপ্ত পরিবারকে ফেলে একাকী ও বসে আছে—আপনার দুঃখকে স্মরণ ক'রতে—

অজিত কহিল—তুমিও কি এমনি একা একা বসে থাকো ঐ জন্যেই ?

—তুমি থাকো না ?

—কদাচিৎ, কিন্তু আমার প্রশ্নের ত উত্তর হ'ল না ওটা। তুমি কেন এমনি একা বসে থাকো—

অপর্ণা বলিল—বল্লে বুঝবে না, কারণ বোঝানা শক্ত, আর যা ব'লবো তা হয়ত বিশ্বাস ক'রবে না—

—বুঝতে হয়ত পারবো না, কিন্তু বিশ্বাস অবশ্যই ক'রবো—

অপর্ণা ধীরে ধীরে বলিল—আমার মনে হয় মানুষের বাসনা এই দেহেই শেষ নয়, এর ঊর্দ্ধে দেহাতীত একটা বাসনা আছে, চাওয়া আছে। সেই বাসনা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এই পৃথিবীতে অতৃপ্ত—তাই মানুষ পরম পরিতৃপ্তি,পূর্ণ আনন্দ থেকেও নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে আপনাকে একান্ত একাকী পেতে চায়। এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার হাত থেকে মানুষের মুক্তি নাই, তাই সে চির-ব্যভিচারী।

অজিত ক্ষণিক কি চিন্তা করিয়া কহিল—তুমি কি আমাকে ভালবাসতে পারো নি ?

—এই রকম প্রশ্ন করবার ভয়েই তোমাকে এ কথা ব'লতে চাই নি। ভাল না বাসতে পারলে তোমাকে বিয়ে ক'রতে পারতুম না,কিন্তু তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো কেন ?

—অবিশ্বাস ? না, তবে আমাকে ঠিক ভালবাসো না বলে সংশয় জেগে ওঠে—

—আমারও যদি তাই মনে হয় তবে তুমি কি উত্তর দেবে ?

—তার উত্তর নেই।

অপর্ণা একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলিল—তবে এ সব কথা তুলে অকারণ অসচ্ছন্দতা ডেকে এনে লাভ নেই। আমি যা ব'লতে চেয়েছি তা হয়ত ব'লতে পারিনি নয়, তুমি ঠিক বুঝতে পারো নি।

—তোমার মত একাকী বসে থাকতে তো আমার ইচ্ছা হয় না—কেন ?

—তুমিই সুখী। আপনার মনকে যদি ভাল ক'রে দেখতে একদিন তবে হয়ত বুঝতে—তুমিও ঠিক আর সকলের মত একা, কারণ তোমার অফুরন্ত চাওয়ার পরিতৃপ্তি যেমন আমার দেওয়ার ক্ষমতা নেই তেমনি—অন্য কোনো মেয়েরই নেই। পক্ষান্তরে কোনো পুরুষেরও নেই।

অজিত সম্ভবতঃ কিছু বুঝিল না, দেহের ঊর্দ্ধে মনের অস্তিত্বকে সে হয়ত জীবনে উপলব্ধি করে নাই, তাই অপর্ণাকে অত্যন্ত রহস্যময়ী বলিয়া সে মনে মনে আপনার দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিল মাত্র। অপর্ণা চাহিয়া দেখে ওই দুঃস্থ পরিবারের কর্ত্তাটি তখনও একান্ত একাকী উঠানেই বসিয়া আছে—

অপর্ণা কহিল—চল ঘরে যাই। কথায় কথা বাড়ে।

খোকা মায়ের কোলের মধ্যে চোখ বুজিয়াই শুইয়া ছিল, মা একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিতেই মিটমিট করিয়া তাকাইতে আরম্ভ করিল—

গৌরী আবার শুইয়া পড়িল—দুষ্টু এখনও ঘুমোস্ নি, ভোর বাবার ফিরবার সময় হ'ল যে ! তাকে ভাত জল দিতে হবে না ?

খোকা মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—তার পর কি মা ?

গৌরী বলিতে আরম্ভ করিল—রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে চ'ল্‌লেন। কত দেশ, কত নদী, কত পর্ব্বত পার হ'য়ে, মেঘের রাজ্য পার হ'য়ে শেষে একদেশে উপস্থিত হলেন। পক্ষীরাজ ঘোড়াকে এক গাছে বেঁধে রেখে তিনি একটু এগিয়ে দেখেন এক প্রকাণ্ড রাজপুরী। বাইরের সিংদরজায় সেপাই পাহারা দিচ্ছে, কিন্তু সে ঘুমন্ত। আশে পাশে আরও কত সেপাই-সান্ত্রী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। রাজপুত্তুর ভিতরে গিয়ে দেখেন, গরু বিচালি খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছে, মুখে বিচালি ঝুলছে, ময়ূর নাচতে নাচতে ঘুমিয়ে পড়েছে·····এই ঘুমন্ত রাজপুরীর সব জায়গা রাজপুত্তুর তন্ন তন্ন ক'রে দেখলেন। এরা কেন ঘুমিয়েছে, কখন জাগবে কিছুই জান্‌লেন না। শেষে দেখেন এক ঘরে এক রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে। চুলগুলো ঝুলে পড়েছে মেঝের—

—পালঙ্ক কি মা ?

—এই খাটের মতই, কিন্তু নক্সা করা, খুব দামী। এ রকম করলে ঘুমোবি কখন ?

পাশের বাড়ীর পেটা ঘড়ীতে নয়টা বাজিয়া গেল।

খোকা প্রশ্ন করিল—ও কিমা ?

—ঘড়িতে ন'টা বাজলো, রাজবাড়ীতে। কখন ঘুমুবি ?

—তার পর কিমা ?

গৌরী পুনরায় আরম্ভ করিল—রাজকন্যার মেঘবরণ চুল, কুঁচবরণ রূপ। সমস্ত ঘর তার রূপে আলো হ'য়ে আছে, রাজকন্যার চুল পালঙ্ক ছাড়িয়ে মেঝেয় এসে পড়েছে—

—সে তো, তোমারও পড়ে মা, তুমি রাজকন্যা ?

—না, শোন তার পর, মাথার শিয়রে একটা সোনার কাঠি, একটা রূপার কাঠি। রাজপুত্তুর তাই নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে সোনার কাঠিটা হাত থেকে রাজকন্যার কপালের উপর পড়লো—দেখতে দেখতে সব জেগে উঠলো। হাতীশালে হাতী ডাক্‌লো, ঘোড়াশালে ঘোড়া···রাজপুত্তুর শেষে একদিন রাজকন্যাকে নিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় উঠে ফিরে এলেন—

—রাজকন্যাকে আনলে কেন ?

—খেলা ক'রবে বলে। এখনও ঘুমোলি নে ?

খোকা কণিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—ওই রাজবাড়ীতে পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে ?

সদর দরজায় কড়ার শব্দ হইল, গৌরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিরক্তির সঙ্গে কহিল—জানিনে, তোর বাবা এসেছে, যেমন ছেলে, এখন একা একা থাকো—

খোকা চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল—সে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছে। বৈকালে আকাশের গায়ে যে সোনালী আর কালো মেঘগুলি দেখিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া সে চলিয়াছে। সোনালী মেঘের প্রাচীর সে তরোয়াল দিয়া কাটিয়া রাস্তা করিয়া চলিয়াছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়াছে। বহুদূরে কালো মেঘের ও-পারে গিয়া দেখে সেই ঘুমন্ত রাজপুরীর চূড়া। রাক্ষসী আসিয়া পথ আটকাইল। বাবা যেন কি বলিতেছেন—

খোকা ঘুমের ঘোরে জড়িত চোখ মেলিয়া আবার চোখ বুজিল। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানে না।

পরদিন সকালে খোকা বারান্দায় সুতা ও ঘুড়ির একটা অকিঞ্চিৎকর সংস্করণ লইয়া খেলা করিতেছিল। ঘুড়ির কাগজের অবশিষ্ট কিছুই নাই, কিন্তু খোকা নিবিষ্ট মনে তাহাই উড়াইতে চেষ্টা করিতেছে।

গৌরী আসিয়া কহিল—কোথাও যাস্ নে খোকা।

—না। এই ত ঘুড়ি ওড়াচ্ছি।

কর্ম্মব্যস্ত মা চলিয়া গেলে, খোকা আকাশের পানে চাহিয়া দেখে তেমনি মেঘ। কালো কালো, তাহার পাশে পেঁজা তুলার মত শাদা মেঘ স্তূপীকৃত হইয়া আছে। খোকা রেলিং ধরিয়া ভাবিল, ওই মেঘরাজ্যের পরেই সেই ঘুমন্ত রাজপুরী, সেখানে চুল এলাইয়া কতকাল ধরিয়া ঘুমাইয়া আছে রাজকন্যা, দাসী চামর হাতে দাঁড়াইয়া আছে।

পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া যেদিন রাজকন্যাকে সে লইয়া আসিবে, মা সেদিন বলিবেন—কোথায় ছিলি খোকা ?

সে রাজকন্যাকে লুকাইয়া রাখিয়া বলিবে—কল্‌ত কোথায় ?

মা আশ্চর্য্য হইবেন, সে রাজকন্যাকে পকেট হইতে বাহির করিয়া দিয়া কেবল হাসিবে—রাক্ষসী হত্যার গল্পটা সে সবিস্তারে বলিবে।

হাতের ঘুড়িখানা বাতাসে কাৎ কাৎ করিয়া উঠিল।

খোকা চাহিয়া চাহিয়া আবার ভাবিল, রাজকন্যা যদি আজই সে আনিতে পারিত তবে দুইজনে মিলিয়া ঘুড়ি উড়াইত—রাজকন্যা ঘুড়ি উড়াইয়া দিত, সে সূতা ধরিয়া দৌড়াইত।

দুপুরে গৌরী ক্লান্তদেহে ঘরে আসিয়া দেখে খোকা পাখি খুলিয়া নিবিষ্টমনে ছবি দেখিতেছে। রাঁধিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া অনেকক্ষণ আগেই সে তাহাকে আফিসে পাঠাইয়াছে। তাহার পর একরাশ কাপড় ওয়াড় কাচিতে সে সত্যই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। গৌরী কহিল—খোকা এদিকে আয় শুয়ে থাকবি—

—না মা, আমি ছবি দেখছি।

—না, যে রোদ পড়েছে, এদিকে আয়।

খোকা মিনতি করিয়া কহিল—কোথাও যাবো না মা, ছবি দেখে পরে শোবো।

গৌরী ক্লান্তদেহে শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িল।

খোকা ছবি দেখিতে দেখিতে মাথা তুলিয়া দেখে মা ঘুমাইতেছে। ভিজাচুল মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িয়াছে রাজকন্যার মত।

নিস্তব্ধ দুপুর। চারিপাশে কোন সাড়া শব্দ নাই—গাছের পাতাও নড়িতেছে না। খোকা এদিকে ওদিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছুদূর আসিয়া দেখে সদর দরজাটাও খোলা আছে—অসাবধানতাবশতঃ দেওয়া হয় নাই। খোকা একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সম্মুখেই বিস্তীর্ণ রাস্তা, কদাচিৎ দুই একখানা গাড়ী চলিতেছে—খোকা অজ্ঞাত, অনির্দ্দিষ্ট, অপ্রাপ্য রাজকন্যাকে আনিতে রওনা দিল—

রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইয়া আছে, তাহার কান ধরিয়া টানিবার দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন ত্যাগ করিয়া সে আর একটু অগ্রসর হইল।

মনে মনে একবার ভাবিল, তাহার হাতে ত তরোয়াল নাই, যদি রাক্ষসী আসিয়া পড়ে সে কি করিবে। বাড়ীর সামনে দেবদারু গাছের তলায় সে ভীত হইয়া ঘুমন্ত কুকুরটির পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। সামনে চাহিয়া দেখে আকাশে কোন মেঘ নাই, রাস্তাটা যথাসম্ভব পরিষ্কার আছে। মা তাহার রাণী নয়, তাই পক্ষীরাজ ঘোড়া দিতে পারে নাই। যাহা হউক, আজ তাহার মা ঘুমাইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই সে সেই স্বপ্নপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যাকে আনিয়া হাজির করিবে।

এক বৃদ্ধা ভিখারিণী, ভিক্ষা করিয়া উত্তপ্ত রাস্তা দিয়া লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে চলিয়াছে। খোকা চুপ করিয়া ভীত দৃষ্টিতে দেখিতেছিল—এই সেই রাক্ষসী কিন্তু তাহার হাতে ত কিছু নাই, একেবারে নিরস্ত্র। সে গাছটির আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল। বুড়ী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল; খোকাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া অগ্রসর হইল।

ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল।

খোকা তাকাইয়া দেখে—ওইত সেই রাজপুরী। মা বলিয়াছে, রাজবাড়ীতে পেটা ঘড়ি বাজে। খোকা হৃষ্টমনে চলিতে লাগিল।

সিংদরজায় সেপাই বন্দুক ঘাড়ে করিয়া একখানা টুলের উপর বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে। চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল সে সত্যই ঘুমাইতেছে—মেঘের রাজ্য পার না হইয়াই সে তাহা হইলে ঘুমন্ত রাজপুরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

পাশের খাঁচায় ময়ূর ঘুমাইতেছে, সামনের জলটুকুতে পাতিহাঁস এক পায়ে ভর দিয়া, পৃষ্ঠের পালকে মুখ লুকাইয়া ঘুমাইতেছে। সেই ঘুমন্তপুরী, খোকা সামনের চত্বর পার হইয়া দালানের সিঁড়িতে উপস্থিত হইল।

ইজেরটা খুলিয়া যাইতেছিল, সেটাকে তুলিয়া দিয়া দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে যাইবে—কিন্তু একটা কুকুর চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে—ঘুমন্ত রাজপুরীর সেই জীবন্ত কুকুরটির অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি খোকার ছিল না—সে উপরে উঠিয়া গেল আর একবার চাহিল, কুকুরটি চোখ বুজিয়াছে—

দরজার পাশে দাঁড়াইয়া খোকা দেখে—তেমনি ঘর, শ্বেত পাথরে বাঁধানো, ইহাই হয়ত পালঙ্ক। ঘরে ঢুকিয়া দেখে সত্যই এক রাজকন্যা ঘুমাইতেছে। মেঝে পর্য্যন্ত এলাইয়া পড়িয়াছে তাহার মেঘবরণ চুল, বালিশে মাথা রাখিয়া কুঁচবরণ কন্যা ঘুমাইতেছে। বুকের উপর একখানা খোলা বই নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিতেছে।

খোকন সমস্ত ঘর খুঁজিতে আরম্ভ করিল—সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, কোথায় থাকিতে পারে? পালঙ্কের নীচে খুঁজিল, তাহার মা সাধারণতঃ এইরূপ স্থানেই মিছরির কৌটা লুকাইয়া রাখেন। কোথাও সোনার কাঠি রূপার কাঠি নাই। বাহির হইয়া আসিবে, হঠাৎ দেখে মেঘবরণ চুলে তাহার পথ বন্ধ। তাহাকে সরাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া আসিল—

আশ্চর্য্য—রাজকন্যা জাগিয়াছে। খোকা তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রশ্ন করিল—তুমি রাজকন্যা?

রাজকন্যা কহিল—হাঁ। তুমি কে?

—আমি খোকা।

রাজকন্যা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। খোকা আবার শুধাইল—তোমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে?

রাজকন্যা হাসিয়া বলিল—হুঁ, তুমি নেবে?

—হুঁ।

—কি করবে?

—দেশ জয় ক'রতে যাবো।

—তারপর?

—রাজকন্যাকে নিয়ে মাকে দেব।

—রাজকন্যাকে নিয়ে কি ক'রবে?

খোকা চিন্তা করিয়া কহিল—খেলব।

—কি খেলবে?

—ঘুড়ি ওড়াবো।

—তোমাদের বাড়ী কোনদিকে?

খোকা অনেকটা উদাসভাবে যা হয় একটা দিক দেখাইয়া দিয়া বলিল—এই দিকে?

—কেমন ক'রে এলে?

—হেঁটে হেঁটে—

—কেন?

খোকা ব্যথিত-কণ্ঠে কহিল—মা'র ত পক্ষীরাজ ঘোড়া নাই।

রাজকন্যা আবার একটু হাসিয়া উঠিল।

অপর্ণা দাসীকে ডাকিয়া কহিল—এ পাশের ওই বাড়ীর খোকা। কেমন ক'রে এখানে এল? একে দিয়ে এসো, ওর মা হয়ত ব্যস্ত হয়েছে।

দাসী খোকাকে কোলে করিয়া লইয়া কহিল—বাড়ী যাবে?

খোকা ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, যাইবে। কিন্তু রাজকন্যার সহিত গেল না। সে কহিল—তুমি যাবে না?

অপর্ণা হাসিয়া কহিল—আমাকে নিয়ে কি ক'রবে?

খেলবো। তুমি ঘুড়ি উড়িয়ে দেবে।

আর?

মা'র কাছে নিয়ে যাবো।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, আর একদিন যাবো। এসো, কেমন?

খোকার ডাগর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল—কই রাজকন্যা ত আসিল না! অত্যন্ত ব্যথিতভাবে সে দাসীর কাঁধের উপর অত্যন্ত ক্লান্তের মত মাথাটা ন্যস্ত করিয়া দিল। দাসী চলিয়া গেল—

খোকার জলে-ভরা চোখ দুইটির অপ্রকাশ্য বেদনা অপর্ণার মনকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। সে আপনমনে ভাবিল, এই খোকার জীবনে প্রথম সে রাজকন্যার সন্ধানে বাহির হইয়াছে, সারা জীবন উন্মুক্ত বিশ্বের বুকে সে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে কিন্তু আজকার মত রাজকন্যা আসিবে না। বার বার দেখা দিয়া ইন্দ্রধনুর মত মিলাইয়া যাইবে। আশা নাই, তবুও খোঁজার অভ্যাস সে ছাড়িতে পারিবে না……এমনি করিয়া অমল একদিন রাজকন্যা খুঁজিতে তাহারই দ্বারে আসিয়াছিল, এই খোকার মত অশ্রু-ভারাক্রান্ত নেত্রে আপনার হৃদয়ের উদ্যত বেদনার কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়া রিক্তহস্তে ফিরিয়া গিয়াছে।……তাহার দ্বারের সম্মুখ দিয়া বিপুল গৌরবে রাজপুত্রও চলিয়া গিয়াছে, জীবনের স্বপ্ন-সঞ্চিত মালাটিকে ছিঁড়িয়া পথের ধূলায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে—খোকার জল-ভরা ডাগর চোখ দুইটি কানের কাছে যেন ক্রমাগত আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে—আসিল না, আর আসিবে না।

ক্রমশঃ

প্রাচীন জ্যোতিষ ও আধুনিক বিজ্ঞানে পৃথিবী

শ্রীনিমচাঁদ সাহা

প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রাচীনত্বে ও মৌলিকতায় জগতের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। কালের তুহীন আবর্তন বা দুর্ধর্ষ সাময়িক অত্যাচারও দূর করিবার চেষ্টা করিলেও অদ্যি পরীক্ষায় তাহা অক্ষুণ্ণ অটুট অক্ষয় থাকিয়া উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় জগতের বিস্ময় উদ্রেক করিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান যান্ত্রিক প্রতিভার প্রাচীন জ্যোতির্বিদের শুভ্র বর্ণনাকে ভাঙ্গিয়া এক দুর্জ্ঞেয় জটিল হইতে জটিলতর পথে ধাবমান হইয়াছে। সহস্র সহস্র জীবনের আজন্মসাধনা তাহার বাঞ্ছিত নয়, কালের নবনবোন্মেষ যেন তার নিত্য নূতন দুর্ধর্ষ, দুরন্ত পথে তাহার অভিযান, কঠোর তাহার সাধনা, ঘোর পরীক্ষায় তাহার রুচির বৈশিষ্ট্য। বহুত চেষ্টা করিয়া নিজ বিজ্ঞান বহু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য নূতনত্ব বিলাস-বৈভবশ্রী শুধু প্রত্যক্ষে ভুলাইয়া পূর্ব একত্বের দিকে অগ্রসর হইতে তাঁর সহায়ক মাত্র। প্রাচীনকালের মূল অন্বেষণ-গৌরবে বৈজ্ঞানিকের বক্ষ তখন এক অদ্ভুতপূর্ব আত্মপ্রসাদে আলোড়িত হইয়া উঠিবে।

"হেতুঃ ক্রমোদর্কে মাসিদ্ধঃ প্রবহানিলৈঃ
সমাভাগ্রঃ ভগণা গ্রহকক্ষা যথাক্রমং"

সূর্যসিদ্ধান্ত ১২শ অধ্যায়, ৭৩ শ্লোক (চন্দ্রোদয়াধ্যায়)

অর্থাৎ "গ্রহের বহু ভগণ প্রবহ-বায়ু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পশ্চাদিক বহে, ইহা ক্রমানুসারে তাহাতে বদ্ধ গ্রহকক্ষা ভগণের সহিত চলিতে থাকে"।

পৃথিবী দুইটি ধ্রুব দ্বারা আবদ্ধ ও স্থির, সূর্য ভ্রাম্যমান থাকিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী কখনও স্থানচ্যুত হইতে পারে না। কাজেই সূর্য বার্ষিক গতি দ্বারা পৃথিবীকে ঘুরিয়া এক বৎসর তিনশত ষাইট দিনে—যাত্রাস্থানে আসে। নিজ অক্ষদেশে ঘুরিয়া পৃথিবীর শুধু আহ্নিক গতিই হয় এবং পৃথিবী আকাশের মধ্যস্থানে অবস্থিত থাকে।

আধুনিক বিজ্ঞান সূর্যকে স্থির রাখিয়া পৃথিবীকে ভ্রাম্যমান বলিতেছে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি দিবারাত্র করে এবং বার্ষিক গতি সূর্যকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরিয়া ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় যাত্রাস্থানে আসিতেছে। বিজ্ঞানের মত একটী প্রমাণে, 'পৃথিবীর মেরু-রেখা উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বাড়াইয়া আকাশের দুই প্রান্তে টেকিয়ে দিলে যে দুই স্থান পাওয়া যায় তাহাই আকাশের ধ্রুবের ও কুবের। ধ্রুবের তারকার নাম ধ্রুব, আর কুবেরের তারকার নাম "হাচ্‌লির অকট্যান্ট্" (শ্রীযুক্তের মতের সরল বিজ্ঞানের ১৩৩নং পাতার তৃতীয় পংক্তিতে) উক্ত প্রমাণ পৃথিবীকে প্রাচীন সূর্য সিদ্ধান্তের ন্যায় স্থির প্রতিপন্ন করিতেছে। পৃথিবীকে প্রথম 'ভ্রাম্যমান' বলিয়া পুনঃ 'স্থির' প্রমাণ করিলে মত দুইটী আত্মবিরোধী হইয়া পড়িল। প্রথমতঃ সূর্যস্থির, দ্বিতীয়তঃ পৃথিবী স্থির এবং তারকা-রাশি যেখানে সর্বসময়ের জন্য স্থির সেখানে চন্দ্র আকাশমার্গে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ইত্যাদি ২৭টী নক্ষত্র ঘুরিলেই তাঁর আকাশ ঘুরা শেষ হয় ও পূর্ণ নক্ষত্রে পৌঁছে। সূর্য যদি স্থির হয় তবে ২৮ দিনে অবশ্যক হইত কিনা তাহা ভুল। ইহা কখনও হয় না।

সূর্য সিদ্ধান্তের মতের মৌলিকত্ব সপ্রমাণে আমার নিজ গবেষণায় তাহার সম্বন্ধে যে যে প্রমাণ ও যুক্তি উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে পৃথিবী যে নিজ অক্ষরেখায় দুইটী ধ্রুব দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া বৈদ্যুতিক পাখার ন্যায় অবিরত পরিভ্রমণ করিতেছে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিক হাচ্‌লির অকট্যান্টে আসিয়া থাকা যাইতেছে, না ফিরিয়া উপায় নাই। এ প্রত্যাবর্তন নয়, বিপর্যয়।

—পরিহাস—

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম-এ

দৈনিক-জীবন-দুই বাঁধিবার কেন এ উল্লাস?
দুর্জ্ঞেয় ঠাঁয়ের পথে বিধাতার একি পরিহাস!
সাহারার ধূ ধূ চরে ক্লিষ্ট আর তৃষার্ত পরাণ,
নিবিড় তরুর ছেয়া জীবনের মিছে এর গান।

আমাদের যাত্রাপথে সঞ্চারিত বহুতের কীট,
অপরিচিত সৌরভের ছলে-কলা এ কি পাগলীর?
শতাব্দীর জীর্ণতায় শীর্ণ আর ক্লেদের বিকাশ,—
অন্ধের ঘুমের ঘোরে পথে শুধু ঘুণির নিঃশ্বাস।

অমৃতের পুত্র যারা, এ কি তার সত্য পরিচয়?
সূর্যের সাধনা দিয়ে আঁধারের হ'বে না কি ক্ষয়?
ধ্বংসের জোয়ার স্রোতে সৃষ্টি নব অরে কামারের,
বিস্মৃতির গর্ভ হ'তে পোষো আমি সে আশার বাণী।

কবিতীর্থে এক রাত্রি

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, আই-এ-এ-এস্

মুক্তির চাকের আসরেই বড় ওঠা তারী এটাই জনশ্রুতি, নিশ্চয়ই বিদগ্ধীতল কাজির সোহাগেও তার বেশ এসে যায়—তার প্রমাণ পাওয়া গেল সেদিনকার নিমন্ত্রণপত্র তাদের তরা মধ্যাহ্নে। বন্ধুকের আহ্বানে বেশ আবার করে ঠাণ্ডা কফি খাওয়া হচ্ছিল, তথা উদ্দেশ—কলকাতা বড় একঘেয়ে লাগছে, সবাই মিলে একদিন কোথাও ঘুরে এলে মন্দ হয় না—স্থান কাল পাত্র অনুকূল, ছিরে আসা যেন বিদ্যুৎবেগেরও আগেকার ছাত্রিনের মাঝে, স্কুলে যাওয়া যেন—কর্মের কলরবে স্থান আনন্দহীন, বৈচিত্র্যহীন, জীবন সঙ্কীর্ণ—যার গণ্ডী, কুসংস্কুকতায় ভরা, হাজারী মনমরকারের খবরদারী শুজনকরা কথা, পালিসকরা জুতো, এইকেট্ কলারকাফুল, ছোট একটি পরিধি—বাইরে থেকে দেখতে বেশ মিষ্টি ও ভরাট্, ভিতরে একেবারেই ফাঁপা, গণ্ডীর ভিতর গণ্ডী, চাকার ভিতর চাকা—একতথায় যা কর্তার ভূতের মত নাড়েও না, ভাড়েও না। কে জানাবে সেই সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি-প্রহীপ, কে জানাবে যে আমাদের এই বার্থকুক্ষ পরিবেশের বাইরে আছে একটা বিপুলা পৃথ্বী, রূপ রসে ভরা ভরীন, গ্রামকান্তিমরী বাত্রী ধরিত্রী তবী শ্যামা যার শাশ্বত আবেদন মনকে করে চঞ্চল, পদ্মলোলকে করে পাগল, ঘর ছাড়াকে উন্মত্ত। কে বলবে আছে দুঃখ, কষ্ট, অনশন অনটন, মরণর, রোগশোক তাপ, আছে মানুষ, আছে সমাজ ; আছে মন। শুধু কি আত্মপ্রসাদের আত্মপ্রবঞ্চনা তার সেলিসান্ কিম্বা বিত্তার করে চলবে?

যাক্ সে কথা—যাওয়া যায় কোথায়। ডাক্তার বন্ধু ছিলেন—প্রাণখোলা আড্ডাবোলা খাঁটি মানুষ, বল্লেন—চলুন, যাওয়া যাক্ শান্তি-নিকেতনে—সামনেই পুণিমাসাক কবিসদনে যাওয়ার পক্ষে প্রশস্ত। আমরা সবাই বন্ধুর তথাস্তু—কতকটা অন্তরের আগ্রহে, কতকটা ভদ্রতার খাতিরে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাঙালীর একটা দুর্বলতা কোথায় আছে যেন? রবীন্দ্রনাথকে আমরা কতটুকু জানি—শুধু কি তিনি গানের ভাণ্ডারী, কথার কাণ্ডারী। কাব্যতীর্থে যেতে গেলে তীর্থযাত্রীরই মন চাই—যেখানে মেলে শ্রদ্ধাবনত মন বন্ধনে—যা দেখতে চাই তা দেখবার চোখ মেলে—"পাংশো নিমেষালম্বনধ্যানাদ্ধি ক্ষণোধিতাত্মামির লোচনাভ্যাম্"

যথারীতি কথাটা আমরা সবাই ভুলেই বসে আছি। কিন্তু ডাক্তার আমাদের মত নগণ্য লোক নন্ করিতকর্মা, তখনই রথীবাবুকে চিঠি লিখে ঠিক্ করে ফেলেছেন। বৃহস্পতিবারের বারবেলার তাঁর আমন্ত্রণ-লিপি সমেত হাজির। বন্ধুবরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন যন্ত্রতন্ত্র জোগাড় করতে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাড়া দেন—চৌরিকোবের ঘণ্টা শুনে যেন—নিশ্চয়ই যেতে হবে মশাই, কোন কথা শোনা হবে না কিন্তু। যাবার ও রথের ব্যবস্থা হোল, এ রথাথ নয় যে যত বা চড়ুন, তার চেয়ে বেশী টানতে হবে। নানান্ দিকে নানান্ ঝামা, ঝঞ্ঝাট কার আছে, কাজের তাড়া আছে, পরীর আছে, মন আছে আবার মনের হাল ধরে বসে আছেন গৃহিণী সচিব সখি মিথঃ যাঁদের unlimited veto power. 'দুর্গাস্মরণু ভ্রাণি' বলে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। শনিবার সাঁঝের পরৈশুরকে স্মরণ করে পাড়ি জমানো হলো হাওড়া ষ্টেশনে। ছুটির দিনের মাতুল সবেত নবরত্ন, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভা যেন নতুন করে বসল। কালিদাসের কালে, মেঘদূতীর যুগে তবু বিপুলিকা চতুরিকার বেশ ছিলত, হয়ত বা রাজার চিত্তশালে, উদ্যানে বীথিকায়, আলবালের অন্তরালে, আমরা কিন্তু পথে নারী বিবর্জিতা।

অল্পকালের জন্য পথচারী হলেও আমরা খাঁটি বেঙ্গলিয়ানিষ্ট মাস্তানচারী, শুধু কাব্যকথায় পেট ভরে না জেনেই বন্ধুবর সঙ্গে এনেছিলেন প্রচুর খাবার উপকরণ—চৈত্রিক্ 'আওধে' হইতে যাত্রাদীর বৈত্রিক ভক্ষিত বস্তু, পর্য্যাপ্ত পোলাও কালিয়া সন্দেশ রসগোল্লা বই আকড়ী। দুঃখ হোল কলিকালে উদরাগ্নির তেজ ও বীর্য্য নেই। গৃহস্থদের বরাতজোর, উদার আতিথ্য, কথার ভিতর রস আছে, রস নেই, সবাসাধী মিঠে লোক—A violet by a mossy stone half hidden from the eye নয়। পথের বন্ধুদের সবাইকেই নমস্কার জানাই, এ হচ্ছে আনন্দের ঋণ।

পথের সাথী নমি বারবার
পথিকজনের নমু নমস্কার।

হাওড়া থেকে বোলপুর মোট ১১ মাইল। পশ্চিম বাংলার চোখ জুড়ান পাকা ধানেরিয়া ছাড়া বর্ণনাযোগ্য কিছুই নেই। ব্যাণ্ডেলে এক কাপ করে চা চলল—একটু সরস হতে তাদের আসর গরম হয়ে উঠল। বর্ধমানে ভুরিভোজন। রাজেশ্বাকরের বর্ধমানে এখনও সীতাভোগ বিখ্যাত পাওয়া যায়, কিন্তু সে মিষ্টান্ন নেই, সুস্বরও নেই, মনের ভিতর গুড়ম কাটা হয় না।

বীরভূম, চণ্ডীদাস, বক্রেশ্বর, জয়দেব, পদ্মাবতী, অজয় মযূরাক্ষীর দেশ আমার শক্তি-সাধনার আত্মনিবেদন তন্ত্রসাধনেরও পীঠস্থান 'পীঠা পীঠা পুনঃ পীঠা পদ্মাঠ ধরণীতলে'। শুধু চণ্ডীদাস ও বৈষ্ণব মহাজনরা 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর' আবিষ্কারছিলেন তা নয়, তত্ত্বসাধনার বহু রোমাঞ্চকর ইতিহাসও শোনা যায়।

রাত সাড়ে বারোটায় বোলপুর—শুভ্র রাত্রে পথের শুভ্র আকাশে নবমল্লিকার মালার মত ফুটে উঠছিল—সারথার আবাহন। কয়েকটা Cycle rickshaw নিয়ে চলুক প্রান্তরের পথ বিয়ে, কুলেডাঙার মাঠ

ভোর, রাত্রির স্বচ্ছ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যাত্রা, পূর্বদিক ফেকাসে, কাক্‌জ্যোৎস্নার গ্রামে একটা মৃদু মধুরতার অপূর্ব অনুভূতি। দূরে বনঝুলের মধুগন্ধ, বৃক্ষবনস্পতির দীর্ঘছায়া। আমরা খোলার অন্ধকারে, বাতায়নগুলিকে মনে হচ্ছিল মফস্বলের ওয়েসিস্—প্রেমাস্থির মাঝে আশ্বাস্। মনে পড়ল সাত বছর আগের কথা। সুদূর লাদাখের থেকে ছুটীর অবকাশে ফিরেছি দেশে। কবিগুরু তখন সবে বিদর্প রোগ থেকে উঠেছেন। কবিগুরুর করবার জন্য সপরিবারে শান্তিনিকেতনে উঠলাম। কবিকে দেখলাম যেন বাজপড়া বনস্পতি—তবু শুভ্র শান্ত, আত্মসমাহিত। একটু হেসে বল্লেন—আমার আর কি আছে—কি দেখতে এসেছ? আমার শিশুবন্ধুকে আমরা তার বলেন—আমাকে দেখে ভয় করছে? সেই সে দেখা।

অতিথি আমাদের সৌহার্দ্যে যেন সবাই ও সচল। শেষরাত্রের ঘন্টা বাজার সাথে দু'একখানা বাড়ী। অপরাপর অভ্যাগতেরা হয়ত আমাদের আগমনীর সাড়া পেয়ে সচকিত হয়ে উঠেছিলেন। কেউ কেউ বেরিয়েই পড়লেন—চাঁদের আলোয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আলাপ হলো। তারপর সতরঞ্চি বিছায়ে শয়ন। যাঁরা আমাদের তাঁদের মাসিকাকুনির ভ্রাতৃদ্বন্দ্বযুদ্ধের তাল বিচিত্র তান রাগিণীর সৃষ্টি করতে লাগল। তারই মধ্যে ঘুমের একটু মিঠে আবেশ। রাত্রির শেষ প্রহর অদ্ভুত প্রশান্তিময়, একটা রহস্যময় মন শীতলতায় দেহের উত্তাপ স্তম্ভিত হয়ে আচ্ছন্নতা নেমে আসে। আকাশের জ্যোতিলোকে দিকভ্রান্তকে পথ দেখাবার জন্য অনন্তে শুকতারা। সপ্তর্ষি বিদায় নিয়েছেন। তার কিন্তু পরেই সোনার ডিমাক্রেরা মুখের উপর পড়ে ঘুম দিল ভাঙিয়ে—জাগো জাগো! প্রত্যেক দিন যদি এমনি করেই জাগি। 'অঞ্জনে যেন জাগে দৃগঞ্জনে যেন প্রাণ'।

প্রাতঃকৃত্য সমাধার পরই এলো উষ্ণজলে চা খাবার নিমন্ত্রণ। রথীবাবু ও তাঁর নবিনী আমাদের আদর আপ্যায়ন্ করলেন প্রচুর। কবির গান মনে পড়ল—

তুমি উষার সোনার বিন্দু, প্রাণের সিন্ধু দুলে
কবির যেমন রবি পূর্বগগনে দৃষ্টি···।

একদেই যাওয়া গেল রবীন্দ্রভবনে—সদ্য সংরক্ষিত পৃথিবীর মনীষিদের অভিনন্দন, নানা ভাষায় অনূদিত কবির গ্রন্থগুলি, কবির সহস্তে আঁকা ছবি, রংএর বিচিত্র মেলা। উদয়ন, কোণার্ক, পুনশ্চ, উদীচি দেখে ফিরলাম গ্রামলীর কাছে—ছোট মাটির ঘর

আমি পাকা ঘরে পাঁথিনি ভিত—
আমার মিনতি কাঁথিনি পাথর দিয়ে তোমার দরজায়
বাসা বেঁধেছি আঙনা মাটিতে
যে চলতি মাটি নদীর জলে এনেছিল ভেসে
যে মাটি পড়বে গলে আষাঢ়ধারায়

বেরুবার সময় তিনি দেবের ছেলেকে দিয়ে এনেছিলেন, 'পথের ধারে গাছ তলাতে তোমার বাসা আমলী'।

শ্রীযুক্ত কৃপালনী আমাদের নিয়ে এলেন শ্রীনিকেতনে। এলমহার্ষ্ট স্পন্সরীর অর্থসাহায্যপুষ্ট শ্রীনিকেতন দেশের কাছ থেকে যেমন কিছু পাবনি এটা আমাদের ন্যায্য বিচার নয়। রবীন্দ্রনাথকে লোকে জানত—বড়লোকের ঘরোয়ানা ছেলে, আদুর গোপাল মেয়ে পরিপুষ্ট মিটোল কান্তিমান্ পুরুষ—তাঁর পক্ষেই চাষের আলো, মাটির রাঙা মিঠে নৈবেদ্য কাব্য করা সোজা পায়, দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ তাঁর নেই। তিনি নিজেই বলতেন আমার দুর্বাম ছিল বরীর সন্তান তার চেয়েও বড় দুর্বাম কবি। যাঁরা একথা বলতেন বা এখনও বলেন, তাঁদের দুর্ভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর পুরুষকে তাঁরা চেনেন নি। দেশের জন্য কি মমত্ববোধ তাঁর ছিল, সব দিক দিয়ে তাকে বড় তোলবার, মানুষে মানুষে সৌহার্দ্যে রসায়িত করবার চেষ্টা ছিল, তার ইতিকথা আজ সবই মানুষ্। তোমাও কোন parochial outlook নেই, প্রোগ্রাম্ নিয়ে মারামারি নেই, দেশহিতৈষিতার নামে সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতার সংঘাত নেই, নীরবে নিভৃতে নিজের মত ও পথ বেছে নিয়ে কাজের আরম্ভ—যেখানে কর্মশালা জেনমুদ্ধির সর্বনাশা বিস্তার নেই। কবির 'স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনার কথা কে না জানেন? এই দুর্গত শ্রীহীন্ ছাড়ীন্ বিরানন্দ মার্থ দেশে মহালক্ষ্মীর পাদপীঠ পরিকল্পনা প্রথম এই কবি মানসেই এসেছিল

আজ চাই প্রাণ চাই, আলো চাই
চাই মুক্ত বায়ু, চাই বাধা চাই বল
আনন্দ উচ্ছল পরমায়ু সাংঘবিস্তৃত বক্ষপট

আত্মবিস্মৃত আত্মঘাতী বাংলাদেশে এই বিশ্বাসের রবি কবিই প্রথমে এনেছেন এবং তাই নিয়ে নিজেই experiment করেছেন। সামান্য এ চেষ্টা কিন্তু একজনের আপ্রাণ চেষ্টা—অন্ধকারে মাটির প্রদীপে ছোট দীপশিখা—আদর্শের বর্তিকা। তিনি বলতেন, শুধু কিছু বিলিতি যেন্তম আলু কলিয়ে, চিরকেলে গাঁত চালিয়ে শতরঞ্চি কাপড় বুনোবই বাঁচবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মানুষ আজকে বিজ্ঞানের শক্তি প্রায় প্রায়ে। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, ফসল যদি বিষিয়ে ওঠে মাটীতে, পশুর ক্ষুরি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা ঢাকা পড়বে না। যেন মাটিতে তৈরি নয়, যেন মানুষে তৈরি।' বড় দুঃখেই তিনি বলেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মধারার রচনা করেছি, আমার জীবিতকালের সঙ্গেই যদি তার অবসান হয় তাতে আমার অগৌরব, না তোমাদের।

পূর্ব ও পশ্চিমের মূলত ও পুরাতনের একটি dynamic integration সহজ সমাধান বিষয় তিনি আমৃত্যু খুঁজেছিলেন আমাদের জীবনে। যেখানে সব সত্যকেই সমভাবে গ্রহণ করতে পারা যাবে প্রাণের প্রাচুর্য দিয়ে। প্রাণশক্তি অর্জন করবে, নিজের পায়ের।

শ্রীনিকেতন থেকে ফিরে এসে যাওয়া যেন প্রয়াগে। নিত্য সবন্, শিক্ষা ভবন, বিদ্যা ভবন, শিল্প ভবন দেখে চীনা ভবনে যাওয়া গেল। ভারতবর্ষ যুগে যুগে দান করেছে তার গুরুকে

পন্থানম্ শাস্তে ফিরে
ভগবান বুদ্ধ যেথা সমাসীন

চিরদিন
মৌন যার শান্তি অন্তঃপুরে
বাণী যার সকরুণ সান্ত্বনার ধারা

সকালবেলা কলাভবনের অবগুণ্ঠন খোলে না, আমাদের মত অরসিক ও অব্যাপারীদের জন্য। সঙ্গীত ভবনের গানের ঝঙ্কারেই দূর থেকেই শোনা যেত। অমরার অনুকরণে বাড়ির ঘরের উপর ফ্রেস্কোগুলি জীবন্ত ও ভাস্বর। প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জদড়ো সিলগুলির অনুলিপি বড়ই সুন্দর লাগলো। বাইরের কাস্টিং ঢালাইয়ের একটি ও অতিথি আবাসের সামনের Plaque-টি এপোলোর বিখ্যাত 'নিওবিদী'কে স্মরণ করাইয়া দেয়। ফিরে এসে ছাতিমতলায় কিছুক্ষণ দাঁড়ানো গেল। জানি না মহর্ষি কি দেখেছিলেন এখানে। অবনীন্দ্রনাথের চমৎকার আখ্যা বলতে গেলে বলতে হয় 'দুই সন্তানী'র গল্প যাঁদের নিয়ে গড়ে উঠেছে—শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী, সারাদিন বিপ্রহরের রোদ শিরিকা-বাহকেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, হয়ত মহর্ষিদেব দেখলেন সাহসে বিপদ প্রদারিত মাঠ আর তাই মাঝখানে একটি ছায়াতরু। কী তাঁর মনে হয়েছিল জানি না—যদিও তিনি দেখেছিলেন তিনি 'দুষ্কোটের দিব ভিত্তিতোক' আকস্মিকতা অনুভব করিয়াছি। প্রথম সন্তানী উদাত্ত কণ্ঠে বলেন 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।' দ্বিতীয় সন্তানীও সেই কথাই কত সুরে কত গানে কত কাজের মধ্যে বলে গেলেন—যত্র বিশ্বং ভবেদেকনীড়ম্' যেখানে বিশ্ব হবে একটি নীড়। দুই সন্তানীর পিতাপুত্রের মিলিত ইচ্ছা মিলেই এই আনন্দ লোকের সৃষ্টি। আর একজন মুক্তির পুরুষের সাধনার এখানকার সপ্তপর্ণীর প্রতি পত্রে লেগে রয়েছে। একদিনের উপাসনার কথা—যড়ঋতু বিজেন্দ্রনাথ আচার্য্য। উপাসনা করতে গিয়ে তিনি নির্বাক্ স্তব্ধ হয়ে মনের গভীরে হারিয়ে গেলেন। মনের ভাব আমার প্রকাশ হলো না, শুধু অনির্বাণ দীপশিখার মত পরীক্ষটী থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল—তাহার আন্তরিক যোগ প্রকাশ পেলো সুন্দর এক অনির্বচনীয় ভঙ্গীতে।

পুপুরেকা আবার উত্তরায়ণে মধ্যাহ্ন ভোজনের আমন্ত্রণ। চমৎকার মেহগনির অভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম আরাম করে ফিরে এলাম অতিথি আবাসে। যান ইতিমধ্যে আমাদের ষ্টেশনে নিয়ে যাবে বলে। সবাইকে প্রীতি নমস্কার জানিয়ে ও মনে মনে 'আমাদের শান্তিনিকেতন' ও তার অধিবেষ্টাকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম। বিশ্বভারতীর কি ভবিষ্যৎ, এখানকার শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা, শ্রীনিকেতনের আয়োজন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার এখন আমাদের নেই—তবে কবির আশা, আকাঙ্ক্ষা আদর্শ তাঁর ঘরে খুঁজি নিতে হেরিম এবং এক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে—সে কথা কবি আমাদের উত্তরাধিকারী আমরা ও ভবিষ্যদ্বিদের ছেলেমেয়েরা যেন না ভুলি

চলার পথে শুনি তার বাঁশী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

কোথায় গান সংক্ষিপ্ত। দুর্গোৎসবের পরে বিজয়া দশমীর দিনে বিসর্জনের পর যেমন মনের অবস্থা হয় তেমনি একটা ম্লান করুণ উদাসী ভাব। বর্ধমানে সীতাভোগ মিহিদানার সঙ্গে ঘ পর্ব—মাকুলের বিদায়। রাস্তায় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—মাইলের পর মাইল জুড়ে সৌম্যশ্রী-সম্পন্ন শুভ্র প্রফুল্ল কাশফুলের ফলন। চোখের অঞ্জনে রঞ্জনার ঘা।—যেন চন্দনের ছাপ। ট্রেণ পৌঁছল হাওড়া ষ্টেশনে—সন্ধ্যাসুন্দর তিমির নিবিড় সন্ধ্যা—আষাঢ় মেঘেরা আশ্বিনে প্রাঙ্গণের উতল ধারা ঝরে। ভিজতে হোল বেশ—

তোমার জীবনে অতীতের সীমা পথে
যুগল তীর্থ জল ঝিল জগতে
যেন নিঃশেষে প্রণাম আমিও টানি
সেইখানে মোর প্রণতি বিলাই আমি।

কল্পনা ও বাস্তব

শ্রীসুবিমেশ দেব বি-এ

নমিতা ট্রেণে বাড়ী থেকে কলকাতা যাচ্ছিল। আগামী কাল কলেজ খুলছে পূজার দীর্ঘ ছুটীর পর।···ট্রেণ জার্নি··· সাথে কয়েকটা বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিক আছে সঙ্গী হিসাবে। বাঁশী বাজিয়ে ট্রেণ যাত্রা সুরু করতেই সে-ও খুলে বসল একটা পত্রিকার গল্পের পাতা।···

গল্পটা অবশ্য লেখক লিখেছেন চমৎকার এবং খুব দরদ দিয়েও বটে। গ্রামের কোলে ছিল একটি সুখী পরিবার, তারপর সারা বাংলা দেশের উপর পড়ল এক ছায়া-মূর্ত্তির কালো হাতের বিভীষিকাময় পরশ··এলো পঞ্চাশের মন্বন্তর। শক্তির ও সামর্থ্যের চরম অসাম্যের ফল নিয়ে এলো দুর্ভিক্ষ···সরকারী ও বেসরকারী বহু উপায়ে বাংলার সরল গ্রাম্য জীবনের সুখী পরিবারগুলিকে রাজপথে টেনে নামানো গেল ভিখারী তৈরী করবার জন্য···সারা দেশের সমাজ ব্যবস্থায় এলো তীব্র আলোড়ন।···

তারপর, লেখক তাঁর নিপুণ লেখনীর সাহায্যে বর্ণনা করেছেন কি ভাবে কলকাতার রাজপথে দুঃস্থরা মৃত্যুবরণ করে…কি করুণ ও শোচনীয় ভাবে—তা'রা মানুষ ও ভাগ্য কাউকেই দোষী না করে নীরবে চলে গেল মৃত্যুর পরপারে।…

পড়তে পড়তে নমিতার চোখের কোণে জল জমে এলো।…লেখক বলছেন, একদিন যাদের দুয়ার থেকে অতিথি কখনো ফিরে যায় নি, তাদেরই ছোট্ট মেয়েটি পথে পথে একমুঠো ভাতের জন্য কেঁদে বেড়াতে লাগলো।…যা'রা তাকে বঞ্চিত করেছে…তা'র মুখের অন্ন যারা গ্রাস করে নিজেদের অধিকতর ধনী করে তুলেছে… তা'দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবারও তা'র ভাষা নেই।…

দুইদিন শুধু কলের জল খেয়ে শরীর অবসন্ন;…নির্জীব ভাবে মেয়েটি পথ দিয়ে চলছে। সন্ধ্যার সাথে চারদিকে আলো জ্বলে উঠেছে…পূজা আসন্ন…তারই আলোকোজ্জ্বল আবাহনী।…মেয়েটি যা'র কাছে হাত পাতে…তিনিই তীব্রভাবে মুখ বিকৃত করেন। কটূক্তিও করেন কেউ। ফুটপাতে বসেছিল একটি লোক…ঝাঁকা ভর্তি কল নিয়ে।…মেয়েটি বার কয়েক তার পাশে ঘুর ঘুর করে কি যেন বলতে চায়, কিন্তু সাহস পায় না। অবশেষে, অনেক সাহস করে এগিয়ে গিয়ে বলে, "দু'দিন কিছুই খাই নি।" লোকটি খিঁচিয়ে ওঠে, "তবে তো রাজা ক'রেচিস্; যা, ভাগ্।" বলে আবার খদ্দেরের সাথে একটা পাকা পেঁপের দাম নিয়ে দর কষাকষি সুরু করে।…মেয়েটির মাথার ভিতর অনশনের আগুন জ্বলছে, …হঠাৎ কি ভাব্‌লো,…নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে দুটো কলা তুলে নিয়েই দিলে ছুট্। সোর গোল উঠল, "চোর চোর।"—ক্ষুধা-কাতর…অনশন ক্লান্ত, দুর্বল দেহ নিয়ে মেয়েটি বেশী দূর ছুটতে পারল না…বীর-বিক্রমে বাবুমান্ দোকানী তাকে ধরে ফেল্ল…তারপর, উপস্থিত সকলেই ন্যায়ের প্রতীক্ হয়ে তাকে শাস্তি দিতে ত্রুটি করলে না। দুর্বল শরীরে শাস্তির প্রাবল্য সহ্য হয় না…বলে পড়ল সে ফুটপাথে অজ্ঞানের মতো।…অতঃপর লাল পাগ্‌ড়ী— শান্তি ও শৃংখলার রক্ষক… টেনে হেঁচ্‌ড়িয়ে, তা'র প্রতাপ দেখিয়ে নিয়ে গেল থানায়।…

লেখক এখানেই গল্পটি শেষ করেছেন।…তাঁর লেখনীর মুক্তিস্নান আছে কিন্তু! গল্পটি শেষ করবার পরও অনেকক্ষণ মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখে দেয় এবং গল্পটির মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে তিনি যে সব সাম্যবাদী কথা বসিয়ে দিয়েছেন, তা' যেন মনে আগুন ধরিয়ে দেয়—আমাদের এই অন্যায় ও অসাম্যের মূর্ত প্রতীক্ সমাজকে ভেঙে ফেল্‌বার জন্য…"সত্যি, কি করুণ", আপন মনেই নমিতা বার গল্পটা শেষ করে।…

হাঁ, পড়ে নমিতা মুগ্ধ হয়ে গেছে; চোখেও জল ভরে এসেছে সমাজের অন্যায়ের কথা ভেবে…ও' একটু ভাবপ্রবণ সত্যি, অস্বীকার করা যায় না এ' কথা। কিন্তু… ওর ভিতরে আছে আগুন,…যা একদিন প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সব অসাম্যকে পুড়িয়ে উজ্জ্বল করে তুলবে ওর কানের হীরের দুলেরই মতো; সেই প্রেরণাই-তো ও সাম্যবাদী দলের একজন নেত্রী।

গাড়ী এসে থাম্‌লো একটা ছোট ষ্টেশনে;—বই-এর পাতা থেকে মুখ তুলে, জান্‌লা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে, নমিতা সিল্কের রুমাল দিয়ে চোখ মুছল…ও'র "পার্টির" বন্ধুরা যে বলে, ও' ভারী ভাবপ্রবণ, দেশের কাজের উপযুক্ত নয়—তা' একেবারে মিথ্যে নয়। ও'র মনটা সত্যি বড়ো কোমল।…

কাম্‌রার সামনে হাত পেতে দাঁড়ালো একটা ভিখারিণী…শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়ে জীর্ণ দেহের লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করেছে…রুক্ষ চেহারা…কোলে বছর খানেকের একটি নির্জীব শিশু।…করুণ সুরে নমিতার দিকে চেয়ে বল্লে—দুটো পয়সা দাও না মা, দু'দিন নিজে কিছুই খাই নি, কোলের ছেলেটাও উপোস…একে বাঁচাও মা!…আমারও একদিন ঘর-বাড়ী ছিল মা, কিন্তু—

আঃ জ্বালাতন, নমিতা বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লো—কি একটা বক্তৃতার কথাগুলো মনে হচ্ছিল, এই ভিখারিণীটার প্যান্-প্যানানিতে তা' হারিয়ে গেলো। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠ-স্বরে বল্লে,…এখানে কিছু হবে না, যাও যাও।…এ'সব ভিক্ষে করা ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। রেল কোম্পানীও যে কি হয়েছে—প্ল্যাটফর্মে ভিক্ষে করা—

ট্রেণ ছেড়ে দিতেই হাওয়ার জন্যে বাকী কথাটা আর শোনা গেল না। ভিখারী মেয়েটি জলভরা চোখে যেন কি প্রশ্ন নিয়ে চলন্ত ট্রেণের দিকে চেয়ে রইলো।…গাড়ীর ভিতর নমিতা তখন বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করে, সোনার রিষ্টওয়াচে সময় দেখ্‌ছিল, কলকাতা পৌঁছ্‌বার আর কত দেরী…বিকেলে আবার "পার্টি"র মিটিং আছে কিনা।

প্রাচীন ভারতের রঙ্গালয় ও রসনিষ্পত্তি

অধ্যাপক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ এম-এ, সাহিত্যশাস্ত্রী

মধ্যযুগে ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের রঙ্গালয়ের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। দেবতা, মনুষ্য এবং মনুষ্য-ভিন্ন বিকৃষ্ট জাতি—এই তিন জাতির রঙ্গালয়ের কথা ভরত বলিয়াছেন। সাধারণতঃ রঙ্গালয় তিন প্রকার—(১) বিকৃষ্ট (Rectangular) (২) চতুরস্র (quadrangular) এবং (৩) ত্র্যস্র (triangular). এই তিন রঙ্গালয় হস্তের প্রমাণ (measurement) অনুসারে পুনরায় তিন প্রকার—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ। হস্তের প্রমাণ লইয়াও পুনরায় তিন প্রকার। সর্বশুদ্ধ—১৮ প্রকার। রঙ্গালয় ১০৮ হাত (সম্ভবতঃ দৈর্ঘ্যে) হইলে তাহা জ্যেষ্ঠ, ৬৪ হাত হইলে মধ্যম এবং ৩২ হাত হইলে কনিষ্ঠ। ইহার মধ্যে বিকৃষ্ট জ্যেষ্ঠ, চতুরস্র মধ্যম এবং ত্র্যস্র কনিষ্ঠ। পুনরায় ইহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রঙ্গালয় দেবতাদিগের জন্য, মধ্যম মনুষ্যদিগের জন্য এবং শেষ প্রকৃতির জন্য কনিষ্ঠ। নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার শ্রীঅভিনব গুপ্ত বলেন যে এইস্থলে দেবতাদিগের রঙ্গালয় বলিতে দেবতাগণ দর্শক এইরূপ অর্থ নহে, কিন্তু যে নাটকে দেব এবং অসুর পরস্পর নায়ক প্রতিনায়ক সেই সকল স্থলে ১০৮ হাত রঙ্গালয়ের প্রয়োজন। কারণ সেই সকল নাটক অত্যন্তপ্রযত্ন এবং দীর্ঘ দীর্ঘতর তালাদি থাকায় জন্য বিস্তৃত রঙ্গালয়ের আবশ্যকতা আছে। কেহ কেহ বলেন এইস্থলে দেবগণ দর্শকরূপেই অভিপ্রেত।

এই তিন প্রকার রঙ্গালয়ের মধ্যে মধ্যম রঙ্গালয় প্রশস্ত। কারণ সেইখানে উচ্চারিত বাক্য এবং সঙ্গীত সুখশ্রাব্য হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগের এই মধ্যম রঙ্গালয় দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত এবং প্রস্থে ৩২ হাত হওয়া উচিত। রঙ্গালয় দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ইহার অধিক হওয়া উচিত নহে, কারণ তাহা দূরবর্তী হইলে পাঠ্য বিষয় হইয়া যায় এবং নাট্যের ভাব অব্যক্ত থাকিয়া যায়। সেইরূপে রঙ্গালয় কনিষ্ঠ অর্থাৎ ছোট হইলে নির্গত স্বর প্রতিধ্বনিত হইয়া পড়ে। কারণ স্বর উচ্চারিত হইবার পর তাহা যদি কাণে না লাগিয়া থাকে তাহাকে বিস্বর বলে। স্বরের প্রকৃত রূপ অনুরণন (Resounding)। এই সকল কারণে মধ্যম রঙ্গালয়ই প্রশস্ততম। এই রঙ্গালয় নির্মাণ করিবার পদ্ধতি নাট্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ রঙ্গালয় দুই ভাগে বিভক্ত—একটি রঙ্গমঞ্চ এবং অপরটি দর্শকমণ্ডলীর আসন। রঙ্গমঞ্চের সম্মুখ এবং পার্শ্বদ্বয় খোলা থাকিত। পশ্চাতে একটিমাত্র যবনিকা। এই যবনিকার গায়ে গ্রাম, উদ্যান, তপোবন, নদী, পর্বত প্রভৃতির নানা চিত্র অঙ্কিত থাকিত। নট রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত দৃশ্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। তাহার পর অভিনয় চলিত। এই জন্য সংস্কৃত নাটকগুলিতে আমরা "ইতি পরিক্রামতি" এইরূপ প্রয়োগ সূচনা (Stage-direction) দেখিতে পাই। যবনিকার দুই প্রান্তে দুইটি দ্বার। তাহার গায়ের প্রবেশ এবং নিষ্ক্রমণ হইত। যবনিকার অপর নামগুলিরও ব্যবহার দেখা যায়, যেমন—পটী, অপটী, চিত্রকর্মিণী, প্রতিসীরা। কোন নটের পক্ষেই অনুচিত হইয়া হোৎ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করা কিংবা অকস্মাৎ নিষ্ক্রান্ত হওয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল। তাহার কারণ ইহাতে রসভঙ্গ হয়। যে সকল স্থলে নটের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ সূচনা করিবার সুযোগ থাকিত না সেই সকল স্থলে নট যবনিকা-সঞ্চালন করিয়া প্রবেশ করিত। এতদ্ব্যতীতও সঞ্চালন করিয়া প্রবেশ করা যায়ের বিধান ছিল। যেমন 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র ষষ্ঠাঙ্কে কঞ্চুকীর প্রবেশ। যবনিকার পশ্চাতে যাবকপর্ণের স্থান (orchestra)। ইহার পশ্চাতে বেশ্যা গৃহ (Green Room)। রঙ্গমঞ্চে যাহার প্রয়োগ সুবিধাজনক হইত না যেমন অশ্বারোহী হাতী, রোদবাস, বিকট শব্দ ইত্যাদি—তাহার অনুষ্ঠান বেশ্যা গৃহে হইত। রঙ্গমঞ্চের উপর সম্মুখস্থ প্রান্তভাগের নাম "রঙ্গশীর্ষ"। ইহা কারুকার্য-খচিত থাকিত এবং এইখানেই অর্ঘ্যোৎসব প্রভৃতি হইত। এইখানে দর্শকমণ্ডলীর বসিবার স্থান। রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখেই একটি বারান্দা থাকিত এবং খুব সম্ভবতঃ ইহাতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বসিতেন। ইহার ঠিক পশ্চাতেই একটি বেত্র গুল্ম এবং তাহার পশ্চাতে ব্রাহ্মণদিগের বসিবার স্থান। তাহারও ঠিক পশ্চাতে একটি রক্তবর্ণ গুল্ম এবং ইহার পশ্চাতে ক্ষত্রিয়গণের আসন। রঙ্গমঞ্চের উত্তরপশ্চিম দিকে একটি পীত গুল্ম থাকিত এবং ইহার পর বৈশ্যগণের আসন। উত্তর পূর্বভাগে কৃষ্ণনীল গুল্ম এবং তাহার পর শূদ্রদিগের আসন। আসনগুলি সাধারণতঃ কাষ্ঠ কিংবা ইষ্টক নির্মিত হইত এবং বেদ্যাকারে রক্ষিত থাকিত। রঙ্গমঞ্চ দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে আট হাত হইত। উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গালয়ের একটি নক্সা পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। মোটের উপর দেখা যায় যে তৎকালীন রঙ্গালয়ের বিশেষ কোন জাঁকজমক বা সাজসজ্জা ছিল না। একটিমাত্র যবনিকা থাকায় অঙ্কই নাটকের একাধিক মৃশ্যাবলী দর্শকগণকে কল্পনা করিয়া লইতে হইত। ইউরোপে সেক্সপীয়রের সময় যেরূপ রঙ্গালয় ছিল ইহা তাহারই অনুরূপ।

রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়া অভিনয় দেখিতে দেখিতে আমরা কখনও হাসি, কখনও আনন্দ বা গর্ব অনুভব করি, কখনও বা কাঁদি। কিন্তু কাহার দুঃখে কাঁদি? আমাদের নিকট নয়। আমরা দুঃখ পাইবার জন্য রঙ্গালয় যাই না, তাহাতেও আবার পয়সা খরচ করিয়া। তবে দুঃখ কাহার? কে কাঁদে এবং কেন কাঁদে। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় কণ্ব, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, শকুন্তলা—ইহারা সকলেই কাঁদিতেছে, তাই বলিয়া আমরা কাঁদিব কেন? তাহা ছাড়াও রঙ্গমঞ্চে যে সকল নট নটী কাঁদিতেছে তাহারা সকলেই কৃত্রিম উপায়ে কাঁদিতেছে। তাহারা ঐ কান্না নাট্যাচার্যের নিকট অনবরত অভ্যাস করিয়া

আসিয়াছে। সুতরাং তাহাদের দুঃখও কৃত্রিম। কিন্তু আমরা সত্যই কাঁদি অথচ আমাদের নিজের কোনও দুঃখ নাই। পরের দুঃখচিত্রণ দেখিয়া কাঁদি। বাস্তবিকপক্ষে ইহা আমাদের দুঃখ নহে, ইহা আমাদের আনন্দ। সেই আনন্দ অনুভব করিয়া আমরা কাঁদি। জগতের যেসব মহাকবি করুণ রসের আনন্দে অশ্রুপাত করিয়াছেন। কিন্তু এই আনন্দ জগতের সাধারণ সুখ হইতে বিলক্ষণ। ইহার নাম রস; তাহা অলৌকিক এবং অমৃত। আমাদের হৃদয়ে অন্তর্নিহিত যে অসংখ্য বৃত্তি (মনোভাব) আছে তাহাদিগকে আটভাগে বিভাগ করা যায়। রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, (কাম)। এইগুলির নাম স্থায়িভাব। ইহারাই আত্মাভাবে হৃদয়ে রসরূপে পরিণত হয়। যেমন স্থায়িভাব রতি সুমার রসরূপে পরিণত হয়। কী করিয়া ইহা সংঘটিত হয় তাহা উদাহরণ দিয়া বোঝান যাইক। এ বিষয়ে ভরতের সূত্রসূত্র হইতেছে—"বিভাবানুভাবব্যভিচারি সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ"—অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব ইহাদের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়।

এই সূত্রের টীকা লোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক, অভিনবগুপ্ত, জগন্নাথ প্রভৃতি মনীষিবর্গ ৭ ৭ মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, এবং ভট্টনায়কের গ্রন্থ এখনো লুপ্ত। অভিনবগুপ্ত ইঁহাদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। রসনিষ্পত্তি বিষয়ে শ্রীভট্টলোল্লটের মতটি আমি বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ভট্টনায়ক বলেন—যে রঙ্গালয়ে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হইতেছে সেখানে শকুন্তলার প্রতি রতি (Love) কাহার? দর্শকের? না, নাটকের চরিত্র দুষ্মন্তের? না, দুষ্মন্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতার? শকুন্তলার প্রতি যদি কেবল দুষ্মন্তেরই রতিভাব অর্থাৎ আসক্তি হয়, তাহা হইলে আমাদের রসাস্বাদ হইবে কি করিয়া? দুষ্মন্তের হইতে পারে। সেইরূপ অভিনেতার হইতে পারে না। কারণ আমরা (দর্শকরা) অনবরত বলিয়া থাকি যে দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেমসূত্রের রসাস্বাদ আস্বাদের হইতেছে। তাহা হইলে শকুন্তলার প্রতি যে রতি সে কী আমাদের? অর্থাৎ আমারই কী শকুন্তলার প্রতি আসক্ত? ইহাও হইতে পারে না। কারণ শকুন্তলা আমাদের প্রেয়সী নহে। সে দুষ্মন্তের প্রেয়সী। সুতরাং তাহার প্রতি আমাদের রতি থাকিতেই পারে না। কেহ যদি এইখানে বলে যে পরকীয়া স্ত্রীতে রতি বিষম নহে। তাহার উত্তর এই যে আমাদের মূল রতি সম্ভোগের বিকাশ; উপভোগের কিংবা রসভোগের নহে। সম্ভোগের উদ্রেক হইলেই যথার্থ রসাস্বাদ হয়। পাক পণ্ডিত, মূল্য তাহার স্থান রসাস্বাদের চিন্তায় নাই। Art is moral, যদি কেহ বলেন—অনুকরণের স্থান রসাস্বাদের চিন্তায় আছে—তাহা হইলে আমরা তাহার রসাস্বাদকে রসাভাস বলিব। এই মূলে যদি কেহ এইরূপ বলেন যে শকুন্তলাকে নিজশ্রেণী ভাবিয়া লইতে বাধা কী? তাহার উত্তর এই যে বাধা আছে। কারণ যে নায়িকে কোনদিন পরস্ত্রী বলিয়া জানি নাই, তাহাকেই যদি নিজ-শ্রেণী ভাবিয়া লইতে পারি। কিন্তু শকুন্তলার বেলা তাহা হয় না। সে রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষভাবে দুষ্মন্তের ভাষাতেই উপস্থিত। অথচ কেহ যদি বলেন যে, দর্শক যদি দুষ্মন্তের সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে শকুন্তলাকে নিজ ভাষ্যরূপে জ্ঞান করা সহজ। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে সমাজের পৃথিবীর অধীশ্বর যদি দুষ্মন্তের মতো দুষ্মন্তের সহিত আমাদের অভেদবুদ্ধি কী করিয়া হইবে? আমরা দর্শকের আসনে বসিয়া দুষ্মন্তের সহিত অভিন্ন হইতে পারি না। যদি কেহ বলা বাড়িয়া তবে বলেন যে, শকুন্তলার প্রতি যদি আমাদের রতিই না হইল তাহা হইলে আমাদের রসাস্বাদ হয় কী করিয়া? ইহার উত্তরে ভট্টনায়ক বলিয়াছেন যে কাব্যের বিভাব (অর্থাৎ দুষ্মন্ত, শকুন্তলা ইত্যাদি) অনুভাব প্রভৃতির এমন একটা অনির্বচনীয় শক্তি আছে যাহার বলে শকুন্তলা আমাদের সম্মুখে দুষ্মন্তের ভাষ্যরূপে উপস্থিত হয় না, কিন্তু সাধারণ রমণীরূপে (Universal woman), যে রমণীকে দর্শক এবং দুষ্মন্ত উভয়েই ভালবাসিতে পারে। বিভাবাদির এই ব্যাপারের (function) নাম "ভাবকত্বব্যাপার" কিংবা "সাধারণীকৃতি"। এই শক্তির প্রভাবে শকুন্তলা দর্শকের এবং দুষ্মন্তের নিকট সাধারণ ভাষ্যরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। দর্শকের নিকট তখন "এই শকুন্তলা দুষ্মন্তেরই ভাষ্যা" এইরূপ জ্ঞান আর থাকে না। তখন তাহার জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত ভালোবাসা এই শকুন্তলার প্রতি ধাবিত হয়। সেইরূপে দুষ্মন্ত সাধারণ পৃথিবীর অধীশ্বররূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হন না, কিন্তু সাধারণ মানুষরূপে, যাহার সহিত আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি। এইরূপ দুষ্মন্তের ভালোবাসা আমাদের ভালোবাসা বলিয়া মনে হয়। রামের দুঃখপ্রকাশ, রাবণবধ, লক্ষ্মণবর্জন এ সকল যেন আমাদের। তাই বনবাসে সীতার প্রথম আমাদের ধৈর্যচ্যুতি বিচলিত করে। এইরূপে কেবল নায়ক নায়িকা নহে—যেন, কাল দেশ সাধারণীকৃত হইয়া যায়। অর্থাৎ কবির অনুভাবন কেবল কবির অনুভাবনরূপে প্রতিভাত হয় না-কিন্তু সাধারণরূপে প্রতিভাত হয়, এইরূপ স্থিতকালে আমরা যদি রঙ্গালয়ে কোন ঐতিহাসিক দৃশ্য দেখি তাহাতে রসোপলব্ধির বাধা ঘটে না। কারণ কাল সেখানে সাধারণীকৃত। কাব্য পড়িতে পড়িতেও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে, কোন পুরাস্মৃতি আমোদের প্রথম বিষয় চিরনূতন হইয়া উপস্থিত হয়। কাব্যের এই ভাবকত্ব ব্যাপার অলৌকিক। এইরূপে ভাবকত্ব ব্যাপার দ্বারা বিভাবাদি সাধারণীকৃত হইলে "ভোজকত্ব ব্যাপার" দ্বারা রসাস্বাদ হইয়া থাকে। ইহা দ্বিতীয় অলৌকিক ব্যাপার। এই ব্যাপারের প্রভাবে আমাদের চিত্তের যাহা কিছু রজোগুণ এবং তমোগুণ তাহা দূরীভূত হইয়া আবরণ শূন্য হইয়া যায়। আমাদের চিত্ত সত্ত্বপ্রধান হইয়া উঠে এবং বিশ্বকে আলিঙ্গন করে। এই আলোচনাপ্রসঙ্গে আচার্য অভিনবগুপ্ত একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়কের মত 'ভাবকত্ব' নামে পৃথক্ ব্যাপার স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে কাব্যের সুখদুঃখকে আমরা হৃদয়সংবাদের দ্বারা পাইয়া থাকি। যেমন মহাকবি বাল্মীকি হৃদয়সংবাদ (Agreement of the heart) দ্বারা শ্লোকের শোককে পাইয়াছিলেন। শোক বাস্তবিকপক্ষে রসাত্মিকা নহে। কারণ তাহার ব্যক্তিগত শোক হইলে

তিনি রামায়ণ রচনা করিতে পারিতেন না। শোকে সকলেই মুহ্যমান হইয়া পড়ে। কিন্তু অপরের শোককে (অর্থাৎ ক্রৌঞ্চ পাখীর) তিনি নিজের মধ্যে পাইয়াছিলেন তন্ময়ীভাব এবং হৃদয়-সংবাদ দ্বারা। অর্থাৎ তিনি বিলাপরত ক্রৌঞ্চের নিকট তাঁহার হৃদয় প্রসারিত করিয়া তাঁহার শোকে শোকবান্ হইয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার শোক শ্লোকাকারে পরিণত হইয়াছিল। তখন সেই শোক কেবলমাত্র ক্রৌঞ্চের কিংবা বাল্মীকির নহে তাহা সর্বকালের সর্বজনের। এইখানে কেহ যদি এইরূপ প্রশ্ন করে যে বাল্মীকি ক্রৌঞ্চের শোক পাইয়াছিলেন বুঝিলাম, কিন্তু তিনি রামায়ণ রচনা করিলেন কী জন্য? ইহার উত্তরে অভিনবগুপ্ত একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন—জলপূর্ণ ঘট আমরা যখন মাথায় করিয়া লইয়া যাই তখন একটু জল উছলাইয়া পড়ে; সেইরূপ শোকপরিপূর্ণ বাল্মীকি-হৃদয়ের দুর্বার আবেগ রামায়ণ-রূপ কাব্য রচনা করিয়া নির্গত হইয়াছিল। সেই আবেগকে প্রশ্ন করা চলে না—কেন তুমি নির্গত হইয়াছিলে? তাহা যেমন ঘট হইতে জলের স্থায় বাল্মীকির হৃদয় হইতে আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। এইরূপে সহৃদয় ব্যক্তিই কেবল প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে পারে। 'সহৃদয়' আমরা তাহাকেই বলিব যাহার হৃদয় অপরের সুখ দুঃখকে তন্ময় হইয়া অনুভব করিতে পারে এবং অনবরত সৎকাব্য অভ্যাস করিয়া যাহাদের বিমল মনোদর্পণে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় তাহাদের প্রতিবিম্ব ফেলিতে পারে। একথায় যাহাদের হৃদয় অন্য জন্মান্তরের সুখদুঃখের স্মৃতি বহন করিয়া থাকে এবং যখন তাহারা রঙ্গমঞ্চে এই জন্মান্তরের সুখদুঃখের অভিনয় দেখে, তখন তাহাদের সেই সঞ্চীয় অসীম সাধারণের হৃদয় সহসা উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ভারতের আমদানী বাণিজ্য ও জাতীয় স্বার্থ

এবারকার মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রপথ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠায় এবার বিদেশ হইতে ভারতে পণ্য আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই পণ্য আমদানী বন্ধের ফলে অসংখ্য প্রকার ভোগ্যপণ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী ভারতবর্ষের অসুবিধার শেষ ছিল না। যুদ্ধের মধ্যে সামান্য সামান্য পণ্য যাও আমদানী হইতেছিল, সামরিক প্রয়োজনের নামে ভারত সরকার সেগুলি সর্বাগ্রে গ্রাস করায় অসামরিক দেশবাসীর ভাগ্যে বলিতে গেলে কিছুই জুটে নাই। এই প্রচণ্ড পণ্যাভাবের দিনে ভারতসরকার উৎসাহ দিলে এ দেশে বহু নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইতে পারিত, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কতকটা যুদ্ধোত্তর বিলাতী পণ্যের বাজার রক্ষা করিতে এবং কতকটা সামরিক পণ্যাদির কারখানায় মজুরের অভাব আশঙ্কা করিয়া এদেশের শিল্প প্রসারে পরোক্ষে বাধা দিয়া ভারতের আত্মনির্ভরশীল হইবার এই সুবর্ণসুযোগ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। নিজেদের একান্ত প্রয়োজনে তাঁহারা এদেশে অল্প কয়েকটি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, তবে এই সব নূতন বা সম্প্রসারিত শিল্পজাত পণ্যাদির শতকরা প্রায় একশত ভাগই সামরিক প্রয়োজনের নামে গ্রাস করিয়া ইহাদের সহিত দেশের লোকের পরিচয় ঘটিতে দেন নাই। ইহার ফলে এখন যুদ্ধ থামিবার পর এই সব পণ্য উৎপাদনের কারখানার বয়স কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ বৎসর হইলেও এখন ইহারা একেবারে আনকোরা কারখানারূপে দেশবাসীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং ইহাদের পণ্যাদির যে ত্রুটি যুদ্ধের সময় ব্যবহারকারীদের সমালোচনায় সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা সংশোধিত না হওয়ায় ইহাদের পণ্যাদি বাজারে মোটেই আদৃত হইতেছে না। পরিচিত বিদেশী পণ্য এখনই কিছু কিছু আসিতে শুরু করিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে আরও আসিবে; কাজেই দেশের লোকের যথেষ্ট অভাব থাকিলেও তাহারা ভাল জিনিষের জন্য এখন অপেক্ষা করাই সমীচীন মনে করিতেছে।

যুদ্ধ শেষ হইলেও ভারতের বাজারে বিবিধ ভোগ্যপণ্যের প্রচণ্ড চাহিদার জন্য এখানে অনেক নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইতে পারে। ভারতসরকার কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন, যুদ্ধোত্তর

কালেও তাহাই পুরোমাত্রায় বজায় আছে। তাছাড়া ষ্টার্লিং পাওনা সম্বন্ধীয় কোন সমাধান এখনো হয় নাই বলিয়া বিদেশ হইতে প্রয়োজনানুরূপ কলকারখানার যন্ত্রপাতি আমদানীও সম্ভব হইতেছে না। ইতিমধ্যে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্য শুরু হইয়া গিয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, যত দিন যাইবে, ভারতে বিদেশীদের বাণিজ্য ততই প্রসারিত হইবে।

সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ১৯৪৫ সালের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টেই বুঝা যায় যুদ্ধের মধ্যে ভারতের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ ভারত সরকারের উদাসীন্যে নষ্ট হওয়ার ফল এই দুর্ভাগ্য দেশের পক্ষে কিরূপ মারাত্মক হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের হিসাবে যুদ্ধ শেষ হইবার পর মাত্র ৫ মাসের হিসাব আছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের আমদানী বাণিজ্য লক্ষণীয়-ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৪৫ সালে ভারতে মোট ২৩৭ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার বিদেশী পণ্য আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে আমদানী পণ্যের মূল্য ছিল ১৮০ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। আমদানী বাণিজ্য এইভাবে বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্য বাড়িলে আমরা ততটা আশঙ্কিত হইতাম না, কারণ ১৯৪৫ সালে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী উভয় বাণিজ্যই পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অনুপাতে সমানহারে বৃদ্ধি পাইলে ১৯৪৪ সালের অনুকূল বাণিজ্যিক গতির ধারা এ বৎসরও পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই। ১৯৪৪ সালে ভারতে আমদানী হয় ১৮০ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার মাল এবং রপ্তানী হয় ২৩১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার মাল, অর্থাৎ এ বৎসর ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ১৯৪৫ সালে ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছে ২৪০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার মাল, কিন্তু এবার আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য গত বৎসর অপেক্ষা প্রায় ৫৭ কোটি টাকা বেশী হওয়ায় বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। এই বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস বিদেশী মুদ্রার হিসাবে ভারতের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যই বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করিবে। ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংগুলি কবে আদায় হইবে কিছুই ঠিক নাই, আদায় হইলেও তাহার বিপরীত দিকে ভারতসরকারের ঋণপত্রে, প্রচলিত নোটে এবং ধন ও ইজারা ব্যবস্থা অনুযায়ী মার্কিণী দেনার প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার আর্থিক দায়িত্ব আছে। সে হিসাবে ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্তের প্রয়োজন এখন অত্যধিক। ভারতে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আশা করা যায় এবার অন্ততঃ ভারতের কৃষি-শিল্প সংস্কার সম্বন্ধে ভারত সরকারের চিরাচরিত ঔদাসীন্যের অবসান ঘটিবে। কাজেই ভারতে জাতীয় সরকারের অধীনে এখন যদি কলকারখানার সম্প্রসারণ হয়, বিদেশ হইতে প্রয়োজনমত যন্ত্রপাতি আমদানী করিবার জন্য বাণিজ্য উদ্বৃত্ত একান্ত আবশ্যক। যুদ্ধোত্তর প্রথম বৎসরেই ভারতের বাজারে বিদেশী ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য্যের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে তাহা ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে নিঃসন্দেহে বিপদের কারণ হইবে। আগেই বলা হইয়াছে, ভারতের আধিপত্যতান্ত্রিক বিদেশী সরকার ভারতে বিলাতী মালের বাজার রক্ষার উদ্দেশ্যেই এদেশে শিল্প-সংস্কারের যুদ্ধকালীন সুবর্ণসুযোগ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। ভারতের বহির্বাণিজ্যের হিসাবে আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাইতেছে, এজন্য ইহাদের পুলকিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতের সত্যকার যাঁহারা কল্যাণকামী তাঁহারা ভারতবাসীর পণ্যাভাবের নাম করিয়া এদেশের বাজার বিলাতী মালে ভর্ত্তি করিয়া দিতে কখনই চাহিবেন না। জাতির বৃহত্তর স্বার্থ উপলব্ধি করিয়া ভারতবাসীরও সহস্র অভাব সত্ত্বেও এদেশের বাজারে বিলাতী মালের ব্যাপক প্রবেশে বাধা দেওয়া উচিত। তাহাদের বুঝা উচিত, যুদ্ধের প্রচণ্ড ওলটপালটের মধ্যে ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করিবার যে সুযোগ বর্ত্তমানে আসিয়াছে, বিদেশী পণ্য আমদানীর পথে প্রথম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করিলে সেই সুযোগ ব্যর্থ হইবে। নিজেদের বিরাট ভবিষ্যত সৃষ্টির জন্য বিদেশী পণ্য সাধ্যমত বর্জ্জনের দ্বারা ভারতবাসীর এই সময় ত্যাগ স্বীকারের বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, উপরিউক্ত কর্ত্তব্যবোধ ভারতীয় ব্যবসাদার ও জনসাধারণ সকলেরই থাকা দরকার। জনসাধারণ প্রায় ক্ষেত্রেই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, জাতীয় স্বার্থ-রক্ষার জন্য অভাব সহিয়া ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার তাহাদের

পক্ষে কঠিন। কাজেই এ বিষয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব অধিক বলিয়া আমরা মনে করি। যাঁহারা বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী করেন, সমগ্র দেশের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই পণ্য আমদানীর ব্যাপারে তাঁহাদের নিজেদের লাভক্ষতি বিবেচনা করা উচিত। এই শ্রেণীর আমদানীকারকেরা অর্থবান ব্যক্তি, বিভিন্ন পণ্য সম্বন্ধে এবং পণ্যের বাজার সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রায় ক্ষেত্রেই প্রচুর। কাজেই বিদেশ হইতে মাল আনাইবার চেষ্টার পূর্ব্বে এ দেশের শিল্প-সংস্কারের প্রয়াসে তাঁহাদের সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে এখনি হয়তো তাঁহাদের তেমন লাভ হইবে না, কিন্তু এইভাবে চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে যথেষ্ট লাভবান হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবার গৌরবও তাঁহারা লাভ করিবেন।

দুঃখের বিষয়, অনেক ভারতীয় আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান এদিক হইতে সমস্যাটিকে দেখিতেছেন না। 'আর্থিক জগৎ' পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতের বৃহত্তম সাইকেল আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের জনৈক অংশীদার মার্কি লণ্ডনে গিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ সাইকেল ক্রয় করিবার জন্য তাঁহার কোম্পানী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ শিল্পপতিরা এমন কি ব্রিটিশ সরকারও ভারতের বাজারে এখন বিলাতী মাল যত বেশী পারেন কাটাইতে চান, কাজেই একটি বড় ভারতীয় আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির এই কথায় তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। দেশে যুদ্ধোত্তর সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান বজায় রাখিবার জন্য ব্রিটিশ বোর্ড অব ট্রেড ব্রিটেনের রপ্তানী বাণিজ্য যুদ্ধের আগের তুলনায় শতকরা ৭৫ ভাগ বাড়াইবার এক বিরাট পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন এবং এই পরিকল্পনা অনুসারে এখন কাজও চলিতেছে। ভারতের বাজারের উপর ব্রিটিশ বণিকদের চিরকালের ভরসা। কাজেই ভারতবর্ষের লোকেরা যদি ব্রিটিশ মাল সাগ্রহে কিনিতে থাকে, ব্রিটিশ রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনা এমনিই বাড়িয়া যায়। মোট কথা, দেশের বর্ত্তমান দুঃসময়ে বিদেশী পণ্য আমদানী বা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে দেশবাসীর বিশেষভাবে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

'কুড ষ্ট্যাটিস্‌টিকস্ অব ইণ্ডিয়া'

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ৪০ কোটি আন্দাজ লোক বাস করে। বৎসরে এদেশে গড়ে ৫০ লক্ষ হিসাবে লোক বাড়িতেছে। ভারতে উল্লেখযোগ্য শিল্পপ্রসার হয় নাই বলিয়া এদেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে জীবিকানির্ব্বাহ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। মোটের উপর ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা অন্ততঃ ৮০ ভাগকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষি-ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিতে হয়।

বর্ত্তমানে অবশ্য ভারতে শিল্পপ্রসারের চেষ্টা চলিতেছে। তবে একথা ঠিক যে, এই বিরাটায়তন দেশের অসংখ্য অধিবাসীর জীবিকা-সংস্থানের উপযোগী শিল্পপ্রসার বহু সময়সাপেক্ষ। এ হিসাবে এখনও দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোককে কৃষির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

সম্পূর্ণ কৃষিজীবী দেশ হইলেও ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে ভারত সরকার এতকাল বিস্ময়কর উদাসীনতা দেখাইয়াছেন। অবশ্য যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রচুর সুযোগ সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভারতে শিল্পপ্রসার হইতে দেন নাই, কৃষির প্রতি এই উদাসীনতার তাহাই মূল কারণ। আসলে ভারতের এই আমলাতান্ত্রিক সরকার ভারতবাসীকে দরিদ্র ও অশিক্ষিত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের কোটি কোটি অধিবাসী শিক্ষায় ও অর্থস্বাচ্ছল্যে বড় হইয়া উঠিলে ব্রিটিশ জাতির পক্ষে তাহাদিগকে বেশীদিন বশে রাখা সম্ভব হইবে না।

যাহা হউক, মহাযুদ্ধের অবসানে ভারত সরকারের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন যে দেখা যাইতেছে, ইহাত সত্যই আশার কথা। মুমূর্ষু ভারতবাসীর সহিত ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ একটা আপোষজনক মীমাংসা করিয়া ফেলিতেই এখন ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন। এই জন্যই তাঁহারা কংগ্রেসকে অন্তর্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্ট গঠনের ভার দিয়াছেন।

ভারতবাসীর প্রধান উপজীবিকা কৃষি সম্বন্ধে তাঁহারা যে এতকাল পরে একটু আগ্রহশীল হইয়াছেন, তাহার অন্যতম প্রমাণ, তাঁহারা শীঘ্রই ভারতবর্ষের কৃষি ও খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যসম্বলিত একখানি সংকলন পুস্তিকা প্রকাশ করিতেছেন। এই প্রয়োজনীয় পুস্তিকাখানির নাম হইবে

'ফুড ষ্ট্যাটিসটিকস্ অব্ ইণ্ডিয়া' (ভারতের খাদ্যসংক্রান্ত তথ্য সংকলন)। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভি কে আর ভি রাও এই পুস্তিকাখানির সম্পাদনা করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, কৃষি ও খাদ্যসংক্রান্ত তথ্যাদি সম্বলিত এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে ভারতীয় কৃষির প্রভূত উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিবে। জমি, সার, সেচ, ফসল, বাজার, যোগাযোগ, যানবাহন প্রভৃতির সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব এতকাল পাওয়া যাইত না বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও সর্ব্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে কৃষিকর্ম্মের উন্নতিসাধন সম্ভব ছিল না। উল্লিখিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে কৃষি-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার যথেষ্ট সুবিধা হইবে এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় কৃষিরও উন্নতি হওয়া স্বাভাবিক।

'ফুড ষ্ট্যাটিসটিকস্ অব ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক ডাঃ রাও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আশা করা যায় তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থ তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য হইয়া খাদ্যের দিক হইতে ঘাটতি ও কৃষিকর্ম্মের দিক হইতে পশ্চাৎপদ এদেশের সত্যকার কল্যাণসাধন করিবে।

'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম'

অধ্যাপক শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম-এ

শ্রুতির সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুষ্ঠিত পাপপুণ্যের ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতদুষ্কৃতের ফল সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া ক্ষয় না করিতে পারিলে মুক্তি নাই ইহাই প্রাচীন ঋষিসিদ্ধান্ত। সেই ফলভোগের কাল অতিদীর্ঘও হইতে পারে আবার অতিস্বল্পও হইতে পারে। পরজন্মেও হইতে পারে, ইহজন্মেও হইতে বাধা নাই।

ত্রিভির্বিবৃদ্ধিমাপন্নৈঃ ত্রিভিঃপঞ্চভিরন্বিতৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও গোপিকাসঙ্গত শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে না পারিয়া জনৈক গোপীর দেহান্তরপ্রাপ্তি সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণনা আছে—

তত্ত্বপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষ পাতকা।
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদ ক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
চিন্তয়ন্তী পরং যুক্তিং পরব্রহ্ম স্বরূপিণং।
নিরস্ত্রাসা তদা যুক্তিং ধর্ম্মাত্মা সোপপদ্যত।

সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্ম যে ভোগদ্বারাই নাশ হইতে পারে এই শ্রুতিসিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিতও সমর্থিত আছে।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ "যাবোঽপি সন্ধ্যঃ সবনস্য কল্পতে" (তৃতীয় স্কন্ধ, ৩৩শ অধ্যায় ৩৯ শ্লোক) দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বর্ণনা করেন যে ভগবদ্ভক্তিও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনাশ করে ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে—

দুর্জ্জাতিরেষ সবনাবোগ্যত্বে কারণং মতঃ।

অর্থাৎ যাব (চণ্ডাল) প্রভৃতির নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণই তাহাদের যজ্ঞানুষ্ঠানের বাধক। ভগবদ্ভক্তি দ্বারা উক্ত অযোগ্যতা দূর হইয়া তাহাদের যাগানুষ্ঠানে অধিকার হয়।

কিন্তু এই মত স্বীকার করিলে শাস্ত্রবিরোধ উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে আছে—

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি-শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, প্রকৃতিখণ্ড ২৬।৭।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণও গোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন যে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আর্ত্ত জিজ্ঞাসু ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা সুহৃৎ তাঁহারা তাঁহার পুণ্যরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করেন এবং যাঁহারা শত্রু তাঁহারা পাপরূপ প্রারব্ধ ফলভোগ করেন। তাঁহার মতে প্রারব্ধকর্ম্ম অন্ততঃ অল্পের দ্বারাও ভোগ হইয়া নাশ হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে না।

শ্রীল রূপ গোস্বামীর টীকাকার শ্রীধর স্বামী এবং তাঁহার টীকার টীকাকার রাধারমণ দাস গোস্বামীর উক্ত "যাবোঽপি সন্ধ্যঃ সবনায় কল্পতে" শ্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত বাক্যে চণ্ডালাদির হরিভক্তি প্রভাবে ইহজন্মেই ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকার হয় ইহাই শ্রীরূপ গোস্বামীর মত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীধর স্বামীর মতে "অবেন পুণ্যেন লক্ষ্যতে"। রাধারমণ দাস গোস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে যেমন অনুপনীত দ্বিজাতির কোন পাপ না থাকিলেও যাগানুষ্ঠান করিতে হইলে উপনয়ন অত্যাবশ্যক, সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত শ্বপচাদিরও যাগানুষ্ঠানে জন্মান্তরের অপেক্ষা আছে। শ্রীজীব গোস্বামীও বলিয়াছেন—"সন্ধ্যঃ সবনায় কল্পত" ইতি—

'সকৃদুচ্চরিতং যেন-হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি।'

ইতিবৎ তত্র যোগ্যতায়াং সন্ধ্যায়ন্তো ভবতীত্যর্থঃ।

তথানন্তরজন্মন্যেব দ্বিজত্বং প্রাপ্য তত্রাধিকারী স্যাৎ। ক্রমসন্দর্ভ।

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে চণ্ডালাদিরও সবন অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ্যতা জন্মায় কিন্তু তাঁহারা পরজন্মেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া উক্ত সবনাদিতে অধিকারী হন।

প্রকৃত, হরিভক্তিবিলাসের সপ্তদশ বিলাসে পুরশ্চরণ প্রকরণে পুরশ্চরণে বর্জ্জনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদীক্ষা দ্বারা যাবৎ পাপের ব্রাহ্মণত্ব লাভের সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্মত হইলে ঐরূপ বর্জ্জনের ব্যবস্থা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ইহা সুধীজনের বিচার্য্য।

ক্ষমতা

(একাঙ্কিকা)

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

বড় হাকিম শ্রীনাথবাবুর বাড়ীর আপিসঘর। ঘরটি বেশ বড়—টেবিল, চেয়ার, বইয়ের তাক, বেয়ারা-পাখী, ফাইল প্রভৃতি দিয়া সাজানো। ইলেক্‌ট্রিক বাতি, পাখা। টেবিলের উপর ব্লোয়ারখান, ব্লটিংপ্যাড, কাগজের ফাইল। টেবিলের দুপাশে দুজোড়া। ঘরের দক্ষিণে ও বামে প্রত্যেক দুইপ্রান্তে দুইটি দরোজা, বাহির হইতে একের যাতায়াত করিবার জন্য। বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য প্রেক্ষাগারের বিপরীত দিকে একটি দরোজা, দরোজায় পরদা টাঙানো।

যবনিকা উঠিতেই পরদার অন্তরালস্থিত ঘড়ীতে
চং চং করিয়া বারোটা বাজিল

একজন ফেরিওয়ালা কাঁধে হরেক রকম মোট লইয়া ঘরে ঢুকিল। এদিক ওদিক তাকাইয়া মেঝেয় উপর মোট রাখিল, কাঁধের গামছা দিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া খানিকটা বাড়িয়া বাতাস খাইল। তারপর ডাক দিল—

ফেরিওয়ালা। মাঠা'ন্ কই গো, মাঠা'ন্? ও মাঠা'ন্-মেমসায়েব? মাঠা'ন্-মেমসায়েব! ছিটের কাপড় আর 'নেস্' যা নেসতে বলেছিলেন, তা এনিচি। একবার এসে দেখবেন নি কো, ও মাঠা'ন্-মেমসায়েব?

পোঁটলা খুলিয়া নানা আকারের কাগজের
বাক্স মেঝেয় সাজাইয়া রাখিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীনাথবাবুর স্ত্রী সুনয়নী বাড়ীর ভিতর হইতে আসিলেন। তাঁহার বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। তিনি বাঙালী-গৃহিণী বলিয়া 'মাঠান' এবং বড় হাকিমের স্ত্রী সুতরাং মেমসায়েব। ফেরিওয়ালা সম্মান করিয়া ডাকে 'মাঠান-মেমসায়েব'। ফেরিওয়ালার আগমনে সুনয়নী দুই ভয়-চকিত, কারণ হাকিম সব বাড়ী আছেন।

সুনয়নী। চুপ চুপ। (বাড়ীর ভিতরের দিকে আঙুল দেখাইয়া) আজ উনি বাড়ী আছেন, আপিস যান নি। তোমায় দেখলে আর রক্ষে রাখবেন না, আজ তুমি যাও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাঠীর খটাখট শব্দসহ একটা খাটের ডাণ্ডা হাতে করিয়া বড় হাকিম শ্রীনাথবাবু ফেরিওয়ালাকে তাড়া করিয়া আসিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উপর, আঁট-সাট চেহারা, কিন্তু মুখে বলিরেখা, মাথায় অল্পস্বল্প টেরি—সেই আমলের কলসাটপার্টিজাতীয় চেহারা। দৃষ্টিভঙ্গী নিষ্ঠুর পোঁয়ারতুমির পরিচায়ক, সুনয়নী ভয়ে বাড়ীর ভিতর পলায়ন করিলেন।

শ্রীনাথ। দূর হও, বেরিয়ে যাও, এখুনি বেরিয়ে যাও—

ডাণ্ডা আস্ফালন

ফেরিওয়ালা। যাচ্ছি, যাচ্ছি বাবু, মারবেন নি, মারবেন নি!

তাড়াতাড়ি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিতে লাগিল

শ্রীনাথ। আপিস গেলে বেটা চুপি চুপি আসে, যত সব ন্যাকড়ার টুকরো আর ছেঁড়া কাপড়ের কালি বেচে আমার রক্ত-জল-করা টাকার সদ্গতি ক'রে যায়! সিকি পয়সার জিনিষ দশটাকায় বিক্রী করে! আবারি ঘরে বসে! আর ওদিকে আমি তক্তক্ষণ বুনোকাথোর তাড়িয়ে বেড়াই! প্রদীপের তলাতেই সব থেকে অন্ধকার।

ফেরিওয়ালা। (নোট বাঁধিতে বাঁধিতে) গরীব লোক বাবু, তাকে দু'এক পয়সা লাভ দেবেন নি কো? মেলা কাচ্ছাবাচ্ছা, তার ওপর এই দুর্ভিক্ষ। আপনাদের তো টাকার অভাব নেই বাবু।

শ্রীনাথ। আবার বক্তৃতা সুরু করলি! বক্তৃতাব্যাধির ওষুধ হল লাঠি। ভারি ঝাঁজালো ওষুধ। দেবো নাকি দু'ঘা?

ফেরিওয়ালা। না বাবু, তার আর দরকার হবেনি কো। (স্বর উচ্চে তুলিয়া) মাঠা'ন্-মেম, আমি এই গেনু গো। আর এক সময় আসব টাঁক বুঝে।

প্রস্থান

শ্রীনাথ। পাজী বেটা, জোচ্চোর বেটা—

শ্রীনাথবাবুর একমাত্র কন্যা জয়ন্তীর প্রবেশ। দুষ্টু চেহারা, চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি, বাক্য শাণিত, বয়স এগুন-বাইশ, অবিবাহিতা

জয়ন্তী। বারোটা বেজে গেছে, খাবে চলো বাবা।

শ্রীনাথ। উত্তর গোলার্দ্ধের পঞ্চাশ কোটি লোক না খেতে পেয়ে মরছে!

জয়ন্তী। তার জন্যে তোমার আপাততঃ উপোষ না করলেও চলে, বিশেষতঃ খাবারের থালা যখন উপস্থিত।

শ্রীনাথ। আমি সে-কথা বলছি নাকি! এই ভীষণ

দুর্ভিক্ষ, অথচ ফেরিওলার পাল্লায় পড়ে পয়সা ওড়ানো হচ্ছে। এর নাম ক্রিমিন্যাল্ ওয়েষ্ট্, অব্ মনি!

জয়ন্তী। তোমার উত্তর-গোলার্দ্ধের পঞ্চাশ কোটির মধ্যে ঐ ফেরিওলাও তো একজন। ওর ব্যবসা কেড়ে নিলে তোমাদের হোগ্‌লা-ছাওয়া রিলিফ্ হাসপাতালের তক্‌পোষের ওপর একজন কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে দিব্যি শুয়ে থাকবে, তাতে টেক্স-দাতার টেক্সর ভার বাড়বে বই কমবে না। অথচ ওর আত্মনির্ভরতা কেড়ে নিয়ে ভিক্ষিরির পয়সপান বাড়াও যদি, তাতেই কি জাতির মস্ত লাভ?

শ্রীনাথ। আত্মনির্ভরতার একটা সীমা থাকা চাই। একটাকায় দশটাকা মুনাফা নেওয়াটা আত্মনির্ভরতা নয়, প্রফিটিয়ারিং। জেল হওয়া উচিত।

জয়ন্তী। জেল তাহলে আমাদের সকলের হওয়া উচিত। কারণ, আমরা যা দিই তার চেয়ে ঢের বেশী দাম আদায় করি। জেল তোমারো হওয়া উচিত, তুমিও প্রফিটিয়ারিং করো।

শ্রীনাথ। আঁ্যা মেয়ে হয়ে বাপকে বলে কি! বেশী লেখাপড়া শেখার এই ফল। আমি করি প্রফিটিয়ারিং! হাকিমের মধ্যে তুমি প্রফিটিয়ারিং দেখলে!

জয়ন্তী। দেখলুম বৈকি। মান, সম্ভ্রম, প্রভাব, প্রতিপত্তি। চাপরাশিতে ধাক্কা মেরে লোক সরিয়ে দিচ্ছে—কি ব্যাপার? না হাকিম আসছেন। "ক্ষুদ্রপ্রাণা আসে যবে, ভৃত্য উচ্চরবে হাঁকি কহে, দূরে যাও, স'রে যাও সবে।" ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে তুমি গেলে কত মানুষকেও চেয়ার থেকে উঠে যেতে হবে। এ সমস্তই তো ছাড্য পাওনার চেয়ে ঢের বেশী আদায়—তাকেই বলে প্রফিটিয়ারিং। বলো না?

শ্রীনাথ। আরে সর্বনাশ! এসব কথা বাপের জন্মেও শুনি নি, নিজের মেয়ের মুখে যা শুনলুম! হাকিমের কর্ত্তব্য কত কঠোর, কত তার দায়িত্ব, কত অবিচলিত তার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখবার জন্যে কী অতন্দ্রিত তার দৃষ্টি—এ সমস্ত বুঝি তোমার চোখে পড়ে না?

জয়ন্তী। পড়বে না কেন, খুব পড়ে। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী ক'রে চোখে পড়ে হাকিমের মোটা মাইনেটা।

শ্রীনাথ। মোটা মাইনে! এমন আর কি মোটা! আর একথা বোলো না, এসব দায়িত্বপূর্ণ কাজে মাইনে একটু বেশী না হলে মানুষ ঘুষ খাবে যে!

জয়ন্তী। তবে আবার 'অবিচলিত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা' 'অতন্দ্রিত-দৃষ্টি'—এসবের বড়াই কেন? সোজা বললেই হয়, মাইনেটাই প্রফিটিয়ারিং হারে, তাতেই পুষিয়ে যায়, তাই আর ঘুষ খাবার দরকার করে না। কারো কারো 'অতন্দ্রিত দৃষ্টি' আবার একটু বেশী প্রখর, তাই ঘুষ খাইয়ে সেই প্রখর দৃষ্টি এড়াতে হয়।

শ্রীনাথ। এমনধারা কথা তো এই পঞ্চাশ বছর কোনোদিন শুনি নি! এসব চিন্তাধারা বোধ করি রাশিয়া থেকে আসছে আজকাল?

জয়ন্তী। যে-সব সত্য সহ্য করতে পারো না, মনে করো সে-সবই আসে রাশিয়া থেকে? না, রাশিয়া থেকে এ চিন্তা আসে নি, আর আসবেই বা কেমন করে? ডাকে যে বর্ম্মঘট। এ চিন্তা আসে নিজের মস্তিষ্ক থেকেই।

শ্রীনাথ। তাহলে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে বুঝতে হবে।

জয়ন্তী। কার?

শ্রীনাথ। (ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কিছুক্ষণ কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন) নেহাৎ বড় হয়েছ তাই, নইলে—

জয়ন্তী। নইলে মারতে? চুলের মুঁটি ধরে পিঠে সপাসপ্ বেত মেরেছিলে যেমন একদিন, তেম্‌নি?

শ্রীনাথ। হাঁা, তেম্‌নি। কিছু দোষ হ'ত না তাতে। বিকৃত-মস্তিষ্কের উপার্জ্জিত মুনাফার প্রতি যদি এতই বিদ্বেষ, তাহ'লে সে টাকাটা বড়মানুষী করে উড়িয়ে দেবার জন্যে তোমাদের মা-মেয়ের কোনো সঙ্কোচ দেখি না কেন? গোরুটা বজ্জাত, কিন্তু দুধটা মিষ্টি, না?

জয়ন্তী। টাকা ওড়ানো তুমি যদি পছন্দ করতে, তাহলে ওড়াতাম না। পছন্দ করো না বলেই তো ওড়াই। কিন্তু তাও আর ভাল লাগে না।

শ্রীনাথ। এম-এ পাশ করে শুধু বুঝি এই রকম উল্টো-উল্টো কথা বলতেই শিখেছ?

ভৃত্য অনুচ্চস্বরে বলে

ভজুয়া। মা বল্‌লেন, খাবার নিয়ে বসে আছেন। খোকা একটা হয়েছেন, হুজুর।

শ্রীনাথ। (গর্জন করিয়া) চুলোয় যা—

ভজুয়া। আজ্ঞে আচ্ছা—

প্রস্থান

শ্রীনাথ। জয়ন্তী, তোমার লেখাপড়া শেখা একদম ব্যর্থ হয়েছে।

জয়ন্তী। ব্যর্থ বই কি, তোমার দিক থেকে একদম ব্যর্থ। তুমি পারলে আমায় মূর্খ ক'রে রাখতে, পারো নি লোকনিন্দার ভয়ে।

শ্রীনাথ। কি রকম?

জয়ন্তী। বড় হাকিমের একমাত্র মেয়ে মূর্খ হলে তোমার হাকিম-মহলে বদ্‌নাম, তাই।

শ্রীনাথ। অসহ্য! অসহ্য স্পর্দ্ধা!

জয়ন্তী। তোমার ব্যবহারও আমার অসহ্য হয়েছে।

শ্রীনাথ। তাই নাকি! আচ্ছা আচ্ছা, দিব্যি আরামে আছো, কি অসহ্য ব্যবহারটা দেখলে?

জয়ন্তী। কাঠগড়ার আসামীর প্রতি ব্যবহার।

শ্রীনাথ। ওসব হেঁয়ালী রেখে স্পষ্ট ক'রে বল। আমি সরল সোজা মানুষ, সোজা কথা বুঝি। তোমার ওসব বাঁকাচোরা কথা বুঝি না।

জয়ন্তী। তোমার কেরাণী আমলারা, তোমার উকিল-মোক্তারেরা, কাঠগড়ার আসামীরা 'হুজুর হুজুর' ক'রে তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে, তাই তুমি মনে করো তোমার আপিসে যেমন তোমার হুকুমে সবাই ওঠে বসে, তোমার বাড়ীতেও আমরা সবাই তেমনি কলের পুতুলের মতো উঠব বসব। আমাদের যে একটা মান-সম্মান জ্ঞান থাকতে পারে, একটা স্বাধীন মতামত থাকতে পারে, সে-কথা তোমার ধারণাতেই আসে না।

শ্রীনাথ। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারতে আমার কথার চলনে তোমাদেরই ভালো। এতে আমার চেয়ে তোমাদেরই ভালো। আমার বয়েস, আমার অভিজ্ঞতা, এসব ভুলে যেও না।

জয়ন্তী। তুমিও একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারতে, হাজার নিঃস্বার্থ হলেও জোর খাটাবার যুগ এ নয়। এ-যুগে জোর ক'রে যেমন তুমি কারো মন্দ করতে পারবে না, জোর ক'রে তেমনি কারো ভাল করবার অধিকারও তোমার নেই।

শ্রীনাথ। বলো কি! নিজের স্ত্রী, নিজের ছেলেমেয়ের ভাল করবার অধিকার আমার নেই!

জয়ন্তী। তবে তুমি তোমার অধিকারের জোর খাটাতেই থাকো, ভালবাসা পাবে না। বুঝতে পারো না?—যা ভাল, তাতেও আমাদের চিত্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে—তোমার হুকুমে ভাল হতে হবে ব'লে, নিজের ইচ্ছায় নয়। কেন তুমি আমাদের বিশ্বাস করো নি কোনোদিন? আমরা কি আসলে এতই খারাপ? আর একমাত্র তুমিই এত ভাল? কেন তোমার এত ভয়, যে একটু ছেড়ে দিলেই অমনি আমরা বিপথে যাবো? আমরা কি চোর? তোমার কাঠগড়ার আসামী?

শ্রীনাথ। কী আশ্চর্য্য! আমি কি তাই ভেবেছি নাকি?

জয়ন্তী। হয়তো তুমি স্পষ্ট ক'রে তা ভাবো নি, কিন্তু তোমার ব্যবহারে আমাদের তাই ভাবিয়েছে। সেইজন্যে যা তুমি করতে মানা করেছ, আমি তাই করেছি। তোমার মুখের সাম্‌নে সিগারেট না টেনে লুকিয়ে খেয়েছি, তুমি পছন্দ করো না পাউডার-লিপষ্টিক্-এনামেল-মাখা মুখ, তাই তোমার সামনে ওগুলো বেশী ক'রে মেখে আসি, আড়ালে যেয়ে ওগুলো অবিশ্যি ধুয়ে ফেলি, কেননা বেশীক্ষণ মেখে থাকলে মুখে ব্রণ আর ফুসুড়ি বেরোয়। তুমি কেরিওলার কাছে জিনিষ কেনা পছন্দ করো না বলেই আমরা বেশী করে কিনি। নইলে হয়তো অত কিনতুম না।

শ্রীনাথ। বটে! আমার চোখ ক্রমশঃ খুলছে। আমারি ঘরে বসে আমারি বিরুদ্ধে এমনি ক'রে বিদ্রোহ করছ!

জয়ন্তী। প্রভুত্ব যেখানে, বিদ্রোহও সেখানে—নইলে প্রভুত্বের বিরাট বাপ পৃথিবীকে ঠেলে ধরে তার শ্বাসরোধ করত। কিন্তু তুমি হাকিম কিনা, তাই বুঝবে না এ কথা। হাকিমদের চোখে যেমন ঠুলিপরানো এমন আর কারো নয়। তোমার শাসন-সংরক্ষণের দায়িত্ব থেকে তোমায় এবার মুক্তি দেব। কথায় কথায় আর বলতে পারবে না, 'আমারি খাচ্ছ, আর আমারি বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছ!' স্বাধীন হবার বয়েস আমার হয়েছে।

শ্রীনাথ। কী মৎলব করেছ, শুনি?

জয়ন্তী। নিজে উপার্জন করব। তোমার অন্ন আর খাব না।

শ্রীনাথ। (ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া) জয়ন্তী!

জয়ন্তী। জানি তুমি এতে ভীষণ চটবে, কেননা এতে তোমার অধিকার খর্ব হবে। কিন্তু বলতে বাধা নেই, তাই ভেবেই আমার উৎসাহ চতুর্গুণ বেড়ে গেছে।

শ্রীনাথ। (খাটের ডাণ্ডা আস্ফালন করিয়া যেরূপ-ভাবে ফেরিওয়ালাকে তাড়াইয়াছিলেন সেইরূপভাবে) বেরিয়ে যাও, এখুনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে—

গোলমাল শুনিয়া শ্রীনাথবাবুর বৃদ্ধামাতা প্রবেশ করিলেন, তাঁহার কেশবেশ শুভ্র, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি

বৃদ্ধা। আঃ, কি করো ছীনাথ, পাগল হ'লে নাকি! আচ্ছা জয়ন্তী, তোরই বা কি আক্কেল! বাপের সঙ্গে সমানে তর্ক করছিস! তোকে কতবার বলেছি, ছীনাথের রাগ দেখলেই চুপি চুপি সরে পড়বি, তা শুনিস না কেন?

জয়ন্তী। শুনি না আবার! খুব শুনি। তাই তো সরে পড়বার ব্যবস্থাই করছি ঠাকুর্মা। কিন্তু চুপি চুপি আর হল না, ঢাক ঢোল বাজিয়েই হল।

বৃদ্ধা। যা, যা, পাগলামি করিস নি। যেমন বাপ, তেমনি বেটী। ঢাক ঢোল বাজবে লো বাজবে। তোর যে আর তর সইছে না নাত্‌জামায়ের জন্যে। আপাততঃ নাত্‌জামায়ের চিন্তা ছেড়ে খেতে যা। বৌমা তখন থেকে ভাত বেড়ে বসে আছে। যাও ছীনাথ, তুমিও যাও, কী তখন থেকে সমান হয়ে মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছ! তুমি বাপু বাড়ী থাকলেই ঝগড়া করো। আজ জ্বরভাব হয়েছে বলে আপিস গেলে না, আমি তখুনি ভেবেছি, এই রেঃ মজাদে! আজ ঝগড়ার চোটে ছেলেপে না হাঁড়ী কাটে!

শ্রীনাথ। অসহ্য, অসহ্য! তোমাদের কাছে আমার না আছে মান, না আছে সম্ভ্রম!

বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন

বৃদ্ধা। ছীনু আমার ভালই ছিল, কাল হ'ল ওর ম্যাজেষ্টর হয়ে। শুনেছি ইস্কুলমাষ্টার ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ছাত্তরের কান মলে। ছীনু এখন দিনরাত ম্যাজেষ্টরি করছে, ঘরে ম্যাজেষ্টরি, বাইরে ম্যাজেষ্টরি।

জয়ন্তী। আশ্চর্য্য তোমার চোখ তো ঠাকুর্মা! এত দেখতেও তুমি পাও!

বৃদ্ধা। বাড়ীতে কে হাঁচল, কে কাশল, তাও ছীনাথের জানা চাই। আমাদের কালে কত্তারা বাড়ীর কোনো খবরই রাখতেন না, দিনের বেলা অন্দরেই আসতেন না। কেবল এক থালার সময়টিতে আসতেন। আমরা বউঝিরা তখন দুর্গানাম জপ করতাম।

জয়ন্তী। কেন, এত ভয় কিসের?

বৃদ্ধা। ভীষণ রাশভারি লোক ছিলেন, কোথাও কিছু বেগড়ালে আর রক্ষে ছিল! একবার হয়েছে কি—কত্তারা দুভায়ে খেতে বসেছেন, বড় রুই মাছের মুড়ো আমি আমার কত্তা—মানে বড়কত্তার পাতে দিয়েছি। প্রত্যেকবার মুড়ো যায় ছোট ভায়ের পাতে, সে ছোট কিনা, তাই মুড়ো খাবার তারই অধিকার। ভাবলুম, আজ বড়কর্ত্তা অনেকদিন মুড়ো খান নি,আজ না হয় বেলেনেই বা।

জয়ন্তী। তোমার নিজের কত্তাটির প্রতি তোমার একটু পক্ষপাত ছিল বলে মনে হচ্ছে ঠাকুর্মা! তা, কি পুরস্কার পেলে?

বৃদ্ধা। পুরস্কার? চোখ কটমটিয়ে বড়কত্তা ভাতের থালা ফেলে উঠে চলে গেলেন, যাবার সময় আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে ছোট ভাইকে বলে গেলেন, 'বুঝলে জগৎ, ছোট ঘরের মেয়ে!' তারপর ছোটকত্তা, আমি, আর সবাই মিলে কত্তার পায়ে ধরি তবে তাঁর রাগ পড়ে।

জয়ন্তী। বাবারে, কী তেজ!

বৃদ্ধা। ঠিকই বলেছিস, তেজ। এমন তেজ তুই দেখেছিস আজকাল? ছোটভাই তার ন্যায্য পাওনা পায় নি বলে বড়ভাই ক্ষুধার অন্ন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে গেল—এমন কি আর হয় রে আজকাল? তাদের ছিল তেজ। আর আজকালকার পুরুষদের আছে শুধু আলা। আজকালকার বাড়ীগুলোও হয়েছে তেমনি। সদরটা একেবারে অন্দরের মাঝমধ্যিখানে ঢুকে বসে আছে! এতে পুরুষ মানুষের আবরু গেল!

জয়ন্তী। পুরুষমানুষের আবরু! ঠাকুর্মা তোমার মৌলিকত্ব আছে!

বৃদ্ধা। মেয়েমানুষের যেমন আবরু রাখতে জানতে হয়, পুরুষমানুষেরও তেমনি। যে-পুরুষমানুষ সব সময় মেয়েদের টিক্‌টিক্ করছে সে মেয়েমানুষের অধম। আমাদের কালে বাপু এমন ছিল না। বাড়ীর ভেতর আমরা ছিলুম গিন্নী, সর্ব্বেসর্ব্বা। সদরে তাঁরা ততক্ষণ তাঁদের দেশাপত্তর নিয়ে যতক্ষণ থাকতেন।

জয়ন্তী। বাড়ীর ভেতর ম্যাগেষ্টারি করার চেয়ে বাড়ীর বাইরে নেশাপত্তর করা ঢের ভালো। তা' ঠাকু'মা, নেশাটি তো বোঝা গেল, কিন্তু 'পত্তর'টি কি?

বৃদ্ধা। তুই আর আলাস্‌নে বাপু!

জয়ন্তী। আচ্ছা ঠাকু'মা, তোমার কর্ত্তাটি যখন নেশাপত্তর ক'রে বাড়ী আসতেন, তুমি তাঁর আদর-আপ্যায়ন করতে কি রকম?

বৃদ্ধা। শোন্ তবে বলি। টলতে টলতে বাড়ী এসে চুপি চুপি যে দাসীকে সাম্‌নে পেতেন তাকে জিগেস করতেন, হ্যাঁ রে তোদের মাঠাকরুণ কোন দিকে?—ঠিক তার উল্টা দিকটি দিয়ে গিয়ে গুড় গুড় করে বিছানায় শুয়ে পড়তেন। আমি কেঁদে কেটে চোখ লাল ক'রে মাথার শিওরে গিয়ে দাঁড়ালে এমন হতাশ অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকাতেন আমার পানে, এমন করুণ কণ্ঠস্বরে ডাকতেন 'বড় বৌ'—যে আমার বুকের ভেতরটা পর্য্যন্ত বেদনায় টনটনিয়ে উঠত।

চোখে আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন

জয়ন্তী। ছি ছি, ওল্ড্ উরোম্যান, তুমি এইসব অসচ্চরিত্রতা আর পানদোষের প্রশ্রয় দিতে!

বৃদ্ধা। তোরা আজকালকার মেয়ে সে সব ঠিক বুঝবি না রে জয়ন্তী। দামাল পুরুষমানুষের সে ছিল একটা প্রচণ্ড দুষ্টামি, আজকালকার পুরুষ-মানুষের অসভ্য ইতরামি নয়।

জয়ন্তী। সব দোষই সমান, শুধু ভালবাসার চোখ বিভিন্ন রকম দেখে। তুমি বুড়ি নেলসন সাহেবের মতন তোমার কানা চোখটি টেলিস্কোপে রাখতে।

বৃদ্ধা। তোদের সায়েব-সুবোর ব্যাপার আমি বুড়ো মানুষ কি বুঝি?—ওমা, ও মিন্‌সে আবার কে গো? আজ আর কারো খাওয়া-দাওয়া হবে না, দেখছি!

জনৈক আগন্তুকের প্রবেশ। পোষাক-পরিচ্ছদে তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী বলিয়া বোধ হয়। গায়ের-পুরুষ চেহারা, গলার কণ্ঠী মালা, পরিধানে দিশী পাঞ্জাবি, অত্যন্ত মোটা ধরা গলায় কথা কহেন

আগন্তুক। আজ্ঞে আজ্ঞে মাঠাকরুণরা, প্রাতঃপ্রণাম হই। ইয়ে বাড়ীতে আছেন, বড় হাকিমবাবু? অধীনের নাম ছিষ্টিধর—ছিষ্টিধর সামন্ত। আমার একটু বিশেষ জরুরি ইয়ে ছিল।

বৃদ্ধা। আচ্ছা, ডেকে দিচ্ছি।

বৃদ্ধা ও জয়ন্তী ভিতরে চলিয়া গেলেন

আগন্তুক। আজ্ঞে, আচ্ছা।

চুল উস্কাখুস্কা, কেশবেশ অবিন্যস্ত শ্রীনাথবাবুর প্রবেশ

আগন্তুক। আজ্ঞে প্রাতঃপ্রণাম হই হুজুর। এ কি, এত বেলাতেও হুজুরের নাওয়া-খাওয়া হয় নি!

শ্রীনাথ। না। তুমি কে? কি জন্যে এসেছ?

আগন্তুক। আজ্ঞে অধীনের নাম ছিষ্টিধর। আমার সোনারূপার কারবার (পকেট হইতে অতিসন্তর্পণে একটি পাতলা কাগজে জড়ানো সোনার হার বাহির করিয়া শ্রীনাথবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন) এরি জন্যে আসা। এই হার আমার গদিতে বন্ধক দিয়ে গেছে। হুজুরের নাম যেমনি শোনা, অমনি নিজে ছুটে এসু। হুজুরের কেচেরিতে গিয়ে শুনি হুজুর আজ যাননি। তাই এখানেই চলে এসু। হুজুর হাকিম, ইচ্ছে করলেই কস্ ক'রে মানুষের ইয়ে করতে পারেন, তাই নিজেই ছুটে এসু।

শ্রীনাথ। এ কার হার?

আগন্তুক। হুজুরের কন্যের।

শ্রীনাথ। জয়ন্তীর? জয়ন্তীর হার তোমার কাছে গেল কি ক'রে?

আগন্তুক। আজ্ঞে সেটি বলতে নিষেধ। নইলে আপনার কাছে আর ইয়ে করতে আমার ইয়েটা কি?

শ্রীনাথ। ধুত্তোর ইয়ের নিকুচি করেছে! বেটা Beaded humbug কোথাকার—

আগন্তুক। আজ্ঞে তেরি-মেরি করবেন নি কো! ভালো হবে নি, বলে দিচ্ছি। একনুত্তো টাকা ইনকমের টেন্‌কো দিই, আমার তেরি-মেরি করবেন নি কো!

শ্রীনাথ। কী আপদেই পড়া গেল! এ হার তোমার কাছে গেল কেমন ক'রে—এই সোজা কথাটা তুমি বলবে না?

আগন্তুক। তাহলে খুলেই বলি, না বললে যখন আমারি ইয়ে হতে পারে, তখন আর নিষেধ ইয়ে করলে চলবে না। আপনার কন্যের কাছ থেকে নিয়ে অনিলবাবু আমার গদীতে বন্ধক দিয়ে গেছে।

শ্রীনাথ। অনিলবাবু? অনিলবাবুটা আবার কে? কার ছেলে?

আগন্তুক। আজ্ঞে কন্‌সার্টপার্টির ছেলে, তবে তার বাপের নাম জানি না। তুনিচি ছায়ামূর্ত্তিতে আবার আক্টোও করে।

শ্রীনাথ। চুলোয় যাক ছায়ামূর্ত্তি! অনিলবাবুর সঙ্গে আমার মেয়ের সম্পর্ক কি?

আগন্তুক। আজ্ঞে, সে কথা বাপ হ'য়ে আপনি জানবেন নি কো, আর সম্পূর্ণ বাইরের লোক হয়ে আমি জানব? আমাকে জানিয়ে কি আর আপনার কন্যে অনিলবাবুর সঙ্গে ইয়ে করবেন?

শ্রীনাথ (উদ্যত ক্রোধে আগন্তুকের ঘাড় ধরিয়া) কী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! চোর কাঁহাকা! বেটাকে পুলিসে দেব! চাপরাশি! এই চাপরাশি!

ছেলে জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। বাবা, বাবা, ও লোকটির কোনো দোষ নেই, ওকে ছেড়ে দাও। আমিই অনিলবাবুকে ও হার বাঁধা দিতে দিয়েছিলুম।

শ্রীনাথবাবু আগন্তুককে ছাড়িয়া দিয়া উগ্রদৃষ্টিতে জয়ন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন

আগন্তুক। (শ্রীনাথবাবুর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া) স্থাও, এবার হ'ল তো! আমার নাম ছিষ্টিধর সাঁতরা, আমার কাছে উনি এসেছেন হেকিমি ফলাতে! কি গো মশাই! এখন যে কথা কইচেন নি কো! পুলুস ডাকবেন নি? আমায় পুলুসে দেবেন নি? (শ্রীনাথবাবু নিরুত্তর) চললুম বাবা। ঠকবাজি ক'রে ইয়ে করেছিনু। হেকিম বাবুদের ঠুকে ঠুকে পেন্নাম। আর তেনাদের কন্যেদেরও!

দ্বিপ্রহরক নমস্কার করিয়া আগন্তুকের প্রস্থান

ঠিক এই সময় বাড়ীর ভিতর হইতে সুনয়নী আসিয়া পরদার পাশে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে পিতাপুত্রী কেহই লক্ষ্য করিলেন না

শ্রীনাথ। (জলন্ত দৃষ্টিতে জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া) অনিলবাবু কে? তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

জয়ন্তী। অনিলবাবু সিনেমা-কোম্পানীর লোক। সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

শ্রীনাথ। আর কিছু নয়?

জয়ন্তী। না।

শ্রীনাথ। হার বন্ধক রাখতে দিয়েছিলে কেন?

জয়ন্তী। উপার্জনের পথ খুঁজছি। টাকা চাই। আর কিছু না জোটে, সিনেমাতেই ঢুকব।

শ্রীনাথ। সিনেমায় ঢুকবে? অনিলবাবু? আমায় একবার জিজ্ঞেস পর্য্যন্ত করো নি, অথচ আমি তোমার বাপ। (রাগে প্রায় ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন) আজ থেকে আমি নিঃসন্তান। (দরোজার দিকে আঙুল দেখাইয়া) বেরিয়ে যাও।

জয়ন্তী। তাই যাচ্ছি।

টেবিলের উপর হইতে হার উঠাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন

চিঠি হস্তে একজন দরোয়ানের প্রবেশ

দরোয়ান। (সেলাম করিয়া) মাইজী চিঠি দিয়েসেন।

দরোয়ানকে দেখিয়া শ্রীনাথবাবুর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিবার মতো। দারুণ ক্রোধে ঘাঁপাইতে ছিলেন। সে-ভাব কাটিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে বিস্ময় এবং অবশেষে লোভ আসিয়া মনকে অধিকার করিল।

শ্রীনাথ। তুমি মৃত সতীশবাবুর দরোয়ান?

দরোয়ান। হুজুর, হাঁ।

শ্রীনাথ। (চিঠি খুলিয়া পড়িয়া) আচ্ছা তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো, জবাব লিখে দিচ্ছি। (দরোয়ান বাহিরে গেল। শ্রীনাথবাবু চিঠিখানি আবার একবার, দুইবার, তিনবার পড়িলেন) আজ সন্ধ্যায় যেতে লিখেছে। নিমন্ত্রণ করেছে। নিশ্চয় যাবো। এতদিন নিজেকে সামলে রেখেছিলুম—কী ফল হয়েছে তাতে? আমার বাড়ীর কেউ কি আমার মুখ চায়, যে আমি তাদের মুখ চাইব! চুলোয় যাক ঘর-সংসার! (চিঠির জবাব লিখিয়া ডাকিলেন) দরোয়ান!

দরোয়ান। (প্রবেশ করিয়া জবাব নিল) জী হুজুর।

শ্রীনাথ। এই নিয়ে যাও জবাব।

দরোয়ান জবাব লইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

নিঃশব্দে পরদা সরাইয়া সুনয়নী আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীনাথবাবু চিঠিখানা তাড়াতাড়ি পকেটে লুকাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু ইহা সুনয়নীর দৃষ্টি এড়াইল না

শ্রীনাথ। খাবার জন্য ডাকছ?

সুনয়নী। না, আজ খাবার পাট তুলে দিয়েছি। সকাল থেকে যা হচ্ছে, তাতেই আমার পেট ভরা। আমার কিছু বলবার ছিল।

শ্রীনাথ। জান না জয়ন্তীর কাণ্ড!

সুনয়নী। জানি। তুমি তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। নেহাৎ বড় হয়েছে, নইলে হয়তো গায়ে হাতও তুলতে। নিজের চোখেই সব দেখেছি।

শ্রীনাথ। সে কি! তুমি এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে ছিলে নাকি! তা-তা জয়ন্তীকে নিষেধ করলে না, তুমি কেমন ধারা মা?

সুনয়নী। জয়ন্তীকে নিষেধ করব কেন? সে ঠিকই করেছে। তোমার হাত থেকে বেঁচেছে।

শ্রীনাথ। ঠিকই করেছে! বটে! তোমাদের ধারণা আমি ভীষণ স্বার্থপর, একটা পশু, এই না! কেবলি তোমাদের ওপর জুলুম ক'রে বেড়াই, এই না? বেশ, এইবার থেকে নিজের খেয়াল খুশিতে চলব।

সুনয়নী। তাও নিজের কানেই এর আগে শুনেছি, যখন বুকপকেটে লুকানো ঐ চিঠিখানা পেলে।

শ্রীনাথ। (চমকাইয়া) চর দেওয়া হচ্ছে আমার ওপর।

সুনয়নী। তোমার কাছেই শেখা। গত বছর আমার খুড়তুতো ভাই অনেককাল পরে বিদেশ থেকে ফিরে এসে আমায় দেখতে এল, তুমি তখন সে-অঞ্চলের দারোগাকে দিয়ে তার বাড়ী-নক্ষত্রের খবর নাও নি?

শ্রীনাথ। সর্বনাশ, তাও জানো!

সুনয়নী। আরো কিছু জানি—সতীশবাবুর বিধবার কাছে তোমার ঘন ঘন যাতায়াত কেন?

শ্রীনাথ। ছি, ছি, কি নীচ তোমার মন! মৃত সতীশবাবুর ষ্টেট্ কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে, তাই সরকারি কাজে আমাকে সেখানে যেতে হয়।

সুনয়নী। ও, তাই নাকি! আমার নীচ মন অত বুঝতে পারে না। ভদ্রমহিলা তোমায় যে সোয়েটার বুনে দিয়েছেন, সেটা ট্রেজারিতে জমা দাও নি কেন? সে তো সরকারি সোয়েটার! ভদ্রমহিলার ফোটোখানা তোমার ঐ টানার মধ্যে কাগজের নিচে লুকিয়ে রেখেছ কেন? ওটা কি সরকারি দলিল-দস্তাবেজ?

শ্রীনাথ। সর্বনাশ, তাও জানো!

সুনয়নী। কিছু কিছু জানতে হয় বৈকি। কাল সন্ধ্যায় ভদ্রমহিলাকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলে, সেটা অবিশ্যি সরকারি কাজে। কিন্তু ফেরবার পথে গাড়ীর মধ্যে বসে তুমি তাঁকে যে প্রীতি নিবেদন করলে, সেটাও কি সরকার-প্রীতি?

শ্রীনাথ। কে বললে তোমায় এ কথা?

সুনয়নী। তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ ড্রাইভারের উপস্থিতি তখন তোমরা দুজনেই ভুলে গিয়েছিলে। প্রণয়ের রীতিই এমনি—'জগতে কেহ যেন নাহি আর'।

শ্রীনাথ। (গোপনতার সমস্ত মুখোস ফেলিয়া দিয়া হিংস্র পশুর মতো দাঁত খিঁচাইয়া) হাতে-নাতে ধরে ফেলে বাহাদুরি নিতে এসেছ! আমার চরম অধঃপতন ঘ'টে গিয়েছে কল্পনা ক'রে খুব একচোট বিজয়োৎসব করে নিচ্ছ মনে মনে, না?

সুনয়নী। না। চরম অধঃপতন তোমার আজও ঘটে নি, আমি তা জানি। কিন্তু তুমি কি চাও আমি সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে থাকব?

সুনয়নীর কথার মধ্যেই যে সত্যের দীপ্তি ছিল তাহার প্রখর আলোকে অবনত পশুর মতো শ্রীনাথবাবু মাথা নিচু করিলেন

শ্রীনাথ। সুনয়নী—

সুনয়নী। তোমাকে তাই বলতেই এসেছিলাম। আমি আর তোমার চরম অবনতি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব না।

শ্রীনাথ। কি করবে?

সুনয়নী। চলে যাব।

শ্রীনাথ। চলে যাবে? সে কি! কোথায়?

সুনয়নী। তা জানি না। যেখানে হোক্, তাতে কিছু যায় আসে না।

শ্রীনাথ। (শরীরের ও মনের অবসন্নতায় টানিয়া টানিয়া কথাগুলি বলিতে লাগিলেন) সুনয়নী, তুমি জানো, সত্যি আমি অত ইতর নই। স্বীকার করছি লোভ আমাকে বিপথে টানছিল, কিন্তু সামলে ছিলুম লোভ! কিসের জোরে? সে কি জানো না তুমি? শুনেছি ভালবাসার চোখ কখনো মিথ্যে দেখে না। তুমি আজও কি আমাকে চিনলে না সুনয়নী? আমি—আমি থামতে পারি না নিজেকে। ক্ষমতার লোভ আমাকে দুর্বল করেছে। মুখে যতই হাঁক-ডাক করি, আমি অত্যন্ত অসহায়।

সুনয়নী। তাই জেনেই এতদিন টেঁকে ছিলুম। কিন্তু এমন কিছু আছে যেটা ভেঙে গেলে মন একেবারে অচল হয়ে যায়।

শ্রীনাথ। না, না, কিছু ভাঙে নি। সব ঠিক আছে। আমি এখুনি গিয়ে জয়ন্তীকে ফিরিয়ে আনছি।

সুনয়নী। জয়ন্তী আর ফিরবে না, যদি তুমি তোমার স্বভাব না বদলাও। কিন্তু কই, তোমার স্বভাব তো বদলায় না। সংসারে আজ কতদিন ধ'রে এমনি অশান্তি চলেছে, তবু তুমি তো কিছু শিখলে না। একটুও তো বদলালে না। আমি অনেকদিন ধরে আশঙ্কা করেছি, জয়ন্তী তেজস্বিনী মেয়ে, সে বিদ্রোহ করবে। শেষে তাই করল। এক কথায় সে তোমার আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে চলে গেল—যে-তোমাকে সে পৃথিবীতে সব চেয়ে ভালবাসে। যখন সে কেবল হামাগুড়ি দিতে শিখেছে, তখন থেকে সে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। তুমি আপিসে যেতে, আর সে তার কচি হাত দুটি দিয়ে কেবলি আমার আঁচল টানত আর জিগেস করত—মা, বাবা কখন আসবে? বাবার আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? পায়ের তলার মাটি আজ সরে গেল। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মান আজ আমার বৃথা। আমি কি তোমাকে বাঁচাতে পারলুম? আমাদের একটিমাত্র স্নেহপুত্তলীকে আমি কি বাঁচাতে পারলুম? সংসারে আগুন লেগে গেল, আমি তো কিছু করতে পারলুম না। কারো কাছে আমার আর মুখ দেখাতে ইচ্ছা করছে না। কান্না আর চেপে রাখতে পারি না। বুক যে ফেটে যায়!—(চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া) যাচ্ছি।

ঘরোয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন

শ্রীনাথ। (ভয়কণ্ঠে) সুনয়নী, আমার মাথার ঠিক ছিল না। আজ সমস্তদিন মাথার ওপর দিয়ে কী ঝড় বইছে একবার ভেবে ছাখো তুমি। কোথায় যাবে সুনয়নী! (হাত দুটি ধরিয়া) তোমার দুটি হাত ধরে মাফ্ চাইছি। অত নিষ্ঠুর হয়ো না। আমাদের পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবন—সেই প্রথম দিনটি—সব কি তুমি ভুলে গেলে! ভুলতে পারলে! কত স্মৃতি—

সুনয়নী। ওই তো আমাকে চাবুক মারছে, বলছে, কালামুখী, সংসারকে তুই শ্মশান করে দিলি!

ঘরোয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন

শ্রীনাথ। করো কি! কোথায় যাও! তুমি তো আজকালকার মেয়েদের মতো নও। বাইরের সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই, কোনোদিন তো একলা কোথাও যাও নি! কেমন ক'রে তুমি পথ চলবে! ওগো, লক্ষ্মীটি যেও না, কথা শোনো। (সুনয়নীর কানে এ কথা প্রবেশ করিল কিনা সন্দেহ। তিনি ঘরোজার চৌকাঠ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন)—নিজের দিকে যদি না'ই তাকাও, অন্ততঃ একটিবার আমার মান-সম্ভ্রম, আমার সুনাম, আমার অবস্থার কথা ভাবো। তুমি চলে গেলে লোকে যখন আমায় জিগেস করবে, আমি কি জবাব দেব?

সুনয়নী। (ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) যা তোমার মনে আসে তাই জবাব দিও। বোলো আমার চরিত্রহানি ঘটেছিল, কারো সঙ্গে পালিয়ে গেছি।

বেগে বাহির হইয়া গেলেন

শ্রীনাথ। (স্তম্ভিতভাবে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া) অ্যাঁ! একটুও বাধল না, চলে গেল! আমি তো এমন ক'রে ওদের ছেড়ে চলে যেতে পারতুম না! ভগবান, আমার সব আলো যে আজ নিভে গেল!

বাহিরে পরে ভৃত্য ভজুয়ার প্রবেশ

ভজুয়া। মা ঠাকরুণ কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে যাচ্ছিলুম, ফিরিয়ে দিলেন। এ-হে-হে, ওখানটায় শোবেন না বাবু, ও বাবু, বাবু! (ভজুয়া শ্রীনাথকে টানিয়া তুলিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল)—হুঁ, বাবু তিরমি গিয়েছেন, যাই কত্তা মা'কে খবর দিই।

প্রস্থান

একটু পরে ড্রাইভারের প্রবেশ

ড্রাইভার। হুজুর, মোটর নিয়ে মাকে ফিরিয়ে আনতে গেলুম, কিন্তু এরি মধ্যে মা যে কোন্‌দিকে চলে গেছেন কিছু বুঝতে পারলুম না। শেষে কি কোনো পুকুরে টুকুরে—পুলিশে একবার খবর দেবেন না হুজুর?

শ্রীনাথবাবু কর্মহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। ড্রাইভার একটু অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল

শ্রীনাথবাবুর বৃদ্ধামাতা প্রবেশ করিলেন

বৃদ্ধা। হীনাথ, কী বলেছিস তুই আমার বউমাকে? কোথায় গেল আমার ঘরের লক্ষ্মী? আজ তোকে কি শনিতে ধরেছে নাকি? হাকিমি ফলাস ঘরের বউঝির ওপর? ঝাঁটা মারি তোর হাকিমির মাথায়। যা ওঠ, খুঁজে নিয়ে আয়। যাবি নি! গোঁ ধরে বসে থাকবি!

তবে আমিই যাচ্ছি। হতভাগা, তোকে আঁতুড় ঘরে গুন খাইয়ে মারি নি কেন!

প্রস্থান

শ্রীনাথবাবু তেম্‌নি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন

খানিক পরে হাট্‌কোট বুট-পরা দারোগার প্রবেশ

দারোগা। (সেলাম করিয়া) সার, আপনার ড্রাইভারের মুখে খবর পেয়েই আমি চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু কোন খোঁজ-খবর নেই।···কি হয়েছিল সার? আপনি কি একটা ষ্টেট্‌মেণ্ট্ করবেন? (শ্রীনাথ-বাবু নিরুত্তর)—রাস্তার ধারের পুকুরটায় কি জাল দেওয়াবো?···আপনার সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছিল?··· শুনলাম আপনার মেয়েকেও আজ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?···আপনি কি আপনার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছিলেন? এরা তো সবাই তাই বলাবলি করছে।··· মাফ করবেন, আপনার মাথার কি কোনো—মানে পাগলামির কিছু···ইস্, কোনো কথাই যে বলেন না!

শ্রীনাথবাবুর মাতার প্রবেশ

বৃদ্ধা মাতা। ও ছীনাথ, তুই এখনো তেম্‌নি করে বসে আছিস? নে, ওঠ, লক্ষ্মী বাবা, মা একটু খোঁজ কর। আজ সারাদিন কিচ্ছু খাস নি। চা টা কিছু খাবি? লক্ষ্মী বাবা, মুখে কিছু দিয়ে যা বৌমাকে খুঁজে নিয়ে আয়। জয়ন্তীর জন্যে ভাবি না, সে কলেজে-পড়া মেয়ে, কিন্তু আমার বৌমা—

শ্রীনাথবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন

দারোগা। নমস্কার, আপনি বুঝি সারের মা?

বৃদ্ধা। আমরণ! আমি ষাঁড়ের মা হ'তে যাবো কেন রে মুখপোড়া, আমি ছীনাথের মা।

দারোগা। আমিও সেই কথাই জিগেস করছিলুম। তা আপনি না বুঝে আমায় গালাগালি করছেন। অমন করবেন না বলে দিচ্ছি, আমি পুলিস। আপনি কি কিছু জানেন এ ঘটনার? ইনি কি মারধোর করেছিলেন? হঠাৎ এঁর স্ত্রীকন্যা প্রায় একসঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন কেন?

বৃদ্ধা। মুখে আগুন, পুলুসের মুখে আগুন। মরছি নিজের জ্বালায়, আর মুখপোড়া পুলুস এসেছেন ট্যাঁওাই ম্যাঁওাই করতে।

দারোগা। (আপন মনে) এখানে কোনো খবর পাবার আশা নেই।

প্রস্থান

বৃদ্ধা। আমি একা কোনদিক সামলাই! বড়ো কর্তা, তুমি আজ বেঁচে নেই কেন!

কান্নায় কণ্ঠরুদ্ধ হইল। চলিয়া গেলেন

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। শ্রীনাথবাবুর ঘরে আলো জ্বলিল না, তিনি তেমনি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন।

অন্য কক্ষে জয়ন্তী প্রবেশ করিলেন

জয়ন্তী। মাকে তুমি কী বলেছ? সাধু সেজে ওখানে চুপ ক'রে বসে বসে মজা দেখা হচ্ছে? দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি তোমায়!

বাঘিনীর মতো শ্রীনাথবাবুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, টানাটানিতে, ধাক্কায়, শ্রীনাথবাবুর মুখ কপালে ঘাড়ে, শরীরের স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইল, গায়ের জামা নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল। শ্রীনাথবাবু তন্ত্রাচ্ছন্নের মতো বসিয়া জয়ন্তীর হাতের পাশবিক নিঃসঙ্গে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভজুয়া আসিল

ভজুয়া। হেই মা দুর্গা, মোহাই তোমার! থাক, দিদিমণি ফিরেছ। (সুইচ্ টিপিয়া বাতি জ্বালিতেই শ্রীনাথ-বাবুর ক্ষতবিক্ষত চেহারা ও পরিচ্ছদ দেখা গেল) আহা-হা করেছ কি দিদিমণি, বাবুকে মেরেছ! বাবু যে আর ওনাতে নেই। বাবু ভিরমি গিয়েছে। মাঠাকরুণ যেই চলে গেলেন, বাবু ঐখানে—ঐ মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। আমিই তো ওনাকে উঠিয়ে এই চেয়ারে বসিয়ে রাখলুম। দিদিমণি, তুমি মেয়ে হয়ে বাপকে মারলে! ছিঃ দিদিমণি, ছিঃ!

জয়ন্তী রামহাতে নিজের চোখ ও কপাল টিপিয়া ধর ধর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন

শেখ ড্রাইভারের প্রবেশ

ড্রাইভার। এই যে দিদিমণি ফিরেছেন! পুকুরে জাল দেওয়া হচ্ছে। কর্তামা সেখানে আছেন। ভজুয়া, তোমায় ডাকছেন, আপনিও চলুন দিদিমণি। শীগ্‌গির!

জয়ন্তী। আঁ! কিছু পাওয়া গেল নাকি! হা ভগবান!

জয়ন্তী, ভজুয়া ও ড্রাইভারের প্রস্থান

শ্রীনাথবাবু এতক্ষণ আচ্ছন্নের মতো বসিয়াছিলেন। ড্রাইভারের কথায় তাঁহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। জয়ন্তী প্রভৃতি চলিয়া যাইবার পর তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীনাথ। সুনয়নী মরে গেছে।···প্রভুত্বই সর্বনাশ করে। ক্ষমতাই সর্বনাশের মূল। ভাল মানুষও ক্ষমতার দোষে নষ্ট হয়ে যায়।···এই সোজা কথাটা সুনয়নী আমায় কতদিন কতভাবে বোঝাতে চেয়েছিল। আমি বোঝার, বুঝি নি। আজ যখন বুঝতে পারলুম, সে-ই তখন নেই। ভগবান, এই চরম দণ্ডে, এই কঠিন মূল্যে তুমি আমায় আজ এই শিক্ষা দেখালে!

বুকপকেট হইতে সতীশবাবুর বিবাহের চিঠি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দিলেন। টানা হইতে তাঁহার অটোগ্রাফ বাঁধান করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। একখানি কাগজ টানিয়া লইয়া খস্ খস্ করিয়া তাহাতে কি লিখিয়া শ্রীনাথবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

চাকরিতে ইস্তফা দিলাম। আজ আমি আর কারো প্রভু রইলাম না, আজ থেকে আমার আর কোনো ক্ষমতা রইল না। আমিও চলে যাবো।

ঘরের ভিতর প্রস্থান

জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। একি! বাবা কোথায় গেলেন! (টেবিলের উপর স্থাপিত শ্রীনাথবাবুর পদত্যাগ পত্রখানির উপর দৃষ্টি পড়ায় সেখানি হাতে লইয়া পড়িয়া দেখিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন) এও সম্ভব হ'তে পারল! বাবার মতন লোকও একমুহূর্তে সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত প্রভুত্ব বিসর্জন দিলেন! ক্ষমতা যাঁর এত প্রিয় ছিল, সেই তিনি এক কলমের আঁচড়ে তা অনায়াসে ত্যাগ করতে পারলেন! আমি তাঁকে কত যে ভুল বুঝেচি—কত যে ভুল বুঝেচি! বাবা, বাবা, আমার বেচারী বাবা! আমি আজ তাঁকে মেরেচি পর্যন্ত!

একহাতে একটি ছোট সুটকেস, আর একহাতে একটি ছোট বেডিং লইয়া শ্রীনাথবাবু ঘরে আসিলেন। তাঁহার পরিধানে তখনো সেই ফ্রক্ কোট, মুখে তখনো সেই শান্তির স্নিগ্ধ।

শ্রীনাথ। জয়ন্তী, মাইয়া! মা!

জয়ন্তী। বাবা! বাবা!

শ্রীনাথবাবুর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কুঁপাইয়া কুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন

শ্রীনাথ। চুপ করো মাইয়া! আর আমাকে ভয় কোরো না। আবার সেই তোর ছেলেবেলার মতো, আমি শুধু তোর 'বাবা'।

জয়ন্তী। তোমার ক্ষমতা-বৃদ্ধ দুর্বলতার মধ্যে এতখানি মৌন তেজ কেমন ক'রে লুকিয়ে রেখেছিলে বাবা? আমি তোমায় মেরেছি। আহা, বড্ড লেগেছে বাবা?

শ্রীনাথ। না মাইয়া, লাগে নি।

জয়ন্তী। বাবা, কে একজন নাকি মা'কে আমাদের গলির মোড়ে ট্রামে চড়তে দেখেছে। পুকুরটাতে জাল দিয়ে কিছু পাওয়া গেল না। মা বেঁচে আছে, না বাবা? মা'কে খুঁজে পাওয়া যাবে, না বাবা?

শ্রীনাথ। ভগবানকে ডাকো জয়ন্তী, যা করবার তিনিই করবেন।

জয়ন্তী। তোমার ওপর রাগ ক'রে বলেছিলুম সিনেমায় ঢুকব। আর আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবো না বাবা।

শ্রীনাথ। কিন্তু আমি যে চলে যাচ্ছি মাইয়া। কাল ভোরেই চলে যাবো।

জয়ন্তী। সে কি! তুমি কোথায় যাবে? কেন যাবে? (শ্রীনাথবাবু নিরুত্তর) কেন চলে যাবে বাবা? আজ মা নেই ব'লে? (শ্রীনাথবাবু ঘাড় নাড়িলেন)। মা'র ওপর অভিমান ক'রে? (শ্রীনাথবাবু ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—'না')। আমি একলা কি ক'রে থাকব বাবা? মা নেই, তুমিও ছেড়ে যাবে!

শ্রীনাথ। উপায় নেই মা। চাকরি ছেড়েচি বলেই ক্ষমতার ভূত যে ঘাড় থেকে নেমেছে তার বিশ্বাস কি? আরাম আবার পাছে পথ ভোলায়, তাই কষ্ট সহ্যের তপস্যা করব।

জয়ন্তী। আমি যে সইতে পারছি না বাবা। তোমার কি দূরে চলে যাওয়ার খুবই দরকার? আমি কার কাছে থাকব বাবা?

শ্রীনাথ। আমার যাওয়ার খুবই দরকার। প্রতি মানুষের বোঝাপড়া তার নিজের সঙ্গে। দুদিন আগেই হোক, দুদিন পরেই হোক, এ বোঝাপড়া তাকে করতেই হবে। দুঃখু কোরো না মা। আমার যা রইল তা তোমারি সব। যতদিন না ফিরে আসি, আমি তোমায় তোমারি হাতে রেখে যাবো। মনে রেখো, নিজের শাসন সব থেকে বড় শাসন।

জয়ন্তী। মা তোমাকে এমন কিছু কি বলে গেছেন, যার জন্যে তোমার চলে যাবার দরকার?

শ্রীনাথ। হ্যাঁ। আমার স্বভাব বদলানো চাই। হয় তো বদলাবে না আমার এই ক্ষমতা-কলুষিত স্বভাব। তবু চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি মা?

জয়ন্তী। না বাবা, না বাবা, মা তোমায় চিনতে পারেন নি, মা তোমার এ অপূর্বরূপ কোনোদিন দেখেন নি! আজ তুমি সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর! কী সুন্দর এই মূর্তি তোমার! আরাম তোমায় পথ ভোলাবে! কী যে তুমি বলো! তুমিই তো বললে, নিজের শাসন সব থেকে বড় শাসন।

শ্রীনাথ। না মা, আমার আর বিশ্বাস নেই। তোমার মা যদি থাকতেন আজ, বিশ্বাস যদি দিতেন, তাহলে সে ছিল অন্য কথা। তোমার ঠাকুর্মা কোথায়?

জয়ন্তী। ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন।

শ্রীনাথ। তুমিও শুতে যাও মাইয়া। রাত অনেক হল। বিদায় দাও মা।

জয়ন্তী। বিদায়! (কাঁদিয়া উঠিলেন) তুমি কি আর খাবেও না, শোবেও না? আজ সারাদিন যে জল পর্যন্ত খাও নি বাবা!

শ্রীনাথবাবু এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না। জয়ন্তী বুঝিলেন তাঁহাকে অনুরোধ করা বৃথা। ক্লান্তিতে জয়ন্তীর শরীর-মন আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, ভিতরে চলিয়া গেলেন।

জয়ন্তী চলিয়া গেলে শ্রীনাথবাবু বুকসেল্ফ্ হইতে টাইমটেব্‌ল্‌খানি লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। একস্থানে একটি চিহ্ন দিয়া টাইমটেব্‌ল্‌খানি রেডিংএর উপর রাখিলেন। তারপর মাথার ফুইচ্, টিপিয়া আলো নিভাইয়া টেবিল্‌ল্যাম্পের জোরে আসিয়া বসিলেন। ক্লান্তিতে তাঁহার মাথা সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সময় অতিক্রম জ্ঞাপনার্থ মুহুর্তঘোষের গম্ভীরধ্বনিকা পড়িয়া আবার উঠিল।

যবনিকা উঠিলে দেখা গেল, ভোর হইয়া আসিয়াছে, কক্ষের অন্ধকার কাটিয়াছে। শ্রীনাথবাবু তেমনি ঘুমাইতেছেন। অদূর ঘড়ীতে চং চং করিয়া পাঁচটা বাজিল।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সুনয়নী আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। বিস্মিত শ্রীনাথবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার দৃষ্টি যেন সেখানেই আটকাইয়া গেল। এ-মুখে কি দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন। অনেকক্ষণ পরে সুনয়নীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল। মেঝের উপর ছেঁড়া কোটো, ছেঁড়া চিঠি, বুটকেস, বেডিং, টাইমটেব্‌ল্ সমস্তই দেখিলেন। টেবিলের উপর শ্রীনাথবাবুর পদত্যাগ পত্রখানি দেখিতে পাইলেন। ঝুঁকিয়া সেটি পড়িলেন। পড়িয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। আবার শ্রীনাথবাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সুনয়নীর দৃষ্টিতে করুণা ও প্রেম যেন উছলিয়া উঠিল।...পদত্যাগ পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

তারপর অত্যন্ত স্নেহে, সুগভীর মমতায় নিজের হাতখানি স্বামীর স্কন্ধে রাখিলেন। শ্রীনাথবাবু জাগিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিলেন, ভাবিলেন ইহা বুঝি স্বপ্ন। তাঁহার মুখে স্নিগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টি। ক্রমে বুঝিলেন, ইহা স্বপ্ন নয়। তাঁহার দৃষ্টি কোমল হইয়া আসিল।

সুনয়নীর হাতখানি লইয়া নিজের স্কন্ধে চাপিয়া ধরিলেন। পরে সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুনয়নীর বাহুর উপর মুখ রাখিলেন।

কেহ কোনো কথা কহিলেন না।

যবনিকা

জয়ধন্যা বকুল

শ্রীপান্নালাল ভড়

কবেরে বকুল বন বীথিকায়
বুঝি হলো রাতি ভোর,
ত্বরান্বিত পথে কিরণ বিধাও
কোথা আছো সাথী মোর।
ওরা বকুলের ঝিক ঝরায়
সহসা চমকি মৃদু হেসে কয়—
এই তো রচেছি আসন হেথায়
যেমনি উষা ভোর।

উষর রাগেতে কি মধু আবেশে
বকুল কহিল তারে ভালবেসে
এসো এসো প্রেয়া পেতেছি আসন?
করিব তোমায় হৃদয় বরণ!
হে মানস প্রিয়া কহিল অরুণ
গাঁথ গাঁথ প্রেম ডোর,
বকুল তোমার জয়ের ঘোষণা
ঘুচে যাও দুখি মোর।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

যখন ঘুম ভাঙিল তখন সন্ধ্যার রক্তাভা পশ্চিমাকাশ হইতে ধীরে ধীরে সমস্ত গগনে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সন্ধ্যার নমস্ত পিতা ডাকিলেন। প্রত্যহের ন্যায় আজও সন্ধ্যায় পিতার নিকট গিয়া বসিলাম। কথা প্রসঙ্গে শোভাযাত্রার কথা উঠিল। তাঁহার নিকট আমি সকল বিষয় বর্ণন করিলাম এবং শেষে যে দুরাশাবোধক যখনের সহিত আমার কলহ ও দ্বন্দ্ব হইয়াছিল তাহাও বলিতে ভুলিলাম না।

অন্য দিনের ন্যায় এদিনও প্রবল বুদ্ধিশালিত আন্তরিক মঙ্গল্য লইয়া আসিলেন; আমরা সকলে মাতার হস্ত হইতে মাঙ্গল্য গ্রহণ করিলাম। প্রবল যাইবার সময় পিতাকে বলিয়া গেলেন যে অদ্য রাত্রির প্রথম প্রহরের মধ্যভাগে আর্য কর্ণপাদ মহাস্থবির পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন।

যথাসময়ে মহাস্থবির আসিলেন; আমরা সকলে তাঁহার পাদবন্দনা করিলাম; তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। আমরা তাঁহার সম্মুখে বসিলাম। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—

"আর্য তথাগত, বৎস দেবদত্ত, অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত আমি আজ এখানে আসিয়াছি। দেবদত্ত আজ বাসোৎসবের শোভাযাত্রা দেখিতে গিয়া একটা গণ্ডগোল বাধাইয়া আসিয়াছে। মনে করিও না, দেবদত্ত, এই ব্যাপারের অবসান এখানেই হইয়া গিয়াছে। আমি শুনিলাম উহারা তোমাকে ধিক্কারিয়াছে এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তবে উহারা গোপনে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে, কারণ উহারা জানে যে ফল্গুর অত্যন্ত স্বাধিকারপ্রমত এবং এই বিষয় তাঁহার গোচরে আসিলে উহাদের জন্য সুবিধা হইবে না। কিন্তু সাবধান হউ, কিন্তু যখনেরা ইহাকে অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, নগরের সকল যখন অধিবাসীগণ আপনাদিগকে অপমানিত, অবমাননিত ও অপদস্থ মনে করিতেছে। তাহার পর যে যখন-যখন যুবক তোমার হস্তে প্রহৃত ও নির্যাতিত হইয়াছে সে ফল্গুর ভালক।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু, অন্য উপায় ছিল না। আর আমিও তাহার নিতান্ত অর্বাচীন ও নীচের মত ব্যবহারে—নিরীহ পথচারীকে অকারণে প্রহার ও নির্যাতন করিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম।

—আমি বলিতেছি না যে তুমি কিছু অন্যায় করিয়াছ। আমার আসিবার উদ্দেশ্য তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া। অদ্য রাত্রেই একটা কিছু অঘটন ঘটিবার সম্ভাবনা এবং তাহার জন্য আমি শুনিলাম, উহারা সকলে প্রস্তুত হইতেছে। শেষের এ সম্বন্ধে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এবং যাহাতে উহারা ব্যর্থকাম হয় এবং কিঞ্চিৎ শাস্তিও পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাত্রে তোমার সহিত মিলিত হইবে। রাত্রি একটু অধিক হইতে পারে তজ্জন্য চিন্তা করিও না। কিন্তু তোমরা অত্যন্ত সতর্ক থাকিবে। আমি পালক ও প্রজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকেও সতর্ক থাকিতে বলিয়া যাইতেছি।"

পিতা বলিলেন, "আর্য, আপনি যে আমাদিগকে অশেষ স্নেহ করেন তাহা আমরা জানি। আপনার উপদেশ মত আমরা সকলেই আজ রাত্রে সজাগ ও সতর্ক থাকিব। আপনার এই সতর্ক বাণীর জন্য আপনি আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন।"

আর্য মহাস্থবির বলিলেন, "আরও একটা কথা, দেবদত্ত, তুমি সর্বদা স্মরণ রাখিবে যে তোমার কার্যক্ষেত্র ইতিপূর্বেই নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সকল সামান্য ব্যাপারে আমাদের ত্রাণসঙ্ঘে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক আছে। তুমি যদি কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে তাহা হইলে সঙ্ঘের কার্য দেখিতে পাইতে। আমি স্বয়ং ছদ্মবেশে ঘটনাস্থলের অদূরে দাঁড়াইয়াছিলাম। শেষে তাহার বাহিনীর কয়েকজনকে লইয়া আমার নিকটেই ছিল। আরও জনকয়েক পাদোন্নত যখন যুবক ঐরূপ উপদ্রব এবং রমণীগণের প্রতি অসম্মান প্রকাশ ও পাশবিকতা বিরুদ্ধ ব্যবহারের জন্য ঐ বাহিনীর সদস্যগণের দ্বারা কণ্ঠরুদ্ধ লাঞ্ছিত হইয়াছে। দুইজন যখন মার খাইয়া অজ্ঞান অবস্থায় পথের ধারে পরোবাসীর মধ্যে হস্ত এখনও পড়িয়া আছে।"

আমি বলিলাম, "ক্ষমা করিবেন—অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুনিয়া আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল।"

—বুঝিলাম; কিন্তু এখন হইতে এই সকল ক্ষুদ্রের মধ্যে তুমি আর আপনাকে অপব্যবহার করিও না। সংযতচিত্তে চিন্তা করিয়া সকল কার্য করিবে। যে মহৎ দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করিয়াছ—যে কার্যের ভার তোমার উপর অর্পিত হইয়াছে—তাহা কখনও বিস্মৃত হইও না।

—বিস্মৃত হই নাই, আর্য—এবং কখনও তাহা বিস্মৃত হইব না। কিন্তু নিরীহ পথচারীর প্রতি এইরূপ উৎপীড়নের উৎকণ্ঠাৎ প্রতিকারের আবশ্যক বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল।

—তজ্জন্য ত্রাণসঙ্ঘের সদস্যগণ অলক্ষিতভাবে নিকটেই ছিল।

তোমার ও প্রভার হাতে উহাকে ও উহার বন্ধুগণকে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া তাহারা আর এ দিকে তখন হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা বোধ করে নাই। সাধারণ দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া তাহারা সব লক্ষ্য করিতেছিল এবং প্রস্তুতও ছিল। দেখিলে না, অতি অল্পক্ষণ পরেই শেখর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেল?

—আমি তখন তাহাদিগকে অতটা লক্ষ্য করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই নাই।

—আমার কি ভয় হয় জান দেবব্রত?—পাছে এই সকল ক্ষুদ্র আঘাতের মধ্যে পড়িয়া আমরা সব হারাইয়া ফেলি। কয়দিনের গুপ্তচর পুরুষপুরের অধিবাসীগণের ঘরে ঘরে ঢুকিতেছে। আমাদিগের সংঘের বিষয় এবং রাজিক-সরকার অত্যাচারী গবর্নমেণ্টের গ্রাস হইতে উহাদের সংরক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ এখনও উহারা কিছু সংগ্রহ করিতে পারে নাই। এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে যেন কোনরূপ সংবাদ বাহির হইয়া না পড়ে তাহার জন্য আমাদিগকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

—কিন্তু এই সকল অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য ত কিছু করা উচিত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা দেখা সত্ত্বেও ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে অত্যাচার ও অত্যাচারীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়—পরোক্ষে অত্যাচারীর সহায়তা করা হয়।

—উপায় অপর লোক ছিল এবং থাকিবে। তোমার উপর যে কার্যভার ন্যস্ত আছে তাহা গুরুতর। এই সকল ক্ষুদ্রের মধ্যে তুমি আপনার অপব্যবহার করিও না। যে দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করিয়াছ—যে কার্যের ভার তোমার উপর অর্পিত হইয়াছে তাহাই সর্বদা মনে রাখিয়া চলিবে।

আমি নীরব রহিলাম। মহাঋষিরও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পরে বলিলেন—

যদি অত্যাচার-উৎপীড়নের মূলে কুঠারাঘাত করিতে—তাহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারিলে, এই সকল সামান্য ও ক্ষুদ্র অনর্থ সহজেই ও আপনা হইতেই নির্মূল হইবে।

আমি মৌন হইয়া রহিলাম। মহাঋষি বলিলেন—

অন্যকার ঘটনা হয়ত এই সব কলহের সহিত শেষ হয় নাই। উহারা ইহাকে জটিল করিয়া তুলিতেছে—এইরূপ আমি শুনিলাম। এ সম্বন্ধে সকল সংবাদ শেখরের নিকট পাইবে। যে যবন যুবককে তুমি প্রহার করিয়াছ, সেই যবন যে কয়জন গ্লানক, তাহাও ভুলিও না। অত্যন্ত সতর্ক থাকিবে—বিশেষতঃ অদ্য রাত্রে; উহারা নব অভিপ্রায় লইয়া প্রস্তুত হইতেছে। অত্যন্ত সাবধানে থাকিবে। আমি এখন চলিলাম।

মহাঋষি বিদায়গ্রহণ করিয়া উঠিলেন। আমরা তাঁহার পাদ বন্দনা করিলাম; তিনি আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পিতা একটু চিন্তিত হইলেন এবং অন্যত্র উঠিয়া গেলেন।

মহাঋষির যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই শেখর আসিয়া উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে প্রভাত আসিয়াছিল এবং আমরা উহার অন্যকার ঘটনা ও মহাঋষির সংবাদ ও উপদেশ লইয়া তখন আলোচনা করিতেছিলাম। শেখর আসিয়া আমাদের আলোচনায় যোগ দিল। সে বলিল, যে অন্য রাত্রে যবনগণ নগরপাল ও চৌদ্দরশ্মির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া গোপনে আমাদিগের গৃহ আক্রমণ করিবে এবং স্থির করিয়াছে যে আমাকে ও হিরণ্ময়কে বলপূর্বক লইয়া যাইবে। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমাদের প্রাক্তন গৃহ-শিক্ষক ডেমিট্রিয়স্ আছেন এবং হিরণ্ময়কে লইয়া যাওয়ার পরামর্শ তাঁহারই প্রদত্ত। এই ব্যাপারটি তাহারা গোপনে সম্পাদন করিবে, কারণ কয়জন ক্রীতদাস এবং যোদ্ধ; প্রজার উপর এরূপ অন্যায় অত্যাচার তিনি সহ্য করিবেন না, এইরূপ উহারা মনে করে এবং মনে মনে ভীত ও সন্ত্রস্ত। উহারা কয়েকটা সুদীর্ঘ রজ্জু সোপান সংগ্রহ করিয়াছে, গৃহের প্রাচীরে উঠিতে উহাদের সুবিধা হইবে এবং কোনও রূপ গোলযোগ না করিয়া সেখান হইতে অনায়াসে গৃহে প্রবেশপূর্বক তাহারা তাহাদের কার্যোদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে, এইরূপ উহারা কল্পনা করিয়াছে।

আমি বুঝিলাম যে আমাদের প্রাণসংহার কিরূপ নিপুণতার সহিত কার্যে পরিণত হইয়া থাকে। আমি দেবব্রতকে বলিলাম, "তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও, আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকিব। তুমি বিশ্রাম কর গিয়া; এ বিষয় লইয়া তোমার আর কষ্ট পাইবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না।"

শেখর জিজ্ঞাসা করিল—বাহিনীর অধিকাংশকে সন্নিকটে প্রস্তুত রাখিয়া গেলে ভাল হয় না?

—তা' রাখিয়া যাইতে পার, তবে তাহারা যেন বংশী ধ্বনির আহ্বান-সঙ্কেত না শুনিলে বাহিরে না আসে। আততায়ীদিগকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা আমরাই করিব।

—তবে আমি চলিলাম—বাহিনীর পঞ্চদশ সশস্ত্র সৈনিককে অতি সন্নিকটে রাখিয়া যেলাম—একজন নায়কও তাহাদের সহিত আছে—আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে ডাকিবে।

শেখর বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার সুনিশ্চিত কার্যনিপুণতা ও বিচারকুশলতা দেখিয়া আমার প্রাণে আনন্দ এবং আমাদের অনুষ্ঠিত ব্রতের সাফল্য সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল।

শেখর যাইবার সময় বলিয়া গেল যে দ্বিতীয় যামের * শেষে এবং তৃতীয় যামজ্ঞেরী † পঙ্কিত হইবার পূর্বে দস্যুগণ তাহাদের কার্যোদ্ধার করিবার কল্পনা করিয়াছে।

পিতাকে এবং আর্য্যপালকে সকল কথা জানাইলাম। তাঁহারা ভৃত্যদিগকে সশস্ত্র হইয়া সজাগ থাকিতে আদেশ দিলেন এবং আমাদের গৃহদ্বয়ের বহির্গমনের দ্বার অতি সতর্কতার সহিত ভিতর হইতে রুদ্ধ হইল। আমরা সকলেই ভৃত্যদিগের সহিত সজাগ ও সতর্ক রহিলাম।

রাত্রি প্রথম যামের শেষে আমাদের নৈশ আহারাদি সমাপন করিয়া

---

* প্রহরের।

† প্রহরে প্রহরে সময় জানাইবার জন্য নগরপালের আদেশানুযায়ী নগরপ্রাকারের তোরণ হইতে ভেরী বা ঘণ্টা বাজাইবার প্রথা যাহাদের দায়িত্বে প্রচলিত ছিল।

পুনর্ব্বার প্রজা ও আমি একত্রিত হইলাম এবং ব্যবহারোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র নির্ব্বাচিত করিয়া যেখান হইতে অবিলম্বে গ্রহণ করা যায় এরূপ স্থানে রাখিয়া দিলাম। আমরা সকলেই সতর্ক ও জাগ্রত রহিলাম এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের গৃহের অধিরোহণে ও সংলগ্ন উদ্যানে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয় যাম নানাপ্রকার হইতে বিঘোষিত হইল। আমরা আমাদিগের নৈশ অতিথিদের সম্বর্দ্ধনার জন্য তাহাদের আগমন প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া রহিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এইরূপে অতীত হইবার পর মনে হইল যেন আমাদের অধিষ্ঠানের নিকট একাধিক কণ্ঠস্বরযুক্ত উত্তেজিতভাবে কিসের আলোচনা হইতেছে। আমরা বুঝিলাম যে, বন্ধুগণ আসিয়াছেন এবং সময় আসন্ন। আমরা সন্তুষ্ট হইয়া হাসিয়া উঠিলাম।

জানুয়ারের পৌর্ণমাসী। তখনও রৈত্য সম্পূর্ণ যায় নাই। জ্যোৎস্না-তরল কুহেলিকার স্বল্প আবিল। নিশীথিনী যেন তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানি স্বচ্ছ ঔনোষ্ণকের অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়াছে। সংলগ্ন উদ্যানের বৃক্ষের লতা পল্লবের ছায়ায় নৈশ কুহেলিকার আবিলতা যেন একটু বিচ্ছিন্নতর হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা, দ্বার হইতে অন্তরালভাবে এই পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে, লক্ষ্য করিলাম যে অনেকগুলি লোক আমাদের গৃহের প্রবেশ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। আমরা দ্বারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাদিগের অবয়বাদি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম এবং মনোযোগের সহিত তাহাদের কথাবার্ত্তা, বক্তব্যের সম্ভব, শুনিবার ও বুঝিবার জন্য সচেষ্ট হইলাম।

একজন বলিল, "না, দরজা ভাঙ্গিবার আবশ্যক নাই। প্রতিবেশীরা সজাগ হইয়া উঠিবে এবং ইহাদের সাহায্য করিতে আসিবে। তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবেই না—হয় ত আমাদের ফিরিয়া যাওয়াও অসম্ভব হইবে।"

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশের কি ব্যবস্থা করিবে?"

অপর একজন বলিল, "এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিলেই পার্শ্বের বাড়ীতে প্রবেশ করা সহজ হইবে। দেখিতেছিস, এ পল্লীর গৃহগুলি পরস্পর সংলগ্ন—এক ছাদে উঠিলে অন্য গৃহের ছাদে অনায়াসে যাওয়া যায়।"

অন্য একজন বলিল, "বেশ, বেশ, উত্তম কথা। এখন কি করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা কর!"

অন্য এক কণ্ঠ বলিল "তবে আর বিলম্বের আবশ্যক নাই। একজন ছাদে উঠিয়া বাটীর মধ্যে নামিয়া যাও ও সম্মুখের দ্বার খুলিয়া দাও!"

—তবে তাহাই হউক!—কে ছাদে উঠিবে?

—কে ছাদে উঠিবে?

—যে হয় একজন উঠ!

—তুমিই কেন উঠ না!

—কেন, তাহাই হইবে—আমিই উঠিব।

—সঙ্গে দড়ি আছে ত?

—হাঁ, সঙ্গে পাকান তরঙ্গারি আছে—বাটীর মধ্যে অন্য কোনও অস্ত্রের আবশ্যক হইবে না।

প্রজা ও আমি, দ্বারের আড়ালের ধারে, প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া, আগন্তুকদিগের কার্য্যাবলী বীক্ষণে লক্ষ্য করিতেছিলাম এবং তাহাদের কথাবার্ত্তা, বক্তব্যের সম্ভব, শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

দস্যুদিগের মধ্যে একজন বলিল, নীচে হইতে রজ্জু সোপান এই উচ্চ গৃহ দ্বারে ছুড়িয়া ফেলা বড় সহজ নহে—একপ্রকার অসম্ভব।—অনেক শক্তির আবশ্যক।—এত শক্তিশালী আমাদের মধ্যে, বোধ হয়, কেহই নাই।

কিয়ৎক্ষণ সকলে নীরব রহিল—বোধ হয়, কখন কি করিবে, তাহাই তাহারা ভাবিতেছিল। একজন এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, হাঁ, একটা উপায় আমি স্থির করিয়াছি। গৃহ সন্নিকটস্থ এই নিম্ব বৃক্ষের উপর উঠিয়া রজ্জু সোপানের আগ্রভাগ দ্বারে ফেলিতে এবং উহার শলাকা দ্বারের আড়ার আবদ্ধ করিতে সহজেই পারা যাইবে।

এই প্রস্তাব সকলেই প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে করিল এবং একজন রজ্জু সোপান লইয়া বৃক্ষে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার পরিধানের বসন ভাল করিয়া গুছাইয়া লইয়া সে মল্লবেশ ধারণ করিল; উত্তরীয় খুলিয়া একজনের নিকট রাখিয়া দিতেছিল। তাহাকে তাহার উত্তরীয় দিতে দেখিয়া সে বলিল, উত্তরীয় লইয়া গাছের উপর উঠ; রজ্জু সোপান ছাদে ফেলিবার সময় উহার আবশ্যক হইবে। একহস্তে বৃক্ষের শাখা ধরিয়া থাকিয়া অপর হস্তে সোপানের আগ্রভাগ দ্বারে ছুড়িয়া ফেলিতে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। উত্তরীয় দ্বারা আপনাকে একটা পরিপুষ্ট শাখার কাণ্ডের সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিবে এবং মুক্ত দুই হস্তে তুমি স্বচ্ছন্দে কার্য্য করিতে পারিবে।

—ঠিক বলিয়াছ—উত্তরীয়ের আবশ্যক হইবে।

লোকটা, উত্তরীয়টা নিয়ে কোনওরূপে জড়াইয়া লইয়া এবং রজ্জু-সোপানের একপ্রান্ত কটিদেশের বসনের সহিত সংলগ্ন করিয়া, বানরের ন্যায় সরল বৃক্ষকাণ্ড ও শাখা বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। বৃক্ষের একটি উচ্চ শাখা আমাদের ছাদের অতি সন্নিকটে প্রসারিত হইয়া আছে এবং উহার কাণ্ডও যেন পরিপুষ্ট ও দৃঢ় বলিয়া অনুমান হয়। ঐ ব্যক্তি এই শাখায় আসিয়া আপনাকে উহার কাণ্ডের সহিত আপনার উত্তরীয় দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিল। আমরা ছাদের প্রাচীরের অন্তরালে থাকায় অন্য প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়া, তাহার কার্য্যকলাপ, এই অপরিস্ফুট চন্দ্রালোকে ও শাখাপল্লবান্বিত তরল ও স্বচ্ছ অন্ধকারে, যতটা সম্ভব, লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সে তাহার কটিদেশ হইতে রজ্জু-সোপানের আগ্রভাগ মুক্ত করিয়া ছাদে ফেলিবার চেষ্টা করিল, দুই তিনবার চেষ্টার পর উহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পড়িল এবং প্রাচীরের এক স্থানে সংলগ্ন হইয়া গেল। আমরা বুঝিলাম যে সোপানের এই প্রান্ত প্রাচীরে সংলগ্ন হইবার জন্য আয়ুধ কোনও অস্ত্র আবদ্ধ আছে। ঐ আবদ্ধ অস্ত্রটা যে কি তাহা

দেখিবার জন্য, আমরা, ধীরে ধীরে, গোপনে, প্রাচীরের রজ্জু-সোপান-সংলগ্ন অংশের নিকট অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম রজ্জু-সোপানের এই ধারে একটী ভারী এক লৌহশলাকা বদ্ধ এবং উহা প্রাচীরমূলের রেখায় তৃণরূপে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি রজ্জু ধরিয়া দুই চারিবার টানিয়া দেখিল যে ঠিক লাগিয়া গিয়াছে—খুলিয়া যাইবার বা ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই—তখন সে সোপান বিয়ে ফেলিয়া দিল, বলিল, —"লও, ঠিক হইয়াছে, এখন কে উঠিবে উঠ! আর আমি এখানে থাকিতে পারিতেছি না, পিপীলিকা দংশনে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভীষণ জ্বলিতেছে—উহু—উহু—মেলাম-মেলাম, আমার সর্ব্বাঙ্গে ধরিয়াছে—ধরিয়া মেলাম—চক্ষুর মধ্যে পিপীলিকা দংশন করিয়াছে—চাহিতে পারিতেছি না—অন্ধ করিয়া দিল।"

একজন নিম্ন হইতে বলিল, "চুপ কর।—চেঁচাইও না!—পিপীলিকা দংশন সহ্য করিতে পার না?"

উপর হইতে বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি বলিল, না!—একবার উঠিয়া আসিয়া ভোগ না কত সুখ! উহু—উহু—উহু—ধাবারে—

বৃক্ষ হইতে সম্বন্ধ সে নীচে পড়িয়া গেল। বোধ হয়, সে তাহার উত্তরীয়বস্ত্র দেহকে মুক্ত করিয়া, ত্বরান্বিত বৃক্ষ হইতে নামিতে গিয়া, তাহার হস্ত ও পদ স্খলন হইয়াছিল। সে নীচে পড়িয়া গোঙ্গাইতে লাগিল। অত উচ্চ হইতে পড়িয়া তাহার আঘাত অত্যন্ত গুরুতরই হইয়াছিল।

দলের একজন জিজ্ঞাসা করিল "খাঁড়িয়া আছে ত?"

—এখনও ত আছে।

—একজন ইহাকে নগরপালের খাটিতে লইয়া যাও, সেখানে ইহার শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হইবে।

—কিন্তু লইয়া যাওয়া যায় কিরূপে? ইহার সর্ব্বাঙ্গ যে পিপীলিকায় ছাইয়া ফেলিয়াছে!

—যে কোনও প্রকারে ইহাকে এখান হইতে লওয়াইতে হইবে। যেমন করিয়া পার ইহাকে লইয়া যাও!

একজন কোন উপায়ে আহত ব্যক্তিকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। সে যে কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা আমরা উপর হইতে অস্পষ্ট আলোকে ভাল দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয় সে আহতের সংজ্ঞাহীন দেহ স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া গিয়া থাকিবে।

এক ব্যক্তি তখন বলিল "তুমি এখন উপরে উঠ। তুমিই উপরে যাইবে বলিয়াছিলে না?"

রজ্জু সোপান ধরিয়া সকলে টানাটানি করিয়া দেখিল যে ছিঁড়িয়া বা খুলিয়া যাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

এক ব্যক্তি বলিল "একজন করিয়া উঠ। একজন গ্রামে পঁহুছিলে তবে আর একজন উঠিবে। দুইজনের ভার রজ্জুতে না সহিতে পারে।"

অপর একজন বলিল "খুব সহিবে। দুইজন একত্রে পাশাপাশি উঠিয়া যাও। একজন করিয়া যাওয়া নিরাপদ নহে। গ্রামে কেহ থাকিতে পারে কিংবা আসিতেও পারে।"

—বেশ, তবে তাহাই হউক—দুইজন একত্রে উঠ।

—আমি এরূপ করিয়া উঠিতে পারিব না।

—কেন পারিবে না?

—না, আমার সাহস হয় না।—রজ্জু ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

—না, ছিঁড়িবে না। উঠ।

—না, আমি উঠিব না—তুমি ত নিজে উঠিতে পার! তুমি নিজে উঠিয়া তোমার সাহসটা দেখাইয়া যাও না!

—বেশ, আমিই উঠিতেছি—কিন্তু আমার সহিত আর কে আসিবে? —দুইজন একসঙ্গে যাওয়া আবশ্যক।

অন্য এক কণ্ঠে শুনিলাম "আচ্ছা, চল! উঠ! আমি তোমারসঙ্গী হইব।"

আমরা, উপর হইতে প্রচ্ছন্ন ভাবে যতটা দেখা যায়, তাহা দেখিয়া বুঝিলাম যে, এই রজ্জু সোপানের দুই দিকে সোপান আছে এবং দুইজন একত্রে দুই দিকের সোপান দিয়া উঠিতেছে। আমরা উভয় প্রাচীর-সংলগ্ন সোপানের শলাকার নিকট বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যখন আমরা দেখিলাম যে তাহারা ছাদের প্রাচীর ধারণ করিবার জন্য হস্তপ্রসারিত করিবার উপক্রম করিতেছে তখন আমি পার্শ্বিত ছুরিকা দ্বারা লৌহশলাকা হইতে সোপানের মূল রজ্জু কর্ত্তন করিয়া দিলাম। শলাকা বিচ্ছিন্ন রজ্জু সোপান আরোহীদ্বয়ের সহিত সশব্দে নিম্নে পতিত হইল। ভূপতিত ব্যক্তিদ্বয়ের অস্পষ্টালোকে বুঝিলাম যে, তাহারা সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে।

একজন অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, "একি? একি হইল?—দেখ! দেখ! যা! মারা গেল বুঝি!—আর নড়ে না যে!—দুইজনেই যে একেবারে অসাড় হইয়া গেল!"

—তাইত!—দুইজনেই বোধ হয় মারা গেল!—নিশ্বাস পড়ে না যে! —মাথায় ও ঘাড়ে ভীষণ আঘাত পাইয়াছে। বোধ হয় দুইজনেই শেষ হইয়া গিয়াছে!

—খাঁড়িয়া থাকুক বা মরিয়াই যাউক্ ইহাদিগকে এখন সত্বর নগর-পালের নিকট লইয়া চল? দুইজন দুইজনকে স্কন্ধে তুলিয়া লও! আর তোমরা এখান হইতে আমাদের সকল অস্ত্রশস্ত্রগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া চল! সাবধান—যেন কিছু পড়িয়া না থাকে।—এখন চল!—আর বিলম্ব করিও না।

—আচ্ছা—তাহাই হইতেছে; কেবল ত হুকুম চালাইতেছ। কোনও কাজে ত এ পর্য্যন্ত হাত দাও নাই।—এখন কথা ছাড়িয়া একটু কাজ কর দেখি!—লও। তুমিই একজনকে কাঁধে তুলিয়া লও!

—বেশ—তাহা লইতেছি—কিন্তু দড়ীটা ছিঁড়িয়া গেল—না, কেহ কাটিয়া দিয়াছে?

অপর এক ব্যক্তি রজ্জুটী তুলিয়া বেশ অভিনিবেশের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল, "দড়ীটা কাটা বলিয়াই মনে হইতেছে।—বোধ হয় ছাদে কেহ আছে।"

—ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না।—কেহ কাটিয়া দিয়াছে বলিয়াই ত মনে হয়।

—কৈ দেখি?—না!—বোধ হয় ছিঁড়িয়াই গিয়াছে।—কেহ কাটিয়া দিলে ধারটা সমান হইত।

—কতকটা ত বেশ সমানই আছে।

—না,—না,—কোথায় সমান?—ছিঁড়িয়াই গিয়াছে বলিয়া ত মনে হইতেছে।

—এখন সে তর্ক থাক্! আর কেহ এখন উঠিতে যাইতেছে না। এখনি ইহাদের লইয়া চল নগরপালের বাটী!

—কিন্তু কাজ ত কিছুই হইল না!

—ভাই, তুমি কর! সব পুরস্কার তুমিই পাইবে। আমাদের দ্বারা আর কিছু হইবে না। পুরস্কারে আমাদের আবশ্যক নাই।

—নও!—চল!—কিরূপে আরও বিপদ ঘটিতে পারে।

ইহাদের কথায় আমরা বুঝিলাম যে রজ্জু কতকটা কাটিয়া ফেলিলে অবশিষ্ট অংশটুকু লোক দুইটার ভারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। উহারা কিন্তু অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া অবশেষে রজ্জুটাকে কেহ কাটিয়া দেয় নাই—ছিঁড়িয়া গিয়াছে, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইল। যাহা হউক উহার আর বিলম্ব করিল না; সহকর্ম্মীদের সংজ্ঞাহীন দেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল!

আমরা ছাদ হইতে নামিলাম এবং পিতাকে জাগরিত করিয়া রাত্রের ঘটনা জানাইলাম। তিনি সকল কথা স্থির ভাবে শুনিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন।—পাচক কি লাভিয়া আছে? তাহাকে কি সব কথা বলিয়াছ?

—না, বলি নাই।

—তাহাকে সংবাদ দাও—আজ আমাদিগের নি[illegible] সতর্ক থাকিতে হইবে।—সশস্ত্র হইয়া থাক—আমাদিগকে [illegible] পালা করিয়া রাত্রিটা জাগিয়া কাটাইতে হইবে।—কিন্তু তোমার [illegible] তিনিল কেমন করিয়া? বাটীর সন্ধানই বা কে দিল?

আমি পিতাকে বলিলাম "যখন পোতাশ্রয়ের পথে পোলযোগ হইতেছিল তখন দেখিয়াছিলাম শিবক ভেমিট্রি আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। অত রাত্রে এখন এই পলাতক দস্যুদলের মধ্যে মনে হইতেছিল যেন ভেমিট্রি অনেক কণ্ঠ শুনিতে পাইতেছিলাম।"

পিতা আর কিছু বলিলেন না। বাটীর দ্বারপাল ও ভৃত্যগণকে তিনি সশস্ত্র হইয়া পালাক্রমে জাগিয়া থাকিতে আদেশ দিয়া হাসে উঠিলেন এবং প্রাচীর আবদ্ধ লৌহশলাকাটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

আমি বলিলাম, "দস্যুরা বোধ হয় আজ আর ফিরিবে না।"

পিতা বলিলেন, "যদি অধিকতর পুরস্কারের লোভে পুনরায় আক্রমণ করে ত আজই আসিবে। কিন্তু বুদ্ধ সতর্ক হইয়া সময় পাইবে ও তাহাতে তাহাদের বিপদ বাড়িবার সম্ভাবনা তাহা তাহারা জানে।"

প্রত্নাবর্ত্তন আর্য্যপালককে সংবাদ দিতে গেল।

ইতি দেববক্তের আত্মচরিতে দস্যুসমাগম নামক নবম বিবৃতি।

ক্রমশঃ

কোথায় ঈশ্বর

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

হিংসার উন্মত্ততায় রক্তাক্ত পৃথিবী,
নরঘাতী, আত্মঘাতী, ভ্রাতৃ-হত্যা পাপ;
সুন্দর যাহা এবে শ্মশান কঙ্কাল,
ছড়ায় বিষাক্ত বায়ু কলুষ জঞ্জাল।

হে সুন্দর! যুগে যুগে যে মহামানব
আত্মাহুতি দিয়ে গেল মানবতা লাগি,
আনিল উপত্যকায় ঐক্যের মিলন,
আজি তারা কোথা গেল তাহার নির্বাসন?

যার ত্রাস মানুষের সভ্যতার নীতি
নিজেরে নিজেই করে আত্ম-হত্যা রণে;
সভ্যতা কাঁদিয়া মরে আধির-কবরে
দেবতা, মানব আজ মেলে এক স্তরে।

ছিন্ন জনতা মাঝে কোথায় ঈশ্বর?
কোথায় মানব শিশু মহা জাতিস্মর।

কোন এক আধুনিক কবির প্রতি

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার কবিতা পড়িলাম:
লিখিয়াছ এ যুগের মানুষের কথা।
লিখেছ কেমন করে মানুষের কর্ম্মহীন কামনা
সুন্দরের মৃত্যু এনে দিল।
তোমরা যেখানে থাক সেথা বাকি সবুজ প্রান্তর
ঘুঘুর গম্ভীর সুরে মেদুর! বঞ্চিত জীবন,
ইস্কাপন মাটি কাঁদে যন্ত্রের পীড়নে।
তোমার কবিতা পড়ি রজনীর দ্বিপ্রহরে।
এখনো কি জেগে আছ তুমি? প্রান্তর কি এখনো ঘুমায়?
জলতরা চোখে তোমা স্মরিলাম কবিবন্ধু মোর।
অপরাধ নিও নাক ভাই:
—তুমিও নূতন নও, আদিম পৃথিবী আজ নাই।
অরণ্যের বাঁচে শুধু সুন্দরের রূপলক্ষ্মী তরে;
মিছেই নূতন কথা বলো। ধৈর্য্যহীন বিবর্ণ বয়ন,
যেখানা মাটির নীচে মুক্তি লাগি কাকন কাঁদিছে।
অরণ্যেতে মরে যায় জীবনের অমৃত পাথেয়,
বিকৃত চেহারাতে শুধু রাজপথে ঘোরফিরু মরে।

অন্তর্বর্তী-গবর্ণমেণ্ট

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

লীগ্‌-লীগ অন্তর্বর্তী সরকার গঠন ও গণ-পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত বর্জ্জন করায় যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহারই পটভূমিতে ৮ই আগষ্ট ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসে। লীগ মহল হইতে কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছিল এই অধিবেশনে সে সকলের উত্তর দেওয়া হয়। লীগের আপত্তি ছিল—কংগ্রেস মন্ত্রিমিশনের দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা সর্ত্তাধীনে গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রাদেশিক পরিকল্পনা পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই। ইহা ছাড়া গণ-পরিষদের সার্ব্বভৌম অধিকারে ও লীগের আপত্তি থাকে। লীগের এই সকল অভিযোগ খণ্ডন করিয়া কংগ্রেস ঘোষণা করেন যে, মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনায় কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের আপত্তি থাকিলেও তাঁহারা উক্ত পরিকল্পনাটি সমগ্রভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে বলেন, মিশন-প্রস্তাবেই প্রদেশসমূহের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রদেশগুলি যথাসীঘ্র হইবে কিনা তাহা স্থির করিবার অধিকার তাহাদের নিজেদের রহিয়াছে। এ সম্পর্কে ১০ই যে তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইবে। গণ-পরিষদের সার্ব্বভৌম অধিকার সম্বন্ধে কংগ্রেস বলেন—ইহার অর্থ এই নয় যে, কোন বল কিশেষের কিশেষ কর্তৃত্বের কথা বলা হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে বাহিরের কোনও শক্তি গণ-পরিষদের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। ভারতের শাসনতন্ত্র রচনায় গণ-পরিষদের স্বাধীন অধিকার থাকিবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি লীগের এই সকল সন্দেহের নিরসন করিয়া উদারতার সহিত লীগকে সহযোগিতার আহ্বান জানান। শিখ সম্প্রদায়ের অভিযোগ সম্বন্ধে কংগ্রেস যে প্রস্তাব করেন তাহাতে বলা হয়, তাঁহাদের প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, শাসনতন্ত্র রচনাকালে কংগ্রেস তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন।

কংগ্রেসের আহ্বানে শিখ সম্প্রদায় গণ-পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিলেন বটে, কিন্তু লীগ কোনও সাড়া দিলেন না। তাঁহারা মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার সময় যে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করেন, পাকিস্থান অর্জ্জনার্থ সেই ১৬ই আগষ্টের সংগ্রাম দিবসের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

বড়লাট ভবন হইতে ১২ই আগষ্ট তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইল যে—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে বড়লাট কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে অবিলম্বে অন্তর্বর্তীকালীন গবর্ণমেণ্ট গঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং রাষ্ট্রপতি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

পণ্ডিত নেহরু বড়লাটের নিকট হইতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আমন্ত্রণ পাইয়া লীগের সহযোগিতার জন্য প্রথমতঃ মিঃ জিন্নার নিকট গমন করেন; তারপর তিনি মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎও করেন কিন্তু মিঃ জিন্না কংগ্রেসের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন।

এদিকে লীগ-ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস কিভাবে পালন করা হইবে পূর্ব্ব হইতেই লীগ নেতারা নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন—কেহ বলিলেন এই সংগ্রাম অহিংস সংগ্রাম হইবে না। কেহ প্রস্তাব করিলেন—আইন অমান্য। কেহ কেহ বলিলেন—এই সংগ্রাম কংগ্রেস বা হিন্দুদের বিরুদ্ধে হইবে না—সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের বিরুদ্ধেই হইবে। লীগের উচ্চতন মহল হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল, ঐ দিন সম্পূর্ণ হরতাল পালন করা হইবে, হরতালের জন্য কাহারও উপর কোনরূপ বলপ্রয়োগ করা হইবে না, তবে অনুরোধ করা হইবে মাত্র। লীগ নেতারা আশ্বাস দিলেন—শান্তিপূর্ণ ভাবে নিষ্কণ্টক দিবস পালন করা হইবে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

১৬ই আগষ্ট আসিয়া পড়িল, কিন্তু শান্তি পূর্ণভাবে নিষ্কণ্টক দিবস পালন করা হইবে এই ভাঁওতার আড়ালে যে বিরাট ষড়যন্ত্র কাজ করিতেছিল, প্রত্যুষ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার বুকের উপর তাহা আত্মপ্রকাশ করিল। লীগ গুণ্ডারা লাঠি, ছোরা, বল্লম, তরবারি, লৌহদণ্ড, কুঠার, সোডার বোতল প্রভৃতি হাতে লইয়া "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান" ধ্বনি করিতে করিতে দলে দলে কলিকাতার পথে পথে বাহির হইয়া পড়িল এবং পাকিস্থানবিরোধী হিন্দু মুসলমান প্রত্যেককেই বলপূর্ব্বক দোকানপাট বন্ধ করিয়া হরতাল পালন করিতে বাধ্য করিতে

লাগিল, এই লইয়া শীখ গুণ্ডারা নানা স্থানে লুঠতরাজ এবং কি ছুরি-মারা পর্য্যন্ত আরম্ভ করিয়া দিল। দুপুরের পর অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। সঙ্ঘবদ্ধ শীখগুণ্ডাদের দ্বারা হিন্দুদের কোটী কোটী টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, নানা স্থানে অবাধে অগ্নিকাণ্ড ও হত্যা চলিতে থাকিল। পুলিশ নিষ্ক্রিয় হইয়া তামাসা দেখিতে লাগিল। আক্রমণকার্য্য কোথাও কোথাও প্রতি আক্রমণ চলিলেও ঐ দিনে হিন্দুরা ঠিক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিল না। শনিবার সকাল হইতে এই আগুন আরও ছড়াইয়া পড়িল এবং মাঝার রূপ অত্যন্ত ভীষণ আকার ধারণ করিল। হিন্দু অঞ্চলে মুসলমান এবং মুসলমান অঞ্চলে হিন্দুগণ নির্ব্বিচারে হতাহত হইতে লাগিল। লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ ও নরহত্যার যে এক পৈশাচিকরূপ।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

রাজপথ শুধু মৃতদেহে সমাকীর্ণ ও নরক্তে প্লাবিত। পথে যানবাহনের নামগন্ধ নাই, বাজার ও দোকান বন্ধ, কোথাও কোথাও লুণ্ঠিত। চারিদিকে হত্যা, আতঙ্ক ও অনাহারের এক অবর্ণনীয় দৃশ্য।

অবস্থা চরমে উঠিলে পর বাঙ্গালার গভর্ণর ও নেতৃবৃন্দ এদিকে দৃষ্টি দিলেন। সহরে মৈশ আইন ও ১৪৪ ধারা জারী করা হইল। বড় বড় রাস্তার উপর সৈন্যদল মোতায়েন হইল এবং মাঝার স্থানে সৈন্যের গুলি চলিতে লাগিল, হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ মিলিতভাবে দেশবাসীর নিকট পরস্পর ভ্রাতৃহত্যা হইতে বিরত থাকিবার জন্য আবেদন জানাইলেন। এ সকল সত্ত্বেও কয়দিন ধরিয়া অলিগলিতে এবং কি বড় রাস্তাতেও হত্যা চলিতে লাগিল। ক্রমে অবস্থা আয়ত্তে আসিতে থাকে। মাঝার প্রায় ৫ হাজার নরনারী নিহত, ১০ হাজার আহত এবং প্রায় ১০ কোটী টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। কলিকাতা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানেও লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস লইয়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়, তবে কোথাও কলিকাতার ন্যায় বীভৎসরূপ ধারণ করে নাই।

লীগের এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কিন্তু অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠন আটকাইয়া রাখিতে পারিল না, ২রা সেপ্টেম্বর তদানীন্তন সরকারের সদস্যগণ পদত্যাগ করিলে তাঁহাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া বড়লাট অন্তর্বর্ত্তী সরকারের নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ অনুমোদন করেন—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, সর্দ্দার বলদেব সিং, ডাঃ জন মাথাই, মিঃ আসফ আলি, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীজগজীবন রাম, স্যার সাফাৎ আহমেদ খাঁ, মিঃ আলি জাহির, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, মিঃ সি, এইচ, ভাবা।

অপর দুইজন মুসলমান সদস্যের নাম পরে ঘোষণা করা হইবে বলিয়া জানান এবং ২রা সেপ্টেম্বর এই সরকার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন।

ঐ দিন যে সময়ে বড়লাট নয়াদিল্লী হইতে বেতার যোগে অন্তর্বর্ত্তী সরকারের নবনিযুক্ত সদস্যদের নাম ঘোষণা করিতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে সরকারের অন্যতম মুসলমান সদস্য স্যার সাফাৎ আহমেদ খাঁ আততায়ীদের হস্তে ছুরিকাহত হন। ইহার পর হইতে বড়লাট অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্যদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রতি নির্দ্দেশ দেন।

১লা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্যদের মধ্যে দপ্তরগুলি নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করা হয়।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু—পররাষ্ট্র ও কমনওয়েল্থ রিলেশন্স।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল—স্বরাষ্ট্র, বেতার, প্রচার

সর্দ্দার বলদেব সিং—যোগাযোগ

ডাঃ জন মাথাই—অর্থ

মিঃ আসফ আলি—যানবাহন

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ—কৃষি ও খাদ্য

শ্রীজগজীবন রাম—শ্রম

স্যার সাফাৎ আহমেদ খাঁ—স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চারুকলা

মিঃ আলি জাহির—আইন, ভাক ও বিমান

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী—শিল্প ও সরবরাহ

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু—খনি, কারখানা, বিদ্যুৎ

মিঃ সি, এইচ, ভাবা—বাণিজ্য

২রা সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার সময় বড়লাট প্রাসাদে অন্তর্বর্ত্তী সরকারের উপস্থিত সদস্যগণ শপথ করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন। সর্দ্দার বলদেব সিং, ডাঃ জন মাথাই, স্যার সাফাৎ আহমেদ খাঁ, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী এবং মিঃ সি, এইচ, ভাবা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিলেও স্ব স্ব দপ্তরের ভার গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দপ্তরের ভার ৪ঠা তারিখ পর্য্যন্ত পণ্ডিত নেহরু ঐ দপ্তর সমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ঐদিন কংগ্রেস অন্তর্বর্ত্তী সরকারের কার্য্যভার গ্রহণ করায় ভারতের সর্ব্বত্রই এক আনন্দোল্লাস প্রবাহিত হয়। হিন্দু ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা গৃহে গৃহে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করে। অপর দিকে কংগ্রেসের কার্য্যের প্রতিবাদকল্পে লীগপন্থী মুসলমানেরা কৃষ্ণপতাকা উত্তোলন করিয়া লীগ সেক্রেটারী মিঃ লিয়াকৎ আলির নির্দ্দেশ পালন করেন।

কংগ্রেস অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠন করায় এশিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকার নানা স্থান হইতে অনেকেই পণ্ডিত নেহরুকে অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেন।

নূতন গভর্ণমেণ্টের নেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কার্য্যভার

গ্রহণ করিবার পর, সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের সহিত এক গোলটেবিলে বৈঠকে জানান—যে, নূতন সরকারের সদস্যগণ যে যে দপ্তরের কার্য্য স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিলেও আমরা সমস্ত গুরুতর ব্যাপারই যৌথভাবে আলোচনা করিব। আমাদের লক্ষ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ইহার ৪০ কোটী নরনারীর জীবন যাত্রার মান উচ্চতর করা। আমরা আমাদের কাজে প্রত্যেক ভারতবাসীর সহযোগিতা আশা করি। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা ও ব্যবসার ক্ষেত্র হইতে ব্রিটিশ ব্যক্তিবিশেষকে বেতার তুলিয়া করার যে প্রথা আছে সেই উপাধি বিতরণ প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া হইবে।

মহাত্মা গান্ধী ঐদিন তাঁহার প্রার্থনার পর বক্তৃতায় বলেন যে, সমগ্র ভারত গুরুতর করিয়া আজিকার এই শুভ দিনটির জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই দিনটির জন্যই তাহারা অশেষ দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ায় এখন বলিতে পারা যায় এতদিনে পূর্ণ স্বাধীনতালাভের পথ উন্মুক্ত হইল। আজিকার দিন ভারতের ইতিহাসে এক চেরস্মরণীয় দিন। তারপর নূতন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—লবণকর সম্পূর্ণরূপে রদ করাই হইল নূতন সরকারের প্রথম কাজ। ইহার ফলে নূতনতম পল্লীর দরিদ্রতম অধিবাসী পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিবে যে স্বাধীনতা সমাগত। ইহা ছাড়া শাস্ত্রবারিক সম্প্রীতি, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও খাদি প্রচারকেও আশু তাঁহাদের কার্য্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৬ই সেপ্টেম্বর বড়লাট ভবনে এই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম অধিবেশন বসে। প্রথম দিনের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ অনুযায়ী লবণ-শুল্ক রদ, খাদি প্রচলন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন আলোচনা হয়। পাঁচজন অনুপস্থিত সদস্য কাজে যোগ না দেওয়া পর্য্যন্ত কোনও গুরুতর বিষয়ে নূতন গবর্ণমেণ্ট কিছু স্থির না করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও জনমতের অনুরোধকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ৭ই সেপ্টেম্বর এই নূতন সরকার আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর উপর হইতে সকল বাধানিষেধ প্রত্যাহার করেন। এই ৭ই তারিখেই পণ্ডিত নেহরু নবগঠিত সরকারের ভাইস-প্রেসিডেণ্টরূপে নয়াদিল্লী হইতে প্রথম বেতার বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতায় বলেন—ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সোপান হিসাবে আমরা অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করিয়াছি। ভারত আজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরা আমাদের অতীত অনুযায়ী দেশের ইতিহাস গড়িয়া তুলিব। আসুন আমরা সকলের সহযোগিতায় আমাদের সর্ব্বের ভারতকে জগতের শান্তি ও প্রগতির অগ্রদূত হিসাবে পৃথিবীর মহান জাতি-সমূহের অন্যতম করিয়া তুলি।

যে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী শাসক ইংরাজের বিরুদ্ধে অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন তাঁহারাই আজ নয়া-দিল্লীর নবগঠিত সরকারের আসনে সমাসীন, ইহা আজ কেমন করিয়া

ইন্দুভূষণ বসু

সম্ভব হইল! ইংরাজ আর কোন মোহে পড়িয়া স্বেচ্ছায় কংগ্রেসকে এই আহ্বান জানাইলেন। তাঁহারা এখন বেশ বুঝিয়াছেন যে শুধুই সংগ্রামের মধ্য দিয়া কংগ্রেস যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাকে আর ঘাঁটাইয়া রাখা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই স্বেচ্ছায় আহ্বান করিয়া আপোষে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই আয়োজন। কংগ্রেস সেই ক্ষমতা গ্রহণ করায় 'স্বাধীনতা আসন্ন ঐ' বলিয়া মনে হইতেছে। উপরেশনে তাহারই নবালোক যেন আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

১-৯-৪৬

শিল্পের জয়যাত্রা

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমদ্দার

যুদ্ধের হিড়িকে দেশে যথেষ্ট শিল্পোন্নতি হয়েছে। তার আদর চাহিদা। কলকব্জা অনেক সময় দূর থেকে জিনিষ বা আমির কাজেই শিল্পকেন্দ্র দ্বিতীয়তঃ বিদেশ থেকে আমদানী অসুবিধা। সময় সংক্ষেপ করবার পড়ে তোলা হয়েছে। এই রকম নানান কারণ এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে সামরিক কর্তৃপক্ষ অনেক সময় অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করেছেন। অবিলম্বে সরকারের সাহায্যও পাওয়া গেছে। সরকারী সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা ক্রমতর হয়েছে।

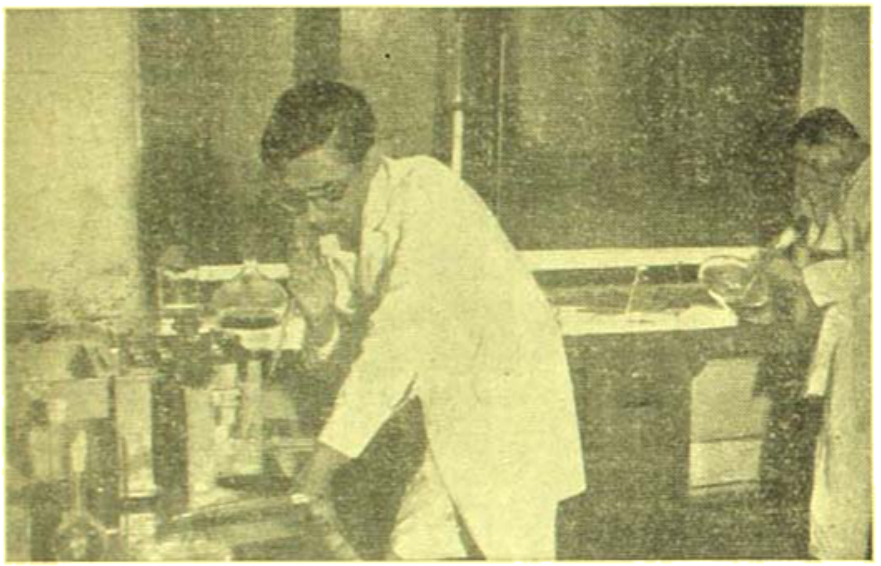

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ্ সায়েন্স বাঙ্গালোরের এক অংশ

এই শিল্পোন্নতির অনেক দিক; সবগুলিই উল্লেখ করা শক্ত। যেগুলি শুধু যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করছে সেগুলি এই পর্য্যায়ে পড়বে। তাছাড়া যারা পর্য্যন্ত লাভ দেখে ভবিষ্যতের কথা ভেবে রাখেনি, বা ভাবে নি তাদের কথাও সন্দেহজনক। এখন অন্যান্য অনেক অসুবিধাও হবে। যেমন বিদেশী প্রতিযোগিতা। তাছাড়া লোকের অর্থের উপর আঘাতও যথেষ্ট হবে গেছে। সে যে ক্রয়শক্তিরই দোষ তা নয়। ধন-তান্ত্রিকতার বুলি ছেড়ে দিলেও দেখা যাবে যে এইসব দেশী শিল্পের মালিক বা প্রতিষ্ঠাতারা তাঁদের প্রত্যহের দিকে নজর দেন নি, অনেক সময় জিনিষ ভাল করবার দিকে মন দেন নি, নিজেদের লাভের খবরা খিয়েই মাথা ঘামিয়েছেন,তারা কারবার তাঁরা নিজেরা বা কারুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন; বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিতাড়ীত দেশের লোক ব্যবসা করবে না। আজ তাঁরা যতই অর্থের বুলি আওড়ান না কেন—দেশের লোক তাদের বিশ্বাস করে।

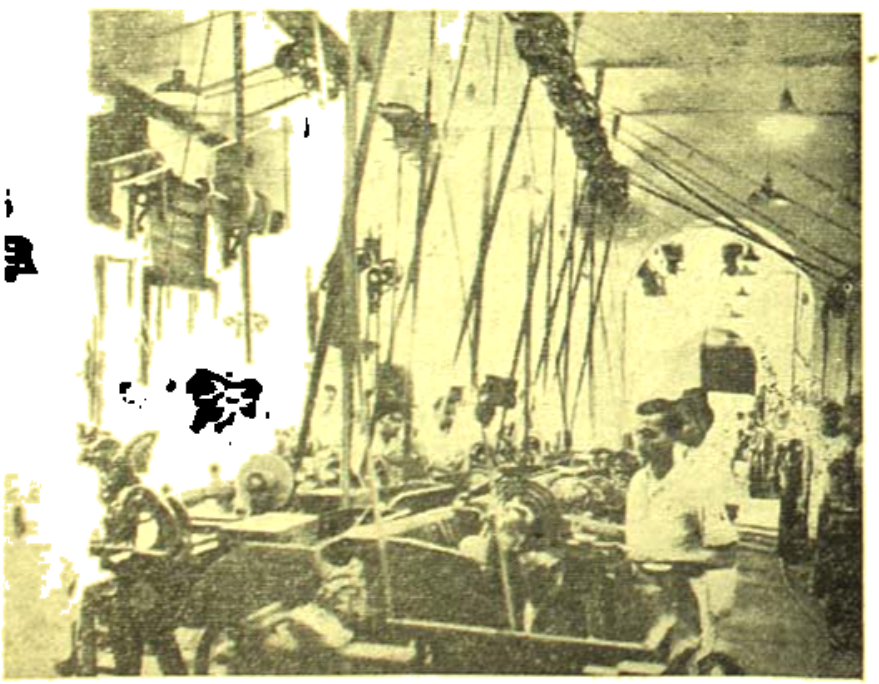

ভারতবর্ষে ম্যাগনেটিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরীর একটি পুরাতন কারখানা

এই শিল্পীকরণের অন্যান্য দিকও আছে। নানা প্রশ্ন। যেমন কোনটা

তাল কোনটা নয়, কোনটি কোথায় চলবে, শিল্প ক্ষেত্রের কথা। শ্রমিকের অবস্থাও সমস্যা। শুধু শ্রমিক নয়—কেরাণীকুলের সমস্যাও আছে—আর আছে বেকার সমস্যার কথা—কাচা মালের দিকটা। ছোট ছোট অনেকগুলো না চালিয়ে একটা বড় করা ভাল কিনা—কিংবা বড় যেগুলো আছে সেগুলো রইল, অল্প কতকগুলো ছোট ছোট ব্যবসায়ের সৃষ্টি করা সমস্ত। আরও বড় কথা অটোকরণের সমস্যা। সেই সঙ্গে আসবে রাজনৈতিক প্রশ্ন।

এত সব প্রশ্নের আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। সেগুলো এক এক করে করা দরকার।

মোট কথা যুদ্ধের কল্যাণে আমাদের দেশে অনেক নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অনেক পুরাতন শিল্প পতনোন্মুখ অবস্থা থেকে বেঁচে গিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি আরও প্রতিষ্ঠাবান হয়েছে। এসবের তথ্য ও তত্ত্ব এখনও পাওয়া যায় না। কারণ এতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধের প্রয়োজনে, For security reasons, এসব খবর সাধারণতঃ বাহিরে বেরোতে দেওয়া হত না। অবশ্য এখন কতক কতক সব পাওয়া যাচ্ছে যা যাচ্ছে। তাহলেও সব পাওয়া কোনদিনই যাবে না—তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী এত যে অনেক সময় পাওয়াই যায় না, সেগুলো তা এত পরে যখন যে তখন তা প্রায় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। Statistics বিদ্যুর নেই তা নয়—কিন্তু সবই আমলাতান্ত্রিক ব্যাপার।

যুদ্ধের পরও নানান কলকারখানা গড়ে উঠছে। হয়ত এসব গোড়াপত্তন যুদ্ধের সময় হয়েছিল। না হলেও এখন আরও শিল্প-প্রতিষ্ঠা চলবে। কারণ লোকের হাতে কাঁচা টাকা জমেছে—এদিকে যতই দুর্ভিক্ষ হোক না কেন?—চাহিদাও আছে—অন্যান্য অনেক সুবিধাও পাওয়া যাচ্ছে—দেশের লোকের না হোক্ কিছু লোকের মাথা এদিকে খুলেছে—আমাদের দেশের জমিদারশ্রেণীও তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিল্প ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকেছেন—ব্যাঙ্কিংএর প্রসারের জন্য ছোটখাট ব্যবসায়ীদেরও কিছুটা সুবিধা হচ্ছে—ইত্যাদি নানা কারণ আছে।

অবশ্য বড় একটা Slump আসতে পারে। তারই জন্য দরকার planning—তবে সে পরিকল্পনা ধনতান্ত্রিক হবে কি সমাজতান্ত্রিক হবে, এই নিয়ে আলোচনা চলবে। শিল্পপতিরা যাই বলুন না কেন, জনসাধারণ সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনাই চাইবে। ধনতন্ত্রের অনেকগুণ থাকতে পারে—কিন্তু দোষ যে অনেক বেশী। আর সমাজতন্ত্র নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু ঠিক রাশিয়ার পদ্ধতিই যে আমাদের অবলম্বন করতে হবে একথা কে বলছে? পরিকল্পনার প্রয়োজন আরও অনেক দিক থেকে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টার ফলে বেশে গবেষণায় সুযোগও অনেক বেড়ে গিয়েছে। যেমন এক নম্বর ছবিতে কাগজের উপর রঙের লাগাবার যে পদ্ধতি দেখা যাচ্ছে তা একজন ভারতীয়েরই আবিষ্কার। ভারতবর্ষেও রঙ্গরের চাষ হচ্ছে। দু নম্বর ছবিও একটি রঙ্গর ফ্যাকটরীর ছবি।

তৃতীয় ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে পেনিসিলিন প্রস্তুতের প্রচেষ্টা। বোম্বাইতে এই গবেষণা চলছে।

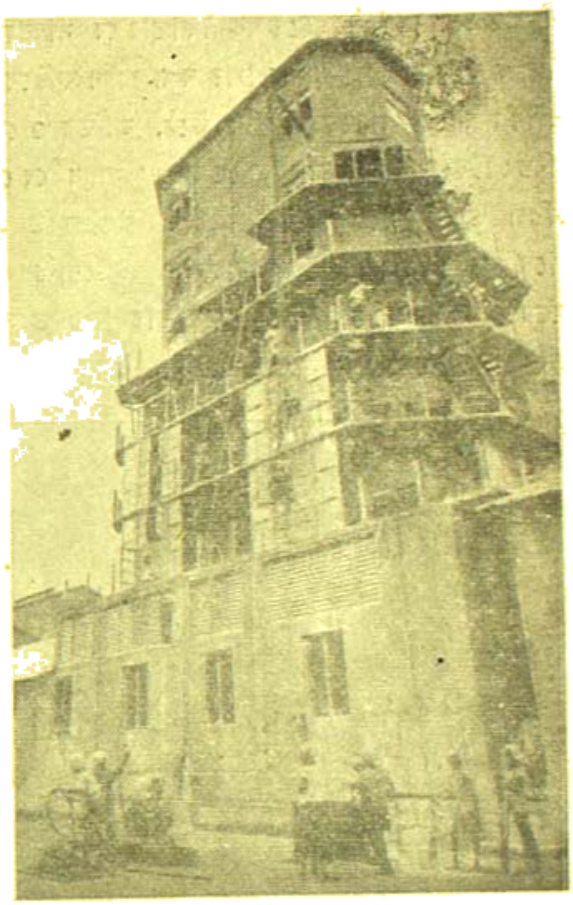

দক্ষিণ ভারতে রাসায়নিক কারখানার একটি অংশ
—স্প্রিং পাইপার তৈরী করার যন্ত্র

দক্ষিণ ভারতের রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ট্রাভাঙ্কোর কেমিক্যাল ঔষধপাতি তৈরীর কারখানা প্রভৃতি ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শিল্পের এই জয়যাত্রা সফল হোক, সার্থক হোক। ইহা ভারতের অধঃপতিত মূক জনসাধারণের প্রকৃত কাজে আসুক। এই ই আমাদের কামনা।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা—

গত ১৬ই আগষ্ট হইতে কলিকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হাঙ্গামা হইয়া গেল তাহার কথা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, জাতির ও দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারা যায় না। মানুষ যে কেমন করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়া পশুপ্রকৃতি হইতে পারে, তাহা ভাবিলে [illegible] হইয়া পড়িতে হয়। [illegible] সময় সময় সংবাদপত্রে কোন কোন দেশের আকস্মিক অগ্নি-উদ্গীরণে কোথাও কোথাও কিছু কিছু অংশ—এক ছাটি অংশ

[illegible] কলিকাতার একটি দৃশ্য — ফটো—শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible] ১০ হাজার লোক [illegible] প্রকাশ করিয়া আমেরিকার একটি বড় সহরে লোক মেরিয়া একদিনে আমরা তাহাদের ১০ হাজার লোক হত্যা করিয়াছি। এই হৈশাচিক কাণ্ড ৬ দিন ধরিয়া সংঘটিত হইয়াছিল। জাপানের টোকিও এবং হিরোশিমা সহরে অগণিত লোক মেরিয়া একে একে নিরীহ লোককে হত্যা করিতে—পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সভ্য জাতি বলিয়া যাহারা গর্ব্ব করে, তাহারা কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

গত কয়দিনে আমরা কলিকাতায় যে তাণ্ডবলীলা দেখিয়াছি। তাহা যে মানুষকে এই ভাবে হত্যা করিতে পারে, তাহা ইতিহাসে বিশ্বাস থাকিলেও যাহারা কখনও ইহা দেখে নাই, তাহাদের পক্ষে মনে করা সহজসাধ্য ছিল না। একদিকে উপর মুসলমান অধ্যুষিত বস্তির অন্ধকারে ইমারতগুলোর ছাদে ছোট ছোট [illegible] হিন্দু সংখ্যাধীন রাস্তা দিয়া চলিতেছিল তাহাদের লক্ষ্য করিয়া ইট পাটকেল ছুড়িয়া মারিয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। এবং কলিকাতা সহরের সমুদয় গঙ্গাতেই ঘটিয়াছে। কলিকাতার কিছু দক্ষিণে আলিপুর প্রভৃতি অঞ্চলের হাওড়া-ব্রীজের নিকটস্থ গঙ্গায় এক এক স্থানে কয়েকখানি করিয়া হাজারের বড় বড় নৌকা বাঁধা ছিল—প্রতি স্থানে হয়ত ৫০।৬০ জন করিয়া হিন্দু মাঝি ছিল। ৫।৭ শত উন্মত্ত মুসলমান তথায় যাইয়া প্রতি স্থান আক্রমণ করিয়া সকল মাঝিকে হত্যা করিয়াছে—১০।১২ স্থানে ঐরূপ ঘটনা হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। এইরূপ বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কথা লিখিতেও কম্পিত হয়।

রামায়ণে, মহাভারতে, ইতিহাসে, পুরাণে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে রাজনীতিক কারণের এরূপ হত্যাকাণ্ড সম্ভব হয়। এখানেও তাহাই হইয়াছে। বৃটীশ মন্ত্রীমিশন ভারতে আসিয়া হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে লইয়া নূতন শাসনপরিষদ ও ব্যবস্থাপরিষদ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কংগ্রেস যে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন—মুসলেমলীগ তাহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। যে কংগ্রেস গত ৬০ বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী প্রত্যেকের জাতি ধর্ম্ম বর্ণনির্ব্বিশেষে মঙ্গলের চেষ্টা করিয়াছেন, একদল মুসলমান সেই কংগ্রেসকে অবিশ্বাস করিল। কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিল এবং মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে

ভারতের একদল মুসলমান গত ১৬ই আগষ্ট নূতন শাসন-পরিষদ গঠনের প্রতিবাদে হরতাল ঘোষণা করিল। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ বর্ত্তমানে কংগ্রেসের শাসনাধীন —একমাত্র সিন্ধু ও বাঙ্গালায় লীগের শাসন চলিতেছে। সিন্ধুতেও হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান এবং সেখানকার হিন্দুরা ঘোড়া—কাজেই বাঙ্গালার লোক সাধারণত নিরীহ, এখানেই কংগ্রেস তথা হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানগণ জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। নানা ভাবে অশিক্ষিত জনতাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলা হইল। যে হইতে এই জেহাদের জন্য আয়োজন চলিতেছিল—সেজন্য ছোরা, লাঠি, বন্দুক, পেট্রল প্রভৃতি সকল জিনিষই পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। জেহাদের পূর্ব্বদিনে সহরতলী হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে লরীযোগে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল।

বৃটীশ মন্ত্রীমিশনের নির্দ্দেশ ও লীগগর্ব্বিত বড়লাটের শাসনপরিষদ গঠনের প্রতিবাদে লীগ মুসলমানগণ যে হরতাল ঘোষণা করিলেন, হিন্দুরা এবং কংগ্রেসী মুসলমানরা তাহাতে যোগদান করে নাই—করিবার কোন কারণও ছিল না।

বাজার কলে একটি ত্রিতল কৃহের অবস্থা ফটো—পান্না সেন

বৃটীশ এই ব্যবস্থার জন্য দায়ী, তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু করিতে যাইলে তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা, কাজেই বাঙ্গালা দেশে সংখ্যায় হিন্দুসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজকে উত্তেজিত করা হইয়াছিল। শুনা যায়, এইজন্য বাহির হইতে গুণ্ডা ও অস্ত্রাদি আমদানী করা হইয়াছে। আলিগড় হইতে প্রেরিত অস্ত্রপূর্ণ বহু বাক্স বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ধরা পড়িয়াছে। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে কলিকাতায় ৩।৪ মাস পূর্ব্ব

একটি ভস্মীভূত বস্তীর দৃশ্য ফটো—পান্না সেন

বাঙ্গালার লীগ সচিবসংঘ বে-আইনীভাবে ঐ দিন সরকারী ছুটী ঘোষণা করিলেন।

তাহার পর ঐ দিন সকাল হইতেই কলিকাতায় হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ প্রভৃতি আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথম কে কোথায় উহা আরম্ভ করিল, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। হিন্দুরা ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা ঐ দিন তাহাদের দোকান খুলিয়া রাখিয়াছিল, মুসলমানগণ জোর করিয়া দোকান বন্ধ করিতে যায়, তাহার ফলে গণ্ডগোলের সূত্রপাত ও হত্যাকাণ্ড আরম্ভ। প্রথমেই চৌরঙ্গীতে বন্দুকের দোকান লুণ্ঠিত হয় ও সেই সকল

বন্দুক হত্যাকাণ্ডে নাকি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ৩ দিন ধরিয়া লালবাজার পুলিস অফিসে উপস্থিত ছিলেন—তিনি পুলিসকে ঠিকমত চালাইবার জন্য তথায় ছিলেন বলিয়া ঘোষণা করিলেও দেখা গিয়াছে যে পুলিস সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ ছিল, তাহারা দাঁড়াইয়া হত্যাকাণ্ড ও লুঠ দেখিয়াছে—তাহাতে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে নাই। শুক্রবার সমস্তদিন কলিকাতার মুসলমানপ্রধান পল্লীগুলিতে যখন নিরীহ হিন্দুঅধিবাসীদিগকে সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া তাহাদের গৃহধ্বংস করা হইতেছিল, তখন হিন্দুরা আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে নাই, তাহারাও সংঘবদ্ধ হইয়া দলে দলে লাঠি বাঁধা বাহির হইয়া হিন্দুদিগকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হয়। এই ব্যাপারে এবার কলিকাতার হিন্দু

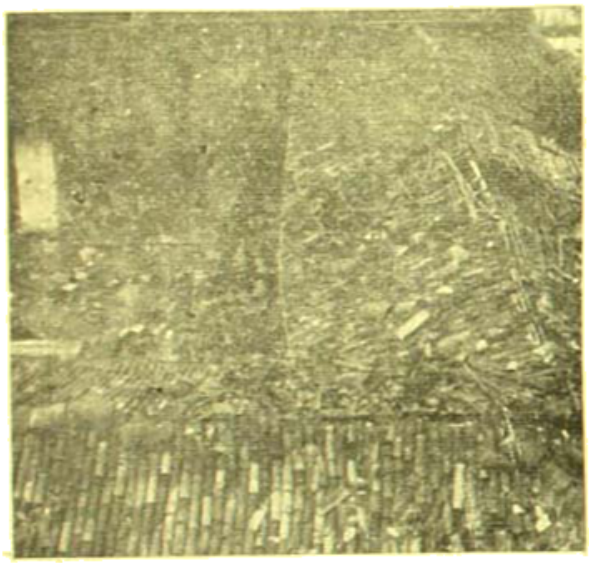

একটি বিধ্বস্ত দোকানের ভগ্নীভূত অবস্থা ফটো—পান্না সেন

যুবকগণ যে বীরত্ব ও শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালার ইতিহাসে অভিনব। যে বাঙ্গালী হিন্দুকে আমরা ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া সর্ব্বদা উপহাস করি, সেই বাঙ্গালী হিন্দু যুবকগণ প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া অসাধারণ সাহস ও বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছে। ১৬ই শুক্রবার হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয় এবং রবিবার পর্য্যন্ত সমভাবেই তাহা চলিতে থাকে। গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে সৈন্যবাহিনী পাহারা দিতে আসার পর হইতে ক্রমশ দাঙ্গা কমিতে থাকে। শনিবার সকাল হইতে হিন্দুরা আত্মরক্ষায় অবহিত হয় ও তাহার পর হিন্দুপল্লীতে যে মুসলমান নিহত হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য শত্রুকে হত্যা করা পাপ নহে—ইহা হিন্দু শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। কাজেই শনিবার ও রবিবার কলিকাতার হিন্দু পল্লীগুলীতেও বহু মুসলমান নিহত হইয়াছিল। তবে নৃশংস মুসলমান গুণ্ডারা যে ভাবে নিরীহ হিন্দুপরিবারগুলিকে সপরিবারে ধ্বংস করিয়াছে ও হিন্দু রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে, হিন্দুদের পক্ষে সেরূপভাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা সম্ভব বা সাধ্যায়ত্ত ছিল না। কাজেই হিন্দুরাই অধিক সংখ্যায় নিহত হইয়াছে। নিহত ব্যক্তিদের

একটি অগ্নিদগ্ধ দোকান ফটো—পান্না সেন

শব কলিকাতার পথে ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত পড়িয়া পচিয়াছে, তাহাদের সৎকাইবার লোক ছিল না। কলিকাতার রাজপথের উপর এবার শকুনির দলকে শব ভক্ষণ করিতে দেখা গিয়াছে। গলির মধ্যে, ময়লার গাদার মধ্যে, মাটীর নীচে ড্রেণের মধ্যে, গঙ্গা, খাল ও আদি গঙ্গার জলে এবার হাজার হাজার শব ভাসিতে দেখা গিয়াছিল। এরূপ বীভৎস দৃশ্য কলিকাতাবাসী কখনও দেখে নাই।

শুক্রবার হইতে ৫।৬ দিন দোকান-পাট, হাট-হাজার প্রভৃতি বন্ধ ছিল—কাজেই সহরবাসী বহু লোককে অন্নাভাবে দিন কাটাইতে হইয়াছে। বহু বাঙ্গীর লোক সপরিবারে

শুধু নুন-ভাত খাইয়া বাঁচিয়াছিল। বুধবার হইতে ক্রমে ক্রমে ২।৪টা দোকান খুলিতে থাকে ও যুবকগণ কলিকাতার বাহির হইতে নিজেরা দলবদ্ধভাবে অস্ত্রশস্ত্রসহ আসিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে জোগান দিতে থাকেন। রেশনের দোকান বন্ধ থাকায় চাউলও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল।

মোট কত লোক মারা গিয়াছে, তাহার হিসাব করা এখনও সম্ভব হয় নাই—কোনদিন হইবে কিনা জানি না। কারণ বহু নিরীহ দরিদ্র ভিখারী, মুটে, মজুর প্রভৃতিও নিহত হইয়াছে। সংবাদপত্রের হিসাব হইতে জানা যায়,

দাঙ্গার কয়দিন পরে একটি বাজারে খাদ্যান্বেষী জনতার ভীড়

ফটো—পান্না সেন

কমপক্ষে অন্ততঃ ১৫ হাজার লোক কলিকাতার দাঙ্গায় হতাহত হইয়াছে। খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান স্থানে হাজার হাজার হিন্দু মরিয়াছে—এখনও ভয়ে ঐ সকল অঞ্চলে হিন্দুরা যাইতে সাহস করে না।

অবশ্য সকল হিন্দু মুসলমানই যে দাঙ্গার সময় পশু-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, একথা মনে করিলে ভুল করা হইবে। বহু মুসলমান পরিবারকে হিন্দুরা আশ্রয় দান করিয়াছিল ও বহু মুসলমান পরিবারে হিন্দুরা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। বীডন স্কোয়ারের নিকট যেমন হিন্দুদের গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়া মুসলমান পরিবারগুলি রক্ষা পাইয়াছে, হনুমানজামা যেমন তেমনই এক মহাপ্রাণ মুসলমানের চেষ্টায় বহু হিন্দু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

কলুটোলা, ক্যানিং ষ্ট্রীট, বৌবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে এবং কড়েয়া, পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার, মৌলালি প্রভৃতি স্থানে বহু ধনী হিন্দুর গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছে। লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ হয় ত কয়েক কোটি টাকা হইবে। কলেজ ষ্ট্রীটের বাজারের মত স্থানে যে ভাবে দোকানগুলি পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

উপরুক্ত অবস্থাসমূহ হইতে নিরীহ হিন্দুদিগকে ও

কলেজ ষ্ট্রীটে অগ্নিদগ্ধ ডালিয়া ফটো—পান্না সেন

মুসলমানেরা মুসলমানদিগকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া নিরাপদ স্থানে রক্ষার ব্যবস্থা করে। সেজন্য কলিকাতার প্রায় সকল স্কুল ও কলেজ বাড়ীগুলি ব্যবহার করা হয়। এখনও লোকজন ভয়ে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে পারে নাই—কাজেই কলিকাতার সকল স্কুল কলেজ পূজার ছুটী পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা হইয়াছে, ১৪ই অক্টোবর স্কুল কলেজ খুলিবে। সাহায্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দুস্থগণকে অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতি দানের বিপুল ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এখনও সে সকল সমিতির কাজ চলিতেছে। ২৪শে আগষ্ট বড়লাট কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতার অবস্থা নিজে

কলিকাতার রাজপথে
বাত্যাবিধ্বস্ত
দুর্ভাগীদের
ফটো—পান্না সেন

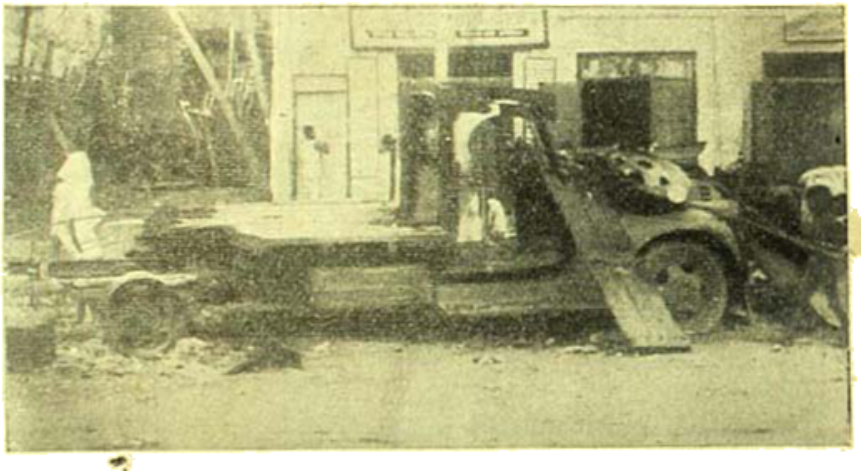

একটি রাজপথে
মোটর নদী
ফটো—পান্না সেন

হুগলীনদীর অপর
পারস্থিত এক দৃশ্য
ফটো—পান্না সেন

কলিকাতার রাজপথে
পথের দৃশ্য
ফটো—পান্না সেন

'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিনে
কলিকাতার পথে
পথে অগ্নিলীলা
ফটো—পান্না সেন

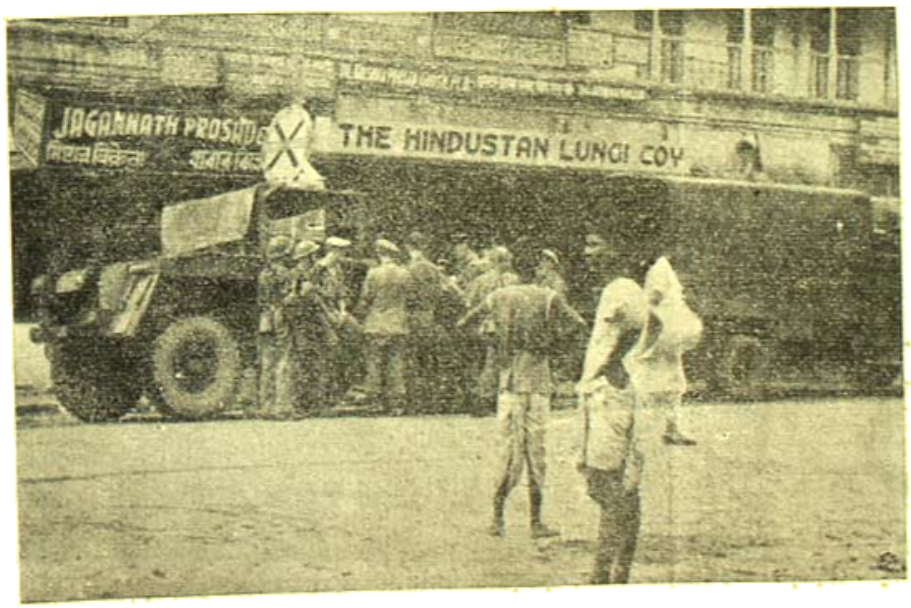

কলিকাতার পথ
মিলিটারী পাহারাধীন
ফটো—পান্না সেন

দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি দমদম বিমানঘাঁটি হইতে মোটরে বাহির হইয়া দুই ঘণ্টা কাল সহর ঘুরিয়া তবে লাটপ্রাসাদে গিয়াছিলেন এবং সোমবার সকল দলের নেতাদের সহিত

ঢাকা বাঙ্গ-বন্দর নট পাড়ায় লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত দোকান
ফটো—ন্যাশনাল ইলেষ্ট্রিক ষ্টুডিও

এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। দাঙ্গা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য শীঘ্রই এক কমিটী নিয়োগ করা হইবে। কমিটীতে একজন শ্বেতাঙ্গ, একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান

সোনারচুলির (নবাবগঞ্জ, ঢাকা) শীতলা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ
ফটো—ন্যাশনাল ইলেষ্ট্রিক ষ্টুডিও

হাইকোর্ট জজ সদস্য থাকিবেন। দাঙ্গার পর ২৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও এখন পর্য্যন্ত সান্ধ্য আইন জারি আছে—কলিকাতা সহরের রাজপথে সন্ধ্যার পর লোক চলাচল করে না। সহরের পথ হইতে আবর্জ্জনা সরানো হয় নাই—রাস্তার জল দেওয়ার ব্যবস্থাও হয় নাই। সহরের অধিকাংশে দোকান এখনও বন্ধ—বড়বাজারে বাইতে লোক সাহস করে না—মুর্গীহাটার বাজার খুলে নাই। এখন এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঙ্গালার মফঃস্বলে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঢাকায় ভীষণ দাঙ্গা চলিতেছে। চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, মৈমনসিংহ, পাবনা প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান জেলাগুলিতে হিন্দুর গৃহ ও বাজার লুঠ হইতেছে এবং হিন্দু অধিবাসীরা নিহত হইতেছে। দুর্গা পূজার আর অধিক বিলম্ব নাই—পূজা বাড়ীগুলি কি ভাবে রক্ষা করা হইবে, তাহা ভাবিয়া হিন্দুরা শঙ্কিত হইতেছেন।

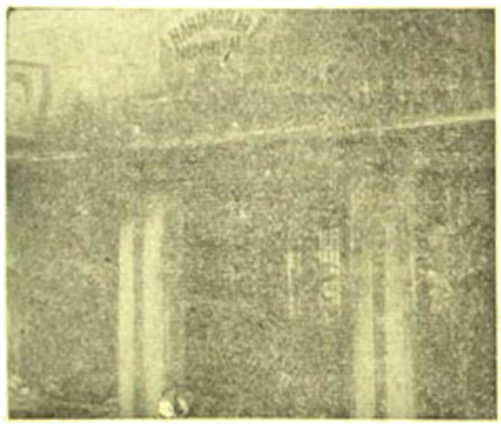

নবাবগঞ্জের একটি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত মুদীর দোকান
ফটো—ন্যাশনাল ইলেষ্ট্রিক ষ্টুডিও

এমন কথাও প্রকাশ পাইয়াছে, যে মিঃ চার্চ্চিলের সহিত মিঃ জিন্নার পত্রালাপের ফলে মিঃ জিন্না-শাসিত মুসলেম লীগ এইভাবে বৃটীশ মন্ত্রীমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে সাহসী হইয়াছে। অথচ একদিকে মিঃ চার্চ্চিল মিঃ জিন্নাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করিলেও প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলীর নির্দ্দেশে ভারতে লীগকে বাদ দিয়াই বড়লাট তাঁহার শাসন পরিষদ গঠন করিয়াছেন। কাজেই বৃটীশ রাজনীতিকদের অধিকাংশই যে এখন কংগ্রেসের সহিত আপোষ করিয়া ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে উৎসুক তাহা নূতন শাসন-পরিষদ গঠনের দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য বাঙ্গালার লীগ সচিবসংঘ, বিশেষ করিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী যে দায়ী, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অথচ কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়

হাঙ্গার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও সচিবসংঘের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা-পরিষদে কিছু করিবেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই। ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন ২রা সেপ্টেম্বরের স্থলে ১২ই সেপ্টেম্বর হইবে—সেদিন বর্ত্তমান লীগ সচীবসংঘের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে। 'ষ্টেটসম্যান' পত্র উপর্য্যুপরি ৩দিন ধরিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে বড়লাটকে অনুরোধ জানাইয়াছেন—বাঙ্গালায় তিনি যেন লীগ-সচিবসংঘ ভাঙ্গিয়া দিয়া ৯৩ ধারা প্রয়োগের দ্বারা স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ করেন—কিন্তু এখনও সে বিষয়ে কিছু হয় নাই।

লীগ সচিবসংঘ বাঙ্গালার শাসন কার্য্যে সর্ব্বত্র হিন্দুদের প্রভুত্ব খর্ব্ব করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতা

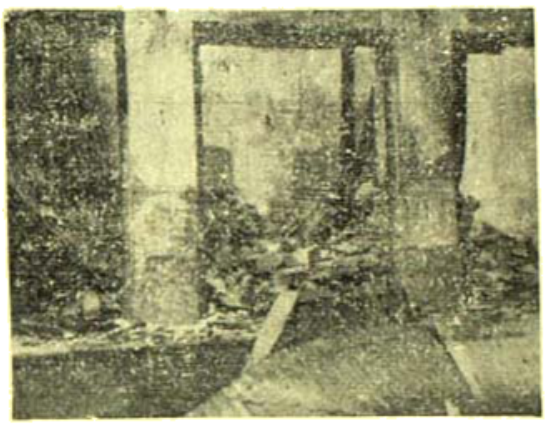

নরহত্যার পর একখানি মুদীর দোকানের লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত অবস্থা ফটো—অমৃত হইতে

পুলিসে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় বিভাগেই দুইজন মুসলমান ডেপুটী কমিশনার কাজ করিতেছেন। মফঃস্বলেও যেখানে হিন্দু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা নির্ব্বিবাদে লীগের নির্দ্দেশ না মানিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিতেছেন, সেখানে তাঁহাদের সরাইয়া মুসলমান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইতেছে।

গভর্ণরের এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকিলেও তিনি তাহা না করায় তাঁহার অযোগ্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। কলিকাতায় ১৬ই আগষ্ট দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণর যদি কড়া ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে এত অধিক ও ব্যাপকভাবে দাঙ্গা বাড়িতে পারিত না। কিন্তু গভর্ণর তাহা না করায় সর্ব্বত্র তিনি নিন্দিত হইয়াছেন। ষ্টেটসম্যানের মত শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত সংবাদপত্রও গভর্ণরকে এজন্য যথেষ্টভাবেই দোষী বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

দাঙ্গার পর ২০।২৫ দিন অতিবাহিত হইলেও কলিকাতার পথে গোপনে ছুরি মারা চলিতেছে। গত ৫ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার একদিনে সহসা ৩জন নিহত ও ২৫জন আহত হওয়ায় সহরের চাঞ্চল্য ও ভীতি দূর হয় নাই। ২।৪টা ছোরা মারার সংবাদ প্রায় প্রত্যহই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

বাঙ্গালা দেশে হিন্দুকে বাদ দিয়া মুসলমানের বা মুসলমানকে বাদ দিয়া হিন্দুর বাস করা সম্ভব নহে। যতদিন না প্রত্যেক হিন্দু ও প্রত্যেক মুসলমান একথা বুঝিতে পারে, ততদিন হাঙ্গামা বন্ধ হইবে না। সেজন্য এখন প্রবলভাবে আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। বাঙ্গালার একদল মুসলমান সাধারণতঃ বেপরোয়া ও হঠকারী—সেজন্য অতি সহজে হাঙ্গামা বাধিয়া যায়। তাহার ফলে মুসলমানই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

হিন্দু এবার সংঘবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষা করিতে ও আক্রমণের পর প্রতি-আক্রমণ করিতে অগ্রসর হওয়ায় কলিকাতার দাঙ্গা অধিক প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ইহাতে হিন্দুদের সংঘবদ্ধ হইয়া শক্তিচর্চ্চায় মনোযোগী হইতে শিক্ষা করা উচিত। শুধু সহরগুলিতে নহে, গ্রাম-গুলিতেও যুবকগণকে এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাদান করা প্রয়োজন। না খাইয়া বাঙ্গালী স্বভাবতঃ হীনবল হইয়া যায়। যদি তাহা সত্ত্বেও তাহারা শক্তিচর্চ্চায় মনোযোগী হয়, তবেই শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। নচেৎ মৃত্যুবরণ করা ছাড়া তাহাদের উপায়ান্তর নাই।

আলিপুর জেলে সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তি—

প্রাক্‌শাসন সংস্কার যুগের নিম্নলিখিত ৭জন রাজবন্দী গত ১৪ই ভাদ্র মুক্তিলাভ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, ওয়াটসন্ গুলী-করা মামলার সুনীল চট্টোপাধ্যায়, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুলী-করা মামলার নলিনী দাস, টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার প্রফুল্ল সেন, চরমুগরিয়া ডাক লুঠ মামলার সুরেন কর, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট ডাকাতি মামলার সুরেশ দাস ও রাজপুর ষড়যন্ত্র মামলার রামচন্দ্র বক্সী।

কলিকাতায় অভূতপূর্ব্ব হরতাল—

গত ২৯শে জুলাই সোমবার ডাক, তার, টেলিফোন ও আর-এম-এস কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘটের প্রতি সমগ্র জাতির সহানুভূতি প্রকাশের জন্য কলিকাতা ও নিকটস্থ শিল্পাঞ্চলে যে ব্যাপক ধর্ম্মঘট ও সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয় কলিকাতা ও বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহার আর তুলনা নিলে না। ঐদিন কলিকাতায় ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা, গরু মহিষাদির গাড়ী—কোনরূপ যানবাহনই রাজপথে দেখা যায় নাই। হিন্দু, মুসলমান, এংলো-ইণ্ডিয়ান, চৈন, শিখ, খৃষ্টান বা এসিয়াবাসী অগণিত দোকানের মালিকও হাটবাজার সব বন্ধ রাখেন। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বঙ্গীয় কমিটীর নির্দ্দেশ মত সকল কারখানার শ্রমিক কাজ বন্ধ করিয়াছিলেন। সকল দৈনিক সংবাদপত্র বন্ধ ছিল এবং রাত্রিতে কোথাও আলো জ্বলে নাই। এমন শান্তিপূর্ণ হরতাল পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই।

মুক্ত রাজবন্দী দল—

১৮ জন রাজবন্দী বহু বৎসর যাবৎ ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে আটক থাকার পর গত ৩১শে আগষ্ট মুক্তিলাভ করিয়া ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাহাদের নাম—শ্রীযুক্ত অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, সুখেন্দু দস্তিদার, লালমোহন সেন, সীতানাথ দে, বিরাজ দেব, অনুলা রায়, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, সুকুমার সেন, সহায়রাম দাস, কাশীপদ ঘোষ, জিতেন গুপ্ত, হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য, প্রভাত চক্রবর্ত্তী, মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী, সুবোধ চৌধুরী, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী। শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল।

মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও—

মুর্শিদাবাদ লালগোলার মহারাজা সার যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও গত ১৮ই আগষ্ট ১০৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। কয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এক মাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর হইতে তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন

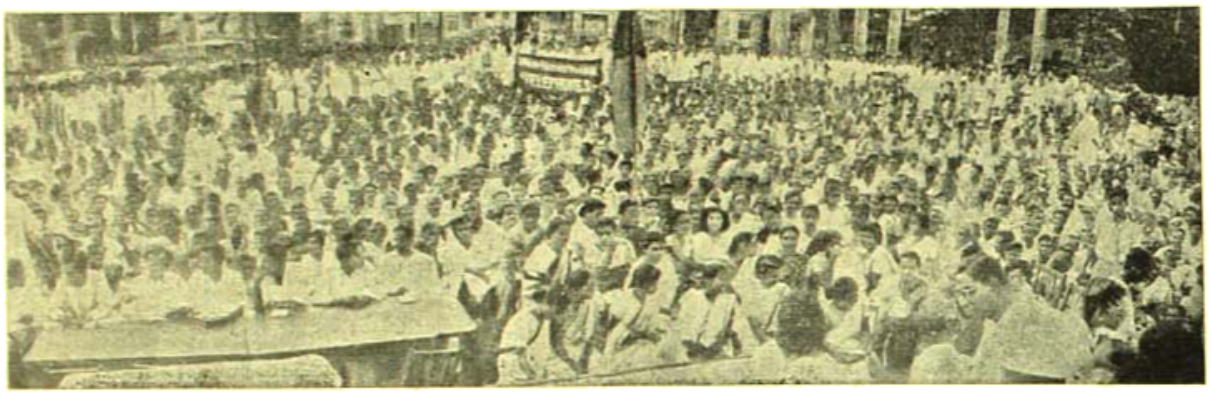

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডাক, তার ও আর-এম-এস ধর্ম্মঘটী কর্ম্মচারীদের মিলিত আলোচনা ফটো—পান্না সেন

মহারাজা সার যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও

করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স ১০০ বৎসর পূর্ণ হইলে দেশবাসী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পৌত্র রাজা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বজনপরিচিত। তিনি শুধু দানশীলতার দ্বারা নহে, তাঁহার অসামান্য সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহু নাটক কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ প্রথম জীবন হইতেই সাহিত্যপ্রীতি ও দানশীলতার জন্য সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন। বহরমপুর হাসপাতালে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা দান করেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জলকষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহার প্রদত্ত অর্থে অসংখ্য পুষ্করিণী, কূপ ও ইন্দারা খনিত হইয়াছে ও বহু পুষ্করিণীর সংস্কার হইয়াছে। কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির মহারাজার দানে নির্ম্মিত ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার এই সুদীর্ঘ কর্ম্মময় সুস্থ জীবন তাঁহার পুণ্যের পরিচায়ক। তিনি জীবনে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এ দেশে ক্রমে তাহা দুর্লভ হইতেছে।

কুমারী লীলা রায়—

স্কটিস চার্চ কলেজের ছাত্রী বিভাগের ব্যায়াম পরিচালিকা কুমারী লীলা রায় বি-এ, বি-টি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের

কুমারী লীলা রায়

বৈদেশিক বৃত্তি পাইয়া মেয়েদের ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যচর্চ্চা সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষার্থ দুই বৎসরের জন্য বিদেশে যাইতেছেন। তিনি সম্প্রতি উইমেনস ইণ্টার কলেজিয়েট এথলেটিক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কুমারী লীলা নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী।

পরলোকে ভবানীচরণ লাহা—

বাংলার স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী, সুকুমার শিল্পকলার একনিষ্ঠ সাধক ও রসবেত্তা, দানে মুক্তহস্ত ভবানীচরণ লাহা গত ১৭ই ভাদ্র ৬৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা

ভবানীচরণ লাহা

ঠনঠনিয়াস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। "ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব ফাইন আর্টস", "আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি-একজিবিশন" প্রভৃতি বহু শিল্পকলা ও সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটের চারুকলা বিভাগের তিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং "গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্ট" ও "ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের" তিনি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। "সোসাইটী অব অরিয়েণ্টাল আর্টসের" তিনি ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, "কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটির" সহঃ সভাপতি, সিংহলের রিলিগ সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট এবং "রূপম্" নামক শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটীর "ফেলো" ও

"রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলের" সভ্য ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় তাঁহার অঙ্কিত 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' ও পরে তাঁহার আরও বহু চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা ললিত কুমারী চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারী তাঁহার অর্থানুকূল্যে সুপরিচালিত হইতেছে। তাঁহার বিশাল জমিদারীতে আমিরাবাদ ভবানীচরণ লাহা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি দেশে জ্ঞান বিস্তারের সুবিধা করিয়া গিয়াছেন। ধনকুবের হইয়াও তিনি সর্ব্বসাধারণের সহিত মিশিতেন ও তাহাদের অভাব দুঃখ রোগ শোকে অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতেন।

পরলোকে খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী—

হাওড়ার খ্যাতনামা এডভোকেট ও কংগ্রেসকর্ম্মী খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ৬১ বৎসর বয়সে তাঁহার সালকিয়া

খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রায় ৩০ বৎসর তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন, একবার ভাইস্‌চেয়ারম্যানও হইয়াছিলেন ও খুব দক্ষতার সহিত মিউনিসিপ্যালিটীর কাজকর্ম চালাইতেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের একজন সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে গাঙ্গুলী মহাশয় হাওড়া বার-এসোসিয়েশনের সম্পাদক ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত খুব ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

পরলোকে প্রমথ চৌধুরী—

বাঙ্গালার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় গত ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯টায় কলিকাতা বালীগঞ্জে ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। পাবনা জেলার হরিপুর তাঁহাদের পৈতৃক বাসভূমি—তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং এম-এ, বার-এট্-ল হইয়া ১৮৯৭ সালে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতারাও সকলেই খ্যাতিমান লোক।

প্রমথ চৌধুরী

সার আশুতোষ চৌধুরী, কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র চৌধুরী, ব্যারিষ্টার ও শিকারী কুমুদ নাথ চৌধুরী, মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল মন্মথনাথ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার অমিয়নাথ চৌধুরী প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। প্রমথনাথ ১০ বৎসর সবুজপত্রের সম্পাদক ও কয়েক বৎসর বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন ও ১৯৩৮ সালে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে

'জগত্তারিণী পদক' প্রদান করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক মাত্র কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইন্দিরা দেবীও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা।

প্রমথনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে নূতনধারা প্রবর্ত্তন করেন—সেজন্য তাহার নাম হয় 'বীরবল'। প্রমথবাবু আইন ব্যবসায় মন না দিয়া প্রবন্ধ রচনায় মন দেন ও সেজন্য অল্পকাল মধ্যে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। সবুজপত্র প্রকাশ করিয়া তিনি এক নূতন সাহিত্যিক দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন—সে দলের সদস্যগণ অনেকেই ভবিষ্যৎ জীবনে সাহিত্য খ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। কয়বৎসর পূর্ব্বে দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিরাটভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল।

পরলোকে মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ব্যারিষ্টার মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ছাব্বার সময় ১৭ই আগষ্ট পথে একটি বালককে রক্ষা করিতে যাইয়া গুণ্ডার দ্বারা নিহত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা খ্যাতনামা স্ত্রীরোগ চিকিৎসক ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর ছিল—কয়বৎসর ব্যারিষ্টারী করার পর তিনি সম্প্রতি অতিরিক্ত জেলা জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

রাজগীর রামকৃষ্ণ-সারদানন্দ সেবাশ্রম—

বিহার প্রদেশে যে রাজগৃহে এক সময়ে মহারাজা জরাসন্ধ ও বিম্বিসারের রাজধানী ছিল, এখন তাহা এক স্বাস্থ্য-নিবাসে পরিণত হইয়াছে। রাজগীরের উষ্ণ প্রস্রবণের জল স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের বিশেষ উপযোগী। ঐ স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালীদের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য স্বামী রূপানন্দ তথায় রামকৃষ্ণ-সারদানন্দ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্মশালা, মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার প্রভৃতি স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। দুই বিঘা জমীর উপর আশ্রম গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানটি পাটনা জেলার মধ্যে, প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েক মাইল দূরে; যাতায়াতের বেশ সুবিধা আছে। স্বামীজী তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য দেশবাসী সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য কামনা করেন।

এসো স্বাধীনতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এসো স্বাধীনতা—হৃদয়ে আমার বস,
বিলম্ব আর কেন কর অতঃপর ?
লোকে বলে তুমি ভালবাস বাকি তুমি ?
নরের রক্তে নহ ধৌত তুমি,
রক্তেতে চাই তোমা তব শিহরণ।

২

আসের লীলা চলেছে নগরী যোগে,
শত নর-নারী মুণ্ড পরক্ষেপে,
যারা চাও তুমি তাহার অধিক পাবে,
ছিন্ন শিরের অন্ত যে দিকে চাবে,
কঠিন কঠোর পথে তব আগমন।

৩

সমর হয়েছে ঘোরী কলিঙ্গের আর,
শোণিত পিপাসা মিটেছে চামুণ্ডার।
অশোক হিন্দু করেছে মুসলমান,
মারণ যজ্ঞে কম নয় কারো দান,
দেহে মুণ্ড, ভয়, লজ্জা বিসর্জ্জন।

৪

তুমি এসে এসো পুণ্য অরুণ রাগ—
ঘুচে যাক সব রক্তের দাগ,
কর বিশুদ্ধ, নবীন জীবন দাও,
দাও দেবত্ব—পশুত্ব দিয়ে যাও,
মনুষ্যত্বে কর সমুদ্ধ নব।

৫

পুনঃ কুৎসিত বীভৎসে কর লয়,
স্মিতোজ্জ্বল শান্ত-রসাপ্লুত।
সুন্দরে ভাবের মিলাইয়া দাও মতি,
কর উন্নত জনগহিত ব্রতী,
এ দেশ হউক তোমার পদাশ্রিত।

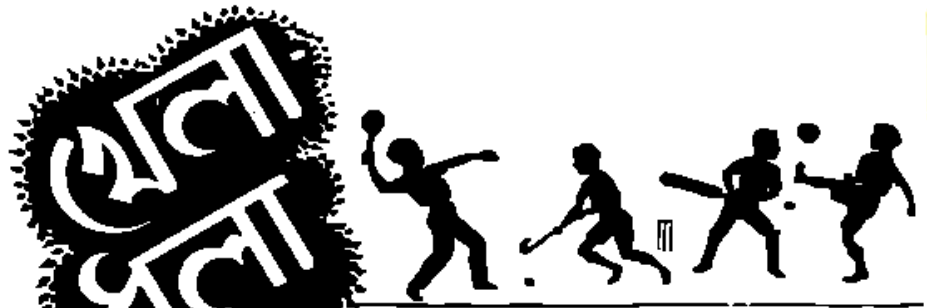

শ্রীকেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেট ঃ

ভারতীয় দল : ৩৩১

ইংলণ্ড : ৯৫ (৩ উইকেট)

বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায় এবং ড্র ব'লে ঘোষণা করা হয়।

ভারতীয় বনাম ইংলণ্ডের তৃতীয় টেষ্টম্যাচ ১৭ই আগষ্ট শনিবার কেনিংটন ওভাল ময়দানে আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড দলে কিসলক এবং এডরিচ মনোনীত হওয়ায় ইংলণ্ডের ব্যাটিং দিকটা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হ'ল। ভারতীয় দলের কাপ্তেন টসে জয়লাভ ক'রে দলকে ব্যাট করতে পাঠালেন। খেলা আরম্ভ হ'ল অনেক দেরীতে—নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে। কোন উইকেট না হারিয়ে ভারতীয় দলের ৭৯ রান উঠলে পর প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় দলের মোট ৯৪ রানে মুস্তাক আলী ৫৯ রান ক'রে রান আউট হলেন। মুস্তাক আলীর খেলার বিশেষত্ব দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। এর পর খেলার বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই—পতৌদি, অমরনাথ এবং হাজারী যথাক্রমে ৯, ৮ ও ১১ রান ক'রে হতাশ করলেন। লাঞ্চের সময় চার উইকেট পড়ে গিয়ে ভারতীয় দলের ২০১ রান উঠেছে। মার্চ্চেণ্ট চার ঘণ্টা ধরে ব্যাট করেছেন কিন্তু এডরিচ ও বেডসার তাঁকে ঘথেষ্ট বেগ দিয়েছেন। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩৩১ রানে শেষ হ'ল। ভি এম মার্চ্চেণ্ট ১২৮ রান ক'রে রান আউট হন। মানকাদ ৪২ রান করেন; সোহনী ২৯ রানে নট আউট থাকেন। এডরিচ ১৯'২ ওভার বল দিয়ে ৪টা মেডেন নিয়ে ৬৮ রানে ৩টে উইকেট পান। বেডসার ৩২ ওভার বলে ৬০ রানে ২টো উইকেট পেলেন।

ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হ'ল। ৬১ রানে তিনটে উইকেট পড়ে গেল। হাটন, ওয়াসব্রুক এবং কিসলক যথাক্রমে ২৭, ১৭ ও ৮ রান ক'রে আউট হলেন। দিনের শেষে ইংলণ্ডের তিন উইকেটে ৯৪ রান উঠলে পর খেলা সেদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল।

তৃতীয় দিনে আর খেলা হ'ল না খেলার উপযুক্ত আবহাওয়ার অভাবে এবং বৃষ্টির জন্য। আবহাওয়া এরকম খারাপ না হ'লে ভারতীয় দলের এ খেলায় জয়লাভের ঘথেষ্ট কারণ এবং আশা ছিল বলে অনেক বিচক্ষণ ক্রীড়ামোদী মনে করেন। তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের এই মোটা রান সংখ্যার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব মার্চ্চেণ্টের এবং সমস্ত সম্মানই তাঁর প্রাপ্য। তাঁর ১২৮ রান ইঙ্গ-ভারতীয় টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের পূর্ব্ব রেকর্ড ১০ রানে ভেঙ্গেছে। ১৯৩৩-৩৪ সালে জার্ডিন দলের সঙ্গে খেলায় অমরনাথ ১১৮ রান ক'রে ভারতীয় দলের পক্ষে প্রথম রেকর্ড করেন। মার্চ্চেণ্টের ১২৮ রানের মধ্যে বাউণ্ডারী ছিল পনেরটা এবং তিনি পাঁচ ঘণ্টাকাল উইকেটে খেলেছিলেন। মার্চ্চেণ্টকে ১২৮ রানে বিখ্যাত ইণ্টার ন্যাশন্যাল ফুটবল খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন রান আউট করেন। এ 'রান-আউটে' বেশ অভিনবত্ব আছে। প্রকৃতপক্ষে ডেনিস কম্পটন বাঁ-পায়ে বলটি সট ক'রে গোল করেন, যারফলে মার্চ্চেণ্ট আউট হ'ন। এ ঘটনা হয় ভারতীয় দলের ২৭২ রানের মাথায়। মানকাদ একটী বল মেরেছেন মিড-অনের ফাঁকা জায়গায়। মার্চ্চেণ্ট একটা রান নেবার জন্যে দৌড়ান আরম্ভ করে দিয়েছেন কিন্তু মানকাদ তাঁকে পিছিয়ে যেতে বলেন; এদিকে হাত দিয়ে বলটি তুলে ছুঁড়ে মেরে রান আউট করার সম্ভাবনা কম দেখে ডেনিস কম্পটন বলটি বাঁ পা

দিয়ে 'first time shot' করলেন; বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়ের এ লক্ষ্য ব্যর্থ হ'ল না, বলটি উইকেটে গিয়ে মার্চেন্টকে আউট করলো। ক্রিকেট খেলার এই ভাবের রান আউট সত্যিই অভিনব! মার্চেন্ট এই টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের পক্ষে রেকর্ড রান স্থাপন করলেও তাঁর খেলায় মাঝে মাঝে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা গিয়েছিল এবং কোন কোন সময়ে তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন হ'তে হয়েছিল। এবারের এই 'টুরে' মার্চেন্ট ইতিমধ্যেই নিজস্ব ২০০০ রান পূর্ণ করেছেন এবং মোদী তাঁর ১০০০ রান করেছেন। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের ফিল্ডিং খুবই উঁচুদরের হয়েছে। এডরিচ নতুন টেষ্টে নেমে ভালই খেলেছেন।

এবারের অভিযানে ভারতীয় বনাম ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ড্র হওয়ায় এবং তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ বৃষ্টির জন্য বন্ধ হওয়ায় ইংলণ্ড প্রথম টেষ্টের জয়লাভের উপর 'রুবার' লাভ করলো।

ওয়ারউইকসায়ার : ৩৭৫ (৯ উইকেটে ডিক্লে:)

ভারতীয় দল : ১৯৭ (মার্চেন্ট ৯৩ নট আউট) ও ২১ (১ উইকেট)। খেলা ড্র যায়।

প্রেক্ষিথ শীল্ড :

গত বছরের প্রেক্ষিথ শীল্ড বিজয়ী মহমেডান দলকে ২-০ গোলে হারিয়ে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এ বছর শীল্ড বিজয়ী হয়েছে।

মহিলার সন্তরণ রেকর্ড :

নেল ভ্যান ভ্লায়েট নামক ডাচ মহিলা ১০০ মিটার ব্রেক ষ্ট্রোক সন্তরণে উক্ত দূরত্ব ৭৯·৪ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে পৃথিবীর মহিলাদের মধ্যে নতুন রেকর্ড করেছেন। পূর্ব্বের রেকর্ড ছিল ৭৯·৮ সেকেণ্ড, গিসিলা গ্রাস নামক জার্ম্মান মহিলার, ১৯৩৩ সালে।

আই এফ এ শীল্ড :

আই এফ এ শীল্ডের খেলা গত ২৫শে জুলাই থেকে আরম্ভ হয়েছে। মোট ৪৭টি ফুটবল টীম প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। বর্ত্তমানে শীল্ডের চতুর্থ রাউণ্ডে খেলা হবে ইষ্টবেঙ্গল বনাম জর্জ্জটেলিগ্রাফ; ভবানীপুর বনাম মোগল-ট্রেডস ইণ্ডিয়া (বোম্বাই) দলের বিজয়ী দল; মহমেডান স্পোর্টিং বনাম বি-এ-রেলওয়ে; মোহনবাগান বনাম ত্রিপুরা পুলিশ। গত ১৬ই আগষ্ট থেকে ক'লকাতায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য ফুটবল খেলা স্থগিত আছে এবং পুনরায় এ বছর ফুটবল খেলা হবে কিনা এখনও আই এফ এ কিছু স্থির করে উঠতে পারেনি। এদিকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা ক'রে মোগল এ সি, ট্রেডস ইণ্ডিয়া (বোম্বাই) এবং ত্রিপুরা পুলিস নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গেছে। এই তিনটি দল যদি আর খেলায় যোগদান না করে এবং আই এফ এ কর্তৃপক্ষ যদি শীল্ডের খেলা পুনরায় আরম্ভ করেন তাহলে ভবানীপুর এবং মোহনবাগানদল 'ওয়াকওভার' পেয়ে সেমিফাইনালে উঠবে। খেলা আরম্ভ হলেও শীল্ড খেলার উপর জনসাধারণের আগ্রহ অনেক কমে গেছে। শীল্ডে বাইরের দলের মধ্যে খাজানা ক্লাবই এরিয়াঙ্গকে খেলার দ্বিতীয় রাউণ্ডে ২-০ গোলে হারিয়ে ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দলটি তৃতীয় রাউণ্ডে ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে মাত্র ১-০ গোলে পরাজিত হয়। ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলায় খাজানা ক্লাব খেলার প্রথম দিকে যে পরিমাণ গোল করবার সুযোগ পায়, তার কয়েকটি কাজে লাগলে খেলার অবস্থা অন্য রকম হয়ে যেত। ইষ্টবেঙ্গল দলও কয়েকটি অব্যর্থ গোলের সুযোগ নষ্ট করে। বাইরের দলের মধ্যে ২৪পরগণা জেলা এসোসিয়েশনের টীম শীল্ডে ভাল খেলেছে। দ্বিতীয় রাউণ্ডে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ট্রেডস ইণ্ডিয়া দলের সঙ্গে তারা ২-০ গোলে পরাজিত হলেও তাদের অগৌরবের কিছু নেই। ট্রেডস ইণ্ডিয়া নামকরা টীম। ২৪পরগণা দলের সকলেই তরুণ খেলোয়াড়; নামকরা দলের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা থাকলে তারা আরও ভাল খেলতে পারতো এবং খেলার ফলাফল বিপরীত হ'লে আশ্চর্য্যের কিছু হ'ত না। ২৪পরগণা দল যে দুর্ভাগ্যের জন্য হেরেছে একথা সেদিনের মাঠের দর্শকমাত্রেই স্বীকার করবেন। বিপক্ষের গোলে বল নিয়ে গিয়ে গোল করবার বহু সুযোগ তাদের ফরওয়ার্ডের খেলোয়াড়রা নষ্ট করেছে। ট্রেডস ইণ্ডিয়া দলের খেলা দর্শকদের হতাশ করেছিল।

ঢাকার ওয়ারী ক্লাব অনেক দিনের; শীল্ড না পেলেও শীল্ডের খেলায় পূর্ব্বাপর বছর এই দলটি বেশ ভালই খেলে গেছে। কিন্তু এবছর এই দলটি মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। তৃতীয় রাউণ্ডে ক'লকাতার দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান জর্জ্জ টেলিগ্রাফ দলের কাছে ৪-০ গোলে

শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এক কথায় ওয়ারী ক্লাব দাঁড়াতেই পারেনি।

সি-এম-পি (মিলিটারী পুলিশ) তৃতীয় রাউণ্ডে ভবানীপুরের কাছে রেফারীর ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে ৩-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। স্থানীয় ইউরোপীয় কোন দলই এবার ফাইনালের দ্বিতীয় রাউণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

দীর্ঘতম টেনিস খেলা ঃ

বিদি টালবার্ট ও গার্ডনার মুলোয় ৩-৬, ৬-৪, ২-৬ ৬-৩ ২০-১৮ সেটে ডোনাল্ড ও'নীল ও ফ্রাঙ্ক গিথর্সকে পরাজিত ক'রে আমেরিকান লন টেনিস ডবলস চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছেন।

এই খেলাটি আমেরিকার ডবলস খেলার ইতিহাসে সব থেকে দীর্ঘ সময় নিয়ে ছিল বলে প্রকাশ।

সাঁতারে পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

ডাচ মহিলা সাঁতারু নেল ভ্যান ভ্লায়েট ২০০ গজ ব্রেষ্ট ষ্ট্রোকে উক্ত দূরত্ব ২ মিঃ ৩৫·৬ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে মহিলাদের মধ্যে পৃথিবীর নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল হলাণ্ডের, ১৯৩৯ স্থানে স্থাপিত ২ মিঃ ৪০·৩ সেকেণ্ড।

সুইডিশ এ্যাথলেটদের কৃতিত্ব ঃ

ইউরোপীয়ান ট্রাক এণ্ড ফিল্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার দশটি বিষয়ের মধ্যে ছয়টিতে সুইডেন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে এবং ১৭৪ পয়েণ্ট পেয়ে, প্রথম হয়েছে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন ৯৬ পয়েণ্ট পেয়ে; তৃতীয় হয়েছে ফ্রান্স ৮০ পয়েণ্ট নিয়ে; ফিনল্যাণ্ড ৭০, গ্রেট বৃটেন ৬৮, নেদারল্যাণ্ড ৭৮, নরওয়ে ৩৯, ডেনমার্ক ৩৬, ইটালী ২৮, চেকোশ্লোভাকিয়া ২২, সুইজারল্যাণ্ড ১৯ এবং পোলাণ্ড ১১ পয়েণ্ট পেয়েছে।

ইংলণ্ডের ক্যাপটেন বিল রবার্টস এই প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত খ্যাতি লাভ করেছেন। এ্যাথলেট হিসাবে ফিনিসদের যে সম্মান ছিল তা আজ হারাতে বসেছে, সে স্থানে সুইডিস এ্যাথলেটরা অগ্রগামী হয়েছে। এই প্রতিযোগিতাটির ষ্ট্যাণ্ডার্ড পৃথিবীর অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সমান সুতরাং ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিলাতে ফুটবল খেলোয়াড়গণ ঃ

বিলাতের ফুটবল মরসুম আরম্ভ হয়েছে। সেখানের ফুটবল খেলোয়াড়রা ইউনিয়ন মারফৎ দাবী জানিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিকের হার তাদের দাবী মত বৃদ্ধি না হ'লে ফুটবল খেলা থেকে বিরত থাকবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ বিজ্ঞান" (২য় খণ্ড)—৩৲

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত "মানব দর্শ"—১।০,

"কপালকুণ্ডলা"—১।০

ভারতী মুখোপাধ্যায় প্রণীত "চিরন্তনী"—১।০,

"ঘটনা প্রবাহ"—৩৲

ইন্দ্রেন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "গল্প, গল্প আর গল্প"—২।০

সমরেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "নিয়তির শাসন"—৸০

ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট-প্রকাশিত "বঙ্গীয় মহাকোষ"

(৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা)—১৲

শ্রীবর্ণকমল ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "কবি কামিনীকুমারের সঙ্গীত"—১।০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

কার্ত্তিক—১৩৫৩

প্রথম খণ্ড	চতুস্ত্রিংশ বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

সুলতানা

নরেন্দ্র দেব

আমি ছিনু দিল্লীর সুলতানা,
নারীর দুর্ভাগ্য সে যে কতবড়—নাহি ছিল জানা।
সসাগরা ভারতের একছত্র শাসনাধিকার
করতলগত ছিল একদা আমার!
বিজয়িনী সাম্রাজ্ঞীর বেশে বসিতাম গর্ব্বোদ্ধত মনে
দিল্লীর দুর্লভ সিংহাসনে।

দিল্লী যার ইতিহাসে লেখা কত সভ্যতার উত্থান পতন,
পুরাণের চেয়ে যার প্রাচীন কাহিনী পুরাতন;
বিগত হস্তিনাপুরে, অতীতের ইন্দ্রপ্রস্থে, কে খুঁজিছে আজ—
কত রাজা—মহারাজা—রাজ-অধিরাজ—
চক্রবর্ত্তী নৃপতির দিগ্বিজয় হয়েছিল গৌরবে অঙ্কিত?
প্রতি ধূলিকণা যার বারে বারে হয়েছে শঙ্কিত
বৈদেশিক আক্রমণে-শাসনে—লুণ্ঠনে!
রাজেন্দ্রনন্দিনী কত, কত রাজমহিষীর রহস্য গুণ্ঠনে
দ্বৈর-দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ, প্রেম, হত্যা আর হরণের রোমাঞ্চ-কাহিনী!
পাঞ্চাল—কোশল—কাঞ্চি—শূরসেনা—বিদেহ-বাহিনী
আর্য্য অনার্য্যের রক্তে আরক্ত করেছে এর পথ;
রেখে গেছে অস্ত্র-লেখা, বক্ষে তার চক্ররেখা
বিজয়ীর রথ।
আসিয়াছে শক, হূন, আসিয়াছে বীর্য্যবান গ্রীক,
এসেছিল শৌর্য্যমত্ত শা'-নামাই শের-ই পারসিক।
উত্তর-পশ্চিম চীন হ'তে
এসেছিল সোনার ভারতে
ইউচি কুষাণ,
কণিষ্ক একদা যেথা হয়েছিল মহাকীর্ত্তিমান?

ইরাকের বীর কাশেম, মদগর্ব্বী গজনীর মামুদ,
ভারত সাগরে তুমি ক্ষণিকের অস্থায়ী বুদ্বুদ
কালের বিস্মৃতি গর্ভে মিলায়েছে আজ ;
দেশভক্ত মহাবীর কোথা সে নির্ভীক পৃথ্বীরাজ ?
কোথা সেই জয়চন্দ্র—উচ্চ-অভিলাষী স্বার্থপর ?
মানুষের কীর্ত্তি তার জীবনেরই অনুরূপ
ক্ষণস্থায়ী একান্ত নশ্বর !
বিস্মৃত মহম্মদ ঘোরী, কুতবের স্মৃতি শুধু
বহিতেছে কুতব-মিনার ;
খলজিবংশ, সৈয়দ, তুঘলুক, লোদী—
গল্প কথা সার !
দুর্দ্দান্ত মোগল দস্যু চেঙ্গিসের শুষ্ক অভিধান,
কোথায় তৈমুরলঙ ? কোথা সব দুরন্ত পাঠান ?

আমি সেথা দিল্লীর সুলতানা !
ক্রীতদাসপুত্রী আমি দাসবংশে আমার ঠিকানা !
নহি কোনো বাদশজাদী—নবাবনন্দিনী,
দৈবচক্র—দিল্লীনাথে ভাগ্যসূত্রে করেছে বন্দিনী ;
আগে পাছে হুকারে নকীব—আমি আজ দিল্লীর সুলতানা
হারেমের ধাত্রী হ'তে দরবারে আমারে
সুবর্ণ তাজামে তুলে আনা !
নারী হয়ে পুরুষের বেশে বসি হেসে তক্ত তাউসে
আমার কুন্তলগন্ধ, অঙ্গের সুরভি খেলে নিয়ে বেহারা বায়ু সে !
সারি সারি চারি ধারে নত হয় শত শির পরশি উষ্ণীষ,
দাঁড়াইয়া উঠি একসাথে, বারে বারে দুই হাতে
জানায় কুর্নিশ !
সারা নিশি শয্যাপার্শ্বে নিদ্রাহীন শত ক্রীতদাসী,
আমি যাহা নিতে চাই, আমি যাহা খেতে ভালোবাসি—
না সরিতে শ্রীমুখের বাণী
তখনি যোগায় তারা আনি।
মোর মনোরঞ্জনের তরে
অবিচ্ছিন্ন নৃত্যগীত চলিয়াছে অন্দর-আসরে।
নানা বাদ্য, নানা নাট্য, নব নব কৌতুকাভিনয়,
যাদুবিদ্যা, ভোজবাজী, ইন্দ্রজাল অনুষ্ঠিত হয়।
মুক্তাভস্ম সেবে দেয় পান,
গোলাপ নির্য্যাসে আমি নিত্য করি স্নান,
মুকুর-মণ্ডিত সেই সুশীতল মর্ম্মর হামাম,—
ডুবাইয়া নগ্নতনু সুরভিত সলিলের বুকে
পাই সেথা পরম আরাম !

তারপরে চলে মোর দীর্ঘ দণ্ড প্রসাধন নানা।
আমি আজ দিল্লীর সুলতানা,
রূপদক্ষ শত সহচরী
চাঁচর চিকুরে মোর রচি দেয় চিকণ কবরী,
কি করিব বেশবাস, কি পরিব রত্ন অলঙ্কার ?
পেটিকা খুলিয়া তারা তুলিয়া ধরায় বার বার—
ফিরোজা, আশমানি কিংবা কিমাবের সাজ,
কি চাও সুলতানা তুমি আজ ?
শেরওয়ানী—সালওয়ার চাই ? চাই কি গো
মিহি পেশোয়াজ ?
জহরৎ কি কি নেবে ? জড়োয়া না মোতি ?
জিঞ্জেশী চুনিয়া তোর পুরুষের ঘটাতে দুর্গতি
কী সাজে সাজিবে আজ দিল্লীর সুলতানা ?
কত না খলিফা যারে ভালবেসে হয়েছে দেওয়ানা !
নিজামৎ পায়ে এসে পড়ে ;
অঙ্গুলী হেলনে যার রাজ্য ভাঙে গড়ে,
কত বীর সর্দ্দারের দম্ভভরা স্পর্দ্ধায় ধূলিতে—
ভ্রূঁয়ির ইঙ্গিত মাত্র ছিন্ন-শির লুটায় ধূলিতে !
কঠোর নির্ম্মম শাস্তি কারো কারো দীর্ঘকাল চলে,
বন্দী রহে আজীবন মৃত্তিকার অন্ধকার তলে।
জীবন্ত সমাধি কারো নৃশংস শাসনে ঘটে লাভ !
জানি এর সবটাই অভিশপ্ত দিল্লীর প্রভাব।

উচ্ছল-যৌবনা আমি, অসামান্যা রূপসী তরুণী,
আমারে ঘিরিয়া আছে সাম্রাজ্যের সেরা যত গুণী।
রণবিশারদ কত মহাভুজ পরাক্রান্ত বলী,
চিত্রকর, নৃত্যশিল্পী, সুরস্রষ্টা, ভাস্কর্য্যকুশলী,
যন্ত্রবিশারদ কত, স্থপতি, সঙ্গীতবিদ, কবি,
আছে কত তত্ত্বদর্শী জ্ঞানবান দার্শনিক নবী ;
আমার করুণাপ্রার্থী, অনুগত তাহারা সবাই
চতুঃষষ্টি কলা আর সর্ব্ববিদ্যা শিখিয়াছি তাই।

অভাগা সে যার প্রতি জেগে ওঠে আমার বিরাগ,
ধরণীর পৃষ্ঠ হতে মুছে দিই তার জীবনের যত কিছু দাগ!
সমগ্র সাম্রাজ্যে নেই দুঃসাহসী হেন কোনো জন—
আমার আদেশ যার সাধ্য আছে করিতে লঙ্ঘন!
আজ্ঞাবহ ভৃত্যসম ছুটে আসে ওমরাহ, আমীর,
কোষমুক্ত অসি নিয়ে ছুটে আসে দিগ্বিজয়ী বীর,
নতশিরে মেনে নেয় নির্ব্বিবাদে আমার নির্দ্দেশ;
নতুবা সবাই জানে মুহূর্ত্তেই হবে তার শেষ!
আমি হাসি। গোলামের কন্যা আমি জানি—
এই স্বর্ণ সিংহাসনখানি
যে সম্মান দেয় মোরে আনি, সে নয় আমার;
নামে আমি দিল্লীশ্বরী, দিল্লী এই সিংহাসন যার।
আমার মুখের তাই একটি আদেশে—
ছুটে যায় লোকে দেশে দেশে,
সংগ্রহ করিয়া আনে যেখানে যা খুঁজে পায় দুর্লভ জিনিস
আমি শুধু যেথা অহর্নিশ
আনন্দে কাটাই কাল সুরা আর সঙ্গীতের সুরে,
দিল্লীর রহস্যময় শাহাজাদী বেগমের পুরে
বিচিত্র এ রঙ্‌মহল রমণীর রমনীয় দেশ
সুকঠিন চিরদিন পুরুষের এখানে প্রবেশ!
'পাজা' পায় শুধু যারা রূপের ঐশ্বর্য্যে ভাগ্যবান
সুলতানা পাঠায় যারে সানুগ্রহে গোপন আহ্বান!

পতঙ্গের মতো তারা বহ্নিশিখা পাশে আসে ছুটে,
কৃতার্থ হইয়া পড়ে পদতলে লুটে;
হীরক-মুকুতা-রত্ন খচিত এ পাদুকা চুম্বনে
ধন্য মানে আপন জীবনে!
আনে কত মূল্যবান মণি আভরণ,
কত দেশ, কত রাজ্য করিয়া লুণ্ঠন
এনে দেয় শ্রেষ্ঠ উপহার।
মোর প্রসন্নতা লাগি অসাধ্য বলিয়া যেন নাহি কিছু আর!

আমি জানি নারী আমি, জানি মনে আমি শুধু মেয়ে,
আমার খেয়াল খুশী চলে তবু ইচ্ছা মতো বেয়ে।
সাধ্য কার বাধা দেয়, স্পর্দ্ধা কার কে করিবে মানা?
আমি আজ দিল্লীর সুলতানা!

আমার রূপের আকর্ষণে
আসে যারা কাছে ছুটে—জানি মনে মনে
নহে তারা মোর অনুরাগী,
আমার প্রেমের কণা লাগি
লক্ষ্য নয় তাহাদের দিল্লীর হারেম,
তারা চায়, তারা খোঁজে—সুলতানার প্রেম!
যে কোনও কঠিন মূল্যে কিনিতে উদ্যত তারা সুলতানার মন,
যাহার পশ্চাতে পাতা দিল্লীর দুর্লভ সিংহাসন!

আমীর—ওমরাহ যত—প্রধানেরা, নবাব, নিজাম,
সবার প্রেমের মূলে রাজদণ্ড বাঞ্ছিত ইনাম;
সুলতানার তুষ্টি আশে তারা
দুঃসাধ্য সাধনে হয় সারা!
দুঃসাহসী কাজে কারো নাহি ভয় লেশ;
যতই দুরূহ হোক আমার আদেশ
পালন করিতে কারো বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাহি জাগে!
সুলতানার কাজে যদি লাগে—
অমূল্য হলেও প্রাণ
অবহেলে দিতে পারে দান!

আমি আজ মহামান্যা দিল্লীর সুলতানা,
বাদশাহী এ অন্দরের একমাত্র স্বাধীন জেনানা!
আশে পাশে ঘোরে ফেরে শতাধিক বাঁদি,
আমার ইচ্ছায় আজ সোনা হয়ে ওঠে দীসা,
সোনা হয়ে ওঠে তামা চাঁদি।
সুলতানার কাজ শুধু অলস বিলাসে ডুবে থাকা।
হেলায় মরুচলচ্ছী পাখা
শতদাসী সুলতানার শ্রান্তি নিরসনে;
ভারতের শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে—
আমি আজ দিল্লীর সুলতানা,
দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য কিছু আমারও যে হতে পারে
ছিলনা তা জানা!

দুর্দ্ধর্ষ হাব্‌শী খোজা, মূরমল্ল, আফ্রিনি—মিশরী—
দুয়ারে জাগিয়া যার দারানিশি সশস্ত্র প্রহরী,
তারও যে হারাতে পারে কিছু, হতে পারে তারও সর্ব্বনাশ,
স্বপ্নে কিম্বা কল্পনায়ও কোনোদিন করিনি বিশ্বাস!

যাহারে চেয়েছি আমি—হাসিমুখে দিয়েছে সে ধরা !
আমারে উপেক্ষা করা
ছিল মোর চিন্তার অতীত ;
ক্রোধে-ক্ষোভে-অপমানে-লাজে-হারায়েছি
সেদিন সম্বিত
যেদিন কাফের যুবা মোর প্রেম করি প্রত্যাখান
চলে গেল অনায়াসে চূর্ণ করি জীবনের আকাঙ্ক্ষিত ধ্যান,
নির্ভীক সুদৃঢ় কণ্ঠ, স্পষ্ট তার ভাষা—
আমারে বলিয়া গেল—সুলতানা কি জানে ভালবাসা ?

তবু তারে যেতে দিতে করিনি নিষেধ ;
নির্ব্বিচারে নিত্য যেথা চলিয়াছে হত্যা নরমেধ—
চলে গেছে সেথা হতে নিরাপদে লইয়া জীবন
হস্তীপদতলে দলি, ব্যাঘ্র মুখে করিনি অর্পণ,
পুরস্কার—তিরস্কার—ভাগ্য নিয়ে যেথা জুয়াখেলা—
বিদায় কে নেয় কবে অকস্মাৎ না-ফুরাতে বেলা,
সেই বধ্যভূমি হ'তে সে গিয়েছে অনাহত চলি !
মনে মনে আজ তাই বার বার বলি—
ওরে ক্রীতদাস পুত্রী ! কোথা পাবি সুলতানার মন ?
কালকূট ভুজঙ্গ-দংশন
যোগ্য শাস্তি প্রাপ্য ছিল যার,
কেমনে করিলি ক্ষমা অপরাধ তার ?
সুলতানার একি পরাজয় !
প্রেম কি গো মানুষেরে নিঃস্ব করি সব কেড়ে লয় ?
জ্বলে যায় মর্ম্মদাহে বুক, শিরে যেন বজ্র দেয় হানা।
তবু মোর কাণে আজও বাজে তার ব্যঙ্গ জয়ধ্বনি
আকাশ বাতাস রণরণি—
'খিলাবার দিল্লীর সুলতানা !'

মনের প্রকৃতি ও ধর্ম্মভাব

রায়বাহাদুর শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

ইংরাজ কবি রাডিয়ার্ড কিপলিং-এর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি একদা জগৎময় বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল—তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে মত ব্যবধানটির উপর সেতুবন্ধন অসম্ভব। কাব্যের রসাল উচ্ছ্বাসকে বাদ দিয়া জনৈক ইউরোপীয় বৃত্তবিদ্ এই মতবাদকে ব্যক্ত করিয়াছেন এমন ভাষায় যে, চাকাচাকি নাই বলিয়া উহা বুঝিতেও কোন গোল নাই। এসিয়াবাসীর বর্ণনা দিয়াছেন তিনি এইরূপ : পীতবর্ণ, কৃষ্ণ কেশ, পিঙ্গল চক্ষু, চর্ম্মিত ভ্রূ ও অর্দ্ধমুদ্রিত, আঁকিয়বাঁকা ঠিয়, লম্বা ঢালাও পোষাক পরিহিত ও প্রচলিত মতের অনুসরণকারী। পক্ষান্তরে ইউরোপিয়ানকে বলা হয়েছে অধিকারী ও সৌম্য প্রকৃতি বলা হইয়াছে। স্বজাতির জনগণের অনেকের চিত্র অঙ্কনে স্বাভাবিক দক্ষতা শিল্প-প্রতিভার সঙ্গে দেশ-জেলের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু উহা যখন জাতি-বিদ্বেষের তুলি টেনে বাঁকিয়া অন্যজাতির গর্হিত নিন্দার প্রসূন হয়, প্রচুর অনর্থের সূত্রপাত হয় তখনই—যার মানবতার উদার বুকে বিশ্ব-মানবের মিলনের পথও তখন বন্ধ হইয়া যায়।

বস্তুতঃ, বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধার দুর্লভতা, সভ্যতার গঠন ও উৎকর্ষের উপকরণগুলি কবি বা জাতিকে আজন্ম করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে নাই ইতিহাস ইহারই সাক্ষ্য দেয়। যে-সব প্রাচ্য জাতি আজ একটি হীন নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, একদিনে তাঁহারা ছিলেন জগৎ-সভ্যতার পুরোধা—জ্ঞানের বৈচিত্র্য, অবয়ব ও আবেষ্টনের যোগাযোগ তাহাদের চিন্তা ও কর্ম্মগুলিকে সার্থকতার পথে ঠেলিয়া দিয়া মানুষের ব্যবহারিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে ইহা মনে হয় সত্য যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনোবৃত্তির মধ্যে কোন প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। অপর্য্যাপ্ত কৌতূহল উদ্যম উৎসাহ ইউরোপীয়দের মেরুদণ্ড বা মৌলীসূত্র অভিমুখে অভিযান করিতে শিখা দিয়াছে, বিজ্ঞানকে বিস্ময়ের বস্তু করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচ্য জাতির মন ধর্ম্মপ্রাণ—অথচ মানব জীবনের কূল-কূণ্ডলিনীর পাকে স্বভাবত নির্ব্বাক হইয়া পড়ে। এই দুইটি বিভিন্ন মনোবৃত্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ অধ্যাপক জেম্‌স্ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত একটি পত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। জনৈক তথ্যান্বেষী ইংরাজ কোন উচ্চপদস্থ তুর্কী রাজকর্ম্মচারীর নিকট তদ্দেশ্য কৃষির ও নরনারীর সংখ্যা, আয়ব্যয়ের হিসাব, স্থানীয় ইতিহাস প্রভৃতি কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে চাহিয়াছিলেন। উত্তরে তুর্কী রাজপুরুষ লিখিলেন—এ-সব সংখ্যা নির্ণয় পণ্ডশ্রম মাত্র। হে আমার আত্মা, যে বস্তুর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নাই, তুমি তাহা কখনও অন্বেষণ করিও না। তুমি আসিয়াছ—যাইবে। শান্তিতে আমার ফিরিয়া যাও। শোন বন্ধু, ঈশ্বরের বিধানই একমাত্র জ্ঞান। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টি-তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার সমকক্ষ হইবার ব্যর্থ চেষ্টা

কেন? বস্তুলোকের কোনটি কাহাকে প্রথমে শিক্ষিত করিতেছে, কোন যুক্তিতর্কের কত বছর পরে আবির্ভাব ও তিরোধান, এই তথ্যগুলি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, তাঁহারই যদৃষ্ট ইহা উহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবে।

তুর্কী অস্ত্রলোকের উপরোক্ত চিঠিতে যে নিষ্পৃহ নির্ভরশীলতা, বিষাদীর আত্মসমর্পণ, নিষ্ক্রিয় নিরুৎসাহ প্রকাশ পায়, তাহাই প্রাচ্য জাতি-প্রকৃতির যথার্থ পরিচয়, ইহা মনে করা অত্যন্ত ভ্রম। যদি উহাই হইত, তাহা হইলে জাপান ও নব্য তুর্কীর অভ্যুদয় কখনও ঘটিতে পারিত কি? সোভিয়েট রাশিয়ার অধিকাংশ জাতি পূর্ব্বদেশীয়, ষ্টালিন নিজেও একজন জর্জ্জিয়ান—এ প্রাচ্যজাতিগুলিও আজ বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথে চলিয়াছে। পক্ষান্তরে, ইউরোপের সামন্তযুগের পাশ্চাত্য জাতিসমূহ সন্ধ্যানের পথে, বিজ্ঞান-বাহিনীর সহিত সম-পাদক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছে, এমন নয়—বরঞ্চ ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা বৈজ্ঞানিকের নির্য্যাতন, স্বাধীন চিন্তার কণ্ঠরোধের বর্ণনায় মসীকৃষ্ণ হইয়া আছে। তবু কথা, প্রতীচ্য জগতে এখন বিজ্ঞানের যুগ চলিতেছে, কিন্তু প্রাচ্যে অন্ধকার মধ্যযুগের অবসান আজও ঘটে নাই—অরুণোদয় সবে দেখা দিয়াছে মাত্র। এই অরুণের প্রতীচি ভাতীয়তার পাত্রে বিজ্ঞানের উগ্র মদিরা পান করিয়া মত্ত হইয়া পড়িয়াছে—বিজ্ঞানকে আপন প্রকৃতিগত মনে করিয়া বিহ্বল কণ্ঠে যুদ্ধমর্ম্মে প্রচার করিতেছে, প্রাচ্য জাতির মন-প্রকৃতি এমনই অন্ধকার উপাদানে গঠিত যে বিজ্ঞানের রবি-রশ্মি সেখানে সঙ্ঘর্ষণে চলিতেও পথ হারাইয়া বসে।

আজ এ-কথা বোধ করি গোপন নাই, বিজ্ঞান আমাদের দেশের চিন্তায় কর্ম্মে ধ্যানধারণায় বিপর্য্যয় বাধাইয়া দিয়াছে। ইউরোপেও তেমনি একদিন নব বিজ্ঞানের আবির্ভাব মন-প্রকৃতির মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহাই তখন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত সুসংহত সমাজের সংস্কারগুলিকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিয়া পিষ্ট হটাইয়া দিতেছিল। ইউরোপে ধর্ম্মবিশ্বাস দিন দিন কিরূপ শিথিল হইয়া আসিয়াছে, অধ্যাপক জোড় কর্ত্তৃক গৃহীত লণ্ডনের কোন গীর্জ্জায় প্রার্থনার জন্য সমবেত জনমণ্ডলীর সংখ্যা হইতে সহজে অনুমান করা যায়। ১৮৮৭ সনে ঐ গীর্জ্জায় ২৯০ জন প্রার্থনা করিতেন, ১৯০৩ সনে ১৮৪ জন এবং ১৯২৭ সনে ঐ সংখ্যা কমিয়া মাত্র ৬৩টিতে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বকার প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমাজের বাঁধা-ধরা লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া চালাইয়া লইয়া যাইত। বিজ্ঞানের বিজয়-অভিযান ঐ সব সংস্কারমূলক গঠনপ্রণালীর মূলোচ্ছেদ করিল বটে, কিন্তু সেখানে কোন লুপ্ত সংস্কারের পুনরুদ্ধার বা নূতন সংস্কারের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা এখনো করিতে পারে নাই। তাই আজ সমাজনীতির ও অর্থনীতির গোত্তাঘরে ঘড়বাপটায় বিপর্য্যস্ত জীবন-তরী আসিয়া ভিড়িয়াছে। ব্যক্তি জীবনের চরম বিকাশ ও পরম সার্থকতা ঘটিবে—বাহ্য সংস্থান, সমাজ ব্যবস্থা ও বস্তুসুখ আরাম-কল্পনার যাদুমন্ত্রে, এই আশায় মানুষ এত মুগ্ধ যে সমাজ বা অর্থনীতির বাহিরে আপন জ্ঞান-লোকে যে চিরসুন্দর মহাশান্তি বিরাজমান তাহার উপলব্ধিটুকুও যেন আর নাই—যেন ঐ সত্তার অনুভূতিকে আকিমের বিষানি বলিয়া উপেক্ষা করাই বাস্তবতার পরিচয়।

কল্পনা বা বাস্তব—সত্যাসত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সবই মনের সংযোগে চেতনার ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়া থাকে। উপনিষদে আছে, আত্মা ইব রথিনাস্তে সর্ব্বং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতং—তেমনই এক হিসাবে ইহাও বলা চলে, জগতের যাবতীয় বস্তুসম্ভার প্রতিষ্ঠা মানুষের মন-মন্ত্রিকে, মনই বস্তুগুলিকে নাম-রূপের সম্বন্ধে বাঁধিয়া সার্থক করিয়া তুলে। বৌদ্ধদর্শনের গ্রন্থ 'ধম্মপদে' বলা হইয়াছে, বুদ্ধবচন সকল বস্তুকে একমাত্র মনই আশ্রিত করে—মনই প্রধান, সকল বস্তুর উপাদান। ইংরাজ দার্শনিক বার্কলে Subjective Idealism নামক যে তত্ত্বের প্রবর্ত্তন করেন তাহাও বৌদ্ধদর্শনের ঐ উপলব্ধির পুনরাবৃত্তি—অর্থাৎ, বস্তুসম্ভার উদ্ভব মন হইতে, মনই উহার উপকরণ এবং মনের বাহিরে কোন সত্তা নাই, বোলবুটি ইহাই তাহার বক্তব্য। চরমপন্থী দার্শনিকদের এই উগ্র মতবাদ অস্বীকার করিলেও ইহা বোধ করি সহজে প্রতীয়মান হইবে যে, বস্তুর রূপ ও আকার মন-নিরপেক্ষ নহে এবং উহার অর্থ ও মূল্য মনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বস্তুগুলির পরস্পর সম্বন্ধ অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে মনের ক্ষেত্রে, আবার উহাদের আপেক্ষিক মূল্যও মনই নির্দ্ধারণ করে। বিজ্ঞান প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয় বটে যে বৈজ্ঞানিকের মন নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র—প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া তাহাকে জ্ঞানের সাধনা করিতে হয়। আসলে, উন্মাদ বা সংস্কার—বিচারের বিঘ্ন উৎপাদনকারী জ্ঞানপ্রবণ চিত্তবৃত্তিগুলিকে তিনি নিরুদ্ধ করেন মাত্র, কিন্তু মনকে কখনো বাদ দিতে পারেন না, কেন না সত্য প্রতিফলিত হয় মনের স্ফটিক-স্বচ্ছে এবং বুদ্ধির কষ্টিপাথরে মনই তথ্যগুলির সত্য-মিথ্যা যাচাই করে। এইরূপে বস্তুর সহিত মনের সংযোগে যে একীভূত পরিপক্ক পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহাকেই আমরা বাস্তব বলিয়া জানি—আর এই অর্থে সমাজ-নীতি ও অর্থনীতির কার্য্যকরী ব্যবস্থাগুলিও বাস্তব সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে ব্যবহারিক জীবনের উর্দ্ধে অনুভূতির যে রম্য জগত মানুষের অন্তরে ছায়াপথের মত ব্যাপ্ত হইয়া আছে, উহা আকাশ-কুসুমের সমষ্টিমাত্র নয়, উহার প্রত্যেকটি তারকা সূর্য্যের মতই দীপ্যমান সত্য। মনের যে নিবিড় রহস্যলোক হইতে শিল্প ও ধর্ম্মচেতনার উদ্ভব, রসবোধের সঞ্চার, প্রেম-করুণা-মৈত্রীর জ্যোতিধারা প্রবাহিত, মুক্ত আনন্দের সন্ধান মিলিয়াছে সেইখানে—তাই মানুষ বাঁচিতে চলিবার ফাঁকে আকাশের পানে চায়, বস্তুলোকের করিত সুধা অবাস্তব বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে না।

সাংখ্যদর্শন বলেন, মন প্রকৃতি-সম্ভূত, আর প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব রজ তম এই তিনটি গুণধর্ম্ম লইয়া প্রকৃতি গঠিত। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল লঘু, সুখ ও জ্ঞানের একাধার। রজ রাগাত্মক, তৃষ্ণা-সম্ভূত দুঃখাত্মক। তম অন্ধকার—অজ্ঞানের মোহ প্রমাদ ও আলস্যের কারণ। এই তিনগুণ প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করে—জ্যোতি চঞ্চলতা

ও অবস্থার রূপ। ইহাও বলা চলে যে রজগুণের চঞ্চলতা (activity) হইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে, সত্ত্বগুণের প্রভাবে স্থিতি ও তমগুণ জড়ের কারণ। এই গুণত্রয় মন-প্রকৃতির মধ্যে কিরূপ আকারে বিদ্যমান থাকার চতুর্দশ প্রকারে তাহার বর্ণনা আছে।

রজস্তম পরাভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।

রজ ও তমগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হয়, সত্ত্ব ও তমগুণকে অভিভূত করিয়া রজগুণ এবং সত্ত্ব ও রজগুণকে পরাভূত করিয়া তমগুণ আবির্ভূত হয়।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ
প্রমাদো মোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞান এব চ।

এই তিন গুণ ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় থাকিলেও উহাদের ভার-সাম্যের অভাব প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়; তাই যে-গুণের প্রভাব অধিকতর, গুণ বিভাগে তাহারই প্রাধান্য দেওয়া হয়। মন-প্রকৃতিকে বিশ্লেষ করিয়া শ্রেণী নির্ণয় করিবার চেষ্টা, কি প্রাচী কি প্রতীচী উভয় দেশেই আদি যুগ হইতে চলিয়াছে—কিন্তু ঐরূপ বিভাগ প্রত্ন-বস্তুর মধ্যে দৈহিক উপাদানের কোন কল্পিত গুণকে আশ্রয় করিয়া করা হইত, যেমন mercurial, sanguine, phlegmatic, colerio, পিত্তপ্রধান শ্লেষ্মপ্রধান প্রভৃতি। এই প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ দেহ-যন্ত্র বা উপাদানের ভিত্তির উপর মানব প্রকৃতিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করিয়াছেন—যথা, somato-tonio, viscero-tonio এবং cerebro-tonio। প্রথম শ্রেণীর somato-tonio ব্যক্তিগণ দেহকেন্দ্রিক, পেশীবহুল অঙ্গের চালনে তৃপ্ত, মানসিক উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য নাই, ব্যায়াম প্রভৃতি দেহ-চর্চ্চায় মত্ত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণী viscero-tonio ব্যক্তিগণের প্রকৃতি আহারবিহার-বিলাসী ও ভোগী মানুষ—উচ্চ চিন্তার ধারাই নাই। আর যাহারা ধীর স্থির পরিশ্রমী ও চিন্তাশীল, জ্ঞানের সাধক, তাহাদের cerebro-tonio শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

মন-প্রকৃতির উপরোক্ত শ্রেণীগুলির বিচার আলোচনায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে এ-বিষয়ে সাধ্যের রূপ-বিচার ধর্ম্ম-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রথম প্রথম অধিকতর সমুজ্জ্বল—সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতে সুরু করিয়া মানুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য পর্য্যন্ত সব-কিছুর সহিত গুণত্রয়ের একটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দার্শনিক উপলব্ধি শুধু যুক্তিতর্কের পথ ধরিয়া চলে—আপ্তবাক্যের মত উহা গ্রহণ করা চলে বটে, বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে বিশ্লেষণের প্রমাণ করা যায় না। তাই, ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া দিয়া আধুনিক মনস্তত্ত্ব ব্যক্তির পরিবেশ, সংস্কার ও অবস্থা, শিক্ষা দীক্ষা সাধনা ও আদিম প্রবৃত্তির (instinct) আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঘোড়-দৌড়ের বাজি ধরিতে আমরা ঘোড়ার বংশধর বিচার করিয়া থাকি—ব্যক্তির দেহ-মনের গুণ বিচার করিতে বংশধরকে লক্ষ্য করে যাচাই করিতে চলে, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। মানুষের চিন্তায় কর্ম্মে আচার-ব্যবহারে শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার, এমন কি আদিম প্রবৃত্তিগুলিরও আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায়। চিত্তবৃত্তির উপর পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাত আধুনিক মনস্তত্ত্বের অন্যতম আলোচ্যের বিষয়। এই সব আলোচনায় মনস্তত্ত্ব অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের, এমন কি জীবতত্ত্বের (biology) সমান উৎকর্ষতা এখনও লাভ করে নাই। ইহার কারণ—বিজ্ঞান-প্রগতির ধারা এখনো জ্যোতিষ্কী গ্রহ নক্ষত্র, তারপর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তারপর উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন, একে একে সকল ক্ষেত্রকেই প্রোজ্জ্বল করিয়া উহার সুরপ্রসারী জ্যোতি-প্রপাত মানবচিত্তের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ধারাবাহিকতার দরুণ বিজ্ঞান যে বিরাট সৌধটি গড়িয়া উঠিয়াছে, মনস্তত্ত্ব তাহারই সর্ব্বোচ্চ স্তর এবং উহার প্রভাবে মন প্রকৃতির যেটুকু পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা সবই বিস্ময়কর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—প্রেম করুণা সৌন্দর্য্য ভক্তি শ্রদ্ধা অনুকম্পা, মানব চরিত্রের মহান ভাবগুলি এমন কি ধর্ম্মের অনুভূতি পর্য্যন্ত কতিপয় আদিম বৃত্তির মিশ্রণে সমুদ্ভূত, তাহার পরিচয় বৈজ্ঞানিক সবিত পরীক্ষা করিলে সহজে পাওয়া যায়। জীবন-সংঘর্ষে প্রয়োজনে যে-সব পশু মূলক বৃত্তি—যেমন বিষয় ভীতি রক্ষণ শক্তি-সঞ্চারণের ইচ্ছা—মানুষের মনে নিহিত রহিয়াছে উহাদের সংমিশ্রণে উন্নত (sublimated) ভাবের আবির্ভাব হয় কিরূপে, মনোবিজ্ঞানের ইহাই একটি প্রধান শিক্ষা। প্রণতি ও প্রশংসার মূলে আছে কৌতূহলী চিত্তের বিস্ময় ও নম্রতা—বৃহতের কাছে নতি স্বীকারের প্রবৃত্তি বিস্ময়ের সহিত মিলিয়া মানুষের মনে প্রশংসা জাগাইয়া তোলে। তেমনই ভক্তিরসের উৎপত্তি বিস্ময় ভীতি কৃতজ্ঞতা ও নম্রতা হইতে—এই বৃত্তি চতুষ্টয়ের মিশ্রণ ধর্ম্মপ্রবণ মনে যে ভক্তির সঞ্চার করে তাহাই ভাবোচ্ছ্বাসকে জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ। স্রষ্টা শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা ভক্তিরসের একটি প্রধান উপাদান, কিন্তু উহা গঠিত বিবিধ প্রবৃত্তি লইয়া—নম্রতা ও কোমল উচ্ছ্বাস, প্রেম মায়ার সঞ্চারও। ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া ভক্তের মনে অনুরাগের একটু কাল্পনিক রঙ ঈষৎ ফিকে হইয়া যায়।

অনেকের ধারণা হইতে পারে যে বিরাট রহস্যময় (mysterious tremendum) সম্বন্ধে যেরূপ ভক্তিমূলক ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে, মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ তাহারই বিরাকরণ করিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে উহার গৌরবও ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞানের ভিত্তির উপর যে গৌরব প্রতিষ্ঠিত তাহার মূল্য অল্প, সুতরাং উহা কাটিতেও অধিকক্ষণ লাগিবার কথা নয়। কিন্তু উহা ছাড়াও বলা চলে,—ভক্তি বিশ্বাসের প্রকৃত রূপ ভক্তের অন্তরেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা উহার মৌলিক বৃত্তিগুলির বিচার করিতে পারি বটে, কিন্তু ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি কখনো সম্ভব হয় না। লোহার টুকরা লইয়া ইঞ্জিন প্রস্তুত হইলেও উহা ঐ লৌহখণ্ডগুলির সমষ্টি মাত্র নহে—খণ্ডগুলি কোন বিজ্ঞানীর সাহায্যে সম্মুখে বসিলে তিনি ইঞ্জিন প্রস্তুত করিতে পারিবেন না। কার্য্যকে কারণের রূপান্তর মনে করা একটি ভুল কথা—কারণ

মূলগত ভাবগুলিকে বিশ্লেষণ করিলেই তাহার উপলব্ধি ও অধিকার জন্মে না। বহিঃপ্রকৃতির মত মনেরও বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ আছে। বিবর্ত্তনের পথে নানা উপাদানের সংমিশ্রণে প্রকৃতি যেমন জগত গড়িয়া তুলিয়াছে—যাহার স্বরূপ মূল উপাদান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—তেমনই মানসিক বৃত্তিগুলির মিশ্রণে যে নূতন ভাবের সৃষ্টি হয়, উপাদানের মধ্যে তাহার প্রকৃত পরিচয় মিলে না। এই ভাবেই ভক্তের মনে ভক্তির রসরূপ যেমন সহজভাবে আসিয়া দেখা দেয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহা কখনো ধরা পড়িবার নয়।

পৃথিবীর পশ্চিমার্দ্ধ গোলকে আমেরিকার আবিষ্কার একদিন ভৌগলিক জ্ঞানের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল, আধুনিক মনোবিজ্ঞানও তেমনই অন্তস্তলের গহনে যে সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের সন্ধান দিয়াছে, তাহা সজ্ঞচেতনা (sub-conscious) ও অচেতনার (unconscious) রাজ্য—সেখানকার সূক্ষ্ম চিন্তার প্রভাব মানুষের মনে নিয়ত বিরাজ করে, এবং সেই আটলাণ্টিসের' কল্পনার অতলান্ত মহাসাগরের মর্ত্তে যেমন শুধুই রহিয়া গেছে, সুপ্ত হয় নাই, আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মশক্তিকে সজ্ঞচেতনাও ঠিক সেই মত অলক্ষ্যে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। এই মন চেতনার একটি সহজ উদাহরণ আমরা হিপ্‌নটিজমের মধ্যে দেখিতে পাই—বিশেষত যাদুনিদ্রার অবসানে পাত্র যখন জাগ্রত অবস্থায়ও অনুদিষ্ট বিষয়বস্তু কাজ করিয়া যায় (post-hypnotic state)। হিপ্‌নটিজমের নিম্ন সংজ্ঞাস্তরের স্বাভাবিক কর্ম্মচেতনাকে আবিষ্ট করিয়া মনের এমন একটি পরাস্বাপবীয় অবস্থার সৃষ্টি করে যে পাত্র তখন যে কোন অনুদেশ (suggestion) বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়া বসে, তাই তাহার নিজের লক্ষ্যের খাতও তিনির মত মিষ্ট হইয়া উঠে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হুগাবাবুর তাহাকে যে অনুদেশ দেওয়া গেল, নিদ্রাভঙ্গে সে-কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেও, সজ্ঞানে ঐ মত কার্য্য সে আশ্চর্য্যরূপ করিয়া যায়। যেমন—পাত্রকে মৃদুস্বরে বলা হইল, খুব জাড়িবার পনের মিনিট বা আধ ঘণ্টা পর বৈঠকখানা ঘরে দক্ষিণের চেয়ারটি সরাইয়া সে যেন পূর্ব্বদিকে রাখিয়া দেয়, কিন্তু এই অনুজ্ঞার কথা তাহার যেন মনেও না জাগে। যাদুনিদ্রা ভাঙিবার পর সে উঠিয়া বসিল, উপস্থিত ব্যক্তিদের সংলাপে যুক্ত থেকে যোগদান করিল, নির্দ্ধারিত সময়ের ঈষৎ পূর্ব্বে কেমন যেন একটু অধৈর্য্যভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল—তারপর হঠাৎ উঠিয়া বলিল, এই ঘরে আলোবাতাস যাওয়ার ব্যবস্থা ভাল নয়; দক্ষিণের চেয়ারটি পূর্ব্বে রাখিলে বেশ হাওয়া, কি বলেন? উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে দক্ষিণ হইতে চেয়ারটি তুলিয়া ঘরের পূর্ব্বভাগে বসাইয়া দিল। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—নিদ্রাকালে অনুদেশের কথা তাহার মনে নাই, কিন্তু সেইমত কাজটি করিতে গিয়া সে যেন একটি মন-গড়া যুক্তির অবতারণা করিয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, অতীত্ কার্য্য সম্পন্ন করিতে মানুষের যুক্তির অভাব হয় না—অন্য কথায়, যুক্তির সিদ্ধান্ত ধরিয়া আমরা সব সময় কাজ করিয়া থাকি, এমন নয়; বরঞ্চ কাজটিকে সমর্থনযোগ্য করিবার জন্য যুক্তি আসিয়া দেখা দেয়।

(আগামী বারে সমাপ্য)

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

ডাক্তার বিনোদ প্রত্যূষে উঠে দেখেন—মাণিক তাঁর আগে উঠে তাঁর যা যা আবশ্যক হতে পারে, গুছিয়ে রেখেছে।

তিনি কথা না কয়ে—মুখ হাত ধুয়ে, কোট প্যাণ্ট পরতে পরতে হাসিমুখে কেবল বললেন—"টেথিসকোপের আর দরকার হবে কি?"

মাণিক। আর কিছুর জন্য না হলেও ওটা ডাক্তারদের "প্রতাঙ্গ" বলেও দরকার আছে।

"তবে দাও।"

মাণিক ছাটটাও এগিয়ে দিলে।—

"ওটা আর মাথায় দিতে ইচ্ছা করছে না মাণিক।"

"কেবল অনুমানের ওপর অতটা"···

ডাক্তার আর দাঁড়ালেন না, একটু হাসি টেনেই—"দুর্গা" বললেন। মাণিক বাইরে দাঁড়িয়ে কেবল একটা মর্ম্মচ্যুত দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

* * * *

সাহেবের বাংলোর বাইরেই কামিজপরা কিশোরীর সঙ্গে দেখা।—"এ কি! এতো সকালে? ডেকেছিলেন নাকি? তা ভালই করেছেন। সাহেব বেরুবার জন্যে প্রস্তুত, কেবল চায়ের অপেক্ষা।"

"তবে আর বিলম্ব নয় ভাই, আমার সেলামটা তাঁকে জানিয়ে দাও।" স্বরটা তাঁর দয়া ভিক্ষার মত ঠাকায়—কিশোরী আর দাঁড়ালো না, একটু চিন্তিতও হোলো।

মিনিট দু'য়ের মধ্যে O/C স্বয়ং বেরিয়ে এলেন—Good Morning Doctor, very kind of you—আমি ভাবছিলুম যাবার আগে দেখাটা হোল না, ডাক্তার কি ভাববেন।

ডাক্তার হাতজোড় করে—Excuse me, my kind Boss, I believe, am under deep delusion and dreadful conspiracy, May be my mind is playing false to me—I am awfully disturbed—I sure you know it সামান্য বিষয় নিয়ে আমার বিপক্ষে অসামান্য ও অনিষ্টকর বা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চলেছে, আপনি নিশ্চয়ই কিছু জানেন।

সাহেব বুঝলেন—কথা বাড়িয়ে ফল নেই, সরাসরি অবিচলিত ভাবেই বললেন—Yes I know Doctor—আমি সব জানি, তাতে হয়েছে কি?

"বিশ্বাস হারালে সে মানুষের আর রইল কি Sir"—

"কার কাছে?"

"জগতের কাছে।"

"মিথ্যা সত্য হয় নাকি?"

"নিতাই হচ্ছে হুজুর।"

যেখানে স্বার্থ থাকে—কিন্তু দু'দিন বাদে স্বার্থ ধরে যায়।

সেই দু'দিনেই যে বদনামটা রটে, দশের কাছে পাকা হয়ে যায়, হুজুর। ওটা যে অন্যের কাছে ভারী মিঠে জিনিষ মালিক! আবার তাদের নিয়েই যে গরীবকে দুঃখের দিন কাটাতে হবে sir—

কিশোরী চায়ের সরঞ্জাম আনলে। তার সঙ্গে মাখন-মিছরি মাখানো রুটির স্লাইস, জ্যাম, আর কিছু ফল। সাহেব নিজে serve করতে করতে বললেন—এখন ভালো করে খেয়ে নেওয়া যাক্, আমার লম্বা পাড়ি, সময়ও কম। খেতে খেতে কথা হোক্—তুমি কি বলতে চাও বলো—

ডাক্তার। আমি সামান্য লোক, আপনার মত আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষী জীবনে কোনদিন পাইনি, পাবার আশাও করিনি, কথাটা বড় অকৃতজ্ঞের মত, এ ছোট মুখে আসছে না, আসা উচিতও নয়। কিন্তু আমি নিরুপায়।

O/C—তবে আমার দুখেই আসুক—চাকরিটা করবে না, এই বলতে চাও। তাহলে আমি এই তোমার ভুল পেলুম, পূর্ব্বে পাইনি। তোমার অপরাধ নেই—তোমাদের দেশের ওটা চিরন্তন ধর্ম্ম—অর্থাৎ ত্যাগেই মুক্তি। অমন easy going সমাধানও আর নেই। কিন্তু তোমাদের দেশ যে অধুনা, আমাদের অনুকরণে মেতেছে—তোমরা যরাজ যরাজ করছো, তার তো মিথ্যাই সম্বল, প্রাণ অন্ন। পরের লুটে পুটে খাওয়া, সেটা সত্য ধরে হয় না—"আমি"-কে বড় ভাবতে হয়। যাক্, ওকথার আজ সময় নেই, তোমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছি, পরে বলবো। এখন শোন—তুমি বেটাকে ভয় করছো—এড়াতে চাচ্ছো—চাকরী ছাড়লে তার যে বিপরীত ফল হবে। সেটা তাদের প্রমাণের কাজই করবে। তাদের মুখ বন্ধ করবার জন্যেই আমি বড় ব্যস্ত, ও কাল কোর্টে না দিলে মিটবে না, তাই ডাক্তারকে বন্ধ করে হাতে রাখলুম। একমাস পরে ফিরে এসে—ব্যবস্থা কোরব। এখন তাদের চুপচাপ থাকতে বলেছি। একটী কথাও যেন বাইরে না যায়। এসে তাদেরি সাজার ব্যবস্থা কোরব। তোমরা সম্পূর্ণ safe আছো। নিশ্চিন্ত হয়ে, তোমাদের যা কাজ আছে, সেরে এসে আমার সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত থেকো। কেমন? আমার উপর বিশ্বাস আছে তো?

"আর আমাকে লজ্জা দেবেন না sir—আমি যত ভুল করছিলুম—আমাদের বাঁচালেন। আর কথা বাড়াব না, কিন্তু ম্যাডামকে আনা চাই।"

সাহেব একটু হাসি টেনে—ইচ্ছা তো আছে। আচ্ছা আর নয়—সময় নেই—Good bye and good wishes—

ডাক্তার—"God be with you."

• • •

উঃ কি করে এত ভুল করছিলুম—কালই না O/C আমাকে তাঁর গোপন হতে গোপনীয় কথা বিশ্বাস করে খুলে বলেছেন—ছি-ছি সে কথা একবার মনেও আসেনি। তিনিও সে কথা উল্লেখ পর্য্যন্ত করলেন না, পাছে লজ্জা পাই। উঃ কি করছিলুম! অন্য কেউ হলে তখনি Regimental cellএ পুরতেন। কি দেবপ্রকৃতির মানুষ! মা-ই রক্ষা করে যাচ্ছেন। অধম সন্তানে ক্ষমা কোরো, চরণে রেখো জননী। সুমতি সুবুদ্ধি যেন থাকে মা।—ওঁর সেবায় যদি প্রাণ দিতে পারি, সেই আমাকে সান্ত্বনা দেবে। বাসার সন্নিকটে এসে পড়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছলেন।—নিশ্চয়ই সয়তানেরা কোনো অসম্ভব মিথ্যার সাহায্য খুঁজে থাকবে—নচেৎ সাজার কথা ওঁর মুখে আসতো না—মাণিককে দেখে—তুমি বাসা ছেড়ে এতদূরে এসে পড়েছ, আমার দেরি হয়েছে কি? চা খেয়েছ?

মাণিকের মুখে ম্লান হাসি দেখা দিলে—"সব বৃত্তিতে এসেছেন তো?—এখন আর তাড়া কি—এক সঙ্গেই খাবো।"

"আমি যে খেয়ে আসবো বলেছিলুম।"

"তা বলেছিলেন—কিন্তু....."

"কিন্তু কি—আমি বুঝতে পারলুম না।"

"অনেক সময় মানুষ না ভেবে ঝোঁকের মাথায় মুখে যা আসে বলে ফেলে, অন্তরে তার প্রাণ তা বলে না। তার মনটা বা মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হলে, পরে তার কাছে সেটা ধরা দেয়। সকালে আপনি বেরিয়ে যাবার পর কেমন একটা অস্বস্তি আরম্ভ হোল। করলুম কি? আপনাকে ফেরাতে ইচ্ছা হোল। পিছু ডাকতেও পারলুম না। অগত্যা ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়ে সান্ত্বনা খুঁজছি, কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না।"

"কেনো বল দিকি?"

"আপনার কাছে বড় অপরাধ করেছি—স্বেচ্ছায় না হলেও তখনকার অবস্থা অজ্ঞানে করিয়েছে। আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলেছি, যা কখনও বলিনি। O/Cর দেওয়া দান, যা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ আশাতীত ছিল, গ্রহে তা অগ্রাহ্য করিয়েছে. লোভ যে অন্তরে গোপনে ছিল, সেটা বুঝতে দেয়নি....."

"তার পর এখন?"

"সব সরিয়ে ফেলে, এখন আর বুঝে কল কি? এখন কেবল আপনার কাছে সত্যটা প্রকাশ করে, অপরাধটা স্বীকার করা, শাস্তি পাওয়া। তারপর আপনার যা আছেন। কোন্ কুগ্রহ যে আমাকে ঘুরছিল"—বলে মাণিক চুপ করলে।—পরে "O/C বোধহয়, বোধহয়ই বা কেনো—নিশ্চয়ই—"

"O/C নয় O/C নয়—দেবতা। তিনি আমাদের একমাসের ছুটি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এখন আমাদের যার যা কাজ আছে সেরে নূতন orderএর জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। কালই বেরিয়ে পড়ি চলো।"

মাণিক সবিস্ময়ে—"কি বলছেন sir?"

ডাক্তার। যা সত্য, তাই বলছি। হাঁড়ি বেচতে হবে না, চাকরীই করতে হবে। ভেবনা, পরে শুনো—মাণিক একেবারে রাস্তাতেই শুয়ে পড়ে ডাক্তারের পায়ে মাথা দিলে।

"ওঠো ওঠো, কাজ রয়েছে।"

মাণিক উঠলো, তার দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে—"ধন্য ভগবান, ধন্য তোমার কৃপা। কি যে করবো, ভেবে পাচ্ছি না হুজুর।"

"কি আবার করবে? চা খেতে হবে, আর কিছু করতে হবে না। ও দৌলতখানাকে তাড়িয়ো কর না—চলো।"

উজ্জ্বেরি হাসি দেখা দিলে।

রঘুনাথদাস গোস্বামী

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম বর্ত্তমানে একটী সামান্য স্থান হইলেও প্রাচীনকালে ইহা একটী তীর্থস্থান এবং ভারতের অন্যতম প্রধান নগর ও প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিচিত ছিল। পুণ্যতোয়া বিশালকায়া সরস্বতী নদী এই বন্দরের নিম্ন দিয়া ছুল্ ছুল্ রবে প্রবাহিত হইত এবং বিদেশীয় বাণিজ্যপোতগুলি পৃথিবীর রত্নরাজি এই দেশে বহন করিয়া আনিত। পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক ডি-বারো (De Barros) লিখিয়াছেন "বাণিজ্য তরীর প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ সম্বন্ধে বন্দিত চট্টগ্রামে অধিকতর সুবিধাজনক, তথাপি সপ্তগ্রাম বন্দর খুব বৃহৎ এবং সপ্তগ্রাম একটী শ্রেষ্ঠ নগর।"

ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের রাজত্ব সচিব টোডরমল রাজস্ব নির্দ্ধারণ করে বঙ্গদেশকে ১৯ সরকারে এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। উক্ত সময়ে সপ্তগ্রাম সরকার সাতগাঁও' নামে অভিহিত হইত এবং ইহার অধ্যে ৫৩ পরগণা ছিল ; কলিকাতা, পাঁচলিয়া, বাঁরাকপুর, নবীন, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানগুলি সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ১শত ১৮ টাকা 'সরকার সাতগাঁও' হইতে সম্রাটের রাজস্ব ও যুদ্ধের সময় পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫০ হাজার পদাতিক সৈন্য শাসন কর্ত্তাকে দিতে হইত। Gladwin's 'Ayeen Akbari,' Page 208.

সপ্তগ্রামের বৈভব গৌরব সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন যে দিল্লীর সময় হইতে পর্ত্তুগীজদের আগমনকাল পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম রাজধানী সমান ছিল।

বাঙ্গলাদেশের প্রথম সাময়িকপত্র "দিগ্দর্শন" নামক মাসিক পত্রের পঞ্চম ভাগে 'বঙ্গদেশের প্রধানসময় বিষয়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত আছে

"সাতগাঁ হুগলির উত্তর পশ্চিম দুই ক্রোশ দূরে। আড়াই শত বৎসর হইল সে বাণিজ্যের এক প্রধান স্থান ছিল এবং ইউরোপ হইতে বড় বাণিজ্যের কারণ গড়ায়াত ছিল সে এই শহরে এবং সেই সময়ে নদীরও এমত অবস্থা ছিল যে অল্প বোঝাই জাহাজে চলিত।" ফিচ্‌ দর্শন আগষ্ট ১৫৮৬ ভ্রমণকারী ফেডরিক ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন "সপ্তগ্রাম বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র, বাণিজ্যার্থ বণিকগণ বহু দূর দেশ হইতে এই স্থানে সমাগত ও সমবেত হয়। প্রতিবৎসর সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে তিন পঞ্চাশ খানি বাণিজ্যতরী চাউল, কার্পাসজাত বস্ত্রাদি, লাক্ষা, প্রচুর পরিমাণ চিনি, কাফর, তৈল (Oil of Zerseline) এবং আরো বহুবিধ বাণিজ্যদ্রব্য দেশান্তরে রপ্তানি হইত।"

আর প্রমাণে তাহাদের এই প্রাচীনতম সহর বর্ত্তমানে লুপ্ত হইয়াছে।

মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ সপ্তগ্রামে রাজবংশের রাধাকৃষ্ণের মন্দির ধ্বংস করিলে বিগ্রহকে এই স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে এইস্থানে ঘাট নির্ম্মাণ করা হয়

ফটো—হিমুদাস কর

বহু প্রাচীনকাল হইতে এই স্থান হিন্দুদিগের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। কোন্ সময়ে কোন রাজা এই স্থানের অধিপতি ছিলেন তাহার পূর্ব্বাপর ইতিহাস না পাওয়া যাইলেও শত্রুজিৎ নামক এক রাজা যে এই স্থানে রাজত্ব করিতেন তাহা কবি কৃষ্ণরাম কৃত "যষ্টিমঙ্গল" গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়।

পরবর্ত্তীকালে দিল্লীর বাদসার অধীন এক শাসনকর্ত্তার দ্বারা এই স্থান শাসিত হইত, পরে রাজা হিরণ্যদাস মজুমদার ও তদীয় ভ্রাতা গোবর্দ্ধন দাস মজুমদার একত্রে সপ্তগ্রামের শাসন কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। ইহারা যদিও রাঢ়ীয় কায়স্থ এবং 'মজুমদার' সম্বন্ধে এরূপ উপাধি ছিল। পরবর্ত্তী শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, তাঁহারা এই স্থান শাসন করিতেন বলিয়া জানা যায়। এই 'মজুমদার' বংশ যে মানে তৎকালে যে প্রধান ছিল তাহার বহু প্রমাণ আছে। রাজা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই সদাচারী, ধার্ম্মিক ও বদান্যতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। গঙ্গাতীরবর্ত্তী বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাদের নিকট হইতে বৃত্তি পাইতেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি দানের বহু নিদর্শন পুরাতন কাগজ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের সপ্তগ্রাম হইতে বার্ষিক আয় তিন লক্ষ টাকা ছিল এবং তাঁহারা গৌড়েশ্বরকে বার লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতেন। এই সম্বন্ধে 'খ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' যাহা লিখিত আছে নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি—

"হেনকালে মুলুকের এক ভেজ্ঞ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী॥
হিরণ্যদাসে মুলুক দিল মোকতা করিয়া।
তার অধিকার সেল যত সে দেখিয়া॥
যার লক্ষ সেন রাজার লাগেন তিন লক্ষ।
সেই তুচ্ছ কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥"

রাজা হিরণ্যদাস নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্দ্ধন দাসের ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল তাহার নাম রঘুনাথ। রাজবংশের একমাত্র পুত্র বলিয়া উক্ত ভ্রাতারই এই শিশু বিশেষ আদরের ছিল। 'রাধাকৃষ্ণ' রাজ বংশের কুলদেবতা ছিল এবং গোবর্দ্ধন মহাসমারোহের সহিত নবজাত পুত্র হওয়ায় বিগ্রহের একটী সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহাদের শাসনকালে পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য বঙ্গদেশে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম আগমন করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে 'সালাহান' নামক পারস্য গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যখন হুগলী হিন্দুরাজার শাসনাধীনে ছিল তখন ব্যবসাদী নির্ম্মাণের জন্য জমি খরিদ করিবার অনুমতি একজন বণিক পাইয়াছিলেন। "While Bengal was governed by its own princes a number of merchants resorted to Hugli and obtained a piece of ground and permission to build houses in order to carry on commerce to advantage" হাণ্টার সাহেব হুগলীতে যে হিন্দু রাজার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ঐতিহাসিকগণ উক্ত রাজাকে গোবর্দ্ধন দাস মজুমদার বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; কারণ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ প্রথম বঙ্গদেশে আগমন করেন, এবং উক্ত সময়ে গোবর্দ্ধন মজুমদার ব্যতীত আর কেহ হুগলীতে রাজত্ব করিতেন না। রঘুনাথ ঐশ্বর্য্যের ও বিলাসের ক্রোড়ে শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। রাজা হিরণ্য দাস রঘুনাথের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুত বলদেব আচার্য্যকে নিযুক্ত করেন। বালক অতিশয় মেধাবী ছিলেন; অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। রঘুনাথ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে বিশেষ আনন্দ

লাভ করিতেন এবং তাহার শিক্ষাগুরু শ্রীযদু নন্দনের আচার্য্যও তদনুযুক্ত ছিলেন।

শ্রীযদু হরিদাস ঠাকুর ঠিক এই সময়ে ঘটনাচক্রে যদুনন্দন আচার্য্যের গৃহে অতিথি হন। রঘুনাথ-হরিদাস ঠাকুরের অসাধারণ ভগবৎ প্রেম দেখিয়া তন্ময় হইয়া পড়েন এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন।

কিছু দিন পরে যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন সেই সংবাদ নদের চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল, তখন রঘুনাথ নারায়ণের অবতারকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব হইতেই হরিদাস ঠাকুরের নিকট মহাপ্রভুর নাম শ্রবণ করিয়া অবধি তাঁহার শ্রীচরণে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

শ্রীপাট অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে যখন মহাপ্রভু পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার বাটীতে যাইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম তাঁহার প্রেমময় মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন। এই স্থানে সাত দিন অতিবাহিত করিবার পর তাঁহার আর ঘর সংসার ভাল লাগিল না। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "রঘুনাথ এখনও তোমার সময় হয় নাই, এখন ঘরে যাও, যখন সময় হইবে, যখন চঞ্চল হৃদয় যথার্থ স্থির বৈরাগ্যের উপযোগী হইবে তখন যদি তোমায় পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন এবং তোমাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন।"

মহাপ্রভুর আদেশে রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি 'রাধাকৃষ্ণের' মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্য এরূপ আকুলা হইতেন যে তাহার জনক ও জ্যেষ্ঠতাত তাহা দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে একবৎসর কাটিল, তাঁহার পিতামাতা রঘুনাথের সহিত এক সুন্দরী কন্যার বিবাহের স্থির করিলেন। রঘুনাথ তাহা জানিতে পারিয়া একদিন রাত্রে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা

সপ্তগ্রাম-অন্তর্গত কৃষ্ণপুর শ্রীযদু রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাট　　ফটো—বিষ্ণুপদ কর

করিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

"এই মত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে পুন পলাইতে কৈল।
রাত্রে উঠি একলা চলিলা পলাইয়া।
দূতে হইতে পিতা আনিল ধরিয়া॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

রঘুনাথ বাড়ী ফিরিয়া সর্ব্বদাই বিমর্ষ হইয়া থাকিতেন, তাঁহার

তীব্র অনুরাগ কিছুতেই বাধা মানিতে চাহিল না। জ্যেষ্ঠতাত, পিতামাতা প্রত্যেকেই রঘুনাথের জন্য বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে বৃদ্ধাবস্থী করিবার জন্য তাঁহারা যুক্তি করিয়া এক ফুলশয্যাবতী কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দিলেন।

পার্থিব ভোগবিলাসে রঘুনাথকে আকৃষ্ট করা গেল না; বরং তাঁহার হৃদয়ে দারুণ বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তাঁহার স্নেহময়ী মাতা ও প্রেমময়ী পত্নী কাঁদিতে লাগিলেন; সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। রঘুনাথ পুনঃ পুনঃ পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া, তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাখিবার প্রস্তাব তাঁহার পিতার নিকট করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে রাজ ঐশ্বর্য ও অসংখ্য স্ত্রী যাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে নাই, দড়ির বন্ধন তাঁহাকে কি করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে?

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, স্ত্রী অপ্সরাসম।
এ সব বান্ধিতে নারে যাহার মন॥
দড়ির বন্ধন তারে রাখিবে কেমতে?
জন্মযাত্রা পিতা নাম প্রায়ক ঘুচাইতে।"—চৈঃ ৪:

রঘুনাথ পানিহাটী গ্রামে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে ভক্তি উপলক্ষি করিয়া বলিয়াছিলেন যে রঘুনাথ আসি আগে তোমাকে দণ্ডিত করিব; তুমি আমার শিরঃপর্বত চিঁড়া-দধি ভোজন করাও। রঘুনাথ প্রেমে গদগদ হইয়া পরমানন্দ মহাপ্রভু, এবং তাঁহার শিরঃপর্বতে চিঁড়া-দধি ভোজন করাইয়াছিলেন। আজও পানিহাটী গ্রামে পুণ্যসলিলা জাহ্নবী তীরে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত চিঁড়া-দধি মহোৎসবের স্মৃতি পরণার্থে বৈষ্ণবগণ 'দণ্ডমহোৎসব লীলা'র অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

"পানিহাটী গ্রামে পাইল প্রভুর মর্ম।
কীর্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে মহাজন।
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে মহামত্ত।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়।
নিকটে না আইস মোর, ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছ, দণ্ডিমু তোমারে।
দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
তুমি আনন্দিত হৈল রঘুনাথ মনে।"—চৈঃ ৪:

অতঃপর রঘুনাথ প্রতিদিন ঘোল ক্রোশ করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া বারদিন পরে পুরীতে নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত মিলিত হন। নীলাচলে যাইতে তাঁহাকে হিংস্র জন্তুসমাকুল বিরিঞ্চি বন ও প্রান্তর এবং মকর ও নক্র বিপদসঙ্কুল নদী সকল সন্তরণ করিয়া যাইতে হইয়াছিল।

নীলাচলে উপস্থিত হইয়া তিনি কয়েক বৎসর শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত বাস করেন। মহাপ্রভু তাঁহার অসাধারণ প্রেমের একাগ্রতা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী রঘুনাথকে ভক্তির উপযুক্ত আধার বিবেচনা করিয়া দীক্ষা প্রদান করেন এবং সাধ্য সাধনতত্ত্ব প্রণালী শিক্ষা দেন। রঘুনাথ যে অসাধারণ কৃচ্ছ্রতা সাধন করিয়া ভক্তির সকল অঙ্গ যাজন এবং ভজন মার্গের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়। তিনি স্নান, আহার ও নিদ্রার জন্য মাত্র তিন ঘণ্টা সময় রাখিয়া, প্রতিদিন একুশ ঘণ্টা হরিনাম সঙ্কীর্তনে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। রঘুনাথের পিতা তাঁহার জন্য অর্থাদি পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি সে অর্থ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাহা ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করিতেন।

"তোমা লাগি রঘুনাথ সব ছাড়ি আইল।
যেখায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল।
তোমার চরণ কৃপা হইতে তাহারে।
তৃণে মানি খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে।"—চৈঃ ৪:

এই সময় রঘুনাথের শোকে তাঁহার মাতা ও পত্নী লোকান্তরিতা হন। নীলাচল হইতে তিনি কয়েক বৎসর পুরীধামে অতিবাহিত করিয়া মহাপ্রভু প্রদত্ত এক সাক্ষাৎ গোবর্ধনশীলাধারী শিলাময়ী নবগোপালের বিগ্রহ লইয়া একবার সপ্তগ্রামে প্রত্যাগমন করেন। সপ্তগ্রামে তাঁহাদের 'চাঁদপুর কুলের' বসিয়ে তিনি উক্ত নবগোপালকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। রঘুনাথ আসিয়াছে শুনিয়া দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বৈষ্ণবগণ আসিয়া হরিনাম সঙ্কীর্তনে সপ্তগ্রামকে মাতাইয়া তুলিল। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুও সপ্তগ্রামে আসিয়া রঘুনাথের সঙ্গে যোগ দিলেন; সপ্তগ্রামের দেবালয় বৈকুণ্ঠালয়ে পরিণত হইল। শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য-ভাগবতে' এই সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে নিম্নে তাহার কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি—

"সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সঙ্কীর্তন করেন লীলায়।
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নহে বলিবার।
পূর্বে যেন সুখ হৈল নবীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে।
এই মতে সপ্তগ্রাম ভাসয়া ঈশ্বরে।
বিহরেন নিত্যানন্দ স্বধর্ম কৌতুকে॥

মহাপ্রভুর পার্ষদগণ যখন বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যান রঘুনাথও সেই সময় বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত পরলোকগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড বিদ্যমান আছে; কিন্তু সাড়ে-চারি শত বৎসর পূর্বে উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের চিহ্ন মাত্র ছিল না। যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে কয়েকটী জলাভূমিকে রাধাকুণ্ড ও শ্যাম-কুণ্ড বলিয়া দেখাইয়া দেন। রঘুনাথ সেই স্থানটীকে তদ্রূপ আরাধনার উপযুক্ত স্থান ভাবিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার মানসিক বলে একটী আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হয়। একদিন রঘুনাথের ইচ্ছা হইল যে কি উপায়ে এই পুণ্য জলাশয় দুইটিকে পূর্বের ন্যায় বিশালাকার করিতে পারা যায়। এইরূপ চিন্তায় কয়েকদিন অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময় এক বস্তাপূর্ণ লইয়া এক ব্যক্তি আসিয়া রঘুনাথকে

বলিলেন যে স্বপ্নাদেশে শ্রীশ্রীনারায়ণ জীউর আদেশে তিনি এই মন্ত্র লইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন যে শ্রীযুত রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট যাইয়া এই মন্ত্র অর্পণ করিয়া বলিও যে তিনি যেন রাধাকৃষ্ণ ও শ্যামকুণ্ড খনন করিয়া দেন। রঘুনাথ ও তাঁহার শিষ্যগণ পুলকে কাঁদিতে লাগিলেন এবং অচিরে কৃষ্ণ দুইটি বৃহৎ জলাশয়ে পরিণত হইল। এই স্থানে রঘুনাথ এরূপ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন যে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একপ্রকার লোপ পাইল।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানগণ পুনরায় সপ্তগ্রাম কাড়িয়া লন এবং এই স্থান মুসলমান শাসনকর্ত্তার দ্বারা শাসিত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে এই প্রাচীন স্থানের যাবতীয় হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া সেই স্থানে মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আকবরের সময় এই স্থানের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে তৎকালীন লেখকগণ এই স্থানকে "বলঘা-স্থান" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "In Akbars time, Satgaon was known as 'Balghak-Khana' the house of Revolt" (Bengal Past & Present, Vol III, 1909) রঘুনাথের বাড়ী ধ্বংস হইল এবং মন্দির মসজিদ হইবার পূর্ব্বেই মন্দিরের পূজারী-ব্রাহ্মণ 'রাধাকৃষ্ণ' এবং 'মদনমোহনের' বিগ্রহগুলি মন্দিরের পার্শ্বে প্রবাহিতা নদীর তীরে প্রোথিত করিয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিলেন; রাজবাড়ীর ভূমি-দেবতার মন্দির ধ্বংস হইল।

সপ্তগ্রামের ভগ্ন মসজিদ সম্বন্ধে ব্লাকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে, এই মসজিদের প্রাচীরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে রচিত এবং প্রাচীরগুলির ভিতর ও বাহির আরবীয় প্রণালীর কারুকার্য্যসমলঙ্কৃত। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রাচীরে একটী 'কুলুঙ্গি' আছে, উহা হিন্দু মন্দিরের বিলানের ন্যায়—দেখিতে অতি সুন্দর। ষোড়শ শতাব্দীর রাজত্বের অবসানে এইগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I, Vol-39, 1870).

বৃন্দাবনে রঘুনাথ তাঁহার আরাধ্য দেবতার দুর্দ্দশার বিষয় জ্ঞানে অবগত হইলেন এবং তাঁহার অন্যতম শিষ্যসহ শ্রীযুত কৃষ্ণমিশ্র গোস্বামীকে সপ্তগ্রামে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে সপ্তগ্রামে যাইলেই তিনি যাবতীয় বিষয় অবগত হইবেন এবং বিগ্রহগুলিকে পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি যেন যথাস্থানে তাঁহাদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথের কথানুযায়ী তদীয় শিষ্য সপ্তগ্রামে আসিয়া বিগ্রহগুলিকে নদীর তীর হইতে উদ্ধার করিলেন এবং যবনের নিকট হইতে কিছু জমি লইয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানেই ঘরের ঘরে তাঁহাদিগকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরবর্ত্তীকালে স্বর্গীয় দানবীর মতিলাল শীলের পিতামহী বর্ত্তমান গৃহ এবং যে স্থানে বিগ্রহগুলি প্রোথিত ছিল, সেই স্থান ইষ্টক দিয়া বাঁধাইয়া তথায় একটী ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

রঘুনাথ বৃন্দাবনে এরূপ কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলেন যে আহার নিদ্রা তাঁহার একপ্রকার লোপ পাইল। অমানুষিক কৃচ্ছ্রতা সাধন করিয়া তিনি সাধনার চরম সীমায় উপনীত হইলেন এবং ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দের (১৪০০ শকাব্দ) আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন রঘুনাথের অমর আত্মা জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত পুরুষে লীন হইয়া গেলেন। শ্রীযুত রঘুনাথ গোস্বামী মুক্তির যে পথ দেখাইয়া গেলেন, তাঁহার শিষ্যগণও সেই অবলম্বন করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার পরম পবিত্র রাধাকৃষ্ণ লীলাকথাপূর্ণ প্রবীণ জীবনকাহিনী বৈষ্ণবগণের নিত্য আস্বাদনের বস্তু। মহাপ্রভুর পরিকরের মধ্যে ছয়জন গোস্বামী ছিলেন, তন্মধ্যে একমাত্র কায়স্থ রঘুনাথ ব্যতীত সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কায়স্থ হইয়াও মহাপ্রভুর কৃপায় এবং নিজ চরিত্রবলে তিনি ব্রাহ্মণসমূহ সর্ব্বতোভাবে পূজনীয় হইয়াছিলেন।

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ।
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ।
এই ছয় গোসাঞী যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ।"

শ্রীযুত রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট হইতে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভুর জীবনের ঘটনাবলী অবগত হইয়াই প্রধানতঃ হিন্দুবিশ্বের অমূল্য গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" শ্রীযুত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচনা করেন। এই সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন···

"রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি।"

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে নিম্নোক্ত ভনিতাটী দেখিতে পাওয়া যায়—

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।"

তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তির বিষয় উক্ত গ্রন্থের 'অন্ত্যলীলা' মধ্যে অতি মধুর ও লোকশিক্ষাপ্রদ ভাষায় বর্ণিত আছে। রঘুনাথ যে সমস্ত অমূল্য ভক্তিমূলক ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কতিপয় মুদ্রিত হইলেও, এখনও বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি কীটদষ্ট হইতেছে। উক্ত অপ্রকাশিত পুঁথিগুলি প্রকাশ করিলে কেবল যে বঙ্গভাষা সমৃদ্ধ হইবে তাহা নহে, তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার পথ অবলম্বন করিয়া দেশবাসী ধন্য ও কৃতার্থ হইবে এবং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মূর্ত্ত প্রতীক কায়স্থ কুলোদ্ভবকারী রঘুনাথেরও কীর্ত্তিস্তম্ভ সংরক্ষিত হইবে।

সপ্তগ্রামের এই প্রাচীন হিন্দু রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ও রঘুনাথের সাধনক্ষেত্র দেখিয়া আজও ভক্তহৃদয়ে হৃদয়ে রঘুনাথের বিষয় জ্ঞান ও ভক্তির স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে; যে মহাত্মা এই জাতিকে প্রেমময় নামের দ্বারা সমাজের শীর্ষস্থানে উন্নীত করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতিবিজড়িত স্থানের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিলে লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া যায়। আমাদের উদাসীনতায় ও অযত্নহেতু বিগ্রহের সেবা পর্য্যন্ত প্রতিদিন হয় না এবং সেবাসদনও বর্ত্তমানে যেরূপ জীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে ইহা ধূলিসাৎ হইতে আর বোধ হয় বিশেষ বিলম্ব নাই।

বর্ত্তমান মন্দিরটী "রঘুনাথ দাসের শ্রীপাট" বলিয়া খ্যাত এবং ইহার

মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিগ্রহগুলি ব্যতীত রঘুনাথের অন্যতম শিষ্য কমললোচন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত "শ্রীশ্রীবিদ্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের" বিগ্রহ আছে। এগুলির যে প্রস্তরময় বেদীর উপর বসিয়া রঘুনাথ সাধনা করিতেন এবং তাঁহার ব্যবহৃত খড়ম-পাদুকা (খড়ম ১-যুগল অন্যের সহিত মন্দির মধ্যে সংরক্ষিত আছে। অধুনালুপ্ত স্বর্গীয় মতিলাল শীলের পিতামহী কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইবার পর ১৩১৬ সালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভ্য স্বর্গীয় অম্বালাল ঘোষচন্দ্র সরকার মহাশয়ের চেষ্টায় এবং রায়বাহাদুর কমলাকান্ত রায়, রায় বহাদুর নাথ চৌধুরী, রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়, কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্তের অর্থ সাহায্যে মন্দিরের সামান্য কিছু সংস্কার হইয়াছিল। পরে ১৩৩০ সালে চুঁচুড়ার স্বর্গগোপালদাস শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ নামক জনৈক ভক্ত পুনরায় মন্দিরের কিছু সংস্কার করিয়া দেন। বর্ত্তমান মোহান্তের নাম শ্রীগৌরগোপাল দাস অধিকারী, অধীনস্থে পঞ্চাশের মধ্যবয়সে ঠাকুরের সেবা করা অসম্ভব হইলে, তিনি শ্রীযুক্ত রামকান্ত বাবাজীর নিকট এই ভিক্ষা জ্ঞাপন করেন এবং ১৩১০ সাল হইতে তাঁহারই যৎকিঞ্চিৎ অর্থসাহায্যে আজও বিগ্রহের সেবা হইতেছে।

এই অনাদৃত ও অজ্ঞাত রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাটের অবস্থিতির পূর্ব্ব-বর্ণিকদিগের পুরুষপুরুষ শ্রীমন্ হরাবন দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট বিদ্যমান আছে। উক্তবাটি পূর্ব্ব বর্ণিক হয় ঘর বহুঠাকুরের শ্রীপাট সুন্দরভাবে সুসংরক্ষিত করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর উক্ত স্থানে দত্ত-ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় পূর্ব্ববর্ণিক সমাজ তাঁহাদের এই জাতীয় মহাপুরুষের কীর্ত্তি স্মরণ করতঃ প্রতি বৎসর উক্ত স্থানে সমবেত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকেন এবং শ্রীপাটের যাবতীয় সংস্কারাদির ভারও তাঁহারাই "সমাজ" গ্রহণ করিয়াছেন।

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি বাঙ্গলার জাতীয় গৌরব শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর ন্যায় কয়জন মহাপুরুষ বাঙ্গলা দেশকে পবিত্র করিয়াছেন? রঘুনাথ প্রবর্ত্তিত পুণ্যসলিলা সরস্বতীর উপকূলে প্রতি বৎসর যে উত্তরায়ণ-মেলার (১লা মাঘ) অনুষ্ঠান আজ দাড়ে চারিশত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার সংবাদ কয়জন জানে?

জাতীয় মহাপুরুষদিগের মহিমা বিস্মৃত হওয়া যে আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। শ্রীভগবানের অংশসম্ভূত রঘুনাথ জীবের প্রতি কৃপা বিতরণের জন্য নরাকারে যে স্থানে এবং যে জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি বিজড়িত সেই স্থানের রক্ষাকল্পে যদি আমরা সচেষ্ট না হই—আমাদের অবহেলায় ও উদাসীনতায় যদি কায়স্থকুল উদ্ধারকারী প্রেমময় মহাত্মার নাম এবং কায়স্থ জাতি ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির মূর্ত্ত-প্রতীক চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের আর যে কোন আশা নাই একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। *

* যে সমস্ত গ্রন্থ ও পুস্তকের সাহায্যে এই মহাত্মার জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি, তাহাদের গ্রন্থকারের নিকট আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি। যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে, তাহা আমারই দোষে হইয়াছে কারণ বৈষ্ণব শাস্ত্রে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্রবন্ধের মধ্যে চিত্রগুলি শ্রীযুক্ত বিভূপদ কর কর্ত্তৃক গৃহীত।

জনতা

শ্রীসুবোধ বসু

বার্ক্কিনিতে চেপে আসিয়াছি। কিন্তু এই কি চেন্ন! উঁচু-নিচু রাস্তায় হাটিয়া বেড়াইতেছি, যেখানেই কপ্ পাইতেছি গিলিয়া ফেলিতেছি। ফল্ মনে করিয়া একদিন পাশের বাড়ির চিনেদীর ঘোঁড়াও গিলিয়া ফেলিয়াছিলাম। সুদূর পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে দৃষ্টিকে দুর্গম অভিসারে পাঠাইতেছি এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা করিয়া দেখা দিলে আদেখ্লার মতো তারিফ করিয়া মরিতেছি। এ সকলই চেন্ন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যে কলিকাতার রাস্তার মতোই গায়ে ধাক্কা দিয়া মানব সন্তানগণ কিল্‌কিল্ করিয়া বেড়াইতেছে, পাহাড়ী ও সমতলবাসী, ইংরেজ-বাঙালি, পাঞ্জাবী-মার্কিণী, ভুটানী-নেপালী, চীনা প্রভৃতি জগতের প্রায় সকল জাতিনিচয়ের প্রতিনিধিগণ চৌরাস্তাভিমুখী রাস্তাগুলি দিয়া স্রোতের মতো আগাইয়া আসিতেছে, ইহা কি চেন্নের লক্ষণ? দার্জ্জিলিং পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অতিস্ফীত জনতা গিস্‌গিস্ করিতেছে; যেন মরিয়া হইয়া সকলে একটিমাত্র জায়গা লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই অবিশ্রান্ত জনতা সকল কিছু অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু জনতার সঙ্গ লাভ করিবার জন্য দার্জ্জিলিং আসি নাই, জনতা এড়াইবার জন্যই আসিয়াছিলাম। যুদ্ধকালীন কলিকাতায় বাস করিবার পর জনতার প্রতি সকল আকর্ষণ হারাইয়াছি। ট্রামে বাসে, বাজারে-হাটে, বাড়ি সংগ্রহ ও

রসদ সংগ্রহের প্রতিযোগিতায়, পথে ঘাটে, মাঠে মন্দিরে, সিনেমায় থিয়েটারে লোকের ভিড় ভোগ করিয়া জনতার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়াছি। মানুষ দেখিলেই মনে হয়—এরা আসিয়া নিশ্চয়ই আমার আহার্য্য, বাসস্থান, বিচরণস্থান এবং সর্ব্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবে। পঙ্গপালের মতো জনতা শহর ছাইয়া ফেলিয়াছে। কোথা হইতে ইহাদের আবির্ভাব হইয়াছে, কতকাল ইহারা থাকিবে, কবেই বা ইহারা দূর হইবে, কিছুরই নিশ্চয়তা নাই, অথচ ইহাদের যুদ্ধকালীন আবির্ভাবে জীবনক্ষেত্র দুর্গম হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ অবস্থায় যদি জনতার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইয়া প্রীতিরক্ষা করিতে না পারি, তবে কি তাহা খুবই দূষণীয়?

আমি কবি-প্রকৃতির লোক। সুতরাং মানুষ অপেক্ষা আমার নিকট নিসর্গবস্তুসমূহ অধিকতর মনোহর মনে হয়। নির্জ্জনতাকে আমি সম্পদ বলিয়া বিবেচনা করি। এ অবস্থায় দার্জ্জিলিঙের পূজার ভিড় যে আমাকে তিক্ত-বিরক্ত করিয়া তুলিবে ইহাই কি স্বাভাবিক নয়? বুঝিলাম ভুল করিয়াছি। এ সময়ে এখানে চেঞ্জে আসা আমার পক্ষে খুবই মূর্খতার কাজ হইয়াছে। যাহারা পরস্পরের সাজ-পোষাক দেখিতে এবং দেখাইতে আসে, যাহারা পুত্রের চাকরি এবং কন্যার বর সংগ্রহের চেষ্টায় দার্জ্জিলিং অভিযান করে আমি তো তাহাদের দলের নই। তবে দার্জ্জিলিঙে না আসিলে আমার কি ক্ষতি হইত? হিমালয় ও শৈত যদি এতই কাম্য তবে তো কাশ্মিরেও যেতেই চলিত। দার্জ্জিলিঙের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্যের লোভে কেন এখানে আসিলাম? ভিড় হইতে কিছু কালের জন্য দূরে থাকিতে পারাই যখন আমার পক্ষে সবচেয়ে বড় পরিবর্ত্তন, তখন এমন ভুলও লোকে করে?

সত্য সত্যই দার্জ্জিলিঙের ভিড় আমাকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে। যত নির্জ্জন রাস্তা দিয়াই বেড়াইতে বাহির হই না, দু'পাঁচটি করিয়া পরিচিত ব্যক্তি বাহির হইয়া হস্তবিকাশপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিবে—কোথায় আছি, কতদিন থাকিব, কখন বাড়ি গেলে আমাকে পাওয়া যাইবে ইত্যাদি নানা তত্ত্ব সংগ্রহ করিবে। পথপ্রান্তে নিজেকে একা মনে করিয়া যখনই কুয়াশা-অস্পষ্ট অরণ্যের দিকে কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়াছি, অমনি হয়তো পায়ের কাছ হইতে একটি নবগ্রহ পরিবার উত্থিত হইয়া পারিবারিক কোলাহল সুরু করিয়া দিবে। ভীত হইয়া যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি, তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। পশ্চাৎ হইতে ঘোড়-সওয়ারেরা ছুটিয়া আসিয়া অবশিষ্ট শান্তি এবং পাহাড়ী-নৈঃশব্দটুকু ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ছুটিয়া পালাইবে। বস্তুত অপারোহণ-অপটু ব্যক্তিদের দার্জ্জিলিঙে ঘোড়া-রোগ বড়ই সংক্রামক। সস্তায় ঘোড়ায় চড়িবার সুযোগ পাইয়া এমন সব ব্যক্তির এবং ব্যক্তিনীর মনে অশ্ব-ধাবন স্পৃহা জাগ্রত হয় যে, দেখিয়া বিরক্তির সহিত করুণা বোধ না করিয়া উপায় থাকে না।

আরও মুস্কিল এই যে, এই জনতার কোনও বৈচিত্র্য নাই। কতকগুলি মুখ এই জনতার মধ্যেও এমন অখণ্ড অঙ্গস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে, বাহির হইলে ইহাদের না দেখিয়া আর উপায় নাই। দার্জ্জিলিঙের কমার্শ্যাল রো-টিকে একমাত্র বাংলা চলচ্চিত্র জগতের সহিতই তুলনা করা যাইতে পারে—এমনই কতগুলি নির্দ্দিষ্ট মুখ অসহ্য একঘেয়েমির সঙ্গে বারবার আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত, এইরূপ কতগুলি মুখকে আমি ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহাদের অনেকেই আমার অপরিচিত ব্যক্তি, অথচ ইহাদের মুখ এতই পরিচিত এবং মুখ-দর্শন এতই অবশ্যম্ভাবী যে, ইহাদের কাহাকাছি উপস্থিত হইলে উল্টা দিকে ফিরিয়া ছুট দিতে ইচ্ছা হয়।

দার্জ্জিলিংয়ের জনতা চৌবাচ্চার জলের মতো; ইহাতে স্রোত নাই, তরঙ্গ নাই, বৈচিত্র্য নাই। একই শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ অসহ্য পৌনঃপুনিকতার সহিত দৃষ্টিপথে এবং শ্রবণপথে পতিত হয়। ইহার চলাফেরা এবং আলাপ আলোচনার রীতি এমনই অভিন্ন যে, মানুষে মানুষে তফাৎ চোখে পড়ে না; অথচ জনতা বলিয়াই ইহাদের প্রতীয়মান হয়। আমার নিকট ইহা যে বিরক্তির কারণ হইবে, আমার কবি-প্রকৃতির সম্বন্ধে জানা থাকিলে ইহাও সহজে বুঝিতে পারিবেন। বস্তুত, দার্জ্জিলিঙের মানুষের ভিড়কে আমি ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রধান প্রধান সড়কগুলি দিয়া যেমন মানুষ-কীট কিলবিল করিয়া চলে তাহাতে ইহাদিগকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়া আমি জনতা-অবজ্ঞাত পথগুলিই অবলম্বন করিয়াছি।

কিন্তু ইহাতেও রেহাই পাইলাম না। আজ ভোর আটটা হইতে সওয়া নয়টা এই ফিকিরচাঁদ একঘণ্টা

কালের মধ্যে এক অলাবুবাবুর সহিতই ছয়বার দেখা হইয়াছে। ভদ্রলোক আমার পরিচিত ব্যক্তি নহেন, তাই তাঁহার পিতৃদত্ত নামটি এমন অহরহ দেখিতে হয় যে, অন্তত নিজের কাছে বিরক্তি জানাইবার জন্য তাঁহার একটি নাম স্থির না করিয়া পারি নাই এবং তাঁহার উদরের পরিধি ও মস্তিষ্কের ইন্দ্রলুপ্তটি লক্ষ্য করিয়া অলাবু অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নাম আর খুঁজিয়া পাই নাই।

ভদ্রলোক যেন আমার সহিতরসিকতা সুরু করিয়াছেন। তাঁহাকে এবং অন্যান্যকে এড়াইবার জন্য যতই আমি নির্জন ও সুবিধাজনক রাস্তা খুঁজিয়া মরিতেছি, ততই যেন তিনি আমার শান্তি নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ঠিক সেই সকল স্থানেই ক্ষণে ক্ষণে আসিয়া উদিত হইতেছেন।

জনশূন্য ক্যালক্যাটা রোডে অলাবু কর্তৃক তাড়িত হইয়া আমি উর্দ্ধশ্বাসে চৌরাস্তার দিকেই ছুটিয়া আসিলাম। কিন্তু এ যেন তপ্ত কড়া হইতে লাফাইয়া চুলার আগুনে পড়া। দেখিলাম, দার্জ্জিলিঙের যাবতীয় স্ত্রী-পুরুষ চৌরাস্তার বেঞ্চগুলি অবলম্বন করিয়া আমারই অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। জনতা সহস্র বাহু মেলিয়া আমাকে আহ্বান জানাইবার জন্য প্রস্তুত। শিহরিয়া উঠিলাম। শিহরিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলাম। চৌরাস্তার পূর্ব্বদিক দিয়া প্রায় সুড়ঙ্গের মতো পূর্ব্ব বার্চ্চহিল রোড; জনতাকে হতাশ করিয়া এই পথ দিয়া সটকাইয়া পড়িলাম। উৎরাইয়ের পথে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম।

নির্জ্জন ও মনোরম এই পথটি। কিন্তু একেবারে জনবিরল নহে। আশে-পাশে বোধ হয় সৈন্যদের কিছু বাসস্থান আছে, তাহাদেরই দুচার জন দার্জ্জিলিঙের কেন্দ্রীয় জনতার সহিত মিশিবার জন্য চৌরাস্তার দিকে চলিয়াছে। চতুর্দ্দিক ক্রমে অস্পষ্ট; সুদূর পাহাড়শ্রেণী অবলুপ্ত হইয়াছে, শুধু শাদা পটভূমিতে আকাশচুম্বী পাইনগাছগুলি জাপানী শিল্পরীতিতে আঁকা মনে হইতেছে। এ অস্পষ্টতা আমার ভালো লাগে। ইহা একটা নিবিড় একাকীত্বের আস্বাদ বহন করিয়া আনে। কাছের বস্তু বা ব্যক্তি ইহার প্রসাদে সুদূরতম হইয়া উঠিয়া প্রত্যেকেই নিজস্ব জগতে বিচরণ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করে। এ জন্যই দূরের কুয়াশটিকাকে আমি আন্তরিকভাবে আহ্বান করিতে লাগিলাম; কহিলাম, হে শুভ্রতা, হে ঐন্দ্রজালিক, তুমি আরও সতীর হইয়া অগ্রসর হইয়া এস। পূর্ব্ব বার্চ্চহিল রোডে বিচরণশীল আমার চারিদিকে তুমি একাকীত্বের মৃদু টানিয়া দাও। জনতার কাছ হইতে আমি মুক্তি পাই।

ম্যাপের ঠিক নিচে বসিয়াই বোধ হয় প্রদীপের নীচের জায়গার মতো এ রাস্তাটা দার্জ্জিলিঙের চেয়ে-আসা ভিড়ের নিকট এক রকম অন্ধকার। অনেকক্ষণ চলিলাম, কিন্তু পরিচিত কোনও মুখই নজরে পড়িল না। মহা-আনন্দে নিরালম্ব মেঘের মতো কুয়াশার আবছা পথটি দিয়া নিরুদ্দেশে চলিতে লাগিলাম।

দক্ষিণে সতীর কুহেলিকার রাজ্য কোমল শুভ্রতার রহস্যপূর্ণ। নিশ্চিত জানি, আমার চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তাহার সমস্তটাই ঘন অরণ্য, পর্ব্বততরঙ্গ ও উপত্যকার পূর্ণ, তবু মন যেন তাহা স্বীকার করিতে চাহে না; এই কুয়াশাকে অবলম্বন করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্যাবলীর স্বপ্ন দেখিতেছি; ভাবিতেছি, কি রহস্য আছে এই শুভ্রতার আড়ালে! আকাশের নীলিমার আড়ালে যে রহস্যের কল্পনা করি, এখানেও কি তাহাই আত্মগোপন করিয়া আছে?

সামনে চাহিয়া দেখিলাম, বড় সড়ক হইতে পায়ে-হাঁটা একটা পাহাড়ী পথ খাড়া নিচের দিকে চলিয়া গিয়াছে। চলিয়া গিয়াছে একেবারে শুভ্রতার রহস্যের মধ্যে। এই পথেই যাইব কি? গাঢ় অস্পষ্টতার মধ্যে যাইয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিব কি? কিন্তু এ পথ আমার পরিচিত নহে। কোথায়, কত নিচে নামিয়া গিয়াছে, কিছুই জানি না। মুনিসিপ্যালিটির সড়ক নয় যে, ইহাকে অবলম্বন করিয়া কোনও পরিচিত স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারিব। কোথায় কোন্ গহ্বরে ইহা চলিয়া গিয়াছে কে জানে?

সহসা সম্মুখে অশ্বখুরধ্বনি শুনিলাম। দেখিলাম, তাহার চেয়ে কিছু রোগা একটি ঘোড়ার উপর বসিয়া অলাবু-বাবু উল্টা দিক হইতে প্রসন্নবদনে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। যেন ভূত দেখিলাম; বার্চ্চহিল রোডের নির্জ্জনতা যেন উপহাস করিয়া উঠিল। কুয়াশা যেন রূপড় করিয়া পাঁচ হাত দূরে সরিয়া গেল। আমি মরিয়া হইয়া দক্ষিণদিকের খাড়া চালু পাহাড়ী রাস্তাটা দিয়া পলায়ন করিলাম।

ভালোই হইয়াছে; সভ্যতার পথের বাহিরে পা

দিয়াছি। এইবার জনতা আর আমার নাগাল পাইবে না। ঢালু অপরিসর পথ দিয়া চলিয়াছি তো চলিয়াছি। ডাহিনে বামে ঘন শুভ্রতা ; কোথাও কোথাও কাছাকাছির পাহাড়ী অরণ্যে অস্পষ্ট পাইন, পপ্‌লার গাছের রেখা চোখে পড়ে ; পথপাশের পাহাড়ের দেওয়ালে বন্য লতার শুষ্ক আস্তর কুয়াশায় বিবর্ণ। নাকের ডগা হইতে দু-তিন হাতের পর আর কিছুই নজরে পড়ে না। এক নির্জন, দিকচিহ্নহীন, দৃশ্যবৈচিত্র্যহীন অপরিসর উৎরাইয়ের পথ দিয়া গভীরতর শুভ্রতা-সমুদ্রের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিতেছি।

সহসা একবার পিছনে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, নিরঞ্জন শুভ্রতায় পিছনের জগৎ অলুপ্ত। পার্শ্বে চাহিলাম, দেখিলাম যতদূর দৃষ্টি যায়, সকলই কুয়াশাশুভ্র। সম্মুখে পিছনে, কাছে দূরে, উপরে নিচে সকলই সাদা, সকলই ধূম্র। এতক্ষণে কি পাহাড়ী, কি চেঞ্জের বাবু, একটি মানব-সন্তানও চোখে পড়ে নাই। ভালই লাগিতেছিল, কিন্তু যতই পরিশ্রম বাড়িতে লাগিল, নির্জনতা দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যহীন হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই মনে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—কোথায় চলিয়াছি? কেন চলিয়াছি? কোন্ পথে ফিরিব?

এইবার পথটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুদিকে গিয়াছে। কোন্‌টি বাছিয়া লইব? ডাহিনে যাইব, না বাঁয়ে যাইব? কোনটি লোকালয়ে গিয়াছে? যে পথে আসিয়াছি, সে পথেই ফিরিব কি? এমন চড়াইয়ের পথে ফিরিয়া যাওয়ার মতো শক্তি কি আমার অবশিষ্ট আছে? ইতিমধ্যে চার পাঁচটি বাঁক ঘুরিয়াছি ; পথ গোলক-ধাঁধা হইয়া গিয়াছে। কোন্ পথ দিয়া কোন্ দুর্গমতর পথে যাইব, তাহারই বা ঠিক কি? এই ঘন কুয়াশার মধ্যে অস্পষ্ট অরণ্যভূমিতে পূর্বের পথটি ঠিক মতো চিনিয়া লওয়া সহজ কথা নয়। অবশ্য এ পথে চলিতে আমার ভালই লাগিতেছে, কিন্তু একেবারে হারাইয়া না যাই, সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন।

দক্ষিণের পথটিই বাছিয়া লইলাম। এটি ক্রমে উঁচু হইয়া আগাইয়া গিয়াছে। আমার অতিক্রান্ত পথের মতো ইহা খাড়া নহে ; অথচ ঊর্দ্ধদিকেই যখন ইহার গতি তখন চলিতে থাকিলে ক্রমে অবশ্যই দার্জিলিঙের স্তরে গিয়া পৌঁছিতে পারিব, ইহা খুবই সম্ভাব্য। বড় আনন্দ হইল। নিচের পাইনগাছগুলির চূড়ার উপর দিয়াই যেন হাঁটিয়া চলিলাম। অরণ্যের গন্ধ, ফলের গন্ধ, বন্য উদ্ভিজ্জের গন্ধ নাকে আসিল। নির্জ্জনতা অখণ্ড হইল। মনে হইল, সারা জগতে একমাত্র জীব আমি, বিশ্ব-চরাচরে মনুষ্য-নামধারী আর কেহ নাই। আমার নিজস্ব সসাগরা পৃথিবী আমি পূর্ণমাত্রাতেই ভোগ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এ কি? পথ হঠাৎ নিচে নামিয়া যাইতেছে? এতক্ষণ উপরে লইয়া যাইবার সকল আশ্বাস দিয়া সহসা ইহা কি আমার সহিত প্রতারণা সুরু করিল? পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে পথে দাঁড়াইয়া দম সংগ্রহ করিতেছি। কিন্তু ইহা সাময়িকভাবে সঞ্জীবিত করিলেও এতক্ষণ ধরিয়া পথচলার অবসাদ মোচন করা যাইতেছে না। পথ নির্জ্জন ; বৈচিত্র্যহীন পার্ব্বত্যবৃক্ষ ও নিশ্চল গাঢ় শুভ্রতা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। দূরের অস্পষ্ট রেখাগুলিকে একটা ভুলিয়া বস্তি মনে করিয়া পুলকিত হইয়াছিলাম। আগাইয়া গিয়া দেখিলাম, বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ন্যাওলা-ন্যাস বৃহৎ প্রস্তর পাহাড়ের গা হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে। এতক্ষণে টের পাইলাম, আমার পা দু'টা আর পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভুল পদক্ষেপ করিতে পারিতেছে না ; দূরত্বের একঘেয়েমি পথের আকর্ষণ ম্লান করিয়াছে। দেখিলাম, কোথায় চলিয়াছি, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। অরণ্য গভীরতর হইতেছে। একটা জীবিত প্রাণীও চোখে পড়িতেছে না। কুয়াশা-অবগুণ্ঠিত কাঞ্চনজঙ্ঘার দিক্‌চিহ্ন-হীন এই অর্দ্ধবাস্তব জগতে আমি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি!

পথ হারাইয়াছি! সহসা এই কথাটা মনের ভিতর পর্য্যন্ত চম্‌কাইয়া দিল! এই নিবিড় অরণ্যভূমির মধ্যে আমি কোথায় চলিয়াছি? কি করিয়া গৃহে ফিরিব? কে আমাকে পথ বলিয়া দিবে? পথ অনুসন্ধানের মতো দৈহিক এবং মানসিক শক্তি কি আমার অবশিষ্ট আছে? এতক্ষণে নজরে পড়িল, পাহাড়ী পায়ে-চলা পথের খদের দিকে রেলিং বা কোনও প্রকার বেড়া নাই। অকস্মাৎ আমার পা টলিতে লাগিল। মনে হইল, কাৎ হইয়া গভীর অজানা গহ্বরের মধ্যে পড়িয়া যাইব। মৃত্যু অটবী-দন্ত বিকাশ করিয়া এই অতল গহ্বরে আমারই মাংসের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি ডাহিন পাশের পাহাড়ের তৃণলতা আঁকড়াইয়া ধরিলাম। কিন্তু তাহাতেও ভরসা

হইল না। মনে হইল, চতুর্দ্দিকের পাহাড় এবং অরণ্য এবং অশরীরী পাহাড়ী প্রেত আমার বিরুদ্ধে এতক্ষণ ষড়যন্ত্র ফাঁদিতেছিল; বহু কলা-কৌশলে তাহারা আমাকে জনমানবহীন এই নির্জ্জন পর্ব্বতগহনে ভুলাইয়া আনিয়াছে। এইবার সকলে মিলিয়া অকস্মাৎ অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে; শঙ্কিত এক মানব-সন্তানের উপর তাহাদের আক্রোশ চরিতার্থ করিবে।

শঙ্কিত হইয়া হাঁক দিলাম। 'কে আছ?' 'কে আছ এদিকে? সাহায্য কর, আমাকে বাঁচাও।' পাহাড়ের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিয়া সে চিৎকার আমাকে যেন বারবার ভেংচাইয়া গেল। মনে হইল, পাহাড়ের উপদেবতারা যেন ক্রুদ্ধ হইয়া কিস্‌কিস্ করিতে লাগিল; 'দাঁড়া, তোকে মজা দেখাইতেছি।' পা পিছলাইয়া যাইতে লাগিল; মনে হইল, দেহ ধরিয়া কে ঝাঁকুনি দিতেছে। পথের উপর উপুড় হইয়া বসিয়া পড়িলাম, তবু কে যেন আমাকে খদের দিকে টানিয়া লইতে লাগিল। প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলাম, 'কে আছ, বাঁচাও, বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও।'

'সাহাব!'

'কে?' চমকাইয়া উপর দিকে চাহিলাম। দেখিলাম মাথায় গোল টুপি-পরা এক বেঁটে পাহাড়ী পুলিসম্যান সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তার দুই গোল গোল চোখে অসীম বিস্ময়, দুই ঠোঁট পোয়া ইঞ্চি ফাঁক হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, আমার দেহভঙ্গিটি ইহার কেন, যে কাহারও বিস্ময় উদ্রেক করিবে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। পায়ে যেন জোর পাইলাম। শরীরের ঝাঁকুনি দূর হইয়াছে। ভদ্রতা বাঁচাইবার জন্য কহিলাম; 'পায়ে চোট পাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম। তুমি কোথায় যাইতেছ? আমাকে চৌরাস্তায় পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে?'

'আমি সেবং-ও দিদির গ্রামে বিজয়ার চালের কৌটা লইতে চলিয়াছি।' সে বিনীত ভাবে কহিল। 'দার্জ্জিলিং ফিরিতে দুপুর হইবে। আপনি একটু সামনে আগাইলেই উপর দিকে যাওয়ার রাস্তা পাইবেন। উহাই আপনাকে চৌরাস্তার কাছাকাছি পৌঁছাইয়া দিবে।"

তবু ভরসা পাইলাম না। কহিলাম 'তুমি আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলে বকশিস পাইবে।'

'তার কোনও দরকার নেই, সাহাব।' সে লজ্জিত ভাবে কহিল। 'চলুন, আপনাকে সামনের রাস্তাটা দেখাইয়া দিয়া আসি। ওটা দিয়া বরাবর উপর দিকে হাঁটিয়া গেলেই হইবে; কোনও বাঁক চোর নাই।'

পথ ক্রমেই উর্দ্ধে উঠিতেছে। বুক আশায় ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। এই ঊর্দ্ধযাত্রা যতই আয়াস-সাধ্য হউক, ইহা যে নিশ্চিত আমাকে লোকালয়ে মানুষের নিশ্চিন্ত নিরাপদ সান্নিধ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইবে, ইহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। ক্রমে কুয়াশা পাতলা হইয়া আসিতে লাগিল। উপরের স্তরের রাস্তা, কাছের এবং দূরের দুইচারটি বাড়ি চোখে পড়িল। পরম নির্ভরতায় পুলকিত হইয়া উৎরাইয়ের পথ লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে লাগিলাম। আবার পাহাড় ভালো লাগিল, পাইন গাছ অপূর্ব্ব মনে হইল, শুভ্র কুয়াশার সৌন্দর্য্য মধুর বলিয়া বোধ হইল। তবু পথে অপেক্ষা করিলাম না; দার্জ্জিলিঙ হিমালয়ান রেলের ইঞ্জিনের মতো হুস হুস করিতে করিতেই উপর দিকে উঠিতে লাগিলাম।

ঐ তো উপরেই রেলিং-ঘেরা দার্জ্জিলিং মিউনিসি-প্যালিটির সড়ক! কোন্ রাস্তা ওটা? ক্যালকাটা রোড কি?

হাঁফাইতে হাঁফাইতে উপরে উঠিয়া আসিলাম। পিচের রাস্তায় পরম নির্ভরতার সঙ্গে প্রথম পা দিয়া তবে চারদিক চাহিয়া দেখিবার শক্তি ও ফুরসৎ হইল। দেখিলাম, পায়ে-হাঁটা পথ ও ক্যালকাটা রোডের সংযোগস্থলে রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছেন আমারই জনাবুবাবু। আমি সহর্ষে ছুটিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া পরম আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া কহিলাম, 'আপনাকে সর্ব্বদাই দেখতে পাই, কিন্তু পরিচয় না থাকাতে আলাপ করতে পারি না। আসুন, সেই পরিচয়টা সেরে নেই…'

ভদ্রলোক হাঁ করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মহারাষ্ট্র ভ্রমণ—আলান্দি

শ্রীঅবনী নাথ রায়

গত ৬ই ফেব্রুয়ারি (১৯৩৮) আমরা সপরিবারে আলান্দি যাই। মিঃ কুলকার্ণি এবং মিঃ আলুণ্ডে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, পরের বাসে মিঃ নিকাম, তাঁহার স্ত্রী, শাশুড়ী এবং ৩ মাসের শিশুপুত্র লইয়া হাজির হইলেন। ইঁহারা সকলেই আমাদের আপিসের লোক সুতরাং সুপরিচিত। আপিসের চাপরাশি গণপৎ তার সঙ্গে ছিল—মোটর উপর আমাদের বলটি কম হয় নাই।

আলান্দি পুণা হইতে আকাঁর অভিমুখে—কিছুদূর যাইয়া বাঁ দিকে যাইতে হয়। মাত্র ১০ মাইল পথ—যাতে আমাদের ৪০ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। আমরা তথায় পৌঁছিয়া রান্না করিয়া খাইব এবং সমস্ত

আলান্দির বৃক্ষ—দূর হইতে

দিন কাটাইব, এই মনে করিয়া চাল ডাল সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। কেবলা ইহার পূর্বে ডিসেম্বর মাসে কার্লা গুহা দেখিতে যাইয়া ২৫ টিকিয়াছিলাম। আজকাল রান্নাবান্নার দিনে চাউল কোথাও পাওয়া যায় না—পয়সা দিলেও নয়, ইহা দেখিয়াছিলাম। বেলা এগারোটার পর আমরা আলান্দি পৌঁছিলাম।

মাদ্ ষ্টাণ্ডের ঠিক সামনেই আলান্দির সরকারী ডাক্তারখানা—তাহার প্রাঙ্গণ সূর্যমুখী ফুলে একেবারে ভরি হইয়া আছে। ডাঃ ঘাটক তখন ডাক্তারখানাতেই ছিলেন। ইনি আমার সহযাত্রী মিঃ কুলকার্ণির পরিচিত —আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া ডাক্তারখানায় বসাইলেন এবং চা খাওয়াইলেন। পরে তথাকার এক পাণ্ডাকে খবর পাঠাইলেন। পাণ্ডার নাম আন্নাসাহেব—বুড়া লোক। মুখে মাত্র সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে আসিলেন। তাঁর বলা বেশি দূরে নয়— জ্ঞানেশ্বরের সমাধি মন্দিরের সামনেই। আমাদের সঙ্গে করিয়া তাঁর বাসায় লইয়া গেলেন।

পাণ্ডা তাঁর সব চেয়ে ভাল ঘরটিতে লইয়া সিল্ক মৃগচর্মের উপর আমাদের বসাইলেন। ঘরের দেওয়ালে যাঁর দাতারতনের প্রতিমূর্তি শোভা পাইতেছে দেখা গেল। হিন্দুমহাসভার মত এমন অখ্যাত ছোট পল্লীতেও আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে দেখিয়া আনন্দ হইল।

জিনিষপত্র রাখিয়া আমরা ইন্দ্রায়ণী নদীতে স্নান করিতে গেলাম। বহুদিন নদীতে নামিয়া অবগাহন-স্নান করা হয় নাই। খুব ভাল লাগিল। নদীতে জল অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু আমাদের আনন্দের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সারিয়া পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া আমরা জ্ঞানেশ্বরের সমাধি দেখিতে বাহির হইলাম। সকল তীর্থ স্থানের মত এখানেও ফুল, ফুল, প্রসাদ প্রভৃতি বিক্রয়ের দোকান আছে—অন্য তীর্থস্থানের মত ভিক্ষুকের উপদ্রবও বেশ, পয়সা না পাইলে কাপড় ধরিয়া টানে। একশত বৎসর পূর্বে জ্ঞানেশ্বরের এই সমাধি নিতান্ত ছোট ছিল—এখন অবশ্য ভক্তদের আনুকূল্যে চারিপাশে বোতালা বাড়ী, নাটমন্দির, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ

জ্ঞানেশ্বরের সমাধি মন্দিরের একাংশ—আলান্দি

প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। খিল্ল বা বিষ্ণুর মন্দিরও পাশেই—গণপতি, মারুতি প্রভৃতি দেবতাদেরও অভাব নাই। আসল সমাধিস্থান অবশ্য নীচে—উপরে জ্ঞানেশ্বরের মূর্তি রাখা হইয়াছে। সমাধি পিরামিডের ধরণ—অর্থাৎ হিন্দু স্থপতিশিল্পের (architecture) নিদর্শন।

কালক্রমে আলান্দিতে অন্যান্য সন্ত এবং সাধকদের স্মৃতিরক্ষে মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে নৃসিংহ সরস্বতীর মন্দির সব চেয়ে বড়। জ্ঞানেশ্বরের সমাধি মন্দিরের একটু দূরে—ইন্দ্রায়ণী নদীর ধারে। এই সাধু বেশী বয়সে দেহত্যাগ করেন—তাঁহার একখানি তৈলচিত্র

বিলম্বিত দেখিলাম। আর একটি মন্দিরে "খোরা কুম্ভারের" মূর্তি দেখিলাম। "কুম্ভার" অর্থাৎ "কুম্ভকার"—ইনি জাতিতে কুম্ভকার

নামদেবের সমাধি মন্দির—আলান্দি

ছিলেন। কথিত আছে ইনি যখন ভগবানের নাম জপ করিতেন তখন বাহিরের জ্ঞান একরকম থাকিত না। এজন্য হাত পা কাজ করিয়া

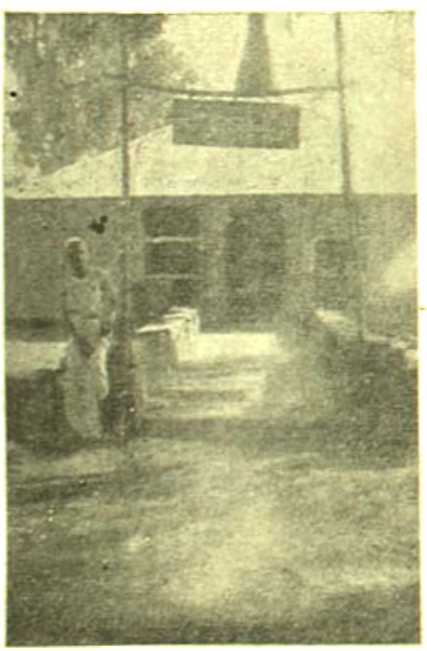

খোরা কুম্ভকারের মন্দির—আলান্দি

যাইত যাত্র। একদিন ঐ ভাবে কাজ করার সময় নিজের শিশু সন্তান কুম্ভকারের চোখার নীচে পড়িয়া গিয়াছে জানিতে পারেন নাই। ফলে শিশুটি ঐ ভাবে পিষ্ট হইয়া মারা যায়।

আলান্দিতে বেড়াইবার বর্ষশালা আছে শুনিলাম। কার্ত্তিকের একাদশীর মেলার সময় সবগুলি ধর্মশালা নাকি তীর্থযাত্রীর ভীড়ে পূর্ণ হইয়া যায়। অধিকন্তু তাহাতেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় চন্দ্রাবতী নদীর উত্তর তীরে বড় বড় বটগাছের নীচে অসংখ্য যাত্রী ছাউনী করিয়া থাকে এবং সেখানেই রান্না খাওয়া করিয়া থাকে। উত্তর ভারতে যেমন হিমালয়ের অন্তরদেশে কালী কম্বলিওয়ালীর চটি সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যেও সেই রকম গাড়গে মহারাজ বা এই রকম আরো দুই চারিজন সাধু মহাত্মার উদ্যমে সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে অনেক ধর্মশালা নির্মিত হইয়াছে। আলান্দি গ্রামখানি ছোট—লোকসংখ্যা আড়াই হাজার। তবে কয়েক ক্রোশ পরিধির মধ্যে আরো কয়েকখানি গ্রাম আছে। আলান্দিতে মিউনিসিপ্যালিটি আছে—তাহারই পরিচালিত ঐ ডাক্তার-খানার উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। আলান্দিতে জলের কল আছে, কিন্তু বিজলী বাতি নাই। সেখানে ডাঃ সা নামক আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল—তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করেন। সরকারী ডাক্তারখানার ডাঃ ফাটক পূর্বে মিলিটারি ডাক্তার ছিলেন—পেন্সান নেওয়ার পর পুনরায় এই চাকরি নিয়াছেন; তাঁহার একছেলে এই যুদ্ধে কমিশন পাইয়া এখন ক্যাপ্টেন হইয়াছেন। ডাঃ ফাটকের প্রাণখোলা হা হা করিয়া উচ্চহাস্য সকলের ভাল লাগিয়াছিল।

* * * * * *

এইবার আলান্দির বিশেষত্ব কোথায় জানাইব। আলান্দিতে যে জ্ঞানেশ্বরের সমাধি-মন্দির তাঁর থেকেই মহারাষ্ট্র সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সূত্রপাত। সেই কারণে জ্ঞানেশ্বরের জীবন-কথা প্রণিধানযোগ্য।

জ্ঞানেশ্বরের প্রধান কীর্তি গীতার টীকা মারাঠী ভাষায়—যার নাম "জ্ঞানেশ্বরী"। ইহার পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় অব্রাহ্মণদের অধিকার ছিল না, সুতরাং গীতা অব্রাহ্মণেরা পড়িতে পাইত না। জ্ঞানেশ্বর মারাঠী ভাষায় এই টীকা লিখিবার পর আপামর সাধারণ সকলে গীতার মহতী বাণীর সন্ধান পায়।

জ্ঞানেশ্বর একজন উচ্চ শ্রেণীর সাধক ছিলেন কিন্তু তবু তাঁর জীবন-কথা বড় করুণ। ইহা মুসলমান রাজত্বেরও পূর্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। তাঁহার পিতার নাম বিঠল পন্থ, মায়ের নাম রুক্মিণী। বিঠল পন্থ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে গুরুর আদেশে তাঁহাকে সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। সেই সময়ে তাঁহার তিন ছেলে এবং এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। সন্ন্যাসীর পুত্রকন্যা বলিয়া এই তিনটি ছেলে এবং একটি মেয়ে আজীবন অনেক কষ্ট পায়। তদানীন্তন বিচারবিধীন গোঁড়া সমাজ তাঁহাদের একঘরে করিয়া রাখে। তাহারা সহর হইতে দূরে কুমার কুমারীর জীবনযাপন করেন—এমন কি কুম্ভকার, কলু যাহাতে তাহাদের কাছে হাঁড়িকুড়ি কিংবা তেল বিক্রয় না করে তাহার ব্যবস্থা করা হইত।

বিঠল পন্থের প্রথম পুত্র নিবৃত্তিনাথ ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানেশ্বর ১২৭১ খৃষ্টাব্দে, তৃতীয় পুত্র সোপানদেব ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে এবং

কন্যা রুক্মাবাই ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানেশ্বর তাঁহার বড় ভাই নিবৃত্তিনাথের কাছে দীক্ষা লইয়াছিলেন।

১২৯০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৮ বৎসর বয়সে জ্ঞানেশ্বর গীতার টীকা লেখেন। জ্ঞানেশ্বরীর রচনাস্থান আমেদনগর জেলার নেওয়াসা (Newasa) নামক গ্রাম। তাঁহার অন্যান্য বইয়ের নাম :—(১) হরিপথ (গানের সংগ্রহ)। (২) সাংদেওপাবাঁশী—ইহা ৩৮টি কবিতার সংগ্রহ (৩) অমৃতানুভব—এই বইখানি বিশ্বনিয়ন্তার সঙ্গে ধ্যানযোগে একত্ব অনুভব করিবার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ। মারাঠী ভাষার ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

দ্বিতীয় বইখানি যা "সাংদেওপাবাঁশী" সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। সাংদেও একজন সাধক ছিলেন—তিনি মনের বাসনাকে মূর্তিমান

জ্ঞানেশ্বরের আজ্ঞাচালিত দেওয়াল—আলান্দি

করিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বেড়াইতেন। নিজের ক্ষমতায় গর্বিত হইয়া তিনি একদিন বাঘে চড়িয়া জ্ঞানেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হন। তখন প্রাতঃকাল—জ্ঞানেশ্বর একটা চাতালের উপর বসিয়া মুখ ধুইতেছিলেন। সাংদেও নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য বলিলেন, দেখুন, আমি যোগশক্তিতে এই জন্তুর পশুকে বশ করিয়াছি, ইহার পিঠে চড়িয়া বেড়াইতেছি। আপনি ইহা পারেন? জ্ঞানেশ্বর বলিলেন, জন্তুর পশুর প্রাণ আছে, তাহাকে বশ করা কঠিন কথা নয়। আমি আজ্ঞা করিলে এই প্রাচীর দেওয়াল আমাকে লইয়া চলিতে সুরু করিবে। সাংদেও বিশ্বাস করিলেন না—তখন জ্ঞানেশ্বরের কথামত সেই দেওয়াল চলিতে আরম্ভ করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া সাংদেও পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং জ্ঞানেশ্বরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তখন গুরু শিষ্যে যে কথোপকথন হইল তাহাই ৩৮টি কবিতায় "সাংদেওপাবাঁশী" নাম দিয়া গ্রথিত হইয়াছে।

আলান্দিতে এই দেওয়ালটি এখনো দেখান হয়—ইহার উপরে জ্ঞানেশ্বরের সকল ভাইয়ের এবং বোনের মর্মরমূর্তি রক্ষিত আছে।

মাত্র ২১ বৎসর বয়সে ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিকী কৃষ্ণ ত্রয়োদশীর দিন জ্ঞানেশ্বর দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে তিনি যোগাসনে উপবেশন করেন এবং সেই উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

ইহার প্রায় তিনশত বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে একনাথের জন্মগ্রহণ হয়। ইনিও একজন উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে জ্ঞানেশ্বরের গলায় একটি গাছের শিকড় জড়াইয়া আছে এবং তাঁর শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি জ্ঞানেশ্বরের সমাধি পুনরায় খনন করান এবং দেখেন যে তাঁহার স্বপ্ন সত্য। তখন সেই গাছের শিকড় কাটিয়া দেওয়া হয়। জ্ঞানেশ্বর একনাথের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া সশরীরে তাঁহাকে দর্শন দেন এবং নিজের রচিত "জ্ঞানেশ্বরী" তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। আদেশ দেন যে এই "জ্ঞানেশ্বরী" তখনকার সময়ের ভাষায় পরিমার্জিত করিয়া আপামর সাধারণ সকলের গোচর করা হউক। বর্তমানে মহারাষ্ট্রে যে জ্ঞানেশ্বরী প্রচলিত তাহা একনাথের কৃত।

হাঁড়িকুড়ির অভাবে রুক্মাবাঈকে কি রকম অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল সে সম্বন্ধেও গল্প আছে। একদিন পাত্রের অভাবে, রুটি সেঁকা

ইন্দ্রায়ণী নদী ও তাহার পুল—আলান্দি

অসম্ভব হইলে রুক্মাবাঈ যেন করিতে থাকেন। ইহাতে জ্ঞানেশ্বর বলিলেন, কোন ভাবনা নাই, আমি ব্যবস্থা করিতেছি। এই বলিয়া তিনি নিজের পিঠ যোগশক্তিবলে এমন উত্তপ্ত করেন যে তাহাতে রুটি সেঁকার কাজ চলিয়া যায়। আলান্দিতে একটি মন্দিরে এই রুটি সেঁকার মর্মরমূর্তি রক্ষিত আছে।

উপরের বর্ণিত গল্পগুলি অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু সেগুলি উল্লেখ করার একমাত্র কৈফিয়ৎ এই যে মহারাষ্ট্রে এগুলি সকলেই—এমন কি ডিগ্রিধারী উকীল, ব্যারিষ্টারেরা পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

'আলান্দি' নামটি 'অলকাবতী' হইতে আসিয়াছে। ইন্দ্রায়ণী নদী ইন্দ্রের কমণ্ডলু হইতে বহির্গত হইয়াছে বলিয়া কথিত। বর্ত্তমান ভূগোলে দেখা যায় যে সে নদী কিছু দূরে গিয়া ভীমা এবং পরে কৃষ্ণা নদীর সঙ্গে মিশিয়া সাগরে পড়িয়াছে।

মহারাষ্ট্রে ওয়ারকারি সম্প্রদায় বলিয়া একটি ধর্ম সম্প্রদায় আছে। ইহারা বাংলা দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুরূপ। বৈষ্ণবের মত ইহারাও কীর্ত্তন করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রে দুইটি স্থান এই সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থক্ষেত্র—একটি আলান্দি, অপরটি পান্ধারপুর (Pandharpur)। এই দুইটি স্থানের মধ্যে একশত মাইলের বেশি ব্যবধান। কৃষ্ণা একাদশীতে আলান্দি এবং শুক্লা একাদশীতে পান্ধারপুরে মেলা বসিয়া থাকে। এখন অনেক লোক আছেন যাঁরা পায়ে হাঁটিয়া এক একাদশীতে আলান্দি এবং অপর একাদশীতে পান্ধারপুরে যোগদান করিয়া থাকেন। জ্ঞানেশ্বরের পাদুকা শোভাযাত্রা করিয়া আলান্দি হইতে পান্ধারপুরে লইয়া যাওয়া হয়—পথিমধ্যে পুণা পড়ে। একদিন পুণায় এক ধর্মশালায় এই পাদুকা রাখা হয়। বৈষ্ণবের মতের পতাকা এই ওয়ারকারি সম্প্রদায়ের জন্ম—মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা বীর শিবাজীরও ঐ পতাকা ছিল। একাদশীর পূর্বে প্রায় দেখা যায় বিরলদন্ত বৃদ্ধ ও পীড়িত বয়স্কারী বৈষ্ণবী জন্ম হাতে করিয়া আলান্দির মেলায় চলিয়াছে।

ইতি

শ্রীসমর সরকার এম-এ, বি-টি, বি-এল্

২

চিরঞ্জীৎ জয়ন্তীর প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়। কারণ যে-অতীত অলীক হয়ে গেছে তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সে চায় না এবং জয়ন্তীর সঙ্গে তার ব্যাপার শ্রীলতাকে বললে শ্রীলতা যে সব বুঝে তাকে রেহাই দেবে এ-ভরসাও তার ছিল না। বরং তার ভয় ছিল জয়ন্তীর কথা শ্রীলতার মনের গতি রুদ্ধ ব্যাহত না করে তাকে সেইদিকেই আরও অগ্রসর করে দেবে। সুতরাং চিরঞ্জীৎ স্থির করে ফেললে যে, তার প্রথম জীবনের ইতিহাস শ্রীলতাকে বিলম্বভাবে না শোনানই উচিত। সেই জন্যই জবাব দিলে শ্রীলতাকে ধোঁয়াটে ধোঁয়া দিয়ে।

'জয়ন্তী আমার ক্লাসে পড়ত, সে-কথা তোমাকে ত সেদিন বলেছি লতু···'

'সে ত শুনেছি···তার বেশী কিছু ত আমাকে বলনি?'

'বেশী বলার কি ছিল?'

'তুমি আমার কাছে এখনও লুকোচ্ছো? পাঁচ বছর আগে তোমার উপহার দেওয়া 'মহুয়া' আর 'শেলী'তে কি লিখেছিল মনে আছে?'

চিরঞ্জীতের এখন স্মরণ হল ওদের কথার মাঝে শ্রীলতা জয়ন্তীর টেবিলের উপর ঐ বই দুখানা নাড়ছিল বটে। ওর কাছে এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝতে পারলে—কেন শ্রীলতার সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। সব দিক বাঁচনার জন্য সে বললে—'ক্লাশের সহপাঠিনীকে কবে কি লিখে দিয়েছিলুম, তাই দেখে তুমি আমাকে ভুল বুঝলে লতু?'

'তুমি যা লিখেছিলে তা' মিথ্যা মনে করব কেন?'

'লতা, তুমি আমায় অবিশ্বাস করছ? আমার দুর্ভাগ্য যে আজ আমার ভালবাসায় তোমার সন্দেহ হচ্ছে।' চিরঞ্জীতের কণ্ঠস্বর দুঃখবিকৃত শোনাল।

শ্রীলতা এতক্ষণে একটু নরম হয়েছিল। সে চিরঞ্জীতের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে এনে রুদ্ধকণ্ঠে বললে—আমার ভয় হয় তোমাকে যদি আমার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নেয়।

'তারী ভীতু তুমি···'

'নাঃ, তোমাকে আমি যেতে দেব না—' চিরঞ্জীতের হাতখানা নিজের মুঠার মধ্যে শক্ত করে শ্রীলতা বললে—'বল, তুমি যাবে না আমাকে ছেড়ে—'

চিরঞ্জীৎ শ্রীলতার কপালে হাত বুলাতে বুলাতে বললে—'কি যে বল তুমি···'

'সত্যি সে আমি সইতে পারব না—'

চিরঞ্জীৎ আদর করে হেসে বললে—'তুমি একটি পাগলী—'

সাময়িকভাবে বাইরে থেকে শ্রীলতা জয়ন্তীর উপর ঈর্ষা দমন করতে পারলেও তার মন তাকে সহজে রেহাই দিলে না। পুঁষে চাপা আগুনের মত সেটা গুমরাতে

লাগল। তার মুহূর্তগুলি এখন আর আগের মত সহজ, সরল, মুক্ত রইল না। পূর্বস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে চলাফেরা করতে চাইলেও মন যেন অজ্ঞাতসারেই স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব বোধ করতে লাগল। সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল জয়ন্তীর সঙ্গে চিরঞ্জীতের সম্পর্কটা সাধারণভাবে নিতে। যদি কোনদিন জয়ন্তীর প্রতি চিরঞ্জীতের দুর্বলতা দেখে থাকে, তাতে আজ তার ক্ষতি কি?

চিরঞ্জীৎ এদিকে শ্রীলতার কাছে ভয়ে ভয়ে রইল। শ্রীলতা কখন ফেটে উঠ্‌বে কে জানে? শ্রীলতা নিজেকে চেপে রাখবার চেষ্টা করলেও ঈর্ষ্যা তার মধ্যে কি-ভাবে কাজ করছে তা' সে টের পেয়েছিল। শ্রীলতাকে সে এতদিন ভালবেসে এসেছে এবং শ্রীলতাও তাকে ভালবেসেছে, কিন্তু শ্রীলতার মনের এই বৃত্তিটির কোন পরিচয় পাবার অবকাশ তার কোনদিন ঘটে নি। এখন সে-পরিচয় পেয়ে সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। কারণ এই জিনিষটি তাদের দীর্ঘ পাঁচ বছরের সুপ্রতিষ্ঠিত শান্তি ক্ষুণ্ণ করতে অগ্রসর হয়েছে। শ্রীলতার ঈর্ষা যদি তার নিজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত, চিরঞ্জীৎকে স্পর্শ না করতো তাহলে চিরঞ্জীৎ এ নিয়ে মাথা ঘামাত না। শ্রীলতা এখন যেন চোখে সন্দেহের অঞ্জন লাগিয়ে তার দিকে চাইতে আরম্ভ করেছিল। চিরঞ্জীৎ ভারী শান্তিপ্রিয় মানুষ। সামান্য জিনিষ নিয়ে তাদের শান্তি নষ্ট হয় সে তা চায় নি। সে স্থির করেছিল শ্রীলতার কাছে সে এখন কোন কিছু বল্‌বে না যাতে জয়ন্তীর কথা উঠ্‌তে পারে। কিন্তু শ্রীলতার মনে জয়ন্তীর একটা রেখা খোদাই হয়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে অতি সাধারণ যে-কোন কথার সঙ্গেই জয়ন্তীর নামটাকে টেনে আন্‌তে প্রস্তুত হত। চিরঞ্জীৎ যে তার কাছে জয়ন্তীর নাম করে না, সে তা লক্ষ্য করেছিল এবং লক্ষ্য করে মনে মনে কিছু যে চাপা আনন্দ উপভোগ করে নি তা' নয়। অবশ্য চিরঞ্জীৎকে ও সে-কথা বল্‌তে ছাড়ে নি।

'তুমি আজকাল খুব চাপা হয়ে যাচ্ছ দেখ্‌ছি।'

'তার মানে?'—বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু নেত্রে বল্‌লে চিরঞ্জীৎ। বুক তার টিপটিপ করতে লাগল—কি বল্‌বে এখনই শ্রীলতা।

'মানে বুঝ্‌তে পারছ না? জয়ন্তী কেমন আছে সে-কথা ত' আমাকে বল নি।'

'ওঃ, এই কথা!' হাঁফ ছেড়ে বল্‌লে চিরঞ্জীৎ—'একটু ভাল।'

'খোঁজ খবর ঠিক তাহলে রাখা হচ্ছে—' ব্যঙ্গভরা শ্রীলতার ভাষা। চিরঞ্জীৎ আন্দাজ করে নিলে বাতাস কোন্ দিকে বইবে। কিছু বলার চেয়ে না বলাই ভাল ভেবে সে রইল নিরুত্তর। ফল হল বিপরীত। চিরঞ্জীতের মৌনতা শ্রীলতাকে মৌন রাখতে পারলে না, উপরন্তু মুখর করে তুল্‌লে। সন্দেহের সাপ তার ফণা বিস্তার করলে—ঈর্ষ্যার বিষে তার নীলা বিবাক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

'মুখে কথা নেই যে। তুমি যে ওখানে যাও আমাকে বল নি ত?'

'বল্‌বার কি আছে এতে। তুমি না গেলেও ভদ্রতার খাতিরেও অন্ততঃ আমার যাওয়া কর্ত্তব্য।'

'আমাকে সঙ্গে নিলে দুজনের জমবে কেন, তাই চুপি চুপি যাওয়া, বুঝেছি। পুরাণ প্রেম আবার ঝালিয়ে নিচ্ছ? বেশ ত আমাকে বিদেয় করে দাও না।'

'ছিঃ, কি যা তা' বল্‌ছ নতু?'

'যা তা কিছুই বলিনি, সত্যি যা তাই বল্‌ছি।···তুমি জয়ন্তীকে ভুল্‌তে পার নি এ-কথা তোমার মুখের উপর স্পষ্ট লেখা রয়েছে—আর্শিটা এনে দেব, মুখখানা দেখবে?'

'নাঃ, জয়ন্তীর উপর তোমার আক্রোশটা দেখ্‌ছি বেড়ে চলেছে। এ যেন বাতাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।'

শ্রীলতা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠ্‌ল—'জয়ন্তীর উপর তোমার দরদ দেখছি বড্ড বেশী। যাও না তার কাছে—থাক গে। এখানে এসেছ কেন? তোমাদের পথ ত বেঁধে দিয়েছে বন্ধনহীন গ্রন্থি, চল্‌তি হাওয়ার পন্থী হয়ে দুজনে চল্‌লেই পার।'

'নতু, তুমি বড্ড ভুল বোঝ। আমি যে শুধু তোমাকেই ভালবাসি এ-কথা কি আমাকে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে হবে? তোমাকে সঙ্গে নিয়েই আমি যে জীবন পথে নেমেছি তা কি তুমি জান না?'

শ্রীলতা কেন উত্তর দিলে না। একটু জোর পেয়ে চিরঞ্জীৎ বলে চল্‌ল—'সত্যি, আমি বুঝ্‌তে পারি না কেন তোমার এই সব মনে হয়। তোমার আমার দীর্ঘদিনের সম্বন্ধের মধ্যে আজ হঠাৎ তুমি কেন যে ফাঁকি আবিষ্কার করলে তা আমি ভেবে উঠ্‌তে পারি না। মাঝে মাঝে

ভাবি আমি কি এতই ঘৃণ্য যে তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না ?'

চিরঞ্জীতের এই কথায় শ্রীলতার মনটা কেমন করে উঠ্‌ল। চিরঞ্জীৎকে সে প্রাণভরে ভালবেসেছে, তাই চিরঞ্জীতের অভিযোগে সে আহত হল। নিজেকে সে বিষত চেষ্টা করে সংযত করে' রাখ্‌তে, কিন্তু যখনই তার মনে হয় তাদের দুজনের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি বুঝি এসে দাঁড়াল তখনই সে উদ্ধত হয়ে উঠে। চিরঞ্জীৎকে কেমন করে' বোঝাবে সে নিজের আশঙ্কা। চিরঞ্জীতের কথার উত্তরে বাষ্পভরা নয়নে বল্‌লে সে—'তোমাকে ভালবাসি বলেই ত' আমার এত কষ্ট। কেন আমাদের মাঝখানে আর একজন এসে দাঁড়াবে ? তোমাকে যদি ভাল না বাস্‌তুম তা হলে তুমি কোথায় কি করছ না করছ সে-বিষয়ে কিছুই বল্‌তুম না। আমার মনের এ-কথাটি কি তুমি বোঝ না ?'

এর পর শ্রীলতা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল। একদিন মাঝে জয়ন্তীকে দেখেও এসেছিল। জয়ন্তীর শরীর ভাল যাচ্ছে না দেখে চিন্তিত হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ অতর্কিত-ভাবে এমন একটা ব্যাপার ঘট্‌ল যাতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌ল।

চিরঞ্জীতের একটা পুরাণ সুটকেশ ছিল। ছাত্রজীবনে এটি সে দাদুর কাছে উপহার পেয়েছিল। বিদেশ ভ্রমণের সময়ে সেটা তার একটা অপরিহার্য উপকরণ ছিল। এরই সামনের দিকে একটা পকেট ছিল। পকেটটা এমন ভাবে তৈরী যে লাইনিংএর সঙ্গে মিশে গেছে—চট্ করে বোঝা যায় না। এইজন্য এই পকেটটা কখনও ব্যবহৃত হত না। সুটকেশ গুছাতে গিয়ে হঠাৎ শ্রীলতা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই পকেটটির ইন্যাস্টিক্‌টা খুলে দেখ্‌লে—ভিতর থেকে একটা সাদা কাগজ উঁকি দিলে। এতদিন এটা তার নজরে পড়ে নি, তাই উৎসুক হয়ে তাড়াতাড়ি সেখানি টেনে বার করে সে পড়তে লাগ্‌ল : জয়ন্তী লিখ্‌ছে চিরঞ্জীৎকে পাঁচ বছর আগে।—চিরঞ্জীৎ কেন তাকে ভুল বুঝে সেদিন চলে গেল—তাদের প্রেমের পূর্ণচ্ছেদ টেনে ?···অসবর্ণ বিয়েতে জয়ন্তী রাজী হয় নি বটে, কিন্তু তাতে প্রেমের মর্যাদা কেন ক্ষুণ্ণ হবে···ইত্যাদি। শেষে অনেক মিনতি করে চিরঞ্জীৎকে অনুরোধ জানিয়েছে একটিবার সে যেন তার সঙ্গে দেখা করে।

চিঠিখানা পড়ে শ্রীলতার রক্ত গরম হয়ে উঠ্‌ল। ইচ্ছা হল চিঠিখানা সে কুচিকুচি করে' ছিঁড়ে ফেলে, কিন্তু চিরঞ্জীৎকে এমন একটা অভাবনীয় সাক্ষ্য দেখাবার জন্য সে সেখানা বার করে রেখে দিলে। সে এখন নিঃসন্দেহ হল চিরঞ্জীৎ যতই তার সঙ্গে জয়ন্তীর প্রেমের কথা গোপন রাখার চেষ্টা করুক্ না কেন, তার ধারণা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু চিরঞ্জীৎ কেন তাকে এ-কথা গোপন করেছিল ? সে ত কোনদিন চিরঞ্জীতের কাছে কিছু গোপন রাখে নি, অকপটে সবই বলেছে। সত্য কথা বলার সৎসাহস তার নেই ? এখনও পর্যন্ত সে অস্বীকার করছে যে তাদের দুজনের মধ্যে ভালবাসা ছিল না।

এই সময়ে ঘরে ঢুক্‌ল চিরঞ্জীৎ। জয়ন্তীর চিঠিখানা তার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্‌লে—'পড়ে দেখ।' শ্রীলতার মূর্তি দেখে চিরঞ্জীৎ ভয় পেয়ে গেল। চিঠিখানিতে দৃষ্টি পড়তেই সে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। আসন্ন দুর্যোগে সে কেমন করে' আত্মরক্ষা করবে মনে মনে চিন্তা করতে লাগ্‌ল।

শ্রীলতা তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বল্‌লে—'এখনও বল্‌বে জয়ন্তীর সঙ্গে তোমার কিছু ছিল না—সহপাঠিনী মাত্র ?' চোখে তার বাঘিনীর দৃষ্টি, মুখের মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক রক্তের তেজে রক্তিম হয়ে উঠেছে, নাসিকা ঘন ঘন স্ফুরিত হচ্ছে।

চিরঞ্জীৎ এর কি উত্তর দেবে ভেবে পেলে না। সে জড়িতস্বরে বল্‌লে—'এ-চিঠি তুমি কোথায় পেলে ?

'তোমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দেবার জন্য এই চিঠি সুটকেশ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে।···আচ্ছা, তুমি কি একটু সত্য বল্‌তে শেখনি—মিথ্যা দিয়েই কি নিজেকে আবৃত করে' রেখেছ ?'

কণ্ঠস্বর নরম রেখেই চিরঞ্জীৎ বল্‌লে—'কি লাভ ছিল বল জয়ন্তীর কথা তোমাকে জানিয়ে। সে ত আমার কাছে মৃত হয়ে গেছে বহুকাল। আমরা প্রেম দিয়ে যে-সংসার রচনা করছিলুম জয়ন্তীর উল্লেখ ত তাকে কোন রকমে সাহায্য করত না—হয় ত আমার প্রতি তোমার বিরূপতা আসতে পারত। সেটা ত কাম্য ছিল না লতু।'

'তাই বলে তুমি সত্য গোপন করে যাবে এবং

এখনও? আমি যখন সমস্তই জেনে ফেলেছি তখন তোমার অস্বীকারোক্তির কি উত্তর দেবে?'

'উত্তর আমার ঐ একই নতু। আমি ত বলেছি যে-অতীত স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেছে তাকে কেন আমি বর্ত্তমানের ক্ষণীণ নিমেষটুকু ধ্বংস করতে দেব? তা'ছাড়া তুমি জয়তীর নামে এমন চটে উঠেছ যে তোমাকে জয়তীর সম্বন্ধে কিছু বলতে সাহস করিনি।'

'তুমি কি ভেবেছিলে আমার মন এতই হীন যে তোমাদের সম্পর্কটাকে ভালভাবে দেখবার মত উদারতা আমার নেই?'

অপ্রস্তুত হয়ে চিরঞ্জীৎ বললে—'না না, আমি তা বলিনি—'

'আর কথা ব'ল না কাপুরুষ—তোমাকে চিনতে আমার আর বাকী নেই। আমার জীবনটাকে তুমি একেবারে ব্যর্থ করে দিলে।'

'তুমি এ-কথা বলছ কেন নতু? আমি কি তোমাকে ভালবাসা দিতে কার্পণ্য করেছি?'

'তুমি যে প্রবঞ্চনার পটু তার জাজ্বল্য প্রমাণ দিয়েছ। নিজে ভালবাসার নিখুঁত অভিনয় করে আমার কাছ থেকে ভালবাসা নিয়েছ প্রবঞ্চনা করে। কোন অজুহাত দেখিয়ে নিজের কপটতাকে ঢাকতে যেও না।'

উত্তরের অপেক্ষা না করে শ্রীলতা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে সতেজ পদক্ষেপে।

দিনকয়েক বাদে একদিন বেড়িয়ে ফিরে এসে শ্রীলতা চিরঞ্জীৎকে বললে—'জয়তীরা চলে গেছে আমাকে বলনি ত'?'

শরীর ভাল না থাকায় সেদিন চিরঞ্জীৎ বেড়াতে যায় নি। জয়তী তার এক পরিচিতার সঙ্গে বেরিয়েছিল। চিরঞ্জীৎ বারান্দায় তার সেই প্রিয় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে উদাস নয়নে সামনের দিকে চেয়েছিল। শ্রীলতার কথায় তার ভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘটল না। আগ্রহহীন স্বরে বললে—'তোমার জেনে কিছু লাভ নেই তাই।'

শ্রীলতা তার মিষ্টতম ভঙ্গীতে বললে—'এবার কলকাতায় ফিরবে না? জয়তী চলে গেছে, এখানে আর মন টিঁকবে কেন? কলকাতায় গিয়ে এবারে ওদের বাড়ীতেই থেক—জামাই আদরে থাকবে।'

ক্লান্ত ভর্ৎসনার স্বরে চিরঞ্জীৎ বললে—'ছিঃ নতু, অমন করে বল না—'

ফেটে পড়ল শ্রীলতা—'কেন গায়ে লাগছে? যদি লেগে থাকে, যাও না জয়তীর কাছে—'

'জয়তী আমাদের নাগালের বাইরে গেছে।'

'তোমার জয়তী তোমার নাগালের বাইরে কি রকম?'

'জয়তী আর পৃথিবীতে নেই, কাল সকালে সে চলে গেছে—তুমি কি বল আমাকেও সেখানে যেতে?'

হাত দিয়ে চিরঞ্জীতের মুখ চাপা দিয়ে অনুতপ্তকণ্ঠে বললে শ্রীলতা—'আমাকে ক্ষমা কর তুমি—আমি না জেনে তোমায় ও-কথা বলেছি।...বল, আমাকে ক্ষমা করলে?' শ্রীলতার বড় বড় জলভরা চোখ দুটি হতে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

চিরঞ্জীৎ শ্রীলতাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

আজাদ-হিন্দ-সরকার

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

এখন যে গল্পটি আমি বলিব, আমি জানি না অপর কেহ স্থানান্তরে—ক্ষেত্রান্তরে—অথবা পত্রান্তরে বলিয়াছেন কি-না! আমার সূত্র নিঃসন্দেহে যদি না নির্ভরযোগ্য হইত, তাহা হইলে তাহার উপরে সৌধ নির্ম্মাণের উদ্যোগ আমি করিতাম না। আর যদি এমনও হয় যে এই কাহিনী অন্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেই বা দোষ কি। কত অসত্য, অমূলক, অলীক কাহিনী লোকের মুখে মুখে—যুগে—যুগে—শতাব্দীতে শতাব্দীতে সত্য বলিয়া বাজারে চলিয়া গেল, আর একটি সত্য ঘটনা—গৌরবময় কাহিনী ব্যক্তি-বিশেষ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্বসংরক্ষিত হইবে, সেই বা কেমন কথা গা?

পরম বিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিদ, সর্ব্বকৃৎ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান বিরোধী ছিলেন। বিবিধমত উপায়ে বিরোধ নিরোধের জন্য

প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। আত্মীয়নিগ্রহ নিবারণকল্পে নিজ মান, মর্য্যাদা, জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়াও যখন দেখিলেন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল, তখন কোন পক্ষাবলম্বন না করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিয়া পৃথিবীতে যে মহাদর্শ স্থাপিত করিয়াছিলেন, কথকঠাকুর ও ঠাকরুণদিদিগণের কল্যাণে সে কথা পৃথিবীর বড় কেহ জানে না। জানা উচিত ছিল, জানিলে উপকার হইত; কিন্তু দুঃখ এই যে, জানে না। বরং জানে, তিনিই যত নষ্টের গুরু ঠাকুর; জাতিবিরোধ ও মহাযুদ্ধ তাঁহার প্ররোচনাতেই ঘটিয়াছিল। আরও জানে, তিনি বাল্যে মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; যৌবনে যুবতী গোপাঙ্গনাগণের বসন চুরি করিয়া মানসে কাম চরিতার্থ করিতেন; পরনারী—তাহাও আবার একটি দু'টি নহে, আমেরিকান শাস্ত্রিদিগের মত পাইকারী দরে—পরনারী সম্ভোগলালসায় 'লেকের ধারে' চন্দ্রমাশালিনী নিশীথে, কদম্বের মূলে রাসলীলার আসর জমাইতেন। প্রচারের কি বিচিত্র মহামহিমা! ক্লেরিওনেট্ অথবা পিকলুআতীয় কোনও যন্ত্রীতে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সেই বাঁশী হস্তে তিনি গৃহস্থ বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং কোকিল যেমন কুহরবে প্রেমিক-প্রেমিকা চিত্ত আনচান করিয়া দেয়, বংশীধ্বনি করিয়া এই ভদ্রলোকটিও তাহাই করিতেন। তাহাতেও উদ্দেশ্য সফল না হইলে মার্কিণ মহাবীরগণের ন্যায় কণ্ট্রাক্টর বা সাপ্লায়ার নিয়োজিত করিতেন। কণ্ট্রাক্টরদিগের মধ্যে কুব্জা প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে সিদ্ধবাক্ কথক ঠাকুর ও ঠাকরুণদিদিগণ বংশীধ্বনির প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনেও বিরত নহেন। 'মধুর মধুর বংশী বাজে, সেই ত বৃন্দাবন'—যেমন বংশী বাজিল—বনমাঝে কি মনোমাঝে কে-জানে, অমনি শ্রীকৃষ্ণের নদীরূপা মহিষী (বাপ্!) কালিন্দী যমুনা উজান বহিল; গোপাঙ্গনাগণ গৃহ-সংসার, পতি-পুত্র, শাশুড়ী-ননদ, মায় জলসা-কুটীলা পর্য্যন্ত, ফেলিয়া-ছেলিয়া কাহারও বা চোখে ধূলি বালি দিয়া, তনুমনঃধন, জীবন-যৌবন অর্থাৎ সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে ছুটিল। বংশীবাদকও তাহাই চাহেন; তাহাই অভিলাষ।

"কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্ণাৎ তন্বী তাম্বূল-চর্ব্বিতম্
একাতদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্দধাৎ।"

আমার দুঃখ এই যে ইহার সুষ্ঠু বঙ্গানুবাদ আমার সাধ্যাতীত। আহা, কি অপরূপ চরিত্র চিত্রণ! ধন্য কথক ঠাকুর, তুমিই ধন্য, কি ছবিই গাঁথিয়া দিয়াছ।

তা যাক্ সে কথা। সুভাষ আই-সি-এস-স্বর্ণ সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন (ভালই করিয়াছিলেন) সকলেই জানেন; কিন্তু কেন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যক্ষ কারণ ছিল কি-না, থাকিলেও তাহা কি, অনেকে তাহা না জানিতেও পারেন এবং প্রচারের কল্যাণে বা কৌশলে ভগবান ভূত হইতেও পারেন। তাই সে কথাটি আমাকে এখন বলিতেই হইবে। সেই কথাটি "প্রত্যক্ষ কারণও" বটে, বিদ্বেষ-বিষ-বৃক্ষের বীজ বপনও বটে! ইচ্ছা ছিল, চিঠিখানি প্রতিলিপি করিয়া মুদ্রিত করি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পত্রলিখিত কাগজখণ্ড বর্ত্তমানে লজ্জাবতী লতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কাগজের মত নির্জীব পদার্থেরও এমন স্পর্শকাতরতা দেখিতেছি যে তাহার অঙ্গস্পর্শে সঙ্কোচ অনতিক্রম্য হইয়া পড়িতেছে। এই চিঠিখানি সেই দিন লেখা—যেদিন একজন ভারতীয় বৃটিশ মহাসাম্রাজ্যের কৌস্তুভরত্নসমাদৃত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে হাসিমুখে ইস্তফা দিয়া আসিয়াছিল। পত্রখানি, কেমব্রিজ, ফিট্‌জ উইলিয়াম হল্ হইতে লিখিত হইয়াছিল।

> "আজ কর্ত্তব্যের আহ্বানে I. C. S. চাকরী ইস্তফা দিয়াছি। আমাদের একটা বই পড়তে হোতো তাতে আছে "Indian Syce is dishonest." আমি ঐ sentence সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করি, কারণ ঐ sentence পড়ে পাঠকের মনে ধারণা হবে যেন ভারতবাসীরা dishonest। কর্তৃপক্ষ next editionএ কথাটা তুলে দেবেন বলেন। আমি বলি যে যখন জিনিষটা অন্যায়, আমি ঐ লাইন পড়িব না। কর্তৃপক্ষ বলেন, না তোমায় পড়তে হবে। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম "আমি তাহলে চাকুরী ছাড়িয়া দিলাম।"*

* চিঠিখানি প্রকাশের সহায়তা ও অনুমতি দেওয়ার জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুমহাশয়কে লিখিত। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনারম্ভের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত যে কয় ব্যক্তির সহিত সুভাষ অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত ছিলেন, তাঁহার অগ্রজবর শরৎচন্দ্র তন্মধ্যে অন্যতম ও প্রধান। একত্রে পাশাপাশি বাড়ী, এক স্কুলে, এক সঙ্গে, এক ক্লাসে অধ্যয়ন, পরীক্ষায় পাশাপাশি স্থানে অধিকার

পত্রের ভাব ও ভাষা এতই স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও স্বতোস্বচ্ছ যে আমার "মল্লিনাথস্য টীকা" করিবার প্রয়োজনাভাব; কিন্তু ব্যাপারটা যখন হুঁকার জল নহে, তখন একটু বিশদ করিয়া বলিতে দোষই বা কি! ধূমপায়িদের অজানা থাকিতে পারে না যে হুঁকার জল মাত্র দু' দশ ফোটা বেশী হইলেও মুখ কিস্, ফস্ ফস্ করিয়া মুখে জল উঠিতে থাকে। ধূমপানের আনন্দ ব্যাহত হয়।

আই-সি-এস্ পরীক্ষা পাশের পরে হাতে কলমে শিক্ষার (প্র্যাক্‌টিক্যাল ট্রেনিংএর ব্যবস্থা আর কি!) ব্যবস্থা আছে; তাহাতে কিছু কিছু পড়াশুনাও করিতে হয়। সেই ব্যবস্থার মধ্যে একখানি অবশ্যপাঠ্য 'প্রাইমার' গ্রন্থ আছে—গ্রন্থ না বলিয়া গীতা—সিভিল সার্ভিস গীতা বলিলেই বোধ হয় প্রাইমারখানির সম্যক পরিচয় প্রকাশ ও মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে। প্রাইমারের একাংশে ঐ ছত্রটি ছিল —Indian Syce is dishonest. ভারতীয় সহিস অসৎ। সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়া যাহারা বৃটিশের সাম্রাজ্য রক্ষা করিবে, সাম্রাজ্যের স্তম্ভ বলিয়া বিবেচিত হইবে, আকাশে ঈশ্বর, মর্ত্ত্যে সিভিল সার্জাণ্ট—কে অধিক শক্তিমান অনন্তকাল ধরিয়া যে তর্কের মীমাংসা কেহ করিতে পারিবে না, সেই অমিতপ্রতাপশালী, অসীম শক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে তুচ্ছ, নগণ্য, ঘৃণ্য সহিসের কথাটা শুনাইতে হইল কেন? যে সিভিল সার্জাণ্ট জেলার দণ্ডমুণ্ডের একছত্রাধিপতি হইবেন, বিভাগের অবিসম্বাদিত অধীশ্বর হইবেন, চাই কি লাটের সিংহাসনে সমাসীন হইয়া কোটী কোটী মানব-শিশুর রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা হইবেন, তাঁহাকে দশ টাকা বেতনের অধম সহিসের গুণপনা হৃদয়ঙ্গম করাইবার কি কারণ থাকিতে পারে?

কারণ আছে বৈ কি! গুরুতর কারণ আছে। অকারণে কেহ কিছু করে না। কূটনীতিবিশারদ বৃটিশ অকারণে সহিসকে এতখানি প্রাধান্য দেয় নাই। ভারতের ভবিতব্য ভাগ্যদেবতা যদি ভারতবাসীর প্রধান গুণটিই না জানিল, ভারত শাসন সে কিরূপে করিবে? ভাগ্য-নিয়ন্তা ভারতবর্ষে গিয়া দেখিবে, কি সহিস, কি বেহারা, কি বাবুর্চ্চি, কি বা কেরাণীবাবু সকলেই পরম অনুগত, অতীব বিনীত; দেখিবে, সবাই তটস্থ, হুকুম তামিলে তৎপর; 'না' বলিতে জানে না; ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে; প্রভু বলিতে 'প্রাণ করে আন্‌চান'! দেখিয়া শুনিয়া পরম কারুণিক দয়াল যীশুপুত্র যদি বা 'প্রেম করিয়া বসে', তাই এই সতর্কবাণী! সাবধান, অসাধুদের সম্বন্ধে সাবধান। বিশ্বাস করিও না, আস্কারা দিও না; হে সাধু, সাবধান।

কথাটা পাঠকের মনে করাইয়া দেওয়া ভাল। সিভিল সার্ভিসের সৃষ্টিকালে শ্বেতাতিরিক্ত কোন জাতির প্রবেশাধিকার কল্পনারও বহির্ভূত ছিল। কৃষ্ণকায় রেয়োভাটগণ যে এখানেও ভিড় জমাইতে আসিবে সার্ভিসের সৃষ্টিকর্ত্তারা ইহা ভাবিতেও পারিতেন না।

শ্লো-পয়জন ইহাকেই বলে। কত সহজে, কেমন নির্দ্দোষ-নিরপরাধ উপায়ে বিষাইয়া দেওয়া হইল। কোথায়ও একটু খিচ্ রহিল না; কোনস্থানে একটু দাগ পড়িল না; সুচারুভাবে কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। সুভাষচন্দ্র বসু আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ভারতবাসীর চরিত্রের প্রতি এই কটু কটাক্ষ মানিয়া লইতে পারিলেন না। তুমুল তর্ক উপস্থিত হইল। পরীক্ষকগণ তর্কে পরাস্ত হইয়া স্বীকার করিলেন যে ঐ ছত্রটি অসঙ্গত এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণে বাদ দেওয়া হইবে; কিন্তু সুভাষ বসু ধারে কারবারে রাজী নহেন। তিনি যুক্তি দিলেন, যাহা অসঙ্গত তাহা এখনই বিলুপ্ত হইবার যোগ্য। আজ নগদ, কাল ধার!

তা' কি করিয়া হয়? আবার তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইল

ইহাই ছিল বাল্যে ও কৈশোরে একত্বয়ের বিশেষত্ব। পরে সুভাষ I. C. S. ও চারু B. C. S। তাহার পরে? চারু আজও জেলা জজের আসনে বসিয়া কাহাকেও জেল, কাহাকেও বা ফাঁসী দিতেছেন; ঘর সংসার করিয়া আমাদেরই মত—অথবা (কিম্বা না-হয়) একটু উঁচুতে উঠিয়া দশের এক হইয়া আছেন; আর সুভাষ? ভারতাকাশে শত সূর্য্যের কিরণ বিকীর্ণ করিয়া সুভাষ-ভাস্কর কোথায় অস্তর্হিত হইয়াছে কে জানে! কিন্তু আকাশ এখনও আছে এবং আছে; বাতাস অম্লান; জনগণমন উদ্বেল, উদ্ভাসিত। সুভাষের সুবাসে ভরা। সুভাষের প্রথম জীবনে চারু ছাড়া আরও দুইজনের সান্নিধ্যের সংবাদ পাওয়া যায়। জগন্নাথ দাস চৌধুরী ও হেমন্তকুমার সরকার। জগন্নাথ উড়িষ্যাপ্রদেশের এক জমীদারবংশসম্ভূত উড়িয়া বালক; আর নদীয়ার চাঁদ হেমন্ত কংগ্রেসে আসিয়া সারাজীবন কারাবাস করিতেছে। "চালচিত্রে" অধ্যায়ে আমি তাহাদের কথা বিশদভাবে বলিব।—লেখক।

এবং তর্কের অবসানে সুভাষচন্দ্রকে সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দিয়া আসিয়া ঐ চিঠি লিখিতে হইল। আই-সি-এস্ নাটোর উজ্জ্বল দৃশ্যের যবনিকা উঠিতে না উঠিতে সীনের দড়ি ছিঁড়িল। যবনিকা পতন হইল। বোধনে বিসর্জ্জন।

তা হোক। কিন্তু বৃটিশের দুরভিসন্ধিমূলক প্রচার-কার্য্যের বিরুদ্ধে যে কঠোর মনোভাব দৃষ্টীভূত হইল, তাহা হ্রাস না পাইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। তাহারও কারণ স্পষ্ট এবং বহু।

ইতিহাস সত্যকথা কদাচিৎ বলে। সত্য গোপন ও সত্য বিকৃত করিবার অসামান্য নৈপুণ্য ইতিহাসের আছে। শুধু কি তাহাই? ক্রীতদাসী যেমন প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বস্ব—নারীত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়, বিজয়ীর পক্ষে নির্লজ্জ স্তাবকতা করিতে নির্লজ্জ ইতিহাসের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। ভারতে বৃটিশের দান অশেষ ও অসংখ্য, ইহাই আমরা শুনি; পৃথিবীতে এই ঢকাই নিনাদিত। কিন্তু বৃটিশের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূচনা যে ভারত বিজয়ের পরবর্ত্তী কালেই ঘটিয়াছে, এই সত্য যতই অরুচিকর হোক, গোপন করিবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সাবানের বিজ্ঞাপনের ছবিতে দেখা যায় "কি ছিলাম" আর "কি হয়েছি"। ভারত অধিকারের পূর্ব্বে বৃটিশের অবস্থা ও ভারত অধিকারের পরে গ্রেট বৃটেনের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে সেই আঙুল ফুলিয়া কলাগাছের উপমা সুপ্রয়োগের বাসনাই প্রবল হইবে। নদীর এক কূল ভাঙ্গে, অপর কূল গড়িয়া উঠে—এই উপমাও সর্ব্বজনবিদিত। ভারতের যেদিন হইতে অবনতি, সেইদিন—সেইক্ষণ হইতে বৃটিশের উন্নতি। ভারত যত জীর্ণ, যত শীর্ণ, বৃটেন ততই শোভায় সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ। বিয়ের জল বলিয়া একটা যেয়েলি কথা চলিত আছে। কথাটার গূঢ়ার্থ যাহাই হোক, বঙ্গগৃহে বিনা সঙ্কোচে ও অবাধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃটিশের সৌভাগ্যবশে ভারতের সঙ্গে যে শুভদিনে সুতহিবুকযোগে গাঁটছড়া বাঁধিতে পারিয়াছিল, তাহার পরমুহূর্ত্ত হইতেই "বিয়ের জলে" তাহার রূপ, তাহার শ্রী, তাহার বুদ্ধি, তাহার বিদ্যা, ধন, মান, মর্য্যাদা ভারে ভারে, শতধারে ঝরিবার বারিষৎ হইয়াছিল। পাঠিকারাণীর বিদ্রূপে হাস্যপুরিত বিদ্যুৎ খেলিতেছে দেখিতেছি। প্রশ্নগুলি এই—কে বা বর, কে বা ক'নে! বিবাহ হইল কোন্ মতে? দৈব? অসুর? পৈশাচ? হায় রে, সেই ইতিহাস কেহ সহজ ও সরল ভাষায় লিখে না কেন? বৃটিশের ধনৈশ্বর্য্য, অস্ত্রতেজী দণ্ডধর্ম্ম, অতুল্য রাজনীতিজ্ঞান, পৃথিবীর খবর-দারীর মূলে যে এই ভারতবর্ষ নামক পরশ পাথরখণ্ড—এই অখণ্ডনীয় সত্য পৃথিবীময় সুপ্রচারিত হয় না কেন! অবশ্য জানে সবাই, শুনে সবাই, দেখেও সবাই; তথাপি সুপ্রচারের প্রয়োজন আছে। আর্কফলার গাঁদাফুলবদ্ধ কথকঠাকুর হইতে থিয়েটারে সিনেমায় বৃটেনের "সেইদিন" আর "এইদিন" কথিত, অঙ্কিত, চিত্রিত ও প্রতিফলিত করিতে উদ্যোগী হইতে বিরত কেন, অনেক সময়ে আমি তাই ভাবি!

১৯৪৫ সালে ভারতবর্ষে আবহাওয়া যখন অনুকূল, নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর অনুকরণে তরুণ ভারত যখন কদমে কদমে অগ্রসর হইতেছে, তখন বৃটিশের নৌ-বাহিনী, সৈন্য-বাহিনী, অস্ত্রশালায় বিদ্রোহ ঘটে। কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, মাদ্রাজ—এক সঙ্গে বৃটিশ বিনষ্ট হোক রবে নিনাদিত। সহরের রাজপথে রক্তের নদী বহিয়া যাইতেছে; তরুণ ভারত রক্তস্নান করিয়া উল্লাসে মাতিয়াছে; মরণকে আমন্ত্রণ দিয়া আনিতে চাহিতেছে; খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়াছে, বায়ু অনুকূল, দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত অগ্নি বিসর্পিত হইবার উপক্রম। নাড়ীজ্ঞানে বৃটিশ আনাড়ী নহে। ভারতের চির অচঞ্চল মানুষ চঞ্চল; বায়ু চঞ্চল, বৃক্ষিরা জড় প্রকৃতিও চঞ্চল; ভারতে পুলিস চঞ্চল; কারখানার কর্ম্মী চঞ্চল; চির অনুগত পদানত ওর্ধাও চঞ্চল। ১৮৫৭র স্মৃতি চিরজাগ্রত। দন্তভরে, হাস্য সহকারে অবহেলা করিবার সাহস বৃটিশের আর হইল না। বিক্ষোভের তত্ত্ব স্বীকার করিল।

কালের কি বিচিত্র গতি। ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষ বৃটিশকে কুইট ইণ্ডিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছিল। মহাপাপ করিয়াছিল। ভারতবর্ষকে মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। পদপাদের অভিধানে শস্যক্ষেত্রের যে দশা ঘটে, বৃটিশের পাশবপ্রবৃত্তির অভিধানে ভারতের সেই দশাই ঘটিয়াছিল। বিহারের আইন সভার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া প্রবীণ সদস্য রামবিনোদ যেদিন সে কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন, আইন সভার যদি চক্ষু থাকিত, চক্ষুর জলে সে'ও ভাসিয়া

যাইত। গুলী করিয়া মনে হইয়াছে যথেষ্ট হয় নাই; বিদ্রোহীর গৃহ অগ্নিদগ্ধ করিয়া মনে হইয়াছে, এমন বেশী কি হইল? ডিনামাইট দিয়া বস্তীর মৃত্তিকা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে। ১৯৪৫ সালে বৃটিশ পশু ও বৃটিশ মনুষ্যের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। বৃটিশ পশু নভেম্বর মাসের একুশে কলিকাতার ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে রক্তের নদী প্রবাহিত করিল; ২২এ নভেম্বর বৃটিশ-মনুষ্য লালদীঘির পথ মুক্ত করিয়া দিল। নেতাজীর আই-এন্-এদের কোর্ট মার্শালে ক্ষমা নাই বিঘোষিত করিয়াও মামলা প্রত্যাহার করিল। বৃটিশ-পশু লাহোরে ও দিল্লীতে নাৎসী অনুকরণে বেল্‌সেন ক্যাম্প বসাইয়াছিল, বিদ্রোহীদের কামানের মুখে স্থাপিত করিয়া অনুপরমাণুতে পরিণত করিতেও পারিত, তাহা না করিয়া বৃটিশ-মনুষ্য বিদ্রোহের কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। সামরিক ইতিহাস অন্বেষণ করিলে বৃটিশের অন্তর্দ্বন্দ্বের বহু পরিচয় প্রত্যক্ষ করা যাইবে।

বোম্বাইয়ের নাবিক বিদ্রোহের পরে একটা তদন্ত কমিটি বসিয়াছিল। বসিয়াছিল না বলিয়া, বসাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল বলাই বোধ হয় সঙ্গত হইবে। তদন্তের বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে না দেওয়াই বোধ করি ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেইচ্ছাও পূর্ণ হইল না। তদন্তে প্রকাশ পাইল, নোঙরের একই দড়ি ভারতের কালা আদমী কালা হাতেও টানে, শ্বেতদ্বীপের শ্বেত হস্তও টানে। দড়ী এক, কাজ এক, উদ্দেশ্য এক—কিন্তু ভাতের এমনই বিধান যে কালো যে বেতন পায়, শ্বেত পায় আটগুণ, কখনও দশ গুণ অধিক। জাহাজের একই চাকা, কৃষ্ণ হস্তে ঘুরিলে যে মর্য্যাদা, শ্বেত হস্তধৃত হইলে মর্য্যাদার আসমান জমিন কারাক। আরও কথা আছে। কালারা আসলে কম পাইলে কি হয়, ফাউ যাহা পায় তাহার যে তুলনা হয় না। পল্লীগ্রামে একটা কথা আছে, ঘরে কি করে—পীলের মেরে ঘেয়, ইহাও তাহাই। ফাউ যাহা প্রাপ্তব্য ঘটে, তাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি ত হয়ই, গর্ব্ব-দম্ভ, অপচার, অতিসার, এ সকলও নিত্য-নৈমিত্তিকের অন্তর্ভুক্ত। রাশনাম, পিতৃমাতৃনাম, জুতা, লাথি—অঙ্গের ভূষণ; "উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী" সম উঠিতে গোরু, বসিতে শূকর! এই গূঢ় বৃত্তান্ত ১৯৪৫-৪৬এ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইবার পরে সকলে জানিতে পারিল বটে; কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালেই ব্যাভিচারের সুরু, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই! ঝকঝকে তাঁবু, বিরাট বিশাল জাহাজ, তকতকে পোষাক, চকচকে বোতাম, গালভরা পদ-পদবীর অন্তরালে পৈশাচিক বীভৎসতা ততদিন চলিয়াছে যতদিন ভারতবর্ষ বৃটিশের দাসত্ব-শৃঙ্খল সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছে। জালিওয়ানওয়াবাগে নাগ্‌স কামানের মুখে গো-সাপের মত বুকে হাঁটিয়াছে; কুইট ইণ্ডিয়ার প্রায়শ্চিত্ত করিতে ধনপ্রাণ দিয়াছে; নারীর মান ইজ্জত লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়াছে, শ্মশানোপরি পিশাচের অট্টহাস্য শ্রবণ করিয়াছে। ধমনীর শীতল শোণিত উষ্ণ হইয়াছে, শিরায় শিরায় খরস্রোত বহিয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষ অবিচলিত হিমালয়ের মত অচল অটল গাম্ভীর্য্যভরে সাগরের পথে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অহিংসকণ্ঠে আজও বলিতেছে, কুইট ইণ্ডিয়া! ভারত ছাড়।

সুভাষ এই অচল অটল অতিবৃদ্ধ হিমালয়ের উপর দিয়া প্রভঞ্জন বহাইয়া দিয়াছে। তাহার হিংসাতপ্ত উত্তেজনা-প্রবাহ ভারতবর্ষকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। বৃটিশ-বিদ্বেষভরে সুভাষচন্দ্র বৃটিশের শক্তিমত্তার পীঠস্থান দিল্লীর লালকেল্লা অধিকার করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই পাঁচশত বৎসরের পুরাতন জীর্ণ কেল্লাই আজ ভারতবর্ষের মানস-নেত্রের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। সেই লালকেল্লার অভ্যন্তরে বিরাজিত বৃটিশত্বের ভিত্তি কাঁপিয়া গিয়াছে। আধিকার জয়হিন্দ ধ্বনিতে লালকেল্লার পাথর কাঁপে; পাথরের সঙ্গে বৃটিশত্ব কাঁপে।

বন্দেমাতরম্

জয়হিন্দ

কঃ পন্থা

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

রসিক এবং রসজ্ঞ পাঠকের নিকট মানুষের ইতিহাস বিচিত্র পুষ্পে গ্রথিত মাল্যের মতই মনোমুগ্ধকর। যুগে যুগে কি করিয়া, কত না দ্বন্দ্ব, কত না উত্থান পতনের মধ্য দিয়া মানব সভ্যতা নব হইতে নবতররূপ লাভ করিয়াছে। কি করিয়া, কি কি কারণের সমাবেশে সভ্যতার নব নব পরিণতি ঘটিয়াছে, আর তাহারই ফলে যে বার বার সংঘটিত হইয়াছে ইতিহাসের অভিনব রূপায়ন, তাহার বিচিত্র কাহিনী ইতিহাস-রসিকের মনে গভীর রেখাপাত না করিয়া পারে না।

বহু বিবর্তনের এবং পরিবর্তনের ভিতর দিয়া বিংশ শতাব্দীতে মানব সমাজ এবং সংস্কৃতি এক নূতন যুগ-সন্ধিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে—ইতিহাসের ধারা কোন্ খাতে বহিবে? সে কি পুরাতন এবং পরীক্ষিত পুঁজিবাদের গতানুগতিক পথ অনুসরণ করিবে, না কার্ল মার্কসের নির্দ্দিষ্ট সাম্যবাদের পথে চলিবে? তাহার পক্ষে কোন্ পথ শ্রেয়ঃ?

সমস্যাটি বড়ই জটিল। সমাধান সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। পুঁজিবাদ আর সাম্যবাদ সম্বন্ধে গোড়াতেই দুই একটি কথা বলিয়া নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে কৃষিযুগের (আরম্ভ ১০০০০ বৎসর পূর্ব্বে) সর্ব্বপ্রথম পুঁজিবাদের গোড়া পত্তন হয়। তাহার পর ক্রমশঃ রূপ বদ্‌লাইতে বদ্‌লাইতে ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে অগণন শ্রমজীবীর প্রাণপাত পরিশ্রমে উৎপন্ন উপকরণ মুখ্যতঃ মুষ্টিমেয় পরিশ্রমজীবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে নিয়োজিত হয়। পুঁজিবাদী নীতি অনুসারে উৎপাদনের উপায় (means of production) ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি। উৎপাদন ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ও ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য উৎপাদন পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থা মানুষকে মানুষের পর করিয়া দিয়াছে। আর ইহারই ফলে আসিয়াছে শ্রেণী এবং সমাজ বৈষম্য, শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ এবং আন্তর্জাতিক বাদ বিসম্বাদ ও যুদ্ধ—আর তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্গতি। বলিবার অনেক কথাই ছিল কিন্তু রহিয়া গেল।

এই পুঁজিবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ। কার্ল মার্কস (Karl-Marx—১৮১৮-৮৩) ইহার প্রবর্ত্তক। মার্কসের মতে বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থের সঙ্ঘাতের ফলে এক অভিনব সমন্বয়ের অভ্যুদয় হয়। প্রকৃতির মত সমাজের বুকেও আছে চিরন্তনদ্বন্দ্ব! বিরোধের নব নব সূত্র মানুষের সমস্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়া অনুস্যূত হইয়া আছে। তাহা আছে বলিয়াই তাহার সভ্যতা সংস্কৃতি সংঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, নূতন হয়, উচ্চতর স্তরে উঠিয়া যায়—আর এই উচ্চতর স্তরে উঠিবার পথই হইল সঙ্কট এবং বিপ্লবের পথ। ইহাই তাহার ইতিহাসের সাক্ষ্য (সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার)। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "মানুষের ইতিহাসেই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় কাঁপতালের সুরে" (শেষের কবিতা)।

ইতিহাসের এই অভিনব ব্যাখ্যা অনুসারে বাস্তব অবস্থা আর আর্থিক ব্যবস্থাই মানব সভ্যতার গতি এবং প্রকৃতির একমাত্র নিয়ামক। সমাজ কিরূপ ধারণ করিবে, তাহার অগ্রগতির ধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হইবে প্রধানতঃ নির্ভর করে তাহার আর্থিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর। এই ব্যবস্থাই মুখ্যতঃ মানুষের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্মীয় সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে। (তুলনীয়—"The mode of production in material life determines the general character of the social, political and spiritual processes of life."—Critique of Political Economy—Marx)।

আর্থিক উৎপাদন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব যাহাদের হাতে থাকে, জনসাধারণ একান্তভাবেই তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। ফলে সমাজ বিত্তবান এবং বিত্তহীন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই দুইয়ের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী বিরোধের ফলে ঘটে শ্রেণীসংগ্রাম। এই শ্রেণী সংগ্রামের ফলেই অভিনব সামাজিক পরিণতি সঙ্ঘটিত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিয়া এই পরিণতি ঘটাইতে হইবে।

দাসত্ব, সামন্ততন্ত্র বা পুঁজিবাদ যে কোন যুগেই হউক না কেন, বিত্তবান সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবে না। কাজেই বিত্তহীন সর্ব্বহারার দলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক রাষ্ট্রিক ক্ষমতা হস্তগত করিতে হইবে। তাহার পর কিছুকালের জন্য অর্থাৎ পুঁজিবাদ হইতে সাম্যবাদে উৎক্রান্তির যুগ-সন্ধিতে চলিবে সর্ব্বহারাদের এক নায়কত্ব (Dictatorship of the proletariat)। একমাত্র এই উপায়েই সমাজ পুঁজিবাদ হইতে সাম্যবাদে উত্তীর্ণ হইবে।

মার্কস আরও বলেন যে উৎপাদনের মূলে আছে শ্রম। অথচ শ্রমিক যাহা উৎপন্ন করে, তাহার অতি নগণ্য একটা অংশ মাত্র সে পায়। পুঁজিদার তাহাকে বঞ্চিত করে।

মার্কসবাদীরা এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া এমন এক যুগ প্রবর্ত্তনের স্বপ্ন দেখেন, যে যুগে শ্রেণী-বৈষম্য অতীতের অপ্রীতিকর স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইবে। পরশ্রমজীবী সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে এবং স্বশ্রমজীবী সম্প্রদায় সর্ব্বময় সামাজিক কর্তৃত্ব পরিচালনা করিবে। উপকরণ উৎপাদন, বণ্টন এবং বিনিময় ব্যবস্থার উপর সমাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। মানুষের পূর্ণবিকাশের পথের সমস্ত কৃত্রিম বাধা অপসারিত হইবে। কেহ কাহারও দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতার সুযোগ নিবে না। প্রত্যেক কার্য্যক্ষম নর এবং নারীকে সামাজিক কল্যাণের জন্য নিজের যোগ্যতানুযায়ী পরিশ্রম করিতে হইবে এবং সমাজ তাহার প্রয়োজন মিটাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে (তুলনীয়—From everyone according to his abilities to everyone according to his needs.)।

এখন প্রশ্ন—মার্কসীয় মতবাদ যুক্তিসহ কিনা এবং মার্কসীয় আদর্শকে কোনদিন বাস্তবে পরিণত করা যাইবে কিনা? অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও খুব কম লোকেই বিশ্বাস করিতেন যে মার্কসীয় আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব। অনেকেই মার্কসীয় মতবাদকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উপহাস করিতেন (তুলনীয়—"It is a creed in which there is much intellectual error, much blindness, social perversity"—Communism by Laski)। কিন্তু উপহাসকারীদের মধ্যেও অনেকেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে সাম্যবাদী ভাবধারা বিস্তার লাভ করিতেছে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের ফলে রুশিয়াতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের একটি প্রধানতম ঘটনা। বহু বৎসর পূর্ব্বে মানব-মৈত্রীর যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন বুদ্ধদেব, ভগবান তথাগত, প্লেটো এবং খৃষ্ট—জীবনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এই তাহার প্রথম প্রয়োগ।

তাহার পর কিঞ্চিদধিক পঞ্চবিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই অল্পকালের ভিতর সোভিয়েট রাষ্ট্র মানুষের দৃষ্টি-ভঙ্গী এবং চিন্তাধারাতে বিপুল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে যে রুশিয়াতে আজিও সাম্যবাদের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। অবশ্য ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহার প্রতিবেশীরা সকলেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সমর্থক। কিন্তু রুশ রাষ্ট্র এবং সমাজ যে সাম্যবাদের বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। একথা সত্য যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মুনাফা আজিও একেবারে লোপ পায় নাই। "From every one according to his abilities, to every one according to his needs." আদর্শ এখনও পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তথাপি এ সত্য অনস্বীকার্য্য যে সোভিয়েট ভূমিতে সমাজ এবং রাষ্ট্র সাম্যবাদী আদর্শের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

রুশিয়াতে বর্ত্তমানে যে রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাকে বলশেভিকবাদ বা লেনিনবাদ—কাহারও কাহারও মতে ষ্ট্যালিনবাদ—নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই ব্যবস্থা একেবারে নিখুঁত নহে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যাহা বলা যাইতে পারে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বলা হইয়াছে।

সোভিয়েট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা প্রধান অভিযোগ এই

যে ইহার ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে গণতন্ত্র বা সর্ব্বহারাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংখ্যালঘু একটা দলের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব (Dictatorship of the determined minority) স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বহারাদের বেনামীতে মুষ্টিমেয় লোক যাবতীয় শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অপঘাত ঘটাইয়াছে। একনায়ক শাসনের প্রধান দোষ এই যে ইহা কোন প্রকার মতানৈক্য সহ্য করে না। অথচ মতানৈক্যের প্রয়োজনীয়তাকে—বিশেষ করিয়া রাজনীতিক ক্ষেত্রে, কোন ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। ওয়েণ্ডেল উইল্কির (Wendell Wilkie) কথায় "The human mind requires contrary expressions on which to test itself" (One World)। শাসক এবং শাসিত উভয়ের পক্ষেই একনায়ক শাসন ব্যবস্থা অমঙ্গলের কারণ। তাহার প্রমাণ নেপোলিয়নের ইতিহাস। কোন এক-নায়ককেই আজ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে দেখা যায় নাই। সোভিয়েট ভূমিতেও কোন দিন এক নায়কত্বের অবসান ত ঘটিবেই না, পক্ষান্তরে ইহা দিনের পর দিন অধিকতর অত্যাচারমূলক হইয়া উঠিবে।

নাগরিকদিগের জীবনকে সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সোভিয়েট রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। শিল্প, সম্পদ, সমবায় নীতিতে পরিচালিত কৃষিকার্য্য, যাবতীয় প্রতিষ্ঠান শ্রমজীবী-সঙ্ঘ ইত্যাদি—কিছুই রাষ্ট্র কর্তৃত্বের বহির্ভূত নয়। রাষ্ট্র জনগণকে—বিশেষ করিয়া তরুণ সম্প্রদায়কে নূতন ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে চায়। কাজেই রুশীয় শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্র-পরিকল্পিত এবং রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং শিক্ষার নামে যে দেশে চলিতেছে প্রচার (তুলনীয়—"people believe what they are told. And we propose to tell them")।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপর একটি প্রধান অভিযোগ এই যে, ইহার নায়কগণের দৃঢ় বিশ্বাস, বিবর্ত্তনের পথে সামাজিক অবিচার দূরীভূত হইবে না। তাহার জন্য হিংসাত্মক বিপ্লব এবং শ্রেণী-সংগ্রাম অপরিহার্য্য।

অভিযোগগুলির সত্যতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও স্বীকার করিতেই হইবে যে সোভিয়েট রুশিয়া রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থ-নীতিক ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি অসাধ্যসাধন করিয়াছে যাহা অন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

মার্কস বলিতেন, "The philosophers have only interpreted the world. It is our business to change it" অর্থাৎ দার্শনিকগণ জগতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু সাম্যবাদীর কাজ হইল ইহার পরিবর্ত্তন সাধন। মার্কসের গ্রন্থাবলী সাম্যবাদীর জীবন-বেদ। লেনিনের গ্রন্থাবলী ইহার সায়নভাষ্য। আর আজ ষ্টালিন তাঁহার নীতি এবং কর্ম্ম দ্বারা এই অভিনব জীবন-বেদের টিকা রচনা করিতেছেন।

বিগত অষ্টবিংশতি বৎসরে রুশিয়াতে এক সম্পূর্ণ অভিনব সংস্কৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংস্কৃতির নাম দেওয়া যাইতে পারে সাম্যবাদী অথবা সোভিয়েট সংস্কৃতি। সাম্যবাদী সংস্কৃতি কি? ১৯১৮ সালে All Russian Congress of Sovietsএ লেনিন ইহার স্বরূপ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বলেন যে, "Formerly all human knowledge, all human talents, laboured only in order to provide some with the benefits of technique and culture and on the other hand, to deprive the others of those things which were most essential-education and self-development. But now all the marvels of technique, all the achievements of culture, will become the general property of the whole people, and from now on, human intelligence and human talent will never again be converted into a means of oppression, a means of exploitation." সোভিয়েট সংস্কৃতি খাঁটি গণ-সংস্কৃতি, গণদেবতা ইহার স্রষ্টা এবং ভোক্তা। প্রাক্-বিপ্লব রুশিয়াতে সংস্কৃতি ছিল কেবল-মাত্র অবসরভোগীসম্প্রদায়ের মানসিক বিলাসের উপকরণ। আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং সংস্কৃতির মহা-মহোৎসব-ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেণীর অবাধ প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

সংস্কৃতির গোড়ার কথা শিক্ষা। শিক্ষাক্ষেত্রে রুশিয়া কি অসাধ্য সাধন করিয়াছে দেখা যাউক। বহু বৎসর

পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে গিয়েছে। যারা মূক ছিল, তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল, তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত হয়েছে" (রুশিয়ার চিঠি)। সোভিয়েট শাসনতন্ত্র নাগরিকগণের শিক্ষালাভের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ১৯১৭ হইতে ১৯৪৪ সালের মধ্যে রাষ্ট্র ৫ লক্ষ নাগরিককে শিক্ষাব্রতী হইবার উপযোগী শিক্ষা দিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ৪ কোটিরও অধিক নিরক্ষর লোক অক্ষর-জ্ঞানলাভ করিয়াছে। বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শিক্ষার জন্য বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরে (১৯৩৬-৪০) সমগ্রদেশে ১০০০০ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যুদ্ধকালেও শিক্ষার অগ্রগতি বিস্তার ব্যাহত হয় নাই। (তুলনীয়—"In the years of the war, when the country is struggling to expedite the final defeat of the Hitlerites, public education in the U. S. S. R is continuing its uninterrupted development and approaching the solution of the task of general compulsory education." Vladimir Potemkin)। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রুশিয়াতে যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের হার ছিল শতকরা ২১·২—১৯২৬ সালে এই হার বাড়িয়া ৪৪ এবং ১৯৩৯এ দাঁড়ায় ৭০। ১৯৪৪ সালের হিসাবে দেখা যায় যে রুশিয়া হইতে নিরক্ষরতা নির্ব্বাসিত হইয়াছে। স্বীকার করিতেই হইবে যে সোভিয়েট ব্যবস্থার এমন একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে যাহাতে ইহা সম্ভব হইয়াছে।

আধুনিক রুশিয়া সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে যে সত্য সবচেয়ে বড় হইয়া চোখে পড়ে তাহা এই যে, অক্টোবর-বিপ্লব মানুষের মনে যে দীপশিখা জ্বালিয়াছে, বিপ্লব নায়কগণের ভুল ভ্রান্তি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাহা নির্ব্বাপিত হইবার নহে। এই দিক হইতে দেখিলে একমাত্র ফরাসী-বিপ্লবের সহিতই অক্টোবর-বিপ্লবের তুলনা চলিতে পারে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ন্যায় ফরাসী বিপ্লবও সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসী-বিপ্লবের নেতাগণ বিশেষ করিয়া জোর দিয়াছিলেন স্বাধীনতার উপর। পক্ষান্তরে রুশীয় বিপ্লবনায়কগণ বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্র এবং সমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা না হইলে মৈত্রী এবং স্বাধীনতা কেবল কথার কথাই থাকিয়া যাইবে।

মানব সভ্যতার উষাকাল হইতেই গণ-স্বার্থ মুষ্টিমেয় বিত্তবানের দ্বারা পদদলিত হইয়া আসিতেছে। রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব চিরদিনই বিত্তবানের কবলিত রহিয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট-ভূমিতে সর্ব্বপ্রথম এই ব্যবস্থার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বিত্তহীনদের উপর সংখ্যালঘু বিত্তবান সম্প্রদায়ের অত্যাচার দূর করিবার একটা যথার্থ প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

বাস্তবক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার সাম্য স্থাপনের প্রয়াস সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্যতম মহৎ কীর্ত্তি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং সমাজ কোন দিনই এই সাম্যকে স্বীকার করে নাই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি রাজনৈতিক অধিকার-সাম্যের নীতি গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অন্য সকল ক্ষেত্রেই সাম্য কেবল কথার কথা থাকিয়া যাইবে। তবে একথা সত্য যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি জীবনের বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পক্ষান্তরে সোভিয়েটতন্ত্র সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিলেও অধিকার সাম্যের আদর্শকে জয়যুক্ত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই এবং করিতেছে না।

রুশ রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একমাত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সোভিয়েট নেতাদের মত ত্যাগব্রতী নহেন। রাষ্ট্রপরিচালকগণের অধিকাংশেরই সততা, শ্রমশীলতা, স্বার্থবিমুখতা এবং কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। ষ্টালিন এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের অতি বড় শত্রুও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে তাঁহাদের সাহস এবং কর্ম্মদক্ষতা অনন্যসাধারণ।

অভিযোগ করা হয় যে রুশ রাষ্ট্র প্রকৃত প্রস্তাবে স্ব-শ্রমজীবী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হইয়া মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়। তর্কের খাতিরে একথা মানিয়া লইলেও সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে বৈধ এবং কুণ্ঠাহীনপ্রভাবযুক্ত এ সত্য অস্বীকার করা চলে না।

সমস্ত দেশেই যে রাজনৈতিক দল শাসন ক্ষমতা পরিচালিত করে, সেই দলের সদস্য এবং সমর্থকগণ নানাপ্রকার বৈধ এবং অবৈধ সুবিধা ভোগ করেন। একমাত্র সোভিয়েট রুশিয়াতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

রাষ্ট্রে উৎপন্ন সকল উপকরণ এখনই সকলে প্রয়োজনানুরূপ পাইবে একথা বলশেভিকগণ বলেন না। তাঁহারা এই কথাটার উপরই জোর দেন যে, রাষ্ট্রে যে উপকরণ উৎপন্ন হইবে তাহাতে সকলেরই অধিকার আছে। তবে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে প্রাপ্য অংশের তারতম্য ঘটিতে বাধ্য। কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে জগতের অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা সোভিয়েট ভূমিতে অধিকার-সাম্য বহুগুণ বেশী।

এই আপেক্ষিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ফলে রুশিয়া শ্রেণী-বিহীন সমাজ স্থাপনের পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। বর্ণ-বৈষম্য, স্ত্রীপুরুষ ভেদ ইত্যাদি সোভিয়েট-ভূমিতে অজ্ঞাত। একই প্রকার পরিশ্রমের জন্য পারিশ্রমিকের হার সমান। যোগ্যতানুসারে সকল নাগরিকের কর্ম্ম-লাভের অধিকার রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রায় ২০০ ন্যাশনালিটির (Nationality) বাস। সাম্রাজ্যবাদশাসিত বহুজাতি-অধ্যুষিত দেশে সকলের অধিকার সমান হয় না। সংখ্যালঘু ন্যাশনালিটীগুলির উন্নতির পথে বহু প্রতিবন্ধক সে সমস্ত দেশে রহিয়াছে। সংখ্যালঘুতাজনিত যে দুর্ব্বলতা, সংখ্যাধিক ন্যাশনালিটিগুলি তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু কি শিক্ষা, কি রাজনীতি, কি সংস্কৃতি, এক কথায় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই সোভিয়েটতন্ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়-গুলির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে, নিপীড়িত এবং শোষিত জাতিসমূহ যে কালে এই অধিকার সাম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কাজেই সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে রুশিয়া একটা সমস্যা এবং বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সোভিয়েট প্রচেষ্টা ইতিহাসের একটি প্রধানতম ঘটনা। সম্পূর্ণ অভিনব আদর্শ এবং উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত সমাজ এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি রুশিয়াতে স্থাপিত হইয়াছে। পরীক্ষা চলিতেছে নূতন নূতন ব্যবস্থার। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে সোভিয়েট রুশিয়া একটা বিরাট "Laboratory of Life"। এই ল্যাবরেটারি হইতে ত্যাগ এবং শৃঙ্খলার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইয়াছে অসাধ্যসাধনকারী অভিনব দুর্ব্বার মানুষের দল।

বিশ্ব-সভ্যতার সঙ্কটময় যুগ-সন্ধিকালে আজ বিশ্বের নিপীড়িত গণ-আত্মার আর্ত্ত প্রশ্ন—শান্তি কোন্ পথে, সুখ কোন্ পথে? পুঁজিবাদ বর্ত্তমান সভ্যতার জনক সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার অন্তরে বিরোধের যে বীজ, যে ক্লেদ রহিয়াছে, তাহারই ফলে সম্পদ-সৌধের ঠিক নীচেই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট। ফলে আসিয়াছে শ্রেণী এবং জাতি বিদ্বেষ, ঘটিয়াছে যুদ্ধের পর যুদ্ধ।

সোভিয়েটবাদ মানুষকে শুনাইয়াছে আশার কথা। "সবার উপরে মানুষ সত্য" এই আদর্শকে সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। J. G. Narany'এর কথায় "U. S. S. R. stands for a new civilization with new ideals, new values, and new principles building up a new man—a man resurrected and rejuvenated"। কাজেই আজ বিশ্বের নিপীড়িত এবং শোষিত সম্প্রদায় ও জাতিগুলি যদি সোভিয়েট রাষ্ট্রকে নবযুগের বার্ত্তাবাহী, অভিনব পথের প্রথম যাত্রী মনে করিয়া তাহারই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তাহাদিগকে দোষ দেওয়া চলে না।

সোভিয়েট ব্যবস্থা এখনও পরীক্ষাধীন রহিয়াছে। ইহা-দ্বারা প্রকৃতই মানব কল্যাণ সাধিত হইবে কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইহার সমর্থকগণ অবশ্য বিশ্বাস করেন যে ইহার ফলে মানবের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন মুক্তি ঘটিবে, আর স্বর্গ কল্পলোক হইতে ভূতলে নামিয়া আসিবে। পক্ষান্তরে ইহার বিরুদ্ধবাদীগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে সোভিয়েট ব্যবস্থা আংশিকভাবে সুফলপ্রসূ হইলেও ইহা দ্বারা পরিপূর্ণ মানব-কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না (তুলনীয়—"I hope that Russia will produce something wonderful. But I must confess that I am doubtful about its being able to bring forth anything really useful. I shall consider it a great success, if, through it, really all wealth goes into the hands of the poor and mental and physical freedom of every person is at the sametime secured; and in that case I will have to revise my concept of 'Ahinsa'."—"গ্রাম উদ্যোগ পত্রিকায়" মহাত্মা গান্ধীর প্রবন্ধ)।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

১৯

অজিত ফিরিয়া আসিলে অপর্ণা তাহাকে এই ক্ষুদ্র রাজপুত্রের কাহিনী বলিয়া হাসিতেছিল। অজিতও উপভোগ করিয়াছিল, তাই প্রশ্ন করিল—কোন ছেলেটি?

—ওই বাড়ীর সেই খোকা। ভেবেছিলুম—কিছুক্ষণ রেখে দেব—কিন্তু বৌটা ভেবে সারা হবে তাই।

অজিত কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—যা হোক্, রাজকন্যা যে রাজপুত্তুরের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় নি সেই আমার ভাগ্য। রাজপুত্তুর যেশব্দ ক'রতেন সত্য, তবে আরএকজনের বিবাহিতা পত্নী হরণ করা হ'ত?

অপর্ণা কহিল—আমি যাবো না শুনে তার বড় বড় চোখ দুটো দেখ্‌তে দেখ্‌তে জলে ভরে উঠ্‌লো, তা দেখ্‌লে সত্যিই মায়া হয়!

—বাব্, বুঝেছি, রাজপুত্তুরের সঙ্গেই যাওয়ার ইচ্ছে, তা যেও। আমার ভাগ্যে যা আছে হবে।

—সত্যিই ওদের বাড়ী গেলে তুমি কিছু মনে ক'রবে না?

—না, মনে ক'রবো কেন?

—আবার রাজকন্যা খুঁজতে এলে, রাজকন্যা রাজপুত্তুরকে ছাড়বে না। কিন্তু রাজার সঙ্গে দেখা হ'লে—

—ও, রাজপুত্তুরের বাবা! আলাপ করে আস্‌বে—কিন্তু রাজপুত্তুর কি আর দরজা খোলা পাবে?

হাস্য-পরিহাসের মাঝে খোকার প্রসঙ্গটা ক্রমেই গুরুত্ব লাভ করিল। খোকাটির ছোট হাত দুইখানি অপর্ণাকে যে এত প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে পারে তাহা সে কখনও ভাবিতে পারে নাই।

বুল বারান্দায় বসিয়া খাইতে খাইতে দুইজনেই খোকাকে অন্বেষণ করিতেছিল, কিন্তু খোকাও তাহার পরিচিত বারান্দার কোনটিতে নাই! কোথায় সে? অপর্ণার একটু ভয়-হইল—কি জানি কি তাহাকে ঠিক ঠিক পৌঁছাইয়া দিতে পারিয়াছে কিনা!

কিছুক্ষণ বাদেই খোকা আসিল, কিন্তু অত্যন্ত বিরস বদনে, হয়ত মা তাহাকে খুব বকিয়াছে—না হয় কিছু উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থাও হইয়াছে। বারান্দায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া উদাস নয়নে কি যেন দেখিতেছে, ওই আকাশের নীল বুকে। মাতা রান্নার জোগাড় করিতেছেন—

কয়েক দিন চলিয়া গেল, কিন্তু রাজপুত্র আসিল না। অপর্ণা কয়েক দিন অপেক্ষা করিতেছিল কিন্তু এখন সে বিশ্বাস করিয়াছে যে খোকার পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য সদর দরজা ভেদ করা সোজা নয়; কিন্তু তবুও সে প্রতীক্ষা করে, ওই খোকা হয়ত একদিন আসিবে—

সেদিন সকালে বসিয়া অপর্ণা ওই খোকাটির বিচিত্র কার্য্যাবলী দেখিতেছিল। দরিদ্র স্বামী বাজার করিয়া নিয়া আসিয়াছে, আফিসের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বধূটি তাড়াতাড়ি মাছ কুটিয়া রান্নার জোগাড় করিতেছে; খোকা সম্ভবতঃ একটি ধাবমান মৎস্যের পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে এবং তারস্বরে চিৎকার করিয়া মাতার উদ্দেশ্যে পলায়নপর মৎস্যের গতিবিধি নির্দ্দেশ করিতেছে—কিন্তু ধরিতে সাহস হইতেছে না।

খোকার কার্য্যাবলী একদিন তাহাকে আনন্দ দিয়াছে, কিন্তু আজ ব্যথিত করিয়া তুলিল। তাহার সন্তানটি বাঁচিয়া থাকিলে এত বড়ই হইত—হয়ত জীবনের মাঝে যে একাকীত্বটা আজ এমন প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা করিত না। অজিতের কোন দোষ নাই, তথাপি তাহার হৃদয়োত্তাপে তাহার হৃদয় উত্তপ্ত হয় না—অস্বস্তিকর একটা শীতলতা মনটাকে যেন ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতেছে—

সেদিন দ্বিপ্রহরেও অপর্ণা শুইয়াছিল কিন্তু কেন যেন ঘুমায় নাই। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর, কোথাও এতটুকু শব্দ নাই, —পাশের বাড়ীটাও নিঝুম। শান্ত দীর্ঘ গাছগুলির মাথা নীল আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মত নিষ্প্রাণ। অপর্ণার হাতের বইখানা অত্যন্ত নীরস বোধ হইতেছিল—পড়ার অযোগ্য।

UNIVERSITY

খুট করিয়া একটু শব্দ হইল। অপর্ণা ফিরিয়া দেখে, খোকা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রেলিংএ রজ্জুবদ্ধ কুকুরটির দিকে ভীতভাবে চাহিয়া আছে। ডাকিবার একটা অদম্য ইচ্ছাকে চাপিয়া অপর্ণা খোকাকে দেখিতে লাগিল—কেমন করিয়া সে তাহার সহিত প্রথম পরিচয় করে।

খোকা ফিরিয়া চাহিয়া জাগরিত রাজকন্যাকে বিছানার উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল—ঘুমন্ত রাজপুরীতে একা রাজকন্যা কেন জাগিয়া থাকিবে? আস্তে আস্তে সে আগাইয়া আসিয়া কহিল—তুমি রাজকন্যা?

—হ্যাঁ, পক্ষীরাজ ঘোড়া নিতে এসেছ? এস—

খোকা অত্যন্ত খুশীর সঙ্গে আর একটু আগাইয়া আসিয়া কহিল—দেবে? যেন অপর্ণার প্রতিশ্রুতিকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নাই।

—তুমি কেমন ক'রে এলে?

খোকা অত্যন্ত উদাসীন ভাবে জবাব দিল—হেঁটে হেঁটে? ঘোড়া কোথায়?

—আছে, ঐ দিকে।

খোকার অঙ্গ আজ যথেষ্ট পরিষ্কার নয়, ইজের ও দেহ সবই ধূলাবলুণ্ঠ—পথে যে একবার অন্ততঃ পতন হইয়াছে এ বিষয়ে সংশয় নাই। অপর্ণা তাহার ইজেরটা এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া বিছানার উপর তুলিয়া লইল। জিজ্ঞাসা করিল—কি নেবে?

—পাখী নেবে?

ঘোড়ার প্রতি আকর্ষণ কমিয়া অকস্মাৎ পক্ষীপ্রীতি বাড়িয়া উঠিয়াছে দেখিয়া অপর্ণা হাসিল। কহিল—কোনটা। খোকা পক্ষীর উচ্চতা দেখাইয়া কহিল—এত বড়।

নীচের সোনা ময়ূরটি যে আজ খোকাকে প্রলুব্ধ করিয়াছে তাহা অপর্ণা বুঝিয়াছিল তাই বলিল—ময়ূর নেবে?

—হে।

—কি ক'রবে?

—চড়বো।

অপর্ণা আবার হাসিল, কহিল—আর কি নেবে?

—রাজকন্যে।

—কি ক'রবে?

—মা'কে দেব।

—আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?

—হুঁ—তুমি রাজকন্যে? জাগরিত এই রাজকন্যাই যে তাহার বাঞ্ছিত ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যা একথা যেন তাহার বিশ্বাস হইতেছে না, তাই বারবার সংশয় প্রকাশ করিতেছে। অপর্ণা মনে মনে কহিল—রাজকন্যা যখন জাগে তখন এমনি করিয়াই সে রাজপুত্রের জীবনে একান্তই অবান্তর হইয়া যায়। রাজপুত্র যেদিন আসে, সেদিন রাজপুত্র হয় সাধারণ মানুষমাত্র। অপর্ণা তাই কহিল—আমাকে নিয়ে যাবে না তা হ'লে?

খোকা তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল—হুঁ। তুমি রাজকন্যে?

—হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে যাবে?

—হুঁ চল। খোকা পালঙ্ক হইতে নামিতে নামিতে কহিল—এসো।

অপর্ণা ঝিকে ডাকিয়া কহিল—এই ছাখ্, সেই খোকাটি আবার এসেছে। সেদিন ওর মাকে কি বলে ছিলি?—ও যে আবার এসেছে।

ঝি কহিল—সদর দরজায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে খুঁজছিল, খোকাকে দেখেই ব'ললে, কোথায় ছিল?

আমি সব তাকে ব'ললুম। আমাকে কত আদর যত্ন ক'রলে—বুড়ীশাশুড়ী বৌকে ও এই গালাগাল—

অপর্ণা কহিল—চল, ওর মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি, খোকা কেমন ক'রে আসে এখানে?

ঝি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—আপনি যাবেন বৌরাণী?

—হ্যাঁ, যাবো। চল্—

দরজা খোলা ছিল—

ঢুকিতে ঢুকিতে অপর্ণা শুনিল, বধূ অত্যন্ত অপরাধিনীর মত শাশুড়ীকে বলিতেছে—মা খোকাকে ত পাচ্ছি না।

শাশুড়ী কহিলেন—না, ধন্যি ছেলের সঙ্গে আর পারা যায় না, দেখো ত সদর খোলা না কি?

বধূটি আসিতেছিল—খোকা তাড়াতাড়ি কোল হইতে নামিয়া তারস্বরে কহিল—মা, মা, রাজকন্যা এনেছি—

তিনজনকে এমনিভাবে আসিতে দেখিয়া গৌরী হতবুদ্ধি

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অপর্ণা হাসিয়া কহিল—আপনার খোকা ও রাজকন্যাকে না এনে ছাড়বে না। কিন্তু খোকা রোজ রোজ পালিয়ে যায় কি ক'রে?

গৌরী একটু হাসিয়া কহিল—আসুন।

অপর্ণা ঝিকে কহিল—তুই যা, গোটা চারেকের সময় এসে আমায় নিয়ে যাস্। চলুন—খোকা, খোকা, রাজ-কন্যাকে দিয়ে কি ক'রবে বলেছিলে?

—মাকে দেব।

অপর্ণা পুনরায় হাসিয়া কহিল—নিন, ছেলে পাঠিয়ে রাজকন্যাকে ঘরে আন্‌লেন, এখন কি ক'রবেন তাই বলুন।

গৌরী অপর্ণাকে নিজ-কক্ষে বিছানার উপর বসাইয়া কহিল—আপনাকে বস্‌তে দেওয়ার মতও ত কিছু নেই—যদি অনুগ্রহ ক'রে এসেছেন তবে—

অপর্ণা কহিল—আমি কে, জানেন?

—জানি, আপনি ঐ রাজবাড়ীর খুলবারান্দায় ব'সে বই পড়েন, না?

—হ্যাঁ, আমি সেই।

গৌরীর মুখখানি সহসা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। অপর্ণা তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল—হঠাৎ এত লজ্জিত হচ্ছেন কেন?

গৌরী অবনতমুখেই কহিল—না।

—কিন্তু, অমনি ক'রে ক্যারমের ঘুঁটি চুরি করা কি ভালো?

গৌরী হাসিয়া উঠিয়া কহিল—আপনি বুঝি ওই দেখেন?

—হ্যাঁ, খোকাও ত আপনাকেই সাহায্য করে।

গৌরী আবার হাসিল। কহিল—কি ক'রবো, খেলে যে কেবলই হেরে যাই।

—আমি ত দেখি, আপনি কেবলই জিতে যান, আর সে বেচারী অন্ধকারভাবে হেরে যায়।

গৌরী একটু হাসিয়া অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিল—কতকটা গর্ব্বে কতকটা ঐ বড়লোকের বাড়ীর বধূটির অকুণ্ঠ সহৃদয়তায়।

অপর্ণা প্রশ্ন করিল—আপনার নামটি কি?

—গৌরী। আপনার নাম?

—অপর্ণা। উনি কি করেন?

গৌরী একটু ব্যথিতভাবে জবাব দিল—কেরাণী। আপনার—

—ব্যারিষ্টার, তবে সে নামমাত্র।

আলাপ প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা হইল—অপর্ণা এম-এ পাশ এবং গৌরী কোন পাশই নয়—তাহাও দুইজনে জানিয়া লইল। অমলের না আসিয়াও কিছু কিছু প্রশ্ন করিলেন এবং খোকার নানা দৌরাত্ম্যের কথা বিবৃত করিয়া কহিলেন—আপনাকে যেয়ে হয়ত কত জ্বালা দিয়েছে—ও ছেলের সঙ্গে পারবার যো নেই। এতদিন ত সদর দরজা খুলতে পারতো না, আজ একটা চৌকি নিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে হুড়কো খুলেছে। রাস্তায় কবে গাড়ী চাপা পড়বে, ও ছেলে—

—না না, ভয় ক'রবেন না অত। ছেলেরা ত একটু দুরন্ত হয়ই। প্রথমদিন ও কি ক'রলে জানেন? ঘুমিয়ে ছিলুম, হঠাৎ দেখি কে যেন চুল ধ'রে টান্‌ছে খাটের নীচে থেকে—কিছুক্ষণ পরে খোকা উঠে এসে বল্‌লে—তুমি রাজকন্যা? আমি হেসে বল্‌লুম—হুঁ।

গৌরী কহিল—ওই রাজকন্যার গল্প শোনে, তাই ভেবেছে বুঝি আপনি সেই—সেত মিথ্যে নয়।

অপর্ণা হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ, প্রায়ই রাজকন্যা, তবে বরণটা মেঘের মত, চুলটা কুঁচের মত—

মাতা কহিলেন—না না, সে কি কথা। আপনার মত রূপ ও রাজার ঘরেও মেলে না—

অপর্ণা এই অতিরঞ্জিত প্রশংসাবাদ শুনিয়া লজ্জিত হইয়া কহিল—কি যে বলেন। আমাকে আর আপনি বলেন কেন?

মাতা প্রতিবাদ করিলেন—না না, আপনাদের মত লোককে কি তুমি বলা যায়?

অপর্ণা প্রসঙ্গান্তরে প্রশ্ন করিল—কি কচ্ছিলেন?

বিছানার উপর একটা হাত ছেঁড়া সিল্কের পাঞ্জাবী, আর তার উপরে একটা ব্লাউজ পড়িয়াছিল। গৌরী তাহাই দেখাইয়া কহিল—ওঁর পাঞ্জাবী ছিঁড়ে গেছে তাই দেখছিলাম ব্লাউজ হয় কি না! সেই ফাঁকে খোকা পালিয়ে গেছে—

খোকা একমুঠা চাল চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, মাতা কহিলেন—রাখ, রাখ, অত চাল দিয়ে কি ক'রবি—

খোকা পালাইতে চেষ্টা করিয়া কহিল—পাখী—পাখী খাবে—

মাতা ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন—কম ক'রে নিয়ে যা।

—না, না—নিও না। খোকা জোর করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া পালাইয়া গেল—

বাহিরে কয়েকটি চড়ুই আসিয়াছে—খোকা চাল ছিটাইয়া দিয়া ডাকিতেছে—আয় আয়—

মাতা কহিলেন—দিবারাত্র এমনি এত অশান্ত! সব জিনিষ ওর লাগবে—

অদূরে ছোট একটি সুসজ্জিত টেবিলের উপর ছোট একটা টাইমপিস্ অনিয়মিত সময় জ্ঞাপন করিত। গৌরী সেদিকে চাহিয়া দেখে চারটা বাজে। সে কহিল—যদি কিছু মনে না করেন, একটু চা তৈরী ক'রে দি।

—জলখাবার তৈরী ক'রবেন ত? সে আমি জানি—

গৌরী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—তাও বটে; কিন্তু তার আগে আপনাকে একটু চা ক'রে দি, তাই ভাবছিলুম। আমাদের মত লোকের বাড়ীতে যদি অনুগ্রহ ক'রে এসেছেনই তবে—

—না, চা এখন আমি খাই না, আপনি খাবার তৈরী করুন, আমি বরং সাহায্য করি।

গৌরী হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—আপনি আবার কি সাহায্য ক'রবেন?

—যা ভাবছেন তা নয়, কিছু তৈরী ক'রতে আমরাও পারি। অন্ততঃ মাংসটা ওর চেয়ে ভালই পারি—

গৌরী মুখ টিপিয়া হাসিল। অপর্ণা পুনরায় কহিল—অবশ্য খোকা যদি সাহায্য না করে—

গৌরী এবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল—ও রকম সাহায্য ফাঁক পেলেই সে করে।

—ঝি আসিয়া জানাইল—চারিটা বাজিয়াছে। অপর্ণা কহিল—আচ্ছা আজ তবে আসি, কাল আস্‌বো—

গৌরী বিনয় প্রকাশ করিয়া কহিল—আসতে বলার সাহস নেই, তবে যদি আসেন অনুগ্রহ করে, তবে মনে মনে আপনার প্রশংসা ক'রবো—

—অত বিনয়ে কি হবে—ভাই? আস্‌বো—

অপর্ণা চলিয়া গেল।

অমল বৈকালে ফিরিলে জলখাবার ও চা দিয়া গৌরী কহিল—আজ খুব মজা হ'য়েছে, জানো?

অমল হাসিয়া কহিল—দুপুরবেলা তোমরা বসে বসে মজা ক'রলে আমি জানবো কি ক'রে? বলো—

—ওই যে রাজবাড়ী, ওর খুলবারান্দায় বসে একটি বউ প্রায়ই বই পড়ে দেখেছ?

—না, পরস্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকা আমার স্বভাব নয়! তার পর?

—সাধু পুরুষ কিনা? খোকা একদিন পালিয়ে··· গৌরী খোকার রাজকন্যা আনিবার কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া কহিল—বউটির কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই। তবে চা খেতে ব'ললাম, খেলে না—

অমল কাহিনীর মাঝে কোথাও 'মজা' খুঁজিয়া পাইল না বলিয়াই মনে হয় এবং বড়লোকের বাড়ীর সহিত ঘনিষ্ঠতাটা খুব শুভ মনে না করিয়া জবাব দিল—ওরা তোমার মত লোকের বাড়ীতে সাধারণতই খায় না—

—না খায় না। ও তরকারী কুটে দিতে চাইল পর্য্যন্ত।

—হাঁা, তরকারী কুটতে হাত কাটুক, আর শেষে ফৌজদারী এক নম্বর হোক আমার নামে। যাই কর, তুমি কিন্তু ওখানে বেড়াতে যেও না, অপমানের একশেষ হ'য়ে ফিরবে—

—বড়লোক হ'লে তারা বুঝি কেবল মানুষকে অপমানই করে?

আভিজাত্যের প্রতি একটা ক্রোধ ও ঈর্ষা অমলের মনে লক্ষিত হইয়াছিল, কারণ তাহার দারিদ্র্য কেবল তাহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিতই করিয়াছে, সে তাই বলিল—অপমান করে না তবে হ'য়ে যায়! যে আজ খুব বীরত্বের সঙ্গে এখানে এসেছে, কাল তাদের সগোত্র দু'চার জনের বিদ্রূপ শুনে কাল সে আপনার কৃতকর্ম্মের জন্যে অনুশোচনা ক'রবে—

গৌরী কথাটা পছন্দ করিল না। কহিল—বউটী এম-এ পাশ তা জানো? অথচ আমাদের সঙ্গে কেমন ঘর-কন্নার কথা ব'লে গেল। খোকাকে খুব ভালবাসে—কাল আবার আসবে।

অমল মুখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—ভাল! মহানুভবতার তুলনা নেই। কাজ আছে এখনি বেরুতে হবে।

গৌরী অভিমানের সুরে কহিল—বাড়ীর উপর যে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না, এত সকালে কোথায় যাবে? ছেলে পড়াতে যাওয়ার ত দেরী আছে।

—একটা কাগজের আফিসে টাকা আন্‌তে যাবো; সেখানে আর একটু কথাও আছে।

গৌরী তাড়াতাড়ি কহিল—কাল যদি উনি আসেনই তবে কিছু ফল আর একটু ছানা নিয়ে এসো, শুধু চা ত দেওয়া যায় না।

অমল জামা গায় দিতে দিতে কহিল—আন্‌বো যা পারি, কিন্তু এটা মাসের ২৭শে—

ক্রমশঃ

রামায়ণে সুন্দরকাণ্ডের অর্থ

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড ছাড়া অন্যান্য কাণ্ডে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে সেই সেই কাণ্ডের নামের কোনরূপ একটা সম্বন্ধ আছে—যেমন বালকাণ্ডে পাওয়া যায় রামচন্দ্রের বাল্যজীবনের কাহিনী এবং অযোধ্যাকাণ্ডে আছে অযোধ্যার রাজপরিবারের বিচিত্র কথা। কিন্তু সুন্দরকাণ্ডে এই নামকরণের তাৎপর্য সহজে ধরা যায় না। বিষয়টি লইয়া পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়াছেন এবং নানাজনে নানারূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

গত বৎসর (১৩৪১ সাল) কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'সুন্দরকাণ্ডের অর্থ কি?' এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া চারিজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমতের উল্লেখ করিয়াছেন।

Das Ramayana গ্রন্থের জার্মাণ পণ্ডিত ল্যাকবির মতে (১২৪ পৃঃ) "সুন্দরকাণ্ডে অনেক কবিত্বময় মধুর বর্ণনা আছে বলিয়াই ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে"। Geschichte der Indischen Litteratur নামক গ্রন্থে (৪১৭ পৃঃ) উইণ্টারনিৎজ্‌ সাহেব লিখিয়াছেন—"রামায়ণের অন্যান্য কাণ্ড অপেক্ষা সুন্দরকাণ্ডে অনেক বেশী পরিমাণে কাহিনী, আখ্যান ও আশ্চর্য্য ঘটনা আছে। ভারতীয় রুচি চিরকাল এই সমুদয়কেই সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্যই রামায়ণের এই খণ্ডের নাম হইয়াছে সুন্দরকাণ্ড।"

মজুমদার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সুন্দরকাণ্ডের আলোচনায় যোগ দিয়াছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমার এই ধারণা হইয়াছে যে এখানে সুন্দর শব্দে দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর তীর বুঝাইতেছে। অযোধ্যা হইতে দক্ষিণে লঙ্কা পর্য্যন্ত যে ভূ-বিন্যাস ছিল, তদনুসারেই অযোধ্যাদি পঞ্চকাণ্ডের নামকরণ হইয়াছে। সুন্দরকাণ্ড তাহারেরই একটি।..... সুন্দর শব্দটি বৃক্ষবিশেষ অর্থে সংস্কৃত অভিধানে পাওয়া যায়। মহাভারত-প্রভৃতি—বেলাবনে—এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে, তাহার নামানুসারে বেলাবনের সুন্দরবন নাম হওয়া খুবই সম্ভব...এবং ইহাও সম্ভব যে রামায়ণোক্ত বেলাবন বিভাগ কোনকালে 'সুন্দরবন' নামে অভিহিত হইত এবং তাহারই নামানুসারে 'সুন্দরকাণ্ড' এই নাম হইয়াছে।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন—"সুন্দর শব্দ এখানে স্থানবাচক এবং উহা লঙ্কার এক পুরাণ নাম—যেমন উজ্জয়িনীর 'বিশালা', অযোধ্যার 'সাকেত' ইত্যাদি।...'চুল্লবগ্গে' লঙ্কাদ্বীপে এক ছোট পাহাড়ের নাম আছে সুন্দর পর্ব্বত এবং সুন্দরনায়ক এক বনের বুদ্ধ কস্সপ ও বুদ্ধ কোনাগমন নাকৃ করিয়াছিলেন এই সংবাদ 'বুদ্ধ বংশে'র 'অট্‌ঠ কথা'য় পাওয়া যায়।"

মজুমদার মহাশয়ের নিজের অভিমত এই যে সুন্দরনামক স্থান হইতে সুন্দরকাণ্ড নাম হইয়াছে এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু রামায়ণে এইরূপ স্থানবাচক নামের কোনই উল্লেখ না থাকায় সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।"

শ্রীযুক্ত সি-এর-দেবী মহাশয় Sundarakandam or Flight of Hanuman to Lanka via Sunda Islands by the Air Route নামক গ্রন্থে অষ্ট্রেলিয়ার লঙ্কা দ্বীপের অবস্থিতি প্রমাণ করিতে যাইয়া সুন্দরকাণ্ডের নাম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অভিনব হইলেও বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আলোচনার (১৮৭ পৃঃ) মর্ম্ম এই যে "রামায়ণের কবি তদ্বৎকালে বর্ণিত ঘটনার প্রতি কিংবা ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট স্থান বিশেষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিভিন্ন কাণ্ডের নাম দিয়াছেন। সুন্দরকাণ্ডে বর্ণিত ঘটনাগুলি সুন্দরদ্বীপের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া বাল্মীকি কাণ্ডটির নাম দিয়াছিলেন 'সুন্দর'। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে লেখকগণের অজ্ঞতা বা অনবধানতা হেতু সুন্দর শব্দটি সুন্দরের পরিণত হইয়াছে।" দেবী মহাশয়ের মতে হনুমান, রাজা ও তৎপরিবৃত ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি সুন্দরদ্বীপের অন্তর্গত। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়াই মালি হনুমান অষ্ট্রেলিয়ার যা বাল্মীকির লঙ্কায় সীতার নিকট গমন করিয়াছিলেন।

এই সকল আলোচনা হইতে দেখা যায় যে পণ্ডিতগণের মধ্যে

অনেকেই সুন্দর পত্তন, দেশবাচক মনে করেন। কেহ অনুমান করিয়াছেন—এই দেশটি দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর কূলে অবস্থিত ছিল। কেহ বলিয়াছেন—উহা লঙ্কারই পুরাতন নাম। আবার কাহারও মতে সুমাত্রা, তারা প্রভৃতি দ্বীপ সমূহ এখানে সুন্দর শব্দের লক্ষ্য।

সম্প্রতি আমি যেরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এক সময়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণে কাবেরী-মুখোপকূলবর্তী প্রদেশে সুন্দরপুর ও সুন্দরারণ্য নামে নগর ও অরণ্য বর্ত্তমান ছিল। 'সুন্দরপুর-মাহাত্ম্য' ও 'সুন্দরারণ্য মাহাত্ম্য' নামক দুইখানি সংস্কৃত মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাওয়া যায়। গ্রন্থ দুইখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। উইলসন সাহেব যে ম্যাকেঞ্জি-সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (Mackenzie Collection, ২য় সংস্করণ, ১৪১ ও ১৪৬ পৃঃ), তাহা হইতে জানা যায় যে ভবিষ্যোত্তর, ব্রহ্মাণ্ড এবং গরুড় পুরাণ হইতে 'সুন্দর-পুর মাহাত্ম্য' সঙ্কলিত হইয়াছে। উহাতে সুন্দরপুর নামে এক নগরের বিবরণ আছে। এই নগর কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। সেখানে সুন্দরেশ্বর শিবের মন্দির ছিল। নগরটির চলিত নাম সুন্দর। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সুন্দরারণ্যমাহাত্ম্য' ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে গৃহীত। উহাতে আছে কাবেরী তীরবর্তী এক পবিত্র কাননের বিবরণ। মাদ্রাজ প্রদেশের প্রসিদ্ধ 'আবিয়ার প্রত্নাগারে'ও 'সুন্দরপুর মাহাত্ম্যে'র একখণ্ড পুঁথি রক্ষিত আছে। উহা আলোচনা করিয়া দেখিলে হয়ত বিলুপ্ত সুন্দরপুরের যথার্থ অবস্থিতি-স্থান এবং অন্যান্য তথ্য প্রকাশিত হইবে।

স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে (বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৭৮৫ পৃঃ) সুন্দরনামক এক গন্ধর্বের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এই সুন্দর ভারতবর্ষের দক্ষিণে কাবেরী তীর্থে বশিষ্ঠ মুনির সম্মুখে নির্লজ্জ আচরণের ফলে শাপগ্রস্ত হইয়া রাক্ষসরূপে ষোল বৎসর নগরে ও অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছিল। পরে সে বেতটাচলের চন্দ্রতীর্থে শাপমুক্ত হয়। সুন্দরপুর ও সুন্দরারণ্য কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, তাহা মাহাত্ম্য গ্রন্থের বিবরণে পূর্বে দেখিয়াছি। সুতরাং এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক যে অভিশপ্ত সুন্দরের বিচরণ স্থানই কালক্রমে সুন্দরপুর ও সুন্দরারণ্য নাম লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক—পুরাণোক্ত সুন্দরের স্কন্দ পুর ও অরণ্যের তাদৃশ নামকরণ হইয়া থাকুক কিংবা তাদৃশ নাম ব্যাখ্যা করিবার জন্য পুরাণে সুন্দরাখ্যানের সৃষ্টি হইয়া থাকুক, এক সময়ে কাবেরী নদীর নিকটবর্তী কোন স্থানে সুন্দরপুর ও সুন্দরারণ্য বর্ত্তমান ছিল, ইহা এখন প্রমাণসিদ্ধ বলা যাইতে পারে। দক্ষিণাত্যের এই অঞ্চল হইতে হনুমান লঙ্কা যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণ পাঠে জানা যায়। অতএব এই স্থানের নাম হইতেই 'সুন্দরকাণ্ড' নামের উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় হইল।

রুষ-মার্কিন কূটনৈতিক দাবার চাল

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

চীনকে কেন্দ্র করিয়া মার্কিন ও রুষের দাবার ঘুঁটি বেশ চালচালি চলিতেছে, মাঝে পড়িয়া বেচারী চীন হা অন্ন, হা অর্থ করিয়া চেঁচাইতেছে। চীনকে আজ বাঁচিতে হইলে তার দুটি বিষয়ের প্রয়োজন—এক খাদ্য, দুই ঋণ। ভাবে মনে হইতেছে যে মার্কিনরা এই দুটোরই ভার লইতে রাজি আছে যদি—। 'যদি'র ব্যাপারটি পাঠক বুঝিয়া লইবেন। প্যারীতে শান্তি সম্মেলনে চীনকে আমন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে রাশিয়ার আপত্তির কারণ জগৎ সমক্ষে খুব প্রকট নহে। পর্দার অন্তরালে যে সব খেলা চলিতেছে, তাহা বুঝিবার শক্তি খুব অভিজ্ঞ রাজনৈতিক দ্রষ্টাদেরও নাই বলিয়া মনে হইতেছে—তবে লক্ষণ দেখিয়া রোগ ধরা রাজনৈতিক জগতে যদি স্বীকৃত হয় তবে বলা যাইতে পারে যে, যে বন্ধুত্ব রাশিয়া এতদিন জাতীয়তা-বাদী চীনের জন্য জমা রাখিয়াছিল তাহা আজ আবার নতুন বন্ধুর পাতে দিবার আশায় আছে। চীনের গৃহযুদ্ধ কাদের কারসাজি তাহা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই। সোভিয়েট রাশিয়া নিজেও জানে যে তাহাকেও একদিন এই পরীক্ষাই দিতে হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রে রাশিয়া যেমন ভুক্তভোগী ছিল, এক্ষেত্রে তেমন হইতেছে চীন। মার্কিনরা কূটনৈতিক বুদ্ধি ও সামর্থ্য যে পরিমাণে চীনের পিছনে খরচ করিতেছে তাহাতে সোনা না তুলিয়া শেষ পর্য্যন্ত ছাড়িবে না, ইহা নিশ্চিত। রাশিয়ার ধর্ম্মভাই কম্যুনিষ্টদের নিয়া খানিকটা পরিমাণে সন্ত্রস্তও বটে। মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া যত সব অপরিহার্য্য শিল্পসম্ভার তা সবই গুটাইয়া লইয়া বাকিটা ধর্ম্মভাই-এর জন্য রাখিয়া গিয়াছে অথবা তাহাদের ব্যবহারের সুযোগ দিয়াছে। তাহার ফল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অশুভ হইয়াছে। রাশিয়া পূর্ব্বাংশে চীনের সহিত যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে,

তাহা ধর্মভাই কম্যুনিষ্ট চীন নহে, তাহা হইতেছে জাতীয়তাবাদী চীন—মনের দিক দিয়া রাশিয়া এই জাতীয়তাবাদী চীনকে গ্রহণ করে নাই। কেননা ধর্মভাই কম্যুনিষ্টদের প্রতি চিয়াং-কাই-শেক যে ব্যবহার ইতিপূর্বে করিয়াছে তাহা রাশিয়া ভুলে নাই। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন অনেক দায়-ঠেকা প্রেম দেখা যায়, যেমন রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর সঙ্গে করিয়াছিল। চীনের সঙ্গে রাশিয়ার যে আঁতাত তাহা অনেকটা ঐ জাতীয়ই বলা যাইতে পারে, তবে জার্মানী সম্পর্কে যেরূপ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, চীন সম্পর্কে ঠিক ততটা নয়। যে কোন কারণে হউক সোভিয়েট রাশিয়া জাতীয়তাবাদী চীনের সঙ্গে সখ্যবদ্ধ। ইহা মৌখিক কারবার নহে, একেবারে লেখাপড়া করিয়া স্থির করিয়াছে যে, চীন ও রাশিয়া উভয়ে উভয়ের বন্ধু। মজা হইতেছে, এই বন্ধুত্বের শিকল গলায় লইয়া চীন দৌড়াইতেছে মার্কিনদের নিকট, আর রাশিয়া সেই দৌড় সামলাইবার নিমিত্ত চীনের ঘরের মধ্যে প্রহরী বসাইতেছে ধর্মভাই কম্যুনিষ্টদের মারফৎ।

চীন রাশিয়াকে বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী বলিয়া দোষী করিতেছে। কেননা রুশ-চীন সখ্য সম্বন্ধের একটা বিশেষ বিধান ছিল, যে মাঞ্চুরিয়ার ডেইরিন বন্দর চীনের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। আর পোর্ট আর্থার বন্দর যৌথভাবে এক কমিশন দ্বারা পরিচালিত হইবে, সেই কমিশনে সোভিয়েট রাশিয়ার থাকিবে তিনজন, আর চীনের থাকিবে দুইজন। কিন্তু রাশিয়া এই সব মানিয়া চলিবার বালাই কিছু রাখে নাই। কেননা সে তাহার সৈন্যসামন্ত যাহা জাপানকে সায়েস্তা করিবার জন্য পাঠাইয়াছিল—তাহা এমনই এক শুভমুহূর্তে পাঠাইয়াছে—যে তাহারা আসিয়া যুদ্ধে নামিবার একরকম পূর্বেই বলা যাইতে পারে, জাপান আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অতএব রাশিয়া তাহার সৈন্য সদ্ব্যবহারের সুযোগ পোর্ট আর্থার ও পোর্ট ডেইরিনের উপর দিয়া লইয়াছে। ইহার পর রুশ-চীন মিতালী থাকিবার কথা নহে, তাছাড়া ধর্মভাই কম্যুনিষ্টদের প্রতি রাশিয়া যে পরিবাগ ধরম ইদানিং দেখাইতেছে তাহাতে ব্যাপারটা অবশ্যই সন্দেহজনক?

এদিকে চীনের কম্যুনিষ্ট নেতারাও বসিয়া নাই। তাহারা স্পষ্ট বলিতেছেন যে, যদি মার্কিনরা জাতীয়তাবাদীদের সাহায্য না করে তবে চীনের গৃহযুদ্ধ খুব সত্বরই সমাধান হইতে পারে। জেনারেল চৌ-এন-লাই এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, চীনের গৃহযুদ্ধে মার্কিন কূটনীতি একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেছে। কথাটা অসত্য বা ভিত্তিহীন নহে, এখানে একটি বিষয় ভাবিবার আছে। গত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন দেশে পাইকিরি বা খুচরা ভাবে যে সমস্ত গৃহযুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ছোট বড় শক্তিগুলি সামর্থ্য ও সুবিধা বুঝিয়া যোগ দিয়াছে। একথা মার্কিনরাও যেমন জানে, রুশরাও তেমনিই জানে, বস্তুতঃ বর্তমান বিশ্ব-রাজনীতিতে ইহা একটি অনিবার্য পর্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাকে জোরজবরদস্তি করিয়া ঠেকাইবার চেষ্টা নিছক বাতুলতা। কেননা, বিজ্ঞান যখন মতবাদ প্রচার করিবার জন্য বিচিত্র রকম পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে তখন আর কোন একটি বিশেষ দেশই সেই বিশেষ দেশটির জন্য নয়। মতবাদ ও মতবাদ সার্থক করিবার পন্থা লইয়া যে সমস্ত বাকবিতণ্ডা পৃথিবী ভরিয়া চলিতেছে তাহার কোন কোন বিশেষ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; দেশের সীমানা অতিক্রম করিয়া আজ তাহা ক্রমশই সুদূরপ্রসারী হইয়া পড়িতেছে। অতএব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন-না-কোন দেশ জড়াইয়া পড়িবেই। বর্তমান ক্ষেত্রে চীনকে কেন্দ্র করিয়া যে রুশ ও মার্কিন শক্তির খেলা চলিতেছে তাহার কারণ হইল উভয় শক্তির প্রাচ্যে আস্তানা গাড়িবার প্রয়াস। ইহার মধ্যে মতবাদ প্রসারের চেষ্টাও রহিয়াছে। কথা উঠিতে পারে যে মার্কিনরা বহু পূর্বেই ও কর্মটি সুরু করিয়াছে, বক্সার বিদ্রোহের সময় মার্কিনরা যেমন ব্রিটিশদের রক্ষা করিয়াছে, তেমন চীনে ভবিষ্যত ব্যবস্থা সম্বন্ধেও যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা একপ্রকার তখন হইতে সুরু করিয়াছে। তাহা হইলেও পুরোপুরি সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার কারণ মাঞ্চু সাম্রাজ্য পতনের পর চীনে যে সব শক্তির খেলা চলিয়াছিল তাহা মূলত তিন প্রধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—যথা ব্রিটিশ, ফরাসী ও জাপান। ফরাসী ও ব্রিটিশ ঘুঘু সাম্রাজ্যবাদী, তাহার সঙ্গে হবু সাম্রাজ্যবাদী জাপানও জুটিয়াছিল, এই তিন-এ মিলিয়া চীনের পিণ্ডি চটকাইয়াছে। বর্তমান গৃহযুদ্ধের প্রথম পর্যায়-এ যে শক্তি অন্তরালে থাকিয়া

চীনের গৃহযুদ্ধকে উস্কানী দিয়াছে তাহার মধ্যে ছিল জাপান, ফরাসী ও ব্রিটিশ। ইহারা শুধু টাকা পয়সাই দেয় নাই, অস্ত্রশস্ত্রও দিয়াছে। বর্ত্তমান বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান নাই, ফরাসীও নাই। কিন্তু ব্রিটিশ ত রহিয়াছে? কিন্তু তাহার নড়িবার শক্তি নাই। বিগত অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া সে যে পরিমাণ সাম্রাজ্যের সুধা পান করিয়াছে তাহাতে তাহার নেশা গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেশ জমাট ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ব্রিটিশের সাম্রাজ্যভোগের নেশায় খানিকটা টান পড়ে, তখনও ঠিক পুরোপুরি নেশা টুটে নাই। এবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে নেশা একেবারে টুটিয়াছে এবং ব্রিটিশ জাত আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে ও সাম্রাজ্যের নবাপ্রবর্ত্তনের জন্য সময় ও বুদ্ধি খরচ করিতেছে। ফল কি হইবে তাহা বলা মুস্কিল। তবে লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে, যে সাম্রাজ্যের নব্য-বিধানকে নাশিয়া ও নব্যবিজ্ঞানের দানকে পকেটস্থ করিয়া ব্রিটিশ জাতি আগামী পঞ্চাশ বছর অন্তত পাড়ি জমাইতে পারিবে। বস্তুত, ব্রিটিশের শ্রমিকদলের চিন্তানায়কেরা এই পরিবর্ত্তনগুলি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন। নচেৎ সাম্রাজ্য-বাদী নীতির এইরূপ পরিবর্ত্তনের কোন কারণ নাই। চীন—তাহাদের সাধের চীন,যেখানে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অহিফেন যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ জাতি তাহার প্রভুত্বের ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছে সেখানে একেবারে চুপচাপ। অবশ্য এই মৌন-নীতি অবলম্বনের আর একটি বিশেষ কারণ আছে। কারণটি হইতেছে হতভাগ্য ভারত। ভারত ব্রিটিশ জাতির একদিন অঙ্গের আভরণ ছিল। সে আভরণ দেখিয়া ফরাসী ঈর্ষা করিয়াছে, যুদ্ধও করিয়াছে। জার্ম্মানীর কাইজার ও রাশিয়ার জার উভয়েই ব্রিটিশ জাতির অঙ্গাভরণ ভারত ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিট্‌লারও চেষ্টা করিয়াছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র হইতে ধ্বংস করা যায় কিনা। প্রথমবারে কাইজার যতটা সফলকাম হন নাই, তার চাইতে বেশী সফলকাম হইয়াছেন হিট্‌লার। হিট্‌লার যাহা চাহিয়াছিল তাহা ঘটিয়াছে, তবে তাহাতে হিট্‌লারের কোন সুবিধা হয় নাই, আর তাহার কোন দিন সুবিধা হইবার সম্ভাবনাও নাই। সাম্রাজ্যের বিশেষ ভক্ত কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া—তাহারা এই যুদ্ধে ব্রিটিশ জাতিকে অবশ্য সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু তাহারা বুঝিয়াও লইয়াছে যে, বিপৎকালে Mother Country কতটা সাহায্য-এ আসে। সাম্রাজিক সম্মেলনের সব সলাপরামর্শই আজ ভাসিয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ জাতি বার বার সাম্রাজিক সম্মেলন করিয়া স্বায়ত্তশাসিত দেশগুলিকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে তাহারা সবাই আপন এবং বৃহত্তর বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্র। তাহাদের নীতি একইনির্দ্ধারিত পথ বাহিয়া চলিবে ও দেশরক্ষা ব্যাপারে ব্রিটিশ জাতি দায়ী থাকিবে। রণ-কৌশলে নব্য বিজ্ঞানের দান যে ব্রিটিশ জাতির সাম্রাজিক নীতির অন্তরায় হইবে তাহা কে ভাবিয়াছে? শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকালে দেখা গেল চাচা আপন বাঁচা। চাচা আপনাকে বাঁচাইতে গিয়া অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা বৈদেশিক নীতিতে স্বাধীন হইয়াছে, ব্রিটিশ জাতির নৈতিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের পরাজয়ের পর আজ কতগুলি নোতুন শক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে। এই নব্য শক্তিপুঞ্জকে পিছন হইতে আঘাত করিবার ক্ষমতা কি ব্রিটিশ কি মার্কিন কাহারও নাই। ব্রিটিশ জাতি এই নব অভ্যুত্থানকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাহারই প্রমাণ স্বরূপ ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, ব্রহ্ম, মালয় ইত্যাদিতে নব্য ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা—ইহা কতটা সফল হইবে আজ তাহা বলা মুস্কিল। যদি কোন দিন ইহার কিছুটাও সফল হয় তবে ভারত, ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন, শ্যাম, চীন, তিব্বত, জাভা ও সুমাত্রা সবাই মিলিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে এক সঙ্ঘরাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই গ্রথিতশক্তি মার্কিন বা রুশ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কাজ করিবে। জাপানের ক্ষত-বিক্ষত শক্তিও ইহাতে যত সত্বর পারে সাড়া দিবে। কেননা, তাহার সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। ব্রিটিশ জাতির শ্রমিকদলের নীতি এই সমস্ত রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করিতে বাধ্য হইবে, নচেৎ ব্রিটেনে যে নব্য অর্থনৈতিক কাঠামো শ্রমিকদল গড়িবার চেষ্টায় আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইবে। শ্রমিকদল কতকগুলি মৌলিক শিল্পের জাতীয়করণ-নীতি গ্রহণ করিয়া ব্রিটেনে এক জাতীয় শত্রুর সৃষ্টি করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহার ফলস্বরূপ যে নবীন সামাজিক ধারা জন্ম লইবে তাহারাই পরবর্ত্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীল

শত্রুকে ধ্বংস করিবে। অতএব রক্ষণশীলদলের পুনরায় প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করিয়া মদনদে বসার স্বপ্ন অনেকটা অবাস্তব। ইতিহাস কখনও উল্টো রথে চলে না, তার গতি সব সময়ই নোতুন ভবিষ্যতের পানে। যাক সে কথা। এখন কথা উঠিতে পারে, এই বিভিন্ন রাজনৈতিক স্রোতের ওঠা-নামার মধ্যে রুশ-মার্কিন দ্বন্দ্বের অবকাশ কোথায়? বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে রুশদের জাপানের নিকট পরাজয় একটা ক্ষোভের কারণ। সেই সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের (গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিনদের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট নহেন) হস্তক্ষেপের ফলে রুশ-জাপান দ্বন্দ্বের একটা নিষ্পত্তি ঘটে। নচেৎ রাশিয়াকে আরও অনেক অপ্রীতিকর ব্যাপারের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে হইত। এই যুদ্ধে রুশ তাহাদের নৌ-শক্তির দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা বুঝিয়াছিল, তাছাড়া উত্তরসাগর তীরবর্ত্তী কোন নৌ-ঘাঁটি না থাকার জন্য তাহারা যে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা রুশরা ভোলে নাই। পক্ষান্তরে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে রুশদের কোন নৌ-ঘাঁটি না থাকায় মার্কিনরা মনে-মনে বেশ আশ্বস্ত ছিল। কেননা চীনে মার্কিন বাণিজ্য দরেমাল যাহা বাঁধিতেছিল এই অবস্থায় প্রশান্ত মহাসাগরে রুশদের দখলে কোন নৌ-ঘাঁটি থাকিলে ঠিক নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কাজেই মার্কিনদের বৃহত্তর আন্তর্জ্জাতিক কূটনৈতিক পরিধির মধ্যে রুশদের সম্প্রদারণ খুবই লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল। রাশিয়ায় জারের উৎখাত ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠায় ইহার কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। কাজেই সমস্যা জারের আমলে যেখানে ছিল এখনও সেইখানেই আছে। তাছাড়া রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা হইবার পর হইতে রাশিয়ার শত্রু বৃদ্ধি হইয়াছে বই কমে নাই। কাজেই প্রাচ্যে ডেইরিণ বন্দর, পোর্ট আর্থার, ভ্লাডিভষ্টক বন্দর ইত্যাদি রাশিয়ার সুদূরপ্রসারী আত্মরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উপাদানস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে মাত্র কয়েক দিনের জন্য লড়াই করিয়া যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে তাহা জার বহুবর্ষব্যাপী অশেষ চেষ্টা করিয়াও পারে নাই। এতদিন পরে রাশিয়া উত্তরসাগর তীরবর্ত্তী দেশে ঘাঁটি তৈরী করিতে সমর্থ হইল। ইহা মার্কিনদের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ এবং রাশিয়া যাহা পীত সাগর ও জাপান সাগরের মুখে পাইয়াছে তাহাতে তাহার প্রশান্ত মহাসাগর পাহারা দেওয়া চলিবে। তাছাড়া বেরিং প্রণালী ও এলুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া আর একখানি দুর্য্যোগের মেঘ রুশ-মার্কিনদের মাঝে আস্তে আস্তে ভাসিয়া উঠিতেছে। রাশিয়ার জার তাঁর আলাস্কা প্রদেশটি মার্কিনদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল। মার্কিনরাও ইহা লইয়া কম ঝামেলা পোহায় নাই, কানাডার সঙ্গে সীমান্ত নীতি লইয়া কম বিরোধ করে নাই। মার্কিনরা এযাবৎ আলাস্কাকে তাদের অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়াই বিবেচনা করিত। কিন্তু গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আলাস্কার গুরুত্ব রীতিমত বাড়িয়া গিয়াছে। রাশিয়াকে এইবার আলাস্কার পথে প্রচুর রণসম্ভার পাঠানো হইয়াছে। রাশিয়া অবশ্য তাহা দায় পড়িয়া গ্রহণ করিয়াছে, সম্ভবত মনে মনে স্বস্তিবোধ করে নাই। কেননা, আসলে শিয়ালকে ভাজা বেড়া দেখানো হইল মাত্র। এ-পথে এ রণসম্ভার গ্রহণ করার অর্থ ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ভয়াবহ করিয়া তোলা। তাই বেরিং প্রণালীর পাড়ে কম্‌স্‌টকা লইয়া দুশ্চিন্তা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বর্ত্তমানে বিমান যুদ্ধের যেমন দ্রুত উন্নতি হইতেছে তাহাতে বিপৎকালে আলাস্কা যে কতটা সর্ব্বনাশ করিবে তাহা হয়ত রাশিয়া এখনই ভাবিতে সুরু করিয়াছে। আসলে এই সবই হইল প্রাচ্যে রুশ-মার্কিন কূটনৈতিক দাবার খেলা।

স্মৃতি

শ্রীবামাচরণ কর্ম্মকার

আমি থাকি অতীতের অতল আঁধারে
হারা কান্না বাধাহীন অশ্রু আকারে।
কারো কাছে ছুটে যাই, কারো কাছে ধীরে
কেহ কাদম্বরে কেহ চাহে থাকো ফিরে।

যার মুখ মিলনের মধু প্রেম রাশি
বিরহে কাঁদাই তার পাশি বিনাশি।
বঞ্চিত বাধাহত পূর্ণ জীবন
অপরিক্ত দুখ আমি অভাব পূরণ।

কন্যা কুমারী

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে যে পরমরমণীয় কন্যা-কুমারী তীর্থ আছে তাহা দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ মেলে রওনা হইলাম। রাত্রে তখন ঘুমাইতে পার হইলাম জানিতে পারি নাই। ভোরের আলোকে ছন্না ছবির মত অতিশয় মনোরম বোধ হইল। নারিকেল-বৃক্ষাবৃত ছোটখাট পাহাড়গুলি দূরের জল হইতে মাথা তুলিয়া যেন তাহার ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে। ক্রমে রৌদ্র উঠিল। পূর্ববাটের পার্বত্যশ্রেণী কোথাও নিকটে কোথাও দূরে দেখা যাইতেছিল। বেলা দ্বিপ্রহরের পরে ওয়াল্টেয়ার পৌঁছিলাম। অপরাহ্ণে রাজামন্ত্রী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। রাজামন্ত্রীর নিকটেই গোদাবরী ষ্টেশন, ইহা গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে অনেক দূরে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে ট্রেণ গোদাবরীর পুলের উপর উঠিল। ইহা দুই মাইলের অধিক দীর্ঘ, বোধ হয় ভারতের দ্বিতীয় সেতু, প্রথম হইল সোন ইষ্ট ব্যাঙ্কের (Sone East Bank) সেতু অপেক্ষা মাত্র কয়েক ফুট কম। খরস্রোতা বিশাল বারিরাশি বহু আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতে করিতে উত্তরের অনুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। কানিকে গোদাবরীর উৎপত্তি স্থলে দেখিয়াছিলাম ক্ষীণ স্রোত মাত্র—এখানে কি বিশাল নদী। নদীতটে বন্দরের দৃশ্য এবং ঘাটগুলি দেখা যাইতেছিল। না জানি কোন্ ঘাটে শ্রীচৈতন্যদেব ও রায় রামানন্দের মিলন হইয়াছিল, এবং কৈশোর বর্ষ তত্ত্ব সকল আলোচিত হইয়াছিল। আর এক রাত্রি ট্রেণে কাটিল। যখন সকাল হইল তখন আমরা মাদ্রাজ নগরীর নিকটেই উপস্থিত হইয়াছি। মধ্যে মধ্যে সমুদ্র। সীমাহীন বারিরাশি দেখা যাইতেছিল। বেলা ৯টায় সময় আমরা মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চালনা ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বাটীতে স্নানাহার করিয়া বৈকালে এগ্‌মোর ষ্টেশনে ত্রিবান্দ্রাম এক্সপ্রেস্ (Trivandrum Express) ধরিলাম। জোৎস্নারাত্রির প্রান্তরের মধ্য দিয়া সারারাত্রি গাড়ী ছুটিল। সকালে কোভাই কানাল রোড ষ্টেশন পার হইলাম। অদূরে উচ্চ পাহাড় দেখা যাইতেছিল, ইহার উপরে কোভাই কানাল নামক বিশ্রাম স্থান বিদ্যমান। কিন্তু পরে যাইব। পৌঁছিলাম। এখানে মীনাক্ষী দেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির। মাদুরা হইতে একটি লাইন রামেশ্বরের অভিমুখে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়াছে, অপর লাইন ত্রিবান্দ্রাম অভিমুখে পশ্চিম দিকে চলিয়াছে। তেনকাশী পার হইয়া সেনকোটা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে পার্বত্য রেলপথ (ghat section) আরম্ভ হইল। চারিদিকে নিবিড় অরণ্যাবৃত পশ্চিম ঘাটের পর্ব্বতশ্রেণী। কোথাও গাড়ী সুড়ঙ্গের উপর দিয়া চলিতেছে—পার্শ্বদিকে দূরে নীচে জলধারা—কোথাও গাড়ী পর্বত গাত্র বেষ্টন করিয়া উপরে উঠিতেছে,—কোথাও সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে

কন্যাকুমারীর পথ

হ্রদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এই সকল স্থানে বন্য জানুক ও অনেক হাতী থাকে। এখান হইতে বহু মূল্যবান কাঠ রপ্তানি হয়। একটি স্থানের আবদ্ধ দেখিলাম "উদয় গিরি রাজার কোম্পানী" লেখা রহিয়াছে, এখানে চারিদিকে অনেক কাঠ কাটা কয়েকটি বাড়ী। অপরাহ্ণে কুইলন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ইহা মাদুরা রাজ্যের উপর একটি বন্দর, প্রাচীনকালে এই বন্দরের সহিত গ্রীস, আরব ও চীনের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। এখান হইতে পথ দক্ষিণ অভিমুখে চলিল। সারাদিন ট্রেণে রৌদ্রতপ্ত হইয়া অপরাহ্ণের স্নিগ্ধবায়ু বড় মধুর লাগিতেছিল। পথটিও মনোরম। পথের ধারেই বড় বড় হ্রদ, কোথাও বা প্রবিস্তৃত নদী, হ্রদ ও নদীর উপর ছোট ছোট নৌকা, তীরে নারিকেলকুঞ্জ, মধ্যে মধ্যে দূরে সমুদ্রের জল দেখা যাইতেছিল। সন্ধ্যার কিছু পরে আমরা ত্রিবান্দ্রাম ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখান হইতে ট্যাক্সি করিয়া রেষ্ট হাউসে (Rest House) গেলাম।

ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের সমুদ্র উপকূল মালাবার নামে পরিচিত। ইহা তিনভাগে বিভক্ত। দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য, মধ্যে কোচিন রাজ্য, উত্তরে ব্রিটিশ মালাবার। পূর্ব পশ্চিমঘাট পাহাড়, পশ্চিমে আরব সাগর, মধ্যবর্তী উপকূলে মালাবার অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম কেরল। ত্রিবাঙ্কুরের লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ। এখানে অনেক খৃষ্টানের বাস। সমগ্র ভারতে যত খৃষ্টান আছে তাহাদের

অর্দ্ধেকের বেশী ত্রিবাঙ্কুরে থাকে। কিছুদিন পূর্বে মাসিকপত্রে একটি করুণ কাহিনী পড়িয়াছিলাম, লেখক লিখিয়াছিলেন অস্পৃশ্যতা প্রথার ফলে ত্রিবাঙ্কুরে এত বেশী লোক হিন্দু ধর্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান হইয়াছে। এই অনুমান যথার্থ নহে। ত্রিবাঙ্কুরে প্রথমে যাহারা খৃষ্টান হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে একটিও অস্পৃশ্য জাতীয় ব্যক্তি ছিল না—সকলেই উচ্চ বর্ণের। যাহারা খৃষ্টান হইয়াছিল তাহারাও জাতিভেদ মানিয়া চলিত। দক্ষিণ ভারতের খৃষ্টান সম্বন্ধে মন্ত্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত "সামাজিক প্রবন্ধ" গ্রন্থের "জাতীয় ভাব—ভারতবর্ষে খৃষ্টানাদি" নামক প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল :—

"একদিন পণ্ডিচেরি হইতে তাঞ্জোর যাইবার পথে একটি খৃষ্টানের সহিত রেলের গাড়ীতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার মাথায় টিকি, টিকির খুলিলে দেখা গেল মাথার কিয়দ্ভাগ ক্ষৌরকর্ম দ্বারা পরিষ্কৃত—মধ্যস্থলে সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ। নাম জিজ্ঞাসিলেন—হরজগৎ। জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি ব্রাহ্মণ?" তিনি বলিলেন "আমি ব্রাহ্মণ বংশজাত কিন্তু খৃষ্টানধর্মাবলম্বী। আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ কিন্তু ধর্মে খৃষ্টান।"

প্রথম এই যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সেন্ট টমাস মাদ্রাজে আসিয়া খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সেখানকার হিন্দু রাজা খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারকদিগকে তাঁহাদের ধর্মপ্রচারে যাহা যেওয়া দূরে থাকুক সকল প্রকার সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন, এমন কি ভূসম্পত্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। বড়ই অদ্ভুত উদারতা সন্দেহ নাই। ধর্ম প্রচার দ্বারা যোদ্ধৃগণ বুঝিয়াছিলেন যে জাতি ত্যাগ করিতে হইবে না জানিলে বেশী লোক খৃষ্টান হইবে।

কালক্রমে অস্পৃশ্যজাতীয় লোকও খৃষ্টান হইয়াছিল, কিন্তু উচ্চবর্ণের খৃষ্টানগণ তাহাদিগকে অস্পৃশ্যই মনে করিতেন। আধুনিককালে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা প্রথার বিরুদ্ধে ভারতের অন্যত্র যেরূপ, ত্রিবাঙ্কুরেও সেইরূপ মত প্রচার হইয়াছে। সে যাহা হউক অস্পৃশ্যতাপ্রথার ফলে ত্রিবাঙ্কুরে খৃষ্টানের সংখ্যা অধিক হইয়াছে ইহা যথার্থ নহে। কারণ অস্পৃশ্যতা ত্রিবাঙ্কুরে যেরূপ প্রচলিত ছিল, মাদ্রাজের অন্যান্য অঞ্চলেও সেইরূপ।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানীর নাম ত্রিবান্দ্রাম। ত্রিবান্দ্রাম শব্দটি তিরু-অনন্তপুরের অপভ্রংশ। তিরু অর্থাৎ শ্রী। এই নগরকে অনন্তপুর বলা হয় কারণ অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণুর মন্দির এখানে বিদ্যমান। বিগ্রহের নাম পদ্মনাভস্বামী। এই পদ্মনাভস্বামীই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মালিক—ত্রিবাঙ্কুরের রাজা তাঁহার কর্মচারীরূপে রাজ্য পরিচালন করেন। প্রতিদিন প্রাতে রাজা মন্দিরে গিয়া পদ্মনাভ স্বামীর পূজা করেন এবং তাঁহার আদেশ আনিয়া রাজ্য পরিচালনা করেন। যেদিন মন্দিরে যাইতে না পারেন সেদিন একটী স্বর্ণ মুদ্রা জরিমানা দিতে হয়।

আমরা বেলা প্রায় নয়টার সময় মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। মন্দির প্রবেশ পথের উপরে গোপুরম। মন্দির মধ্যে সুসজ্জিত প্রাঙ্গণ, মন্দিরের রাজা স্বর্ণমণ্ডিত বলিয়া শুনিলাম। রাজা আসিয়া পূজা না করিলে যাত্রীগণ কেহ দর্শন করিতে পারেন না। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে। শুনিলাম, প্রত্যহ দুই সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন হয়। কিছুক্ষণ পরে রাজা আসিলেন। প্রথমে দুইজন সৈনী বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছে, তাহার পর কয়েকজন ব্রাহ্মণ, তাহার পর বাদ্যযন্ত্রসহিত ত্রিবাঙ্কুরি ধরণে কয়েকজন রক্ষী, তাহার পর রাজা, তাহার পর কয়েকজন ব্রাহ্মণ গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে আসিতেছেন। রাজার নগ্নপদ, অনাবৃত দেহ। বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর। সৌম্য দর্শন। অল্পক্ষণ থাকিয়া মন্দির মধ্যে পূজা করিয়া বাহিরে আসিলেন। তাহার পর গোপালজির মন্দিরে গিয়া পূজা করিলেন। তাহার পর রাজা চলিয়া যাইবার পরে আমরা প্রবেশ করিলাম।

পদ্মনাভ স্বামীর মূর্ত্তি বিশালকায়। ইহা কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত। বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ান। যে ফণে তিনি শয়ন করিয়া আছেন, যাত্রীরা সে ফণা যাইতে পারে না। ফণার বাহিরে চত্বর, চত্বরের উপর কিছুদূরে দাঁড়াইয়া দর্শন করিলাম। মন্দির প্রকোষ্ঠে তিনটি ক্ষুদ্রকায় দ্বার। একটি দ্বার দিয়া পদ্মনাভ স্বামীর মুখারবিন্দ, একটি দ্বার দিয়া নাভিপদ্ম ও একটি দ্বার দিয়া চরণারবিন্দ দেখা যায়। একসঙ্গে সমগ্র বিগ্রহ দেখা যায় না। মূল মন্দিরের বাহিরে গোপমূর্ত্তি, নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি, এবং সীতারাম ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তির দর্শন করিলাম।

কয়েক বৎসর পূর্বে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ঘোষণা করেন যে মহারাজের যে সকল খাস মন্দির আছে সে সকল মন্দিরে সকল জাতির লোক প্রবেশ করিতে পারিবে। সেই ঘোষণা অনুসারে পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরেও অস্পৃশ্যজাতির লোক প্রবেশ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, মন্দিরপ্রকোষ্ঠে

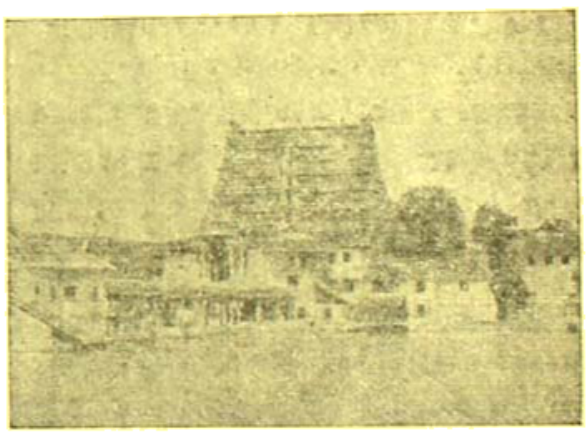

শ্রীপদ্মনাভ স্বামীর মন্দির

তাহারা প্রবেশ করিতে পারে না। ত্রিবাঙ্কুরের যে সকল মন্দির মহারাজার সম্পত্তি নহে, সে সকল মন্দিরে পূর্বে হইতে অস্পৃশ্যজাতির প্রবেশ নিষেধ।

ত্রিবান্দ্রাম নগরটি সুন্দর। লোকসংখ্যা ১,৩০,০০০। সমুদ্র হইতে প্রায় দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত। প্রশস্ত রাজপথ। বড় বড় অট্টালিকা। হাইকোর্ট, য়ুনিভার্সিটি, টাউনহল, যাদুঘর, চিত্রাগার, ওয়াটার ওয়ার্কস্,

ইনেস্টিটিউশন, গভর্ণমেণ্ট মানমন্দির প্রভৃতি বিদ্যমান। এখানকার বেতারে আমি সি-পি-রামস্বামী আয়ার। আমি তাঁহাকে পূর্ব হইতে লিখিয়াছিলাম যে আমি ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপনিষদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে ইচ্ছা করি। বেতারে মহাশয় টাউনহলে বক্তৃতার ব্যবস্থা

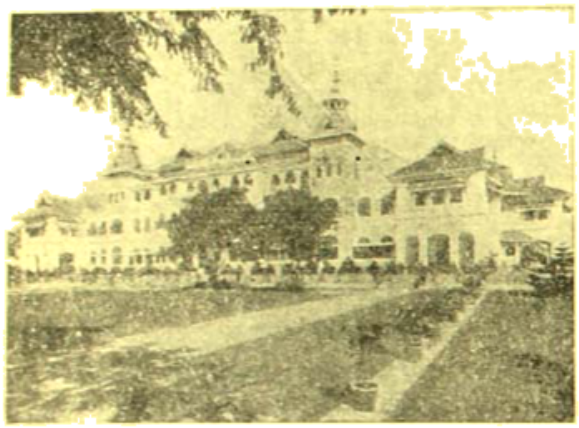

রাজপ্রাসাদ—ত্রিবান্দ্রম

করিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত টি. এম্ কৃষ্ণস্বামী আয়ার সভাপতি ছিলেন। সভায় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ছাত্র আসিয়াছিলেন। মহিলারাজীও অনেকগুলি আসিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরে যত বেশী লোক স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছে ভারতের অন্যত্র তত বেশী লোক শিক্ষালাভ করে নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা এখানে ব্যাপক।

ত্রিবাঙ্কুর নব হিন্দু-বিধান—কুল শঙ্কর অবতরণ। বর্তমান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য পূর্বে বহু খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখনকার ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ছিল পদ্মনাভপুরম্—ইহা ত্রিবান্দ্রম হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে এবং কন্যাকুমারী যাইবার পথ হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে মহারাজা মার্তণ্ড বর্মা অন্য ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয় করিয়া বর্তমান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য স্থাপন করেন এবং সমস্ত রাজ্য শ্রীপদ্মনাভস্বামীকে (বিষ্ণুকে) দান করেন। তদবধি রাজারা নিজেদিগকে পদ্মনাভদাস নামে পরিচয় প্রদান করেন। এই সময় রাজধানী পদ্মনাভপুর হইতে ত্রিবান্দ্রমে আনীত হয়। পদ্মনাভপুরের পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদে বহু উৎকৃষ্ট চিত্র এবং ভাস্কর্য বিদ্যমান আছে, সাধারণে ইহা দেখিতে পারে। এই সকল শিল্পদ্রব্য হেতু ইহা দক্ষিণের অজন্তা নামে পরিচিত।

কন্যাকুমারী তীর্থ ত্রিবান্দ্রম হইতে ৫০ মাইল। মোটরযোগে যাইতে হয়। ত্রিবান্দ্রম হইতে নাগরকোয়েল ৪০ মাইল পর্যন্ত একটি বাস যায়। আবার সেখান হইতে কন্যাকুমারী তীর্থ ১০।১১ মাইল অন্য বাস যায়। নাগরকোয়েল বড় সহর। ইহার নিকট ওটেরম্ নামক তীর্থস্থান। এখানে ইহা মৌহম-পাস হইতে সুরু হয়। নগর—গ্রাম—ক্ষুদ্র স্রোত—বালুকাময় মধ্য দিয়া পথ। মধ্যে মধ্যে দূরে পাহাড় দেখা যাইতেছিল। অপরাহ্ণে আমরা কন্যাকুমারী পৌঁছিলাম। উচ্চভূমি হইতে দিবা সমুদ্রের দৃশ্য অতি সুন্দর। পূর্বে দক্ষিণে পশ্চিমে অনন্ত বিস্তার সমুদ্র। দক্ষিণে তটভূমির নিকট স্থানে স্থানে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সমুদ্র হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শোনা যায়, এইস্থান স্বামী বিবেকানন্দের খুব প্রিয় ছিল। তিনি সাঁতার দিয়া ঐ সকল প্রস্তরখণ্ডের উপরে উঠিয়াছিলেন। এখান হইতে দক্ষিণ মেরু (South Pole) পর্যন্ত কোনও দ্বীপ নাই, প্রায় ৬০ হাজার মাইল কেবল সমুদ্র। স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণার্থ এখানে একটি স্বামী বিবেকানন্দ পাবলিক লাইব্রেরী আছে। এখানে একটি ছত্রম বা ধর্মশালা আছে। Rest House এবং Cape Hotel নামক আধুনিকভাবে সজ্জিত দুইটি বাড়ি আছে। এখানে ভাড়া দিয়া থাকিতে পারা যায়। কুমারী এই স্থানটি পরিবর্তন করিয়া ইংরাজরা নাম দিয়াছেন Comorin।

কন্যাকুমারী ক্ষুদ্র স্থান। এখানে কয়েকটি দোকান ঘর আছে। সমুদ্রের দক্ষিণতম প্রান্তে কুমারী দেবীর বৃহৎ মন্দির। কুমারী দেবীর মনুষ্যসমান মূর্তি—হাতে প্রস্তরময় পুষ্পমালা। এই তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে কৈলাস পর্বতে মহাদেব ও পার্বতী দেবীর নিকট বাণাসুরের স্ত্রী আসিয়া ছিল খুব করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। পার্বতী দেবী ঐ রমণীর নাম পুষ্পকালী রাখিয়াছিলেন। পুষ্পকালীর পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাহাকে বর চাহিতে বলিলেন। পুষ্পকালী বলিলেন, তিনি যেন প্রলয়ের সময় মহাদেবের সহিত ক্রীড়া করিতে পারেন। মহাদেব বলিলেন—তথাস্তু, কিন্তু প্রলয় হইতে অনেক দেরী; কারণ ৩২,৫৬,০০০ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার একদিন, এইরূপ ৩৬০ দিনে ব্রহ্মার এক বৎসর; এইরূপ ১০০ বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু; তাহার পর প্রলয়। যতদিন না প্রলয় হয় ততদিন মহাদেব পুষ্পকালীকে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে তপস্যা করিতে বলিলেন। পুষ্পকালী পৃথিবীতে জন্ম লইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে বাণাসুর পুষ্পকালীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং পুষ্পকালীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। পাণ্ডা-ঠাকুর যে বিবরণ বলিলেন তাহা কিছু ভিন্ন। তাহা স্থানীয় স্থল-পুরাণানুযায়ী। সে বিবরণ এই যে, বাণাসুর বর চাহিয়াছিলেন—কোনও পুরুষ বা রমণী যেন তাঁহাকে বধ করিতে না পারে। কুমারীর নিকট হইতে অবশ্যই তিনি চাহেন নাই। মহাদেব পার্বতীকে বলিলেন, "তুমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর এবং কুমারী অবস্থায় বাণাসুরকে বধ কর, তাহার পর আমি তোমাকে বিবাহ করিব।" পার্বতী কন্যা-কুমারীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বাণাসুরকে বধ করিলেন। তাহার পর বিবাহের জন্য কুসুম, হরিদ্রা, তণ্ডুল প্রভৃতি সকল আয়োজন করিয়া পুষ্পমাল্য হস্তে মহাদেবের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। এদিকে কলিযুগ আরম্ভ হইল। মহাদেব আসিয়া বলিলেন "কলিযুগে দেবতারা বিবাহ করেন না, সত্যযুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে"। দেবী তাই অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার বেহ, হাতের মালা এবং কুসুম, হরিদ্রা, চাউল প্রভৃতি সব উপকরণ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। কোন্ শুভ মুহূর্তে মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া বিবাহ

করিবেন বেলা শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। সমুদ্রতীরে কতকগুলি ঝড় ও ঘরিয়ালগণের বাসুকা পড়িয়া আছে, পাণ্ডাগণ তাহাই অপরীভূত মুকুর ও হরিত্রা বলিয়া থাকেন।

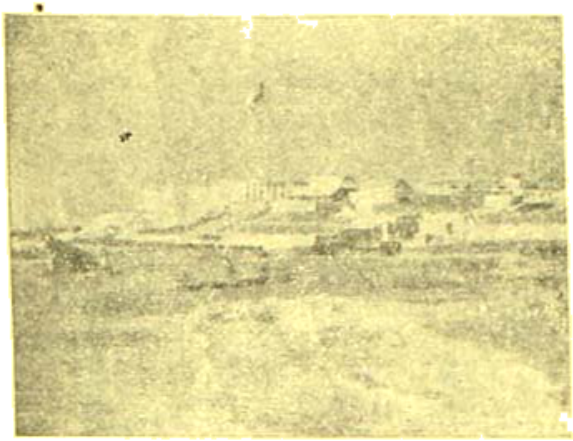

কেপ-কুমারী

কন্যাকুমারী দেবীর মন্দিরের পশ্চাতেই সমুদ্র। সমুদ্রে স্নান করিবার জন্য পাথরে বাঁধান ঘাট, আর জলাশয় আছে। এখানে চক্রতীর্থ এবং পাপনাশ, গায়ত্রী, সাবিত্রী প্রভৃতি এগারটি তীর্থ আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে কন্যাকুমারী গিয়াছিলেন, সেখান হইতে মালাবার উপকূল দিয়া উত্তর ও পূর্ব মুখে পুরী ফিরিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কন্যাকুমারীর পর আমলকীতলা, বাঠাপানী ও পয়স্বিনীর উল্লেখ আছে, তাহার পর অনন্ত পদ্মনাভের নাম পাওয়া যায়। এই অনন্ত পদ্মনাভই ত্রিবান্দ্রামের পদ্মনাভস্বামী। পয়স্বিনী তীরে চৈতন্যদেব আদিকেশবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা বর্ত্তমান তিরুবত্তর নামক স্থানে অবস্থিত। এইখানে তিনি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পুঁথি পাইয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
কলা অন্ত-যেন গুপ্ত পুলক বিকার।
সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ মহিমাজ্ঞানের পরম কারণ।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই অঞ্চলকে "মলয় দেশ" বলা হইয়াছে। মলয় শব্দ বোধ হয় মালাবার শব্দেরই রূপান্তর। এই দেশের লোককে "ভট্টমারি" কেন বলা হইয়াছে বোঝা গেল না। চৈতন্যদেবের সহিত কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণ ছিল, কোনও ভট্টমারি "স্ত্রীধন দেখাইয়া তাহার লোভ জন্মাইয়াছিল," । কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবকে পরিত্যাগ করিয়া ভট্টমারির গৃহে গিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন, ভট্টমারিগণ চৈতন্যদেবকে নানা অস্ত্র লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল, চৈতন্যদেব নিজ বিভূতি প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মালাবার দেশে রমণীরাই ধনের অধিকারী, এই প্রথা লক্ষ্য করিয়া বোধহয় স্ত্রীধন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পদ্মনাভ স্বামীকে দর্শন করিয়া চৈতন্যদেব শ্রীজনার্দ্দন দর্শন করিয়াছিলেন। ত্রিবান্দ্রাম ও কুইলন ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী বরকলা (Varkala) নামক ষ্টেশনের নিকট জনার্দ্দনের মন্দির এখনও বিদ্যমান।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য মালাবার দেশে নম্বুরী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান 'কালটি' ত্রিবান্দ্রাম রাজ্যেই অবস্থিত। নম্বুরী ব্রাহ্মণদের মধ্যে এখনও বহুবিবাহ প্রথা আছে।

ত্রিবান্দ্রাম রাজ্যের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা মুসলমান বা ইংরাজের শাসনাধীন হয় নাই। পুরাণে ইহা পরশুরামক্ষেত্র নামে পরিচিত। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সমস্ত পৃথিবী কশ্যপকে দান করিয়াছিলেন এবং কশ্যপের নির্দ্দেশ অনুসারে পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মালাবার প্রদেশে রমণীরাই ধনের অধিকারী। এখানে প্রত্যেক রমণী তাহার পুত্রকন্যা লইয়া একটি গোষ্ঠি বা পরিবার গঠন করে, স্বামী ভিন্ন পরিবারের অন্তর্গত। রাজবংশেও এই নিয়ম। রাজার পুত্র রাজা হয় না, রাজার ভাগিনেয় রাজা হয়। রাজার পত্নীকে

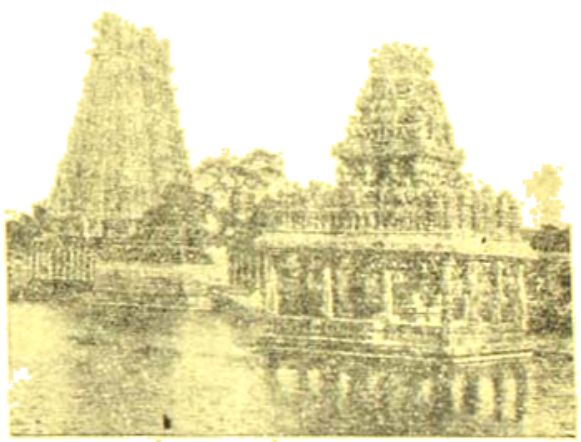

শঙ্খীভ্রামের মন্দির

রাণী বলা হয় না, রাজার মাতা এবং ভগ্নীই রাণী হয়। কোচিন রাজবংশেও এই নিয়ম।

ত্রিবান্দ্রামে শ্রীযুক্ত পি শেষাদ্রি আয়ার নামে একটি ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হয়। ইনি উত্তম বাঙ্গলা জানেন। বিশ্ববাণী নামক মাসিকপত্রে তাঁহার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার একখানি আমাকে দিলেন। তিনি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতে যে সকল স্থান দর্শন করিয়াছেন তাহার আধুনিক নাম কি তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে সেই তালিকা দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত আয়ার ভারতবর্ষের এবং য়ুরোপের প্রায় সকল ভাষাই জানেন। তিনি ত্রিবান্দ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগের অধ্যক্ষ (Superintendent, University Publications)।

চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লিখিত নাম	আধুনিক নাম	চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লিখিত নাম	আধুনিক নাম
ত্রিপদী	ত্রিপত্তি	দক্ষিণ মথুরা	মাদুরা
ত্রিমল্ল	ত্রিকালাহাটি	কৃতমালা	বৈগাই নদী
শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী—কাঞ্চিতম		দুর্বেদন	ঘর্ঘরম্
ত্রিকাল হস্তী	কালহস্তী	মহেন্দ্র শৈল	গন্ধমাদন পর্বত
পঞ্চতীর্থ	ত্রিকণ্ডানুত্তরম	রসুতীর্থ	বসুকোট
শ্বেতবরাহ	ত্রিকিদাবেঞ্জাই	নাগিনী	নবতিরূপতি
	(মহাবলীপুরের নিকটে)	চিরুতলা	চেয়ামাদেবী
পীতাম্বর শিব	চিদম্বরম	তিলকাঞ্চী	তেরকাশী
শিয়ালি	শ্রীকালী	মলয় পর্বত	অগস্ত্যকূটম্
গোবমার	অবড়ডুরা	বরাহ	মালাবার
বেঙ্কট	বেঙ্কটগম্	পয়স্বিনী	তিরুপত্তুর
কৃতমর্ণ	কৃতমালাম্	অনন্ত পদ্মনাভ	ত্রিবান্দ্রাম
ঋষভপর্বত	আনাইমালা	জনার্দন	বরকালা
শ্রীশৈল	তিরুপতি কুন্রম্	পয়োষ্ণী	নগাইকুলম্

বঙ্কিম-বন্দনা

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

মাতৃ-বন্দনার গানে মুক্ত-কণ্ঠ করিতে মুখর,
লক্ষ্মীবেণী-বন্ধনের লক্ষ্যহারা প্রাণ শুভঙ্কর,
জাতির জীবনে নিয়া অভিনব স্পন্দনের ঘোর,
বঙ্গগগনে বিরাজিলে জ্যোতির্ময় তারক-কিশোর।
উষাতুরে শুনাইয়া বেণুমন্ত্র জাগরণী গান,
করে তার সমর্পিয়া গৌরবের দিব্য অবদান
নিখিলে ভারতবর্ষে ভারতীয় নব উপাসনা।
তাই গুরু, বঙ্গভূমি করে আজি তোমারে বন্দনা।

ভাবের বিলাস লয়ে বিদ্যা বালা বীণি কল্পনায়
প্রবেশ করনি তুমি মধু কুঞ্জে বাণী-দেবতার।
বাজায়ে মঙ্গলশঙ্খ দর্পাহত করিবারে সুর
বরষায় বীণা তন্ত্রে পরাইলে কল্যাণের সুর।
সত্যশিবসুন্দরের সিংহাসন সাহিত্য-মন্দিরে
প্রতিষ্ঠা করিলে তুমি মানবের সুখ দুঃখ ঘিরে।
পঙ্কিলতা-লেশহীন শুভ্র তব শুভ্র রচনা
তাই শিল্পী, ভক্তিনত বঙ্গ করে তোমারে বন্দনা।

নিষ্করুণ সভ্যতার অত্যাচার ক্ষুব্ধ ক্ষুব্ধ বসি
যাও নাই উপদেশ অপিক্ষিতে নিত্য উপাসনা।
লয়ে আপন বক্ষে তাদেরই দুঃখদুঃখরাশি,
স্নেহে আপন করি তাদেরই অশ্রু আর হাসি।
ধরিয়া ধরিয়া নিজ হৃদয়ের রচিলে চন্দন,
তুলিলে অমৃতভাণ্ড আপনারে করিয়া মথন,
স্নেহাপ্লুত ভাই বলি বাঙালীরে দিলে আলিঙ্গন।
হে মাতৃল, বঙ্গ ভাই করে আজি তোমারে বন্দন।

এঁকেছিলে একদিন দুর্ভিক্ষের চিত্র ভয়ঙ্কর,
দুর্ভাগিনীদের দুঃখ দুর্ভাগ্যের রাত্রি ঘোরতর
দেখাইলে যে দুর্যোগে ধীরধান দুর্মদ সন্তান
মায়ের পুলিন ধারা আর উচ্চকক্ষে করি স্নান
স্বচক্ষে দেখেছি মোরা পলাশের মহাসমর,
আজিও সম্মুখে দেখি অরহীন লক্ষ নারী নর,
দেখেছি বঙ্গের প্রান্তে প্রাণবন্ত বাঙালী সন্তান
করিতেছে অকাতরে জীবনের সব কিছু দান।

উদ্ধারিলে জননীর নিমজ্জিত রত্নসিংহাসন
শোণিত অক্ষর দিয়া লিখিবারে জাগ্রত জীবন।
এ আনন্দমঠ-ঋষি সত্যদ্রষ্টা, দেখেছিলে তুমি।
তাই ঋষি, তব পদে পূজা দেয় মাতা বঙ্গভূমি।

মাতৃমন্ত্রে অবসন্ন সার্থপর এ জাতির ভালে
বিপুল কালিমাপুঞ্জ জমিয়া উঠেছে কালে কালে।
এ পরাধীনতা-জাত দুঃখতার হোক অবসান,
তোমারে স্মরিয়া মোরা ফিরে যেন পাই সুখ প্রাণ,
সর্বহারা জননীরে দেখি যেন রাজরাজেশ্বরী ;
নগণ্যরূপে বাঁচি, আর নগণ্যরূপে যেন মোরা মরি।

ক্ষণ ও চিরন্তন

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

আমার ঘরখানা সত্যি বড়ো উঁচুতে। বাড়ীটার চারতলায়! দক্ষিণ ও পশ্চিম খোলা। জানালা দু'টো দক্ষিণমুখো। পশ্চিমমুখো আরো দু'টো জানালা। ঘরে হাওয়া আসে প্রচুর। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে শহরের কোনো জায়গায় বাতাস না থাকলেও আমার ঘরখানায় থাকে।

পৃথিবীর বুক থেকে যেনো পৃথক হয়ে আমি শূন্যে বাস করি।

ঘরখানা ছোটো; কিন্তু এর দূর-দৃষ্টি আছে, এ কথা না বলে থাকা যায় না। জানালার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে কতদূর পর্য্যন্তই না দেখা যায়! আশে-পাশে আর দূরত্বের বাড়ীগুলির অন্তঃপুরের নিরালা কোণেও আমার চোখের বাধাহীন চাহনি গিয়ে পড়ে।

এই বাড়ীটা যেন বনিয়াদী বটগাছ। এর সামনের বাড়ীগুলি আগাছা।

বাড়ীটার তিন-তলায় থাকেন, মিত্র পরিবার। সংসার খুব ছোটো। স্বামী আর স্ত্রী। ছেলে-পুলের কোনো বালাই নেই। এঁদের দু'জনেরই বয়েস হয়েছে। কর্ত্তা শ্যামসুন্দর, গিন্নী শৈলজা।

এঁদের সঙ্গেই শুধু আমার অন্তরঙ্গতা।

সুদীর্ঘ বছর ঘরে স্বামীস্ত্রীতে এঁরা, মানে শ্যামসুন্দর আর শৈলজা, সংসার করে আসছেন। সংসার ধর্ম্মের সুখ-দুঃখের সঙ্গে এই দু'টি নর-নারী পরস্পরকে অবিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। এমনভাবে বসবাস করছেন যে, দু-জনকে ভিন্ন আত্মা ভাবা যেনো একটা মহা অন্যায় এবং ভ্রমের ব্যাপার।

শ্যামসুন্দর আর শৈলজার মুখের চেহারা পর্য্যন্ত এক হয়ে এসেছে।

শৈলজা ঠিক করলেন—বাপের বাড়ী যাবেন। একঘেয়ে সংসারের ঘানি-টানা আর তাঁর ভালোলাগে না। জীবনটা শুধু হাঁড়ি ঠেলেই যাবে কেটে? সংসার-ধর্ম্ম তাঁর কাছে আজ বিস্বাদ, অসম্ভব রকম বিস্বাদ বলেই মনে হতে লাগলো।

উনি বাক্স-পাঁটরা গোছাতে সুরু করেন।

শ্যামসুন্দর ভাত না খেয়েই রাগে, ভয়ানক রাগে—বাড়ী থেকে বেরিয়ে হঠাৎ কী মনে করে ফিরে আসেন। দোতালায় এসে ভাড়াটে ধরিত্রীদের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকেন।

ধরিত্রীর এখনো বিয়ে হয় নি। বিয়ের বয়েস হয়েছে। কলেজে পড়ে।

শৈলজা খাবার ঘরে আসেন। এসে দেখেন—স্বামী ভাত ফেলে গেছেন উঠে। মুখের গ্রাস পড়ে রয়েছে।

ওঁর মন অন্তর্ঘাতনায় টন্-টন্ করে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

তিনিও ভাত খান না। নিজের ওপর তাঁর সত্যি রাগ হয়।

শৈলজা উঠে আসেন আমার ঘরে।

বসুম: রাঙামি যে! হঠাৎ এ-সময়ে?

আমি জানি, ওঁদের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটলেই উনি আমার ঘরে না এসে থাকতে পারেন না।

বল্লেন: দুস্তর সংসার! সংসারে আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেলো। ভালো লাগে না বাপু! এতোকাল কেবল যাঁদির মতো গেলুম খেটে!

এই বলে শৈলজা একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে উপবেশন করলেন।

হাসি গোপন ক'রে বসুম: কী হলো আবার? দাদু বুঝি বোকেছেন?

শৈলজা জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে তেমনি-ভাবেই চেয়ে অন্যমনস্কে বল্লেন: হুঁ, বকেছে!

কিন্তু তখুনি দৃষ্টি নিলেন ফিরিয়ে। আমার মুখপানে স্থির দৃষ্টিতে চাইলেন। বল্লেন: বকেছে মানে? আমার

বকবে তোমার দাদু? ইঃ—ভারী সাহস? কামড়ে খাঁড়ার মতো নাকটা টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে দেবো না? আমায় বকবেন, উনি?

হেসে ফেল্‌লুম। হাসি চাপতে গিয়েও পারলুম না। সহাস্যেই বল্লুম: দাদুর নাকটার ওপর আপনার অতো আক্রোশ কেন বলুন তো, রাঙাদি?

উনি হাত নেড়ে এক অদ্ভুত মুখভঙ্গি সহকারে বল্লেন: হবে না? আক্রোশ হবে না তো কী? ঐ নাকটাই তো আমার সতীন। খাঁড়ার মতো নাকওলা লোকগুলোই এ-সংসারে ঝঞ্ঝাটের শিরোমণি। যতো রাজ্যের ঝগড়া আর কু-মতলব ঐ নাকটার ভেতরে আছে—তা জানিস্?

কথাটা রাগের। কেন না, রাঙাদি নিজেই বহুবার আমার কাছে দাদুর প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে করেছেন।

বুঝ্‌লুম, ওঁদের মধ্যে কলহ আশ্রয় করেছে। আজ সকালের দিকটায়, নীচে থেকে ওঁদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আমার ঘর থেকে শোনা যাচ্ছিল।

বল্লুম: রাগারাগি হয়েছে আপনাদের—ভাত খান্‌নি তো? রাগলে তো আপনার অনশন করবার জিদ্ বেড়ে যায়। কিন্তু কী বিশ্রী কথা দেখুন তো! অন্নের অভাবে বাংলার বুক থেকে প্রায় আধ কোটি লোক চোখের জল ফেলতে ফেলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে, আর আপনার নিজের মুখের বাড়াভাত রাগ করে' খান্ না।

শৈলজা আমার কথার তাৎপর্য্য বোধকরি উপলব্ধি করতে পারলেন না। বল্লেন: ভাত? ভাত খাবো কী ক'রে শুনি? কত্তা তো যাচ্ছে তাই করে' আমার সঙ্গে ঝগড়া করলে! আবার তেজ করে' ভাত না খেয়ে উঠে যাওয়া হলো! থাক্ না। না খেয়ে থাকুক না সারাদিন। আমার কী?

কিন্তু আমার উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না ক'রে পুনশ্চ বল্লেন: এতোদিন একসঙ্গে ঘর করে এলুম। মায়া বলেও তো একটা জিনিষ আছে? এই মায়াই তো আমায় খেয়ে বসে আছে। একজন না খেয়ে চলে গেলো, আর আমি বসে বসে খাবো ভাত? তাও কখনো হয়?

স্বরটা নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে' বল্লেন: কিন্তু তোর দাদু গেলো কোথায় বলতো? টিপ্-টিপ্ করে' বৃষ্টি পড়ছে। একটা ছাতাও তো নিতে হয়। ঐ তো শরীর। জলে ভিজে আসবে। দেখতে না দেখতেই সর্দ্দি, কাশি, জ্বর, গলায় ব্যথা! তখন তো বাপু আমারই জ্বালা।

বল্লুম: কোথায় আর যাবেন তিনি! আপনার রাগ হলে যেমন আমার কাছে আসেন, তেমনি দাদুও রাগ হলে গিয়ে বসেন—দোতলায় ধরিত্রীদের ঘরে। ঐ দেখুন না! দাদু হাত মুখ নেড়ে, আর নাকে ঘন-ঘন হাত বুলিয়ে ধরিত্রীকে কতো কথাই না বলে যাচ্ছেন। সুতরাং রাঙাদি, আপনার আশঙ্কার কোনো কারণই দেখছি নে।

আমি স্মিতহাস্যে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে ওদের ঘরখানা দেখিয়ে দিলুম। শৈলজা উঠে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলেন। একটু পরে ঐ দিকেই চেয়ে আমাকে বল্লেন: নিন্দে করছে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমার নিন্দে করছে। কিন্তু দেখ্ সুধাংশু—ধরিত্রীটা কী রকম বেহায়া দেখ্। দাঁত বার করে হাসছে, কেবলি হাসছে। দিতে হয় ঐ দাঁতগুলো নোড়া দিয়ে গুঁড়িয়ে।

শৈলজার আর বাপের বাড়ী যাওয়া হল না। বোধ করি ওঁদের মান-অভিমানের পালা শেষ হয়েছে। ঃ—রাত্রে সেল্‌ফ থেকে মিঃ বসুর "ইতালীর সেরা গল্প" বইখানা খুঁজতে গিয়ে সহসা চোখ গিয়ে পড়লো—তেতলার ঘরে। রাঙাদি দাদুকে খাইয়ে দিচ্ছেন। দাদু হাসছেন। সামনে ভাতের থালা নিয়ে বসেছেন রাঙাদি। দাদু অকৃতজ্ঞ নন্। উনিও রাঙাদিকে দিচ্ছেন খাইয়ে। ওঁদের মুখের চেহারা দেখে বোঝবার কোনো উপায় নেই—আজ সকালে ওঁরা পরস্পরে কলহে উঠেছিলেন মেতে।

রাঙাদির সোনা দিয়ে বাঁধানো গুটিকয়েক দাঁত হাসির ঝলকে ঠিক্ সোনার মতোই মনোরম দেখাচ্ছে।

দিন কয়েক পরে, একদিন দুপুরের দিকে এসে বসলুম রাঙাদিদির ঘরে। ঘর খোলাই ছিল। কিন্তু ঘরের লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখা গেলো না। চাকরটা শুয়েছিল চাতালটায়। প্রশ্ন করতেই বল্লে: বাবু আর মা—দু'-জনেই রাগারাগি করে' বেরিয়ে গেছেন।

আহা এঁদের কী একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে সকালের দিকটায় কলহ হয়েছিল। এটা আমিও জানি। ধরিত্রীরও অজানা নয়।

সিঁড়িতে কার যেনো পদশব্দ! শব্দটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসে।

গুণ গুণ করে' গান গাইতে গাইতে ধরিত্রী ঘরে প্রবেশ করে।

কিন্তু আমার দিকে চোখ পড়তেই একটা অপ্রস্তুতের ভাব ওর সমগ্র মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হতে দেরি লাগলো না। ও আমাকে এই সময়ে এখানে আশা করতে পারে নি। নিজের সহজ চপলগতিতে এই ঘরখানায় প্রবেশ করাতে মনে হলো—ও আপনাকেই মনে-মনে সহস্রবার ধিক্কার দিয়ে উঠলো। আমার সুমুখে হঠাৎ এমনিভাবে এসে পড়াটা ওর দিক দিয়ে যেনো অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে।

ধরিত্রী ঘর ছেড়ে বাইরেও এলো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখতে লাগলো।

বল্লুম: বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বলে আমি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম।

ধরিত্রী কথা কইলে। বল্লে: না না, আপনি উঠবেন না। বসুন আপনি। এঁরা বুঝি কেউ নেই। কিন্তু আমার দরকার ছিল। আচ্ছা, এখন আমি যাই। পরে আসবো অখন।

ধরিত্রীকে ছাড়তে আমার মন চাইলো না। ওকে আমি জানি। জানি বেশ কিছুদিন থেকেই। সেও আমায় জানে। পরস্পরে আমরা অপরিচিত নয়। আমার জানালার নীচে ওদের ঘর। এই ঘরে ওকে দেখেছি অসংখ্য বার। দেখেছি লুকিয়ে, চোরের মতো। সে দেখাতে আনন্দ ছিল বটে, কিন্তু তৃপ্তি ছিল না।

ওর গায়ের রং যেন দুধে-আলতা মিশ্রিত। দেহের কমনীয়তা এমনি যে, নারীর মনেও লালসার উদ্রেক হয়। মাথার কেশ কুচ্‌কুচে কালো এবং কুঞ্চিত। সরল নাক। ঠোঁট দুটির ভেতর চমৎকার শাদা ধব্‌ধবে ছোটো ছোটো দাঁতের সারি। চোখ দু'টি মেঘমুক্ত নীলাকাশের মতোই! ওর যৌবনশ্রী, অনন্যসাধারণ রূপরাশি এবং সীমাহীন মাদকতা পুরুষের মাথা খারাপ করে দেয়।

মুগ্ধ হয়ে বলে ফেল্লুম: কাজ আছে বলছিলেন না? বসুন না একটু। ওঁরা যেখানেই যান, এসে পড়বেন এখুনি।

ধরিত্রী আমার কথা শুনে একটুখানি নিঃশব্দে হাসলো। আমার পরিত্যক্ত আসনটায় উপবেশন করে বেশ সহজ কণ্ঠেই বল্লে: আপনার কথাই রাখলুম। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে-ই রইলেন যে! বসুন, বসুন আপনি!

একটা কাঠের টুল টেনে নিয়ে উপবিষ্ট হলুম।

কিছুক্ষণ ঘরখানায় একটা বিশ্রী রকম নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকলো। কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা দূর করলে—ধরিত্রী। বল্লে: কী দুর্ভাগ্য দেখুন। এতোকাল ঘরে' ওঁরা দু-জনে এক সঙ্গে ঘর-সংসার করছেন, তবু পরস্পরকে চেনেন না!

শুনে ক্ষণকাল মৌন হয়ে রইলুম।

বল্লুম: ওঁদের স্বামীস্ত্রীর বিবাদটা মনে হয়, বিপরীত দিক থেকে আসা দু'টি দক্ষিণা বাতাসের মতো। এই বিপরীত বাতাস সমুদ্রে তরঙ্গের 'পর তরঙ্গ তোলে। তরঙ্গ এতো উঁচুতেও ওঠে যে, বুঝি আকাশটাকেই ফেলে ছুঁয়ে। কিন্তু সেই ক্ষিপ্ত বাতাসের যখন সমাপ্তি ঘটে, তখন সমুদ্র হয়ে যায় শান্ত। তখন সমুদ্রের উপরিভাগ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

ধরিত্রীর কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া গেলো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও সহসা প্রশ্ন করলে: কটা বাজলো বলতে পারেন?

: চারটে হবে।

ধরিত্রী যেনো চমকে উঠলো: বলেন কি? না—না, আর নয়। বড্ডো দেরি হয়ে গেলো। আবার আসবো অখন।

এই বলে ও উঠে দাঁড়ালো।

হাতের ঘড়িটা দেখে বল্লুম: চারটে এখনো বাজে নি তো! সতেরো মিনিট দেরি।

শুনে ধরিত্রী হেসে ফেল্লে। পরিষ্কার, স্বচ্ছ হাসি।

আমার সর্বশরীর অন্তরের সীমাহীন উল্লাসে শিউরে উঠলো। টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই কানে এলো পদ-শব্দ এবং ক্ষণকালের মধ্যেই রাঙাদি আর দাদু প্রসন্নচিত্তেই ঘরে প্রবেশ করলেন।

দাদুকে উদ্দেশ করে ধরিত্রী বল্লে: রাঙাদিকে ধরে নিয়ে এলেন বুঝি?

দাদু একগাল হেসে জবাব দিলেন: আর বলিস্ কেন? বুড়ো বয়েসে ভালো ঝঞ্ঝাট্ হয়েছে যা' হোক! উনি-ই করলেন ঝগড়া, আবার উনিই রাগ করে' বেরিয়ে গেলেন গঙ্গায় ডুবে মরতে! দেখ্ না, হাতের সোনার চুড়িগুলো পর্য্যন্ত খুলে রেখে দিয়েছে!

রাঙাদির হাতের দিকে নজর পড়লো! দাদু মিছে কথা বলেন্ নি। ধরিত্রী নিজেই জোর করে আলমারি খোলাসে রাঙাদিকে দিয়ে। পরিত্যক্ত সোনার চুড়িগুলো দিলে পরিয়ে। সহাস্যে বল্লে: আপনার রাগ তো বড়ো কম নয়, রাঙাদি! তারপর বল্লে: আমি চল্লুম। অনেকক্ষণ এসেছি। আর নয়।

রাঙাদি এ-কথায় আমার দিকে ফিরে চাইলেন। বল্লেন: তুমি কতোক্ষণ এসেছো, সুধাংশু?

: আমি? তা' ঘণ্টা খানেক হয়ে গেছে। ওঁর আসবার আগে।

এই বলে আমি আঙুল দিয়ে ধরিত্রীকে দেখিয়ে দিলুম।

রাঙাদি স্মিত হাস্যে ধরিত্রীকে লক্ষ্য করে' বল্লেন: তা' হলে তোর সময়টা বৃথা যায় নি বল, ধরিত্রী?

এই মন্তব্যে যে-ইঙ্গিতটা প্রচ্ছন্ন ছিল, সেটা ধরিত্রী বুঝতে পারলে। ওঁর মুখখানা রক্তাভ হয়ে উঠলো। এবং সেটা নিরীক্ষণ করে আমার নিজের বুকটা একটা অজানা সৌভাগ্যে দুরু-দুরু করে উঠলো।

* * *

সমস্ত রাত্রিটা সেদিন ধরিত্রীকে স্বপ্নে দেখলুম। পরদিন প্রভাতের প্রথম আলোয় শয্যা ত্যাগ করে গিয়ে দাঁড়ালুম—জানালাটার সুমুখে। তখনো ওর ঘরের জানালা খোলে নি।

ফিরে এলুম। কিন্তু মনের মধ্যে একটা দুর্নিবার আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাকে অস্থির করে তুল্লে।

আবার জানালাটায় গিয়ে দাঁড়ালুম। তখন সূর্য্য পূবদিকে অনেকটা আকাশের গায়ে উঠে গেছে।

দেখলুম, ধরিত্রী উঠেছে।

দু-জনের দু-জোড়া চোখ সহসা এক হয়ে গেল। ফিক্ করে হেসে ফেলে ধরিত্রী। কিন্তু আর ওকে দেখা গেল না।

* * * *

এই মিত্র-দম্পতির সান্নিধ্যকে কেন্দ্র করে আমার ও ধরিত্রীর মধ্যে আকর্ষণ এবং ভালোবাসার একটা বন্ধন একটু-একটু করেই সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে গেলো। একে আমরা কেউ-ই উপেক্ষা করতে পারলুম না।

তাই ভগবান একদিন আমাদের দু-জনের হাত এক করে' দিলেন।

বিয়ে করলে মানুষের সুখ-স্বচ্ছন্দের দিকে আগ্রহটা বেড়ে ওঠে। ধরিত্রীকে পূর্ব্বরূপের মধ্য দিয়ে পেয়েছি। ওকে সুখী করতে আমি এই বাসাটা পরিত্যাগ করলুম। শহরের গোলমাল থেকে অব্যাহতি পেতে একটা নিরিবিলি স্থানে বাড়ী ভাড়া করা গেলো। এখানের নীচে থেকে আকাশ দেখা যায় চোখ ভরে'। সবুজ গাছ-পালা দেখে, মনে আসে অনাবিল আনন্দ। ধরিত্রী আর আমি। আর কেউ নেই। এই আমাদের ভালো।

ধরিত্রীর স্ফূর্ত্তি আর ধরে না। হাসে, কেবল-ই সে হাসে, ওর গতির মধ্যে একটা অপূর্ব্ব ছন্দ-লালিত্য আমাকে মুগ্ধ করে। ওর চোখের চাহনি, চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারার মতো মনোহর। ওর কথার বাণীগুলি যেনো মধু দিয়ে তৈরি।

সত্যি ধরিত্রীকে আমার এতো ভালো লাগে!

কিন্তু আমার একটা দোষ আছে। সেটা লেখার দোষ। লেখবার সময় আমি ধ্যানস্থ—বাইরের জগতের সঙ্গে যেনো কোনো সম্পর্ক নেই, এমনি ভাব!

অন্য সময়ে, না লিখলেও—গল্পের গতি এবং পরিণতির সম্বন্ধে একাগ্রতার সঙ্গে চিন্তা করি। এই অন্যে প্রায়-ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। ধরিত্রী যখন আমার সান্নিধ্য চায় পেতে, তখন হয়তো আমি কল্পনা জগতে বিচরণ করি।

* * * * *

রাত্রে একটা গল্প শেষ করতে বসেছি। লিখতে বেশ ভালো লাগছে।

আজ-ই পরিসমাপ্তি ঘটাতে না পারলে, দ্বিতীয় দিন পেরে উঠবো না।

ধরিত্রী মশারীর ভেতর থেকে এলো বেরিয়ে। বল্লে: কটা বাজলো, খেয়াল আছে? একটা যে বেজে গেলো। শোবে এসো। একলা ঘুম আসছে না।

কোনো জবাব দিলুম না। লিখেই যেতে লাগলুম।

: শুনতে পাচ্ছো না? তাতো পাবেই না! আমি তোমার কে যে, আমার জন্যে তোমার দরদ্ হবে?

ধরিত্রীর কণ্ঠস্বর অভিমানে আর্দ্র।

কিন্তু আমি তথাপি নিরুত্তর।

: এ রকম করলে, ভালো হবে না বলছি। আমি একলা বিছানায় থাকবো শুয়ে, আর উনি লিখে রাত্রি কাটিয়ে দেবেন! ভারী ই-য়ে হয়েছে!

রাগ হলো। বল্লুম: বিরক্ত করো না। কানের কাছে এসে বক্-বক্ করার চেয়ে শোওগে যাও না তুমি। তোমার তো ঘুম্ হাত-ধরা। পড়লেই ঘুম। পাশে একটা লোক থাকে, হুঁস থাকে না তোমার!

ধরিত্রী তৎক্ষণাৎ মুখ ঝাম্টা দিয়ে বল্লে: ঘুমবো না তো কী? জেগে থাকবো তোমার জন্যে সারা রাত্রি? বয়ে গেছে আমার। সংসারের খাটুনিটা তুমি খাটবে—না?

বলেই ও উত্তরের প্রত্যাশা না করে' সক্রোধে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

পরদিন।

বল্লুম: গল্পটা শুনবে? লেখা শেষ হয়েছে।

ধরিত্রী নিজের জন্যে সায়া সেলাই করছিল। বল্লে: না। শোনবার সময় নেই আমার।

: মানে? বসে-বসে তো সেলাই করছো। শোনবার সময় হয় না?

: না। ও ছাই আমার ভালো লাগে না।

: ভালো লাগে না?

: না—না—না। কতোবার বলবো? তোমার লেখা আমার ভালো লাগে না। হলো তো?

আর একদিন।

ধরিত্রী কোথায় ছিল জানি না। আমার জুতোর শব্দে কাছে এলো। বল্লে: তোমার বইয়ের সমালোচনা বেরিয়েছে কাগজে না? পড় না গা?

বল্লুম: কাগজ তো সামনেই রয়েছে। পড়লেই পারো।

: কেন, তুমি একটু শোনাতে পারো না পড়ে?

: না। আমার সময় নেই।

অপর একদিন।

খেতে বসেছি।

ধরিত্রী বল্লে: কপির ডাল্নাটা কেমন হয়েছে গা?

বল্লুম: ভালো নয়। নুন্ আর হলুদ হয়েছে বেশি!

শুনে ওর মুখ ভার হয়ে ওঠে। বলে: আমার রান্না তোমার ভালো লাগবে কেন? তুমি আমায় দেখতে পারো না। আমার ছায়া দেখলে তোমার গা' ঘিন্-ঘিন্ করে।

ধরিত্রীর গলার স্বর অনুসরণ করে' মুখ তুলে চাইলুম। দেখলুম—ওর সুন্দর মুখখানার ওপর অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ছে—সদ্য-প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর শীতের শিশির বিন্দুর মতোই।

•

• •

আজ রবিবার। বায়স্কোপের টিকিট কিনে আন্লুম দু'খানা।

ধরিত্রীকে বল্লুম: শিগ্গির তৈরি হয়ে নাও। ম্যাটিনীতে যাবো সিনেমায়। চমৎকার ছবি।

ওর কোনোই উৎসাহ দেখা গেলো না। বল্লে: তুমি দেখোগে যাও। আমার দরকার নেই।

: তার মানে? তুমি বসতে চাও টিকিটখানা নষ্ট হবে? ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট। দু'-টাকা ছ'-আনা দাম—জানো?

: নষ্ট হবে কেন? গিয়ে বিক্রি করে দাও না! বাড়তি কিছু আসবে!

রাগ হলো। বল্লুম: বাজে বকো না। অনাবশ্যক ঝগড়া করা তোমার আজকাল একটা বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকম করলে, আমি তো আর পেরে উঠবো না। জীবনটা দেখছি এরই মধ্যে অসহ্য হয়ে উঠলো।

ধরিত্রী জানালার দিকে মুখ করে বলে: আমারও ঠিক্ তাই মনে হচ্ছে। সত্যি, আমার আর ভালো লাগছে না।

ওর দিকে এগিয়ে আসি। সিক্ত চোখের পাতা মুছিয়ে দিতে হাত দিলাম প্রসারিত করে'। কিন্তু ধরিত্রী আমার হাতখানা জোর করে' সরিয়ে দিয়ে, পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে হাওয়ার মতো বেরিয়ে গেল।

ক্রোধাধিক্যে হাতের টিকিট দু'খানাই ছিঁড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো করলুম। দলা পাকিয়ে দিলুম বাইরে নিক্ষেপ করে'। তারপর রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম।

বাড়ীর সম্মুখেই একটা পার্ক। পার্কেই ঢুকে পড়লাম। পার্ক প্রদক্ষিণকালে নানা প্রকার চিন্তা আমার মনে ভিড় করতে সুরু লাগলো। :—তাইতো! কেন এমন হচ্ছে? বিয়ের প্রথম আটমাস কী সুখেই না কেটেছিল! কিন্তু এখন? এখন যেনো বিপরীত দিক থেকে আসা দু'-টি প্রবল বাতাসে লেগেছে দারুণ সংঘর্ষ! হায় রে! এই সময় যদি শ্বশুর শাশুড়ী আর শৈলজা থাকতেন! আমরা তাঁদের দাম্পত্য-কলহে মধ্যস্থতা করে' তাঁদের কলহ দূর করতুম। তাঁদের মনে আবার দিতুম শান্তির ধারা বহিয়ে। আমাদের এই কলহে নিশ্চয়ই তাঁরা মাঝে থেকে আমাদের কলহ দূর করতেন। আমাদের মনে আবার শান্তির ধারা দিতেন বহিয়ে!

সেতার অনভিজ্ঞ লোকের টোকায় সেতার ব্যথা পায়। সুর বিকৃত হয়। যিনি ওস্তাদ লোক, তাঁর হাতে সেতারের হয় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

সেতার কথা বলে। ওস্তাদ তাকে চালান। সে জানে, সেতার আনন্দে ছন্দ-মাধুরীতে তার কথা শোনে। এতে সেতারের পরম তৃপ্তি। ওস্তাদেরও শান্তির অন্ত থাকে না।

বাড়ী ফেরবার পথে এই কথাই আমার বারংবার মনে হতে লাগলো। তাই তো, আমি তো অনভিজ্ঞ সেতারা!

* * * * *

ধরিত্রী আমার একখানা বাই-স্কটোর সামনে মুখ করে' দাঁড়িয়ে বোধ করি আমার চেহারাটাই একদৃষ্টে দেখছিল। আমি ঘরে আসতেই জুতোর শব্দে সে ফিরে চাইলে।

ধরিত্রীর দু-চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু ঝরে' পড়ছে। যেনো যুক্ত। মুক্তো গড়িয়ে পড়ছে নিটোল দুটি রক্তাভ কপোলের ওপর দিয়ে।

তাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করলুম। কোনো বাধা দিলে না সে! অশান্তির মাঝে শান্তির আলোক দেখলে মানুষ যেমন তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তেমনি ধরিত্রী পরম অনুরাগ ভরে নিজের মাথাটা আমার কাঁধের ওপরই ন্যস্ত করলে।

আদর করে ধরিত্রীকে শান্ত করলুম।

বল্লুম: ওসব ভুলে যাও ধরিত্রী! মানুষ ভুল করে। ভুল করা মানুষের ধর্ম্ম।

ধরিত্রী এবার আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। ক্ষণকাল পরে রুদ্ধকণ্ঠে বলে: তিনি আর নেই!

একখানা চেয়ারে উপবেশন করলুম। উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলুম: কে—কে তিনি?

: রাঙাদি। আমাদের সেই রাঙাদি।

শুনে আমারও মনটা মর্ম্মান্তিক যাতনায় পরিপ্লুত হয়ে উঠলো। বেশ উপলব্ধি করলুম, আমার চোখ দু-টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে।

ধরিত্রী চোখ মোছবার কোনো চেষ্টা না করে' ধরা গলায় বল্লে: ভগবান এবার সত্যি ওঁদের দু-জনকে আলাদা করে দিলেন।

: কিন্তু তুমি জানলে কী করে'?

: এই দেখো টেলিগ্রাম। তুমি বেরিয়ে যাবার পর পিওন দিয়ে গেছে।

এই বলে ধরিত্রী ব্লাউজের ভেতর থেকে টেলিগ্রামখানা বের করে' আমার হাতে দিলে।

পড়লুম। বল্লুম: আমি যাই একবার।

ধরিত্রী আমার হাত ধরে' প্রেমপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করলে: আমি যাবো তোমার সঙ্গে? তুমি কী বলো?

: তুমি যাবে? কিন্তু আমি বলছিলুম কি, যে আমিই যাই এখন। তোমাকে বিকেলের দিকে নিয়ে যাবো—কেমন?

ধরিত্রী কোনো আপত্তি করলে না। বল্লে: আচ্ছা। কিন্তু তুমি আর দেরি করো না।

: না। এখুনি বেরিয়ে পড়ছি।

*

* *

কিন্তু গিয়ে যা' দেখলুম, তাতে আমি শুধু বিস্মিত হলুম না—মুগ্ধও হলুম। ওঁদের স্বামী স্ত্রীর অখণ্ড ভালোবাসা যে ওপারেও অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেলো, এর প্রমাণ আমি চাক্ষুষ পেলুম। তখনো রাঙাদির স্পন্দনহীন শীতল দেহটার

পার্শ্বে দাদুর প্রাণহীন দেহটাও নিঃসাড়ে শুয়ে আছে। সকলে বল্লে: দাদু স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছেন। জীবনের সাথীকে তিনি ছেড়ে থাকবেন কী করে'?

দাদুর মুখে সেই শিশুসুলভ হাসি! সেই হাসি-হাসি মুখখানার পানে চেয়ে আমার যেনো মনে হলো উনি বলতে চাইছেন—মৃত্যুও আমাদের পৃথক করতে পারলে না।

তাঁর মুখে এ যে জয়ের হাসি, পরম তৃপ্তির হাসি!

শবদাহ করে' রাত্রি দশটার পর বাড়ী ফিরলুম।

ধরিত্রী জানালায় দাঁড়িয়ে বোধ করি আমার-ই জন্যে উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করছিল।

আমার রুক্ষকেশ আর সিক্ত বসন দেখে ও ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে' রইলো চেয়ে।

হাত ধরে' ওকে এ-ঘরে নিয়ে এলুম। সিক্ত বসন পরিবর্ত্তন করে' কৌচে বসলুম। ধরিত্রীকে বসালুম পাশে। তারপর সব বললুম।

শুনে ধরিত্রী, ঠিক্ নিথর পাষাণের মতোই বহুক্ষণ আমার মুখপানে নির্নিমেষে চেয়ে রইলো। তারপর এক সময়ে সহসা আমার কণ্ঠদেশ, তার মৃণাল ভুজ দু'টির সাহায্যে বেষ্টন করে' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আস্ফুটে বারংবার বলতে লাগলো: হ্যাঁ গা, আমরাও এরকমভাবে মরতে পারবো তো?

খাদ্য সমস্যা সমাধানে গোলআলুর স্থান

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম-এসসি

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মহম্মদ আফজল হোসেন, এম-এ, এম-এসসি, ডাহোমে তাঁহার অভিভাষণে ভারতের খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাঙলার জনসাধারণের পক্ষে তাঁহার এই অভিভাষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

অধ্যাপক হোসেন দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে হারে বাড়িতেছে তাহাতে ১৯৭০ সালে ভারতের লোক সংখ্যা ৭০ কোটি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং বর্ত্তমান জনসংখ্যার জন্যই যখন পর্য্যাপ্ত খাদ্যের সংস্থান নাই তখন ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান্ লোক সংখ্যার জন্য যে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের লোকের আয়ুষ্কাল অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্দ্ধেকেরও কম। তারপর আমাদের অধিকাংশ লোকই উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে ও অন্যথা নিতান্তই ক্ষীণজীবী। জীবনীশক্তির অল্পতা-প্রযুক্ত আমরা সহজেই সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে পতিত হইয়া থাকি। বিশেষজ্ঞরা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান লোকসংখ্যার উপযুক্ত খাদ্য সংস্থান করিতে হইলে বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা নিম্নলিখিত হারে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইবে। ধান যব গম প্রভৃতি শ্বেতসার-প্রধান খাদ্যশস্য শত করা ১০ অংশ, মটর কলাই প্রভৃতি ডাল জাতীয় শস্য শতকরা ২০ অংশ, তৈল জাতীয় পদার্থ শতকরা ২৫০ অংশ, ফল শতকরা ৫০ অংশ, শাকসব্জি শতকরা ১০০ অংশ, দুগ্ধ শতকরা ৩০০ অংশ এবং ডিম, মাছ-মাংস শতকরা ৩০০ অংশ। বলা বাহুল্য, লোকসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে উল্লিখিত খাদ্যদ্রব্যগুলিও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইবে।

কর্ণেল ম্যাকে, ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ প্রভৃতি খাদ্যবিদ্ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীর সাধারণ খাদ্যে আমিষ পদার্থের শোচনীয় অল্পতাপ্রযুক্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তিহীনতা ক্রমশঃ ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। লেখকের খাদ্যবিজ্ঞান গ্রন্থেও ইহার সম্যক আলোচনা করা হইয়াছে। জন রাসেল বলিয়াছেন—ভারতবাসীর বর্ত্তমান খাদ্যে শ্বেতসার উপাদান(চাউল আটা প্রভৃতি) খুব অল্প বলা যায় না ; তবে দুষ্কীখাদ্য—আমিষ, তৈল ও লবণ জাতীয় পদার্থ এবং ভিটামিনের তরফ হইতে ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বাংলা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর লোকের খাদ্য নিতান্তই অপ্রতুল। খাদ্যের শেষোক্ত উপাদানগুলি যথা মাংস ডিম দুগ্ধ শাকসব্জি ও ফল হইতে পাওয়া যায়। আর ইহাদের অভাবে মানুষ রোগ পরবাহ্য হইয়া পড়ে। তাই অধ্যাপক হোসেন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"How else can one explain the curious phenomenon that lakhs died in Bengal without attempting to obtain food by fighting for it." অর্থাৎ ইহা নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয় যে বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল অথচ তাহারা খাদ্য লাভের জন্য কোনওরূপ উদ্যম্ চেষ্টা অবলম্বন করিল না। ফলতঃ যতকাল যাবৎ অত্যাবশ্যক খাদ্যোপাদান হইতে তিলে তিলে বঞ্চিত, নিরীর্য্য ও অন্তঃসারশূন্য না হইলে দলে দলে নিরীহভাবে মৃত্যুবরণ করা কোনও দেশের সজীব মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে।

বাংলাদেশে রক্ষীধান্যের ত কথাই নাই, সাধারণ শক্তিপ্রদ খাদ্যোপযোগী চাউল আটা প্রভৃতির অভাব ও অন্নকষ্টও সর্বত্র স্বীকার্য্য। সকলেই জানেন, বর্ত্তমান বর্ষে বাংলার অধিকাংশ জিলাতেই ধান জন্মে নাই বলিলেও চলে। লেখক যখন বাংলার যে সব গ্রামের সহিত সুপরিচিত সেখানে এখন এমন একজন গৃহস্থও নাই যিনি সংবৎসর ক্ষেতের ধানে সংসার চালাইবেন। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে সেই সব স্থানে ভবিষ্যতও শীতকালীন বৃষ্টির অভাবে নষ্ট হইতে চলিয়াছে। দেবমাতৃক বাংলাদেশ গত কয়েক বৎসর যাবৎ নিষ্ঠুরভাবে দৈবকৃপা বঞ্চিত হইয়াছে। সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় আউশ ধান বোনা দেরী হইয়া যায়—এদিকে দেরীতে বুনা ধান পাকিবার আগেই বানের জলে ডুবিয়া যাওয়ার সুদৃঢ় দুর্ঘটনা চলিতে থাকে। আষাঢ় আষাঢ়ে ধান তুলিবার সময় বৃষ্টির অভাবে আউশ ধান নষ্ট হইয়া যায়—রোপা ধানও ঐ সময় বৃষ্টি না হওয়ায় রোপণ করাই ঘটিয়া উঠে না। এই কারণবিধায়ক ব্যাপার গত কয়েক বৎসর হইতে সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। সুতরাং বাংলাদেশের অনেক স্থলেই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় জলসেচের ব্যবস্থা না করিলে হতভাগ্য বাঙালী জাতি দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস হইতে নিস্তার পাইবে না। পদ্মার হালিচরে যে সব জায়গায় পলি পড়ে সেখানে উৎকৃষ্ট জমিধান প্রচুর ফলে। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় চৈত্র বৈশাখে ধান তুলিবার সময় বৃষ্টি না হওয়ায় ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ঐ জমি ধানের জমির চেয়ে ৫০০ হাতের মধ্যেই পদ্মার অফুরন্ত জল, কিন্তু সেচের ব্যবস্থা না থাকায় কৃষক চাষকের মত আকাশের পানে চাহিয়া থাকে এবং দেবতার দয়া না হইলে তাহার সমস্ত আশা নিরাশায় পর্য্যবসিত হয়। জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করিয়া লোকের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা ও বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া এই শোচনীয় অবস্থার অবসানকল্পে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করা শাসিতশীল জাতীয় গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য।

ধান যব গম প্রভৃতির পরেই শ্বেতসারযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে গোল আলু উল্লেখযোগ্য। এই গোল আলুর জন্য প্রধান আবশ্যক উৎকৃষ্ট সস্তা বীজ, সস্তায় ও স্থানবিশেষে জলসেচের ব্যবস্থা। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে গোল আলুর চাষ হইতে পারে; ফলে দেশবাসীর খাদ্য সমস্যারও অনেকটা সমাধান সম্ভবপর।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধান যব গম ও গোল আলু কি পরিমাণ জন্মিয়া উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেক ফসলের অনুপাতে গোল আলুর চাষ কি পরিমাণ তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় লিখিত হইল :—

দেশ	গোল আলু	ধান যব গম ও অন্যান্য প্রভৃতি শস্য	উপরের শতকরা অনুপাত
ভারতবর্ষে	৪৪০০০০ একর	১৭৯২৭৬০০০ একর	২·৪
জর্মানি	৭০৪৪০০০ ,,	২৮১৭৬০০০ ,,	২৫·০
ফ্রান্স	৩৪১১০০০ ,,	২১৩৬৯০০০ ,,	১৬·০
বিলাত	৭৩৩০০০ ,,	৩১২৪০০০ ,,	১৭·৮
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৩২৭৪০০০ ,,	২১০০৬৬০০০ ,,	১·৫
রুশিয়া	১৭৬০১০০০ ,,	২৪৪২২২০০০ ,,	৭·২

উপরের তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, জার্মানিতে যতবার ৩৮ মত চাষ হয়, তাহার শতকরা ২৫ অংশ গোলআলুর আবাদ হইয়া থাকে। ফলতঃ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অপর্য্যাপ্ত গোলআলুর চাষ প্রবর্ত্তিত না হইলে জার্মানি গত যুদ্ধে মাথিতেই পারিত না বলিয়া অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আটা ময়দা ও গোলআলু লোকের দৈনন্দিন খাদ্যে কি অনুপাতে ব্যবহৃত হয় নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

দেশ	আটা ময়দা প্রভৃতি	গোলআলু
জার্মানি	১০৮·৪	২৪৭·৮
বেলজিয়ম	২২৪·৪	২৩০·২
পোল্যাণ্ড	১৮৮·৬	১৭৪·১
চেকোশ্লোভেকিয়া	১৮৭·৯	১১৮·০
সুইডেন	১১২·৯	১০১·১
ফিন্‌ল্যাণ্ড	১২৯·৯	১১০·৪
বিলাত	৮৭·৩	৭৮·১
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৭৯·৮	৪৪·৩

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে, জার্মানি ও বেলজিয়মের লোকে আটা ময়দার চেয়ে গোলআলুই বেশী খাইয়া থাকে। ফলতঃ ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই লোকের দৈনন্দিন আহারে রুটিবিস্কুট এবং আলু প্রায় সমপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

খাদ্য হিসাবে গোলআলু বা রাঙাআলু যে চাউল বা আটা হইতে নিকৃষ্ট নয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে বেশ বুঝা যাইবে।

টাটকা গোলআলুতে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জল থাকে এজন্য শুকাইয়া জলের ভাগ শতকরা ১২·২ করা যেখানে হইয়াছে—

শতকরা	চাঁকিছাটা চাল	আটা	গোলআলু	রাঙা বা লাল দেশী আলু (মৌ আলু)
জলীয় অংশ	১২·৪	১২·৮		
আমিষ পদার্থ	৮·৫	১১·৮	৫·৩	৩·১
তৈল পদার্থ	০·৩	১·৪	০·৩৪	০·৭৮
লবণ পদার্থ	০·৭	১·৪	২·১	২·৩
শ্বেতসার ও পর্করা (কার্বোহাই ড্রেট)	৭৮·০	৭১·২	৭৯·৩	৮১·২
চুণ জাতীয় পদার্থ	০·০১	০·০৫	০·০৩	০·০৫
ফসফরাস	০·১৭	০·৩২	০·১	০·১৩

সুতরাং দেখা যাইতেছে—শ্বেতসারপ্রধান খাদ্য হিসাবে গোলআলু বা রাঙাআলু ভাত বা রুটির অপেক্ষা আদৌ নিকৃষ্ট নয়। আমাদের দেশের অনেক অকেজো জমিতেও অনায়াসে রাঙাআলুর আবাদ চলিতে পারে। উঁচু বোয়াল মাটিতে বৎসরে দুইবার রাঙাআলুর চাষ করা যায়। ইহার ফলনও মন্দ নয়। জমির উর্বরতা অনুসারে বিঘাপ্রতি ৩০ মণ হইতে ১০০ মণ পর্য্যন্ত রাঙাআলু ফলিয়া থাকে। গোলআলুও বাংলাদেশে ভালভাবে চাষ করিলে উৎকৃষ্ট ফসল দিয়া থাকে। বাংলাদেশের অধিকাংশ পুরাতন গ্রামেই অনেক পতিত জলযুক্ত ভিটা আছে। ঐ সব জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আবা

করিলে গোলআলু অনেক ভাল ফলিয়া থাকে। পাবনা জেলার কয়েক গ্রামে এরূপ ভিটামাটিতে উৎকৃষ্ট প্রকারের গোলআলুর প্রচুর ফলন লেখক দিখেই দেখিয়াছেন। এরূপ জমিতে আমাদের আর একটি সুবিধা এই যে, কয়েকবৎসর ক্ষেতে কোনও সার দিবার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য যদি করিয়া সার দিয়া ও সময়ে সেচের ব্যবস্থা করিয়া বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানেই গোলআলুর চাষ করা যাইতে পারে। লেখক অবগত আছেন যে, ডায়মণ্ডহারবারের নিকট তাঁহার এক বন্ধুর বসতবাটি সংলগ্ন জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে খৈলের সার দিয়া গোলআলুর চাষ করাতে তিনি গত বৎসর ৯ কাঠা জমিতে ২৩ মণ উৎকৃষ্ট বড় সাইজের গোলআলু উৎপন্ন করিয়াছেন। গোলআলুর ক্ষেতে বেড়ীর খৈল বিঘাপ্রতি ৩০ মণ পরিমাণ দিলে উৎকৃষ্ট ফসল হইয়া থাকে।

খেতমজুর প্রধান তিনটি শস্য সমগ্র পৃথিবীতে বর্ত্তমানে কি পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা জানান হইল—

ফসল	পৃথিবীর উৎপন্নের পরিমাণ
গোলআলু	৬০১ কোটি মণ
ধান	৩৯৩৯ কোটি মণ
চাউল	২৬১৭ কোটি মণ

১৯৩১ সালে আমেরিকার প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তি নিকলসন বলিয়াছিলেন—"পূর্বে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে প্রায়ঃ দুর্ভিক্ষ লাগিয়া থাকিত, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপকভাবে ঐ সব দেশে গোলআলুর আবাদ প্রচলন হওয়াতে আর দুর্ভিক্ষ দেখা যায় না।" তিনি বলিয়াছেন—"চীনদেশে প্রচুর পরিমাণে গোলআলুর চাষ আরম্ভ হইলে ঐ দেশের অন্নকষ্ট লাঘব হইবে।" চীনের সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও যে উহা সমভাবেই প্রযোজ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশবাসীর ও গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের সমবেত একনিষ্ঠ চেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশে অন্ততঃ যত বেশী পরিমাণে গোলআলুর চাষ প্রবর্ত্তিত হয় ততই মঙ্গল—এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইবার অবসর নাই।

নর ও নারী

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বিচিত্র নন্দন কাননে বিধাতা আর একটি নূতন জীব পাঠাইয়া দিলেন। সেই প্রথমদিন প্রথম মানব আপনাতেই মগ্ন হইয়া থাকে। নন্দনের বৈচিত্র্য তাহার অন্তরস্পর্শ করে না। কত দিন তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কোনও গতির ছন্দ তাহার অঙ্গে কুটিল না। সারা নন্দন তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবে—এত সুন্দর! তবু ছন্দহীন!

বিধাতা একদিন কৌতুক করিয়া সেই আপন-ভোলার পাশে আসিয়া বসিয়া রহিলেন। দীর্ঘ মুহূর্ত্তগুলি নিঃশব্দে সকৌতুকে পাশ দিয়া দেখিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। শেষে বিধাতা এক সময় হাসিয়া অন্তর্ধান করিলেন। কতক্ষণ পরে মানবের মনে হইল, বিধাতা পাশে বসিয়াছিলেন তো বেশ! নন্দন দেখিল, সুন্দরে চেতনা ফুটিতেছে!

মানব বলিল—কোথায়? বিধাতা বলিলেন—এখানে। মানব বিধাতার কণ্ঠ অনুসরণ করিয়া সেখানে আসিয়া দেখিল—নাই, সে তো নাই। বিধাতা সকৌতুকে আর এক দিক হইতে বলিলেন—এই তো এখানে। মানব এদিক হইতে ওদিক ছুটিয়া বেড়াইল, কিন্তু বিধাতার সন্ধান মিলিল না। নাই মিলুক, তবু এই সন্ধান তরে চকল চরণ-নিক্ষেপও বেশ মধুর! হরিণ ছুটিয়া গেল পাশে, গ্রীবা উচ্চে তুলিয়া মুগ্ধ নয়নে নীরব ভাষায় মানবকে আহ্বান করিল—এসো লীলা করি। চকলতম চরণ ফেলিয়া মানব-সঙ্গীটিকে পশ্চাতে হারাইয়া হরিণ কোথায় চলিয়া গেল। মানব দেখিল—ওই বহুদূরে হরিণ কেমন আর একটি হরিণের সাথে বিতালী করিতেছে। সারা নন্দনে এখানে দুটি হরিণ, ওখানে দুটি পাখী, শুধু দুয়ে দুয়ে ছন্দ!

মানব বিধাতাকে বলিল—তোমাকে আমার খেলার সঙ্গী হইতে হইবে। আমরাও দুয়ে মিলিয়া ওদের সম্মুখে বেড়াইব। বিধাতা কৌতুক করিলেন—আমার সময় নাই, তোমার সঙ্গী হইবার মতো অতো অবসর নাই। মানব চাহিয়া দেখিল, তখন একে অপরের সম্মুখে করিতেছে দুজন গুঞ্জন, আর একটি এক সঙ্গিনীকে ডাকিতেছে কেকা! মানব তাও বুঝিল না, কিন্তু তাহার ভাল লাগিল। বিধাতার প্রত্যাখ্যানে মনে আসিল কেমন যেন বিষণ্ণতা, কেমন যেন একত্ব বোধ। মানব বিধাতাকে

অনুরোধ করিল—তুমি না সঙ্গী হও, আমার মতো আর এক জন সঙ্গী এনে দাও। বিধাতা হাসিলেন খানিক।

সেদিন মানবের পাশে মানবকাব্যের প্রথম ছন্দে যে আসিয়া দাঁড়াইল, মানব তাহার পানে চাহিয়া বিস্ময়ে বলিল—সুন্দর! তুমি হবে তো আমার সাথী? সে বলিল—সন্দেহ কেন? সেদিন সারা নন্দন সে চরণে লুটাইয়া অভিনন্দন পাঠ করিল। হে অনুপমা! কুসুমে কুসুমে নও উপহার, শাখে শাখে শোন গান, দেব ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিলে রঙ! কোন এক ক্ষণে বিধাতাকে মানব বলিল—এ সাথী আমাকে তো একেবারে দিলে?

বিধাতা হাসেন।

—ওকে পেলে হে মানব, সুখী হবে তো?

—খুউব সুখী হবো।

বিধাতা বলিলেন—হে মানব, ও তোমারই। তোমারই জন্য এনেছি ওকে। কখনও ফিরায়ে নোব না।

মানব বড় খুশিভরে বলিল—আজ—হে আমার সাথী, আমি ধন্য।

যেখানে ঝরণা নামে হরিণী গতিতে, যেখানে ঝরণার জল ছুটে চলে ওই দূরে পাহাড় হইতে পাহাড়ে, যেখানে ঝরণার জল শান্তচপল, সেখানে মানবী ছুটিয়া আসে। মানবকে ডাকে—এসো, ছুটে এসো, দেখো ঝরণাধারা কেমন গতিছন্দে চলে!

যেখানে হরিণী সঙ্গীকে করে আদর, যেখানে ময়ূর বিছায় পুচ্ছলীলা, মুহূর্তমধ্যে মানবী ছুটিয়া আসে সেখানে। মানবকে বলে—এসো, দেখো দুয়ে কেমন কাব্য রচনা করে।

সে সঙ্গিনীকে স্নেহ করে, আপনি না খেয়ে মুখে ফল তুলে দেয়, গান করে, কথা কয়—কত মধুর কথা! ফুলের শয্যা রচনা করে। মাঝে মাঝে দূরে যায় তার অন্বেষণে, সেই সাথী তার জন্য বৃথা ফেরে বনে—বনান্তরে।

বিধাতা কৌতুক করেন।

—হে মানব! আজ কেমন সুখী?

মানব উত্তর দেয়—হে বিধাতা, সব ভালো তার, সব তার মধু। শুধু মাঝে মাঝে মিথ্যালীলা ছলে বড় ভোগায় আমাকে। হে বিধাতা, সব ভালো তার। শুধু সে বড় চপলমতি।

নন্দন কাননে যেখানে ঝরণা করে ঝরঝর ধারে—দিন নাই রাত নাই, শুধু তার ঝরা! সেখানে মানবী কয় কথা, কথা শুধু কথা—! অর্থ কী যে, কী যে তার ভাষা! কী বলে সে?

বিস্মিত মানব শুধু শোনে, শুধু শোনাই তার কাজ। মানব যদি সেখানে কথা কয়,মানবীর কথা থেমে যায়—ছন্দ কেটে যায়। তাই এ ধারে ঝরণার ভাষা উচ্ছল যাবার, আর ও ধারে মানবীভাষা চকল কলকথা—দুই কথাসৃষ্টিতে মানব ভাবিয়া চলে—কোথা এর শেষ সোম্?

বিধাতা প্রশ্ন করেন—

হে মানব! সুখে আছো তো!

হাসিয়া মানব বলে—হে বিধাতা! সুখী আমি, শুধু দিবারাত্রি বসে নব ছন্দে কথা শুনি। আমাকে যে সাথী দিলে, সব ভালো তার, শুধু আমারে সে করেছে নির্বাক্। বোঝে নাকো আমারো যে আছে কথা তারই জন্য, তারই মধু ভরা। হে বিধাতা! সব ভালো তার, শুধু বড় বেশী কথা কয়।

হয় কথা—নয় লীলা—এই নিয়ে মানবী মহিমা। মানবী শুধু চাহে তার খুশী মতো মানব কহিবে কথা, তাহারই খুশীর জন্য আনিবে ঝরণার জল, পেড়ে দেবে ফুল। প্রথম দিনের সেই আপন-ভোলা মানব ভাবিতে থাকে—তাহারও তো কিছু আছে চাওয়া, কেন মানবী নয়নে চাহি' দীর্ঘ দিন তার এসে ফিরে যাবে। যে বিধাতা মানবের তরে রচিল নন্দন শোভা, শুধু মানবেরই সাথী শুনে দিলো তার সাথী, যে বিধাতা মানবের তরে রচিল মানবী তার নিঃসঙ্গতার সাক্ষীরূপে, সে বিধাতারও মানবের কাছে কিছু আছে চাওয়া—এত যে দিয়েছে তার প্রতিদানে।

তার বিধাতাকে স্মরণের অবসরটুকুও মানবী রাখে না। এই সে সঙ্গিনী হাসিতে কথায় উছলা পাহাড়ী নদী, মুহূর্তেক পরে নয়ন কোণে কোথা হোতে আসে জল, মধু কাব্য ভরা! মানবকে করে বিচলিত এমনি লীলায়। কি যে করিবে সে? কি দিলে, কি কথা কহিলে, সে নয়ন কোণের জল আশ্বাসে বিশ্বাসে ক্ষণে টলমল কোরে পুন মিশে যাবে লুকাবে নয়নে?

এই অধরেতে হাসি, এই নয়ন কোণে জল—

অপূর্ব্ব এ মিলন। তবু মানব তার সঙ্গিনীকে অনুরোধ করে, প্রার্থনা করে সামান্য অবসর শুধু তার বিধাতাকে স্মরণ করিতে—দিনমানে মাত্র একবার! সে অবসর মানবী দিবে না। মানবী বলে—দুজনার এই যে জীবন এই তো মধুর, এই ভরা গাঢ় দিন মাঝে বিধাতার কিবা প্রয়োজন? দুজনার এইটুকু দিনে বিধাতাকে ভাগ দিতে হোলে তাহাদের কি রহিবে? সত্যই যদি বিধাতা এ দিনের ভাগ দাবী করে, তবে কেন ফিরায়ে নিক না তার দেওয়া দিন, কেড়ে নিক একেকে অপরের কাছ হোতে!

মানব বলে—হে সঙ্গিনী, হে নিরুপমা! এই দেখ পারিজাত, পারিজাতে তোমাকে সুন্দর মানায়! কেন এমন পারিজাত ফুল তুলে কবরী রচনা কর না, কর্ণমূলে কণ্ঠহারে কেন পারিজাতমণি শোভিত করো না। এই প্রশংসায় এই অলঙ্কার লোভে যদি মানবী ক্ষণেকও একা যায় পারিজাত বনে, মানবের বড় আশা সেইক্ষণে আপনার বিধাতাকে করিবে স্মরণ, সেই প্রথমদিনের মতো একটুকু আপনাতে রহিবে তন্ময়।

মানবী মানবকে বলে—সত্যি, ভালবাসি পারিজাত। কিন্তু তুমি না তুলিয়া দিলে, তুমি না পরায়ে দিলে, পারিজাত চাহি নাকো আমি, চাহি নাকো কিছু।

হায় বিধাতা, এমনই সাথী দিলে—যাকে নিয়ে অবসর মেলা ভার, যাকে নিয়ে মানবের এতটুকু নাহি স্বাধীনতা!

মানব কাঁদিয়া বলে—হে বিধাতা! বলে দাও মানবীরে যেন সে আমাকে দেয় সারাদিনে কিছু ছুটি, কিছু অবসর, নয়তো ফিরায়ে নাও দান। সেই সাথীহারা দিন—শুধু বসে থাকা, শুধু নিজ মনে ভাবা—সেও ছিল ভাল।

হে বিধাতা! বলো দেখি, যে আমাকে গ্রাস করে নিল, যাকে আমি না পারি বোঝাতে, না পারি নিজের মতে সুখী করে নিতে, তাকে নিয়ে থাকা শুধু আপনার সর্ব্বনাশ নয়? যে সঙ্গিনী আমার বিধাতাকেও এতটুকু অবসর নাহি দিতে চায়, শুধু চায় তার মুখে চেয়ে তাকে আমি খুশী করি আর হাসি গাই—সে অপরূপ সৃষ্টি তোমার হে বিধাতা, ফিরায়ে নাও। বনে কান্তারে শুধু কেরা নিঃসঙ্গ একাকী, নাহি কারো হাসি অভিমান, নাহি গতি, নাহি ছন্দ, নাহি কোনও মিল—সেও ভালো তবু।

মানব মিনতি করে—বলে দাও তারে, হে বিধাতা, তারও পূর্ব্বে আমি জগতে এসেছি, আমারও যে মন আছে, চিন্তা আছে, আমারও যে আছে স্বপ্নদেশ। মানবী ভাবে যে শুধু তারই তরে নন্দনকানন শোভা, শুধু তারই তরে নীলাকাশ, এমন কি তারই তরে কাব্যসুধা করিতে রচনা সৃষ্ট আমি। এ অসহ্য! ফিরায়ে নাও মানবীরে। তবুও মনে হয়ত বাজিবে বেদনা, ছন্দ আমার ফিরায়ে নেবে যখন। হে বিধাতা! এই ক্ষণেই কেড়ে নাও তারে। তার তরে পারো যদি নূতন নন্দন কোনো রচনা করিয়া দিও।

বিধাতা হাসিয়া বলেন—কেড়ে নিতে পারি, তবে একেবারে। মানবীর এই তবে হবে শেষ দিন। সহিতে পারিবে?

মানব কাঁদিয়া ওঠে—হে বিধাতা! এত নিষ্ঠুরতা সহিব কেমনে? যে আমাকে মধু দিন, সেবা দিল, আমাকে চাহিয়া যার এত কলকথা, এত উচ্ছলতা, তাহাকে রাখিয়া দাও দূরে কিছু ব্যবধানে। হে বিধাতা! কেড়ে নাও তারে, কিন্তু জীবনের পরপারে নহে।

সে যে আরও আশা—

বিধাতা হাসিয়া বলেন—মনে আছে, একদিন কথা দিয়েছিলাম যে সাথীটিকে চিরতরে তোমাকে দিলাম। আজ তাই ফিরাতে পারি না সেই কথা, সেই মোর দান। ভাল হোক মন্দ হোক, হোক সে চপল, যত খুশী কথা কয়ে যাক, তবু তাকে নিয়েই তোমার জীবন।

চিরকাল ধ'রে মানব মিনতি করে—তবু শাসন করিয়া দাও তাকে, মানবীর কথা কিছু বন্ধ হোক, কিছু চপলতা।

মানবী শুনিয়া বলে—আমি বেশী কথা কই! কোথা তার প্রমাণ? কাব্য মহাকাব্য এত কে লিখেছে? সে কি আমি, না তুমি মহাশয়?

বিধাতা হাসিয়া বলেন—এই ভালো দুজনারই দ্বন্দ্ব নিয়ে দুজনায় থাকো। তবু যুগে যুগে একান্তে গোপনে মানব নিশ্বাস ফেলে। কোথা সেই সাথীহীন দিন, সেই মুক্ত খোলা নীলাকাশ! সেই আপনাতে আপনি মগ্ন থাকা, সেই শুধু একা!

বাধা দিল নারী—ওগো মহাজ্ঞানী! কোনও ধন স্মরণ কি হয়?

পুরুষ বলিল—সত্য, বহু ঋণ, বহু তব সেবা যত্ন স্নেহ—

নারী দাবী করিল—সেই ঋণ শোধ কিছু দেবে ?

বিস্মিত হইল পুরুষ—কী রূপে হইবে শোধ ?

মহাসুখে উত্তর জানাল নারী—সে রূপ যে তুমি মহাশয় ! আজি হোতে হাহতাশ বন্ধ করো তবে। আমারই যে রূপ হবে—আজ হোতে আমিই তব অধিকারিণী ঋণশোধ তরে। সে রূপ আমিই বুঝিয়া লব, আমিই তা ভোগ করিব খুশী মতো।

পুরুষ হাসিয়া বলে—তোমারও আমার কাছে আছে কিছু ঋণ !

নারী বলে—কেন ঋণ ? কিসের ঋণ ? চিরকাল বলিয়া এসেছ একা হোলে ভালো থাকো। অন্য কোনও কথা শুনি নাই, কোনও ক্ষণে কোনও কালে কিছু পাই নাই।

উত্তর মিলিল শুধু—হে সরলে ! ধন্য তুমি ! আর কিছু বলিবার নাই। বিধাতা হাসেন আর যুগ বহে' চলে। প্রথম মানব ও মানবীর অন্তরের ভাষা সারা কালের চির দেশের দ্বন্দ্বকাব্য গড়ে।

পুরুষ নারীর জন্য সাধনা করিল। নারী সেও ভজনা করিল আপনার দেবতাকে।

পুরুষ বলিল—দেবী ! ধন্য আমি তোমাকে পাইয়া—

নারী বলিল—দেবতা ! আমি ধন্য, তুমি কেন হবে ? তবু ইতিহাসে দেখে, যুগে যুগে বলেছে মানব, নারীজাতি তরলা চপলা, মূর্ত্তিমতী বাধা নারী সাধনার পথে।

প্রতিক্ষণে দিনে দিনে সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে নারী যা লিখিল কাব্য, তা' রহিল বিনা খাতায় বিনা লেখায় বিনা ধরাবাঁধায়।

পৃথিবীতে যত জাতি সকলেরই পুরাণকথায় আছে বিধাতা, আছে নন্দনকানন, আছে প্রথমদিনের সেই মানবমানবী।

পশ্চিম আকাশতলে বিধাতা প্রথম যে মানব গড়িলেন তারই ইতিহাস হোলেও, এ অপূর্ব্ব কথা আমাদেরও বহু পরিচিত। পশ্চিমের ইতিহাসে সাধনা আরাধনার এত মূল্য নাই, বিধাতার জন্য এত দরদ, এত কামনা নাই। তাই মানবমানবীর সেই প্রথম মিলনে ভারতের অন্তরকথা মিশ্রিত !

• • • •

পূর্ব্ব গগনতলেও যেদিন বিধাতা প্রথম মানব সৃষ্টি করিলেন, জাত হওয়া মাত্রই সেও বিধাতার পদধূলি লইয়া হিমাচলের অশোকতীর্থে সাধনা করিতে চলিয়া গেল। সনৎকুমারাদি আদিসন্তানেরা এমনই ভাবে বিধার কৌতুক বুঝিয়া নিঃসঙ্গ জীবনই সার করিয়া লইলেন। বহুদিন পরে মহাসৃষ্টির কল্পদ্রুমমূলে বসিয়া মহামুনি কশ্যপ বিধাতার ইচ্ছায় দুই দুইটি জীবনসঙ্গিনী গ্রহণ করিলেন ও সত্যই প্রীত হইলেন। কিন্তু একদিন মহামুনি সান্ধ্য উপাসনায় প্রস্তুত হইতেছেন, এমন ক্ষণে তাঁহার অন্যতমা জীবনসঙ্গিনী আসিয়া আনতবদনে দাঁড়াইল। মুনি বলিলেন—দেবী ! বলো কি তোমার মনোভিলাষ ? মৌন কেন ?

আনতবদনা কহিলেন—দেবতা, বড় সাধ এইক্ষণে জীবনের সুধা পান করি। হে দেবতা ! ফিরায়ে দিও না—

মুনি বলিলেন—দেবী ! কিন্তু এখন আমি যে উপাসনার্থ প্রস্তুত। এ উত্তরে মানবী প্রসন্না হইলেন না। অগত্যা মহামুনিকে চলিতে হইল কাব্য-ভজনে। সেদিনও বিধাতার কাছে মিনতি নিবেদন—হে বিধাতা ! একি করিলে ! সাধাহীন দিন—সেই তো ছিল ভালো।

আর একদিন অমরাবতীতে দেবরাজ সভায়—যেখানে ত্রিকালজ্ঞ দেব-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর ও মানব সদস্যগণ কোনও জটিল সমস্যার মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া স্থির করিলেন, ধ্যান বলে বিষ্ণুলোকের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে, সেইখানে সেই ধ্যানমগ্নতার মাঝে ইন্দ্রাণীর অকস্মাৎ মনে হইল তাঁহার ললাট হইতে চন্দ্রকলা টিপটি খসিয়া গিয়াছে ! অমনি সেই ললাটদেশে করখানি তুলিলেন, মহামূল্য করাভরণ ধ্যানস্তব্ধ সুরসভাকে চমকিত করিল মিষ্ট ধ্বনিতে।

সদস্যেরা কি-ই বা বলিবেন—তিনি যে ইন্দ্রাণী !

ক্ষণপরে উর্ব্বশীর বোধ হইল—শিথিল তার কবরী। অমনি কবরী রক্ষণে সেই বাহু তোলা, অলকার বাজিল রিণিঝিণি। সদস্যেরা বিরক্তি লুকাইয়া বলিলেন—কেন এত চাপল্য উর্ব্বশী ?

উর্ব্বশী উত্তর দিল—কি করিব ? কবরী যে আপনি শিথিল হইল—! কিছু পরে তিলোত্তমাকে নাসিকাগ্রে হাত তুলিতে হইল। অমরাবতী মর্ত্ত্য নহে, সেখানে

নাসিকাগ্রে বসিবে বর্ত্তোর জীব মশা মাছি! তবু এ চপলতা চিরকালের ধারা।

দেবরাজ বলিলেন—রে চপলে! কেন এ আচার?

প্রাথাভঙ্গে সভাভঙ্গ করিয়া সে বলিল—কি করিব? হাত যে আপনি উঠিল, আপনি যে আভরণ তুলিল ঝঙ্কার!

বড় দুঃখে সেদিন মহাজ্ঞানী সদন্ত বলিয়াছিলেন—হে বিধাতা! এ অপরূপা সৃষ্টি তোমার ফিরায়ে নাও, আমাদের কোনও দুঃখ নাই।

উর্ব্বশী হাসিয়া বলিল—স্বর্গে তবে কি হইবে? কি করিবে পারিজাত নিয়া। নারী যদি না রহিল, তবে ব্যর্থ হবে নন্দন রচনা।

বড় কৌতুকে বিধাতা হাসিয়াছিলেন।

সেদিন কোনও নারী, দুই করে ভরা আভরণ, আপনি মগ্না ছিল আপনার কাজে। কি জানি সে নারীও ভাবিল—বড় গোল করে এই শাঁখা চুড়িগুলি। অবিরত ঠুং ঠাং, বিশ্রামবিহীন। কত কাজে বাধা দেয়, চিন্তাকে করে সূত্রহীন!

নারী উঠিয়া করতোতে এক একটি আভরণ লইল খুলিয়া। তবু শব্দ করে, তবু বাজে কথা কয়, বাকী আভরণ!

একে একে, শুধু শাঁখারে সম্বল করি, নারী খুলিয়া লইল আভরণ। বড় তৃপ্তি হইল মনে। কেমন এ শাঁখাখানি তন্ময়া নির্ব্বাক্!

অমনি ভাবিল নারী—তাই কি পুরুষে চাহে রাখিতে একাকী! পরক্ষণেই একে একে পুনরায় পরিয়া লইল আভরণ। মহাপুলকিত নারী শুনিতে লাগিল সেই আভরণ-ধ্বনি, সেই অবিরাম কলকথা।

আপনি বলিয়া উঠিল নারী—এই ভালো, এই অবিরাম ছন্দ, এই চিরকালের স্বপ্ন!

হাসিয়া উঠিল নারী—এই ভালো, এই জীবনে যা করি রচনা আপনার সাথীটিকে ঘিরে—তাহাকে বিব্রত করি' এই চিরকৌতুকলীলা—অভিমান হাসি কান্না দিন, এই মোর কাব্য গাথা দিনে রাতে—অন্তরেতে মধুনিবেশে!

পুরুষ বলিল—ভালো, সব ভালো দেবী! শুধু যদি ধরা কোরে কোনও ক্ষণে মুক্তি দিতে দীনে!

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

চতুর্থ দৃশ্য

অবনী বাবুর বাটীর ড্রিয়িংরুম। আধুনিক ধনী-জনোচিত আসবাবে সজ্জিত। একটি টেবিলে কয়েকটি ফুলের তোড়া, ফুলের মালা রহিয়াছে। টেবিলের পাশে অবনী এটর্নি ও রাজনৈতিক নেতা অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায় নমস্কারের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। তাঁহার কণ্ঠে গোটা দুই ফুলের মালা। ঘরে আট দশ জন ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ভদ্রলোক। অধিকাংশের পরিধানে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি, কাহারও কোট প্যাণ্টালুন টাই। একজন পাচকাদার ও চাপকান পরিহিত। ইহারা নমস্কার করমর্দন ইত্যাদির যোগে অবনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতেছিল। সিঁড়ির মুখে কয়েকটি কণ্ঠের সমবায়ে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিত হইল। সকলে প্রস্থান করিল। এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতে কহিতে অবনী নায়িকা সেন।

ঘরে রহিল মিষ্টার মধুসূদন নামক অবনীর এক বন্ধু। মধুসূদনের শ্রীহীন চেহারা, অধিকন্তু কাঁচা পাকা কেশ ও লোক দাড়ি, অপরিচ্ছন্ন প্যাণ্ট ও শার্ট, দীর্ঘ দেহ। সে চলিয়া যাইতে যাইতে এক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া একটি জলন্ত সিগারেটের অবশিষ্ট অংশ হইতে নূতন সিগারেট ধরাইতেছিল। বাটীর ভিতর হইতে একটি সোটকেলিও ব্যাগ হাতে জয়ন্ত প্রবেশ করিল, মধুসূদনকে দেখিয়া দাঁড়াইল।

জয়ন্ত। মিষ্টার মধুসূদন, আপনার নামে অভিযোগ আছে।

মধুসূদন। আই প্রিড, মিস্টি। (বলিয়া হাতঘড়ি পরিধার ভঙ্গীতে দুইটি হাত বাড়াইয়া দিল।)

জয়ন্ত। কিন্তু চার্জটা কী তা জানতেও চান না?

মধুসূদন। না। অনাবশ্যক। কর ইয়োর সেল্ফ, সব চার্জ স্বীকার করে নেব।

জয়ন্ত। আপনি তো কই আজ বাবাকে অভিনন্দন করলেন না?

মধুসূদন। অভিনন্দন? করিনি বুঝি? কেন করিনি বলতো? তাহলে ভুল হয়ে গেছে।

জয়ন্ত। ভুল বলা নয়, আপনি ইচ্ছে ক'রে করেন নি। অথচ আপনি বাবার অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

মধুসূদন। ছাট্ এক্সকিউজ্ মি। অভিনন্দন যখন, তখন আর কী ক'রে অভিনন্দন করি বল? ওটা কেমন আয়রাবার মতো শোনাতো না? সভাপতি তো ওকে হতেই হবে। ও যে বরাবর ফার্ষ্ট হয়ে এসেছে। না হয়ে চলবে কী? ওকেকে কে রোধিতে পারে?

হরহর। আমার কী মনে হয় বলব? আমার মনে হয় এই বেঙ্গল কন্‌ভারেন্সকে আপনি খুব বড় ক'রে দেখেন না। কোনও কন্‌ভারেন্স, কন্‌গ্রেস, য়্যাসোসিয়েশনের প্রতিই আপনার মনোযোগ বিশেষ নেই।

মধুসূদন। না, কন্‌ভারেন্স তো হবে জিনিস, আমি খুব শ্রদ্ধা করি তাকে। (প্রস্থানোদ্যত)

হরহর। কন্‌ভারেন্স কংগ্রেস সম্বন্ধে একদিন আপনার সঙ্গে পরামর্শ করব আমি। ওদের সার্থকতা কতখানি—এ বিষয়ে একটা গুরুতর আলোচনা করা দরকার।

মধুসূদন। আমার সঙ্গে পরামর্শ? বড় বেশি ইই, বাই বয়!

উভয়ের প্রস্থান

অল্পকাল পরে অবনী প্রবেশ করিল। সে একটা ছোট সুটকেসে কাপড়চোপড় গুছাইয়া তুলিতেছে, অদূরে হইতে অবনীর স্ত্রী সুমিত্রা প্রবেশ করিল।

সুমিত্রা। (উদ্বিগ্ন স্বরে) হাঁগা এ কী কথা? বলু বলছে, তুমি নাকি এখুনি রওনা হবে?

অবনী। এখনি নয়। (হাতঘড়ি দেখিয়া) আরও একঘণ্টা বিশেক পরে।

সুমিত্রা। তা হলে সত্যি? কিন্তু তোমার যে বিকেলের গাড়ীতে রওনা হবার কথা?

অবনী। ছিল, কথা তাই ছিল। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির টেলিগ্রাম এসেছে। অনুরোধ করেছেন, যদি সম্ভব হয় সকালের গাড়ীতে যেন যাই। কারণ তাহলে বিকেলেই ওখানে পৌঁছাতে পারব। ওঁরা কী সব রেসেপশন ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন।

সুমিত্রা। না না, সে কী করে হবে? সে হতে পারে না। আজকের দিনে তুমি আর খোকা পাশাপাশি বসে খাবে না? অমাদিনে ও একলাটি ভাত খাবে? সে হয় না।

অবনী। তা, সে জন্যে ভাবনা কী? বলতে ডেকে পাঠাচ্ছি, তুমি ঠাকুরকে বলে যাও দু থালা—

সুমিত্রা। কী বল তার ঠিক নেই। তুমি কি সব ভুলে গেলে? ঠাকুর দুথালা ভাত দিয়ে ফেলেই হল? আমার বাড়ীর সুজোই এখনও নামা হয়নি, তারপর খোকাকে দিয়ে কালীঘাট—, না বাপু, এ সব কি ৭১ মিনিটের কাজ? আজকের দিনটিতে তোমার পাশে বসে তোমার সেবায় সুখ দিয়ে যাবে না?

অবনী। তাই হবে তখন। সুজো টুজো তখন তোমার ডিপার্টমেন্ট তুমি নারো। আর পাশে বসে খাওয়া? বেশ তো, বলু আমার সঙ্গে বসেই খাবে খাক।

সুমিত্রা। হবে? তবে এখুনি বেরবে না তো?

অবনী। এখনই বেরোবও বটে, জলের সঙ্গে জল মিশে যাবও বটে। তুমি ভেব না। রিফ্রেশমেন্ট কার-এ শুয়ে আমাকে এক টেবিলে বসেই যাব। (সুমিত্রার বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া) বলছ যে আমার সঙ্গে যাচ্ছে খোকা।

সুমিত্রা। তোমার সঙ্গে যাচ্ছে? খোকা?

অবনী। (ঈষৎ হাসিয়া) ও যে একজন মস্ত বড় ডেলিগেট গো, খোকা হয়ে তার মায়ের কোলের কাছে বসে পায়েস খাবার সময় কি তার আছে? সামান্য প্রভিন্সিয়াল কন্‌ভারেন্স-এর প্রেসিডেন্ট হয়েছি আমি, ওকে একদিন হতে হবে অল্ ইণ্ডিয়া কন্‌ভারেন্স এর প্রেসিডেন্ট। সেই আদর্শেই ওকে তৈরী করেছি আমি। একদিন লোকে আমাকে দেখিয়ে বলবে—ঐ জয়ন্ত ঘোষের বাবা যাচ্ছে, বুঝলে, জয়ন্ত ঘোষের বাবা। ওর বক্তৃতা তুমি শোন নি? কী গো চুপ করে রইলে যে?

সুমিত্রা। না, আর চুপ করে থাকব না। চিরকাল চুপ করে আছি বলে তোমরা এই অন্যায়ের করে আসছ। আমি আর চুপ করে থাকব না।

অবনী। (হাসিয়া) তবে? খুব কথা কইবে? বেশ তো। চল আমাদের সঙ্গে। সভাপতির অভিভাষণ হয়ে গেলে, সভাপত্নীর—কথাটা ভাল লাগেই নিও, সভাপত্নীর অভিভাষণ হবে। তাহলে জয়ন্ত বলে যে বার্থ মার্ক এক খানা রিজার্ভ করতে ফোন করে দিক। কী বল?

সুমিত্রা। ঠাট্টা করো না। খোকা আজ যাবে না।

অবনী। পাগল না কি!

সুমিত্রা। না, পাগল নই। কিন্তু খোকার যাওয়া হবে না। আজকের দিনে আমি খোকাকে ছেড়ে দেব না, তাই শুধু বলে দিলুম।

(প্রস্থানোদ্যত)

অবনী। কী আশ্চর্য! এইটুকুতে তোমার চোখ ছলছল করে এল? ছেলে, ছেলে। জন্মের অন্তদিন তাতে তোমার কী? যাদে, আমি যখন সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

সুমিত্রা। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু মুছিয়া) খোকার জন্মদিনে আমার কী, তা এতদিন পরে তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা আমি করব না। তোমার মনে আছে নিশ্চয়, তোমাদের বাড়ীতে আমার প্রথম পরিচয় যার সঙ্গে সে তুমি নয়, সে আমার খোকা।

অবনী। মনে আছে বই কি। আর না থাকলেও তোমার কাছে সে কথা এতবার শুনেছি যে—

সুমিত্রা। হ্যাঁ, অনেকবার শুনিয়েছি, যদি বেঁচে থাকি আরও কতবার শোনাব তার ঠিক নেই। ঐ কথাই যে আমার সবার বড় কথা আর আজ পর্যন্ত ঐ কথাই আমার শেষ কথা। যদি ফিরে দিনে তোমাদের উঠানে যখন এসে দাঁড়াব, কে একজন খোকাকে এনে আমায় দেখিয়ে দিলেন।

অবনী। মনে আছে, পিসিমা।

সুমিত্রা। বললেন—ঐ তোর মা এসেছে, যা মার কাছে যা।

খোকা এল না। ওরে টানতে পেলুম, পারলুম না। মাধবের দেহ ঘিরে খোকা পাথরের মূর্তির মতন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুখ ফিরিয়ে। তারপর জোর করে কোলে নেবামাত্র কান্নায় ভেঙে পড়ল ছেলে। খালি বলে—কেন তুই আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছিলি? কেন গেলি? আমায় ছেড়ে ঘরে আদর করে খোকা আমার কোলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ল যখন, তখনও তার দুটি মুঠোর মধ্যে শক্ত করে আমার আঁচল ধরা, পাছে আবার আমি পালিয়ে যাই। (চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল)

অবনী। সে তো আমি জানি মুখি, কিন্তু কাঁদছ কেন, ছি, আজকের দিনে কাঁদতে নেই।

মুখিরা। কাঁদিনি। ও আমার চোখের ব্যামো। মেয়েদের কথা মনে পড়লেই চোখের ব্যামো বাড়ে। (চোখ মুছিল) মুখের মধ্যেও খোকা মুখ গুঁজিয়ে উঠতে লাগল। না হ'ল ঘড়ি ধোলা, না হ'ল আচার অনুষ্ঠান, খোকার মা হয়ে, খোকাকে বুকে নিয়ে সারা রাত কাটল। ওরে তার গা কাটিয়ে তবু পাপ ফিরতে দেরি খোকা, সেকথা কি ভুলতে পারা যায়।

অবনী। তুমিনি তো মুখি। কেউ ভোলেনি। খোকা তো ফিরেইছিল। তাকে তুমিই নতুন করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনলে। কেউ সেকথা ভোলেনি। মা যতদিন বেঁচেছিলেন,—শুধু মা কেন, পাড়া-সুদ্ধ লোক তোমার প্রশংসা করেছে।

মুখিরা। প্রশংসার কথা বলছি না, খোকার কথা বলছি। মা তো আমার নিজের মা-ই ছিলেন। কিন্তু সবাই তো মা নয়। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল—তোমাদের কাশায়ী-পাড়ার মাসীমার গলা শুনে। কথা শুনে শিউরে উঠলুম। থাক, সে কথায় দরকার নেই। নারায়ণ আমার প্রার্থনা শুনেছেন, আমার সেই সন্তান ফিরে খোকাকে আমার সতীনপো করে নেননি। (এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া) সেই মাসীমাই আবার বলেছিলেন—আহা, বৌমার হাতের জল শুদ্ধ জল না পা।

অবনী। ছুলো, ছুঁস্ নে ছুলো!

মুখিরা। রাগ করলে কী হবে, সন্ধ্যা বেলাকে লোকে তো বলবেই।

অবনী। সন্ধ্যা? লোকে কী জানে? খোকার জন্যে তোমার আত্মবিসর্জনের খবর নারায়ণ জানেন, কিন্তু মানুষে কী করে জানবে?

ভৃত্যের প্রবেশ, তাহার হাতে সংবাদপত্র

ভৃত্য। জান না, বারো ঘোড়ার গাড়ী করে বাবাকে নিয়ে যাবে। এই যেন অমৃতবাজারে লিখেছে, এই যে বাবার ছবির নীচে এইখানটায়, প্রেসিডেন্সীতে প্রোসেশন কী রকম হবে তার একটা প্রোগ্রাম দিয়েছে। আমার কাজেরা নিচ্ছি, তোমায় দেখাব—আমি অবশ্য প্রেসিডেন্সীর গাড়ীতে যাবব না, তাহলেও—

মুখিরা। খোকা, তুই ওঁর সঙ্গে নাই গেলি বাবা।

ভৃত্য। নাই গেলি? তার মানে?

মুখিরা। আজ যে তোর জন্মদিন।

ভৃত্য। জন্মদিন? তা কী হয়েছে? ও, তুমি সেই নতুন কাপড়-চোপড় পর, পায়েসটায়েস খাওয়া, সেই পুজো-টুজো—সেই কথা বলছ? (মাথা নাড়িয়া) না মা, যে দেশের অর্ধেক লোক একবেলা একমুঠো খেতে পায় না, সে দেশের ছেলের জন্মদিনে ঘটা করে পায়েস খাবার দিন আর নেই মা।

মুখিরা। খোকা—

ভৃত্য। (হাসিয়া) তুমি ভাবছ খোকা তোমার খোকাই আছে বুঝি! আমি যে আমাদের পার্টির ছেলেদেরই মা'। আমার নামে দুটো রেজোলিউশন আছে। তোমার ও জন্মতিথিটিথি হবে'খন এর পর তখন দিয়ে এলে।

অবনী। ভৃত্য, তুমি তো আজ না দিয়ে কাল যাত্রা করতে পার। ওপ্‌দিকে তোমার কিছু তো করবার নেই। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে আর লাস্ট্‌ভোট্‌স্ কমিটির মিটিং থাকলেই তোমার চলবে।

ভৃত্য। কিন্তু আমাদের ইয়ুথ কনফারেন্সও যে রয়েছে মা। মা, মা, সে হয় না, লক্ষ্মীটি মা, আমি ফিরে এসে তোমার পুজো-আচ্চা নিয়ম-ধর্ম সব করব, সেই রামবাটীর একখানি পায়েস খাব—

ভৃত্যের প্রবেশ

অবনী। কী রে?

ভৃত্য। একটী সাহেব কলে আপনার নিচে। আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলছেন।

ভৃত্য। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই কথা বলতেই এসেছিলাম, এসোসিয়েটেড প্রেসের রিপ্রেজেন্টেটিভ, আপনার সঙ্গে ইন্টারভিউ চায়।

অবনী। তুমি নিচে যাও ভৃত্য, সাহেবকে বসতে বল, আমি আসছি।

ভৃত্য ও ভৃত্যের প্রস্থান

অবনী। তুমি মন খারাপ কোরো না মুখি। খোকা তো তোমারই খোকা, কিন্তু ওর সামনে যে কাজ এসে পড়েছে, তাকে যে ডাকছে। জান ত, সম্রাট অশোক একমাত্র ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন সুদূর সিংহলে। তাকে রাজভোগের মধ্যে রাজপুত্র করে ঘরে রেখে যাননি। অশোকের ইতিহাস অবশ্য পুরাণের মত পুরোনো। কিন্তু আমিও ছেলেকে ঘরের কোণে রাখবার জন্য মানুষ করি নি তা তো তুমি জান। ভৃত্য আমাকে ছাড়িয়ে যাবে, আমাকে ছাপিয়ে উঠবে, আমি যার স্বপ্ন দেখেছি মাত্র, ভৃত্য তার সমাধা করবে একদিন। সেই গর্বের দিনের অপেক্ষা কি আমার মত তুমিও কর না?

মুখিরা। কী জানি! ধরত' তোমাদের মত অমন করে ছেলেকে খালি গর্বের জিনিস বলে ভাবতে পারি না। ভাগ্যের জিনিস বলেই মনে করি। এমনি আমাদের দুর্বল মন। খোকন আমার তোমারই উপযুক্ত হোক, সব বিষয়ে সবার বড় হয়ে উঠুক, এর চেয়ে বেশী কামনা আর কিছু নেই। কিন্তু যত বড়ই হোক, আমার কোলের চেয়ে বড় হবে সে, আমার কোল ছাড়িয়ে যাবে, এ আমি ভাবতে পারিনি।

অবনী। তা যাবে না গো, যাবে না। তোমার পুজো শেষ করে এস, আমি ইতিমধ্যে রিপোর্টার সাহেবকে বিদেয় করে আসি।

প্রস্থানোদ্যত

ঘুমিত্রা। আমি বুঝতে পারছি আমারই ভুল। তোমার ছেলে ও—

অবনী। ও কথা বল না ঘুমি। তোমার ছেলে নয়? আমার আর কটুকু? তোমারই তো ছেলে।

ঘুমিত্রা। না, আমি ওর সাত জন্ম নয়। ডিটেক্টিভে যেমন না সাপে। ও তোমারই ছেলে। তোমারই মত লম্বা চওড়া, বুদ্ধু মন। আমার মত বুদ্ধিসুদ্ধি ওর থাকবে কী করে? আমার কিছুই ওকে দিতে পারিনি। মানুষ করা দিয়ের মত খালি চোখ করিয়েছি, ঘুম পাড়িয়েছি। খাইয়ে দিয়েছি, হাত ধরে, বুকে করে খাওয়াতে পারিনি।

অবনী। কী পাগলের মত বকছ ঘুমি? তুমি না খাওয়ালে ওকে খাওয়াল কে?

ঘুমিত্রা। (এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া) দেখ, বুড়ো হয়েছি, আর তোমার কাছে বলতে লজ্জাই বা কী, মাঝে মাঝে মনে হয় পেটে যদি একটা ধরতুম, তা হ'লে—

অবনী। তা হ'লে কী হত? (টেবিলের উপর রাখা হাতের হাতের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে) তাহলে?

ঘুমিত্রা। তাহ'লে অন্তত তার জন্য থেকেও একফোঁটা বুকের দুধ আমার খোকাকে খাওয়াতে পারতুম।

অবনী। পাগল, পাগল তুমি। (কয়েকটি মৌন থাকিয়া) লোকটা বসে আছে, আমি আসছি। প্রস্থান

ঘুমিত্রা ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এমন সময় একদিক হইতে রঘু ও অন্যদিক হইতে তুতা প্রবেশ করিল।

তুতা। মা, বাবু-ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, পায়েসের চাল কি এখন বার করে দেবেন?

ঘুমিত্রা। না।

তুতা। উনুন আবার ধরেছে কিনা, তাই বলছিল এই বেলা—

ঘুমিত্রা। অত কিছু চড়াতে হবে না, পায়েস হবে না।

তুতার প্রস্থান

ড্রাইভারের প্রবেশ

ড্রাইভার। কালিঘাটে তবে পরেই যাব না, আগে বাবুকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ঘুমিত্রা। কালিঘাটে যাবার দরকার নেই বদ্রু।

ড্রাইভার। গাড়ী খোলাই করতে দেরি করে দিলে না। (হাতঘড়ি দেখিয়া) আচ্ছা চলুন, আগে কালিঘাটই ঘুরে আসি, সে আমি ম্যানেজ করিয়ে নেব—

ঘুমিত্রা। কালিঘাট আজ যাব না। তুমি ষ্টেশনেই যাও।

ড্রাইভার। (হাতজোড় করিয়া) কসুর হয়েছে মা, সব হামারই কসুর। আভি কালীঘাট—

ঘুমিত্রা। না বদ্রু, আমি রাগ করিনি। বাবুকেই দিয়ে আসুন, কালীঘাট আর একদিন যাব যাহু। ষ্টেশন থেকে এসে তোমার ছুটি, তুমি গাড়ী তুলে দিও।

রঘু। (আগাইয়া আসিয়া) এখনই তোমার ছুটি বদ্রু। কিন্তু গাড়ী তুলো না। আমি যেতাম। আচ্ছা তুমি যাও।

ড্রাইভারের প্রস্থান

ঘুমিত্রা। তুই এখন যেতবি? তুই তো ওঁর সঙ্গে—

রঘু। (ঘাড় নাড়িয়া) তোমার সঙ্গে।

ঘুমিত্রা। ষ্টেশনে যাবি—

রঘু। কালিঘাটে যাব না।

ঘুমিত্রা। (সবিস্ময় আনন্দে) সত্যি যাবি? কিন্তু উনি যে বলেন এখুনি ট্রেন—

রঘু। হাঁ, বাবাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব আগে। তারপর বিস্তিতে কালীঘাট, তারপর নতুন কাপড়, তারপর বিয়ের সিঁদুর, তারপর পাঁঠার বাজনা, তারপর কলার বড়া, তারপর একবাটি—কিন্তু তোমার ঐ বাবুন ঠাকুরের হাতের পায়েস—(মাথা নাড়িয়া) নৈব নৈব চ, এই বলে দিলুম। প্রস্থান

ঘুমিত্রা। তুই যাবি না ওঁর সঙ্গে? ওরে, ও হাবাল, বাবুন-ঠাকুরকে বল—

ঘুমিত্রা দ্রুত বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। একটু পরে অবনী ও মধুসূদন বাহির হইতে প্রবেশ করিল।

মধুসূদন। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কথা। অন্যায়ের মধ্যে আর কি। কিন্তু এ জন্যেই। এই জন্যেই ঘটালে যোর জন্ম জন্মান্তর। ম্যান্ লিভ্স্ এগেন ইন্ হিজ চাইল্ড। জীবনের রথ এমনি করেই ঘুরে চলেছে।

অবনী। কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলতে হবে, ম্যান্ নয়, ফাদার। ফাদার লিভ্স্ ইন, বাট মাদার লিভ্স্ অর দি চাইল্ড। বাপ ছেলেকে বেশি ভালবাসে, কি ছেলের মধ্যে নিজেকেই ইগোকে বেশি ভালবাসে, সেটা ভাববার কথা। কিন্তু মায়ের স্নেহের রূপ অন্য রকম মধুসূদন।

মধুসূদন সিগারেটের কেস খুলিয়া দেখিল সিগারেট নাই।

মধুসূদন। অবনী, পাঁচসিকে পয়সা দেখি।

অবনী পার্স খুলিয়া একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিল।

মধুসূদন। পাঁচ টাকা নয়, পাঁচ সিকে চেয়েছি।

অবনী। দরি। খুচরো ছাড়তে পারি না, পথে দরকার হবে।

মধুসূদন। তবে যাও। (নোট লইল) থ্যাঙ্কস্। (নোটবুক বাহির করিল)

অবনী। (হাসিয়া) তোমার পাগলামি এখনও গেল না মধুসূদন?

মধুসূদন। পাগলামি আবার কোথায় দেখলে? একাউন্ট ইজ একাউন্ট। টাকাকড়ির লেন দেন লেখাপড়ার মধ্যে থাকবে না তো থাকবে কী?

অবনী। আচ্ছা, আচ্ছা, লেখ লেখ।

অবনী বাড়ীর ভিতর প্রস্থান করিল।

মধুসূদন একটা কৌচে বসিয়া নোটবুকের পাতায় লিখিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের শিল্প-সমস্যা

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় ভারতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ রাজনীতির দিক হইতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হইলেও ইহাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে দেশীয় রাজন্যবর্গই পরিচালনা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষকে যে আজও কৃষিপ্রধান দেশ বলা হয়—তাহা অবশ্যই দেশীয় রাজ্যসমূহের অর্থনীতির কথা বিবেচনা করিয়া।

বাস্তবিক ব্রিটিশ ভারতে তবু কিছু কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি এখনও একরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষিজীবনে পড়িয়া আছে। ভারতের মোট আয়তন ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার বর্গমাইল, ইহার মধ্যে শতকরা ৪৩ ভাগ দেশীয় রাজ্য। লোকসংখ্যা অবশ্য দেশীয় রাজ্যে কম এবং সর্ব্বসাকুল্যে ইহা ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না। ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজন্যবর্গের ধনৈশ্বর্য্যের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। ব্রিটিশ ভারতের ধনবণ্টন ব্যবস্থায় অসাম্য অত্যন্ত স্পষ্ট সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশীয় রাজ্যসমূহের অসম ধনবণ্টন যে কোন অনবধানী ব্যক্তিকেও ব্যথিত করিবে। ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার, কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকিলে এই সব রাজ্যে বহু শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করিতে পারিত; কিন্তু তাহা না হইয়া এই সকল রাজ্য ব্রিটেনাদি শিল্পপ্রধান দেশকে কাঁচা মাল জোগাইয়া নিজেদের বিপুল সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। ব্রিটিশ ভারতে বর্ত্তমানে যে সব কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের অনেকখানিও দেশীয় রাজ্যসমূহ জোগাইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনমত উৎসাহ লইয়া চেষ্টা হইলে শিল্পের দিক হইতে ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা দেশীয় রাজ্যসমূহের সাফল্যলাভের আশা কম নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমসম্ভার প্রভৃতি শিল্পপ্রসারের যে সব অত্যাবশ্যক উপাদান, দেশীয় রাজ্যগুলিতে তাহা প্রচুর ও সুলভ। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেশীয় রাজন্যবর্গ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উৎসাহের অভাবে ব্রিটিশ ভারতের তুলনায় ভারতের দেশীয় রাজ্যে নগণ্য শিল্পপ্রসার হইয়াছে। আগেই বলা হইয়াছে, ভারতের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করা হয় সমগ্রভাবে। একে ব্রিটিশ ভারতে এ পর্য্যন্ত সন্তোষজনক শিল্পপ্রসার হয় নাই, তাহার উপর দেশীয় রাজ্যসমূহ এখনো প্রায় পুরোপুরীভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল; কাজেই ভারতবর্ষ দরিদ্র কৃষিজীবী দেশ হিসাবেই পরিগণিত হইয়া থাকে।

অবশ্য দেশীয় রাজ্যের এই পশ্চাৎপদ অবস্থার কথা বলার অর্থ—নির্ব্বিচারে সমস্তদেশীয় রাজ্যসম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য করা নয়। প্রকৃতপক্ষে ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর প্রভৃতি কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে যে পরিমাণ শিক্ষা বা শিল্পপ্রসার হইয়াছে, তাহা ব্রিটিশ ভারতের তুলনায় নিন্দনীয় নহে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উন্নতিশীল কয়েকটি মাত্র দেশীয় রাজ্য লইয়াই দেশীয় ভারত নয়, প্রকৃতপক্ষে ভারতে ৫৬২টি দেশীয় রাজ্য আছে। দেশীয় রাজ্যের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা নয় কোটী নরনারী অধ্যুষিত এই ৫৬২টি রাজ্যের সামগ্রিক বিবেচনাতেই বলা হইতেছে।

বস্ত্র মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক বস্তু। ভারতবর্ষ মোটামুটি বস্ত্রের দিক হইতে স্বাবলম্বীও হইয়াছে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি এ হিসাবেও শোচনীয়-ভাবে পশ্চাৎপদ। ১৯৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায়, বৃটিশ ভারতে এই বৎসর মোট কাপড়ের কল ছিল ৩৮৯টি। দেশীয় ভারতের আয়তন ব্রিটিশ ভারতের ⅔ ভাগ হওয়ায় এবং ইহার লোকসংখ্যা ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ হওয়ায় দেশীয় রাজ্যসমূহে অন্ততঃ ১২৫টি কাপড়ের কল থাকা উচিত ছিল; কিন্তু সে তুলনায় ১৯৩৮

সালে দেশীয় ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৪। হস্তচালিত তাঁতের দিক হইতে আবার দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা ছিল আরও খারাপ এবং ব্রিটিশ ভারতের তাঁতের সংখ্যার হিসাবে দেশীয় রাজ্যসমূহে এই সময় শতকরা ১ ভাগও হস্তচালিত তাঁত চালু ছিল না। একমাত্র রেশমের কারখানা, সিমেন্ট ও দেশলাইয়ের কারখানার হিসাবেই ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের অবস্থাকে তবু আশাপ্রদ বলা যায়। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতে মোট রেশমের কারখানা ছিল ১২০টি, তন্মধ্যে দেশীয় রাজ্যসমূহে ২৫টি কারখানা ছিল। ভারতে মোট ১১৩টি দেশলাইয়ের কারখানার মধ্যে এই সময় দেশীয় রাজ্যসমূহে ছিল ২৮টি কারখানা। মোট ১৯টি ভারতীয় সিমেন্টের কারখানার ভিতর দেশীয় ভারতে ৬টি কারখানা থাকা অবশ্যই অগৌরবের কথা নয়।

ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে রাসায়নিক দ্রব্যাদির কারখানা, কাগজের কল, কাচের কারখানা, চিনির কল প্রভৃতি মোটেই প্রসারিত হয় নাই। অন্যান্য নানাবিধ ভোগ্যপণ্যের জন্যও দেশীয় ভারত পরমুখাপেক্ষী। আগেই বলা হইয়াছে, দেশীয় রাজ্যসমূহের সুযোগ সম্ভাবনা যেরূপ, তাহাতে এই শিল্পগত দুরবস্থা সত্যই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে মোট ২টি কাগজের কল ও ১৩টি চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাগজের কলের প্রধান উপাদান বাঁশ ও সাবাই ঘাস এবং চিনির কলের উপাদান আখ ভারতের দেশীয় রাজ্যে কিছু কম উৎপন্ন হয় না। এই সব উপাদানের উৎপাদন কর্তৃপক্ষ একটু চেষ্টা করিলে অবশ্যই বাড়াইতে পারেন। দেশীয় ভারতে এই সব শিল্প গড়িয়া উঠা শুধু মাত্র কর্তৃপক্ষ ও শিল্পোৎসাহীদের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

ভারতে সমাজতন্ত্রবাদের দ্রুত প্রতিষ্ঠা ঘটিতেছে। স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ ভারত বলিয়া দুই পৃথক দেশের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। তখন ভারতীয় অর্থনীতির বিচার করা হইবে সমগ্র ভারতের আর্থিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া। সে হিসাবে ভারতের শিল্প-বাণিজ্য-পরিকল্পনা সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে রচনা করিতে হইলে দেশীয় রাজ্যগুলির কথা ভুলিলে চলিবে না। দেশে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারিত হইলে অর্থের অন্তর্দেশীয় প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্বসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছল্য সৃষ্টি হয়, ইহা ব্রিটিশ ভারতের পক্ষেও যেমন সত্য, ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের পক্ষেও ইহা ঠিক একইভাবে প্রযোজ্য।

ভারতে ব্রিটিশ সম্পত্তি

ভারতশাসনে ইংরেজকে কম অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, তথাপি ব্রিটিশ সরকার যে ভারত সাম্রাজ্য আঁকড়াইয়া আছেন, তাহার রাজনৈতিক কারণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষ শিল্পের দিক হইতে একান্ত পশ্চাৎপদ, অথচ এদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। শিল্পজীবী ব্রিটেন ভারতের এই কাঁচা মাল কিছুতেই হাতছাড়া করিতে ইচ্ছুক নয়। তাছাড়া ভোগ্যপণ্যের দিক হইতে ভারতবর্ষ পরনির্ভরশীল বলিয়া এখানকার বিরাট বাজারে প্রচুর বিলাতী মাল বিক্রীত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ সরকার পণ্য বিক্রয়ের এই প্রকাণ্ড বাজারটিও হারাইতে প্রস্তুত নন। এইজন্য রাজনৈতিক গণ্ডগোলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যদিও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে হতাশ হইয়া পড়েন, অর্থনৈতিক স্বার্থই তাহাদের শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়হস্তে ভারতশাসনের রাশ টানিয়া ধরিবার প্রেরণা দেয়।

ভারত হইতে শুধু ব্রিটেনে কাঁচা মাল চালান দেওয়া বা তৈয়ারী বিলাতী শিল্পপণ্য ভারতবর্ষে বিক্রয় করাই হয় না, সেই সঙ্গে এদেশে প্রভূত পরিমাণ ব্রিটিশ অর্থও নানাভাবে লগ্নী হইয়া পড়িয়াছে। খনির ইজারায়, কলকারখানার ও অফিসাদিতেই এই টাকার অধিকাংশ খাটিতেছে। ভারতে এইরূপ ব্রিটিশ সম্পত্তির পরিমাণ বিশেষজ্ঞদের মতে একশত কোটি পাউণ্ড বা প্রায় ১৪ শত কোটি টাকার কাছাকাছি। খনি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্পের মালিকানা এবং বিভিন্ন কোম্পানীর পরিচালনার (ম্যানেজিং এজেন্সী) অধিকারে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা প্রতি বৎসর এদেশ হইতে পারিশ্রমিক বা লভ্যাংশ প্রভৃতির হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া যান। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত তাহার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্পাদন অপরিহার্য্য এবং সেক্ষেত্রে এদেশকে শোচনীয় বিদেশী শোষণের লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য্য।

ভারতে যে ব্রিটিশ সম্পত্তি জমিয়া উঠিয়াছে, সেগুলির

ভারতীয়করণ করিতে হইলে এই কার্য্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভারতসরকারকেই লইতে হইবে। অবশ্য যে বিদেশী আমলাতন্ত্র এতকাল ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, তাঁহাদের নিকট হইতে ভারতবাসীর এই স্বার্থসংরক্ষণ আশা করা বৃথা; তবে এখন কেন্দ্রে কংগ্রেসী অন্তর্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান আমরা অনতিবিলম্বেই আশা করিতেছি।

ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হইয়া এদেশের শাসনাধিকার পরিত্যাগ করিতেছেন, কিন্তু এই সময় তাঁহারা বন্ধুর দেখাইয়া নূতন জাতীয় সরকারের নিকট হইতে এদেশে কিছু কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা কায়েমী করিয়া লইতে চেষ্টা করিবেনই। বলা বাহুল্য, যে ক্ষেত্রে তাঁহারা ভারতে নূতন আর্থিক স্বার্থ সৃষ্টি করিতে উৎসুক, সেক্ষেত্রে ভারতস্থিত লাভজনক ব্রিটিশ সম্পত্তি নষ্ট করিতে তাঁহারা একটুও আগ্রহশীল হইতে পারেন না। বাস্তবিক সম্প্রতি কমন্স সভায় এক প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে ব্রিটিশ অর্থসচিব ডাঃ হিউ ডালটন পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, ভারতস্থিত কোন ব্রিটিশ সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তরকরণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ব্রিটিশ সরকারের নীতি নয়।

অথচ একথা সকলেই স্বীকার করিবেন, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিপূরক হিসাবে এই দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বিদেশী শোষণ হইতে ভারতবর্ষকে অবশ্যই মুক্ত করিতে হইবে। ভারতে ব্রিটিশ সম্পত্তি রক্ষায় ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ আছে, কাজেই উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়েও এই সম্পত্তি ভারতীয়করণের প্রশ্নে তাঁহারা মোটেই উৎসাহিত নন। বলা বাহুল্য, ভারতের জাতীয় সরকারের কিন্তু দেশের অর্থনীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এই সমস্যা উপেক্ষা করা চলিবে না। কংগ্রেস এখন কেন্দ্রে যে অন্তর্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন, ইহার পরিণতিতে ভারতে পূর্ণ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়াই মনে হয়। আমরা এই জাতীয় সরকারের নিকট হইতেই 'ভারতে বৈদেশিক মূলধন' সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান আশা করিতেছি।

মিটিবে কি এ ক্ষুধা আমার

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ

বিবসনা এরো লোভা—বিবসনা অমল বৈভব,
অমৃতের পুত্র আমি রিক্ত তবু থাকি চিরকাল,
অর্থহীন আক্ষেপের ধারা শুধু ঝোলে কলরব,
ঐশ্বর্য্যের মর্ম্ম কণা দক্ষুমতে নাহিরে ভরসা।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত আমি চিরন্তন ক্ষুধিত পথিক,
বুভুক্ষার কথা মোর চিরদিন লেখে ইতিহাস,—
আমার পরম তৃপ্তি তবু আজও মিলিল না ঠিক,
ক্ষিতির সম্পদ রাশি শুধু মোরে করে পরিহাস।

বাহিরে পড়িয়া আছে প্রাণহীন নির্ম্মীব প্রকৃতি,
অন্তরে নাহিক তার জীবনের মধুর স্পন্দন,—
অন্তহীন শূন্যতায়—ক্লেদময় ঘৃণিত বিকৃতি,
তাহাদের মাঝখানে আত্মা মোর করিছে ক্রন্দন।

সকলে ঘুমায়ে আছে—আত্মা মোর শুধু রহে জাগি,
যুগ-যুগান্তর ধরি' নাহি মর তাহারে সান্ত্বনা,

চেতনা সহায় তার চির-সুপ্তি সমাধির লাগি',
জন্ম-জন্মান্তর ধরি' চলিয়াছে তারই আরাধনা।

ক্লান্ত আমি, রিক্ত আমি,—মনে মনে জানি সত্যবর—
সম্পদের মাঝখানে মিটিবে কি এ ক্ষুধা আমার?

অর্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

রেখা—শ্রীরঞ্জন ভট্ট

নীহারিকা দখন আরম্ভ করে, যবনিকা আর সহজে পড়তে দেয় না। এ সভায় শুধু সে কবি নয়, বিদূষকও বটে। 'এনকোরের' আশ্বাসে ওর কাহিনী কীর্ত্তন সরস ভাবে আপনা থেকে এগিয়ে চলে। বন্ধুর বিবাহ তার মনে গল্প প্রবাহ জাগিয়ে দিল। সে বলে চলল, "আমাদের গাঁয়ের গোবর্দ্ধনদা দুবার বইয়ের বি-এতে 'ফেল' হবার পর বইয়ের বিদ্যেতে পাশ করবার জন্ম উঠে পড়ে লেগে গেল। অথচ বাড়ী পাড়াগাঁয়ে হলেও বাড়ীর সবাই এম-এর আগে মেয়ে ঘরে আনবে না সেইরকমই ঠিক করে রেখেছিল। তবে বেচারার দোষই বা কি? দাদা হারাধন কলকাতায় চাকরী করে আর সস্ত্রীক থাকে। একে কলকাতার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া প্রেমে পড়তে চাওয়ার পক্ষে দিন দিনই অনুকূল হয়ে উঠছে, তায় ছোট্ট বাড়ীখানা আপাততঃ অবিরাম কপোতকূজনে ও নব প্রণয়োচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে আছে। তার তরঙ্গ যে আর একজনের বাণুলোয় সফেন হয়ে আঘাত করে যাচ্ছে তার খবর ওরা কেন রাখছে না। কিন্তু সে ত জল নয়, শুধুই ফেনা, তাতে ত মনে হেনা বা চামেলী ফুটাতে পারবে না। যাই হোক, প্রেমে না পড়ুক প্রেমে পড়ার সঙ্গে প্রেমে সে বহুদিন থেকেই পড়ে আছে। পড়ার আর অনুরাগ হচ্ছে না দেখে গোবর্দ্ধন বৈরাগ্যে মন দিল—অর্থাৎ নিজের খাওয়া দাওয়ার দিকে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলল।

দুষ্ট লোকে বলতে লাগল যে, ও এককালে ভেবেছিল যে একালে বিয়ে না করলেও প্রেম করা চলে এবং সেটাই উৎকৃষ্টতর, কারণ সে আগুনে তাপ আছে, দাহ নেই; সে ফুলে সৌরভ আছে, কণ্টক নেই। কিন্তু তার এক বন্ধু এ বিষয়ে বিশেষ একটা ধাক্কা মারাতে গোবর্দ্ধন আর সাহস করে এগিয়ে যেতে পারে নি। দুই তরুণ তরুণীতে ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম—একটী কাজল সন্ধ্যার বিজনতার মধ্যে বন্ধু বাণী খুঁজে পেল। কণ্ঠে গদগদ ভাব এনে, প্রায় হাঁটু গেড়ে বসে মধ্যযুগের নাইট আধুনিক যুগের নায়িকার কাছে প্রেম নিবেদন করল।

নাইট। তোমার, তোমার পদতলে আমি সারা পৃথিবী পেতে দিব আমার হৃদয়ের সঙ্গে। আমায় তুমি গ্রহণ কর।

নায়িকা। (মৃদুহাস্যে) আহা কি কথাই বললে। আমার পায়ের তলায় পৃথিবী ত এমনিই পাতা রয়েছে। তোমার যা যোগাড় করা দরকার, তা হচ্ছে মাথার উপর একখানি বাড়ী।

বাড়ী ও গাড়ী না সংগ্রহ হলে নারী জীবনে পদার্পণ করবেন না। সংসারের আত্মীয়পরিজনদের ভীড়ে তিনি নীড় রচনা করতে অনিচ্ছুক এবং অপারগ। বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে ঐ রূঢ় পরিচয়ে বন্ধুর আকাশকুসুম নাকি শুকিয়ে গেল এমন করে—যে সে আর ও পথ মাড়ায়নি। বড় বোনের ননদের স্বামীর শ্যালিকার কাছে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছিল যে মাতৃ আজ্ঞা পালন করতে পারবে তেমন মডার্ণ ছেলেই সে নয়।

যাই হোক্ ব্যাপার কিছু না বুঝতে পেরে—আর হারাধনের হারামণি ফিরে পাওয়ার মত অবস্থায় বুঝতে পারার কথাও নয় এবং বৌদি বাড়ীতে নূতন লোক, সে বুঝতে পারলেও বলতে পারে না—মাকে খবর দেওয়া হল। মা কলকাতায় এসেই তারস্বরে নানাবিধ প্রশ্নের পর ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু চালসে-পড়া দৃষ্টি ও পানসে-পড়া মনে তাঁর সহরপ্রবাসী সন্তানের মনের রং সহজে ধরা পড়বার কথা নয়। তাই অনেক কথাবার্ত্তার পর রাত্রে নির্জনে তিনি ছেলের শোবার ঘরে ঢুকে তাকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করলেন। বেসামরিক বাঙ্গালীর জীবনে যাকে বলে একেবারে "ফ্রন্টাল য়্যাটাক"।

যুদ্ধের যুগ তখনো আরম্ভ হয় নি। একজন কলকাতার কবি লিখেছিলেন "পথ চলতে ঘাসের ফুল"। কিন্তু কলকাতার লোক তখনো পথ চলতে সবে ফুল দেখতে সুরু করে নি। পথে বিপথে—এবং বিপথেই বোধ হয় বেশী—

(বিজয়ী—দুষ্ট লোকে টিননী কাটে যে রণক্ষেত্রে ও হৃদয়ক্ষেত্রে

উভয়তই—মহারথীদের comrades in arms সঙ্গে নিয়ে—তাদেরই সঙ্গের প্রেরণায় হয়ত—উদ্দাম বেগে বিপুল রথ চালনা ক্ষুদ্র পদাতিকদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে তুলবে, একথা তখন কেউ ভাবতেও পারত না। অবশ্য হতভাগ্য পদাতিকের রথ—নিজেই যদি গতি হয় সেটাই তার উপযুক্ত স্থান—কারণ পদাতিকের স্বাভাবিক পরিণতি নির্ভর করছে পাদদেশের উপর, রথ বা রথীর তাতে কোন হাত নেই।

যদি যুদ্ধের যুগ আরম্ভ হওয়ার পর এ কাহিনী হত, তাহলে গোবর্দ্ধনের এত দুরবস্থা হত না। পথিকের ভীরু হৃদয় যুদ্ধের কল্যাণে বিদ্যুদ্রথের প্রচণ্ড গর্জ্জনে বেপথুমান হতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রথ থেকে উৎসারিত বিবিধ কলধ্বনি—দুষ্ট লোকে বলে কেলি ধ্বনি—হৃদয়কে যুগপৎ উচ্চকিত ও পুলকিত করে চলে যায়, আর সহরটা রণভূমি বা রঙ্গভূমি সে বিষয়ে পরম ভ্রম হবার উপক্রম হয়েছে। রসিকজন বলেন "দুনিয়া রঙ্গ রঙ্গিলে বাবা"; কাজেই কলকাতার যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর রঙ্গভূমি দেখে থাকলে গোবর্দ্ধনও মার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারত—"মোর প্রেম নয়ত ভীরু, নয়ত হীনবল"।

নীহারিকার বন্ধুপুঞ্জ উৎসুক হয়ে ওর চারদিকে একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল। সবাই জজ্ঞেস করতে লাগল তারস্বরে, "তারপর? তারপর?" হেসে নীহারিকা বলতে আরম্ভ করল। এ হেন বিপদের যুগে মেয়েরা থাকলেও বিপদে নাকি আত্মনেপদী বুদ্ধিতে কুলোয় না; মেয়েদের স্মরণ করার ফলে যে বিদ্রোহ হয়, তা থেকে উদ্ধারের জন্য পুরুষদেরই শরণাপন্ন হতে হয় সেটুকু বুদ্ধিও গোবর্দ্ধনের ছিল। অনেক ভেবে চিন্তে সে এসে আমার পরামর্শ চাইল, বলল যে—তাকে কিরকম ভাবে মা কলকাতায় এসে কথাবার্ত্তা চালাতে হবে তার—একটা মহলা দিয়ে দিতে হবে। গুরুজনরা নাটকের উপর চিরকালই খড়্গহস্ত; কারণ লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁরা তা দেখতে ভালবাসেন, কিন্তু নাটক আমাদের বেলাতেও যে শুধু না-টক নয়, বরং বিশিষ্ট ভাবে মিষ্ট, সেটা তাঁরা যৌবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যান। যা হোক, আমার অভিনয়টা শোন।

মা যখন আদর করে ছেলেকে ডাকেন 'ধন'—তা সে হারাই হোক, আর গোবরই হোক্—ছেলে তখনি তাড়াতাড়ি ছুটে আসে। দুজন থাকলে দুজনই ছুটে আসে—কে আগে এসে আদরটা পাবে। কিন্তু গোবর্দ্ধন বলল যে, দেখ, মা যখন 'ধন' বলে ডাকবে এবার দাদা আমার সত্যি সত্যিই হারাধন হয়ে যাবে; আমাকেই যে ডাকা হচ্ছে সেটা বুঝতে কোন ভুল হবে না এবং এই মিষ্টি ডাকের পিছনের শক্ত ইঙ্গিতটাও বুঝতে ভুল হবে না। কিন্তু এই একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, মাকে আমার মনের ব্যথাটা একটু দরদ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। স্কুলের সামনে বিক্রী হয় যে আলুকাবলী তার থাট্টার মত আর কি। মানে একটু টক থাকবে, একটু ঝাল, একটু নুন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আদমিটা যেন রসে সিক্ত হয়ে যায়। মানে এই একটু—এই যাকে বলে দরদ আর কি আমার উপর, বুঝলে নীহারিকা?

আমি ত খুবই বুঝলাম। কি ছেলেরে বাবা!

চলুকের মুটকল দেখা

আধুনিকদের বাবা একেবারে। বন্ধুবান্ধবদের কাছে ওই ধন নামটাই চালিয়েছে। কারণ সে জানে যে একটা ছোট্ট মিষ্টি ডাক-নাম আধুনিকাদের মনে ঢোকার একটা পাশপোর্ট। ঠোঁটের সিন্দুর আর কপোলের আপেলী রং ফোটাবার গোলাপজলের সঙ্গে সঙ্গে তরুণীদের মনে ঘুরতে থাকবে, ভ্যানিটী ব্যাগেই যেন ঘুরছে।

গোবর্দ্ধন। তুমি ত সবই জান নীহারিকা, বর তুমি আমার মা আর সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁরে ধন, তোর কি হয়েছে বল ত?

নীহারিকা। দেখ সে সুবিধের হবে না। তোমার মা কি রকম বলবেন তা আমি কি করে জানব? তার

ছেলে তুমি হও তোমার মা, আর আমি হই তুমি। আচ্ছা এস সুরু করা যাক্।

মা। হ্যাঁরে ধন, তোর কি হয়েছে বল ত?

ধন। কেন মা? কিছুই হয় নি ত। এবারে পাশটা নির্ঘাতই করব দেখে নিয়ো।

মা। তোকে কি পাশের কথা শুধোচ্ছি ধন? সে পাশ ত আকাশের চাঁদ, একদিন পুণ্যিমে হবেই। আমি বলছি তোর নিজের কথা। এই ধর-না তোর বালিশটার কি ছিরি হয়েছে, বিছানাটার কি অবস্থা। আজকাল কি ঘুমানো ছেড়ে দিয়েছিস না কি?

ধন। কেন, আমার ঘুমের কসুর হল কোথায়? বিছানা ত পাতাই আছে সারা বছর ধরে। যদি আবার

নটরাজ নৃত্য

নতুন পাতা হয়, সে হয়ত হবে হালখাতার সময়। আমার কি আর শাদা ধবধবে নূতন চাদরে তোয়ালেতে বালিশ-ঢাকা বিছানার দরকার আছে? না, পানের বাটাটা রোজ পরিষ্কার করে মাজানোর দরকার আছে? কি-ই বা হবে তাতে? ভাগ্যিস ঘরে ফ্যান আছে। তাই হাত-পাখার দরকার নেই। আর দরকার হলেই বা কি করতাম? এক হাতে কতক্ষণ বাতাস করা যায়। নিজে হাতে নিজেকে বাতাস করলে ঘুমাবই বা কখন? তবে এটা ঠিক যে আমি ঘুমাই, কি আমার বালিশ ঘুমায় সে বোঝাই যায় না! শালগ্রামশিলার আবার শোয়া আর বসা। আমার ঘুম? সে ত হচ্ছে মাথার উপর বালিশ চড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

মা। আচ্ছা, ঘুম হচ্ছে না তবে একটু জবাকুসুম মালিশ করিস না কেন মাথায় দাদার মত। তাতে মাথাও ঠাণ্ডা থাকবে। তা ছাড়া ভাল করে চান করবি রোজ।

ধন। হ্যাঁ, চান ত করতে হবেই। রোজই করছি। তা বাড়ীর চৌবাচ্ছার জল আমার জন্য বাকী আছে কি না, তা আমার নিজেকে দেখে নেবার সময় হয় না। আর তোমার ওই জবাকুসুম—তা এ হাতে আর এ মাথায় মাখতে গেলে জগাখিচুড়ী পাকিয়ে যায় চুলে। দেরী হয়ে গেলে আবার রাস্তায় মুন্সিপালের কলের জন্য 'কিউ' করতে হতে পারে। তাই কোন রকমে সেই সাত সকালের শীতে কলতলায় দৌড়ে গিয়ে এই একটু নটরাজ নৃত্য করে আসি আর কি।

মা। হ্যাঁরে, নটরাজ নেত্যটা কি জিনিষ?

ধন। কেন? সেই যে যাকে বলে ওরিয়েন্ট্যাল ডান্স। তার চান্স ত আমার মত লোক ছাড়া সকলের কপালে মেলে না। তা ছাড়া সেটা করাও খুব শক্ত। কারণ এ হচ্ছে চতুষ্পদী। আগে লোকে জানত দ্বিপদী নৃত্য, আর সপ্তপদী বিবাহ। কিন্তু নৃত্যটা একালে চতুষ্পদী, হাত পা দুই-ই চালাতে হয় কি না। আর বিবাহটা ত শুধু পরস্মৈপদীই দেখলাম এ পর্য্যন্ত।

মা। আচ্ছা, তা না হয় হল রসিক ছেলে কোথাকার। তারপর ভাল করে খাওয়া দাওয়া করিস না কেন? বৌমা বলছিল পাতের ভাত থাকে পাতে পড়ে, মুখের মধ্যে আর সরে না।

ধন। বৌদি ত বলবেই। আমার কত ভাত দিল, কে পাত পেড়ে দিল সে খবর ত সবাই রাখছে। আমার আবার খাওয়া! সে ত ঠাকুরের ফুটবল খেলা।

মা। সে কি আবার? ঠাকুর এর মধ্যে কি করল?

ধন। কেন, সেই ত সব করে। হঠাৎ যখন দেখি যে কলেজের সময় হয়ে যাচ্ছে—এক দৌড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে চলে আসি, ঠাকুর ভাত দাও। ঠাকুর তাড়াতাড়ি থালায় গোল করে ভাতের ফুটবল সাজিয়ে কেলে, আর তার গায়ে মাথার একটু ছিটেফোঁটা ডালের কাদা—মানে, বৃষ্টির দিন কি না। তার পরই থালাটা এক পেনাল্টী

কিকে ছিটকে ছুঁড়ে গোল করে দেয়। থ্রি চিয়ার্স ফর কটকবাগান।

* * * * *

মাতা পুত্র সংবাদের এই বিবরণের পর মন্ত্রণাসভাটী ঐক্যমত হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করল যে প্রদ্যুম্নের বিয়েটা করা একান্তই উচিত। তবে বিপদবান্ধব সমিতির পক্ষ থেকে কেশব একটা সংশোধন প্রস্তাব করিয়ে নিল যে, বাকী সভ্যরা কেহ ত্রিশের আগে বিয়ে করবে না। এ প্রস্তাবেরও একটী সংশোধনী করিয়ে নিল রাজীব যে, বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত তার বয়সই ত্রিশ হয়ে উঠবে না।

(ক্রমশঃ)

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

রায়বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী একটি স্মরণীয় যুগ। এই শতাব্দীতেই আমরা বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যপূর্ণ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, ঘন নাটক এবং বহু হাস্যোদ্দীপন প্রহসন সম্পদ লাভ করেছিলাম। প্রাচীন যে প্রচুর পরিচয় এই যুগের সাহিত্যে পাওয়া যায়, অন্য যুগে তার তুলনা বিরল।

এ যুগে অনেক প্রতিভাবান্ কবি, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক জন্মেছিলেন—যাঁদের আবির্ভূত হবার বাংলা সাহিত্য একটি চমৎকার ঐশ্বর্য লাভ করেছিল। ঈশ্বর গুপ্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের এই যুগ জ্যোতিষের কৃতিত্বের উল্লেখ এখানে করবো না। কারণ তার আলোচনায় একখানি সমগ্র গ্রন্থ রচিত হতে পারে। অন্য যে সব সাহিত্যরথী এই গৌরবময় যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁদের হাস্যরসের সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য সরস হয়ে উঠেছে এই প্রবন্ধে তাঁদের কথাই আজ সংক্ষেপে আলোচনা করবো। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন প্রমুখ কবি ও নাট্যকারের কথা সকলেরই মনে পড়বে। তা ছাড়া ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর বিখ্যাত পুত্রগণও এই যুগের অন্তর্ভুক্ত। এঁরা সকলেই অন্নবিস্তর রসসৃষ্টি করে বাঙালীর জীবনকে সরস ও মধুর করে তুলেছিলেন। এই শতাব্দীরই শেষ ভাগে হরেন্দ্রকৃষ্ণ মহাপাত্র তাঁর প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র মাদ্রাজ সাহিত্যের মধ্য দিয়েও হাস্য রস পরিবেশনে অনেই সহায়তা করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য সমালোচনার রসপিপাসা এখনও অপরাজেয় হয়ে আছে। 'সাহিত্য' যখন প্রতিষ্ঠানীরহিত মাসিকপত্রিকা ছিল, তখন সুরেশবাবুর সাহিত্য সমালোচনা পড়বার জন্যে লোক মাসের পর মাস উদ্গ্রীব হয়ে থাকতো।

এই সকল কবি ও লেখকের রচনায় হাস্যরসের যেন একটি ক্রমপরিণতি দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালার গানে বা যাত্রার দলের সঙে যে পরিহাস-রসিকতার চেষ্টা আমরা দেখি, তা তত মার্জিত নয়। হয়ত একটু আদিম বা primitive, হয়ত কিছু অশ্লীল বা Coarse, কিন্তু লোকের মধ্যে হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টা হিসাবে এরেও অশ্রদ্ধা করা চলে না। কবির গানের যে ধারা সে যুগে প্রবর্তিত হয়েছিল, আমাদের বাল্যকালেও তার কিছু নিদর্শন আমরা পেয়েছিলাম। 'পক্ষির গুরু হরু ঠাকুর, মরা জোলা, পাটনী কাঁদিনাথ'—তার পরে এন্ট্রী কিরিঙ্গি, রামবসু প্রভৃতিও ছিলেন। এঁদেরই আদর্শে যে কবির গান ওঠের সাম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়েরা করেছেন, তা শোনবার সুযোগ আমার কিছু হয়েছিল। একটি দল হাত পুরুষের, অন্য দল স্ত্রীলোকের—একদল হিন্দুর আর এক দল মুসলমানের—এঁদের মধ্যে উৎকট অশ্লীলতা পালাগানপূর্ণ প্রতিযোগিতায় লোকে আনন্দই পেতো এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্যে কখনও অসদ্ভাব হতেও দেখিনি। কিন্তু সে দিন চলে গেছে। এখন হাসির স্রোত আর অবাধে বইতে পারে না। সে সাধারণের খোলা-হাসির যুগ আর নেই।

অশ্লীল হলেই যে অসুন্দর হবে, এমন কোনও কথা নেই। রসসৃষ্টির মধ্যে শিল্প যদি দানা বেঁধে ওঠে, তবে আর্ট হিসাবে তাকে মনোত্তীর্ণ বলে গণ্য করতে বাধা নেই, তা অশ্লীল হলেও। যাক্, আমরা সে পুর বোধ হয় পিছনে ফেলে এসেছি—অর্থাৎ হাস্য রসকে উপভোগ্য করে তুলতে হলেই যে তাকে অশ্লীলতার বন্ধন সঙ্গে বাঁধিত করতে হবে এমন ধারণা সাহিত্য থেকে বিদায় নিয়েছে—এ কথা শ্রোতা ও লেখক—দুইয়ের সাহিত্য সম্বন্ধেই খাটে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে—অলঙ্কার-শাস্ত্র যেমন অনেকের—হাসিরও তারতম্য আছে। রুচি ও সংস্কৃতি ভেদে হাসি উত্তম, মধ্যম ও অধম; এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। উত্তমের 'স্মিত হাস্য' মৃদু ও মধুর। অধমের উচ্চ হাস্যকে বলে 'অপহাসিত'—সেখানে সূক্ষ্ম রসবোধ নেই। মধ্যমের হাসিকে 'বিহাসিত' বলা যায়—অর্থাৎ উত্তম ও অধম হাসির মাঝামাঝি। সাহিত্যে হাস্যরসের পরিবেশনে এই বিবিধ রূপেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

হাস্যরসের থেকে যে শুধু আনন্দের খোরাক পাওয়া যায়, তা নয়,

এর দ্বারা সময় সময় লক্ষ্যও উপলব্ধ পাওয়া যায়। জীবনে যেখানে অসঙ্গতি ও গলদ থাকে—এমন কি সমাজ জীবনে যে সব অন্তরায় পরিপূর্ণ থাকে, হাস্যরসের বুল আই (Bull's eye)—লক্ষ্যের আলো তার উপর ফেলে সংস্কারের পথ বাহির করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যে যে সব হাস্যরসের নিদর্শন পাওয়া যায়, তা অধিকাংশস্থলেই এই প্রথম শ্রেণীর এই বিদ্রূপ বা Satire। এই বিদ্রূপ অনেক সময় ছুরিকা ছুরির মতো ছিল—একদিকে বিরুদ্ধ আঘাত পরিবেশন; অন্যদিকে বাঙালীর জীবনের গলদ বিশ্লেষণ করা। নবাগত সভ্যতা চোখে ধাঁধা দিয়ে রেখেছিল জীবনে যে সব অসঙ্গতি, যা কিছু কুৎসিত বা বিশৃঙ্খল রয়েছে। এক দিকে এই নবাগতার ধাক্কায় যারা টাল সামলাতে পারেনি তাদের উদ্ভট্ অনাচার, এবং প্রাচীন সংস্কারের দোহাই দিয়ে যারা মনের নানা কদাচারের প্রশ্রয় দিত তাদের ভণ্ডামি বেফাঁস—এই দুয়ের উপরই প্রচুর উপাদান যুগিয়েছিল।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবাবাবুবিলাস, নবাবিবি বিলাস দুতী-বিলাস লেখা হয়েছিল নব্য সভ্যতাকে বিদ্রূপ করে। এ শুধু হুতোম প্রভৃতি হাস্যরস সোসাইটি নয়, সমাজ জীবনকে আক্রমণ দিয়ে করবার জন্যও এই। পাদ্রী লঙ, বলেছিলেন নবাবাবুবিলাস সম্বন্ধে—One of the ablest satires on the Calcutta Babu. মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর "একেই কি বলে সভ্যতা," এই উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন। মাইকেলের একেই প্রহসনখানির ঐ একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়েছিল। "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" কমটি ভণ্ড বৈষ্ণবদের প্রতি বিদ্রূপ। মাইকেলের 'বুলশী বনের বাঘ' প্রবাদের মত হয়ে রয়েছে। মাইকেলের শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী নাটকে যে 'বিদূষকের' সৃষ্টি করেছেন, তার হাস্যরসের উপকরণ যোগাবার জন্যে সন্দেহ নেই। কিন্তু সংস্কৃতের ঐ বেণী অনুকরণ বলে' সার্থক হতে পারেনি। বিদূষক সেটুকু ব্রাহ্মণকে দিয়ে একালে আর রহস্য করা চলে না। তবে মাইকেল যে মৌলিকত্ব হারাননি, তা পদ্মাবতীর বিদূষকচরিত্র থেকে কিছু বোঝা যায়। সেখানে হাস্য এক নূতন রূপ স্বভাবতঃ তাঁর বিদূষককে "প্রতিহারি" থেকে তুলে নেয়নি।

মাইকেলের তার দীনবন্ধু বিদ্রূপ সমাজের গলদ নিয়ে ব্যঙ্গরসের সৃষ্টিতে অনেক পড়তা পেয়েছিলেন। তাঁর ছিল পাগলা বুড়ো, জামাই বারিক, সধবার একাদশী প্রভৃতি তথাকথিত হিন্দুসমাজের উপর satire বা বিদ্রূপে ভরা। বঙ্কিমবাবু সত্যই বলেছেন যে সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা যে সব প্রহসন বা নাটক, আর্ট হিসাবে তার তেমন মূল্য দেওয়া যায় না। বাস্তবিক এসব সময়ের সহচর। কোনও একটি সময়ের যা দুঃখের জন্য যে রসসৃষ্টি হয়, তা সেই যুগের সঙ্গেই চলে পড়ে। তা নইলে দীনবন্ধু হাস্যরসে যে খোলতা ছুটিয়েছেন, তা বঙ্গসাহিত্যের চিরবিস্ময়ের সম্পদ্ বলা যেতে পারে। দীনদর্পণের করুণ আর্তনাদপূর্ণ কাহিনীতে তিনি আহুরীর প্রতিমা সৃষ্টি করেছেন, তাতেই তাঁর রসসৃষ্টিকুশলতা সপ্রমাণ হয়। বঙ্কিমবাবু দীনদর্পণকে হৃদয়দীর্ণ ব্যথা বলেছেন; কিন্তু আমার মনে হয় সধবার একাদশীতে নিমচাঁদের চরিত্রটি একদম প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্টের পরিচয় প্রদান করে। নবীনতপস্বিনীর রোমান্স বুৎকতে, কমলে কামিনীর রূপবর্ণন, সধবার একাদশীর ঘটনায় ঢেলুটি দীনবন্ধুর অপূর্ব সৃষ্টি। দীনবন্ধু মাইকেলের ন্যায় বেঙ্গলী ও বিদেশী সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। উপরন্তু মাইকেল যে সুযোগ পাননি দীনবন্ধুর তা ঘটেছিল। অর্থাৎ নানাপ্রকৃতির বাঙালীর সঙ্গে মিশে দীনবন্ধু লোক-চরিত্র সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তার তুলনা নেই। সেই জন্য তাঁর চরিত্রগুলি বেশ realistic হতে পেরেছিল—মনে হয় সেগুলি যেন আমাদের চিরপরিচিত লোকের ফটোগ্রাফ। উপন্যাস ও নাটকের সাহিত্যিক শিল্প হিসাবে দীনবন্ধুর মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটিরও অভাব ঘটেছিল, কিন্তু একটি গুণ ছিল এই যে নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে মেলানোর ধরনটি। হাস্যরসের একটি উপাদান অবশ্য অতিরঞ্জন, কিন্তু দীনবন্ধুর সৃষ্টিতে সে অতিরঞ্জন অনেক সময় বাস্তব চরিত্রের বিভিন্ন উপর প্রতিষ্ঠিত।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমাজের উপর একদম বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি। তাঁর 'বাঙ্গিমাবু' কবিতায় যে রসসৃষ্টি হয়েছিল, কি ভাষার দিক্ দিয়ে, কি ছন্দের দিক্ দিয়ে তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে নেই।

ছেঁচে থাকো বুধুজের পো খেলুলে ভাল ঝোট।
তোমার খেলার বাং ফুলো হয়, মোরয়ে পালুক ঘোট

সাময়িক রসরঙ্গ হলেও প্রয়োজনার মতুনত্বীয়। বুধুজের পোকে আমরা কবে ভুলে গেছি, কিন্তু হেমচন্দ্রের কবিতা ভুলতে পারি নি। এখানে ইতিহাস কবির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য।

সে কালে নব্য সমাজ বা ইয়ং বেঙ্গলকে ব্যঙ্গকরা কবি ও লেখকদের মধ্যে একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। টেকচাঁদ ঠাকুর তাঁর আলালের ঘরের দুলালে যে সামাজিক নক্সা আঁকলেন, তা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। টেকচাঁদ দীনবন্ধুর মত একজন নাট্যকার পরিহাস-প্রিয় লোক ছিলেন। বিষয়টার চরিত্র যেমন দীনবন্ধুর হাতে ফুটেছে, ঠিক তাঁর চরিত্র তেমনি টেকচাঁদের অবদান সৃষ্টি। তিনি ভাষায় যেমন হাস্যিয়েছেন, তেমনি হাসিয়েছেন ঠকামিতে। টেকচাঁদের সামাজিক নক্সা কালীপ্রসন্ন সিংহের হাতে পূর্ণবিকাশ লাভ করেছিল। 'হুতোম প্যাচার নক্সা' রসরঙ্গে ভরপুর। স্থানে স্থানে একটু অশ্লীলতা দোষ থাকলেও আর্ট হিসাবে চমৎকার। তাঁর বিদ্রূপের পিছনে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য এমন ভাবে থাকলেও রসসৃষ্টি হিসাবে সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করেছে। তাঁর মহাপুরুষ, মহাফেরা, কুচনামাদ্দে প্রভৃতি গদ্যিকায় রসসৃষ্টি হিসাবে অবদান।

রসরাজ অমৃতলাল বসু কথায়, গল্পে ও প্রহসনে বাঙালীকে অনেক হাসির খোরাক দিয়ে গিয়েছেন। এমন মজলিসী লোক এযুগে দেখা যায় না। তাঁর বিবাহবিভ্রাট, তাজ্জব ব্যাপার প্রভৃতির রঙ্গরস সেকালে বাঙালীর মনোরঞ্জন করেছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষও হাস্যরসের পরিবেশনে অনেক কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর আবুহোসেন, বেল্লিক বাজার,

যায়না কি ভায়না প্রভৃতি যাদের বিশেষ উপভোগের সামগ্রী হয়েছিল। তবে দ্বিজেনবাবু ছিলেন কিছু গম্ভীর প্রকৃতির, আর অমৃতলাল ছিলেন হাল্কা সেই জন্যই বোধ হয় অমৃতলালই সেকালে মাৎ করে দিয়েছিলেন।

এই সময়ে আর একজন নাট্যকারের অভ্যুদয় হলো—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সরকারী হাকিম, বিলাতে শিক্ষিত—তাঁর হাসি শুধু দুঁইফুলের মত ফুটেছিল গানে। কথা ও সুরের বিচিত্র সমাবেশ তিনি আধুনিক রুচির সঙ্গে ছন্দ রক্ষা করে' যে সব হাসির গান রচনা করলেন, তাতে সে সময়ের দেশের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। হাস্যরসে যে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ প্রাণ খুলে যোগদান করতে পারে, তা দ্বিজেন্দ্রলালই বোধ হয় প্রথম দেখালেন। তাঁর রঙ্গ রচনা—পুনর্জ্জন্ম, কল্কি অবতারও সার্থক হয়েছিল। কিন্তু প্রথম তাঁর নাম পড়ে গেল হাসির গানে। একজন কবি হাসির গানে বেশ ধরতা রেখেছিলেন, তিনি হচ্ছেন কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন। এই দুইজন কবির হাসির গান তাদের নিজের মুখে শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, গানে গানে তাঁরা বাঙ্গালার প্রাণে যে পুলক জাগিয়ে দিয়েছিলেন, তার তুলনা নেই। উভয়ই ছিলেন অত্যন্ত পরিহাসরসিক, উভয়ই ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক। রজনীকান্ত অত্যন্ত গায়ক, একটির পর একটি হাসির গান তিনি গেয়েই যেতেন; তাতে কারও ক্লান্তি বোধ হতো না। তাঁর 'ধরের ঘর, যেমনা যেমাই, কেরাণী জীবন প্রভৃতি যাদবের খনি। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই যুগে খাঁটি হাস্যরসের লেখার দিয়েছিলেন, তাঁর ভায়ত উদ্ধার প্রভৃতি যে সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

এখন থেকে হাস্যরস সত্যিকার মুক্তিলাভ করলো। লোককে, সমাজকে বা আচারকে বিদ্রূপ করে যে হাসি, সে হাসি সাময়িক প্রয়োজনের ফলীভূত। অলঙ্কারশাস্ত্রে বলেন, হাস্য রসের বর্ণ শুভ্র। বস্তুতঃ কোনও প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের সঙ্গতে যদি হাস্য রস করে, তবে তাকে উৎকৃষ্ট বলা যেতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ইতিহাস এই হাসির থেকে হাস্যরসের মুক্তির ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে। রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা প্রভৃতি হাস্যরসের পরিবেশনে একটা মুক্ত হাওয়ার সন্ধান এনে দিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রের অলীক বাবু, স্বর্ণ-কুমারীর কৌতুক নাট্য প্রভৃতিতে এই স্বাধীন রঙ্গরসের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের দুজনা ছিলেন ধার্শনিক, কিন্তু রঙ্গরসের দিকে তিনিও যথেষ্ট মন দিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি কবিতা উদ্ধৃত করে' শেষ করি:

ইচ্ছা সম্যক্ ফল ধরণেতে কিন্তু পাকের বাকি।
পাকে শিক্ষী মন উড়ু উড়ু, একি দৈবের পাকি।
ইচ্ছা দেবী করে যদি কৃপা না রহে দুঃখ জ্বালা।
বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই কিছু না খালি উদরে বি ঢালা।

অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

(২)

অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ২রশে সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীর সাংবাদিক বৈঠকে যে বিবৃতি দেন, তাহাতে সত্যই এক নবভারতের আগমনীর বার্ত্তা শুনা গিয়াছে। পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্রগুলির সহিত ভারত এতাবৎকাল তাহার কোনও সম্পর্কের কথাই চিন্তা করিতে পারিত না। অস্ত্রের মুল্য, শান্তি, বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে তাহার কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। ভারতের যাহা কিছু বক্তব্য ও কর্ত্তব্য তাহার সমস্তই নির্দ্ধারিত হইত লণ্ডন হইতে; এবং বৃটেন নিজের স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়াই তাহা বিধারণ করিয়া দিতেন। কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ায় এখন হইতে লাট-সচিব পারের লণ্ডন সরকারী পরিবর্ত্তে নয়াদিল্লী হইতে ভারতের মর্ম্মবাণী জগতের মাঝে প্রচারিত হইবে।

বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত ভারতের কি ভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হইবে সে সম্বন্ধে পররাষ্ট্র বিভাগের সহকারী হিসাবে পণ্ডিত নেহরু জানান—সর্ব্বাগ্রে শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণের এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম ইউরোপের দেশ-গুলির সহিত ভারতের দৌত্য স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। মিশর, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি দেশে শুভেচ্ছা মিশনের প্রতিনিধি হিসাবে মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে এবং ইউরোপের জন্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননকে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। অদূর ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ককে একজন ভারতীয় কনসাল এবং সাইগনে একজন ভাইস-কনসাল নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সহিত ভারতের পূর্ব্ব হইতেই একটি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত রহিয়াছে। এই সম্পর্ক শীঘ্রই নিজস্ব কূটনৈতিক নীতির ভিত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া আরও দৃঢ়তর করা হইবে। তাহা ছাড়া অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় হাই-কমিশনার, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয় প্রভৃতি দেশে ট্রেড কমিশনার রহিয়াছেন। এই সকল স্থানের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহে এবং অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহে কূটনৈতিক ও বাণিজ্য

সম্পর্কীয় বস্তুর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি ভারতীয় বৈদেশিক দপ্তরের সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হইয়াছে। রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য যেসকলের সহিত ভারত সরকারের সম্পর্ক স্থাপন করা হইবে।

পণ্ডিত নেহরুর এই ঘোষণার পর ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া লীগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন, প্যারীর শান্তি সম্মেলনে কল দূতাবাসে রাশিয়ার পররাষ্ট্রসচিব মিঃ মলোটভের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভবিষ্যতে ভারতের সহিত রাশিয়ার দূত বিনিময় এবং রাশিয়ার নিকট হইতে ভারতের জন্য খাদ্যসম্ভার ধার লইয়া শ্রীযুক্ত মেনন মিঃ মলোটভের সহিত আলোচনা করেন।

কংগ্রেস অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিবার কিছুদিন পূর্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের দমন করিবার জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাহাদের উপর বোমা বর্ষণ করেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যভার গ্রহণ করিয়াই আদেশ দিয়া উপজাতিদের উপর বোমা বর্ষণ বন্ধ করিয়া দেন। তিনি জানান, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব লইয়া আমরা এই সীমান্তনীতি বিবেচনা করিব। ইহাদের সম্বন্ধে নীতি স্থির করিবার জন্য পণ্ডিত নেহরু নিজেই উক্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিবার কথাও ঘোষণা করেন। এ সম্পর্কে তিনি আফগান সরকারের সহিত পরামর্শ করিবার কথা বলেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের এই সকল উপজাতি ইংরাজদের এক সন্ত্রাসবিহীন সমস্যা। কোনক্রমেই ইহারা ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে নাই, অথচ ইহাদের বশে আনিবার জন্য ইংরাজ সরকারের কোনও চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। সুদক্ষ কংগ্রেস এই অকূল শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণ করিতে চাহিলে ভারত সরকার তাহাতে বাধা প্রদান করেন। বর্তমানে আবার এই সকল উপজাতিদিগকে কয়েকজন লীগপন্থী মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেও উপজাতিদের নেতা ইদ্রিস ফকির কিন্তু কংগ্রেসের প্রতিই তাঁহার পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইংরাজ সরকার এতদিনের চেষ্টায় যাহাদের বশে আনিতে পারেন নাই, সেই সকল দুর্ধর্ষ উপজাতিরা অন্তর্বর্তী সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সহজেই সভ্যতার স্তরে উন্নীত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

৮ই সেপ্টেম্বর বেতার বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছিলেন—আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্বাধীন জাতিহিসাবেই আমরা যোগদান করিব এবং আমরাই আমাদের নীতি রচনা করিব। এই উক্তির সকল পরিচয় পাই, ১৭ই সেপ্টেম্বর শান্তিতে অনুষ্ঠিত জাতিপুঞ্জের বৈঠকে ভারতবর্ষ যখন তাহার স্বাধীন নীতি অবলম্বন করিয়া সর্বপ্রথম বৃটেনের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। এই সঙ্গে ভারতের পক্ষে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ১৮ই সেপ্টেম্বর সরকারী ভাবে ভারতবর্ষে প্রথম বৃটিশ হাই-কমিশনারের নাম ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার দ্বারা ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে এতদিন যে সম্পর্ক ছিল তাহার পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়। স্বাধীন ভারতের প্রতি বৃটেনের নূতন সম্পর্কের প্রথম ধাপ বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে, মিঃ টোবেল হোন বৃটিশ হাই-কমিশনারের পদগ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

এই সকল ঘটনা হইতেই অন্তর্বর্তী সরকারের মর্যাদা ও ক্ষমতার অনেকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন মর্যাদা লাভ করিতে এই গবর্ণমেণ্টকে এখনও বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। তবে প্রমিক গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা যদি সত্যই আন্তরিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে বাধা সহজেই দূরীভূত হইবে।

এদিকে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ভারতের নানা স্থানে বিশেষ করিয়া কলিকাতার বুকে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটে তাহার পর লীগ নায়কবৃন্দ বুঝিতে পারেন যে, এক শ্রেণীর লোক ব্যতীত মুসলমান জনসাধারণের সমর্থন ইহাতে মোটেই মিলে নাই। তাঁহারা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছেন যে সরকারী খেতাব বর্জনের আবেদন কি ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। অনেক খোঁড়া লীগপন্থীই খেতাবের মোহ কাটাইতে পারেন নাই। এবার দিল্লীতে বসিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সংক্রান্ত কার্যক্রমের নূতন করিয়া খসড়া প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। একজন লীগ নেতা জানান—এই সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ অথচ বে-আইনী হইবে। মোটামুটিভাবে সংগ্রামের তালিকা ঠিক হয়—(১) গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত আবশ্যক মোদে প্রদেশিক আইন সভাগুলিতে সিকেটিং (২) খাজনা বন্ধ (৩) আয়কর বন্ধ (৪) ১৪৪ ধারা অমান্য। তবে এই তালিকা বিভিন্ন-ওয়ার্কিং আলোচনার ফলাফলের অপেক্ষায় থাকে।

মিঃ জিন্না বসা দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া ভারত সরকারের জিন্নতান্ত্রিক পরামর্শদাতা স্যার বি. এন. রাওএর নিকটে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা পুনরায় পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে থাকেন এবং বড়লাটের নিকট হইতে আমন্ত্রণ পাইয়া বৈধানুসারে বড়লাটের সহিত বার বার সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। আবার ভূপালের নবাবের প্রচেষ্টাতেও কয়েকবার নেহরু-জিন্না সাক্ষাৎকার ঘটে। মিঃ জিন্নার এই সকল সাক্ষাতের ফলে অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের যোগদানের অনেক সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। লীগ এবার যদি সত্যই মিলন মৈত্রীর আন্তরিক কামনা লইয়া কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস একা যে লক্ষ্য চলিয়াছেন তাহা সহজেই আরও নিকটতর হইয়া পড়িবে।

১১।১০।৪৬

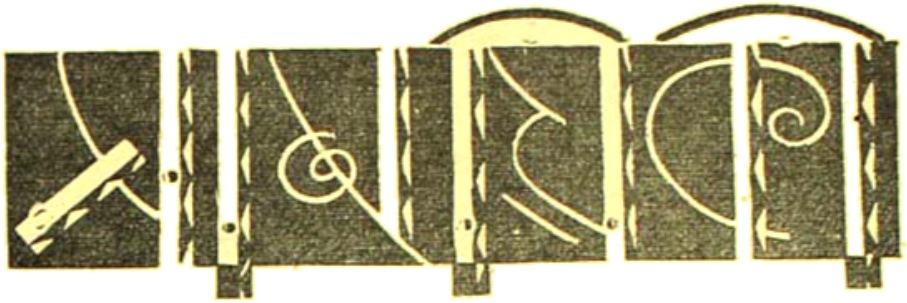

বিজয়া-অভিনন্দন—

বৎসরান্তে মহাপূজার পর আমরা আমাদের স্বজনগণকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। বাংলা ১৩৫৩ সাল একদিকে যেমন ডাক ধর্ম্মঘট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতির মত নানা দুর্য্যোগপূর্ণ—অন্য দিকে তেমনই বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উপর ভারতের শাসনভার অর্পণের মত আশার বাণী লইয়া সমাগত। এই মহা পরীক্ষার দিনে শক্তিময়ী মা যেন আমাদিগকে সকল সুখ ও দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিবার শক্তিদান করেন—সেই শক্তি যেন আমাদিগকে জয়-যাত্রার পথে অগ্রসর করে—সকলকে আজ সমবেত ভাবে আমরা সেই প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করি।

সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ—

গত ১৬ই আগষ্ট মুসলেম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম উপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীতে যে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, আজ দুই মাস ধরিয়া তাহা চলিতেছে, বিরতির কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। শক্তিহীন শাসক সম্প্রদায় দাঙ্গাকারীদের দমনে অসমর্থ হইয়া সংবাদ-পত্রসমূহের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সরকার অনুমোদিত সংবাদ ছাড়া অন্য সংবাদ প্রকাশ বন্ধের আদেশ করায় গত ১লা অক্টোবর হইতে সাত দিন কলিকাতার ২১ খানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ ছিল। জনগণের অনুরোধে ৮ই অক্টোবর হইতে সংবাদ-পত্রগুলি পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে। সাত দিন সংবাদ প্রকাশ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কলিকাতায় হাঙ্গামা কমে নাই—যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতেছে।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস—

গত ২রা অক্টোবর ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর ৭৮তম জন্ম-দিবস ভারতের সর্ব্বত্র উৎসবের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। গত ২৫ বৎসরেরও অধিককাল গান্ধীজি ভারতের মুক্তি সংগ্রাম পরিচালিত করিয়া আজ ভারতকে মুক্তির দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। সে জন্য ভারতবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ—তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা সম্মান করিয়া থাকে। আজও অন্তর্বর্ত্তী সরকারের কংগ্রেস দলীয় সদস্যগণের অনুরোধে গান্ধীজি দিল্লীতে বাস করিয়া শাসন কার্য্য পরিচালনে সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। এই পরিণত বয়সেও তাঁহার কর্ম্মশক্তি যে অসাধারণ, তাহার প্রমাণ সর্ব্বদা ভারতবাসী পাইয়া থাকে। সেজন্য সকল ভারতবাসীর সহিত এক সুরে আমরাও আজ প্রার্থনা করি, গান্ধীজি দীর্ঘজীবী হইয়া ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে সর্ব্ব প্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

গত বারুণ বারিপাতের ফলে জলমগ্নিত কলিকাতার রেহুলা

ফটো—শিপ্রা সেন

কংগ্রেসে গ্রামপন্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধি—

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্যগণকে কংগ্রেস

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকিবার অনুমতি দানের প্রস্তাবের পক্ষে ১৩৫ জন ও বিপক্ষে ৮০ জন সদস্য ভোট দিয়াছেন। শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ নিজে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হইয়াও প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিলেন। কংগ্রেসে যে বাম-পন্থীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা এই ভোট গণনার সংখ্যা দেখিয়াই বুঝা যায়।

হিন্দু মহাসভা—

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডাঃ শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অসুস্থ হইয়া কিছু দিনের জন্য সভাপতির কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করায় ডাঃ বি-এস মুঞ্জে তাঁহার স্থানে সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির সভায় একটি সেনাবাহিনী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, প্রত্যেক হিন্দুর সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

কলিকাতার পথ ঘাট জলমগ্ন—চিৎপুর এবং বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল। ফটো—শ্রীপান্না সেন

ব্ল্যাকপুলে মিঃ চার্চ্চিলের আস্ফালন—

ব্ল্যাকপুলে অনুষ্ঠিত বৃটিশ রক্ষণশীলদলের সম্মেলনে মিঃ চার্চ্চিল বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন···শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট যেভাবে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিয়াছেন, তাহাতে যে বৃটিশরাজ ভারতকে আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে এতদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহাকে সেই বৃটিশের হাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ভারতের শাসন ভার এরূপ লোকের উপরে চাপান হইয়াছে যাহারা বৃটিশের সহিত সম্পর্ক রাখার তীব্র বিরোধী। তাহারা ৪০ কোটী ভারতবাসীর প্রতিনিধিও নহেন। আশঙ্কা হয়, ইউরোপের ন্যায় আয়তনে বড় অথচ জনবহুল ভারতের বিপদ আসন্ন। মিঃ চার্চ্চিল আরও বলেন যে, ইংরাজ শাসনের ফলে ভারতে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে এবং ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে যে দুঃখকষ্ট ও রক্তপাত দেখা দিবে তাহার পরিমাপ করা যাইবে না। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের ভাইস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সংবাদপত্র মারফৎ জানাইয়া দিয়াছেন যে, উক্ত বক্তৃতা ঈর্ষাপ্রণোদিত ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। ইহাদ্বারা ভারতে অশান্তি এবং স্থায়ী সরকারগঠন ও একতার বিঘ্ন সৃষ্টির প্ররোচনা করা হইয়াছে। আমরা বৃটীশের সহিত সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু যাহারা ভারতের স্বাধীনতায় বাধা প্রদান করিবে, তাহাদের সহিত সংযোগিতা করিতে চাহি না।

ব্রহ্মে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন—

গত সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ব্রহ্মদেশের গবর্ণর স্যার হুবার্ট র‍্যান্স ব্রহ্মের জাতীয় নেতাদের লইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন করিয়াছেন। দেশে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভের ফলেই এই সরকার গঠনে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। মোট ১১ জন সদস্য লইয়া শাসন পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ফ্যাসীবিরোধী-গণস্বাধীনতা সঙ্ঘের ৬ জন সদস্য ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ৪ জন সদস্য ইহাতে রহিয়াছেন। গরিলাযুদ্ধের নেতা ও বর্ত্তমান ব্রহ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব ইউ আউঙ্গ সান অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের সহ সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই নূতন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ও মর্য্যাদা ভারতের অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের ন্যায় হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি ভারতীয় নেতারা মিঃ ইউ, আউঙ্গ সানকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। ব্রহ্মের নূতন গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াই মিঃ আউঙ্গ

সান ভারতকে এক লক্ষ টন উদ্বৃত্ত চাউল প্রেরণের কথা বলিয়াছেন। ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষেরই একটি প্রদেশ ছিল। ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইলেও যাহাতে ব্রহ্মদেশের খনিজ ও কাষ্ঠ সম্পদ হাতে থাকে তাহার জন্যই রক্ষণশীল ইংরাজদল ইহাকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন। ব্রহ্ম ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ে যে সকল বাধানিষেধ আরোপ করা হইয়াছে শীঘ্রই তাহা দূরীভূত হইবে এবং উভয়েরই মধ্যে স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক আদান প্রদান চলিয়া আসিবে বলিয়া আশা করা যায়।

গভর্ণমেণ্ট উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিক অর্থদান ও সরকারী অনুমোদনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মিঃ কার্ভের জীবন-ব্যাপী সাধনার ফলে এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

মিঃ মির্জ্জা আহমেদ বেগ—

মিঃ মির্জ্জা আমেদ বেগ জার্ম্মানীর বৃটীশ অধিকৃত অঞ্চলে আটক ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। নেতাজী বসুর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে তিনি ইউরোপে মুসলমানদের মধ্যে সংগঠন কার্য্য করিতেন। পরে তিনি আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি

কলিকাতার পথে নৌকা—ল্যান্সডাউন রোড ও রাসবিহারী এভেনিউ সংযোগস্থল ফটো—ন্যাশনাল ইউনাইটেড আর্টিষ্ট্

ভারতীয় নারী বিশ্ববিদ্যালয়—

ডাঃ ডি-কে কার্ভে ১৮৯৬ সালে পুণায় বিধবা আশ্রম ও সেই সঙ্গে নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ক্রমে তাহা ভারতীয় নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া সর্ব্বজনপরিচিত হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বোম্বায়ের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি-জি খেরের সভাপতিত্বে এক উৎসব হইয়া গিয়াছে। অশীতিপর বৃদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কার্ভে গত ৫০ বৎসরের ইতিহাস বিবৃত করেন। বোম্বাই

বলিয়াছিলেন—বৃটীশ অধিকৃত ফ্রান্সান অঞ্চলে এখনও ২২ জন ভারতীয় আটক আছেন, তাঁহাদের মুক্তির জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত।

ব্যবস্থা পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব—

গত ২০শে ও ২১শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতার হাঙ্গার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার পক্ষে ৮৭ ও বিপক্ষে ১৩১ জন সদস্য ভোট দেওয়ায় তাহা গৃহীত হয় নাই। ঐ

সম্পর্কে পরিষদে ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। পরিষদের খেতাঙ্গ দল ও ৩ জন কম্যুনিষ্ট সদস্য কোন পক্ষে ভোট দেয় নাই। এংলো ইণ্ডিয়ান সদস্যগণ মন্ত্রী পক্ষে ও একজন ভারতীয়-খৃষ্টান কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিয়াছিল। মুসলমানগণ সকলেই মন্ত্রীপক্ষে ভোট দেন। মন্ত্রী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং তপশীলভুক্ত জাতির শ্রীঈশ্বরদাস বাকরী, শ্রীভোলানাথ বিশ্বাস ও শ্রীহারাধন বর্মণও মন্ত্রীপক্ষে ভোট দিয়াছেন। মুসলমানগণের এরূপ একতা পরিষদে আর কখনও দেখা যায় নাই।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটীর এক সভায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত আছেন ও উপযুক্ত সময়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করিবেন। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে আরও নানা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—একটিতে বলা হইয়াছে যে সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতার গৃহে বাস করিতেছেন। অপরটিতে বলা হইয়াছে, সুভাষচন্দ্র উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইপির ফকীরের অতিথিরূপে তথায় বাস করিতেছেন।

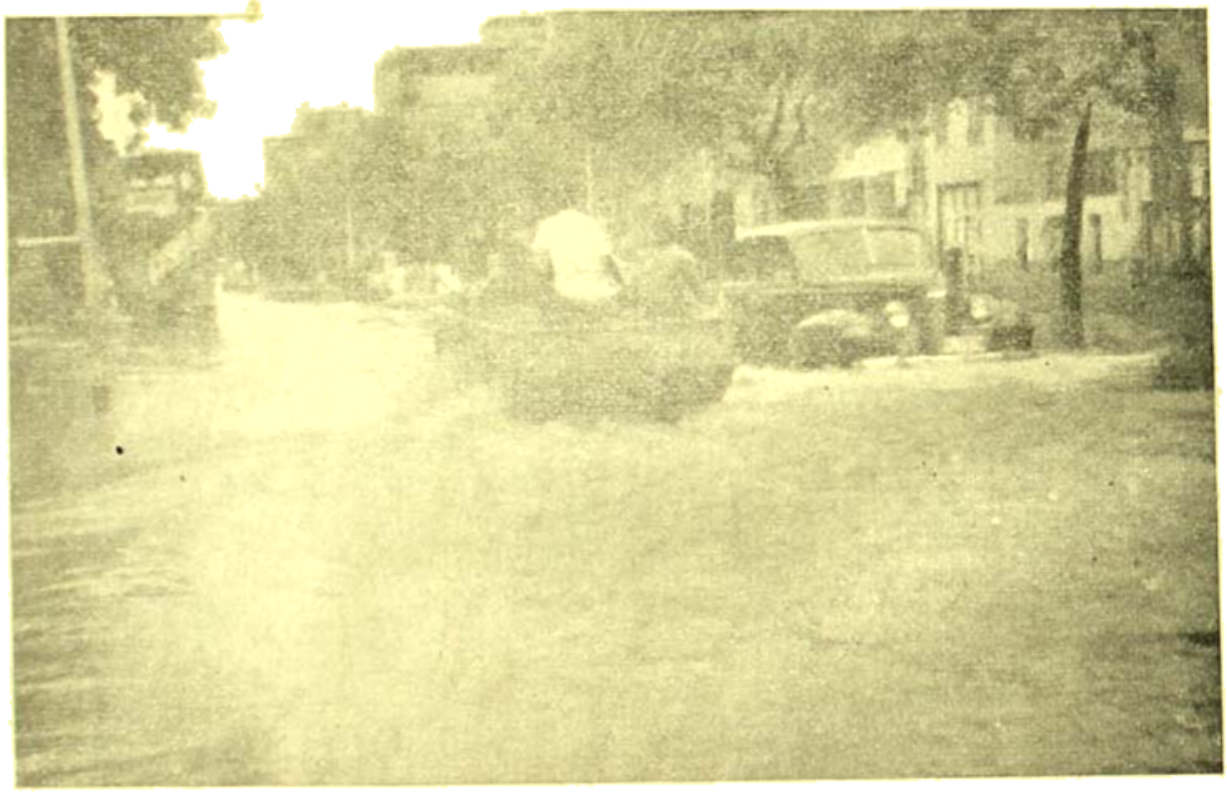

জলপথে কলিকাতার পথে—দামার এরোনিট ও ল্যাণ্ডিং এয়ারক্রাফটের সংযোগস্থল ফটো—ব্রিটিশ ইনফরমেশন অফিস

মীরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন—

আগামী নভেম্বর মাসে যুক্তপ্রদেশের মীরাট সহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। মীরাটে সেজন্য উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। যে বিরাট মণ্ডপ প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে দেড় লক্ষ লোকের স্থান হইবে! অভ্যর্থনা সমিতি ২০ হাজার সদস্য ও ৩ হাজার প্রতিনিধির বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের অবসান

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ভারতের সকল শাখার কর্ম্মীরা তাঁহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য দেড় মাস কাল কাজ বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা পুনরায় কাজে যোগদান করিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁহাদের অভিযোগ দূর করার ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

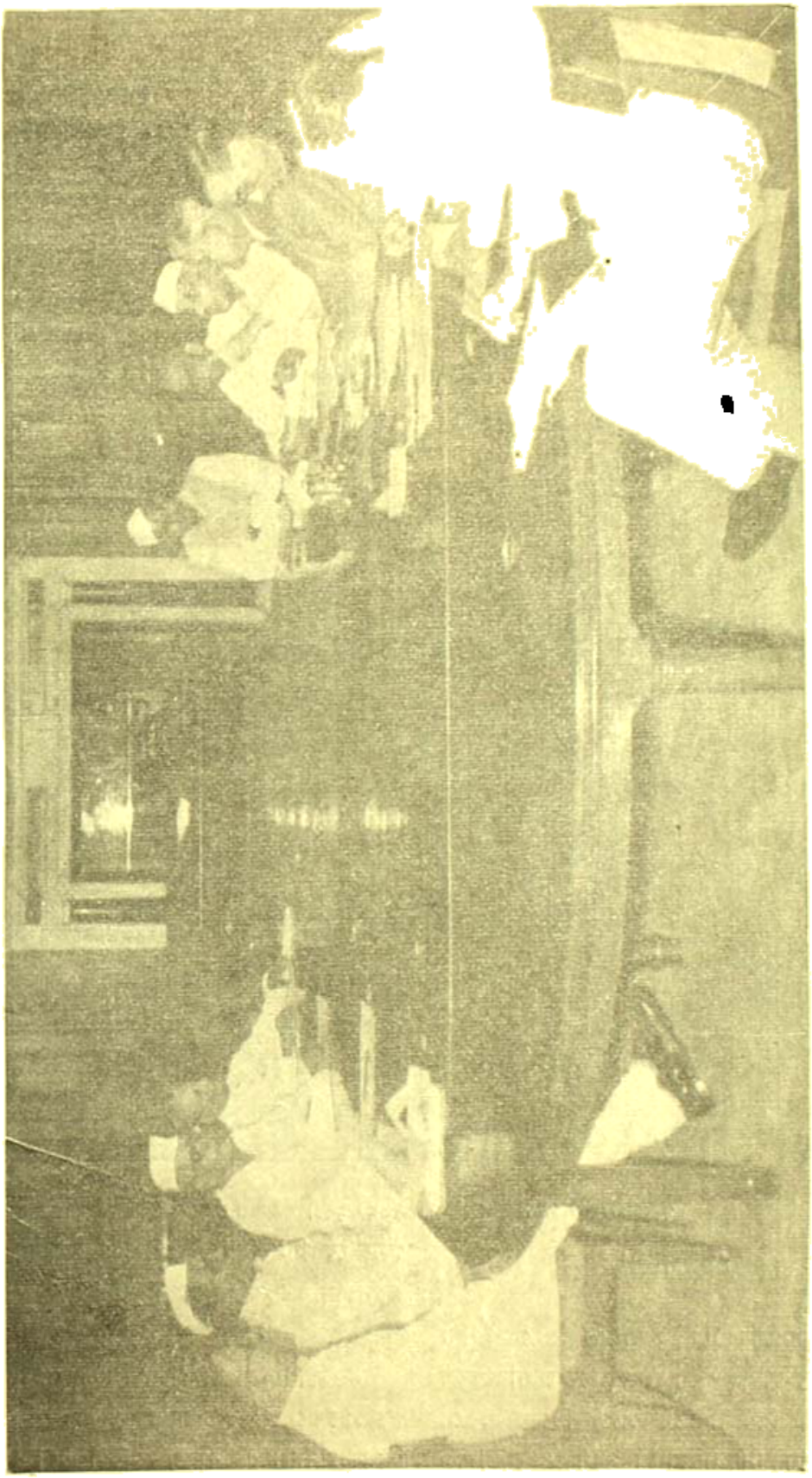

মহাত্মা গান্ধীর অন্তিম মুহূর্তের ছবি

অন্তর্বর্ত্তী সরকার ও সুভাষচন্দ্র—

কংগ্রেস নেতারা অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সমস্ত পদ গ্রহণ করিয়া গত ২রা সেপ্টেম্বর যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসী তাঁহাদের অসাধারণ সাহসিকতায় বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। জনগণের অনুরোধে স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল নেতাজী শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাজেই এখন সুভাষচন্দ্রের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনে বা আত্মপ্রকাশে কোন বাধাই থাকিল না। ভারতের সকল লোক তাঁহার আগমনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

প্রকাশ করিয়া থাকেন। খাতনামা পাকসার নেতা আল্লামা মাশরিকী, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতা খুদিকল্প খান আবদুল গফুর খাঁ, সীমান্তের উপজাতি নেতা ইপির ফকির প্রভৃতি সকলেই বিবৃতি প্রকাশ করিয়া দেশবাসীকে জানাইয়া দিয়াছেন—কেহ যেন মিঃ জিন্নার আন্দোলনে প্রতারিত না হন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতের হিন্দু মুসলমান জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র—তাঁহার ত্যাগ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্ম্মক্ষমতা প্রভৃতির জন্য দেশবাসী সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করেন—সেজন্য ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া মিঃ জিন্না তাঁহার সহিত কথা বলা বা তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করা অন্যায় বলিয়া মনে করেন। তথাপি একদল মুসলমান

গড়ীয়াহাটা রোডস্থ ম্যাণ্ডেভেলী গার্ডেনএর সম্মুখভাগে জলপ্লাবিত ফটো—বাণিজ্য ইউনাইটেড আর্টিষ্ট্

বৃটীশ সরকার ও মিঃ জিন্না—

নিখিল ভারত মুসলেম লীগের সভাপতি ও নেতা মিঃ এম-এ-জিন্না যে বৃটীশ রক্ষণশীল দলের হাতে খেলার পুতুল হইয়া ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করিতেছেন, সে কথা শুধু হিন্দুরা বলেন না, চিন্তাশীল মুসলমান নেতারাও কেন যে মিঃ জিন্নার প্রতি এত দরদী, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কঠিন নহে।

ভারতের ব্যাণিজ্য নীতি—

অন্তর্বর্ত্তী সরকারের বাণিজ্য সচিব মিঃ সি-এচ-ভাবা গত ১৯শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে নূতন সরকারের বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছেন। যদি সে নীতি

অনুসরণ করিয়া কাজ চলে, তাহা হইলে কি বহির্বাণিজ্য, বা অন্তর্বাণিজ্য উভয়দিক দিয়াই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সকল অভাবই দূরীভূত হইবে।

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ—

বাঙ্গালা দেশের বহু জেলায় চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। পাবনা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় গত

কলিকাতা সেকের নিকটে দামার এজেনিটর প্লাবন দৃশ্য ফটো—বালিগঞ্জ ইউনাইটেড আর্টিষ্টস্

অতি বৃষ্টি ও ঝড়—

এ বৎসর বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে অতিবৃষ্টি ও ঝড়ের ফলে শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আউস ধান্য কাটিয়া তোলা সম্ভব হয় নাই—মাঠ জলে ভাসিয়া গিয়াছে। বৃষ্টিতে আমন ধান্যেরও বেশ ক্ষতি হইয়াছে। আলু বাঙ্গালীর একটি প্রধান খাদ্য—আশ্বিনের প্রথম হইতেই আলুর চাষের আয়োজন করা প্রয়োজন—তাহাও বৃষ্টির জন্য সম্ভব হয় নাই। মাঠ জলে ডুবিয়া যাওয়ায় তরি-তরকারীও অগ্নিমূল্য হইয়াছে। সাধারণ লোক যে কত দিক দিয়া বিপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ অন্তর্বর্ত্তী সরকারের খাদ্য ও কৃষি বিভাগের ভার লইয়া অনেক বড় বড় কথা শুনাইয়াছেন। কিন্তু সে কথা কি কোনদিন কার্য্যে পরিণত করা হইবে?

এবারের দুর্গোৎসব—

১৬ই আগষ্ট বাঙ্গালা দেশে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে তাহা শেষ না হওয়ায় এবারের দুর্গোৎসবে বাঙ্গালা আনন্দ উপভোগ করিতে পারে নাই। পূজার পূর্ব্বেই যশোহর, বরিশাল প্রভৃতি

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হইতেই চাউলের মণ ৩০, ৪০ বা ৫০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এ অবস্থায় বহু লোক যে না পাইয়া মারা যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? যে লীগ-মন্ত্রি-সভা দুই মাসেও কলিকাতার দাঙ্গা থামাইতে পারিল না, তাহা যে দেশবাসীর অন্নকষ্টের জন্য চিন্তিত হইবে, এমন মনে হয় না। নবগঠিত কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্ত্তী সরকারও এখন পর্য্যন্ত এদিকে মন দেন নাই—কাজেই বাঙ্গালার দরিদ্র জনগণের পক্ষে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া উপায়ন্তর নাই।

জেলার বহু স্থানে দুর্বৃত্তগণ দেবী প্রতিমা নষ্ট করিয়া দিয়া দুর্গোৎসবে বাধা প্রদান করিয়াছে। কলিকাতার মত সহরেও মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে লোক দুর্গোৎসব করিতে সাহসী হয় নাই। সকল স্থানেই বিশেষ পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া লোককে ভয়ে ভয়ে প্রতিমা পূজা করিতে হইয়াছে। দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই—কাজেই পূজায় দীয়তাম্, ভুজ্যতাম্-এর কোন ব্যবস্থা করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব হয় নাই। মা যে আসিয়াছিলেন, লোক তাহা অনুভব করিতেও পারে নাই।

শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দত্ত

খ্যাতনামা কাগজ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দত্ত সম্প্রতি ভারত

শ্রীমাণিকলাল দত্ত

গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা বিভাগ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া জার্ম্মানীতে কাগজ শিল্প সম্বন্ধে গবেষণার জন্য গমন করিয়াছেন। তিনি ১৯৩৮ সালে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কাগজ প্রস্তুত ও মুদ্রণ শিল্প সম্বন্ধে উপাধি লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার বহু বড় বড় কারখানা ও শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্সের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীতে কাগজ শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পর তিনি নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের কারখানাগুলিও দেখিয়া আসিবেন। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

রাণাঘাটে মেজর-জেনারেল—

গত ১৩ই জুলাই রাণাঘাটে স্পোর্টিং এসোসিয়েসনের সাধারণ বার্ষিক সভায় আজাদ-হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৌরহিত্য করেন। তাঁহার সহিত ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারাও ছিলেন! শ্রীযুক্ত হেমন্ত বসু ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার স্থানীয় এসোসিয়েসনের সভ্যদের স্বাস্থ্য ও পীড়াকৌতুক দেখিয়া

রাণাঘাট স্পোর্টিং এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক মেজর জেনারেল এ.সি চ্যাটার্জ্জীকে সম্বর্দ্ধনা

মুগ্ধ হন। মেজর-জেনারেল দেশের প্রত্যেক নর-নারীকে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে কোন কাজে অগ্রসর হইতে বলেন ও আজাদ-হিন্দ ফৌজের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার নিয়ম বর্ণনা করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য শ্রীযুক্ত পি-এন্ পটবর্দ্ধন মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন বলিয়া পদত্যাগ করায় কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

মোটরের মিশর—

বড়লাটের নূতন শাসন পরিষদের সদস্যগণ স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা মোটর গাড়ী ও গৃহ ভাড়া সম্বন্ধে

মাসিক ১৫ শত টাকা বেতন লইবেন। পূর্ব্বে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণ বার্ষিক ৬৬ হাজার টাকা বেতন পাইতেন।

অন্ধ ছাত্রীর কৃতিত্ব—

কলিকাতা কালীঘাট ২৯ রসারোডের নিখিল ভারত অন্ধ আলোক নিকেতনের ছাত্রী শ্রীমতী প্রতিভা বাগচী এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা

শ্রীমতী প্রতিভা বাগচী

পাশ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে ভারতে আর একজন মাত্র অন্ধ ছাত্রী ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিল। তিনি কলেজে প্রবেশ করিয়া উচ্চ শিক্ষালাভ করিবেন।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ—

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ দীর্ঘ ৩১ বৎসরকাল ভারতের বাহিরে থাকিয়া গত ৯ই আগষ্ট জাপান হইতে মাদ্রাজে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি ইউরোপে যাইয়া শত্রুদলে যোগদান করায় এতদিন তাঁহাকে ভারতে ফিরিয়া আসার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ১৯১৫ সালে তিনি কাবুলে এক অস্থায়ী ভারত সরকারও গঠন করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়া বৃন্দাবনে প্রেম মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতনে নারী শিক্ষাশ্রম—

ভারতীয়দের প্রতি চীন জাতির সহানুভূতির নিদর্শন-স্বরূপ চুংকিএর চীনভারত সংস্কৃতি সমিতি শান্তিনিকেতনে একটি নারী শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। অল্পবয়স্কা নিঃস্ব নারীদিগকে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষা ঐ আশ্রমে প্রদত্ত হইবে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট মাসিক তিন হাজার টাকা দান করিবেন।

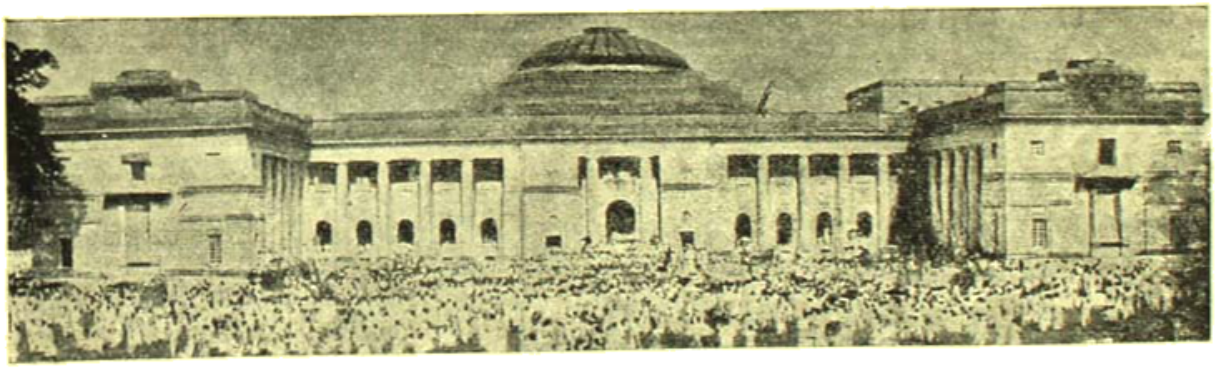

রাজবন্দীদের মুক্তি প্রার্থনায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরাট জনতা ফটো—ইণ্ডিয়া নেস

উচ্চতর সভার ডেপুটি সভাপতি—

গত ১৩ই আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক (উচ্চতর সভা) সভায় মিঃ আবদুল হামিদ চৌধুরী সভার ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় সভাপতিরূপে, মিঃ আব্দিরুল হক, রায় বাহাদুর ব্রজেন্দ্র মৈত্র, সি-মর্গান, সতীশ সেন প্রভৃতি নির্ব্বাচনের পর তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ-সাহিত্য—

দিল্লীবাসী শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস মহাশয়ের চেষ্টায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তথায় বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক আলোচনার জন্য অর্থব্যয় ও ব্যবস্থা করিতে সম্মত

হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় নভেম্বর মাসে সেজন্য দিল্লীতে গমন করিবেন।

সাহিত্যিকের দান—

খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ৮৪তম জন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য এবার পূর্ণিয়া হইতে জন্মভূমি দক্ষিণেশ্বরে (২৪ পরগণা) আসিয়া স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের অনুরোধে

যশোরে মধুসূদনের পাদদেশে এক বিশাল জনসভায় ডাঃ তারা চৌধুরীকে ও আর-এম-এসের কর্ম্মচারীদের মিলন ফটো—শ্রীপান্থ সেন

গণপরিষদে ডাক্তার জয়াকর—

গণপরিষদের নির্ব্বাচনের সময় বোম্বাইয়ে খ্যাতনামা ডক্টর মুকুন্দরাও জয়াকর বিলাতে ছিলেন। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে পরিষদের একটি সদস্য পদ খালি হওয়ায় ডাক্তার জয়াকর বিনা বাধায় গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

নিজ বসতবাটী, তৎসংলগ্ন জমী, পুষ্করিণী প্রভৃতি স্থানীয় 'রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী'কে দান করিয়া গিয়াছেন। ঐ সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণও তাঁহাদের অংশ দান করিয়াছেন। কেদারবাবু পূর্ণিয়ায় তাঁহার দৌহিত্রগণের নিকট থাকেন। তাঁহার মত দরিদ্র সাহিত্যিকের এই দানের তুলনা নাই।

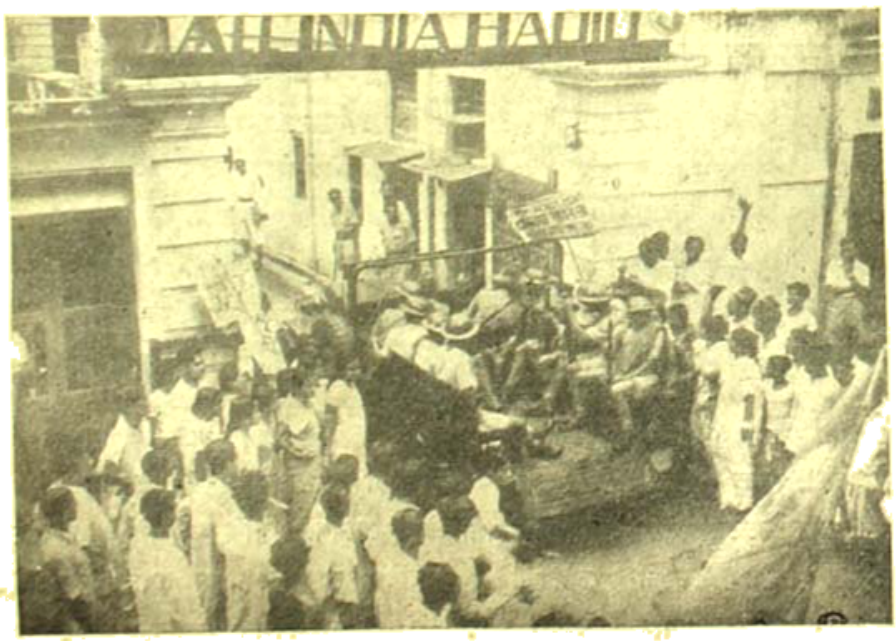

কলিকাতা রেডিও অফিসে
ধর্ম্মঘটে পুলিস
ফটো—শ্রীপান্থ সেন

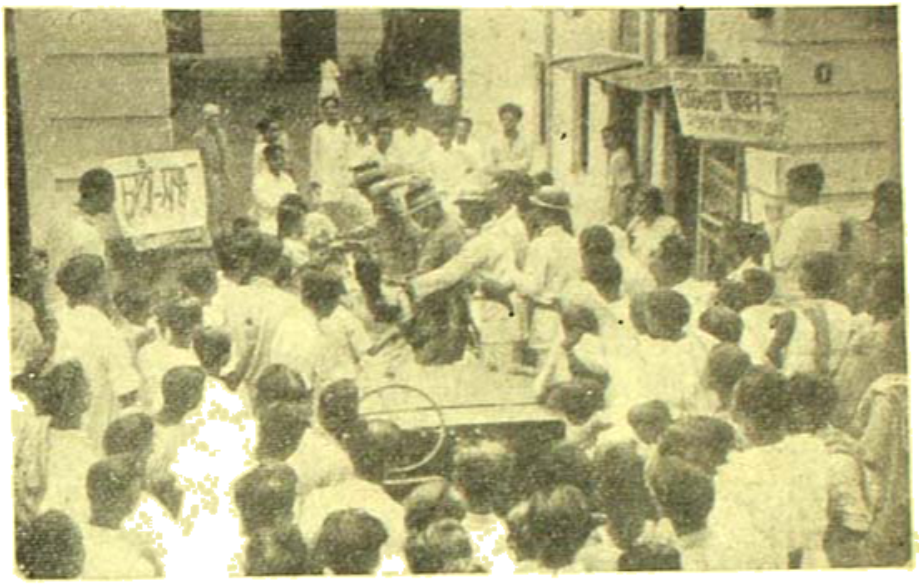

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের
কার্যালয়ের সম্মুখে ছাত্রী
সিকটার্সদের প্রতি পুলিসের
অনাচার
ফটো—ঈশ্বরী সেন

নূতন দিল্লীর বিশ্বিল ভারত চিত্র ও
শিল্প সম্ভারের ব্যবস্থাপনায়
এক চিত্র প্রদর্শনীতে বড়লাট
ও লাট ঈশানাথ সেন

কর্মরতা টেলিফোন মহিলা কর্মীবৃন্দ
ফটো—ঈশ্বরী সেন

মুক্ত রাজবন্দীগণ

উপবিষ্ট (বাম হইতে দক্ষিণে) নলিনী দাস (কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুলি চালনা মামলা) রমেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা) নিরঞ্জন সেন (রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটির সম্পাদক) অনন্ত সিং (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা)। দণ্ডায়মান (বাম হইতে দক্ষিণ) বিনোদ সেন (ইলা ঘোষ ডাকাতি মামলা), সুধেন্দু দস্তিদার (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা), সুবীর চট্টোপাধ্যায় (ওয়াটসন গুলি মারার মামলা) হেম সরকার (রংপুর ষড়যন্ত্র) প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী (বাদুড়িয়া ডাকাতি মামলা) আশুতোষ সরকার (কোটালীপাড়া গুপ্তচর হত্যা মামলা) যোগেশ চক্রবর্ত্তী (বাদুড়িয়া ডাকাতি মামলা) কালীপদ ঘোষ (বার্জ হত্যা মামলা) সহায়রাম দাস ও অনন্ত গুপ্ত (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা। ফটো—শ্রীগোপাল সেন

শোক-সংবাদ

পরলোকে ভাওয়াল সন্ন্যাসী—

ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় গত ৮ঠা আগষ্ট শনিবার ৬৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। বিলাতে প্রিভিকাউন্সিলের মামলায় তিনি জয়লাভ করিয়াছেন—কিন্তু তজ্জন্য আনন্দপ্রকাশের সময় পান নাই। বহু বৎসর সন্ন্যাসী থাকার পর তিনি গৃহে ফিরিলে যে মামলা হইয়াছিল, তাহা আইনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মাত্র কয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি আবার বিবাহ করিয়াছিলেন।

পরলোকে এচ্-জি-ওয়েল্স্—

খ্যাতনামা বিলাতী লেখক মিঃ এচ্-জি ওয়েল্স্ গত ১৩ই আগষ্ট লণ্ডনে ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্কুলের শিক্ষক হিসাবে তিনি কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন ও পরবর্ত্তীকালে গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

পরলোকে শশিভূষণ ঘোষ—

রাঁচী ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক আচার্য্য শশিভূষণ ঘোষ সম্প্রতি ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। এম-এ পাশ করিয়া তিনি ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহধর্ম্মিণীর শিষ্য ছিলেন। রাঁচীর বিদ্যালয় সর্ব্বজনবিদিত।

পরলোকে সার জেম্‌স জীন্‌স—

গত ১৬ই সেপ্টম্বর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্ব্বিদ সার জেম্‌স জীন্‌স ৬৯ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে পরলোকগমন

করিয়াছেন। তিনি স্বাধীন ও নির্ভীক চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের জুবিলী উৎসবে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'রহস্যময় জগত' গ্রন্থ সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ।

পরলোকে জ্যোতিশ্চন্দ্র গুহ—

খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মী ও ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা জ্যোতিশ্চন্দ্র গুহ ৬ই জুলাই শনিবার কলিকাতা ১১৮

জ্যোতিশ্চন্দ্র গুহ

বিবেকানন্দ রোডে ৪০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ঢাকার শিক্ষালাভের পর কলিকাতায় আসিয়া ১৯৩০ সালে এম-এ ও ১৯৩১ সালে বি-এল পাশ করেন। তিনি ছোট আদালতে ওকালতী করিতেন। ১৯৪২ সালে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লী দুর্গে লইয়া গিয়া তাঁহার শরীরের উপর অত্যাচারের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

পরলোকে কিশোরীমোহন চৌধুরী—

রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উকিল ও রাজনীতিক নেতা কিশোরীমোহন চৌধুরী গত ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ৯০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন এবং দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। রাজসাহী সংঘের সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল এবং এক সময়ে ৮০জন ছাত্র

কিশোরীমোহন চৌধুরী

তাঁহার রাজসাহীর গৃহে থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিত। তিনি বহু বৎসর রাজসাহী উকিল সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান।

পরলোকে গোষ্ঠবিহারী দে—

ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী ও ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসের পরিচালক গোষ্ঠবিহারী দে গত ১১ই শ্রাবণ ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন ধর্ম্মপ্রাণ, ভগবদ্ভক্ত ও ত্যাগী ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা, সৌজন্য, বদান্যতা, ক্ষমশীলতা এবং বীরতার জন্য, যাঁহারা একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই আন্তরিক ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহু পুস্তকের মধ্যে "প্রিন্টার্স গাইড" বইখানি মুদ্রণ-সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। অল্পদিন হইল যুবকবৃন্দকে সহজে ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে মুদ্রণ-কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায়

ইষ্টার্ণ স্কুল অফ প্রিন্টিং নামে যে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনি তাহার প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন।

গোষ্ঠবিহারী দে

পরলোকে কালিদাস চক্রবর্ত্তী—

কলিকাতা সিটি কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক কালিদাস চক্রবর্ত্তী তাঁহার যাদবপুর কলোনীস্থ বাটিতে গত ৮ই ভাদ্র রবিবার টাইফয়েড্ রোগে ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১২৯৬ বঙ্গাব্দে ওরা ফাল্গুন রাজসাহী জেলান্তর্গত নাটোর মহকুমার অধীন মাধবগ্রাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপনা নৈপুণ্যে তিনি তাঁহার ছাত্রমহলে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

পরলোকে সার হাসান সুরাবর্দ্দী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার সার হাসান সুরাবর্দ্দী গত ১৭ই সেপ্টেম্বর পরিণত বয়সে কলিকাতা ট্রপিক্যাল মেডিকেল স্কুলে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ই-বি-রেলের চিফ মেডিকেল অফিসার রূপে কাজ করিয়াছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। তাঁহাদের বংশ বিদ্যা ও আভিজাত্য-গৌরবে খ্যাত। তাঁহার ভ্রাতা পরলোকগত অধ্যাপক সার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দী ও ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার জাহিদ সুরাবর্দ্দীর নাম সুপরিচিত। বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ এচ-এস-সুরাবর্দ্দী সার হাসানের ভ্রাতুষ্পুত্র।

পরলোকে কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—

বিগত ২৬শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের পিতা গৈপুর নিবাসী পণ্ডিত কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পাঁচদিন সর্দ্দি জ্বরে ভুগিয়া ৯৫ বৎসর বয়সে নিজ বসত বাটীতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

পণ্ডিত কান্তিচরণ ভট্টাচার্য্য

বাংলার ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত পল্লী অঞ্চলে মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত দৈহিক শক্তি না হারাইয়া ইঁহার ন্যায় প্রায় শত বৎসর সুস্থ চিত্তে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সাধারণ বাঙালী-সমাজের মধ্যে দৃষ্টান্ত বিরল। ইনি পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তত্ত্বদর্শী এবং তন্ত্র সাধক ছিলেন।

রূমী ও রামানুজ

ডক্টর রমা চৌধুরী এম-এ, ডি-ফিল্ (অক্সন) এফ্-আর-এ-এস্-বি

বিখ্যাত পারসিক সূফী মরমী-কবি রূমীর নাম সর্বজনবিদিত। তিনি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম জালালউদ্দীন্ মুহাম্মদ্। কিন্তুতিনি রুম্ অর্থাৎ এশিয়া-মাইনরনিবাসী ছিলেন বলিয়া 'রূমী' নামেই সর্বাধিক পরিচিত। রূমী রচিত "মসনবী" ও "দিওয়ান্" জগৎপ্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। রূমীর কাব্য প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁহার দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধেই কেবল কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

রূমীর মতে, ঈশ্বর নির্গুণ নহেন, সগুণ ও সর্বগুণোপেত। প্রাণ, বল, জ্ঞান, প্রেম ও করুণা তাঁহার প্রধান গুণাবলী। কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের পক্ষে তাঁহার স্বরূপ ও অসংখ্য গুণাবলীর পূর্ণ ধারণা অসম্ভব। বস্তুতঃ, বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরজ্ঞানের আশা বৃথা। কারণ, প্রথমতঃ সাধারণ বিচারবুদ্ধি কেবল দেশকালস্থ পার্থিব বস্তু বিষয়েই ধারণা ও জ্ঞানলাভে সমর্থ ; কিন্তু যাহা দেশাতীত, কালাতীত ও অপার্থিব, তাহা বুদ্ধিরও অতীত। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিজনিত জ্ঞান সাপেক্ষ জ্ঞান মাত্র ; অর্থাৎ, একটী বস্তুকে জানিতে হইলে তাহাকে অপরাপর বস্তুর সহিত তুলনা করিতে হয়, যথা অন্ধকারের সহিত তুলনা না করিলে আলোক সম্বন্ধে জানা যায় না। কিন্তু সর্বব্যাপী, একমেবাদ্বিতীয় পরমেশ্বরের বাহিরে এমন কিছুই নাই যাহার সহিত তাঁহার তুলনা করা চলে। তৃতীয়তঃ, বুদ্ধি যাহা স্পষ্ট পদার্থ মাত্র, কিরূপে ইহা স্রষ্টাকে জানিবে? চতুর্থতঃ, বুদ্ধির ক্ষুদ্র বহ্নি তাহাকে কেবল দ্বৈত বর্জনেই সাহায্য করে—অদ্বৈত জ্ঞান তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত। অতএব, বুদ্ধিবিচারশক্তি পারমার্থিক উদ্যোগপর্বে কেবল যে অসার তাহাই নহে, বাধাস্বরূপও বটে। বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলয় হইলে, হৃদয় পরমেশ্বরের আলোক দ্বারা আলোকিত হয় এবং সেই আলোকেই তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়। অতএব রূমীর মতে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ হৃদয়প্রসূত, মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি-প্রসূত নহে।

সনাতন ইস্লাম ও অন্যান্য বহু সূফী সম্প্রদায়ের মতে জীবাত্মা সৃষ্ট পদার্থ মাত্র। কিন্তু রূমীর মতে, আত্মা ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য, অনাদি ও অনন্ত, অজ। আত্মা কেবল নিত্যই নহে, স্বয়ম্ভূও। আত্মায় আত্মায় পরস্পর ভেদ ভ্রান্ত প্রতীতি মাত্র—প্রকৃতপক্ষে আত্মা স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। ভেদের অস্তিত্ব পার্থিব জগতেই কেবল সম্ভব, কিন্তু অপার্থিব নিত্য আত্মার জগতের লেশমাত্র ও থাকিতে পারে না। রূমী বলিয়াছেন যে যেরূপ বিভিন্ন গবাক্ষদ্বারবর্তী সূর্যরশ্মি, বিভিন্ন দীপাধারবর্তী আলোকশিখা, এবং বায়ুতাড়িত বিভিন্ন তরঙ্গাবলী আকারতঃ পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, স্বরূপতঃ অভিন্ন—সেইরূপ বিভিন্ন দেহধারী মানবসমূহ আকারতঃ ভিন্ন মাত্র, স্বরূপতঃ নহে—যেরূপ গবাক্ষ দ্বারা এক সূর্য নানারূপ এক ও অভিন্ন দ্বারা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র। আত্মা পৃথিবীভুক্ত হইলেও পার্থিব জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; দেহ সংশ্লিষ্ট হইলেও শুদ্ধ ও মুক্ত। ক্ষুধা তৃষ্ণা, শোক দুঃখ প্রভৃতি দেহ ধর্ম, আত্মার নহে। কিন্তু আত্মা ভ্রমক্রমে সেই সকল দেহ ধর্মের আরোপ করিয়া অশেষ দুঃখভাগী হয়। অতএব দেহমনের সহিত আত্মার ঈদৃশ ভ্রান্ত অভেদকল্পনাই সকল দুঃখের মূল কারণ। রাত্রিকালে নিদ্রাসময় জীবের আত্মা ক্ষণকালের জন্য দেহমন পৃথক্সংযুক্ত হইয়া শুদ্ধস্বরূপ পুনঃ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত জ্ঞানী ও ভক্ত কিন্তু জাগ্রত অবস্থাতেও পার্থিব অবস্থা ও দেহমনের ধর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না।

বর্তমান অবস্থায় আত্মা জড় জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও জগৎ আত্মারই নিম্নতম অবস্থা মাত্র। রূমী জগৎকে বিবর্তবাদানুরূপ ঈশ্বরের পশ্চাদ্ভাগ ও আত্মাকে তাহার সম্মুখভাগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব, জড়জগৎ সম্পূর্ণরূপে প্রাণ ও জ্ঞানহীন নহে, প্রাণ ও জ্ঞানের বিকৃতি, নিম্নতম, অবচ্ছিন্নতম অবস্থা মাত্র। রূমী জাগতিক ক্রমবিবর্তনবাদের প্রবর্তনা করেন। তাঁহার মতে, আত্মা ক্রমান্বয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। প্রাণহীন আত্মা জড়রূপ ধারণ করে, এবং অগ্নি, জল, বায়ু ও ব্যোমরূপে বিরাজমান থাকে। তৎপরে সে ক্রমান্বয়ে উদ্ভিদ্, জীবন্ত ও মানবরূপ পরিগ্রহ করে। এইরূপে, রূমীর মতে জগতে ক্রমান্বয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীর উদ্ভব হইতেছে—জড়বস্তু, উদ্ভিদ্, পশুপক্ষী ও মানব। প্রতি ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণী উচ্চতর শ্রেণী দ্বারা উপযুক্ত হইয়া সেই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইতেছে। যথা, জড়বস্তু উদ্ভিদ্ কর্তৃক উপযুক্ত হইয়া উদ্ভিদরূপ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, বৃক্ষ লতা প্রভৃতি মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ করিলে সেই রস মৃত্তিকাস্বরূপ ত্যাগ করিয়া বৃক্ষের অংশরূপে পরিণত হয়। এইরূপে উদ্ভিদ্ জীবন্ত কর্তৃক উপযুক্ত হইয়া জীবন্ত ধারণ করে। অর্থাৎ, আহারযুক্ত তৃণাদি অশ্বের শরীরের অংশরূপে পরিণত হয়। পরিশেষে, মানবোপযুক্ত জীবন্ত মানবরূপ ধারণ করে। এইরূপে, জড়বস্তু হইতে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ্ হইতে জীবন্তজন্তু, জীবন্ত হইতে মানবে প্রাণ ও জ্ঞানের ক্রমোন্নতি হইতেছে। কিন্তু ইহাই বিবর্তনের পরিসমাপ্তি নহে। মানবও পুনরায় দেবদূতত্ব এবং পরিশেষে ঈশ্বর প্রাপ্ত হইতে সচেষ্ট। মানব যদি সাধনা বলে দেবদূতসদৃশ গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়া দেবদূতরূপ ধারণ করে এবং সেই অবস্থা হইতে অন্তঃপরে ঈশ্বরত্বলাভ প্রাপ্ত হয়। অতএব জড়বস্তু, উদ্ভিদ্, জীবন্তজন্তু, মানব, দেবদূত ও ঈশ্বর—ইহাই ক্রমবিবর্তনের ক্রমোচ্চ ধাপ। সুতরাং রূমীর মতে, জগৎ অপারমার্থিক হইলেও মিথ্যা নহে—জগতের ভিতর দিয়াই জীবাত্মা ক্রমান্বয়ে পরমাত্মায় পরিণতি পূর্ণবিলসিত হয়।

রূমীর মতে, ঈশ্বরের সহিত পূর্ণমিলনই মানবের চরম লক্ষ্য। এই

বিশেষের দুইটী বিভক্তি—অস্তি (আছে) ও স্থিতি (থাকা)। "অস্তি" অর্থ মানবের স্বকল্প জ্ঞানে নহে, মানবোচিত গুণের বিলয় হয়। "স্থিতি" অর্থ ঈশ্বরোচিত গুণবিগ্রহরূপে ঈশ্বরেই স্থিতি। সুতরাং, মুক্তিকালে জীবাত্মা গুণতঃ পরমাত্মার সহিত অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্বরূপতঃ ভিন্নই থাকে। রামী এস্থলে বহু উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। যথা—অগ্নি ও অঙ্গার, দীপ ও তাহার তেজ ও দূরালোক, লৌহ ও অগ্নি। অগ্নি অঙ্গার হইতে গুণতঃ অভিন্ন—কারণ অঙ্গারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভব করিয়া রামীর গুণই অগ্নির গুণ—কিন্তু স্বরূপতঃ ভিন্ন। পুনরায়, প্রভাত সূর্য্যালোকে দীপ ও তাহার তেজ বিলিপ্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহাদের তাহাদের গুণ সূর্য্যের তাহাদের গুণে বিলয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহাদের স্বরূপ বা অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, কারণ যদি কেহ দীপোপরি যন্ত্রতন্ত্র নিক্ষেপ করে, তাহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়,—ইহা দীপের স্বতন্ত্র অস্তিত্বসূচক। এইরূপে, অগ্নিতে বিলিপ্ত লৌহ অগ্নির ন্যায়, বস্তুতঃ প্রভৃতি গুণপ্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অগ্নি স্বরূপতঃ লাভ করে না। সেইভাবে মুক্ত, ঈশ্বরসন্নিভ জীব ঈশ্বরের গুণাবলী প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জীবত্বরূপ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরত্বরূপ লাভ করে না। অতএব, মুক্ত জীব ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন, গুণতঃ অভিন্ন। এই মতানুসারে, মুক্ত জীবগণও গুণতঃ পরস্পর অভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ ভিন্ন। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রামীর মতে জীবগণ আপাততঃ আকারতঃ ভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে স্বরূপতঃ অভিন্ন। সুতরাং এই বিষয়ে রামীর মত স্ববিরুদ্ধ। মুক্তজীবের অবস্থা সম্বন্ধেও রামীর রচনায় অনৈক্য দৃষ্ট হয়। তাঁহার কোনও কোনও উদাহরণ ও কবিতা পাঠে ইহাও মনে হয় যে, তাঁহার মতে, মুক্তজীবের স্বরূপও কেবল ঈশ্বরই নহে, ঈশ্বরস্বরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যথা, তিনি বলিয়াছেন যে, একবিন্দু জল যেরূপ সীমাহীন সমুদ্রে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ মুক্তজীবও ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া যায়। যাহা হউক, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভিন্নত্ব ও গুণতঃ অভিন্নত্বই সাধারণভাবে রামীর মত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

রামীর মতে একমাত্র প্রেমই ঈশ্বর ও মানবের মিলন সেতু। ঈশ্বর বুদ্ধিগম্য নহেন, কারণ বৈতবাদী বুদ্ধি ঈশ্বর ও জীবের একত্ব উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। কিন্তু একমাত্র প্রেমই ঈশ্বরের উপলব্ধির সাক্ষাৎ কারণ। প্রেম হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অনুভব, বুদ্ধির পরোক্ষ জ্ঞান নহে।

রামীর সহিত বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তের প্রবর্ত্তক রামানুজের কিরূপে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রামানুজের মতেও ব্রহ্ম সগুণ—সর্ব্বকল্যাণগুণযুক্ত ও সর্ব্বদোষগন্ধশূন্য। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের গুণ, অংশ, কার্য্য ও শরীররূপে ব্রহ্মেরই ন্যায় নিত্য ও সত্য, কিন্তু ব্রহ্মের অধীন ও অন্তর্গত। অতএব রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে—ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ, এই তিন তত্ত্ব। ব্রহ্ম নিত্যুক্ত, জীব ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের স্বাধারূপে ব্রহ্মস্বরূপ, কিন্তু গুণতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। জীব ও জগৎ পরস্পর ভিন্নজাতি। প্রেম ও জ্ঞান জীবেরই ধর্ম, ব্রহ্মের নহে। কিন্তু রামীর মতে জীব ব্রহ্মসঙ্গ হইতেই ক্রমবিবর্ত্তিত, এবং ব্রহ্মেতে প্রেম ও জ্ঞান নিহিত আছে। রামানুজের ক্রমবিবর্ত্তনবাদের আলোচনা নাই এবং তিনি জগতের সত্যত্বও স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মাকাশে ব্রহ্মের চিৎ ও অচিৎ শক্তির বিকাশ, এবং উভয়েই ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও ভিন্নস্বরূপ। এই বিষয়ে রামী ও রামানুজ ভিন্নমত।

মুক্তি সম্বন্ধে কিন্তু উভয়ের মতের বিশেষ পার্থক্য নাই। রামীর মতে মুক্তজীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ ভিন্ন, গুণতঃ অভিন্ন; রামানুজের মতে, মুক্তজীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, গুণতঃ ভিন্ন। কিন্তু এই পার্থক্য বস্তুতঃ শব্দগত মাত্র, অর্থগত নহে। প্রথমতঃ, রামীর মতে, মুক্তজীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হইলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন হইতে পারে না, কারণ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তুর গুণতঃ অভিন্নতা ও মিলন সম্ভবপর নহে। অতএব, মুক্তজীব ঈশ্বরস্বরূপরূপে ঈশ্বর হইতে অভিন্নস্বরূপও নিশ্চয়। পুনরায়, রামানুজের মতে, মুক্তজীব ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও সম্পূর্ণ অভিন্ন হইতেই পারে না, কারণ মুক্তজীবও পৃথক্ সত্তাবান্ এবং ঈশ্বরের সহিত এক নহে। অতএব মুক্তজীবও ঈশ্বর হইতে ভিন্নস্বরূপ। সুতরাং রামীর 'স্বরূপতঃ ভিন্নতা' এবং রামানুজের 'স্বরূপতঃ অভিন্নতা'র অর্থ একই, অর্থাৎ 'স্বরূপতঃ ভিন্নাভিন্নতা'। দ্বিতীয়তঃ, রামীর মতে মুক্তজীব গুণতঃ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও সম্পূর্ণ অভিন্ন নহে, কারণ সে ঈশ্বরের সকল গুণ প্রাপ্ত হইতে পারে না। পুনরায়, রামানুজের মতেও, মুক্তজীব ঈশ্বর হইতে গুণতঃ ভিন্ন হইলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে, কারণ অণুত্ব ও সৃষ্টি-শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মের অপর সকল গুণই সে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এস্থলেও রামীর 'গুণতঃ অভিন্নতা' ও রামানুজের 'গুণতঃ ভিন্নতা'র অর্থ একই, অর্থাৎ 'গুণতঃ ভিন্নাভিন্নতা'। অতএব রামী ও রামানুজ উভয়েরই মতেই, মুক্তজীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ ও গুণতঃ উভয়তঃই ভিন্নাভিন্ন।

রামীর ন্যায় রামানুজের মতেও ঈশ্বর সাধারণ বিচারবুদ্ধিগম্য নহে,—শুদ্ধ জ্ঞানে মুক্তি নাই, ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়। কিন্তু রামানুজের 'ভক্তি' ও রামীর 'প্রেম' তথা অনেক। রামানুজীয় ভক্তি জ্ঞান না হইলেও জ্ঞানমূলক, জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ। রামানুজ ইহাকে বৈদ্যধারা। ন্যায় অনবচ্ছিন্ন স্মৃত্যনুভূতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা অনবরত চিন্তা, ধ্যান, স্মরণ, প্রেম, প্রীতি, আবেশ, বা উচ্ছ্বাস নহে। শঙ্করবিরোধী হইলেও শঙ্করের শুষ্ক জ্ঞানবাদের প্রভাব রামানুজের মতবাদে যথেষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। নিম্বার্ক, বল্লভ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদে যে রস-পরিপ্লুত আবেগময়ভাবুক প্রেমবাদের প্রবর্তনা পরিলক্ষিত হয়, রামানুজে তাহার বিন্দুমাত্রও নাই। কিন্তু রামীর মতবাদ পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদেরই ন্যায় অনুরূপভাবেপ্রবণ। রামী ও রামানুজ উভয়ের মতেই জীব বিশ্বাস করে, ঈশ্বরের সহিত অভিন্নও নহে, কিন্তু ঈশ্বরের নিত্যসেবক ও উপাসক। কিন্তু রামানুজের ভক্তি ঐশ্বর্য্যপ্রধানা—ভাবনা, ভাব নহে; রামীর ভক্তি মাধুর্য্যপ্রধানা—অর্চ্চনা নহে। রামানুজের মতে ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ রাজা-প্রজা, প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ, রামীর মতে ইহা প্রেমিক প্রেমিকার সম্বন্ধ। এইরূপে, রামানুজ জ্ঞান ও ধ্যানের দিকে, কিন্তু রামী প্রেম ও প্রীতির দিকেই জোর দিয়াছেন।

উঠানছত্র ভ্রমণ

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার অধিকারী এম-এ

চট্টগ্রাম হইতে কর্ণফুলী নদীর উজান বাহিয়া ৬০ মাইল গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আরম্ভ। পার্বত্য চট্টগ্রামের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই।—প্রকৃতির যথেচ্ছাচিত্ত বনন কানন—পাহাড়ে, নদীতে, ঝরণায়, গ্রাম দুকলে, বিভিন্ন রঙীমুখে, আরণ্য কুকুটে, মৃদমন্দীতে পরিপূর্ণ। এখান নদীর রাস্তাঘাট—ঘোট কিন্তু সুন্দর। রাঙ্গামাটিতে নৌকা ছাড়িলাম—বেলছড়ী নদীর উজান বাহিয়া যাইতে হইবে। দুই দিকে পাহাড়, পাহাড়ের উপর গাছ—কতরকমের লতা। যত কলা গাছ, হাতীর দলও তাহা খাইয়া শেষ করিতে পারে নাই। কলস্রোত বিশিষ্ট নদী বাম দিয়া চলিয়াছে। কিছু দূরে ডেঙ্গী নদীর জল বিপুল বেগে কর্ণফুলীতে পড়িয়াছে। আরও কিছু দূরে নদীগর্ভে দুইটি পাহাড়—স্থানীয় লোকেরা ইহাদের নাম দিয়াছে—হাতী হাতিনীর পাহাড়; মনে হয় যেন পাহাড় কুঁদিয়া প্রকৃতি দুইটি হাতীর মাথা তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছেন। হাতী হাতিনীর পাহাড় ছাড়াইয়া দেখিলাম—বাম দিকে বন ঘাস বনে একটি হরিণ ঘাস খাইতেছে। বন্দুকে টোটা ভরিয়া তৈরী হইলাম—হরিণ হঠাৎ চোখ মেলিয়া দেখিয়া বনে অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আরও কিছুদূরে সুবলং নদী কর্ণফুলীতে পড়িয়াছে, দুই নদীর সংযোগ স্থানে একটি চাক বাংলা আছে। সুবলং ছাড়াইয়া আরও কিছু দূরে কাপ্তাইমুখী কর্ণফুলীতে পড়িয়াছে। কাপ্তাই বাম রাখিয়া আমরা আরও উজাইয়া চলিলাম। দুধারেই পাহাড়। মাঝে মাঝে পাহাড়ে 'ঝুমে' চাষ করিয়া পাহাড়ীরা অনেক রকম শস্য করিয়াছে। এক জায়গায় দেখা গেল একদল বানর পরম সুখে একটি ঝুমের' শস্য খাইতেছে। একটী পাহাড়ী মেয়ে বন্দুকধারীকে অনুচরগণকে তাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু দলটি বন বাদীকে মোটেই ভয় করিতেছে না। আরও দূরে আমের ডালে একদল টিয়া "হুদু" "হুদু" শব্দ করিতেছে। এক ঝাঁক টিয়া শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। নৌকা চলিল, প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকার গতি অতি মন্দ। সঙ্গীরা পাহাড়ের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। অনেক দেখিয়া আমার চোখে আর নূতনত্ব কিছুই মনে হইল না।

অবশেষে বরকল পৌঁছিলাম। নদীর দুই দিকে পাহাড় খুব উচ্চ। নদী গর্ভেও পাহাড়—একটি প্রপাতের (Rapid) সৃষ্টি করিয়াছে। নৌকা আর চলিবে না। এখানে একটি ট্রলি লাইন আছে। ট্রলি চাপিয়া বরকল চাক বাংলোয় আসিলাম। ঠিক নীচেই নদীর প্রপাত। ইহার বিবরণ অনেক পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। হাজার হাজার বেলওয়ে ইঞ্জিনের মত শব্দ হইতেছে। জলরাশি প্রচণ্ডবেগে নীচের দিকে চলিতেছে। এখন শীতকাল; জল খুব বেশী নয়, অতি সাবধানে এক খণ্ড পাথরের উপর দাঁড়াইলাম। দুই দিকে পাহাড় এত উঁচু যে জলে কখনও রৌদ্র পড়িতে পায় না। 'বেবিলন' জল শীতকালে মহাশব্দে পাথরের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এইখানে প্রকাণ্ড মহাশোল (mahseer) মাছ পাওয়া যায়। অনেকে সময়ে সময়ে ছিপে ধরিয়া থাকেন।

বরকল বাজারে মগ ও চাকমা, পুরুষ ও মেয়েরা নানা জিনিষ লইয়া আসিয়াছে। তুলা, কমলালেবু, ঝুমের নানা তরকারী, তিল ইত্যাদি এখান। 'মাঝি'র জন্যে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা গেল না। চাকবাংলোয় চলিলাম। বাংলোটি একটি উঁচু টিলার উপর অবস্থিত। তাহার পাশে একটা মগ পল্লী। সেখান হইতে আমার পূর্ব্বপরিচিত শীলাদং মগ আসিয়া জুটিল—বরকটা টোটা পাইলে সে হরিণ মারিয়া আনিতে পারে। তাহাকে কয়েকটা টোটা দিলাম এবং বলিলাম যে আমরা পরদিন 'ঝুমপড়া' যাইব। সেও আমাদের সঙ্গে যাইবে বলিল। শীলাদং সে রাত্রে ফিরিল না। হরিণের মাংস না পাওয়া গেলেও রাঁধা মাংস মিলিয়াছিল। আমার বাবুর্চিটি উপস্থ পাকক্রিয়ায় অতি নিপুণ, অল্পক্ষণেই নানারকম ব্যঞ্জনাদি রান্না করিল। দুঃখের ভোজনের ত্রুটি হইল না। প্রপাতের গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে শুইতে গেলাম। বাংলোর নীচেই barking deer এর ডাকও অনেকবার শোনা গেল।

পরদিন ভোরে প্রপাতের ওদিকে নৌকা চাপিলাম—নদীর দৃশ্য খুব সুন্দর, মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মত পাহাড়, কার্পাস ফলের গুচ্ছে ভরা। নদীর জল সেখানে ব্যাহত হইয়া প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। নৌকা চলিতে লাগিল। দ্বিপ্রহরে আহারাদি নৌকার মধ্যেই সারিলাম। অপরাহ্ণে ঝুমপড়া পৌঁছিলাম। এখানকার হেডম্যান বাবু চন্দ্র মোহন দেওয়ান চাকমা সমাজে খুব প্রতিপত্তিশালী। তাঁহার একটি ছেলে গ্রাজুয়েট। নদীর ধারেই পাহাড়ের নীচে অনেকখানি জমিতে তিনি নানারকম তরকারীর চাষ করিয়াছেন—এবেলে সে সবই নূতন। তাহার বাগান দেখিলাম, বেগুন, ঝিঙ্গে, কড়াইশুটি, আলু, টমেটো, প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। এই তরকারী জমিতে যাহা দেওয়া যায় তাহাই হয়। বাগানের ভিতর দিয়াও অনেকটি ঝরণা পাহাড় হইতে বাহির হইয়া কুলু কুলু শব্দে বহিতে পড়িতেছে। এক জায়গায় অনেকখানি জল জমা হইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইহা একটি উৎস। পানীয় জল এখান হইতে সংগৃহীত হয়। চারিদিকে পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, তাহার উপর গাছ। পাহাড়ের গায়ে Terrace করিয়া চন্দ্রমোহনবাবু কমলা-লেবুর চাষ করিতেছেন। চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ীতেই একটি ঘরে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। সন্ধ্যার সময় শীলাদং মগ দুইটি হরিণ মারিয়া আনিল। মাছও ধরা হইয়াছিল অনেক। বাগানের তরকারী দিতে চন্দ্রমোহনবাবু কার্পণ্য করেন নাই। আমার ভৃত্য উপেন ও পাচক কুমারের খাটুনি অনেক বাড়িয়া গেল। এইখানে অনেক দূরের

(Rosalie) ছিল। আমার সঙ্গে ঘরে তৈরী একশিশি উহার জেলী ছিল। স্ত্রীকে মহিলারা সাদরে সেটি চাহিয়া দেখিলেন এবং আমার কৃতজ্ঞতার নিকট প্রস্তুত প্রণালী জানিয়া লইলেন। চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ীতে আমাদের লাট ও লাটপত্নী আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের গল্প বলিলেন। লাটপত্নীকে চন্দ্রমোহনবাবু নিজেদের প্রস্তুত স্নাদি দিয়াছিলেন। লাট মহিলাও তাঁহাদিগকে কিছু উপহার দিয়াছেন। রাত্রের আহার হইল রীতিমত ভোজ। সেন মহাশয়ের আদরের সীমা নাই। আমার মত হিন্দুপন্থিক লোকের বেশীর ভাগই কেবল দর্শন হইল।

পরদিন ভোরে উঠিয়া দেখিলাম, নদীর ওপারে ঘন সবুজ বন তারপর নীল পাহাড়,—পাহাড়ের চূড়ায় সাদা মেঘ, সেই মেঘের ফাঁক দিয়া প্রভাতসূর্য্য প্রকাশ সূর্য্যদেব উঁকি দিতেছেন। মন আপনিই সৃষ্টিকর্ত্তার চরণে লুটাইয়া পড়িল।

নদীতীরের তাকিয়া তুলিয়া আবার নৌকায় উঠিলাম। কিছু দূরে 'ছোট হরিণা' বাজার। ইহার পর ঐদিকে বাংলাদেশে আর বাজার নাই। খানিকক্ষণ বাজার পরিদর্শন করিয়া আবার নদীর উজানে চলিলাম।

উজানচর পৌঁছিলাম, দুইদিকে ব্লেটে পাহাড়—নদীগর্ভেও পাহাড়। জলস্রোতে সে পাহাড় ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ পাথরের অনেক বাইলব্যাপী প্রকাণ্ড বাসনের মত। বালুকা বা কর্দ্দমের লেশমাত্র নাই। এইখানে আহারাদির আয়োজন করিতে বলিয়া আমরা আরও অগ্রসর হইলাম।

নদীর দৃশ্য কি সুন্দর! নদীর বুকে কৃষ্ণপ্রস্তরের জল বাহত হইয়া অনেকগুলি প্রশস্ত ও অনেকগুলি ছোট ছোট স্রোতস্বতীরা দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে। নদীকে আর নদী বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন একটা সুজলা সুফলা সুন্দর বাগান। দুইকূলে পাহাড় যেওয়ালের মত, তাহাতেও ফুল। এই প্রকৃতিরচিত উদ্যানের শোভার কাছে মানুষের বাগানের তুলনাই হয় না। দৃষ্টি অনুপম, সানুদেশ কর্দ্দমহীন সাদা জলরাশি প্রবাহক্রমে আসিতেছে, তাহার উপর দিয়া দূরে নীলাইহিলের পর্ব্বতশ্রেণী নীল আকাশের গায়ে কালো চিত্রের ন্যায় দেখাইতেছে—দুইধারে পাহাড়ে নানা জাতীয়বৃক্ষ ফুল। পিছনেও নীলাচল। মাঝখানে কি এক স্বপ্নময় উদ্যান, জলপ্রপাতে, শ্যামলদ্বীপে অসংখ্য নানাপ্রকার চিত্রবৃক্ষ ভার্ত্তে, ছোট উপলখণ্ডবিশিষ্ট শৈলে রঞ্জিত। কিছুক্ষণ এই শোভা দেখিয়া আরও অগ্রসর হইলাম—বরহরিণা নদীতে পড়িলাম, নদীটি একটি খালের মত। একদিকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, অন্যদিকে লুসাইহিল। বাংলা ও আসামের সীমার ভিতর দিয়া চলিয়াছে। প্রায় একটায় দুধাতালাং বোঝার পৌঁছিলাম। গ্রামের প্রধানব্যক্তি ডেবেরা কার্ব্বারী অপেক্ষা করিতেছিল। বন্দুকে শব্দ করিয়া অভ্যর্থনা জানাইল। নীচ নদীগর্ভ হইতে উপরে উঠিতেই দেখিলাম—অসংখ্য কমলালেবুর গাছ—সুপক্ক সুবৃহৎ ফলে পরিপূর্ণ। তাহার শোভাও বাগানের শোভার চেয়ে কম নয়। আমি ফলাস্বাদন করিয়া তুলা বিশ্লেষণের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সঙ্গী সেনমহাশয় মাটির গুণাগুণ পরীক্ষায় ব্যস্ত রহিলেন।

কার্ব্বারী অত্যন্ত অনুনয় করিয়া তাহার ঘাড়ীতে উঠিতে বলিল। গাছের সিড়ির উপর দিয়া তাহার মাচানের উপর উঠিলাম। কার্ব্বারী কিছু দুধ ও ফল খাইতে দিয়া সে বেলাটা তাহার ওখানে থাকিতে অনুরোধ করিল। তাহা করা সম্ভব হইল না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কিরিয়া চলিলাম। সঙ্গে দুই বুড়ি কমলালেবু। একবুড়ি ১৲ হাজার হিসাবে কিনিয়াছিলাম। অজস্রবুড়ি উপহার। এইবার অনুকূল নদীস্রোতে আধঘণ্টার মধ্যেই উজানচরে পৌঁছিলাম। আমাদের আহার্য্য সেখানে প্রস্তুত। রৌদ্রে প্রখর উত্তপ্ত হইয়াছে। গাছের পাতা দিয়া একটা আচ্ছাদনের মত করা হইয়াছে। নদীজলে স্নানে সে কি আনন্দ। পাথরের উপর বসিয়া পরমতৃপ্তিতে সকলে মিলিয়া ভোজন করা গেল। যাঁহারা পাহাড়ে ভ্রমণের জন্য ইউরোপ বা জার্ম্মানীতে চারিদিক ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহারা বাংলার প্রান্তস্থিত পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণ করিয়া আসুন।

দুর্গাপ্রতিমার রূপ-কল্পনা

শ্রীজনরঞ্জন রায়

অভিনব এ রূপ-কল্পনা···অপরূপ এ রূপসৃষ্টি!—ইহা স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির পূজা।

এখানে স্রষ্টা কে? বেদ-পুরাণে ছড়িত হইয়া রহিয়াছে তাহাই। দেখা যায় এ রূপ-কল্পনা চলিয়াছে বহুদিন ধরিয়া। তাহা পরে বলিতেছি। আগের কথা আছে। এই শারদীয় পূজা কিন্তু রামচন্দ্র করেন নাই। এই 'অকাল বোধন' করিয়া পূজার কথা বাল্মীকি বলেন নাই। ইহা পুরাণের কথা। সুতরাং কিছুতে প্রাচীন নয়। আমরা এই যে সাত পুঁথুলের পুরাণ প্রতিমা—ইহা অত্যন্ত আধুনিক। কিন্তু এই আধুনিক মূর্ত্তিতে পূর্ব্বের কল্পনাগুলির অপেক্ষা ভাবৈশ্বর্য্য সবচেয়ে বেশি।

বাল্মীকি বলিয়াছেন—"ইতো দৃষ্ট পরিশ্রান্তং সমরে চিন্তয়াপরম্···।" অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্র যখন পরিশ্রান্ত ও চিন্তিত, তখন অগস্ত্য সেখানে আসিলেন এবং রামকে 'আদিত্যহৃদয়' স্তোক শুনাইলেন। ইহা নিশ্চয় রাত্রের ঘটনা। কারণ তৎপরে রাম সূর্য্যস্তব করিয়া সূর্য্যদেবকে দর্শন করেন ও পরে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া রাবণবধে কৃতকার্য্য হন।

কিন্তু কালিকাপুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে—'অকালে ব্রহ্মণা-বোধঃ'। অর্থাৎ রামের প্রতি অনুগ্রহ ও রাবণ বধের জন্য ব্রহ্মা নিজে অকালে দেবীর বোধন করেন। অকাল অর্থে রাত্রিকাল। অকালে দেবীপূজা করিলে 'বোধন' করিতে হয়। শরৎকাল দেবতাদের

রাত্রিকাল—অকাল। পুরাণযুগে দেবতাদের 'দিন' ছিল উত্তরায়ণ কালে—মাঘ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত। আর বর্ষা ও শীতকাল, শ্রাবণ হইতে পৌষ—দক্ষিণায়নে, দেবতাদের 'রাত্রি' বা অকাল ছিল। রাত্রিকালে লোকে নিদ্রা যায়। সুতরাং (পুরাণমতে) পরম বা রাত্রিকালে যখন দেবীর পূজা হইল, তখন দেবীকে 'বোধন' দিতে হইল। অর্থাৎ দেবীকে জাগরিত করিয়া পূজা দিতে হইল। বোধন অর্থে জাগান।

আমরা দেখিয়েছি পুরাণযুগে শুধু দুর্গাপূজার সময়টাই বদলাইয়া দিবার চেষ্টা হয় নাই, বাল্মীকির 'আদিত্যহৃদয়' স্তবটাকেও উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রকে এই স্তোত্র শোনান। ভবিষ্যপুরাণে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ইহা শুনাইতেছেন। সুমন্ত-শতানীক-সংবাদরূপে ইহা উক্ত পুরাণে কল্পিত হইয়াছে। ঠিক যেন গীতার পরিশিষ্ট। বাল্মীকি রামায়ণের এবং ভবিষ্যপুরাণের আদিত্যহৃদয় স্তোত্রে যেমন অর্থের মিল আছে, তেমনি স্থানেই শব্দের মিল আছে। তবে পুরাণে বেশির ভাগ আছে—উক্ত স্তোত্রের ধ্যান, স্নান ও যন্ত্রাদির উল্লেখ।

নিজেদের বক্তব্য বিশেষ উজ্জ্বল করিবার জন্য পরবর্ত্তীরা পূর্ব্ববর্ত্তীদের বর্ণিত ঘটনার এইভাবে রূপ-পরিবর্ত্তন করেন—ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যদি মনে করা যায় যে, রুদ্রের জন্মের উৎসব ছিল বৃত্রাসুরবধ এবং তাহা বর্ত্তমানে 'নেড়াপোড়া'র পর্য্যবসিত হইয়াছে—তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা উৎসব দোলযাত্রা দ্বারা ইন্দ্রের বৃত্রাসুরবধ উৎসবকে সৌষ্ঠবযুক্ত করা হইয়াছে। ইন্দ্র তাঁহার বজ্র দ্বারা বৃত্রাকারে উত্থিত মেঘকে আঘাত করিয়া বৃষ্টি অভিবর্ষণ করেন (১৩৭।৫ মন্ত্র)—ইহাই বৃত্রাসুরবধ কল্পনা। সূর্য্যদেব অয়ন পরিবর্ত্তন কালে যেন আকাশে দুলিতেছেন—ইহাকে দোলের মূলতত্ত্ব কল্পনা বলা হইয়া থাকে। নেড়াপোড়া করিয়া এই দোল উৎসব আরম্ভ করা এখনকার প্রথা। অবশ্য এই নেড়াপোড়ার ভিন্ন প্রকারের ইতিহাসও আমরা পাইয়া থাকি।

যারা শ্রোত বাঙালী হিন্দু ভিন্ন হইতে দেবী পূজা প্রতিপালন করে। রামায়ণমতে বাসন্তীপূজা যারা এখন একপ্রকার অন্নপূর্ণা পূজাতে পরিণত হইয়াছে। তবে পুরাণমতে শারদীয়া পূজারই আড়ম্বর বেশি। ঠিক এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণের দুইটি রাসের ভিতর একটি—কল্পের রাস, এখন কল্পরাসের রাস সবত্র দোলি উৎসবে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং শরতের রাসেরই আড়ম্বর অধিক। এইসব হইতে আমরা যদি মনে করি যে বৎসর আরম্ভের কাল পরিবর্ত্তনই ইহার কারণ—তবে তাহা ভুল হইবে কি-না তাহা ভাবিবার বিষয়। আমরা মোটামুটি তিনবার বৎসর আরম্ভের কাল পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়াছি। চারবার বলিলেও বলা যায়। তাহা যেমন জ্যোতিষের মত। কিন্তু এইসব একই রকমের উৎসব বৎসরের কোন সময়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। কখন বা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়, কোন কারণে তাহা ঠিক করিয়া বলা খুবই শক্ত।

এখনে কালিকাপুরাণের ধ্যান দ্বারা দুর্গাপূজা হয়। প্রত্যেক দেবতারই ধ্যানের মধ্যে তাঁহার জন্মকথা থাকে। কালিকাপুরাণের ধ্যানে দেবীর যে রূপ বর্ণনা আছে, তাহা কিন্তু এখনকার সাতপুরুষানুক্রম দুর্গামূর্ত্তি নয়। কালিকাপুরাণের দেবী (চামুণ্ডা, চণ্ডিকা প্রভৃতি) অষ্টশক্তি বেষ্টিতা। তাঁদের সঙ্গে সিংহ এবং অসুরও আছে। কিন্তু কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও নবপত্রিকার কোন উল্লেখ কালিকা-পুরাণে নাই। বরং এই সকলের উল্লেখ আছে কালীবিলাস তন্ত্রে (১৮শ ও ২১শ পটলে)। কিন্তু কালীবিলাস তন্ত্রে ইঁহাদের সঙ্গে জয়া ও বিজয়ার মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। কাজেই অধুনা প্রচলিত মূর্ত্তি অভিনব।

পরন্তু পূজা স্বরূপে এই অভিনব মূর্ত্তি বর্ণনে আমরা ভুলিয়া যাই ইহা রামচন্দ্র পূজা করিয়াছিলেন কি করেন নাই। আমরা বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া দেখি এই অভিনব মূর্ত্তির দিকে। যত দেখি ততোই আনন্দ বাড়ে। মনে হয় এ যেন বাঙালীর নিজের গড়ানো···তার নিজের ভাব মূর্ত্তি।···পাছে বাঙালী একদিন তার নিজের ইষ্টমূর্ত্তির নকটি গড়িয়াছিল নিজের কল্পনামতো। ইহা যেন সেই পূর্ব্বাদেবের ত্রিনাথ প্রকৃতিরই রূপ (যার বিস্তার)। রূপকভাবে ইহা কল্পিত হইয়াছে। ত্রিনাথ অর্থে—১। প্রাতঃকাল, ২। মধ্যাহ্ন ও ৩। অপরাহ্নকাল বোঝায়। দুর্গামূর্ত্তি দ্বারা বাঙালী সূর্য্য দেবের এই তিন স্থানে অবস্থানের মূর্ত্তি গড়িয়াছে। অর্থাৎ ত্রিকালের বা ত্রিসন্ধ্যার মূর্ত্তি গড়িয়াছে। মনে করুন দক্ষিণমুখী করিয়া আমি মূর্ত্তিগুলি গড়িতেছি। তাহা হইলে সরস্বতী হইতে আরম্ভ করিতে হয়। যে বেদীর উপর মূর্ত্তিগুলি গড়িতেছি তাহা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে লম্বা। প্রতিমাগুলির নীচের এই বেদীদ্বারা আমি দিনমানকে বাঁক করিতেছি। পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ। পূর্ব্ব অর্থে প্রাতঃকালে অরুণোদয়ে দিবারম্ভ হয়। সেজন্য অরুণ বা উষার মূর্ত্তিই সরস্বতীমূর্ত্তি। তিনি জ্ঞানদায়ী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। উষা উদয়ের সঙ্গে জীবের জ্ঞান আসে। এই জ্ঞানদায়ীকে বা উষাকালকে লোকলোচন হইতে আবৃত করে মেঘ বা মেঘজনী অসুর। কল্পনা করা হইল এই অসুর নামের জন্য একেবারে মেঘসেনাপতি কার্ত্তিককে সরস্বতীর পাশে বসাইয়া এই ভাবটিকে পরিস্ফুট করিতে। তাই কার্ত্তিক বসিলেন সরস্বতীর পাশে। উভয়েই প্রাতঃকালের মূর্ত্তি। সুতরাং প্রাতঃকালে বেড়ায় যে সব পক্ষী, যথা—ময়ূর ও রাজহংস, তাহারা যথাক্রমে কার্ত্তিক ও সরস্বতীর বাহন হইল। তাঁহারা যারা হাতে ধারণ করিলেন তাহারাও তাঁহাদের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়েছে। এইবার আমরা পশ্চিম প্রান্তে যাইতেছি। মধ্যস্থলে পরে আসিব। পশ্চিমপ্রান্ত সন্ধ্যা বা প্রদোষকালের দ্যোতক। বেলাশিতে অর্থকে অলক্ষ্মীকারী বলা হইয়াছে। এই অর্থকে লক্ষ্মীমূর্ত্তি দেওয়া হইল। তিনি আমাদের হতই তমাচ্ছন্নকারে লইয়া যান, আমরা অর্থাৎ জগৎ তাঁর আরাধনায় সর্ব্বদা ধাবিত হইতেছি। তাই বাঙালী শিল্পী লক্ষ্মীর ভারে গণনাথ অর্থাৎ গণেশকে বসাইলেন। উভয়েই সন্ধ্যাকালের প্রতীক। সুতরাং সন্ধ্যাকালে বাহির হয় যেসব ক্ষুদ্রক্ষুদ্র জীবাদি—যথা, মূষিক ও পেচক, গণেশ ও লক্ষ্মীর বাহনরূপে পরিকল্পিত হইল। লক্ষ্মী ও গণেশের হাতেও যারা দেওয়া হইল তাহার দ্বারা কে কি কারণে কল্পিত সে ভাবটিও পরিস্ফুট করে। এইবার আসুন মধ্যস্থলে। মধ্যাহ্নে সূর্য্যদেব পূর্ণগৌরবে বিরাজ করেন। পৃথিবীর সর্ব্বদিকে তাঁর রশ্মি বিস্তৃত, জীবের শক্তিরূপ সূর্য্যের উত্তাপে নির্ম্মূল হইতেছে। এই গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তিই দুর্গামূর্ত্তি। যেন সূর্য্যের শক্তিমূর্ত্তি। বলদিকে বলরূপ। মানুষের পরিত্রাণ সব অস্ত্রই তাঁর হাতে। সিংহ ও মানবের শত্রু রাজরাজ পশুরাজে পর্য্যন্ত, সেকালে হিংস্র নাগরাজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে। তাঁর পশ্চাতে সূর্য্যের ছটারূপে 'চাল'টি প্রতিভাত। চালের 'কঞ্চি'গুলি সূর্য্যতেজরশ্মিটার দ্যোতক। স্বর্গদেব শিবরূপে এই চালে দুর্গামূর্ত্তির পশ্চাতেই অঙ্কিত থাকেন।

ইহা যেন স্বর্গপরিবারের—শিবপরিবারের ছবি। তার সঙ্গে আসেন পটে অঙ্কিত সূর্য্যমন্ত্রে দেবগণ। আরও আছে পশুরাজ, নাগরাজ, পেচক, মূষিক, দানব প্রভৃতি। দুর্গাপূজার নামে মানুষ এই বিশ্বসংসারকে পূজা করিতেছে। প্রকৃতই ইহা বিশ্বসংসারের ছবি। দুর্গাপূজা মানেই পূর্ণ প্রকৃতির পূজা—প্রত্যহ সহিত সৃষ্টির পূজা। ইহা মানব কল্পনার শ্রেষ্ঠ কল্পনা—বাঙালীরই কল্পনা।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলায় ১৯৪৬ সালের ভারতীয় ক্রিকেট দল বিশেষ সাফল্যলাভ ক'রেছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় ক্রিকেট দল অধিকতর ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাতে সক্ষম হবে বলে বিলাতের ক্রীড়ামহল বিশেষ অভিমত প্রকাশ করেছে। ভারতীয় ক্রিকেট দল ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালনায় ১৯৩২ সালে প্রথম ইংলণ্ডে খেলে আসে। সেই দলটি প্রথম শ্রেণীর ২৭টি ম্যাচ খেলে ৯টিতে জয়লাভ করে, ৮টি খেলায় পরাজিত হয় এবং ৯টি খেলা ড্র যায়। এ ছাড়াও ভারতীয় দল ১২টি ম্যাচ খেলেছিলো। শেষে সব মিলিয়ে ফলাফল এই দাঁড়ায়—জয়-১৩, হার-৯, ড্র-১৪। ২টি খেলা শেষ পর্য্যন্ত হয় নি। ১৯৩৬ সালের ভারতীয় দল ইংলণ্ডের সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলেছিলো। প্রথম ও তৃতীয় টেষ্টম্যাচে ইংলণ্ড ৯ উইকেটে জয়লাভ করে এবং দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ড্র যায়—ইংলণ্ড সেবার 'রবার' পায়। ১৯৪৬ সালের অভিযানেও ইংলণ্ড 'রবার' পেয়েছে। দৈব দুর্বিপাক, বারিপাতের দরুণ তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা বন্ধ হয়ে যায়। তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের জয়লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ড্র হয়েছিলো। প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলায় ইংলণ্ড জয়লাভ করায় ইংলণ্ডই শেষ পর্য্যন্ত 'রবার' পেল। ভারতীয় দল এবার বিশেষ সাফল্যলাভ করলেও টেষ্ট খেলায় 'রবার' না পাওয়া পর্য্যন্ত ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের কৃতিত্ব সমর্থিত হবে না। এবারের ক্রিকেট অভিযানে ভারতীয় দলকে বহুবিধ অসুবিধার মধ্যে খেলতে হয়েছিল; অনভ্যস্ত আবহাওয়া এবং ব্যক্তিগত অসুস্থতা ভারতীয় দলকে বিব্রত করেছিল। কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধা ভারতীয় ক্রিকেট খেলাকে নিষ্প্রভ করতে পারেনি, এবারের অভিযানের ফলাফলই তার সাক্ষ্য দেয়। এই সাফল্যের মধ্যে ভারতীয় দলের খেলায় সব থেকে বড় ত্রুটি খারাপ ফিল্ডিং তার জন্য অনেকক্ষেত্রে বিপক্ষ দল লাভবান হয়েছে এবং খেলার ফলাফলও ভারতীয় দলের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। এবারের অভিযানে ভারতীয় দলের মধ্যে ভি এম মার্চ্চেন্টের খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ভারতীয় দলের এবারের সাফল্যের জন্য অধিক সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। দলের পতনের মুখে তাঁর খেলায় দৃঢ়তা, উইকেটের চারিপাশে দর্শনীয় ব্যাট চালনা এবং বিপক্ষের সর্ব্বপ্রকার আক্রমণকে বাধা দানের প্রচেষ্টা ইংলণ্ডের দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেছে। খেলার কোন অবস্থায় দলকে পরাস্ত হতে দিতে তিনি যেন রাজী ছিলেন না। অমরনাথ এবার সাধারণ শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় দর্শকদের হতাশ করলেও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তিনি হতাশ করেন নি, ব্যাটিংয়ের থেকে তাঁর বোলিং খুবই কাজ দিয়েছে। মানকাদ, হাজারী দলের জন্য যথেষ্ট করেছেন। ক্যাপটেন নবাব পতৌদি ইংলণ্ডের ক্রীড়ামহলে উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং রয়টার সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নিযুক্ত ক্রিকেট সমালোচক Learie Constantine ভারতীয় দলের ক্রিকেট খেলা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "I am convinced that the time is not far distant when India will not only beat England on English soil, but will challenge and beat Australia, New Zealand and all comers."

অমরনাথ, মানকাদ এবং সারভাতে পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে ল্যাঙ্কেশায়ার লীগ দলে যোগদান করেছেন এবং হাজির ইংলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য ইংলণ্ডে রয়ে গেছেন! বাকি সবাই স্বদেশে ফিরছেন।

১৯৪৬ সালের খেলার ফলাফল : খেলা-৩৩ ; জয়-১৩ ; পরাজয়-৪ ; ড্র-১৬।

ভারতীয় দলের পক্ষে 'সেঞ্চুরী' হয়েছে মোট সেঞ্চুরী-২৩।

ভি এম মার্চেন্ট (৮ সেঞ্চুরী)

১৪৮	এম সি সির	বিপক্ষে
১১১	ল্যাঙ্কাশায়ারের	"
১১০	নর্থ হাম্পসায়ারের	"
* ২৪২	ল্যাঙ্কাসায়ারের	"
* ১৪১	ক্লাব ক্রিকেট কন্	"
২০৫	সাসেক্সের	"
১৮১	"	"
১২৮	ইংলণ্ডের (তৃতীয় টেষ্ট)	"

নবাব পতৌদি (৪) বিপক্ষে

১২১	কেম্ব্রিজের	"
১০১	নটিং হাম্পসায়ারের	"
১১৩	ডার্বিসায়ারের	
* ১১০	সাসেক্সের	

ভি এস হাজারী (৩)

১৩২	ইয়র্কসায়ারের	বিপক্ষে
১০৫	সাসেক্সের	"
* ১০৯	মিডলসেক্সের	"

লালা অমরনাথ (২)

* ১০৪	গ্লামোর্গানসায়ারের	বিপক্ষে
১০৬	সাসেক্সের	"

আর এস মোদী (১)

১০৩ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে

সি টি সারভাতে (১)

* ১২৪ দলের বিপক্ষে ;

এস ব্যানার্জী (১)

১২২ দলের বিপক্ষে।

সমস্ত খেলায় গড়পড়তা

ব্যাটিং

খেলোয়াড়ের নাম	ইনিংস	কতবার নট-আউট	সর্ব্বাপেক্ষা রান	মোট রান	এভারেজ
ভি এম মার্চেন্ট	৪৪	১০	*২৪২	২৬৩০	৭৫·১৪
ভি এস হাজারী	৩৫	৭	*২৪৪	১৪৮৫	৫৩·০৩
নবাব পতৌদি	২৬	৫	১২২	৯৭৭	৪৬·৪২
আর এস মোদী	৩৯	৩	১০৩	১২৮০	৩৫·৫৫
ভিনু মানকদ	৪৩	১	১৩২	১১২২	২৬·৭১
সি টি সারভাতে	২৬	৯	*১২৪	৪২৫	২৫·০০

বোলিং

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	এভারেজ
ভিনু মানকদ	১১৮৭·১	৩১৭	২৭৫১	১৩৪	২০·৫২
সি টি সারভাতে	৯৩·৩	৫৮	১০৪৮	৫০	২০·৯৬
ভি এস হাজারী	৬৬৬·৪	১৬৩	১৪৯৫	৬৪	২৩·৩৫
এস অমরনাথ	৮০২	২৭৮	১৫৭০	৪৩	২৬·৮৫

টেষ্ট খেলায় উভয় দলের গড়পড়তা

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড

(প্রথম তিনজন)

নাম	খেলা	ইনিংস সংখ্যা	কতবার নট-আউট	সর্ব্বাপেক্ষা রান	মোট রান	এভারেজ
ভারতবর্ষ						
ভি এস মার্চ্চেণ্ট	৩	৫		১২৮	২৪৫	৪৯·০০
এস মোহনী	২	৩		*২৯	৪৩	৪৯·০০
মুস্তাক আলী	২	৩		৫১	১০৬	৩৫·৩৩
ইংলণ্ড						
জি হার্ডষ্টাফ	২			*২০৫	২১০	১০৫·০০
ডি কম্পটন	৩			*৭১	১৪৫	৭৩·০০
ডবলউ হামণ্ড	৩			৬৯	১১৯	৩৯·৩৩

বোলিং

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড

(প্রথম তিনজন)

নাম	ইনিংস সংখ্যা	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	এভারেজ
ভারতবর্ষ						
লালা অমরনাথ	৫	১৫৭	৫০	৩৩০	১৩	২৫·৩৮
ভি মানকড়	৫	১৩৯·৫	৪৪	২৯২	১১	২৬·৫৪
সি এস নাইডু	৩	১৮	৩	৪৭	১	৪৭·০০
ইংলণ্ড						
বেডসার	৫	১৪৭·২	৩৩	২৯৮	২৪	১২·৪১
পোলার্ড	২	৫২	২৬	৮৭	৭	১২·৪২
এডরিচ	১	১৯·২	৪	৪৮	৪	১৭·০০

* তারকা চিহ্নিত নট-আউট।

ভারতীয় টেনিস ঃ

ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকা অল্ ইণ্ডিয়া লন্ টেনিস এসোসিয়েশন নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করেছে।

(১) ঘস্ মহম্মদ (বরোদা), (২) মান মোহন (আগ্রা) (৩) নরেন্দ্রনাথ (লাহোর), (৪) দিলীপ বসু (ক্যালকাটা) (৫) বি আর কপিনিপাণী (বাঙ্গালোর), (৬) জে-এম মেটা (বোম্বাই), (৭) ইরলাদ হোসেন (ক্যালকাটা), (৮) প্রেম পাঞ্জী (পেশোয়ার), (৯) জে-কে-কাপুল এবং খসু সেন (ইন্দোর ও পাটনা), (১০) সুমন্ত মিশ্র (ক্যালকাটা)।

পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

রীলে রেসে সুইডিস টীম ৪,৮০০ গজ দূরত্ব ৭ মিঃ ২৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে ১৯৪৩ সালে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৭ মিঃ ৩২·৬ সেকেণ্ডের পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীনবীনোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "পকাই ডাক্তার"—২।০
শ্রীনলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "সতী"—১।০
মনসা চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "রাত্রির ভিখারী"—১।০
শ্রীবিমলাচরণ সেন প্রণীত "সাহিত্য-প্রসঙ্গ"—৭৲

পণ্ডিত রমানাথ চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত "সাধুবাদ, সচিত্র, ষষ্ঠম চণ্ডী"—১।০
সুজিতকুমারনাথ-সম্পাদিত "আলমনী"—২৲
শান্তিরঞ্জন গুহ প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "কাব্যমালিকা"—৷৷০
ব্যারিষ্টার কবি সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "তুলসী ও চন্দন"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অগ্রহায়ণ—১৩৫৩

প্রথম খণ্ড | চতুস্ত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

পৃথিবীদোহন

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

আকাশ মাটি ও জল, যাহা লইয়া এই পৃথিবী তাহারা তো তেমনই রহিয়াছে সনাতন মহিমায়। আকাশ তেমনই উদার, মাটি তেমনই অকৃপণা, আর জলও অপার চির-সুনীল। আকাশ মাটি ও জল এই ত্রিবেণীর সমন্বয়ে ধাত্রী-পৃথিবীর কোলে মানবের ইতিহাসগঠন। তবু কেন ধরিত্রীমাতার সন্তানের মুখে দিকেদিকে এত ক্ষুধার বেদনা? মহাকুরুক্ষেত্রই যদি ঘটিয়া থাকে পৃথিবীতে, তবে সে আর কি নূতন কথা? পাঞ্চজন্য শঙ্খ যেদিন কুরুক্ষেত্র আহ্বান করিল, সেদিন কি শ্মশান রচনা হয় নাই মহাযুদ্ধভূমিতে? কিন্তু সেই পাঞ্চজন্যই যে মুহূর্তে ঘোষণা করিল যুদ্ধবিরতি, তারপরে শ্মশানস্মৃতি আর বেশী দূরে যাইতে পারে নাই। কুরুক্ষেত্রের বাহিরে ছিল যা বিরাট পৃথিবী—তাহাতে বাজিল শান্তি, ফুটিল অমৃত। অন্নপূর্ণার পৃথিবী দুদিনেই হাসিয়া উঠিল।

বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় মহাকুরুক্ষেত্রে যে শ্মশান জমিয়াছিল তাহা যেন নিভিতেই চাহে না। আগুন এতটুকুও কমিল না, মাটিতে অমৃত ফুটিবে কোথায়? তাই তো অন্নপূর্ণার সন্তানেরা বুভুক্ষু শ্মশানচারীদল ঘুরিয়া মরিতেছে।

আপস্তম্বের রচিত মহাযুদ্ধের শান্তিপর্বে যথারীতি অস্ত্রশস্ত্র ঘোষিত হইয়াছে। ন্যায় ও ধর্মের বিজয়কীর্তি ভেরীমন্ত্রিত এখনও। তবু ন্যায় ও ধর্মেরই যদি জয় হইল, তবে কি কারণে কোন্ ফাঁকে নিখিলমানবসন্তান আজ অন্নকাতর? ধর্মের জয়ে পৃথিবী তো রিক্তা হইতে পারেন নাই কখনও। ন্যায় ও ধর্মের বলে শ্মশানে তো ফুটিয়া ওঠা উচিত শস্যশ্যামল।

আজ নিখিলমানব বসুধার স্তন্যপান করিতে একান্ত উন্মুখ ও কাতর। আজ তাহারা বৎসদম লালায়িত। কিন্তু কে বসুধার স্তন্যসুধা বৎসতরে দোহন করিবে? অহরহ

বসুন্ধরায় এতটুকু অন্নের জন্য অন্নপূর্ণার সন্তানেরা কাতর, আর্ত ক্ষুধিত সন্তানের সম্মুখে জননীর স্তন্য শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কে শস্যশ্যামলে ধরার দুগ্ধ উচ্ছল করিবে? কে অমৃতমন্থন করিবে?

হিংসাময় পৃথিবীতে মানবেরই কবি স্মরণ করাইয়া দিলেন—

হে মানব, মনে রেখো 'মোরা অমৃতের পুত্র'।

কিন্তু একথা কে শুনিবে? আজিকার মানব মহাজ্ঞানী হইয়াছে, সে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছে, তাহার কাছে মিথ্যা ইতিহাস, মিথ্যা বিধাতা, মিথ্যা অমৃতকল্পনা—আর সত্য শুধু ক্ষুধিতের জন্য আণবিক মহাস্ত্রনির্মাণ। জ্ঞানদর্পীমানব তাই অস্ত্র হানিয়াছে ও হানিবে—পৃথিবীবক্ষে অকুণ্ঠায় নির্মমে—তাই ক্ষুধিত নিখিলমানবের সম্মুখে পৃথিবী দিনে দিনে হইতেছেন রিক্তা। তল মাটি ও বাতাসে যদি কোথাও এতটুকু আজও থাকে মধু, মানুষই মানুষকে বঞ্চিত করিতেছে সেইটুকু হইতে।

মানুষেরই কোন্ পাপে ম্লান হইল সুদর্শন, তাই না আণবাস্ত্রে আবার কূটিল ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভা। আবার কি মানুষেরই অন্তরশক্তিতে জাগিবে না সুদর্শন, নিখিল মানবকে আশ্বাসিয়া বাজিবে না পাঞ্চজন্য?

আজ যখন আর্তা পীড়িতা বসুধা বারণাস্ত্রের জ্বালামুখে কহিতেছেন—

রে মানুষ, কেন পীড়ন কর মাতৃবক্ষ!

তখন দৃপ্তকণ্ঠে মানুষ বলিতেছে শুনি—

হে বসুমতী, আরও কত রত্ন রেখেছ লুকায়ে? সব রত্ন সব ঐশ্বর্য, সম্ভব হোলে তোমার বক্ষমণিটিও হরণ কোরে আমি একা বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হোতে চাই। আমি শুধু একাই শ্রেষ্ঠ হোতে চাই।

এমনই সর্বগ্রাসী লোভ বর্তমানের। সেই রাক্ষসীবৃত্তিই পৃথিবীকে পীড়ন করিতেছে। অথচ এই মানবেরই এক পৌরাণিক বিজয় ইতিহাস দেখি, বসুধাবক্ষ মানবের শরশাসনে পীড়িত হইলে, বসুধা যখন কাঁদিয়া বলিলেন—

রে মানুষ, কেন মাতৃবক্ষ পীড়ন? কেন এক সন্তান আর এক সন্তানের রক্তে মাতৃবক্ষ কর কলঙ্কিত? শরজাল সংহরণ কর। দেখ, মাটিতে লুটায়েছি অমৃত। পান কর তাহা, শক্তিমান হও। মাতৃবক্ষে লীলা কর, কিন্তু শক্তির আস্ফালনে নহে, শক্তির আনন্দে।

সেদিনের মানব তখন শরজাল প্রত্যাহার করিয়া যুক্তকণ্ঠে স্তব করিয়াছিল—

হে ধরিত্রী মাতা, ধন্য আমি! অকৃতজ্ঞ সন্তানকেও এত ভালবেসে অমৃত এনে দিলে!

সেদিন সার্বজনীন ঐকান্তিকতায় ধরিত্রী শ্যামলা সুনীলা হইয়া প্রতি ফুলে ফলে প্রতি শস্যকণায় সঞ্চিত করিলেন মধু, সেই মধু বিনা হিংসা দ্বেষে সকলেই করিল পান, ধরিত্রীর বক্ষসুধায় সকলেই মিটাইল ক্ষুধা।

আজ মানবের সে অমৃতে নাই লোভ—নাই ভালবাসিয়া সকলেই একসাথে ধরিত্রীর বক্ষসুধাপান। শুধু আছে ঐশ্বর্য বিলাসবাসনায় পৃথ্বীবক্ষ শুষ্ক করিবার মহাউন্মত্ততা। আজিকার মহামানী মানুষের কাছে অমৃত শুধু পুরাণকারের কাব্যবিলাস, সুতরাং অলীক কল্পনা।

আজিকার মদদর্পী মানবতাই—সব মধু সব রত্ন সবআলো-বাতাস একা ভোগ করিতে চায়। সেই ইচ্ছার প্রতিরোধী যাহারা তাহাদের অস্থিমাংসে ধ্বিকর্দ্ধনৃত্য করিতে পারিলে খুশী হয়। আরও চায় পৃথিবী হইতে যত বাজে লোকের বাস উঠাইয়া দিতে।

পৃথিবীমোহন শব্দে আজ স্বতঃই মনে হইবে পৃথিবীপীড়ন। অথচ বৎসকল্যাণেই মোহন শব্দের মাহাত্ম্য। মানবেরই কল্যাণে চিরযুগে পৃথিবীমোহন কল্পিত, কিন্তু বর্তমানের মদদর্পীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন—রে ভাববিলাসী, ইতিহাসমুখাপেক্ষী, আমারই কল্যাণে তোমার কল্যাণ, আমারই শক্তি সঞ্চয়ে তোমার শক্তি।

আজ সারা জগৎ জুড়িয়া সেই অপরূপ পাঠ প্রচারিত হইতেছে। গুরুমশাইগিরি শুধু পাঠপ্রচারেই ক্ষান্ত নহে, সঙ্গে বেত্রদণ্ডটিও সকল রহিয়াছে।

আজ তাই যত ক্ষুধিত-নিখিল-মানব-সন্তানকে মিলিয়া জুড়িয়া গুরুমশাইয়ের তন্দ্রার অবসরে অন্নের সন্ধান করিতে হইবে। পারিলে, নিখিল-ক্ষুধিতদের বৎস কল্পনা করিয়া অমৃতত্ব মোহন করিতে হইবে। পারা না পারার কথাই বা কেন? ক্ষুধিতদের সম্মিলিত শক্তিই হইবে পৃথিবীমোহন-কারী। আর যদি ছুটিয়া আসে দৈত্য সেই অন্নহরণ করিতে, তবে নিখিল সন্তানের সে নব আনন্দমঠে নিখিল

ক্ষুধাতুর তাহাদের ক্ষুধায় কখনই মুষ্টকের করে তুলিয়া দিবে না।

সন্তানের তরে জননী কখনও কৃপণা নহেন। পৃথিবী কখনও শুষ্কবক্ষ ধরিতে পারেন না ক্ষুধিত সন্তানের সম্মুখে। মানুষ কামনা করিলেই, সত্য করিয়া ইচ্ছা করিলেই এই মাটিতেই ফুটিবে অমৃত।

আছে জলন্ত ইতিহাস, আছে বিংশ শতাব্দীর সম্মুখে তাহারই গৌরবময় পরিচয়, রক্তলোলুপতা ভুলিয়া হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া শুধু অমৃতের জন্য পৃথিবীদোহন।

গল্প নহে। সে একদিন হিমাচলের রত্নগুহায় বসন্ত-কালের মধু আধিক্য হইলে দেবদানবে উৎসবমত্ত হইলেন। দেবদানবে বলিলে পারস্পরিক বিবাদই বুঝায়, কিন্তু সেদিন দেবদানবে মধু সম্মেলন! বাসন্তিক গন্ধবিলাসে দানবেরা বিস্মিত হইলেন—শুধু ফুলেরই এত মাধুর্য্য, না জানি ফলের কতদূর।

দানবেরা মন্ত্রণা করিলেন—সারা হিমাচলদেশে এইরূপ যত বৃক্ষ আছে—ফুলে ফলে মধুতে অপূর্ব্ব, তাহাদের সমূলে তুলিয়া পৃথিবীতে নবরাজ্য নবনন্দন প্রতিষ্ঠা করিব।

হিমাচলের দেশে দানবেরা দেবতাদের অতিথি মাত্র। সেখানে দেবরাজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। তাই দেবরাজ্য হইতে হরণ করিয়া পৃথিবীতে নন্দনশোভা রচনার স্বপ্ন! কিন্তু মধুবিলাসে দেবতাদের সহিত উৎসবমুখর হইয়া দানব হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া গেল, দেবরাজ্য হরণ করিবার কথাতেও লজ্জিত হইল—অনাবিষ্কৃত বিশাল সমুদ্ররাজ্যসকল 'মন্থন' করিয়া এমনই দেবতরু সকল অপহরণ করিতে হইবে, এমনই অপূর্ব্ব তরুদের ফলে ও ফুলে অমৃত রচিয়া অমরলোকে দেবতুল্য হইতে হইবে!

দানবদের সেই সমুদ্রমন্থন কামনায় নিখিলজাতি মিলিত হইল। অমৃত আহরণের জন্য দেব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর মহানন্দে সম্মত হইল।

সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রথমেই যে অমৃত উঠিল দানবেরা তাহা লোভবশে হরণ করিল। সমুদ্রমন্থনে উঠিল কৌস্তুভ-মণি, দানবেরা তাহা চাহিল না। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উঠিল, দানবেরা তাহাতেও লোভও করিল না। আশ্চর্য্য যে দানবেরা মণিরত্নও চাহিল না, চাহিল শুধু অমৃত। পুনরায় সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠিল দেবতারা তাহা দখল করিলেন। অমৃতপানে যখন দেবতারা মত্ত হইলেন, তখন কোন্ মত্ততার ক্ষণে, কি বিস্মৃতির মুহূর্ত্তে পৃথিবী ইন্দ্রহস্ত হইতে সেই অমৃত হরণ করিলেন।

সমুদ্ররাজ্য মন্থন করিয়া যে মধুবৃক্ষসকল অপহরণ করা হইল, দেবদানবের অসতর্কতায় তাহারা হিমাচলদেশে ও হিমাচলকোলে বীজে বীজান্তরে বিস্তারলাভ করিল। বহুদিন ধরিয়া সেই সকল মধুবৃক্ষ হইতে দেবদানব ও মানবে যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরের সাথে মধুপান করিল। মাটির বক্ষসুধা সকলেই পান করিয়া যখন মাটির উৎসধারাকে শুকাইয়া দিল যুগশেষে, যখন মাটি হইল অনুর্ব্বরা ও রিক্তা, যখন মধুবৃক্ষ আর মধু পাইল না মাটির বক্ষশিরা হইতে, তখন একদিন আবার অমৃতমন্থনের প্রয়োজন হইল। এবার সমুদ্রদেশে মন্থন হইল না, এবার দেবদানবে মাথা ঘামাইল না, আপন প্রতিভায় মানব স্থির করিল পৃথিবীদোহন করিতে হইবে।

পাহাড় ভাঙিয়া মাটি কাটিয়া নদীপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়া মানুষই মাটীর শিরায় শিরায় নব উৎসের রচনা করিল। মাটির বক্ষে ফুটিয়া উঠিল আবার নবমধু বৃক্ষ, ফুলে ফলে মধুভরা—অমৃতের খনি।

ভারতের ইতিহাস বলে—আগেকার মানুষ, পৃথিবীকে ভালবাসিত, শিশু যেমন ভালবাসে স্তন্যদাত্রীকে। মাতার স্তন্য লইয়া সন্তানে হানাহানি করিত জন্তুত, কিন্তু মাতা বসুন্ধরা যখন স্তন্য ধারা উচ্ছসিত করিতেন, তখন মাতৃসুধা-গর্ব্বে সকলেই সমভাবে খুশী হইত। তাই পৃথিবী যত বার যুগে যুগে শ্যামলাঞ্চল বিছাইয়াছেন, শ্যামলে সুনীলে যত বার অমৃত বিলাইয়াছেন তত্তবারই পৌরাণিক ইতিহাসে হইয়াছে মধুমিলন, জাতিতে জাতিতে প্রীতি জাগিয়াছে, প্রতি অন্তরেতে ফুটিয়াছে মানবিকতার নীতি। তাই সে দিনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দেবযক্ষরক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও মানবে মিলিয়া আন্তর্জ্জাতিক প্রীতিপত্র।

আর আজ কিন্তু পৃথিবী যদি এতই দাক্ষিণ্যভরে স্তন্য-ধারা উচ্ছসিত করেন, তবে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইতিহাস গঠিত হইবে, মানুষে মানুষের হানাহানি রক্ত তাণ্ডব লইয়া। মাটির কাণায় যে প্রীতি ছিল আণবিক মারণাস্ত্রে তাহা ধ্বস্ত হইয়া গেছে, আছে শুধু ইট কাঠ পাথর আর ধ্বংসাবশেষ, আর আকাশ বাতাসময় মহারুক্ষতা।

আগেকার মানুষ, দেবদানব ভালবাসিত ধরিত্রীর শুভ্র সুধা। আর আজ ভালবাসে মাতা ধরিত্রীর বক্ষ ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে—কোথা হইতে কোন রসমূল হইতে ওঠে এত উৎস এত সরসতা। আজ ভালবাসে ব্যবচ্ছিন্ন ধরিত্রীর হৃদয় হইতে সেই আনাবিষ্কৃত বক্ষমণি করিতে হরণ। পূর্ব্বে পৃথিবীদোহন অর্থে ছিল ধরাবক্ষে মধু ও অন্নের উচ্ছলতা বহানো, আর আজ পৃথিবীদোহনে বুঝি—ধরার উৎস হরণ করিয়া রিক্ত করা—শুষ্ক করা তাহাকে, শুষ্ক করিয়া সম্ভব হইলে প্রাণশক্তিটুকু হইতেও বঞ্চিত করা।

আর তাই পৃথিবীর দুগ্ধটুকু অধিকার করা লইয়া মানুষের সহিত মানুষের দ্বন্দ্ব। তাই আজ পৃথিবীদোহনে মেলে শুধু রক্তধারা—মানুষের পরস্পর হানাহানি ও দাপাদাপিতে বসুন্ধরা বক্ষবিদীর্ণ ছিন্ন হইয়া ওঠে শুধু রক্তধারা। পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া যেদিন মানুষ মহোল্লাস করিবে, সেইদিনই তাহার এবারের শেষ ইতিহাস। পুরাকালে পিশাচেরা পৃথিবীদোহন করিয়াছিল। পিশাচেরা মানুষেরই একজাতি, তাহারা মরুদেশনিবাসী। তাহাদের সেই পৃথিবীদোহনে কি দুগ্ধ উঠিয়াছিল? রুধির উঠিয়াছিল। সেই রুধির পানেই তাহারা শক্তিমান। আজও সেই পিশাচেরই দৃষ্টান্তে দিকে দিকে রুধির লাভের জন্য পৃথিবী-দোহন। আজ পৃথ্বীমাতার স্তন্য হইতে শক্তিমান মানুষ রুধির পান করিতে চায়।

মানুষের আর এক জাতি নাগেরাও একদিন পৃথিবী-দোহন করিয়াছিল। তাহারা পাইল বিষ। সেই বিষপানেই তাহারা উগ্র ও দর্পী হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত কত শক্তিশালী জাতি বিষদুগ্ধ পান করিয়া মত্ত ও দর্পী হইয়া উঠিয়াছিল। আজও মানুষ মনুষ্যপ্রীতি ভুলিয়া ধরণীর রুধির দুগ্ধে বিলাস করিতে চায়।

ঋষিগণও পৃথিবীকে স্তব করিলে পৃথিবী দুগ্ধদান করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি ছিলেন দোহনকারী, চন্দ্র হইয়াছিলেন বৎস, আর বেদসকল কল্পিত হইয়াছিল পাত্ররূপে। সেই বেদরূপ আধারে বৎস চন্দ্রমুখে পৃথিবী তপোরূপ ব্রহ্ম-দুগ্ধ নিখিল মানবেরই পুষ্টির জন্য উচ্ছলিত করিলেন।

আর একদিন গোপালকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বৎস কল্পনা করিয়া নিখিল মানবের জন্য পৃথিবীর জ্ঞানস্তন্য দোহন করিয়াছিলেন। তাই পৃথিবীদোহন করিলে বিষই উঠে না, শুধু রুধিরই বহে না, নিখিল মানবের পুষ্টিকর সুধাও উৎপন্ন হয়। সেইখানে দোহনকারীর ইচ্ছা ও মাহাত্ম্য থাকা চাই।

আজ সারা পৃথিবীর সন্তানেরা যখন বিশ্বময় অন্নবিনা হাহাকার করিতেছে, তখন অন্নের জন্য পৃথিবীদোহন তো কেহ চাহিতেছে না। বিষ ও রুধিরই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ভারতেরই ইতিহাসের এক গৌরবময় দিনে এমনই অন্নবিনা হাহাকার উঠিলে নিখিল মানবকে বৎস কল্পনা করিয়া অন্নদুগ্ধ দোহন করা হইয়াছিল। সেই অতীত দিনের কথা স্মরণ করা আজ এই জন্য প্রয়োজন—যে সময় আসিয়াছে আবার অন্নের জন্য পৃথিবীদোহন করিবার, নিখিল মানবের জীবন রক্ষার কথা ভাবিবার।

পৌরাণিক যুগে একদিন পৃথিবী শস্যহীনা অন্নহীনা হইলে, মহারাজ পৃথুর সকাশে নিখিল মানব আবেদন জানাইল—আমাদের অন্নের বিধান করুন। সেই মহারাজ অমনিই অস্ত্রকরে পৃথিবীকে প্রহার করিতে লাগিলেন। বসুধা আর্ত্তা হইয়া বলিলেন—রাজন্! কেন আমায় পীড়ন করিতেছ? আমি ভিন্ন কে প্রজা রক্ষা করিবে? আমাকে পীড়ন করিলে আপনার সমস্ত প্রজারই বিনাশ হইবে। প্রজাগণের মঙ্গলে আমাকে বধ করা উচিত নহে।

আজ যখন চারিদিকে মানবেরই ধরিত্রীমাতাকে বধ করিবার অভিযান চলিতেছে, তখনও সেই আর্ত্তা বসুধা কহিতেছেন শুনি—

হেমানুষ! তোমাদেরই মঙ্গল আমার মঙ্গল। কেন নিখিল মানুষের সর্ব্বনাশ করিতেছ আমাকে হনন করিয়া? আর সেই পৌরাণিক দিনে পৃথিবী কাঁদিয়া কহিয়াছিলেন—হে রাজন্! আমাকে বিনাশ করিলে প্রজাগণের প্রাণরক্ষণ অসম্ভব! আমি প্রজাগণের অন্নস্বরূপ হইব।

আজও বসুধা কাঁদিতেছেন—অন্নের জন্য দোহন কর আমায়। কেন পীড়ন কর আমাকে, কেন কর মানুষেরই সর্ব্বনাশসাধন? সন্তান চাহিলে মাতৃবক্ষ আপনি যে উচ্ছল হইবে। মাতা তো সন্তানের তরে কখনও কৃপণা নহে। তবে কেন অস্ত্র হানাহানি, কেন রুধিরলোভ? মাতা তো সন্তানকে রুধির দান করিতে পারেন না তাহার অন্নের জন্য।

—হে নিখিল মানব! শস্যের জন্য, মানবেরই জীবন-

পুষ্টির জন্য কেন আমার দোহন কর না! কেন শস্য দুগ্ধে শক্তিমান হও না? কেন সকলে মিলিয়া জননীর দান সেই ওষধি ও শস্যদুগ্ধ আনন্দে পান কর না।

সেই পৌরাণিক ইতিহাসে দেখি পৃথিবী মহারাজ পৃথুকে সম্বোধন করিয়াছিলেন—

হে ধার্মিকপ্রবর! আপনি আমাকে বৎস প্রদান করুন, আমি তাহার প্রতি স্নেহবতী হইয়া ক্ষীর স্রবণ করিব। আর আমার অঙ্গ সকল সমতল করিয়া দিন, আমি সকল স্থানে সমানভাবে ক্ষীর সঞ্চালন করিতে পারিব।

তখন মহারাজ পৃথু অস্ত্র হানিয়া সকল শিলা সরাইয়া দিলেন। পাহাড় ভাঙিয়া পৃথ্বাঅঙ্গ সমতল করিয়া দিলেন। শস্যশ্যামলে হাসিয়া উঠিল বসুন্ধরা, মানুষ শস্য-দুগ্ধ পানে যৌবন ফিরিয়া পাইল।

মহারাজ পৃথু নিখিল মানবের পুষ্টির জন্য মানবকেই বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবী হইতে শস্য দোহন করিলেন। দেবতা ও দানবে মিলিয়া একদিন যে অমৃতলোভে সমুদ্ররাজ্যের ওষধি ও শস্য রাশি লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন, মানবের প্রচেষ্টায় সেই অমৃত ফুলিল শ্যামলে।

মহারাজ পৃথুর অস্ত্রমুখে যখন পৃথ্বী-অঙ্গ সমতল হইয়া শস্যভূমিতে ও নদীপ্রবাহে অপরূপ রূপে ঝলমল করিয়া উঠিল, তখন সেই মহারাজ যুদ্ধ হইয়া আপন অস্ত্রকে ধন্য মনে করিলেন। অস্ত্র মানুষে মানুষে হানাহানি করিয়া ধন্য হয় ইহাই বর্ত্তমানের ধারণা। আজ মানুষ সেই অস্ত্রকেই ধন্য মনে করে যাহাতে পৃথিবীর ও মানুষের সর্ব্বাধিক ধ্বংস-সাধন হইয়াছে। আজ আণবিক মারণাস্ত্রের এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসাগান শুধু শ্রেষ্ঠ ধ্বংসকারী বলিয়াই, আজ তাই এত আণবিক চরিতামৃত পৃথিবীর কর্ণভেদ করিয়া দিতেছে।

মহারাজ পৃথুর আদর্শে অস্ত্রকে মানব কল্যাণে কে ধন্য করিতে চাহে? কে ক্ষুধিত মানুষের মুখে শস্যদুগ্ধ আনয়ন করিবে? পৃথিবীকে আর না পীড়ন করিয়া, আর না লুণ্ঠন করিয়া, মহা-অস্ত্র হানিয়া পৃথিবী অঙ্গ সমতলে নবনদীপ্রবাহে নবীন করিয়া, নিখিল মানবকে বৎস কল্পনায় নবশস্যদুগ্ধ কি আর কেহ পান করাইবে না?

আবার কি শস্যশ্যামলে মানবকল্যাণে হিংসা দ্বেষ হানাহানি ডুবাইয়া অমৃত ফুটিবে না?

স্তন্যপানতরে শুধু সন্তানই কাতর হয় না, সন্তানকে স্তন্যদানের জন্য মাতাও কম কাতরা নহেন। তাই আজ দিকে দিকে যখন মর্ম্মভেদী হাহাকার, ব্যথিতা বসুধা ডাকিতেছেন—

হে মানুষ, হে ক্ষুধার্ত্ত, আমি যুগযুগের প্রসিদ্ধ সুরভি, আমাকে দোহন কর, আমি প্রতি ক্ষুধিত মুখে ক্ষীরধারা সিঞ্চন করিব।

ধাত্রী ও বিধাত্রী এই বসুধাই প্রতি যুগশেষে মানুষের তিমিত শক্তিতে তরঙ্গ আনিয়াছেন। প্রতি যুগশেষে আবার নবযৌবন প্লাবনে মানুষ ভাসিয়াছে। আবার সুরভি মানুষের সর্ব্বকামনাই পূরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতি যুগশেষে এই নবযৌবনসুধা যিনি বহাইলেন, তিনিই তো দোগ্ধা, তিনিই তো পালক। মানুষের ইতিহাসে প্রতি যুগশেষে একএকটি অপরূপ প্রতিভা আসিয়াছে—মানবেরই কল্যাণে নবজীবনরচনায় পৃথিবীদোহন করিতে।

আজ এক কণা শস্যের জন্য মানুষে মানুষে হলাহল পান করিতেছে, ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে পরস্পরের ধ্বংসের জন্য। আজ তাই তো একান্ত প্রয়োজন ক্ষুধিতের তুষ্টি ও পুষ্টির জন্য হিংসাহলাহলকে পাতালে ডুবাইয়া পৃথিবীদোহন।

মানুষ সেই পৃথিবীদোহনে বিষদুগ্ধ পান করিতে চাহে নাকো আর, চাহে না রুধির দুগ্ধ। আজ হিংসা নয়, রক্তপাত নয়, মানুষ চাহিতেছে শুধু ধরিত্রীর বসুধা গলাইয়া কিছু শস্যদুগ্ধ।

পৃথিবীদোহন করিয়া মানুষ বাঁচিতে চাহে। আজ মানুষ আবার ফিরিয়া পাইতে চাহে সেই শস্যশ্যামলে ভরা অমৃত।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

অপর্ণা গৌরীর নিকট হইতে ফিরিয়া দেখে অজিত কোর্ট হইতে সকালেই ফিরিয়াছে। অজিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই অপর্ণা কহিল—ও বাড়ীতে গেছলুম, আলাপ ক'রে এলাম।

—ভাল, রাজার মেয়া কিলো?

—না, রাজা আফিসে। রাজার দর্শনে ত যাইনি, রাজমাতা ও রাণীর সঙ্গে আলাপ হ'ল?

—কেমন জমলো?

—তা কি একদিনেই জমে? বড়লোক বলে একটু আড়ষ্ট হ'য়ে ত থাকবেই, তারপর তাড়াতাড়িতে একটু ভুল ক'রলাম—

—কি?

—চা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু না খেয়ে এসে ভাল হয় নি। আভিজাত্য তথা গর্ব্ব মনে ক'রতে পারে।

—পারে। তা রাজপুত্র?

—রাজকন্যাকে নিয়ে গিয়েই একেবারে ডিস্‌ইন্‌টারেষ্টেড, তখন চড়ুই পাখীকে চাল খাওয়ানো হ'ল। সত্যিই অমন ধন্যি ছেলে নিয়ে পারাও দায়। আজ নিজে দরজা খুলে পালিয়েছে।

—কেমন ক'রে গেলে?

—পেছনের দরজা দিয়ে ঝিকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কেন? তোমার আপত্তি থাকলে স্পষ্ট ক'রে বলো—

অজিত বলিল—না, তুমি ত আর এমন অসূর্য্যম্পশ্যা নও; একা একা ত ক'লকাতা ঘুরে বেড়িয়েছো। তবে আমি ঠিক আমার এ মন নিয়ে হয়ত ওদের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতে পারতুম না। তোমার মনটা একটু ডিমোক্রেটিক।

অপর্ণা কহিল—জানি না কেন, ওই ছেলেটা আর ওর মাকে জানবার একটা অদম্য কৌতূহল আমার মনে আছে। ওদের এই শান্তিময় জীবনযাত্রার মাঝে ওরা কতখানি সুখী।

—কি দেখলে?

—একদিনেই কি দেখা হয়? ছেঁড়া পাঞ্জাবী দিয়ে রুমাল কি ব্লাউজ ক'রবে তাই ভাবছিল। এই যে অনটন, এর মাঝে একটা ত্যাগের প্রতিযোগিতা চলেছে হয়ত—

অজিত হাসিয়া কহিল—তবে প্রাচুর্য্যই কি ভালবাসার অন্তরায়! থাক্, আজ একটু ড্রাইভ ক'রতে যাবো, তুমি যাবে সঙ্গে?

—যাবো। আমাকে ড্রাইভ ক'রতে দিতে হবে কিন্তু।

—হাঁ। তোমার যখন লাইসেন্স রয়েছে তখন বারণ ক'রলেই বা শুনবে কেন? তবে বেচারা দু'চারজনকে চাপা দিও না।

অপর্ণা ব্রীড়াভঙ্গি করিয়া কহিল—তোমার মত র‍্যাস্ ত আমি নয়।

—গরুর গাড়ী চালানে বিপদ কম।

মাসের ২৫শে হইলেও অমল কিছু ফল ও ছানা লইয়া ফিরিয়াছিল—

পরদিন দুপুরে গৌরী অমলেরই একটা গল্প পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। খোকা সদর দরজার অলিন্দে বসিয়া নানারূপ ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিল এমনি সময়ে কড়ায় মৃদু শব্দ হইল। খোকা নানারূপ চেষ্টা করিয়াও দরজা খুলিতে পারিল না, তাই মা'কে আসিয়া ডাকিল।

কে আসিবে তাহা জানা ছিল, অতএব গৌরী উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—আসুন।

অপর্ণা নমস্কার করিয়া একটু অগ্রসর হইতে হইতে দেখিল, মায়ের পিছন দিকে দাঁড়াইয়া খোকা কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়া তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। অপর্ণা কহিল—খোকা, আমি কে?

খোকা একটু থতমত খাইয়া কোন জবাব দিল না। পুনরায় প্রশ্ন করিলে স্মিতহাস্যে বলিল—রাজকন্যা।

অপর্ণা হাসিয়া উঠিল, গৌরীও হাসিল। অপর্ণা ঝিকে বলিল—তুই যা, ঘণ্টা দু'য়েক পরে এসে আমাকে নিয়ে যাবি। আর বাবু যদি বাড়ীতে আগেই আসে ত খবর দিস্।

ঝি চলিয়া গেল।

গৌরীর গৃহে একটি শয্যা, একটি টেবিল ও চেয়ার এবং একটি আলমারী ছাড়া কোন আসবাবপত্র নাই। বসিতে হইলে হয় শয্যায়, না হয় চেয়ারে। অপর্ণা বিছানায় বসিয়া খোলা মাসিকখানা টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—কি পড়ছিলেন?

গৌরী লজ্জিতভাবে বলিল—পড়া নয়, ছবি দেখছিলাম। অপর্ণা পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিল, জনৈক অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গল্প। কতদিন এই লেখকের গল্প পড়িয়া সে ভাবিয়াছে এই কি সেই অমল? সেকেণ্ড ক্লাস পাইয়া সে হয়ত কোন স্কুলে, না হয় সওদাগরী আফিসে চাকুরী করে; তাহার মাঝে আজও কি কাব্যপ্রতিভা বাঁচিয়া আছে? তাহার লেখার মাঝে আপনাকে খুঁজিয়াছে কিন্তু পায় নাই—

অপর্ণা ক্ষণিক পরে প্রশ্ন করিল—গল্পটা কেমন পড়লেন?

—ছাই।

গল্পটা অপর্ণার পড়া ছিল, সে কহিল—আপনি ত ছাই বলবেনই—আপনাদের ত আর এমন নয়। এ লেখকের যেন স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও নেই, না? আপনার কাছে তাই ভাল লাগেনি—

—কেন?

—দূর থেকে যা দেখেছি তাতেই ব'লতে পারি। যে রকম ক্যারম খেলা, আর তার পরে উঠানের মাঝে—অপর্ণা অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিল।

গৌরী লজ্জারক্তিম মুখখানি নীচু করিয়া কহিল—ওই ত ওর দোষ। আমি লেখাপড়া জানি না বলে ওর কি রাগ—দিবারাত্রি তাই ঝগড়া করে—

অপর্ণা তাহাকে বিশ্বাস করে নাই এমনিভাবে হাসিয়া উঠিল—এ যেন অভিমান।

গৌরী তাই বলিল—সত্যিই, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে পড়াতে সুরু ক'রলে কিন্তু কি করি—ওই দুরন্ত ছেলে নিয়ে কি পড়া হয়। তার পরে রান্না করা—সংসারের কাজ—

অপর্ণা ঠাট্টা করিয়া কহিল—পড়তে পড়তে ঝগড়া হয়নি? ধরুন কলকল মহম্মদ তোগলকের বেরাই কিনা—এই নিয়ে যেমন এই গল্প হ'য়েছে—

গৌরী হাসিয়া মুখ নীচু করিল, কোন জবাব দিল না। অপর্ণা ভাবিল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের এই সংঘাত চলিয়াছে চিরদিন। একের পাওয়ার সহিত আর একজনের দেওয়ার বিভেদ কত দূরপ্রসারী। অপর্ণা প্রশ্ন করিল—আপনি তাহ'লে তাকে ভালবাসেন না?

গৌরী প্রতিবাদ করিল—তা কেন? ওই ত অমনি। একা একা রাত্রে কি করে, কিন্তু আমি কি জেগে থাকতে পারি ওর সঙ্গে?

—কি করেন?

—ছাইভস্ম লেখে, আর মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথা বলে—শুনলে হাসি পায়, কিন্তু হাসলে বিপদ?

—কেন?

—সে সব কি কাব্য-কথা, অত শত আমি ত বুঝি না। চাঁদ উঠলে একরকম হবে, বিষ্টি হ'লে হয়ত কাঁদতে হবে—রোদ উঠলে হয়ত গান ক'রতে হবে। গৌরী মুখ টিপিয়া হাসিল, অপর্ণা বুঝিল এই ব্যঙ্গের মাঝে গৌরীর গর্ব্ব ও আনন্দ প্রস্রবণের বাইরে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অপর্ণা তাই কহিল—সেজন্যে মনে মনে ত বেশ খুশী, আর কেবল দুষ্টুমী করা হয় না? আপনার ওঁর নাম কি?

গৌরী জবাব দিল—নাম সে করে না; সহসা সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। খোকা টবের মধ্যে নামিয়া জলকেলি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নিজদেহ দিয়া খোকাকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়া প্রসঙ্গান্তরে কহিল—দেখেছেন, দু'জনও কি সুস্থভাবে কথা বলারই উপায় আছে?

খোকা মাতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া চীৎকার করিতেছে—যাবো, আমি যাবো—

অপর্ণা কহিল—খোকন, এস, আর যায় না।

খোকা সেকথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহার রুচিমত চীৎকার করিতেছিল, অপর্ণা কহিল—না, একখানা ঘুড়ি দেব, কেমন উড়বে।

খোকা একটু চিন্তা করিয়া কহিল—দাও।

—কাল দেব। কেমন?

খোকা অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—কাল?

কড়ায় শব্দ হইল। খোকা কহিল—ঘরলা খুলি মা?

গৌরী জিহ্বায় একটু কামড় দিয়া কহিল—ইস্, আজ ত শনিবার, তাই সকালেই ফিরেছে—

—কি করে বুঝলেন ?

—ওই কড়ার শব্দে, আচ্ছা ওকে আর ঘরে পাঠিয়ে দেব, কেমন ?

অপর্ণা কহিল—দরকার কি ? আমি না হয় আলাপই ক'রলাম। অসূর্য্যম্পশ্যা তুমনয়—

অকস্মাৎ অমল আসিয়া একেবারে ঘরের মেঝের দাঁড়াইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে অপর্ণার মুখের পানে চাহিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—অপর্ণা !

অপর্ণাও সঙ্গে সঙ্গে কহিল—অমল ? কি ভাগ্যচক্র, শেষে তোমার বৌ'এর সঙ্গে আলাপ ক'রতেই ছুটে এসেছি এখানে ?

গৌরীর মুখখানা দেখিতে দেখিতে শাদা হইয়া গেল, একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া সে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল। অমল চেয়ারটার উপর বিবশ দেহটাকে কোনমতে বসাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অকস্মাৎ কহিল—হ্যাঁ, ভাগ্যচক্রেই বলতে হবে, নইলে খোকা রান্নাকক্ষা খুঁজতে তোমার ওখানেই যাবে কেন ? এসেছ ভালই হ'য়েছে, একটু চা পেয়ে নাও। তোমাকে আজ আপনি বলাই হয়ত সঙ্গত ছিল কিন্তু সম্ভব নয়। গৌরী একটু চা' ক'রে দাও।

গৌরীর খাবার প্রস্তুত ছিল, সে ষ্টোভ জ্বালিবার জন্য স্পিরিটও ঢালিয়াছিল। অমল আফিসের জুতা খুলিতে খুলিতে কহিল—রান্নাকক্ষা খোকাও পায় নি—খোকার বাবাও খুঁজে খুঁজে পরশ পাথরের সন্ন্যাসীর মত ঘুরছে—পুরাতন জীর্ণপথ মৃতবৎ পড়ে আছে সামনে দিগন্ত বিস্তৃত। অমলের মা আসিয়া কহিলেন—অমল এসি রে ?

অমল কহিল—হ্যাঁ মা। ইনি কে চিনেছ ? কলেজে পড়বার সময় তোমার অসুখ হ'লে একজন তোমার কুশল সংবাদ পাওয়ার জন্যে পত্র দিয়েছিলেন মনে আছে ?

মা বলিলেন—হ্যাঁ।

—এই সেই অপর্ণা।

অপর্ণা মায়ের উদ্দেশে কহিল—সেই সামান্য ঘটনাটা এতদিনও মনে ক'রে রেখেছেন ?

জবাব দিল অমল—কারণ, ওঁর কুশল প্রশ্ন এক আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ করেনি কোনদিন। আমরা একসঙ্গে এম-এ পড়েছি মা, আমি সেকেণ্ড ক্লাস—উনি ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছিলেন।

অপর্ণা লজ্জিত হইয়াছিল, কহিল—সেকথা তুলে কি হবে ? তোমার নোট পড়েই আমি ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছি।

মাতা কহিলেন—বহুদিন পরে ত তোমাদের দেখা না ? ভালই হ'ল পাশাপাশি বাড়ী।

অমল অপর্ণাকে কটাক্ষ করিয়া কহিল—কিন্তু ব্যবধান অনেক।

—কিন্তু এটা তোমার বাড়ী তা ঠিক না পেয়েই এসেছিলাম।

মাতা বাহির হইয়া যাবমান খোকার অনর্থ নিবারণে মনোযোগ দিলেন। অমল অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পাইয়া কহিল—কেন-? তোমাদের মত বড়লোকের বাড়ীর বৌ'রা সাধারণতঃই আসে না। তাদের অন্য সমাজ, অন্য ব্যবস্থা।

অপর্ণা একটু থামিয়া কহিল—অসাধারণ কিছুকিছুও মাঝে মাঝে ঘটে, তার জন্যে প্রস্তুত থাকাই ভাল। তোমার বৌএর সঙ্গে আলাপ ক'রবার একটা দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছে ছিল—তোমাদের ক্যারম খেলা, মাংস রাঁধা ব্যাপার দেখে। সুযোগ ছিল না, খোকার ভুল সে সুযোগ এনে দিল।

—ইচ্ছেটা দুর্দ্দমনীয় হ'ল কেন ?

—মনে হ'ল তোমরা খুব সুখী দম্পতি তাই।

—কেন, তোমরা ?

—আলোচনা ক'রে লাভ নেই, অন্ততঃ আজ।

অমল হাসিয়া বলিল—ও আলোচনা না হয় থাক্, কিন্তু আমরা খুব সুখী এ ধারণার মূলেও ত কোন হেতু নেই। তবে অকারণ কাউকে কোন দিন দুঃখ আমি দেই নি—

গৌরীর চা হইয়া গিয়াছিল। অমল বলিল—আমাদের দু'জনকেই দাও, এক সঙ্গে আমরা খেয়েছি বহুদিন। গৌরী খাবার ও চা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল—সম্ভবতঃ অভিমানে, না হয় অশুভের আশঙ্কা করিয়া। অপর্ণা ও অমলের এই সাক্ষাৎকে মনে মনে সে কিছুতেই সরলভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না।

অমল ডাকিল—গৌরী। অপর্ণা তোমার কাছেই এসেছে সেকথা ভুলো না—

গৌরী 'আসছি' বলিয়া চলিয়া গেল।

অমল কহিল—আমার এ অবচ্ছল গৃহের মাঝে তুমি অতিথি হ'য়ে আস্‌বে একথা ছিল স্বপ্নাতীত—আজ ভাগ্য-চক্রে যদি তাই ঘটেছে তবে আমাদের সামান্য সৌজন্যকে গ্রহণ ক'রে ধন্য ক'রো।

অপর্ণা অত্যন্ত কাতরদৃষ্টিতে অমলের পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া কহিল—এতদিন পরেও কি আমাকে ব্যঙ্গ ক'রে, আঘাত ক'রে তুমি আনন্দ পেতে চাও? আমাকে বেদনা দিয়ে তোমার লাভ?

—লাভ নেই। তুমি আজ আমার আঘাতের অনেক উপরে, তাই কেবলমাত্র সৌজন্যই প্রকাশ ক'রতে চেয়েছি।

অপর্ণা চা'য়ে চুমুক দিয়া সজল চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—ভাল। ভুল ক'রেছি মানি, কিন্তু আজ ত সে ভুল শোধরাবার কোন উপায় নেই—তা কি ক্ষমার বাইরে।

—ক্ষমা! তুমি হাসালে, তুমি কোন ভুল ক'রনি। আমার অজ্ঞায় স্পর্দ্ধাকে আজ আমি তিরস্কার করি।

—সেকেণ্ড ক্লাস না হ'লে হয়ত আজ—অপর্ণা বলিতে পারিল না, সহসা থামিয়া গেল।

অমল সমবেদনার কণ্ঠে কহিল—সেজন্যে আর যাই হোক্, তোমাকে দায়ী ক'রবো না। আমার মনটাই তখন বাঁধনের বাইরে চলে গিয়েছিল তাই, নইলে হয় ত হ'তে পারত—

দুইজনই অকস্মাৎ চুপ করিয়া গেল। অপর্ণা তাড়াতাড়ি আঙুর কয়েকটা মুখে ফেলিয়া দিয়া কি যেন ভাবিল। অমল বাইরের পানে চাহিয়াছিল। অপর্ণা কহিল—অমল, তুমি যে একান্ত একাকী নিশীথ রাত্রে উঠানে ঘুরে বেড়াও সেকথা আমি জানি—আমিও একান্ত একা ঝুলবারাণ্ডায় বসে দেখি। আমার কাছে তোমার কিছুই গোপন নেই, সম্ভবতঃ এই জন্যই তোমার ছেলে তার কচি হাতে এমনি-ভাবে উঁচু থেকে টেনে নামিয়ে এনেছে, কিন্তু আজ কেমন ক'রে তোমায় আমি সমস্ত বল্‌বো?

অমল কাতরকণ্ঠে কহিল—লাভ নেই, অপর্ণা। আমাদের চাওয়ার ত কোন শেষ নেই, আজ বিবাহিত জীবনে বুঝেছি যে মানুষ একা, একান্তই একা। নইলে গৌরীর কোন ত্রুটি নেই, তবুও আমি কেন তৃপ্তিহীন জীবন-যাপন করি? আমার দেহাতীত মনের ব্যসন তুমি, তোমাকে আপনার ক'রে পেলেও মনের সে ব্যসনবৃত্তি যেতো না।

—জানি, তবুও তোমার সে বিদ্বেষের বিষটি নিরন্তর আমাকে যেন সাপের মত দংশন করে—

গৌরী আসিয়া পড়িল—যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা আর চলিতে পারে না। অপর্ণা একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—কবিতা ছেড়ে, গল্প লিখতে সুরু ক'রেছ কতদিন? তোমার লেখাই যে পড়ি, তা'ত এতদিন জানতুম না।

—আজ জান্‌লে, এখন মনোযোগ দিয়ে প'ড়ো।

গৌরীকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া অপর্ণা কহিল—ওর সমস্ত গোপন কথা লিখে ফেলেছ যে?

গৌরী হাসিয়া কহিল—আমার কেন?

অমল একটু ব্যঙ্গের সুরে কহিল—গোপনটা আমার—

গৌরী গ্রীবা বাঁকাইয়া কহিল—ইস্— (ক্রমশঃ)

মধ্যযুগ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এচ্-ডি, ডি-লিট্ (লণ্ডন)

মহম্মদ গোরীর আক্রমণ হইতে অরঙ্গজীবের মৃত্যু পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগ বা মুসলমান যুগ ধরা হয়। আমরাও এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার সময় এই ধারণা লইয়া অগ্রসর হইব। এই যুগের প্রারম্ভে তুর্কিস্তান মুসলমান, পারস্য, মুক্তপ্রদেশ ও কিছুদিন পরে বিহার এবং বঙ্গদেশ জয় করিয়া সমস্ত উত্তর ভারত নিজেদের করায়ত্ত আনয়ন করে এবং প্রায় পাঁচ শত বৎসরের উপর নিজেদের অপ্রতিহত প্রভুত্ব বজায় রাখে।

খৃষ্টীয় খৃষ্টাব্দের পরিশেষে হিন্দুসমাজের যে গঠনপ্রণালী চলিত ছিল তাহাতে ভারতবাসীরা যুদ্ধে বড় একটা যোগ দিত না। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য অথবা শূদ্রের যুদ্ধের সহিত কোনও সম্পর্ক ছিল না। দেশ রক্ষা কেবল ক্ষত্রিয়ের কর্ম এরূপ একটা ধারণা সমাজের সকল স্তরের মধ্যেই বদ্ধমূল ছিল। ক্রমাগত যুদ্ধে ক্ষয় হওয়ায় ক্ষত্রিয়েরা সংখ্যাতেও আর অধিক ছিল না। আবার ক্ষত্রিয়কর্মের মধ্যেও সর্ব্বদাই কলহ লাগিয়া থাকিত। শৌর্য্যে, বীর্য্যে রাজপুতেরা নিজেদের

লোক প্রমাণ করিয়া উহার অনেকটা অংশ অধিকার করিয়া লয়। মুসলমান সৈন্যের আগমনকালে দিল্লী, কনৌজ, আজমীর, বুন্দেলখণ্ড ও গুজরাত ইত্যাদি প্রদেশ রাজপুতবর্গের কবলে ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব আদৌ ছিল না। গুজরাতী বা বুন্দেলারা সাধারণতঃ দিল্লীর বা কনৌজের রাজাদের অনুরাগী ছিলেন না, বরং যখন সুবিধা পাইতেন তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। আর দিল্লী ও কনৌজের রাজাদের ত কথাই নাই। তাঁহাদের মধ্যে কিরূপ একপ ঈর্ষ্যাভাব বাস করিয়াছিল যে মুহম্মদ গোরী লাহোর হস্তগত করিয়া আরও পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছেন ইহা জানিয়াও তাঁহারা নিজেদের হিংসা হইতে বিরত হন নাই। ফলে যখন মুহম্মদ দিল্লী সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন, কেবলমাত্র রাজপুতবর্গের চৌহান শাখাই যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়, কাজেই দিল্লী মুসলমানদিগের সহজেই অধিকৃত হয় এবং ইহার মাসকয়েক পরে আজমীর এবং কনৌজও সহজেই বিজিত হয়। ইহা হইতে আপনারা ভারতবাসীর পরাজয়ের প্রধান কারণ কি ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। মুষ্টিমেয় রাজপুত ছাড়া অন্য শ্রেণী বা জাতির মধ্যে দেশপ্রেম আদৌ ছিল না।

এই যে অরাজপুতবর্গের মধ্যে নির্লিপ্ততার ভাব দেখিতে পাই ইহাই আমাদের অধঃপতনের এবং তৎসঙ্গে আজ পর্য্যন্ত দাসত্বেরও কারণ। সেকালে নাগরিকেরা যেমন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিমুখ থাকিত মফস্বলবাসীরা তেমনি নিজেদের গ্রামের কাজে ব্যস্ত থাকিয়া দিন কাটাইত। যদি তাহারা একজোট হইয়া গ্রাম সম্বন্ধীয় কার্য্যে সকলের যোগদান করিত, না হয় নিজেদের চাষবাসে নিযুক্ত থাকিত। তাহার ফলে যখন পাঁচশত বৎসর পরে মুসলমান শাসনের অবসান হইল তখনও পল্লীবাসীরা নিজেদের গ্রামের সাধারণ কাজেই এত লিপ্ত যে অন্য কোনও দিকে দৃকপাত করিবার অবসর তাহাদের ছিল না। পল্লীবাসীদের এই চিরন্তন ভাবই বিশেষ লক্ষণীয়।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে মুসলমান রাজকর্ম্মচারীরা গ্রামবাসীদের কাজে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিত না। গ্রামবাসীর সহিত কর্ম্মচারীদের খাজনা আদায় পর্য্যন্ত সম্পর্ক ছিল। ইহা আদায় হইয়া গেলে তাহারাও গ্রাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। কতকটা এই কারণেও আমরা আজও দেখিতে পাই যে সেই পুরাতন গ্রামের পটওয়ারী,চৌকিদার, মুখিয়া বা মুকদ্দম ও গ্রামের পঞ্চায়ত গ্রামের রক্ষণ করিতেছে।

যখন মুসলমানেরা প্রথম ভারতবর্ষে আসে তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় থাকায় বাধ্য হইয়া হিন্দুধর্ম্মকর্ম্মের প্রতি উদার পন্থায় প্রবর্ত্তন করে। হিন্দুদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা, ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাসকলের শ্রীবৃদ্ধি করা, এমন কি তাহাদের ধর্ম্ম সকল সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ না করা এই সকল নীতির প্রতি মুসলমানদের লক্ষ্য ছিল। তবে মুসলমানরা সাধারণতঃ বেশ গোঁড়া, সেজন্য মধ্যযুগেও তাহাদের গোঁড়ামির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা নিকটস্থ হিন্দু রাজাদিগের বিষয় করিয়া তাহাদের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লওয়া, কিম্বা হিন্দু প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা বা তাহাদের মন্দিরাদি ধ্বংস করা ইত্যাদি।

মুসলমানেরা যে উদারপ্রকৃতির ছিল তাহার দুএকটী দৃষ্টান্ত এই স্থলে দিতেছি। মুহম্মদবিনবখ্তিয়ার যখন বাঙ্গালার দেশে আসেন তখন তাঁহার প্রথম কার্য্য বিহারশরিফে মুসলমান হইতে উচ্চ আসনের মধ্যে "আ ইয়াহা কিল্ দিনে" এই কথাটী আছে। ইহার অনুবাদ এইরূপ "ধর্ম্ম কোনও প্রকারের জোর জুলুম বা অবরদস্তি নাই।" তাই যখন পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর মুহম্মদ গোরী দিল্লী অধিকার করেন তখন হিন্দুদিগকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। আমার কৌশম্বীপুর ও বিজাপুর যখন স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হয় সেখানেও প্রথম হইতে কোনও একটী বড় মসজিদে ঐ বাক্যটী ক্ষোদিত করিয়া মুসলমানবর্গকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহারা যেন হিন্দু প্রজার প্রতি কোনও প্রকার গোঁড়ামি না দেখায়।

এ সম্বন্ধে আর একটী দৃষ্টান্ত দিব। মুঘল বাদশাহেরা বেশ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। বাবর ও হুমায়ূঁর মৃত্যি ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তবুও তাঁহারা অন্য ধর্ম্মের প্রতি বা ইস্লাম ধর্ম্মের অন্য শাখার প্রতি কোনও প্রকারের বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ করেন নাই। বাবর নিজ জীবনচরিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে গোয়ালিয়রে হিন্দুমন্দিরাদি দর্শন করিয়া তিনি আনন্দ বোধ করেন (enjoyed); আগ্রায় বিহার অভিযান পথে একস্থানে ইহা দেখেন যে মুসলমানেরা হিন্দু যোগীর নিকট ধর্ম্মশিক্ষালাভ করিতেছে; তাহাতেও কোনওরূপ নিষেধাত্মক বিধান প্রচার করেন নাই।

মুঘল বাদশাহদিগের মধ্যে প্রথম তিন জনের রাজত্বকালে ইঁহাদের শাহ মৃত্যিবর্গের উপরে অতিমাত্রায় অত্যাচার করিতেন এবং প্রতিফল-স্বরূপ মৃত্যি সাম্রাজ্যগুলিও (যথা তুরস্ক গ্রীসের ও মধ্য এসিয়ার খলতানেরাও) শিয়া ধর্ম্মের উপরে বাবাতাবে অত্যাচার করিতেন। ফলে এই সকল প্রদেশের মুসলমান শিয়া মৃত্যিরা (minority) নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে বসবাস করিবার জন্য আসিতে লাগিল।

এই উদারনীতির ক্রমোন্নতি যদি আকবরের সময়ে ইলাহি ধর্ম্মে দাঁড়ায় তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে? যদিও আকবরের মৃত্যুর পরে ইলাহি ধর্ম্মের কথা বড় একটা শোনা যায় নাই, তথাপি জাহাঁগীর অনেকটা এবং শাহজাঁ কতকটা আকবরের পদানুসরণ করিয়াছিলেন। ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে আলমগীর বাদশাহ এত পণ্ডিত ও বিচক্ষণ হইয়াও হিন্দু বিদ্বেষনীতি অবলম্বন করেন এবং মারাঠা, রাজপুত, বুন্দেলা, জাঠ ও শিখদের অসন্তুষ্ট করিয়া তাহাদের বিদ্রোহী হইবার সুযোগ দেন। ইহারই পরে মুঘল রাজ্যের অবসান হয়।

আরও দু একটী কথা এই প্রসঙ্গে বলিতে চাহি। প্রথমতঃ যে যুক্ত প্রদেশে ভারতের মুসলমান বাদশাহদের রাজধানী স্থাপিত ছিল সেই প্রদেশে আজও মুসলমানের সংখ্যার হিন্দুর তুলনায় অতি অল্প। কেবল মাত্র পঞ্চমাংশ হইবে বা পরের। যদি মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিত তাহা হইলে কি তাহারা সংখ্যায় এত অল্প থাকিত?

আর একটী কথা। ইতিহাস আমাদের ইহাই বলে যে বাদশার ক্ষুদ্রতম বৃথাক্রমের জন্য ঐকৃষ্ণের মৃত্যুর অল্প দিনের মধ্যে দায়িত্ব হয়। আজিকার সমৃদ্ধিশালী বৃথাক্রমের সংবাদসহও মুখন মুগেই হইয়াছে। হয় বড় বড় পুরাতন মন্দিরাদি আজ সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় কোনটাই তাহার বোল খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের নয়। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে কি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না যে দিল্লীর মুসলমান বাদশাহেরা সকল সময়ে খোঁড়ামির পক্ষপাতি ছিলেন না বরং উদার নীতিই অবলম্বন করিতেন।

এইবার মধ্যযুগের আইন সকল ও ছিরকার্য্য বিষয়টী ধরা যাউক। পুরাতন বা চলিত আইনের সংশোধন ও নূতন বারা প্রবর্ত্তনের কথা সেকালে উঠিতই না। কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই পূর্ব্ব প্রচলিত সনাতন রীতিই অচিরাৎ মানিয়া লইতেন। হিন্দুরা শাস্ত্রের ও মুসলমানেরা কুরাণ শরিয়তের দোহাই পাড়িতেন। যতক্ষণ কোনও মামলার দুই পক্ষই এক সমাজভুক্ত থাকিত ততক্ষণ কোন গোল বাধিত না। হিন্দুরা আপনাদের পঞ্চায়ত দ্বারা অথবা মুসলমান নির্বাচিত পণ্ডিতের দ্বারা সুবিচার পাইবার চেষ্টা করিতেন ও মুসলমানের বিচার কাজি বা মুফ্তি কখনও কখনও হুসতাম নিজে করিতেন। গোল বাধিত যখন বাদী ও প্রতিবাদী ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেন। আপনারা অনেকেই জানেন যে মুসলমানেরাও কয়েকটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত যথা সুন্নি, শিয়া, ইস্মাইলিয়া, মুতজলা, মহদবী, বহরা বা খোজা ইত্যাদি এবং বিবির দিক দিয়াও তাহাদের মধ্যে কয়েকটী বিভিন্ন দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। যথা—হনফি, শাফিই, হম্বলি ও মালিকি। দিল্লীর মুসলমানেরা বিভিন্ন দলের জন্য পৃথক পৃথক কাজির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তবে যখন এক দলের সঙ্গে অন্য দলের বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ঘটিত তখন মুন্সি মুসলমানেরা কখনও কখনও অন্যায় করিয়া বসিতেন। হিন্দু জনার প্রতিও কখনও কখনও অন্যায় করা হইত। তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। মুসলমান মজলিসে যদি হিন্দুরা গিয়া বসে তাহাতে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মসভায় মুসলমান গেলেই উহা মহা মুসীবত তাজ হইত। বিদ্যোৎসাহী কতকটা এই কারণে একজন ব্রাহ্মণকে পোড়াইয়া মারেন। কাশ্মীরে সাহজাহ বাদশাহের পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান পরিবারের মধ্যে বিবাহাদির প্রচলন ছিল ও সেই সঙ্গে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে স্বামী ও স্ত্রী কতকটা স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া চলিবেন। এমন কি স্ত্রী যদি হিন্দু পরিবার হইতে আসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার পক্ষে গরু কোরবাণী করা হইত, যদি মুসলমান পরিবার হইতে আসিয়া থাকে তবে তাহাকে শোর খেতে দেওয়া হইত। পুরুষের প্রতিও ওই নিয়মটী খাটিত। সাহজাহ বাদশাহের ইহা মনঃপুত হইল না। সেজন্য তিনি নূতন করিয়া আজ্ঞা প্রচার করেন যে এই সকল বিবাহ শরিয়ত অনুযায়ী নয় বলিয়া মুসলমান সমাজ এইগুলিকে মানিয়া লইবে না। কেবল সেই বিবাহগুলি বিধিসিদ্ধ স্বীকার করা হইবে—যে স্থলে স্ত্রী হিন্দু ও পতি মুসলমান। কিন্তু যেখানে হিন্দু পুরুষ কোনও মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করিয়াছে সেখানে তার পুরুষ ইস্লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করুক, নয় না হয় সে নিজ মুসলিম স্ত্রীকে ত্যাগ করুক।

মধ্য যুগের ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার বিবৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বেশ একটু নূতনত্ব পাওয়া যায়। যথা মুসলমান সমাজে নরহত্যা করাকে এরূপ গুরুতর অপরাধ মনে করা হইত না যে, তজ্জন্য সমাজ বা রাজকর্ম্মচারীবর্গ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে। ইহা সেই মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান বা উত্তরাধিকারীবর্গের অভিপ্রায় বিষয় ছিল যে, তাহারা আততায়ীর বিপক্ষে বিচারালয়ে মামলা দায়ের করিবে অর্থাৎ এই নালিশ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরাই কেবল করিতে পারিত অন্য কাহারও এই অধিকার ছিল না। ফলে যেখানে মৃত ব্যক্তির কেহ নাবালক পুত্রাদি থাকিত সেখানে অনেক সময় নালিশ করাই হইত না। আবার এমনও হইত যে নাবালক উত্তরাধিকারীরাও হত্যাকারীর নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহার বিপক্ষে মামলা চালাইতে চাহিত না। আবার মামলা বিচারালয়ে দাখিল হইলে এমন চারিটী সাক্ষীর প্রয়োজন হইত যাহারা স্বচক্ষে হত্যাকাণ্ড দেখিয়াছে; মুসলমান আততায়ীর বিপক্ষে কেবল হিন্দু জনসাধারণ থাকিলে মামলা খারিজ হইয়া যাইত। দুইটী হিন্দুর সাক্ষ্য একটী মুসলমান পুরুষের তুল্য ধরা হইত। পিতা মাতার বিপক্ষে সন্তান হত্যার অভিযোগ আদৌ গৃহীত হইত না। আবার কি ভাবে খুন করা হইয়াছে এই প্রশ্নের উত্তরের উপর শাস্তির গুরুত্ব নির্ভর করিত। যদি লোহার অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তবে শাস্তির পরিমাণ অধিক হইত; কিন্তু যদি লাঠি বা অন্য কোনও লঘু অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তবে শাস্তিও লঘু হইত। একবার কোনও দুই ব্যক্তি একটী শিশুকে বালুতির জলে ডুবাইয়া মারে, ফৌজদির বিচারে তাহার অতি অল্প সাজা হইয়াছিল।

কারু শিল্প বা কলা (art) সম্বন্ধে মুসলমান বাদশাহদিগের যেটুকু উপর দৃষ্টিপাত করিতে হয়। যদিও ইস্লামে প্রথম প্রথম কলার বিশেষ আদর ছিল না ও মুসলমানও ইহার সেবকতা করিতে চাহিতেন না তবুও ভারতবাসীরা মধ্য যুগে ঐ বিদ্যার কয়েকটী শাখাতে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। প্রথমে স্থপতি বিজ্ঞান বা Architecture ই ধরা যাউক। মুসলমানদের ভারত আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবাসীরা এই শাখায় প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছিল। মুসলমান পরিব্রাজক অল্ বরুনি মহমুদ গজনীর মথুরা আক্রমণ কালে সেখানকার বড় বড় প্রাসাদ মন্দিরাদি দেখিয়া অবাক্ হইয়া যান ও নিজ বিবরণে উল্লেখ করেন যে এমন অপরূপ নির্ম্মাণ করা ত দূরের কথা, মুসলমানেরা কল্পনাও করিতে পারে না। তাই মুহম্মদগোরী যখন তার পৃথ্বীরাজের শেষে দিল্লী অধিকার করেন তখন হিন্দু শিল্পীগণের সাহায্যে তাঁহার কর্ম্মচারী কুতুবউদ্দীন ও পরবর্ত্তী লোকেরা সুবিশাল তখন প্রাসাদ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করান। যাঁহারা দিল্লী গিয়াছেন তাঁহারা কুতবউল্-ইস্লাম মসজিদ, কুতুবমিনার, ইলতুতমিসের সমাধি সৌধ-ই-সমশি ইত্যাদি দেখিয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে এগুলি কিরূপ কারুকার্য্যখচিত। এইগুলি মুসলমানের, না হিন্দুর দ্বারা

নির্দিষ্ট এখানে সে কথা তুলিয়া লাভ নাই। ইহা যে ভারতবাসীর দ্বারা নির্দিষ্ট ইহাই জানিলে যথেষ্ট হইবে। মুসলমানেরা এইরূপ কারুকার্য্য ভারতবাসীর নিকটেই শিখিয়াছে। এই শিক্ষার ফলেই কয়েক শতাব্দী পরে আমরা হুমায়ুৎ সুলতান হর্ম্মাবলী ও সমাধির পরিকল্পনা দেখিতে পাই। আগ্রা ও দিল্লীর মোতিমস্‌জিদ্‌দ্বয়, সেকন্দার, হুমায়ুঁ, আকবর ও ইতিমাদ্‌ উদ্দৌলার সমাধিগুলি, তাজমহল, আগ্রা এবং দিল্লীর প্রাসাদগুলি চলতে অনুকরণীয় ও মধ্যযুগের সংস্কৃতির পরিচায়ক।

যেমন স্থপতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা হইল তেমনি অন্যান্য শাখার বিষয়ে বলা যাইতে পারে। সঙ্গীতশাস্ত্র, চিত্রকলা, মিনা করা বাসনের উপর কারুকার্য্য (enamel painting), চিত্রাপল দিয়া (mosaic work) অন্তর দাঁত, সূক্ষ্ম স্বর্ণ বা রৌপ্য তারের কারুকার্য্য (filigree work), পুস্তকাধারের কারুকার্য্য (artistic book cases), জরীর বুটাদার বেশমী কাপড় (brocade), সূক্ষ্ম মল মল ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভারত তখন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আজ আমাদের এই দুর্দ্দিনে এ সকল স্বপ্নবৎ মনে হয় ও হৃদয়ে একটা অনুশোচনা জাগে যে সেদিন কি আমার ফিরিয়া আসিবে!

এইবার সেকালের সমাজের দু একটি দোষ দেখাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। প্রথমতঃ স্ত্রীলোকেরা রাষ্ট্রের ব্যাপারে বড় একটা হস্তক্ষেপ করাটা আদৌ সুনজরে দেখিত না। রাজিয়া ইলতুৎ মিসের উপযুক্ত প্রমাণ হইলেও তাঁহি স্বল্পকাল শাসন করিতে সক্ষম হন নাই। সংযুক্তার সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহের পর হইতেই রাজা রাজ্যশাসনে শিথিলতা দেখান। আলাউদ্দীনের স্ত্রী ও শাশুড়ী সুলতানের মহা অশান্তির কারণ ছিলেন। নুরজাঁকেই জহাঁগীরের রাজ্যের অবনতির কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। অবশ্য দু চারিটী দেবীপ্রতিম নারীও এই সঙ্গে দেখিতে পাই—যথা মুসলমান যুগালোকের মাতা নবযুবা-ই-জহাঁ, সন্ন্যাসিনী-মীরাবাই, নূরজাহ বেগম ও জাহানারা। তবে ইহারা কেহই রাষ্ট্রের ব্যাপারে বড় একটা যোগ দেন নাই, কেবলমাত্র পরামর্শদাত্রী বা নানা-প্রকার পুণ্য কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতেন।

মুসলমানেরা পঞ্চ শতাব্দী যাবৎ রাজ্যশাসন করিয়াও পরিশেষে ছই পরবর্ত্তিত হিন্দুপ্রজার নিকটেই পরাজিত হয়। ইহার একটী কারণ এই যে তাহারা সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে মন দেয় নাই। যদিও তাহারা ভারতবর্ষকেই নিজেদের আবাসভূমি বলিয়া স্বীকার করে তবুও আকবর ছাড়া অন্য সুলতানেরা হিন্দু প্রজার সহিত কোনওরূপ সৌহার্দ্য-পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ পৃথক রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা হিন্দুবিদ্বেষের অবতার চক্ষে দেখিতেন, তাহাদের কাফের বলিয়া ও তাহাদের বধ করিয়া, তাহাদের নরকে পাঠাইয়া নিজেরা স্বর্গবাসী হইতে পারিয়াছেন ভাবিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। কেবল আবুল ফজলেতে এই দোষ দেখা যায় না এবং তিনিই অনেকটা আকবর বাদসাহকে উদার নীতির দ্বারা চালাইতে উৎসাহিত করেন এবং হিন্দুমুসলমানের জন্য সকল প্রকারের ভেদগুলি ঘুচিয়া ফেলিতে পরামর্শ দেন। এই নীতি যদি মুসলমানেরা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে মুঘল সাম্রাজ্য এত শীঘ্র অন্তর্হিত হইত না।

অন্যদিকে হিন্দু প্রজারাও এমন নিশ্চেষ্ট ভাবে জীবন যাপন করিত যে, রাজধানীর কোনও সংবাদ তাহারা রাখিত না। মুসলমান, কৃষ্ণ কারাগারে বাঁচিয়া আছে না মরিয়া গিয়াছে, যারা সিকোর আরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী বা পরাজিত হইল এরূপ কোনও রাষ্ট্রীয় খবর লইয়া তাহারা মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত ছিল না। আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দূরদূর অঞ্চল প্রদেশে যখন শিবাজী তাঁহার মারাঠা বল লইয়া স্বাধীনতার হিন্দু বিজয় পূর্ণ নীতি সকলের প্রতিবাদস্বরূপ মস্তক উত্তোলন করেন তখনও উত্তর ভারতীয়েরা তাঁহার সহিত বড় একটা যোগ দেয় নাই। মারাঠারাও আরঙ্গজেবের সময় বা বাদশাহের মৃত্যুর পরে নিজেদের কর্ত্তব্য কেবল এইটুকু মনে করিতেন যে, মহারাষ্ট্র দেশবাসীরা যেন সুখে দিন যাপন করে। ভারতের সকল হিন্দু নেতা একযোট হইয়া কোনও দেশহিতকর কার্য্যপদ্ধতির অবতারণা করেন নাই। মারাঠারা যদিও নিজেদের হিন্দু পদপাদের মুক্তিদাতা বলিয়া প্রচার করে তবুও উত্তর ভারতের বিরাট কৃষকবর্গের বিপুলিত অর্থদ্বারা মহারাষ্ট্র প্রদেশের উন্নতিতে ব্যস্ত থাকিত। ফলাফল ইহার ফল বিষময় হয়। মারাঠারা মুঘল সাম্রাজ্যের বিনাশ করিতে অবশ্য সক্ষম হয় কিন্তু তদস্থলে নিজেদের কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য স্থাপিত করিতে সক্ষম হয় নাই। যেমে হিংসা ও বিদ্বেষের প্রাদুর্ভাব এত অধিক পরিমাণ ছিল যে, ঐতিহাসিকেরা বলেন, পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে যত না মারাঠা সমর-ক্ষেত্রে হত হইয়াছিল তাহা হইতে বহু অধিক সংখ্যক পরাজিত ও পলায়িত মারাঠা হিন্দু কৃষকের হস্তে প্রাণদান করে। মারাঠা বা অন্য কোন হিন্দু ইহা উপলব্ধি করে নাই, এই পরস্পর শত্রুতার ফল ইহাই হইবে যে, শীঘ্রই কোন বিদেশীয় শক্তি আসিয়া তাহাদের সকলেরই উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। রাষ্ট্রীয় নিশ্চিন্ততাই হিন্দুদিগকে অতিসহজেই এই মুষ্টিমেয় ইংরেজ বিদেশীর শাসন মানিয়া লইতে সক্ষম করায়।

যাত্রী

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র এম-এ

হরিনাথা শুভ্র নভে
মেঘে আসে বিদায়ের কাল যবনিকা—
পূরবের পাণ্ডুর গগনে
জেগে ওঠে আজ দীর্ঘ মৌন শশীলেখা।

ধূলিম্লান ধরণীর উদ্‌ভ্রান্ত পথিক—
পথ চলে অতন্দ্রিত উদাসী নির্ভীক।
যাত্রা তার হ'ল যা যে শেষ—
একটী প্রদীপ শুধু তারি লাগি জ্বলে নিরুদ্দেশ।

সার্বজাতিকতা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(১)

লক্ষ্মণ সেনের বুদ্ধি প্রখর, মেধা সক্রিয়, এ কথা তার শত্রুপক্ষকেও স্বীকার করতে হয়। ঐ প্রখরতা এবং ক্রিয়াশীলতা পরিলক্ষিত হয়েছিল তার তারুণ্যে নাম-পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায়। লক্ষ্মণ ত্রেতার নাম, সেন সংযোগেও খৃষ্টীয় একাদশ শতকের। এ দিনে ও নাম বিশেষত্ববিহীন। তাই ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রাক্কালে, অবশ্য পিতার অনুমতি নিয়ে, যে নিজের নামকরণ করেছিল—অমিয় সেন। অমিয় সৃষ্টির চিরসাথী! অমিয়র অপভ্রংশ অমি শব্দটা মোটেই শ্রুতি-কঠোর বা বাজারে নয়। কিন্তু লক্ষ্মণের ডাকনাম লকা—ওঃ সর্বনাশ।

তার মেধার অগ্রগতির পথ ছিল প্রতি পদে যৌক্তিক। বন্ধু আমার—বলতে তার বাক্যে বাণীর আশীষ মূর্ত হ'ত। কিন্তু তার রুচি প্রকটিত হত কাবুলী মেওয়ায়, ধোবাই ছিটে, মাদুরা সাড়িতে, পাঞ্জাবী পিরাণে এবং পাটনাই মুগুর ডালে। নারীর রূপ সম্বন্ধে তার বচন বাঙ্গালিনা-কোমলতার প্রশংসা-মুখর ছিল। কিন্তু অন্তরাত্মা পশ্চিম-ভারতের বলিষ্ঠা সুন্দরীর চঞ্চল-চল-চরণ-ভঙ্গে মুগ্ধ হ'ত। এমন কি নেপালিনী দেশ-চানী এবং ভুটিয়ানীর স্বাধীন নির্ভয় চলন ও চাহনী তার প্রাণে ব্যাকুলতার লহর তুলতো। সাহস ও স্পষ্টবাদিতার উপর প্রবন্ধ লিখে শ্রীমান অমিয় সেন এক প্রতিযোগিতায় পারিতোষিক লাভ ক'রেছিল। কিন্তু সংসারের নিত্য-চলার-পথে সে ঐ সদ্‌গুণ দুটিকে ব্যবহার করত না। যা উত্তম তা প্রত্যহ ব্যবহার্য নয়। কাঁসার থালায় দৈনন্দিন ভোজন চলে—কিন্তু সোনার থাল বিশেষ দিনের সামগ্রী। সূর্য্য চক্ষুষ্মান্ বলে দেখা যেন না কারণ তিনি সৃষ্টির আদি কারণ। সাহস সম্বন্ধেও শ্রীযুক্ত অমিয় সেনের ঐ প্রকার ধারণা। নিত্য সাহস দেখিয়ে অপ্রিয় কলহের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করা অন্যায়। স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই, কারণ সোজা কথা বলতে মেধার উদ্ভাবনী শক্তির অপচয় অনাবশ্যক।

এই সব ভিন্ন মুখ ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে নিজের সুকুমার যৌন বুদ্ধি প্রতিহত হত কাব্য জীবনসঙ্গিনী অনুসন্ধানের ব্যাপারে। সে বুঝেছিল পশ্চিমের সুন্দরী ক্ষত্রী কন্যা-পাণি-গ্রহণের প্রস্তাবের অনিবার্য্য ফল হবে অবমান ও প্রত্যাখ্যান। নেপালী গুলা খুকরী নিয়ে ঘোরে। তাদের সমাজে সাথী নির্বাচনের অভিধান রক্তারক্তি কাণ্ডে পর্য্যবসিত হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। অথচ বাঙ্গালী কুমারীর চিত্তকুঞ্জে প্রেম ভিক্ষার রোমাঞ্চ নাই। একদিন এ সব আলোচনার পর তার অন্তরঙ্গ সুধীরকুমার বলে—তুমি নিরেট ইডিয়ট, রাগ কর না অমিয়। তাদের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ—

অমিয় বাধা দিয়ে বলে—গালাগালিতে আর্ট নেই। চীন ভাষায় তর্জমা করলে এ গান চীন জাতির পক্ষে সত্য। কিন্নরী গ্রীসের জঙ্গলীদের মাতৃস্নেহ পবিত্র। বিস্তারের রহস্য নূতন শক্তির অর্জন। বাপ পিতামহ সবাই তো বাঙালীর ঘরে বিবাহ করেছে যার ফলে—যাক্।

সুধীর ছাড়বার পাত্র নয়। সে বলে—মোগোলের প্রপিতামহী কি বৃদ্ধ-প্রপিতামহী কবে কোন যুগে পর্তুগীজ বিয়ে করেছিল, যার ফলে—যাক্।

তর্ক মতিগতি ফেরাতে পারে না। সেক্ষেত্রে অমিয়কুমার মুষ্টি-যুদ্ধে পরিণত করলে না বাক্‌যুদ্ধকে। মুচকী হেসে সে আলোচনা বন্ধ করলে। প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হ'ল। তর্ক উঠ্‌লো ছাগ কেটে দেবী কুকুরকে আশৈশব মাংস খাওয়ালে তার সাহস বাড়ে কিনা।

(২)

যিনি খান্ চিনি, তাঁকে জোগান চিন্তামণি। গ্রীষ্মের অবকাশে অধ্যাপক অমিয় সেন খাসিয়া পাহাড়ে বাস করবার সময় জীবনের অনেকগুলা সমস্যা সমাধানের সঙ্কেত সহজ দৃষ্টিতে দেখলে। বাঙলার মত দেশ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু শিলঙের বায়ু শীতল, চারিদিকে স্রষ্টার আপন তুলিতে আঁকা ছবি। এমন চিত্র অন্য কোথাও নয়নপথে পড়ে না। দার্জিলিঙ সুদৃশ্য। কিন্তু স্যানিটেরিয়াম হতে জলাপাহাড়ে উঠ্‌তে বুকের ধড়ফড়ানির

কাতর সঙ্গীতে সকল সৌন্দর্য্যের ছন্দ যে-সুরে যে-তালে হয়। খাসিয়া পাহাড়ে কদম কদম বাড়ায়ে যেতে হৃদ্‌পিণ্ড পদে পদে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রোপাগাণ্ডা করে না। আর হৃদয়ের কথাই যদি উঠ্‌লো—দক্ষিণে বামে ইত্যাদি ইত্যাদি দশ দিকে সুন্দরী খাসিয়া যুবতী অবলীলাক্রমে বিচরণ করছে।

খাসিয়া মহিলার রূপে, হাবে বা ভাবে উগ্রতা নাই। শিল্প গোপনই শিল্পের সার্থকতা। সে নিজের প্রকৃতি-লব্ধ সৌন্দর্য্য এবং বস্ত্র-শিল্পীর নিপুণতা ঢেকে রাখে নিজের দেহলতাকে চাদর দিয়ে। ঘেরাটোপের অন্তর হ'তে মেখলা উঁকি মারে। মেখলা সুশ্রী পুষ্ট দেহের আবরণ।

যোগাযোগ অনাগত কালের সঙ্কেত। যখন বড়-বাজারে পণ্য-দ্রব্য এবং পসারিণী দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রফেসার অমিয় সেন হঠাৎ মিঃ জেকবের সাক্ষাৎ পেলে, ভাবী-কালের অঙ্কে যেন ঝলক দিয়ে বিজলী লিখলে—সুলক্ষণ। জেকব তার সহপাঠী। কলিকাতার কলেজে উভয়ে এক শ্রেণীর ছাত্র ছিল। মাত্র মুখ-চেনা সহপাঠী—জেকবের ঘর বাড়ি বা জাতীয়তা সম্বন্ধে অমিয়র কোনো ধারণা ছিল না। মোটামুটি জানা ছিল, জেকব খৃষ্টান। তার রক্ত-পরীক্ষায় কোন জাতির রক্ত পাওয়া যাবে সে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে অমিয় বা তার দলের ছাত্রদের মস্তিষ্কে কোনোদিন লহর ওঠেনি। জাপান হ'তে বোম্বাই অবধি সকল প্রদেশে নাসিকার বহু বিভিন্নতা প্রতিভাত হয় পরীক্ষার ফলে। আজ অমিয় সেনের আত্ম-গ্লানি হ'ল—জেকবের জাতীয়তার অজ্ঞতার অভিযোগে। যা কাঁচের মত স্বচ্ছ, তার অনুপলব্ধি মারাত্মক। সত্যই তো এর নাসিকা অনার্য্য।

"হ্যালো মিঃ জেকব।"

"আহা! মিঃ সেন।"

প্রথম উচ্ছ্বাসের অবসানে সেন বল্লে—তুমি শিলঙের লোক, এ কথা আমি পূর্ব্বে জানতাম না।

জেকব মাত্র হাসলে। তার অনভিদূরে আর একজন গোপনে হাসলে। সে জেকবের ভগ্নী এল্‌সী। কিন্তু অগ্রজের সহপাঠীর সহসা দৃষ্টি এড়িয়ে শ্রীমতী এল্‌সী আত্ম-গোপন করতে পারলে না। তাদের চারি চক্ষুর মিলন হ'ল। এল্‌সি তাড়াতাড়ি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে পাশের বিপণীর গুবাকে। অমিয় দেখলে নিচে মাংসের দোকানে কাটা শূকরের মুণ্ড। জেকব দেখলে দুজন লজ্জিতকে।

সে তাড়াতাড়ি তাদের পরিচয় ক'রে দিলে। এল্‌সি লেডী কীন কলেজ হ'তে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে কলিকাতার মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হবার চেষ্টা করছে।

সে তো সোজা কথা। অমিয়র পিতার বন্ধু প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার পঞ্চানন চাটুজ্যে মশায়ের অন্তরঙ্গের আত্মীয়। তাঁর সহায়তা মেডিক্যাল কলেজের রুদ্ধ দ্বারের চিচিঙ্‌ ফাঁক মন্ত্র।

এল্‌সি কৃতজ্ঞতা জানালো অমায়িক সরল হাসি হেসে। তার পর তারা তিন জনে হাটের ভিড়ে ঘুরে বেড়ালে। অমিয় সেন লক্ষ্য করলে শ্রীমতী এলসী এবং আদিম খাসিয়া পসারিণীর পার্থক্য। পোষাকের আকার প্রকারে বিভিন্নতা। এলসীর পায়ে মোজা-জুতা, অন্যরা নগ্নপদ। তাদের বর্ণ গৌরবর্ণ, শ্রীমতী জেকবের ঘরে সংরক্ষিত দেহের বর্ণ গৌর, স্বচ্ছ মসৃণ। ওদের মুখ তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত, দেশের বন্ধু-ভগ্নীর অধর এবং ওষ্ঠ স্বাভাবিক সুস্থতার রঙে রাঙা। তাই শিক্ষিত অমিয়র চিত্ত প্রসন্ন হ'ল। প্রসাধন ভালো, যদি তা শিল্প-বিমুখ না হয়।

(৩)

ক্রমশঃ অমিয়র সকাল সন্ধ্যার গন্তব্য স্থল হ'ল মোথারে জেকব-কটেজ। এরা শিক্ষিতা। গৃহ-সজ্জায় উগ্রতা নাই। বিলাতী ভাব ঢুকেছে—যে ভাবের অভাব নাই শিক্ষিত বাঙ্গালী গৃহে। শিলঙে যা কিছু দ্রষ্টব্য, তা দেখলে অমিয় শ্রীমতী এল্‌সী জেকবের এবং শ্রীমান জন জেকবের সাহচর্য্যে। একদিন মিস জেকব বল্লে—মিষ্টার সেন লেডী কীন কলেজ দেখবেন না? ওখানে অনেক বাঙ্গালী ছাত্রী আছে, অধ্যাপিকা আছেন।

ঐ কারণগুলাই ছিল অধ্যাপক সেনের প্রতিবন্ধক। পথের মাঝে বাঙ্গালী দেখলে তার গা ছম্ ছম্ করত। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব, কথা-বার্ত্তায় একটু অনবধানতা বা অপ্রিয়তার চিহ্ন তার মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করত। পাছে তার খাসিয়া সঙ্গিনী বাঙালী জাতি সম্বন্ধে মন্দ কথা ভাবে। বাঙ্গালী চরিত্রের অন্য একটা দিক্ তাকে শঙ্কিত করত। স্বজাতি সাহিত্য এবং গানে নিজের বিদ্যা বুদ্ধির বিজয়-ডঙ্কা বাজায় বটে, কিন্তু তার বাহিরের

চাক-চিক্যের নীচে বিরাট অন্ধকার। তারা বাঙালার বাহিরের লোককে সমুচিত শ্রদ্ধা করে না। জেকবেরা বাঙালী প্রতিভার প্রশংসক। কিন্তু তাদের দৃষ্টি গভীর হ'লে প্রকাশ পাবে বঙ্গবাসীর আসল রূপ। অবশ্য নিজের কাছে ধরা পড়তো না অমিয় সেনের এ হীনতার শঙ্কা। অন্যে এমন কথা কহিলে সে বলতো, সেটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। কিন্তু অধুনা তার আশঙ্কা, পাছে কেহ খাসিয়ার আচার ব্যবহার উপলক্ষ ক'রে নিজের রসপ্রিয়তার পরিচয় দিতে যত্নবান হয়।

তাই একটু ইতস্তত করে সে বলে—ওদের অসুবিধা হতে পারে।

—অসুবিধা কিসের? হোষ্টেলে ওঁরা একেলা থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বাহিরের জগত হতে বিচ্ছিন্ন। আপনার মত কৃতবিদ্য—

বাধা দিয়ে সেন বললে—ধন্যবাদ। তার পর সাহস করে বলে—কৃতবিদ্য কিনা জানি না, তবে গর্বিত কারণ সঙ্গে থাবে শিক্ষিতা সুন্দরী।

এলসীর ঈষৎ হরিদ্রাভ গৌর মুখে সিঁদুর শোণিতের স্রোত পৌঁছে তথায় কমলালেবুর রঙ সঞ্চার করলে! সে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে—ধন্যবাদ। কিন্তু হোষ্টেলে প্রকৃত সুন্দরী বাঙালী আছে শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রীদের মাঝে।

অমিয় বলে—সৌন্দর্য্যের বিচারক দর্শক। আপাততঃ,

কুমারী বাধা দিয়ে বলে—বাঙ্গালী মহিলারা সুন্দরী। ওদের পোষাক ভালো।

অমিয় উত্তর দিল—বাঙ্গালী মহিলার সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে। তার পোষাকে আর্ট আছে। কিন্তু শিলঙে এসে আমার এ গর্ব নাই যে সুরুপার অভাব আছে অন্যত্র। কিম্বা বাঙ্গালীর প্রতিবেশিনী খাসিয়ার দৈনন্দিন জীবনে শিল্পের অভাব।

জেকব-দুহিতা একটু অসোয়াস্তি ভোগের লক্ষণ দেখাচ্ছিল। অমিয় আত্ম-গোপন করতে পারলে না। সে বলে—এল্‌সী তুমি সুন্দরী, তোমার সুষমা অপরিমেয়, তোমার কণ্ঠস্বর মধুর—

অতি ক্ষীণ স্বরে লজ্জাশীলা বলে—এদিকে আসুন একখানা মিলিটারী লরী আসছে।

অমিয় পথের ধারে সরে গেল। একখানা জিপ তাদের পাশ দিয়ে দ্রুত ছুটে গেল। অমিয় মনে মনে দিগের মুণ্ডপাত করলে, কারণ সেই অবকাশে প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে শ্রীমতী বলে—যুদ্ধের পূর্বে আমাদের শিলঙ ছিল শান্তিময়। এই সৈনিক গাড়িগুলা পথের নিরাপত্তার ভঙ্গ করেছে।

অমিয় বলে—হুঁ।

কুমারী বলে—শুনেছি কলকাতা এদের জন্য বিপদসঙ্কুল।

সেই বিপদের কথা হল আপদ। যে গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করেছিল মিঃ সেন, গাওনা সে সুরে আর জমাতে পারলে না। আর সব কথা হল অবান্তর। প্রসঙ্গ ঘোরপাক খেয়ে ফৌজী গাড়ির নির্বিচার বেগের মাঝে পড়লো।

(৪)

যেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনতি-উচ্চ শৈলের গা বেয়ে উঠে অমিয় নূতন সহচরী এলসী সমবিভ্যাহারে লেডী কীন্ কলেজে ছাত্রী নিবাসে গেল, তার অভ্যর্থনা হল প্রচুর। কলিকাতার কলেজের নবীন অধ্যাপক অমায়িক বাক্-পটু হাস্য-মুখ অতিথি, মহিলাদের আতিথ্যে তুষ্ট হল। সে কলিকাতার বহু গল্প করলে। জহরলাল শিলঙে গিয়েছিলেন। কিন্তু কলিকাতার সুভাষ দিনে তাঁর সম্বর্দ্ধনার কথা শুনে অধ্যাপিকা মিস সেন আকুল হলেন। সে সময় তিনি ছিলেন ঢাকায়। যখন শ্রীযুক্ত অমিয় সেন বুঝলেন সমবেত মহিলামণ্ডলীর কেহই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অভ্যর্থনার দিনে কলিকাতায় ছিলেন না, তার ফেনিল উচ্ছ্বাস বহুরূপ সৃষ্টি করলে। ইতিহাস রচনা হিসাবে গল্প ছিল উপাদেয়। কিন্তু সত্যের পরিমাপে তার মধ্যে অত্যুক্তি ছিল না একথা বলা যায় না।

একতো নেতাজীর নামের উল্লেখমাত্রে গল্প জমে। তার পরে আবার কুমারী এল্‌সী জেকব নিশ্বাস বন্ধ ক'রে মিঃ সেনের গল্প শুনছিল। এক্ষেত্রে প্রগল্‌ভতা হয় অনবরুদ্ধ। একবার দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে এলসী বলে—আমি অভাগিনী। জীবনে নেতাজিকে দেখিনি।

মিস বড়ুয়া বলেন—সত্যই তুমি অভাগিনী!

তার পর গল্প হ'ল সার্বজনীন। প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। শ্রীমান জানতেন পড়ে থাকা মিছে, মরে থাকা মিছে। সুতরাং সে বলে—নেতাজির ঐ দেব-দুর্লভ হাসি কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের বিধি

বিগর্হিত আচরণ সহ্য করা না। মহাজাতি সদনের ভিত-গাড়ার দিন, আমি শাইন ভেঙে রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধূলা নিয়েছিলাম। নেতাজী এমন কঠোর ভাবে আমার দিকে তাকালেন যে আমি বিজলীর বেগে স্বস্থানে ফিরে গিয়ে মোমের পুতুলের মত দাঁড়ালাম।

এলসী অভিভূত হ'ল। একে নেতাজী—তার উপর কবি। দুজনের এত কাছে যার গতিবিধি ছিল, সে ধন্য। অন্য মহিলাদেরও প্রসাদ লাভ করলে অমিয় সেন। সুতরাং সভার শেষে কুমারী শর্মা বল্লেন—মিঃ সেন আবার আসবেন।

কুমারী শুপ্তর প্রচ্ছন্ন দুষ্টামী সকলে বুঝলে না, যখন সে বল্লে—এলসী তোমার উপর ভার দিলাম। প্রফেসার সেনকে শনিবারে এখানে এনো।

(৪)

এলসীর জননী সেকালের খাসিয়া মহিলার আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তিনী। তিনি নিজের হাতে গৃহ কার্য্য করেন, স্বয়ং বাজার ঘুরে সওদায় ঝিনিসপত্র খরিদ করেন, আবশ্যক হ'লে পিঠে চোঙা-চুবড়ি বেঁধে শাক সব্জি, আলু কপি নিয়ে আসেন।

একদিন বড়বাজারে ঘোরবার সময় অমিয় দেখলে মিসেস জেকবকে, পিঠে চুবড়ি বাঁধা। তার উপর হ'তে উঁকি মারছে পায়ে দড়ি বাঁধা একজোড়া পাতি হাঁস। চুবড়ির মধ্যে নিশ্চয় ছিল মূলা, চিচিঙ্গ, কপি এবং লাউ। মিঃ অমিয় সেনের দক্ষিণে ছিল এলসি জেকব, বামে ছিল তার এক বন্ধু মিনী লঙ্। অমিয়র দরদী প্রাণে লজ্জা উপজিল, তার সাথে সহানুভূতি। শিক্ষিতা নবীনার জননীর পিঠে ঝুলছে ধুচুনী। কাপড় ময়লা হবার ভয়ে তার নিচে এক টুকরা চ্যাটাই। আধারে খাদ্যদ্রব্য—যা দিয়ে দেহ পুষ্ট করবে তার সুন্দরী সহচরী। অকস্মাৎ বিদেশী বন্ধুর দৃষ্টি পড়েছে এ কথা ভাবলে লজ্জাশীলা শ্রীমতীর মুখ-মণ্ডল কমলা-বর্ণ ধারণ করবে, তার নিজের লজ্জা করছিল, এলসী সে লজ্জায় মুইয়ে পড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? মায়েরা কু-সংস্কারের বশে নানা রকম গর্হিত কাজ করে। শিশু আসবার প্রাক্কালে তার নিজের মা, মা কালীর নাম ক'রে তার শিরে স্পর্শ করিয়ে ছিলেন একটি চকচকে আধুনিক খাদি রূপার টাকা। কিন্তু পিঠে বাঁশের ঝুচুনী যার অন্তর হ'তে উঁকি মেরে পাতিহাঁস প্যাক প্যাক করছে! বিড়ম্বনা।

এলসীর এ দীন দর্শনের দুর্দশা এড়াবার জন্য, অধ্যাপক সেন অন্যদিকে তাকিয়ে বল্লে—আচ্ছা এলসী ঐ উঁচু পাথর কতকগুলা ওখানে পোতা রয়েছে কেন?

কিন্তু এ দুঃখ-ত্রাণ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দেবার পূর্বেই তার দৃষ্টি পড়েছিল জননীর উপর। শ্রীমতী মিনীও দর্শন লাভ করেছিল এলসী জননীর। সে খাসিয়া ভাষায় কিছু বল্লে বান্ধবীকে। তার পর দুটি সুহাসিনী বিস্মিত বাঙ্গালী নবীনকে উপেক্ষা ক'রে ছুটে গেল বর্ষীয়সীর দুদিকে। তারা চুবড়ির গভীরে অনুসন্ধানরতা। তিনজনের দারুণ ফূর্ত্তি।

খাসিয়া চরিত্রের এ বিকাশ শ্রীমানকে লজ্জিত করলো। লজ্জা নিজের দীন মনোবৃত্তির জন্য। সত্যইতো জননীর দীন শ্রমিকার আচরণে তরুণীরা উৎফুল্ল। এ কাজের মধ্যে তারা দীনতা বা হীনতার নির্দেশ উপলব্ধি করলে না। ডিগ্‌নিটি অফ্ লেবার প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ইংরাজি যেন তার চিত্তের গভীরে গজিয়ে উঠলো। আর একটা ইংরাজি প্রবচন সে স্মরণ করলে—লাভ এট ফার্ষ্ট সাইট। সে চিত্ত-পরীক্ষার ফলে বুঝলে—যে প্রথম দর্শনেই সে এলসীর প্রেমে পড়েছে। হাঁ সত্যই সে সরলা খাসিয়াকে ভালবাসে, আজ তার সিদ্ধান্তকে পরীয়ান করলে তরুণীর সংসাহস এবং মাতৃ-ভক্তি।

যখন মহিলাদের মিলন-সুখের উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হ'ল, তাদের স্মরণ হ'ল বিদেশীর অস্তিত্ব। হাস্য-মুখী এলসী তাকে ডাকলে। তার মা অমিয়কে অভ্যর্থনা করলে। খাসিয়া-সুলভ সৌজন্যে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার ভাগনে ভালো আছে?

প্রশ্নে মিঃ সেন একটু থতমত খেলে। তার একরাশি আত্মীয়-কুটুম্ব থাকতে হঠাৎ মহিলা কেন তার ভাগিনেয়র কুশল অনুসন্ধান করলে, এ রহস্য তাকে বিস্মিত করলে।

তরুণী মহিলারা বুঝলে তার অপ্রতিভ অবস্থা।

শ্রীমতী মিনী একটু কম দরদী। তার সহায়তা না ক'রে, অমিয়কে বল্লে—মিসেস জেকব জানতে চাইছেন তোমার বোনের ছেলে কেমন আছে?

শ্রীমতী জেকব-ধরণী বুঝলেন একটা কি কাণ্ড হয়েছে। তাঁর ইংরাজি জ্ঞান অতি অল্প। বাঙলা কিছু বুঝেন।

জানতেন বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করতে হয় পুত্র কন্যার কুশল কিন্তু অমিয় যে অন্য।

এবার এলসীর প্রাণে নিষ্ঠুরতা জাগলো। সে বল্লে—মার কথার জবাব দাও, মিঃ সেন।

তার হাসি দেখে এতক্ষণে অমিয়র বুদ্ধি খুললো। প্রত্যুৎপন্নমতি অমিয়। এক্ষেত্রে স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই। সে বল্লে—মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। আমার বোন ছোট, তার এখনও বিবাহ হয়নি। অতএব ভাগনের কুশলের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এবার বর্ষীয়সী বুঝলেন ব্যাপারটা। তিনি বল্লেন—ওটা আমাদের কথার ধারা।

মিনি বল্লে—যেহেতু জন্ জেকবের বিষয় তার ছেলে পাবে না। পাবে এলসীর ছেলে। সুতরাং ভাগনের স্থান পুত্র হতে আত্মীয়তা হিসাবে নিকটতর।

এবার এলসীর সময় সাধ জেগে উঠলো। সে বল্লে—আর মিনীর মার বিষয় মিনীর ভাই পাবে না, পাবে ওর স্বামী।

মিনী ছাড়বার পাত্রী নয়। সে বল্লে—মিসেস্ জেকব খুব ধনী। মাইনিয়ামে ওঁর অনেক বিষয় আছে, চেরায় দু'খানা বাড়ি আছে। সম্বন্ধ হল মিঃ সেন। সেগুলো আপনার পাওয়ার আশা আছে।

এলসীর মুখে সিঁদুর ছড়িয়ে পড়লো। সে মিনীর নাক ধরে টান্‌লে।

মিসেস্ জেকব ব্যাপারটা বুঝলেন না। তিনি টুকরীর হাঁস, কমলালেবু, বাঁধা কপি এবং তেলা মাছ দেখিয়ে অমিয়কে সান্ধ্য-ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন।

(আগামী বারে সমাপ্য)

জৈন কর্মবাদ

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

গত শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট, মহাশয়ের 'জৈন কর্মবাদ' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ডক্টর লাহার ন্যায় সুপণ্ডিত ও ধর্মীয় ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধ দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম যে কর্মবাদ সম্বন্ধে জৈন-ধর্মের মত সুচিন্তিত ও বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে কিন্তু প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সত্যই মর্মাহত হইয়াছি। মনে হয় ডক্টর লাহা কিছু মনন না করিয়াই প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন। যাহা হউক যে কয়েকটি স্থলে জৈন কর্মবাদের প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত করা হয় নাই আমরা তাহা নির্দেশ করিতেছি।

প্রবন্ধের প্রথমেই লিখিত আছে যে, "জৈনদিগের মতে ব্রত পালন, ভিক্ষু এবং গুরুর সেবা, নিরন্নকে অন্নদান এবং দীন দরিদ্রদিগকে খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তু দানের দ্বারা কর্মকে বিনষ্ট করা যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই সমস্ত দয়াত্মক কার্যের দ্বারা কর্ম বিনষ্ট না হইয়া বরং পুণ্য কর্মের বন্ধন হয় এবং এই পুণ্য কর্মের ফল-স্বরূপ পরবর্তী জীবনে নানা প্রকার সুখ ভোগ করিতে পারা যায়।

তাহার একটু পরেই লিখিত আছে যে, "মানবের দেহ, মন এবং বাক্য পার্থিব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কর্মের সৃষ্টি হয়।" এই বাক্যের দ্বারা যে কি ভাব প্রকাশ করিতেছেন তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন। পার্থিব বস্তু কি? তাহার সংশ্লিষ্ট হইয়া কর্মের সৃষ্টি হয় ইহারই বা অর্থ কি? এই স্থলে কর্ম বন্ধ দ্বারা পরমাণু বুঝাইতেছে কি? তাহা যদি হয় তবে কি কর্ম পরমাণুর নূতন সৃষ্টি হইল এইরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কিন্তু পরমাণু যে অনাদি তাহার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। তাহার পরই আবার লিখিত আছে "রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, ও মানকে প্রভৃতি মিলে কর্ম বিপাক হয়" এই স্থলে "কর্ম বিপাক হয়" ইহারই বা অর্থ কি? রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভকে প্রভৃতি মিলে বা এই সমস্ত কষায়ের দ্বারা অভিভূত হইলে কর্মের বন্ধন হয় কিন্তু 'কর্ম বিপাক' হইবার কোন অর্থই বোধগম্য হয় না।

আট প্রকার কর্মের বিবরণ যে স্থলে দেওয়া হইয়াছে সে স্থলে নবম 'গোত্র' কর্মের বিবরণের জন্য "জাতি, মানবের জীবন, পেশা, বাসস্থান, বিবাহ, খাদ্য এবং ধর্ম পালন প্রভৃতি বিষয়গুলি নির্দ্ধারণ করে" লিখিত হইয়াছে কিন্তু তাহা ঠিক নহে, গোত্র কর্মের দ্বারা উচ্চ ও নীচ বংশে জন্ম-গ্রহণ করা নিরূপিত হয় কিন্তু বিবাহ, খাদ্য, ধর্মপালন প্রভৃতি কার্যগুলিতে এই কর্মের কোন প্রভাব নাই।

ইহার পরবর্তী প্যারাগ্রাফের প্রথমে লিখিত আছে যে "জৈনদিগের মতে আত্মা সর্ব প্রথমে কর্মের সম্পূর্ণ প্রভাব অনুভব করে এবং সত্য সম্বন্ধে কিছুই জানে না" এই স্থলে 'সর্ব প্রথমে কর্মের সম্পূর্ণ প্রভাব অনুভব করে, ইহার অর্থ কি? জৈন মতে আত্মা অনাদিকাল হইতে কর্মের সহিত লিপ্ত আছে, এমন কোন সময় প্রথম অবস্থা ধারণা করিতে

পারা সম্ভব নহে যখন আত্মা কর্মের সম্পূর্ণ প্রভাব অনুভব করে। সম্পূর্ণ শব্দেরই বা এই স্থলে অর্থ কি? আত্মা সব সময়েই উহার আগত কর্মের সম্পূর্ণ প্রভাবই অনুভব করে। এই বাক্যের পরই লিখিত আছে যে "আত্মা পূর্বসঞ্চিত দ্বারা পক্ষতা লাভ করে;" এই পক্ষতা লাভ শব্দের দ্বারা যে কি বুঝান হইয়াছে তাহা মোটেই বোধগম্য হয় না।

ইহার পরবর্তী প্যারাগ্রাফে কার্যবাদ, অকার্যবাদ, অজ্ঞানবাদ ও বিনয়বাদের কথা যে স্থলে উল্লিখিত আছে তথায় লেখা আছে যে "...এবং জৈনদিগের সমাধৃষ্টি এক নহে। অকার্য, নাস্তিকতা, এবং ঐশ্বরত পরামর্শ (অর্থাৎ আত্মার বলি) জৈন সমাধৃষ্টির অন্তর্গত।" পরিভাষার কিন্তু 'সমাধৃষ্টি' ও 'ঐশ্বরত পরামর্শ' এই দুইটি শব্দ জৈন ধর্মের কোন শব্দ নয়। হয়ত বৌদ্ধ ধর্মের এই শব্দগুলি কোন প্রকার ভ্রম ক্রমে জৈন বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ইহার দুই প্যারাগ্রাফের পরের প্যারাগ্রাফটিতে যে স্থলে মহাবীরের মত ব্যক্ত করিয়াছেন সেই স্থলে "ইহাই জৈন মিশ্রের 'নবতত্ত্ব' বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সেই স্থলে যে সমস্ত বিষয়ণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নব-তত্ত্বের কোন একটি তত্ত্বেরও নাম বা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। আমরা এই স্থলে নব-তত্ত্বের নাম দিতেছি যথা :—জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন যে এই নয়টি তত্ত্বের ব্যাখ্যা বা বিবরণ উক্ত স্থলে দেওয়া আছে কিনা।

ইহার পরবর্তী প্যারাগ্রাফে লিখিত আছে যে "কর্মই আত্মাকে নিজের উৎপত্তি স্থলে কিংবা পূর্বজ্ঞান এবং চির-শান্তির স্বাভাবিক অধিষ্ঠানে নিয়ত করে" পূর্বজ্ঞান ও চির-শান্তির স্বাভাবিক অধিষ্ঠান বলিলে মুক্তিকে বুঝায়; কিন্তু সেই পূর্বজ্ঞান ও চির-শান্তির স্বাভাবিক অধিষ্ঠানে কোন্ কর্মের প্রভাবে আত্মা নিয়ত হয়? কর্মই কি আত্মাকে মুক্তি দেয়? এই স্থলে কর্ম শব্দের অর্থ কি? জৈন দর্শনে 'কর্ম' শব্দটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় যাহা অন্য কোন দর্শনে পাওয়া যায় না। ভট্টর লাহা মহাশয়ও কর্মের সেই বিশেষ অর্থের কথা লিখিয়াছেন; এবং আটটি কর্ম বিভাগের বিবরণও দিয়াছেন কিন্তু এই আট প্রকার কর্মের মধ্যে কোন্ প্রকার কর্মের দ্বারা আত্মা পূর্বজ্ঞান ও চির-শান্তির স্বাভাবিক অধিষ্ঠানে নিয়ত হয়? প্রকৃত কথা এই যে যতক্ষণ কর্ম আত্মার সহিত যুক্ত থাকিবে ততক্ষণ পূর্বজ্ঞান ও চির-শান্তির স্থানে আত্মা যাইতে পারে না কিন্তু কর্ম-প্রভাব কর্মের আত্যন্তিক ক্ষয় হইলেই মুক্তি লাভ করিতে পারে।

জৈন কর্মবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যে সমস্ত পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে 'কল্প সূত্রের'ও নাম আছে; 'কল্প সূত্রের' তিনটি বিভাগ আছে। প্রথমটিতে তীর্থঙ্করগণের বিবরণ যাহাকে 'জিনাবলী' বলা হয়; দ্বিতীয়টিতে স্থবির অর্থাৎ আচার্যগণের বিবরণ যাহাকে 'স্থবিরাবলী' বলা হয়; এবং তৃতীয়টিতে সাধুগণের আচার ব্যবহারকে 'সাধু সমাচারী' বলা হয়। এই তিন বিভাগের মধ্যে কর্মবাদ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু জৈন কর্মবাদ সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থকে বিশেষ এবং বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে সেই গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করা হয় নাই যথা :—১। 'কর্মবিপাক', 'কর্মস্তব', 'বন্ধস্বামিত্ব', 'ষড়শীতি'; 'শতক' ও 'সপ্ততিকা' নামক ছয়টি কর্মগ্রন্থ; ২। কর্মপ্রকৃতি; ৩। পঞ্চ সংগ্রহ; ৪। ভাব প্রকরণ; ৫। গোম্মটসার প্রভৃতি।

অকার্যবাদ বা অক্রিয়াবাদ জৈন দর্শনের বিরুদ্ধ বলিয়া তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করা হইল না।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত মনে এই প্রতিবাদ লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। ডাঃ লাহার ন্যায় প্রসিদ্ধ ও বিদ্বান ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধ দেখিয়া পাঠকগণের মনে ধারণার উদ্ভব হইতে পারে এই আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রতিবাদটি লিখিত হইল।

রাতের মায়া

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

চাকরীর চাকায় ঘুরতে ঘুরতে রঞ্জত রায় একদিন বাসবীদেরই আফিসে বড় সাহেবদের একজন হয়ে গেল।

লিফ্‌টে দেখা বাসবীর সঙ্গে—ছিপছিপে, ছিমছাম মুঠাম বুদ্ধু উজ্জ্বল চেহারা, পরণে একটা সাদাসিধে শাড়ী, দাজাঘষা প্রসাধন সুরস্ত, এক হাতে একগাছা সরু চুড়ি, আর হাতে ছোট্ট মিষ্টি ওয়াচ, এলায়িত খোঁপা। সেদিন দুপুর থেকেই সারা কলকাতার দিকে দিকে হাঙ্গামা। তার উপর বিকাল থেকে ক্লান্তদিনের শেষে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে পথঘাট ভাসিয়ে দিয়ে। ট্রাম বাস যানবাহনের সব ব্যবস্থা অচল।

ফিরা ঘোড়ারগাড়ীর পর্যন্ত দুর্লভ। একটা অস্বাভাবিক অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। আফিসে কর্মব্যস্ততার ছাপ, কিন্তু সবাই উদ্বিগ্ন—কি ক'রে সকাল সকাল বাড়ী ফেরা যায়। কাজে মন নেই কারুর।

সে কি আপনি এখানে ?

হ্যাঁ, আমি 'সি' সেক্সনে কাজ করছি।

যাবেন কি করে ?

দেখা যাক্ কতদূর কি হয়, হেঁটেই চলে যাব ভেবেছিলাম।

সে কি ? রাস্তায় এক কোমর জল দাঁড়িয়েছে, তার উপর ট্রাম বাস বন্ধ।

তা আর কি করা যাবে, অত ভাবতে গেলে মেয়েদের চাকরী করা চলে না ?

না, না, চলুন আমিই পৌঁছে দেব, কোথায় থাকেন ?

রসার মেসে, আপনি ?

বালীগঞ্জ সার্কুলারে।

কেন এতদূর ডিটুর করবেন শুধু শুধু, বৃষ্টি কমে এসেছে, হেঁটেই বেরিয়ে পড়ি।

সে কি হয়, বিশেষ করে আজকের দিনে।

কলকাতার রাস্তায় বৃষ্টির দিনে যে রকম জল দাঁড়ায়, তার উন্মুক্ত ছবি ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। পার্কষ্ট্রীটের মোড়ে জলের তোড় এত বেশী যে গণ্ডোলা ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। বহু গাড়ীর গতি হয়েছে স্থগিত, পথে আটক আফিসচারী পথিকের দল। সেদিন হাওয়া ও বর্ষার মিলে অন্ধকারের আঁচল টেনে দিয়েছে রাস্তায়। কালোর পটভূমিকায় আলোহীন দিনের শেষক্ষণ মেঘমেদুর বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় তিমিত।

একটা পূর্ব্বের ইতিকথা আছে। কলেজে রজত ও বাসবী ছিল সহাধ্যায়ী। বাসবী ছিল পরীক্ষায় নামকরা মেয়ে, টক্ টক্ করে পাশ করে গেছে। গরীব স্কুল মাষ্টার বাবা অতি কষ্টে মেয়ের পড়ার খরচ জোগাড় করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন সযতনে। সে ছিল তৃতীয়া। বড়টি পার করতে প্রৌঢ়ের যা কিছু সম্বল গিয়াছে, গিয়ার গয়না, কো-অপারেটিভে দেনা, প্রভিডেন্ট ফণ্ডে টান। দ্বিতীয়া স্বামীরত্ন সংগ্রহ করেছেন পৈতৃক ভিটের বদলে। তৃতীয়ার জন্ম ভদ্রলোকের দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না—তাই তাকে পড়তে দিয়েছিলেন—যদি নিজের বিদ্যে নিজেই কিছু করতে পারে। পড়াশুনার দিকে ঝোঁকও ছিল বাসবীর, দেখতেও নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়েদের চেয়ে ভাল, মুখের শ্রী ও রংএর চটক আছে। মা বলেন—দুটো মেয়েকে চোদ্দ বছরে পার করেছ—একে নিজের ঘরাতে ছেড়ে দাও—আর তা ছাড়া দেশের রীতিনীতিও বদলাচ্ছে দিন দিন ; সেটাও ত দেখতে হবে। বাসবীর সহপাঠিনীরা ছিল ব্যারিষ্টার সুশোভন রায়ের মেয়ে রেবা রায়, জষ্টিস্ মিত্রের মেয়ে ডলি, বড়চাকুরে অভিনব সেনের অভিনবা দুহিতা সুনন্দা ইত্যাদি। আর রজত রায়ের কথা কে না জানে। যেমন স্মার্ট তেমনি আপটু ডেট্। সম্ভ্রান্ত সমাজের ছেলে, শ্রীমান ঘরের দুলাল, কাঞ্চন কৌলীন্যের ছাপমারা তার সঙ্গ ও সুপারিশ অভিজাত সোসাইটিতে ঢোকবার ছাড়পত্র। লেখাপড়ায় সে হাঁসিয়ার চৌকস, রসবোধে মার্জ্জিত। কলেজ ইউনিয়নে বক্তৃতা দিতে সে যেমন পেছপাও নয়, রেষ্টুরাণ্টে বসে চপ কাটলেটের সঙ্গে দল বাঁধতে ও দল ভাঙাতেও সে ওস্তাদ। হকি ফুটবলের মাঠে সে পাণ্ডা, পিকনিক্ পিকচারে সে অগ্রণী। লেডিসম্যান্ বলে তার একটা সুনাম বা দুর্নাম ছিল। মেয়েরা তার প্রতি একটু বেশী রকমের সপ্রতিভ ও সচেতন। রীতিনীতির দোহাই সে কখন দিত না। মেয়েদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুবিধাবাদীর ব্যবহারই সে করত। নিন্দুকরা বলত—এক নম্বরের ক্লাট ও স্কাউণ্ড্রেল। সে হেসে উঠ্‌ত, ধরাত সিগারেটের পর সিগারেট। বলত—যত সব কাউয়ার্ড ইম্পোটেন্টের দল, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, উঠতি বয়সে কি হরিনামের মালা নিয়ে জপ করতে বসব। তা সত্বেও সবাই তার নাম করতে অজ্ঞান। রেবা রায়কে সে নিয়ে যেত কার্পোয় তার টুসিটারে, সুনন্দার সঙ্গে দেখতে যেত 'শাভলেটার' ডলি মিত্রের পার্টি জমতইনা তাকে না জোটালে। কিন্তু বাসবীর কাছেই সে আমল পেত না মোটেই, আর সেইজন্যই তাকে টানবার আগ্রহ ছিল তার বেশী। বাসবী যে গোমড়ামুখী হয়ে কলেজে যেত আসত তা নয়, হাসিমুখে সবার সঙ্গে মিশত, মিটিংএ বক্তৃতা আবৃত্তি করত, অভিনয় ট্যাবলোয় যোগদান করত। অথচ তার সঙ্গে হাল্কা ভাবে চটুল চপল ব্যবহার করবে এমন প্রশ্রয় সে কখন কাউকে দেয়নি, কোমল মোলায়েম বাইরের নীচে একটা সজীব সচেতন মনের বাঁধন শুচিতার বর্ম্ম এমনই শক্ত ছিল যে অনুরাগীর দল কোন সুযোগ নিতে সাহস করা দূরের কথা, কল্পনাই করত না।

এক রাত্রির কথা মনে আছে। ইন্সটিটিউটে 'রাজা-রাণী' অভিনয় হোল দুর্গতদের রিলিফের জন্য। রজত সেজেছিল 'রাজা' বাসবী 'রাণী'। এক বাক্যে সবাই স্বীকার করলে এমন নিখুঁত অভিনয় তারা অনেক দিন দেখেন নি। রাজার উন্মত্ত প্রেমের এমন একটা অপরূপ রূপ রজত সেদিন ফুটিয়ে তুলেছিল যা অভিনয় নৈপুণ্যে সত্যই হয়েছিল অপূর্ব, প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক ভঙ্গীতে, ইঙ্গিতে ভিতরকার এক অস্থির প্রেরণা রূপ নিয়েছিল রজতের মধ্যে। আর তারই পাশে দাঁড়িয়েছিল বাসবী স্থির, শান্ত, সংযত। সুমিত্রার পার্ট—রাজার দুর্দাম সম্ভোগবাসনা, তার উন্মত্ততাকে বৃহত্তর মঙ্গলের পরিবেশে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য এক কল্যাণীর ভূমিকায়। শিক্ষিত অভিনেত্রী পুলক চঞ্চল হয়ে দেখতে লাগল কবিধর্মী দুইটি বিচিত্র মনের অন্তর্নিহিত আবরণ উন্মোচন। দুজনে অভিনয় করছিল কি নিজেদের মর্মকথাকে উদ্ঘাটিত করছিল তা বলা শক্ত। অভিনয় শেষে রজত বল্লে—চলুন আপনাকে পৌঁছে দি। তার ভিতরের উত্তেজনা তখনও শান্ত নয়, রক্ত চঞ্চল, গলার স্বরে ছড়ত: মাখানো আবেগ। আবছা আলোর অন্ধকারে কলকাতার সর্পিল পথ মুহ্যমান। গড়ের মাঠের জনবিরল প্রান্তর রাজপথে দুই কাকজ্যোৎস্নার একটু ক্ষীণছায়া। দুএকটা সাঁজোয়া গাড়ী হেডলাইট্ জ্বালিয়ে অতিকায় অন্ধ জন্তুর দুচোখের মত চোখ বার করে দ্রুত পেরিয়ে গেল। দূরে গঙ্গায় জোয়ার এসেছে, তারই ছলছল শব্দ, জাহাজগুলির কালো মাস্তুল অস্পষ্ট আলোর অস্ফুট। এমন পরিবেশের মধ্যে ইডেন গার্ডনের কাছে রসভঙ্গের মতই রজত গাড়ী ফেল্লে থামিয়ে। বাসবী চুপ করেছিল, কঠিন হয়ে উঠল, বল্লে—গাড়ী থামালেন কেন?

রজত হেসে উত্তর দিলে—এই এমনি।

মানে?

মানে আর কি—এমন চাঁদিনী রাতে—বলে তার কুলের মত নরম হাতদুটো জড়িয়ে ধরলে। রজতের সমস্ত দেহটা একটা ব্যাকুল আকুতি নিয়ে আপনি এগিয়ে এল বাসবীর দিকে। বাসবী পর পর করে কাঁপছিল, মুখ উত্তেজনায় রাঙা কিন্তু হাতদুটো বরফ শীতল, অত্যন্ত পরুষ ও নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলে—ছেড়ে দিন, ছেলেমানবী করবেন না, বহু মেয়ের সঙ্গে বহুদিন প্লাট করেছেন শুনেছি, হয়ত অন্যায় সুযোগও নিয়েছেন, আমাকেও কি সেই টাইপ ভেবেছেন নাকি? লজ্জা করে না, পুরুষজাতগুলোর ছ্যাংলামী ও নোংরামীর কি শেষ নেই। রজত কাঠ হয়ে গেল। একটিও কথা বল্লে না, সোজা এক্সিলেটারে পা দিয়ে স্টার্ট দিলে—৬০ মাইল স্পীড কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাসবীদের বাড়ীর সামনে এসে তাকে নামিয়ে দিয়ে বল্লে—নমস্কার, পারেন ত মাফ্ করবেন। উত্তরের অপেক্ষা না করেই গাড়ী ফেল্লে ঘুরিয়ে। পরের দিন কলেজে দেখা হোল না। কিছুদিন পরে শোনা গেল, সে যাচ্ছে বিলেত, আই-সি-এস্ হবার জন্য। তার পর আজ সাত বছর পরে দেখা।

এই ক বছরে বাসবীকেও নানা ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। মা গেলেন মারা, এম-এ পরীক্ষায় সে পেলে সেকেণ্ড ক্লাশ বুদ্ধের বাজার, বোমা, ব্ল্যাকমার্কেট, কাপড়ের টাকার চলতি। কোথায় চাল, কোথায় কাপড়, কোথায় কয়লা, তাকে নিয়ে এল ঘরের মনুষ্যত্ব থেকে মাটির তীব্রতায়। পাশ করে একটা ইণ্টারমিডিয়েট ছোট কলেজে কাজ জুটেছিল, মাইনে কিছু মোটা নয়। অথচ বাড়ীতে অভাব লেগেই আছে, বাপ পেন্সন নিয়ে বসে আছেন। ভেবেচিন্তে নতুন নতুন ডিপার্টমেণ্টের একটায় চাকরীর জন্য দরখাস্ত করে দিলে। বাপ সেকেলে লোক—মেয়ে চাকরী করবে, মনটা খচ্ খচ্ করে, কলেজে পড়া পর্যন্ত সহ্য হয় কিন্তু গট্ গট্ করে গিয়ে সারাদিন অপরিচিত পুরুষদের মাঝে হাস্যালাপের মধ্যে চাকরী করে আসবে তা যেন তার মনে খাপ খায় না। কিন্তু যা টানাটানির দিন। যা হয় কিছু টাকা আসছে ঘরে, ভাই বোনদের পড়ার সাহায্য হচ্ছে, সংসারের চাকা একটু বেশী তেল পাচ্ছে, আজকের দিনে সেটা কম আশ্বাসের কথা নয়। তবু মন হয় বিরস, ভিতরে ভিতরে বন্ধু অধরবাবুর সঙ্গে হতে থাকে সলাপরামর্শ, ঘটকের আনাগোনা। বৃদ্ধ সেদিন পেন্সন নিতে গিয়েছিলেন—ফিরতে দেরী হল—দেখেন একটার সময় এসপ্লানেডের মোড়ে বাসবী চলেছে হাসতে হাসতে, সঙ্গে দুজন সুবেশ যুবক, তারা ঢুকলো এক রেষ্টুরাণ্টে। একে বেলা হয়ে গেছে, তায় খাওয়া হয় নি, বৃদ্ধের নিরুদ্যম রক্ত হ'ল তপ্ত। সন্ধ্যায় যখন বাসবী বাড়ী ফিরল তখন বৃদ্ধ গম্ভীরস্বরে তাকে ডাকছিলেন, বল্লেন—

কাপড়-চোপড় ছেড়ে এস মা, তোমার সঙ্গে কাজের কথা আছে। বাসবী বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরে জবাব দিলে —কি হয়েছে বাবা।

কিচ্ছু না।

তারপর যখন সে ফিরে এসে তাঁর কাছে বসল তখন তিনি ভণিতা না করেই বল্লেন—দেখো বাসু, তোমার বয়স হয়েছে, লেখাপড়াও শিখেছ ঢের, টাকাও রোজগার করছ নিজের জোরে, আমার সাহায্যও হচ্ছে কিছু, তবু তোমার মা নেই, স্পষ্ট করেই বলতে হচ্ছে যে আমার ইচ্ছা নয় যে, তুমি আর চাকরী কর। চাকরী বা টাকার চেয়ে মেয়েদের মর্য্যাদা সুনাম বড়ো। কাল থেকে তুমি রিজাইন দাও। আর একটা কথা, আমার মত হচ্ছে এইবারে শীঘ্রই তোমার বিয়ে করা উচিত—একটি পাত্রের খবর পেয়েছি, মেদিনীপুরে মোক্তারী করে, জমিজমা খেতখামার—

বাধা দিয়ে বাসবী বলে—এ সব কি বলছো বাবা—

বৃদ্ধ স্পষ্টভাষী, ছেলেমেয়েরা ও তাদের মা চিরকাল ভয় আর সেই সঙ্গে ভক্তি করে এসেছে, একটু কঠিন হয়েই উত্তর দিলেন—বিয়ে কর না কর, চাকরী তোমায় ছাড়তে হবে।

বাসবী সতেজে, দৃপ্ত ভঙ্গীতে বল্লে—কেন?

বাপ রেগে বল্লে—বেশ আমার কথা যদি না শোন তোমার দায়িত্ব তুমি নিজেই বুঝে নাও, এমন অবাধ্য মেয়ের আমার ঘরে স্থান নেই।

আচ্ছা বাবা—বলে পায়ের ধুলো নিয়ে বাসবী সেই যে বেরুল আর ফিরল না। উঠলো গিয়ে এক বান্ধবীর ফ্ল্যাটে। বাপও খোঁজ খবর করলেন না, ক্ষোভে, অভিমানে, লজ্জায় ও দুঃখে। শুধু ছোট ভাই অমল কলেজ ফেরতা এক আধদিন লুকিয়ে সেজদির সঙ্গে দেখা করতে আসত আর জোগাড় করে নিয়ে যেত দু-এক টাকা, মোহনবাগানের ম্যাচ, সিনেমা, পিকনিক ইত্যাদির জন্যে। বাসবী চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করত—হ্যারা বাবা কিছু বলেন। কিচ্ছু না, 'চল না' সেজদি বাড়ীতে ফিরে, আমার বন্ধুরা এসে কেই বা পাপরভাজা চা করে দেয় আর কেই বা কপি করে দেয় লন্ড্রিকের নোট্, চলনা বাড়ী, বাবা আজকাল কাউকে বকে না, শুধু চুপ করে বসে থাকে। বাসবীর চোখ দুটো জলে ভরে যায় দেয় দু'টাকা তার হাতে গুঁজে, বলে ন্যাংড়া আম কিনে নিয়ে যাস্। বৃদ্ধ ঘন দুধের সঙ্গে ন্যাংড়া আমের ভক্ত।

অনেক দূরে অনেক দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে বড় ক্যাডিলাক্‌টা সার্কুলার রোডের কাছে গেল বন্ধ হয়ে, জল ঢুকছে কার্বুরেটারে। নিজেই ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করে দেখল রজত।—হোল ভাল, আজ এখান থেকেই না সটান্ হন্টন দিতে হয়, সহরে গোলমালেরও শেষ নেই।

বাসবী তার স্বেদসিক্ত ভিজে মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন একটু আনমনা হয়ে গেল। মনে হল তাকে দেখতে বেশ ভাল লাগছে।

রজত বল্লে—চলুন কাছেই আমার বাড়ী ড্রাইভার কোন রকমে ঠেলে গাড়ী নিয়ে আসুক তারপর আপনাকে পৌঁছে দেবে। ভিজে কাপড়ে বসে থেকে কি লাভ, কর্ম্মভোগ ত' যথেষ্টই হয়েছে।

আমি এখান থেকেই পাড়ি দিই—বাসবী উত্তর দেয়—সবে রাত ৮টা। না, না তা হয় না বলে রজত তার হাত ধরলে, বাসবী একটু কেঁপে উঠল, আর একদিনের পাণি-গ্রহণের ম্লান স্মৃতি ফুটে উঠল মনে, বুকের শোণিত প্রবাহ কিছু দ্রুত হ'য়ে উঠল।

আচ্ছা চলুন—একটু অপেক্ষা করে দেখি।

অন্ধকার রাস্তার মাঝ দিয়ে রজতের নির্দ্দেশানুযায়ী তার হাত ধরে একটু এগিয়ে গিয়ে ঢুকল একটী চওড়া বাগানের ফটক্‌ওয়ালা বাড়ীর গেটের মধ্যে।

কাপড় চোপড় ছেড়ে দুজনে বসল কাঁচে ঘেরা গোল বারান্দায়, বয় এনে দিলে সশব্দধূমায়িত কফির পেয়ালা। বাসবী স্বপ্নোত্থিতার মত জিজ্ঞাসা করে—বারে? মিসেস্ কোথায়, আলাপ করিয়ে দিন।

রজত একটু অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দেয়—সে সৌভাগ্য এখনও হয়নি মিস্ সে।

ওঃ, বলে বাসবী একেবারে চুপ হয়ে যায়। কথা আর আসে না। সত্যই কি দুর্য্যোগের রাত। দরোয়ান্ ও ড্রাইভার এসে জানায় যে, গাড়ী ঠেলে গ্যারেজে নিয়ে আসা সম্ভব হলেও আজ রাত্রে গাড়ী চালান অসম্ভব। বাইরে জলের শাণিত শব্দ—প্রখর। রেডিয়োতে জানিয়ে দিলে রাত ৯টার পর কার্ফিউ অর্ডার। বাসবী একটু অস্থির

হয়ে পড়ল, এরকম আটকে যাবে জানলে রজতের সঙ্গে কিছুতেই আসত না। রজত লম্বা পাইপ ধরিয়ে ইজিচেয়ারে বসে আরাম করে টানছে, হেসে বলে—ভেবে আর কি করবেন এ হচ্ছে নিয়তির পরিহাস—আপনি আজকের রাতে আমার ক্ষণিকের অনাহূত অতিথি, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডিনারের ঘণ্টা পড়বে, তার পরে···।

তার পরে কি—বাসবীর গলা চেপে যায়।

এমন রোমান্টিক কিছু নয়—ধরুন একটু কাব্য-চর্চ্চা।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্ বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ

নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়

এর রসবোধ করতে পারেন নিশ্চয়ই, খাস পদ্মাবতীর চরণ চারণ চক্রবর্ত্তী ইনি, কতরকমের রসোদ্ঘাটন করে গেছেন। বাসবী পদটির মানে বোঝে, গাল লাল হয়ে ওঠে। রজতের আবৃত্তি যেন কাব্যক ফেনিল মদ। যদিও তার মনের জোর কিছু কম নয়, কারুর কাছে জবাবদিহীর দাবী নেই এবং নিজের বিচার বিবেচনার উপর গভীরতম বিশ্বাস; তবু অতি অদ্বিতীয়া বাড়ীতে রজতের সঙ্গে একত্রে রাত কাটাবার আভাষ তাকে বিচলিত করে সব দিক থেকে। অথচ কতদিন তার কল্পনা হয়েছে উদ্দাম বল্গাহীন ঘোড়ার মত যা তা ভেবেছে যার কোন মানে নেই, যা শুধু অবচেতন মনের গোপন অভিসার। এমন কি মনে মনে ভেবেছে সেদিন যদি রজত অত সহজে তাকে মুক্তি না দিত তাহলে সে কি করত? বাসবী রজতের দিকে মুগ্ধ তাকিয়ে আছে বলে—সত্যি পুরাণো দিনের কত কথা মনে পড়ছে।

সে কামুকী ঘেঁটে কিছু লাভ নেই, বাসবী দেবী, প্রতিক্ষণেই আমরা নতুন হচ্ছি, মাইড:—জবাব দেয় হেসে রজত।

বয় এসে জানিয়ে যায়, ডিনার তৈয়ারী, নীচে গং বাজে টুং টাং।

গভীর নিশুতি রাত, চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। বৃষ্টির বেগ থেমেছে। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা ম্লান তারার আভাস, নিভন্ত, দৃষ্টিহীন। রজত পার হয়ে যাচ্ছে, বাসবী শুনছে মন্ত্রমুগ্ধার মত—কত কবির কত ভাব, কত অনির্ব্বাণ গোপন বেদনার ইতিহাস, যা ছড়িয়ে রয়েছে ছন্দে, গানে, গাথায়, কত অশরীরির প্রেমের ব্যাকুল আকুতি ধরা পড়ল সুরে সুরে সেই নিস্তব্ধ ধারাকুল মধ্য রাত্রের গভীরে। শুচিস্মিতা তপস্যারতা উমার মত সে চেয়ে রইল রজতের দিকে, অপরূপ এক রহস্যমধুর রসঘন অনুভূতি নিয়ে। বাসবী আর পারছে না নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে, নিজের ভারে সে নিজে নুইয়ে পড়েছে, সে আজ সব কিছু পারে, অসাধ্য সাধন, নিজেকে নিঃসঙ্কোচে নির্ম্মমভাবে বিলিয়ে দিতে পারে, মান ইজ্জত, দেহ। শুধু নেবার অপেক্ষা, সে জানে সে সব দিয়ে দিলেও ফতুর হবে না, ফুরিয়ে যাবে না, বরং ফুটে উঠবে, শত বিকশিত ফুলের মত। নিজের উপর আজ তার ভরসা নেই, কিন্তু ভয়ও নেই। বিদ্যুৎ স্পৃষ্টার মত সে এগিয়ে যেতে চাইল রজতের দিকে, কিন্তু পারল না, শুধু ধরা গলায় বলে—রাত শেষ হয়ে এল যে, শুবে না। তার কথা আজ মধুক্ষরা, নিবেদিত যৌবনের গুরুভারে সে আজ অলস মন্থর। রজত স্থির নিষ্পলক নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। চোখের ভাষা যে এত উদাস হতে পারে তার প্রথম পরিচয় বাসবী পেলে।

দাঁড়িয়ে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে রজত বলে—সত্যই ত, বড্ড রাত হয়েছে। ওই পাশের ঘরটা আমার গেষ্ট রুম—বিছানাপত্র ঠিকই আছে—একটা রাত্রি কষ্ট করে কাটিয়ে দিন। গুড নাইট।

বাসবি চুপ করে থমথমে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেন সে নিরালম্বন নিরাশ্রয়। তার সর্ব্ব স্নায়ু চেতনা পরীক্ষা করে দেখতে চায় তার মনের গতির সঙ্গে প্রকৃতির এই বিসর্য্যয় খাপ খায় কিনা। দিক প্রান্তে দিগন্তান্তের জন্য সুন্দরী শুকতারা পড়েছে হেলে।

দু'জনে শুয়ে পড়ল পর্দ্দা টেনে দিয়ে। কনডেন্সনের বালাই নেই, বাইরের হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ। দুটো, তিনটে, চারটে, পেটা ঘড়ির ঘণ্টা জানিয়ে দিয়ে যায়—রাত্রি শেষের অদ্ভুত দ্রুত গতি। বাসবির পোড়া চোখে ঘুম এল না মোটেই। কখন যে ঢুকে পড়েছে রজতের ঘরে নিজের অজ্ঞাতসারে তা নিজেই জানে না। তার সুপ্ত শুভ্র দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়েছে অনন্ত-কাল বুঝি সে চেয়ে থাকতে পারে ঐ নিমীলিত একজোড়া আঁখির দিকে। আর ওদিকে শুদ্ধ নিবিড় ঘুমের মধ্যে রজত স্বপ্ন দেখছে

কে একটি মহিমময়ী মেয়ে তার দিকে চেয়ে আছে উপোসীর মত, দুটি সেলর কোমল ঠোঁটের দুরু ভিজে পরশ, কপালে দুফোঁটা চোখের জল। ভোরের স্বপ্ন চরম সত্য।

সকালবেলা ঘুমভাঙার পর খোঁজ করাতে মাদ্রাজী বয় বল্লে—আম্মা সাহেবকে কল্‌ সেলাম জানিয়ে ভোরবেলাই হেঁটে চলে গেছেন।

রজত একটু হাসল।

আপার আফিসে দেখা, বাসবী জরুরী ফাইল সই করাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, ভাবলেশহীন। রজত গম্ভীর-ভাবে কাগজ ওল্টায় বলে—রাবিশ, কিচ্ছু হয়নি, গোটা কেসটার একটা প্রেসি চাই একঘণ্টা পরে নিয়ে আসবেন।

বাইরে ট্রামের ঘড়ঘড় শব্দ, ফেরিওয়ালার চীৎকার, মটরের হর্ণ কর্মমুখর অতি বাস্তব কলকাতা জ্বল জ্বল করছে দুপুরের মেঘহীন দীপ্ত মধ্যাহ্নে।

যোনিপীঠের কথা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পি-এচ-ডি

কিছুকাল পূর্ব্বে আমি একান্নপীঠের উৎপত্তিবিষয়ক কিংবদন্তীর ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পীঠস্থানের সহিত দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষের সম্পর্ক কল্পনার মূল কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে পণ্ডিতসমাজের বিবেচনার নিমিত্ত যে চারিটি বিষয় উপস্থাপিত করা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার পুনরালোচনা করা যাইতে পারে।

১। দক্ষযজ্ঞে সতীর প্রাণত্যাগের কাহিনী মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব এবং মৎস্যাদি কতিপয় প্রাচীনতর পুরাণ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে পরবর্ত্তীকালে দক্ষযজ্ঞের বিবরণ পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। শতপথব্রাহ্মণে (৩।২।১।৫) বলা হইয়াছে, যজ্ঞকর্ত্তা প্রজাপতির খণ্ডিত রেতঃ দেখিয়া তাঁহার মেত্র রক্ত হইয়াছিল এবং পূষা উহা ভক্ষণ করায় তাঁহার দন্ত ভগ্ন হয়। গোপথব্রাহ্মণে (১।২) আখ্যায়িকাটি অপেক্ষাকৃত বিকাশ লাভ করিয়াছে। এস্থলে দেখা যায়, যজ্ঞকর্ত্তা প্রজাপতি হরকে অস্বীকার করেন। ফলে রুদ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করেন। সেই ছিন্ন যজ্ঞাঙ্গ দেখিয়া ভগের চক্ষু দৃষ্টিহীন হয় এবং পূষা দন্তহীন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৫) এবং বায়ু ও কালিকাপুরাণে দক্ষযজ্ঞ বিনাশের বিবরণে বীরভদ্র কর্ত্তৃক ভগের চক্ষু উৎপাটন এবং পূষার দন্ত ভগ্ন করার উল্লেখ আছে। যাহা হউক, প্রাচীন বিবরণে সতীর অবয়ব পতন ফলে পীঠস্থানের উৎপত্তির কাহিনী দেখা যায় না। কেবল দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থসমূহে ইহার উল্লেখ আছে।

২। মৎস্যপুরাণে জলস্রোতা সতীকে ভারতের দ্বিতীয় তীর্থক্ষেত্রে পূজিত তথাকথিত অষ্টোত্তরশত দেবতার সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। বহ্নিপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত দেবীখণ্ডে শক্রবিজয় (অর্থাৎ জলস্রোতা পত্তনীয়) বিভিন্ন প্রকাশের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঠিক এই সমসংখ্যক তালিকা উদ্ধৃত দেখিতে পাই। পদ্মপুরাণের সপ্তম খণ্ডে সাবিত্রী দেবীর যে অষ্টোত্তরশত বিকাশের তালিকা পাওয়া যায়, তাহা মৎস্য ও বহ্নিপুরাণের তালিকা হইতে ভিন্ন। দেবীভাগবতে ঐ একই তালিকা উদ্ধৃত করিয়া স্থানগুলিকে জলধারা পীঠরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মেরাধিদেব মহাদেবেরও বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রস্থিত রূপের অনুরূপ তালিকা পাওয়া যায়। বহ্নিপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ডান্তর্গত কেদার খণ্ড এবং শিবপুরাণের সপ্তকোটীশ্বর সংহিতা খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৩। পীঠস্থানের সংখ্যা সম্বন্ধে ঐকমত্য দেখা যায় না। দেবীভাগবত অনুসারে পীঠের সংখ্যা ১০৮; তবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ইহার ভিন্ন দেবীর অসংখ্য পীঠস্থান ব্যতীত আরও কতকগুলি পীঠও আছে। কালিকাপুরাণের একস্থলে দেখা যায় পীঠ সাতটি, তাহাতে তিনটি কারণরূপে অবস্থিত, অন্যত্র পীঠের সংখ্যা চারিটি যায়। তন্ত্রচূড়ামণিতে ৫২টি; কিন্তু জ্ঞানার্ণবতন্ত্রানুসারে ৫০টি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত তন্ত্রসার গ্রন্থে জ্ঞানার্ণবতন্ত্র হইতে পীঠস্থানের তালিকা ও সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু মেরুবিরি সংজ্ঞক একটি পীঠকে মেরুপীঠ ও মিরিপীঠ নামক দুইটি ভিন্ন পীঠ গণনা করায় মোট পীঠের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫১। আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে পীঠের সংখ্যা ৫১ স্বীকার করিয়া পীঠস্থান, দেবী ও ভৈরবের নামের পার্থক্য তান্ত্রিকী প্রকট হইয়াছে। তন্ত্রসার হইতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃহত্তন্ত্রসার রাজতরঙ্গিণী বিদ্যানন্দার তৎকৃত প্রাণতোষিণী গ্রন্থে এই তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে অভিধানেও এই তালিকাটি গৃহীত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গলে (১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) "একান্ন" পীঠের অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "একমত যা হর পুরাণ তন্ত্র। আমি কহি যন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রমত।" সম্ভবতঃ "যন্ত্রচূড়ামণি" স্থলে "তন্ত্রচূড়ামণি" পাঠ হইবে। অন্নদামঙ্গলের বঙ্গবাসী সংস্করণ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল,

উহাতে সংকলিত শ্লোকগুলির সংখ্যাধিক্যের সৌষ্ঠবাদর্শ রক্ষিত হয় নাই এবং বহু পীঠস্থানের বিবরণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটীতে তন্ত্রচূড়ামণি সংজ্ঞক একখানি পুথি আছে। উহাতে জ্ঞানার্ণবের তালিকার অনুরূপ একটি পীঠতালিকা দেখা যায়; কিন্তু পীঠস্থান, দেবী ও ভৈরবের একটিও ভিন্ন ভিন্ন বাক্যসম্বলিত কোন বৃহৎ তালিকা উহাতে পাওয়া যায় না। সোসাইটীর সংগ্রহে পীঠনির্ণয় বা মহাপীঠ বিবরণ সম্বলিত কতিপয় ক্ষুদ্র পুথিতেই উল্লিখিত আছে এবং উহা তন্ত্রচূড়ামণির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি এই পীঠতালিকাটির শুদ্ধপাঠনির্ধারণে সচেষ্ট আছি। যত অধিকসংখ্যক পুথি পরীক্ষা করিতে পারিব, মৌলিক পাঠনির্ণয় ততই সহজসাধ্য হইবে। "ভারতবর্ষীয়" পাঠকমণ্ডলীর নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহাদের কাহারও সংগ্রহে যদি তন্ত্রচূড়ামণির কোন সমগ্র পুথি কিংবা তদন্তর্ভুক্ত পীঠস্থান বিষয়ক কোন ক্ষুদ্র পুথি থাকে, তবে আমাকে উহা পরীক্ষা করিবার সুযোগ দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৪। পীঠের সংখ্যায় যে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, উহার স্থাননির্ধারণ ব্যাপারেও তদনুরূপ অনৈক্য দেখিতে পাই। কতকগুলি পীঠ অধ্যায় অধিকাংশ তালিকাতে স্বীকৃত হইলেও, বিভিন্ন তালিকায় একই বিভিন্ন স্থাননামক পীঠস্থানরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। বিভিন্ন গ্রন্থকার সাধারণতঃ স্বকীয় বিবেচনা অনুসারে পীঠতালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কোন সুনির্দিষ্ট প্রাচীন তালিকার অনুসরণ করেন নাই; কারণ এইরূপ সর্বজনস্বীকৃত কোন প্রাচীন তালিকা ছিল না। পীঠস্থানের সহ তালিকা সম্বলিত দৈবেয়ার অনেকগুলি উদাহরণ আমরা পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে। বর্তমান প্রবন্ধেও প্রসঙ্গক্রমে কতিপয় দৃষ্টান্তের আলোচনা করিতে হইবে; অতিরিক্ত কতকগুলি উদাহরণের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের ৩য় পটলে আটটি পীঠের নাম করা হইয়াছে;—কামরূপ, ওড্র, কৌলগিরি, কুলান্তক, ত্রৈহোত্র, প্রয়াগ, উড্ডীয়ান এবং দেবকোট। তন্ত্রসারের একান্নপীঠস্তোত্র প্রসঙ্গে দশটি প্রধান পীঠের উল্লেখ আছে;—মূলাধারে কামরূপ, হৃদয়ে জালন্ধর, ললাটে পূর্ণগিরি, ললাটোর্ধ্বে ওড্ডীয়ান, ভ্রূমধ্যে বারাণসী, লোচনত্রয়ে জলন্ধরী (জয়ন্তী?) মুখমণ্ডলে মালবতী, কণ্ঠে মধুপুরী (বঙ্গুরা), নাভিদেশে অযোধ্যা এবং কটিতে কাঞ্চী। যথারূপে পীঠের তালিকা উল্লেখব্যাপারে যে কতদূর স্বাধীনতা অবলম্বন করা সম্ভব হইত, ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কোন কোন পুথিতে দক্ষযজ্ঞের পৌরাণিক বর্ণনার পর সতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পতনের ফলে উদ্ভূত পীঠস্থান সমূহের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বহু পীঠের নাম দেখিতেছি;—ঘাটশিলায় দেবীর বামচরণ পতিত হয়, সেখানে দেবীর নাম কপিলী, বাজপুরে দক্ষিণচরণ, দেবী বিমলা; রাজবোলহাটে বামহস্ত, দেবী বিশাল লোচনী, বালিচাড়ায় দক্ষিণ হস্ত, দেবী রাজেশ্বরী; ক্ষীরগ্রামে পৃষ্ঠদেশ, দেবী যোগাদ্যা; নবরুকোটে বক্ষঃ, দেবী জালন্ধরী; হিংলাজে ব্রহ্মরন্ধ্র, দেবী কোট্টরী; পাটনায় যেহেতু এই তীর্থের দেবীনাম উদ্ধার করা যায় না; কামাখ্যায় যথা আছে, দেবী কামরূপ কামাখ্যা; এবং বারাণসীতে বক্ষঃস্থল, দেবী বিশালাক্ষী। বলা বাহুল্য, রাজবোলহাটে, বালিচাড়া প্রভৃতি যে সকলের অন্যান্য যেসমস্ত স্থানগুলিকে ঐ শ্লোকে কবি স্বীকৃত অন্য কোন পীঠের অধ্যায়ে ভুক্ত করেন নাই।

এখন প্রশ্ন এই যে, জগন্মাতার বিভিন্ন অবয়বের সহিত কতকগুলি তীর্থ স্থানের সম্পর্কল্পনার কারণ কি? আদ্যাশক্তি জগন্মাতাকে বিভিন্ন তীর্থ ক্ষেত্রস্থিত দেবীরূপের সহিত অভিন্ন বলনা করার মধ্যে আমরা একটা সমন্বয়ের আদর্শ দেখিতে পাই। উহা দ্বারা সর্বতীর্থে আদ্যাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু দেবীর অঙ্গবিশেষের সহিত তীর্থস্থানগুলির সম্পর্ক নির্ধারিত হইবে কেন? প্রশ্নটির উত্তর দুরূহ নহে।

শিবলিঙ্গ পূজার মূল কারণ লিঙ্গের সহিত প্রজা সৃষ্টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু সৃজন ব্যাপারে লিঙ্গ অপেক্ষা যোনির মর্যাদা কম নহে। "ভগবান্" এবং "ভগবতী" এই দুইটি নামের মধ্যে অন্ততঃ আংশিক ভাবেও জনক পিতা ও জগজ্জননীর সৃজন লীলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন বিশিষ্ট আকারের পাষাণ বা মৃত্তিকে জনক পিতার লিঙ্গ (পরবর্তীকালের অজ্ঞ লিঙ্গ) কল্পনা করা সহজ ছিল, বাণীবিশেষকে জগন্মাতার যোনিরূপ কল্পনা করা তদপেক্ষা কঠিন ছিল না। যোনিমুদ্রার প্রদর্শনের অনুকরণেই পরে হিরণ্যগর্ভ মহাযাগের অনুষ্ঠানটি কল্পিত হইয়াছিল। যজমান একটি সুবর্ণ নির্মিত গর্ভাকার ফুলে যজমান প্রবেশ করিতেন এবং রূপকচ্ছলে আদ্য সৃষ্টি যজ্ঞ রাখিয়া পক্ষ নিঃশ্বাস পতন কাল যাবৎ তথায় অবস্থান করিতেন। অতঃপর ব্রাহ্মণেরা ঐ হিরণ্য নির্মিত গর্ভের গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন-ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন এবং যজমানকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার জাতকর্মাদি ষোড়শ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন। হিরণ্যগর্ভ হইতে নব জন্মলাভ করিয়া যজমান বলিতেন, "আমি পূর্বে মাতৃগর্ভ হইতে জন্মিয়া গর্ভবাসী ছিলাম; এইবার তোমার গর্ভ হইতে জন্ম লাভ করিয়া দ্বিজ দেহ ধারণ করিলাম।" প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, লিঙ্গ ও যোনির মাহাত্ম্য মূলক ধারণা সমূহ আদ্য-ধর্মের উপর অনার্য প্রভাবের ফল। যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে আমার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। প্রাচীন ভারতীয়গণ অনুরূপ ভাবে বিশিষ্ট আকারের ভূগর্ভ বা মৃত্তিকে জগন্মাতার স্তন কল্পনা করিলে আশ্চর্যান্বিত হইবার কারণ নাই। মাতা কেবলমাত্র সন্তানের প্রসবকারিণী নহেন, তিনি তাহাকে স্তন্যের সুধাদানে বাঁচাইয়া রাখেন। সে জন্য সন্তানের কাছে মাতৃস্তনের মূল্য ও মর্যাদা অসীম। সুতরাং ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে জগজ্জননীর কাল্পনিক স্তন দুগ্ধ (অর্থাৎ তদীয় রূপকল্পে কল্পিত পর্বতের অবস্থিত কুণ্ডবিশেষের জল) স্নান বা পানার্থ ব্যবহারে আগ্রহশীল হওয়া অসম্ভব নহে। আমার কল্পনাটিতে ভাবতত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। কালিদাসকৃত রঘুবংশে দক্ষিণ দিগ্বধূর বর্ণনায় বলা হইয়াছে, "তনাবিব বিন্ধ্যস্য সৈলেয় কলমর্দ্ধ রৌ।"

উক্ত আলোচনা হইতে কুব্জ ও কুমল পর্বত বিশেষকে অনুমানের অনুরূপে কল্পনা করার কারণ খুবা কঠিন হইবে না। এই দুইটি কল্পনা (অর্থাৎ যোনিকুণ্ড এবং স্তন কুণ্ডের কল্পনা) দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত তীর্থস্থানের সম্পর্ক নির্ণয়ক কল্পনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরবর্তীকালে এই কল্পনাটি বিশাল লাভ করে এবং দেবীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত কতকগুলি তীর্থের (প্রধানতঃ শাক্ত ও সৌর তীর্থের) সম্পর্ক কল্পিত হয়।

মহাভারতের বন পর্বাধ্যায়ের তীর্থ যাত্রাপর্ব গুপ্ত যুগের পূর্বে রচিত এবং সতীর অঙ্গপাত-জনিত তীর্থাদির পৌরাণিক বিবরণ অপেক্ষা প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই তীর্থযাত্রাপর্বে পঞ্চনদের নিকটবর্তী তীর্থস্থানে অবস্থিত যোনিদ্বার এবং গৌরীশিখর সংজ্ঞক পর্বতে শিবসন্নিধি সুমেরুতেও উল্লেখ আছে। তীর্থস্থান সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "অতো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থানাং হ্রদমুত্তমম্। তত্র স্নাত্বা তু যোক্ত্রায়াং বৈ পরো ভবতি তত্ত্বতঃ। দেব্যাঃ পুত্রা ভবেৎ রাজন্ চতুর্ভুজসমন্বিতঃ। গবাং শতসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।" উত্তর পর্বতে বিষয়ে বলা হইয়াছে, "উত্তরস্যাং ততো গচ্ছেৎ পর্বতং গৌরমাশ্রিতম্। সান্নিধ্যাত্তস্য তত্র বৃষতে ভরতর্ষভ।.....যোনিদ্বারং তদ্বৈ বিদ্ধিতং ভারতর্ষভ। তস্মাদ্বিগাহ্য মৃত্যুং পুরুষো যোনিসঙ্কটাৎ।" গৌরী শিখর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ তীর্থং সেবেত্তৎপরঃ। শিখরং বৈ মহাদেব্যা গৌরীত্যেবাভিবিশ্রুতম্। সমাজগ্মু বরশ্রেষ্ঠ সুমেরুপৃষ্ঠে সংবিদম্। সুমেরুপৃষ্ঠমাসাদ্য রাজসেবকবৎ ভবেৎ। তস্মাদ্বিবেক কুর্বাণঃ পিতৃদেবার্চনরতঃ। হয় মেধমবাপ্নোতি পরলোকং গচ্ছতি।" তীর্থক্রমের মধ্যে গৌরীশিখর হিমালয়ে; কিন্তু ইহা হেমকূটমণিবর্তিত কামরূপের অন্তর্গত গৌরীশিখর কিনা, তাহা বলিতে পারি না। উক্ত পর্বত পূর্ব ভারতে অবস্থিত ছিল বলিয়া বোধ হয়; তবে ইহা কামরূপের অন্তর্গত ছিল কিনা, তাহা বলা যায় না। তীর্থস্থানে আধুনিক দেশোয়ালী জেলায় শাহবাজগড়ী নামক স্থানের নিকটবর্তী কারাদার পর্বতে অবস্থিত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউএন-সং প্রাচীন পঞ্চালরাষ্ট্রের অন্তর্গত এই তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গাঢ় নীলবর্ণ পর্বতগাত্রে মহেশ্বরপত্নী তীর্থদেবীর প্রস্তর মূর্তি বিরাজিত ছিল। এই দেবীমূর্তিতে অনেক অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ আরোপিত হইত. ভারতের সর্বাঞ্চল হইতে বহু তীর্থযাত্রী তীর্থস্থান দর্শন করিতে যাইত। তাহারা সাতদিন উপবাস করিয়া দেবীর নিকট প্রার্থনা জানাইলে অনেক সময় তিনি স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া তাহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। তীর্থপর্বতের পাদমূলে মহেশ্বরের মন্দির ছিল। সেখানে ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর তীর্থিকেরা (অর্থাৎ পাশুপতসম্প্রদায়ীরা) পূজার্চনা করিতেন। বৈদেশিক পরিব্রাজকের উদ্ধৃত বিবরণ হইতে প্রাচীন তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য ও জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়। তীর্থপর্বতের পাদমূলে মহেশ্বর মন্দিরের অবস্থান দেবীর পীঠস্থানে ভৈরবের অস্তিত্ব কল্পনা স্মরণ করাইয়া দেয়।

পূর্বে বলিয়াছি যে, বিভিন্ন তীর্থস্থানের দেবীগণের সহিত আদ্যাশক্তির অভিন্নত্ব কল্পনা পীঠস্থানের সংখ্যাবিস্তারণ প্রয়াসীদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু অন্য দিকে আবার প্রাচীনকালেই ভারতের উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলস্থিত চারিটি শক্তিতীর্থকে দেবীর পীঠ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইত। অবশ্য এই গুলির সহিত দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ মঞ্জুশ্রীমূলতন্ত্রে চারি পীঠের নাম পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন, এই তন্ত্রগ্রন্থটি ৬০০ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে মঞ্জুশ্রীতন্ত্র রচয়িতা পঞ্চগৌড়ের জনৈক শিষ্য ছিলেন পাল রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র অজয়বজ্র। গোপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার পুত্রের গুরু সম্ভবতঃ ঐ সময়েই মঞ্জুশ্রীতন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই গ্রন্থে যে চারিটি পীঠস্থানের উল্লেখ আছে, তাহা জালন্ধর, ওড্ডিয়ান (উড্ডিয়ান), পূর্ণগিরি এবং কামরূপ। কালিকাপুরাণের একস্থলে এই কিংবদন্তী অনুসৃত হইয়াছে। এখানে দেখা যায়, পশ্চিমদিকে ওড্ডপীঠ, দেবী ওড্ডেশ্বরী কাত্যায়নী; উত্তরদিকে জালশৈল, দেবী জালন্ধরী চণ্ডী; দক্ষিণ দিকে পূর্ণশৈল, দেবী পূর্ণেশ্বরী শিবা; পূর্ব দিকে সুপ্রসিদ্ধ কামরূপ পীঠ। এই বিবরণে জালশৈল জালন্ধরের সহিত অভিন্ন এবং ওড্ডদেশ "উড্ডিয়ান" নামটির ভ্রান্ত পাঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ কালিকাপুরাণেই অন্যত্র সাতটি পীঠস্থানের উল্লেখ আছে; উহাতে বলা হইয়াছে যে, জালন্ধরে দেবীর স্তনযুগল পতিত হয়, দেবী চণ্ডী এবং উড্ডিয়ানে উরুযুগল, দেবী কাত্যায়নী। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, পীঠের এই সংখ্যাটি ঠিক আছে, কিন্তু চারিটির মধ্যে একটি নাম অন্যত্র। মধ্যযুগে রচিত যজ্ঞবল্লভের বৌদ্ধগ্রন্থ সাধনমালাতে চারিপীঠের নাম বলা হইয়াছে, ওড্ডিয়ান (উড্ডিয়ান), পূর্ণগিরি, কামাখ্যা এবং সিরিহট্ট, (শ্রীহট্ট)। এখানে জালন্ধরের পরিবর্তে শ্রীহট্টের উল্লেখ দেখা যায়। এই গ্রন্থে উড্ডিয়ানকে একস্থলে যজ্ঞপীঠ বলা হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, মাঝেমাঝে বৈষম্য থাকিলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনেকে পীঠের সংখ্যা চারিটি স্বীকার করিতেন। নগরকোট বর্ণনা প্রসঙ্গে আবুলফজল বলিয়াছেন, "নগরটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত; ইহার প্রকৃত নাম কাঙ্গড়া। নগরের নিকটে জ্বালামুখীর মন্দির। ইহা প্রসিদ্ধ দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। দূরদূরান্তর হইতে তীর্থযাত্রীরা এই স্থানে সমাগত হয়। দেবী তাহাদের প্রার্থনা সফল করেন। দেবীর প্রসন্নতা কামনা করিয়া ভক্তগণ জিহ্বা কাটিয়া ফেলে; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাহাদের কর্তিত জিহ্বা সঙ্গে সঙ্গে অথবা দুই একদিনের মধ্যে পুনরায় গজাইয়া উঠে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে কর্তিত জিহ্বা বর্দ্ধিত হইতে পারে বলিয়া স্বীকৃত হয়; কিন্তু এত অল্প সময় মধ্যে তাহা কিরূপে সম্ভব হয়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। হিন্দু-

শাস্ত্র অনুসারে মহামায়া মহাদেবের পত্নী। শাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন, তিনি শিবের শক্তি। কথিত আছে, কোন এক সময়ে অসুরা (অর্থাৎ শঙ্করের পত্নির প্রতি অসুয়া) করিয়া মহামায়া সতীর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। এই খণ্ডগুলি চারিটি স্থানে পতিত হয়। দেবীর মস্তক এবং আর কয়েকটি অবয়ব কাশ্মীরের উত্তর বিরজী কামরূপের নিকটস্থ পর্ব্বতে পতিত হয়; ঐ অধ্যায়ের নাম হয় সারদা। অন্যান্য কতক অংশ দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিদ্যাপুরের সন্নিকটে পতিত হয়; উহার নাম ত্রিপুরা বা ত্রিপুরা ভবানী। পূর্ব্বদেশে কামরূপের নিকটে দেবীর যে দেহাংশ পড়িয়াছিল, তাহার নাম কামাখ্যা। অবশিষ্ট যে অঙ্গাংশ অন্যস্থানে পড়িয়াছিল, তাহার নাম হয় জালেশ্বরী; উহাই এই স্থান। এই নগরের নিকটে অনেক স্থলে মৃত্তিকার নিম্ন হইতে ধূমোদ্গম এবং প্রস্তরীভূত লোকের ন্যায় অগ্নিশিখা পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে অনেক তীর্থযাত্রী ভীড় করিয়া থাকে। তাহারা জলন্ত অগ্নিশিখার উপরে রান্না করে। উপরে শিবমন্দোত্তিত যে মন্দির আছে, সেখানেও অগণিত তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, উক্ত অগ্নিশিখা অলৌকিক; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই স্থানে গন্ধকের খনি আছে বলিয়াই ঐরূপ হইয়া থাকে।" আবুল ফজলের বিবরণ অনুসারে, পীঠদেবতা চারিটি—কাশ্মীরের অন্তর্গত আধুনিক সারদাতে অবস্থিত সারদাদেবী, দাক্ষিণাত্যে বিদ্যাপুরের সন্নিকটস্থ ত্রিপুরা ভবানী, কামরূপে কামাখ্যা এবং জালন্ধরে জালন্ধরী। দন্তাস্থি প্রস্তর নির্ম্মিত, পূর্ণগিরি সম্ভবতঃ বিদ্যাপুরের নিকটে অবস্থিত ছিল। আবুলফজল উড্ডিয়ানের পরিবর্ত্তে কাশ্মীরের নাম করিয়াছেন।

চারিপীঠের বিবরণ হইতে দুইটি বিষয় প্রতীয়মান হয়। প্রথমতঃ চারিটি পীঠের সকল তালিকাতেই কামরূপের নাম আছে। ইহাতে মনে হয়, অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালেই ভারতের অন্যান্য বৌদ্ধিকুল সমূহের তীর্থ যাত্রার অনেকাংশে আত্মসাৎ করিয়া কামরূপ অগ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ কামাখ্যাদেবী এই সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। কারণ ঐ সময়ে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন-সং কিরৎকাল কামরূপ রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কামাখ্যাদেবীর উল্লেখ করেন নাই। কামাখ্যাদেবীর প্রকৃত নাম সম্ভবতঃ কামা। এই নামের সহিত দেশের কামরূপ নামের সম্পর্ক আছে। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশের কামরূপ নামের খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিলিপিতে কামরূপ রাজ্যের উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রাচীনকালে উত্তর পশ্চিম ভারতের সারদা, উড্ডিয়ান, কাশ্মীর ও জালন্ধর পীঠসাধনার জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং অর্থাৎ সোহাং নদীর তীরবর্ত্তী উড্ডিয়ান যেন শক্তি উপাসনার একটি প্রধান ক্ষেত্র ছিল বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ দেশের অন্তর্গত তীমাক্ষ্মা এবং কাশ্মীরের সন্নিহিত, পারমার্থিক উড্ডিয়ান দেশের সীমার বহির্ভূত ছিল না। সপ্তম শতাব্দীতে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউএন সং উড্ডিয়ান যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন, "এই দেশের অধিবাসীগণ ভীরু ও প্রবঞ্চক। তাহারা বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত শাস্ত্রাধ্যয়ন করে না। যাদুবিদ্যায় পারদর্শিতা-লাভেই তাহারা একমাত্র পেশারূপে অবলম্বন করিয়াছে।" ইহাতে বুঝা যায়, সপ্তমশতাব্দীতেই উড্ডিয়ানবাসীদিগের তান্ত্রিক বিদ্যাবত্তার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই দেশের নাম অনুসারে তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের তারাদেবীর নাম হয় উড্ডিয়ান-যোগিনী। উড্ডিয়ানবাসী ইন্দ্রভূতি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী জনৈক সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য্য ছিলেন। জ্ঞানসিদ্ধি প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ তাঁহারই রচনা। ইন্দ্রভূতির পুত্র বজ্রযোগিনীর দিব্যাচার্য্য লোকাতীতবাদী পদ্মসম্ভব তিব্বতে বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, বৌদ্ধতর্কাচার্য্য শান্ত রক্ষিতের সহযোগিতায় তিনি ৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে সম্‌-যস্ নামক বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা ইন্দ্রভূতির ভগ্নী লক্ষীঙ্করা অবধূতিসিদ্ধি সংজ্ঞক বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দশমশতাব্দী হইতে উত্তর পশ্চিম ভারতে তুর্কীজাতীয় মুসলমানদিগের অধিকার বিস্তৃত হইতে থাকে। ইহার ফলে ধীরে ধীরে সারদা ও উড্ডিয়ান দেশের তান্ত্রিক সাধনা বিলুপ্ত হয়।

ভালো

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

সতীশের চাকরী গেল আর তার স্ত্রীর হ'ল চাকরী।

সুরমা হাসতে হাসতে বললো—মজা হ'ল বেশ। এবার তুমি রেঁধে ভাত দেবে আর আমি যাব আফিস, কি বল'।

সতীশ তাড়াতাড়ি বলে উঠে—নিশ্চয় নিশ্চয়, এ আমি খুব পারবো।

সুরমা হাসিতে যেন ফেটে পড়ে, বলে—কিন্তু লোকে বলবে কি! গৌরী, হেনা জানলা দিয়ে উঁকি মারবে, ছি-ছি।

সতীশ নির্বিকারচিত্তে বলে যায়—উঁকি মারুক্ না, আমি বরং তাদের ডেকে বলবো—এই ভাই রান্না এতক্ষণে হ'ল, উনি খেয়ে-দেয়ে এই মাত্তর আফিস গেলেন।

হাসির দমকে সুরমার মুখ লাল হ'য়ে ওঠে—অতিকষ্টে দম নিয়ে সে বলে—থামো, খুব হয়েছে। কোন কথা তোমাকে বলবার যো নেই। সবতাতেই ঠাট্টা।

স্নিগ্ধ সকাল সুখী দম্পতীর কলকণ্ঠে মুখর হ'য়ে ওঠে। কথা তাদের যেন আর থামে না!

পাশের বাড়ীর একটা জানলা সশব্দে খুলে যায়। হেনা মুখ বাড়িয়ে বলে—কি হ'ল ভাই তোদের? সকালবেলায় —মাগো মা, পাড়া যে একেবারে মাতিয়ে তুলেছিস্!

সতীশ তাড়াতাড়ি অমৃতবাজারখানা টেনে নেয়। সুরমা চাপা কণ্ঠে আস্তে আস্তে বলে—সর্বনাশ হ'য়েছে ভাই আমাদের! ওঁর চাকরীটি গেছে।

হেনা বলে—তাতে এত হাসি কিসের শুনি?

সুরমা আবার হাসে, বলে—আমার কিন্তু ভাই চাকরী হ'য়েছে। এই মাত্র চিঠি এল। দীনবন্ধু গার্লস্ স্কুলে হেডমিষ্ট্রেসগিরি। একশো টাকা মাইনে।

—ওমা, তাই নাকি, দাঁড়া যাচ্ছি আমি। জানলা বন্ধ হ'য়ে যায়—হেনা আসে।

রান্না কিন্তু সুরমাই করে।

দুজনে একসঙ্গে খায়, তারপর একসঙ্গে বের হয় ঘরে তালা দিয়ে।

সুরমা যায় স্কুলে আর সতীশ যায় চাকরীর উমেদারী করতে।

খবরের কাগজের ওয়ান্টেড্ কলম থেকে চাকরীর সন্ধান ক'রে দরখাস্ত নিয়ে নিজেই হাজির হয় যথাস্থানে।

পথে সেদিন বাল্যবন্ধু অবেশের সঙ্গে দেখা। চাকরী গেছে শুনে দুঃখ করে সে তাকে সান্ত্বনা দেয়, বলে—দাঁড়া আমাদের অফিসে তোকে ঢুকিয়ে দেব শিগ্গির। শুনছি একটা নতুন ব্রাঞ্চ ওপেন করবে।

একথা সেকথার পর সতীশ বলে—সুরমার চাকরী হ'য়েছে।

অবেশ যেন লাফিয়ে ওঠে—তাই নাকি, কোথায়?

—দীনবন্ধু গার্লস্ স্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ। সতীশ বলে।

অবেশ আশীর্বাদের মত বলে যায়—ভাল ভাল, খুব ভাল। তবু কতকটা তোর রক্ষে।

একটু আহত হয়েই সতীশ প্রশ্ন করে—তার মানে?

অবেশ বলে—তার মানে উপোষ দিতে হবে না আর কি। ধীরে সুস্থে যা-হোক একটা কাজ তুমিও দেখে নিতে পারবে।

—আচ্ছা যাই তবে, আর একদিন দেখা করবো—কথাটা বলেই অকস্মাৎ সতীশ চলে যায় অন্য একটা রাস্তায়। অবেশ আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়—তাকিয়ে থাকে সতীশের গমন পথের দিকে।

—ওগো শুনছো!

শুনছি, কাণ আমার খাড়াই আছে—সতীশ উত্তর দেয়। আজ আর সে কথায় রসিকতা নেই, আছে উগ্রতার সুর।

অধীর আগ্রহে আর আনন্দে কি যেন বলতে চেয়েছিল সুরমা! বলা তার হ'ল না—থেমে গেল।

থামলে যে—সতীশ বলে।

সুরমা আহতকণ্ঠে উত্তর দেয়—থামবো না! যা তোমার কথার ছিরি! কিছু বলবার যো আছে!

সতীশ ব্যঙ্গ ক'রে বলে—কেন, খারাপ শোনালো বুঝি!

—খারাপ শোনাবে না—কথাটা বলেই সুরমা থেমে যায়। চেয়ে দেখে সতীশের অস্বাভাবিক কঠিন দৃষ্টি তার দিকে জল জল ক'রে তাকিয়ে আছে।

সতীশের গলাটা দুহাতে জড়িয়ে সুরমা বলে—মিনতিভরা কণ্ঠে—আমি কি করেছি বলতো? কেন রাগ করো আমার ওপর। বল, বল শিগ্গির।

সতীশের মন ভিজে যায়, তবু দৃঢ়কণ্ঠে বলে—দুঃখ নয়, রাগ নয় সুরমা। কেমন যেন একটা অস্বস্তিভাব। কিছু ভাল লাগছে না। তুমি চাকরী ক'রে আমায় খাওয়াচ্ছ।

গলা থেকে হাত নামিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় সুরমা। রাগে তার সমস্ত মুখ লাল হ'য়ে যায়। বলে—বটে, আমি চাকরী করি—এ তুমি সহ্য করতে পারো না! কেন পারো না জিগ্যেস করি?

সতীশ দমবার পাত্র নয়, সমান তেজে বলে যায়—আমি পুরুষ, তাই স্ত্রীলোকের রোজগারের পয়সায় খাওয়া অপমানকর বলে মনে করি। তুমি এনে দেবে তবে খাব'?

সুরমাও বলে যায় তার উত্তরে—আমিও মনে করি পুরুষের উপার্জনে নির্ভর করা আজকালকার মেয়ের উপযুক্ত কাজ নয়। আজকের মেয়েরা অক্ষম নয় জেনো। রাগের মুখে অনেক অন্যায় কথাও সুরমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

সতীশ গুম্ খেয়ে চুপ করে থাকে। তারপর বেরিয়ে যায়।

সমস্ত দিন সে ঘুরে বেড়ায় কাজের সন্ধানে। বহু লোকের কাছেই যায়। কেউ নিরাশ করে, আর কেউ বা একটু আশা দেয়, বলে—আচ্ছা চেষ্টা করবো।

সতীশের মাথায় অপমানের আগুন, তাই সে-কথায় তার মন ভরে না। কাজ যেন তার আজই চাই।

শেষকালে বিকেলের দিকে যায় ভবেশের বাড়ী। হাজার হোক্ পুরানো বন্ধু, হয় তো বুঝবে তার ব্যথা।

সব কথাই ভবেশ শুনলো।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে বললো—ভাল কথা মনে পড়েছে! করবি একটা কাজ? তবে সম্মানে একটু বাধবে—।

আরে রেখে দাও তোমার সম্মান—সতীশের কথাটা গর্জনের মত শোনায়।

তারপর সে বলে—যে কাজই হোক্ না কেন, আমি নিশ্চয় তা করবো।

ভবেশ বলে—কাজটা কি জানিস—ফাইল সরকারের পোষ্ট—মাইনে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। কাজটা আমারই আণ্ডারে অবশ্য।

তাই যে তুই, তাই যে—ভিক্ষুকের মত সতীশ অনুনয় জানায়।

ভবেশের একটু চেষ্টাতেই কাজটা সতীশের হয়ে গেল।

হোক্ ফাইল সরকারী তবু চাকরী তো। বীর রোজগারে খাওয়ার চেয়ে ঢের ভালো—ঢের বেশী সম্মান এতে।

খুব মন দিয়েই সতীশ কাজ ক'রে যায়।

অফিসের বড়বাবু শুনলেন—সতীশ রায় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট—ফাইল সরকারের কাজ করছে।

ভবেশের দিকে চেয়ে তিনি বললেন—How funy! কিন্তু কদিন থাকবে ও?

ভবেশ বললো—যে কদিন থাকে থাকুক না। উপোষ করার চেয়ে তো ঢের ভালো।

বড়বাবু লোক ভালো। শিক্ষিতের সম্মান বোঝেন, তাই তাঁর চেষ্টার ফলে সতীশ চলে যায় অন্য ডিপার্টমেণ্টে, মাহিনা একশ টাকা।

ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হ'লেন সতীশের ওপর। তাই দু'মাস বাদেই সতীশের আবার পদোন্নতি।

এখন সে একটা ডিপোর এ্যাসিষ্টেণ্ট্ ম্যানেজার, মাইনে আড়াইশো টাকা।

চাকরী হবার পর থেকেই সুরমার সঙ্গে বিবাদ তার মিটে যায়। এখন তো প্রতিদিনই মধুচন্দ্রিমা।

মাসের শেষে আড়াই শ' টাকা মাইনে নিয়ে সতীশ এল বাড়ী।

সুরমারও মাইনে জমেছে দেড়শো টাকা।

টাকাগুলো একত্র করে সুরমা গোণে। ভাবে—ওঃ কত টাকা—চারশো টাকা! দুটা মানুষ, কি করবে এত টাকা। জমাবে খুব বড় ব্যাঙ্কে। তারপর ব্যবসা··· তারপর বড় বাড়ী বালিগঞ্জের লেকের ধারে—ঝক্‌ঝকে মোটর।

সতীশের উচ্চ হাসে চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যায়।

সতীশ বলে—এইবার চাকরী তুমি ছেড়ে দাও। এত টাকা কি হবে আমাদের।

সুরমা বলে—না—না, চাকরী আমি ছাড়বো না। দুজনের জমানো টাকায় কি কি হবে জানো?

কী? সতীশ প্রশ্ন করে।

সুরমার মুখ খুশীর হাসিতে ভরে যায়। বলে—খুব বড় বাড়ী···ঝক্‌ঝকে মোটর।

সতীশ কিছুক্ষণ ভেবে নেয়। তারপর বলে—না না তা নয়। আমাদের দুজনের টাকা জমিয়ে ব্যবসা করবো, তারপর সেই ব্যবসার টাকায় বড় বাড়ী নয়—ঝক্‌ঝকে মোটর নয়।

জানলার কাছে সুরমাকে টেনে নিয়ে পথের দিকে আঙুল দেখিয়ে সতীশ ব্যথাতুর কণ্ঠে বলে—যদি পারি, ওদের ভালো করবো।

সুরমা জানলা দিয়ে দেখলো—কঙ্কালসার ভিক্ষুকের দল মহানগরীর মহাপথ ধরে চলে যাচ্ছে।

সংকীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপাসনা

শ্রীনবীগোপাল গোস্বামী এম-এ

গয়াধামে যখন কাঁদিতে কাঁদিতে আর্ত্তকণ্ঠে নিমাই চন্দ্রশেখরাদি পার্ষদগণকে কহিলেন—"তোমরা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি আর সংসারে যাইব না ; আমি প্রাণেশের উদ্দেশে মথুরায় চলিলাম, আমার বৃদ্ধা জননীকে তোমরা সান্ত্বনা দিও", তখন তাঁহারা বড়ই বিপদে পড়িলেন। পরে অনেক প্রবোধ দিয়া ও একরূপ জোর করিয়াই তাঁহারা এই প্রেমের প্রতিমাটিকে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনিলেন।

নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সকলেই সবিস্ময়ে দেখিলেন সেই উদ্ধত স্থিরবুদ্ধির পূর্ণভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে ও তাঁহার স্থানে প্রেমোন্মাদের লক্ষণসমূহ আসিয়া স্থান অধিকার করিয়াছে। এই দিব্য প্রেমোন্মাদের মধ্যে যখন যাহা প্রকট তিনি একরূপ বিস্মৃতপ্রায়, তখন একদিন তাঁহার অদ্যাপক ছাত্র, তাঁহাকে দেখিতে করতঃ পাঠ-গ্রহণ করিতে আসিল। তিনিও সকলকে পাঠ দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অধ্যাপনা আর তিনি করিতে পারিলেন না। সে সময় তিনি যাহা কিছু ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, সমস্তই হরিপক্ষে হইতে লাগিল। ছাত্রগণকে স্পষ্টই তিনি বলিয়া দিলেন—"যেখানে তোমাদের ইচ্ছা, তোমরা সেইখানে গিয়া অধ্যয়ন কর। আমি আর তোমাদিগকে পড়াইতে পারিব না। পড়াইতে গেলে সকল শাস্ত্রের মূল স্বরূপ কৃষ্ণনাম আমার মনে পড়ে, আমি আর স্থির থাকিতে পারি না।" মহাপ্রভু ইহা বলিয়া প্রেমে ভোর হইলেন। ছাত্রগণও উদ্যুক্ত। তাহারা বলিল—"আমরাও আর পড়িব না। তোমার যে সঙ্কল্প প্রভু, আমাদেরও সেই সঙ্কল্প। আমরাও হরিনাম করিব।"

তখন প্রভু করতালি দিয়া নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

পড়ুয়ারাও অধ্যাপকের অনুসরণ করিলেন, আর মহাপ্রভু সেই সঙ্কীর্ত্তনক্ষেত্রের ধূলিতলে গড়াগড়ি দিয়া কলিহত জীবের উদ্ধার প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিলেন।

ইহাই কীর্ত্তনের আরম্ভ এবং ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবের জ্বালা জুড়াইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুই এই পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন—

"কলিযুগের ধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥"

চৈতন্য-লীলায় গুরু হইতে যাহাই হোক না কেন, নাম-যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা কলিহত জীবের উদ্ধারের পথ দেখানই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। রায়রামানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন—"চৈতন্যাবতারের নিগূঢ় মর্ম্ম কৃষ্ণতত্ত্বের গোস্বামীরাও সহজে ইহাকে প্রেমোন্মাদ বলিতে পারে, কিন্তু বৃন্দাবন এবং গৌড়ের সকল ভক্তগণের মতেই অবতারের প্রধানতম উদ্দেশ্য হইতেছে সঙ্কীর্ত্তন প্রচার।"

কাজেই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ পূজা সম্ভার দ্বারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাসনানুষ্ঠান বিধেয়। যিনি যেরূপ দেবতা, তাঁহার সেইরূপ উপহার দ্বারাই পূজা করিতে হয়। যে দ্রব্যে যাঁহার বিশেষ প্রীতি, তাঁহাকে সেই দ্রব্য সম্ভারে পূজা করিতে পারিলেই, তবে তাঁহার কৃপা আকর্ষণ করিতে পারা যায়। শ্রীচানুকূল্য ব্যাপারকেই পূজা বলে। যিনি কলিকালে অবতীর্ণ হইয়া সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ বিশেষকে জগতে প্রকাশ করিলেন, একমাত্র সংকীর্ত্তনেই যাঁহার বিশেষ প্রীতি, সংকীর্ত্তন ভিন্ন তাঁহার শ্রীচানুকূল সামগ্রী আর কি হইতে পারে! শাস্ত্রও ঠিক হইয়াছে,—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদৈঃ।
সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।

ইহার কারিকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামীও বলিয়াছেন,—

"অকৃষ্ণ বর্হিগৌরঃ, বর্ণিতাস্ত্রাদি স্বৈরতঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনাখ্যৈঃ, কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

যাহা করি ভাগবতে কহে আর বার।
কলিযুগে ধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন সার॥—চৈঃ-চঃ।

আমার যুগ-সন্ধির শেষ বৈরাগী—আচার্য্য মদনের বিদ্যাভূষণও সারার্থদর্শিনীতে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকের ব্যাখ্যায় "অথ কৃষ্ণাবির্ভাবক ঘনশ্যামকৃত পীতাম্বরত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যত্ব বিরুদ্ধমিতি মন্যতে" বলিয়াছেন এবং "অন্যেতি বিদ্যাভূষণাদয়ৈতৌ উপাস্যেতি শ্রীরূপপণ্ডিতাদয়ঃ" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত—শ্রীমদ্বৈষ্ণবসার্বভৌম বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ মদনগোপাল গোস্বামী ইহার অনুবাদ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"যিনি সাধারণ দৃষ্টিতে গৌরকান্তি হইয়াও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে শ্যামসুন্দররূপে বিভাত, অদ্বৈত-বিদ্যানন্দ যাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি যাঁহার উপাঙ্গ, হরিনাম যাঁহার অস্ত্র, এবং গদাধর, গোবিন্দ প্রভৃতি যাঁহার পার্ষদ, বিজ্ঞমুখি সাধুগণ সংকীর্ত্তন যজ্ঞদ্বারা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।"

শ্রীপাদ নীলমণি গোস্বামীও তদুচিত শ্রীগৌরাঙ্গাবতার-পক্ষে মহাপ্রভুর স্বরূপ-রূপ প্রকাশ করিতে গিয়া এই দুইটি কারিকা তুলিয়াছেন—

কান্তাকান্তি দ্বারা গৌর, হইলেও চিত্তচৌ॥
কৃষ্ণবর্ণপ্রথির প্রত্যয়।

অদ্বয় পরমানন্দ, অদ্বৈত শ্রীবিত্যাক্ষ,
ত্রিবিধ্যাত যাঁর অঙ্গ ছয়।
উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি, আদি যত শক্তি তার,
হরিনাম অস্ত্র প্রায় যাঁর।
শ্রীবাসাদি ভক্তচয়, পারিষদ সমাশ্রয়,
সঙ্গ লক্ষে যাঁর অবতার।
কলিতে দুষ্টদমন, গৌরহরি তার নাম,
সংকীর্ত্তন প্রায় যজ্ঞসার।
দীনের করুণ করি, সেই প্রভু গৌরহরি,
বিদ্যমান জানাব সবারে।"

চৈতন্যাবতারের পূর্ব্ব হইতেই সাঙ্গোপাঙ্গ এবং বহু হইতেছে সংকীর্ত্তন। শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন মাহাত্ম্যে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই পূর্ণ অভিব্যক্তি—শ্রীগৌরাঙ্গলীলা।

অতীষ্ট বিষয়ে চৈতন্যোন্মুখতা সম্পাদক ক্রিয়া বিশেষকেই উপাসনা কহে। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে অবশ্য পৃথক পৃথক উপাসনার উপযোগিতা আছে, কিন্তু কলিকালে একমাত্র সংকীর্ত্তনময়ী উপাসনাই সর্ব্বনিয়ন্ত্রেক্ষরূপে সর্ব্বার্থ সাধিকা হইয়াছে। সংকীর্ত্তনের ন্যায় পরম সুখজনক সুসহ উপাসনা আর দ্বিতীয় নাই। বেদাদি শাস্ত্র-ব্যবসায়ী বিদ্বানেরা বহুকাল ধরিয়া ধ্যান-ধারণা সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া যাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপায় অত্যন্ত নীচজনেরাও একমাত্র সংকীর্ত্তনকে আশ্রয় করিয়া, অত্যল্পকাল মধ্যে অনায়াসে সর্ব্বদুঃখ নিবারক পরম-তত্ত্বকে অপরোক্ষরূপে অনুভব করিতেছে। কাজেই সংকীর্ত্তনের প্রভাব কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নয়। প্রাচীন মহাজনেরা ইহার অলৌকিক শক্তি অনুভব করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন,—

"চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনং,
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যা বধূ জীবনং।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং।"

যিনি চিত্তরূপ দর্পণের মলাপনোদক, সংসাররূপ মহা দাবানলের নির্ব্বাপক, মঙ্গলরূপ কুমুদকুলের জ্যোৎস্না বিতরক, বিদ্যারূপ বধূর জীবন স্বরূপ, সকলের আত্মশোধক, আনন্দ জলধিবর্দ্ধক, পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন-কারক, সেই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হইতেছেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, চিত্তরূপ দর্পণ সুমার্জ্জিত হইলেই উহা সচ্চিদানন্দময় ভগবানের প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়। শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়ে ঐ আনন্দ-জলধি উচ্ছলিত হইয়া গিরি-পর্ব্বত, কানন-প্রান্তরকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল, আর ঐ সংকীর্ত্তনধ্বনির সর্ব্বত্রই সুখস্বরূপ কুমুদকুল বিকশিত হইয়া চক্ষুষ্মানগণকে আহ্লাদিত করিয়াছিল। মৃতপ্রায় বিদ্যাবধূ সংকীর্ত্তন নিষেবনে পুনরুজ্জীবিতা হইয়া অধিষ্ঠাত্রী জীবগণকে প্রবোধিত করিয়া আত্ম-ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুষ্টদল সংকীর্ত্তনমন্ত্রে মুহ্যমুঃ ত্রাস্ত হওয়ায়, জীবের মন বুদ্ধি প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়কুল আত্মবিশুদ্ধি লাভ পূর্ব্বক ভগবৎ পূজার অধিকার লাভ করিয়াছিল। অলৌকিক সংকীর্ত্তনামৃত নিষেবনে প্রাণী মাত্রের দুঃখ, শোক, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুভয় নিবারিত হয়। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, আশু প্রাণনাশক বিসূচিকা ব্যাধিগ্রস্ত ভীত ব্যক্তিগণও সংকীর্ত্তনকে আশ্রয় করিয়া অবলীলাক্রমে ঐ ভয়কে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে। আবার আসন্ন মৃত্যুকবলে পতিত ব্যক্তি, যাহার কিছুতেই আনন্দ নাই, সেও সংকীর্ত্তন শ্রবণমাত্র পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন করিয়া থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ এবং তদনুগত ভক্ত-প্রবরেরা একমাত্র সংকীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহাকে বিশ্বরূপে অর্চ্চনা করিয়াছেন। সেই সকল মহাজনের বিরচিত পদ-ক্রমই তদ্বিষয়ের মুখ্য প্রমাণ। প্রাচীন মহাজনেরা সংকীর্ত্তন-যজ্ঞকে চতুঃষষ্টি অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐ যে চতুঃষষ্টিতেও, উহাই পূজোপচার। পূজা-পদ্ধতি শব্দ পূজোপচারেরই বাচক।

সংকীর্ত্তনে শ্রীমহাপ্রভুর নাম, রূপ, গুণ, লীলার যে গান শ্রবণ করা যায়, উহাকে গৌরচন্দ্র কীর্ত্তন বলে। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার কীর্ত্তনকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বলা হইয়া থাকে। প্রথমে গৌরচন্দ্র কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রীতি মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ আছে। গৌর-কৃষ্ণের অভেদ ভাব ঐ কীর্ত্তনে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। যাহারা বুঝিতে পারে না বা বুঝিতে চায় না, তাহারা ঐ সংকীর্ত্তনের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া উভয়ের অনাদি ভেদ কল্পনা করে; কিন্তু রসিকগণ বিষয় ও আশ্রয়রূপ আস্বাদন বিভাবের প্রয়োজনায় রস-স্বরূপ একমাত্র তত্ত্বকেই আস্বাদন করিয়া থাকেন। একমাত্র অখণ্ড রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম, বিষয় ও আশ্রয় ভেদে দ্বিধা বিভাবিত হন। সাধকের চিত্তে বিভাব প্রবেশ করিলে ক্রমে ক্রমে অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব-কদম্ব উদ্ভি হয়াই হৌক, আর আক্ষেপ দ্বারাই হৌক, একত্র সম্মিলিত হইয়া একটী অলৌকিক আস্বাদনরূপ রস নিষ্পন্ন হয়। যে রসের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় শ্রীরাধিকা, ঐ বিষয় ও আশ্রয়ের, তদাত্ম্য ভাবাপন্ন তত্ত্বই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পূর্ণরস-স্বরূপ তত্ত্বই রসাস্বাদক হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে দীপ্তি পাইতেছেন। সাধকেরা ঐ রসাস্বাদক তত্ত্বকে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা রসাত্মকরূপে উপাসনা করেন। ঐ উপাসনা দ্বারা চিত্ত, রসের বিষয়ে উন্মুখ হয়, পরে বিষয়ক আস্বাদন করিতে সক্ষম হয়। এই নিমিত্তই গৌর-কীর্ত্তনের পর শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদ্ধতি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভক্তগণ "স্বয়ং ভগবান" বলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে "ভগবান" ও "স্বয়ং ভগবানের" মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। যেরূপ বর্ণনেই "স্বয়ং ভগবানকে" পাওয়া যায়। "ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা যাঁহার অংশবিভব, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্—আর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু "স্বয়ং ভগবান্।" "ভগবান" ও "স্বয়ং ভগবানের" মধ্যে ভেদাভেদ উপলব্ধি করিতে না পারিলে শ্রীবৃন্দাবনতত্ত্ব ও তাহার উপসংহার শ্রীচৈতন্যলীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

এই জন্যই বঙ্গদেশীয় কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর চরিত্রচর্চিত নাটক রচনা করিয়া তাহা নীলাচলে যাইয়া স্বরূপ দামোদরকে শ্রবণ করাইলে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়াই ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন—

> আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্বনাশ
> দুই ত ঈশ্বর তোর নাহিক বিশ্বাস।
> পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
> তারে কৈলি তুচ্ছ নশ্বর প্রাকৃত কায়।
> পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
> তারে কৈলি ক্ষুদ্র জীব ক্ষ লিঙ্গ সমান।
> দুই ঠাঁই অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
> অতএব তত্ত্বকর্ম তাঁর এই গতি।
> আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
> দেহ-দেহী ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ।
> ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী ভেদ।
> স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিচ্ছেদ।

উক্ত পণ্ডিত প্রবরের ধারণা ছিল শ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ অচেতন এবং তাহাতে চৈতন্যের যোগ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছে। অবশ্য শ্রীমুখ ব্রাহ্মণের এরূপ ধারণায় পণ্ডিত হইলেও তাঁহার মূর্খতাই প্রকাশ পাইয়াছিল। পণ্ডিত কতকগুলি বই পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কেন না, সচ্চিদানন্দঘন শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহকে প্রকৃত জড় বলিয়া বর্ণনা করায় এবং বহির্বাপূর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে "জীবচৈতন্যের" ন্যায় বর্ণনা করায় তাহার যে মহাপরাধ জাত হইয়াছে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই। জীবের ন্যায় পরমেশ্বরের দেহ ও আত্মার কোন ভেদ নাই। সচ্চিদানন্দঘন ভগবানের শ্রীমূর্তিসকলকে জড় দেহাভিমানী মর্ত্য জীবেরই জড়ের ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। ভক্তিদেবীর কৃপায় যখন স্থূল সূক্ষ্ম কারণদেহের অভিমান বিদূরিত হইলে ভগবদ্ভক্তের নিকট শ্রীমূর্তিসকল সচ্চিদানন্দঘন-রূপে প্রতীত হয়।

কাজেই শ্রীবৃন্দাবনতত্ত্ব ও তাহার উপসংহার শ্রীচৈতন্যলীলা বুঝিতে হইলে শ্রীজগন্নাথকে তাঁহার স্বরূপে স্বরূপ দেখিতে হইবে।

এই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্কীর্তনান্দোলনের চিত্রকে রসের বিষয় উন্মুখ করিয়া পরে বিশ্বকে আস্বাদননিমিত্ত কৃষ্ণকীর্তনের উপযোগিতা।

ভগবানের দিক হইতে জগৎকে দেখিয়া জগন্নাথের প্রকাশের যে বাহন, তাহাই হইতেছে কীর্তন। প্রেমের ঠাকুরের মধুর রসাপ্লুত চরিত-কথা স্মরণ করিয়া মন প্রেম-ভক্তিতে অভিষিক্ত করিয়া লইতে পারিলেই জীবের ভবযন্ত্রণা মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীজগন্নাথরূপে নিবেদিত হইয়া পড়ে। তখন তাহার দেহ-প্রেরার্ত্ত বৃত্তিসমূহ আত্মপ্রকাশের সার্থকতা লাভ করিয়া তরীচিত্তকে সরস, সুন্দর, উন্নত, ধর্মানুগত করিয়া তুলে।

এই জন্যই সঙ্কীর্তনবহুল পুরীধামের শ্রীজগন্নাথ হইতে অভিন্ন, অথচ তাঁহারই আবির্ভাববিশেষ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপাসনাসূত্রে গৌরাঙ্গরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, এবং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ ভজনে একান্ত অভিলাষী, তাঁহাদিগের জন্য এরূপে শ্রীচৈতন্যদেবের উপাসনা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে।

ভস্মে হবি

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়া যা করতে পারেন নি সেই অসাধ্য সাধন করেছিল খোকার জীবন যৌবনে প্রথম আবির্ভূতা সদ্যপরিণীতা প্রিয়তমা ফুলশয্যার মধুযামিনীতে যদি একটা অনুরোধ করেন, তা পালন করবার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন না এমন কোনো পাষাণপুরুষ কি ভূবিশ্বে আছে? আমার বিয়ের ফুলশয্যার মাঝা-নিশীথে প্রিয়তমা মোহন-সংকোচে মৃদুকণ্ঠে আমাকে ধূমপানের বদ-অভ্যাসটা ছাড়বার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন।

আমি কি করলাম? সেই অনুরোধ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করামাত্রই আমি হাতের সিকি দগ্ধ সিগারেটটা সজোরে সুদূরে নিক্ষেপ করলাম। প্রেম-গদগদ ভাষে নিবেদন করলাম—তিনি যেন আমার সকল পাপ এমনি করেই মোচন করেন।

তারপর এক দুই তিন করে আট-চল্লিশটা ঘণ্টা—পুরোপুরি দুটো দিন আর দুটো রাত আমি সত্যি-সত্যি আর ধূমপান করলাম না। তারপর? তারপর বৈরাগ্যের উনপঞ্চাশত্তম ঘণ্টায় অফিসে নৈশ কর্তব্যের কালে ধূম-পিপাসায় আমার মাথার একেবারে উনপঞ্চাশী চেপে গেল। আমি আবার সিগারেট ধরালাম, ঠোঁটে নিয়ে তা টানলাম এবং মুখে নিয়ে তার ধূম পান করলাম। তখন থেকে

আবার যথাপূর্ব অপরাধটির নিয়মিত অনুষ্ঠান চলল—অবশ্য অত্যন্ত গোপনে।

কিন্তু মাসখানেক পরেই ধরা পড়ে গেলাম। প্রিয়া অভিমান করলেন। আমি আবার ধূমপান ছাড়ার অভিনয় করে আবার সংগোপনে অপরাধ করতে লাগলাম। মাস কয়েক পরে পুনরায় যখন ধরা পড়ে গেলাম, তখন একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। প্রিয়া ক্রুদ্ধা হলেন, মুখরা হলেন, গর্জন করলেন, বর্ষণ করলেন, এমন কি আমাকে শয্যাবর্জিত পর্যন্ত করলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই—কিছুতেই ধূমপান ছাড়তে পারলাম না। অগত্যা প্রিয়তমা কপালে করাঘাত হেনে নিবৃত্ত হলেন। আমার নেশা পূর্ণ গতিতে চলতে লাগল এবং তার পেছনে সহধর্মিনীর দুঃসহ বাক্যবাণ অবিশ্রাম বর্ষিত হতে লাগল।

বছরকয়েক পরে হল একটি খোকা।

দেড় বছর বয়সে খোকা যখন সারা উঠোনময় হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে বেড়াচ্ছে, যখন সে সকলের সকল কথার অনুসরণ করতে গিয়ে অযোধ্য কতকগুলো কথা উচ্চারণ করে সকলের হাস্যোদ্রেক করছে এবং সকলের সকল কাজের অনুকরণ করতে গিয়ে সকলকে পুলকিত করছে, সেইসময় একদিন দেখলাম, খোকা কোথা থেকে আমারই পানাবশিষ্ট এক টুকরা দগ্ধ সিগারেট কুড়িয়ে নিজের ঠোঁটে চেপে ধরে গম্ভীরভাবে ধূমপানের অনুকরণ করছে।

আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম : খোকার যে তামাকের নেশার হাতে খড়ি হচ্ছে! গৃহিণীকে সঙ্কোচে কথাটা জানাতে তিনি সতেজে জানালেন যে, খোকা নাকি বেশ করছে, সে নাকি ব্যাপ-কা ব্যাটা হচ্ছে। নিজেকে একান্ত নিরুপায় বোধ করলাম।

নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি বলেই তামাকের অভ্যাস আমি ছাড়তে পারছিলাম না, কিন্তু ছাড়তে পারলে বাঁচতাম সে-কথা প্রিয়াকে বোঝালেও তিনি যে কিছুতেই বুঝতেন না—বুঝতে চাইতেনই না। আত্মরক্ষার জন্যে বিদেশী ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের সুরে সুর মিলিয়ে যতই কেন-না গুণ গান করি, নিজের অন্তরে ভালো করেই জানি যে, ধূমপানের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই ; যদিও বা সামান্য কিছু থাকে অপকারের স্তূপের তলায় তা চাপাও পড়ে যায়। ধূমপানের পেছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, আমার মতো লোকের পক্ষে তা একান্তই বিপুল এবং নিতান্তই মোনাবাধক। ধূমপান এদেশে দুর্নীতির মধ্যে গণ্য। কোনো দিক দিয়েই নেশা-টাকে সমর্থন করার কোনো উপায় নেই। নিজে মরেছি—মরেছি, খোকাও এ নেশার মরবে একথা ভাবতেই মনটা কেমন টন্‌টন্ করে উঠল, নিজেকে অপরাধী বোধ করতে লাগলাম।

খোকার ভবিষ্যৎ-অকল্যাণের আশংকা আমাকে দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল করে তুলল। নিজের গায়ে চাবুক মারতে ইচ্ছা হল : খোকাকে আমিই নষ্ট করছি, তার জীবনে মন্দ আদর্শ আমার থেকেই সংক্রামিত হচ্ছে।

হিমালয়িক দৃঢ়তায় মনের মধ্যে সংকল্প অটল হয়ে উঠল। আমি ধূমপান ছেড়ে দিলাম—ছেড়ে দিতে পারলাম এবং আর ধরলাম না। ছেড়ে কষ্ট হতে লাগল। সে যে কী কষ্ট ভুক্তভোগীজন তা অনুমান করলেই শিউরে উঠবেন ; আর, অভুক্তভোগীকে তা বোঝাতে যাওয়া বৃথা। পরম-সহিষ্ণুতায় সে-কষ্ট আমি বরণ করে নিলাম ; মুখ আমি আর কিছুতেই পান করলাম না, ধূমপান আমি ছেড়ে দিলাম, দিতে পারলাম।

একমাস ছমাস তিনমাস—মাসের পর মাস পরীক্ষা করে খোকার মা যখন দেখলেন যে, নেশাটা আমি সত্যি ছেড়েছি, তখন একদিন যে দীর্ঘশ্বাসটি তিনি ছাড়লেন এবং খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে যে-চুমোটি তিনি খেলেন, আমার বুকে চিরদিনের তরে তা মুদ্রিত হয়ে রইল।

খোকা আমার নেশা ছাড়াল। তার মা যা পারেন নি সেই অসাধ্য সাধন করল খোকা।

তারপরে বহুদিন চলে গেছে। এখন আমি প্রৌঢ় হয়েছি, চাকরি থেকে অবসর নেবার দিন গুনছি। মাথার সবখানা সমুখ জুড়ে প্রকাণ্ড টাক পড়েছে, এবং টাক দিয়ে যেটুকু বাকিস্থান, পাকা চুলে তা একেবারে পাকিস্থান হয়ে উঠছে।

এক কালে যে ধূমপান করতাম তা এখন ভুলেই গেছি। এখনকার যুবকরা যখন কে কত বেশি দামের কত ভালো সিগারেট পান করে—তাই নিয়ে হামবড়াইএর পাল্লা লাগায়, তা শুনে আমি বিন্দুমাত্র উত্তেজনা বোধ করিনে।

বার্ধক্য বোধ করছি। অথচ খরচ নেশার অভ্যাস আমার কোনো দিনই নেই, তার জন্যে এতকাল হিসাবে

কোনো গরমিলও বোধ করি নি ; কিন্তু আজকাল যেন প্রায়ই মনে হয়—পকেটে যত রেখেছিলাম তত নেই, যেন কিছু কম রয়েছে ! মনে মনে হাসি—মাথা বুঝি বেঠিক হতে শুরু করল, দীর্ঘশ্বাস ফেলি : দিন ফুরিয়ে এল আর কি !

আর ভাবনাই বা কী ? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে খোকা আমার আঠারো বছরে পা দিয়েছে ; ম্যাট্রিক পাশ করে খোকা এখন কলেজে 'সেকেণ্ড-ইয়ার'এ পড়ছে……

সেদিন অফিস থেকে ফিরছি। মাঝপথে এক বাগানের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সেটা পার হতে গিয়ে তার মধ্যখানেই আমায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। সামনিক গাড়ির নিচে চাপা পড়বার আতঙ্ক পর্যন্ত ভুলে আমায় নিশ্চল নিষ্ফল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। একটা যেন ধাক্কা খেলাম, সেটা মাথায় কি বুকে কি পেটে কি মনে—কিছুই নির্ণয় করতে পারলাম না। সে ধাক্কায় আমার সর্বসত্তা একেবারে ঝি-ঝি করে কেঁপে উঠল। সে মুহূর্তে আমার দৃষ্টি অনড় স্তম্ভিত হয়ে রইল, তা হচ্ছে—আমার খোকা, আমারই সেই খোকা—সামনের বাগানের অমুচ্চ রেলিংএর ওপর অবলীলাক্রমে এক পা তুলে দাঁড়িয়েছে, তার সামনে দণ্ডায়মান বন্ধুর মুখে ধৃত সিগারেটটা অনন্ত দেশলাই এর কাঠিতে সে ধরিয়েছিল, এবং নিজের অধরে ধৃত সিগারেটটিতেও স্বচ্ছন্দে খোকা অগ্নিসংযোগ করছে।

অনয়া রাধিতো নুনং

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, বার্-এট-ল

কৃষ্ণাবন তরুলতা জান যদি কৃষ্ণ কথা
কহ শুধে কোথা সে লুকালো ?
খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে, দেখে আঁকা বনদেশে
পদচিহ্ন পথ করি' আলো।
করে সবে বলাবলি, সখি দেখ এ সকলি
নখ-নখমের চিহ্ন সব,
পথে তাঁর পদচিহ্ন পথে কার তিনি ভিন্ন
অন্য পদ অনুপ ও নব ?
কৃষ্ণ পদচিহ্ন ধরি' বনপথে অগ্রসরি'
অবলা ব্রজের বালা যত,
দেখে কৃষ্ণ রেখাসহ পদচিহ্ন, দুর্বিষহ
দুঃখে তারা অন্তরে আহত।
কে বধূ অনুগামিনী চলেছে কেএ কামিনী,
করি সহ করিণী কি যায় ?
দেখে করপদ আঁকি' চলিয়াছে পথবাকি,
কে প্রেয়সী, তাহারা সুধায়।
এরি আরাধনাফলে ভগবান লীলাচ্ছলে
সঙ্গে এয়ে এনেছে নির্জনে,
ত্যজ ক্ষোভ মন মাঝে অন্তরে ক্রন্দন বাজে,
কৃষ্ণধারা ঘুরি কবে বনে।
অন্যের পদচিহ্ন, বল সখি কৃষ্ণ ভিন্ন
কে করিবে কেশ প্রসাধন ?
রেখা ধরি' ওরফুলে যত বনফুল তুলে,
তুলে তায় পরাল ফুলন।

মদনপুরে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্র-দেবের নূতন তাম্রশাসন

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম-এ, পিএচ্-ডি

আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজসাহীর অনুসন্ধান-সমিতির সভ্যরূপে তদানীন্তন যুবক এই লেখক ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বুরলীয়ক মহকুমার অন্তর্গত রামপাল নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বুদ্ধিতে বৌদ্ধ নরপতি শ্রীচন্দ্র-দেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তিনি সেই তাম্রশাসন সম্বন্ধে ৺হরপ্রসাদ সম্পাদিত "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রের ১৩২০ বঙ্গাব্দের (ইং ১৯১৩ সালের) শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পরে তিনি সরকারী Epigraphia Indica নামক ইংরেজী পত্রিকায় যথারীতি সেই তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা সহকারে এক প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কে জানিত যে, সেই বৌদ্ধ নরপতি শ্রীচন্দ্রের পঞ্চম তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া, ইতিমধ্যে অনেকেরই সেই লেখকের হস্তেই পতিত হইবে, এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে পুনরায় লেখনী ধারণপূর্ব্বক উদ্ধৃত পাঠ অবলম্বন করিয়া মাসিক পত্রস্থ একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে হইবে? যে যাহা হউক, আলোচ্য পাঁচখানিকে কেন শ্রীচন্দ্রের পঞ্চম তাম্রশাসন বলা হইল, সে বিষয়ে একটু পরিষ্কার পরিচয় দিতে হইতেছে। এই রাজার প্রথম আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের সংবাদ আমরা পাইয়াছিলাম ইংরেজী ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে। শাসনখানি এখনও অপ্রকাশিত ও একরূপ নষ্টাবস্থায় ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী ইদিলপুর নিবাসী ভৈরব জমিদারের গৃহে নিধিরূপে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিক গবেষণার ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়া জানিবার মহাশয়দিগের মনে বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যাবিষ্কারে অভিরুচি আজ পর্য্যন্ত কেন যে হইতেছে না, তাহা জানি না। স্বর্গীয় সত্যমোহন দত্ত এম্-এ মহাশয় অতিকষ্টে সেই তাম্রপট্টখানি কেবলমাত্র পরিদর্শন করিবার অনুমতি পাইয়া দ্রুতপাঠের ফলে তাহা হইতে জ্ঞাতব্য ঐতিহাসিক তথ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (ইং ১৯১২ সালের অক্টোবর সংখ্যার) Dacca Review নামক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্র দেবের দ্বিতীয় তাম্রশাসন হইল উপরি উল্লিখিত আমাদের আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত রামপালে প্রাপ্ত তাম্রশাসন। তার পরে ইং ১৯১৯ সালে ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী কেদারপুর নামক স্থানে ডাইর বলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় শ্রীচন্দ্র দেবের যে তাম্রশাসন-খানি আবিষ্কার করিয়া Epigraphia Indica পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন, সেইখানিকে এই রাজার তাম্রশাসনপঞ্চকের তৃতীয় শাসন বলা যায়। উক্ত তিনখানি শাসনে রাজ্যাঙ্কের সংকেতের কোন সংখ্যা বা উল্লেখ নাই। এই রাজার চতুর্থ তাম্রশাসনখানিও ডাঃ ভট্টশালীর আবিষ্কৃত একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ। ইহা ইং ১৯২৪ সালে আবিষ্কৃত হইলেও এখন পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত রহিয়া গিয়াছে। আশা করা যায় শীঘ্রই ডাঃ ভট্টশালী ইহা প্রকাশ করিবেন। ঢাকা জেলার উত্তর-পশ্চিম ভাগে প্রসিদ্ধ জমিদার বলভি ধানকোড়াগ্রামের অদূরবর্ত্তী বুধা নামক গ্রামে ইহা পাওয়া গিয়াছিল। সেই শাসনখানি রাজার ৩য় বর্ষ রাজ্য সংবৎ-সংবলিত। এই প্রবন্ধে আলোচ্য পঞ্চম তাম্রশাসনখানি পাওয়া গিয়াছে ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী সাভার গ্রামের প্রাচীনকালের রাজা হরিশ্চন্দ্র পালের রাজবাড়ীর নিকটস্থ মদনপুর নামক একটি মৌজাতে। ইহার আবিষ্কার কাহিনী এইরূপ,—বর্ত্তমান বৎসরের জুন মাসের প্রথম ভাগে সাভারের উত্তর পূর্ব্ব দিকে প্রায় ২ মাইল দূরে অবস্থিত মদনপুর মৌজার শেষ সেওয়াল উত্তীর্ণের জমিতে একটি ডিঙ্গি খনন করার সময়ে এই তাম্রফলকখানি পাওয়া যায়। ফলকের ধাতু সোনা হইতে পারে, সম্ভবতঃ ইহা মনে করিয়াই, আবিষ্কারকদিগের কেহ ফলকের নিম্ন দক্ষিণের দীপের খানিক অংশ কাটিয়া ফেলিয়াছেন। এই দুষ্কার্য্যের ফলে তাম্রপট্টের সম্মুখের পৃষ্ঠার ১৪ হইতে ২৩ পংক্তির প্রথম ভাগের ৪-৫টি করিয়া অক্ষর লোপ পাইয়াছে এবং পশ্চাতের পৃষ্ঠারও ২৯ হইতে ৪২ পংক্তির শেষ ভাগের ৪-৫টি করিয়া অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে এই রাজার অন্যান্য শাসনের পাঠের সাহায্যে কোন অক্ষর অধিকাংশই পুনরুদ্ধার হইতে পারিয়াছে। উক্ত সেওয়াল-উত্তীর্ণ সাভারের খ্যাতনামা বর্ত্তমান হেড মাষ্টার, আমার প্রাক্তন ছিত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত শুভপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, বি-টি মহাশয়ের নিম্ন ছাত্র শ্রীমান শান্তিরঞ্জন রায়ের পিতাকে তাম্রফলকখানি দেন। পরে শান্তিরঞ্জন তাহার প্রধান শিক্ষক গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ইহা উপস্থাপিত করে। গত ১৩ই জুন তারিখে শুভপ্রসাদবাবু সাভার হইতে ঢাকায় আসিয়া আমার নিকট এই তাম্রশাসনের আবিষ্কার বার্ত্তা বলেন এবং ১৭ই জুন তারিখে তিনি লোক মারফত তাম্রশাসনখানি আমার কাছে ইহার পাঠোদ্ধারকল্পে ও ব্যাখ্যা প্রকাশার্থে পাঠাইয়া দিয়া ঐতিহাসিকগণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। পাঠাদি কার্য্য সমাধানান্তে তাম্রশাসনখানি Dacca Museum এ রক্ষার্থে উপহৃত হইবে, ইহাও স্থির করা হইয়াছে।

মূল তাম্রশাসনের সাহায্যে ইহাতে কোদিত লিপির পাঠোদ্ধার হইতে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ঐতিহাসিক বিষয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিদ্বৎসমাজের আলোচনা ও বিচারার্থ অদ্য প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিতেছি।

মৃত্তিকা নীচে প্রোথিত থাকায়, তাম্রপট্টখানির কিছু অংশই নষ্টাবস্থায় এবং এই কারণে স্থানে স্থানে অক্ষরের সম্পূর্ণ বিলোপ না হইলেও, লিপীর অনবধানতায় যে সকল অক্ষর তাম্রপট্টে কোদিত হয় নাই, বা অসম্যক্ ভাবে কোদিত হইয়াছে তাহা যথাস্থানে সংযোজিত করিয়া দেখান হইয়াছে। আলোচ্য তাম্রশাসনখানির আয়তন প্রায় ৮½ × ৬½ ইঞ্চ।

ইহার দৈর্ঘ্যদেশে (মধ্যাহ্নে) যে রাজমুদ্রা সংযুক্ত আছে তাহার আয়তন প্রায় ৩½ × ৩½ ইঞ্চ এবং ইহার মাঝখানের ব্যাস প্রায় ২ ইঞ্চ পরিমিত আছে। রাজমুদ্রায় "শ্রী-শ্রীচন্দ্রদেবঃ" এই নামটি উচ্চভাবে উৎকীর্ণ দেখা যায়। রাজার নামের উপর প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মচক্রের লাঞ্ছন। ধর্মচক্রটির উভয় পার্শ্বে নূন সমসাময়িক সারনাথের মৃগমিথুন বা মৃগযুগলের মূর্তিরূপে দুইটি সমাসীন মৃগমূর্তি উৎকীর্ণ। দেখা যায় যে, এই রাজমুদ্রাতে একটুকু ছিদ্র করিয়া চারিটি বৃত্ত আছে। ক্ষুদ্রতম চতুর্থ বৃত্তটির নিম্নে রাজার নামটি ও তদুপরি ধর্মচক্র ও মৃগযুগল একটি পুষ্পময় বেদির উপর উৎকীর্ণ। মুদ্রার চতুষ্পার্শ্বের ক্ষুদ্রপাঠার লাঞ্ছন আছে। রাজারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া রামপাল লিপির মুদ্রাতে রাজার নামের নীচে যে অর্ধচন্দ্রের লাঞ্ছন দেখা যায়, এই লিপির মুদ্রাতে তাহা লক্ষিত হয় না। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ অনেকেই বলেন যে, বাঙ্গালার পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও সমতটের গৌড়ীয় পালরাজগণের তাম্রশাসনগুলিতেও এই প্রকার মৃগমূর্তিমণ্ডিত ধর্মচক্রমুদ্রা সংযোজিত আছে।

তাম্রশাসনখানির সম্মুখের পৃষ্ঠাতে ২০ পংক্তি ও পশ্চাতের পৃষ্ঠাতে ১৯ পংক্তি, একুনে ৩৯ পংক্তি, লেখা বিদ্যমান। তাম্রলিপি গদ্যপদ্যময় সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সম্মুখের পৃষ্ঠায় ১৭ পংক্তি পর্য্যন্ত আটটি শ্লোকে রাজকবি নিজ প্রভুর বংশের অবদান বর্ণনা করিয়াছেন; তার পরে ২৯ পংক্তি পর্য্যন্ত লিপির গদ্যাংশ। তৎপর ৩৩ পংক্তি পর্য্যন্ত দানপ্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণের বংশকীর্তি ছয়টি শ্লোকে লিপিবদ্ধ আছে। তদনন্তর ৩৭ পংক্তি পর্য্যন্ত পুনরায় খানিকটা গদ্যাংশ আছে। তাহার পর ৪১ পংক্তি পর্য্যন্ত লিপিতে ধর্মানুশংসী তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্বশেষে ৪১ ও ৪২ পংক্তিতে রাজার রাজাদেশ ও তারিখ ও দুইজন উপস্থিত রাজপারিষদীয় অধিকারের সাংকেতিক স্বাক্ষরচিহ্নরূপে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি অক্ষর লক্ষিত হয়। ইহাতে রাজার রাজ্যের ৪৪ সংবৎসর মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের ২৮ তারিখ দানপ্রদানের কাল বলিয়া উল্লিখিত পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীচন্দ্রের এক পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত দানপত্রিকাগুলির মধ্যে কেবল ঢুলাতে প্রাপ্ত লিপিতেই ৪৪ সংবৎসর উল্লেখ আছে এবং ইদিলপুর, রামপাল ও বেতারপুর লিপিগুলিতে কোন সন-তারিখ পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে রাজকবি, লিপিকর ও শিল্পীর নামোল্লেখ নাই।

তাম্রপট্ট ক্ষোদিত অক্ষরগুলি দেখিতে সুন্দর ও সর্বত্র সমাকার। প্রত্যেক অক্ষরের মাপ প্রায় ¼ ইঞ্চ হইবে। যে অক্ষরে শাসনলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহাকে দশম-একাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষর বলিয়া পরিচিত করা যায়। পালরাজ নারায়ণপাল, প্রথম মহীপাল ও মদনপালের সময়ের লিপির অক্ষরের আকার ও সংযুক্ত বর্ণাদির ধরণ হইতে, পর্য্যালোচনা করিলে শ্রীচন্দ্রের লিপিগুলিতে উৎকীর্ণ অক্ষরের কালনিরূপণ অনেকটা সম্ভবপর হইতে পারে। মনে হয় যে, আমরা তেত্রিশ বৎসর পূর্বে রামপাল তাম্রশাসনের অক্ষরের কাল একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া যে নির্দেশ করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা সমীচীন হয় নাই। লিপিকাল আরও প্রায় এক শতাব্দী পিছাইয়া যাইবে। লিপির অক্ষরের পরিচয়ের সঙ্গে ইহাতে লক্ষিত কয়েকটি বর্ণবৈশিষ্ট্যের কথা বলার প্রয়োজন বোধ করি। বাঙ্গালীরা যে উচ্চারণে বর্গীয় (ব) ও অন্তঃস্থ (ব)-এর ঐক্য করেন না, ইহা যেন অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে; কারণ, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় রচিত, লিখিত ও উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিতেও এই দুই প্রকার ব-কারের জন্য পৃথক অক্ষরকে ব্যবহার করেন নাই। বর্তমান তাম্রশাসনেও আমরা ইহার প্রমাণ অল্পই পাইতে পারি। আর একটি বৈশিষ্ট্য—'শ'-সংযোগে অনুস্বার 'ঙ'-তে পরিণত হয়, যথা 'বংশে' (৫ পংক্তি) ও 'করাঙশুঃ' (৭ পংক্তি)। এই লিপিতে কোথাও কোনও স্থানে অবগ্রহ বা লুপ্ত-অকারের চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে (যথা, ৭, ৮ ও ২১ পংক্তিতে), আবার কোথাও কোথাও স্থানে ইহা ব্যবহৃত হয় নাই (যথা, ২, ১২ ও ১৪ পংক্তিতে)। রেফ-সংযোগে

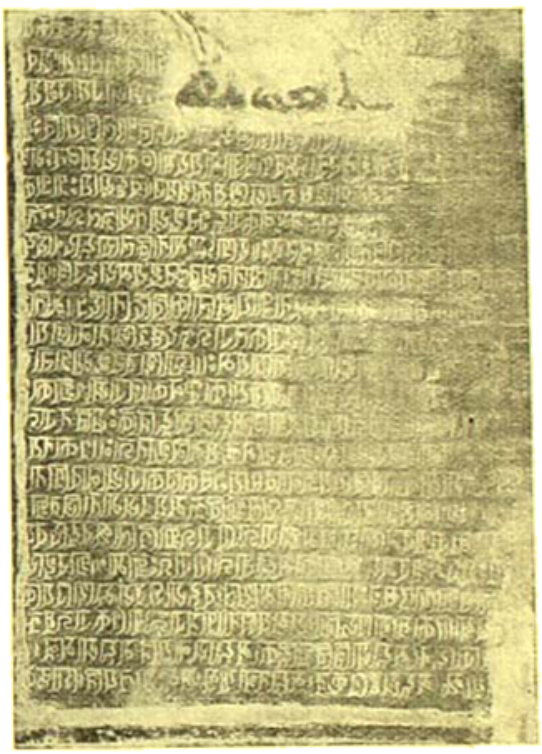

মদনপুরে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্রদেবের নূতন তাম্রশাসন—সম্মুখের পৃষ্ঠা

চ, ণ, ত, ন, ম, য ও ব—এই ব্যঞ্জন বর্ণগুলির দ্বিত্ব-সাধনও এই কালের লিপির একটা বৈশিষ্ট্য বিশেষতঃ এই অবস্থায় 'ণ'-কারের দ্বিত্বরূপটা।

বিশিষ্ট বন্ধুর অনুরোধেও আমার লিপিটিকে 'সাতার তাম্রশাসনলিপি' বলিতে ইচ্ছা করি না। ঐতিহাসিকের বিবেচনায় ইহার প্রাপ্তিস্থান মদনপুর মৌজার নামানুসারে ইহাকে মদনপুর-লিপি বলিয়া আখ্যাত করা শ্রেয়। সর্বত্রই আমরা প্রাপ্তিস্থানের নাম অবলম্বন করিয়াই তাম্রশাসন ও প্রস্তরপ্রশস্তি প্রভৃতির নামকরণ বিধান করিয়া থাকি।

(ঢাকা জেলার অন্তর্গত) বিক্রমপুরে মদনপুর অবস্থিত জয়স্কন্ধাবার (রাজধানী বা রাজসেনানিবাস স্থল) হইতে, ধর্মচক্রমুদ্রাসংযুক্ত এই তাম্র

শাসন শাসাইয়া, চন্দ্রবংশীয় (অতএব, ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত), মহারাজাধিরাজ শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবপাদানুধ্যাত, পরমসৌগত, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেব,—বেদবিদ্যাপারগ লোমশ এক ব্রাহ্মণকুলের মহাযেবনাশ্বা দ্বিজের প্রপৌত্র, বরাহ নামধেয় দ্বিজের পৌত্র ও হরনাথধারী দ্বিজের পুত্র, বিদ্বান্বিত ঋগ্বিবিৎ, আর্য্য, সজ্জনশ্রেষ্ঠ ও হাস্যমুখে অতিথ্যাবণশীল ব্রাহ্মণ শুভদেবকে—তাঁহার বিজয়রাজ্যের ৪১ সংবতে (সম্ভবতঃ ভাদ্রমাসের) অমাবস্যা তিথিতে স্নানপূর্ব্বক ভগবান বুদ্ধ ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া, মাতাপিতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত, সমস্ত রাজপাদোপজীবী ও ব্রাহ্মণোত্তরদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, যথাবিধি উদক-স্পর্শসহকারে—শ্রীসৌভূ কুক্তির অন্তঃপাতী বোলাবাটস-

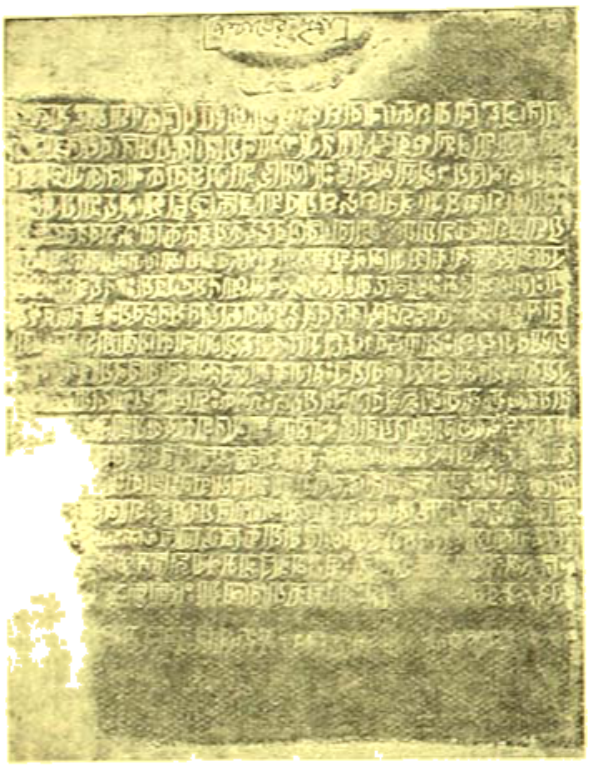

মদনপুরে-আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্রদেবের নূতন তাম্রশাসন—পশ্চাতের পৃষ্ঠা

স্থিত (বঙ্গসাগর-সংভাগারিষক-নামক ?) এক গ্রামে (বা বিষয়ে ?) আটদ্রোণ পরিমিত ভূমি দান করিয়াছিলেন। কত আঢকাদিমান পরিমিত ভূমিদহ আটদ্রোণ ভূমি রাজার দানের বিষয়ীভূত ছিল, তাম্রপট্টখানির কতক অংশ খণ্ডিত বলিয়া তৎস্থিত অক্ষরসমূহ বিলুপ্ত হওয়ায়, তাহা সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না।

এখন এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে আমরা কি কি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইতেছে। শ্রীচন্দ্রদেবের রামপালে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে রাজবংশের বিবৃতিসূচক যে শ্লোকাটক আছে, এই মদনপুর শাসনেও সেই আট শ্লোকই আছে। সেদিন ঢাকা মিউজিয়মে দেখিলাম যে, ডাঃ ভট্টশালীর আবিষ্কৃত ঘুরাগ্রামের শাসনেও ঐ আট শ্লোক আছে, ফরিদপুর জেলার কেদারপুরে আবিষ্কৃত তৃতীয় শাসনের নূতন নূতন শ্লোকাবলীর মধ্যে "শ্রীঃ পাথিবশাস্ত—" ইত্যাদি প্রতীকের শ্লোকটিও আছে। স্বর্গীয় পদ্মমোহন লস্কর-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত ফরিদপুরের ইদিলপুরে প্রাপ্ত এখন শাসনে কেদারপুরলিপির শ্লোকাবলীর কয়েকটি ব্যতীত, রামপাল ঘুরা ও আলোচ্য মদনপুর শাসনের কোন কোন শ্লোকও বিদ্যমান আছে। সে যাহা হউক, রাজবংশের পরিচয় বিজ্ঞাপক শ্লোকগুলি যেন দুইপ্রকার মূলাবিধা অবলম্বন করিয়া রচিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। ফরিদপুরের লিপিগুলিতে অনেকাংশে একপ্রকার ও চাকার লিপিগুলিতে একটু অন্যপ্রকার। উপরি উল্লিখিত শ্লোকাটকের লিপিপ্রারম্ভসূচক প্রথম শ্লোকে রাজকবি—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—এই 'ত্রিরত্নের' উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়া স্বয়ম্ভুর বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগের নিদর্শন ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিপুল সম্পদের অধিকারী চন্দ্ররা রোহিতাগিরি নামক স্থানে বিরাজভোগ করিতেন এবং সেই বংশেই পূর্ণচন্দ্র নামক অত্যন্ত প্রভাবশালী এক ব্যক্তি ছিলেন। যদিও তিনি সেই রোহিতাগিরি বা অন্য কোন স্থানের রাজা ছিলেন বলিয়া ইহাতে কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তথাপি তিনি যে স্বপ্রভাবে রাজতুল্য ব্যক্তি ছিলেন, তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে। তাঁহার নিজের (বা তাঁহার প্রধানের) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাসমূহের পাদপীঠে তাঁহার নামে অঙ্কিত হইত, এবং তিনি সৎসন্ততির বংশধর বলিয়া অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার নামে নিজের স্থাপিত অনেক মঠসমূহ ও তাম্রশাসনের প্রশস্তিতেও পঠিত হইত। সুতরাং শ্রীচন্দ্র রাজার প্রপিতামহ পূর্ণচন্দ্রকে আমরা রাজতুল্য প্রভাবশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিতি পাইতেছি। চন্দ্রবিষয়ের আদি স্থান বলিয়া বর্ণিত এই রোহিতাগিরির অবস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। আমিও এক সময়ে রোহিতাগিরিকে বিহার প্রদেশের সাহাবাদ জেলার রোহিতাশগিরি বা রোটাসগড় বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু, এখন মনে হয়, ডাঃ ভট্টশালী যে এই রোহিতাগিরিকে পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা সহরের অল্প পশ্চিমস্থ 'লালমাই-পাহাড়' বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন, তাহাই সঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ চন্দ্ররা আদিতে বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলের লোক ছিলেন এবং তাঁহারা রোহিতাগিরি হইতেই ক্রমশঃ প্রাচীন বঙ্গের অন্যান্য স্থানে অধিকার বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে শ্রীচন্দ্রের পিতামহ সুবর্ণচন্দ্রের জন্ম ও নামকরণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সুবর্ণচন্দ্র চন্দ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চন্দ্রের সহিত প্রাচীন কোনও জন্মে চন্দ্রস্থিত-শশক জাতক বর্ণিত বুদ্ধদেবের সম্বন্ধ আছে—এই জন্যই লোকেরা সুবর্ণচন্দ্রকে "বৌদ্ধ" বলিয়া অভিহিত করিত। পঞ্চম শ্লোকে বেশ একটু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র (অর্থাৎ তাম্রশাসনদাতা শ্রীচন্দ্রের পিতা) ত্রৈলোক্যচন্দ্রের গুণাবলীর কথা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া, তিনি ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র বলিয়া বিদিত ছিলেন। এই ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ব্বে চন্দ্রবীপের নৃপতি হইয়াছিলেন এবং রাজকবি তাঁহাকে—

"আধারো ভুবিকেল রাজকুলজৈরভ্যর্চিতানাং বিরাং"—

এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়া এবং রাজার স্বপ্নের পরবর্তী ঐতিহাসিকদিগের ব্যাখ্যা সহজ বাড়াইয়া দিয়াছেন। এই বিশেষণটির সহজ অর্থ এই যে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র সেই রাজলক্ষ্মীরই আধার বা অধিকারভুক্ত ছিলেন, রাজলক্ষ্মীর 'স্থিত' বা স্থায়িরূপে উদ্ভাসিত ছিল হরিকেলরাজ্যের রাজচ্ছত্রধারী (শ্বেত) ছত্রটি। সংস্কৃত সাহিত্যে রাজছত্রকে রাজলক্ষ্মীর হস্তরূপে বর্ণনা একটি সাধারণ আলঙ্কারিক রচনা কৌশল। হরিকেলরাজ্যের রাজলক্ষ্মীর 'আধার' ছিলেন ত্রৈলোক্যচন্দ্র। এই বচনটি হইতে সাধারণ ব্যাখ্যার উদ্ভব হইতে পারে। ত্রৈলোক্যচন্দ্র কি নিজেই কোন সময়ে হরিকেলের রাজা হইয়াছিলেন? অথবা, তিনি অন্য কোন হরিকেল রাজের কোন বিশিষ্ট সামন্ত বা রাজকর্মচারী ছিলেন? কিংবা, পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্র উপযুক্ত পুত্র শ্রীচন্দ্রদেবের বল বা হরিকেল রাজ্যের রাজলক্ষ্মীর আধার স্বরূপ ছিলেন? কেহ মনে করেন তিনি পূর্বে হরিকেলের রাজা থাকিয়াই চন্দ্র বংশের দিকে রাজ্য বিস্তার করিয়া লইয়া চন্দ্রদ্বীপের "নৃপতি" হইয়াছিলেন। আবার কেহ মনে করেন যে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্বে চন্দ্রদ্বীপেরই রাজা ছিলেন, পরে তিনি হরিকেলেও স্বরাজ্য বিস্তার করিয়া লইয়াছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমাদের আলোচ্য শাসনখানি অন্তত একাদশ শতাব্দীর লিপি। একাদশ শতাব্দীর সন্ধ্যাকরনন্দিনী রামচন্দ্র (রাজ ১০৮৯ খৃষ্টাব্দে) "সমতট হরিকেলীয় অঙ্গাদ্যুপোপনক্ষিতাঃ" এইরূপ অভিধান করিয়া গিয়াছেন। অঙ্গদেশ ও চম্পা অভিন্ন বলিয়া সকলেই গ্রহণ করেন, তবে এই অভিধান হইতে বঙ্গদেশই যে হরিকেলদেশ তাহা বুঝিয়া লইতে ইতস্তত: করার কারণ দেখা যায় না। আমার বিশ্বাস যে, যে বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল বিক্রমপুর, সে দেশের নাম একাদশশতাব্দীতে হরিকেল বলিয়াও আখ্যাত হইত। তাহা হইলে, শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্র প্রথমত: চন্দ্রদ্বীপের "নৃপতি" ছিলেন এবং পরে তিনি উত্তরাধিকারিত্ব বঙ্গ বা হরিকেল দেশে নিজ আধিপত্য ক্রমশ: বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রদেবের সব শাসনেই তিনি নিজ পিতা ত্রৈলোক্য-চন্দ্রকে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করিয়া নিজেকে তৎপুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তাই মনে হয়—চন্দ্র-নরপতিদিগের মধ্যে প্রথমত: ত্রৈলোক্যচন্দ্রই মহারাজাধিরাজরূপে রাজশাসন আরম্ভ করেন। শাসনে উল্লিখিত চন্দ্রদ্বীপ প্রধান বর্তমান বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর ও খুলনা জেলার অংশবিশেষ লইয়াই দক্ষিণ দিকে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোটের উপর দাঁড়াইয়া সমস্ত ইহাই বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপ নামে কথিত হইত। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীকল্যাণবতী জিহ্বা বা কায়ার গর্ভে 'রাজবোধের' ওরসে সুবর্ণে শ্রীচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীচন্দ্রদেবে যে ভবিষ্যতে রাজা হইবেন জ্যোতিষীরা এই কথা তাঁহার জন্ম সময়ে তাঁহার কোষ্ঠী রাজচিহ্ন সকল দেখিয়া গুণিয়া বলিয়াছিলেন। অষ্টম শ্লোকেও কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। তথায় বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীচন্দ্র পূর্ব জন্মের বিদ্বেষ ছিলেন না, অর্থাৎ তিনি সতত প্রজাজনের সঙ্গ করিয়া, রাজলক্ষ্মীকে 'একান্তসম্ভাবনা' করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অর্থাৎ বঙ্গদেশকে একচ্ছত্রাধিপত্যের বিভীষিত করিয়াছিলেন, এবং এই কার্য্য সাধন তিনি অনেক সময়কে আত্মবিরুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে, তিনি দিগ্‌মণ্ডলে বিশেষভাবে যশস্বী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাধীন রাজ্যাধিপ হইয়া তিনি অন্যূন ৪৪ বৎসর পর্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন,—এই তাম্রশাসন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কোন্ শত্রুবিগ্রহকে বঙ্গদেশ হইয়া তাড়াইয়া ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র ইহাতে একচ্ছত্রাধিপত্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা কঠিন। দশম শতাব্দীতে গৌড়-মণ্ডলের পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রধান ভুক্তির নাম ছিল পৌণ্ড্রভুক্তি বা পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি। শ্রীচন্দ্রের শাসন পত্রকে দেখা যায় যে, তিনি রাজ্যের যে-সব বিষয় বা জেলায় ও যে-সব মণ্ডলে অবস্থিত গ্রামাদিতে ভূমি দান করিয়াছিলেন, সে-সব বিষয় ও মণ্ডল পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গতী ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাই মনে হয়, পাল সাম্রাজ্যের প্রথম গৌরবের দিনে অর্থাৎ প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যকাল পর্যন্ত বঙ্গদেশে পাল রাজাদিগেরই আধিপত্য ছিল। কোন্ বিপ্লবের অবসরে যে পালরাজগণের কবলগত হস্ত হইতে বঙ্গদেশ বৌদ্ধ রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র পুত্র শ্রীচন্দ্রের করগত হইয়াছিল তাহা এখন পর্যন্ত একটি ঐতিহাসিক সমস্যা বিশেষ। তবে দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজনৈতিক দুরবস্থার সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়া থাকিবেক।

পঞ্চম-ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন বঙ্গ ও সমতট প্রদেশ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্বন্ধ লইয়া গুপ্ত সম্রাটদিগের রাজ্যান্তর্গত ছিল। ৫০৭-৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত (প্রাচীন সমতটের) ত্রিপুরা জেলার ভুলাইঘর লিপির আবিষ্কারের পর দেখা যায় যে, সেই লিপির মহারাজ বৈন্যগুপ্ত একরূপ স্বাধীনভাবেই সমতটে শাসন পরিচালনা করিতেন। তৎপর সম্ভবত: বঙ্গ ও সমতটেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের সাময়িক রাজত্বয়। তাঁহারা ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। এই কথা ফরিদপুর জেলার ও বর্দ্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহাদের তাম্রশাসন নিচয় হইতে অনুমিত হয়। ঢাকা ও কুমিল্লা জেলায় আবিষ্কৃত লিপি হইতে তৎপরবর্তী কালের অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর খড়্গবংশীয় বৌদ্ধ রাজা দেবখড়্গাদির রাজত্বের কথা জানা গিয়াছে এবং তাঁহারাও যে সমতটের স্বাধীন রাজা ছিলেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা। প্রাচীন বাঙ্গালার পূর্বাঞ্চলের দেব বিশেষে নাথবংশীয় লোকনাথ নামক এক সামন্ত নরপতির (ত্রিপুরা জেলার প্রাপ্ত) একখানি তাম্রশাসন হইতে আমরা বঙ্গ সমতটের অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাইয়াছিলাম (১৩৫১ বঙ্গাব্দের "সাহিত্যের" জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই লিপিতে জীবধারণ নামক এক নরপতির উল্লেখ ছিল। তিনি যে কোন্ স্থানের রাজা ছিলেন তাহা তখন আমরা কেহই নির্ণয় করিতে পারি নাই। কিন্তু, ঐতিহাসিকগণের সৌভাগ্য-ক্রমে সম্প্রতি ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কইলাং নামক এক স্থানে আবিষ্কৃত শ্রীধারণ নামক এক "সমতটেশ্বরের" একখানি তাম্রশাসন

আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিগত বৈশাখ মাসের "ভারতবর্ষে" বন্ধুবর চট্টগ্রাম শ্রীবিমলেন্দ্রচন্দ্র সরকার মহাশয় তাহা হইতে সর্বপ্রথম উদ্ধৃত করিয়া যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায় যে, আমাদের লোকনাথ পালদের জীবনরক্ষা মূর্তিই ছিলেন এই ফইলার তাম্রশাসনের লব্ধপ্রতিষ্ঠা শ্রীনারায়ণপালদেবের পিতা। পিতা ও পুত্র উভয়েই সেই শাসনে "সমতটেশ্বর" বলিয়া আখ্যাত। প্রাচীন সমতট যে পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলা লইয়া অবস্থিত ছিল—এই বিষয়টি এখন একরূপ নিঃসন্দেহ ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গৃহীত হওয়ার যোগ্য। তার পর চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ কান্তিদেবের অসম্পূর্ণ তাম্রশাসনলিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি বর্দ্ধমানপুর নামক রাজধানী হইতে সেই শাসন সম্পাদন করিয়াছিলেন। কান্তিদেব হরিকেল মণ্ডলের ভবিষ্যৎ রাজাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিপিমধ্যে আদেশ নির্দ্দেশ করায় মনে করা যাইতে পারে যে, তিনি হরিকেল মণ্ডলের উপর স্বকীয় রাজপ্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। কোন কোনও ঐতিহাসিক এই শাসনোক্ত বর্দ্ধমানপুর ও বিক্রমপুরকে অভিন্ন বিবেচনা করেন। এই চট্টগ্রাম লিপির বিস্তৃত পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাকে সুদীপ্ত অষ্টম-নবম শতাব্দীর অক্ষর বলিয়া স্থির করেন। প্রাচীন বঙ্গ, সমতট ও হরিকেলের উপরে যিনিই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ এই যুগে লিপিবদ্ধ করিবার কারণ এই যে, আমরা দেখিতেছি যে, বঙ্গ পূর্ব্বকাল হইতেই বঙ্গাধিপেরা স্বাতন্ত্র্যাবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তৎপর গৌড়-মগধে অষ্টম শতাব্দীতে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, সম্ভবতঃ দশম-একাদশ শতাব্দীর কোন সময় পর্য্যন্ত 'বঙ্গ' অর্থাৎ পূর্ব্ব দক্ষিণ বাঙ্গালাপ্রদেশ গৌড়বর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী থাকিয়া পাল নরপালদিগের শাসনাধীন ছিল। তবে কোন্ সময়ে যে চন্দ্র নৃপতিরা পালরাজবংশের আধিপত্য হইতে বঙ্গকে মুক্ত করিয়া সেই বেশ পুনরায় স্বশাসনতন্ত্রের মধ্যে আনিয়াছিলেন, তাহা যে একটি সমস্যাপূর্ণ প্রশ্ন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা এখন একরূপ নিশ্চিত সত্য যে, বিক্রমপুর রাজধানীক বর্ম্মরাজবংশের বঙ্গরাজ্য চন্দ্ররাজবংশের রাজাশাসনের পরবর্ত্তী যুগের রাজা বলিয়াই গণনীয়। চট্টগ্রাম ফইলার ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ কুমিল্লা সহরের কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ভারেরা গ্রামে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্রের ৩য় বর্ষের মূর্ত্তির পাদপীঠ লিপিতে উল্লিখিত রাজা শ্রীচন্দ্রকেও আলোচ্য শাসনের চন্দ্ররাজদিগের বংশেরই লোক মনে করেন। সে যাহা হউক, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা গোবিন্দচন্দ্র নামক এক রাজার যে দুইখানি প্রস্তর লিপির সংবাদ ভট্টশালীর আবিষ্কার হইতে অবগত হইয়াছি, প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাসে তাহার মূল্য পরাজয় অধিক। ফরিদপুর জেলায় মুলফুড়ি গ্রামে আবিষ্কৃত প্রস্তরময় বুদ্ধ মূর্ত্তির পাদপীঠ লিপির কাল গোবিন্দচন্দ্রের ১২ সংবৎ এবং ঢাকা জেলায় বেতৃকা (বেতিবাড়ী) গ্রামে আবিষ্কৃত প্রস্তরময় বাসুদেব মূর্ত্তির পাদপীঠ লিপির কাল সেই রাজারই ২৩ সংবৎ বলিয়া উল্লেখিত পাওয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্র এবং একদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় পর্ব্বতগাত্রে খোদিত লিপিতে উল্লিখিত ১০২৩ খৃষ্টাব্দে পরাজিত বঙ্গাধিরাজ গোবিন্দচন্দ্র একই ব্যক্তি হইবেন। বর্দ্ধমান ফরিদপুর ও ঢাকা জেলাদ্বয় যে প্রাচীন বঙ্গ বা বঙ্গাল দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা বলা একবারেই অনাবশ্যক বোধ হয়। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, বঙ্গাধিপ এই গোবিন্দচন্দ্র শ্রীচন্দ্র রাজারই বংশধর তাহাও একবারে উড়াইয়া দেওয়ার বিষয় নহে। শ্রীচন্দ্রকে আমরা এখন আলোচ্য লিপির বলে অন্ততঃ ৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে দেখিতে পাইতেছি। আর যদি গোবিন্দচন্দ্র শ্রীচন্দ্রেরই বংশধর ও উত্তরাধিকারী সূত্রে বঙ্গাল দেশে রাজত্ব করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার অন্যূন ২৩ বৎসর রাজত্বের কাল ইহাতে যোগ করিলে, আমরা এই দুই রাজার রাজত্বকালের পরিমাণ অন্ততঃ ৬৭ বৎসর পাইতে পারি। তবে ভবিষ্যতে ইহার অনুকূল প্রমাণস্বরূপ আরও তাম্রলিপি বা প্রস্তর প্রশস্ত্যাদি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এই বিষয়ে নিঃসংশয়ে কোন কথা বলিতে পারি না। সর্ব্বশেষে বলিতে হয় যে, আমরা বৌদ্ধ পালরাজদিগকে যেমন ব্রাহ্মণবংশীয় প্রধান প্রধান মন্ত্রীদিগের সাহায্যে রাজ্য শাসন কার্য্য চালাইতে দেখিতে পাই এবং যেরূপ ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিতে দেখিতে পাই, তেমন অনেক বৌদ্ধ রাজা শ্রীচন্দ্রকেও যেরূপ আর্য্য লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণ শ্রীবিষ্ণুকে ভূমিদান করিতে দেখিতে পাইতেছি। প্রাচীন যুগে ধর্ম্ম বিষয়ে মিশ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে সাহিত্যের সৌহার্দ্দ স্থাপিত ছিল—পরস্পরের ধর্ম্মে অসহিষ্ণু ভাব লক্ষিত হইত না। সে-কালে ও একালে এই বিষয়ে কত প্রভেদ!

পরের সংখ্যায় ময়নপুর লিপির উদ্ধৃত পাঠ ও ইহার টীকা সহ যথাসুখায় প্রকাশিত হইবে।

স্যালভেজ

শ্রীসন্তোষকুমার দে

যুদ্ধের ঠিকাদারিতে কিছু টাকা পেয়েছিল অবিনাশ, এখন সেটাকে কোন লাভজনক কারবারে খাটিয়ে দশগুণ বাড়িয়ে তুলবার সন্ধানে ঘুরছিল। সন্ধান পাওয়া গেল পূর্ববঙ্গের একটি সহরে অনেকগুলি মোটর গাড়ী, চাকা আর অন্যান্য সরঞ্জাম জলের দরে বিকোচ্ছে, পাঁচ হাজারে কিনলে পঞ্চাশ হাজার মিলবে তাতে সন্দেহ নেই। শুভ্যস্তু শীঘ্রম্, বিলম্ব করলে প্রকাশ্যে নিলাম হবে, দাম উঠবে চড় চড় করে, তার আগে কিছু গোপন বন্দোবস্তের চেষ্টা করাই অবিনাশের অভীপ্সা।

অপরাহ্নের একটা গাড়ীতে সে এসে সেই সহরে পৌঁছুল। সহরটা তার জানা নয়, তবে তার একজন পূর্বপরিচিত ব্যবসায়ী বন্ধু আছেন এখানে। বাক্স বিছানা হোটেলে ফেলে সে গেল সেই বন্ধুর সন্ধানে। বন্ধুর দোকানটি মনোরম, বৃদ্ধের দোলতে ভরে গেছে যেটুকু গর্ত যেখানে ছিল এমনি একটা পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের ছাপ। মফঃস্বলে এমন দোকান দেখতে পাবে অবিনাশের ভরসা ছিল না।

কিন্তু বন্ধু খগেনবাবুর সাথে সাক্ষাৎ হ'ল না। ছিল তার ভাই নগেন, বল্লে—দাদা শিলং গেছেন, কিন্তু আপনি তাই বলে যেন কিছু অসুবিধা বোধ করবেন না, আমি তো আছি।—আমি আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন?

অবিনাশের ইচ্ছা ছিল না সবার সামনে কথাটা বলে, তাই নগেনকে ভিতরে ডেকে নিয়ে সংক্ষেপে তার আগমনের উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে বল্লে। নগেন বল্লে—তার জন্য কি, আমাদের গাড়ী নিয়ে আপনি ঘুরে আসুন না, এখনও বেলা আছে। স্যালভেজ ডিপো বেশী দূরে নয়, ময়নামতী পাহাড়ের কোলে কয়েকটি ডিপো। সোফার সব চেনে, সেই আপনাকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনবে।

দোকানের অদূরে একটি সিডান বডির ঝকঝকে গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। সামনেই একটা বড় ব্যাঙ্ক, গাড়ীখানা ব্যাঙ্কের কোন পদস্থ কর্মচারীর হবে এটা ধারণা করাই সহজ। কিন্তু কথা বলতে বলতে নগেন অবিনাশকে সেই গাড়ীর কাছেই নিয়ে এলো এবং ময়নামতী পাহাড়ের পথের নির্দেশ সোফারকে বুঝিয়ে দিয়ে অবিনাশের জন্য সে দোকানে প্রতীক্ষা করবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে গেল। গাড়ীতে বসে গদির নোলায়েম মখমলে হাত বুলাতে বুলাতে অবিনাশ ভাবলে—বুকে সবাইকে পূর্ণ করে দিয়ে গেছে, আশাতীত লাভবরণ করে দিয়ে গেছে।

সেই তো খগেনবাবু, পটলডাঙ্গার মেসে পুঁই ডাটা চচ্চড়ি আর চিংড়ি মাছের ঝোল খেতে খেতে যিনি অবিনাশের সাথে রাজনীতি ও সমাজনীতির জগাখিচুড়ি আলোচনা করতেন, মাসান্তে মসীজীবির বেতন—মেস খরচা বাঁচিয়ে বাড়ী পাঠাতে কুলাতো না, মাসের ভিতর পঁচিশ দিন অমৃতবাজার আর ষ্টেটস্‌ম্যানের ওয়ান্টেড্ কলম পড়ে ভালো চাকুরীর সন্ধান করতেন আর সুবিধা বুঝলেই দরখাস্ত ঝাড়তেন। তারপর কোথা দিয়ে কি হ'ল, খগেনবাবু সত্যিই চাকরি ছাড়লেন, লাগলেন ঠিকাদারি কারবারের অংশীদাররূপে। মাস ঘুরে বছর, বছরের পর বছর ঘুরে তার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়িয়েছে, অংশীদার হ'তে পৃথক হ'য়ে এসে তিনি নিজের কারবার গড়ে তুলেছেন। বৃদ্ধ খগেনবাবুকে সত্যি অজস্র দিয়ে গেছে। বাড়ী গাড়ী কী তার না হয়েছে। বন্ধুর উন্নতির পরিমাণ দেখে অবিনাশের মনটা যেন জ্বলতে লাগল।

ময়নামতী পাহাড়—দূর বেশী নয়। উঁচু টিলা, কিছু গাছপালা, তারই নাম পাহাড়। এক সময়ে নির্জন ছিল, লোক চলাচল না থাকায় পথচারী ভয় পেত। হিংস্র বন্য জন্তুর অবস্থানের কথাও শোনা যেত, যুদ্ধের প্রয়োজনে উঁচুনীচু মাটিতে রচিত হয়েছে পথ, প্রয়োজনের কুঠারে কেটে বনস্থলীর বুকে গড়ে উঠেছে লস্করী দপ্তরখানা, মালখানা, তাবু, ঘর, গাড়ী রাখবার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ—কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। পথ কালো পীচে প্রখর। পথের মোড়ে আর প্রবেশদ্বারের দুপাশে পীচের ড্রাম খাড়া করা, খড়ি মাখান, গাছের গায়ে ক্যাম্পের নাম লেখা নোটিশবোর্ড।

যুদ্ধের সময় এই এলাকায় সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ

ছিল। দ্বারপথে সশস্ত্র শান্ত্রী প্রহরা থাকত। এখন সে ব্যবস্থা নেই। সোফার গাড়ী বড় রাস্তা হ'তে ভিতরে নিয়ে এলো। পথের দুপাশে স্তালভেজ, অগুণতি মাল জমা করা। পথটা যেখানে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে তারই কাছে একটা ছোট বটগাছতলায় গাড়ী থামিয়ে অবিনাশকে সোফার ক্যাম্পের কাছে নিয়ে এলো।

ক্যাম্পের লোকজন সোফারের পরিচিত, সেই সুবাদে অবিনাশকে সে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে। অবিনাশকে দিয়ে তাদের সকলেরই যে সুবিধা আছে, সে কথা তারাও বুঝলে, যখন অবিনাশ ছোট বড় সবাইকে কার্লটন স্পেশাল সিগারেট দিয়ে আপ্যায়িত করলে। ক্যানভাস আঁটা চেয়ার বেরুল, ওরই মধ্যে যিনি একটু মাতব্বর ধরণের তিনি হুকুম করলেন চায়ের জন্য। একজন নেপালী গেল চায়ের যোগাড়ে।

ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল অবিনাশ, সত্যি যেন চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। বোধ হয় আলিবাবা এমনি বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে দেখেছিল পাহাড়ের গুহায় লুক্কায়িত ধনরত্ন। মোটর, মোটরের মেসিন, মোটর বাইক, টায়ার, টিউব, ষ্টিয়ারিং শাফ্ট, ছোট বড় নানা আকৃতির ডায়নামো, কয়েকটি এরোপ্লেনের এঞ্জিন পর্যন্ত চেনা যায়। তা ছাড়া আরো যে কত কিছু স্তূপীকৃত হয়ে আছে তার সবটা এক দৃষ্টিতে দেখাও যায় না, চেনাও যায় না। কতগুলি প্যাকিং বাক্স খোলা হয়নি পর্যন্ত। পেট্রোলের টিন দিয়ে যেন ইটের পাঁজা সাজানো হয়েছে। ব্যারেল, এনামেলের পাত্র, কিট ব্যাগ—কি যে নেই তাই খুঁজতে হয়। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে পায়ে চলা ছোট পথ। উপরে উঠে গেলে অনেকদূর দেখা যায়। সবটা এই স্তালভেজ ডিপোর অন্তর্গত। অধিকাংশ মেসিন ও গাড়ী ভেঙ্গে চুরে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু কিছু খরচ করলেই আবার চালু করা যায় এমন যন্ত্রপাতির সংখ্যাও অনেক।

দেখতে দেখতে অবিনাশের চোখ ভারি হয়ে ওঠে। কত মানুষের হাতের স্পর্শ পাওয়া ওই জিনিষগুলি, কত দেশ দেশান্তর সাগর মরু পেরিয়ে, যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে এসে এই পাহাড়তলীতে বিশ্রাম করছে। রোদ লাগছে, ঘাস গজিয়ে উঠেছে ফাঁকে ফাঁকে। একটা কলসীলতা লতিয়ে উঠেছে একপাশে মোটর সাইকেলের উপর, জুটিয়ে দিয়েছে ফুলের মুখে প্রাণের আনন্দ। গতিমান যখন স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে, প্রকৃতি সুরু করেছে নিঃশব্দ সংহার সাধন।

সমস্তটা জুড়ে একটা এলোমেলো ব্যস্ততা যেন আকস্মিক ভাবে স্তব্ধ হয়ে গেছে। এর পশ্চাতের সংগ্রামশীল ইতিহাসের স্পষ্ট স্বাক্ষরগুলি অনায়াসেই চেনা যায়, কিন্তু সে যেন কত যুগ যুগান্তের কথা, এখন এই নিরীহ নিষ্প্রাণ যন্ত্রগুলির দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে একদা এরা গর্জন করে ছুটে গিয়েছিল বন পাহাড় নদী অতিক্রম করে, সৈন্যদের মালপত্র ও রসদ বহন করে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে যুদ্ধক্ষেত্রে। ডিমাপুর, ইম্ফাল, কোহিমার মাটি এখনও লেগে আছে এর অনেকগুলির চাকায় চাকায়—এ কথা যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না। এরোপ্লেনের একটা বিশাল সার্চলাইট ভেঙ্গে পড়ে আছে একপাশে, দেখে কি মনে হয় অল্পদিন আগেও সেটি উঠেছিল পৃথিবী ছাড়িয়ে উর্দ্ধে, ধেয়ে গিয়েছিল চারশো মাইল ঘণ্টায় শত্রুর শিবির হানা দিতে? অতীতের কিছু কি তার গায়ে লেখা আছে? জড়াজড়ি করে পড়ে আছে একটা চার হাজার ভোল্টের ডায়নামো—বিদ্যুৎগর্ভ সেই যন্ত্রটাও আজ স্তব্ধ।

অবিনাশ গেল এই মৃত বস্তুস্তূপের কাছে। দুপুরের দিকে বৃষ্টি হয়ে গেছে, জল জমে আছে ব্যারেলের মুখে, পেট্রোলের টিনের উপর গোলকরা চাকতিতে। লস্করেরা যে এলুমিনিয়মের পাত্রে খাবার খেত তার কয়েক হাজার এক জায়গায় জড়ো করা, তারো কতকগুলিতে জল জমে আছে, একটার মধ্যে ছোট একটি ব্যাঙ ভাসছে। যুদ্ধগত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলেই এখন এগুলির এত অনাদর, পড়ে আছে খোলামাঠে রোদ বৃষ্টির কৃপায়। কিছু বা বসে গেছে বালিতে কাদায়, ঘাসে চাপা পড়েছে কিছু, দুমাসপরে কাঁটালতায় ঢেকে যাবে আরো অনেকগুলি।

পরিত্যক্ত মালগুলির দিকে তাকিয়ে অবিনাশ যেন পিছন ফিরে তাকাতে পারল একবার। জীবনের দুপাশে এমন কত কিছু আমরাও কি প্রত্যহ রচনা করি না? যে পথ ধরে চলে যাই, ফিরে কি তাকাই তার দিকে প্রয়োজন ফুরাবার সাথে সাথে ফেলে চলে আসি। বাল্যের বন্ধুত্ব কৈশোরে ঝরে যায়, যৌবনের প্রিয়বস্তু প্রৌঢ়ত্বে নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

কিন্তু ভাবাপুত্য করতে অবিনাশ আসে নি। সে এসেছে এ মরা পাথর কেটে সৌভাগ্যের মণি জহরত আবিষ্কার করতে। স্যালভেজ সে কিনতে চায়। সে জানে, এই ভাঙ্গা মেশিন জোড়া দিয়ে চালিয়ে তুলতে পারলে তাতে প্রচুর টাকা মুনাফা পাওয়া যাবে—যুদ্ধের শেষ দান, মরা হাতীও লাখ টাকা।

তার ক্যাম্প চেয়ারে সে ফিরে এলো।

নেপালীর দেওয়া চা খেতে খেতে অবিনাশ কথাটা পাড়লে। ইন্-চার্জ যিনি তাঁর এ সব বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বল্লেন, আপনি চা খেয়ে নিন, আপনাকে আমি আমাদের অফিসারের কাছে নিয়ে যাবো। বিলাতি সাহেব, ভদ্রলোকের মান রাখতে জানে। কিন্তু বুঝছেন তো, খালি হাতে যাওয়া চলবে না। সাহেব আবার বিলাতি ছাড়া খায় না।

অবিনাশ তার পরদিন সন্ধ্যায় সময় স্থির করে ফিরে এলো। এসে নগেনকে ধরলে কিছু বিলাতি বোতলের জন্য। ওসবের সাথে বোতলের যে সম্বন্ধ থাকা কঠিন নয়, নগেন সে কথা অস্বীকার করলে না।

নগেন নিয়ে গেল তাকে দোকানের পিছনে—অফিস ঘরে। সেখানে অবিনাশের জন্য চা ও খাবার আনতে পাঠিয়ে সে গেলো বোতলের সন্ধানে।

বসে বসে অবিনাশ খবরের কাগজ পড়ছিল। খগেন যে স্থানীয় দুর্গতদের চিকিৎসার জন্য তার মায়ের নামে হাসপাতালে একটি ওয়ার্ড করে দিতে দশ হাজার টাকা দান করেছে সেই সংবাদটার পাশে লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া। সেই দাগটা অবিনাশের নজরে পড়ল। কাউকে ডেকে বিষয়টার সমস্ত তথ্য সে শুনবে বলে উঠে গেল।

পাশে আর একটা ছোট ঘর, সেখানেও আলো জ্বলছে। কৌতূহলের বশে উঁকি মেরে অবিনাশ অবাক হয়ে গেল। এখানেও একটা স্যালভেজ নাকি? নানা আকারের নানা ধরণের বিলিতি মদের বোতল ইতস্ততঃ ছড়ানো। স্বচ্ছন্দে এগুলোকে দোকানের জিনিষ বলে স্বীকার করে নেওয়া যেত, কিন্তু অবিনাশের মনই যেন বল্লে—তা নয়। বোতলগুলি এই ঘরেই খালি হয়েছে, উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, গড়িয়ে গেছে, তেমনি একটা অত্যাচারের চিহ্ন যেন সর্বত্র ফুটে আছে।

এ ঘরটা খগেনের খাস কামরা, প্রাইভেট লেখা আছে দরজার উপর। স্যালভেজ লেখা থাকলেও ক্ষতি ছিল না—মনে হ'ল অবিনাশের।

পরের সন্ধ্যায় গাড়ী নিয়েই অবিনাশ প্রথম গেল স্যালভেজ ডিপোয়, তারপর সেই গাড়ীতেই আরো কিছু দূরে অফিসারের ক্যাম্পে। ক্যাম্প না বলে তাকে বাংলো বলাও চলে। ভদ্রলোকটি যে সৌখিন সেটি বিজ্ঞাপিত হয়ে আছে খড়ের ঘরে, ক্যাম্পে, প্রাঙ্গনের দুপাশে ফুল বাগানে, বারান্দায় ঝোলা অর্কিডে, জানালায় ঝোলানো নীল রঙের পর্দায়। বেতের চেয়ার আর টিপয় পাতা। মিলিটারি পোষাক পরা ভৃত্য শ্রেণীর একজন লোক ডাকাডাকিতে বাইরে এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে জানালে—সাহেব বাইরে গেছে, ফিরবে এখুনি।

অগত্যা অবিনাশকে বসতে হ'ল।

দু'টা বোতল সাথে এনেছিল অবিনাশ, কিন্তু তা বাবে নগদ কি পরিমাণ দিতে হতে পারে তারই আলোচনা চলছিল ইন-চার্জ ভদ্রলোকের সাথে। এমন সময় একটি কুকুর আগে নিয়ে সাহেব সান্ধ্য-ভ্রমণ থেকে ফিরলেন। পশ্চাতে একজন সঙ্গিনী, খাকি শাড়ী পরা থাকলেও বাঙ্গালী বলে তাকে চেনা দুষ্কর নয়।

'খাস্-ইন-মিস্ সানিয়াল'—মৃদু হেসে সাহেব বল্লে মেয়েটিকে।

'এখন নয়'—জবাবে মেয়েটি বিশুদ্ধ ইংরাজিতে বল্লে—আটটায় গাড়ী পাঠিও।

'ভাটস্ গুড্'। গুডবাই ডার্লিং—শিস্ দিতে দিতে সাহেব ভিতরে গেল, আগে আগে কুকুর আর পিছে পিছে ইনচার্জ ভদ্রলোকটিকে নিয়ে।

মেয়েটি বারান্দা অতিক্রম হয়ে প্রাঙ্গণে নেমেছে, এবার অবিনাশ নিঃসংশয়ে চিহ্নকে চিনতে পারলে। কণ্ঠ স্বরটি পর্যন্ত বদলায়নি, শুধু শাড়ী বদলে সে অবিনাশকে ফাঁকি দেবে কেমন করে? নিজের অজ্ঞাতেই অবিনাশ ডেকে ফেল্লে—চিনু!

চমকে ফিরে তাকালে মেয়েটি, ভ্রূ কুঁচকে দেখতে চাইলে বারান্দার উপবিষ্ট কাউকে সে চেনে কিনা। তার পর আবার সে চলতে লাগল।

কিন্তু ততক্ষণে অবিনাশের সংশয় কেটে গেছে। সেও

নেমে এলো বারান্দা হ'তে এবং পথের বাঁকে মেয়েটির কাছাকাছি পৌঁছে আবার ডাকলে—চিত্র!

ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি, তারপর বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে অবিনাশের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বল্লে—তুমি? তুমি এখানে কি করে এলে, কবে এলে?

তার কথার কোন জবাব না দিয়ে অবিনাশ বল্লে, শুনেছিলাম, তুমি ইস্কুলে চাকরি নিয়ে রমনা ছেড়ে চলে এসেছিলে, কিন্তু এ কী রূপরিণী মূর্ত্তি?

'সে অনেক কথা'—মাথা নীচু করে বল্লে চিত্র—আর এক দিন শুনো, আজ আমি ব্যস্ত আছি।

অবিনাশ বল্লে—আমার সাথে গাড়ী আছে, এসো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। কোথায় থাকো তুমি?

সে অনেক দূরে, সেখানে তোমার যাওয়া চলতে পারে না, তোমায় আমি নিয়ে যেতে পারব না সেখানে, অধীর ভাবে বল্লে চিত্র, যেন পাশের কোন ঘরে আশ্রয় নিতে ছুটে যেতে পারলে সে বাঁচত। সে কাঁপছিল থরথর করে, অবিনাশ তার হাতের মুঠো নিজের হাতে তুলে নিয়ে বল্লে—ওই যে গাড়ী, এসো গাড়ীতে উঠে কথা হ'বে।

• • • •

কিছু বিবরণ শুনে অবিনাশ বল্লে—বুঝেছি, কাগজেও আমি কিছু কিছু পড়েছিলাম, কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি তোমরা, মানে তুমিও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছ। ভাগ্য অন্বেষণে যখন আমি ব্যস্ত, জীবন বিপন্ন করেও অর্থার্জনের আশায় উন্মত্ত, তখন তুমি যে এমন বিপন্ন হয়ে পড়েছিলে তাতো জানতে পারিনি। আমাদের এরোড্রমের কাজ শেষে যখন প্রথম রমনায় গেলাম, শুনলাম কোন্ ইস্কুলে চাকুরি নিয়ে ঢাকা হ'তে তুমি চলে গেছ। যাক্, যা হয়ে গেছে তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। তোমার অতসীদি, রেবাদি প্রভৃতি যারা সব একসাথে মাষ্টারি ছেড়ে অফিসার হওয়ার লোভে, টেকনিসিয়ান হওয়ার লোভে এই চাকরি নিয়েছিলে তাদের সব খবর ভালো?

ভালো? রিক্ততার হাসি হাসলে চিত্রা, বল্লে—অতসীদির একটি মেয়ে হ'তে যারা গেছেন, অত বয়সে প্রথম প্রসবে সাধারণত এমনটাই ঘটে থাকে। রেবাদির অবস্থাও এখন তখন। আমরা একসাথে অনেকেই ছিলাম।

অবিনাশ বল্লে—তোমার আর সেখানে যেয়ে কাজ নেই, আজকের ট্রেনেই কলকাতায় চলো।

চিত্রা দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বল্লে—কিন্তু সব তো এখনো শোননি তুমি। সব শুনলে তোমার মতি পরিবর্ত্তিত হ'বে।

অবিনাশ বল্লে—সব আর কি শোনাতে চাও? তোমার অতসীদি রেবাদির চেয়েও কিছু খারাপ অবস্থা যদি তোমার হয়ে থাকে তবু আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।

চিত্রা ম্লান কণ্ঠে বল্লে—ধরো তাই যদি সত্য হয় সেটা কি তুমি ক্ষমা করতে পারবে?

ক্ষমা? অবিনাশ চিত্রার হাত চেপে ধরে বল্লে—ক্ষমা আমারই চাওয়া উচিত—সমগ্র সমাজ ও দেশের হ'য়ে যারা তোমাদের রক্ষা করতে যায় নি, রক্ষা করতে পারে নি। তুমি চাইবে ক্ষমা!

• • • •

ট্রেনে বসে এতক্ষণে হাসতে পারলে চিত্রা, বল্লে—কিন্তু শুধু আমাকে নিয়েই ফিরে চল্লে, তোমার স্যালভেজ কিনবার কি হ'ল, যার জন্য এতদূর ছুটে আসা?

অবিনাশ বল্লে—স্যালভেজই তো কিনে নিয়ে যাচ্ছি নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে। ইচ্ছা ছিল ভাঙ্গা মেসিন জোড়া লাগিয়ে লাভবান হ'ব, দেখি ভাঙ্গা মন জোড়া লাগানোতে কি ফল হয়।

ব্যর্থ অভিযান

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

কহিল আকাশে মোরে "ছুটে আয় পাখে,
ডাল ভাঙ্গ খেলবার সন্ধান থাকে।
অত উঁচু হতে মোর শঙ্কা জাগে প্রাণে,
"কিন্তু তবু?" আশা কয় ধীরে ভরসা ভাবে।
দেখা মোর লাগাইতে রঙ খেলবার
সে দম দেখিয়া আঁখি পলকিয়া যায়।

হাতে আসি ধরা দেয় রঙ যাইল উঠিয়া,
ভাবিলাম ক্রীড়াতরে তুলিব ধরিয়া।
আশা ও আকাঙ্ক্ষা মেলে যায় অতি দূরে,
ধেয়ে ধেয়ে গেল মোরে অসীমার ফেরে।
অসীমায় পড়ি ধরা উচ্চ হ'তে ধীরে
ভূমি তরে অভিযান করুণাদি ছিরে।

আবুলকালাম আজাদ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

"আজ ছ'মাস ?"

মাজিস্ট্রেটের অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের পানে চাহিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল। বিচারক বিপুল বিস্ময়ে আসামীর পানে চাহিলেন। আসামীর বিস্ময় বিস্ময়কর বটে।

আসামীর প্রতিভাপ্রদীপ্ত সুকুমার আনন, অনুচ্চাস গৌরবর্ণ বেশ কসোয়ার গোলাপ-আগে দশ কোটা গোলাপ, বুদ্ধি দৃপ্ত আয়ত লোচন, ঘন লম্বা নাসা, কুঞ্চিত কেশদাম, দীর্ঘ বপু বেশ, যৌবনোজ্জ্বলিত অঙ্গে বিচ্ছুরিত আভিজাত্যের দিব্য আভা, পরিচ্ছদ সম্ভ্রান্ত বেশবাস, কলিকাতার চোর ডাকাত খুনে পকেটমার অধ্যুষিত ফৌজদারী আদালতের কালিমা ও মালিন্য বিদূরিত করিয়া আজ এক অপূর্ব্ব ও অভিনব শ্রী দান করিয়াছে। আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য। এই আদালতে ভিড় রোজই হয়; কিন্তু আজ সে ভিড় নহে। চোর, পকেটমার, বদমাস, লম্পট, বেশ্যা, দালাল ও প্রতারকের পীঠস্থানে আজ ভারতবাসীর শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত সমাজের বিচিত্র ও বিরাট সমাবেশ। যে কাঠগড়ার পানে চাহিতেও ঘৃণাবিমিশ্র করুণায় মানুষের মন বিমুখ হইয়া পড়ে, আজ সেই কলঙ্কী প্রধানা কলিকাতা তাহারই পানে প্রত্যাবনত সজল বিস্ময় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে। আসামীর ললাটজ্যোতিঃতে আদালত আলোকিত। আসামীর অধরে মৃদুমধুর হাসি, প্রসন্নকৃষ্ণ শুভ্রশ্রেণিকায় বিদ্যুল্লতার মত থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া খেলা করিয়া ফিরিতেছে। ম্যাজিস্ট্রেট অত্যন্ত গম্ভীর; মনে হইতেও পারে, যেন বিষণ্ণ অথবা অনুতপ্ত।

"আজ ছ'মাস! কিন্তু আমি দীর্ঘকালের জন্য ও গুরুতর মত প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।"

ম্যাজিস্ট্রেট বিস্ময়ের জন্য সস্মিত মুখে চাহিলেন। বলিবার কিছু ছিল কিনা কে জানে, বলিলেন না এবং ক্রমে বিচারাসন ত্যাগ করিয়া দ্রিপ্রপদে এজলাস হইতে নামিয়া পাশের ঘরটা পেরিয়া খাস্ কামরায় প্রবেশ করিলেন; কিন্তু একি, যাইবার সময় আসামীটিকে অকুণ্ঠ স্বরে আসামীর উদ্দেশে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া গেলেন। আসামীও সৌজন্যকণে প্রত্যাভিবাদন করিলেন। আদালত গৃহ সামাজিক শিষ্টাচার বিনিময়ের স্থান নহে; তাই এই বিদায়বটুকু বেশী করিয়াই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যাহারা উহার পক্ষের জানিত, তাহারা বলাবলি করিল, তাহলে সাজিলে শুভ্রলোকও আছে! ততক্ষণে আদালত ভবন বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে পরিপূরিত হইয়া গিয়াছে। ধ্বনি এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে ছুটিল, সেখানেও ধ্বনিত হইল, বন্দে মাতরম্। নিকটের ও দূরের, পার্শ্বের ও সম্মুখের রাজপথ হইতে প্রতিধ্বনি ধ্বনি ফিরাইয়া দিল, বন্দে মাতরম্! দেখিতে দেখিতে সমগ্র কলিকাতা ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, বন্দে মাতরম্!

সেদিনের সেই আসামী, আজিকার অবসরবর্জিত, শিরোরাজ, সংযতবাক্, রাজনীতিজ্ঞ সাধু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। সেদিনের সেই কারাবাস রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ। তারপর দুই যুগ অতিক্রান্ত।

কর্ত্তা, মুসলমানের ভেহেস্ত রমজান (১৭ই নভেম্বর, ১৮৮৮) জন্মগ্রহণ। বাল্যে পিতা আতা আলী সরকিয়ানারে একদা এই নবীন হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন; তদবধি বঙ্গভূমি ভারতবর্ষই মাতৃভূমি এবং কলিকাতা রাজধানী।

পরাধীন ভারতের দুঃখ দুর্দশা লাঞ্ছনা বেদনাও যেমন ভারতবাসীর সহিত সমভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছেন, নির্যাতন, নিপীড়নও তেমনই

ভূতপূর্ব কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও লেখক

সমান ভাগে ভোগ করিয়া ভারতবর্ষীয়গণের পুরোভাগে দণ্ডায়মান। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য দীর্ঘকাল যাবত যে কুরুক্ষেত্র মহাসমর পরিচালিত হইতেছে, সেই মহাযুদ্ধের সমর নায়কদিগের মধ্যেও তাঁহার স্থান সর্ব্বাগ্রে। কংগ্রেস-মঞ্চকে গান্ধীজীকে যদিও শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা অভিনয় করিতে হইয়া থাকে, মনস্বী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের উপর নিঃসংশয়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভূমিকা অভিনয়ার্থ ন্যস্ত হইয়াছিল। দুর্য্যোধন পৃথিবীর লোকের নিকট দুর্য্যোধন হইলেও যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সুযোধন আখ্যায় অভিহিত করিতেন। যুধিষ্ঠিরের চিত্তের শুচিতা ছিল

এমনই শুদ্ধ, এমনই পবিত্র। আবুল কালাম আজাদের সহিত এই উপমার সঙ্গতি যে কতদূর অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাহা লিখিত হইয়া আছে।

সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে নায়কদিগের রূপ ও গুণের আদর্শ নির্দিষ্ট ছিল। নায়ক সর্বদা সুপুরুষ, বীর ও ধার্মিক হইতে বাধ্য। না বলিলে অত্যুক্তির দোষী হইতে হইবে নায়িকার হ্যাণ্ডার্ডও বাঁধা ছিল। নায়কের যেমন প্রায়শঃই এক চোখে চালা, নায়িকারাও তদ্রূপ। একমাত্র সম্মানজনক ও অনুকরণীয় ব্যক্তিক্রম দেখি, দ্রৌপদী। ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে মাত্র গান্ধীজীর অভ্যুত্থানের পর হইতে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের নায়কগণের রূপের (রূপের নহে!) রূপের হ্যাণ্ডার্ড বাঁধিতে হইলে সর্বাগ্রগণ্য গান্ধীজীই কেন্ হইতেন।) আদর্শ অলিখিত আইন অলেই পড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের কৃষ্টি, ভারতের সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি, ভারতের অতীতের ভিত্তির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই আদর্শ গঠিত। ভারতের প্রতি যাহার ভক্তি অবিচলিত নহে গান্ধী-অনুষ্ঠিত যজ্ঞভূমিতে তাহার স্থান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দ মঠ" মহাকাব্যের প্রস্তাবনা সূত্রের প্রতি আমি আমার পাঠক ও পাঠিকাগণের অনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি। সত্যানন্দ সাধনায় সিদ্ধিলাভার্থ সর্বস্ব, এমন কি প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত থাকিলেও অদৃষ্ট মহাপুরুষকে যবনাদি বিরচ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আর কি আছে যে দিব? উত্তর হইয়াছিল, ভক্তি। সত্যানন্দ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গান্ধীজীও চাহিয়াছিলেন, ভক্তি। ভক্তি—কোন মানুষকে নহে, জন্মভূমি, মাতৃভূমি, ভারতবর্ষের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও অকপট ভক্তি।

বুদ্ধির সেরা বুদ্ধি, ভক্তি; ভক্তির সেরা ভক্তি, দেশভক্তি। ভক্তিতে যাহার চিত্ত ভরিয়াছে, তাহার নিকট পার্থিব সুখ সম্পদ ধন মান যশঃ দুঃখ কষ্ট অপমান নির্যাতন নিষ্পীড়ন সকলই তুচ্ছ ও নগণ্য। ভক্তি যাহার অক্ষিল, মরণ জন্মকে সে অবিনশ্বর; অমৃত পান করিয়া অমৃতত্ব পুনঃ সে অমৃত হইয়াছে। তাহার নিকট দুঃখ আর দুঃখ নহে; কষ্ট আর কষ্ট নহে; লাঞ্ছনা লাঞ্ছনা নহে; নির্যাতনও নির্যাতন নহে। মনে সে শূন্যহীন, মনে নির্ভিকার। তাহার আপনার নাই, পর নাই; উচ্চ নীচ ভেদাভেদ তাহার চিত্তসোপান বাহিতে পারে না। আপামরের পরিত্রাণ, আপামরের উদ্ধারণ। হায়, এ পৃথিবীতে কি এমন মানুষ আছে? আছে বলিয়া জানি, আছে,—মনশ্চিত্তে। তাই যদি নাই হইবে তাহা হইলে ইসলামীয় জন্মভের এই মহাজাতী, পরম ধার্মিক রাজনীতিক ব্যক্তিটির সারাজীবন ব্যক্তিত্ব মনস্তাপ কেন? ইহিত মাত্রে দুনিয়ার মৌলভী যাঁহার কর্ম সহচরী হইয়া বড় জোর করিত, ইঙ্গিত মাত্রে যাহার চরণ তলে বৃটিশ-মহা-সাম্রাজ্যের মহার্ঘ উপঢৌকন দিতে বৃটিশ কর্তা মাত্র দ্বিধা করিত না, যাঁহাকে মিত্ররূপে পাইলে জোর জন্মভে বৃটিশ বিভিন্নদের সৌধ অনুভব করিত, সারা জীবন কারাবাস আর লাঞ্ছনা নির্যাতন বরণ করিয়াও মুখের হাসি, হৃদয়ের কোমলতা, অন্তরের উদারতা অম্লান, অবিচল রহিল কি করিয়া? সেই সুদূর কৈশোরের ভারতভূমিকে যেদিন মাতৃসমা বলিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন, নির্যাতনের সূচনা সেইদিন; যেদিন জীবনাবসান ঘটিবে, মাটীর দেহ মাটীতে আশ্রয় লভিবে, নিষ্পীড়নের অবসান হবে সেই দিন হইবে।

ভারতবর্ষে একই সময়ে দুইজন মনস্বী মুসলমান জননায়কের উদ্ভব হইয়াছে। পাণ্ডিত্যে, প্রভাবে, প্রতিপত্তিতে উভয়েই তুল্য মূল্য। তুলনা রহিত। ভারতের মুসলমান সমাজ যে বহু অংশে হিন্দুর পশ্চাদবর্তী তাহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। শিক্ষায়, সমাজ-ব্যবস্থায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অনেকখানি পতিত। এমতাবস্থায় জননেতার উদ্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। হিন্দুর অবতারবাদে যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহারাও রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, প্রভৃতির উদ্ভব বা আবির্ভাবের সহিত হিন্দু সমাজের উন্নতির ইতিহ অস্বীকার করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। অবতার আকাশ হইতে অবতরণ করেন না। গীতা-প্রণেতাও মানুষের বেশ ধারণ করিয়া মানুষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষের ঘরেই এই জন্মমরণের জগতে বিচরণ করিয়াছিলেন এবং দুষ্কৃত দমন, সাধুর পরিত্রাণ ও ধর্ম স্থাপনার্থ যুগে যুগে মানুষের মধ্যেই অতি মানুষের উদ্ভব হয় তাহাও তিনিই বলিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস তাঁহার সেই উক্তির সাক্ষ্য দিতেছে। অবশ্য মুসলমান সমাজে যে একই সময়ে মহাত্মাজী ভিন্ন ও আবুল কালাম আজাদের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাতে কি মুসলমানের সৌভাগ্যই সূচিত করিতেছে না। আজাদের পাণ্ডিত্য, আজাদের রাজনৈতিক দিব্য জ্ঞান, আজাদের মানবিকতা কি আজ সমাসন্না পৃথিবীর ঈর্ষার বস্তু নহে? সমগ্রত বরিষিব কি আবুল কালাম আজাদকেই ইসলামের পাক ব্যাখ্যাকার সর্বোচ্চ আসনেই প্রতিষ্ঠিত করে নাই? পবিত্র ও অত্যুদার মহম্মদীয় ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মর্মোদ্ধারের জন্য ইসলামীয় জগত কি একমাত্র আজাদের পানেই নয়ন নিবদ্ধ করিয়া নাই? আর জিন্না? ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মুসলমানকে আজ কে এক সূত্রে, একতা পাশে বদ্ধ করিয়াছে? শতধা বিভিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও উদাসীন মুসলমানকে সামাজিক অগ্রগতি, রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে কে? কে তাহাদের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে? আশা ভরসা মূল যাহি দিবসে কে তাহাকে বিউগীর রূপ দিয়াছে? কে তাহাদের অন্তরে উৎসাহের অনল প্রজ্বলিত করিয়াছে? অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলেখ্য কে আঁকিয়াছে? জিন্না—জিন্না—জিন্না! কিন্তু মুসলমানের দুর্ভাগ্য, তাহার প্রতিবাদী হিন্দুর দুর্ভাগ্য, অতোধিক দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের, যে এই দুই মনীষার—প্রতিভার পরস্পরের—সমার পশ্চিমতা, বহুবার বশঃ ঈর্ষা—বিদ্বেষ ঘটিয়া বিপরীত পথ —বিভিন্ন গতি অবলম্বন করিল। ভারতভাগ্যবিধাতার বিচিত্র বিধান! এমন না হইলে সৌভাগ্যবতী ভারতের এমন দুর্ভাগ্য হইবে কেন?

পরাধীন ও পৃথলিতহাত ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনায় একজন দিবস পর দিন, বৎসরের পর বৎসর নিষ্পীড়ন, নির্যাতন বরণ করিয়া তাহার আদর্শে, চারিত্রিক মাধুর্যে, তিতিক্ষার সৌভাগ্যে ভারতকে উদ্বুদ্ধ

শিখরাজ দেখিবার আশায় স্বেচ্ছাকিন্নী হইয়া জগৎগুরু মন্ত্রের অনুশাসনে স্নেহে, প্রেমে, সৌভ্রাত্রে ও সৌহার্দ্যে মানব সমাজকে আত্মীয়তা বন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিলেন; প্রসারিত বাহুর প্রেমালিঙ্গনে হিন্দু মুসলমান জৈন খৃষ্টান পাশী অছুৎ ধরা দিল, আর এ কি কম দুঃখ কম দুর্ভাগ্য যে সমবাণি জিন্না তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিলেন না। আকাশের মত উদার, সাগর বারির মত স্বচ্ছ, একের প্রেমে পবিত্র ইসলাম অনুশাসন ব্যর্থ হইল, এই দুই দিগন্তকী প্রতিভার মিলনের সেতু রচিত হইল না। ভাবি, সাগর কি সাগরে মিলিত হয় না? অগ্নি কি অগ্নিতে সংযুক্ত হয় না? কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের একটি ঘটনা আজ বারম্বার মনে পড়ে। কুন্তীপুত্র কর্ণ ও কুন্তীতনয় অর্জ্জুনের মিলন সাধনের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। কিন্তু হায়! যদি দুই ভ্রাতা, দুই মহারথী, দুই বীরকেশরী মিলিত হইতে পারিতেন! বিধাতার বিধান—ভারত বিধ্বস্ত হইবে, কাহার সাধ্য গতি রোধ করে!

বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের মহারাজার জোড়া—সর্ব্বাধিনায়ক গান্ধীজীর, সৈন্যাধ্যক্ষ—যজ্ঞরক্ষক নির্ব্বাচনে রক্ষতা অনন্যসাধারণ বলিলেও বেশী বলা হয় না। মতিলাল নেহেরু, মহম্মদআলি, সৌকতআলি, লজপৎ রায়, চিত্তরঞ্জন দাস, আজমলখান, আবুল কালাম আজাদ, সর্দ্দার বল্লভভাই, পণ্ডিত জওহর লাল, সরোজিনী নাইডু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ জনে জনে বিকপাল: এই গান্ধী মণ্ডল ভারতবর্ষের ইতিহাস পৃষ্ঠায় চিরোজ্জ্বল। গান্ধী মণ্ডল তথা গান্ধী দর্শন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতেও বিপ্লব সাধন করিয়াছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে আমরা সকলেই সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা গান্ধীর দীক্ষিতে প্রতিভাত হইতে দেখি, তখনকার গান্ধী-মণ্ডল বিদ্যুত চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ্যদলের পুরোভাগে। আজাদ ও সুভাষ চিত্তরঞ্জনের শক্তির দুই উৎস—দুই বাহু—সোমুখী ও আলামুখী উভয়কালে উভয়েই ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

বলিয়াছি, অতি অল্প বয়সে মৌলানা পিতা-মাতা-ভগিনী সমভিব্যাহারে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পিতা স্কুল কলেজের শিক্ষায় আস্থাবান ছিলেন না; গৃহ-শিক্ষার ব্যবস্থাই হইল। প্রতিভা যাহার ললাটে রাজটীকা দিয়ে, কিশোর বয়সেই তাহার অসাধারণত্ব পরিস্ফুট হইতে থাকে। ইসলামীয় উচ্চশিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা ভারতবর্ষে প্রাপ্তব্য ছিল না বলিয়া উভয়কালে তাঁহাকে বাহিরের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হয়। যাত্রীভূমি ভারতবর্ষ যে মুহূর্তে, কোন্ সময়ে তাবুকেরও অজ্ঞাতসারে মাতৃভূমির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, আগে তাহা জানা ছিল না, এই প্রবাস-কালেই তাহা মূর্ত্ত হইয়া উঠে। প্রবাসে স্বদেশের কথা, প্রিয়জনের কথা যত মনে পড়ে, যত বেদনা অনুভূত হয়, এমন আর কখনও নহে। মধুসূদন যত প্রবাসকক্ষ কালে বঙ্গমাতার নিকট যে কাতর নিবেদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা অমরত্বলাভ করিয়াছে। কাইরো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম পদ লাভালাভেও তাহার প্রতি চিত্তাকর্ষণ শিথিল হইল না। তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতভূমির সেবাকেই আত্মনিয়োগ করিতে হইল। বন্ধনহীন সৌভাগ্যশালিনী ভারতের ধনরত্নের অভাব কোনকালেই ছিল না।

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে উৎসর্গীকৃত আজাদের "অল্ হিলাল" নামক সাপ্তাহিক পত্রের বিলোপ সাধনে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট কাল বিলম্ব করিলেন না। অগ্নি বিনির্গত হইবার পূর্ব্বেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু অগ্নি রাশিতে যাহার জন্ম, অগ্নি যুগে যাহার বাস, তাহার গতি বিরামহীন কে করিতে পারে? অবিলম্বে "অল্ বলগ্" জন্ম লাভ করিল। বাঙ্গলার অগ্নি যুগের "বন্দে মাতরম্", "সন্ধ্যা" ও "যুগান্তর"-এর মত মৌলানা আজাদের উর্দ্দু পত্রও ভারত রাজ্যে প্রলয়বহ্নির অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল। সে আগুন নিবাইতে কত সময় যে লাগিয়াছিল তাহা আমরা সকলেই জানি। "অল্ বলগ্" তাহার অগ্রজের মত অকালেই

মৌলানা আবুলকালাম আজাদ

রাজরোষে কালগ্রাসে পতিত হইল এবং তাহাদের দুর্বিনীত জনক বাঙ্গলা দেশের বাহিরে, রাঁচীতে অন্তরীণে আবদ্ধ রহিলেন।

কারাগারের ব্যবস্থা যখন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তখন রাষ্ট্রশাসকগণ কারাগারকে চরিত্রসংশোধনের সহায়ক হইবে ভাবিয়াছিলেন; অন্তরীণ ব্যবস্থার লক্ষ্যও নিঃসন্দেহে তদ্রূপ। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কয়জন বদ্ধ ভক্ত কারাগারের বাহিরে আসিয়া আশু লক্ষ্য বলিয়াছে তাহা আমরা জানি না। অন্তরীণযুক্ত দুবক আজাদের 'চারিত্রিক উন্নতি' ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হইল না। অশিষ্ট বালকের অভিভাবক যেমন বাল ছাড়িতে পারেন না, গভর্ণমেণ্টও আজাদের চরিত্রের উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর না হইয়া পারিলেন না। অল্প কয়েকদিন পরেই পুনরায় রাজ-আতিথ্যে আহ্বান আসিল। ১৯১৯ হইতে জীবন শেষ এই দোহার কাঁটার খেলাই

চলিয়াছে। অনেকখানি গ্রন্থ—অধিকাংশ মাসিক ও সাপ্তাহিক—রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, জীবন ধারণে তাহারাই ছিল সহায় ও সম্বল, পুনঃ পুনঃ কারাগারের তলে গ্রন্থমালাও ক্রমশঃ অঙ্কুর হইয়া পড়িতে লাগিল। সুতরাং সংসারের অবস্থাও হইবেঃ।

জীবন তরঙ্গে পুষ্পকোরকসম দুটি সন্তান আগমন করিয়াছিল। অভাবে অনটনে, অযত্নে দুর্ভোগেই তাহারা ঝরিয়া পড়িল। এই বিশাল ও বিচিত্র বিশ্ব যিনি সৃজন করিয়াছেন, নিতান্ত অন্ধ ও বোধবিবেকহীন যন্ত্রিকেও সকলেই স্রষ্টার অসীম অনুকম্পা অনন্ত করুণার অসংখ্য পরিচয় প্রতিনিয়তই দেখিতে পায়। আকুল কান্নায় আকাশের সংসার মহাস্থানে গ্রামের একটি সাধু-সাধারণ ঘর করিয়াছিলেন। অনন্তকাল ধরিয়া একখানি মূর্তিমতী প্রতীক্ষা অনিমেষ বসিয়া নয়নের অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে। নারীজীবন আশা-পথ চাহিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। কালে ভদ্রে কোনদিন কারামুক্তি ঘটিলে স্বামী স্ত্রীর মিলন ঘটিত। মিলনের প্রীতির বন্যায় উঠিতে না উঠিতে, বাসনার পান পাত্র অধরস্পৃষ্ট হইতে না হইতে আবার চির বিরহের গান ধ্বনিয়া উঠিত। নারী জীবনের ইতিহাসে এই এক কথাই লিখিত। তবু সেই অবসাদী মিলনের আশায় দুর দুরান্তে অবস্থিত দুইটি অতৃপ্ত হৃদয় আশার আনন্দে অপেক্ষার নিত্যই নব ইন্দ্রধনু রচনা করিত। একজন দেশের চিন্তায় উন্মত্ত, বিচারে, আন্দোলনে, আন্দোলনের করিয়া বন্ধ; আর একজন চিরকারাবাসী গৃহিণীকে দেশ-মাতৃকার রূপে নিবেদন করিয়া আত্মসমাহিত। কারাগারে একটি করিয়া দিন কাটিত আর মিলনের দিন নিকট হইয়া আসিত। সে দিন গণনার কি আনন্দ ছিল! তারপর সাতাই যেদিন মিলন ঘটিত, সেদিন অন্তরের মুকুলনে—দুঃখীরাতিবন্ধিকাবেলাগোলাপকাহিনীবকুলরজনীগন্ধা ফুটিত; অনাহতপাখে পাপিয়া বোধহয় কোথাও পঞ্চমে গাহিত, আকাশে চাঁদ হাসিত। কিন্তু দীর্ঘ বিচ্ছেদাবসানে এই আনন্দের মুখও দীর্ঘস্থায়ী হইল না। ১৯২১ সালে, তিন বৎসরের পর স্বামী আসিয়া দেখা দেল সেই যে অশ্রুপ্রতিমাখানি অন্তরের নীরব ভাষায় রচিত বরাসনে প্রেমাস্পদকে প্রেম রাজ্য অভ্যর্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিত, সে প্রতিমার বিসর্জন হইয়া গিয়াছে। তার পার্শ্বের মুকুল গাছটি তেমনই দাঁড়াইয়া আছে, মৃদু বায়ুহিল্লোলে তাহাও অজস্র মুকুল উপহার দিতেছে; কিন্তু সেই মুকুলম আহরণ করিয় মুকুলের মালা যে গাঁথিত; সে আর নাই। আজও রজনীর অন্ধিমের পার্শ্বের কাহিনী ফুটে—সুরভি বিলায়, হায়, সেই সুরভিতে সুরভি মিলাইয়া এই মলিন মুখে নিমেষের নয়ন রচনা করিত যে সে নাই! সে নাই!

জনক নন্দিনী সীতার ন্যায় আজাদ-মহিষীর কাহিনী কি কম করুণ? অল্প মধুর? দেশের-সাথে যার বিবাহিত স্বামী তখন আন্দামানের দুর্গে বন্দী। গান্ধীজী পুণায় এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আহ্মদনগরে। পুণার আগাখান প্রাসাদাভ্যন্তরে গান্ধীজীর ক্ষিপ্ত হস্ত মহাদেব ভাই বক্ষ দর্শনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। গান্ধীজীর আদরিণী সহচরী সরলা পত্নীসম কস্তুরবা নারীর স্বর্গ পতির ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। একদিনের একখানা 'আখবর' (সংবাদপত্র) দেশের জিহ্বার বাক্ আহ্মদনগরের দুর্গে পৌঁছাইয়া দিল! হিমালয়ে কি ভূকম্প হইয়াছিল? চির উন্নত সাগরবক্ষে কি আর একটি উল্কাস বৃদ্ধি পাইয়াছিল? জানি না; বলিতে পারি না।

তবে ঘটনাপ্রবাহ আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম; এদিকের দুটি কথা বলিতেও পারি। দেশবন্ধুর অসুস্থতার সংবাদ দেশ প্রাণপণ চেষ্টা গোপন করিতেই চাহিয়াছিলেন। তুচ্ছ শরীরের সংবাদ দূরস্থ আহ্মদনগর পর্যন্ত যাহাতে না যায় তাহার জন্য সর্ববিধ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরপারের নিশ্চিত আহ্বান যখন কর্ণে পশিল, তখন সাধ্বী সতী অন্তর্নিহিত শীর্ণ হস্তে একখানি অস্পষ্টাক্ষর ক্ষুদ্র লিপি রচনা করিয়া মিত্রীর মারফতে প্রেরণ করিলেন—জীবনের সাধ একবার, শেষবার, জন্মের মত একটিবার জীবন সর্বস্বকে দেখিবার বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু হায় রাজা আর, হায় দারুণা অবজ্ঞা! আর হায়, বাঙ্গালার লর্ড লিটনিয়ো! পরপারের যাত্রীটির অন্তিম শয্যার পার্শ্বে বিদ্রোহীর অবস্থিতিটুকুও তিনি এক্সপেনসি বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। সুতরাং আহ্মদনগরের পথে দুটি বিরহ থাকিতে থাকিতে দুটি দৃষ্টিহীন হইয়া গেল; অন্তরের একটি নিঃশ্বাস অন্তরে—বায়ুচ্ছ বিলীন হইল। কবিরের এত সৌভাগ্য ধরিত্রী কতদিন সহে?

১৯৪০ সালে, রামগড়ে মৌলানা আজাদ দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তখন ইয়োরোপে সমরানল দ্বিগুণ জ্বলিতেছে। ভারতবর্ষের আবহাওয়াও অত্যুত্তপ্ত। সুভাষচন্দ্র বহু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। রামগড়ের সন্নিকটে কংগ্রেস-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করতঃ কংগ্রেসের সংগ্রামহীন মনোভাবের তীব্র সমালোচনায় কংগ্রেসকে জর্জরিত করিতেও তাঁহার অসীম উদ্যম হৃদয়ের ক্লান্তি নাই। আজ বলিতে বাধা নাই, স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের অবদানের কঠোরতা উগ্র স্বাধীনতার তাব প্রবাহ অক্লান্ত যোদ্ধা গান্ধীজীকেও সন্দেহের চক্ষুতে দেখিতে চাহিয়াছিল। গান্ধী নবজ-ক্লান্ত; গান্ধী যুদ্ধে পরিশ্রান্ত! এই অস্বাভাবিক ও অশুভ আবহাওয়ার মধ্যেই মৌলানা সাহেবকে আর একবার কংগ্রেসের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইল। শুধু কি তাহাই? কংগ্রেসের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সোৎসাহে স্নেহাস্পদ সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধেও কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা করিতে হইল। অথচ একদিন ছিল যখন চিত্তরঞ্জন গান্ধীর মত আজাদও সুভাষকে দেশের আশা ভরসা জ্ঞানে অপত্য স্নেহে সহোদরাধিক আদরে বক্ষে ধারণ করিতেন। ত্রিরামচন্দ্রের লক্ষণ বর্জনের উপর কত করুণ বিয়োগান্ত কাব্য নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে, যুগে যুগে মানুষ কাহিনীর উপরে প্রেমাশ্রু ঢালিয়া দিয়েছে, মৌলানা আবুলকালাম আজাদের সুভাষ বর্জনের কাহিনী যেদিন রচিত হইবে সেদিনও অশ্রুরোধ করিতে কেহ পারিবে না।

কংগ্রেস একদিন ভারতবর্ষের সাত আটটি প্রদেশের শাসন পরিচালিত করিয়াছিল। বৃটিশের যুদ্ধনীতির সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় একদিনে এক সঙ্গে সমস্ত প্রদেশের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া, বাহির হইয়া আসিল। অক্ষ শক্তির পার্শ্বে-পার্শ্বে হইতে অত্যাচারিত ধরিত্রীকে মুক্ত করিবার জন্যই

বৃটিশ বিরুদ্ধে অবতীর্ণ। এমন সময়ে কংগ্রেস যদি প্রশ্ন করে যে, যে পৃথিবীকে বৃটিশ মুক্ত ও স্বাধীন করিয়াছে এই ভারত কি সেই পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত? না, পুণ্য বারাণসীর মত পৃথিবীর সীমাবহির্ভূত শিবের ত্রিশূলে অবস্থিত—ভারতও কি শিবের বাহিরে, বৃটিশের বেয়োনেটে রক্ষিত ও অনুশাসিত? এই প্রশ্নের উত্তর বৃটিশ চার্চ্চিলের মুখ দিয়া দিল। একদিন একজন বৃটিশ মন্ত্রীসভার বলিয়াছিলেন ভারতবর্ষ ডমিনিয়নের অধিকৃত হইয়াছে, ডমিনিয়ন মুখে শাসিত হইবে। তাঁহারই বংশধর বক্তব্যটার সেই কথাই আর একবার স্মরণ করাইয়া দিল। ইহার পরে কংগ্রেসের মত আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বৃটিশের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে না। কংগ্রেস শাসন ভার পরিত্যাগ করিল। মৌলানা আজাদই কংগ্রেসের সভাপতি।

১৯৪২ সালে, জাপানী যখন ভারতের পূর্ব্বদ্বারে সমাগত, বৃটিশ বিদূষক ও বিরক্ত ভারতের সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিল। ক্রীপস্ সাহেব নিরামিষাশী পণ্ডিত জওহরলালের সহিত প্রথম দর্শনে আবদ্ধ; ইংলণ্ডে তাঁহার জারী পশার। ধূর্ত, কূটবুদ্ধি চার্চ্চিল তাঁহার মারফৎ "Post-dated cheque on a crushing Bank" পাঠাইয়াছিলেন। উলটানামান ব্যাঙ্কের উপর অনির্দ্দিষ্ট তারিখ সম্বলিত চেক্‌খানি ভারতবর্ষ গ্রহণ না করিয়া ফেরৎ দিল। ক্রীপস্ দুপাপাসে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলেন।

মৌলানা আজাদই রাষ্ট্রপতি। গান্ধীজী ত চেক্ খানিকে "ভুয়া" বলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব তাহাতে বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। "চেক" খানি ভাঙ্গানো যায় কি-না কিম্বা তদ্দ্বারা দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন সম্ভব হইতে পারে কি-না সে সম্বন্ধে 'শেষ কথা' বলিতে কংগ্রেসের কর্ম্মপরিষদ ও রাষ্ট্রপতিই সমর্থ। কাজেই ভুয়া চেক্ লইয়া গবেষণা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। প্রবন্ধ-রচয়িতা তখন দিল্লীতে এবং কংগ্রেসের সর্ব্বোচ্চ পরিষদের সহিত মিটে কোঁচা সংযোগও তাঁহার ছিল। সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেও দেখক নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন যে, একদিন এমন কথাও হইয়াছিল—ঐ চেক্‌খানি গ্রহণ করা হোক। চেকের মর্য্যাদা রক্ষার ভার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের, তাঁহারা তাহাতে বিরত হইবেন না। আমাদের মনে আছে, সেদিন সমগ্র ভারতে উল্লাস প্রকাশ পাইয়াছিল। ঠিক পরমুহূর্ত্তে, কে-জানে-কেন ক্রীপস্ সাহেব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া "না না ও কি! একি! কৈ, ও কথা ত হয় নাই! আমি বলিয়াছি, কৈ না!" করিতে করিতে পশ্চাদ্দের পাততাড়ি গুটাইয়া চম্পট পরিপাটী। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ বুঝিল, চার্চ্চিলের "মোহ ভঙ্গ" হইয়াছে। সাম্রাজ্যের নীলাম-সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমি রাজার প্রধান মন্ত্রী হই নাই।" "যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহার যে সম্পত্তি ছিল, যুদ্ধের পরেও তাহার তাহাই থাকিবে।" চার্চ্চিল তখন প্রধান মন্ত্রী এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও সর্ব্বনিয়ন্তা! ক্রীপস্ অপ্রতিভ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে আবোল্ তাবোল্ বকিয়া প্রস্থান করিলেন। আবোল্ তাবোলে সত্য আদৌ থাকে না এমন নয়, তবে অনেক অর্দ্ধ সত্য প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইতে বাধ্য: তা যদি না হইবে তবে আবোল্ তাবোল্ নামই বা হইবে কেন?

যথাযথঃ বীর দ্বিগ্ বাক্ মৌলানা সাহেবের ধৈর্য্য ভঙ্গ হইল; মৌলানা সিংহনাদে ক্রীপসের অসংলগ্ন উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন; ক্রীপস্ তাঁহার বলপতি ও প্রভু চার্চ্চিলের মুখ ও মান রক্ষা করিতে বাধ্য; আবার আবোল্ তাবোলের আশ্রয় লইলেন। কিন্তু পৃথিবীর লোক ততদিনে বুঝিয়া ফেলিয়াছে, চেক্ সত্যই ভুয়া। বিষয় যাক বিতণ্ডা, বাদ প্রতিবাদ, সওয়াল জবাবের অন্ত নাই; মৌলানাকেও দিল্লী হইতে হয়; কিন্তু একটি শব্দ, একটি অক্ষর অসাবধান অসাবধান অসতর্ক প্রযুক্ত হোয়াইট হয় নাই।

এই সম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। সম্ভবতঃ ক্রীপস পক্ষীয় কোন লোক সংবাদপত্রের মারফত বলিয়া বসিল, রাষ্ট্রপতি ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ; ইংরাজের সহিত আলাপে তাঁহাকে দো-ভাষীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ফলত দোভাষী ক্রীপসের বক্তব্য ঠিক ঠিক বুঝাইতে পারে নাই, তাহার ফলেই মৌলানা ও ক্রীপসের মধ্যে এই বৈষম্য ও বালির বাঁধটায়ছে। পণ্ডিত নেহরু এই অসংলগ্ন উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলেন, মৌলানা সাহেবের ইংরাজী-জ্ঞান আমাদের কাহারও অপেক্ষা ন্যূন বা হীন নহে।" মৌলানা আজাদ কখনও কাহারও লিখিত বিবৃতির ভাষার বাক্যালাপ করেন না, শিক্ষিত সমাজে ইহা সকলেরই জানা আছে। সমাজের একাংশ সম্ভবতঃ তাহা হইতেই স্বতঃসিদ্ধ করিয়া লইলেন যে মৌলানা ইংরাজী অনভিজ্ঞ। পণ্ডিতজীর তীব্র উক্তি আজি নিরসন করিলেও এখনও এমন লোক অনেক আছেন যাঁহাদিগকে সন্দেহ মৌলানার মোসাহেবদের মধ্যে গণ্য করা যায়। কিন্তু কেন এই সন্দেহ, তাহা বুঝি না। ভারতবর্ষীয় সমাজ জীবনের সর্ব্ব স্তরের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য, তাঁহারা কি মৌলী-এফেন্দী, মৌলবী বা মুন্সী দেখেন নাই? আহার্য্য গ্রহণ কালে বাক্যালাপ করেন না এমন লোকের অস্তিত্ব কি অজ্ঞাত? সারাজীবন বাসরেও আহার্য্য গ্রহণ করেন এমন ব্রহ্মচারীর কথা কি শুনেন নাই? একাধিক কন্যা বা শিষ্যার ধর্ম্মনের কথাও কি তাঁহারা শুনেন নাই? গান্ধীজী সপ্তাহে একদিন মৌনাবলম্বন করেন, ইহাও কি তাঁহাদের জানা নাই? রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর সহিত কখনও ইংরাজীতে কথা বা পত্রব্যবহার করিতেন না ইহাও কি তাঁহারা শুনেন নাই? তা যদি শুনিয়া থাকেন, তবে আর একজন অনন্যসাধারণ সুচিন্তিত সুস্থ প্রধানের বাক্য ইংরাজী বাক্যালাপ বর্জ্জনের দুষ্প্রভাব কেন যে অবোধ্য হয় তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ভারতবর্ষীয় কংগ্রেস, বিশ্বিজয়ী বিকাশসঙ্ঘের মিলন ক্ষেত্র, প্রতিভার পুণ্য বারাণসী; বিশ্বজয়ের উদ্ধারিণী, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। সেই কংগ্রেসেও মৌলানার মত সুপণ্ডিত, সবিবেচক, নৈয়ায়িক ও বাস্তব দার্শনিক বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু আমি নম্রতাবে করিয়া, আমার দুঃখ এই যে, এই বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার নিকট আমার সর্ব্বজনালঙ্কৃতা মাতৃভাষা প্রাপ্য মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত রহিল কেন? ইংরাজী (পাঠক লক্ষ্য

করিবেন, ইংরাজীর সাম্য সর্ব্বাগ্রে উচ্চারণ করিতেছি) ইংরাজ, পার্সিক, আরবীয়, হিন্দী, হিন্দুস্থানী, আর্মান, গ্রীক, সবাই স্ব স্ব স্থান করিয়া লইল, আমার লজ্জাবনতমুখী বঙ্গ সিংহদ্বারের বাহিরে পড়িয়া রহিল কেন!

তবে এ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা দরকার। গান্ধী কংগ্রেস বিধানের বারাণসী, আগেই বলিয়াছি; কংগ্রেসে যে প্রতিভা নাই, দেশেও সে প্রতিভা নাই। কিন্তু সেই কংগ্রেসেই আবুলকালাম আজাদই সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যক্তি যাঁহার অঙ্কে বৃটিশ, কি-বৃটিশ কি-ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাল্লা মুদ্রাঙ্কিত করিতে পারে নাই। এই সঙ্গে আর এক বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে যিনি স্বকীয় মনীষার দীপ্তিতে বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ।

অমাবৃত অঙ্গ, যাদু কটীবাস, নগ্নপদ, দীর্ঘ দেহ—দীন ভারতের নিঃস্বরূপ যাঁহাতে প্রতিফলিত, ভারতের নিঃসহায় চাষী, অনাহার তাঁতী, নিঃসম্বল শ্রমিক যাহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করে, সেই গান্ধীজীকে বৃটিশের বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বাগ্রে দাবী করিতে পারে এবং করিলেও অসঙ্গত নহে।

কড়া নাড়িয়া বৃহত্তর মন বুঝা বলিয়া একটী চলিত কথা আছে। চার্চ্চিলও ক্রীপ্‌সকে পাঠাইয়া কংগ্রেসের মন বুঝিতে চাহিয়াছিল। যখন বেখিল দলবদ্ধ অনুযায়ী কংগ্রেস মীমাংসার উদ্‌গ্রীব হইল, তখন বুঝিল, কংগ্রেস শক্তিহীন, শ্রান্ত ও ক্লান্ত। চার্চ্চিল গান্ধী ও কংগ্রেসের জন্য সাধনের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। 'যে যায় ঢিনি, ঢিনি যোগায় চিন্তামণি', দুরাশার ছলের অভাব হয় না। ক্রীপ্‌স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইবার মাস তিনেক পরে বোম্বাইয়ে 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব পাশ হয়। প্রস্তাবের কালী শুকাইবার পূর্ব্বেই মিল্লীবরো বা জনসীবরো বা লর্ড লিনলিথগো কংগ্রেসকে কারারুদ্ধ করেন। অহিংস কংগ্রেস নিরস্ত্রভাবে কারাবরণ করিল বটে কিন্তু ভারতবর্ষ বিদ্রোহ করিল। বৃটিশের শাসনাধিকারে এত বড় বিপ্লব বা বিদ্রোহ আর কখনও হয় নাই। বৃটিশ বিপ্লবে কথায় উড়াইয়া পথে ঘাটে মেশিনগান বসাইয়া, রাইফেল, ব্রেন গান ও মেসেনজার দাবদাহের প্রাণ অনুষ্ঠিত করিয়া বিদ্রোহ দমন করিল। স্থানে স্থানে শোণিত প্রবাহ বহিল, স্থানে স্থানে শব স্তূপাকার ধারণ করিল। তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন উহার পক্ষেই শান্তি আসিল, 'শান্তি' স্থাপিত হইল।

ইত্যবসরে ১৯৪০-এর মন্বন্তর। সরকারী মতে, ১৫ লক্ষ, দেশের লোক গণনা করে, পঞ্চাশ লক্ষ নরনারী খবরাজার রাজ্যে গিয়া বাস করিল। বিলাতে ভারত সচিব চার্চ্চিল বোধির অন্বেষী ভগবানের ঘাড়ে (যীশুর ঘাড়ে নয় !) দশ বোঝা চাপাইয়া দিয়া নিজেকে গলা ঝাড়িয়া ফেলিল; ভারতে বড় লাট লিনলিথগো নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ! ভারতবর্ষের বাহিরের লোক হয়ত বিশ্বাস করিতে পারিবে না, তবুও কথাটা ছাপার অক্ষরে লিখিয়া রাখিতে চাহি যে, যে বাঙ্গলা দেশের রাজধানী মহানগরী (বৃটিশের প্রাসাদ-নগরী !) কলিকাতার রাজপথেও যখন শব স্তূপ জমিয়া উঠিতেছে, লিনলিথগো মহোদয় সেই বাঙ্গলায় বারেকমাত্র পদধূলি দেওয়া ও দুঃখের কথা, বাঙ্গলার দুঃখে একটী হা কাড়েন নাই। কতকটা ভাগ্যের কথা এই যে লর্ড মহোদয়ের বিদায়ের বাদ্য বাজিয়াছিল এবং তাঁহার স্থানে মানুষের অন্তঃকরণ বিশিষ্ট লর্ড ওয়াভেল বড় লাট হইয়া আসিলেন। লর্ড ওয়াভেল দিল্লীর মসনদে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে, সর্ব্বকর্ম্মপরিহরি বাঙ্গলায় আসিলেন। ফলতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিল।

লর্ড ওয়াভেলের দ্বিতীয় কীর্ত্তি, পূণা ও আহমদনগরের কারাগার-দ্বার উদ্ঘাটন। গান্ধীজী মহাদেবভাই ও কস্তুরবাকে আগাখান প্রাসাদের মৃত্তিকাতলে রাখিয়া বাহিরে আসিলেন (তিনি কিছুদিন পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন); আমাদের রাষ্ট্রপতি শুভ্র মনে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চিরপ্রতীক্ষমাণা লক্ষ্মীর প্রতিমা চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছেন।

আমি অনেক সময়ে ভাবি, ভাবিতে ভাবিতে আমার চোখে জল আসিয়া পড়ে, সন্দেহ হয়, এ ত অভিমানে আত্মহারা নহে? সমগ্র নারী-জীবন যে নারী বিরহ ও বিদ্বেষ অবহেলা ও অমর্শন সহ করিয়াছে, তাহার অন্তরে প্রজ্বলিত বিদ্রোহানলে সে নিজেই নিঃশেষে ভস্মীভূত হইল না ত? নারীর অন্তরে উচ্চতম বৃত্তির অভাব আছে অথবা দেশভক্তি স্থান লাভ করে নাই, এমন অযথা কথা আমি মনের কোণেও স্থান দিই না; কিন্তু নারীর স্নেহ ও রমণীর মন কি চিরদিন স্বভাবজ বৃত্তিনিচয়ের দাবী ও অধিকার বর্জ্জন করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারে? সারাজীবন একাদশীর উপবাস করিয়াও জীবিত থাকা সম্ভব হয়? যাহার আশা করিবার নাই, যেমন হিন্দু বিধবার, তাহার কথা আর যাহার থাকিয়াও নাই, তাহার কথা এক হইতে পারে না। যাহার আশা করিবার নাই সে বিধিবিধানের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়া অথবা বিধিবিধাতার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতেও পারে; কিন্তু অন্যে? চিরবিরহ ও অনন্তবিচ্ছেদ কি রক্তবীজকে বিনষ্ট করিবে না? বিরহ বিচ্ছেদ নারীর অমর যৌবনের মত। সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে, আকর্ষণ মনোমুগ্ধকর। কিন্তু সন্তান মত তাহারও সীমা আছে; অসীম ও অনন্ত হইতে পারে না। যেমন সাহেবের কথা আলিতে আলিতে আমার তাই সেই সন্দেহই জাগে, আপনার অজ্ঞাতে আপন অন্তরের দুরন্ত অভিমানেই কি পতিপরায়ণা সতী তাঁহার পতিকে ত্যাগ করিয়া গেলেন? বেদনের কথায় আর একটী মহিমময়ী নারীর অকাল প্রয়াণের কথা কতই মনে পড়ে। দুর্দ্দম যোদ্ধা অরবিন্দের স্নেহাভাবে যে প্রেমিক ও কবিচিত্ত পাশুপতি লাভ করে তাহার প্রেমময় অন্তরের অফুরন্ত প্রেমার্ঘ্য পাইয়াও কমলা দুরন্তমতি অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছিল। বেদনের স্বামীর মত, কমলার স্বামীর জীবনও দুর্ম দুর্ম করিয়া বৃটিশের কারাগারে অতিবাহিত হইয়াছিল। উভয়কেই, সুদীর্ঘ বিচ্ছেদান্তে বহুকষ্টসাধ্য মিলনের আনন্দ পূর্ণ হইতে না হইতে আশার বিচ্ছেদের আবাহন। জোয়ারের জল আসিতে না আসিতে বিরহের ভাঁটা পড়িত। সৌন্দর্য্যবর্দ্ধিনী স্বামীর দুরিতা কমলা অবশ্যম্ভাবী বিরহে মুক্ত প্রাণে ইতাশার গন্তব্যস্থলে কালাতিপাহিত করিতে

না পারিয়া বীরাঙ্গনার মত পতিপরায়ণ অনুসরণে কারাগারে প্রবেশ করিয়া নারীহৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে ধন্যিত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু হায়, শেষ পর্য্যন্ত নিজেই ধন্যিত, পিষ্ট ও নিষ্পিষ্ট হইয়া গেলেন! বেসন্ত সাহেবের স্বামীপ্রেম ছিল অনন্যসাধারণ; বিশ্বহিতের স্বামীর যশের সাধনায় উৎসর্গীকৃতজীবন ছিল পরম গৌরবের সামগ্রী। রাজপুতরমণীর মত বেসন্ত আমারও বিশ্বিতা যোদ্ধাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া কারাগারে প্রেরণ করিতেন। মরণের উদ্যত অস্ত্রকে তিরস্কার করিয়া নেসৎ পাঠাইয়া হাসিমুখে বিদায় দিতেন। কিন্তু সান্ধী মরীর সেই হাতের অন্তরালে রোদন সমূহ আবর্ত্তিত হইয়া কি না কে বলিতে পারে। সেই অশ্রু সাগরের অবিরাম অবিশ্রান্ত তরঙ্গাঘাতেই বিরহমিশ্র ও বিদ্বেষকীর্ণ উপলখণ্ডটি চূর্ণীকৃত হয় নাই, তাই বা কে বলিতে পারে? যুই আমি, এ প্রশ্ন আমি মৌলনা সাহেবকে করিয়াছি, উত্তর পাই নাই; হিমালয়ের অটল গাম্ভীর্য্য কে কবে মুখ হইতে বেহিয়াছে? পণ্ডিতজীকেও এই প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিলাম, দেখিলাম আগে-ভাগেই তিনি উত্তর দিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার রচিত সুমধুর আত্ম-জীবনীর উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় স্বভাবসত্য সম্ভাষণী ভাষায় "To Kamala who is no more."

আজকের মত এত সুদীর্ঘকাল কোনও রাষ্ট্রপতিকে বেসন কংগ্রেসের গুরুতর ভার বহন করিতে হয় নাই, কঠিন ও জটিলসমস্যা বহুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতেও আর কাহাকেও হয় নাই। ১৯০০ হইতে ১৯১৮, এই হয় বৎসর কংগ্রেসের পক্ষে, ভারতবর্ষের পক্ষে, শুধু ভারতবর্ষই বা বলি কেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে মহা দুর্দ্দিন—মহা দুর্ব্বৎসর। সৃষ্টি বিলয়গামী হইতে চাহিয়াছে। মানুষ যে সভ্যতার গর্ব্ব করে, যে সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সংসারের সুখশান্তি নির্ভর করে, মানুষের দানব প্রবৃত্তি পাশব বল প্রয়োগে সে সকলের বিলোপ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। মারী, যুদ্ধ, পরস্বাপহারপ্রবৃত্তি, পরপীড়ন, পরাধিকারহরণ, হত্যা, লুণ্ঠন, স্বকীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, অপরের স্বাধীনতা, স্বত্বের অপহরণ—যেন রোগ মহামারীর রূপ ধরিয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যে মানুষ শিল্প সুরুচি দিয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বলে সুন্দরী ধরিত্রীকে বহুতর অধিকতর সুন্দরী করিতে যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে কত সাধনা করিয়াছে, সেই মানুষ তাহার শিল্প জ্ঞান, তাহার সুরুচি, তাহার উপকরণ সামগ্রী বিজ্ঞানকে পর্য্যন্ত সৃষ্টি ধ্বংসের কার্য্যে নিয়োজিত করিবে, মানুষ নিজেই কি কোনদিন ভাবিয়াছিল? বিশ্বব্যাপী পৈশাচিক তাণ্ডবের মাঝে ভারতের কীণকণ্ঠের অহিংসার বাণী মানুষের স্নেহে ক্ষমে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, এই—কংগ্রেসকে। একদিকে অনন্ত প্রলোভন, অন্যদিকে বিফলতায় অসীম নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও কংগ্রেস যে তাহার লক্ষ্যচ্যুত হয় নাই, তাহার উদার, স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ, স্নেহস্নিগ্ধ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল, তাহার মূলে এই আত্মজান-বিরহিত ত্যাগী বৃদ্ধদক্ষ মহামানবটির মধুর প্রভাব কতখানি কার্য্যকরী হইয়াছিল, কংগ্রেসের ইতিহাস অনাগত অনন্তকাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইবে। সংসার ভাসিয়া গিয়াছে, স্নেহের বন্ধনগুলি একটির পর একটি দুর্দ্দম স্রোত আকুল হাহাকার হারাইয়া গিয়াছে, যেন অরাজীর্ণ, ধাত্রী অবসন্ন, কিন্তু ভারতবর্ষের আহ্বানে, কংগ্রেসের কাছে নব শতাব্দীর বল প্রয়োগের কথা আজ কাহার অবিদিত! গান্ধীজী শতায়ু হৌন, প্রার্থিত পরমায়ু একশত পঁচিশ বর্ষ হৌক, ভারতের ভাগ্য; আজিকার অবিশ্রান্ত কংগ্রেসের অন্তর্নিহিত মহাশক্তির উৎসমূলে এই হরিশ্চন্দ্রের অক্ষয়ের দান বিভব অতীত গৌরবশালিনী ভারতবর্ষকেও গৌরবে পরিপূরিত করিয়াছে, সোনার কাগজে রবিমাণিক্যের অক্ষরে লিখিয়া রাখিলেও মর্য্যাদা দান সম্পূর্ণ হয় বলিয়া মনে হয় না।

পুণ্যশ্লোক কস্তুরবার পবিত্র স্মৃতির সম্মানরক্ষার্থ ভারতবাসী কস্তুরবা স্মৃতি ভাণ্ডার স্থাপিত করিয়াছিলেন। উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য ছিল, এক কোটি টাকা। নির্দ্দিষ্ট দিবসে দেখা গেল, এক কোটীর অনেক অধিক অর্থ ভাণ্ডারে সংগৃহীত হইয়াছে। গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে সরলা পল্লীবালা কস্তুরবার স্মৃতিপূজার্থ পল্লীরমণীগণের কল্যাণকল্পে ভারতের একাধন প্রদেশে বিদ্যালয়, প্রসূতিভবন প্রভৃতির কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। যাঁহারা কস্তুরবার স্মৃতিরক্ষার্থ ভাণ্ডার স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই চিরদুঃখিনী আবাধ-মহিষীর স্মৃতি পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহাতেও বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। মৌলানা সাহেব কারামুক্ত হইয়া শ্রিহীন শূন্য গৃহে আসিয়াই উদ্যোক্তৃগণকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্যের অসংখ্য ও আন্তরিক সাধুবাদ করিয়া বলিলেন, ভারতীয় বীরনারীর স্মৃতিপূজা, ভারতীয়গণ পরিচালিত, ভারতীয় নারীগণের একমাত্র চিকিৎসাগার—এলাহাবাদের কমলা নেহেরু হাসপাতাল অর্থের অভাবে পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে; তাহার পূর্ণ কণ্ঠ আজও হইতেছে; অর্থের অভাবে উহা তাহার সম্প্রসারণ সম্ভব হইতেছে না। আপনাদের সংগৃহীত অর্থ কমলা নেহেরু হাসপাতালে দান করিয়া নারী-জাতির কল্যাণসাধনে সহায়তা করুন, বেসন্তের আত্ম পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন।

আজাদের উপযুক্ত দেশবাসী অবনতমস্তকে নির্দ্দেশ পালন করিল। আর ভাবিল, সার্থক আজাদের নিষ্কাম প্রেমসাধনা! আজাদ জীবনে নিজের জন্য কোনও কামনাই করেন নাই; প্রিয়তমা মহিষীর বিয়োগান্ত জীবনের স্মৃতি রক্ষার তাঁহার দেশবাসীই উদ্যোগী হইয়াছিল, তাহার সহিত তাঁহার কামনা-বাসনার সংস্পর্শও ছিল না, সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা ইহাই বুঝি; কিন্তু নিষ্কাম ধর্ম্মপালন যাঁহার জীবনের ব্রত, তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ থাকিবেই। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম কিন্তু আজও স্মৃতিপটে অক্ষরে অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে, উপন্যাসের নেবী চৌধুরাণী বলিয়াছিল, "আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদের কে?" শুনিয়া নিশি মনে মনে দেবীকে বড় বড় বলিল। ভাবিল, এই সার্থক নিষ্কাম ধর্ম্ম লিখিয়াছিল। ইহার মূলে মরিয়াও সুখ।

মিশিঠাকুরাণীর আদায়ের করিয়া আমারও বলিতে ইচ্ছা হয়, এই লোকের সঙ্গে এই দেশে এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরাও ধন্য।

সাম্যবাদী

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ এম্-এ

আমাদের শ্রীমান্ দিলীপচন্দ্র—কমরেড্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিপ্লবী এবং একনিষ্ঠ সাম্যবাদী বনিয়াছে।

ক্লাশ ফাইভ হইতেই হাতে খড়ি। তখন বিভিন্ন "দিবস" উপলক্ষ করিয়া "ইন্‌ক্লাব্ জিন্দাবাদ্" ধ্বনি করিয়া ক্লাশ হইতে বাহির হইয়া সহরে মিছিল করিয়া বেড়ানোই চরম দেশ সেবা, এই শিক্ষা লাভ হয়। ধাপে ধাপে এই শিক্ষা আগাইয়া চলিয়াছে। এখন Matric পরীক্ষার পর অখণ্ড অবসরে বিখ্যাত বিখ্যাত কমরেড্‌দের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ফলে রাজনীতিজ্ঞান পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। এখন সাম্যবাদের সমস্ত তত্ত্ব দিলীপের নখাগ্রে। নদীর ধারে সান্ধ্য আড্ডায় দিলীপ ও তাহার সহকর্মীরা দেশ বিদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে যে ভাবে অসংশয় আলোচনা করে এবং চূড়ান্ত মত প্রকাশ করে তাহাতে যে কোন প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের ফাঁদরেল সম্পাদকেরও তাক্ লাগিবার কথা। আপোষ-বাদী, বুর্জোয়াপুষ্ট কংগ্রেসকে তাহারা রীতিমত ঘৃণা করে। চরকা, খদ্দর, অহিংসা আর হরিজনসেবা-মার্কা গান্ধীবাদকে তাহারা পরম কৃপার বস্তুই মনে করে। তীর্থভূমি রাশিয়ায় সাম্যবাদ কি করিয়া উদ্ভব হইয়াছে, বিকশিত হইয়াছে, মোড় ফিরিয়াছে এ সব সহজ কথা তো এখন ক্লাশ সিক্সের ছেলেরাও জানে। Lenin, Trosky এবং Stalin এর মধ্যে কাহার মতবাদ বিজ্ঞান-সম্মত; Marxism এর প্রকৃত ব্যাখ্যা কি—Capital না পড়িয়াও তাহাদের তাহা জানিতে বাকী নাই।

আজই Town Hall এর মাঠে Workers Rallyতে microphone বিকম্পিত করিয়া দিলীপ বক্তৃতা দিয়াছে। তাহাতে সে বলিয়াছে মানুষের সমান অধিকারের কথা, ধনিকের উৎপীড়নের কথা, বিশ্ব বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের চাষী মজুরের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতির কথা, দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার কথা, ধনিকেরা যে খাদ্য অপচয় করে সে ক্ষমাহীন পাপের কথা।—প্রচুর হাততালি পাইয়াছে সে, বক্তৃতা শেষে। আশা হইতেছে দেশের শ্রমিক এতদিনে সত্যপথের নির্দ্দেশ পাইয়াছে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিন আসিল বলিয়া।

সর্ব্বহারাদের দুঃখে হৃদয় বিগলিত, তাহাদের উৎসাহে হৃদয় উদ্দীপ্ত—দিলীপ যখন বাসায় ফিরিল তখন রাত বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। কর্ত্তা মাতা শুইয়া পড়িয়াছেন। ভাইবোনগুলি ঘুমে মগ্ন। ভাগ্য ভাল, পিতা ব্যবসায় উপলক্ষে চট্টগ্রাম গিয়াছেন। ছোকরা চাকর পাকের ঘরে বসিয়া ঝিমাইতেছে।

হাত মুখ ধুইয়া দিলীপ ছোকরাকে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া খাইতে বসিল। কিন্তু কয় গ্রাস খাইয়াই তাহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল—ভাত ঠাণ্ডা কণ্‌কণে, ডাল পোড়া লাগিয়াছে, তরকারীতে ধোঁয়ার গন্ধ—মাছ নাই। দিলীপ রাগে চীৎকার করিয়া থালা শুদ্ধ ভাত ছড়াইয়া ফেলিল। পিঁড়ি হইতে উঠিয়া উচ্ছিষ্ট হাতেই ছোকরাকে কান ধরিয়া বারান্দায় টানিয়া বাহির করিয়া বলিল "হারামজাদা মাইনে খাস্‌নে? যা খুসী তাই অখাদ্য খাইয়ে মারতে চাস?"—তাহার পর চলিল চড় ও ঘুষি। গোলমাল শুনিয়া মা উঠিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া দিলীপকে ধম্‌কাইলেন—"কি শুরু করেছিস্? এত বড়ো ছেলে ধরমর এঁটো ভাত ছিটিয়ে কত কাজ বাড়ালি বল্ তো? আর চাকর বাকরকে মার ধোর করিস্—ওরা বুঝি মানুষ নয়?"

দিলীপ মহা খাপ্পা হইয়া বলিল "চাকরবাকরকে চাকর-বাকরের মতই রাখতে হয়। আস্কারা দিয়ে দিয়েই তো তোমরা ওদের নষ্ট করেছো।" এই বলিয়া হাত ধুইয়া রাগে গর্ গর্ করিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। মা এক বাটি ক্ষীর, কলা আর খই আনিয়া বহু অনুনয় করিয়া ছেলের রাগ ভাঙাইলেন।

বাস্তবিক, মায়েরই তো দোষ। বাসার চাকর তো আর ফ্যাক্টরীর শ্রমিক নয়!

আমেরিকায় ভারতীয় যাদুকরের সম্মানলাভ

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন পূর্বে ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"কয় বৎসর পূর্বে একটি প্রিয়দর্শন তরুণ এসে তার অদ্ভুত যাদুশিল্প দেখিয়ে আমাদের চমৎকৃত করেছিল—কেন জানি না, সেই দিন থেকেই তার প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই এবং সে আকর্ষণ দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে। আজ সেই পি-সি-সরকারের ম্যাজিক দেখে শুধু বাংলার নয়—শুধু ভারতের নয়—সমগ্র পৃথিবীর লোক চমৎকৃত—এজন্য আমরাই শুধু গৌরব বোধ করি না—সমগ্র ভারতে যাদুকর সরকারের যাদুক গৌরবের বস্তু হয়েছে।" সম্পাদক মহাশয়ের পূর্বোক্ত বাণী আদৌ অতিশয়োক্তি নহে—উহা যে কতদূর সত্য তাহা সাম্প্রতিক আমেরিকার কতকগুলি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ভারতীয়দের একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, বিদেশের দুর্বীসমাজ হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সম্মানলাভ কোনও গুণীর ভাগ্যে সম্ভব হয়, ততক্ষণ এদেশীয় জনসাধারণ তাহাকে গুণের উপযুক্ত সম্মান করেন না, বা করিতে চান না। এদেশীয় কেহ যদি বিদেশে আপন আবিষ্কার, বিদ্যা বা প্রতিভার জন্য সম্মানলাভ করেন—ভারতীয়গণ তখন তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন প্রদানে কুণ্ঠিত হন না। এদেশের যাদুকর শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকার চীন জাপান প্রমুখ প্রাচ্যভূখণ্ডে তাঁহার অদ্ভুত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম জাপানের যাদুকর সম্মিলনীর 'সম্মানিত সদস্য' নির্বাচিত হন। অতঃপর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। এমন কি ভারতীয় ধার্য্যাজীবী সমিতি তাঁহার কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়া 'পদক' পুরস্কার ঘোষণা করেন।

সূর্য্য যখন আকাশে উদিত হয় তখন তাহাকে দেখিবার জন্য প্রদীপ জ্বালিবার প্রয়োজন হয় না। যাদুসম্রাটের যশঃকীর্তনে আজ সমগ্র জগত মুখরিত। সম্প্রতি তিনি আমেরিকা হইতে যে সম্মানলাভ করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয়—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব

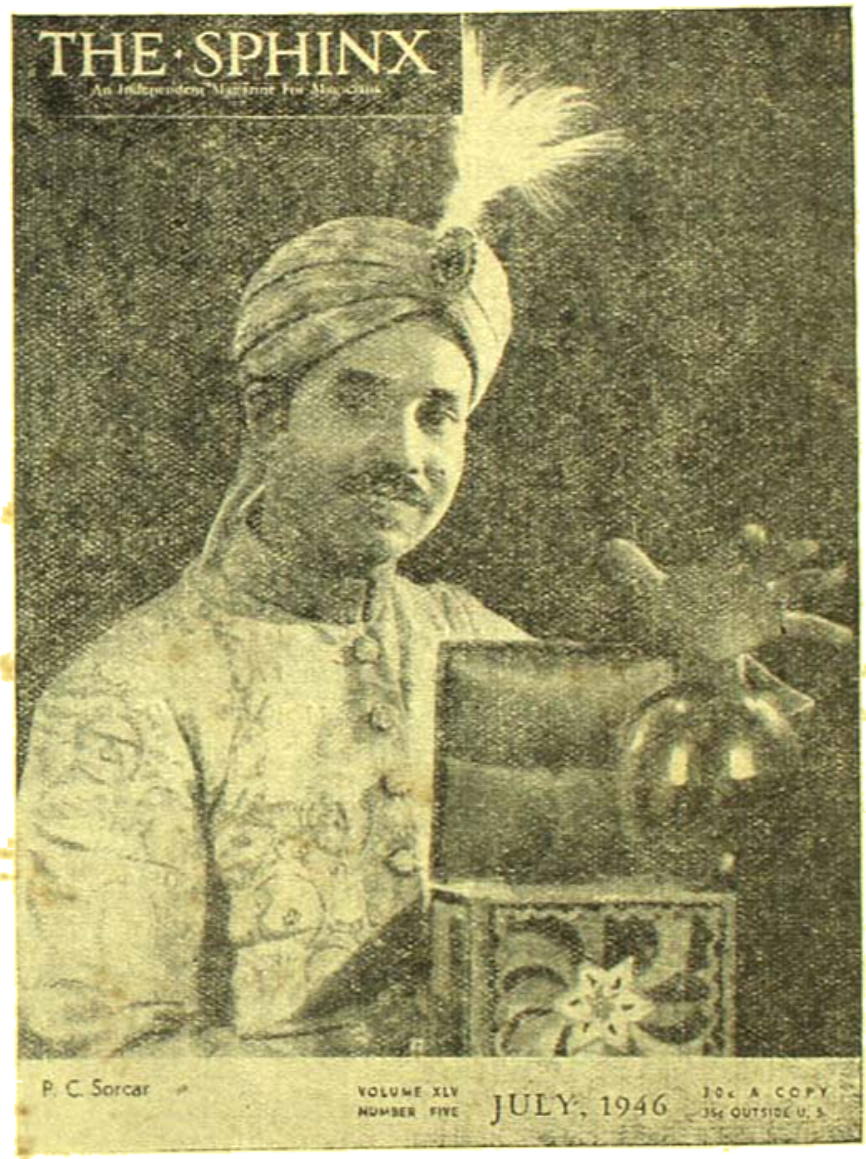

যাদুকর পি-সি-সরকার

করিবেন। বিগত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যাদুকর সম্মিলনী International Brotherhood of Magicians-এর 'সম্মানিত সদস্য' নির্বাচিত হন। তাহার পর আমেরিকার চিকাগো Magicians Round Table-এ তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে

'সম্মানিত সদস্য' নির্বাচিত হন। সেখানে শ্রীযুক্ত সরকারের জন্য একটি চেয়ার সংরক্ষিত হইয়াছে এবং রাইস টেবিলের মুখ বিখ্যাত যে শ্রীযুক্ত সরকার নিশ্চই চিকাগো পৌঁছিবেন এবং ঐ আসন গ্রহণ করিবেন। সম্প্রতি আমেরিকার কতকগুলি সাময়িক ও মাসিক-পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় যাদুকর যেরূপ সম্মানলাভ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাইব।

প্রথমেই লিখিতে হয় The Sphinx নামক আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার (৩৩শ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা) মুলাই ১৯৩৯ সংখ্যার কভারের উপর যাদুসম্রাট পি সি-সরকারের ফটোচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বিদেশীয় পত্রিকায় এদেশীয় লোকের সামান্য সংবাদ বা ফটো প্রকাশিত হওয়াই আশ্চর্য্যের কথা। এহেন অবস্থায় কভারের উপর ভারতীয় যাদুকরের ছবি প্রকাশিত হওয়া ভারতীয় মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। পত্রিকার সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধটি P. C. Sorcar,—Indian Magician শিরোনামায় লিখিত হইয়াছে। উহা লিখিয়াছেন বর্ত্তমান আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর জ্যাক গুইন সাহেব এবং যাদুসম্রাট সম্বন্ধে বিশেষ প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন জগৎপ্রসিদ্ধ যাদুকর ডক্টর মুলহলাণ্ড সাহেব স্বয়ং। The Sphinx পত্রিকায় কভারে ফটো প্রকাশিত হওয়া কতটা গৌরবের কথা, তাহা যাদুকর ডক্টর মুলহলাণ্ডের লেখা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তিনি লিখিয়াছেন—

...'Only the world's best professional magicians ever are pictured on the covers of the Sphinx, and no one can buy the cover. Therefore, it is considered a very great honour by the magicians to be selected for a cover of the Sphinx, which is America's oldest and leading magazine'.....অর্থাৎ কেবলমাত্র পৃথিবীর সেরা যাদুকরদের ছবিই 'স্ফিংক্স্' পত্রিকার প্রচ্ছদ পটে প্রকাশিত হয় এবং কেহই ইহা অর্থের বিনিময়ে কিনিতে পারে না। সুতরাং যাদুকর সমাজ আমেরিকার প্রাচীনতম ও প্রধান 'স্ফিংক্স্' পত্রিকার প্রচ্ছদ-পটের জন্য নির্বাচিত হওয়াকে বিশেষ সম্মানের বিষয় বলিয়া মনে করেন।"...

ইহা ছাড়া জুন ১৯৩৯ সংখ্যায় আমেরিকার অপর এক মাসিক পত্রিকায়—Linking Ring-র চারিপৃষ্ঠা ব্যাপী SORCAR-great Indian magician শিরোনামে একটি সচিত্র জীবন কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সভাপতি John Braun সাহেব যাদুসম্রাট সম্বন্ধে আরও কতকগুলি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। Society of American magicians এর I. B. M-এর প্রাক্তন সভাপতি Eugene Bernstein তাঁহাকে জানান যে..."I feel that you are more than worthy of the excellent publicity which you have received in the Sphinx & the Linking Ring"...

শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকারের লেখা পুস্তক ও প্রবন্ধ পাইয়া সুপ্রসিদ্ধ মার্কিণ যাদুকর Carl W. Jones বলেন, "তিনি পি-সি-সরকারের লেখায় এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তাঁহার বাংলা লেখাগুলি পড়িবার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষায় উদ্যোগী হইয়াছেন।" বাঙ্গালীর পক্ষে ইহাও কম গৌরবের কথা নয়। আমেরিকার প্রবীণতম যাদুকর Dr. Henry R. Evans—ভারতীয় যাদুবিদ্যায় "শ্রীযুক্ত সরকারের স্থায়ী আসন লাভের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়াছেন।"

প্রসিদ্ধ যাদুকর John Platt সাহেব আমেরিকার তিন চারিটি প্রসিদ্ধ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সরকার সম্বন্ধে সচিত্র ও বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মার্কিণ যাদুকর T. J. Crawford সাহেব শ্রীযুক্ত সরকারকে "বর্ত্তমান জগতের একজন খ্যাতিমান লোক" বলিয়া সে দেশের পত্রিকায় লিখিয়াছেন। সম্প্রতি আমেরিকার Modern Magic নামক মাসিক পত্রিকা শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকারের সম্মানার্থে SORCAR NUMBER বা যাদুসম্রাট সরকারের নামে একটি 'বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ইহা ছাড়া, আমেরিকার TOPS নামক মাসিক পত্রিকায় প্রায় প্রতিমাসেই তাঁহার সংবাদ ও তথ্যাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। এদেশীয় পত্রিকাগুলিতে যেমন প্রায়ই শ্রীযুক্ত সরকার প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন তেমনি বিদেশের পত্রিকাদিতেও তিনি ভারতীয় যাদু সম্বন্ধে ও তাঁহার নব নব উদ্ভাবিত অত্যাশ্চর্য্য যাদু কৌশল বিষয়ে নানা প্রবন্ধ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। আমেরিকার Magic Capital of the worldএর প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্র 'Sphinx' ৪৪ সংখ্যায় Sorcar's Balloon Target, সেপ্টেম্বর '৪৪ সংখ্যায় The Future of Magic, অক্টোবর '৪৪ সংখ্যায় Good Night Target, মে ৪৫ সংখ্যায় Improved Think-a-Name, জুন ৪৫ সংখ্যায় Sorcar's Magic Circle প্রভৃতি তাঁহার বড় বড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। The Sphinx পত্রিকার জুন '৪৫ সংখ্যায় তাঁহার লেখা Floating skull প্রকাশিত হইয়াছে। The Linking Ring-র আগষ্ট '৪৫ সংখ্যা হইতে 'ভারতীয় যাদুবিদ্যা' সম্পর্কে একটি সচিত্র ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে।

বিদেশীরা হইতে তাঁহার 'ইন্দ্রজাল' নামক একটি পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং উহার ইংরাজী সংস্করণ Indian Magic নামে আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুবিদ্যা প্রকাশক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে স্থির হইয়াছে।

ইংলণ্ডের Magic wand নামক পত্রিকায় জুন '৪৫ সংখ্যায় যাদুসম্রাটের সচিত্র জীবনকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের যাদুকর সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা উইল গোল্ডস্টোন সাহেব বহুপূর্ব্বেই তাঁহাকে 'জগদ্বিখ্যাত যাদুকর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভারতীয় যাদুকরের পৃথিবীর এই সুনাম লাভে ভারতীয় মাত্রেরই গর্ব্বের বিষয়।

'শনিবারের চিঠি' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস আশ্বিন ১৩৫০

সালে লিখিয়াছিলেন—"শ্রীযুক্ত সি-সি-সরকার আমার স্নেহাস্পদ এবং বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্বের বাহ্য আড়ালে বুদ্ধি ও কৌশলের বাহুতে তিনি আমাকে বার-বার পরাজিত করে তার প্রতি আমাকে শ্রদ্ধান্বিত করেছেন। হাত সাফাই জিনিষটাকে তিনি এমনভাবেই শিল্পের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছেন যে, বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিজীবী লোকেরাও তাঁকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে মনে করতে বাধ্য হবেন। ইন্দ্রজালবিদ্যায় ভারতবর্ষের পুরাতন খ্যাতিকে তিনি বর্ত্তমানে শুধু বজায়ই রাখেন নি, বর্দ্ধিত করেছেন, তার সম্বন্ধে এইটেই সব চাইতে বড় কথা। তিনি কম বয়সেই দেশের অন্যতম গৌরব হয়ে দাঁড়িয়েছেন, এতে তাঁর বন্ধু হিসাবে আমিও গৌরবান্বিত।"

সকলের সঙ্গে হ্যারিণাইয়া আমিও লিখি যে, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সি-সি-সরকারের প্রতিভার অলৌকিকতার সঙ্গেত দেখে কতো বাস্তববাদীও চমকে উঠবে। অমূল শক্তির কাছে বন্ধুবরের বাহুশক্তির আরো উন্নতি কামনা করি।

অর্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা— শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

রেখা—শ্রীরঞ্জন ভট্ট এম-এ

(৫)

বৌভাতের রাত।

'ইহাগচ্ছ' বলে মন্ত্রণাসভাতে যার আমন্ত্রণকে—তাকে নয়, কারণ এ বাড়ীতে শুধু অনুরাগ চলতে পারে পূর্ব্বরাগ নয়, আর বন্ধুরাগ ও কল্পনারও অতীত—সাগ্রহে আবাহন করে নিল তিনি দেখা দিলেন শুধু একটী দেবী প্রতিমার মত। মর্ত্ত্যের মানবী কোথায় তার মধ্যে? তার সবই ত শুধু সৌন্দর্য্য, অন্তঃপুরের অন্তরালেই জ্বল জ্বল করবে। তার উপস্থিতি, ব্রীড়াময়ীর কোন সলজ্জ হাসি, অর্দ্ধনম্র আঁখি ভঙ্গী বা নত মুখের ছোট্ট একটী নমস্কারও তাদের এই উন্মুখ শুভ সম্ভাষণকে পুরস্কৃত করবে না। প্রতিমা প্রাণময়ী হয়ে উঠবে না। সুসজ্জিতা সিংহাসনারূঢ়া দেবীতে মানবীর অনুভব প্রকাশ পাবে না।

আজ রাত্রিতে শত বিজলীবাতির সাজানো ঘরটী ফুলে চন্দনে শোভায় সৌরভে স্বর্গের মত মনে হচ্ছে। নববধূর চারদিক ঘিরে কত সুসজ্জিতা তরুণী ও অতিসজ্জিতা প্রৌঢ়া অশ্রান্তভাবে বাক্যালাপ করছে। ঘরের বাইরে বন্ধুর দল। প্রৌঢ়ারা ভাবছে,ওরা হচ্ছে ভোজের আসরে রবাহূতের মত; এ সভায় ওদের শোভা পাবে না। তরুণীরা ভাবছে যে, ওরা কেন এমন দূরে সঙ্কুচিতের মত দাঁড়িয়ে আছে আমরা যখন ওদের দেখে বিমুখ হচ্ছি না বা কুণ্ঠিত ভাব দেখাচ্ছি না। তারা জানে যে, আজকের রাতে সবাই সুন্দর, কারণ আনন্দই হচ্ছে সৌন্দর্য্য। প্রিয়ার মুখের রূপালী হাসিই হচ্ছে রূপ। কে জানে আজ হয়ত তাদের কারো মুখের হাসি ওদের কারো মনে আলো জ্বালিয়ে তুলবে। মেয়েরা সবাই নিজেদের বিকাশ করে তুলছে তাই আজকের রাতে।

বন্ধুরা কিন্তু সবাই পিকেটিং করছে ঘরের সামনে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সুবিধা নিয়ে এ জিনিষটী বড়ই সম্মানজনক হয়ে উঠেছে আজকাল। শীত করছে ভোর বেলা; আচ্ছা, বিছানায় এমন সময় লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকাটাই কি সত্য নয়? তাহলে সত্যাগ্রহ করে পিকেটিং করে যাও—পুলিশরূপিণী গৃহিণী যতই তোমার অসহযোগকে অসহ্য মনে করে চটে তাড়া করুন না কেন। গরমের ছুটী হয়নি এখনো এবং অধ্যাপক গরম গরম অঙ্ক কষাচ্ছেন ক্লাসে; বেশ, কলেজের পাচীলের পিছনের বটগাছের

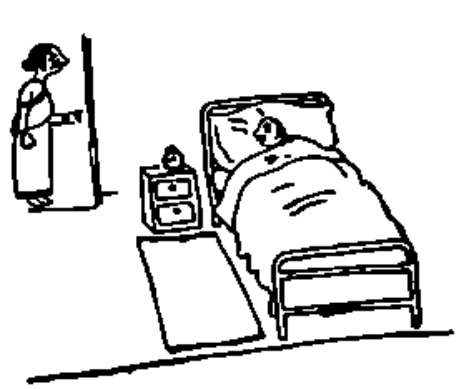

বিছানায় পিকেটিং

তলায় চানাচুর সহযোগে পিকেটিং করতে করতে তার সঙ্গে অহিংস অসহযোগ করতে থাক।

নারীসঙ্ঘ ব্যূহ ভেদ করে অবশেষে প্রদ্যুম্ন কলেজের ছাত্রীদের নববধূর সিংহাসনের কাছে নিয়ে এল। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের পর পরিচয় পর্ব্ব বলে কোন পর্ব্ব বেদব্যাসের মহাভারতে স্থান হয়নি। যদি পেত তাহলে সেই ঊনবিংশ পর্ব্বটীই সবচেয়ে বেশী করে মুক্তিকামী পাঠকরা পড়তেন তাতে সন্দেহ নেই। সিনেমার ভাষায় কোন চিত্রকে প্রথম দেখানকে কি মুক্তিস্নাত বলে বর্ণনা করে না? কাজেই প্রথম পরিচয়টাকে আধুনিক ভাষায় মুক্তিস্নাত বলেই যদি পাঠকরা গ্রহণ করেন তা হলে ভুল হবে না।

পরিচয় দিতে অবশ্য প্রথম আরম্ভ করল প্রদ্যুম্ন, কিন্তু ঐতিহাসিক ধারা বজায় রেখে পাউডার-মণ্ডিতা গৌরী সেনাদের রণক্ষেত্র থেকে উঠিয়ে দিয়ে গৌড়বিজয়ী নীহারিকা আবার বক্তিয়ারের অংশ গ্রহণ করল। কোনখানটায় প্রদ্যুম্ন থামল ও নীহারিকা রণক্ষেত্রে নামল তা বোঝা শক্ত, আর তা বুঝে দরকারও নেই আমাদের।

এর নাম হচ্ছে নিরঞ্জন। বাপ মা এ নাম দিয়েছিল যাতে অকালে ছেলের মনে কোন অঞ্জন না পড়ে, অথবা কারো মনোরঞ্জন করতে না ছুটে—অন্তত পড়াশোনাটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত। কিন্তু বন্ধুমহলে ওর নাম হচ্ছে নারায়রঞ্জন। রঙীণ পাঞ্জাবী ও সর্ব্বদাই পরে, আর নারীদের যে কোন প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত অঙ্গিমাবের আভাস পেলেই ও হয়ে ওঠে একেবারে সেই রামায়ণের অঞ্জনানন্দন। কলির গন্ধমাদন ইভনিং ইন প্যারিস ওর পকেটে পকেটেই ঘুরছে। এই দেখুন তার প্রমাণ। এই বলে চট করে ওর পকেটে হাত দিয়ে পুষ্পদারের সুদৃশ্য আধারটী বের করে নীহারিকা উপহারটী বন্ধুকে আর্য্যপুত্রী সম্বোধন করে নিবেদন করে দিল।

আর এই হচ্ছে সৌরভ মিত্র। ওরফে রাসভ মিত্র। ও গান গাইতে চায়, তার উপর কেলা ক্ল্যাশিকাল। তবে ওর ক্ল্যাশিক আর আমাদের কাঁসী রতই এক সঙ্গে ঐক্যতান চালাতে থাকে ততই ওর গলার কসরৎ বেড়ে যায়। আজ যদি আর একটু দেরী হত দেবীর সিংহাসন প্রান্তে আমাদের পৌঁছাতে, তাহলে আমরা রাসভের কণ্ঠ-নিনাদের তুর্য্যধ্বনি বাজিয়ে মুর্বাইকে সরিয়ে দিতে পারতাম।

রাসভ মিত্র

বন্ধু বর্ণনার ব্যঞ্জনা এই বিরাট তরুণের দলকে পেয়ে বসল। কেহ ভেবে দেখল না যে তাদের এই মুখর প্রগল্‌ভতাকে নববধূ কেমন ভাবে গ্রহণ করছে বা কতখানি উপভোগ করছে। পিছন থেকে একজন তাকে ভাল করে দেখবার জন্য উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। তাকে এক ফাঁকে সামনে সরিয়ে এনে প্রদ্যুম্ন পরিচয় করিয়ে দিল—হাতীর দাঁতের কাজ করা চন্দন কাঠের বাক্স হাতে এই বন্ধুটীর নাম হচ্ছে জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী। বন্ধুরা কিন্তু উচ্চ হাস্যে প্রতিবাদ করে উঠল, "না, না," ও হচ্ছে গজবন্ধু চক্রবর্ত্তী। প্রথম নামটার সার্থক প্রমাণ হাতে হাতেই রয়েছে, আর উপাধিটা হচ্ছে পেশার পরিচয়। পার্শীদের মতন; যেমন ধরুন ধোতিওয়ালা—যদিও সে হয়ত জীবনে স্যুট ছাড়া আর কিছু পরবে না। কারো নাম মার্চেন্ট, যদিও সে নিজে মার্চেন্ট অফিসের কেরাণীর বেশী কিছু নয়। চক্রবর্ত্তীর কাছে সংসারের সব কিছুরই বাঁকা-রূপটীর সন্ধান পাবেন যদি চান ত। সাইমন কমিশন থেকে আরম্ভ করে শ্যামবাজারের বাঁ পাশেই কেন রাধাবাজার হল না, তার নায্য ব্যাখ্যা আমাদের সব সময়ই দেয়। এই দেখুন না, আপনাদের এই পাড়ার কোনের করালী কেবিনে সাইন বোর্ড লটকান আছে—ফাউল চপ বানানটা অবশ্য শুদ্ধ ইংরেজীতে হয় নি। তবে "বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের" হোটেলে ম্লেচ্ছ ভাষার বানানটা যদি অশুদ্ধই হয় দুটো নিগেটিভে মিলে একটা পজিটিভের ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে অর্থাৎ বিলিতি স্বাদের চপের বদলে উড়িয়া স্বাদের খাঁটী স্বদেশী জিনিষই পাওয়া যাবে

এই ইঙ্গিত নাকি ওর মধ্যে আছে। তার উপর গজবন্ধু বলে, যে লোকটা এত সাধু ও সত্যবাদী তার দোকানেই পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত।

রোম্যান এসে খাটী রোম্যান প্রথায় অভিবাদন করল নববধূকে, একহাতে চাদর জড়িয়ে নিয়ে এবং অন্য হাত সামনে ছড়িয়ে দিয়ে। এ হচ্ছে রোম্যান। বাপ মা নাম দিয়েছিল সুমন; কিন্তু রাসভের রূপদকে টেক্কা দেওয়ার

বং—রোম্যান

জন্য ও জার্মাণ সঙ্গীত সাধনা আরম্ভ করল। অর্থাৎ দাঁতে কাঁকর ছড়ানো কড়াই মাড়াই করতে করতে গাইত, আর ইংরেজীতে নামের বানান লিখত ওস্তাদ। আমরা একদিন এলিজাবেথ ওস্তাদের গানের রেকর্ড জোর করে শুনিয়ে দেবার পর থেকে সঙ্গীত ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিল। কিন্তু কদিন পরে দেখি যে ইতিহাস অনার্সের পরম হংসটী আমাদের পরম বকে পরিণত হয়েছে। বক বক করে বেড়াচ্ছে যে, বাঙ্গালা স্বাধীন জাতি—রোম্যানদের এক পর্য্যায়ের ও এমন কি একই গোত্র। প্রমাণ করে দিয়েছে যে পৃথিবীতে সব সভ্য জাতির মধ্যে কেবল দুটী জাতির মাথায় কোন পোষাক ছিল না। প্রাচীন যুগের রোম্যান ও এযুগের বং-রোম্যান বা বঙ্গম্যান; পদ্মা পার হয়ে থাকলে ব্যঙ্গম্যানও কইতে পারেন। কথাটা অবশ্য বাংলা ইংরিজি মিশিয়ে বেংলিশ (Benglish) হল, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। রামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের মত সর্ব্বভাষা সমন্বয় হচ্ছে। বরং সুবিধা হচ্ছে এই যে, কোন ভাষাই আর খাঁটী করে শিখতে হয় না।

মোট কথা রোম্যানরা বাঙ্গালীদেরই মত ধুতি চাদর পরত; নাম ছিল তখন টোগা আর টিউনিক। টোগা আর চাপকান নয়; সেটা মুসলমানী, রোমানী নয়। পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত লোকরা পূর্ব্বপুরুষদের কথা সহজে ভুলতে পারে না, তাই ওরা এখনো হাটু পর্য্যন্তই ধুতি পরে। মুসোলিনিকে সব কথা খুলে চিঠি লিখলেই একখানা মুখল পাঠিয়ে দেবে বঙ্গম্যানদের জাতীয় ঝাণ্ডা হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য। জিনিষটা বিদেশী হলেও কাস্তে কুড়ুলের চেয়ে বেশী বেমানান হবে না।

ইতিহাসের কথাই যদি উঠল তবে এর পরিচয় দিই আপনার কাছে—এই বলে একটী লাজুক বিনম্র ও বিনাধা-পরা বন্ধুকে সবাই ঠেলে সামনে পাঠিয়ে দিল। ইতিহাসের একেবারে ইতিকথার গিয়ে পৌছেচে আমাদের হরিহর ওরফে অড়হর। বাঙ্গালীর প্রতিভার একেবারে পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ পোড়া কাঠ। সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে ওর রিসার্চের অর্থাৎ গন্ধ খোঁজার ভিতর কোন পণ্ডিতের পুঁথি বা তথ্যের কোনই ভেজাল নেই। একেবারে স্বকীয় অর্থাৎ "অরিজিন্যাল"। কেবল বাঙ্গালীরই উর্ব্বর মস্তিষ্কে "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি" এরকম ইতিহাস জন্মাতে পারে। টেক্সট বুক, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, প্রত্নতত্ত্ব, শিলালিপি সব হার মেনে গেছে। অড়হরের থিসীস হচ্ছে মগুর ডাল সম্বন্ধে। সংক্ষেপে ওর বক্তব্য হচ্ছে এই যে মুগুরী ডালটা সাত্ত্বিক হিন্দুরা যে বাদ দিয়ে চলেছিল তার বিশেষ কারণ আছে। বিদেশী বর্জ্জনটা

কিছু আর জাতীয় কল্পরেসের নব রঙ্গ নয়। ওরা যেন না ভাবে যে বিদেশী বর্জনটা ওদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। সেকালের টাক টিকি এও কোং একালের বিলেত-ফেরত বিদেশীদের মতই বিদেশী বর্জন করে দিয়েছিলেন। মুগুরী ভালটা বাদ গেল, কারণ ওটা মিশর থেকে সরাসরি এদেশে এসেছিল। ক্লিয়োপেট্রার কয়েকটী সখা তার প্রসাধন করত ও গায়ের রং ঠিক রাখত মুগুরী পিষে দুধের সরের সঙ্গে গায়ে মাখিয়ে। ওরা কোন রকমে পালিয়ে এসে প্রথম কিষ্কিন্ধ্যায় ছুটেছিল, তাই ও জায়গার নাম বদলিয়ে চল যাইশোর। আদি ও অকৃত্রিম বাংলার শ্রেষ্ঠ অপভ্রংশ। তবে ছোলাটা খাওয়া চলে। কারণ হিন্দুরাই নবদ্বীপে ওটা চাষ করত, তাই কোন কোন শস্তের নাম ধব শস্ত। হিঁদুয়ানী বাঁচিয়ে সস্তায় স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হলে ওর মতে ছোলা খাওয়া উচিত। কিন্তু আমরা বলি যে ছোলারই বা দরকার কি? এই দেখুন না ও উপহার এনেছে পেতলের একটী পাখা, কেমন সুন্দর পুষ্টই নবরঙ্গ, জীবন রস একেবারে উপচিয়ে পড়ছে—তাই আমরা কোরাস গাই—

অড়হর দা-ল্-অ
তুমি খাইলে কেন ছোলা
তোমার খাস্ত যে গো ঘাস্-অ।

(৬)

পরিচয়পর্বটা প্রাণান্তকর হয়ে উঠছিল—শ্রোত্রী ও বক্তৃদল উভয়তই। এবং তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রতিবেশিনী ও নিমন্ত্রিতাদের দল যাদের এই ছেলেরা ঘরছাড়া করে এতক্ষণ ধরে মৌরসী পাট্টা করে রেখেছে তারাও বহুক্ষণ থেকে দখল আবার সাব্যস্ত করবার জন্ত ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে। তারা আতঙ্কে বিস্ময়ে ও সরোষে এই অর্বাচীনদের প্রলাপ শুনে অসন্তোষ দেখাচ্ছে। তা স্বাভাবিকও বটে। বন্ধুর দল এসব কৌতুক পরিচয়ের অস্ত্র হানাহানি করত নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সঙ্গে, যদি বাগ্‌যুদ্ধ কখনো হত। তখন কিন্তু তারা নিজেরাই কখনো ভাবেনি যে এরূপ প্রগল্‌ভতা নববধূর সামনে তারা করবে। দোষও তাদের দেওয়া যায় না। এই জীবনে প্রথম একটী নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ যে তাদেরই একজনের নিকটতম হয়ে এসেছে। তার সঙ্গে সম্পর্ক বা মানসিক বিকাশের ব্যবধানের কথা হয়ত তারা সাময়িক ভাবে ভুলে গিয়েছিল বা আনন্দোৎসবের মধ্যে খেয়াল হয় নি। কিন্তু তা বলে সাংসারিকতায় অভিজ্ঞ প্রবীণরা তা মেনে নেবে কেন? অন্তরালে তাদের অপ্রসন্ন গুঞ্জন ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে গর্জনার রূপ ধারণ করতে লাগল।

ক্রমশঃ

কৃত্তিবাস পণ্ডিত

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মহামুনি বাল্মীকির অবতার বাঙ্গলার আদি কবি কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কৃত্তিবাসের উপাধি: কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর শেষে লিখিত আছে। (ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩৪১, পৃঃ ৪৪৬)

মুখটী বংশে ওঝা বংশ সভার বিদিত।
হরি উপজিল এই কিত্তিবাস পণ্ডিত।

সুতরাং তাঁহার কুলোপাধি 'মুখটী'; তখনও 'মুখোপাধ্যায়' লিখিবার রীতি প্রচলিত হয় নাই বুঝা যায়। কবে ঐ রীতি প্রচলিত হইল তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। নরসিংহ ওঝা ও মুরারি ওঝার নামে মুখবংশের এই শাখাটি "ওঝা বংশ" নামে পরিচিত হইয়াছিল এবং কৃত্তিবাসেরও 'ওঝা' উপাধিই ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। বস্তুতঃ উদ্ধৃত পয়ারে এবং অন্যান্য রামায়ণের শত শত ভণিতায়—'কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি', 'কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ', 'লক্ষাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে' প্রভৃতিতে—কবিরা যথাযথ তাঁহার পাণ্ডিত্যের উপাধিটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামগতি হইতে আরম্ভ করিয়া ডক্টর সুকুমার সেন পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিকই বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করেন নাই। সকলেই পণ্ডিত শব্দটিকে সাধারণ বিশেষণ পদ ধরিয়াছেন। লক্ষ্য করিতে হইবে ভণিতায় মুরারি কৃত্তিবাসের 'ওঝা' উপাধি পাওয়া যায় না। আত্মবিবরণীতে পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের মুরারিগুপ্তসহ সুধীরও "পণ্ডিত" উপাধি ছিল। বস্তুতঃ সার্বভৌম, শিরোমণি প্রভৃতির ন্যায় "পণ্ডিত" উপাধিও যে একসময়ে বঙ্গের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত ছিল ইহা অনেকের জানা নাই এবং আমাদেরও

ছিল না। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থগুলির পরীক্ষা করিয়াই আমরা এই তথ্য প্রথম অবগত হইয়াছি। কুলপঞ্জীতে কৃত্তিবাসের নাম কি ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

(১) (বমবালি)সুতা আসন-শান্তি-বলক্ষত্র-মৃত্যুঞ্জয়-ভাগো-ভাসো-কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত শ্রীনাথ-শ্রীকান্ত-শ্রীকণ্ঠ-চতুর্ভুজাঃ। কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত রামায়ণস্য পাঁচালিকারকঃ।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথির ২২৭ খ পত্র)

(২) বনবালিকস্য - - - - উৎসুতাঃ কীর্ত্তিবাস পণ্ডিৎ মৃত্যুঞ্জয় শান্তি মাধব শ্রীধর-শ্রীনারায়ণোকাঃ।

(অন্যত্রিকটে রক্ষিত পুথির ২১ ক পত্র)

(৩) বনবালিকস্য - - - উৎসুতাঃ কৃত্তিবাস পণ্ডিৎ শান্তিমাধব মৃত্যুঞ্জয়কলো শ্রীকণ্ঠ-শ্রীধর-চতুর্ভুজ বালাধর ভাস্করজগন্নাথাসো শ্রীনাথ শ্রীকান্তাঃ। কৃত্তিবাস পণ্ডিৎ রামায়ণপাঁচালিকর্ত্তা।

(রাজসাহী মিউজিয়মে রক্ষিত বিক্রমপুর হইতে সংগৃহীত পুথির ৩১৩ ক পত্র)

(৪) কিত্তিবাস পণ্ডিত রামায়ণ রচিছিলো।

(আড়িয়াদহের ঘটক সূত্রে রক্ষিত একটি পুথির ৩৫৯ ক পত্র)

ঘটক গ্রন্থে প্রায় সর্বত্র পণ্ডিতগণের উপাধি যথাযথ লিখিত পাওয়া যায়। কবি কৃত্তিবাসের বিভিন্ন উপাধিটিও পূর্বোপর কুলগ্রন্থে যথাযথ কীর্তিত হইয়া আসিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে নব্য ন্যায়ের পূর্ণ অভ্যুদয়কালে এই সকল প্রাচীন উপাধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। তৎপূর্বে "পণ্ডিত" উপাধিটি বহুল পরিমাণে বিদ্বৎ সমাজে প্রচলিত ছিল। আমরা একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে "পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর" নামে একজন মহা পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার একাধিক পুস্তকের পুষ্পিকায় তাঁহার পিতার নাম লিখিত আছে "মহামহোপাধ্যায় শ্রীহর-শ্রীকান্ত পণ্ডিত" (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃঃ ১৪২, ১৪৮)। কুলপঞ্জীর উদ্ধৃত বচন হইতে প্রমাণ হইতেছে—তাঁহাদের সকল একমাত্র কৃত্তিবাসই উপাধিধারী ছিলেন। আত্মবিবরণীর নিম্নলিখিত পয়ারটি অতঃপর আর অসংলগ্ন বলে হইবে না:

কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কিত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সভায়।

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'পণ্ডিত' ছাটিয়া 'মুখটি' করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাসের মাতামহ: পিতা বনমালীর সম্বন্ধে আত্মবিবরণীতে লিখিত আছে:—

মুরারি ওঝার বংশ ওঝা বনমালী।
প্রথম বিভা তৈল ওঝা মুক্তার পাতুলী।

প্রবাদের মহাবংশাবলীতে যথাযথ পাওয়া যায় (পৃ ৬৪) বনমালীর "আরি" (অর্থাৎ শ্বশুর) ছিলেন 'গাং পুরো' অর্থাৎ গাঙ্গুলীবংশীয় ৪৩ সমীকরণের বিখ্যাত কুলীন শিবপুর পুলস্ত্যোত্তম (মহাবংশাবলী, পৃ ৫৩)। কুলগ্রন্থ হইতে আত্মবিবরণীর এইরূপ বহু বিশ্লেষণের সমর্থন ও পরিপূরণ লাভ করা যায়। আমরা যথাসম্ভবে অন্তর্নিবেশ পরিত্যাগ করিলাম।

কৃত্তিবাসের বিবাহ: আত্মবিবরণীতে কিম্বা অন্যত্র কৃত্তিবাস নিজের বিবাহ ও পুত্রকন্যাদির বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব রহিয়াছেন। কুলপঞ্জীতে এ বিষয়ে প্রামাণিক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

কৃত্তিবাসের "আরি" (অর্থাৎ শ্বশুর) তিনজন—"বং শশুর (একটি পুথির পাঠ শ্বশুর) বং ঘ্যান বং ওণাকর" (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃ ৪০ দ্রষ্টব্য)। ওণাকরের নাম আমাদের পুথিতে আছে)। "বন্য" বংশীয় এই তিনজনের মধ্যে একজনের পরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুলাবলেপের একটি অমিশ্রলিঙ্গ শাখা "উদুরা" নামে পরিচিত। ঐ শাখার আদি কুলীন দ্বিতীয় সমীকরণের ঈশানের অধস্তন সপ্তম পুরুষ শশুরই কৃত্তিবাসের শশুর। আমাদের পুথিতে শশুরের কুলবিবরণে পাওয়া যায় "কেমা মুখ কীর্তিবাস:" (৩৩৯ক পত্র)। ঢাকেশ্বরীর পুথিতে আরও স্পষ্ট লিখিত আছে "অতিকেমা মুং কির্তিবাস পণ্ডিত" (১২১ পত্র)। এই উদুরা বংশ কুলমানে উৎকৃষ্ট নহে। কুলিয়ার শ্রেষ্ঠ বংশে কন্যাদান করিয়া শশুরই মর্যাদা লাভ করেন, 'অতি-কেমা' শব্দদ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের অপর শশুরালয়ের পরিচয় কুলগ্রন্থে গবেষণীয়। আমরা এখনও তাহা আবিষ্কার করিতে পারি নাই।

কৃত্তিবাসের পুত্র-পৌত্রাদি: কৃত্তিবাসের অধস্তন বংশলতা কুলপঞ্জী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃ ৪০-৪১)। নূতন অন্বেষণার ফলে তাহার সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে। কৃত্তিবাসের পুত্র সংখ্যা ৪ কিম্বা ৫—অর্জুন পাঠক, শ্রীধর, বংশধর ও শঙ্কর। আড়িয়াদহের একটি কুলগ্রন্থে অপর একটি নাম আছে সূর্য। পুত্রদের মধ্যে "পাঠক" উপাধিধারী অর্জুনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিদ্বান্ ছিলেন। তৎপুত্র রজনীকর ঘটক। তৎপুত্র বিদ্যানন্দাচার্য্য ও দামোদর "সরস্বতী"। বিদ্যানন্দের অধস্তন ধারা যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা প্রামাণিক নহে। বিদ্যানন্দের ৩ পুত্র—রঘুনাথ, চতুর্ভানন ও রামলোচন। অতঃপর কোন নাম অর্জুনের ধারায় কুলগ্রন্থে আর পাওয়া যায় নাই। বিদ্যানন্দাচার্য্যও "কুলিয়া" নিবাসী ছিলেন, এইরূপ স্পষ্ট নির্দেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। "ধনিয়া"র চট্টরাজীর ন্যাসের কুলবিবরণে লিখিত আছে। "ন্যাসক বিবাহ মুং বিদ্যানন্দাচার্য্যস্য কন্যা, ধানিং, মুখটী-মধ্যগ্রামবাসী।" উক্ত ন্যাস বিবরণের বংশধর এবং আদিকুলীন বন্দ্যঘটির বংশের পুরুষ অধস্তন (সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথির ১৭৭ক পত্র)। কুলিয়ার যে পাড়ায় কৃত্তিবাসের বাড়ী ছিল তাহার নাম পাওয়া গেল 'মধ্য-গ্রাম'। বর্তমানে 'বালোপাড়া' কিম্বা 'আলিশা' নামে কোন পাড়া কুলিয়ায় বিদ্যমান আছে কি না, স্থানীয় অনুসন্ধানে নির্ণয় করা আবশ্যক। তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের ভিটি আবিষ্কৃত হইতে পারে।

কৃত্তিবাসের কন্যা: কৃত্তিবাসের ৩ কন্যার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। আড়িয়াদহ ও রাজসাহির পুথি অনুসারে একটি কন্যা "বনমালা বন্দ্যঘটিতা"। আমাদের নিকট রক্ষিত পুথিতে অপর এক কন্যা "শশাঙ্কমুখী, পদ্মেন্দ্র রায়ে বিবাহ, হালিসহর।" পদ্মেন্দ্র রায় সম্ভবতঃ "বড়বাটী" অর্থাৎ পোড়াদহ শ্রোত্রিয় বাগচীবংশের উত্তরীয় হইতে অভিন্ন, শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিয়া

কৃত্তিবাসের কুলহানি হয়। কৃত্তিবাসের "আপনা জন্মাবার বৃত্তিকারকটের বীজ, হানি" (পরিষদের উক্ত পুথি ৪২৭ খ পত্র)। বৃত্তি-করকটের পরিচয় অজ্ঞাত, বৃত্তিকর নামে মাঘাদিকাব্যের একজন প্রাচীন টীকাকার ছিলেন, তিনি অত্রির বংশধর হইতে পারেন। আমাদের নিকট রক্ষিত "ঘটক-কেশরী"র কুলগ্রন্থানুসারে কৃত্তিবাসের কুলনাশ হওয়ার পূর্বেই তাঁহার এক পৌত্র পঞ্চর-সুত কালিদাসের বিবাহ হইয়াছিল (সা-প-প, ১৩৪৪, পৃ-১১৬-৮)। সুতরাং কৃত্তিবাস দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন প্রমাণ হয়। কৃত্তিবাসের কন্যাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিবরণ দেখিয়া অনুমান হয় কবি সম্ভবতঃ গৌড়ীয়প্রথার সহযোগিতা বর্জন করিয়া সংস্কারের পরিচয় দিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ: সম্প্রতি একাধিক নূতন নির্দেশ আবিষ্কৃত হওয়ায় এ বিষয়ে জটিল সমস্যার মীমাংসা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। দুইটী মাত্র মূল্যবান তথ্য আমরা আলোচনা করিলাম।

(১) কৃত্তিবাসের বন্ধুর "উনুরা" বংশীয় পূর্বোল্লিখিত পঞ্চরের এক ভাই ছিলেন "উৎসাহ"। এই উৎসাহের বৃদ্ধপৌত্রই বিখ্যাত নৈয়ায়িক "কণাদ তর্কবাগীশ"। বংশলতা যথা, উৎসাহ—শ্রীহর্ষ—হরেশ্বর—বৃহস্পতিদত্ত—কণাদ। কণাদ তর্কবাগীশ বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ও রঘুনাথ শিরোমণির সহাধ্যায়ী ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। (৺মনোমোহন চক্রবর্তী প্রবন্ধ J. A. S. B., 1915, p. 276 এবং Vidyabhusana : Hist. of Indian Logic, p. 466 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) এই প্রবাদের সমর্থনে আমরা কণাদ-রচিত অজ্ঞাত দুষ্প্রাপ্য চিন্তামণিটীকার অনুমান খণ্ডের প্রতিলিপিটি আবিষ্কার করিয়াছি। ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে আছে

সার্বভৌম-পদাম্ভোজমধুকরীকৃত বৌলিনা।
অনুমান মণিব্যাখ্যা শ্রীকণাদেন তন্যতে।

কণাদ পরে জানকীনাথ ভট্টাচার্যচূড়ামণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। (সা-প-প, ৮০১), পৃ: ২০) শিরোমণির জন্মাব্দ আমরা ১৪৮০-৯০ খ্রী: মধ্যে অনুমান করিয়াছি (ঐ, ১৩৪০, পৃ. ১৩-১৫) এবং তাঁহার সমর্থক বহুপ্রমাণ সংপ্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিরোমণি বাসুদেব সার্বভৌমের জন্ম ছিলেন, তাহারও নিশ্চিত এবং উৎকৃষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং কণাদের জন্মাব্দ ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে যাইবে না। তাঁহার প্রপিতামহের তর্কবাগীশ কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্মাব্দও ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে। কারণ, একপুরুষের গড়পড়তা ৩৫ বৎসর বলিয়া আমরা নির্ণয় করিয়াছি (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ১১৮)। উর্দ্ধমুখী গণনায় একটী মাত্র সূত্র এখানে আলোচিত হইল। অধোমুখী গণনায়ও একটী নবাবিষ্কৃত উৎকৃষ্ট সূত্র আলোচনার যোগ্য।

(২) কৃত্তিবাসের পিতামহ "মুরারি ওঝা" ৩৪ সমীকরণের বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। তাঁহার সমকালীন অন্য দুই জন কুলীনের নাম উল্লেখ করিতে হইবে—একজন 'বৃহদ্বন্দ্যঘটী'-বংশীয় "বাসু" এবং অপর একজন 'কাঞ্জি'-বংশীয় "কুবের"। ইঁহারা তিনজনই প্রথম কুলীন হইতে অন্যূন ৬ পুরুষ। বংশলতা যথা,—(বন্ধনী মধ্যে সমীকরণের সংখ্যা লিখিত হইল)।

(ক) আদিত্য (১)—উমা (৩)—শিবো (৭)—নরসিংহ (১৩)। গর্ভেশ্বর (২১)—মুরারি। (খ) মহেশ্বর (১)—মহাদেব (৩)—দুর্গাবলি (৭) মহেশ্বর (১৩)—উৎসাহ (২০)—বাসু। (গ) কৃষ্ণ (২)—চামুণ্ডা (৩) —তেজী (৮)—বসু (৪)—রবি (১৩)—কুবের।

উক্ত বাসুর সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—"বাসুকস্য সুতাঃ কাং কুবের রাজপণ্ডিত,. তৎসুতো সুবর্ণ-কুকো।" (পরিষদের পূর্বোল্লিখিত পুথির ৪৪ খ পত্র) 'কাং' অর্থাৎ কাঞ্জিবিল্লী বংশে দুই জন কুবেরের নাম পাওয়া যায়—প্রথম কুলীন কুসুমদলের পুত্র এবং উল্লিখিত রবির পুত্র। বাসুর কুলক্রিয়া যে দ্বিতীয় কুবেরের সহিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই।" তাঁহার "রাজপণ্ডিত" উপাধিটি এখানে লিপিবদ্ধ হওয়ায় অতি মূল্যবান্ একটী তথ্য আবিষ্কৃত হইল। কারণ "কাঞ্জিবিল্লীয় কুবের রাজপণ্ডিত" সূলপাণি প্রভৃতিরও পূর্ববর্তী একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত প্রবক্তা ছিলেন। হরিদাস তর্কচোর্য, গোবিন্দানন্দ ও রঘুনন্দন তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কলকাতার "অপোচসার" গ্রন্থে "কাঞ্জিবল্লীস-সংপণ্ডিত কুবের শর্মার" সমর্থ উদ্ধৃত হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ এই কুবেরকৃত একটী গ্রন্থের রচনাকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি "নবাধিষুগ্মশুদ্ধিতে শকাব্দে" অর্থাৎ ১২২৯ শকে (১৩০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে) জাবতীকল্পের বৃত্তি রচনা করেন। এই গ্রন্থে তত্রত্রিত "সমর সার" গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং পুষ্পিকায় আছে "ইতি কাঞ্জিবিল্লীয়-রাজপণ্ডিত-শ্রীকুবেরশর্মবিরচিতা জাবতীব্যাখ্যা সমাপ্তা।" (Indian Culture vol XI, pp. 33-36 দ্রষ্টব্য) উক্ত কুবের যে অত্রির তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। গ্রন্থরচনা কালে তাঁহার বয়স ন্যূনকল্পে ২৭ ধরিয়া তাঁহার জন্মাব্দ হয় ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ। মুরারি ওঝার জন্মাব্দও কিছুতেই তাহার পরে যাইবে না। কৃত্তিবাসের জন্মকালে তিনি প্রৌঢ় ছিলেন এবং তৎকালে তাঁহার বয়স ১০০ বৎসর বলিলেও উক্ত জন্মকাল ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যাইবে না। সুতরাং চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে (১৩০০—১৩২৫ খ্রী-অব্দে) কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ নির্ণয় করিতে হইবে। আত্মবিবরণী অনুসারে কৃত্তিবাসের জন্ম হয় "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস। উক্ত-সমস্ত অব্দে গণনা দ্বারা তিনটী মাত্র বৎসরে এই যোগ পাওয়া যায়।

(১) ১৩১২ খ্রী, ২২ জানুয়ারি—১০ মাঘ, রবিবার, শুক্লা পঞ্চমী ২৭।৪৫ পল। (২) ১৩২২, ১১ জানুয়ারি—১০ মাঘ, রবিবার শুক্লা পঞ্চমী ৩২।৪৩ পল। (৩) ১৩৩২, ৭ জানুয়ারি—১১ মাঘ, শুক্লা পঞ্চমী ৩৮।৪৩ পল।

তন্মধ্যে ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম নির্ণয় করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। এতদনুসারে "গৌড়েশ্বর" (রাজা গণেশের) সভায় অভ্যর্থনাকালে তাঁহার বয়স হয় প্রায় ৪৫। পাঠসমাপনের অব্যবহিত পরেই তিনি রাজদর্শন করেন এইরূপ ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পরিশেষে, আমরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের আলোচনা সাদরে আহ্বান করিতেছি। কৃত্তিবাস বাঙ্গালার আদীয় কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাঁহার জন্মস্থান মিংশিংগ্রামে নির্মিত হওয়া কর্তব্য। তাঁহার জন্মস্থান ভূমিয়ায় যে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে জন্মাব্দ "১৪০০ খৃষ্টাব্দ" বলিয়া উৎকীর্ণ হইয়াছে। বর্তমানে তাহার সংশোধন আবশ্যক। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর মূল গ্রন্থটি দেখিবার জন্য বিগত ৪০ বৎসর মধ্যে বহু সাহিত্যিক চেষ্টা করিয়াছেন, সর্বপ্রথম যোগেশ রায় গ্রন্থমন্দির মহাশয় (সা-প-প, ১৩০৬, পৃঃ ১১৭-৪২)। কিন্তু রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের মূল প্রতিলিপি সমূহ এখন দুষ্প্রাপ্য নহে, তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের যতটুকু বিবরণ অপেক্ষাও অধিকতর ও নূতন তথ্য যে নিহিত রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধানে কাহাকেও প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। কুলগ্রন্থের প্রতি এই অনাদর নানা কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। আমাদের ধারণা প্রচলিত মুদ্রিত কুলগ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া সংশ্লিষ্টগণ মূল গ্রন্থের আলোচনা করিলে এই অনাদর পরমাদরে পরিণত হইবে। আমাদের নিজ অভিজ্ঞতা হইতে একথা দৃঢ়তার বলিতে পারি।

বিশ্বের অতীত ও ভবিষ্যৎ

অধ্যাপক শ্রীকামিনীকুমার দে এম-এসসি

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, জ্যোতিষের সিদ্ধান্তসমূহ পরীক্ষণ হইলেও বিশ্বের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্যোতিষীর মতবাদ পরীক্ষার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বিশ্বের বর্তমানে অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া গাণিতিক ভিত্তিতে কতকগুলি অনুমান মাত্র।

বিশ্বে মহাশূন্যমধ্যে স্থানে স্থানে পদার্থ নীহারিকারূপে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। প্রথমে নীহারিকা কি তাহা জানা দরকার। আমরা জানি নক্ষত্রগুলি প্রত্যেকে এক একটি ছোট বড় সূর্য্য—ইহাদের আয়তনের পার্থক্য যথেষ্ট হইলেও বস্তুমান বা পদার্থ সমাবেশ সকল নক্ষত্রেই প্রায় সমান। দুইটি নক্ষত্রের মধ্যে নূনতম দূরত্ব ৪ আলোকবৎসর* অর্থাৎ আলো, প্রতি সেকেণ্ড ১,৮৬০০০ মাইল ছুটিয়া এক নক্ষত্র হইতে তাহার নিকটতম নক্ষত্রে যাইতে ৪ বৎসর সময় অতিবাহিত করে। এরকম প্রায় দশ লক্ষ কোটি নক্ষত্রের একত্র সমাবেশে একটা নক্ষত্র-জগৎ—মহাসমুদ্রে যেন বহু দ্বীপ লইয়া গঠিত একটা দ্বীপপুঞ্জ। তারপর মহাব্যোমে তাহার চতুঃসীমানার মধ্যে আর কিছুই নাই। একটি নাক্ষত্রজগৎ যে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার তুলনায় বহুগুণ দূরে আবার এরকম নাক্ষত্র জগৎ। কোন নাক্ষত্রজগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দূরত্ব অন্ততঃ ৫০ হাজার আলোক বৎসর; কিন্তু এক নাক্ষত্র জগৎ হইতে নিকটতম নাক্ষত্রজগতের দূরত্ব ইহার প্রায় ৮।১০ গুণ। অনুমান করা যায় প্রায় দশ লক্ষ কোটি নাক্ষত্রজগৎ লইয়া বিশ্ব। আমরা যে নাক্ষত্র জগতে আছি—তারাকে ছায়াপথ সমন্বিত নাক্ষত্রজগৎ বলা হয়। ছায়াপথের বহু কোটি নক্ষত্র আমাদের সূর্য্যের সঙ্গে একই নাক্ষত্রজগতের অধিবাসী, বহু দূরবীণ দিয়া আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিলে পাতলা মেঘের টুকরার মত আলোকচিহ্ন সব দেখা যায়; ইহাদের সাধারণ নাম নীহারিকা। ইহাদের বেশির ভাগেরই কুণ্ডলীপাকান আকৃতি। এই কুণ্ডলিত নীহারিকাগুলি এক একটা নাক্ষত্রজগৎ। এণ্ড্রোমিডা মণ্ডলের দিকে তাকাইলে আমাদের নিকটতম নাক্ষত্রজগৎ এণ্ড্রোমিডা নীহারিকাকে পাতলা একটু মেঘের মত দেখা যায়। ইহা হইতে আমাদের নিকট আলো আসিতে ৮ লক্ষ বৎসর সময় লাগে। এই নাক্ষত্রজগৎগুলি ঘূর্ণ্যমান। প্রত্যেক নাক্ষত্রজগতে গ্যাসও আছে, এই সমস্ত বিষয় জ্যোতিষীরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

বিশ্বের পদার্থনিচয় যদি সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে বিশ্বকে নিতান্তই ফাঁকা দেখাইবে। তখন এক ঘন ইঞ্চি পরিমাণ বাতাসই ৯ লক্ষ কোটি ঘন মাইল জুড়িয়া ফেলিবে। নাক্ষত্রজগৎগুলি পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে এইজন্য বিশ্বে পদার্থের গড় ঘনত্ব (density) ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। কয়েকশত কোটিবর্ষ পূর্বে এই গড় ঘনত্ব বর্তমানের সহস্রগুণ ছিল। তথাপি ইহা নিতান্তই নগণ্য। আমরা অনুমান করিতে পারি যে একসময় পদার্থনিচয় গ্যাসীয় অবস্থায় সমভাবে বিশ্বে সমভাবে ছড়াইয়া ছিল। ইহা আমাদের নিছক অনুমান—আমাদের সম্মুখে বিশ্বের অতীত অবস্থার একটা ছক উপস্থাপিত করে। এই অবস্থারই পরিণতি আমরা পর্য্যালোচনা করিব।

পদার্থ ঠিক সমভাবে ছড়ান থাকিলে এই অবস্থা চিরকালই চলিতে পারিত। কিন্তু ইহার সামান্য ব্যতিক্রমেই যেখানে ঘনত্ব সেখানে আরও পদার্থ পুঞ্জীভূত হইতে চেষ্টা পাইবে। বস্তুকণাগুলি পুনঃ ছড়াইয়া পড়িতে না পায় এমন প্রবলতর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন হইতে হইলে বস্তুপুঞ্জের ভর সূর্য্যের বহু কোটি গুণ হওয়া দরকার। এই রকম বহু সমাবেশেই এক একটা নাক্ষত্রজগতের উপাদান।

এই আদি নাক্ষত্রজগৎগুলির যে কিরূপ ঘূর্ণনবেগ ছিল ইহাও অনুমান করা যায়। প্রত্যেক আদি নাক্ষত্রজগতের অন্তর্গত বস্তুকণাগুলি ক্রমশঃ ঘন সন্নিবিষ্ট হইতে লাগিল। তখন গণিতশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী এই আদি নাক্ষত্রজগৎ বা নীহারিকার ঘূর্ণন বেগ বাড়িতে লাগিল এবং দুই

---

* এক বৎসরে আলোক যতদূর ভ্রমণ করে সেই দূরত্বকে অর্থাৎ প্রায় ৬ × ১০^১২ বা ছয় কোটি মাইল দূরত্বকে এক আলোক বৎসর বলে।

প্রায় চাপা হইয়া পড়িল। তারও বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয় চাপা প্রান্ত হইতে সমসূত্রে বিদ্যুৎ প্রবেশ হইতে পদার্থ বিস্রাবিত হইতে চেষ্টা পায়। কিন্তু প্রতিবেশী অন্য নীহারিকার আকর্ষণের ফলে পদার্থ চারিদিকে সমভাবে বিচ্ছুরিত না হইয়া দুই বিপরীত দিকে বাহির হইতে থাকে। কুণ্ডলিত নীহারিকাগুলিতে এরকম ঘটনাই দেখা যায়। কিন্তু পাশের প্রকাণ্ড পিণ্ডের দূরত্ব হেতু তাহার যতরকম পরিণতি পণ্ডিতগণ মনে মনে সম্ভব মহাকাশে সেই সবরকম নাক্ষত্রজগৎই ছিল। যাহা হউক, এই যে নীহারিকা—ইহার সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে ঘনত্ব বাড়িতে লাগিল এবং পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে নীহারিকার মধ্যেই আবার বস্তুপুঞ্জ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এই পুঞ্জীভূত পদার্থের ভর সূর্য্যের সম পরিমাণ হইলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বস্তুখণ্ডগুলিকে পুনঃ বিলাইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিতে পারে। অতএব নক্ষত্রগুলির জন্ম এই রকমেই হইয়াছে ইহা বলা অসঙ্গত নয়। এই নক্ষত্রপুঞ্জ সম্ভবতঃ দুই সূত্রে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমে নক্ষত্রপুঞ্জ গঠনোপযোগী বস্তুপুঞ্জ একজায়গায় মিলিত হইয়াছে, পরে তাহা হইতে পৃথক্ পৃথক্ নক্ষত্রের জন্ম হইয়াছে। তবে পৃথক্ পৃথক্ নক্ষত্র যে আদি নীহারিকা হইতে একবারেই গঠিত হইতে পারে না তাহা নয়।

বহু তারাই যুগ্ম. এই যুগ্ম তারা দুই রকমে গঠিত হইতে পারে। নীহারিকাতে যখন ক্ষুদ্রতর গ্যাসের পিণ্ড গঠিত হয় তাহার কেন্দ্রের দিকে ঘনত্ব বেশি হইলে ঘূর্ণনের ফলে বিষুবক্ষেত্রের চারিদিকে পদার্থ বিক্ষুব্ধিত হইয়া ইহা আকাশে মিলাইয়া যায়। কিংবা ঐ গ্যাসপিণ্ড বা নক্ষত্রের চারিদিকে একটা বস্তুকণার আবরণরূপে বিরাজ করে। বহু তারার চারিদিকে এইরকম বস্তুকণার আবরণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা পূর্ব্বোক্তরূপে গঠিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু কেন্দ্রের দিকে ঘনত্ব বেশি না হইলে ঘুরিতে ঘুরিতে ইহা চাপা সোলকাকৃতি হইতে হইতে বেলুনের আকার ধারণ করিয়া ক্রমশঃ মধ্য স্থলে সরু হইয়া উঠে এবং চাষেলের মত হয়। সর্ব্বশেষে পিণ্ডটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পরস্পর কাছাকাছি থাকিয়া একে অন্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। আর এক রকম যুগ্ম তারা আছে যাহারা জন্মিবে থাকিয়া পরস্পরের মাধ্যাকর্ষণের জোরে একে অন্যের চারিদিকে ঘুরে। ইহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গঠিত হয় নাই। সম্ভবতঃ আদি নাক্ষত্রজগতে নক্ষত্র গঠিত হইবার কালে দুইটি পিণ্ড এমন কাছাকাছি ছিল যে তাহারা পরস্পরের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে বাঁধা পড়িয়া পরস্পরের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

প্রাথমিক অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্র সৃষ্টির অবস্থা পর্য্যন্ত আমরা পর্য্যালোচনা করিলাম। এই পর্য্যালোচনায় নক্ষত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর জড়পিণ্ডের উৎপত্তি-সম্ভাবনা দেখা যায় না। এখন প্রশ্ন, সৌরজগতের মত গ্রহসমন্বিত নক্ষত্র আর আছে কিনা এবং এই সৌরজগতের উৎপত্তিই বা কেমন করিয়া হইল? সৌরজগৎ সম্বন্ধে অধুনা প্রচলিত মতবাদ এই যে, অন্য একটি নক্ষত্র মহাশূন্যে ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ সূর্য্যের নিকটে আসিয়া পড়ে অথচ এমন কাছাকাছি নয় যে একটি অপরটির মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে বাঁধা পড়িতে পারে, এই নক্ষত্র সরিহিত হইবার কালে তাহার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে সূর্য্যপৃষ্ঠে প্রকাণ্ড জোয়ার উৎপন্ন হইয়া আগন্তুক নক্ষত্রের দিকে সূর্য্যের অনেকটা অংশ ফাঁপিয়া উঠিল। নক্ষত্রটি সূর্য্যের নিকটতর হইলে ফাঁপা অংশ সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, এবং নিকটতম অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পদার্থ টানিয়া লইল। তারপর সে তাহার গন্তব্যপথে যাইবার কালে যখন সূর্য্য হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল সূর্য্যের এই উচ্ছ্বাস ও বস্তু উদ্গীরণ ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। ফলে বর্শা চুরুটের মত একটা বিচ্ছিন্ন অংশ রহিয়া গেল। এই বিচ্ছিন্ন অংশ ক্রমে শীতল হইতে লাগিল এবং প্রথমে দুইপ্রান্ত তরল অবস্থায় আসিল। পরে সর্ব্বত্র এক একটি বস্তু পিণ্ড গঠিত হইতে লাগিল। অধিকতর বস্তুমান বিশিষ্ট অংশ হইতে ক্ষুদ্রতর পিণ্ড উৎপন্ন হইল। বৃহস্পতি গ্রহ বৃহস্পতি ও শনিকে যে আমরা মধ্যভাগে দেখিতে পাই, আর ক্ষুদ্রতর গ্রহগুলিকে তাহাদের দুইদিকে দেখি ইহাই আমাদের প্রত্যাশিত। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রতর গ্রহগুলি জন্ম হইতেই তরল অবস্থায় এমন কি কঠিন অবস্থায় ছিল, আর বৃহত্তম দুইটি আদিতে গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। সূর্য্যের আকর্ষণের ফলে গ্রহমধ্যে জোয়ার উৎপন্ন হইয়া অনুরূপে উপগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু এইভাবে গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি হইয়া থাকিলে নাক্ষত্রজগৎগুলিতে গ্রহসমন্বিত নক্ষত্রের সংখ্যা খুবই কম হওয়ার কথা। দুইটি নক্ষত্রের পক্ষে উপরোক্ত প্রকারে গ্রহ সৃষ্টির অনুকূল সান্নিধ্যে আসা একটি বিরল ঘটনা। একটা নক্ষত্র জগতে লক্ষ লক্ষ বৎসরে এমন একটি ঘটনা ঘটিতে পারে কি না সন্দেহ। তবে নক্ষত্রদের মধ্যে পরস্পর দূরত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। অতএব একসময়ে যখন তাহারা নিকটতর অবস্থায় ছিল তখন এরূপ ঘটনা বেশি পরিমাণে ঘটা অসম্ভব ছিল না, সেজন্য অনেক নক্ষত্রেরই গ্রহ নাই একথা জোর করিয়া বলা যায় না।

বিশ্বের অতীত কি আমরা দেখিলাম, এখন তাহার ভবিষ্যৎ কি দেখা যাউক। প্রথমেই আসে আমাদের পৃথিবীর কথা, জন্মিলেই মৃত্যু—পৃথিবীরও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তবে সে মৃত্যু হিমশীতল জড় লইয়া পৃথিবীর পরিণত বয়সে তাহাকে আচ্ছন্ন করিবে অথবা অপরিণত বয়সে অগ্নিমূর্ত্তিতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া তাহার অপমৃত্যু ঘটাইবে তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। আমরা জানি পৃথিবী সূর্য্যের নিকট হইতে আলো ও তাপ পাইয়াই জীবন রসে সমৃদ্ধ। মাতার স্নেহশোণিত যেমন ভ্রূণরূপে পরিণত হইয়া শিশুকে পোষণ করে তেমনই সূর্য্যের দেহ হইতে প্রতি সেকেণ্ডে অন্ততঃ দশ কোটি মন পদার্থ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া কন্যা ধরিত্রীকে আলো ও তাপ দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই হেতু সূর্য্য প্রতি মুহূর্ত্তে কিছু তাপ হারাইতেছে। আমাদের পৃথিবীও তাই ক্রমশঃ একটু একটু শীতল হইয়া পড়িতেছে—যদিও আমাদের পরিমাপে তাহা ধরা পড়ে না। সূর্য্যের ভিতর পরমাণু ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অক্সিজেন পরমাণু হইতে হাইড্রোজেন পরমাণু হইতে যৌগিক পরমাণু গঠিত হইয়া এইতাপ যোগান সম্ভব হইতেছে। যদি পরমাণু ভাঙ্গার বদলে আমরা তাপ পাই, তবে পৃথিবী এখনও সংজ্ঞাহীন

শিশুমাত্র; তাহার পরমায়ুর বহর আরও কোটি বৎসর। যৌগিক পরমাণু সৃষ্টির দরুণ তাপ আসিলে ধরিত্রী এখন কয়েক বৎসরের বালিকা। এদিক দিয়া পৃথিবীর মৃত্যুর কথা ভাবিয়া আমাদের চঞ্চল হইবার কোন কারণ নাই।

এবার তারার অপমৃত্যুর দিকটা বিবেচনা করা যাউক। দেখা যায় আকাশে হঠাৎ একটা নক্ষত্র ফাটিয়া পড়ে—ইহাকে বলা হয় 'নোভা' বা নবনক্ষত্র।* প্রত্যেক নক্ষত্রকেই তাহার জীবনে একবার এই অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। আমাদের সূর্য্য এখন এই অবস্থার ভিতর দিয়া যায় নাই। যখন সূর্য্য তদুপযোগী হইবে তখন হঠাৎ একদিন সে ফাটিয়া পড়িবে, কয়েকদিনে এমন কি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার তাপের মাত্রা এমন বাড়িয়া যাইবে যে জীবনের চিহ্ন মাত্র ধরা হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, বনরাজি ভস্ম হইয়া যাইবে, আর সূর্য্য অতিস্ফীত হইয়া পৃথিবীকে পর্য্যন্ত কবলিত করিয়া ফেলিবে। কাজেই মনে হয়, পৃথিবী তাহার জীবনের খেলা শেষ করিবার আগেই একদিন অকস্মাৎ অপমৃত্যুর কবলে পড়িয়া যাইবে।

এখন আমরা নাক্ষত্রজগৎগুলি তথা সমগ্রবিশ্বের পরিণাম বিচারকরিয়া দেখিব। নক্ষত্রের জীবনযাত্রা পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া আমরা তাহার শক্তির উৎস—যাহার প্রভাবে সে তাপও আলোকে বিকীরণ করে—খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। এই শক্তির উৎস যাহাই হউক না কেন, একদিন তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তখন নক্ষত্র আর তাপ ও আলোক বিকীরণ করিবে না। তাপ ও আলোক বিকীরণ করিতে করিতে নক্ষত্র তাহার তাপ হারাইতেছে অর্থাৎ তাহার ভিতরকার পদার্থ বিলাইয়া যাইতেছে। আর বিকীর্ণ তাপ মহাশূন্যে ভরিয়া উঠিতেছে। এই আলো ও তাপ মহাশূন্যে অব্যাহতভাবেই ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু যখন ইহা বস্তুকণার উপর গিয়া পড়ে—সে বস্তুকণা পরমাণু, বৈদ্যুতিক কিম্বা যে কোন ছোটকণাই হউক—তখন তাহার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়িয়া যায়। সুতরাং শেষপর্য্যন্ত তাহারা অতিদীর্ঘ বেতার তরঙ্গের মত তরঙ্গে পর্য্যবসিত হইবে।

বিশ্বে শক্তির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট; আরও সঠিকভাবে বলিতে হয় যে পুদার্থ ও শক্তির মিলিত পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট। এই শক্তি ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। জল যখন নীচে নামে তখন শক্তি সংগ্রহ করে। সেই শক্তির সাহায্যে আমরা আবার জল উপরে উঠাইতে পারি, কিন্তু যতটুকু জল নামিয়া ছিল ঠিক ততটুকু পারি না—কিছুটা শক্তি এমনভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে যে তাহাকে কাজে লাগান যায় না। অনবরত শক্তির কিছুটা অংশ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং এমন একদিন আসিবে যেদিন কাজে লাগাইবার উপযুক্ত শক্তি আর পাওয়া যাইবে না। শক্তির পরিমাণ অফুরন্ত আছে কিন্তু রূপান্তর আর সম্ভব নয়। তখন সমগ্র বিশ্বে তাপসাম্য উপস্থিত হইবে আর এই সাম্যই হইবে বিশ্বের পক্ষে মারাত্মক।

এখনও কোন কোন বৈজ্ঞানিক আমাদিগকে আশার বাণী শুনাইতেছেন। আমরা বাদ করিতেছি স্ফীত হইতেছে এইরকম বিশ্বে এবং এই অবস্থাতেই শক্তি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। বিশ্ব যদি সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে তবে শক্তির পদার্থে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব। দৈবক্রমে যে যুগে বিশ্ব স্ফীত হইতেছে আমরা সেইযুগে বাস করিতেছি। বিশ্ব স্ফীত হইতে হইতে একটা চরম অবস্থায় পৌঁছিয়া আবার সঙ্কুচিত হইতে পারে, তখন মহাপ্রলয়ের পর আবার নবসৃষ্টি।

---

* পূর্ব্বে ইহাদের আবির্ভাবকে নব আবির্ভাব মনে করিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছিল এজন্য এখনও সেই নামে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হয়।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

পাট

পাট বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থকরী ফসল। প্রায় এক কোটি বাঙ্গালী কৃষক পাটচাষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বর্ষার পচা জলে দিন কাটাইয়া পাটচাষ করিতে হয়। এত কষ্ট করিয়া যাহারা এই সোনার ফসল উৎপাদন করে, তাহাদের অদৃষ্টে কিন্তু দুইবেলা অন্নও জুটে না। অথচ পাট লইয়া যাহারা কারবার করে, কলওয়ালা, আড়তদার, দালাল প্রভৃতি সকলেই মোটা মুনাফা লুটিয়া থাকে। কৃষকেরা যে পাটচাষ করিয়া কিছু পায় না, তাহার কারণ তাহাদের দুরবস্থা ও শিক্ষার অভাব এবং গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য। পাটকলওয়ালারা সঙ্ঘবদ্ধ ও অর্থবান, দালালরা বুদ্ধিজীবী; ইহাদের চক্রান্তে পড়িয়া চাষী একেবারে কোণঠাসা হইয়া যায়। অভাবের সুযোগ লইয়া ব্যাপারীরা চাষীদের নামমাত্র দামদেওয়ার বিনিময়ে ফসলের উপর অধিকার বিস্তার করে। তাছাড়া চাষীরা ভালমন্দ বোঝে না বলিয়া ভাল ভাল পাট এজেণ্টরা গলার জোরে খারাপ শ্রেণীর বলিয়া চালাইয়া সস্তায় কিনিয়া লয়। সবচেয়ে বড় কথা, যখন বর্ষান্তে পাট ওঠে, দিনমালিকদের পক্ষ হইতে উদাসীনতা দেখাইয়া চাহিদা হ্রাসের অভিনয় করা হয়; অশিক্ষিত চাষী এই ভাঁওতায় ভুলিয়া অভাবের তাড়নায় যে কোন দরে পাট বেচিয়া ফেলে। বোটের উপর পাটচাষী যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যথোচিত হিসাবে পাট ধরিয়া রাখিতে

পারিত অথবা গভর্ণমেণ্ট যদি বর্ষগোলা স্থাপন করিয়া সমধার নীতি অনুসারে কাঁচা পাটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গলার পাটচাষীদের অদৃষ্ট অবশ্যই ফিরিয়া যাইত।

কলিকাতার আশে পাশে হুগলী নদীর দুইধারে যে শতাধিক পাটকল বিশ্বব্যাপী পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা মিটাইয়া অধিকন্তু মুনাফা লাভ করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশের মালিকই ইয়োরোপীয়েরা। বাঙ্গলায় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এই সব ইউরোপীয়ের স্বার্থরক্ষা যে গভর্ণমেণ্টের পাটনীতির মূল কথা ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সুরু হইবার পর অবশ্য অবস্থার পরিবর্ত্তন সকলেই আশা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। গত ১০ বৎসরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই বাঙ্গলায় মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত আছে। পাটচাষীদের অধিকাংশই জাতিতে মুসলমান। মুসলীম লীগ কিন্তু এই চাষীদের ভোটের জোরে ক্ষমতা করিয়াও তাহাদের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যযোগ্য কোন চেষ্টাই করেন নাই। লীগ মন্ত্রীসভার এই উদাসীনতার কারণ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ৩০টি ইউরোপীয় সদস্যের ভোট। পাটচাষীদের আর্থিক উন্নতি করার অর্থ পাটকলওয়ালাদের লাভের অঙ্ক কিছুটা কমানো এবং এ ব্যবস্থা হইলে পরিষদের ইউরোপীয় সম্প্রদায় যে লীগ মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করিবেন না, লীগনেতা ইহা ভাল করিয়াই জানে।

যুদ্ধের সময় ভারতীয় পাটের রপ্তানী বহুলাংশে কমিয়া যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতসরকার সেই সময় পাটের ও পাটজাত দ্রব্যের বড় রকমের ঘাটতির সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ান। ফলে, যুদ্ধের অজুহাত রাখিয়া তাঁহারা ১৯৪১ সালের যে মাসে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে এক অর্ডিনান্স জারি করিয়া শ্রেণী হিসাবে পাটের সর্ব্বনিম্ন দর ১১ টাকা হইতে ১৭ টাকায় বাঁধিয়া দিলেন। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যাভাবে বাঙ্গালী তখন ছত্রভঙ্গ, ১৯৪৩ সালের বহু লক্ষ লোকক্ষয়কারী ভীষণ দুর্ভিক্ষের জের তখনও চলিতেছে, চাহিদা বেশী থাকায় কাঁচা পাটের মূল্য-রেখা বাড়াইয়া দিতে ভারত সরকার অনায়াসেই পারিতেন, কিন্তু পাটকলওয়ালাদের সুবিধার জন্য তাহা তাঁহারা করেন নাই। বাঙ্গলায় তখন খাজা নাজিমুদ্দিন পরিচালিত লীগ মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত। পাটমূল্য এইরূপ অন্যায় হারে নির্দ্ধারণ করিলে চাষীদের সমূহ ক্ষতি হইবে জানিয়াও নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা ভারত সরকারকে সমর্থনই করিলেন।

তারপর যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এবং গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ভারতরক্ষা আইনের মেয়াদ শেষের সঙ্গে সঙ্গে পাটমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মেয়াদও শেষ হইয়াছে। ১লা অক্টোবর হইতে প্রকৃতপক্ষে পাটের অর্ডার্নেন্স নিয়ন্ত্রণ ভার পড়িয়াছে প্রাদেশিক সরকারের উপর। এই সময় কেন্দ্রে পণ্ডিত নেহরু পরিচালিত অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন; কাজেই আশা করা স্বাভাবিক যে, পাট সম্বন্ধে সরকারী নীতি এইবার পাটচাষীদেরই অনুকূলে যাইবে। পাটমূল্য নিয়ন্ত্রণ অর্ডিনান্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার অন্ততঃ আরও কিছুদিন পাটের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহাদের এই ইচ্ছার কারণ ছিল দুইটি। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষে এখন শোচনীয় খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিয়াছে। এই সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে আর্জ্জেন্টিনাদি পৃথিবীর উদ্বৃত্ত দেশসমূহ হইতে ভারতে বহু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে সব দেশ ভারতকে খাদ্য সাহায্য করিবে তাহাদিগকে এই সাহায্যের পরিবর্ত্তে ভারতের প্রেরণযোগ্য পণ্য পাট বা পাটজাত দ্রব্য চাহিদানুসারে বিক্রয় করিতে হইবে এবং এই বিক্রয়ে অন্যায় মুনাফাবৃত্তি চলিবে না। এইজন্যই ভারত সরকার মুনাফাখোর মিলওয়ালাদের কবলোচ্যুত হইতে জনসাধারণের জন্য খুচরার বাজারেও পাটমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলার গরীব পাটচাষীদের কথাও তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরিষ্কার বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধকালীন ১১ টাকা হইতে ১৭ টাকা দরের তুলনায় অধিকতর উচ্চ হারে তাঁহারা পাটের নিয়তম মূল্য বাঁধিয়া দিতে প্রস্তুত। যুদ্ধ শেষ হইলেও তোষাপাথর চড়া বাজার শেষ হয় নাই, সুতরাং, অর্থবান ও ক্ষমতাবান মিলমালিক এবং দালাল বা এজেন্টদের কাঁচা পাটের জন্য উচ্চতর হারে মূল্য এখনে বাধ্য করিতে হইলে বর্ত্তমানে পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক বলিয়াই কেন্দ্রীয় সরকার মনে করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সরকারের কিন্তু এ ব্যবস্থা পছন্দ হয় নাই। চাষীদের কাঁচা পাটের জন্য বেশী টাকা দিবার বাধ্যবাধকতা থাকিলে এবং কেন্দ্রীয় সরকার আন্তর্জাতিক দ্রব্যের রপ্তানী মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে পাটকলওয়ালাদের যুদ্ধকালীন মুনাফার হার সংরক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং বিদেশী কলওয়ালাদের বেশী চাষীদের স্বার্থে এই ত্যাগস্বীকারে রাজী না হওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ইউরোপীয় সদস্যগণ পাটকলওয়ালাদের স্বার্থটাই বড় করিয়া দেখেন এবং বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রীবর্গও এই শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের হাতে রাখিতে কৃষকবন্ধু সাজিয়া ঘোষণা করিলেন যে, এবার আর তাঁহারা পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন না। তাঁহারা জানাইলেন যে, তাঁহাদের মতে খোলা বাজারে পাট বেচিতে পারিলে পৃথিবীজোড়া চাহিদার জন্য এবৎসর পাটচাষীরা এমনই অনেক বেশী লাভবান হইবেন। উৎসাহী লীগপন্থীরা এই সুযোগে বাঙ্গলার পাটচাষীদের নাম করিয়া পাটমূল্য নিয়ন্ত্রণে ইচ্ছুক নেহরু সরকারকে একবার প্রাণ ভরিয়া গালাগালিও দিয়া লইলেন। পাটমূল্য সম্পর্কে সুসমঞ্জস একটি নীতি স্থির করিবার জন্য অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গত ২১শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও বাঙ্গলা এই চারিটি পাট উৎপাদক প্রদেশের সরকারী প্রতিনিধিবর্গের এবং মিলমালিক ও পাটচাষীদের প্রতিনিধিদের একটি যুক্ত সম্মেলন আহ্বান করেন। বাঙ্গলা সরকার এই সম্মেলনে ইচ্ছা করিয়াই কোন প্রতিনিধি পাঠান নাই। ইহার পর গত ১২ই অক্টোবর দিল্লীতে বসিয়া বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দি প্রকাশ্যভাবে পাটের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত অসহযোগিতার দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়া কৃষকদিগকে মরতম হিসাবে পাট ধরিয়া রাখিবার চালোয়া পরামর্শ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গরীব চাষীদের সরকারী সাহায্য না করিলে তাহাদের পক্ষে

যাতের পাট অবিলম্বে বেচিবার জন্য ধরিয়া রাখা কেমন করিয়া সম্ভব, মিঃ হুসাবর্দি সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই।

কেন্দ্রীয় সরকার যখন শেষ পর্যন্ত বাঙ্গলা সরকারের সমর্থনে পিছা পাইলেন না, তখন অগত্যা তাঁহারা ১লা অক্টোবর হইতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী শুল্ক বাঁধিয়া দিলেন। এই ব্যবস্থায় কিন্তু সুবিধা হইল না। প্রাদেশিক সরকার অন্তর্দেশীয় পাটশুল্ক নিয়ন্ত্রণ না করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পাটের রপ্তানী শুল্ক নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ফাটকা বাজারে তেজীভাব দেখা গেলেও কলওয়ালারা অনিশ্চিত বাজারে পাট কিনিতে স্বভাবতঃই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ পাট রপ্তানী ব্যবস্থা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই বানচাল হইবার উপক্রম করিল।

পাটের রপ্তানী শুল্ক নিয়ন্ত্রণের এই নীতির ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য অবিলম্বেই সাবধান হইয়াছেন। ২৩শে অক্টোবরের এক সরকারী ইস্তাহার মারফৎ ১৯৪৯ সালের পাট রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাটচাষীদের স্বার্থরক্ষায় ও ভারতকে সাহায্যকারী পৃথিবীর বিভিন্ন পাটব্যবসায়ীকারক দেশকে ক্ষুব্ধ করিবার চেষ্টা ছাড়াও পাটনীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারত সরকার তাঁহাদের যুদ্ধোত্তর মুদ্রাসংকোচনীতির দিক হইতে লাভবান হইবার আশা করিয়াছিলেন। মিল মালিক বা এজেন্টদের প্রচুর মুনাফা লাভের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হইলে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কিছুটা দূর হওয়া স্বাভাবিক। যাহা হউক, যখন শেষ অবধি বাঙ্গলা সরকারের সাহায্যের অভাবে পাট মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি চালু করা বা পাট রপ্তানী ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব হইল না, তখন মুদ্রাসংকোচন নীতির উপর জোর দিয়া কেন্দ্রীয় সরকার রপ্তানীযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পাটের উপর ভিন্ন ভিন্ন হারে শুল্ক বাড়াইয়া দিলেন। একখানি অতিরিক্ত গেজেট মারফৎ ইণ্ডিয়ান ট্যারিফ এ্যাক্ট এ্যামেণ্ডমেণ্ট অর্ডিন্যান্স (১৯৪৯) নামে একটি নূতন আইন প্রবর্তন করিয়া রপ্তানী পাটের উপর শুল্ক বাড়ানো হইয়াছে। আগে ৪০০ পাউণ্ড বা প্রায় পাঁচমণ ওজনের কাঁচা পাটের রপ্তার জন্য শুল্ক ধরা হইত ১ টাকা ৪ আনা হইতে ৪ টাকা ৮ আনা, এখন এই শুল্ক বাড়াইয়া যথাক্রমে ৪ টাকা ৮ আনা হইতে ১৩ টাকা করা হইয়াছে। আগে ২২৪০ পাউণ্ড বা এক টন ওজনের চটের জন্য রপ্তানী শুল্ক ধরা হইত ২০ টাকা, এখন নূতন আইন অনুসারে ইহা সর্বোচ্চভাবে ৮০ টাকা করা হইয়াছে।

মোটের উপর এখন পাটের উপর হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গিয়াছে। রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় জন্য পাটব্যবসায়ে এখন গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব অবশ্যই অনেক বাড়িয়া যাইবে। ইহার ফলে পাটের আন্তর্জাতিক চাহিদার হিসাবে মূল্য বৃদ্ধির জন্য কাঁচা পাট বেচিয়া কৃষকদের অধিকতর লাভবান হইবার সম্ভাবনা এবং রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্ক নিয়োগ চুক্তির দৌলতে বাঙ্গলাপ্রমুখ প্রাদেশিক সরকারের আয় বাড়িবার ও কার্য্য পরিচালনার সুবিধা হইবার যথেষ্ট আশা আছে।

অবশ্য একথা না বলিলেও চলিবে যে চাষীদের দু পয়সা বেশী পাওয়াইয়া দিতে হইলে বাঙ্গলা সরকারকে বর্তমান দুই স্তরের পরিবর্তন করিতেই হইবে। এ পর্য্যন্ত ফলওয়ালা, দালাল বা আড়তদারেরা অশিক্ষিত দরিদ্র পাটচাষীদের অভাবে শোষণ করিয়া আসিয়াছে। আগেই বলা হইয়াছে, চাষীরা উচ্চশ্রেণীর পাট উৎপাদন করিলেও অনেক সময় দালাল বা এজেন্টরা বাজারে সেই পাটকে নিম্নশ্রেণীর বলিয়া প্রচার করে এবং শেষ পর্য্যন্ত গরীব চাষী অপেক্ষা করিতে বা মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না বলিয়া মাল অনেক কম পায়। মরশুম অবধি ধরিয়া রাখিলে পাটের দর সব সময়ই বেশী পাওয়ার কথা, কিন্তু মুষ্টিমেয় কৃষক পাট কাটিয়াই অভাবের দায়ে যে কোন মূল্যে তাহা বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। তাহাড়া যখন পাটের সময় নয়, তখনও চাষীদের দারিদ্র্যের সুবিধা লইয়া এজেন্টরা পরবর্তী ফসলের জন্য বায়না দিয়া থাকে। চড়া সুদের জন্য এই বায়না গ্রহণ করিয়া অবশেষে চাষীরা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই এইসব শোষণ সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে বন্ধ না হইলে পাটচাষীদের আর্থিক উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। এই শোষণ আছে বলিয়াই চাষীদের লাভ কতকটা নিশ্চিত করিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে পাটের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস সদস্যবৃন্দও একই কারণে পাটের নিম্নতম দর সম্প্রতি ৪০ টাকা করিবার প্রস্তাব আনেন। বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রীসভার এবং পরিষদের লীগ ও ইয়োরোপীয় সদস্যদের প্রতিকূলতাতেই কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যবৃন্দকে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যেকালে বাঙ্গলা সরকারের পাটনীতিই কার্য্যকরী হইল, অর্থাৎ মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভার আমলে বাঙ্গলার এক কোটি নিরন্ন পাটচাষীর (ইহাদের অধিকাংশেই মুসলমান) অবস্থা কিভাবে উন্নীত হয়, তাহা সকলেরই সাগ্রহে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

নূতন শিল্পের সংরক্ষণ

ভারতবর্ষ শিল্পজাত ভোগ্য পণ্যাদির জন্য বরাবরই পরমুখাপেক্ষী ছিল। যুদ্ধের সময় বিদেশী মাল আমদানী বন্ধ থাকায় অথচ ভারতবর্ষ পূর্ব এশিয়ায় মিত্রপক্ষের বৃহত্তম ঘাঁটি হইয়া পড়ায় ভারত সরকার সামরিক বিভাগের ভোগ্য পণ্যের চাহিদা মিটাইতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন। অসামরিক ভোগবাসীর কথা দূরে থাক, সৈন্যদের প্রয়োজন মিটাইবার মত সঙ্গতিও ভারত সরকারের ছিল না। ভারত সরকার বরাবর এদেশের শিল্পপ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। সম্ভবতঃ বাণিজ্যজীবী ব্রিটেনের জন্য ভারতের বাজার সংরক্ষণের প্রয়াসই এই নীতির মূল কারণ। যাহা হউক, নিরুপায় ভারত সরকার শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধের দায়ে ভারতে নূতন কতকগুলি ভোগ্য-পণ্য উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছিলেন।

এইসব নূতন শিল্পে উৎপন্ন মাল যে অল্প ক্ষেত্রেই অসামরিক ভোগবাসীর ভোগে আসিয়াছে, তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। ইহার

হয় হইয়াছে এই যে, অধিকাম নিশ্চিত চাহিবার জন্য প্রথমতঃ এইসব পণ্যের ক্রটি শোধরাইবার সুযোগ হয় নাই এবং দ্বিতীয়তঃ এইসব বিদেশ দেশের অসাধারণ বাজার দখল করিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই। যুদ্ধ শেষ হওয়ায় এখন পরিচিত বিদেশী জোগানদারদের আমদানী সুরু হইয়াছে, এখন মিলিটারী কন্ট্রাক্ট হইতে ছাড়ান পাওয়া এইসব দেশীয় পণ্যের অনুকূলেও চাহিদা না হওয়াই স্বাভাবিক।

অবশ্য একথা না বলিলেও চলিবে যে, যুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠিত এইসব শিল্পকে ভারতের যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। একেবারে নূতন শিল্পের তুলনায় এই শিল্পগুলি তবু কতকটা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ইহাদের পরিচালকবর্গের অভিজ্ঞতাও জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

ভারতে এখন পণ্ডিত নেহরুর পরিচালনাধীন অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের স্বার্থ সম্পর্কে এই গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিভঙ্গি ভূতপূর্ব ভারত সরকারের তুলনায় অবশ্যই অনেক উদার। ভারতের নব প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকে কিভাবে বাঁচানো যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভারত সরকার সম্প্রতি ট্যারিফ বোর্ডকে এগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করিবার নির্দেশ দেন।

ট্যারিফ বোর্ড ১৩টি শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধানাদি শেষ করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। এই শিল্পগুলির মধ্যে কোকো পাউডার ও চকোলেট হইতে এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু এবং ফসফেটাদি বিভিন্ন রাসায়নিক পণ্য উৎপাদন শিল্প আছে। এইসব শিল্প যাহাতে সস্তায় বিকাইয়া দেশের বাজার দখল করিতে পারে তজ্জন্য ট্যারিফ বোর্ড ইহাদের কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করিতে সুপারিশ করিয়াছেন। বিদেশী পণ্য যাহাতে অসদ্ভাবে দেশী পণ্যকে বাজার হইতে হটাইয়া দিতে না পারে, তজ্জন্য বিদেশী শিল্পের উপর উচ্চতর হারে কর ধার্য্যেরও ট্যারিফ বোর্ডের অন্যতম মূল্যবান সুপারিশ।

ভারতে এ পর্য্যন্ত জাতীয় কল্যাণের নামে অনেকগুলি কমিটি ও কমিশন গঠিত হইয়াছে। এইসব কমিটিকমিশন এযন অনেক মূল্যবান সুপারিশ করিয়াছেন, সেগুলি কার্য্যকরী হইলে সত্যই ভারতের অদৃষ্ট ফিরিয়া যাইত। কিন্তু বরাবরই দেখা গিয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট কমিটি বা কমিশন বসাইবার সময় যেরূপ উৎসাহ দেখান, রিপোর্টের সুপারিশগুলি কার্য্যকরী করিতে সেই উৎসাহের শতাংশের একাংশও দেখা যায় না। ইণ্ডিয়ান ফিসকাল কমিশন (১৯২২) বা এক্সটারনাল ক্যাপিটাল কমিটির (১৯২৬) রিপোর্টের পরিণতি এই শ্রেণীর শোচনীয় ঘটনার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। তবে এবার অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ট্যারিফ বোর্ড যে সব শিল্প-সংক্রান্ত রিপোর্ট দিয়াছেন, পরিণামে সেগুলি আগের মত উইপোকার পেট ভরাইবে না বলিয়াই আমরা আশা করি। তাহার কথা, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য লক্ষণীয় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। গত ২৮শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলি-খান স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতসরকার অতঃপর ভারতের স্বার্থ সর্ব্বাগ্রে দেখিবেন, তাহার পর অন্যদেশের কথা বিবেচনা করিবেন। এই ঘোষণা কার্য্যকরী হইলে, অর্থাৎ ভারতের শিল্পপ্রসারের জন্য ভারতসরকারের সহানুভূতি সরল দেখা গেলে ট্যারিফবোর্ডের সুপারিশগুলি কার্য্যে পরিণত হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কেন্দ্রে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া দেশবাসী আশান্বিত ; বলা নিষ্প্রয়োজন এসময় অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের আর্থিক স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হইলে তাহাতে তাঁহাদের কর্তৃত্বজ্ঞান প্রমাণিত হইবে ও সুনাম বৃদ্ধি পাইবে।

১।১১।৪৬

মায়ের মেয়ে

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ এম-এ, বি-এল্

আমার কচি মেয়ে
সেদিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ এলো ধেয়ে—
শুধালো হায় বেহাৎ অকারণে :
বাবা, মা কি মোর হারিয়ে গেছে আকাশ-ভরা তারার বনে ?
চুপ থেকে কইনু তারে
মিথ্যে কথা বেবাক্‌টুকুন : তাও কি হতে পারে ?
মেয়ে আমার অবাক্ হয়ে রইলো চেয়ে
আমার মেল মেয়ে
সেই সে দেখা, দেখা আকাশ কেবল অপেক্ষা হয়ে চলে।
মুক্ত মনে মিষ্টি করে বলে
বাবা, মা বুঝি হায় ভাবলো আমায় : আসবে আর—
এবার দেবার কীই বা আছে ? ছাই, মেয়ে অন্ধ কেবল আমার।

* * *

আরেক্ সন্ধ্যেবেলা
আকাশজোড়া জেগেছি তারায় মেলা—
আঙুল দিলুম্ মেয়ের মুখে :
একটু যেন উঠলো হেসে : হয়তো সে সে সপ্তর্ষিকে।
হারায় যদিও মায়ের ডাক—সে কি ঘুমাই যায় !
হায় গো হায় !!

* * * *

আরেক্ দাঁঝে
এমনি আলোর মাঝে
শূন্যজোড়া এই অভাগায় :
জিজ্ঞা আমায়, যাবার বেলায় ডাক দিয়ো হায় !

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি

শ্রীঅতুল দত্ত

প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অঙ্গাঙ্গি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণের ক্ষমতা যে রাষ্ট্রের নাই, সে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যের কর্তৃত্ব-মুক্ত হইলেও নিশ্চয়ই স্বাধীন নহে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সময় সময় অত্যধিক উদার হইয়া "স্বাধীনতা" বণ্টন করিয়া থাকে। এই সব স্বাধীনতা যে একেবারেই অন্তঃসারশূন্য, তাহার একটি বড় প্রমাণ—এইভাবে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির স্বাধীন বৈদেশিক নীতি থাকে না; তাহারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুরুব্বিয়ানা খুশীমত চলিতে বাধ্য হয়। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে এই ধরণের "স্বাধীনতা" দেওয়া হইয়াছিল; একবার সাময়িক আইন জারি করিয়া তাহাকে এই "স্বাধীনতা" গিলাইবার চেষ্টা হয়। ইরাক এই ধরণের স্বাধীন দেশ। সম্প্রতি ট্রান্সজর্ডানকে এইরূপ স্বাধীনতাই দেওয়া হইয়াছে; সেখানে বৃটিশের তাঁবেদার আমীর আব্দুল্লাহকে রাজমুকুট পরাইয়া তাঁহার প্রতিনিধিকে আন্তর্জাতিক আসরে নামাইবার চেষ্টা চলিতেছে। ফিলিপাইনকে এইভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া আন্তর্জাতিক আসরে বৃটিশের "গণ্ডায় আণ্ডা" দিবার আর একটি প্রতিনিধি যোগাড় করিবার চেষ্টাও গোপন নাই। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমেরিকা সম্প্রতি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে যে স্বাধীনতা দিয়াছে, তাহা ১৯২১ ও ৩৬ সালে ফিলাকে দেওয়া বৃটিশমার্কা স্বাধীনতা অপেক্ষাও অন্তঃসারশূন্য।

বহু দিনের পরাধীন জাতির জনসাধারণের "স্বাধীনতা" শব্দটির প্রতি যথেষ্ট মোহ থাকে। তাই কোনও দেশে স্বাধীনতা-আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিলে সেখানকার প্রতিক্রিয়াপন্থীদের হাতে কতক পরিমাণে আভ্যন্তরীণ কর্তৃত্বভার ছাড়িয়া দিয়া জনসাধারণকে "স্বাধীনতা" শব্দটির যাদুস্পর্শে বিভ্রান্ত করা তাহাদের একটি অস্ত্র। তখন, এই সব দেশের প্রগতিপন্থী জাতীয় আন্দোলন হয়ের ভার পড়ে দেশীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীরা; আর তাহাদেরই অনুচরেরা স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সাজিয়া আন্তর্জাতিক আসরে মুরুব্বি রাষ্ট্রের প্রতিনিধির পাশে জাঁকাইয়া বসে। ইহা ছাড়া বহু ক্ষেত্রেই স্বাধীন রাষ্ট্রকেও অর্থনৈতিক বাঁধনে বাঁধিয়া অথবা সামরিক শক্তির ভয় দেখাইয়া বশে রাখা হয়। ইহারা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে একটি প্রবল রাষ্ট্রের মুখ চাহিয়া কথা বলিতে বাধ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ—দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং প্রাক্‌যুদ্ধকালীন বল্‌কান্ রাষ্ট্রসমূহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মোট কথা, কোনও দেশ সত্যই স্বাধীন কিনা, তাহার একটি বড় পরীক্ষা—সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অন্য দেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনের, স্বাধীনভাবে মিত্র নির্বাচনের এবং অন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশের পথ নিষ্কণ্টক আছে কি না। যদি এই ক্ষমতা প্রকাশের পথ নিষ্কণ্টক থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিত বলা যাইবে, সে রাষ্ট্র স্বাধীন বটে।

৮ বৃটিশ শ্রমিক গভর্নমেণ্ট হলপ্ করিয়া বলিয়াছেন—ভারতবর্ষকে ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া দিবার জন্য তাঁহারা উদ্‌গ্রীব; তাঁহাদের আন্তরিকতায় যেন কেহ সন্দেহ না করে। ভারতের সর্বপ্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই আন্তরিকতায় সন্দেহ করে নাই। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা "ভারতবর্ষ সত্যই ভারতবাসীর হাতে আসিতেছে" ধরিয়া লইয়া কাজ করিতেছেন। ভারতবাসী আজ কর্তৃত্বমুক্ত হইয়াছে কিনা, তাহার একটি বড় পরীক্ষা—নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের অধিকার সে পাইয়াছে কি না। নূতন কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট এবং বৈদেশিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য পণ্ডিত নেহরু গত ২৭শে সেপ্‌টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে নূতন ভারত গভর্নমেণ্টের পররাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতির মূলকথা—অতঃপর আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিবে—হোয়াইট হল্ অথবা বৃটিশ কমনওয়েল্থ লেবাটের পথই তাহার পথ হইবে না। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ যদি ভারতীয় জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারে, তাহা হইলেই বৃটিশ শ্রমিক গভর্নমেণ্টের আন্তরিকতা কার্যতঃ প্রমাণিত হইবে—The proof of the pudding is in the eating.

পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী সমর্থন করিবে। ইহার অর্থ—আন্তর্জাতিক ভারতবর্ষ পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে তাহার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐতিহ্য রক্ষা করিয়াই চলিবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সহিত ভারতবর্ষের নাড়ীর যোগ রহিয়াছে। এই যোগসূত্রের মর্যাদা ভারতবর্ষ রক্ষা করিবে। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিক, ইন্দোচীনে ভিয়েটনাম, থাইল্যাণ্ডশাসিত ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্বাধীন ভারতের স্বাভাবিক মিত্র। ইহাদের সহিত ভারতের সহযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইবে। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিককে ভারতবর্ষ একরূপ স্বীকার করিয়াই লইয়াছে।

পণ্ডিত নেহরুর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উক্তি—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ কোনও দলে ভিড়িবে না। সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় মিত্র নির্বাচন করিবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ, আমেরিকা এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত ভারতবর্ষ স্বতন্ত্রভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দল-বিভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট। এংলো-স্যাক্সন শক্তির সহিত সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরোধ গোপন নাই।

এই বিরোধের মূল কারণ চাপা দিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সমতন্ত্র বিরোধী মতামত নিয়া এই বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিরপেক্ষ পর্যালোচকের নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অবিশ্বাস ও তাহাকে কোণঠাসা করিয়া রাখিবার অপচেষ্টাই এই বিরোধের প্রকৃত কারণ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট-বিরোধী নীতি এখন এত প্রবল যে, সিঃ ওয়ালেস্ অল্পেকটি সত্য কথা বলায় তাঁহাকে অপসারিত হইতে হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার অপরাধ—ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের মধ্য দিয়া পূর্ব ইউরোপে গণতন্ত্রের যে জাগরণ আসিয়াছে, তাহাকে সে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চায়। সে স্বাধীনভূ মর্মীতে উহার তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকায় পক্ষপাতী তাহার প্রতিপক্ষ বার্ডনেলিসের দূরবর্তী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কর্তৃত্ব সে স্বীকার করিতে নারাজী। সোভিয়েট রুশিয়া জার্মানীতে নাৎসীদের সমর্থনপুষ্ট ধনিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ঘটাইয়া জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দিতে চায়। সোভিয়েট অধিকৃত জার্মান অঞ্চলে অভিজাত ভূস্বামীদের সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; প্রধান প্রধান শিল্পগুলি জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতেছে। এই অঞ্চলে জনসাধারণ সর্বাগ্রে রাজনৈতিক অধিকার পাইয়াছিল। জাপানেও জঙ্গী সম্প্রদায়ের সমর্থক প্রতিক্রিয়াপন্থী ধনিকের উচ্ছেদ ঘটান সোভিয়েট রুশিয়ার উদ্দেশ্য। এংলো-স্যাক্সন শক্তি গণতন্ত্রের নামে সোভিয়েট রুশিয়ার এই প্রগতিপন্থী নীতির বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাইতেছে। ইহার কারণ—বাল্টিক ও কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলিতে (অবশ্য রুশিয়া ছাড়া), জার্মানীতে, জাপানে—সর্বত্র এংলো-স্যাক্সন শক্তি প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করিতে চায়। তাহারা ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ বলিতে কেবল জার্মানী ও জাপানের ফিউরার তাজিয়া তাহাদিগকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঔদরে রাখাই বোঝে। এইরূপ অবস্থায়, এংলো-স্যাক্সন জাতির সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার বিরোধ স্বাভাবিক।

ইহা ছাড়া, সোভিয়েট রুশিয়া ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করে। ইন্দোনেশিয়া হইতে ফৈয়েশিক সৈন্য অপসারণের দাবী সে একাধিবার জানাইয়াছে; ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতার নামে স্থায়িভাবে মার্কিণ ডলারের চাকায় বাঁধিবার যে চেষ্টা, তাহার বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। ভারতবর্ষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়ার প্রস্তাবের মধ্যে জানিয়ে খাঁট খাঁটি রাখিবার চেষ্টা সোভিয়েট সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সোভিয়েট রুশিয়া বিশ্ব হইতে বৃটিশের অপসরণ চাহিয়াছে; পারস্য-ইরাকের ব্যাপারে ফৈয়েশিক প্রভাবের অবসান দাবী করিয়াছে। পারস্যে আজারবাইজানীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সে সমর্থন করিয়াছিল। চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সে কিছে হস্তক্ষেপ করিবে না বলিয়া কথা দিয়াছে এবং সেখানে মার্কিণের হস্তক্ষেপ বন্ধ করিবার দাবী জানাইয়াছে।

এংলো-স্যাক্সন শক্তির পক্ষ হইতে বলা হয় যে, সোভিয়েট রুশিয়ার এই পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—সে বিভিন্ন রাজ্যে হয় বিপ্লব প্রচার ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা চাহিতেছে, অথবা এংলো-স্যাক্সন শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইঙ্গ-মার্কিণ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মিথ্যা অপপ্রচার প্রবলভাবে প্রচার করে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষেও এই প্রচারকার্যের ফল দেখা দিয়াছে; বহু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সোভিয়েট রুশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির প্রতি কটাক্ষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করা যায়, সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে জগতের প্রগতিশীল শক্তির একমাত্র মিত্র এই রাষ্ট্র সম্পর্কে ভারতবাসীর মিথ্যা ধারণা দূর হইবে; তাহারা বুঝিবে—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির যদি কোনও মিত্র থাকে, তাহা হইলে এই সোভিয়েট রুশিয়া।

অবশ্য সোভিয়েট রুশিয়ার মিত্রতা অহেতুক নহে; সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল হইতে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির পরিপূর্ণ মুক্তি সোভিয়েট রুশিয়ার স্বার্থ। ঔপনিবেশিক অঞ্চল শোষণ করিয়াই সাম্রাজ্যবাদের পুষ্টি; এই সব অঞ্চল যত বেশী পরিমাণে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে, ততই জগতের সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হইবে। এই দিক হইতে গণতান্ত্রিক সোভিয়েট রুশিয়া এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থ এক এবং তাহারা পরস্পরের স্বাভাবিক মিত্র।

তাহার পর, পণ্ডিত নেহরু নিউইয়র্কে জাতি সঙ্ঘের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিরা কিরূপ নীতি অনুসরণ করিবেন, তাহার আভাস দেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ উক্তি—যদি পরিষদে বড় শক্তিগুলির 'ভিটোর' অধিকার ভারতীয় প্রতিনিধিরা সমর্থন করিবে; কারণ বড় শক্তিগুলির ঐকমত্যের উপর জগতের শান্তি নির্ভর করিতেছে। পণ্ডিত নেহরুর এই উক্তিতে আমাদের দেশের অনেকের ভ্রান্ত ধারণার অবসান হইবে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অধিকারের জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠা অনেক সময় বিশ্বশান্তি ভাবাবেগ ছাড়া কিছুই নহে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বার্থ ও সঙ্গত অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, চীনদেশ, প্যালেস্তাইন, ট্রান্সজর্ডান, ইরাক প্রভৃতি রাষ্ট্রের ভোটের জোরে জগতে শান্তি রক্ষিত হইতে পারে না। বড় পরিষদের স্থায়ী সভ্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ ঘটিলে জগতে অশান্তি অনিবার্য। ইহারা যাহাতে একমত হইয়া বিশ্ব শান্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে, সেই উদ্দেশ্যেই 'ভিটোর' ব্যবস্থা। ইহা যে গণতন্ত্রসম্মত নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ইহাই একমাত্র সহজ ও কার্যকরী ব্যবস্থা।

এংলো-স্যাক্সন শক্তিগুলি এখন তাহাদের কয়েকটি অনুগত রাষ্ট্রের প্রতিনিধির দ্বারা জাতি সঙ্ঘে ভিটো-ব্যবস্থা সংশোধন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে; কারণ সোভিয়েট রুশিয়া পর পর কয়েকবার ভিটোর অধিকার প্রয়োগ করিয়া তাহাদের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। নিউ ইয়র্কে জাতি-সঙ্ঘের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিবেন।

পণ্ডিত নেহরু মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলিতে ভারতবর্ষ হইতে সৈন্যদল প্রেরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সব আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সহিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নৈতিক যোগ আছে। ইহাদের সহিত স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের সৌহার্দ্য স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহাতে উভয় পক্ষই উপকৃত হইবে। ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা যাহাদের স্বার্থে, তাহারা আশা করি উপকৃত হইবে যে, প্যালেস্টাইনে ইহুদী-আরব বিরোধ সাম্প্রদায়িক বিরোধ নহে—সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য এংলো-স্যাক্সন জাতির হীন চক্রান্তের ফল; তাহারা জানিয়া বিস্মিত হইবে যে, লীগ-নেতৃত্বে মুসলমান ও খৃষ্টান এক সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে। পক্ষান্তরে, মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলিও জানিবে—প্রকৃত স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, মুসলীম লীগ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে যোগ দিবার পরও মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় সৈন্যদল প্রেরণের সমস্ত নির্দ্ধারণে পণ্ডিত নেহরুর ক্ষমতা ব্যাহত হয় নাই। বৈদেশিক বিভাগ এখনও তাঁহারই হাতে; শাসন পরিষদে মুসলীম লীগের সহিত কংগ্রেসের সম্মিলিত দায়িত্বের ব্যবস্থাও হয় নাই।

লীগের অকুণ্ঠ উপনিবেশিকতার সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, তাহাদের সম্পর্কে শত্রুভাব ত্যাগ করিয়া উপনিবেশিক অঞ্চলের প্রকৃত উন্নতি বিধান নূতন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নীতি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এতদিন বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া উপনিবেশিকদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। নূতন গভর্ণমেণ্ট এই নীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অনুচর এবং মুসলীম লীগের চক্রান্তে পণ্ডিত নেহরু রাষ্ট্রনৈতিক লীগের সমস্ত আশানুরূপ সফলতা লাভ করে নাই বটে, কিন্তু ইহা সত্য—অদূর ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আন্তরিক চেষ্টা সফল হইবেই।

বেলুচিস্তানের অধিবাসীরা অনুরূপ আশা পাইয়া এতদিন শাসনকার্য্যে কোনরূপ অংশ লইতে পারে নাই। পণ্ডিত নেহরু জানাইয়াছেন যে, গণ-পরিষদের অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বেলুচিস্তানের রাজনৈতিক ভাগ্য অনির্দ্দিষ্ট রাখা হইবে না। বেলুচিস্তান প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে প্রতিনিধি লইয়া একটি পরামর্শ পরিষদ গঠনের কথা এখনই বিবেচনা করা হইতেছে।

সর্ব্বোপরি, নূতন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট পরাধীন ভারতবাসীর একটি বহুদিনের কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করিবেন। পরাধীন ভারতের বৈদেশিক শাসক অন্য দেশের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা দমনের জন্য ভারতীয় সৈন্য ব্যবহার করিয়া ভারতবাসীর মুখ মসীলিপ্ত করিয়া থাকে। এখনও বিভিন্ন স্থানে ৪০ হাজার ভারতীয় সৈন্য রহিয়াছে। ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায় ও ইরাকে ১০ হাজার করিয়া ভারতীয় সৈন্য সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য নিয়োজিত। নূতন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে এই সব সৈন্য ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিয়া স্বাধীনতাকামী সহযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

নুরেমবার্গের বিচার

শ্রীগোরা

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে ভার্সাই সন্ধি দ্বারদের ন্যায় পরাজিত জার্ম্মানীকে চিরতরে পঙ্গু করিবার উল্লাসে বিজয়ী জাতিগুলি উল্লাসে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল। অসংখ্য ঋণের বোঝা চাপাইয়া, সামরিক শক্তি সীমাবদ্ধ করিয়া, উপনিবেশ হইতে বঞ্চিত করিয়া ইহাকে এক অক্টোপাশের কঠিন বাঁধনে বাঁধিয়া দিয়াছিল। ভাবিয়াছিল ইহার পুনরুত্থানের পথ একেবারে বন্ধ করা হইল। কিন্তু এমনি আশ্চর্য্যের বিষয় যে মাত্র ২০টি বৎসরের মধ্যেই এই পঙ্গুকৃত জার্ম্মানী সকল বাঁধন কাটিয়া, বাধা ও বিঘ্নের অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। মৃত্যুঞ্জয়ীর মতই সে আবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হইয়া, ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির ত্রাসের কারণ হইয়া পড়িল।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর। সূর্য্যোদয় হইতে তখনও কিছুটা সময় বাকি রহিয়াছে। রাত্রি শেষের এই আবছা অন্ধকারের মধ্য দিয়া জার্ম্মানী সর্ব্বপ্রথম পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। এই আক্রমণের সমর্থনে জার্ম্মানীর দাবীই থাকুক, ইহাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত। ইহার পর জার্ম্মানী অবিশ্বাস্যরূপে বিদ্যুৎ রথ চালাইয়া মাত্র কয়টি বৎসরের মধ্যেই মধ্য-ইউরোপের ছোট বড় প্রায় সকল রাষ্ট্রগুলিকেই শাসন কুক্ষীগত করিয়া ফেলিল। ইহার প্রবল প্রতাপে সারা পৃথিবী চঞ্চল হইয়া উঠিল, মুখ্যতঃ প্রায় সকল জাতিই আত্মরক্ষার্থে এই বিশ্ব-যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ছাড়া উপায় দেখিল না। একদিকে জার্ম্মানী, ইতালী ও জাপান—অপর দিকে ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, ফরাসী, চীন হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর অসংখ্য রাষ্ট্র। ছয়টি বৎসর ধরিয়া বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধের যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, পৃথিবীর ইতিহাসে সেরূপ আর কখন ঘটে নাই। অবশেষে একে একে ইতালী, জার্ম্মানী ও জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে

সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের অবসান হইল। মাত্র দুইটি আণবিক বোমার আঘাতে জাপানের দুইটি ঘনবদ্ধ নগরকে একেবারে বিশ্লিষ্ট করিয়া লক্ষ লক্ষ নিরীহ বে-সামরিক অধিবাসীর জীবননাশ করার পরে জাপান আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

যুদ্ধ থামিয়া গেল। বিজয়ী রাষ্ট্র নেতারা বিজয় গৌরবে দ্বিগুণ উৎসাহে পক্ষ সমর্থনকারকদের ধরপাকড় আরম্ভ করিয়া দিলেন। জার্মানীর হিটলার, হিমলার ও গোয়েবেল্‌স এবং ইতালীর মুসোলিনী পক্ষ হইতে ধরা পড়িলেন না। পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা আত্মহত্যা বা আত্মগোপন করিলেন, তাহা এখনও তর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। জার্মানীর উক্ত তিন জন ছাড়া গোয়েরিং, রিবেনট্রপ, কাইটেল, হেস প্রভৃতি অন্যান্য রাষ্ট্র দূতেরা ধরা পড়িলেন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লণ্ডনে ১৮টি মিত্রশক্তি একত্রিত হইয়া জার্মানীর যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির বিষয়ে সর্বপ্রথম চিন্তা করিয়াছিল। তখন অবশ্য জার্মানী আপন প্রভাবে তাহার পক্ষ শক্তিকে একেবারে কোনঠাসা করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার পর মস্কো সম্মেলনে রুজভেল্ট, চার্চিল ও ষ্টালিন জার্মানীর সমর নায়কদের শাস্তি দিবার কথা ঘোষণা করেন।

যুদ্ধান্তে অধিকৃত জার্মানীর নুরেমবার্গ সহরে জার্মান যুদ্ধ-নেতাদের বিচারের জন্য এক আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন করা হইল। বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও ফ্রান্স এই চারিটি জাতির পক্ষ হইতে বিচারক নিযুক্ত হইলেন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১০শে অক্টোবর এই আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী বিচারালয়ে ২১ জন জার্মান নেতাকে আসামী করিয়া তাহাদের বিচার সুরু হইল। এই ২১ জন হইতেছেন—

হারম্যান উইলহেল্‌ম গোয়েরিং (৫০)। হিটলারের পরেই ইহার স্থান। জার্মানীতে ইহার অসাধারণ প্রভাব ছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি রাইখ ডিফেন্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন।

ফন্ রিবেনট্রপ (৫৩)। জার্মানীর পররাষ্ট্র সচিব। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে গুপ্ত মন্ত্রণা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এবং ১৯৩৯-৪৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে জার্মানীর দূত হিসাবে কার্য্য করেন।

উইলহেল্‌ম কাইটেল (৫৪)। জার্মানীর ফিল্ড মার্শাল এবং রাইখ ডিফেন্স কাউন্সিল ও গুপ্ত মন্ত্রণা কাউন্সিলের সদস্য।

আর্ণষ্ট কাল্টেন ব্রানার (৪৩)। হিমলারের অধীনে ইনি পুলিশ রক্ষী বাহিনীর অন্যতম পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং অষ্ট্রিয়ার এস, এস বাহিনীর অধিনায়ক করেন।

আলফ্রেড রোজেনবার্গ, ন্যাশনাল সোসালিষ্ট পার্টির দার্শনিক এবং ইহার পলিটিক্যাল অফিসের নেতা ছিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে অধিকৃত পূর্ব্ব রাজ্য সমূহের রাইখের মন্ত্রী ছিলেন।

ডাঃ হান্স ফ্রাঙ্ক (৪৬)। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পোল্যাণ্ডের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন।

উইলহেল্‌ম ফ্রিক (৬৯)। ১৯৩৩-৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাইখের মন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৩৯ খৃঃ হইতে রাইখ ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

যুলিয়াস ষ্ট্রেচার (৫৩)। ষ্টারমাখের সম্পাদক। ইনি নাজি একজন বিখ্যাত ইহুদী-পীড়ক।

ফ্রিৎস সোকেল (৪৯)। যুদ্ধের কাজে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য তিনি জেনারেল কমিশনার ছিলেন। অধিকৃত দেশসমূহ হইতে তিনি বলপূর্ব্বক শ্রমিক সংগ্রহ করিতেন।

আলফ্রেড জোডল্ (৫৩)। ইনি জার্মান সেনাবাহিনীর অন্যতম ছিলেন। হিটলারকে যুদ্ধবিষয়ে উপদেশ দান করিতেন।

আর্টুর ফন্ সেস্-ইনকোয়ার্ট (৪৩)। একজন অষ্ট্রিয়ান, অষ্ট্রিয়ায় হিটলারের প্রধান এজেন্টের কাজ করিতেন। ইনি অষ্ট্রিয়ার যখন গভর্ণর ছিলেন তখন ইহুদী-খ্রিষ্টানদের নানাভাবে নির্য্যাতন করিতেন। ১৯৪০ খৃঃ নেদারল্যাণ্ডের রাইখ-কমিশনার নিযুক্ত হন।

মার্টিন বোরম্যান (৪৬)। ইনি চ্যান্সেলারী পার্টির নেতা ছিলেন।

রুডল্‌ফ হেস (৫০)। ন্যাশনাল সোসালিষ্ট পার্টির ডেপুটি লীডার, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে স্কটলেণ্ড যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি রাইখ ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ তিনি স্কটলেণ্ডের হাতে বন্দী হন।

ডাঃ ওয়ালথার ফাঙ্ক (৫৮)। জার্মানীর অর্থনৈতিক সচিব। রাইখ ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য ও রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

এরিক রেডার (৭০)। গ্রাণ্ড এডমিরাল। রাইখ ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য এবং ১৯৪৩ খৃঃ পর্য্যন্ত জার্মান নৌবাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ ছিলেন।

জোকেলার আলবার্ট শীরার (৪১)। জার্মানীর অস্ত্রসচিব। ১৯৪২ খৃঃ ডাঃ টডএর মৃত্যুর পর টডএ অর্গানিজেশনের নেতা হন।

বাল্ডুর ফন শিরাক (৩৯)। নাৎসী-যুবকদলের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। ভিয়েনা হইতে ইহুদী বিতাড়নের ব্যাপারে তিনি যুক্ত ছিলেন।

ফ্রাঞ্জ কনষ্টান্টিন ফন্ নয়রাথ (৭৩)। এক সময়ে লণ্ডনে জার্মানীর দূত ছিলেন। রিবেনট্রপের পূর্ব্বে তিনি জার্মানীর পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন। ১৯৩৯-৪১ খৃঃ বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার রাইখ্‌স প্রোটেক্টার ছিলেন।

কার্ল ডোয়েনিৎস (৫৮)। জার্মান নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। ইনি সাবমেরিণ বিভাগের অধিনায়ক ছিলেন। জার্মানীর পতনের প্রাক্‌কালে ইনি জার্মানীর ফুয়ার হইয়াছিলেন।

হান্স ফ্রাৎসেন (৫৭)। হিটলারের উত্থানের পূর্ব্বে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি জার্মানীর চান্সেলার ছিলেন। ১৯৩৪-৩৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রী, ১৯৩৬-৩৮ খৃঃ তুরস্কের দূত নিযুক্ত হন।

ওয়াল্টার ফাঙ্ক (৫৩)। ১৯১৪-৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। হিটলারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন।

হান্স ফ্রিৎসে। গোয়েবেলের প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রিসভার ষ্টেট সেক্রেটারী ছিলেন এবং নাৎসী-নেতার বিভাগের প্রধান ছিলেন।

ওয়ার্থ সে (৫৩)। ইনি অধিকৃতদের নেতা ছিলেন, এবং বহু বিদেশী শ্রমিককে জার্মানীতে আনয়ন করেন।

গোটফ হাসব্যাচ (৭৫)। জার্মানীর নৌপরিবহন বিভাগের নেতা ছিলেন।

এই ২৪ জন আসামীর মধ্যে যখন কে বিচার চলিবার কালে আত্মহত্যা করেন এবং গুরুতর পীড়ার জন্য হালবাচের বিচার স্থগিত থাকে।

দীর্ঘকাল ধরিয়া নাৎসী-নায়কদের বিচার চলিতে থাকে। ১২১০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া, প্রায় দুই লক্ষ দলীলপত্র ঘাঁটিয়া, ৩৩১ দিন অধিবেশনের পর এই বিচারের পালা সমাপ্ত হয়। ১লা অক্টোবর তারিখে ২২ জন অভিযুক্ত নাৎসী-আসামীর বিরুদ্ধে বিচারের রায় ঘোষণা করা হয়।

গোরেরিং, রিবেনট্রপ, কাইটেল, কাল্টেনব্রানার, রোসেনবার্গ, ফ্রাঙ্ক, ফ্রিক, ট্রেগার, সোকেল, ফোডল, সেস-ইঙ্কোয়ার্ট ও মার্টিন বোরম্যানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ইহাদের মধ্যে বোরম্যানকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, তাঁহার অনুপস্থিতিতেই তাঁহার বিচার হইয়াছে।

হেস, ফাঙ্ক, রেডার যাবজ্জীবন, শিরাখ, স্পীয়ার প্রত্যেকে কুড়ি বৎসর, নয়রাথ ১৫ বৎসর এবং ডোয়েনিৎস ১০ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ পায়।

২৫ জন আসামীর মধ্যে মাত্র প্যাপেন,সাখ্‌ট ও ফ্রিৎসে এই তিনজন মুক্তিলাভ করেন।

আসামীদের বিরুদ্ধে (১) ষড়যন্ত্র, (২) শান্তিনাশ (৩) যুদ্ধাপরাধ ও (৪) মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এই চার প্রকারের অভিযোগ আনা হয়। গোরেরিং, রিবেনট্রপ, কাইটেল, রোসেনবার্গ, ফোডল ও নয়রাথ উক্ত চারি অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন। রেডার উপরোক্ত ১, ২, ৩নং অভিযোগে, হেস ১ ও ২নং অপরাধে, সেস-ইঙ্কোয়ার্ট, ফ্রিক ও ফাঙ্ক ২, ৩ এবং ৪নং অভিযোগে, ফ্রনার, ফ্রাঙ্ক, সোকেল, বোরম্যান, ডোনিৎস, স্পীয়ার ৩ ও ৪নং দোষে, শিরাখ এবং ট্রেগার ৪নং দোষী অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন।

মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদিগকে ১৬ই অক্টোবর ফাঁসি দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

মামলার এই রায়ে সোভিয়েট জজ কয়েকটি বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। প্যাপেন, সাখ্‌ট ও ফ্রিৎসের বেকসুর মুক্তিতে তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন। ইহাদিগকেও অপরাধী করিয়া শাস্তিদানের কথা তিনি জানাইয়াছিলেন। হেসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার কথা তিনি জানান।

আসামীদের মধ্যে কয়েকজন ফাঁসির বদলে গুলি করিয়া মারিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন কিন্তু আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্তৃক তাহা অগ্রাহ্য করা হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত এরিক রেডার কারাগারে পচিয়া মরা অপেক্ষা সৈনিকের ন্যায় মৃত্যুবরণকে শ্রেয় জ্ঞান করিয়া মৃত্যুদণ্ড রদের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাও গ্রাহ্য হয় নাই।

কারাদণ্ডে দণ্ডিত ৭জন নাৎসী যুদ্ধাপরাধীকে বার্লিনে বৃটিশ অধিকৃত এলাকায় স্পাণ্ডাউ কারাগারে রাখা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

যে সকল জার্মান সমর নায়কদের ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয় তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য জার্মানরা যদি কোনরূপ চেষ্টা করে এই আশঙ্কায় নুরেমবার্গ বিচারালয়ের প্রহরণ পথে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ফলক হিসাবে প্রায় সকল সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে ফাঁসি দেখিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহাদিগকেও সর্বপ্রকার প্রহরাধীনে রাখা হইয়াছিল।

ফাঁসির দিন অপরাহ্ণ পর্যন্তও দণ্ডিতদের কখন ফাঁসি দেওয়া হইবে জানান হয় নাই। ফাঁসির আড়াই ঘণ্টা পূর্বে গোরেরিংকে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তিনি প্রহরী-বেষ্টিত হইয়াও রহস্যজনক-ভাবে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। ইহার পর অপর সকলের হাতে হাতকড়া লাগাইয়া দেওয়া হয়।

রাত্রি ১ ঘটিকার সময় সর্বপ্রথম রিবেনট্রপকে বন্দীশালার বিরাট হলটির মধ্য দিয়া ফাঁসির মঞ্চে আনা হইল। মঞ্চভূমিতে ১০টি ফোর পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাতি জ্বলিতেছিল। ফাঁসীর মঞ্চে রিবেনট্রপকে তোলা হইলে একজন তাঁহাকে নাম বলিতে বলিলেন। রিবেনট্রপ কোনদিকে তাকাইলেন না, কোন উত্তরও দিলেন না। পুনরায় নাম বলিবার কথা তাঁহাকে বলা হইল। তখন অকম্পিতকণ্ঠে তিনি নিজের নাম প্রকাশ করিলেন। একজন রিবেনট্রপকে শেষ কথা বলিবার কিছু থাকিলে তাহা বলিতে বলেন। রিবেনট্রপ প্রহরীদের বা অন্য কাহারও দিকে তাকাইলেন না, ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শুধু বলিলেন—ভগবান জার্মানীকে রক্ষা করুন।

ইহার পর একে একে আর সকলের ফাঁসি হইয়া গেল। মৃত্যুকালে কাইটেল বলিয়াছিলেন—ভগবান জার্মানবাসীদের প্রতি দয়া করুন। আমার পূর্বে কুড়ি লক্ষ জন মৃত্যুবরণ করিয়াছে, আমি আমার পূর্বের অনুসরণ করিতেছি।

ফাঁসির পর চতুঃশক্তি কমিশন হইতে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়—মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের ফাঁসিকার্য আমাদের সম্মুখে সমাপ্ত করা হইয়াছে।

দলিল হিসাবে রাখিবার জন্য চতুঃশক্তির চারজন প্রতিনিধির সম্মুখে সরকারী ফটোগ্রাফার নাৎসী নেতাদের মৃতদেহের ফটোগ্রাফ তোলে। পরবিন গোরেরিং ও অপর দশজন জার্মান নেতা যাহাদের ফাঁসী হইল তাহাদের মৃতদেহ ভস্মীভূত করা হয় কিন্তু কোনও চিহ্নচিহ্ন রাখা হইল না।

এইভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরত্ব, যাহাদের শক্তিমত্তায় সারা পৃথিবী একদিন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল তাঁহাদের জীবনাবসান হইল। ইতিহাসের এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস। যাঁহারা অল্প কিছু দিনের জন্যই পৃথিবীর মানচিত্রের বহুল পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহাদের পরাজয়ের পর বিজয়ীগণ পরম উৎসাহে তাঁহাদের অবর্তমানে বসিয়া তাঁহাদেরই বিচার পর্ব শেষ করিলেন। এই বিচারে ইংলণ্ড, আমেরিকা, রুশ ও ফরাসী দীর্ঘ সময় ধরিয়া, লক্ষ লক্ষ দলীলপত্র ঘাঁটিয়া, হাজার হাজার লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া বাহিরে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে আসামীদের প্রতি তাঁহারা ন্যায়পরায়ণতার কোনরূপ ত্রুটি রাখেন নাই। আসামীদিগকে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য

বারবরাই সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়াই বিভিন্ন আসামী যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা ছাড়া অনেকে আপন আপন সপক্ষের সমর্থনও প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আসল কথা হইতেছে, যাঁহারা প্রধান অভিযোক্তা তাঁহারাই বিচারকের আসন গ্রহণ করিলেন কেমন করিয়া? আর এই বিচার সভায় পৃথিবীর শত্রু-মিত্র, কি নিরপেক্ষ কাহার কোনও প্রতিনিধি স্থান লাভই বা করিল না কেন? অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোক্তাদের শত্রু, তাঁহাদেরই হাতে পরাজিত। অভিযোগকারী নিজে তাঁহার পক্ষের বিচার করিতেছেন, ইহাতে আন্তর্জাতিক আইনের কোন্ ধারা যে রক্ষিত হইয়াছে তাহা বুঝা কঠিন। কিন্তু যে ধারাই ইহার মধ্যে থাকুক না কেন তাঁহারা জার্মানীর প্রধান সমর নায়কদের ফাঁসীর মঞ্চে ঝুলাইয়া যে ভাবে শহীদ করিয়া রাখিয়া গেলেন, ভবীষ্যকালের জার্মান জাতি যে ইহাকে সুদৃষ্টিতে দেখিবে না তাহা বুঝা সহজ। জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ জার্মানী যে চিরকাল পদানত থাকিবে না, তাহা অস্বীকার করিবারও উপায় নাই। সুতরাং এই বিচারে তৃতীয় মহাযুদ্ধের বীজ উপ্ত হইল কিনা তাহাই সন্দেহ হইতেছে।

দুই শেয়ালের বিবৃতি

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ বার্ণেস প্যারিস হইতে ফিরিয়াই মুখ খুলিয়াছেন। তিনি যখন প্যারিস শান্তি সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির ভবিষ্যৎ প্রকৃতি কিরূপ হইবে তাহার ছোটখাট একটা পরীক্ষা-কার্য্য চালাইতেছিলেন তখন একদিকে ছেলে, অর্থাৎ মার্কিন মুলুকে বাণিজ্য-সচিব হেন্‌রি ওয়ালেস চটিয়া আগুন। সমস্যাটা মূলত খুব হইয়াছে রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া। ইহার চাইতে সংক্ষেপে বলিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায়—রুশ না ব্রিটিশ। কোন পক্ষ? বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আজ সবাইকে হটাইয়া দিয়া রহিয়াছে মাত্র রুশ আর ব্রিটিশ। মার্কিনরা বিজ্ঞ হলে বলাবাহুল্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এমনও ত হয়, রাশিয়া ফেলে বড় বড় পালোয়ানদেরও লাটি আসাইয়া দিবার লোকের প্রয়োজন হয়।

মার্কিনদের আজ য়ুরোপে লাটি আসাইয়া দিবার লোকের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। য়ুরোপে মার্কিনদের আত্মানি লইবার পর হইতে —গ্রাম রাখি কি কুল রাখি—এই চিন্তা তাহাদের সুরু হইয়াছে। যদি গ্রাম রাখিতে হয় তবে সব জলাঞ্জলি দিয়া গ্রামের সঙ্গে সমান তালে না হোক, কোন কোন ক্ষেত্রে তাল মিলাইয়া আসরে নাচিতে হইবে। বেতাল হইলে রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। সব ধরা পড়িয়া যাইবে। তার চাইতে কুলই ভাল। জাত যাইবার ভয় নাই, অথচ পেট ভরিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে। তাই বার্ণেস সাহেব যখন কোমর বাঁধিয়া শান্তি সম্মেলনে কুল রাখিবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন তখন এদিকে গ্রামের প্রেমে যিনি মজিয়াছেন তাঁহার অন্যথা ভাবিল। তাই মার্কিন পররাষ্ট্র রাজনীতিতে আজ কলহ সুরু হইয়াছে। তবে ইহা কলহ ই মাত্র। ইহার কলহও অর্থমূখী; ধর্মমূখী কোন গতি নাই। এই কলহের কলহ দেখিয়া বিদেশীর ভয় পাইবার কারণ নাই। এই কলহটিকে আগামী মার্কিনী নির্ব্বাচনীর পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলেই ভাল হইবে। লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে যে মার্কিনবাসীরা সুদিন সমতন্ত্রের বিশ্বাস খাইয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছে। বাস্ত ব্যবসাইবার জন্য সাধারণতন্ত্রের হাল ধরিবে কিনা ইহাই এই চিন্তা করিতেছে। এই সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের ইহুদী নীতির কথাই প্রথম উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ইথাফিং যে সব বিবৃতি প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতি সম্বন্ধে খুব অপরিণত জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। এই দিক তাঁহার সমসাময়ীক অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদগণ, আবশ্যক হইতে কুশলী অগ্রজ ব্রিটিশকে ডাকিলে কাজটা ভাল হইত। কিন্তু মুস্কিল হইতেছে শ্রমিক সরকারের নীতি কোন কোন ক্ষেত্রে মার্কিনদের একেবারে কোল ঘেঁসিয়া ফেলেও ঠিক যেন ধরা দিতেছে না। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের বিবৃতি অনেকখানি জল ঘোলা করিয়া ফেলিয়াছে। গোটা আরবও জুড়িয়া ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগের বেগ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছে। ব্রিটিশ জাতি মধ্যপ্রাচ্যে অবলীলায় কূটনৈতিক নেতৃত্ব ও পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রভুত্ব করিয়া সমস্যাটা তাহার হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। আরব ইহুদী সমস্যায় ব্রিটিশ শ্রমিক একবারেও ভুল নাই—আরব ও ইহুদীরা তাহাদের সমস্যা সমাধান করুক, আমরা সরিয়া পড়িলাম। এমন মৌলিক পরিবর্ত্তনের কোন ইঙ্গিত ব্রিটিশ কূটনীতির মধ্যে নাই। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান একটা মৌলিক সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন; তিনি ইহুদীদেরও সন্তুষ্ট করিয়াছেন নির্ব্বাচনের চাবায় জল দিয়া ওপারে যাইবার আশায়। এইখানটাই ব্রিটিশ কূটনীতি ও মার্কিন কূটনীতির প্রভেদ। ব্রিটিশ শ্রমিক কূটনীতি বিবৃতি দিয়া তেমন কাহাকেও অসন্তুষ্ট করেন নাই। তার কথা ও কাজ চিরকালই যে সে পথে চলে আজও ঠিক তেমনি সেই সেই পথেই চলিতেছে, মতের ব্রিটিশ রক্ষণশীল বা শ্রমিক দলের পররাষ্ট্র নীতির সমর্থন করিতেছে না। এইখানে বেভিন সাহেব বাজি-মাৎ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, পূর্ব্ব আলোচনায় ফিরিয়া আসা যাক, আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, ওয়ালেস-বার্ণেস কলহ। বার্ণেস

কলহটিকে মিটাইয়া রাখিতে নিজ উদ্যোগ পররাষ্ট্র নীতির মোটামুটি একটি খসড়া বিবরণীকে দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বিজয় ব্যবসা করিয়া মোটা মুনাফাকে অর্থনৈতিক লাভের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবে না। মার্কিনরা চায়—যাতে য়ুরোপ বাঁচিয়া থাকে, য়ুরোপ বাঁচিলেই বিশ্বের শান্তি রক্ষা হইবে। মোট কথা—য়ুরোপ যদি প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে বিশ্বের শান্তি (—অর্থাৎ যেভাবে অনুষ্ঠিত যুদ্ধফলের অকল—সেই অকল সমৃদ্ধিশালী হইবে ও তথায় শান্তি বিরাজ করিবে। কিন্তু প্রাচ্যদেশের অবস্থা কি হইবে? সে সম্বন্ধেও মার্শেল সাহেব কিছু বলেন নাই, শুধু বলিয়াছেন, "We defend freedom every where" (The statesman october 20, 1946) খুব ভাল কথা। কিন্তু কি অর্থে এই freedom রক্ষা কার্যটি চলে? মার্শেল সাহেব বলিয়াছেন, আমাদের মতে মানব জাতির স্বাধীনতা ও প্রগতি অবিচ্ছেদ্য। কথাটা অবশ্যই মানিয়াছি। কিন্তু সেই স্বাধীনতার স্বরূপ কি গণসমুদ্যী স্বাই স্রোপায়? প্রগতি অর্থে কি বিশ্বের জাতির প্রতি নিগ্রহ? মার্শেল সাহেবের কথা ধরিয়া লইলে এ সত্য স্বীকার করিতে হইবে যে মার্কিনরা ভবিষ্যতেও কোন জাতির অর্থনৈতিক লাভ চাহেন না। কিন্তু মোটা ন্যাশনাল আমেরিকার অবস্থাটা কি আমাদের জানিতে কৌতূহল হয়। কার্টেল, মার্জারগুলি কোন সভ্যতার দান? সেখানে কি মার্কিন জাতির কোন কীর্তি আজিও শর্তহীন বিরাজ করিতেছেন? মার্শেল সাহেব যে পাক বিদ্যা আজ ঘরে ঢাকিবার আশায় আছেন সে পাকে আজ লোকা ধরিয়াছে। অতএব বাজের আসল খরচটি ধরা পড়িয়াছে।

সেনেটর ভ্যান্ডেনবার্গ, ইনি মার্কিনী সাধারণ তন্ত্রের পররাষ্ট্র নীতির মুরুব্বী, প্যারিস শান্তি সম্মেলনের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। মার্কিন-এ গণতন্ত্রীরা যতই কেন শক্তিশালী হউক না, সাধারণ তন্ত্রীদের মতামত তাদের গুরুত্ব করিয়া চলিতে হয়, রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধ হইবে না বলিয়াই তিনি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বাসী এই মতামতকে আশাপ্রদ বলিয়াই ধরিবে। কিন্তু রাশিয়ার বিরোধের সূত্রটি আমাদের যতদূর মনে হইতেছে, নিছক মতান্তরের উপরই নির্ভর করিতেছে না। ইহার উৎস মূল যেখানে, সেখানে বুদ্ধি না দিয়া সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্ত লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে। অবশ্য ঘটনার বিলক্ষণ পরিবর্তন হইতেছে। একটা কথা অবশ্য ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিনরা সাধ করিয়া বিরোধ বাধাইবে না। বস্তুত পক্ষে কেহই সাধ করিয়া বিরোধ বাধায় না। ঘটনার অনিবার্য গতি যেখানে আসাইয়া লইয়া যায়, সেইখানেই বিদ্যা বাঁড়াইতে হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দৃষ্টান্ত হইতে এই কথাটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে জার্মানী রাশিয়াকে ঠেলিয়াই যুদ্ধে নামাইয়া দিল। পক্ষান্তরে জার্মানীর রাশিয়াকে আক্রমণ না করিয়া কোন উপায় ছিল না। রাশিয়ার মত অত বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র পিছনে রাখিয়া সম্মুখে কাহারোই সৈন্য পাঠানো সম্ভবপর নয়। জার্মানী অনেকটা দায় পড়িয়াই রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে। কথা উঠিতে পারে যে জার্মানী যখন রাশিয়াকে আক্রমণ করে তখন উহার যেন সম্মুখে ও পশ্চাতে সমানে সমানে যুদ্ধ হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য হইলে যুদ্ধ হওয়া যুক্তি, তবে সাময়িক একটা ব্যবস্থা হইতে পারে মাত্র। তাছাড়া কূটনীতির রূপ রাষ্ট্র চেতনা ও আদর্শের উপর অনেকখানি নির্ভর করে—দুই ভিন্ন মতপন্থীর কূটনীতির ভিন্নরূপ হইতে বাধ্য। কারণ রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বার্থের যে বড়ি টানাটানি হয় তার উপাদান যে শ্রেণীর লোক, তাদের স্বার্থ রাষ্ট্রের স্বার্থে কতটা পরিপালী—তারই উপর নির্ভর করে এই দুই নীতির রূপের বিভিন্নতা। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে যে সোভিয়েত স্বার্থ ও প্রভুত্বের খেলা চলিয়াছিল, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে তাহা খানিকটা প্রসারিত হইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থ বিজ্ঞান সোভিয়েত সীমানা পার হইয়া বৃহত্তর সমাজ পরিধির মধ্যে নয়া অর্থনৈতিক রূপ লইতেছে। এই পরিবর্তনের পথে জনসাধারণের চেতনার বিকাশ কোথাও সুষম হইতেছে, কোথাও বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। তাই বর্তমান ইতিহাসের গতিকে জনসাধারণের চেতনাই আংশিকভাবে নির্ধারণ করিতেছে। আফ্রিকার মুদ্রাস্ফীতির বিষয় দুই একটা ঘটনার বিশ্লেষণ করিলেই বোঝা যাইবে যে জনসাধারণের স্বার্থ কূটনীতিতে একটা বিশেষ রূপ গ্রহণ করিতেছে। বিজয় গোটাসত প্রভুত্ব ও স্বার্থ আজ আদায় করাইতে পারিতেছে না। তাই যে ব্যক্তি যখনই যুদ্ধ হইবে বা হইবে এইরূপ মতামত প্রকাশ করেন, অমনই প্রশ্ন হইতেছে তিনি কাহাদের প্রতিনিধি এবং কোন শ্রেণীর লোকদের স্বার্থের খাতির হইয়া কথা কহিতেছেন। যদি সেক্রেটারী ভ্যান্ডেনবার্গকে মার্কিন দেশের সংবাদপত্রের মুখপাত্র বলিয়া ধরিয়া লইতে হয় তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে মার্কিন ধনিকরা রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চাহে না। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে তারে কাহারা এবং যাহারা আশঙ্কা করিতেছে যে রাশিয়ার সঙ্গে সোলযোগ ঘটিবে তাহাদের আশঙ্কার উৎস কোথায়? একথা ঐতিহাসিক সত্য যে রাশিয়ার রাষ্ট্র চেতনা ও আদর্শ মার্কিনদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতএব তার স্বার্থ ও মার্কিন স্বার্থ দুই বিপরীত খাতে বহিতেছে। ইহার মধ্যে মিলনের অবকাশ কোথায়? সম্ভবতঃ এই অবকাশহীন খুঁজিয়ার জন্যই এই কথা উদ্ভব হইয়াছে "he (vandenberg) agreed with Marshal Stalin that it was possible to work out "live and let live accommodation between Eastern communism and our Western Democracy"—(The Statesman october 21, 1946.) কিন্তু পরিচ্ছন্ন কি সব ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয়? মার্কিন অর্থনীতি বর্তমান বিশ্বের প্রতি রন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আগামী তিরিশ বছর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক অভিযান অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিবে। যে সব রাষ্ট্র আজ নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িবার প্রয়াস পাইতেছে তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষ, চীন ও রাশিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগে যদি এই তিনটি দেশের মিতালী সম্ভবপর হয় তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী শক্তি হিসাবে এই শক্তিত্রয় নূতন সভ্যতার বাহন হইতে পারিবে। বর্তমান ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতার মূলে এই তিনটি শক্তির সহযোগিতা থাকিলে ভারত ও চীন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক অভিযান হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি এই দিক চিন্তা করিবেন।*

• • • •

* গত সংখ্যায় বলিয়াছিলাম যে "ভারত, ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন, শ্যাম, চীন, তিব্বত, জাভা ও সুমাত্রা সবাই মিলিয়া এশিয়ার মহাসাগরে এক মাইলস্টোন গড়িয়া তুলিবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই সম্মিলিত শক্তি মার্কিন বা রুশ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কাজ করিবে।" অবশ্য মুই মনে হইতেছে যে, ইহা আংশিক সত্য। রাশিয়ার সম্বোভাব ভারতের প্রতি সহানুভূতিসূচক হওয়ায় পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

(৩)

ভূপালের নবাব অসীম উৎসাহে তাজী তালেবীতে বড়লাট সাহেবের দিকটে যেমন যাতায়াত করিতে লাগিলেন, অপর দিকে ঠিক তেমনি আগন বিবাদ ভঞ্জনে নেহরু-জিন্না সাক্ষাৎ লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। অনেকবার সাক্ষাৎও ঘটিল; কিন্তু উভয়ের আদর্শ একমুখী না হওয়ায় শেষ মুহূর্তে আসিয়া সমস্ত আলোচনা অকস্মাৎ ভাঙিয়া গেল। ইহা লইয়া মিঃ জিন্নার সহিত কংগ্রেসের কতখানি যে বিরোধের মূল প্রসার হইল তাহার হিসাব করিলে ঐতিহাসিকের এক গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। যাহাই হউক, ভূপালের নবাবও এবারে মিলনের দূত হইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিলেন। ব্যর্থমনোরথে আপন রাজ্য ভূপালে ফিরিয়া আসিলেন।

কংগ্রেসের সহিত মিটমাট হইল না, বড়লাটেরও ভেদ জিৎ নাই, আর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্যমও সফল হয় নাই, অথচ সমস্ত শাসন ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতেই রহিয়া যাইতেছে, মিঃ জিন্না এবার ভীষণ বেকায়দায় পড়িয়া গেলেন। বিপাকে পড়িয়া নিজেই অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের সূত্র খুঁজিতে লাগিলেন। ২০শে আগষ্ট বড়লাট তাঁহার এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—লীগ যদি অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করে তবে তাহাদিগকে ৫টি আসন বেশী দেওয়া হইবে। বড়লাটের বেতার বক্তৃতার এই সুযোগ ধরিয়া লীগ "আধিকার বলে" অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঠিক পূর্বে বড়লাট ও মিঃ জিন্নার মধ্যে যে আটখানি পত্র বিনিময় হইয়াছিল তাহা প্রকাশিত হওয়ায় মিঃ জিন্নার বেকায়দায় পড়ার ব্যাপারটি বাহির হইয়া পড়ে। মিঃ জিন্না বড়লাটকে বলিয়াছিলেন :—অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস তাঁহাদের প্রাপ্য ছয়টি আসনের মধ্য হইতে যে একজন তপশীলী সদস্যকে মনোনীত করিবেন, তাহাতে কংগ্রেসকে লীগের সম্মতি বা অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। অপর পাঁচজনের মধ্য হইতে কংগ্রেস ইচ্ছামত কোন মুসলমানকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। পালা বা পর্যায়ক্রমে কংগ্রেস ও লীগের মধ্য হইতে অন্তর্বর্তী সরকারের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

বড়লাট তাঁহার পত্রে মিঃ জিন্নার উক্ত সকল অভিযোগ করটাই অগ্রাহ্য করেন। গুরুত্ব বন্টন সম্বন্ধে বড়লাট মিঃ জিন্নাকে জানান যে, অর্থ, বাণিজ্য, ডাক ও বিমান, স্বাস্থ্য, আইন এই কয়টি দপ্তরের ভার তিনি লীগকে দিতে প্রস্তুত আছেন। কয়েকটি বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ দপ্তর লীগের ভাগে না পড়ায় মিঃ জিন্না দুঃখ প্রকাশ করিলেও আর কোন পাল্টাইতে সাহস করিলেন না। তিনি এবার বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান না করিলেও ইহাতে মুসলমান সদস্যের অভাব হইবে না। বড়লাট অ-লীগ মুসলমানদের লইয়াই সরকার গঠন করিবেন। তাই তিনি অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের যোগদানে বাহবীর ঘোষণা গ্রহণ করিলেন।

এইভাবে অনেক জল ঘোলা করিয়া, বহু সময় অপব্যয় করিয়া লীগ শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছে। এই গবর্ণমেণ্টে যোগদানের পূর্বে পণ্ডিত নেহরু মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লীগকে পাঁচটি আসন দিবার প্রস্তাব গ্রহণ করাইয়াছিলেন। মিঃ জিন্না তখন আপন মহিমায় থাকিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করেন।

১০ই জুলাই বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত লীগ কাউন্সিলের সভায় মিঃ জিন্না তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"আপোষ করিবার আর অবকাশ নাই। অগ্রসর হও।" ইহার পর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইলে ৭ই সেপ্টেম্বর মিঃ জিন্না আর একবার বলিয়াছিলেন—অন্তর্বর্তী সরকার যা গণপরিষদে লীগের যোগদানের কোন আশা দেখিতেছি না, কারণ যোগদান করিতে হইলে উহা আমাদের পক্ষে আত্মসমর্পণ বা অপমানের সিল হইবে।

অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার সময় মিঃ জিন্না তাঁহার এই সকল পূর্বোক্তিগুলিকে বিস্মৃতির কালো পর্দায় ঢাকা দিয়া দিলেন। সেই জাতীয়তাবাদী মুসলমান স্বীকার করিতেই হইল, অথচ এই একটি লোককে লইয়া মিঃ জিন্নার জিদ এমনি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে আপোষের ছোঁয়ায় তাহা ক্রমশঃই উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছিল। শেষে আপোষের সকল ছোঁয়া ব্যর্থ হওয়ায় এবং আর কোন সম্ভাবনা না থাকায় মিঃ জিন্না আপনা হইতেই তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন।

লীগ মনোনীত পাঁচজন সদস্য, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ, মিঃ আব্দুর রব নিস্তার, মিঃ আই-আই-চুন্দ্রীগড় মিঃ গজনফর আলি খাঁ ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে ১৫ই অক্টোবর তারিখে গভর্ণর অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য বলিয়া ঘোষণা করেন। লীগ মনোনীত হইয়া যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান এক অভাবনীয় ও আশ্চর্য ব্যাপার। বাঙলার লীগ মন্ত্রিসভার সহিত যখন এখানকার বর্ণ হিন্দুরা অসহযোগিতা করেন, তখন তিনি লীগকে ত্যাগ করিয়া গবর্ণর ও তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এমন কি ১৬ই আগষ্ট তারিখে লীগের যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কলিকাতার ইতিহাসে এক ভয়ঙ্কর কালি মাখিয়া গেছে, তিনি বাকি সেদিন গভর্ণমেণ্টে লীগের সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভা করিয়াছিলেন। এহেন যোগেন্দ্রনাথ

সকল লীগ দেশের যোগ্য পুরস্কার হিসাবে বাঙলা হইতে টিট্‌কারিয়া মন্ত্রিত্বের গদিতে পিছা পড়িলেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে, লীগ কেবল মুসলমানের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। এতদিন পর্যন্ত এই লীগ নিজেদের সকল মুসলমানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়াই কংগ্রেসের সহিত লড়িয়া আসিতেছিলেন। এখন হঠাৎ নিজেদের পক্ষ হইতে একজন অমুসলমান ভপশীলীকে মনোনীত করিয়া বসিলেন। লীগ নিজেকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান জানিয়াও লীগের এই অযোগ্যতাকে বড়লাট এবং সম্রাটই বা সমর্থন করিলেন কেমন করিয়া?

এই ব্যাপারে স্বতঃই সন্দেহ হয় যে অন্তর্বর্তী সরকারে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিবার জন্যই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এইরূপ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে খান আবদুল গফুর খান স্পষ্টই জানান যে—লীগ গণ্ডগোল পাকাইবার জন্যই বাঁকা পথে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা বাহির হইতে আসিয়াও এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি জানাইলেন—লীগের জন্য নির্দিষ্ট ৫টি আসন হইতে ১টি আসন হরিজনকে দেওয়ায় লীগের স্বরূপটার পরিচয় পাওয়া যায়; অর্থাৎ ইহা তাঁহারা হিন্দুর সহিত সংগ্রাম করিবার জন্যই অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছেন।

যাহাই হউক, লীগ অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করায় মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন সম্ভব করিবার জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, মিঃ আসফ আলি ও সৈয়দ আলি জাহীর পদত্যাগ করিলেন এবং মৃতন করিয়া বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু এই সময়ে সীমান্তের উপজাতি অঞ্চলে ব্রহ্মদের উস্কানী হওয়ায় বন্টন ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে।

মৃতন গবর্ণমেণ্টের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হিসাবে পণ্ডিত নেহরু ১৩ই অক্টোবর সীমান্ত অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হন। উপজাতিরা তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানায়। কিন্তু (পলিটিক্যাল এজেণ্টস) প্রয়োচনায় সরল উপজাতিদের অধিকাংশ পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার সহযোগী খান আবদুল গফুর খান ও ডাঃ খান সাহেবের উপর অত্যন্তভাবে আক্রমণ চালায়। ফলে উপজাতি অঞ্চল ভ্রমণ দিন তিন জন্যই স্থগিত রাখিতে হয়। এই সময় উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব কংগ্রেসের অহিংস আদর্শের যথার্থ পরিচয় দেন, যদিও তিনি তাঁহার সামরিক শক্তিকে আহ্বান করিলে ইহাদের সকলেরই প্রাণ যাইত।

অনেক ঘোরাঘুরির পর লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করিলেন বটে কিন্তু প্রকৃত সংগ্রামের ভেরী বাজিল না। সারা ভারত ব্যাপিয়া এই সংগ্রাম লাগিয়া রহিল। কিন্তু সকলকে স্তব্ধ করিয়া ভাগলপুর ট্রেণ পূর্বাঞ্চলের ঘটনা। কলিকাতার সাময়িক হত্যাকাণ্ডও ইহার নিকটে অতি তুচ্ছ হইয়া পড়িল।

পণ্ডিত নেহরু সীমান্ত সফর শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ফলে অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিলে বৈঠকে পূর্বাঞ্চলের অরাজকতা ও মুসলীমলীগের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান সম্পর্কে আলোচনা হয়। বাংলার এই সর্বাত্মক বর্বরতার তীব্র নিন্দা করা হয়। অন্তর্বর্তী সরকার সম্বন্ধে লীগ সহযোগিতার ভাব লইয়া কাজ করিবেন কিনা লীগের নিকট হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয়। লীগ বড়লাটের নিকট এই প্রতিশ্রুতি দিলে পরে অক্টোবর দ্বিতীয়ভাগে ভাবে বন্টনসমূহ বন্টন করা হয়—

মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ—অর্থ
মিঃ আই, আই, চুন্দ্রীগড়—বাণিজ্য
মিঃ আবদুর রব নিস্তার—ডাক ও তার
মিঃ গজনফর আলি খাঁ—স্বাস্থ্য
মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল—শ্রমিক
ডাঃ জন মাথাই—শিল্প ও সরবরাহ
মিঃ রাজাগোপালাচারী—শিক্ষা ও চারুকলা
মিঃ স্বামী—পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ

নিম্নের মন্ত্রীদের কোনও রদবদল হইল না, পূর্বের মতই রহিল—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—পররাষ্ট্র
সর্দার প্যাটেল—স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও বেতার
ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ—খাদ্য এবং কৃষি
মিঃ আসফ আলি—যাতায়াত ও রেলওয়ে
সর্দার বলদেব সিং—প্রতিরক্ষা
মিঃ জগজীবন রাম—শ্রমিক

পরদিন লীগের ৫ জন মুসলমান মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ দপ্তরভার পরিবর্তন করেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল হাসপাতালে নিজ দপ্তর গ্রহণের কথা জানাইলেন।

এবার কংগ্রেসের নেতৃত্ব হাতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইয়াছে; ইতিমধ্যেই বিশ্বের দরবারে ইহা যথেষ্ট সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতের সম্পূর্ণ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মন্ত্রিগণ যথাযথ কার্যাবলী প্রণয়নে ব্যস্ত রহিয়াছেন। পূর্ব কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের স্বার্থকে প্রথম বলিয়া কখন চিন্তা করেন নাই। অন্তর্বর্তী সরকারকে দেশের খাদ্য, বস্ত্র, বেকার সমস্যা, শিল্প, ব্যবসা প্রভৃতি বহু গুরুতর বিষয়ের সমাধান করিতে হইবে। লীগ বর্তমানে কংগ্রেসকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁহারা এই প্রতিশ্রুতি কতদূর রক্ষা করিবেন বলা কঠিন। লীগ সত্যই যদি কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করেন, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতেই এই দ্বৈত শক্তি এক ঐক্য ভারতের সৃষ্টি করিয়া বিশ্বের সম্মুখে ইহাকে এক আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারেন।

দাঙ্গা ও গীতা পাঠ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এসসি

প্রথম অধ্যায়—অর্জুনবিষাদ যোগ। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আত্মীয় বন্ধুজনের বিনাশ ভাবনায় অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হইলেন, বলিলেন এরূপ যুদ্ধ করা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া খাওয়াও ভাল (হেথো ভোজ ন ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে)। অর্জুন একবারে non-violent ভাব ধারণ করিলেন, বলিলেন—

যদি মামপ্রতিকারং অশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।

ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।গী-১।৪৬ শ্লো।

যদি প্রতিকারপরাঙ্মুখ অস্ত্র আমাকে শস্ত্রপাণি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ রণে হনন করে তাহা আমার পক্ষে ক্ষেমতর হইবে।

এই চিত্রের মধ্যে একটী আধুনিক চিত্র। non-violent (পাণ্ড) বীর, পেটের সামনে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া; সম্মুখে রাস্তায় গুণ্ডাদল লাঠী ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রে শোভিত হইয়া আস্ফালন করিতেছে। ভিতরে ছেলেমেয়েরা ক্রন্দন করিতেছে। শান্ত রোধকারী (non-violent resister) নিহত হইলে সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইবে, মেয়েছেলেরা বিধবা হইবে—অথচ মেয়েরা হত্যা অপেক্ষাও মৃত্যুসহস্র দুর্গতি ভোগ করিবে। শান্ত রোধকারী বলিলেন—হে গুণ্ডাদল, তোমরা এই পাপ কার্য্য হইতে বিরত হও—বক্তৃতা শেষ হইতে পারিল না, এক ইঁট, তার পর এক ঘা লাঠী, তার পর ছোরার আঘাত—।

দুর্ভাগ্যক্রমে মহাত্মা গান্ধীর কোনও শিষ্য বা ভক্ত বঙ্গদেশে শান্ত ভাবে কিরূপে গুণ্ডা দলকে শান্ত করা যাইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত দেখান নাই।

বঙ্কিমের আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও অনুশীলন (ধর্ম্মতত্ত্ব) এবং পণ্ডিত যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের বিবিধ লেখার দ্বারা প্রণোদিত অনুশীলন সমিতি ও অন্যান্য ব্যায়াম সমিতির প্রচেষ্টায় তীব্র বাঙ্গালী যুবকদের মেরুদণ্ড কিছু সোজা ও শক্ত হইতেছিল। পরবর্ত্তী non-violence প্রচারের ফলে আবার তাহাদের মেরুদণ্ড বক্র এবং ঘাড়-কলানি বাড়িয়া চলিয়াছিল।

একটা জাতির জীবন বহু বিষয় (factor) এর উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক নির্ণয় করিবে মহাত্মা গান্ধীর অনুকরণে মন ভারাক্রান্ত ও নিষ্ক্রিয় হওয়া কতখানি হিন্দু জাতির ক্ষতি বা ক্ষতি হইয়াছে।

অর্জুন যখন non-violent ভাব ধারণ করিলেন ভগবান তখন গীতার উপদেশ আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে গীতা আরম্ভ। ইহার পূর্ব্বের অংশ গীতার পৌরচন্দ্রিকা মাত্র। সুতরাং এই স্থান হইতেই গীতা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভগবান প্রথমেই বলিলেন—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ—ক্লীব বা কাপুরুষ ভাব ধারণ করিও না। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যক্তোত্তিষ্ঠ—ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যজিয়া উঠ। গীতার শেষ উপদেশোক্তি—করিষ্যেবচনং তব—তোমার কি অজ্ঞান সম্মোহ নষ্ট হইল? গীতায় অর্জ্জুনের শেষোক্তি—নষ্টো মোহঃ… স্থিতোস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব—আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে গতসন্দেহ হইয়াছি, তোমার কথা মত কার্য্য করিব—অর্থাৎ যুদ্ধ করিব। দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধিকাংশ আসই এই হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগের উপদেশ। কতকটা রাজসিক ভাবের উপদেশ—অধিকাংশ সাত্ত্বিক উপদেশ।

রাজসিক উপদেশ—অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে-মৃতম্। তথাপিত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি—যদি তুমি মনে নিত্যজাত এবং নিত্য মৃত হয় এরূপ ভাব—তাহা হইলেও তোমার শোক করা উচিত হয় না। জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যুঃ—জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। জন্মিলেই মরিতে হইবে মরিলেই জন্মিতে হইবে। অতএব এই অপরিহার্য্য বিষয়ে শোক করিবে কেন?

অর্জুনকে তর্ক দেখাইতেছেন—অকীর্ত্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম। সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে। যুদ্ধ পরাঙ্মুখ হইলে লোকে তোমার নিন্দা করিবে। মানীর ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখকর কি হইতে পারে?

লোভ দেখাইতেছেন—হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায়কৃত নিশ্চয়ঃ। হত হইলে স্বর্গ পাইবে জিতিলে মহীভোগ করিবে। অতএব যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠ।

সাত্ত্বিক উক্তি এ অধ্যায়ে বহু। সব তুলিব না। আত্মা নিত্য অবিনশ্বর এই ভাব। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। এই আত্মাকে শস্ত্র ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি দহন করিতে পারে না। ইহা জানিয়া তোমার শোক করা ঠিক নহে—তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি।

গীতায় আদর্শ পুরুষের বর্ণনা নানা স্থানে আছে। খুব সংক্ষেপে তুলিব।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ …

দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ মুক্ত। (২য় ৫৬ শ্লো) ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রেষ্ঠ গুণাবলির বর্ণনায় অভয়কে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে।

গীতার উপদিষ্ট উক্তিগুলি এই নির্ভয় ভাবের উপদেশ মাত্র। অথ কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা—উদ্ভব জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু (তুলনা—যেহেতু সৃষ্টে জন্মাদ্যস্য যতঃ)।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। ৭ অ। ৭ শ্লো।

ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর অন্য কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে, ব্রহ্মে সর্ববস্তুই তেমনি গ্রথিত আছে। অতএব কেহ বা কাহাকে ভয় করিবে এবং কেহ বা কাহাকে হনন করিবে। ব্রহ্মই সকল করেন আর কেহ কর্ত্তা নহে—নিমিত্ত মাত্র।

"মঙ্কেতে নিহতা পূর্ব্বমেব নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচী" (গী।১১ অ) ভীষ্মাদিকে আমিই পূর্ব্বে নিহত করিয়াছি তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।

কলিকাতায় নিরস্ত্র যাত্রার বিবরণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই সকল জানা গিয়াছে। স্ত্রৈণ ভাবাপন্ন লোক—গুণ্ডার সামনে অস্ত্র বন্ধনে করযোড়ে—হে বাবা রক্ষাকর ইত্যাদি ভাবে স্থিত ব্যক্তি—অনেক স্থলে সম্মান ও ধনপ্রাণ সহ বাচা গিয়াছে। কচিৎ প্রাণ পাইয়াছে, সম্পত্তি রক্ষা হয় নাই; স্থলে স্থলে স্ত্রীলোকদিগের সম্ভ্রমও রক্ষা হয় নাই। সাহসের সহিত যাহারা গুণ্ডাদের সহ যুদ্ধ করিয়াছেন তাহারা বহু স্থলেই অল্প প্রাণে বাচিয়াছেন—কচিৎ মরিয়াছেন। অতএব স্ত্রৈণ বর্জ্জনীয় —নির্ভীকতা অবলম্বনীয়।

আততায়ীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার অধিকার সকলদেশের শিষ্টাচারেই রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ পক্ষপাতী মনু পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন আততায়ী ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত হইলেও তাহাকে নিহত করিবে।

ভীষণভাবে (violently) গুণ্ডার আক্রমণ প্রতিরোধ করাটা কি উচ্চ নীতির অননুমোদিত? বল-তান্ত্রোল্লাস প্রচারের ফলে কেহ কেহ ঐরূপ ভাবেন। তাহার বিপক্ষে দুইয়ের কথা কহি।

গুণ্ডা আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। গুণ্ডার দেহটা বেশী, না তাহার আত্মা বেশী প্রয়োজনীয় বস্তু? ভীষণভাবে তাহাকে প্রতিরোধ করিলে নাক ভাঙ্গিতে পারে, হাত পা বা এরূপ অঙ্গ হানি হইতে পারে—অথবা তাহার প্রাণও যাইতে পারে। প্রতিহত হইলে গুণ্ডার আত্মা অনেক পাপ—নরহত্যা, লুণ্ঠন, শিশু হত্যা, স্ত্রীধর্ষণ—হইতে রক্ষা পাইল।

ভীষণভাবে আত্মরক্ষাকারীর এরূপ পুণ্যও আছে। গুণ্ডা যদি বেগে আক্রান্ত—যে জাতীয়—নির্ব্বাধায় তাহাকে হনন এবং তাহার বাটীতে অন্য অত্যাচার করা যাইতে পারে, তাহার লোভ বাড়িয়া যায়। কিন্তু প্রথম বারেই যদি সে বা যারা তাহা হইলে তাহার অন্যত্র আক্রমণ করিতে যাইবার স্পৃহা লোপ পায় বা কমিয়া যায়। অতএব ভীষণভাবে আত্ম-রক্ষাকারী অনেক লোকের রক্ষা বিধানের কারণ হইয়া পুণ্য অর্জন করে।

বাঙ্গালীদিগকে নির্ভীক হইতে হইবে। সকল স্বাধীন জাতির মধ্যে জনমত এমনভাবে গঠিত করা হয়—যে কাপুরুষ হইতে লোকে ঘৃণা পায়। বাঙ্গালা দেশে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হইয়া কি লাভ বা ক্ষতি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক। দাঙ্গার লাভ কথাটা শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইবে। বলিবে পাঁচ বন কোটি টাকা লুট হইল; আট বন হাজার লোক মরিল—লাভ কোথা?

আমার জীবনে যখন আট বন কোটী টাকা লোকসান বা আট বন হাজার লোক মরা কিছুই নহে। এই ত সেদিন দুর্ভিক্ষে ১-১৫০ লক্ষ লোক মরিয়া গেল। তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে কোটী টাকা উপার্জ্জন করিত।

বাঙ্গালী হিন্দুরা ভীরু এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক দাঙ্গার পর তাহাদের সাহস-নির্দ্দেশ (courage Index) বাড়িয়া গিয়াছে। চলিত কথা আছে "হোমেরি বিলিটাণী হামে বি বিলিটাণী" ইহাদের মধ্যে সখ্য সহজেই জন্মে। দুর্ব্বলের সখা কেহ চাহে না। দাঙ্গায় হিন্দুরা মুসলমানের সমকক্ষ হইলে সহজেই তাহাদের মধ্যে পুনরায় বন্ধুত্ব হইবে এবং সম্মিলিত হিন্দু মুসলমান একটী দুর্জ্জয় জাতি গড়িয়া তুলিবে।

বিপদের সাহিত্য যে লোকের কতটা সাহস বাড়ায় তাহা এই দাঙ্গায় স্বচক্ষে দেখিতেছি এবং জাপানী বোমা আক্রমণেও দেখিয়াছিলাম। উহার কলিকাতায় প্রথম বোমা বর্ষণের ফলে কতিপয় লোক হত হওয়ায় কলিকাতাবাসীরা দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। বিদেশে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া তাহারা কলিকাতা ফিরিয়া আসিল। আমার এক আত্মীয় তাহার মত কলিকাতায় বাটী পরিত্যাগ করিয়া মফঃস্বলে এক হীন আবাসে কয়েক মাস কাটাইয়া পুনরায় কলিকাতা ফিরিলেন। পরে খিদিরপুরের বোমা বর্ষণের ফলে যখন শত শত লোক মরিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এবারে পলাইয়াছিলেন কবে? তিনি বলিলেন, যা থাকে অদৃষ্টে—এবারই আর কলিকাতা ছাড়িতেছি না।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সাহসই জাতির উন্নতির একমাত্র উপায় নহে। জার্ম্মাণীর অসাধারণ সাহস ও বলবত্তা ছিল, তা সত্ত্বেও তাহার পতন হইল কেন? আমাদের নারায়ণের প্রধান মন্ত্র আছে "জ্ঞানবিত্তায় কৃষ্ণায় নমঃ"। গীতাতেও আছে—"জগবানের প্রিয় তিনিই যিনি সর্ব্বভূত হিতে রত" (গীতা বারদশ অধ্যায়)। জার্ম্মাণ জাতি এই "জগদ্ধিত চিন্তা" বা "সর্ব্বভূতহিত চিন্তা" ছাড়িয়া শুধু "আত্মহিত চিন্তা" সেই পূজা করিয়াছিল তাই তাহাদের আত্মহিত লাভ ও হয় নাই।

সৌভাগ্যক্রমে মহাত্মা গান্ধি পরিচালিত কংগ্রেস এই জগদ্ধিতচিন্তা ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। গান্ধির চিন্তার মধ্যে মুসলমান বিদ্বেষের স্থান নাই, এমন কি গুণ্ডাবিদ্বেষেরও স্থান নাই—যদি চ গুণ্ডাকে বাধা দিতে হইবে সত্য।

যাহার অনুগ্রহে বহুলোকের মঙ্গল তাহার অনুগ্রহ অনিবার্য্য। সর্ব্বশেষে আমাদের গীতার এই বাণী মনটি মনে রাখিতে হইবে :—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।

হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ সচমে প্রিয়ঃ। গী (১২ অঃ ১৫ শ্লঃ

যিনি কিছুতেই উদ্বিগ্ন হন না এবং নিজেও কাহারও উদ্বেগের কারণ হন না, যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনি আমার (ভগবানের) প্রিয়।

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

পঞ্চম দৃশ্য

মহেন্দ্রবাবুর বাটীর বাহিরের বারান্দা। অনুরাধা হাসিতেছে, বিক্রম গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে।

অনুরাধা। (হাসিতে হাসিতে) বাবুর। কী করে যে আপনি ডাক্তারি করেন তাই ভাবি আমি। আমি বাজী রাখতে পারি যে রুগী দেখতে গিয়ে নিশ্চয় তার সঙ্গে আপনি ঠাট্টা ইয়ার্কি জুড়ে দেন।

বিক্রম। কে আমার নামে তোমার কাছে লাগিয়েছে বল তো? ওরা বলে ঐ জন্যেই আমার পশার হল না। কিন্তু কী করব, রুগী দেখলেই আমার হাসির পেট ফুলে যায়।

অনুরাধা। রুগী দেখলে হাসি? তাও আবার একটু-আধটু কিম্বা করে হাসি নয়, হুহুকর হাসি পায়?

বিক্রম। হুঁ, তা পায়। চিকিৎসা করতে গিয়ে সব চিকিৎসা করতুম না, কিন্তু হাসি পায়।

অনুরাধা। কী করে? রুগী রোগের যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছে, তাকে দেখে হাসি পাবে কী করে?

বিক্রম। কেন পাবে না? তোমাদের প্রোফেসর যদি কলার খোসায় পা দিয়ে পিছলে পড়েন, তুমি হাস না? ওঁর বেরবার কথা ভেবে ছেড়ে দাও?

অনুরাধা। সে হল অন্য কথা।

বিক্রম। এও হল অন্য কথা। যন্ত্রণা তো আমার হচ্ছে না। প্রোফেসর পড়ে গেলে তোমার লাভ নেই, শুধু হাস। আমার বরং লাভের কথা, বাহোক দুটো টাকা চারটে টাকা হাতে আসবে। আমার হাসি পেতে বাধা কী? তাছাড়া দেখ বাপু, এক একটা রুগী আবার এমনি হোড়া যে দেখলে না হেসে তুমিও থাকতে পারবে না। এই ধর, হাঁটের যন্ত্রণা। কী রকম জানো তো?

অনুরাধা। উঃ, বলে মনে করিয়ে দেবেন না, মনে করলেও ভয় পায়।

বিক্রম। ঠিক তাই। মনে করলেই আমার হাসি পায়। গাল ফোলা, হয়তো নীচের ঠোঁট ফুলে পড়েছে, হয়তো একটা চোখ ছোট হয়ে গেছে, মুখের আদ্যোপান্ত গলাবন্ধ জড়ানো, একটা আধি ও অকৃত্রিম নকুড়ধানা। আবার হাঁ করতে বললে দুটো দাঁত 'ও' করেন, তখন তাঁর যন্ত্রণা দেখে হাসি চাপতে ঘর ছেড়ে পালানো ছাড়া আর উপায় থাকে? বল? তুমিই বল।

অনুরাধা। উঃ, আপনি এমন নিষ্ঠুর! আপনার নিজের নিশ্চয় হাঁটের ব্যথা হয়নি কখনও?

বিক্রম। হাঁটের ব্যথা আমার নিত্য সহচর। মানে অন্ততঃ একবার তো হবেই। তাই তো সে-সময় সাবধানে পথ হাঁটি, বেশ পানের দোকানের সামনে গিয়ে না পড়ি।

অনুরাধা। কেন? পানের হাওয়া হাঁটের পক্ষে খারাপ বুঝি?

বিক্রম। তা জানি না। কিন্তু পানের দোকানে আয়নি থাকে যে। যদি নিজের মুখটা দেখে চিনতে না পেরে হেসে ফেলি। সেটা বড় অশোভন হবে না?

অনুরাধা। (হাসিতে হাসিতে) আপনি ভেলোরাল ডাক্তার।

বিক্রম। জানি। একথা একজনরা বলেছিল বটে। সে বড় বিপদে পড়েছিলুম। একটি ছোট ছেলের নিউরোসের অসুখ, আমাকে ডেকেছে। বড়লোকের ছেলে, আদুর-দুদুর বয়স নেই। বাপ জানে কি দেবে, চাই কি, বাড়ীর সব রুগীই হাতে আসতে পারে। এমন উৎসাহের সঙ্গে হাত লাগালুম। মানে, হাত লাগালুম সেই সোনাগাল বয়স পর্যন্ত পৌঁছিতে। ফিলুম এক টিপুনি। ব্যস্। আর যায় কোথা। ছেলে উঠল এইসা করিয়ে—

অনুরাধা। কাঁদবে না? যা আপনার কাণ্ডির মতন লম্বা লম্বা আঙুল। তাতে আবার এমন উৎসাহ।

বিক্রম। ছেলে তো কাঁদিয়ে হেসে উঠল। সে কী হাসি! জানো তো, হাসি বড় বিশ্রী ছোঁয়াচে রোগ। ফলে রুগীও ঘর হাসে, আমিও তত হাসি। হাসি আর থামে না। হাসির চোটে আমার মনে হল হার্নিয়ার জোগাড়, আর রুগী। চোখ উল্টেছে কপালে। শেষে ছেলের এক দাড়িওলা সিপাই এসে আমাকে ঘাড় ধরে টেনে তুলে দেয়, তবে রুগীর পেট থেকে আমার হাত ওঠে, রুগী বাঁচে। মানে, হাসতে হাসতে পেট থেকে হাত সরাতেই ভুলে গেছি—(অনুরাধা উচ্চ-খিলখিলভাবে হাসিতে লাগিল)

অনুরাধা। বেশ করেছেন, ডাক্তার বড়, খুব আপনি—

ভরত প্রবেশ করিল। বিক্রমের সহিত অনুরাধার এই সময় ও কৌতুকোজ্জ্বল ঘনিষ্ঠতা তাহার আনন্দবর্ধন করিল না। তাহার মুখ গম্ভীর হইল।

বিক্রম। এই যে ভরতবাবু এসেছেন, ভালই হয়েছে। আসুন। আচ্ছা, আপনি তো একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি, বলুন তো, গালফোলা বেঁটেরুগী দেখলে আপনার হাসি পায় না?

ভরত। (গম্ভীরভাবে) সব আইন এখনও তো পড়া হয়নি আমার, তাই বোধহয় হাসি পায় না।

বিক্রম। (উচ্চহাস্য) বাঃ, বেশ বলেছেন। (হাসিতে হাসিতে

উঠিল) আচ্ছা, আপনারা গল্প করুন, আমি একবার ওঘর থেকে আসি। ডাক্তারবাবু এলেন বোধহয়, দলা পাঠিয়ে দেব। প্রস্থান

অনুরাধা। বসুন জয়ন্তদা।

জয়ন্ত। না, আমি বসবার জন্যে আসিনি। তোমার বাবার খবরটা দেবার জন্যেই এসেছিলুম। চলুম।

অনুরাধা। তা, খবর না জিজ্ঞাসা করেই চলেন?

জয়ন্ত। খবর জিজ্ঞাসা করবার দরকার হল না। ভালই আছেন নিশ্চয়, নইলে মেয়ে এমন হাস্যমুখরা হয় কী করে?

অনুরাধা। বীরদার ডাক্তারির বিবরণ শুনে হাসছিলুম। বেশ লোক বীরদা নয়?

জয়ন্ত। হুঁ।

অনুরাধা। এত সিরিয়াস আর এমন কাজের লোক তো। অথচ এত হালাতে পারেন।

জয়ন্ত। হুঁ। তা দেখছি।

অনুরাধা। আর এমন সাদাসিধে। কোনও চাল নেই। কাল কী মজা হয়েছে জানেন? বাসুঠাকুরুনের জ্বর হয়েছিল বলে আমি আর মিথি রান্না করছি। ওদিকে বাবার তো অসুখ, চব্বিশটি বাটী মিথিকে চাই। বীরদা এসে তোর ঘরে মিথিকে উঠিয়ে দিয়ে বসে গেলেন ফলী বলতে। সে যা সব ফলী বলল—(হাসিতে হাসিতে) আপনি যদি দেখতেন—

জয়ন্ত। বাঁ, তাহলে খুবই ভাল লোক বই কি, ফলী বলতে পারেন—

অনুরাধা। সত্যি। উনি না এসে পড়লে কী যে করতুম আমরা, তা জানি না। বাবার হঠাৎ ঐ রকম বাড়াবাড়ি হয়ে উঠল, আর আমরা দুটো মেয়ে তো মারা যাচ্ছিলুম। মিথি বলল, বীরদাবু ঘরে এসে ঢুকলেই মনে হয় আর ভয় নেই।

জয়ন্ত। মিথি কী বলেন সে কথার দরকার কী? তোমার নিজের কথাই বল।

অনুরাধা। আমার তো চমৎকার লাগে। মনে হয় যেন সত্যিই কত আপনার লোক। ক সপ্তাহ নয়, কত বছরের চেনা যেন।

জয়ন্ত। তাই আজকাল তোমার দেখা পাওয়া যায় না, না?

অনুরাধা। বাবার কাছে থাকি যে।

জয়ন্ত। তা তো থাকবেই। আর যখন বাবার কাছে না থাকো, তখন বীরদা আছেন। চমৎকার লোক। আচ্ছা, আমি চলনুম।

অনুরাধা। আমিও যাই, বাবার কাছে। ডাক্তার এসেছেন। (জয়ন্ত সেন না দেখিয়া) আমাকে কিছু বলবেন কি?

জয়ন্ত। না, সে এমন কিছু নয়। আমি চলি।

অনুরাধা। তাহলে কাল বলবেন? এখন—

জয়ন্ত। বাঁ, এখন তুমি যাও।

অনুরাধা চলিয়া যাইতেছিল; জয়ন্ত ডাকিয়া বলিল

অনুরাধা ওদিকে ফিরিতে ফিরিতে

জয়ন্ত। কাল আমি আসব না, অনুরাধা। আমি চলনুম।

তাহার গলিবার ভঙ্গী ও সুর শুনিয়া অনুরাধা বিস্মিত হইল

অনুরাধা। কাল আসবেন না? কবে আসবেন?

জয়ন্ত। তা বলা যায় না। নাই যদি আসি—

অনুরাধা। ও কী কথা জয়ন্তদা?

জয়ন্ত। না, কথা এমন কিছু নয়।

অনুরাধা। না, আপনি বলুন। কী বলবেন বলছিলেন বলুন—

জয়ন্ত। না, আর কথা কইব না, জিব দিয়ে কথা অনেক করেছি, এবার দেখি যদি হাত দিয়ে কথা কইতে পারি। (অনুরাধা বিস্মিত হইতে চাহিয়া রহিল) অনুরাধা, ফুলের মালার লোভে নন্দন করেছি। অন্য মালা ফুটবে কিনা জানি না। কিন্তু যদি ফোটে তখন তোমার মনে থাকবে কি? কে জানে। দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

অনুরাধা কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভিতরে প্রস্থান করিল। প্রবেশ করিল নীলমণি ডাক্তার ও বিক্রম।

নীলমণি। আপনি তো বুঝতে পারছেন ডাক্তার ঘোষ, এখন ভেসে কিছুমাত্র ভরসা নেই। প্রেসারটা আরও খানিক বাড়ুক তবে কতকটা—

বিক্রম। তাইবা কতক্ষণ বলুন। যে রকম টেম্পারামেন্ট আর অন্যান্য উপসর্গও যা, তাতে প্রেসার বেশ উঠে ছেড়েই যা কতক্ষণ?

নীলমণি। এক্জ্যাক্টলি সো। ইট্ মে গো আপ্, এবি মোমেন্ট্। তাইতো বলছি, তার এখন যোল আনাই—

রাধার প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়া ডাক্তার কথা চাপিয়া বলিল—

এই যে আসুন। ওষুধ খেলেন উনি?

রাধা। বাঁ, অনেক কষ্টে খাইয়েছি। কিন্তু ভয়ের কথা কী বলছিলেন ডাক্তারবাবু?

নীলমণি। বাঁ, বলছিলুম ডাক্তার ঘোষকে যে—অবশ্য যোল আনাই ভেবে রাখি, কিন্তু এখনও খুব সাবধানেই রাখতে হবে।

রাধা। খুব সাবধানেই তো রেখেছি। কিন্তু কথা শোনেন না যে বাবা, খালি উঠতে চান, খালি কথা কন—

নীলমণি। আসল সাবধানতা ঐ যা বলছি—কোনও রকম দুশ্চিন্তা উদ্বেগ ওঁকে করতে দেবেন না। ওষুধ এও এসেনশিয়াল যাচ্ছে ব্লাড-প্রেসারের বাড়ো আমা কারণ। ঐদিকে খালি লক্ষ্য রাখবেন, যাতে উনি সর্বদা প্রফুল্ল থাকেন, আর রাত্রে ঘুমোতে পারেন। আপনাদের দিক থেকে অবশ্য দুশ্চিন্তা বা অসন্তোষের কারণ কখনও ঘটবে না, তা আমি জানি। তবে বাইরের বা বৈষয়িক কোনও ডিস্টার্বিং নিউজ যা কানে ওঠে, এই আর কী। আচ্ছা, ওঠ্ঘাই চটা যোব।

রাধা নমস্কার করিল।

বিক্রম। আপনার ঐ ওষুধটা আমি নিজে দেখছি কোথায় পাওয়া যায়।

রাধা আঁচল হইতে টাকা বাহির করিয়া দিল, বিক্রম

ডাক্তারকে দর্শনী দিল

নীলমণি। থ্যাঙ্ক্। বাঁ, ও ওষুধটাতে কয়েকটা কেমিক্যাল আমি খুব ভাল মত পেয়েছি। ওটা আনিয়ে নিব। প্রস্থান

ডাক্তারের সঙ্গে কয়েক পদ দিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া ফিরিয়া বিক্রম দেখিল, রাধা একদৃষ্টিতে চিন্তাকুলমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

বিক্রম। কী ভাবছেন?

রাধা। আমার ভাববার কি কুলকিনারা আছে বীরবাবু? যাক, সে তো আছেই। আপাততঃ ভাবছিলুম ভগবান বিপদে ফেলেন অকস্মাৎ বটে, কিন্তু যখন উদ্ধার করবেন মনে করেন, তখন তার ব্যবস্থাও করে রাখেন অলক্ষ্যে।—বাবার এই যে অসুখ বাড়লো, ঠিক এই সময় যদি আপনি না এসে পড়তেন, তাহলে কী যে হত তাই ভাবছি। আপনি যা করেছেন—

বিক্রম। তা যে কোনও লোকই করতো। অতএব ও নিয়ে মিছে ভেবে মাথা খারাপ করবেন না।

রাধা। যে কোনও লোকই করতো কিনা বলতে পারি না। তাঁর একটা কথা আমার মনে পড়ছে। আপনার সম্বন্ধেই তিনি একদিন বলেছিলেন যে, যদি এমন দিন আসে যে আমি নেই আর ও আছে, তা হলে তোমার কথা ভেবে আমি দুশ্চিন্তা করব না, এটা ঠিক।

বিক্রম। পাগল, পাগল ছিল সে। (হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু কণ্ঠে হাসি ফুটিল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিবার পর) ওঁর কাছে কে আছে? অনু?

রাধা। হ্যাঁ।

বিক্রম। তাহলে আপনার সঙ্গে একটা কথা করে নি।

বলিয়া বিক্রম রাধা নীচু করিয়া কী চিন্তা করিতে লাগিল।

রাধা সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া—

রাধা। কী কথা বলছিলেন?

বিক্রম। হ্যাঁ, বলি। কী করে বলব তাই ভেবে ঠিক করতে পারছি না। কিন্তু বলতে হবেই। আমাকেই বলতে হবে। আপনি বসুন।

রাধা। (উদ্বেগে কণ্টকিত হইল, বসিল না) না, আপনি বসুন আগে। কী কথা? বাবার কথা কি?

বিক্রম। ব্যস্ত হবেন না। আপনার বাবার কথাই বটে, কিন্তু তার সঙ্গে আপনার কথা, আমার, আমাদের সকলের কথাই আছে।

রাধা। বলুন।

বিক্রম। এই যে ডাক্তারবাবু বলেন আপনাকে, তার আর নেই, সেটা আপনাকে আঘাত দেবার জন্যে। উনি আপনাকে চেনেন না, কিন্তু আমি তো চিনি। ও বৃথা আঘাতে অন্য মেয়েরা এরোজন থাকতে পারে, আপনার নেই। তার এখনও যথেষ্টই আছে।

রাধা। কিন্তু ডাক্তারবাবু তো হার্ট দেখে বলেন হার্ট ভাল আছে।

বিক্রম। সেটা মিছে আশ্বাস নয়, সেটা সত্যি। হার্ট ভাল আছে। কিন্তু এই হাই ব্লাড্‌প্রেসার আর তার সঙ্গে এরকম এক্‌সাইটেব্‌ল্ নার্ভ্‌, এ দুটোর ওপর যে মোটেই ভরসা নেই। এতে হয় কী, সামান্য কারণেই—যাক—

রাধা। তা ব্লাড্‌প্রেসার কি নামানো যায় না বীরবাবু? কী করলে নামতে পারে, বলুন?

বিক্রম। সেই চেষ্টাই তো করতে হবে আমাদের। আর তারই জন্যেই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা। নীলমণিবাবু কী কার জানবেন রোগের মূল কোথায়? উনি রোগীকে ওষুধ দিয়ে, আর তাঁর আত্মীয় স্বজনকে আশ্বাস দিয়েই খেলেন। কিন্তু আসল চিকিৎসা আপনাকেই হাতে নিতে হবে, মিসেস সেন।

রাধা চিন্তার কৌতূহলে শঙ্কিতচিত্তে, কথা কহিল না।

আজ দু সপ্তাহ উনি বিছানায় পড়ে আছেন, কিন্তু প্রকৃত রোগ উনি এক মুহূর্তের পাচ্ছেন না। কারণ ওঁর মনের বিশ্রাম নেই এক মুহূর্ত। মনের কাঁটা ওঁকে পাগল করে তুলেছে। কী সে কাঁটা জানেন মিসেস সেন?

রাধা। জানি। আমিই ওঁর সকল রোগের, সকল কষ্টের কারণ, তা জানি বই কি বীরবাবু।

বিক্রম। জানেন, কিন্তু সবটা জানেন না। আপনার দুর্ভাগ্য ওঁকে অসুস্থ করেছে, কিন্তু সেই অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলেছে ওঁর অতুল চিন্তা—উনি আপনার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়তে চান।

রাধা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

উনি আপনার আবার বিয়ে দিতে চান।

রাধা। আমার বিয়ে? বাবা আমার বিয়ে দিতে চান? এ কী অসম্ভব কথা বলছেন বীরবাবু?

বিক্রম। অসম্ভব, সেটা আপনার আমার চেয়ে আপনার বাবা কম জানেন না। সেই অসম্ভবের চিন্তাই তো পাগল করে তুলেছে ওঁকে। ঐ অসম্ভবকে সম্ভব করবার জন্যে উনি সম্ভব অসম্ভব কত প্ল্যান করছেন আর ভাবছেন রাত্রি দিন, চব্বিশটি ঘণ্টা এবং ঘণ্টাই এই অসাধ্য সাধনের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, তাতই রোগ ওঁকে বেড়ে ধরছে। আমার সঙ্গে তো অন্য কথাই নেই।

রাধা। বাবা এই কথা বলেন! সে সঙ্কল্প শেষ করে দিতে বলেন বাবা? রাধা এরই মধ্যে তাকে ভুলে গেলেন? তাকে যে অত ভাল—

বিক্রম। ভুল করবেন না, মিসেস্ সেন। তাকে হারিয়ে ওঁর যা অবস্থা, এক মাত্র ছেলে হারালে কোনও বাপের অবস্থা তার চেয়ে খারাপ হয় কি না আমি জানি না। কিন্তু আপনার কথাও তো উনি ভুলতে পারছেন না। আপনার সারাটা জীবনের কথা—

রাধা। অসম্ভব।

বিক্রম। সম্ভব হলে কি রোগ বাড়তো? না, সমস্যা এত জটিল হত?

রাধা। কিন্তু—আমি কী করব? আমার তো কিছু করবার নেই বীরবাবু? এ যে কানে শুনলে পাপ হয়। আমি কী করতে পারি?

বিক্রম। বলছি। কিন্তু তার আগে আপনার বাবার ইচ্ছের বাকীটুকু বলি। আপনার তিনি আবার বিয়ে দিতে চান, পাত্রও ঠিক করেছেন। কাকে জানেন?…আমাকে।

রাধা। আ-আপনাকে?

বিক্রম। হাঁ। আমাকে। কেন নয় বলুন? আমার বাপমা আত্মীয়স্বজন কেউ নেই যে এ রকম বিয়েতে বাধা দেবে। দুটো পাঁচশা রোজগার করেও আনছি, অন্ততঃ আমার চেয়ে কম রোজগার করেও লোকে সংসার করছে। তা ছাড়া আমাকে পাত্র স্থির করার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে—আমার সঙ্গে আপনার এই—মানে—এই বন্ধুত্বের সম্বন্ধ। উনি জানেন আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আর আপনিও আমাকে বন্ধুভাবেই দেখেন।

রাধা। বাবার এই ইচ্ছে? আর আপনিও তাতে সম্মতি দিয়েছেন?

বিক্রম। আমার সম্মতির কথা তো আসে না, আমার মতামতের কথাও আসছে না। আপনার বাবার মনের ইচ্ছের কথাই বলছি। তিনি চান আপনাকে সুখী দেখতে, তিনি চান এতদিন যেন আমার আপনার মুখ হাসি ফোটে, সংসারের দিকে মন ফেরে আপনার। হয় তো আমি পারি সেই মন ফেরাতে—, এই তিনি আশা করেন।

শুনিতে শুনিতে রাধার মুখ কঠিন হইল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইল।

রাধা। আর আপনি? আপনিও তাই আশা করেন? বলেছেন বাবাকে?

বিক্রম। তা বলিনি; তবে এ-ও বলতে পারি নি যে এ আশা তাঁর দুরাশা।

রাধা। (তীব্র কণ্ঠে) আপনি তাঁর দায়া জীবনের বন্ধু ছিলেন, আমার এই অসহায় অবস্থায় আপনাকেই একমাত্র বন্ধু বলে মনে করে আপনার সঙ্গে মিশেছি, আর আপনি মনে মনে আমার সম্বন্ধে—

বিক্রম। ও কথা বলবেন না, ও কথা বলবেন না মিসেস সেন। ছি ছি ছি ছি। আপনি এত বড় ভুল করলেন কী করে। আমার কথাই আসছে না। আমার কোনও আকাঙ্ক্ষা, কোনও উচ্চাশা নেই, ঈশ্বর জানেন। আমি শুধু আপনার বাবার তীব্র আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথাই বলেছি।

রাধা। সে আকাঙ্ক্ষা যখন পূর্ণ হতে পারে না আপনি জানেন, তখন এ সব কথা আমাকে শোনাচ্ছেন কেন? আমি কী করতে পারি?

বিক্রম। অভিনয়।

রাধা বুঝিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

ওঁর সময় কত ছোটবড়, কত হাঁসি, তা বুঝতে পারছেন না? আপনার বাবার বিয়ে দিতে চান, কিন্তু তা দিতে গেলে আপনাকে আগে জানাতে হয় যে আপনি—আপনি—

রাধা। বুঝেছি। আমার সর্বনাশের খবর আমাকে আগে জানাতে হয়। তাও পারছেন না।

বিক্রম। পারছেন না। কারণ, তারপর যদি আপনি বিয়েতে রাজী না হন। তার চেয়ে তো আপনার বর্তমান অবস্থাই ভালো, দুর্ভাগ্যের কথা না জেনে আছেন সেই ভালো, যতদিন এমনই কাটে…

রাধা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল

রাধা। তাই আমাকে অভিনয় করতে হবে যেন আপনার প্রতি—

বিক্রম উত্তর দিল না।

না, না, সে হয় না, সে আমি পারব না।

বিক্রম। বেশ, পারতে আমি বলছি না। কিন্তু কেন পারবেন না বলুন তো? এ তো সত্য নয়। আমাকে বিশ্বাস করুন, যেদিন আপনার বাবা এই টানাটা সামলে উঠবেন, যেদিন আপনি আমাকে বলবেন আমার উপস্থিতি এখানে অনাবশ্যক, সেই দিন সেই মুহূর্তে আমি চলে যাব। বিশ্বাস করুন।

শুনিয়া রাধার দৃষ্টি কোমল হইল।

রাধা। সে আমি বিশ্বাস করি। সে কথা নয়। যেমন অভিনয় যদি বলেন, এতদিনও অভিনয়ই করেছি, তাতে প্রতারণা অবশ্য আছে, কিন্তু গ্লানি নেই। কিন্তু এ তো তা নয়। বাবার ধারণা—আমাকে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন, আমি কিন্তু জানি না। তা হলে আমি—আমি কেমন করে ও অভিনয়—, না, আমি পারব না, বীরুবাবু, ও আমি পারব না।

বিক্রম। (কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বাধা দিয়া বলিল) তা বটে, তাই বটে। এ আপনি পারবেন না, পারা উচিত নয়। আচ্ছা, থাক। আপনাকে কিছু করতে হবে না। কেবল আমার একটা অনুরোধ আপনি রাখতে পারবেন মিসেস্ সেন? সামান্য একটু অনুরোধ?

রাধা। আপনি অমন করে বলছেন কেন বীরুবাবু? আপনার চেয়ে বড় বন্ধু আর আমার—আমাদের কে আছে।

বীরু। তবে আপনার কথাতেই বলি। এই বন্ধুত্বটা তো অভিনয় নয়?

রাধা। না।

বীরু। সেই বন্ধু হিসেবেই বলছি। আপনার বাবার একটা বড় দুঃখ এই যে আপনাকে তিনি এই সংসার থেকে নির্বাসিত করে এই দীর্ঘকাল ধরে একটা বুড়ো মানুষের রোগশয্যার ধারে বন্দী করে রেখেছেন—

রাধা। আমার নিজেরই কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

বীরু। সে আমি জানি। আর এও আমি জানি যে আপনি কোথাও গেলেও ওঁর দুশ্চিন্তার অন্ত থাকবে না। কিন্তু আপনার নিরানন্দ বন্দী অবস্থা দেখেও খুশী হতে পারেন না। এই কি একটা মিসেস সেন?

রাধা। হুঁ।

বীরু। সেই জন্যে, ওঁকে প্রসন্ন রাখবার জন্যে আমরা, মানে আপনি, মনু আর আমি যদি মধ্যে মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গায়, এই এদিকে ওদিকে ঘুরে আসি, সেটা কি পারবেন না?

রাধা। কিন্তু ভালো লাগে না বীরুবাবু, আমার ভালো লাগে না। এই পোড়ামুখ পৃথিবীতে যার করতে আমার ইচ্ছে করে না। আচ্ছা, দেখব।

বীরু। তাই, উইল্ ডু। আচ্ছা, আমি একবার ওপরটায় যেয়ে দেখি, আর আমার বোর্ডিংটা ঘুরে আসব, দুটি একদু-টেন্‌সনের ব্যাপার ছয়েছিলুম, কোনও অসুবিধে এল কিনা—

চলিয়া যাইতেছিল—

রাধা। বীরুবাবু, দাঁড়ান। আপনার কাছে আমি অপরাধ করেছি। আমায় ক্ষমা করুন। (হাতজোড় করিল)

বীরু। ও কী? আমার কাছে অমন হাতজোড় করবেন না, (রাধার মুকুলের ধূলিয়া দিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিল, কিন্তু স্পর্শ করিবার ভয়ে নিরস্ত হইল) হাত খুলুন আপনি, হাত খুলে ফেলুন।

রাধা। আগে বলুন ক্ষমা করলেন।

বীরু। কী ক্ষমা করব মিসেস সেন? আপনার অপরাধ কী? আমিই কথাটা স্পষ্ট করে বলতে পারি নি।

রাধা। না, বীরুবাবু, অপরাধ আমার হয়েছিল বইকি, আপনাকে অনুরোধ করেছিলুম, আপনার সঙ্গে ছড়তাবে—

বীরু। ঠিক আছে, ঠিক আছে। উই আর ফ্রেণ্ড্। যান আপনি রোগীর কাছে গিয়ে বসুন। আমি ঘুরে আসি।

বিক্রম চলিয়া গেল। রাধা চিন্তাকুল মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বাহির হইতে দুই ব্যক্তির কথা শুনিতে পাওয়া গেল—

বিক্রম। (নেপথ্যে) আজ্ঞে হাঁ, এইটেই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী।

অন্তরঙ্গ। (নেপথ্যে) তা হলে ঠিকই এসেছি, তা—আপনি কি এইখানেই থাকেন?

বিক্রম। (নেপথ্যে) আজ্ঞে না, আমি জলপাইগুড়িতে থাকি। আমি ওঁর জামাইয়ের—

অন্তরঙ্গ। (নেপথ্যে) জলপাইগুড়ি? হাঁ, হাঁ, আর বলতে হবে না। আচ্ছা, তুমি এস বাবা।

মহেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু নিশ্চেশ্বর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পাকা মাথা, পাকা দাড়ি, পরণে ছোট ঝুলের মোটা খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের জামা, পায়ে জামা নাই, আজানু ধূলিধূসর পায়েচটি জুতা, এক হাতে পাকা আমড়ালের একটি ডাল, অন্য হাতে ছাতি ও লাঠি। বেশ দীর্ঘ, অমুদ ও বপু। তিনি রাধাকে সম্মুখে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—

নিশ্চেশ্বর। (স্বগতভাবে) এই যে রাধা মা, থাক, তা হলে ঠিক বাড়ীতেই এসেছি। বাবা কেমন আছে বল?

রাধা। (এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের প্রথম বিস্ময় কাটাইয়া) জ্যেঠামশাই! আপনি এসেছেন! (প্রণাম করিল) এ কী চেহারা হয়েছে জ্যেঠামশাই? বসুন, বসুন। (চেয়ার ঘুরাইয়া দিল।) ছিপ ব্যাগ দিন।

নিশ্চেশ্বর। না, না, ও থাক, আগে বল্ তোর বাবা, বাবা কেমন আছে?

রাধা। দিন পনের আগে একদিন অজ্ঞান মতো হয়ে—

নিশ্চেশ্বর। (অধীরভাবে) সে শুনেছি, শুনেছি। এখন? এখন কেমন আছে?

রাধা। এখন আগের চেয়ে কতকটা ভালো আছেন। এখানে না এলেন আপনি ভেতরে চলুন।

নিশ্চেশ্বর। আছে? আগের চেয়ে ভালো আছে তো? (ব্যাগ ও ছাতি লাঠি রাখিল।) তবে দাঁড়া, রিক্‌শাটার ভাড়া দিয়ে আসি। ওটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। মনে করেছিলুম, যদি—যদি মহিমধরটাকে দেখতে না পাই, তবে তোদের বাড়ীতেই আর—(নেপথ্যে রিক্‌শার ঘণ্টার শব্দ উঠিল। উচ্চকণ্ঠে বলিলেন) আরে যাচ্ছি রে বাবা যাচ্ছি। ওটাকে বিদেয় করে এসে বসি। অনেক গল্প আছে তোর সঙ্গে, মহিমধরের জন্যে ভাবনা নেই।

বলিতে বলিতে বাহিরে গেলেন। রাধা প্রশ্নে উজ্জ্বল মুখে অপেক্ষা করিতেছে।

মঞ্চ ঘুরিল

মহেন্দ্রবাবুর কক্ষ। খাটের উপর পীড়িত মহেন্দ্র ঘুমিত বদনে শুইয়া আছেন, মাথার কাছে দাঁড়াইয়া অনুরাধা হাওয়া করিতেছে।

মহেন্দ্র। (চোখ খুলিয়া) তুই সেই থেকে হাওয়া করছিস মা? থাক্, থাক্, হাত ব্যথা করবে যে।

অনুরাধা। হাঁ, আমি যেন কতি খুকী, এরই জন্যে হাত ব্যথা করবে। এই তো আসছি আমি।

মহেন্দ্র। তা হোক, আর হাওয়ার দরকার নেই। তুই যা, পাখা রেখে তুই আয়, আমার কাছে বোস।

অনুরাধা পিতার কোলের কাছে খাটের উপর বসিল। মহেন্দ্র উঠিয়া বসিতে উদ্যত হইলেন

অনুরাধা। ও কী, বাবা? তুমি কের উঠছ? ডিসি না অত করে বারণ করে গেল?

মহেন্দ্র। তোর ডিসির কথা ছেড়ে দে। এই বালিশটা একটু তুলে দে তো, হাঁ, এই হয়েছে। আঃ! কিন্তু এর পর? এর পর কে করবে আমার সেবা তাই ভাবছি।

অনুরাধা। কেন? আমরা তো রয়েছি। ভাবনাটা কী।

মহেন্দ্র। তোমরা আর কত কাল করবে মা। হাঁরে, রাধু কোথা গেল?

অনুরাধা। ঐ যে বারান্দায় বীরুবাবুর সঙ্গে কথা কইছে। ডাকব দিদিকে?

মহেন্দ্র। বীরুর সঙ্গে কথা কইছে? না না ডাকতে হবে না, ডাকতে হবে না। তুই বোস।—আহা, বড় ভালো ছেলে বীরু। (মেয়ের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে) হাঁরে অনু, তোর দিদি চলে গেলে তুই আমায় সব ভার নিতে পারবি?

অনুরাধা। (সাগ্রহে) দিদি কোথা যাবে? শ্বশুর বাড়ী?

মহেন্দ্র। হুঁ।

অনুরাধা। কবে যাবে? জামাইবাবু কিরে যাচ্ছেন বুঝি? চিঠি এসেছে? কই দেখি?

মহেন্দ্র। না, না, চিঠি নয়। চিঠি কি আসে?

অনুরাধা। খবর পেয়েছ বুঝি? কবে দিদিকে নিতে যাবে? হ্যাঁ বাবা? কী ভাবছ?

মহেন্দ্র। তোর দিদি চলে গেলে আমার যে কী হবে তাই ভাবছি।

অনুরাধা। কেন? আমি তো আছি। আমি তোমার সব কাজ করব। দিদির মতন ভালো পারব না হয়তো, কিন্তু তাই বলে তুমি যেন দিদিকে পাঠাতে একটুও দেরী কোরো না। আমি সব করব। কী? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আমাকে?

মহেন্দ্র। না, তা নয়। কিন্তু, তুমিই বা ক'দিনের? মেয়ে পরের জিনিস, দু'দিন বাদে তুমিও তো পরের বাড়ী চলে যাবে। তখন?

অনুরাধা। (মুখ ভার করিয়া) না বাবা, আমাকে তুমি কিছুর জন্যে দিও না, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, তোমার কাছে থাকব আমি।

মহেন্দ্র। আমার কাছে ক'দিন থাকবি মা? আমি তো চলে যাব শিগ্‌গিরই। তখন কী করবি বল?

অনুরাধা। কাজের ভাবনা কী বাবা? আমি বেশের কাজ করব। বেশে কত কাজ রয়েছে, ছেলেরাই সব কাজ করবে, আর আমরা কেবল ঘরে বসে ভাবব, নয় গল্প করব? বেশের জন্য কিছু করব না আমরা?

(নিজের উৎসাহের আধিক্যে হঠাৎ লজ্জা অনুভব করিয়া থামিয়া গেল। অল্পকাল নীরব থাকিয়া পরে বলিল)—জামাইবাবু আসছেন, দিদিকে বলেছ বাবা?

মহেন্দ্র। (ব্যস্তভাবে) না, না, দিদিকে এসব কথা কিছু বোলো না যেন, খবরদার বোলো না। আগে দেখি খবরটা পাকা কি না। মিথ্যে আশা করা, সে বড় কষ্ট মা, সে বড় কষ্ট।

মহেন্দ্রর মাথার দিকের দরজা দিয়া রাধা ও শিবশেখর প্রবেশ করিল

রাধা। বাবা, কে এসেছেন বলতো?

মহেন্দ্র। এ কী। শেখর। তুমি এসেছ?

অনুরাধা। জ্যাঠামশাই!

(সে খাট হইতে নামিয়া একপাশে দাঁড়াইল)

শিবশেখর। হ্যাঁ, আমি এসেছিই তো। এবং আমিই এসেছি তো। কিন্তু তোমার মতলব কী বল তো মহিন্দর? তাড়াতাড়ি সরে পড়বে মনে করেছ?

মহেন্দ্র। রাধু, চেয়ারটা এগিয়ে দে। তাহলে তো বাঁচি রে ভাই। তাহলে বেঁচে যাই।

শিবশেখর। হুঁ। চুড়োন্ত হয়ে গেছে বুঝি? (রাধাকে চেয়ার আনিতে দেখিয়া) আরে রাখ্, রাখ্ তোদের চেয়ার টেবিল। আমি এই কম্বলে চেপে ধরিয়ান্ হয়ে, তারপর যা করতে পারিস কর, কেমন করে তাড়াস দেখি একবার।

বিছানার উপর চটীজুতা পায়ের উপর পা দিয়া বসিলেন।

অনুরাধা আসিয়া প্রণাম করিল

শিবশেখর। এই তো আমার ছোট মা রয়? আরে তুই যে বড় লম্বা হয়ে গেছিস এই দু'বছরের মধ্যে। একেবারে ডবল প্রমোশন পেয়ে পেছিস বাকি? কিন্তু শুধু পেলাম করলে তো হবে না। আমার খোরাক চাই। উঃ, কম খোরানটা ঘুরছি তোর বাবার এই অজ্ঞাতবাস আবিষ্কার করতে! চাকরটাকে ডাক না মা একবার, একটু খোরাক দিক।

অনুরাধাকে রাধা ইঙ্গিত করিল

অনুরাধা। আমি আনছি জ্যাঠামশাই।

অনুরাধা বাহিরে গেল। রাধা টেবলকে বাতাস করিতে প্রবৃত্ত হইল

শিবশেখর। কিন্তু হঠাৎ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এসে উঠ্‌লে কেন বল তো?

মহেন্দ্র। সে বলবো অখন পরে।

শিবশেখর। তাই বোলো, আমার তাড়া নেই।

মহেন্দ্র। কবে ফিরলে কাশী থেকে? তোমাকে আমার ঠিকানাই বা দিলে কে? অসুখের খবরই বা পেলে কোথায়?

শিবশেখর। ফিরেছি—তা দিন আষ্টেক হবে। হাওড়া ষ্টেশনে নেমেই আমাদের নীলু ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। তারই কাছে শুনলুম তোমার এই বেয়ারামির কথা। কেস্ হওয়াও চলছে। তাবলুম মহিন্দরটা অজ্ঞান তো বরাবরই, এবার আমার জ্ঞান যাচ্ছিয়ে হাতিক্যাপে আমাকে বুঝি মেরে দেয়। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

মহেন্দ্র। তা দেব ভাই, তোমাকে মেরে দেব। শেষ মারণটা এসে পেছি কিনিস্ দেখতে পাচ্ছি। তোমাকে মেরে দেব।

শিবশেখর। দাও মেরে, তোমার যদি তোমার কাছে। কিন্তু সে রকম কথা ছিল না।

রাধা। আট দিন কলকাতায় এসেছেন জ্যাঠামশাই, ডাক্তারবাবুর কাছে ঠিকানাও পেয়েছিলেন, আর আজ আসবার সময় হল আপনার? কে আসতে বলেছিল?

শিবশেখর। এই যে। মায়ের কোপে পড়লুম দেখছি! আরে, আসবার কী জো আছে মা! সে এক কোত্থেকে ঝঞ্ঝাট এল ঘাড়ে—ঝালাতন, ঝালাতন! বেলুড় ছিঁড়ে এক সন্ন্যা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা আর দেখতে দিলে না।

মহেন্দ্র। ঝঞ্ঝাটের তোমার তো অন্ত নেই কোনও দিনই। যত রাজ্যের ঝঞ্ঝাট কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করে ঘাড়ে নেবে। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় যে তোমাকে।

শিবশেখর। তাই বটে। কাশীতে গেছি শেষ ছুটোদিন নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে নিশ্বেস ফেলব মনে করে, তাও কি বিধাতা দেবে! এক ঘণ্ড কি পাড়ি আছে যে। বলে, তুমি যাও বলে, কপাল যায় সঙ্গে।

রাধা। কাশীতে কেমন ছিলেন জ্যাঠামশাই? ছয়মাসের পর তো কলকাতায় এলেন, না?

শিবশেখর। তা হবে, বছর দুই হবে বই কি। আছি খুব ভালো, চমৎকার আছি। মা অন্নপূর্ণা দুটো ভাত দিচ্ছেন, আর পায়াধিন কম্বল গায়ে জড়াচ্ছি। আমার ভাবনা কী?

মহেন্দ্র। আর এই করে কপাল যায় সঙ্গে। ঝঞ্ঝাট।

শিবশেখর। শোনো, বুড়োর কথা শোনো। ওষ্ঠাট যা তো কী? তুই হলে পাগল হয়ে যেতিস মহিমর, আমরা চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত পাগল হয়ে যেতিস।

মহেন্দ্র। তার জন্যে কাশী যেতে হয় না।

রাধা। আমি কিন্তুকে কাশী যাইবি। আমার বড্ড কাশী যেতে ইচ্ছে করে।

শিবশেখর। (পরম আগ্রহে) যাবি? কাশী যাবি? চল্, আমার সঙ্গে চল্। আমি পরশু যাচ্ছি। অমন জায়গা আর নেই, চ, মাসে গোরে যাওয়া যাক্। পরশু সন্ধ্যে ৮০২-এ গাড়ী, বুঝলি? তাহলে আমি এই সাড়ে ছ টা নাগাদ এসে তোকে তুলে নিয়ে যাব। কেমন?

রাধা। পরশু যাব কেমন করে জ্যেঠামশাই?

মহেন্দ্র। তুই যেমন পাগল রাদু। ও বুড়োর কি কোনও হিসেব আছে, না জ্ঞানগম্যি আছে। কল্লই হল—চল্, কাশী চল্।

শিবশেখর। তুমি থামো তো হে ছোকরা। কেন হবে না? আমি আমার কিরে আনছি তো দু তিন দিন পরেই। আমার সঙ্গে চলে আসবে। তুমি কিন্তু ভেবো না যা। আমি তোমাকে নিয়ে যাবই, এই বলে দিলুম। ও বুড়োর কথা ছেড়ে দাও।

রাধা। আমাদের যাওয়া কি অত সহজ জ্যেঠামশাই! আপনারা পুরুষ মানুষ, যত বুড়ো হন আর যাই হন, যখন ইচ্ছে যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারেন। আমাদের কি অত স্বাধীনতা আছে?

শিবশেখর। ঘটে ঘটে। আমারই ভুল। বুড়ো হওয়ার অনেক গুণ, কিন্তু একটা মস্ত দোষ—বয়সটা বেড়ে যায়, অল্প পশ্চাৎ থেয়াল থাকে না। যাযাবরীর মতটা একবার নিতে হবে বই কি। যাযাবরী বুঝি বেরিয়ে গেলেন? ঠিক আমিও চুকছি আর যাযাবরীও বেরোচ্ছেন, বুঝলে মহিমর?

মহেন্দ্র। না, না, শোনো—

শিবশেখর। আমি আসতে পারিনি, দেখিওনি। আর কেনই, চমৎকার জানাই তবে—

কথা চাপা দিবার জন্য মহেন্দ্র ব্যস্ত হইলেন।

মহেন্দ্র। শোনো মামা, ও শেখর, বলি তোমার দু তিন দিনের জন্যে কাশী ছোটবার কারণটা কী বল আমায়? এই তো এলে কত কাল পরে—

ইতিমধ্যে অনুরাধা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে প্রবেশ করিল, তাহার পিছনে গড়গড়া হাতে মধু। সে গড়গড়া রাখিয়া গেল। অনুরাধা তাহাতে কলিকা স্থাপন করিয়া নলটী শিবশেখরের হাতে তুলিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

শিবশেখর। দুদিনের জন্যে কাশী ছোটার কারণ? তবে আর গেরো বলেছে কেন? কতগুলো অপোগণ্ড কাচ্চা বাচ্চা দিলে আমার কি এক দণ্ড বিশ্রাম রেখে কোথাও? যত পাপের ভোগ এই আমার কপালে!

তিনি ধূম পানে রত হইলেন।

মহেন্দ্র। কাচ্চাবাচ্চা? কার কাচ্চাবাচ্চা? কী বকছ যে পাগলের মতো?

শিবশেখর। পাগলই বটে! এদের জ্বালায় পাগল হতে আর বাকী নেই। কাচ্চা বাচ্চা কি আমার একটা যে মহিমর? সাতটি মেয়ে আর গোটি—মা, মা, চারটি মেয়ে আর সাতটি—, কে জানে অত খেয়াল থাকে না, এই এতগুলিকে রেখে এসেছি ভাগিসে। আমার এই একটি এলেম এ সপ্তাহে। যাই এটাকে রেখে আসি বাড়ীতে।

মহেন্দ্রর বিস্ময় বাড়িল, বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিলেন—

মহেন্দ্র। এই সপ্তাহে এলেন? কার ছেলে? কত বড়ো ছেলে?

শিবশেখর। (উচ্চহাস্য) নাঃ, তুমি আমের বুড়ো হয়ে গেছ মহিমর, তোমার আর আশা নেই। বলছি এই সপ্তাহে এল, আর বলে কত বড়ো ছেলে!

মহেন্দ্র। কিন্তু কাদের ছেলে?

শিবশেখর। কাদের ছেলে তা কে জানে? আর জেনেই বা হুকিয়ে কী হচ্ছে বল? পড়ল তো আমার ঘাড়ে। দুর্গা'র আর কাকে বলে।

রাধা। (অল্প হাসিয়া) কিন্তু আপনার মুখ দেখে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন জ্যেঠামশাই? আপনার ঘাড়ে পড়ে নি, আপনিই যেন ঘাড় বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মহেন্দ্র। তাই বটে! আর লোক পেলে না, তোমার ঘাড়েই বা পড়ল কেন শুনি?

শিবশেখর। ঐ তো বলছি, মেয়ের জেরা। সিরেছিলুম কেদুর মঠে। বদ্যিনাথের চরণ দর্শন করতে। কলকাতায় এলেই যাই একবার, এইটুকু কৃপা আছে আমার ওপর। (উদ্দেশে প্রণাম করিলেন ও কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া বলিলেন—) মেয়েটাকে দুদিন আগে গঙ্গার ধারে বসিয়ে মুখ থেকে ওঁয়াই উদ্ধার করেছিলেন, হাসপাতালে অবস্থাও করে দিয়েছিলেন ওঁরা। সেইখানেই এলেন অপ্রার্থিত ঘর।

রাধা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

রাধা। তা আপনি কাকে বিয়ে যাচ্ছেন, ছেলের বাপ না—

শিবশেখর। বাপের খবর তো জানিনে মা, তবে মা হতভাগী বেঁচে গিয়েছে। তাকে আর বিষনাথের পায়ের তলায় টেনে নিয়ে যেতে পারলুম না। যেন আমার অপেক্ষাতেই ছিল। গঙ্গাতীরে যেই এসে আমা হয়েছিল, গঙ্গাতীরেই রেখে এলুম। যাক্, সেখানে পতিত-পাবন ঠাকুর আছেন, তাঁর কাছে সৎও নেই অসৎও নেই। পতিতাও যেমন, সাধ্বীও তেমন, সকল মেয়েই মা, সবাই জগৎজননীর অংশ। (নিজের মনেই বলিয়া যাইতেছেন, সেই ভাবের মুখে কেহ প্রশ্নের দ্বারা বাধা দিল না। নিজেই চুপ করিলেন। তথাপি পিতাপুত্রী কোনও সন্তুষ্য বা প্রশ্ন করিল না। পুনরায় বলিতে লাগিলেন—) আমার পায়ে ধরে কান্না। বলুম, আমার পা ছেড়ে দে মা, ছেড়ে দে। ঐ ওদের মণির দেখা যাচ্ছে, ওদিকে ফেরে দেখ। তোর ছেলের চিন্তা তনিই করবেন, ওঁর চিন্তাটা তুই কর। আশ্চর্যজনক ব্যাপার, যাকে চাইনি, যার আসার আগে মরতে ছুটেছিনু—তাকেই ফেলে যেতে কী কান্না।

শিবশেখরের চক্ষু যেন সেই পলাতীরবর্তী মৃত্যুমুখী জননীর শেষ ক্রন্দন পুনরায় প্রত্যক্ষ করিতে ছিল। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাষ্পকলঙ্কী চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া গেণ্ডের উপর ঝরিয়া পড়িল।

রাধা। ছেলেটিকে কার কাছে রেখে এলেন জ্যেঠামশাই?

শিবশেখর। কার কাছে আর রাখব মা, কে রাখতে রাজী হবে? বলে কয়ে দুটো দিনের জন্যে হাসপাতালেই রেখে এসেছি।

ক্ষণকাল সকলে নীরব রহিল।

মহেন্দ্র। শেখর, ভাই, তোমাকে কী বলব, তুমি মানুষ নও, তুমি—

শিবশেখর (বাধা দিয়া) তুই থাম তো মহিন্দর। আমায় বলে ভাববার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, একা মানুষ, বুড়ো বয়সে এই এক ভরন্ত কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কী বিপদে যে আমি পড়েছি তা আমিই জানি। বলে আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে! আমার হয়েছে তাই।

মহেন্দ্র। সত্যিই তো, অতগুলো শিশু, সব বেলা তোমা করছে কে? চালাচ্ছ কী করে?

শিবশেখর। আরে, বেলা তোমার ভাববা কী? সব ব্যবস্থাই তো আর অত সহজে বুঝি পায় না। আমার যেমন মা-হারা সন্তান আছে, তেমনই সন্তান-হারা মা-ও তো রয়েছে কত। আর নয়ার ওপোরে আছেন মা অন্নপূর্ণা। চালাচ্ছেন তিনি, ভাবছেনও তিনি। আমার কিসের ভাববা? যার কাজ সে কি আর ঘুমাচ্ছে যে মুখপু! সে আমার চেয়ে চালাক, এবংকি বোধহয় তোর চেয়েও চালাক, হাঃ হাঃ হাঃ···আমার ভাববা কী?

মহেন্দ্র। নাঃ, তোমার আর ভাববাটা কী। যথাসর্বস্ব ঈশ্বরেই ছেলে দিয়ে বুঝতে পারছি, আর বুড়ো বয়সে বিশ্ব-বিধিক ঘুরে মরছ, ভাববা আর কী!

অনুরাধার প্রবেশ

অনুরাধা। উঠুন জ্যেঠামশাই, পা ধোবেন চলুন।

শিবশেখর। (বিস্ময়ের ভান করিয়া) পা ধোবো? কেন? পায়ে তো কিছু দাড়াইনি। একটু ধুলো লেগেছে যাত্র।

অনুরাধা। দাই বা কিছু বাড়ালেন। চলুন হাতে পায়ে একটু জল দেবেন না?

শিবশেখর। (পরম লোভী বালকের মতো) ও—, বাবার বিধি বুঝি? যে মা, এইখানেই যে। অন্ন কিছে পেয়েছে। খুব মনে করিয়ে দিয়েছিস তো মা। ঠিকই যে, ঠিকই যে।

রাধা। (সহাস্যে) জ্যেঠামশাই তোর ঘাইজিন্ টাইজিন্ মানের মা অনু। তুই নিয়ে যা।

শিবশেখর। আরে মানব না কেন? উনি ও অন্যান্য অনেক পড়েছিস তো? উনিয়ের ভাববা করলে অন্যান্য অনেককে আর দেখতে হবে না। এ হল ঘাইজিনের ওপোর ঘোরতরজি, কথামালার শিক্ষা। হাতে পায়ে জল দেবার দরকার কী?

অনুরাধা। আপনি ভারি দেটুক হয়েছেন দেখছি জ্যেঠামশাই।

শিবশেখর। দেটুক বলিসনে মা, অত বীচ আমি নই। একটা কল আমার উষধা। সকলের সঙ্গেই ছুটিয়ে স্নান করে ফেরে-ফিরে যাই, পায়ে লেগেছে, উষধটিতামান্ দরকার ছুটিবকম্। (বলিয়া উদরে হাত বুলাইতে লাগিলেন।)

দুই বধূ অস্ফুট পরস্পরকে হাসিয়া ফেলিল

অনুরাধা। (হাসিতে হাসিতে) মানে কী জ্যেঠামশাই? দুইবার বাড়ী ফিরে তার পর মানে বকম পায়ে?

শিবশেখর। হাঃ, হাঃ, হাঃ, তা যেতে পায়। কিন্তু কম যাবে না। ছুটিবকম্ কিনা ছুটিয়ে করে কম যায় লোকে।

রাধা। আঃ, অনু, কী বেহায়া করছিস? যা, খাবার নিয়ে আয়।

হাসিতে হাসিতে অনুরাধার প্রস্থান

শিবশেখর। যিনি আর যে, মহিন্দর। বুড়ো হওয়ার এড্-ভানটেজের মধ্যে দেখছি। দুই লক্ষ্মী সরস্বতীর মেলা খাচ্ছ, আর শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছ। ভাববা নেই, চিন্তা নেই, পরম শান্তিতে আছ।

রাধা। যাই, আপনার চা-টা নিয়ে আসি। অনু একলা পারবে না।

সে বেগে পলাইয়া গেল

শিবশেখর। তোরা সুখে থাক, তা অসুখ করবে না কেন? এ বয়সে মেলা খেলে আমারও রোজ—

মহেন্দ্র। কোথায় এসে উঠেছ?

শিবশেখর। উঠব আবার কোথায়? যেখানে হোক রাতটা কাটিয়ে দেওয়া বইতো নয়।

মহেন্দ্র। সে জানি, ল্যাটফর্ম আছে, পার্ক আছে, রাত তোমার কেটে যাবেই। কিন্তু খাওয়া দাওয়া? সেটা কোথায় করছ?

শিবশেখর। সত্যি যখন ঘর বাঁধিয়ে করতে পারলে, তখন তোদের যে ভয় তা আর মাথায় এল না? সেও ঠিক হচ্ছে, মা অন্নপূর্ণা কোন হাঁড়ীতে তখন এক মুঠো চাল দিয়েছেন তা কি আমাকে আগে থাকতে বলে দিয়েছেন। তাঁর রাজত্ব যে সর্বত্র—

রাধা ও অনুরাধা চা ও জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল ও

একটি টিপয়ের উপর রাখিল

এই—এই যেখ। খাওয়ানোর কাজ যার সে ঠিক খাবার ঘরে এনে হাজির করেছে। আমি তো পক্ষীবিশারদ। সেই তো আমার মন, যে বিদেশে ভরসার যার তারই। রাধু মা, এ দুটো দিন হবে তোরই আশ্রয় নিলুম। এখন সেবা ছেড়ে আর নড়তে ইচ্ছে করছে না।

রাধা। আপনাকে আমরা নড়তে দিলে তো। এই ঘরে চাবি দিয়ে রেখে দেব। অনু, জ্যেঠামশাইয়ের জন্যে পান সেজে নিয়ে আয় তো। আর তুমুর ট্রাঙ্কগুলো ঘরে আর সকাল সকাল মশারীটা খাটিয়ে রাখুক।

অনুরাধার প্রস্থান

শিবশেখর। পরও দিনটা খুব বেশী ভয় আসে, অনেক দিন পরে আসে, তাহলে বেশ হয়।

রাধা। পরশু যাবেই আসুক, আমরা আপনাকে ছাড়ছি না। ও ভাবী টাবী এখন থাক।

শিবশেখর। না না, পরশু যেতেই হবে। আবার আসব। বুঝলে মহিমার, এই মধ্যে তোমার মেয়ে সুরে ওঠা চাই। সকাল সন্ধ্যে দুটি লম্বা মরশিং ওয়াক্ মেয়ে এসে দুটো ধন্তি মেয়ে যখন পাশাপাশি পাত পেড়ে বসবে, তখন ঘিয়ে ডুবিয়ে টাকতে পারবে না মা, তা বলে রাখছি—হাঃ হাঃ হাঃ……

রাধা। মিনু, মেয়ে মিনু জেঠামশাই।. এই বলছিলেন ঘিয়ে খেয়েছে।

শিবশেখর। অজানত ঘিয়ে—

থাবারের থালি তুলিয়া কোলের উপর রাখিয়াছেন, এমন সময়

বিজয়ের প্রবেশ

এই যে এস বাবা, বেড়ানো হল?

বিজয়। আজ্ঞে না, বেড়াতে যাইনি। এই ওষুধটা আনতে গিয়েছিলুম।

মহেন্দ্র। বীরু, তুমি শেখরকে চেন না। কী করেই বা চিনবে। ওর পরিচয়—পরিচয় ওর অনেক। গভর্নমেণ্ট প্লিডার ছিলেন, মফস্বলে অপারেশন করে লক্ষ্মীর ঝাঁপির টাকায় প্র্যাকটিস, রায়বাহাদুরী—

শিবশেখর। নাঃ, চুপ করে থাকতে দিলে না। ধাম জাদতে গিয়ের গীত। মহিমবাটার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে ভীমরথী ধরেছে দেখছি। আরে ছত্ত যারে কথা, ওগুলো কি আমার পরিচয় হচ্ছে? আমি কি চাকরী খুঁজতে বাচ্ছি বাবাজীর কাছে? আসল পরিচয় আমি ছুলি সোনো বাবাজী, এক গাঁয়ে, একদিনে এসেছি, এক পাঠশালায় পড়েছি, আর, আর এই এক সঙ্গে বাব এই সবহু করেছি—তোমার বলতে আর আমার মধ্যে এই সম্পর্ক, বুঝলে বাবা? হাঃ হাঃ হাঃ…

মহেন্দ্র। শেখর, তুমি ভুল করছ—

শিবশেখর। ভুল করছি ভাই, ভুল না। সবহু করেছি এটা তো মিথ্যে নয়, তারপর এক সঙ্গে খেতে পারি কি না পারি, কী বল বাবাজী—

মহেন্দ্র। আঃ, তুমি বুঝতে পারছ না—

শিবশেখর। কী আবার বুঝতে পারছি না, পণ্ডিত মশাই!

মহেন্দ্র। বীরু আমার জামাই নয়। আমার জামাইয়ের, আমাদের এবং সংসারের বন্ধু। উনি নিজেও ডাক্তার।

শিবশেখর। (গম্ভীর হইয়া গেলেন) আই য়্যাম্ সরি, মহিমবর। আমার অন্যায় হয়েছে। আই এপলোজাইজ, বীরু বাবু। বুড়ো মানুষের জিভকে ক্ষমা—

বিজয়। না, না, সে কী কথা? আমাকে ওকথা বলবেন না। (রাধার প্রতি) আমাকে আবার একটু বেরোতে হচ্ছে। আপনি এই ওষুধটা এক দাগ খাইয়ে দেবেন এখনই।

রাধা ঘাড় নাড়িল। বিজয় ঔষধ রাখিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত, শিবশেখর হঠাৎ খাট হইতে নামিয়া আসিতে আসিতে বলিল—

শিবশেখর। একটা কথা বলছিলুম, বীরুবাবু।০ (কাছে আসিয়া মিষ্ট করে) এসে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করবার মতো লোক পাইনি, বাজে বকছি, ডাক্তারে কী বলছেন বলুন তো—আপনিও তো ডাক্তার—

বিজয়। ডাক্তার যা বলছেন—

শিবশেখর। না, না, এ ঘরে নয়, চলুন বাইরে—

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্র। এই একটা মানুষ, মানু। সত্যিই মানুষ একটা। এমনটি আর দেখলুম না।

রাধা। জেঠামশাইয়ের মতন মানুষ কি হয়? আমার বড় ইচ্ছে করে ওঁকে ধরে কাছে রাখি। এই ঘরের, এই বাড়ীর, কেউ যেখবার নেই—কোথায় যান, কোথায় শোন—

বলিতে বলিতে এই পরম আত্মীয়ের প্রতি স্নেহে তাহার চক্ষু সজল হইল।

মহেন্দ্র। এই আবার কাঁদতে কী কাণ্ড করে তুলেছে তখনি তো! নিজের সংসার নেই, বিশ্বসুদ্ধ সংসার ওর নিজের হয়েছে।

রাধা। বলেছিলেন এইবার বিশ্রাম নেব মা, সম্পূর্ণ বিশ্রাম। বলে' কাশী গেলেন—

মহেন্দ্র। ওসব লোকের বিশ্রাম নেই মা। কিছু কি ফুরোয় যে। পালনকর্তা ব্রহ্মার দুটি আছে, সংহারকর্তা রুদ্রের দুটি আছে, পালনকর্তার দুটি নিলে চলবে কেন?

অনুরাধা এক ডিবা জর্দা পান ও একটি অসম্ভ কলিকা লইয়া প্রবেশ করিল।

অনুরাধা। কোথায় গেলেন জেঠামশাই!

রাধা। বাইরে বীরুবাবুর সঙ্গে কথা কইছেন।

মহেন্দ্র। বরাবরই ঐ রকম ছিল, তবে তোর জেঠাইমা চলে যেতে একেবারেই ঘর আঁধার। অত বড় প্র্যাকটিস্, অত টাকাকড়ি, বাগানবাড়ি, কিছুতেই তার এক বিন্দু মায়া রইল না। বলে, এত দিন তো সুখের ভূমিকা অভিনয় করলুম, কিন্তু কো-এক্টর্স্ চলে গেলে আর পালা গাইব কাকে নিয়ে।

অনুরাধা। এবার জেঠামশাইকে আর যেতে দেব না, দেখনা—

—বক ঘুরিল—

পূর্বোক্ত বাহিরের বারান্দা। একাকী শিবশেখর দাঁড়াইয়া চারদিকে চক্ষু বুলিতেছেন। পরে তিনি বারান্দার একপ্রান্তে রক্ষিত তাঁহার ব্যাগ, ছাতি, লাঠি তুলিয়া লইয়া চোরের মতো চুপে চুপে বাহির হইয়া যাইতেছেন, অর্ধেক বারান্দা পার হইয়া আসিয়াছেন এমন সময় ভিতর হইতে বিজয় প্রবেশ করিল, তাহার হাতে কয়েকটি ছোট বড় কাগজ, দৃষ্টি কাগজে নিবদ্ধ।

বিজয়। এই দেখুন, তার উইলই বলুন আর—এ কী! আপনি কোথায় যাচ্ছেন!

শিবশেখর। যাঁ, যাচ্ছি।

বিজয়। কেন! কোথায়!

শিবশেখর। আমি চল্লুম।

বিক্রম। কেন? এরই মধ্যে চল্লেন? আপনার যে যাওয়া হবে না। এই অন্ধকারে বনস্থলির আপনি থাকবেন কেমন করে, তাই ভাবলুম আপনাকে ডেকেই—

শিবশেখর। না বাবা, আর থাকতে পারব না। কী করে থাকব? রাধা মা'র মুখের দিকে চাইব কী করে? না, সে আমি পারব না। এ বাড়ীতে আর আসব না আমি, আর আসব না।

বিক্রম। উঁহু! আমি তো বড় মুস্কিলে পড়লুম। আপনার কাছে পরামর্শ চাইবার জন্যে সব বলতে গেলুম, একলা কিছু ঠিক করতে পারছি না, এঁদের তো এই কঠিন অবস্থা—

শিবশেখর। বিয়ের সময় আসতে পারিনি, কলকাতায় ফিরেছি আজ দুবছর পরে। কবে যে বিয়ে হল, কবে যে এরা ঘরে কাও হল! তাই ঈশ্বরের এই বনবাসে এসে যান করছে। আহাহা! ও কী করে এই শেল সহ্য করে আছে, তাই ভাবছি। তাই ওর এই কঠিন ব্যামো। আহারে! (চোখের জল মুছিয়া ফেলিল) ও কি আমার মতো চামারুকো লোক? ঐ ছেলেই যে ওর প্রাণ—(চোখ মুছিয়া) আমি চল্লুম বীরুবাবু—

বিক্রম। আপনিও চলে যাচ্ছেন? আমি যে কী করব কিছু বুঝতে পারছি না।

শিবশেখর। পরামর্শ দেবার শক্তি আর আমার নেই। এতটাইল যেবার পালা শেষ করেছি। তবে মনে হয় এরকম করে সমস্যার মীমাংসা হবে না। যাক্, আমি পালাই। তুমি আমার রাধুমাকে বোলো, লক্ষ্মীর আশ্রয় এই লক্ষ্মীছাড়ার কপালে নেই। ওঃ, তাই মা আমার কাশী যেতে চাইছিল, আহারা, যাবারে।

বাহির হইয়া গেলেন। বিক্রম নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। এক মুহূর্ত পরে শিবশেখর পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

শিবশেখর। এইযে, তুমি আছ। দেখ বাবা, আমার বাস কাশীর সব পোষ্টঅফিসে জানে। যদি কোনও দিন যেতে চাও, একটা লাইন লিখে যেও যেন। আমি নিজে এসে নিয়ে যাব বাকে। বোলো, বুঝলে? (বিক্রম ঘাড় নাড়িল। শেখর বাহির হইলেন এবং আবার ফিরিলেন) না খেয়ে গেলুম বলে রাগ না যেন রাগ করে না। আমি—আমি—আচ্ছা চল্লুম।

যেন জোর করিয়া নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। হতবুদ্ধি বিক্রম নীরব নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রথম অঙ্কের যবনিকা নামিল।

নোয়াখালি

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

চলিছে খড়্গ, জ্বলিছে অগ্নি, ভস্ম হতেছে ঘর,
সব সম্পদ নিমেষে উড়িয়া যায়।
সতী-লাঞ্ছনা যে বারবনী লীলা চলিছে অন্তর
সেকথা ভাষিতে ঘৃণা ও লজ্জা পায়।

হাজারে হাজারে চলে পথে পথে আশ্রয়হারা যত
নিরাশা-আঁধার সবার ভবিষ্যৎ;
চলচ্ছক্তি-বিহীন বৃদ্ধ অর্ভক শত শত
আর্তকণ্ঠে পূর্ণ করিছে পথ।

বাজে তাণ্ডবে মানব-শঙ্খ চরমে ধর্ম বলি
নারী-মর্যাদা লুণ্ঠিত ধূলিতলে
গাহে বিজীত পল্লী-বাসীরা নিঠা পড়িছে বলি
দিকে দিকে শুধু পিশাচ মৃত্যু চলে।

নরক-বহ্নি পরার মুখে ছারেরে করিছে লয়,
বিদ্যা করিছে অস্ত্রের উপহাস!
পাশব-রথের সারথি যাহারা নির্বাক ভেবে রয়
পথের পঙ্কে চক্র করেছে গ্রাস!

মানব কি আজ গিয়াছে মরিয়া মানব ধর্ম ভেবি?
দেবতা কি আজ হয়েছে ভস্মীভূত?
ভীরুতা কি আজ স্নান করিয়াছে মনুষ্যত্ব ভেবি?
প্রাণবন্তা কি হয়েছে আসনচ্যুত?

সাময়িকী

আচার্য্য কৃপালনী—

নভেম্বর মাসের শেষভাগে যুক্তপ্রদেশের মীরাটে কংগ্রেসের যে ৪৪তম বার্ষিক অধিবেশন হইবে, আচার্য্য জে-বি-কৃপালানী তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—এবনই তাঁহার উপর রাষ্ট্রপতির কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। আচার্য্য ১২ বৎসরেরও অধিক কাল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছেন—কাজেই কংগ্রেসের সকল বিভাগের সকল কার্য্যের সহিতই তিনি সুপরিচিত। গত ২৬ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি সর্ব্বত্যাগী ও অনলসকর্ম্মী হইয়া কংগ্রেসের ও দেশের সেবা

মোটরযোগে যাত্রারম্ভের অব্যবহিত পরিবর্ত্তনে শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু, আচার্য্য কৃপালানী ও তাঁহার পত্নী এবং মিঃ এইচ-এস-সুহ্রাবর্দ্দী

ফটো—তারক দাস

করিয়াছেন, কাজেই তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে অনাচারের সংবাদ পাইয়াই তিনি দিল্লীতে বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ থাকা সত্ত্বেও সস্ত্রীক পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন এবং নৌকাযোগে ও পদব্রজে ঘটনাস্থলসমূহে যাইয়া যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহা যেমন মর্ম্মন্তুদ, তেমনই ঘটনাবহুল। তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই তাঁহার মত নির্ভয়ে সকল কথা প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী গত প্রায় এক মাস কাল উপদ্রুত অঞ্চলে থাকিয়া কাজ করিতেছেন। তিনি শুধু স্বামীর আদর্শ গ্রহণ করেন নাই, সকল কাজেই স্বামীর উপযুক্ত সহযোগিনী। আচার্য্য কৃপালানীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সম্মান ও মর্য্যাদা যে সুরক্ষিত থাকিবে, তাহার পরিচয় পাইয়া দেশবাসী তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে।

কংগ্রেসের প্রস্তাব—

গত ২৪শে অক্টোবর দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশনে বাঙ্গালার অরাজকতা সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ প্রস্তাব গ্রহণের সময় মহাত্মা গান্ধী কমিটীর সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাব এইরূপ :—

১। "পূর্ব বাংলায় বর্ত্তমানে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে সেই সম্পর্কে মনের বিতৃষ্ণা ও বেদনা যথাযথভাবে প্রকাশ করা কমিটির পক্ষে দুরূহ। সংবাদপত্রে যে সকল খবর বাহির হইয়াছে এবং জনসেবকগণ বিবৃতি দিয়া পাশবিকতা ও মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার যে সকল দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে ভাল লোক মাত্রেরই মন লজ্জা, ঘৃণা, বিরক্তি ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবেই। নারীহরণ, নারীধর্ষণ, জবরদস্তি, ধর্ম্মান্তরকরণ, লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ ও নরহত্যা বিস্তৃত-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহা যাহারা করিয়াছে তাহাদের নিকট রাইফেল এবং অন্যান্য প্রকার বন্দুক দেখা গিয়াছে।

"কমিটি জানেন, কোন কোন স্থান হইতে জোরের সহিত বলা হইতেছে যে ঘটনাবলী অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। কিন্তু বাংলা গবর্মেণ্টের ইস্তাহার ও প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি-গুলিতে বীভৎসতা ও ব্যাপক সর্বনাশের এরূপ চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে যে (লোকের মনে) প্রতিক্রিয়া বাড়াইবার জন্য অতিরঞ্জনের প্রয়োজন হয় না।

"কমিটির এই মত যে বিগত বৎসরগুলিতে মুসলীম লীগ যে ঘৃণা ও গৃহবিবাদের রাজনীতি চালাইয়াছেন এবং বিগত মাসগুলিতে প্রতিদিন তাঁহারা যে অত্যাচারের জয়

দেখাইয়াছেন, পাশবিকতার এই ভয়ঙ্কর প্রকাশ তাহারই সাক্ষাৎ ফল। প্রদেশের অধিবাসীগণের উপর এত বড় অন্তর্বিপ্লব ঘটিতে দিবার প্রধান দায়িত্ব অবশ্যই প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের উপর পড়িতেছে। আরও প্রাদেশিক লাট ও বড়লাট এই ধরণের ব্যাপারে তাঁহাদের বিশেষ দায়িত্ব আছে বলিয়া দাবী করেন—সে কারণ বাংলার এই সকল দুর্ঘটনার দায়িত্বের অংশ তাঁহাদের লইতেই হয়। তাঁহাদের দায়িত্ব আরও অধিক হইয়া উঠে, যখন এই কথা স্মরণ করা যায় যে কলিকাতার সর্বনাশকর ঘটনা তাঁহাদের পরিষ্কারভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছিল এবং পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট ও লাটের নিকট প্রতিনিধি মারফৎ নিবেদের অবস্থার কথা জানাইয়া প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং রক্ষণের দাবী

নয়াদিল্লীর বিমানঘাঁটিতে প্যাটেল ও মৌলানা আবুলকালাম আজাদের বিমান হইতে অবতরণ ফটো—তারক দাস

করিয়াছিল। কমিটি বিস্ময় ও অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া পারেন না, যখন দেখা যায় যে সেই অবস্থায়ও শুধু যে প্রতিরোধমূলক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই তাহা নহে, অত্যাচার আরম্ভ হইয়া যাইবার পরও তাহা বন্ধ করিবার জন্য অথবা অপরাধীগণকে ধরিবার জন্য রীতিমত কোন চেষ্টা হয় নাই। পরিবর্তে বরং ঘটনা অতিরঞ্জনের অজুহাতে তাঁহারা (কর্তৃপক্ষ) তাঁহাদের স্বেচ্ছামূলক উপেক্ষা বা অধোগতি অথবা উভয়ই ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন।

"এরূপ ঘটনা উপলক্ষে মনের ভার প্রকাশ করাই যথেষ্ট নহে জানিয়াও কমিটি পূর্ব বাংলার অত্যাচারিতগণের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। আরও, তাঁহারা বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের ভাল লোকের প্রতি এই আবেদন করিতেছেন যে এই সকল অপরাধ-অত্যাচার সম্পর্কে শুধু তীব্র নিন্দা প্রকাশ নহে, এই সকল অরাজক বর্বরতা যাহারই দ্বারা অনুষ্ঠিত হউক না কেন তাহাকে রুদ্ধ করিবার জন্য রীতিমত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। সেই সঙ্গে প্রতিহিংসা-মূলক সাম্প্রদায়িক অত্যাচার-সংঘটন সম্পর্কে কমিটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতেছেন। জাতীয়তাও সাম্প্রদায়িকতা জীবনমরণ দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত অবস্থায় আসিয়াছে। ভারতীয় জাতীয়তাকে ধ্বংস করিবার এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দিকে দেশের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য এক ধরণের রাজনৈতিক গোপন প্রচেষ্টা আছে—বাংলার দাঙ্গাহাঙ্গামা স্পষ্টরূপেই তাহার অংশ। সুতরাং কমিটি এই সাবধানবাণীর উপর খুবই জোর দিতেছেন যে একমাত্র জাতীয়তার শক্তি দ্বারাই সাম্প্রদায়িকতা নিরোধ করা যায় —পাল্টা সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা নহে, পাল্টা সাম্প্রদায়িকতার ফলে বৈদেশিক শাসনই বরাবর চলিতে থাকে।"

কলিকাতার অবস্থা—

বাঙ্গালার নানাস্থানে যে সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সংবাদ প্রকাশে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বিধি-

লালবাজার কন্ট্রোলরুমে কলিকাতা রাত্রা ওরফ করিমবক্স সভাপতি-কাল সেটিক শেল ফটো—তারক দাস

নিষেধ আরোপ করায় তাহার প্রতিবাদে কলিকাতা সহরের সকল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র অক্টোবর মাসের প্রথম

৭দিন সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। তাহার পর গভর্ণমেণ্টের সহিত একটা রফা হওয়ায় সংবাদপত্রসমূহের প্রকাশ আরম্ভ হয়। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে কলিকাতার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়ে, বাস ও ট্রামের বহু কর্ম্মী হতাহত হওয়ায় গত ২৬শে অক্টোবর হইতে ৭দিন কলিকাতায় বাস চলাচল একেবারে বন্ধ ছিল—সে সময়ে ট্রাম চলাচলও প্রায় বন্ধ ছিল। পথে ঘাটে হত্যা-লীলা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি চলিয়াছিল। কাজেই সহরের অধিবাসীদিগের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। বাজারহাট, দোকানপাট সবই প্রায় বন্ধ থাকায় মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদিগকে অনশনে দিনযাপন করিতে হইয়াছে। ১৬ই আগষ্টের পরও ১০।১২ দিন কলিকাতাবাসীদিগকে অনুরূপ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। আমরা যে কোন সভ্যদেশে সুনিয়ন্ত্রিত শাসনের মধ্যে বাস করি, এখন আর তাহা মনে করাই যায় না।

নোয়াখালির বর্ত্তমান অবস্থা—

ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তী ও ডক্টর শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী বসু নোয়াখালি জেলার উপদ্রুত অঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়া মহাত্মা

মৌহাটী এম-ই-এস ক্যাম্পের অফিসের সম্মুখে শান্তিসেনারা গৃহহীনদের সেবাকার্য্যে রত ফটো—কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য

গান্ধীকে জানাইয়াছেন—"উপদ্রুত অঞ্চলে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য—অসংখ্য অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করা। অপহৃতা হিন্দু নারীদিগকে বর্ত্তমানে বোরখা পরাইয়া রাখা হইয়াছে। ফলে কেহ তাহাদের চিনিতে পারে না। এই সকল নারীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বা নারী সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা একান্ত প্রয়োজন। তাহারা ভীত অবস্থায় পশুজীবন যাপন করিতেছে।"

মীরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন—

আগামী ১৯শে ও ২০শে নভেম্বর দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন হইবে। তাহার পর ২১শে ও ২২শে মীরাটে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন এবং ২৩, ২৪ ও ২৫শে মীরাটে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন হইবে।

সরকারী ঘোষণা বর্জ্জন—

গত ২৭শে অক্টোবর পাটনায় বিহারবাসী বাঙ্গালী সমিতির সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—যেহেতু বাঙ্গালায় এই ভ্রাতৃবিরোধ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের প্ররোচনাপ্রসূত এবং যেহেতু ভারতে তাহাদের প্রতিনিধি বড়লাট এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করেন নাই, বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সকল উপাধি ত্যাগ করা হউক। অন্য একটি প্রস্তাবে সিংহভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া জেলা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য একটি কমিটী গঠিত হয়। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

মৌহাটী ক্যাম্পে নোয়াখালী হইতে আগত রমণীগণ
ফটো—কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালায় খাদ্যাভাব—

বর্ত্তমান দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। বহু জেলায় চাউল ৩০।৪০ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। যানবাহন চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এক স্থানের খাদ্য অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায় না। ওদিকে ধান কাটার লোকের অভাবে মাঠে পাকা ধান নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান ভ্রাতৃদ্রোহী সংগ্রাম বন্ধ না হইলে বাঙ্গালায় বহু লোক খাদ্যাভাবে মারা যাইবে। কলিকাতায় গত ২৭শে ২৮শে অক্টোবরের অবস্থার কথা মনে করিলেই সারা বাঙ্গালা দেশের অবস্থা

বুঝা যায়। এ অবস্থায় কোন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে গঠনমূলক কার্য্যের কথা চিন্তা করাও সম্ভব নহে। অথচ মহাযুদ্ধের পর সারা বিশ্বে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, গঠনমূলক কার্য্য ছাড়া তাহা দূর করার আর অন্য উপায় নাই।

পণ্ডিত নেহরুর সীমান্ত ভ্রমণ—

অন্তর্বর্ত্তী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সহ-সভাপতিরূপে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের উপজাতি-সমূহের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার জন্য সীমান্ত ভ্রমণে গিয়াছিলেন। ৬দিন ভ্রমণের পর তিনি ২২শে অক্টোবর দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। মুসলীম লীগদল ও সাম্রাজ্যবাদীরা এই মিলন চেষ্টা সুনজরে দেখিতে পারেন নাই—সেজন্য পথে তাঁহাকে আক্রান্ত হইতে হইয়াছিল। সীমান্ত নেতা খান আবদুল গফুর খাঁ ও সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খাঁ সাহেব পণ্ডিতজীর সঙ্গে ছিলেন। আবদুল গফুর খাঁ সাংঘাতিকভাবে আহত হন, পণ্ডিতজীর ও খাঁ সাহেবের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়। দেশসেবকের পক্ষে ইহাতে দুঃখিত বা বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু যে বৃটীশ সরকার পণ্ডিতজীকে ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক দলের নেতা হিসাবে অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সহ-সভাপতি পদে বৃত করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন ত?

শাসকসম্প্রদায়ের বিতাড়ন দাবী—

বাঙ্গালার দাঙ্গা নিবারণে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে শুধু ভারতবর্ষের নহে, জগতের সকল

ভারত-আফগান-সীমান্তে খাইবারের নিকট সশস্ত্রদলে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

স্থানের সংবাদপত্রসমূহে আলোচনা হইতেছে। সকলেই বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের বিতাড়ন দাবী করিয়াছেন। ভারতের বড়লাট ও বাঙ্গালার গভর্ণরের উদাসীনতা ও নিরপেক্ষতার জন্য তাঁহাদের অপসারণও দাবী করা হইয়াছে। বৃটীশ শ্রমিক সরকারও এবিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হন নাই। কাজেই নূতন অন্তর্বর্ত্তী

সরকার গঠনে তাঁহাদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে কেহই বিশ্বাস করেন না।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু—

বহু লোক বিশ্বাস করেন ও প্রকাশ করিয়াছেন যে নেতাজী শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এখনও জীবিত আছেন। সম্প্রতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু অন্তর্বর্তী সরকারের সহ-সভাপতিরূপে এক সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে সুভাষচন্দ্র জীবিত নাই। ঐ ইস্তাহার প্রকাশের উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাহার পরও সুভাষচন্দ্রের বহু বন্ধু ও সহকর্মী তাঁহার জীবিত থাকার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করুন—প্রত্যেক ভারতবাসী সর্ব্বদা ইহা প্রার্থনা করে।

সীমান্ত সফর কালে খাইবার পাশ এলাকায় বিস্ফোরক-কারিগণ কর্তৃক আক্রান্ত পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার মোটর কার।

লীগের যোগদান—

শেষ পর্য্যন্ত মুসলীম লীগের নেতারা অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করিয়াছেন। গত ১৫ই অক্টোবর মিঃ জিন্না বড়লাটকে জানাইয়াছেন যে নিম্নলিখিত ৫ জন লীগ-নেতা সরকারের সদস্য হইবেন—(১) মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ (২) মিঃ আই-আই-চন্দ্রীগড় (৩) মিঃ আবদুর রব নিস্তার (৪) মিঃ গজনফর আলি খাঁ ও (৫) মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। লীগ যোগদান করায় নিম্নলিখিত ৩ জন সদস্যকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে—(১) শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু (২) সার সাকাৎ আহম্মদ খাঁ ও (৩) সৈয়দ আলি জহীর। নিম্নলিখিত ৯জন পূর্ব্ব নিযুক্ত সদস্য বহাল রহিলেন—(১) পণ্ডিত জহরলাল নেহরু (২) সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল (৩) ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ (৪) মিঃ আসফ আলি (৫) শ্রীযুত সি-রাজাগোপালাচারী (৬) ডাক্তার জন মাথাই (৭) সর্দ্দার বলদেব সিং (৮) শ্রীযুত জগজীবন রাম ও (৯) মিঃ কুবেরজী হরমুসজী ভাবা।

রাজঘাট নামক স্থানে সভায় উপস্থিত নেতাদের সহিত করমর্দ্দনরত পণ্ডিত নেহরু

আসামে বন্যার ক্ষতি—

মহাপূজার পরই আসামে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টির ফলে কয়েকটি জেলা বিপন্ন হইয়াছে। ঝড়ে বহু বাসগৃহ, শস্য প্রভৃতি নষ্ট হইয়াছে। দুই লক্ষাধিক লোক এমনই দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছে যে কয়েক মাস ধরিয়া তাহাদের সাহায্যদানের ব্যবস্থা না করা হইলে তাহারা মারা যাইবে। দেশের দুর্দ্দশা একপ্রকার নহে।

আক্রান্তাবস্থায় মহাত্মা গান্ধী—

বাঙ্গালার হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হইয়া মহাত্মা গান্ধী সদলে গত ২৯শে অক্টোবর নিজে বাঙ্গালায় আসিয়াছেন। তিনি নোয়াখালি প্রতিষ্ঠানে কয়েক দিন বাস করিয়া গত ৬ই নভেম্বর নোয়াখালি যাত্রা করেন। এখানে অবস্থানকালে বাঙ্গালার প্রধান সচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী কয়েক দিন তাঁহার সহিত সোদপুরে সাক্ষাৎ করিয়া শান্তির কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। গান্ধীজি বাঙ্গালার লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং ৫ই নভেম্বর বিকালে মিঃ সুরাবর্দ্দীর থিয়েটার রোডস্থ গৃহে যাইয়া মুসলিম-নেতাদের

এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার শুভাগমনে বাঙ্গালায় শান্তি ফিরিয়া আসুক—সকলেই ইহা প্রার্থনা করিতেছে।

কেন্দ্রীয় সেবা সমিতি—

বাঙ্গালার সকল স্থানের দুর্গত জনগণের সাহায্য কল্পে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে সভাপতি, শ্রীযুত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকাকে সম্পাদক ও শ্রীযুত ভগীরথ কানোরিয়াকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া একটি কেন্দ্রীয় সেবা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহাতে কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা ও অন্যান্য সকল রাজনীতিক, ব্যবসা সম্বন্ধীয় ও সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কলিকাতা ১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংসে কেন্দ্রীয় সেবা-সমিতির কার্য্যালয় স্থাপিত। সকলে যেন তথায় নিজ নিজ শক্তিমত সাহায্য প্রেরণ করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বিমানের গবাক্ষপথে মিঃ এইচ-এস-সুরাবর্দীর নোয়াখালী দর্শন

ফটো—তারক দাস

হিন্দুস্থান ন্যাশানাল গার্ড—

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য লইয়া বাঙ্গালায় ও ভারতের সর্ব্বত্র 'হিন্দুস্থান ন্যাশানাল গার্ড' গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন—(১) পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন ও অখণ্ড হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠা (২) সকল প্রকার আইনসঙ্গতভাবে হিন্দুর অধিকার ও স্বার্থরক্ষা (৩) ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি বজায় রাখা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা (৪) হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ ও উহার উন্নতি বিধান (৫) সামাজিক ও অর্থনীতিক উন্নতি লাভের জন্য সর্ব্ব সম্প্রদায়ের হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (৬) এম্বুলেন্স ও মেডিকেল ইউনিট গঠন। এজন্য শ্যামাপ্রসাদবাবু লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য পাইতেছেন ও সকল স্থানের লোক এই সৈন্যবাহিনী গঠনে সাড়া দিতেছে।

কলিকাতায় দ্বিতীয়বারের হাঙ্গামার পর একটি বিশিষ্ট রাজপথের

দৃশ্য—পুনঃকৃত আবর্জ্জনা ফটো—ষ্টাফ সেন

সমাজ সংস্কারের জন্য আবেদন—

বাঙ্গালার সকল বর্ণাশ্রমী হিন্দু নেতা সমবেতভাবে এই মর্ম্মে এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। এই ঘোষণায় বাঙ্গালার সকল ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা স্বাক্ষর করিয়াছেন। ঘোষণায় বলা হইয়াছে—(১) হিন্দু জাতির বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীসমূহের মধ্যে সামাজিক অধিকার বৈষম্য থাকিবে না। (২) হিন্দুর মন্দিরে ও দেবদেবীর পূজা মণ্ডপে হিন্দু মাত্রেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে। কাহারও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক মন্দিরে বা মণ্ডপে অপরের প্রবেশ মালিকের অনুমতি-সাপেক্ষ হইবে (৩) হিন্দু সমাজের ক্ষৌরকার, রজক প্রভৃতি হিন্দু মাত্রেরই কাজ করিবে—এ বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না (৪) ব্রাহ্মণ হিন্দুমাত্রেরই পূজা-অর্চ্চনাদি ধর্ম্মকার্য্যে পৌরহিত্য করিতে পারিবেন, তাহাতে সামাজিক অবনতি ঘটিবে না। এতদ্বারা কেহ যেন অপরের বৃত্তিচ্ছেদ করিতে উৎসাহিত না হন।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরা—

কলিকাতার ১৬ই আগষ্টের হাঙ্গামা বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই গত ১০ই অক্টোবর হইতে সমগ্র নোয়াখালি জেলায় ও ত্রিপুরা জেলার স্থানে স্থানে যে বর্ব্বরতা ও অত্যাচার আরম্ভ

হইয়াছে, তাহার তুলনা ইতিহাসে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হাজার হাজার লোককে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করা হয়—যাহারা তাহাতে বাধা দেয়, তাহাদের গৃহে আগুন লাগাইয়া দিয়া তাহাদের সবংশে নিধন করা হইয়াছে। নোয়াখালির খ্যাতনামা উকীল রায়সাহেব রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী মহাশয় তাহাতে বাধা দিতে যাইয়া শুধু নিজের জীবন দেন নাই—তাঁহার পরিবারের প্রায় ২৫ জন লোক নিহত হয়। এইরূপ বহু রাজেন্দ্রলালের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। দুর্ব্বৃত্তরা হিন্দু মহিলাদিগকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া লইয়া গিয়া নিজ নিজ গৃহে আটক করিয়াছে। এখনও এইরূপ বহু নারী বোরখার মধ্যে আবৃত থাকিয়া পশুজীবন যাপন করিতেছেন। একমাস ঘুরিবার সঙ্কল্প করিয়া তথায় গমন করিয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ বাঙ্গালার নেতারা দুর্গতদের সাহায্যদান কল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। শ্যামাপ্রসাদ নিজে ঘটনাস্থলে যাইয়া নৌকাযোগে ও পদব্রজে বহু গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যতদিন বাঙ্গালায় লীগগঠিত মন্ত্রিসভা থাকিবে, ততদিন এখানে কিছু করা সম্ভব হইবে না। লীগ-গভর্ণমেণ্ট এদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই বরং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিয়া অশান্তি বৃদ্ধিতে দুর্বৃত্তদের সাহায্য করিয়া দেশকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালার লাট বা বড়লাট কেহই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ পর্য্যন্ত করেন নাই। লীগ মন্ত্রিসভাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া যদি বাঙ্গালায়

শিয়ালদহ ষ্টেশনে চাঁদপুর ও নোয়াখালী হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থিগণ ফটো—শ্রীপান্থ সেন

অতীত হওয়ার পরও তাহাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা হয় নাই। সেখানে সেনাবাহিনী পাঠানো হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সেনাবাহিনী স্থানীয় পুলিসের নির্দ্দেশ মত কাজ করিতেছে। পুলিস সক্রিয় থাকিলে তথায় ঐ সকল অত্যাচার অনুষ্ঠান কখনই সম্ভব হইত না। উপযুক্ত পাহারার অভাবে স্বেচ্ছাসেবকগণ উপদ্রুত অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে না। দেশনেতারা অনেকেই তথায় যাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহাদের পক্ষে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ানো কখনই সম্ভব নহে। রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালানী ও তাঁহার পত্নী বাঙ্গালায় এই দারুণ দুর্দ্দিনে বহুদিন ধরিয়া উপদ্রুত অঞ্চলে থাকিয়া যাহা করিয়াছেন, তাহা সত্যই অনন্যসাধারণ। মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গালায় আসিয়াছেন ও নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে ৯৩ ধারাও জারি করা হইত, তাহা হইলে এক সম্প্রদায় এত সাহসের সহিত অপর সম্প্রদায়ের অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হইত না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নেতারা ও খিলাফৎ বা মার্কিণের জননায়কগণ পর্য্যন্ত বড়লাট এবং বাঙ্গালার গভর্ণরের কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন—কিন্তু কোন অদৃশ্য হস্ত তাঁহাদের পরিচালন করিতেছে, তাহা বুঝা কঠিন নহে। অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্যরূপে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন নাই—বড়লাট বা গভর্ণরের মারফত ছাড়া তাঁহাদের কিছু করিবার উপায় নাই। হয় ত শীঘ্রই এমন অবস্থার উদ্ভব হইবে যে অন্তর্বর্ত্তী সরকারের কংগ্রেসী সদস্যদিগকে সরকারী পদ ছাড়িয়া দিয়া জনগণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

আজ যাহারা দিল্লীর সরকারী দপ্তরে কর্তৃত্ব করিতেছেন, অল্প দিনের মধ্যে আবার তাঁহাদিগকে যে কারাগারের প্রাচীরাভ্যন্তরে যাইতে হইবে না, এমন কথাও বলা যায় না। নোয়াখালির পর গত ১লা নভেম্বর হইতে বিহারে হিন্দু কর্তৃক মুসলমান নির্য্যাতন আরম্ভ হইয়াছে। বিহারের ঘটনার ব্যাপকতা বা ভয়াবহতা নোয়াখালির ঘটনা অপেক্ষা কম নহে। মিঃ এ-কে ফজলল হক বিহার ভ্রমণের পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন—বিহারে এক লক্ষ মুসলমান নিহত হইয়াছে—এ কথা সত্য না হইলেও পাটনা, গয়া, ভাগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি জেলায় যে শত শত মুসলমান ধনেপ্রাণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত নেহরুপ্রমুখ বহু নেতা বিহারে কয়েকদিন উপস্থিত থাকিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার কঠোরতা অবলম্বন করিয়া বিহার হাঙ্গামা বন্ধ করিয়াছেন—১০ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে বিহারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দুজাতি কখনও প্রতিহিংসা-পরায়ণ নহে—কাজেই বিহারের এই হত্যাকাণ্ড হিন্দুর নাম কলঙ্কিত করিয়াছে। বিহারের ঘটনায় মহাত্মা গান্ধীও বিচলিত হইয়া প্রায়োপবেশনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, সে জন্য পণ্ডিত নেহরুকে ও বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলকে বিহারে অত্যধিক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালার লীগ মন্ত্রিসভা যদি এইরূপ কঠোর হইতেন, তবে বহুপূর্ব্বেই বাঙ্গালা দেশেও শান্তি ফিরিয়া আসিতে পারিত। এই ধ্বংসলীলা ক্রমে যুক্তপ্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। মীরাটে ও কাশীতে গত কয়দিন হইতে হাঙ্গামা চলিতেছে, মীরাটের যে স্থানে কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য নূতন নগর গঠিত হইতেছিল, দুর্ব্বৃত্তেরা তাহার একাংশ পুড়াইয়া দিয়াছে। কানপুরেও রাজপথে খুনজখম আরম্ভ হইয়াছে। যুক্ত-প্রদেশেও কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল একটু অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিলে শীঘ্রই ইহার অবসান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে যাইয়া শান্তির বাণী প্রচার করিতেছেন ও বাঙ্গালার লীগ মন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দীন আহমদ গান্ধীজীর সম্মুখে বসিয়া মুসলমান দুর্ব্বৃত্তদের কার্য্যের যে ভাবে নিন্দা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে কোন ফল হইবে কি না কে জানে।

আজাদ-হিন্দ-সরকার প্রতিষ্ঠা দিবস—

গত ২১শে অক্টোবর সোমবার সমারোহের সহিত ভারতের সর্ব্বত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু গঠিত আজাদ-হিন্দ-সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে।

আজাদ-হিন্দ-সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবসে নেতাজী ভবনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কর্তৃক শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে প্রদীপ দান

ফটো—তারক দাস

সর্ব্বত্র নেতাজীর চিত্র মাল্যভূষিত করা হয় ও উক্ত সরকারের প্রথম ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। রাত্রিতে সর্ব্বত্র সকল গৃহ আলোক-মালায় সজ্জিত করা হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবন এলগিন রোডস্থ প্রাসাদটি 'নেতাজি ভবন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সাধারণের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইয়াছে এবং ঐ দিন সকালে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তথায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মৃত্তিকাস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন। 'নেতাজী ভবন' সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল ও সকলকে তাহা দেখিতে দেওয়া হইয়াছে। ঐ দিন ভারতের গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী নেতাজীর কথা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়াছে ও তাঁহার দীর্ঘজীবন ও সত্বর ভারতে প্রত্যাগমন কামনা করিয়াছে।

অমরাবতীতে শল্পীর চর্চ্চা সম্মেলন—

গত ১৩ই অক্টোবর মধ্যপ্রদেশের অমরাবতীতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত শল্পীর চর্চ্চা সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সম্মিলনে

শরৎচন্দ্রের প্রদত্ত বক্তৃতায় জাতি গঠনে শরীর চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা, বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষাদান, শরীর-চর্চ্চার প্রতি ভারতবাসীর উদাসীনতা ও যুবকদের কর্ত্তব্যের কথা আলোচিত হইয়াছিল। শরৎবাবুর উপদেশ সর্ব্বত্র আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হওয়া প্রয়োজন।

কলিকাতা মিটজিয়ামে নানা স্থান হইতে উদ্ধার করা বহুপ্রকার যাদুমন্ত্র ও মিথ্যা ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ফটো—তারক দাস

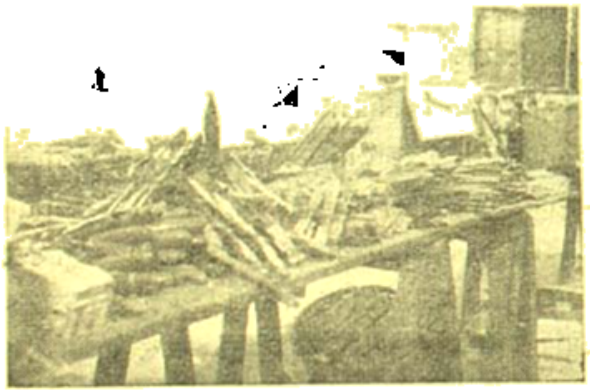

মিটজিয়ামে কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে পুলিশের দ্বারায় উদ্ধার-করা মারাত্মকরূপে মারাত্মক বোমারাশি ফটো—তারক দাস

ভারতে খাদ্যাভাব—

ভারতে যে দারুণ খাদ্যাভাব উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গত ৬ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভায় দেওয়ান চমনলাল সেকথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করার প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন। মার্কিণ সংবাদপত্রসমূহেও প্রকাশিত হইয়াছে যে আগামী বৎসর ভারতবর্ষে বর্ত্তমান বর্ষ অপেক্ষা খাদ্যাভাব অধিক হইবে। এ বৎসর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা লীগের চেষ্টায় মার্কিণ খাদ্যমিশন কর্ত্তৃক ভারত পরিদর্শনের ফলে মার্কিণ হইতে ভারতে প্রচুর খাদ্য আসিয়াছে। কিন্তু এইভাবে ভারতকে কয় বৎসর বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইবে? শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের খাদ্য ও কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য। তিনি ভারতের খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা সাধারণে প্রচারিত হইলে লোক আশ্বস্ত হইতে পারে। ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যাপক ব্যবস্থায় সরকার মনোযোগী না হইলে গত কয় বৎসরের মত আগামী কয়েক বৎসরও ভারতে খাদ্যাভাবে বহু লোক মারা যাইবে।

মিটজিয়ামে রক্ষিত লুটের মাল—হুইলেল প্রভৃতি ফটো—তারক দাস

সরকারী তৎপরতা—

১০ই অক্টোবর নোয়াখালির হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়। ১৯শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও বাঙ্গালার কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ বিশেষ বিমানে নোয়াখালি গমন করেন—তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, মেজর-জেনারেল অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য কুমার দেবেন্দ্রলাল খানও গমন করেন। সেইদিন দার্জ্জিলিং হইতে বিমানে বাঙ্গালার গভর্ণর, প্রধান-মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী ও বাঙ্গলার পুলিশের ইন্সপেক্টার-জেনারেল

কেন্দী ও চট্টগ্রামে যান—পথে নোয়াখালি উপস্থিত অকল বিমান হইতে দেখিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম হইতে তাঁহারা সেই বিমানেই যাত্রা করিয়া যান। ইহাই সরকারী তৎপরতা।

বিশেষ বিমান যাত্রায় অন্তর্বর্তী-সরকারের সদস্যবৃন্দ—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ, এবং মিঃ আব্দুর রব নিস্তার ফটো—তারক দাস

সদস্যগণের বাঙ্গলায় আগমন—

অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের ৪ জন সদস্য—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই পেটেল, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ ও মিঃ আবদুর রব নিস্তার গত ২রা নভেম্বর কলিকাতায় আসিয়া বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দের ও গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৩রা তারিখেই বিহারে চলিয়া গিয়াছেন। বড়লাট ও ১লা নভেম্বর নোয়াখালি দেখিয়া ২রা সন্ধ্যায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। অন্তর্বর্তী সরকারের রক্ষা-সচিব সর্দার বলদেব সিংও দুই দিনের জন্য বাঙ্গালা ও বিহার ঘুরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আগমনের ফলে বাঙ্গালার এই ভ্রাতৃদ্রোহী হত্যাকাণ্ড বন্ধ হইবে বলিয়া সকলেই আশা করিতেছেন।

শোক-সংবাদ

পরলোকে মদনমোহন মালব্য—

গত ১২ই নভেম্বর অপরাহ্ণ ৪টা ১০ মিনিটের সময় মনীষী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ৮৪ বৎসর বয়সে পবিত্র বারাণসীধামে ইহলীলা সম্বরণ করেন। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনি একজন অক্লান্ত সৈনিক এবং হিন্দু সমাজের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ভারতের সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সংবাদে তিনি বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যর জন্ম হয়। শৈশবে ধর্ম্মজ্ঞানোপদেশ পাঠশালায় সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া তিনি এলাহাবাদের সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। তারপর মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ হইতে এফ-এ এবং

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৮৯২ খৃঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল-এল-বি পাশ করিয়া তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং "ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন" "হিন্দুস্থান" এবং "অভ্যুদয়" পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং ১৯০৯, ১৯১৮ ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য
ফটো—শ্রীরবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কাশীরহাটী) সৌজন্যে

সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৩, ১৯২৪, ও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার সভাপতিত্ব করেন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে কার্য্য করেন এবং ভাইস-চ্যান্সেলারের পদত্যাগ করার পর হইতে মৃত্যুকাল অবধি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ছিলেন।

প্রায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইতেই কংগ্রেসের সহিত যুক্ত থাকিয়া তিনি ঐকান্তিকভাবে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আইন অমান্য আন্দোলনে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি কারাবরণ করেন। হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার যেমন গভীর আস্থা ছিল, হিন্দুশাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ভারতের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও তিনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতেন। তাই বৃদ্ধ বয়সে তিনি "কায়কল্প" চিকিৎসার কঠোরতা বরণ করিয়াছিলেন। হিন্দুর সামাজিক সংস্কারের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি হিন্দু জাগরণ আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ছিলেন।

কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার গঠনমূলক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁহার স্বধর্ম্মের উপর গভীর আস্থা এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রভাব ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের উপর এমনি ভাবে প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে তাঁহারা হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মুক্ত হস্তে তাঁহাকে অপরিমিত অর্থ দান করিয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার জীবনের এক অক্ষয় কীর্ত্তি।

পরলোকে ত্রৈলোক্যনাথ স্মৃতিভূষণ—

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার মহারাজার সভাপণ্ডিত ত্রৈলোকানাথ স্মৃতিভূষণ গত ২রা কার্ত্তিক ৮১ বৎসর বয়সে

ত্রৈলোক্যনাথ স্মৃতিভূষণ

লালগোলায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল লালগোলার টোলে অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভাময়ী লেখনী 'দক্ষতা' হইয়াছিলেন, লালগোলার সন্নিকটে সেই 'সতীতলায়' তিনি একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলগ্রামে তাঁহার জন্মভূমিতে তিনি একটী দেবীপীঠ ও শ্মশানে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

পরলোকে সর্দ্দার অজিৎ সিং—

সর্দ্দার অজিৎ সিং ভারতের একজন পুরাতন বিপ্লবী কর্ম্মী। গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য তিনি গত ১৯০৮ সাল হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় বাস করিতেছিলেন। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি জার্ম্মানীতে থাকিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় রেডিওতে সংবাদ প্রচার করিতেন। সম্প্রতি বার্লিনের এক হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সারা-জীবন ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টায় নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন কথা বহুল পরিমাণে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন।

পরলোকে ডাক্তার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতির প্রাণ-স্বরূপ খ্যাতনামা ব্যায়ামবীর ডাক্তার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৬ই অক্টোবর সকালে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নিজে শুধু ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেন না, বাঙ্গালী যুবক-গণকে ব্যায়াম চর্চ্চায় দীক্ষিত করার জন্য নানাপ্রকার অসুবিধা ও কষ্ট স্বীকার করিয়া সারা বাঙ্গালায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনি মাতুল ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও সেগুলির সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিতেন।

এক টুকরা কাগজ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

আমার মনে পড়ে,
ঘুমন্ত-ভরা ব্যাকুলতা টুকরো কাগজ ভরে।
করা হ'ল তাহার জন্য
যায় পেটরা ভরা,
কতই বেলা হল—ঘরে আর নাহি চড়ে।

২

ব্যাপার সহজ নয়,
নইলে মায়ের মুখ কি আমার এমন মলিন হয়?
যদিও নাই চক্ষে পানি
অন্তরে তা বেদনা জানী,
ভরা শ্রাবণ মেঘের মত কখন যেন ঝরে।

৩

সবার মূল্য নাই
টুকরা কাগজ, হায় কি তারা একই মূল্যবান!
অকারণে সজল আঁখি—
ঘরের পানে তাকিয়ে থাকি
কিসের লাগি বুকের ব্যথা সরালে না সরে!

৪

যেন না মোর আজ—
'চিন্তাদেবী' পালিয়ে গেছে পোড়া সে পোস্ট আপিস মাঝে।
শ্রীমন্তের কি কমল টোপর
খুঁজতে মায়ের হ'ল ভুলর?
পাখা মেলে যায় না পাওয়া কই সে বসুন্ধরে?

৫

জানতে বড় সাধ,
টুকরা কাগজ সে কি কোন ব্যবসায়ী তারবার্ত্তা?
মায়ের আমার সেই মূরতি,
আজও জাগে চক্ষে নিতি,
টুকরা কাগজ বাস রেখেছে বুকের এ প্রকোষ্ঠে।

৬

তাহার পরে ভাই—
পেলেন কিনা টুকরা কাগজ খপর রাখি নাই।
জানতে আমি পারিনি তা,
দেখা তাতে কি ছত্র যা—
'রামপ্রসাদের গানের মত নাকে ব্যাকুল করে।

অভিজ্ঞতা

শ্রীমনোরমা দেবী

শেয়ালদহ ষ্টেশন—জনসমুদ্র ঠেলে ট্রেণে ওঠা কি ব্যাপার তা কারও অজানা নাই, তবু গরজ বড় বালাই, প্রয়োজন বিষম, মেয়ের বিয়ের নানা জিনিষ কল্‌কাতা থেকে নিয়ে যাচ্ছি, মফঃস্বলে ও-সব মেলে না, পাত্রপক্ষের যা দাবী, তার একচুল কম হওয়াও তাঁদের পক্ষে অসহনীয় হবে। সে ব্যাপার ভীতিপ্রদ কম নয়।

সঙ্গে কেবল চোদ্দ বছরের ছেলে। দেশ, কাল, সময়, সব তখন প্রতিকূলে। একজন লোকও যোগাড় করা গেল না, স্বামী কিছুতেই ছুটি পেলেন না। অথচ কন্যাদায় উদ্ধার হবে সে সুযোগ ছাড়া কঠিন।

কোন রকমে মাল নিয়ে ট্রেণে উঠলাম, জায়গা করে নিয়ে বস্‌বার চেষ্টায় আছি। ম্লানমুখে ছেলে এসে বল্লে, "আমরা এত মাল নিয়ে যেতে পারবো না মা; নেমে যেতে বলছে, না হয় ত পাঁচটা টাকা দিতে হবে।" বুঝলাম ব্যাপার, একা স্ত্রীলোক আছি, সঙ্গে বালক। আমার দেশবাসী এ সুযোগে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন। নেমে এলাম, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম তাঁর বক্তব্য, তিনি বল্লেন পাঁচটি টাকা পেলেই আমায় যেতে দিতে পারেন, না হলে বে-আইনি মাল নিয়ে যেতে দিতে অক্ষম। আমার টিকিট অনুসারে কতখানি মাল আমি পেতে পারি সে জ্ঞান আমার ছিল। আশে পাশে অনেকেই দাঁড়িয়ে, ঘটনা নীরবে দেখছিলেন। সত্যই নিজেকে অসহায় ও নিরুপায় মনে হল, তবু মন বেঁকে গেল, বল্লাম, "বে-আইনি আমিও করতে অনিচ্ছুক। পাঁচ টাকা দেওয়াও বে-আইন"—কুলীকে মাল তুলতে বল্লাম ওজন করে ব্রেকেই দেব।

—দূরে দেখা গেল আমার কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধু আসছেন, ট্রেণ যাতায়াতের বিড়ম্বনা সকলেই এখন জানেন, তাই আমার দুর্ভোগের আশঙ্কায় সকলেই কোন রকমে কাজ থেকে ছুটি করে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

ট্রেণে উঠলাম, তিল ধারণের স্থান নাই। একটি বেঞ্চ দখল করে বসে আছেন তিনটি চীনা মহিলা সপুত্র—তাঁরা আসামের মিলিটারী কণ্ট্রাক্টর। আর দুটি বেঞ্চে ১০টি বাঙালী মহিলা, পুত্রকন্যাসহ। এঁরা বসে আছেন ভীত ত্রস্ত হয়ে একপাশে। আমি চীনা মহিলাদের একটু জায়গা দিতে বলায় তাঁরা রুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন। অগত্যা নিরস্ত হওয়াই বিধি, কিছুক্ষণ ধরে চীনা শিশুদের নানা প্রকার খাদ্য আহার ও ছড়ানো চলছিল তারপর অন্যান্য আরোহীদের জিনিষপত্রের উপর ঝটি ছেলের মলমূত্র ত্যাগেরও ব্যবস্থা দেখে আমার স্বজাতিরা আমায় বল্লেন প্রতিবাদ করতে। আমি যথোচিত বিনয় সহকারেই তাঁদের কাছে এরূপ অনুযোগ অবশ্য কর্‌লাম। এরপরে সে চীনা নারীত্রয় যে কি রকম অসহিষ্ণু হ'য়ে যা তা বল্লেন, তা লেখা যায় না। পাশেই পুরুষদের কামরা, আমার ছেলেটি গোলমাল দেখে সহযাত্রীদের একথা জানাল। আশ্চর্য্য হয়ে শুনলাম তাঁরা বলছেন, "খোকা তোমার মাকে বল চুপ করে থাকতে, ওরা যে রকম দেখছি হয়ত ছোরা মেরে বসবে।" আমার অত্যন্ত ঘৃণা ও লজ্জা বোধ হল—এঁরা সকলেই সম্ভ্রান্ত ও প্রায়ই পদস্থ এঁদের এই হল বিবেচনা—ব্যাপার যখন এতটাই গড়াল তখন নিজেই দাঁড়ালাম, মহিলাদের সাথী চীনা ভদ্রলোকটিকে ডেকে বল্লাম, "এরকম ব্যবহার তাঁরা কেন কর্চ্ছেন, এ কি উচিত।"

পুরুষদের কামরার শেষের দিকে যে বাঙ্গালী যুবকটি বসেছিলেন আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি উঠে এলেন—"মা আপনি!"—দেখলাম তিনি আমার স্বামীর ছাত্র, সমস্ত বিবরণই শুনছিলেন, কেবল আমায় তখনও দেখেন নি, অতিশয় লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্লেন, "ক্ষমা করুন মা, আমি বুঝতে পারিনি আপনিই এরকম অপদস্থ হচ্ছেন, পরের ষ্টেশনে এর প্রতিকার আমি কচ্ছি।" মিলিটারী বিভাগে বড় পদে তিনি চাকুরী করেন। তাঁর পরিচয়ে তখনই যেন, কিযেন, দুই কামরার ভাব পরিবর্ত্তন ঘটে গেল, চীনা ভদ্রলোকটিও তাঁর সঙ্গিনীদের হ'য়ে আমার কাছে মাপ চাইলেন, সঙ্গিনীদের উপদেশ দিয়ে গেলেন। একজন পদস্থ অফিসার আমার সুবিধার জন্য ব্যস্ত—তখন সে কি সম্মান আমার।

—বাকী পথটুকু অতিক্রম করে গন্তব্যস্থানে এলাম। স্বামী উদ্বিগ্ন হ'য়ে ষ্টেশনে এসেছেন। তাঁর ছাত্র নেমে তাঁকে প্রণাম করল, উনি ত ছাত্রকে পেয়ে আনন্দ প্রকাশের পর আমাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, হেসে বল্লাম "শ্রীমানের কাছেই শোন, আমি শুধু ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের "চাপরাশ" সম্বন্ধেই ভাবছি—তোমার পরিচয়ের চাপরাশ ছাড়া আত্মসম্মান রক্ষা হত না, চাপরাশ ছাড়া পথ চলায় বড় বিপদ—"

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺হুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ডেভিস কাপে ভারতীয় দল ঃ

আগামী ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ থেকে একটি টেনিস দল যোগদান করবে। নিম্নলিখিত টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে অল্ ইণ্ডিয়া লন্ টেনিস এসোসিয়েশনের ডেভিস কাপ কমিটি খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করবে বলে জানা গেছে—খস্ মহম্মদ (বরোদা), ম্যান মোহন (পাঞ্জাব), দিলীপ বসু (বাঙ্গলা), কপিলা পাথী (মহীশূর), জিমি মেটা (বোম্বাই), ইরসাদ হোসেন (বাঙ্গলা), সুমন্ত মিশ্র (বাঙ্গলা), কে বি মদন (বাঙ্গলা)। এই সব টেনিস খেলোয়াড়দের কলকাতার ভারতীয় ন্যাশানাল চ্যাম্পিয়ানসীপ এবং মাদ্রাজের সাউথ ইণ্ডিয়ান চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় অবশ্যই যোগদান করতে হবে। এছাড়া বেঙ্গল লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ (কলকাতা, ডিসেম্বর ১৬-২২শে), ইউ পি লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ (লক্ষ্ণৌ, জানুয়ারী ১৮-২৬শে), এবং সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের(এলাহাবাদ, জানুয়ারী ২৬শে—২রা ফেব্রুয়ারী) যে কোন দু'টি প্রতিযোগিতায় খেলতে হবে। এই সব প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের ফলাফল শেষ নির্ব্বাচন সময়ে যথেষ্ট কাজ দেবে। নির্ব্বাচন শেষ হ'লে পর পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় দ্বারা নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়দের টেনিস খেলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গেছে। ইউ পি'র লন্ টেনিস এসোসিয়েশনের অবৈতনিক সম্পাদক ইউ এস গুপ্ত ডেভিস কাপ দলের ম্যানেজার মনোনীত হয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে ভারতীয় টেনিস দল আগত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত খেলার পরিচয় দিতে পারবে।

লালা অমরনাথ ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় লালা অমরনাথ ইংলণ্ডের সাসেক্স কাউণ্টি ক্রিকেট দলের পক্ষে খেলবেন বলে তিন বছরের চুক্তি করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড তাঁকে সাসেক্সের পক্ষে খেলতে অনুমতি দিয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে, বেড় বছর পর অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডে খেলতে এলে অমরনাথ ইংলণ্ডের পক্ষে খেলবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের যে পরিমাণ ফি দেওয়া হয়েছে লালা অমরনাথকে তার থেকে অনেক বেশী দেওয়া হবে; তিনিই ইংলণ্ডে সব থেকে বেশী 'ফি' পাওয়ার গৌরব লাভ করলেন।

অলিম্পিক গেম ঃ

১৯৩৬ সালে বার্লিনে সর্ব্বশেষ অলিম্পিক গেম হয়েছে। যুদ্ধের দরুণ ১৯৪০ সালের অলিম্পিক গেম স্থগিত ছিল। ১৯৪৮ সালের ২৮শে জুলাই অলিম্পিকের উদ্বোধন হবে এবং ১৪ই আগষ্ট অনুষ্ঠান শেষ হবে। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান লিষ্টিতে ১৪টি বিষয় আছে, এর মধ্যে হকি ধরা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় হকি খেলা হবে কিনা তা পাকাপাকি স্থির হয়নি। আগষ্ট মাসে ইংলণ্ডের হকি মরসুম শেষ হয়ে যায় সেই কারণে হকি খেলার মাঠ পাওয়া যাবে না। ভারতবর্ষ পর্য্যায়ক্রমে তিনবার অলিম্পিক হকি খেলায় বিজয়ী হয়ে হকি খেলায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন সুসভ্য দেশে হকি খেলা চলছে এবং পূর্ব্বাপর অলিম্পিক খেলায় হকি খেলার স্থান ছিল। সুতরাং এই খেলাটি অলিম্পিক অনুষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়ার কোন যুক্তির কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা ঃ

ইংলণ্ড থেকে আগত ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে ভারতীয় এক বাছাই ক্রিকেট দলের খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। যেসব ইংলণ্ডে খেলতে গিয়েছিল তার নামকরণ হয়েছে ইংলণ্ডে ভারতীয় দল। এই দল 'ভারতীয় অবশিষ্ট' দলের সঙ্গে খেলবে। প্রথম ম্যাচ খেলা হবে দিল্লীর উইলিংডন প্যাভেলিয়ন মাঠে ২৩, ২৪ ও ২৫শে নভেম্বর। বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে হবে ১৪—১৬ ডিসেম্বর, কলকাতার ইডেন গার্ডেনে হবে ৩১শে ডিসেম্বর, ১ ও ২রা জানুয়ারী ১৯৪৭, লাহোরের লাহোর জিমখানা মাঠে ১৮-২০ জানুয়ারী, মাদ্রাজের মাদ্রাজ ক্রিকেট ক্লাব মাঠে ২৪-২৭শে জানুয়ারী।

নবাব পতৌদী ইংলণ্ড প্রত্যাগত ভারতীয় একাদশ দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন করবেন এবং অধিনায়ক হবেন। ভারতীয় অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন করবে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত মনোনয়ন কমিটি। এই কমিটিতে নবাব পতৌদি এবং প্রফেসর ডি বি দেওধরও আছেন। অবশিষ্ট দলের অধিনায়ক বিভিন্ন স্থানের খেলায় বিভিন্ন ব্যক্তি হবেন। দিল্লীতে হবেন কর্ণেল সি কে নাইডু, লাহোরে ডাঃ জাহাঙ্গীর খাঁ, কলকাতায় মহারাজা ঘুংবিহার, বোম্বাইয়ে প্রফেসর ডি বি দেওধর, মাদ্রাজে পিল্লো পালিয়া।

মুষ্টিযুদ্ধে নতুন ব্রটিশ মিডল-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান ঃ

ইষ্টনাইট হাস্পাসায়ারের ওল্ড রেলওয়ের কর্মচারী ডিক্স হকিংস (২৩ বছর) ১৫ রাউণ্ড খেলায় ভূতপূর্ব ব্রিটিশ মিডল-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান এরি রোজারিকে হারিয়ে নতুন চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

ইংলণ্ডে ফুটবল খেলোয়াড়দের ধর্মঘট ঃ

সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে ফুটবল খেলার মরসুমে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের আর ধর্মঘট হবে না। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের সমিতি খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধির জন্য এক আন্দোলন আরম্ভ করেছিল এবং তাদের দাবী না মেনে নিলে ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছিল। অনেক আলাপ আলোচনার পর শ্রমিক মন্ত্রীর মধ্যস্থতায় বিরোধের অবসান ঘটেছে। খেলোয়াড়দের এ আন্দোলন সার্থক হয়েছে। কুড়ি বছরের উপরের খেলোয়াড়দের শীতকালে সপ্তাহে ৭ পাউণ্ড এবং গ্রীষ্মকালে ৫ পাউণ্ড হিসাবে ন্যূনতম মাহিনা দিতে হবে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া খেলোয়াড়দের আরও অনেক দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "জ্যোর আলো" (১ম খণ্ড)—৩৷০

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত নাটক "মহাত্মা গান্ধী"—১৷০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "মেঘদূত"—১৲

শ্রীগৌতম সেন প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী "ব্রহ্মদেশের বার্মিজিং যাত্রা"—১৷০

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "করুণা দেবীর আশ্রম"—১৲

স্বামী সত্যানন্দ-সম্পাদিত "পঞ্চশস্য"—২৲

বেঙ্গল লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত "অঞ্জলি"—৩৲

নব্যভারতী প্রণীত শিশু উপন্যাস "সূর্য্যোদয়ের রাজে"—১৲

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য—২৫ অগ্রহায়ণের মধ্যে যে সকল ষাণ্মাসিক-গ্রাহকের টাকা পাইব না তাঁহাদের পৌষ সংখ্যা পরবর্ত্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক নম্বরসহ টাকা মনিঅর্ডার করিলে ৩৷০ আনা, ভিঃ পিঃতে ৩৷৵০ টাকা লাগে। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ২০ অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌এ

সূচীপত্র

চতুস্ত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৫৩

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অঘটন (গল্প) শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী ২৯৩
অনন্ত রাত্রিতে দুবং (কবিতা) শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, বার-এট-ল ... ৫১৩
অর্ধেক মানবী তুমি (নক্সা) শ্রীবেণচন্দ্র দাশ আই-সি-এস ২১১, ৩২৪, ৪৪২, ৫৩৪
অভিজাত্য (গল্প)—শ্রীমনোরমা দেবী ... ৫৭৮
অভিনয় (নাটক) শ্রীকানাই বসু ২৩১, ২৯৯, ৪৪৭, ৫৪৩
অভিনয় (কবিতা) শ্রীমদনা দে ... ২৬৬
অমরাবতী (প্রবন্ধ) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ ... ২৪৯
অলিম্পা ডেথাজেম মতবাদ (প্রবন্ধ) অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এসসি ৩১৩
অমৃত (প্রবন্ধ) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ ... ৩২৭
অন্তবর্তী-গবর্ণমেণ্ট (প্রবন্ধ) শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ৩৬৪, ৪৫৭, ৪৪২
আগমনী (কবিতা) শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ... ৩২৩
আনার-দ্বিজ-সরকার (কাহিনী) শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ৪৩, ১৪৪, ২২৩, ৩০৯, ৪০৯
আমেরিকায় ভারতীয় যাদুকরের সম্মানলাভ (প্রবন্ধ) শ্রীবিনোদ চট্টোপাধ্যায় ৫৩১
আবুলকালাম আজাদ (প্রবন্ধ) শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ৫২৩
আলোর বিদায় (কবিতা) শ্রীবেণচন্দ্র দাশ আই-সি এস ৩৪
আশা (কবিতা) শ্রীমতী দীপ্তি দেবী ৩৮
আষাঢ়ের প্রথম দিবসে (কবিতা) শ্রীবিভু সরস্বতী ... ১৪৯
আসবে (গল্প) শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ... ২১
ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সিদ্ধের তুলনা (প্রবন্ধ) শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন এম-এসসি ... ২১৫
উক্তি (গল্প) শ্রীসমর সরকার এম-এ, বি-টি, বি-এল ৩১৬, ৪০৯
উপমা (কবিতা) শ্রীকমল মৈত্র ... ১৪৩
উমার যৌবন (কবিতা) কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় ... ১৯৩
এবারকার ভ্রমণ (ভ্রমণ) শ্রীসুধাংশুকুমার অধিকারী এম-এ ... ৪৭৫
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গরস (প্রবন্ধ) রায়বাহাদুর শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ ৪৫৫
এক চক্ষু হরিণ (গল্প) অধ্যাপক শ্রীবিভূতিরঞ্জন গুহ ১২৩
এক টুকরা কাগজ (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৪৭৭
এস স্বাধীনতা (কবিতা) শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৩৮১
কঙ্কণ পরা (প্রবন্ধ) অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় ৪১৪
কবি কুমুদরঞ্জনের প্রতি (কবিতা) শ্রীগোপাল ভৌমিক ৫৭৭
কবিতা-লক্ষ্মী (কবিতা) শ্রীবাসীকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ৫৭৭
কবি-তীর্থে একরাত্রি (ভ্রমণ) শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ৫৭৭
কল্পনা ও বাস্তবে (গল্প) শ্রীসুবিকেশ দেব বি-এ ৫৭৭
কন্যাকুমারী (ভ্রমণ) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ৫৭৭
কর্মযোগ—কর্মফল (প্রবন্ধ) শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস ৫৭৭
কাঙাল হরিনাথের বাউল সংগীত (প্রবন্ধ) শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার কাব্যনিধি ১৮৬
কাশীধামে শঙ্করাচার্য্যের মঠ (প্রবন্ধ) অধ্যাপক শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম-এ ২৮৩
কায়কুবাদ বিহজাত (প্রবন্ধ) শ্রীশুকবাস সরকার এম-এ ... ৫৩
কৃত্তিবাস পণ্ডিত (প্রবন্ধ) অধ্যাপক শ্রীহরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৫৫১
ক্যাপ্টেন (কবিতা) শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৭৭
কেষ্টঠাকুরের বরযাত্রা (গল্প) অধ্যাপক শ্রীফণীন্দ্র বসু ৫৭৭
কোথায় ঈশ্বর (কবিতা) শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য ৫৭৭
কোন এক আধুনিক কবির প্রতি (কবিতা) শ্রীশ্যামসুন্দর অধ্যাপাধ্যায় ৫৭৭
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (প্রবন্ধ)—শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী ৫৭৭
ক্ষণ ও চিরন্তন (গল্প)—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু ৫৭৭
ক্ষমতা (একাঙ্কিকা) শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস ৫১৯
ক্ষান্ত সমস্যা সমাধানে সোন আমুর স্থান (প্রবন্ধ) শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম-এসসি ... ৪৩৯
খেলাধূলা—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ২৩, ১৮৭, ২৮৫, ৩৮৯, ৪৭৮, ৫৭৯
গঙ্গাজল (গল্প)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৩৭
গণ-পরিষদ (প্রবন্ধ)—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ... ২৮৫
গঠন-মূলক কর্মপদ্ধতি (প্রবন্ধ)—শ্রীগান্ধী সেবক ... ১৪৪
গান (কবিতা)—শ্রীমতী কমলরাণী মিত্র ... ২১১
গীতায় কৃপাবাদ (প্রবন্ধ) শ্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

চোর (গল্প)—শ্রীঅন্তোষকুমার দে ... ২২০
ছায়ার কায়া (গল্প)—শ্রীমৃণাল সেন ৩২৯
ছেলেবেলার কথা (প্রবন্ধ)
এস ওয়াজেদ আলি বি-এ (ক্যান্টাব) বার-এট-ল ৫৫
জনা (গল্প)—শ্রীসুবোধ বসু ... ৩৯৮
জবা ও বকুল (কবিতা)—শ্রীপান্নালাল ভড় ... ৩৫৯
জাফর নগরের শের (শিকার কাহিনী)
শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় ... ৩০১
জার্মানীতে ইঙ্গ মার্কিণ মিতালী (প্রবন্ধ)—শ্রীনগেন্দ্র দত্ত ... ৩২০
জৈন কর্মবাদ (প্রবন্ধ)—ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল,
পি-এচডি, ডি-ফিট ... ১৩১
জৈন কর্মবাদ (প্রবন্ধ)—শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা ... ৪৯৭
তুষার শ্রী (প্রবন্ধ) - শ্রীবিজেন মল্লিক ... ২০৯
তেজিয়সাং ন দোষায় (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ২৯৬
দাদাঠাকুর (কবিতা)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ... ৯২
দাস্য ও গীতাপাঠ (প্রবন্ধ)—শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
এম-এ, বি-এসসি ... ৫৫৪
দুঃশাসন (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ... ৩০৫
দুই শেয়ানের বিবৃতি (প্রবন্ধ) শ্রীনগেন্দ্র দত্ত ... ৫৫০
দুনিয়ার অর্থনীতি (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়
এম-এ ৬৬, ১৬২, ২৬৪, ৩৪৫, ৪৪৯, ৫৪১
দুর্গাপ্রতিমার রূপ কল্পনা (প্রবন্ধ)—শ্রীজনরঞ্জন রায় ... ৪৭৬
দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে প্রদর্শনী (প্রবন্ধ) ... ৬৪
দেবস্ত (প্রবন্ধ)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার ৩৫, ১০৪, ২২৭, ৩৬০
দেহ ও দেহাতীত (উপন্যাস)
শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ ২৭, ১৫০, ২৫২, ৩৩৪, ৪১৯, ৪৮৬
দৈব-দুর্যোগ (গল্প)—শ্রীকানাই বসু ... ৩২
ধান্যাদি খাদ্যশস্য চাষের সমস্যা ও তাহা সমাধানের উপায় নির্দ্দেশ
(প্রবন্ধ)—শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম-এসসি ... ১১
নক্ষত্রপুরুষ (উপন্যাস)—বনফুল ... ৬৯, ১৩৭
নব্য রাসায়নী-শিল্প (প্রবন্ধ)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় ... ২৪০
নর ও নারী (কবিকা)—শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ৪৪১
না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম-এ ... ৩৮৪
নুরেনবার্গের বিচার (প্রবন্ধ)—শ্রীগোরা ... ৫৪৭
নেই তাই খাচ্ছ (গল্প)—শ্রীমোহিতকুমার গুপ্ত ... ১৩৩
নোঙ্গাখালী (কবিতা) - শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী ... ৫৬৫
পথহারা (গল্প)—শ্রীবিমল বসু ... ৪৮
পরমাণু বোমা (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এসসি ... ২০৩
পরীক্ষায় দুর্নীতির কারণ নির্ণয় (প্রবন্ধ)—শ্রীউমাপতি ঘটক ... ২৮৯
পরিহাস (কবিতা)—শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম-এ ... ৩৩৮
পূর্ব্বরাগ ও মিলন (প্রবন্ধ)
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ... ৩০৩
পূজা (গল্প)—শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ... ৩১৪
পৃথিবীবোহন (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ৪৮১
প্রাচীন জ্যোতিষ ও আধুনিক বিজ্ঞানে পৃথিবী (প্রবন্ধ)
শ্রীনিমচাঁদ সাহা ... ৩৩৮
প্রাচীন ভারতের রঙ্গালয় ও রসনিষ্পত্তি (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ এম-এ ... ৩৪৩
প্রৌঢ় (গল্প)—শ্রীজুড়নজীবন মুখোপাধ্যায় ... ১২৪
প্লাসটিকস্ (প্রবন্ধ)—শ্রীসুবর্ণকমল রায় ... ২৫
বঙ্কিম বন্দনা (কবিতা)—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী ... ৪৩২
বহির্বিশ্ব (প্রবন্ধ)—শ্রীনগেন দত্ত ... ৭৬১
বাসক (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এসসি
ও কবিরাজ শ্রীসতীকুমার ভট্টাচার্য্য ... ২৫
বিজয়ী (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ৭৯
বিবর্ত্তন বাদ (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ... ১
বিবেক (গল্প)—শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ১০১
বিন্দুর ছেলে (প্রবন্ধ)—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় ... ১১
বিশ্বের অতীত ও ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)—
অধ্যাপক শ্রীকামিনীকুমার দে এম-এসসি ৫৩
বুলেট বনাম মলাট (গল্প)—আমিনুর রহমান ... ১২
ভগ্নে ছবি (গল্প)—শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় ... ৫১
ভারতে বৃটীশ মন্ত্রীমিশন (প্রবন্ধ)—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ... ৭৬, ১৬৬
ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যবস্থা (প্রবন্ধ)—শ্রীগিরেন্দ্রনাথ সরকার ... ৩১৫
ভারতের পররাষ্ট্রনীতি (প্রবন্ধ)—শ্রীঅতুল দত্ত ... ৫৬০
ভুলো না আমায় (কবিতা)—ভাস্কর ... ২২৬
ভালো (গল্প)—শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত ... ৫০
ভ্রমণ-কাহিনী (প্রবন্ধ)—রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ ১১
মদনপুরে আবিষ্কৃত শ্রীভদ্রদেবের নূতন তাম্রশাসন (প্রবন্ধ)
শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম-এ, পিএচ ডি ... ৫১৩
মনস্তাত্ত্বিক (প্রহসন)—শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় ১১৮, ১৯
মধ্যযুগ সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা (প্রবন্ধ)—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
এম এ, পিএচ-ডি ডি-লিট (লণ্ডন) ... ৪৮৯
মনের প্রকৃতি ও ধর্মভাব (প্রবন্ধ)
রায়বাহাদুর শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ ... ৩৮
মহারাষ্ট্র ভ্রমণ—আলান্দি (প্রবন্ধ)—শ্রীঅবনীনাথ রায় ... ৪০
মহাসাগর (কবিতা (—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ ...
মিটিবে কি এ ক্ষুধা আমার (কবিতা)
শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ ... ৪৫
মায়ের মেয়ে (কবিতা)—শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ এম এ, বি-এল ৫৪০
মিশরের ডায়েরী (ভ্রমণ)
অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী ... ৬১
মৃত্যুর পারে (প্রবন্ধ)—রায় বাহাদুর শ্রীতারকচন্দ্র রায় ... ২
মুক্তিসেনা (কবিতা)—শ্রীশান্তশীল দাশ ... ১৭০
যাত্রী (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণ মিত্র এম-এ ... ৪৯২
যুদ্ধোত্তর বৃটেন ও আমেরিকার রাসায়নিক শিল্প (প্রবন্ধ)
শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন এম-এসসি ... ১০২
যুদ্ধকালীন শিল্প-সংরক্ষণ ব্যবস্থা (প্রবন্ধ)—শ্রীচিন্তামণি কর ... ২৩৫
যোগ-বিয়োগ (গল্প)—শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় ... ৮
যোনিপীঠের কথা (প্রবন্ধ)—শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার
এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি ... ৫০৩
রবীন্দ্রনাথের শেষ রচনা (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
এম-এ, পিএচ-ডি ... ৯৭, ২৫৭
রঘুনাথ গোস্বামী (প্রবন্ধ)—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র ... ৩৯৩
রতের মায়া (গল্প)—শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৯৮
রামায়নে সুন্দরকাণ্ডের অর্থ (প্রবন্ধ)—শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য ৪২৩
রুস-মার্কিণ কূটনৈতিক দাবার চাল (প্রবন্ধ)—শ্রীনগেন্দ্র দত্ত ৪২৪
রমী ও রামানুজ (প্রবন্ধ)—ডক্টর রমা চৌধুরী এম-এ,
ডি-ফিল (অক্সন) এফ আর-এ-এস-বি ... ৪৭৩
লাখো বছরের ইতিহাসে তুমি (কবিতা)
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ... ২৫১

শাক ও গাড়ী (গল্প)—ভাস্কর ... ১৪৪
শিল্পের জয়যাত্রা (প্রবন্ধ)—শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার ... ৩৬৮
শেষ নমস্কার (কবিতা)—শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার ... ৩১
শোক-সংবাদ ... ৪৭০, ৫৭৫
শ্রমিকদলের পররাষ্ট্রনীতি (প্রবন্ধ)—শ্রীনগেন্দ্র দত্ত ... ১৬০
শ্রাবণে (কবিতা)—শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ ... ১০৯
সংকীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপাসনা (প্রবন্ধ)—
শ্রীননীগোপাল গোস্বামী এম-এ ... ৫০৯
তির বিনিময় (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১২৭
ধা (কবিতা) শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ১৯৮
ত (কবিতা) শ্রীবীণা দে ... ১৩৬
া ও সিদ্ধি (গল্প)—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী ... ২৪৪
াম্যবাদী (গল্প)—শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ এম-এ ... ৫৩০
সাময়িকী ৮১, ১৭১, ২৬৭, ৩৭০, ৪৫৯, ৫৬৬
সাম্প্রদায়িকতা (গল্প)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৪৯৩
সাহিত্য সংবাদ ৯৬, ১৯২, ২৮৮, ৩৮৪, ৪৮০, ৫৮০
সিন্ধেকবীরো মঞ্জুশ্রী—বিক্রমপুর (প্রবন্ধ)—
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৩২২
সুলতানা (কবিতা)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ... ৩৮৫
সুন্দরবনের নদীপথে (ভ্রমণ কাহিনী)—
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম-এ, এম এল-এ ... ৫৬
সূর্য্য আর উঠবে না (গল্প)—
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৩
স্তালভেজ (গল্প)—শ্রীসন্তোষকুমার দে ... ৫১৯
স্বাধীনতার রূপান্তর—কোরিয়া (প্রবন্ধ)
শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১, ১২২
স্মৃতি (কবিতা)—শ্রীবামাচরণ কর্মকার ... ৪২৭
হাসি ও অশ্রু (গল্প)—শ্রীমতী মীরা ঘোষ ... ২০৮
হিংসা নিকেশ (নক্সা)—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৫, ৩০৬, ৩৯১
১৬ই আগষ্ট (কবিতা)—শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত ... ৩৩২

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

আষাঢ়—১৩৫৩

১। পার্টের মাঝখানেই ফকির হঠাৎ থেমে গেল, ২। মাদারিপুর, দূর হইতে গোপালন্দ, ৪। বেদুইন পরিচ্ছদে লেখক, ৫। চা-জা জয়াৎউস-সায়, ৬। ধ্যানি বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে লেখক, ৭। সৈনিকদের এক প্রীতি-সম্মেলনে লেখক, ৮। লেখকের হোটেল ভোষাত্রীসহ মেজর জেনারেল এ-সি চ্যাটার্জ্জী, ১০। কলিকাতা প্রশনের নূতন মেয়র—মিঃ এস-এম-ওস্‌মান, ১১। ডেপুটি মেয়র যুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২। হাওড়া পুলের উপর দিয়া ভাযাত্রাসহ মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ ও মহবুব আমেদ, ১৩। া ষ্টেশন হইতে আই এন এ রিলফ অফিস অভিমুখে মোটর যোগে র জেনারেল এ-সি চ্যাটার্জ্জী ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, ১৪। আনন্দপার্কে এক জনসভায় শাহনওয়াজ ও মহবুবের বক্তৃতা, ১৫। গর শ্মশানঘাটে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনে কাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেশবন্ধুপার্কে এক বিরাট জনসভায় শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ন ও সহধর্ম্মিণী, ১৭। কাশীনাথ চন্দ্র, ১৮। প্রফুল্লচন্দ্র বসু। ১৯। প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ২০। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ ার্য্য ২১। বাঁকুড়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক প্রেস রিপোর্টার্স সম্মিলনের অধিবেশন, ২২। ডাঃ শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বসু, ২৩। দ্বিজদাস দত্ত মহানন্দে 'মনোরমা গ্রন্থাগার' ও 'প্রাচ্যভবনের উদ্বোধনী সভা। নূতন বিদ্যালয়।

বহুবর্ণ চিত্র

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুলকালাম আজাদ

শ্রাবণ—১৩৫৩

১। নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন—আড়িয়াদহ, ২। শ্রীযুত সুব্রত চৌধুরী, ৩। শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিদায় সম্বর্দ্ধনা, ৪। শ্রীযুক্ত তীন্দ্রমোহন বাগচীর সভাপতিত্বে নবীনচন্দ্র শতবার্ষিকী, ৫। আচার্য্য ফুল্লচন্দ্রের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত, ৬। সরলা রায়, ৭। মেজর জেনারেল এ-সি চ্যাটার্জ্জীর সভাপতিত্বে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে দেশবন্ধুর মৃত্যুদিবস পালন, ৮। কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক পৌর অভিনন্দনের প্রাক্কালে মেজর জেনারেল এ-সি-চ্যাটার্জ্জী, ৯। মেদিনীপুর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলের সেবাকার্য্যে হোড়শালি দাতব্য চিকিৎসালয়, ১০। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, ১১। শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ, ১২। ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ১৩। কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে দেশবন্ধুর সমাধি মন্দির, ১৪। শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ১৫। ডাঃ মদনমোহন দত্ত।

বহুবর্ণ চিত্র

সাঁচির পল্লী

ভাদ্র—১৩৫৩

১। য়ুরেনিয়মের খনিজ প্রস্তর দিবালোকে গৃহীত ফটো (বামে), অন্ধকারে গৃহীত ফটো (দক্ষিণে) ২। পরমাণু বোমার কারখানা, ৩। বিস্ফোরণের পরবর্ত্তী অবস্থা, ৫। হিরোসিমা নগর, ৬। নাগসাকী নগর, ৭। তুষারপাতে শিমলার দৃশ্য—১-২-৩-৪, ৮। পঙ্কা প্যাকাটির উপর স্যুট চড়িয়ে, ৯। কৌশল্যা-মক্ষদা সংবাদ, ১০। রঙ্গীন কাচ নির্ম্মিত চিত্র-ফলকের পুনরুদ্ধার, ১১। পারীর নেতরদাম গীর্জ্জা ও সাঁ জোয়ারয়া লোজেরোয়া গীর্জ্জার প্রবেশদ্বার ১২। লুভরএ রক্ষিত কাষ্ঠনির্ম্মিত যীশুর শয়ান মূর্ত্তি, ১৩। লুভরএ রক্ষিত মাতৃমূর্ত্তি এবং প্লাস ভ লাঁ কঁকদ-এ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত মারচির অশ্ব ১৪। ভূগর্ভস্থ কক্ষে রক্ষিত মূর্ত্তিসমূহ, ১৫। লুভরের প্রসিদ্ধ ডায়নামা ১৬। লুভরএ পনঃ প্রতিষ্ঠিত সামোথাসের বিনয় মূর্ত্তি, ১৭। সাযুলপিসের ভূগর্ভস্থ খিলানে রক্ষিত মূর্ত্তিসমূহ, ১৮। পারীর অপেরা ভবনের প্রসিদ্ধ নৃত্যকারীর মূর্ত্তি, ১৯। কলিকাতায় মহিলা সম্মিলনে সমাগত শ্রীযুক্ত হংস মেটা ও রাজকুমারী অমৃত কাউর, ২০। ডাকধর্ম্মঘটের জন্য বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আগত আর-এম-এসএর খালি কামরা, ২১। ডাক ধর্ম্মঘটের ফলে সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে সশস্ত্র পুলিস পাহারা, ২২।

ডাক ধর্ম্মঘটে কর্মীশূন্য জি-পি-ওতে কর্মরত ঘড়ি, ২৩। ডাক ধর্ম্মঘটে তালাবন্ধ অবস্থায় বেঙ্গল টেলিফোনের বড়বাজার শাখা, ২৪। পরিষদ গৃহে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের ভাষণ, ২৫। কাঁটালপাড়া বঙ্কিম জন্মোৎসবে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ, ২৬। ৺প্রতাপচন্দ্র মুখার্জ্জি, ২৭। শা-নগর শ্মশানঘাটে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজা, ২৮। পরিষদ ভবনের প্রাঙ্গণে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এচ-এস সুরাবর্দী কর্ত্তৃক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আশ্বাস দান, ২৯। টেলিফোন অফিসের সম্মুখে মহিলা ধর্ম্মঘটী, ৩০। প্রতিবেশীবৃন্দসহ কবি কুমুদরঞ্জন, ৩১। ধর্ম্মঘটকালে দিবাভাগে কর্ম্মীগণ রুদ্ধদ্বার জি-পি-ও, ৩২। সাহিত্যবাসরের উদ্যোগে কালিদাস উৎসব, ৩৩। রাজবন্দীদের মুক্তি দাবীতে কলিকাতায় নারী শোভাযাত্রী, ৩৪। ধর্ম্মঘটের সময় জি-পি-ওতে পত্রসংগ্রহার্থীর ভীড়, ৩৫। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, ৩৬। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের উদ্যোগে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে মহিলা সভা, ৩৭। রায়সাহেব শশিভূষণ পাল, ৩৮। জি-পি-ওর সম্মুখে প্রেসিডেন্সী পোষ্ট মাষ্টার, ৩৯। ডাক ধর্ম্মঘটে জনবিরল জি-পি-ওর সেভিং ব্যাঙ্কের সম্মুখের দৃশ্য।

বহুবর্ণ চিত্র

ঝাণ্ডী-রাণী বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়িকা—লক্ষ্মী স্বামীনাথম্

আশ্বিন—১৩৫৩

১। মঞ্জুশ্রী, ২। বাঙ্গালীর বার্থরাইট, ৩। জাফরনগরের নিহত শের, ৪। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, ৫। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ৬। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, ৭। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ্ সায়েন্স গবেষণাগারের এক অংশ, ৮। ভারতবর্ষে ন্যাথামেটিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরীর একটি পুরাতন কারখানা, ৯। দক্ষিণ ভারতে রাসায়নিক কারখানার অন্য অংশ, ১০। দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের একটি অংশ, ১১। দাঙ্গার ফলে একটি ত্রিতল গৃহের অবস্থা, ১২। একটি ভস্মীভূত বস্তির দৃশ্য, ১৩। একটি বিখ্যাত বস্তির ভস্মীভূত অবস্থা, ১৪। একটি অগ্নিদগ্ধ বস্তি, ১৫। দাঙ্গার কয়দিন পরে একটি বাজারে খাদ্যান্বেষী জনতার ভীড়, ১৬। কলেজ ষ্ট্রীটে অগ্নিদগ্ধ ডালিয়া ১৭। কলিকাতার রাজপথে দাঙ্গাজনিত মৃত্যুলীলা, ১৮। একটি দগ্ধপ্রায় মোটর লরী, ১৯। হত্যালীলার অপর এক মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য, ২০। কলিকাতার রাজপথে শবের দৃশ্য, ২১। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিন কলিকাতার পথে পথে অগ্নিলীলা, ২২। কলিকাতার পথ মিলিটারী পাহারাধীন, ২৩। ঢাকা বাড্ডানগর নট্র পাড়ার লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত অবস্থা, ২৪। সোণারটুলির শীতলা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, ২৫। নবাবগঞ্জের একটি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত মুদীর দোকান, ২৬। নবাবগঞ্জের অপর একখানি মুদীর দোকানের লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত অবস্থা, ২৭। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডাক, তার ও আর-এম-এস ধর্ম্মঘটী কর্মচারীদের মিলিত আলোচনা, ২৮। মহারাজা সার যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, ২৯। কুমারী লীলা রায়, ৩০। ভবাণীচরণ লাহা, ৩১। খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৩২। প্রথম চৌধুরী।

বহুবর্ণ চিত্র

রাগিণী টোরি

কার্ত্তিক—১৩৫৩

১। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ সপ্তগ্রামে রাজবংশের রাধাকৃষ্ণের মন্দির ধ্বংস করিলে বিগ্রহকে এইস্থানে প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, ২। সপ্তগ্রাম অন্তর্গত কৃষ্ণপুরে শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাট, ৩। আলান্দির দৃশ্য—দূর হইতে, ৪। জ্ঞানেশ্বরের সমাধি মন্দিরের একাংশ, ৫। নৃসিংহ সরস্বতীর সমাধি মন্দির, ৬। গোরা কুম্ভকারের মন্দির, ৭। জ্ঞানেশ্বরের আজ্ঞাচলিত দেওয়ান, ৮। ইন্দ্রায়নী নদী ও তাহার তাহার পুল, ৯। কন্যা কুমারীর পথে ১০। শ্রীপদ্মলাভ স্বামীর মন্দির, ১১। রাজপ্রাসাদ—ত্রিবান্দ্রাম ১২। কেপ কুমারী, ১৩। শচীন্দ্রামের মন্দির ১৪। ঠাকুরের ফুটবল খেলা, ১৫। নটরাজ নৃত্য, ১৬। গত দারুণ বারি পাতে[illegible] জলপ্লাবিত কলিকাতার হেদুয়া, ১৭। কলিকাতার পথঘাট জলমগ্ন—চিৎপুর এবং বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল, ১৮। কলিকাতার পথে নৌকা, ১৯। অন্তবর্ত্তী সরকারের সদস্যবৃন্দ ও বড়লাট, ২০। গড়ীয়াহাটা রোডস্থ ম্যাণ্ডেভেলী গার্ডেনএর সম্মুখভাগে জলস্রোত, ২১। কলিকাতা লেকের নিকট সদার্ণ এভেনিউর প্লাবণ দৃশ্য, ২২। শ্রীমাণিকলাল দত্ত, ২৩। রাণাঘাট স্পোর্টিং এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জ্জীর সম্বর্দ্ধনা, ২৪। শ্রীমতী প্রভাবতী বাগচি, ২৫। রাজবন্দীদের মুক্তি প্রার্থনায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরাট জনতা, ২৬। ময়দানে মনুমেণ্টের পাদদেশে এক বিশাল জনসভায় ডাক তার টেলিফোন ও আর-এম-এসের ধর্ম্মঘটীদের মিলন, ২৭। কলিকাতা রেডিও অফিসের ধর্ম্মঘটে পুলিশ, ২৮। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের কার্য্যালয়ের সম্মুখে ছাত্রী পিকেটার্সদের প্রতি পুলিশের অনাচার, ২৯। নূতন দিল্লীর নিখিল ভারত চিত্র ও শিল্পী সম্প্রদায়ের ব্যবস্থাপনার এক চিত্র প্রদর্শনীতে বড়লাট ও সার উবানাথ সেন, ৩০। ধর্ম্মঘটী টেলিফোন মহিলা কর্ম্মীবৃন্দ ৩১। মুক্তরাজবন্দীগণ ৩২। জ্যোতিষচন্দ্র গুহ, ৩৩। কিশোরীমোহন চৌধুরী ৩৪। গোষ্ঠবিহারী দে, ৩৫। পণ্ডিত কান্তিচরণ ভট্টাচার্য্য।

বহুবর্ণ চিত্র

দুর্গম পথের যাত্রী

অগ্রহায়ণ—১৩৫৩

১। মদনপুরে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্র-দেবের নূতন তাম্রশাসন—সম্মুখের পৃষ্ঠা, ২। মদনপুরে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্র-দেবের নূতন তাম্রশাসন—পশ্চাতের পৃষ্ঠা, ৩। ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুলকালাম আজাদ ও লেখক, ৪। মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, ৫। যাদুকর পি-সি-সরকার, ৬। বিছানায় পিকেটিং, ৭। রাঘব মিত্র, ৮। করাল কেবিন, ৯। বং—রোম্যান, ১০। নোয়াখালী দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, আচার্য্য কৃপালনী ও তদীয় পত্নী এবং মিঃ সুরাবর্দী, ১১। দম-দমে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, ১২। লালবাজার কণ্ট্রোলরুমে কলিকাতা দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের সভাপতি স্যার পেট্রিক স্পেন্স, ১৩। গৌহাটী এম-ই-এস ক্যাম্পের আফিসের সম্মুখে, ১৪। গৌহাটী ক্যাম্পে নোয়াখালী হইতে আগত রমণীগণ, ১৫। ভারত-আফগান-সীমান্ত খাইবারের নিকট সদলবলে পণ্ডিত নেহরু ১৬। সীমান্ত [illegible] কালে খাইবার পাশ এলাকায় বিক্ষোভকারিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত [illegible] নেহরু ও তাঁহার মোটরকার ১৭। রাজমাক নামক স্থানে [illegible] উপজাতি নেতাদের সহিত করমর্দ্দনরত পণ্ডিত নেহরু [illegible] বিমানের গবাক্ষ পথে মিঃ এইচ-এস-সুরাবর্দীর নোয়াখালী [illegible] ১৯। কলিকাতার দ্বিতীয়বার হাঙ্গামার পর একটি বিশিষ্ট রাস্তা দৃশ্য—স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা, ২০। শিয়ালদহ ষ্টেশনে চাঁদপুর নোয়াখালী হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থিগণ, ২১। আজাদ-হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবসে নেতাজী ভবনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু [illegible] শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রদীপ দান, ২২। কলিকাতা মিউজিয়ম নানা স্থান হইতে উদ্ধার করা বহু প্রকার বাদ্যযন্ত্র ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, ২৩। মিউজিয়মে কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে পুলিশের দ্বারায় উদ্ধার-করা নানা রকম মারাত্মক ছোরা [illegible] ২৪। মিউজিয়মে রক্ষিত লুটের মাল—সুটকেশ প্রভৃতি, ২৫। দম-দম বিমান ঘাঁটিতে অন্তর্বর্তী-সরকারের সদস্যবৃন্দ, ২৬। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ২৭। ত্রৈলোক্যনাথ স্মৃতিভূষণ ৫৭৬।

বহুবর্ণ চিত্র—ধ্যানভঙ্গ